পবিত্র কোরআন-হাদিস ও নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিকদের আলোচনা থেকে সংকলিত

সহজ কাসাসুল আম্বিয়া

(তথ্যনির্ভর নবীজীবনী)

মূল

আল্লামা ইবনে কাসীর রহ.

ও

মাওলানা হিফযুর রহমান রহ.

সংকলন ও বিন্যাস

মাওলানা সাদ আবদুল্লাহ মামুন

শিক্ষক, জামিয়া ইমদাদিয়া দারুল উলুম

মুসলিম বাজার, মিরপুর-১২ ঢাকা।

সম্পাদনায়

হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

শায়খুল হাদীস, মাদরাসা দারুর রাশাদ

পল্লবী, মিরপুর-১২ ঢাকা।

আল-কাউসার প্রকাশনী

ইসলামী টাওয়ার, ১১, বাংলাবাজার ঢাকা

পাঠক বন্ধু মার্কেট, ৫০, বাংলাবাজার ঢাকা

মোবা : ০১৭১৬৮৫৭৭২৮ ফোন : ৭১৬৫৪৭৭

প্রকাশক
মুহাম্মদ এণ্ড ব্রাদার্স
বাসা নং : ২১৭, ব্লক : ত,
মিরপুর-১২ পল্লবী, ঢাকা।

সংশোধিত সংস্করণ
যিলক্বাদ ১৪৩৫হি. সেপ্টেম্বর ২০১৪ঈ.

মূল্য
ছয়শত দশ টাকা মাত্র

অঙ্গসজ্জা
আল-কাউসার কম্পিউটার্স

মুদ্রণ
মেসার্স জননী প্রিন্টার্স, বাংলাবাজার ঢাকা।

প্রসঙ্গ কথা

এ সুন্দর বসুন্ধরায় যখন মানব জাতির আবির্ভাব ঘটে, তখন থেকে যুগের আবর্তন-বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানবজাতির মধ্যে বিভিন্ন পথভ্রষ্টতার প্রাদুর্ভাব ঘটে। এমনকি তারা তাওহিদের পরিবর্তে শিরক তথা বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করতে শুরু করে। তাদের সংশোধনের জন্য আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে অসংখ্যা নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। এ মহামনীষীগণ পথহারা মানুষকে আল্লাহ তাআলার সঠিক পথে পরিচালনা করার জন্য নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। দীনের দুশমনেরা তাদের প্রতি সীমাহীন নির্যাতন চালিয়েছে। কোনো নবীকে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছে, কাউকে হত্যা করা হয়েছে, কাউকে করাত দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে। কিন্তু তাদের এ দৃঢ়তার মধ্যে কোনো দুর্বলতা দেখা দেয় নি। দীনের প্রচার-প্রসারের জন্য তাঁরা জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত মেহনত চালিয়েছেন।

'সহজ কাসাসুল আম্বিয়া' পবিত্র কোরআন-হাদিস ও নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিকদের আলোচনা থেকে সংকলিত নবী-রাসূলগণের জীবনীতিহাস। যা **'আল-কাউসার প্রকাশনী**র সুন্দর অনুবাদ, সংকলন, সংগ্রহ, অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনার ধারাবাহিকতা রক্ষায় এক নব দিগন্তের উন্মোচন। এ গ্রন্থটি প্রসিদ্ধ মুফাসসিরে কোরআন, মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনে কাসীর কুরাইশী রহ. এর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া', মাওলানা হিফজুর রহমান রহ. রচিত 'কাছাছুল কুরআন', মুফতি মুহাম্মদ শফী রহ. রচিত 'সীরাতে খাতামুল আম্বিয়া'-সহ অন্যান্য তথ্যনির্ভর কিতাব থেকে সংকলন করা হয়েছে।

গ্রন্থটি সংকলন করেছেন মাওলানা সাদ আবদুল্লাহ মামুন, ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ সোহরাব হোসেনসহ অনেকে। কম্পোজে সহযোগিতা করেছেন মাওলানা শাহজালাল ও মুহাম্মদ যিকরুল্লাহ। অঙ্গসজ্জা মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াসিন। প্রুফ রিডিং ও সম্পাদনা করেছেন হাফেয মাওলানা আইয়ুবুর রহমান ও মাওলানা ছায়াদুল্লাহ শিকদার।

গ্রন্থটির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

(১) সর্বসাধারণের দিকে লক্ষ্য রেখে ভাষা সহজ ও সাবলীল করা হয়েছে।
(২) শিক্ষিত সমাজ ও গবেষকদের সুবিধার্থে তথ্যসূত্র উল্লেখ করা হয়েছে।
(৩) কোরআনুল কারিমের প্রতিটি আয়াতের পারা ও পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে।
(৪) উল্লিখিত বিষয়গুলোকে শিরোনাম ও উপশিরোনামে সাজানো হয়েছে।
(৫) যথাসম্ভব ইসরাইলি রেওয়ায়েত থেকে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে।
(৬) মিথ্যা ও অলীক রেওয়ায়েত পরিহার করে যথাসম্ভব নির্ভরযোগ্য ও সঠিক বরাত যাচাই করে গ্রহণ করা হয়েছে।
(৭) নবী-রাসূলগণের প্রেরিত এলাকা, তাদের হিজরত ও দাওয়াতের এলাকাসমূহের ভৌগলিক সীমারেখা ও ম্যাপ উপস্থাপন করা হয়েছে।

আমাদের সার্বিক দুর্বলতার কারণে যদি কিতাবে কোনো ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় তাহলে মেহেরবানি করে জানালে কৃতজ্ঞ হবো। পরবর্তী মুদ্রণে তা শুদ্ধ করে নেবো, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা আমাদের মেহনতকে কবুল করুন। আমিন।

বিনীত
প্রকাশক

সূচিপত্র

হযরত ইদরীস আ.

হযরত নূহ আ.

হযরত হুদ আ.

হযরত ছালেহ আ.

হযরত ইবরাহীম আ.

হযরত লুত আ.

হযরত ইসমাঈল আ.

হযরত ইসহাক আ.

হযরত ইয়াকুব আ.

হযরত ইউসুফ আ.

হযরত শুআইব আ.

হযরত আইয়ুব আ.

হযরত যুলকিফ্ল আ.

হযরত ইউনুস আ.

হযরত মূসা আ.

হযরত হারূন আ.

হযরত খিযির আ.

হযরত ইউশা ইবনে নূন আ.

হযরত হিযকিল আ.

হযরত ইলিয়াস আ.

হযরত আলইয়াসা আ.

হযরত শামুয়েল আ.

হযরত দাউদ আ.

হযরত সুলাইমান আ.

হযরত দানিয়াল আ.

হযরত উযায়ের আ.

হযরত যাকারিয়া আ.

হযরত ইয়াহইয়া আ.

হযরত লোকমান আ.

হযরত যুলকারনাইন

ইয়াজুজ-মাজুজ

হযরত ঈসা আ.

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

প্রথম হিজরি
ইসলামে জিহাদের বিধান ও অনুমোদন

দ্বিতীয় হিজরি
কেবলা পরিবর্তন, বদরের যুদ্ধ
এবং সারিয়ায়ে আবদুল্লাহ বিন জাহাশ

তৃতীয় হিজরি

গাযওয়ায়ে ওহুদ ও গাযওয়ায়ে গাতফান

চতুর্থ হিজরি

পঞ্চম হিজরি

গাযওয়ায়ে আহযাব বা খন্দকের যুদ্ধ

ষষ্ঠ হিজরি

হোদায়বিয়ার সন্ধি, বাইয়াতে রিদওয়ান, রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে ইসলামের দাওয়াত

সপ্তম হিজরি

অষ্টম হিজরি

মুতার যুদ্ধ ও মক্কা বিজয়

নবম হিজরি

তাবুক যুদ্ধ, হাজ্জুল ইসলাম, প্রতিনিধি দলের আগমন এবং দলে দলে ইসলাম গ্রহণ

দশম হিজরি

একাদশ হিজরি

সারিয়ায়ে উসামা, রোগ ও মৃত্যু

আল্লামা ইবনে কাসীর রহ.-এর

সংক্ষিপ্ত জীবনী

(৭০১-৭৭৪ হি.)

জন্ম ও বংশ পরিচয় : আবুল ফিদা ইসমাইল ইবনে উমর ইবনে দু ইবনে কাসীর ইবনে দিরা আল-কোরাইশি। তিনি কোরাইশের সম্ভ্রান্ত গোত্রের বনি হাসালা শাখার 'বুসরা'র অন্তর্গত 'মিজদাল' নামক জনপদে ৭০১ হিজরি সনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা খতিব শিহাবুদ্দীন আবু হাফস উমর ইবনে কাসীর রহ.। তিনি একজন স্বনামধন্য আলেম ও কবি ছিলেন।

প্রাথমিক শিক্ষা : শৈশব থেকেই ইবনে কাসীর রহ. প্রখর মেধাশক্তির অধিকারী ছিলেন। দশ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই তিনি কোরআন মাজিদ হেফয করেন।

শৈশব ও যৌবন : ইবনে কাসীর রহ. তাঁর সহোদর আবদুল ওয়াহাব রহ.-এর তত্ত্বাবধানে শৈশবকাল অতিবাহিত করেন। তিনি হিজরি ৮ম শতাব্দীতে মামলুক সুলতানদের শাসনামলে তাঁর যৌবনকাল অতিবাহিত করেন। তাতারীদের আক্রমণ, একাধিক দুর্ভিক্ষ, হৃদয় বিদারক দুর্যোগগুলো তিনি স্বচক্ষে দেখেন। তিনি ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে সংঘটিত ক্রুসেড যুদ্ধগুলোও দেখেছেন।

হাদীস শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য : তৎকালীন সময়ে প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস শায়খ 'মিয্যী' রহ.-এর কাছে তিনি হাদিস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি তাঁর সমসাময়িক যুগের শ্রেষ্ঠ ইতিহাসবিদ, হাদিস বিশারদ, তাফসিরকারক ও গণিত শাস্ত্রবিদ হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

জ্ঞান-গরিমার স্বীকৃতি : আল্লামা সুয়ূতী রহ. তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, 'তার তাফসির গ্রন্থটি অভূতপূর্ব। এ পদ্ধতিতে আর কোনো তাফসির গ্রন্থ সংকলিত হয় নি।" আল্লামা যাহাবি রহ.-এর পর তিনি 'উম্মুস সাওয়াত তানাক্কুরিয়া' মাদরাসায় অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তিনি ৭৪৮ হিজরি সনে ফাওকানি বিশ্ববিদ্যালয়েও অধ্যাপনা করেন।

রচনাবলী : ইবনে কাসির রহ. বিশেষত ইতিহাস, তাফসির ও হাদিস বিষয়ে প্রচুর গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে ৭টিরও বেশি পাওয়া যায়। তাঁর অপ্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে ১২টিরও বেশি সন্ধান পাওয়া যায়।

মৃত্যু : ৭৭৪ হিজরি সনে ২৬ শে শাবান বৃহস্পতিবার এ মহামনীষী বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী আল্লাহ তাআলার সান্নিধ্যে পাড়ি জমান। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তাঁর জানাযায় বহু লোকের সমাগম ঘটে। অসিয়ত অনুসারে তাঁকে দামেশকের বাব আন-নাসর- সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত সুফিদের কবরস্থানে শায়খুল ইসলাম আল্লামা তাকিউদ্দীন ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর পাশে দাফন করা হয়।

প্রথম মানব হযরত আদম আ.

বর্তমানকালের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষ সৃষ্টির ধারণা হলো, 'ক্রমোন্নতি' বা ধাপে ধাপে উন্নতি। বিজ্ঞানীদের মতে প্রাণীজগৎ প্রথমে ছিল নির্জীব পদার্থ। তারপর উদ্ভিদ জাতীয় বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করে লাখ লাখ বছর অতিক্রমের পর ধাপে ধাপে উন্নতি করে প্রথমে জোঁকের রূপ ধারণ করে। এরপর এরূপ বিভিন্ন প্রাণীর ছোট বড় রূপ ধারণ করতে করতে অবশেষে মানব আকৃতিতে স্থিতি লাভ করেছে।

কিন্তু ধর্মীয় মত হলো, মহাবিশ্বের স্রষ্টা মহান আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিজগতের প্রথম মানব হযরত আদম আ.-কে মানব আকৃতিতেই সৃষ্টি করেছেন। তারপর আদম আ.-থেকে হযরত হাওয়া আ.-কে অস্তিত্বে এনে ধারাবাহিকভাবে মানব জাতির বংশ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করেছেন। আর আদম আ. হলেন সেই মানুষ, বিশ্ব প্রতিপালক যাকে সকল সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। আল্লাহ পাক শরিয়তের গুরুদায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পণ করেছেন। এবং সমস্ত সৃষ্টিকে তাঁর বাধ্যগত করে আল্লাহ পাক পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধিত্বের মহান দায়িত্ব দান করেছেন। আল্লাহ পাক এ সম্পর্কে বলেন :

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

"আমি আদমকে পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি নিযুক্ত করব।" (সূরা বাকারা : ৩০)

আল্লাহ পাক হযরত আদম আ.কে সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে যেমনি শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান দান করেছেন, তেমনি তাকে সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টির সুন্দরতম অবয়বে। আল্লাহ পাক বলেন :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

"আর নিঃসন্দেহে আমি আদম সন্তানদেরকে সকল সৃষ্টির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান দান করেছি।" (সূরা বনি ইসরাইল : ৭০)

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

"নিঃসন্দেহে আমি মানুষকে অতি উত্তম গঠনে সৃষ্টি করেছি।" (সূরা তীন : ৪)

আদি মানব হযরত আদম আ. ক্রমোন্নতি মতবাদ অনুযায়ী ধাপে ধাপে উন্নীত হয়ে মানবাকৃতি ধারণ করেছেন, না কি সৃষ্টির শুরু থেকেই মানবরূপে অস্তিত্ব লাভ করেছেন এ ব্যাপারে মতভেদ যা-ই থাকুক, বিবেক ও ধর্ম এ কথায় অবশ্যই একমত, বর্তমানে এ মানবজাতি সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠসৃষ্টি এবং জ্ঞান বুদ্ধি-বিবেকসম্পন্ন। এ গঠনাকৃতিকেই তার ভালো-মন্দ কাজের জন্য আল্লাহ পাকের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। এটাই আল্লাহর নির্ধারিত বিধান।

বলা যায়, মানুষের কার্যকলাপ, ইলম-আমল, চরিত্র ইত্যাদির প্রেক্ষিতে তার অস্তিত্ব লাভের বিশদ বিবরণ কী, এর তেমন গুরুত্ব নেই। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, সৃষ্টিজগতে

তার অস্তিত্ব কি নিরর্থক ও উদ্দেশ্যহীনভাবেই এসেছে, না কি কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে? তার কার্যাবলী ও উক্তিসমূহের ফলাফল কি একেবারেই উদ্দেশ্যহীন? তার জড় দেহ ও আধ্যাত্মিক মর্যাদা সবই কি অর্থহীন নিষ্ফল, না কি মূল্যবান প্রতিফলের অধিকারী ও তাৎপর্যপূর্ণ?

এ সকল প্রশ্নের উত্তর যদি নেতিবাচক না হয়ে ইতিবাচক হয়, তবে স্বতঃসিদ্ধভাবে মেনে নিতে হবে, মানব সৃষ্টির অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনার পরিবর্তে পৃথিবীতে তার অস্তিত্ব লাভের উদ্দেশ্যের প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল করা উচিত। মনে রাখতে হবে, সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টির অস্তিত্বের পেছনে এক মহান উদ্দেশ্য রয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক বলেন–

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى

"মানুষ কি এরূপ ধারণা করে নিয়েছে, তাদেরকে উদ্দেশ্যহীনভাবে পরিহার করা হবে।"

বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন এ আকৃতিকে সমগ্র সৃষ্টিজগতের সেরা বানিয়ে তাকে প্রদান করা হয়েছে ভালো-মন্দ পার্থক্যকরণের শক্তি। মন্দ হতে দূরে থাকার এবং ভালোকে গ্রহণ করার জন্য দেওয়া হয়েছে পথ-নির্দেশনা। আল্লাহ্ তাআলা বলেন :

خَلَقَهُ ثُمَّ هَدَى

"আল্লাহ পাক মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তাকে ভালো-মন্দের পথ দেখিয়েছেন।

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ

অনন্তর আমি মানুষকে ভালো ও মন্দ উভয় পথ প্রদর্শন করেছি।"

কোরআন মাজিদের উপদেশ ও দাওয়াত, সকল আদেশ-নিষেধ, হেদায়াত ও পথ প্রদর্শনের লক্ষ্যস্থল এবং দুনিয়া ও আখেরাতের কেন্দ্রস্থল এ জীব অস্তিত্বই; যাকে মানুষ নামে আখ্যায়িত করা হয়। এ কারণেই কোরআন মাজিদে আদি মানবের সৃষ্টির অবস্থা ও বিস্তারিত বিবরণ প্রদান না করে তার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের বিধানাবলীর প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

কোরআনুল কারিমের আলোকে হযরত আদম আ.

পবিত্র কোরআনুল কারিমে হযরত আদম আ.-এর নাম ২৫ বার এসেছে। কোরআন মাজিদে পয়গম্বরগণের আলোচনায় সর্বপ্রথম হযরত আদম আ.-এর আলোচনা এসেছে। সূরা বাকারা, আরাফ, ইসরা, কাহাফ এবং ত্বহায় তাঁর নাম, গুণাবলী ও কার্যাবলীর আলোচনা হয়েছে। সূরা হিজর ও ছোয়াদে শুধু গুণাবলী এবং সূরা আল-ইমরান, মায়েদা, মারইয়াম এবং ইয়াসিনে আনুসাঙ্গিকরূপে শুধু নামের উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٣٠) وَعَلَّمَ

آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٣١) قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (٣٢) قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (٣٣) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (٣٤) وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (٣٥) فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ (٣٦) فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (٣٧) قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٣٨) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"স্মরণ করো, যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি। তারা বলল : আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যে অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে? আমরাই তো আপনার সপ্রশংস স্তুতি ও পবিত্রতা ঘোষণা করি। তিনি বললেন, আমি যা জানি তোমরা জান না।" এবং তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন, তারপর তিনি সমুদয় ফেরেশতার সম্মুখে তা প্রকাশ করলেন এবং বললেন, তোমরা আমাকে এ সবের নাম বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও! তারা বলল, আপনি মহান, পবিত্র! আপনি আমাদের যা শিক্ষা দিয়েছেন, তা ছাড়া আমাদের তো কোনো জ্ঞানই নেই। বস্তুত আপনি মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়।

তিনি বললেন, হে আদম! তাদেরকে এ সবের নাম বলে দাও। যখন সে তাদেরকে এ সবের নাম বলে দিল– তিনি বললেন : আমি কি তোমাদের বলি নি, আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর অদৃশ্য বস্তু সম্বন্ধে আমি নিশ্চিতভাবে অবহিত এবং তোমরা যা প্রকাশ কর আর যা গোপন কর, আমি তা-ও জানি? আর যখন ফেরেশতাদের বললাম, তোমরা আদমকে সিজদা করো! তখন ইবলীস ছাড়া সকলেই সিজদা করল। সে অমান্য করল ও অহংকার করল। সুতরাং সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। এবং আমি বললাম, হে আদম! তুমি ও তোমার সঙ্গিনী জান্নাতে বসবাস কর এবং যেথায় ইচ্ছে আহার করো; কিন্তু এ বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না। তা হলে তোমরা অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু শয়তান সেখান থেকে তাদের পদস্খলন ঘটাল এবং তারা যেখানে ছিল সেখান থেকে তাদের বিতাড়িত করল। আমি বললাম : তোমরা একে অন্যের শত্রুরূপে নেমে যাও আর পৃথিবীতে কিছুকালের জন্য তোমাদের রইল বসবাস ও জীবিকা। তারপর

আদম তার প্রতিপালকের কাছ থেকে কিছু বাণী প্রাপ্ত হলো। আল্লাহ তার প্রতি ক্ষমাপরবশ হলেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু। আমি বললাম, তোমরা সকলেই এ স্থান থেকে নেমে যাও। পরে যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সৎপথের কোনো নির্দেশ আসবে, তখন যারা আমার সৎপথের অনুসরণ করবে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। যারা কুফরি করবে ও আমার নির্দেশসমূহ অস্বীকার করবে, তারাই হবে জাহান্নামী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

(সূরা বাকারা : ৩০-৩৯)

অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন–

إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٥٩)

"আল্লাহর কাছে ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্তের মতো। আল্লাহ তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছিলেন। তারপর তাকে বলেছিলেন, হও! ফলে সে হয়ে যায়।"

(আল-ইমরান : ৫৯)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, তিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন। এবং তাদের দু'জন থেকে বিস্তার করেছেন বহু নর-নারী। আর সেই আল্লাহকে ভয় করো, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচনা কর এবং সতর্ক থাকো আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে। আল্লাহ তোমাদের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।" (সূরা নিসা : ১)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

"তিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার সঙ্গিনী, যাতে সে তার কাছে প্রশান্তি লাভ করে।" (সূরা আ'রাফ : ১৮৯)

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (١١) قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (١٢) قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ (١٣) قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (١٤) قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (١٥) قَالَ فَبِمَا

أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ (١٦) ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ (١٧) قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ (١٨) وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (١٩) فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ (٢٠) وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ (٢١) فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ (٢٢) قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٢٣) قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ (٢٤) قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ (٢٥)

"আমিই তোমাদের সৃষ্টি করেছি, তারপর রূপদান করেছি, তারপর ফেরেশতাদের বলেছি আদমকে সিজদা করতে। তখন ইবলিস ছাড়া সকলেই সিজদা করে; সে সিজদাকারীদের দলভুক্ত হয় নি।" তিনি বললেন, "আমি যখন তোমাকে আদেশ দিলাম তখন সিজদা করা থেকে কী সে তোমাকে বারণ করল? সে বলল, আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ; আমাকে তুমি আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছ আর তাকে সৃষ্টি করেছ কাদা মাটি দিয়ে। তিনি বললেন, এখান থেকে তুমি নেমে যাও– এখানে থেকে তুমি অহংকার করবে, তা হতে পারে না। সুতরাং তুমি বের হয়ে যাও, তুমি অধমদের অন্তর্ভুক্ত।" সে বলল, পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত তুমি আমাকে অবকাশ দাও। তিনি বললেন, যাদেরকে অবকাশ দেওয়া হয়েছে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হলে। ইবলিস বলল, তুমি আমাকে শাস্তি দান করলে, তাই আমিও নিঃসন্দেহে তোমার সরল পথে মানুষের জন্য ওঁৎ পেতে থাকব। তারপর আমি নিশ্চয় তাদের সম্মুখ, পশ্চাৎ, ডান ও বাম দিক থেকে তাদের কাছে আসব আর তুমি তাদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞ পাবে না।" তিনি বললেন, "এখান থেকে তুমি ধিকৃত ও বিতাড়িত অবস্থায় বের হয়ে যাও; মানুষের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে, নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবই। আর বললাম, হে আদম! তুমি ও তোমার সঙ্গিনী জান্নাতে বসবাস করো এবং যেখান থেকে যা ইচ্ছে আহার কর; কিন্তু এ গাছের নিকটবর্তীও হয়ো না। অন্যথায় তোমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।" তারপর তাদের গোপন করে রাখা লজ্জাস্থান তাদের কাছে প্রকাশ করার জন্য শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিল এবং বলল, পরে না তোমরা ফেরেশতা হয়ে যাও কিংবা তোমরা চিরস্থায়ী হও– এ জন্য তোমাদের প্রতিপালক এ বৃক্ষ সম্বন্ধে তোমাদের নিষেধ করেছেন। এবং সে তাদের উভয়ের কাছে শপথ করে বলল, আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষীদের একজন।

এভাবে সে প্রবঞ্চনা দ্বারা তাদের অধঃপতিত করল। তারপর যখন তারা সে বৃক্ষফল আস্বাদন করল, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তারা জান্নাতের পাতা দিয়ে নিজেদের ঢাকতে লাগল। তখন তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, আমি কি তোমাদের এ বৃক্ষের নিকটবর্তী হতে নিষেধ করি নি এবং আমি কি তোমাদেরকে বলি নি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? তারা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করেছি, তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না কর এবং দয়া না কর; তা হলে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব। তিনি বললেন, তোমরা একে অন্যের শত্রুরূপে নেমে যাও এবং পৃথিবীতে কিছু দিনের জন্যে তোমাদের রইল আবাসন ও জীবিকা। তিনি বললেন : সেখানেই তোমরা জীবন যাপন করবে, সেখানেই তোমাদের মৃত্যু হবে এবং সেখান থেকেই তোমাদের বের করে আনা হবে। (সূরা আরাফ : ১১-২৫)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন–

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى

"এ (মাটি) থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছি, তাতেই তোমাদের ফিরিয়ে দেব এবং সেখান থেকেই পুনরায় তোমাদের বের করে আনব।" (সূরা ত্বহা : ৫৫)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (٢٦) وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ (٢٧) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (٢٨) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (٢٩) فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (٣٠) إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ (٣١) قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ (٣٢) قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (٣٣) قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (٣٤) وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ (٣٥) قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (٣٦) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (٣٧) إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (٣٨) قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٣٩) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (٤٠) قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ (٤١) إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ (٤٢) وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ (٤٣) لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ (٤٤)

"আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি ছাঁচে-ঢালা শুকনো ঠনঠনে মাটি থেকে এবং তার পূর্বে সৃষ্টি করেছি জিন জাতিকে অতি উষ্ণ বায়ুর উত্তাপ থেকে। স্মরণ করো! যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি ছাঁচে-ঢালা শুকনো ঠনঠনে মাটি দিয়ে মানুষ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি। যখন আমি তাকে সুঠাম করব এবং তাতে আমার রূহ সঞ্চার করব;

তখন তোমরা তার সামনে সিজদায় পড়ে যেয়ো। তখন ফেরেশতাগণ সকলেই সিজদা করল কিন্তু ইবলিস সিজদা করল না। সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকার করল।"

আল্লাহ তাআলা বলেন, হে ইবলিস! কী ব্যাপার তুমি সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলে না যে! সে বলল, আমি এমন মানুষকে সিজদা করার নই, যাকে আপনি ছাঁচে-ঢালা শুকনো ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তাআলা বললেন, তবে তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও। কারণ, তুমি বিতাড়িত এবং কিয়ামত পর্যন্ত তোমার প্রতি রইল লানত।

সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। আল্লাহ তাআলা বললেন, যাও, অবধারিত সময় আসা পর্যন্ত তোমাকে অবকাশ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করা হল। সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আপনি যে আমাকে পথভ্রষ্ট করলেন, সে জন্য আমি পৃথিবীতে পাপকর্মকে মানুষের সামনে শোভন করে উপস্থাপন করব এবং আপনার মনোনীত বান্দাদের ছাড়া তাদের সকলকেই আমি বিপথগামী করে ছাড়ব।

আল্লাহ তাআলা বললেন, এ হলো আমার কাছে পৌঁছানোর সরল-সোজা পথ। বিভ্রান্তদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে, তারা ছাড়া আমার বান্দাদের ওপর তোমার কোনো ক্ষমতা থাকবে না। অবশ্য তোমার অনুসারীদের সকলেরই নির্ধারিত স্থান হবে জাহান্নাম। যার সাতটি দরজা আছে। প্রত্যেক দরজার জন্য আছে পৃথক পৃথক দল। (সূরা হিজর : ২৬-৪৪)

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا (٦١) قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا (٦٢) قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا (٦٣) وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا (٦٤) إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا (٦٥)

"স্মরণ কর! যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম 'আদমকে সিজদা কর', তখন ইবলিস ছাড়া সকলেই সিজদা করল। সে বলল : যাকে আপনি কাদা মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, আমি কি তাকে সিজদা করব? সে আরো বলল, বলুন! ওকে যে আপনি আমার উপর উচ্চ মর্যাদা দান করলেন, তা কেন? আপনি যদি কিয়ামত পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দেন, তবে অল্প কয়েকজন ছাড়া তার বংশধরকে আমি আমার কর্তৃত্বাধীন করে ফেলব। আল্লাহ তাআলা বললেন, যাও, তাদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে, জাহান্নামই হবে তাদের সকলের শাস্তি; পূর্ণ শাস্তি। তোমার আহ্বানে ওদের মধ্যকার যাদেরকে পার পদস্খলিত কর! তুমি তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে তাদেরকে আক্রমণ কর এবং তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতিতে শরিক হয়ে যাও আর তাদের প্রতিশ্রুতি দাও। শয়তান তাদের যে প্রতিশ্রুতি দেয়; তা ছলনা মাত্র। আমার বান্দাদের ওপর তোমার কোনো ক্ষমতা নেই। কর্মবিধায়ক হিসেবে তোমার প্রতিপালকই যথেষ্ট।" (সূরা বনি ইসরাইল : ৬১-৬৫)

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا (٥٠)

"আর স্মরণ কর! যখন আমি ফেরেশতাদের বলেছিলাম, আদমকে সিজদা কর! তখন ইবলিস ছাড়া তারা সকলেই সিজদা করল। সে ছিল জিনদের একজন। সে তার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল। তবে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে এবং তার বংশধরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করছ? অথচ তারা তোমাদের শত্রু। জালিমদের এ বিনিময় কত নিকৃষ্ট!" (সূরা কাহাফ : ৫০)

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا (١١٥) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى (١١٦) فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى (١١٧) إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى (١١٨) وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى (١١٩) فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى (١٢٠) فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى (١٢١) ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى (١٢٢) قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى (١٢٣) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (١٢٤) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا (١٢٥) قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى (١٢٦)

"আমি তো ইতোপূর্বে আদমের প্রতি নির্দেশ দিয়েছিলাম। কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিল। আমি তাকে সংকল্পে দৃঢ় পাই নি। স্মরণ কর! যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, আদমের প্রতি সিজদা করো! তখন ইবলিস ছাড়া সকলেই সিজদা করল; সে অমান্য করল। তারপর আমি বললাম, হে আদম! এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু। সুতরাং সে যেন কিছুতেই তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে না দেয়, দিলে তোমরা দুঃখ পাবে। তোমার জন্য এ-ই রইল, তুমি জান্নাতে ক্ষুধার্ত হবে না, নগ্নও হবে না এবং তথায় পিপাসার্ত হবে না; রৌদ্রক্লিষ্টও হবে না।

তারপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল। সে বলল, হে আদম! আমি কি তোমাকে বলে দিব অনন্ত জীবনপ্রদ গাছের কথা ও অক্ষয় রাজ্যের কথা? তারপর তারা তা থেকে ভক্ষণ করল; তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তারা জান্নাতের গাছের পাতা দিয়ে নিজেদের আবৃত করতে লাগল। আদম তার প্রতিপালকের

হুকুম অমান্য করল। ফলে সে ভ্রমে পতিত হল। এরপর তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন, তার প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হলেন ও তাকে পথ-নির্দেশ করলেন।

তিনি বললেন, তোমরা একই সঙ্গে জান্নাত থেকে নেমে যাও! তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু। পরে আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সৎ পথের নির্দেশ আসলে যে আমার নির্দেশ অনুসরণ করবে, সে বিপথগামী হবে না ও দুঃখ-কষ্ট পাবে না। যে আমার স্মরণে বিমুখ তার জীবন যাপন হবে সঙ্কুচিত এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন উত্থিত করব অন্ধ অবস্থায়। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলে? আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম। তিনি বললেন : এরূপই আমার নির্দেশাবলী তোমার কাছে এসেছিল, কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে এবং সেভাবেই আজ তুমিও বিস্মৃত হলে।" (সূরা ত্বহা : ১১৫-১২৬)

قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ (٦٧) أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ (٦٨) مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ (٦٩) إِنْ يُوحَى إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (٧٠) إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ (٧١) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (٧٢) فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (٧٣) إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (٧٤) قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ (٧٥) قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (٧٦) قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (٧٧) وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ (٧٨) قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (٧٩) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (٨٠) إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (٨١) قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٨٢) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (٨٣) قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ (٨٤) لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ (٨٥) قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ (٨٦) إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (٨٧) وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ (٨٨)

"বলো, এ এক মহা সংবাদ। যা থেকে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ; ঊর্ধ্বলোকে তাদের বাদানুবাদ সম্পর্কে আমার কোনো জ্ঞান ছিল না। আমার কাছে তা ওহি এসেছে, আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারী। স্মরণ কর! তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বলেছিলেন, আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি কাদা মাটি থেকে। যখন আমি তাকে সুষম করব, তখন তোমরা তার প্রতি সিজদাবনত হয়ো। তখন ইবলিস ছাড়া ফেরেশতারা সকলেই সিজদাবনত হলো। সে অহংকার করল এবং কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হলো।

তিনি বললেন, হে ইবলিস! আমি যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি, তার প্রতি সিজদাবনত হতে তোমাকে কী সে বাধা দিল? তুমি কি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলে, না তুমি

উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন? সে বলল, আমি তার থেকে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন আর তাকে সৃষ্টি করেছেন কাদা মাটি থেকে। তিনি বললেন, তুমি এখানে থেকে বের হয়ে যাও, নিশ্চয়ই তুমি বিতাড়িত এবং তোমার ওপর আমার লানত স্থায়ী হবে কর্মফল দিবস পর্যন্ত।

সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। তিনি বললেন, তুমি অবকাশ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হলে অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত। সে বলল, আপনার ক্ষমতার শপথ! আমি তাদের সকলকেই পথভ্রষ্ট করব, তবে তাদের মধ্যে আপনার একনিষ্ঠ বান্দাদের নয়।

তিনি বললেন, তবে এটাই সত্য; আর আমি সত্যই বলি– তোমার দ্বারা ও তোমার অনুসারীদের দ্বারা আমি জাহান্নাম পূর্ণ করবই। বল, এর জন্য আমি তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না এবং যারা মিথ্যা দাবি করে, আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই। এ তো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ মাত্র। এর সংবাদ তোমরা অবশ্যই জানবে কিছুকাল পরে। (সূরা সোয়াদ : ৬৭-৮৮)

এ হলো কোরআনের বিভিন্ন আয়াতের আলোকে হযরত আদম আ.-এর সৃষ্টির বিবরণ।

হাদিসের আলোকে হযরত আদম আ.-এর সৃষ্টি

✪ আবু মূসা আশআরী রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তাআলা আদম আ.-কে সমগ্র পৃথিবী থেকে সংগৃহীত এক মুঠো মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেন। তাই মাটি অনুপাতে আদম সন্তানের কেউ হয় সাদা, কেউ হয় গৌরবর্ণ, কেউ হয় কালো, কেউ মাঝামাঝি বর্ণের। আবার কেউ হয় নোংরা, কেউ হয় পরিচ্ছন্ন, কেউ হয় কোমল, কেউ হয় পাষাণ, কেউ-বা এগুলোর মাঝামাঝি। সামান্য শাব্দিক পার্থক্যসহ তিনি ভিন্ন সূত্রে উক্ত হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযি রহ. হাদিসটিকে হাসান সহি বলেছেন।

✪ সুদ্দী রহ. ইবনে আব্বাস ও ইবনে মাসউদ রাযি.সহ কয়েকজন সাহাবির সূত্রে বর্ণনা করেন। তারা বলেন : আল্লাহ তাআলা কিছু কাদা মাটি নেওয়ার জন্য জিবরাইল আ.-কে যমিনে প্রেরণ করেন। তিনি এসে মাটি নিতে চাইলে জমিন বলল, তুমি আমার অঙ্গহানি করবে বা আমাতে খুঁত সৃষ্টি করবে– এ ব্যাপারে তোমার কাছ থেকে আমি আল্লাহর পানাহ চাই। ফলে জিবরাঈল আ. মাটি না নিয়ে ফিরে গিয়ে বললেন, হে আমার রব! যমিন তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করায় আমি তাকে ছেড়ে এসেছি।

এবার আল্লাহ তাআলা মিকাইল আ.-কে প্রেরণ করেন। জমিন তাঁর কাছে থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা করে বসে। তিনিও ফিরে গিয়ে জিবরাইল আ.-এর মতো বর্ণনা করেন। এবার আল্লাহ তাআলা আজরাইল আ.-কে প্রেরণ করেন। যমিন তাঁর কাছ থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা করল। তিনি বললেন, আমি আল্লাহ তাআলার আদেশ বাস্তবায়ন না করে শূন্য হাতে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে তাঁর পানাহ চাই। এ কথা বলে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে সাদা, লাল ও কালো রংয়ের কিছু মাটি সংগ্রহ করে মিশিয়ে নিয়ে যান। এ

কারণেই আদম আ.-এর সন্তানদের এক একজনের গায়ের রং এক এক রকম হয়ে থাকে। আজরাইল আ. মাটি নিয়ে উপস্থিত হলে আল্লাহ তাআলা মাটিগুলো ভিজিয়ে নেন। এতে তা আঠালো হয়ে যায়। তারপর ফেরেশতাদের উদ্দেশ্যে তিনি ঘোষণা করেন :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (٢٨) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (٢٩)

"স্মরণ কর যখন তোমার প্রতিপালন ফিরিশতাগণকে বললেন, কাদা মাটি দ্বারা আমি মানুষ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি। যখন আমি তাকে সুঠাম করব এবং তাতে আমার রূহ সঞ্চার করব, তখন তোমরা তার প্রতি সিজদাবনত হয়ো।" (সূরা হিজর : ২৮)

তারপর আল্লাহ তাআলা আদম আ.-কে নিজ হাতে সৃষ্টি করেন, যাতে ইবলিস তার ব্যাপারে অহংকার করতে না পারে। তারপর মাটির তৈরি এ মানবদেহটি চল্লিশ বছর পর্যন্ত এভাবে পড়ে থাকে। তা দেখে ফেরেশতাগণ ঘাবড়ে যান। সবচেয়ে বেশি ভয় পায় ইবলিস। সে তাঁর পাশ দিয়ে আনাগোনা করত এবং তাঁকে আঘাত করত। ফলে দেহটি ঠনঠনে পোড়া মাটির মতো শব্দ করত। এ কারণেই মানব সৃষ্টির উপাদানকে صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ তথা পোড়ামাটির মতো ঠনঠনে মাটি বলে অভিহিত করা হয়েছে। আর ইবলিস তাঁকে বলত, তুমি একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হয়েছ।

এক পর্যায়ে ইবলিস তাঁর মুখ দিয়ে প্রবেশ করে পেছন দিয়ে বের হয়ে এসে ফেরেশতাগণকে বলল, একে তোমাদের ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। কেননা তোমাদের রব হলেন সামাদ তথা অমুখাপেক্ষী আর এটি একটি শূন্যগর্ভ বস্তু মাত্র। কাছে পেলে আমি একে ধ্বংস করেই ছাড়ব।

এরপর তাঁর মধ্যে রূহ সঞ্চার করার সময় হয়ে এলে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাগণকে বললেন : আমি যখন এর মধ্যে রূহ সঞ্চার করব, তখন তার প্রতি তোমরা সিজদাবনত হবে! যথাসময়ে আল্লাহ তাআলা তাঁর মধ্যে রূহ সঞ্চার করলেন। যখন রূহ তাঁর মাথায় প্রবেশ করে, তখন তিনি হাঁচি দেন। ফেরেশতাগণ বললেন, আপনি 'আলহামদুলিল্লাহ' বলুন। তিনি 'আলহামদুলিল্লাহ' বললেন।

জবাবে আল্লাহ তাআলা বললেন : يرحمك ربك (তোমার রব তোমাকে রহম করুন!)

তারপর রূহ তাঁর দু চোখে প্রবেশ করলে তিনি জান্নাতের ফল-ফলাদির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। এবার রূহ তাঁর পেটে প্রবেশ করলে তাঁর মনে খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা জাগে। ফলে রূহ পা পর্যন্ত পৌঁছানোর আগেই তড়িঘড়ি করে তিনি জান্নাতের ফল-ফলাদির দিকে ছুটে যান। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা বলেন :

خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ

"মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই ত্বরাপ্রবণ।" (সূরা আম্বিয়া : ৩৭)

✪ ইমাম আহমদ রহ. বর্ণনা করেন, আনাস রাযি. বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "আল্লাহ তাআলা আদম আ.-কে সৃষ্টি করে নিজের

ইচ্ছানুযায়ী কিছুদিন তাঁকে ফেলে রাখেন। এ সুযোগে ইবলিস তাঁর চারপাশে চক্কর দিতে শুরু করে। অবশেষে তাঁকে শূন্যগর্ভ দেখতে পেয়ে সে আঁচ করতে পারল, এটা তো এমন একটি সৃষ্টি, যার সংযম ক্ষমতা থাকবে না।"

✪ ইবনে হিব্বান রহ. তাঁর সহি গ্রন্থে বর্ণনা করেন, হযরত আনাস রাযি. বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "আদম আ.-এর মধ্যে রূহ সঞ্চারিত হওয়ার পর রূহ তাঁর মাথায় পৌঁছুলে তিনি হাঁচি দেন এবং 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন' বলেন। উত্তরে আল্লাহ তাআলা বলেন : 'ইয়ারহামুকাল্লাহ'। সামান্য শাব্দিক পার্থক্যসহ হাফিজ আবু বকর বাযযার রহ. (ইয়াহইয়া ইবনে মুহাম্মদ সাকান)-ও হাদিসটি বর্ণনা করেন।

✪ হাফিজ আবু ইয়ালা রহ. বর্ণনা করেন, হযরত আনাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "আল্লাহ তাআলা হযরত আদম আ.-কে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেন। প্রথমে মাটিগুলোকে ভিজিয়ে আঠালো করে কিছু দিন রেখে দেন। এতে তা ছাঁচে-ঢালা মাটিতে পরিণত হলে আদম আ.-এর আকৃতি সৃষ্টি করে কিছুদিন এ অবস্থায় রেখে দেন। এবার তা পোড়ামাটির মতো শুকনো ঠনঠনে মাটিতে রূপান্তরিত হয়। বর্ণনাকারী বলেন : ইবলিস তখন তাঁর কাছে গিয়ে বলতে শুরু করে, তুমি এক মহান উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হয়েছ। তারপর আল্লাহ তাআলা তাঁর মধ্যে রূহ সঞ্চার করেন। রূহ সর্বপ্রথম তাঁর চোখ ও নাকের ছিদ্রে প্রবেশ করলে তিনি হাঁচি দেন। হাঁচি শুনে আল্লাহ পাক বললেন :

يَرْحَمُكَ رَبُّكَ

তোমার রব তোমার উপর রহমত বর্ষণ করুন!

এরপর আল্লাহ তাআলা বললেন : হে আদম! তুমি ওই ফেরেশতা দলের কাছে গিয়ে দেখ তারা কী বলে? তখন তিনি ফেরেশতা দলের কাছে গিয়ে তাদেরকে সালাম দেন। আর তাঁরা اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ বলে উত্তর দেন। তখন আল্লাহ তাআলা বললেন : হে আদম! এটা তোমার এবং তোমার বংশধরের অভিবাদন। আদম আ. জিজ্ঞাসা করলেন : হে আমার রব! আমার বংশধর আবার কী? আল্লাহ তাআলা বললেন : আদম! তুমি আমার দু হাতের যে কোনো একটি পছন্দ করো। আদম আ. বললেন : আমি আমার রবের ডান হাত পছন্দ করলাম। আমার রব-এর উভয় হাতই তো ডান হাত–বরকতময়।

এবার আল্লাহ তাআলা নিজের হাতের তালু প্রসারিত করলে আদম আ. কেয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী তাঁর সকল সন্তানকে আল্লাহর হাতের তালুতে দেখতে পান। তন্মধ্যে কিছু সংখ্যকের মুখমণ্ডল ছিল নূরে সমুজ্জ্বল। সহসা তাদের মধ্যে একজনের নূরে অধিক বিমুগ্ধ হয়ে আদম আ. জিজ্ঞাসা করলেন, হে আমার রব! ওনি কে? আল্লাহ তাআলা বললেন : তোমার সন্তান দাউদ। জিজ্ঞাসা করলেন, এর আয়ু কত নির্ধারণ করেছেন? আল্লাহ তাআলা বললেন, ষাট বছর। আদম আ. বললেন, আমার থেকে নিয়ে এর আয়ু

পূর্ণ একশ বছর করে দিন। আল্লাহ তাঁর আবদার মনযুর করেন এবং এ ব্যাপারে ফেরেশতাগণকে সাক্ষী রাখেন।

তারপর যখন আদম আ.-এর আয়ু শেষ হয়ে আসল, তখন তাঁর রূহ কবয করার জন্য আল্লাহ তাআলা আযরাইল আ.-কে প্রেরণ করেন। তখন আদম আ. বললেন, কেন? আমার আয়ু তো আরো চল্লিশ বছর বাকি আছে! ফেরেশতা বললেন, আপনি তো আপনার আয়ুর চল্লিশ বছর আপনার সন্তান দাউদ আ.-কে দিয়ে দিয়েছিলেন! কিন্তু আদম আ. তা অস্বীকার করে বসেন এবং পূর্বের কথা ভুলে যান। ফলে তার সন্তানদের মধ্যে অস্বীকৃতি ও বিস্মৃতির প্রবণতা সৃষ্টি হয়।

✪ হাফিজ আবু বকর বাযযার রহ. তিরমিযি ও নাসায়ি রহ. তাঁর 'ইয়াওম ওয়াল লাইল' কিতাবে হযরত আবু হোরায়রা রাযি. সূত্রে এ হাদিসটি বর্ণনা করেন। তিরমিযি রহ. বলেন, হাদিসটি হাসান গরিব এবং ইমাম নাসায়ি রহ. 'মুনকার' তথা গ্রহণযোগ্য নয় বলে মন্তব্য করেছেন।

✪ ইমাম তিরমিযি রহ. বর্ণনা করেন, আবু হোরায়রা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "আদম আ.-কে সৃষ্টি করে আল্লাহ তাআলা তাঁর পিঠে হাত বুলান। সঙ্গে সঙ্গে কেয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী তাঁর সবকটি সন্তান পিঠ থেকে ঝরে পড়ে। আর আল্লাহ তাআলা তাদের প্রত্যেকের দু চোখের মাঝে একটি করে নূরের দীপ্তি স্থাপন করে দিয়ে তাদেরকে আদম আ.-এর সামনে পেশ করেন।

হযরত আদম আ. তাদের দেখে আল্লাহ তাআলাকে বললেন, হে আমার রব! এরা কারা? আল্লাহ তাআলা বললেন, এরা তোমার সন্তান-সন্ততি। তখন তাদের একজনের দু চোখের মাঝের দীপ্তিতে বিমুগ্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আমার রব! ওনি কে? আল্লাহ তাআলা বললেন, সে তোমার ভবিষ্যৎ বংশধর দাউদ নামক এক ব্যক্তি। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, এর আয়ু কত নির্ধারণ করেছেন? আল্লাহ তাআলা বললেন, ষাট বছর।

আদম আ. বললেন, হে আমার রব! আমার আয়ু থেকে নিয়ে এর আয়ু আরো চল্লিশ বছর বৃদ্ধি করে দিন। তারপর যখন আদম আ.-এর আয়ু শেষ হয়ে যায়, তখন জান কবয করার জন্য আযরাইল আ. তাঁর কাছে আগমন করেন। তখন তিনি বললেন, আমার আয়ু তো আরো চল্লিশ বছর বাকি আছে? আযরাইল আ. বললেন, কেন? আপনি তো আপনার সন্তান দাউদ আ.-কে চল্লিশ বছর দিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু আদম আ. তা অস্বীকার করে বসেন। এ কারণে তাঁর সন্তানদের মধ্যেও অস্বীকৃতির প্রবণতা রয়েছে। তিনি পূর্বের কথা ভুলে যান। ফলে তাঁর সন্তানদের মধ্যেও বিস্মৃতির প্রবণতা রয়েছে। আদম আ. ত্রুটি করেন, তাই তাঁর সন্তানরাও ত্রুটি করে থাকে।

ইমাম তিরমিযি রহ. হাদিসটি হাসান সহি বলেছেন। হযরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে আরো একাধিক সূত্রে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। হাকিম রহ. তাঁর মুস্তাদরাকে আবু নুআইম (ফযল ইবনে দুকায়ন)-এর সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করে বলেছেন, ইমাম

মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী হাদিসটি সহি। তবে ইমাম বোখারি ও মুসলিমের কেউই হাদিসটি বর্ণনা করেন নি।

আর ইবনে আবু হাতিম রহ. হাদিসটির যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে এও আছে, আল্লাহ তাআলা আদম আ.-এর বংশধরকে তাঁর সামনে পেশ করে বললেন, হে আদম! এরা তোমার সন্তান-সন্ততি। তখন আদম আ. তাদের মধ্যে কুষ্ঠরোগী ও শ্বেতরোগী, অন্ধ এবং আরো নানা প্রকার ব্যাধিগ্রস্ত লোক দেখতে পেয়ে বললেন, হে আমার রব! আমার সন্তানদের আপনি এ দশা করলেন কেন?

আল্লাহ তাআলা বললেন : করেছি এজন্য, যাতে আমার নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা হয়। এর পরে বর্ণনাটিতে দাউদ আ.-এর প্রসঙ্গ রয়েছে– যা ইবনে আব্বাস রাযি.-এর সূত্রে পরে আসছে।

✪ ইমাম আহমদ রহ. তাঁর মুসনাদে বর্ণনা করেন, আবু দারদা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যথাসময়ে আল্লাহ তাআলা আদম আ.-কে সৃষ্টি করে তাঁর ডান কাঁধে আঘাত করে মুক্তার মতো ধবধবে সাদা তাঁর একদল সন্তানকে বের করেন। আবার তাঁর বাম কাঁধে আঘাত করে কয়লার মতো মিছমিছে কালো একদল সন্তানকে বের করে আনেন। তারপর ডান পাশেরগুলোকে বললেন, তোমরা জান্নাতগামী; আমি কারো পরোয়া করি না। আর বাঁম কাঁধেরগুলোকে বললেন, তোমরা জাহান্নামগামী; আমি কারো পরোয়া করি না।

✪ ইবনে আবুদ্ দুনিয়া রহ. বর্ণনা করেন, হাসান রহ. বলেন, "আদম আ.-কে সৃষ্টি করে আল্লাহ তাআলা তাঁর ডান পার্শ্বদেশ থেকে জান্নাতীদের আর বাম পার্শ্বদেশ থেকে জাহান্নামীদের বের করে এনে তাদেরকে জমিনে নিক্ষেপ করেন। এদের মধ্যে কিছু লোককে অন্ধ, বধির ও অন্যান্য রোগে আক্রান্ত দেখে আদম আ. বললেন, হে আমার রব! আমার সন্তানদের সকলকে এক সমান করে সৃষ্টি করলেন না কেন? আল্লাহ তাআলা বললেন, "আমি চাই, আমার শুকরিয়া আদায় হোক।" আবদুর রায্যাক অনুরূপ রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন।

ইবনে হিব্বানের এ সংক্রান্ত বর্ণনার শেষ দিকে আছে– আল্লাহর মর্জি মোতাবেক আদম আ. কিছুকাল জান্নাতে বসবাস করেন। তারপর সেখান থেকে পৃথিবীতে অবতরণ করেন। অবশেষে একসময় আযরাইল আ. তাঁর কাছে আগমন করলে তিনি বললেন, আমার আয়ু তো এক হাজার বছর। আপনি নির্ধারিত সময়ের আগেই এসে পড়েছেন। আযরাঈল আ. বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু আপনি তো আপনার আয়ু থেকে চল্লিশ বছর আপনার সন্তান দাউদকে দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আদম আ. তা অস্বীকার করে বসেন। ফলে তাঁর সন্তানদের মধ্যেও অস্বীকার করার প্রবণতা সৃষ্টি হয়। তিনি পূর্বের কথা ভুলে যান। ফলে তাঁর সন্তানদের মধ্যে বিস্মৃতির প্রবণতা দেখা দেয়। সেদিন থেকেই পারস্পরিক লেনদেন লিপিবদ্ধ করে রাখার এবং সাক্ষী রাখার আদেশ জারি হয়।

✪ ইমাম বোখারি রহ. বর্ণনা করেন, আবু হোরায়রা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "আল্লাহ তাআলা হযরত আদম আ.-কে ষাট হাত দীর্ঘ করে সৃষ্টি করেন। তারপর বললেন~ ওই ফেরেশতা দলের কাছে গিয়ে তুমি সালাম করো এবং লক্ষ করে শোন, তারা তোমাকে কী উত্তর দেয়? কারণ, এটাই হবে তোমার এবং তোমার সন্তান-সন্ততির অভিবাদন। আদেশ মতো ফেরেশতাগণের কাছে গিয়ে তিনি اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলে সালাম করলেন। তাঁরা وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ বলে উত্তর দেন।

উল্লেখ্য, আদম আ.-এর সন্তানদের যারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে, তারা সকলেই আদম আ.-এর আকৃতি সম্পন্ন হবে। ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে পেতে মানুষের উচ্চতা আজকের পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে।

✪ ইমাম আহমদ রহ. বর্ণনা করেন, আবু হোরায়রা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আদম আ.-এর উচ্চতা ছিল ষাট হাত আর প্রস্থ সাত হাত।

✪ ইমাম আহমদ রহ. বর্ণনা করেন, ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন : বকেয়া লেনদেন লিপিবদ্ধ করে রাখার আদেশ সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– সর্বপ্রথম যিনি অস্বীকার করেন, তিনি হলেন আদম আ.। ঘটনা হলো, আল্লাহ তাআলা আদম আ.-কে সৃষ্টি করে তাঁর পৃষ্ঠদেশে হাত বুলিয়ে কেয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মানুষকে বের করে এনে তাঁর সামনে পেশ করেন।

তাদের মধ্যে তিনি উজ্জ্বল এক ব্যক্তিকে দেখতে পেয়ে বললেন, হে আমার রব! ওনি কে? আল্লাহ বলেন, সে তোমার সন্তান দাউদ। আদম আ. জিজ্ঞাসা করলেন, এর আয়ু কত? আল্লাহ তাআলা বললেন, ষাট বছর। আদম আ. বললেন, এর আয়ু আরো বাড়িয়ে দিন। আল্লাহ তাআলা বলেন : না, তা হবে না। তোমার আয়ু থেকে কর্তন করে বাড়াতে পারি। উল্লেখ্য, আদম আ.-এর আয়ু ছিল এক হাজার বছর। তাঁর আয়ু থেকে কর্তন করে আল্লাহ তাআলা দাউদ-এর আয়ু চল্লিশ বছর বৃদ্ধি করে দেন।

এ ব্যাপারে চুক্তিনামা লিপিবদ্ধ করে নেন এবং ফেরেশতাদের সাক্ষী রাখেন। অবশেষে আদম আ.-এর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তাঁর জান কবয করার জন্য আযরাইল আ. তাঁর কাছে আগমন করেন। তখন তিনি বললেন, আমার আয়ু তো আরো চল্লিশ বছর বাকি আছে! জিজ্ঞাসা করা হলো, কেন? আপনি তো আপনার সন্তান দাউদকে চল্লিশ বছর দিয়ে দিয়েছেন। আদম আ. তা অস্বীকার করে বললেন, আমি তো এমনটি করি নি! তখন প্রমাণস্বরূপ আল্লাহ তাআলা পূর্বের লিখিত চুক্তিনামা তাঁর সামনে তুলে ধরেন এবং ফেরেশতাগণ এ ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করেন।

✪ ইমাম আহমদের অনুরূপ আরেকটি বর্ণনার শেষাংশে আছে : অবশেষে আল্লাহ দাউদের বয়স একশ বছর আর আদম আ.-এর এক হাজার বছর পূর্ণ করে দেন। ইমাম তাবরানি রহ.ও অনুরূপ একটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন।

✪ ইমাম মালিক ইবনে আনাস রহ. বর্ণনা করেন, মুসলিম ইবনে ইয়াসার রহ. বলেন, উমর ইবনে খাত্তাব রাযি.-কে এ আয়াতখানা :

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বললেন, এ আয়াত সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন– আল্লাহ তাআলা আদম আ.-কে সৃষ্টি করে তাঁর পিঠে নিজের ডান হাত বুলিয়ে তাঁর সন্তানদের একদল বের করে এনে বললেন, এদেরকে আমি জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করলাম। এরা জান্নাতীদের আমলই করবে। পুনরায় হাত বুলিয়ে আরেক দল সন্তানকে বের করে এনে বললেন, এদের আমি জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি। এরা জাহান্নামীদেরই আমল করবে।

এ কথা শুনে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসূল ! তা হলে আমল করার প্রয়োজন কী? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আল্লাহ যাকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেন, তার থেকে তিনি জান্নাতীদেরই আমল করান। আমৃত্যু জান্নাতীদের আমল করতে করতেই শেষ পর্যন্ত সে জান্নাতে চলে যাবে। পক্ষান্তরে যাকে তিনি জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেন, তার দ্বারা তিনি জাহান্নামীদের আমলই করান। আমৃত্যু জাহান্নামীদের আমল করতে করতেই শেষ পর্যন্ত সে জাহান্নামে পৌঁছে যাবে।" ইমাম তিরমিযি রহ. হাদিসটি 'হাসান সহি' বলেছেন।

ইমাম দারাকুতনী বলেন, "উপরিউক্ত সবকটি হাদিসই প্রমাণ করে, আল্লাহ তাআলা আদম আ.-এর সন্তানদের তাঁরই পিঠ থেকে ছোট ছোট পিঁপড়ার মতো বের করে এনেছেন এবং তাদেরকে ডান ও বাম দু' দলে বিভক্ত করেছেন। এরপর ডান দলকে বলেছেন, তোমরা জান্নাতী! আমি কাউকে পরোয়া করি না। আর বাম দলকে বলেছেন, তোমরা জাহান্নামী। আমার কারো পরোয়া নেই।"

পক্ষান্তরে তাঁদের কাছ থেকে সাক্ষ্য এবং আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কে তাঁদের থেকে স্বীকারোক্তি নেওয়ার কথা প্রামাণ্য কোনো হাদিসে পাওয়া যায় না। সূরা আরাফের একটি আয়াতকে এ অর্থে প্রয়োগ করার ব্যাপারে আপত্তি রয়েছে। যথাস্থানে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তবে এ মর্মে ইমাম আহমদ রহ. কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস আছে। ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী যার সনদ উত্তম ও শক্তিশালী। হাদিসটি হলো :

✪ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "আল্লাহ তাআলা যিলহজের নয় তারিখে 'নো'মান' নামক স্থানে আদম আ.-এর পিঠ থেকে অঙ্গীকার নেন। তারপর তাঁর মেরুদণ্ড থেকে (কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী) তাঁর সকল সন্তানকে বের করে এনে তাঁর সম্মুখে ছড়িয়ে দেন। তারপর তাদের সাথে সামনা-সামনি কথা বলেন। তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করেন, আমি

কি তোমাদের রব নই? তারা বলল, নিশ্চয়ই আপনি আমাদের রব। আমরা এর সাক্ষী থাকলাম। এ স্বীকৃতি গ্রহণের কারণ, তোমরা যাতে কেয়ামতের দিন বলতে না পার– আমরা তো এ ব্যাপারে অবহিত ছিলাম না কিংবা বলতে না পার– আমাদের পূর্ব-পুরুষগণই তো আমাদের পূর্বে শিরক করেছে। আর আমরা তো তাদের পরবর্তী বংশধর। তবে কি পথভ্রষ্টদের কৃতকর্মের জন্য তুমি আমাদের ধ্বংস করবে?

ইমাম নাসায়ি, ইবনে জারির ও হাকিম রহ. এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। হাকিম রহ. হাদিসটির সনদ সহি বলেছেন। প্রামাণ্য কথা হলো, বর্ণিত হাদিসটি আসলে ইবনে আব্বাস রাযি.-এর উক্তি। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকেও মওকুফ, মারফু উভয় সূত্রেই হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। তবে মওকুফ সূত্রটি সর্বাধিক বিশুদ্ধ। অধিকাংশ আলেমের মতে সেদিন আদম আ.-এর সন্তানদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছে। এর দলিল হলো, ইমাম আহমদ রহ. বর্ণিত হাদিসটি। যাতে আছে–

✪ আনাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের দিন এক জাহান্নামিকে বলা হবে– আচ্ছা! যদি তুমি পৃথিবীতে সমুদয় বস্তু-সম্ভারের মালিক হতে, তা হলে এখন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তার সব কিছুই মুক্তিপণরূপে দিতে প্রস্তুত থাকতে? উত্তরে সে বলবে, জি হ্যাঁ। তখন আল্লাহ বলবেন, আমি তো তোমার কাছ থেকে এর চেয়ে আরো সহজটাই চেয়েছিলাম। আদম আ.-এর পিঠে থাকা অবস্থায় আমি তোমার কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম, আমার সঙ্গে তুমি কাউকে শরিক করবে না। কিন্তু তা প্রত্যাখ্যান করে তুমি শরিক না করে ছাড় নি। হযরত শুবার বরাতে ইমাম বোখারি ও মুসলিম রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

✪ আবু জাফর রাযি রহ. বর্ণনা করেন, উবাই ইবনে কাব রাযি. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ এ আয়াত এবং এর পরবর্তী আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : কেয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মানুষ সৃষ্টি করে আল্লাহ তাআলা তাদের এক স্থানে সমবেত করেন। তারপর তাদের সঙ্গে কথা বলেন। তাদের কাছে থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেন এবং তাদের নিজেদেরকেই তাদের সাক্ষীরূপে রেখে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "আমি কি তোমাদের রব নই? তাঁরা বলল, জি হ্যাঁ। আল্লাহ তাআলা বললেন : এ ব্যাপারে আমি সাত আসমান, সাত যমিন এবং তোমাদের পিতা আদম আ.-কে সাক্ষী রাখলাম। যাতে কেয়ামতের দিন তোমরা এ কথা বলতে না পার, এ ব্যাপারে তো আমরা কিছুই জানতাম না। তোমরা জেনে রাখ! আমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, আমি ছাড়া কোনো রব নেই। আমার সঙ্গে তোমরা কাউকে শরিক করো না। তোমাদের কাছে পর্যায়ক্রমে আমি রাসূল পাঠাব। তাঁরা তোমাদেরকে আমার এ অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে সতর্ক করবেন। আর তোমাদের কাছে আমি আমার কিতাব নাযিল করব।"

তাঁরা বলল : আমরা সাক্ষ্য দিলাম, আপনি আমাদের রব ও ইলাহ। আপনি ছাড়া আমাদের কোনো রব বা ইলাহ নেই। মোটকথা, সেদিন তাঁরা আল্লাহর আনুগত্যের অঙ্গীকার করেছিল।

এরপর উপর থেকে দৃষ্টি করে আদম আ. তাঁদের মধ্যে ধনী-গরীব ও সুশ্রী-কুশ্রী সকল ধরনের লোক দেখতে পেয়ে বললেন, হে আমার রব! আপনার বান্দাদের সকলকে যদি সমান করে সৃষ্টি করতেন! আল্লাহ তাআলা বললেন: আমি চাই, আমার শুকরিয়া আদায় করা হোক। এরপর আদম আ. নবীগণকে তাদের মধ্যে প্রদীপের মতো দীপ্তিমান দেখতে পান। আল্লাহ তাআলা তাদের কাছ থেকে রেসালাত ও নবুয়তের বিশেষ অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

'স্মরণ কর! যখন আমি নবীগণের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম এবং তোমার কাছ থেকেও এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও মারইয়াম তনয় ঈসা আ.-এর কাছ থেকে। এদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলাম দৃঢ় অঙ্গীকার।" (সূরা আহযাব : ৭)

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ٠

"তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে দীনে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই।" (সূরা রূম : ৩০)

هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى (٥٦)

"অতীতের সতর্ককারীদের মতো এ নবীও একজন সতর্ককারী।" (সূরা নাজম : ৫৭)

وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ (١٠٢)

"আমি তাঁদের অধিকাংশকে প্রতিশ্রুতি পালনকারী পাই নি বরং তাদের অধিকাংশকে তো সত্য ত্যাগী পেয়েছি।" (সূরা আরাফ : ১০২)

✪ ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ, ইবনে আবু হাতিম, ইবনে জারির ও ইবনে মারদুওয়েহ রহ. তাঁদের নিজ নিজ তাফসির গ্রন্থে আবু জাফর রহ. সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। মুজাহিদ, ইকরামা, সাঈদ ইবনে যুবায়ের, হাসান বসরি, কাতাদা ও সুদ্দী রহ. প্রমুখ পূর্বসূরী আলেম থেকেও এসব হাদিসের সমর্থনে বর্ণনা পাওয়া যায়।

পূর্বে আমরা এ কথাটি উল্লেখ করে এসেছি, ফেরেশতাগণ আদম আ.-কে সিজদা করার জন্যে আদিষ্ট হলে ইবলিস ছাড়া সকলেই সে খোদায়ি ফরমান পালন করেন। ইবলিস হিংসা ও শত্রুতাবশত সিজদা করা থেকে বিরত থাকে। ফলে আল্লাহ তাআলা তাকে আপন সান্নিধ্য থেকে বিতাড়িত করে অভিশপ্ত শয়তান বানিয়ে পৃথিবীতে নির্বাসন দেন।

✪ ইমাম আহমদ রহ. বর্ণনা করেন, আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "আদমের সন্তানরা সিজদার আয়াত পাঠ করে যখন

সিজদা করে, ইবলিস তখন একদিকে সরে গিয়ে কাঁদতে শুরু করে এবং বলে, হায় কপাল! আল্লাহর আদেশ পালনার্থে সিজদা করে আদম সন্তান জান্নাতী হলো আর সিজদার আদেশ অমান্য করে আমি হলাম জাহান্নামী।" ইমাম মুসলিমও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

হযরত আদম আ. ও হাওয়া আ.-এর জান্নাতে অবস্থানকাল

যা হোক, হযরত আদম আ. ও তাঁর স্ত্রী হাওয়া আ. জান্নাতে– তা আসমানেই হোক বা যমিনের কোনো উদ্যানই হোক; যে মতভেদের কথা পূর্বেই বিবৃত হয়েছে– কিছুকাল বসবাস করেন। এবং অবাধে ও স্বাচ্ছন্দে সেখানে আহারাদি করতে থাকেন। অবশেষে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল আহার করায় তাদের পরিধানের পোশাক ছিনিয়ে নেওয়া হয় এবং তাদেরকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেওয়া হয়। অবতরণের ক্ষেত্র সম্পর্কে মতভেদের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

জান্নাতে আদম আ.-এর অবস্থানকাল সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কারো মতে দুনিয়ার হিসাবের একদিনের কিছু অংশ। আবু হোরায়রা রাযি. থেকে মারফু সূত্রে ইমাম মুসলিম রহ. কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস উপরে উল্লেখ করে এসেছি, জুমার দিন আদম আ.-কে সৃষ্টি করা হয়। আর এদিনই তাঁকে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করা হয়। সুতরাং যদি এমন হয়ে থাকে, অর্থাৎ যেদিন আদম আ.-এর সৃষ্টি হন এবং ঠিক সেদিনই জান্নাত থেকে তিনি বহিষ্কৃত হন, তা হলে বলা যায়, তিনি একদিনের মাত্র কিছু অংশ জান্নাতে অবস্থান করেছিলেন। তবে এ বক্তব্যটি বিতর্কের ঊর্ধে নয়।

পক্ষান্তরে যদি তাঁর বহিষ্কার সৃষ্টির দিন থেকে ভিন্ন কোনো দিনে হয়ে থাকে কিংবা ওই ছয় দিনের সময়ের পরিমাণ ছয় হাজার বছর হয়ে থাকে, তা হলে সেখানে তিনি সুদীর্ঘ সময়ই অবস্থান করে থাকবেন। যেমন : ইবনে আব্বাস রাযি., মুজাহিদ ও যাহ্হাক রহ. থেকে বর্ণিত এবং ইবনে জারির রহ. কর্তৃক সমর্থিত বর্ণনা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে।

○ ইবনে জারির রহ. বলেন : এটা জানা কথা, আদম আ.-কে সৃষ্টি করা হয়েছে জুমার দিনের শেষ প্রহরে। আর সেখানকার এক প্রহর দুনিয়ার তিরাশি বছর চার মাসের সমান। এতে প্রমাণিত হয়, রূহ সঞ্চারের পূর্বে জান্নাতে অবস্থান করেছেন তেতাল্লিশ বছর চার মাস কাল। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

হযরত আদম আ.-এর উচ্চতা

আবদুর রাযযাক রহ. বর্ণনা করেন, 'আতা ইবনে আবু রাবাহ রহ. বলেন : আদম আ.-এর পদদ্বয় যখন পৃথিবী স্পর্শ করে, তখনও তাঁর মাথা ছিল আকাশে। তারপর আল্লাহ তাঁর দৈর্ঘ্য ষাট হাতে কমিয়ে আনেন। ইবনে আব্বাস রাযি. সূত্রেও এরূপ একটি বর্ণনা আছে। তবে এ তথ্যটি আপত্তিকর। কারণ, ইতোপূর্বে আবু হোরায়রা রাযি. কর্তৃক সর্বজন স্বীকৃত বিশুদ্ধ হাদিস উদ্ধৃত করে এসেছি– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তাআলা আদম আ.-কে ষাট হাত দীর্ঘ করে সৃষ্টি করেন। এরপর তাঁর সন্তানদের উচ্চতা কমতে কমতে এখন এ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। এ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়, আদম আ.-কে সৃষ্টিই করা হয়েছে ষাট হাত দৈর্ঘ্য দিয়ে; তার বেশি নয়। আর তাঁর সন্তানদের উচ্চতা হ্রাস পেতে পেতে বর্তমান পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে।

হযরত আদম আ.-কর্তৃক আল্লাহর ঘর নির্মাণ

✪ ইবনে জারির রহ. ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তাআলা বলেন : হে আদম! আমার আরশ বরাবর পৃথিবীতে আমার একটি সম্মানিত স্থান আছে। তুমি গিয়ে তথায় আমার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করে তা তাওয়াফ কর। যেমনটি ফেরেশতারা আমার আরশ তাওয়াফ করে। এরপর আল্লাহ তাআলা তাঁর কাছে একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। তিনি আদম আ.-কে জায়গাটি দেখিয়ে দেন এবং তাকে হজের করণীয় কাজসমূহ শিখিয়ে দেন। ইবনে জারির রহ. আরো উল্লেখ করেন, দুনিয়ার যেখানে যেখানে আদম আ.-এর পদচারণা হয়, পরবর্তীকালে সেখানেই এক একটি জনবসতি গড়ে উঠে।

হযরত আদম আ.-এর প্রথম খাদ্য

✪ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে আরো বর্ণিত আছে, পৃথিবীতে আদম আ.-এর প্রথম খাদ্য ছিল গম। জিবরাইল আ. তার কাছে সাতটি গমের বীজ নিয়ে উপস্থিত হলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এগুলো কী? জিবরাইল আ. বললেন : এ-ই তো আপনার সেই নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল, যা আপনি খেয়েছিলেন। আদম আ. জিজ্ঞাসা করলেন, এগুলো আমি কী করব? জিবরাইল আ. বললেন, যমিনে বপন করবেন।

উল্লেখ্য, প্রতিটি বীজের ওজন ছিল দুনিয়ার এক লক্ষ দানা অপেক্ষা বেশি। বীজগুলো বপন করার পর ফসল উৎপন্ন হলে আদম আ. তা কেটে মাড়িয়ে পিষে আটা বানিয়ে খামির করে রুটি বানিয়ে বহু কষ্ট ও শ্রমের পর তা আহার করেন। এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ (١١٧)

সুতরাং সে যেন তোমাদের কিছুতেই জান্নাত থেকে বের করে না দেয়। দিলে তোমরা দুঃখ পাবে। (সূরা ত্ব-হা : ১১৭)

সর্বপ্রথম পোশাক

হযরত আদম ও হাওয়া আ. সর্বপ্রথম যে পোশাক পরিধান করেন, তা ছিল ভেড়ার পশমের তৈরি। প্রথমে চামড়া থেকে পশমগুলো খসিয়ে তা দিয়ে সুতা তৈরি করেন। তারপর আদম আ. নিজের জন্য একটি জুব্বা আর হাওয়া আ.-এর জন্য একটি কামিজ ও একটি ওড়না তৈরি করে নেন। জান্নাতে থাকাবস্থায় তাঁদের কোনো সন্তানাদি জন্মেছিল কি না, এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কারো কারো মতে পৃথিবী ছাড়া অন্য কোথাও তাঁদের কোনো সন্তান জন্মে নি। কেউ বলেন, জন্মেছে। কাবিল ও তার বোনের জন্ম জান্নাতেই হয়েছিল। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

উল্লেখ্য, প্রতি দফায় আদম আ.-এর এক সঙ্গে একটি পুত্র সন্তান ও একটি কন্যা সন্তান জন্ম নিত। আর একগর্ভের পুত্রের সঙ্গে পরবর্তী গর্ভের কন্যার ও কন্যার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দেওয়ার বিধান ছিল। পরবর্তী সময়ে একই গর্ভের দু ভাই-বোনের এরূপ বিবাহ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়।

আদম আ.-কে সৃষ্টির ঘোষণা

আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি ফেরেশতাদেরকে সম্বোধন করে বলেছিলেন :

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

"পৃথিবীতে আমি প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি।" (সূরা বাকারা : ৩০)

এ ঘোষণায় আল্লাহ তাআলা আদম আ. ও তাঁর বংশধরদের সৃষ্টি করার সংকল্প ব্যক্ত করেছেন, যারা একে অপরের প্রতিনিধিত্ব করবে। যেমন– এক আয়াতে তিনি বলেন :

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ

"তিনিই তোমাদেরকে দুনিয়ার প্রতিনিধি বানিয়েছেন। (সূরা আন'আম : ১৬৫)

এ ঘোষণা দ্বারা আল্লাহ তাআলা সংকল্প ব্যক্ত করণার্থে ফেরেশতাদেরকে আদম আ. ও তাঁর বংশধরদের সৃষ্টি করার কথা জানিয়ে দেন। যেমন বাস্তবায়িত হওয়ার আগেই কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আগাম সংবাদ দেওয়া হয়ে থাকে। ঘোষণা শুনে ফেরেশতাগণ বললেন :

أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ

"আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যে সেখানে অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে?" (সূরা বাকারা : ৩০)

ফেরেশতাগণ বিষয়টির তাৎপর্য জানা এবং তার রহস্য সম্পর্কে অবগতি লাভ করার উদ্দেশ্যে এ কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আদম সন্তানদের অমর্যাদা বা তাদের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করা উদ্দেশ্য আদৌ ছিল না। যেমনটা কোনো কোনো মুফাসসির গলত ধারণা করেছেন। তারা বলেছিলেন, আপনি কি পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী ও রক্তপাতকারী কাউকে সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন? এর ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেন, আদমের পূর্বে যে জিন জাতির বসবাস ছিল, তাদের কার্যকলাপ দেখে ফেরেশতাগণ জানতে পেরেছিলেন, আগামীতেও এমন অঘটন ঘটবে। এটা কাতাদার অভিমত।

✪ আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. বলেন, আদম আ.-এর পূর্বে জিন জাতি দু হাজার বছর পৃথিবীতে বসবাস করে। তারা রক্তপাতে লিপ্ত হলে আল্লাহ তাআলা তাদের কাছে একদল ফেরেশতা বাহিনী প্রেরণ করেন। তারা তাদেরকে বিভিন্ন দ্বীপে তাড়িয়ে দেন। ইবনে আব্বাস রাযি. থেকেও এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

✪ হাসান রহ. থেকে বর্ণিত আছে, ফেরেশতাগণের প্রতি এ তথ্য ইলহাম করা হয়েছিল। কেউ বলেন, লাওহে মাহফুয থেকে তাঁরা এ ব্যাপারে অবগত হয়েছিলেন।

কেউ বলেন, মারূত ও হারূত তাদেরকে তা অবগত করেছিলেন। তাঁরা দু জন তা জানতে পেরেছিলেন তাঁদের উপরস্থ শাজাল নামক এক ফেরেশতার কাছ থেকে। ইবনে আবু হাতিম রহ. আবু জাফর বাকির রহ. সূত্রে এটা বর্ণনা করেন। কেউ কেউ বলেন, তাদের একথা জানা ছিল, মাটি থেকে সৃষ্ট জীবের স্বভাব এরূপ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তাই তারা বলেছিলেন,

وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ

"আমরা সর্বদা আপনার ইবাদত করি। আমাদের মধ্যকার কেউ আপনার অবাধ্যতা করে না।)

এখন যদি এদেরকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য এই হয়, তারা আপনার ইবাদত করবে; তবে আমরাই তো রাত-দিন অবিশ্রান্তভাবে এ কাজে নিয়োজিত রয়েছি।

قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"এদেরকে সৃষ্টি করার মধ্যে যে কী স্বার্থকতা রয়েছে, তা আমি জানি– তোমরা জান না। অর্থাৎ অদূর ভবিষ্যতে এদেরই মধ্য থেকে বহু নবী-রাসূল, সিদ্দিক ও শহিদের জন্ম হবে।

আদম আ. কে শিক্ষাদান

তারপর আল্লাহ তাআলা ইলমের ক্ষেত্রে ফেরেশতাগণের উপর আদমের শ্রেষ্ঠত্বের কথা ব্যক্ত করে বলেন :

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا

"এবং তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন।"

✪ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, "তা হলো সেসব নাম, যদ্বারা মানুষ পরিচিতি লাভ করে থাকে। যেমন : মানুষ, জীব, ভূমি, স্থলভাগ ও জলভাগ, পাহাড়-পর্বত, উট-গাধা ইত্যাদি।"

✪ অন্য এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে ডেগ-ডেকচি, থালা-বাসন থেকে আরম্ভ করে বায়ু নির্গমনের নাম পর্যন্ত শিক্ষা দেন।

✪ মুজাহিদ রহ. বলেন : "আল্লাহ তাঁকে সকল জীব-জন্তু, পশু-পাখি ও সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিয়েছেন।" সাঈদ ইবনে যুবায়ের রহ. এবং কাতাদা রহ.সহ প্রমুখ এরূপ বলেছেন। রাবী বলেন : "আল্লাহ তাআলা তাঁকে ফেরেশতাগণের নামসমূহ শিক্ষা দেন। আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ রহ. বলেন : "আল্লাহ তাঁকে তাঁর সন্তানদের নাম শিক্ষা দিয়েছেন।" সঠিক কথা হলো, আল্লাহ তাআলা আদম আ.-কে ছোট-বড় সকল বস্তু ও তার গুণাগুণ বা বৈশিষ্ট্যের নাম শিক্ষা দেন। ইবনে আব্বাস রাযি. এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

✪ ইমাম বোখারি রহ. ও মুসলিম রহ. এ প্রসঙ্গে আনাস ইবনে মালিক রাযি., কাতাদা এবং সাঈদ ও হিশামের সূত্রে বর্ণিত একটি হাদিস উল্লেখ করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : "কেয়ামতের দিন মুমিনগণ সমবেত হয়ে

বলবে, আল্লাহর নিকট সুপারিশ করার জন্য আমরা যদি কারো কাছে আবেদন করতাম! এই বলে তারা আদম আ.-এর কাছে এসে বলবে, আপনি মানব জাতির পিতা। আল্লাহ আপনাকে নিজ কুদরতি হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণকে আপনার সামনে সিজদাবনত করেছেন ও আপনাকে যাবতীয় বস্তুর নাম শিক্ষা দিয়েছেন ...।

ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

"তারপর সেগুলো ফেরেশতাগণের সম্মুখে পেশ করলেন এবং বললেন, তোমরা আমাকে এ সবের নাম বলে দাও যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।" (সূরা বাকারা : ৩১)

✪ হাসান বসরি রহ. বলেন, আল্লাহ তাআলা আদম আ. কে সৃষ্টি করতে চাইলে ফেরেশতারা বললেন : আমাদের রব যাকেই সৃষ্টি করুন না কেন আমরাই তাঁর চাইতে বেশি জ্ঞানী প্রতিপন্ন হবো। তাই এভাবে তাদেরকে পরীক্ষা করা হয়। 'যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক' বলে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন মুফাসসির বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন।

قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (٣٢)

"তারা (ফেরেশতারা) বলল, আপনি পবিত্র। আপনি আমাদের যা শিক্ষা দিয়েছেন, তা ছাড়া আমাদের তো কোনো জ্ঞান নেই। বস্তুত আপনি জ্ঞানময় ও প্রজ্ঞাময়।" (সূরা বাকারা : ৩২)

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ

"তিনি যা ইচ্ছা করেন, তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না।" (সূরা বাকারা : ২৫৫)

قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (٣٣)

"আল্লাহ বলেন, হে আদম! তাদেরকে এগুলোর নাম বলে দাও। যখন সে এ সকল নাম বলে দিল, তিনি বললেন : আমি কি তোমাদেরকে বলি নি, আকাশসমূহ ও পৃথিবীর অদৃশ্য বস্তু সম্বন্ধে আমি নিশ্চিতভাবে অবহিত এবং তোমরা যা ব্যক্ত কর বা গোপন রাখ, আমি তাও জানি?" (সূরা বাকারা : ৩৩)

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা গোপন বিষয় তেমনিভাবেই জানেন, যেভাবে জানেন প্রকাশ্য বিষয়। কারো মতে "প্রকাশ্য বিষয়" অবহিত দ্বারা এখানে ফেরেশতাদের কথা বুঝানো হয়েছে। যা তারা (ফেরেশতাগণ) আল্লাহ তাআলার আদম আ.-কে সৃষ্টির ঘোষণা শুনে বলেছিলেন। তারা বলেছিলেন :

أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا

"আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যে সেখানে অশান্তি ঘটাবে?"(সূরা বাকারা : ৩০)

আর "গোপন বিষয়" অবহিত হওয়ার দ্বারা ইবলিসের অন্তরে যে অহঙ্কার ও বড়ত্ব গোপন ছিল, তাকে বুঝানো হয়েছে। হযরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের, মুজাহিদ, সুদ্দী, যিহাক, সাওরি ও ইবনে জারির রহ. তাঁরা সকলেই এ অভিমত সমর্থন করেছেন।

আবুল আলীয়া, রবী, হাসান ও কাতাদা রহ. বলেন :

وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

"(যা তোমরা গোপন রাখ)" এর দ্বারা ফেরেশতাদের সে কথাকে বুঝানো হয়েছে, আমাদের প্রতিপালক, আমাদের চাইতে জ্ঞানবান ও মর্যাদাবান কাউকে সৃষ্টি করবেন না।"

সিজদার আদেশদান এবং ইবলিসের অবাধ্যতা ও লাঞ্ছনা

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ

"যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম : তোমরা আদমকে সিজদা করো! তখন ইবলিস ছাড়া সকলেই সিজদা করল, সে অমান্য করল ও অহঙ্কার করল।"

(সূরা বাকারা : ৩৪)

আল্লাহ তাআলা হযরত আদম আ.-কে সেজদা করার জন্য ফেরেশতাদের যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেই নির্দেশ এবং তা বাস্তবায়নের মধ্যে নিহিত ছিল হযরত আদম আ.-এর জন্য বিরাট সম্মান ও মর্যাদা। আদম আ.-কে আল্লাহ তাআলা তাঁর কুদরতি হাতে সৃষ্টি করে তাতে রূহ সঞ্চার করার পর ফেরেশতাদেরকে আদেশ করলেন তাঁকে ওই সিজদা করার জন্য। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (٢٩)

"যখন আমি তাকে সুঠাম করব এবং তাতে আমার রূহ সঞ্চার করব, তখন তোমরা তার প্রতি সিজদাবনত হয়ো।" (সূরা হিজর : ২৯)

আদম আ.-কে চারটি মর্যাদা দান

(১) আল্লাহ তাআলা তাঁকে নিজ কুদরতি হাতে সৃষ্টি করেছেন।

(২) তাঁর মধ্যে নিজ রূহ সঞ্চার করেছেন।

(৩) তাঁকে সেজদা করার জন্য ফেরেশতাদের আদেশ দিয়েছেন।

(৪) তাঁকে সমস্ত বস্তুর নাম শিক্ষা দিয়েছেন।

এ কারণে উর্ধ্বজগতে যখন হযরত মূসা আ. ও হযরত আদম আ.-এর মধ্যে সাক্ষাৎ হয়, তখন হযরত মূসা আ. বলেছিলেন– আপনি মানবজাতির পিতা। আপনাকে আল্লাহ পাক নিজ কুদরতি হাতে সৃষ্টি করেছেন। আপনার মধ্যে তাঁর (আল্লাহর) রূহ সঞ্চার করেছেন। ফেরেশতাদের দিয়ে আপনাকে সিজদা করিয়েছেন। আপনাকে তিনি সকল

বস্তুর নাম শিক্ষা দিয়েছেন এবং তার গুণাবলী ও কার্যকারিতা সম্পর্কে জ্ঞান দান করেছেন।

কেয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে সমবেত লোকেরাও হযরত আদম আ.-এর কাছে অনুরূপভাবে আরয করবে। অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (١١)

"আমিই তোমাদেরকে (প্রথমে মাটি দিয়ে) সৃষ্টি করেছি। এরপর তোমাদেরকে রূপ দান করেছি এবং তারপর ফেরেশতাদেরকে বলেছি আদমকে সিজদা করতে। ইবলিস ছাড়া সকলেই সিজদা করল। সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলো না।"

(সূরা আরাফ : ১১)

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন :

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ

"আমি যখন তোমাকে আদেশ করলাম, তখন কী সে তোমাকে সিজদা করতে বারণ করল?"

قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ

"সে বলল, আমি তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ; আমাকে আপনি অগ্নি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন কাদামাটি দিয়ে। (সূরা আরাফ : ১১-১২)

সর্বপ্রথম অলীক যুক্তি উপস্থাপনকারী

হযরত হাসান বসরি রহ. বলেন, ইবলিস এখানে যুক্তি দিতে চেষ্টা করেছে এবং এভাবে যুক্তি প্রদানকারী সর্বপ্রথম সে (ইবলিস)-ই। মুহাম্মদ ইবনে সিরীন রহ. বলেন : সর্বপ্রথম যে এরূপ যুক্তির সূচনা করে, সে হলো ইবলিস। আর সূর্য ও চন্দ্রের পূজাও এই যুক্তির উপর ভিত্তি করেই শুরু হয়। (তাফসিরে তাবারি : ৮/৯৮)

ইবলিস নিজের ও আদম আ.-এর মাঝে (জ্ঞানের দিক থেকে) তুলনা করেছিল। সুতরাং আদম আ.-কে সেজদা করার জন্য তার প্রতি ও ফেরেশতাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার নির্দেশ হওয়া সত্ত্বেও সে (ইবলিস) নিজেকে আদম আ.-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাসম্পন্ন ধারণা করে সিজদা করা থেকে বিরত থাকে। (এখানে আল্লাহ তাআলার সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও) ইবলিস (তার শ্রেষ্ঠত্বের) যুক্তি প্রদান করে।

এ কথা সুস্পষ্ট, আল্লাহ তাআলার সরাসরি আদেশের সামনে সকল প্রকার যুক্তি বাতিল ও নিরর্থক। তা ছাড়া ইবলিসের এই যুক্তিটি ছিল সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও মনগড়া। কারণ, মাটি আগুনের চেয়ে উপকারী ও উত্তম। কেননা মাটির মধ্যে রয়েছে কোমলতা, স্থিরতা, সহিষ্ণুতা ও শীতলতা। আর মাটি উৎপাদনশক্তি সম্পন্ন। মাটি থেকে প্রায় সব জিনিসই সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ সব রকম শস্য উৎপাদক। আর মাটির মধ্যে যে সকল বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী রয়েছে, সেগুলো আল্লাহ তাআলারও পছন্দনীয়।

পক্ষান্তরে আগুনের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য মাটির সম্পূর্ণ বিপরীত। আগুনের মধ্যে রয়েছে উগ্রতা, তীব্রতা, উত্তাপ এবং ধ্বংস করার প্রবণতা। যেগুলো আল্লাহ তাআলার কাছে অপছন্দনীয়। যে কারণে তিনি আগুনকে জাহান্নামের সামগ্রী বানিয়েছেন। এরপর আল্লাহ তাআলা হযরত আদম আ.-কে অধিক মর্যাদা ও সম্মান দান করেছেন। (যা অভিশপ্ত ইবলিস অর্জন করতে পারে নি)। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অভিশপ্ত ইবলিস লানত ও লাঞ্ছনার পাত্র হয়ে গেল। ইবলিস নিম্নলিখিত কারণে অভিশপ্ত হয়েছিল।

(১) হযরত আদম আ.-কে তুচ্ছ মনে করেছিল।

(২) আল্লাহ তাআলার আদেশ অমান্য করেছিল।

(৩) হযরত আদম আ.-কে সেজদা করার জন্য আল্লাহ তাআলার সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও সে (ইবলিস) নিজেকে আদম আ.-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ দাবি করে অমূলক যুক্তি দিয়েছিল।

(৪) সত্যকে প্রত্যাখান করেছিল।

ইবলিস আদম আ.-কে তো সেজদা করলই না বরং সে উল্টো নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও আমিত্ব প্রকাশ করল। এবং মানুষদেরকে পথভ্রষ্ট করে তার অনুগত করার কথা বলল। সেই সঙ্গে এর জন্য সে কেয়ামত পর্যন্ত অবকাশ চাইল। ইবলিসের এই অপরাধ প্রথম অপরাধের চেয়েও জঘন্যতর ছিল।

✪ হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : "ফেরেশতাদেরকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। আর জিনদেরকে ধোঁয়াবিহীন আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আদমকে সেই বস্তু দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে, যা তোমাদের বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ প্রত্যেক আদম সন্তানকে এমন মাটি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে, যার বৈশিষ্ট্য ওই মাটির মধ্যে নিহিত।"

✪ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস ও সাহাবাগণের একটি দল এবং সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব রহ. প্রমুখ বলেন, ইবলিস পৃথিবীর নিকটতম আকাশের ফেরেশতাদের সর্দার ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, তার নাম ছিল 'আযাযিল'। হযরত আব্বাস রাযি.-এর এক বর্ণনা মতে তার নাম ছিল 'হারিস'। নাক্কাশ রাযি. বলেন, তার উপাধী ছিল 'আবু বকর দাওস'।

✪ হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, 'ইবলিস ফেরেশতাদের একটি দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যাদেরকে জিন বলা হত। এরা জান্নাতের রক্ষক হিসেবে নিযুক্ত ছিল।'

যখন ইবলিস আল্লাহ তাআলার আদেশ অমান্য করে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করল, তখন আল্লাহ তাআলা তাকে বের হয়ে যাওয়ার জন্য বললেন। সে আল্লাহর কাছে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ চাইল। আল্লাহ তাকে অবকাশ দান করলেন। সে বলল, "আপনার ক্ষমতার শপথ! আমি তাদের সকলকেই পথভ্রষ্ট করব, তবে তাদের মধ্যে আপনার একনিষ্ঠ বান্দাদের নয়। আল্লাহ তাআলা বললেন : "তবে এটাই সত্য আর আমি সত্যই বলি– তোমার দ্বারা ও তোমার অনুসারীদের দ্বারা আমি জাহান্নাম পূর্ণ করবই।"

✪ হযরত সুবরা বিন ফাকিহা রাযি. থেকে ইমাম আহমদ রহ. একটি হাদিস বর্ণনা করেন। হযরত সুবরা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি : "নিশ্চয়ই শয়তান আদম সন্তানদের পথভ্রষ্ট করার জন্য রাস্তায় (ওঁৎ পেতে) বসে থাকে।" (আহমাদ : ৩/৪৮৩, নাসাঈ)

জান্নাত আসমানে না যমিনে!

হযরত আদম আ. যে জান্নাতে প্রবেশ করেছিলেন, তার অবস্থান আসমানে না যমিনে– এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। তা বিস্তারিত আলোচনা ও নিস্পত্তি হওয়া প্রয়োজন। জমহুর আলেমদের অভিমত হচ্ছে, তা আসমানে অবস্থিত জান্নাতুল মাওয়া। কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে এবং বিভিন্ন হাদিসে যার ইঙ্গিত রয়েছে। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ

"আমি বললাম, হে আদম! তুমি এবং তোমার সঙ্গিনী জান্নাতে বসবাস কর।"

এ আয়াতে الجنة এর আলিফ-লাম ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয় নি বরং তা দ্বারা সুনির্দিষ্ট একটি জান্নাতকে বুঝানো হয়েছে। তা হলো জান্নাতুল মাওয়া। আবার মূসা আ. হযরত আদম আ.-কে বলেছিলেন, কেন আপনি আমাদেরকে এবং নিজেকে জান্নাত থেকে বের করলেন? এটি একটি হাদিসের অংশ। তবে এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা হবে।

✪ সহি মুসলিম শরিফে বর্ণিত আছে, আবু হোরায়রা রাযি. ও হুযাইফা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে সমবেত করবেন। ফলে মুমিনগণ এমন সময় উঠে দাঁড়াবে, যখন জান্নাত তাদের কাছে এসে যাবে। তারা আদম আ.-এর কাছে এসে বলবেন, হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্য আপনি জান্নাত খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন! তখন তিনি বলবেন, তোমাদের পিতার অপরাধেই তো তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল।

এ হাদিস প্রমাণ করে, হযরত আদম আ. যে জান্নাতে বসবাস করেছিলেন, তা হলো জান্নাতুল মাওয়া। কিন্তু এ যুক্তিটিও বিতর্কের উর্ধ্বে নয়।

অন্যরা বলেন : আল্লাহ তাআলা আদম আ.-কে যে জান্নাতে বসবাস করতে দিয়েছিলেন, তা 'জান্নাতুল খুলদ' তথা অনন্ত জান্নাত ছিল না। কারণ, নির্দিষ্ট একটি গাছের ফল খেতে নিষেধ করে সেখানে তাঁর ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছিল। তিনি সেখানে নিদ্রা যান, সেখান থেকে তাঁকে বহিষ্কারও করা হয় এবং ইবলিসও সেখানে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়। এ সব কটি বিষয়ই প্রমাণ করে, সেটি জান্নাতুল মাওয়া ছিল না। এ অভিমত হযরত উবাই ইবনে কাব, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ ও সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা রহ. থেকে বর্ণিত। ইমাম আবু হানিফা রহ. ও তাঁর বিশিষ্ট শাগরিদগণ থেকেও এরূপ অভিমত বর্ণিত আছে।

○ হযরত ইমাম রাযি রহ. তাঁর তাফসির গ্রন্থে আবুল কাসেম বলখী ও আবু মুসলিম ইস্পাহানি রহ. থেকে এবং কুরতুবি তাঁর তাফসির গ্রন্থে আবুল কাসেম বলখী ও আবু মুসলিম ইস্পাহানি রহ. থেকে এবং কুরতুবী তাঁর তাফসির গ্রন্থ 'মুতাযিলা ও কাদরিয়্যাহ' থেকে এ অভিমতটি উদ্ধৃত করেছেন। আহলে কিতাবিদের হাতে থাকা তাওরাত পাঠেও এর স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। আবু মুহাম্মদ ইবনে হাযম 'আল-মিলাল ও আন-নিহাল' গ্রন্থে এবং আবু মুহাম্মদ ইবনে আতিয়া ও আবু ঈসা রুম্মানী আপন আপন তাফসিরে এ বিষয়টির মতভেদের কথা উল্লেখ করেছেন।

জমহুর আলেমদের বর্ণনায় প্রথম অভিমতের সমর্থন পাওয়া যায়। কাযি মাওয়ারদি রহ. তাঁর তাফসিরে বলেন, হযরত আদম ও হাওয়া আ. যে জান্নাতে বসবাস করেন, তার ব্যাপারে দুটি অভিমত রয়েছে। প্রথমত, তা জান্নাতুল খুলদ। দ্বিতীয়ত, তা স্বতন্ত্র এক জান্নাত। যা আল্লাহ তাআলা তাঁর পরীক্ষাস্থল হিসাবে তৈরি করেন। এটা সে জান্নাতুল খুলদ নয়, যা আল্লাহ তাআলা পুরস্কারের স্থান হিসাবে প্রস্তুত করে রেখেছেন।

এ দ্বিতীয় অভিমতের সমর্থকদের মধ্যে আবার মতভেদ রয়েছে। একদল বলেন, তার অবস্থান আসমানে। কারণ, আল্লাহ তাআলা আদম ও হাওয়া আ. কে জান্নাত থেকে নামিয়ে দিয়েছিলেন। এটা হাসানের অভিমত। অপর দল বলেন, সেটির অবস্থান পৃথিবীতে। কেননা আল্লাহ তাআলা সে জান্নাতে বহু ফল-ফলাদির মাঝে বিশেষ একটি গাছ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে তাদেরকে পরীক্ষা করেছিলেন।

বলা বাহুল্য, দ্বিতীয় অভিমতের সমর্থকগণ একটি প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেছেন, নিঃসন্দেহে সেজদা করা থেকে বিরত থাকার দরুন আল্লাহ তাআলা ইবলিসকে জান্নাত থেকে বিতাড়িত করেন এবং তাকে সেখান থেকে নেমে যাওয়ার আদেশ প্রদান করেন। আর এ আদেশটি কোনো শরয়ি আদেশ ছিল না, তাঁর বিরুদ্ধাচরণের অবকাশ থাকবে বরং তা ছিল এমন অখণ্ডনীয় তকদির সংক্রান্ত নির্দেশ, যার বিরুদ্ধাচরণের কোনো অবকাশ থাকে না। তাই আল্লাহ তাআলা বলেন :

قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا

"এখান থেকে তুমি ধিকৃত ও বিতাড়িত অবস্থায় বের হয়ে যাও।" (সূরা আরাফ : ১৮)

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا

"এ স্থান থেকে তুমি নেমে যাও! এখানে থেকে তুমি অহঙ্কার করবে, এ হতে পারে না।" (সূরা আরাফ : ১৩)

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (٣٤)

"তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও! কারণ, তুমি অভিশপ্ত।" (সূরা হিজর : ৩৪)

এ আয়াতগুলোতে منهاএর সর্বনামটি দ্বারা الجنة (জান্নাত) কিংবা السماء (আসমান) অথবা المنزلة (আবাসস্থল) বুঝানো হয়েছে। যাই হোক! নিঃসন্দেহে

ইবলিসকে যে স্থান থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল, সেখানে সামান্যতম সময়ের জন্যেও তার উপস্থিতি থাকার কথা নয়।

তাঁরা বলেন, কোরআনের বাহ্যিক বর্ণনাভঙ্গি থেকে আরো প্রমাণিত, ইবলিস আদম আ. কে এই বলে কুমন্ত্রণা দিয়েছিল :

هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى (١٢٠)

"হে আদম! আমি কি তোমাকে বলে দিব, অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষের কথা এবং অক্ষয় রাজ্যের কথা? (সূরা ত্বহা : ১২০)

وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ (٢٠) وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ (٢١) فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ

"আর সে বলল : পাছে তোমরা উভয়ে ফেরেশতা হয়ে যাও কিংবা তোমরা স্থায়ী হও, এ জন্যই তোমাদের প্রতিপালক এ বৃক্ষ সম্বন্ধে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন। সে তাদের উভয়ের নিকট শপথ করে বলল, আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষীদের একজন। এভাবে সে তাদেরকে প্রবঞ্চনা দ্বারা অধঃপতিত করল। (সূরা আরাফ : ২০-২২)

এ আয়াতগুলো স্পষ্ট প্রমাণ করে, আদম ও হাওয়া আ.-এর সঙ্গে ইবলিসের সাক্ষাৎ ঘটেছিল জান্নাতে। তাঁদের এ প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে, নিয়মিত বসবাসের ভিত্তিতে না হলেও যাতায়াত ও আনাগোনার সুবাদে জান্নাতে আদম ও হাওয়া আ.-এর সঙ্গে ইবলিসের একত্র হওয়া বিচিত্র নয়। কিংবা হতে পারে জান্নাতের দরজায় দাঁড়িয়ে বা আকাশের নিচে থেকে ইবলিস তাঁদেরকে কুমন্ত্রণা দিয়েছিল। তবে তিনটি জবাবের কোনোটিই সন্দেহমুক্ত নয়। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

হযরত হাওয়া আ.-এর সৃষ্টি

হাওয়া আ.-এর সৃষ্টি আদম আ.-এর জান্নাতে প্রবেশের আগেই হয়েছিল। কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেন, "হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর।"

ইসহাক ইবনে বাশশার রহ. স্পষ্টরূপেই এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু সুদ্দী আবু সালেহ ও আবু মালেকের সূত্রে ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে এবং মুররা-এর সূত্রে ইবনে মাসউদ রাযি. ও কতিপয় সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন : আল্লাহ তাআলা ইবলিসকে জান্নাত থেকে বের করে দেন। আদম আ. কে জান্নাতে বসবাস করতে দেন। আদম আ. তথায় নিঃসঙ্গ একাকী ঘুরে বেড়াতে থাকেন। সেখানে তাঁর স্ত্রী নেই, যার কাছে গিয়ে একটু শান্তি লাভ করা যায়। একসময় তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। জাগ্রত হয়ে দেখতে পান, তাঁর শিয়রে একজন নারী উপবিষ্ট রয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে আদম আ.-এর পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করেন। তাকে দেখে আদম আ. জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে হে? তিনি বললেন : আমি একজন নারী। আদম আ. বললেন, তোমাকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে? জবাবে তিনি বললেন, যাতে আপনি আমার কাছে শান্তি পান।

তখন ফেরেশতাগণ আদম আ.-এর জ্ঞান যাচাই করার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আদম! বলুন তো, ওনার নাম কী? আদম আ. বললেন, হাওয়া। তাঁরা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, হাওয়া নাম হল কেন? আদম আ. বললেন, কারণ তাঁকে 'হাই' (জীবন্ত সত্তা) থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

✪ মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক রহ. ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, হাওয়াকে আদম আ.-এর বাম পাঁজরের সবচেয়ে ছোট হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তখন আদম আ. ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন। পরে সে স্থানটি আবার গোশত দ্বারা পূরণ করে দেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

"হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তা হতে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দুজন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। (সূরা আনফাল : ১)

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ

"তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেন, যাতে সে তার নিকট শান্তি পায়। তারপর যখন সে তার সঙ্গে মিলিত হয়, তখন সে এক লঘু গর্ভধারণ করে এবং তা নিয়ে সে অনায়াসে চলাফেরা করে।" (সূরা আ'রাফ : ১৮৯)

✪ সহি বোখারি ও মুসলিম শরিফে বর্ণিত আছে, আবু হোরায়রা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : মহিলাদের ব্যাপারে তোমরা আমার সদুপদেশ গ্রহণ করো। কেননা নারীদেরকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের উপরের অংশটুকু সর্বাধিক বাঁকা। যদি তোমরা তা সোজা করতে যাও, তা হলে ভেঙে ফেলবে এবং আপন অবস্থায় ছেড়ে দিলে তা বাঁকাই থেকে যাবে। অতএব মহিলাদের ব্যাপারে তোমরা আমার সদুপদেশ গ্রহণ করো। বর্ণনাটি ইমাম বোখারি রহ. এর।

নিষিদ্ধ বৃক্ষটি কী?

وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণের মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, গাছটি ছিল আঙ্গুরের। ইবনে আব্বাস ও ইবনে মাসউদ রাযি.সহ কয়েকজন সাহাবা থেকে এক বর্ণনায় আছে, ইহুদিদের ধারণা হলো গাছটি ছিল গমের। ইবনে আব্বাস রাযি. হাসান বসরি, ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ, আতিয়া আওফি, আবু মালেক, মুহারি ইবনে দিছার ও আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা থেকেও এ কথা বর্ণিত আছে।

ওহাব রহ. বলেন, তার দানাগুলো ছিল মাখন অপেক্ষা নরম আর মধু অপেক্ষা মিষ্ট। সাওরি আবু হাসীন ও আবু মালিক রহ. সূত্রে বলেন : فمرت به এ আয়াতে যে বৃক্ষের কথা বলা হয়েছে, তা হলো খেজুর গাছ।

✪ ইবনে জুরায়জ মুজাহিদ রহ. থেকে বর্ণনা করেন, তা হলো ডুমুর গাছ। কাতাদা ও ইবনে জুরায়জও এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

আবুল আলিয়া বলেন : তা এমন একটি গাছ ছিল, যার ফল খেলেই পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যেত। কিন্তু জান্নাতে পবিত্রতা নষ্ট হওয়া অনুচিত।

মোটকথা, এ মতভেদগুলো প্রায় কাছাকাছি। তবে লক্ষণীয় হলো, আল্লাহ তাআলা নির্দিষ্ট করে এর নাম উল্লেখ করেন নি। যদি উল্লেখ করার মধ্যে আমাদের কোনো উপকার নিহিত থাকত; তা হলে আল্লাহ তাআলা নির্দিষ্ট করে তা উল্লেখ করে দিতেন। পবিত্র কোরআনের আরো বহু ক্ষেত্রে এরূপ অস্পষ্ট রাখার নযির রয়েছে।

ইবলিসের কুমন্ত্রণা

ইবলিস আদম আ.-কে কুমন্ত্রণা দিয়ে বলেছিল :

هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ (١٢٠)

"হে আদম! আমি কি তোমাকে বলে দেব অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষের কথা এবং অক্ষয় রাজ্যের কথা? (সূরা ত্বহা : ১২০)

অর্থাৎ, আমি কি তোমাকে এমন বৃক্ষের সন্ধান দিব, যার ফল খেলে তুমি স্থায়ী জীবন লাভ করবে? তুমি এখন যে সুখ-সম্ভোগ ও শান্তিতে আছ, চিরজীবন তা ভোগ করতে পারবে; তুমি লাভ করবে এমন রাজত্ব, যার কখনো বিনাশ ঘটবে না। ইবলিসের এ বক্তব্য ছিল সম্পূর্ণ প্রতারণামূলক এবং অবাস্তব। আলোচ্য আয়াতের মর্ম হচ্ছে, এর ফল ভক্ষণ করলে তুমি অনন্ত জীবন লাভ করবে। আবার এখানে সে বৃক্ষও উদ্দেশ্য হতে পারে, নিম্নোক্ত হাদিসে যার উল্লেখ রয়েছে। যেমন–

✪ ইমাম আহমদ রহ. বর্ণনা করেন, আবু হোরায়রা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : "জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ আছে, কোনো আরোহী তার ছায়ায় একশ বছর ভ্রমণ করেও তা অতিক্রম করতে পারবে না। তা হলো 'শাজারাতুল খুলদ'। হাদিসটি অন্যান্য সূত্রেও বর্ণিত আছে এবং ইমাম আবু দাউদ তায়ালিসীও তাঁর মুসনাদে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। গুনদার বলেন : আমি শুবাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এটি কি সেই শাজারাতুল খুলদ? তিনি বললেন, না।

পবিত্র কোরআনের অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে :

فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ

"এভাবে সে তাদেরকে প্রবঞ্চনা দ্বারা অধঃপতিত করল। তারপর যখন তারা সে বৃক্ষ-ফলের স্বাদ গ্রহণ করল। তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং উদ্যানপত্র দ্বারা তারা তাদেরকে আবৃত করতে লাগল।" (সূরা আরাফ: ২২)

আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ

"তারপর তারা তা থেকে ভক্ষণ করল; তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ল। (সূরা ত্বহা : ১২১)

আদম আ.-এর আগে হাওয়া আ. বৃক্ষ-ফল ভক্ষণ করেছিলেন। এবং তিনিই আদম আ. কে তা খাওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ। বোখারির নিম্নোক্ত হাদিসটি এ অর্থেই নেয়া হয়ে থাকে।

✪ ইমাম বোখারি রহ. বর্ণনা করেন, আবু হোরায়রা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "বনি ইসরাইলরা না হলে গোশত পচতো না; আর হাওয়া আ. না হলে কোনো নারী তার স্বামীর সঙ্গে খেয়ানত করত না।"

(বোখারি, মুসলিম ও আহমাদ)

আহলে কিতাবদের হাতে থাকা তাওরাতে আছে, হাওয়া আ. কে বৃক্ষ-ফল খাওয়ার পথ দেখিয়েছিল একটি সাপ। সাপটি ছিল অত্যন্ত সুদর্শন ও বৃহদাকার। তার কথায় হাওয়া আ.-ও তা খান এবং আদম আ.-কেও খাওয়ান। এ প্রসঙ্গে ইবলিসের উল্লেখ নেই। খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের চোখ খুলে যায় এবং তাঁরা দু জনেই অনুভব করেন, তাঁরা দু জনই বিবস্ত্র। ফলে তাঁরা ডুমুরের পাতা গায়ে জড়িয়ে নেন। তাওরাতে আরো আছে, তাঁরা বিবস্ত্রই ছিলেন। ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ রহ. বলেন, হযরত আদম ও হাওয়া আ.-এর পোশাক ছিল তাদের উভয়ের লজ্জাস্থানের উপর একটি জ্যোতির আবরণ।

উল্লেখ্য, আহলে কিতাবদের হাতে রক্ষিত বর্তমান তাওরাতে এ কথাটা ভুল ও বিকৃত এবং আরবি ভাষান্তরের প্রমাদ বিশেষ। কারণ, ভাষান্তর কর্মটি যার-তার পক্ষে সহজসাধ্য নয়। বিশেষ করে আরবি ভাষায় যার কোনো দক্ষতা নেই এবং মূল কিতাবের ভাব উদ্ধারে যিনি পটু নন, তার পক্ষে তো এ কাজটি অত্যন্ত দুরূহ। এ জন্যই আহলে কিতাবদের তাওরাত আরবিকরণে শব্দ ও মর্মগত যথেষ্ট ভুল-ভ্রান্তি হয়েছে। কোরআনুল কারিমের নিম্নোক্ত বর্ণনার দ্বারা প্রতীয়মান হয়, হযরত আদম ও হাওয়া আ.-এর দেহে বস্ত্র ছিল।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا

"শয়তান তাদেরকে তাদের লজ্জাস্থান দেখানোর জন্য বিবস্ত্র করে।" (সূরা আরাফ : ২৭)

কোরআনের এ বক্তব্য তো আর অন্য কারো কথায় উড়িয়ে দেওয়া যায় না! অন্যান্য সূত্রে বিশুদ্ধতার সনদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অনুরূপ একটি রেওয়ায়েত রয়েছে।

وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ (٢٢)

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٢٣)

"তখন তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এ বৃক্ষের নিকটবর্তী হতে বারণ করি নি? আর আমি কি তোমাদের বলি নি, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? তাঁরা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করেছি, যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না কর এবং দয়া না কর, তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।" (সূরা আরাফ : ২২-২৩)

এ হলো অপরাধ স্বীকার, তওবার শরণাপন্ন হওয়া এবং উপস্থিত মুহূর্তে আল্লাহর কাছে নিজের হীনতা, বিনয় ও অসহায়ত্বের অভিব্যক্তি। আদম সন্তানদের মধ্যে যে-ই অপরাধ স্বীকার করে এরূপ তওবা করবে, ইহ ও পরকালে তার পরিণাম মঙ্গলজনকই হবে। কোরআনুল কারিমের অপর স্থানে আল্লাহ বলেন :

وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ (٢٠) وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ (٢١) فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ (٢٢)

"আর সে বলল— পাছে তোমরা উভয়ে ফেরেশতা হয়ে যাও কিংবা তোমরা স্থায়ী হও, এ জন্যই তোমাদের প্রতিপালক এ বৃক্ষ সম্বন্ধে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন। সে তাদের উভয়ের কাছে শপথ করে বলল, আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষীদের একজন। এভাবে সে তাদেরকে প্রবঞ্চনা দ্বারা অধঃপতিত করল।" (সূরা আরাফ : ২০-২২)

অর্থাৎ, শয়তান তাদের বলল, আল্লাহ তাআলা তোমাদের এ বৃক্ষের ফল খেতে নিষেধ করার কারণ হলো, তা খেলে তোমরা ফেরেশতা হয়ে যাবে কিংবা এখানে চিরস্থায়ী হয়ে যাবে। সেই সঙ্গে তাদের শপথ করে বলল, নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের একজন হিতাকাঙ্ক্ষী।

নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ

এভাবে তার প্রবঞ্চনায় প্রতারিত হয়ে যখন তাঁরা সে বৃক্ষফল আস্বাদন করল, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ল। তাঁরা জান্নাতের পাতা দিয়ে নিজেদের ঢাকতে লাগলেন। তখন তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এ বৃক্ষের নিকটবর্তী হতে নিষেধ করি নি? আমি কি তোমাদের বলি নি, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? তাঁরা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছি! তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না কর এবং দয়া না কর, তা হলে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।

আল্লাহ্ তাআলা কোরআনে বলেন, "তারপর শয়তান তাদের কুমন্ত্রণা দিল। সে বলল, হে আদম! আমি কি তোমাকে বলে দিব অনন্ত জীবন দানকারী গাছের কথা, অক্ষয় রাজ্যের কথা? তারপর তাঁরা তা থেকে ভক্ষণ করল। ফলে তাদের লজ্জাস্থান তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তারা জান্নাতের গাছের পাতা নিয়ে নিজেদের আবৃত করতে লাগল। আদম তাঁর প্রতিপালকের হুকুম অমান্য করল। ফলে সে ভ্রমে পতিত হলো। এরপর তাঁর প্রতিপালক তাঁকে মনোনীত করলেন, তাঁর প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হলেন এবং তাঁকে পথ-নির্দেশ করলেন।"

নবীদের নিষ্পাপ হওয়ার অর্থ

বিশ্বজগতের স্রষ্টা দয়াময় আল্লাহ মানুষকে পরস্পর বিরোধী শক্তিসমূহ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তাকে পাপ ও পূণ্য উভয় প্রকারের শক্তি প্রদান করেছেন। সে পাপও করতে পারে, পুণ্যও করতে পারে। তার মধ্যে মন্দ কাজের ইচ্ছাশক্তি আছে, ভালো কাজের ইচ্ছাশক্তিও আছে। এটাই তার মানবসুলভ মর্যাদার পার্থক্যের প্রতীক।

এই বিপরীতমুখী শক্তিসমূহের বাহক মানুষের মধ্য হতেই আল্লাহ্ তাআলা মানুষের হেদায়াত- সৎপথ প্রদর্শন এবং আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছানোর উপায় প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে কোনো কোনো সময় কোনো মানুষকে নির্বাচিত করে তাঁকে নিজের রাসূল, নবী ও পয়গম্বর মনোনীত করেন। এরূপ ব্যক্তিত্বকে যখন আল্লাহ্ তাআলা নুবয়তের জন্য নির্বাচিত করে নেন, তখন তাঁর জন্য সর্বপ্রকার পাপকাজ নাফরমানি থেকে পবিত্র ও নিষ্কলুষ থাকা কর্তব্য হয়ে যায়। যাতে তিনি আল্লাহ্ তাআলার পয়গাম পৌঁছানোর ও প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব সুষ্ঠু ও বিশুদ্ধভাবে পালন করতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে

او خویشتن گم است کرا رہبری کند

"যে নিজেই পথভ্রষ্ট, অপরকে কেমন করে পথ দেখাবে?" এ প্রবাদ বাক্যের প্রয়োগক্ষেত্র না হন।

নবীগণ আর দশজন মানুষের মতোই পানাহার করেন। ঘুমান। পরিবার ও সন্তান-সন্ততির সঙ্গে বসবাস করেন। তাঁরা সর্বপ্রকার ইচ্ছা-কর্ম সংক্রান্ত পাপ হতে পবিত্র থাকেন। তাঁরা নেককাজের প্রতি হেদায়াত ও নসিহতকারী এবং আল্লাহ্ তাআলার প্রতিনিধি। যদিও তাঁরা অন্যান্য মানুষের মতো বিপরীতমুখী শক্তিসমূহের অধিকারী; কিন্তু কাজে ও ইচ্ছায় তাদের দ্বারা সর্বপ্রকার মন্দকাজ সংঘটিত হওয়া অসম্ভব করে দেওয়া হয়েছে। যাতে তাঁদের প্রতিটি কাজ বিশ্ববাসীর জন্য আদর্শ ও নমুনাস্বরূপ হতে পারে। অবশ্য মানুষ হওয়ার কারণে ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতির সম্ভাবনা (অবশিষ্ট) থাকে এবং কদাচিৎ কাজেও পরিণত হয়ে থাকে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাঁদের সতর্ক করে দেওয়া হয়। তাঁরা সাবধানতা অবলম্বন করে, তা হতে দূরে সরে যান।

আল্লাহ্ পাকের দরবারে সান্নিধ্যপ্রাপ্ত একজন মহামানব আল্লাহ্ পাকের মর্জি বুঝার ব্যাপারে এই ত্রুটি-বিচ্যুতির সম্মুখীন হবেন কেন? এ জন্য আল্লাহ্ তাআলার নীতি

হলো, তিনি নবী ও রাসূলগণের এ জাতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতির ওপর যখন তাদের সতর্ক করেন, তখন প্রথমে অতি কঠোরভাবে এবং অপরাধীর আকারে সেই ত্রুটি-বিচ্যুতির উল্লেখ করেন। সেই সঙ্গে অন্য কোনো ক্ষেত্রে বিষয়টির স্বরূপ বর্ণনা করে দিয়ে নবী ও রাসূলের অনুরূপ কাজকে ত্রুটি-বিচ্যুতির সীমার ভিতরে নিয়ে আসেন। তাদের পক্ষ হতে নিজে ওযর পেশ করে দেন। যাতে মুশরিক ও মুনাফিকরা নবী ও রাসুলগণের প্রতি কোনো বিষয়ে দোষারোপ করতে সাহস না পায়। এই তত্ত্বসমষ্টির নামই 'নবীদের নিষ্পাপতা'। এবং এটি ইসলামী আকিদাসমূহের মধ্যে একটি মৌলিক আকিদা।

আম্বিয়ায়ে কেরামের নিষ্পাপতা সম্পর্কিত উপরোক্ত তত্ত্ব জানার পর এবার হযরত আদম আ. এর ঘটনাটি দেখুন এবং চিন্তা করুন। কোরআন মাজিদের সূরা বাকারার মধ্যে যখন এ ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে, তখন পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, এই ভুল পাপজনিত ছিল না; অবাধ্যতামূলকও ছিল না বরং তা অতি সাধারণ ধরনের বিচ্যুতি ছিল। "শয়তান তাঁদের উভয়ের দ্বারা ত্রুটি করিয়ে দিল। আর একটি চিরন্তন সত্য হলো

حَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِيْنَ

"সৎকর্মশীলদের পুণ্যকর্মও নিকটতম প্রিয়জনদের পক্ষে কখনো অপরাধ বলে বিবেচিত হয়।"

এরপর সূরা আরাফে এবং সূরা ত্বহার দু জায়গায় এই ঘটনাটিকে উদ্ধৃত করে ওয়াসওয়াসা শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন :

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ

"শয়তান তাঁদের ফুসলিয়ে পদস্খলিত করল।"

আর সূরা ত্বহার তৃতীয় স্থানে ত্রুটি ও ফুসলানোর কারণ নিজেই ব্যক্ত করে হযরত আদমকে সর্বপ্রকারের ইচ্ছা-কর্ম সংক্রান্ত গুনাহ থেকে পবিত্র বলে প্রকাশ করেছেন এবং তাঁর নিষ্পাপতার বিষয়টিকে অত্যন্ত সুদৃঢ় ও মজবুত করে দিয়েছেন–

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا

"আর নিঃসন্দেহে, আমি আদম হতে একটি অঙ্গীকার নিয়েছিলাম। এরপর সে তা ভুলে গেল। আর আমি তাকে দৃঢ়তার মধ্যে পাই নি (আমি তাকে অঙ্গীকার পূরণ না করার ব্যাপারে তাঁর ইচ্ছা ও বাসনার অধিকারী দেখতে পাই নি)। সূরা ত্বহা : ১১৫)

এ আয়াতগুলো থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়, হযরত আদম আ. কোনো প্রকার গুনাহ করেন নি। যতটুকু ব্যাপার ঘটেছে, তাতেও তাঁর ইচ্ছাকৃত আদেশ লঙ্ঘনের কোনো দখল নেই বরং সেটা শুধু শয়তানের কুমন্ত্রণায় সংঘটিত ভুলক্রমে বিচ্যুতি ছিল

✪ ইমাম বোখারি রহ. বর্ণনা করেন, আবু হোরায়রা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "হযরত মূসা আ. ও হযরত আদম আ.-এর মধ্যে পরস্পর কথোপকথন হয়েছে। হযরত মূসা আ. তাঁকে বললেন, আপনিই তো মানুষকে আপনার অপরাধ দ্বারা জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছেন এবং তাদেরকে

দুর্বিপাকে ফেলেছেন!" আদম আ. বললেন, হে মূসা! আল্লাহ তাআলা তাঁর রিসালাত ও কালাম দিয়ে আপনাকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন। আপনি কি আমাকে এমন একটি কাজের জন্য তিরস্কার করছেন, যা আমাকে সৃষ্টি করার আগেই আল্লাহ আমার নামে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এতে আদম আ. মূসা আ.-এর ওপর বিজয়ী হন।

কোরআনের আয়াতসমূহ থেকে প্রমাণিত হয়েছে, হযরত আদম আ. নবী ছিলেন। আল্লাহ পাকের খাঁটি বন্ধু, মনোনীত বান্দা ও আল্লাহ পাকের প্রতিনিধিরূপে মহান মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তিনি আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত একজন মহামানব ছিলেন। যাকে আল্লাহ পাক নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন, নিজ রূহ তাঁর মধ্যে সঞ্চার করেছেন এবং যিনি আল্লাহ পাকের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছেন। সুতরাং এই ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং ভুলও তাঁর মর্যাদার বিচারে অত্যন্ত হীন ও অসঙ্গত।

পৃথিবীতে আদম আ.-এর আগমন

ইবলিসের ধোঁকায় পড়ে হযরত আদম ও হাওয়া আ. নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করার পর আল্লাহ তাআলা তাদের স্মরণ করিয়ে দেন, "আমি কি তোমাদের বলি নি, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু!"

তারপর তাঁরা আল্লাহ তাআলার কাছে অত্যন্ত বিনয়াবনত হয়ে ক্ষমা ও দয়ার প্রার্থনা করলেন। সুতরাং আল্লাহ তাআলা হযরত আদম ও হাওয়া আ. এবং ইবলিসকে সম্বোধন করে বলেন :

قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ

"তোমরা নেমে যাও! তোমরা একে অপরের শত্রু এবং পৃথিবীতে তোমাদের কিছুকাল বসবাস ও জীবিকা রয়েছে।" (সূরা বাকারা : ২৪)

কারো কারো মতে তাঁদের সঙ্গে সাপের প্রতিও এ আদেশ অন্তর্ভুক্ত ছিল। সীমালঙ্ঘন করার অপরাধে তাদেরকে জান্নাত থেকে নেমে যাওয়ার এ আদেশ দেওয়া হয়।

আদম ও হাওয়া আ.-এর সঙ্গে সাপের উল্লেখের স্বপক্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একটি হাদিস পেশ করা হয়ে থাকে। তা হলো– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাপ হত্যার আদেশ দিয়ে বলেন, "যেদিন এগুলোর সঙ্গে আমরা লড়াই শুরু করেছি, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত এগুলোর সঙ্গে আর আমরা সন্ধি করি নি।"

সূরা ত্বহায় আল্লাহ তাআলা বলেন :

قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ

"তোমরা দুজনে একই সঙ্গে জান্নাত থেকে নেমে যাও! তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু।" (সূরা ত্বহা : ১২৩)

এই আদেশ হল আদম আ. ও ইবলিসের প্রতি। আর হাওয়া আ. হযরত আদম আ.-এর এবং সাপ ইবলিসের অনুগামী হিসাবে এ আদেশের আওতাভুক্ত। কেউ কেউ বলেন, এখানে দ্বিবচন শব্দ দ্বারা একত্রে সকলকেই আদেশ করা হয়েছে।

হাফেজ ইবনে আসাকির রহ. মুজাহিদ রহ. থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা হযরত আদম ও হাওয়া আ. কে তাঁর নৈকট্য থেকে বের করে দেওয়ার জন্য দুজন ফেরেশতাকে আদেশ দেন। ফলে জিবরাইল আ. তাঁর মাথা থেকে মুকুট উঠিয়ে নেন। মিকাইল আ.ও তাঁর কপাল থেকে মুকুট খুলে ফেলেন। আর তাঁকে একটি বৃক্ষ শাখা জড়িয়ে ধরে। তখন আদম আ. ধারণা করলেন, এটা তাঁর তাৎক্ষণিক শাস্তি। তাই তিনি মাথা নিচু করে বলতে লাগলেন– ক্ষমা চাই! ক্ষমা চাই! তখন আল্লাহ তাআলা বললেন, তুমি কি আমার কাছ থেকে পালাচ্ছ? আদম আ. বললেন : না, বরং আপনার লজ্জায় এমনটি করছি, হে আমার রব।

আওযায়ি রহ. হাসসান ইবনে আতিয়া রহ. এর সূত্রে বর্ণনা করেন। আদম আ. জান্নাতে একশ বছরকাল অবস্থান করেন। অন্য এক বর্ণনায় ষাট বছরের উল্লেখ রয়েছে। তিনি জান্নাত হারানোর দুঃখে সত্তর বছর, অন্যায়ের অনুতাপে সত্তর বছর এবং নিহত পুত্রের শোকে চল্লিশ বছর কাঁদেন। ইবনে আসাকির রহ. এটি বর্ণনা করেন।

ইবনে আবু হাতিম রহ. বর্ণনা করেন, ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন : আদম আ. কে মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী দাহনা নামক স্থানে নামিয়ে দেওয়া হয়।

হাসান রহ. বলেন : আদম আ. কে ভারতে, হাওয়া আ. কে জিদ্দায় এবং ইবলিসকে বসরা থেকে মাইল কয়েক দূরে দস্তমিসান নামক স্থানে নামিয়ে দেওয়া হয়। আর সাপকে নামানো হয় ইস্পাহানে।

সুদ্দী রহ. বলেন, আদম আ. ভারতে অবতরণ করেন। আসার সময় তিনি হাজরে আসওয়াদ ও জান্নাতের একমুঠো পাতা নিয়ে আসেন এবং এ পাতাগুলো ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে দেন। ফলে সে দেশে সুগন্ধি গাছ উৎপন্ন হয়।

ইবনে ওমর রাযি. বলেন, আদম আ. কে সাফায় এবং হাওয়া আ.-কে মারওয়ায় নামিয়ে দেওয়া হয়। ইবনে আবু হাতিম এ তথ্যটিও বর্ণনা করেছেন।

আবদুর রাযযাক রহ. আবু মুসা আশআরী রাযি.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন : আল্লাহ তাআলা আদম আ. কে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেওয়ার সময় যাবতীয় বস্তুর প্রস্তুতপ্রণালী শিখিয়ে দেন। এবং জান্নাতের ফল-ফলাদি থেকে তার খাবারের ব্যবস্থা করে দেন। সুতরাং তোমাদের এ ফল-মূল জান্নাতের ফল-মূল থেকেই এসেছে। পার্থক্য শুধু এতটুকু, এগুলো নষ্ট হয় আর ওগুলো মোটেও নষ্ট হয় না।

হাকিম রহ. তাঁর মুসতাদরাকে বর্ণনা করেন, ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন : আদম আ. কে জান্নাতে শুধু আছর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময় থাকতে দেওয়া হয়েছিল। হাকিম রহ. বলেন : হাদিসটি বোখারি ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহি। তবে তাঁরা হাদিসটি বর্ণনা করেন নি।

সহি মুসলিমে বর্ণিত আছে। হযরত আবু হোরায়রা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "দিবসসমূহের মধ্যে জুমার দিন হলো সর্বোত্তম। এ

দিনে আদম আ.-কে সৃষ্টি করা হয়। এ দিনেই তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়। এ দিনেই তাঁকে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করা হয়।" সহি বোখারিতে অন্য এক সূত্রে বর্ণিত আছে, "এ দিনেই কিয়ামত সংঘটিত হবে।"

ইবনে আবু হাতিম রহ. বর্ণনা করেন, উবাই ইবনে কাব রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আদম আ. বললেন, হে আমার রব! আমি যদি তাওবা করি ও ফিরে আসি, তা হলে আমি কি আবার জান্নাতে যেতে পারব? আল্লাহ তাআলা বললেন, নিশ্চয় পারবে।

ইবনে আবু নাজিহ রহ. মুজাহিদ রহ. থেকে বর্ণনা করেন। আল্লাহ তাআলার কাছে করা হযরত আদম আ.-এর দোয়াগুলো হলো–

اَللّٰهُمَّ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ رَبِّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ اِنَّكَ خَيْرُ الْغَافِرِيْنَ.

اَللّٰهُمَّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ رَبِّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْلِيْ اِنَّكَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ.

اَللّٰهُمَّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ رَبِّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَتُبْ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

"হে আল্লাহ! তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আমি তোমার পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করি। হে আমার রব! নিশ্চয় আমি আমার নিজের ওপর যুলুম করেছি। তুমি আমাকে মাফ করে দাও! নিশ্চয় তুমি ক্ষমাকারীদের সর্বোত্তম। হে আল্লাহ! তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি ও প্রশংসা করি। হে আমার রব! নিশ্চয় আমি নিজের প্রতি অবিচার করেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও! নিশ্চয় তুমি সর্বোত্তম দয়ালু। হে আল্লাহ! তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি ও প্রশংসা করি। হে আমার রব! আমি নিজের প্রতি অন্যায় করেছি। আমার প্রতি তুমি ক্ষমা পরবশ হও! নিশ্চয় তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

✪ ইমাম হাকেম রহ. বর্ণনা করেন, ইবনে আব্বাস রাযি. فَتَلَقّٰى آدَمُ مِنْ رَبِّهٖ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ এর ব্যাখ্যায় বলেন– আদম আ. বললেন, হে আমার রব! আপনি কি আমাকে আপনার কুদরতি হাতে সৃষ্টি করেন নি? বলা হলো, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, আপনি কি আমার দেহে আপনার রূহ সঞ্চার করেন নি? বলা হলো, হ্যাঁ। তখন তিনি পুনরায় বললেন, আমি হাঁচি দিলে আপনি কি يرحمك الله (আল্লাহ তোমাকে রহম করুন!) বলেন নি এবং আপনার রহমত কি আপনার গযবের উপর প্রবল নয়? বলা হলো, হ্যাঁ। পুনরায় তিনি বললেন, আপনি কি এ কথা নির্ধারণ করে রাখেন নি, আমি এ কাজ করব? বলা হলো, হ্যাঁ। এবার আদম আ. বললেন, আচ্ছা আমি যদি তাওবা করি, তা হলে আপনি পুনরায় আমাকে জান্নাতে ফিরিয়ে দেবেন কি? আল্লাহ তাআলা বললেন, হ্যাঁ। হাকিম বলেন : এর সনদ সহি; কিন্তু ইমাম বোখারি ও মুসলিম রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেন নি।

✪ ইমাম হাকেম, বায়হাকি ও ইবনে আসাকির রহ. ওমর ইবনে খাত্তাব রাযি. থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "আদম আ. যখন ভুল করে বসলেন, তখন বললেন– হে আমার রব! মুহাম্মদের উছিলা দিয়ে আমি আপনার দরবারে দোয়া করছি, আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন! তখন আল্লাহ তাআলা বললেন, তুমি মুহাম্মদকে চিনলে কী করে অথচ এখনও তাঁকে আমি সৃষ্টিই করি নি? আদম আ. বললেন, হে আমার রব! যখন আপনি আমাকে আপনার নিজ হাতে সৃষ্টি করলেন এবং আমার মধ্যে আপনার রূহ সঞ্চার করলেন, তখন আমি মাথা তুলে আরশের স্তম্ভসমূহে لَآاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ লিখিত দেখতে পাই। আমি বুঝতে পারলাম, আপনার পবিত্র নামের সঙ্গে আপনি সৃষ্টির মধ্যে আপনার সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো নাম যোগ করেন নি। তখন আল্লাহ তাআলা বললেন– তুমি যথার্থই বলেছ, হে আদম! নিশ্চয় তিনি সৃষ্টির মধ্যে আমার প্রিয়তম। তাঁর উসিলায় যখন তুমি আমার কাছে দোয়া করেছ, তখন আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। আর মুহাম্মদকে সৃষ্টি না করলে তোমাকে আমি সৃষ্টি করতাম না। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

কোরআন মাজিদে বর্ণিত আছে :

وَعَصَىٰٓ اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى (١٢١) ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى (١٢٢)

"আদম তার প্রতিপালকের হুকুম অমান্য করল। ফলে সে ভ্রমে পতিত হলো। এরপর তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন, তার প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হলেন এবং তাকে পথ-নির্দেশ করলেন। (সূরা ত্বহা : ১২১-১২২)

হযরত মূসা আ.-এর সাথে কথোপকথন

ইমাম বোখারি রহ. বর্ণনা করেন, আবু হোরায়রা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : হযরত মূসা আ. হযরত আদম আ.-এর মধ্যে পরস্পরে কথোপকথন হয়। হযরত মূসা আ. তাঁকে বললেন, আপনিই তো মানুষকে আপনার অপরাধ দ্বারা জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছেন এবং তাদেরকে দুর্বিপাকে ফেলেছেন। আদম আ. বললেন, মূসা! আপনি তো সে ব্যক্তি, আল্লাহ তাআলা তাঁর রিসালাত ও কালাম দিয়ে আপনাকে বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছেন। আপনি কি আমাকে এমন একটি কাজের জন্য তিরস্কার করছেন, যা আমাকে সৃষ্টি করার আগেই আল্লাহ আমার নামে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এতে আদম আ. মূসা আ.-এর ওপর বিজয়ী হন। (মুসলিম, নাসায়ি ও আহমাদ)

ইমাম আহমাদ রহ. বর্ণনা করেন, আবু হোরায়রা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : আদম আ. ও মূসা আ. আলোচনায় রত হন। মূসা আ. আদম আ. কে বললেন– আপনি তো সে আদম, আপনার ত্রুটি আপনাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছে। উত্তরে আদম আ. তাকে বললেন– আর আপনি তো সেই মূসা, যাকে আল্লাহ তাআলা তাঁর রিসালাত ও কালাম দিয়ে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন। আপনি কি আমাকে এমন একটি কাজের জন্য তিরস্কার করছেন, যা আমার সৃষ্টির

আগেই স্থির করে রাখা হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : এভাবে আদম আ. যুক্তিপ্রমাণে মূসা আ.-এর ওপর জয়লাভ করেন। কথাটি তিনি দুবার বলেছেন। (বোখারি ও মুসলিম)

ইবনে আবু হাতেম রহ. বর্ণিত এ হাদিসের শেষাংশে আদম আ.-এর উক্তিসহ অতিরিক্ত এরূপ বর্ণনা আছে– "আল্লাহ আপনাকে এমন কয়েকটি ফলক দান করেছেন, যাতে যাবতীয় বিষয়ের সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে এবং একান্তে নৈকট্য দান করেছেন। এবার আপনি বলুন, আল্লাহ তাআলা তাওরাত কখন লিপিবদ্ধ করেছিলেন? মূসা আ. বললেন, সৃষ্টির চল্লিশ বছর আগে। আদম আ. বললেন, তাতে কি আপনি وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ কথাটি পান নি? মূসা আ. বললেন : জী পেয়েছি! আদম আ. বললেন : তবে কি আপনি আমাকে আমার এমন একটি কৃতকর্মের জন্য তিরস্কার করছেন, যা আমার সৃষ্টির চল্লিশ বছর আগেই আল্লাহ তাআলা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, আমি তা করব?" বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : "এভাবে আদম আ. মূসার ওপর জয় লাভ করেন।"

ইমাম আহমদ রহ. বর্ণিত রেওয়ায়েতে মূসা আ.-এর বক্তব্যে অতিরিক্ত আরো আছে– "আপনি আপনার সন্তানদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন।" তবে এ অংশটি হাদিসের অংশ কি না, তাতে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

✪ হাফেয আবু ইয়ালা আল-মূসিলি তাঁর মুসনাদে আমিরুল মুমিনিন ওমর ইবনে খাত্তাব রাযি.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "মূসা আ. বললেন, হে আমার রব! আপনি আমাকে সে আদম আ. কে একটু দেখান, যিনি আমাদেরকে এবং নিজেকে জান্নাত থেকে বের করিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে আদম আ. কে দেখালেন। মূসা আ. বললেন, আপনিই আদম আ.? তিনি বললেন, হ্যাঁ। মূসা আ. বললেন, আপনি সে ব্যক্তি, যার মধ্যে আল্লাহ তাআলা তাঁর রূহ সঞ্চার করেছেন, যাঁর সামনে তাঁর ফেরেশতাদের সিজদাবনত করিয়েছেন এবং যাঁকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিয়েছেন? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ। মূসা আ. জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদেরকে এবং আপনার নিজেকে জান্নাত থেকে বের করে দিতে কী সে আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল?

আদম আ. বললেন, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি মূসা আ.। আদম আ. বললেন, আপনি কি বনি ইসরাইলের নবী মূসা আ., আল্লাহ তাআলা পর্দার আড়াল থেকে যার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলেছেন, আপনার ও তাঁর মধ্যে কোনো দূত ছিল না? মূসা আ. বললেন, জী হ্যাঁ। আদম আ. বললেন : আপনি আমাকে এমন একটি বিষয়ে তিরস্কার করছেন, যা পূর্ব থেকেই আল্লাহ তাআলা নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এভাবে আদম আ. মূসা আ.-এর ওপর জয়ী হন। আবু দাউদ রহ. ভিন্নসূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

কারো কারো মতে এ জয়লাভের কারণ হলো, আদম আ. হলেন মূসা আ.-এর চেয়ে প্রবীণ। কেউ কেউ বলেন– এর কারণ হলো, আদম আ. হলেন তাঁর আদি-পিতা।

কারো কারো মতে এর কারণ, তাঁরা দুজন ছিলেন ভিন্ন ভিন্ন শরিয়তের ধারক। আবার কেউ কেউ বলেন, এর কারণ তাঁরা দুজনই ছিলেন আলমে-বরযখে (যা এ জগতের বা পরকালের ব্যাপারে নয়, বরং মধ্যবর্তী আরেক জগতের ব্যাপার) আর তাঁদের ধারণায় সে জগতে শরিয়তের বিধান প্রযোজ্য নয়।

সঠিক কথা হলো, এ হাদিসটি বহুপাঠে বর্ণিত হয়েছে। তার কোনো কোনোটি বর্ণিত হয়েছে অর্থগতরূপে; কিন্তু তা সন্দেহমুক্ত নয়। বোখারি, মুসলিমসহ অন্যান্য কিতাবের বেশির ভাগ বক্তব্যের সারকথা হলো, মূসা আ. আদম আ. কে তাঁর নিজেকে ও সন্তানদেরকে জান্নাত থেকে বের করে দেয়ার জন্য দোষারোপ করেছিলেন। তাই উত্তরে আদম আ. তাঁকে বলেছিলেন, আমি আপনাদের বের করি নি। মূলত বের করেছেন সেই সত্তা, যিনি আমার বৃক্ষ-ফল খাওয়ার সঙ্গে বহিষ্কারকে সংশ্লিষ্ট করে রেখেছিলেন। আর যিনি তা সংশ্লিষ্ট করে রেখেছিলেন আমার সৃষ্টির পূর্বেই। এবং তা লিপিবদ্ধ ও নির্ধারিত করে রেখেছিলেন, তিনি হলেন মহান আল্লাহ। সুতরাং আপনি আমাকে এমন একটি কাজের জন্য দোষারোপ করছেন, যার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। বড়জোর এতটুকু বলা যায়, আমাকে বৃক্ষ-ফল খেতে নিষেধ করা হয়েছিল; কিন্তু আমি তা খেয়ে ফেলেছি। এর সঙ্গে বহিষ্কারের সংশ্লিষ্টতা আমার কর্ম নয়। সুতরাং আপনাদেরকে এবং আমার নিজেকে জান্নাত থেকে বহিষ্কার আমি করি নি। তা ছিল সম্পূর্ণ আল্লাহ তাআলার কুদরতের লীলা! অবশ্য তাতে আল্লাহর হেকমত রয়েছে। অতএব এ কারণে হযরত আদম আ. মূসা আ.-এর ওপর জয়ী হয়েছিলেন।

পক্ষান্তরে যারা এ হাদিসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, তারা আসলে একগুঁয়ে। কেননা হাদিসটি আবু হোরায়রা রাযি. থেকে মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আর বিশ্বাসযোগ্যতা ও স্মৃতিশক্তির ব্যাপারে আবু হোরায়রা রাযি.-এর মর্যাদা প্রশ্নাতীত। তা ছাড়া আরো কতিপয় সাহাবা থেকেও হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করে এসেছি। আর একটু আগে হাদিসটির যেসব ব্যাখ্যার কথা উল্লেখ করা হয়েছিল, তা হাদিসের শব্দ ও মর্ম উভয়ের সঙ্গেই অসঙ্গতিপূর্ণ। তাদের মধ্যে অবস্থানের যৌক্তিকতা জাবরিয়া সম্প্রদায়ের চেয়ে বেশি আর কারো নেই। কিন্তু কয়েক দিক থেকে তাতেও আপত্তি রয়েছে।

প্রথমত : মূসা আ. এমন কাজের জন্য দোষারোপ করতে পারেন না, যে কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তাওবা করে নিয়েছেন। দ্বিতীয়ত : মূসা আ. নিজে আদিষ্ট না হয়েও এক ব্যক্তিকে হত্যা করে আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করে বলেছিলেন :

رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ

হে আমার রব! আমি নিজের উপর অত্যাচার করেছি। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও! ফলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। (সূরা কাসাস : ১৬)

তৃতীয়ত : আদম আ. যদি পূর্বলিখিত তাকদির দ্বারা অপরাধের জন্য দোষারোপের জবাব দিয়ে থাকেন, তা হলে কৃতকর্মে তিরস্কৃত সকলের জন্যই এ পথ খুলে যেত এবং

সকলেই পূর্ব নির্ধারিত তাকদিরের দোহাই দিয়ে প্রমাণ পেশ করতে পারত। এভাবে কিসাস ও হুদূদ তথা শরিয়ত নির্ধারিত শাস্তিসমূহের বিধানের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যেত। তাকদিরকেই যদি দলিলরূপে পেশ করা যেত, তা হলে যে কেউ ছোট-বড় সকল কৃত অপরাধের জন্য তার দ্বারা দলিল পেশ করতে পারত। আর এটা ভয়াবহ পরিণতির দিকেই নিয়ে যেত। এ জন্যই কোনো কোনো আলিম বলেন : আদম আ. তাকদির দ্বারা দুর্ভোগের ব্যাপারে দলিল পেশ করেছিলেন; আল্লাহর আদেশ অমান্যের স্বপক্ষে যুক্তি হিসাবে নয়। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

হাবীল ও কাবীলের কাহিনী

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (٢٧) لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ (٢٨) إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ (٢٩) فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٣٠) فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ (٣١)

"আদমের দু পুত্রের বৃত্তান্ত তুমি তাদেরকে যথাযথভাবে শোনাও! যখন তারা উভয়ে কোরবানি করেছিল, তখন একজনের কোরবানি কবুল হলো, অন্যজনের কবুল হলো না। তাদের একজন বলল, আমি তোমাকে হত্যা করবই। অপরজন বলল, আল্লাহ মুত্তাকীদের কোরবানি করেন। আমাকে হত্যা করার জন্য আমার প্রতি হাত বাড়ালেও তোমাকে হত্যা করার জন্য আমি হাত বাড়াব না। আমি তো জগতসমূহের প্রতিপালককে ভয় করি। আমি চাই, তুমি আমার ও তোমার পাপের ভার বহন করে জাহান্নামী হও এবং এটা জালিমদের কর্মফল। তারপর তার প্রবৃত্তি তার ভাইকে হত্যা করতে উদ্বুদ্ধ করল এবং সে তাকে হত্যা করল। ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হলো। তারপর আল্লাহ তাআলা একটি কাক পাঠালেন, যে তার ভাইয়ের লাশ কীভাবে গোপন করা যায়, তা দেখানোর জন্য মাটি খুঁড়তে লাগল। সে বলল, হায়! আমি কি এ কাকের মতোও হতে পারলাম না! যাতে আমার ভাইয়ের লাশ গোপন করতে পারি? তারপর সে অনুতপ্ত হলো। (সূরা মায়েদা : ২৭-৩১)

সুদ্দী রহ. ইবনে আব্বাস ও ইবনে মাসউদ রাযি.সহ কতিপয় সাহাবা সূত্রে বর্ণনা করেন, আদম আ.-এর এক গর্ভের পুত্র সন্তানের সঙ্গে অন্য গর্ভের কন্যা সন্তানকে বিয়ে দিতেন। সে মতে কাবীলের যমজ বোনকে বিয়ে করতে মনস্ত করেন হাবীল। কাবীল বয়সে হাবীলের চেয়ে বড় ছিল। আর তার বোন ছিল অত্যন্ত রূপসী।

তাই কাবিল ভাইকে না দিয়ে নিজেই আপন বোনকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে চাইল এবং আদম আ. হাবীলের সঙ্গে তাকে বিবাহ দেওয়ার আদেশ করলে সে তা অগ্রাহ্য করল। ফলে আদম আ. তাদের দুজনকে কোরবানি করার আদেশ দিয়ে তিনি হজ করার জন্য মক্কায় চলে যান। যাওয়ার প্রাক্কালে তিনি আসমানসমূহকে তাঁর সন্তানদের দেখাশুনার দায়িত্ব দিতে চান; তারা তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। যমিন, পাহাড়-পর্বতকে তা নিতে বললে তারাও অস্বীকৃতি জানায়। শেষে কাবীল এ দায়িত্বভার গ্রহণ করে।

তারপর আদম আ. চলে গেলে তারা তাদের কোরবানি করে। হাবীল একটি মোটা তাজা বকরি কোরবানি করে। তার অনেক বকরি ছিল। আর কাবীল কোরবানি দেয় নিজের উৎপাদিত নিম্নমানের এক বোঝা শস্য। তারপর আগুন হাবিলের কোরবানি গ্রাস করে নেয় আর কাবীলের কোরবানি অগ্রাহ্য হয়। এতে কাবীল ক্ষেপে গিয়ে বলল, তোমাকে আমি হত্যা করেই ছাড়ব। যাতে করে তুমি আমার বোনকে বিয়ে করতে না পার। উত্তরে হাবীল বলল, আল্লাহ তাআলা কেবল মুত্তাকীদের কোরবানিই কবুল করে থাকেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আমরা রাযি. বলেন, আল্লাহর কসম! তাদের দুজনের মধ্যে নিহত লোকটিই অধিক শক্তিশালী ছিল। কিন্তু নির্দোষ থাকার প্রবণতা তাকে হত্যাকারীর প্রতি হাত বাড়ানো থেকে বিরত রাখে।

হাবীল ও কাবীলের কোরবানি

আবু জাফর আল-বাকির রহ. বলেন, আদম আ. তাঁর দুই পুত্র হাবীল ও কাবীলের কোরবানি করা এবং হাবীলের কোরবানি কবুল হওয়া ও কাবীলের কোরবানি কবুল না হওয়ার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। তখন কাবীল বলল, ওর জন্য আপনি দোয়া করেছিলেন। তাই ওর কোরবানি কবুল হয়েছে; আর আমার জন্য আপনি দোয়া করেন নি।

কিছুদিন পর এক রাতে হাবীল পশুপাল নিয়ে বাড়ি ফিরতে বিলম্ব করেন। ফলে আদম আ. তার ভাই কাবীলকে বললেন, দেখ তো ওর আসতে এতো দেরি হচ্ছে কেন? কাবীল গিয়ে হাবীলকে চারণভূমিতে দেখতে পেয়ে তাকে বলল, তোমার কোরবানি কবুল হলো আর আমারটা হলো না!। হাবীল বলল, আল্লাহ কেবল মুত্তাকীদের কোরবানিই কবুল করে থাকেন।

এ কথা শুনে কাবীল চটে গেল। সঙ্গে থাকা লোহার একটা টুকরা দিয়ে হাবীলকে আঘাত করে হত্যা করে ফেলল। কেউ কেউ বলেন, কাবীল ঘুমন্ত অবস্থায় হাবীলকে একটি পাথরখণ্ড নিক্ষেপ করে তাঁর মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। কেউ কেউ বলেন, কাবীল সজোরে হাবীলের গলা টিপে ধরে এবং হিংস্র পশুর মতো তাঁকে কামড় দেয়, ফলে তিনি মারা যান। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ

إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ (٢٨)

"আমাকে খুন করার জন্য তুমি আমার প্রতি হাত বাড়ালেও তোমাকে খুন করার জন্য আমি হাত বাড়াবার নই। (সূরা মায়েদা : ২৮)

কাবীলের হত্যার হুমকির জবাবে হাবীলের এ বক্তব্য তাঁর উত্তম চরিত্র, খোদাভীতি এবং ভাই তাঁর ক্ষতিসাধন করার যে সংকল্প ব্যক্ত করেছিল, তার প্রতিশোধ নেওয়া থেকে তাঁর বিরত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এ প্রসঙ্গে বোখারি ও মুসলিমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন : তরবারি উঁচিয়ে দুজন মুসলমান মুখোমুখি হলে হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি দুজনই জাহান্নামে যাবে। এ কথা শুনে সাহাবাগণ বললেন– আল্লাহর রাসূল! হত্যাকারী জাহান্নামে যাওয়ার কারণটা তো বুঝলাম, নিহত ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে কেন? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : কারণ, সেও তার সঙ্গীকে হত্যার জন্য লালায়িত ছিল।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে :

إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ (٢٩)

আমি তোমার সাথে লড়াই করা পরিহার করতে চাই। যদিও আমি তোমার চেয়ে বেশি শক্তিশালী। কারণ, আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছি, তুমি আমার ও তোমার পাপের ভার বহন করবে। আমি এটাই চাই।

অর্থাৎ, পূর্ববর্তী পাপসমূহের সঙ্গে আমাকে হত্যা করার পাপের বোঝাও তুমি বহন করবে, আমি এটাই চাই।

মুজাহিদ, সুদ্দী ও ইবনে জারির রহ. প্রমুখ আলোচ্য আয়াতের এ অর্থ করেছেন। এ আয়াতের উদ্দেশ্য এটা নয়, নিছক হত্যার কারণে নিহত ব্যক্তির যাবতীয় পাপ হত্যাকারীর ঘাড়ে গিয়ে চাপে; যেমনটি কেউ কেউ ধারণা করে থাকেন। কেননা ইবনে জারির এ মতের বিপরীত মতকে সর্বসম্মত মত বলে বর্ণনা করেছেন।

কেউ কেউ এ মর্মে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির যিম্মায় কোনো পাপ অবশিষ্ট রাখে না। কিন্তু এর কোনো ভিত্তি নেই এবং হাদিসের কোনো কিতাবে সহি হাসান বা যয়িফ-দুর্বল কোনো সনদে এর প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে কারো কারো বেলায় কেয়ামতের দিন দেখা যাবে, নিহত ব্যক্তি হত্যাকারীর কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করবে। কিন্তু হত্যাকারীর নেকআমলসমূহ তা পূরণ করতে পারবে না। ফলে নিহত ব্যক্তির পাপকর্ম হত্যাকারীর ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হবে। যেমনটি সর্বপ্রকার অত্যাচার-অবিচারের ব্যাপারে সহি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। আর হত্যা হলো, সব যুলুমের বড় যুলুম। আল্লাহই সর্বজ্ঞ। সকল প্রশংসা আল্লাহর।

ইমাম আহমদ, আবু দাউদ ও তিরমিযি রহ. হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাযি.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি উসমান ইবনে আফফান রাযি.-এর গোলযোগের

সময় বলেছিলেন : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "অদূর ভবিষ্যতে এমন একটি গোলযোগ হবে, সে সময়ে বসে থাকা ব্যক্তি দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তির চেয়ে, দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তি চলন্ত ব্যক্তির চেয়ে এবং চলন্ত ব্যক্তি ধাবমান ব্যক্তির চেয়ে উত্তম হবে।" এ কথা শুনে সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযি. বললেন, আচ্ছা! কেউ যদি আমার ঘরে প্রবেশ করে আমাকে হত্যা করার জন্য হাত বাড়ায়, তখন আমি কী করব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "তখন তুমি আদমের পুত্রের মতো হয়ো।"

হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান রাযি. থেকে ইবনে মারদুহ মারফূ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "তখন তুমি আদমের দুই পুত্রের উত্তমজনের মতো হয়ো।"

আহমদ রহ. বর্ণনা করেন, ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "অন্যায়ভাবে যে ব্যক্তিই নিহত হয়, তার খুনের একটি দায় আদমের প্রথম পুত্রের ওপর বর্তায়। কারণ, সে-ই সর্বপ্রথম হত্যাকর্মের প্রচলন করে।"

তদ্রুপ আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাযি. ও ইবরাহিম নাখয়ি রহ. থেকে বর্ণিত আছে। দামেশকের উত্তর সীমান্তে কাসিয়ুন পাহাড়ের কাছে একটি বধ্যভূমি আছে বলে জনশ্রুতি আছে। এ স্থানটিকে মাগারাতুদ দাম বলা হয়ে থাকে। কেননা সেখানেই কাবীল তার ভাই হাবীলকে খুন করেছিল বলে কথিত আছে। তথ্যটি আহলে কিতাবদের থেকে সংগৃহীত। তাই এর যথার্থতা সম্পর্কে আল্লাহই ভালো জানেন।

হাফেজ ইবনে আসাকির রহ. তাঁর গ্রন্থে আহমদ ইবনে কাসির রহ.-এর জীবনী প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, তিনি একজন পুণ্যবান লোক ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হযরত আবু বকর, ওমর রাযি. ও হাবীলকে স্বপ্ন দেখেন। তিনি হাবীলকে কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, এখানেই তাঁর রক্তপাত করা হয়েছে কি না? তিনি শপথ করে তা স্বীকার করেন এবং বলেন– তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন, তিনি যেন এ স্থানটিকে সকল দোয়া কবুল হওয়ার স্থান করে দেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর দোয়া কবুল করেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে তাঁকে সমর্থন দান করে বলেন, আবু বকর ও ওমর রাযি. প্রতি বৃহস্পতিবার এ স্থানটি যিয়ারত করতেন।

আমাদের কথা হলো, এটি একটি স্বপ্ন মাত্র। ঘটনাটি সত্যি সত্যি আহমদ ইবনে কাসির-এর হলেও এর ওপর শরয়ি বিধান কার্যকর হবে না। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ (٣١)

"তারপর আল্লাহ এক কাক পাঠালেন, যে তার ভাইয়ের শবদেহ কীভাবে গোপন করা যায়, তা দেখানোর জন্য মাটি খনন করতে লাগল। সে বলল, হায়! আমি কি এ

কাকের মতোও হতে পারলাম না, যাতে আমার ভাইয়ের লাশ গোপন করতে পারি। তারপর সে অনুতপ্ত হলো। (সূরা মায়েদা : ৩১)

কেউ কেউ উল্লেখ করেন, কাবীল হাবীলকে হত্যা করে এক বছর পর্যন্ত মতান্তরে একশ বছর পর্যন্ত তাকে নিজের পিঠে করে ঘুরে বেড়ায়। এরপর আল্লাহ তাআলা দুটি কাক প্রেরণ করেন।

সুদ্দী রহ. সনদসহ কয়েকজন সাহাবীর বরাতে বর্ণনা করেন : দুই ভাই (ভাই সম্পর্কীয় দুটি কাক) পরস্পর ঝগড়া করে একজন অপরজনকে হত্যা করে ফেলে। তারপর মাটি খুঁড়ে তাকে দাফন করে রাখে। কাবীল এ দৃশ্য দেখে বলে– يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ এরপর সে কাকের ন্যায় হাবীলকে দাফন করে।

ইতিহাস ও সীরাত বিশারদগণ বলেন, আদম আ. তাঁর পুত্র হাবীলের জন্য অত্যন্ত শোকাহত হয়ে পড়েন এবং এ বিষয়ে কয়েকটি পঙক্তি আবৃত্তি করেন। ইবনে জারির রহ. ইবনে হুমায়দ থেকে তা উল্লেখ করেন। যথা–

تَغَيَّرَتِ الْبِلَادُ وَمَنْ عَلَيْهَا. فَوَجْهُ الْأَرْضِ مُغْبَرٌّ قُبْحٌ

تَغَيَّرَ كُلُّ ذِيْ لَوْنٍ وَّطَعْمٍ. وَقَلَّ بَشَاشَةُ الْوَجْهِ الْمَلِيْحِ

"জনপদ ও জনগণ সব উলট-পালট হয়ে গেছে। পৃথিবীর চেহারা এখন ধূলি-ধূসর ও মলিনরূপ ধারণ করেছে। কোনো কিছুরই রং-রূপ স্বাদ-গন্ধ এখন আর আগের মতো নেই। লাবণ্যময় চেহারার ঔজ্জ্বল্যও আগের চেয়ে কমে গেছে।"

এরপর আদম আ.-এর উদ্দেশ্যে বলা হয়–

اَبَا هُبَيْلٍ قَدْ قُتِلَا جَمِيْعًا. وَصَارَ اِلَيَّ كَالْمَيِّتِ الذَّبِحِ

وَجَاءَ بِشَرَّةٍ قَدْ كَانَ مِنْهَا. عَلَى خَوْفٍ فَجَاءَ بِهَا يَصِيْحُ.

"হে হাবীলের পিতা! ওরা দুজনই নিহত হয়েছে। আর বেঁচে থাকা লোকটিও জবাইকৃত মৃতের মতো হয়ে গেছে। সে এমন একটি অপকর্ম করল, ফলে সে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে আর্তনাদ করতে করতে ছুটতে লাগল।"

এ পঙক্তিগুলোও সন্দেহমুক্ত নয়। হতে পারে আদম আ. পুত্রশোকে নিজের ভাষায় কোনো কথা বলেছিলেন। পরবর্তীকালে কেউ তা এভাবে ছন্দরূপ দেয়। এ ব্যাপারে বেশ মতভেদ রয়েছে। আল্লাহ পাকই ভালো জানেন।

মুজাহিদ রহ. উল্লেখ করেন, কাবীল যে-দিন তার ভাইকে হত্যা করেছিল সেদিনই নগদ নগদ তাকে এর শাস্তি প্রদান করা হয়। মাতা-পিতার অবাধ্যতা, ভাইয়ের প্রতি হিংসা এবং পাপের শাস্তিস্বরূপ তার পায়ের গোছাকে উরুর সাথে ঝুলিয়ে এবং মুখমণ্ডলকে সূর্যমুখী করে রাখা হয়েছিল। হাদিসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "পরকালের জন্য শাস্তি সঞ্চিত রাখার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তাআলা

তাকে নগদ শাস্তি প্রদান করেন। শাসকের বিরুদ্ধাচরণ ও আত্মীয়তা ছিন্ন করার মতো এমন জঘন্য অপরাধ আর নেই।"

আহলে কিতাবদের হাতে রক্ষিত তাওরাতে রয়েছে, আল্লাহ তাআলা কাবীলকে অবকাশ দিয়েছেন। সে এডেনের পূর্ব দিকে অবস্থিত নূদ অঞ্চলের কিন্নীন নামক স্থানে কিছুকাল বসবাস করেছিল। খানুখ নামে তার একটি সন্তানও জন্ম হয়েছিল। তারপর খানুখের ঔরসে উনদুর, উনদুরের ঔরসে মাহওয়াবিল, মাহওয়াবিলের ঔরসে মুতাওয়াশিল এবং মুতাওয়াশিলের ঔরসে লামাকের জন্ম হয়। এই লামাক দুই মহিলাকে বিবাহ করে। একজন হল আদা অপরজন সালা। আদা ইবিল নামের এক সন্তান প্রসব করে। এ ইবিলই প্রথম ব্যক্তি, যে গম্বুজাকৃতির তাবুতে বসবাস করে এবং সম্পদ আহরণ করে। আদার গর্ভে নওবিল নামের আরেকটি সন্তান জন্ম হয়। যে সর্বপ্রথম বাদ্যযন্ত্র ও করতাল ব্যবহার করে।

অপরদিকে 'সালা' তুবলাকিন নামের একটা সন্তান প্রসব করেন। তুবলাকিনই প্রথম তামা ও লোহা ব্যবহার করেন। সালা একটি কন্যা সন্তানও প্রসব করেন। তার নাম ছিল নামা।

কথিত তাওরাতে আরো আছে, আদম আ. একবার স্ত্রী সহবাস করলে তাঁর একটি পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করে। স্ত্রী তার নাম 'শীষ' রেখে বললেন, কাবীল কর্তৃক নিহত হাবীলের পরিবর্তে আমাকে এ সন্তান দান করা হয়েছে। তাই তার এ নাম রাখা হলো। শীষের ঔরসে 'আনুশ'-এর জন্ম হয়।

কথিত আছে, শীষের যেদিন জন্ম হয় সেদিন আদম আ.-এর বয়স ছিল একশ ত্রিশ বছর। এরপর তিনি আরো আট শ' বছর বেঁচেছিলেন। আনুশের জন্মের দিন 'শীষ'-এর বয়স ছিল একশ পঁয়ষট্টি বছর। 'আনুশ' ছাড়া তাঁর আরো কয়েকজন ছেলে-মেয়ে ভূমিষ্ঠ হয়। আনুশের বয়স যখন নব্বই বছর, তখন তার পুত্র 'কীনান'-এর জন্ম হয়। তারপর যখন কীনানের বয়স সত্তর বছরে উপনীত হয়, তখন তাঁর ঔরসে 'মাহলাইল'-এর জন্ম হয়। তারপর মাহলাইল পঁয়ষট্টি বছর বয়সে উপনীত হলে তার পুত্র 'ইয়ারদ'-এর জন্ম হয়। তারপর 'ইয়ারদ' একশ বাষট্টি বছর বয়সে পৌঁছলে তাঁর পুত্র 'খানুখে'র জন্ম হয়। তারপর খানুখের বয়স পঁয়ষট্টি বছর হলে তার পুত্র মুতাওয়াশ্শালিহ এর জন্ম হয়। তারপর যখন মুতাওয়াশ্শালিহ একশ সাতাশি বছর বয়সে উপনীত হন, তখন তাঁর পুত্র 'লামাক' এর জন্ম হয়। লামাক এর বয়স একশ' বিরাশি বছর হলে তার ঔরসে নূহ আ.-এর জন্ম হয়।

এরপর আদম আ. আরো পাঁচ শ' পঁচানব্বই বছর বেঁচে থাকেন। এ সময়ে তাঁর আরো কয়েকজন ছেলে-মেয়ে জন্ম হয়। তারপর নূহ আ.-এর বয়স পাঁচশ বছর হলে তাঁর ঔরসে সাম, হাম ও ইয়াফিছ'-এর জন্ম হয়। এ হলো আহলে কিতাবদের গ্রন্থের বর্ণনা। উক্ত ঘটনাপঞ্জি আসমানি কিতাবের বর্ণনা কি-না, এ ব্যাপারে সন্দেহ আছে। বহু আলেম এ ব্যাপারে আহলে কিতাবদের বক্তব্যের সমালোচনা করেছেন।

উল্লেখ্য, এ বর্ণনায় অবিবেচনাপ্রসূত অতিকথন রয়েছে। অনেকে এ বর্ণনাটির ব্যাখ্যাস্বরূপ অনেক সংযোজন করেছেন এবং তাতে যথেষ্ট ভুলও রয়েছে। যথাস্থানে বিষয়টি আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ।

ইমাম আবু জাফর তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে কতিপয় আহলে কিতাবের বরাতে উল্লেখ করেছেন, আদম আ.-এর ঔরসে হাওয়া আ.-এর বিশ গর্ভে চল্লিশজন সন্তান প্রসব করেন। ইবনে ইসহাক এ বক্তব্য দিয়ে তাদের নামও উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

কেউ কেউ বলেন, হাওয়া আ. প্রতি গর্ভে একটি পুত্র ও একটি কন্যা সন্তান করে একশ' বিশ জোড়া সন্তান জন্ম দেন। এদের সর্বপ্রথম হলো, কাবীল ও তার বোন কালিমা আর সর্বশেষ হল আবদুল মুগিছ ও তাঁর বোন উম্মুল মুগিছ। এরপর মানুষ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। সংখ্যায় তারা অনেক হয়ে পৃথিবীর আনাচে-কানাচে বিস্তার লাভ করে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا

وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

"হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন। আর যিনি তার থেকে তার সঙ্গিনীকেও সৃষ্টি করেছেন। এবং যিনি তাদের দুজন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন।" (সূরা নিসা : ১)

ঐতিহাসিকগণ বলেন, আদম আ. তাঁর ঔরসজাত সন্তান এবং তাদের সন্তানদের সংখ্যা চার লাখে উপনীত হওয়ার পর ইনতেকাল করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ

حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

(١٨٩) فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

"তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে সে তার কাছে শান্তি পায়। তারপর যখন সে তার সঙ্গে মিলিত হয়, তখন সে এক লঘু গর্ভধারণ করে এবং তা নিয়ে সে অনায়াসে চলাফেরা করে; গর্ভ যখন গুরুভার হয় তখন তারা উভয়ে তাদের প্রতিপালক আল্লাহর কাছে দোয়া করেন– যদি তুমি আমাদেরকে এক পূর্ণাঙ্গ সন্তান দাও, তবে তো আমরা কৃতজ্ঞ থাকব। তারপর যখন তিনি তাদেরকে এক পূর্ণাঙ্গ সন্তান দান করেন, তখন তারা তাদেরকে যা দান করা হয়, সে সম্বন্ধে আল্লাহর শরিক করে; কিন্তু তারা যাকে শরিক করে আল্লাহ তা অপেক্ষা অনেক উর্ধ্বে।"

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম আদম আ.-এর কথা উল্লেখ করে পরে ভ্রূণ তথা মানবজাতির আলোচনা করেছেন। এর দ্বারা হযরত আদম ও হাওয়া আ.কে বুঝানো হয় নি। বরং ব্যক্তি উল্লেখের দ্বারা মানব জাতিকে বুঝানো উদ্দেশ্য। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (١٢) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (١٣)

"আমি মানুষকে মৃত্তিকার উপাদান থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর আমি তাকে শুক্র বিন্দুরূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে। (সূরা ত্বহা : ১২-১৩)

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ

"আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা এবং তাদেরকে করেছি শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ।" (সূরা মুল্‌ক : ৫)

এটা জানা কথা,এখানে শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ সত্যি সত্যি আকাশের নক্ষত্ররাজি নয়। বরং আয়াতে নক্ষত্র শব্দ উল্লেখ করে নক্ষত্র শ্রেণী বুঝানো হয়েছে।

✪ ইমাম আহমদ রহ. বলেন, এক হাদিসে আছে– হাওয়া আ.-এর সন্তান জন্মগ্রহণ করে বাঁচতো না। একবার তাঁর একটি সন্তান জন্ম হলে ইবলিস তাঁর কাছে গমন করে বলল, তুমি এর নাম আবদুল হারিস রেখে দাও, তবে সে বাঁচবে। হাওয়া তার নাম আবদুল হারিস রেখে দিলে সে বেঁচে যায়।

আমাদের কথা হলো, আল্লাহ তাআলা আদম ও হাওয়া আ. কে সৃষ্টি করেছেন, তারা মানবজাতির উৎসমূল হবেন। তাঁদের থেকে তিনি বহু নর-নারী বিস্তার করবেন। সুতরাং উপরিউক্ত হাদিসে যা উল্লেখ করা হয়েছে, যদি তা যথার্থ হয়ে থাকে, তা হলে হাওয়া আ.-এর সন্তান না বাঁচার কী যুক্তি থাকতে পারে? তাই হাদিসটি মারফু আখ্যা দেওয়া ভুল। মওকুফ হওয়াই যথার্থ। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।

হযরত শীষ আ.-কে অসিয়ত

শীষ অর্থ আল্লাহর দান। হাবীল নিহত হওয়ার পর হযরত আদম আ. এ পুত্র সন্তান লাভ করেছিলেন। তাই হযরত আদম ও হাওয়া আ. তাঁর এ নাম রেখেছিলেন।

✪ হযরত আবু যর রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন : আল্লাহ তাআলা একশ চারখানা সহিফা (পুস্তিকা) নাযিল করেছেন। তন্মধ্যে পঞ্চাশটি নাযিল করেন শীষ আ.-এর ওপর।

✪ মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক রহ. বলেন : হযরত আদম আ.-এর ওফাতের সময় যখন ঘনিয়ে আসে, তখন তিনি তাঁর পুত্র শীষ আ. কে কাছে ডেকে অসিয়ত ও নসিহত করেন। তিনি পুত্র শীষ আ. কে দিন ও রাতের সময়গুলোর পরিচয় করিয়ে দেন এবং এ সময়ের ইবাদতসমূহের শিক্ষা দেন। পরবর্তীকালে যে মহা তুফান সংঘটিত হবে, তিনি সে খবরও তাঁকে জানিয়ে দেন।

হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী তিনি নবী ছিলেন। ইবনে হিব্বান তাঁর সহি কিতাবে আবু যর রাযি. থেকে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হযরত শীষ আ.-এর ওপর পঞ্চাশটি সহিফা নাযিল হয়। এরপর তাঁর মৃত্যু ঘনিয়ে আসলে তাঁর অসিয়ত অনুসারে তাঁর পুত্র

আনুশ, তারপর তাঁর পুত্র কিনান দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তারপর তিনিও মৃত্যুবরণ করলে তাঁর ছেলে মাহলাইল দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

পারসিকদের মতে মাহলাইল সপ্ত রাজ্যের তথা গোটা পৃথিবীর রাজা ছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম গাছপালা কেটে শহর, নগর ও বড় বড় দুর্গ নির্মাণ করেন। বাবেল ও 'সূস আল-আকসা' নগরী তিনিই নির্মাণ করেন। তিনিই ইবলিস ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের পরাজিত করে তাদেরকে পৃথিবীর সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহে এবং বিভিন্ন পাহাড়ি উপত্যকায় তাড়িয়ে দেন। তিনি একদল অবাধ্য জিন-ভূতকেও হত্যা করেন। তার একটি বড় মুকুট ছিল। তিনি লোকজনদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা প্রদান করতেন। তাঁর রাজত্ব চল্লিশ বছর পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ইয়ারদ তাঁর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এরপর তাঁরও মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তিনি আপন পুত্র খানুখকে অসিয়ত করে যান। প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী এ খানুখই হলেন হযরত ইদরিস আ.।

ওফাত লাভ

✪ মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেন, মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে আদম আ. তাঁর পুত্র শীষ আ. কে অসিয়ত করেন। তাতে রাত ও দিবসের ক্ষণসমূহ এবং সেসব ক্ষণের ইবাদতসমূহ শিখিয়ে যান ও ভবিষ্যতে আসন্ন তুফান সম্পর্কে অবহিত করে যান।

✪ মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক রহ. বলেন, আজকের সকল আদম সন্তানের বংশধারা শীষ পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়ে যায় এবং শীষ ছাড়া আদম আ.-এর অপর সব কটি বংশধারাই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আল্লাহ্ পাকই সর্বজ্ঞ।

জুমার দিন দিন আদম আ. শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ফেরেশতাগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে জান্নাতের কিছু সুগন্ধি ও কাফন নিয়ে তাঁর কাছে আগমন করেন এবং তাঁর পুত্র ও স্থলাভিষিক্ত শীষ আ.-কে সান্ত্বনা দান করেন। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক রহ. বলেন, সেই সঙ্গে সাত দিন সাত রাত পর্যন্ত চন্দ্র ও সূর্যের গ্রহণ লেগে থাকে।

✪ ইমাম আহমদের পুত্র আবদুল্লাহ বলেন, ইয়াহইয়া ইবনে যামরা সাদী বলেন, মদিনায় আমি এক প্রবীণ ব্যক্তিকে কথা বলতে দেখে তাঁর পরিচয় জানতে চাইলে লোকেরা বলল, তিনি উবাই ইবনে কাব রাযি.। তখন তিনি কথা প্রসঙ্গে বললেন, "আদম আ.-এর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তিনি তাঁর পুত্রদের বললেন, আমার জান্নাতের ফল খেতে ইচ্ছা হয়। তাঁরা ফলের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন।

পথে তাঁদের সঙ্গে কতিপয় ফেরেশতাদের সাক্ষাৎ ঘটে। তাদের সাথে আদম আ.-এর কাফন, সুগন্ধি, কয়েকটি কুঠার, কোদাল ও থলে ছিল। ফেরেশতাগণ তাদের বললেন, হে আদম-পুত্রগণ! তোমরা কী চাও এবং কী খুঁজছ? কিংবা বললেন, তোমরা কী উদ্দেশ্যে এবং কোথায় যাচ্ছ? উত্তরে তারা বললেন, আমাদের পিতা অসুস্থ। তিনি জান্নাতের ফল খাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন। এ কথা শুনে ফেরেশতাগণ বললেন, তোমরা ফিরে যাও। তোমাদের পিতার ইনতেকালের সময় ঘনিয়ে এসেছে।

ফেরেশতাগণ আদম আ.-এর কাছে এলে হাওয়া আ. তাদের চিনে ফেলেন এবং আদম আ. কে জড়িয়ে ধরেন। তখন আদম আ. বললেন, আমাকে ছেড়ে দিয়ে তুমি সরে যাও। কারণ, তোমার আগেই আমার ডাক পড়েছে। অতএব আমার ও আমার মহান রব-এর ফেরেশতাগণের মধ্য থেকে তুমি সরে দাঁড়াও।

ফেরেশতাগণ তাঁর জান কবয করে নিয়ে তাঁকে গোসল দেন। কাফন পরান। সুগন্ধি মাখিয়ে দেন। এবং তাঁর জন্য বগলী কবর খুঁড়ে জানাযার নামায আদায় করেন। তারপর তাঁকে কবরে রেখে দাফন করেন। এরপর তাঁরা বললেন, হে আদমের সন্তানগণ! এ হলো তোমাদের দাফনের নিয়ম। এ বর্ণনাটির সনদ সহি।

✪ ইবনে আসাকির রহ. ইবনে আব্বাস রাযি.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ফেরেশতাগণ আদম আ.-এর জানাযায় চারবার, আবু বকর রাযি. ফাতেমা রাযি.-এর জানাযায় চারবার, হযরত ওমর রাযি. হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযি.-এর জানাযায় চারবার এবং সুহাইব রাযি. হযরত ওমর রাযি.-এর জানাযায় চারবার তাকবির পাঠ করেন। ইবনে আসাকির বলেন, শায়বান ছাড়া অন্যান্য রাবি মাইমুন সূত্রে ইবনে ওমর রাযি. থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেন।

আদম আ.-কে কোথায় দাফন করা হয়েছে

হযরত আদম আ.-কে কোথায় দাফন করা হয়েছে, এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। প্রসিদ্ধ মতে, তাঁকে সে পাহাড়ের কাছে দাফন করা হয়েছে, যে পাহাড় থেকে তাঁকে ভারতবর্ষে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কেউ কউে বলেন, আবু কুবাইস পাহাড়ে তাঁকে দাফন করা হয়। কেউ কেউ বলেন, মহা প্লাবনের সময় হযরত নূহ আ. আদম ও হাওয়া আ.-এর লাশ একটি সিন্দুকে ভরে বায়তুল মুকাদ্দাসে দাফন করেন। ইবনে জারির এ তথ্য বর্ণনা করেছেন।

✪ ইবনে আসাকির কারো কারো সূত্রে বর্ণনা করেন, আদম আ.-এর মাথা হলো মসজিদে ইবরাহিমের কাছে, এবং পা দু'খানা বায়তুল মুকাদ্দাসের সাখরা নামক বিখ্যাত পাথর খণ্ডের কাছে। হযরত আদম আ.-এর এক বছর পরই হাওয়া আ.-এর মৃত্যু হয়।

আদম আ.-এর আয়ু কত ছিল, এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। ইবনে আব্বাস রাযি. ও আবু হোরায়রা রাযি. থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত হাদিসে আমরা উল্লেখ করে এসেছি, আদম আ.-এর আয়ু লাওহে মাহফুযে এক হাজার বছর লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। আদম আ. নয় শ ত্রিশ বছর জীবন লাভ করেছিলেন বলে তাওরাতে যে তথ্য আছে, তার সঙ্গে এর কোনো বিরোধ নেই। কারণ ইহুদিদের এ বক্তব্য আপত্তিকর এবং আমাদের হাতে যে সংরক্ষিত সঠিক তথ্য রয়েছে, তার সঙ্গে সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে তা প্রত্যাখাত। তা ছাড়া ইহুদিদের বক্তব্য ও হাদিসের তথ্যের মাঝে সমন্বয় সাধন করাও সম্ভব। কারণ, তাওরাতের তথ্য যদি সংরক্ষিত হয়; তা হলে তা অবতরণের পর পৃথিবীতে অবস্থান করার মেয়াদের ওপর প্রয়োগ হবে। আর তা হলো সৌর বছর

হিসাবে নয় শ ত্রিশ বছর। চন্দ্র বছর হিসাবে নয় শ সাতান্ন বছর। এর সঙ্গে যোগ হবে ইবনে জারির রহ.-এর বর্ণনানুযায়ী অবতরণের পূর্বে জান্নাতে অবস্থানের মেয়াদকাল তেতাল্লিশ বছর। সর্বসাকুল্যে এক হাজার বছর।

'আতা খুরাসানি বলেন, হযরত আদম আ.-এর ইনতেকাল হলে গোটা সৃষ্টিজগৎ সাতদিন পর্যন্ত ক্রন্দন করে। ইবনে আসাকির রহ. এ তথ্য বর্ণনা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শীষ আ. তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

হযরত আদম আ.-এর কিছু গুণাবলী

হযরত আদম ও হাওয়া আ. অত্যন্ত মুত্তাকী ছিলেন। কেননা আদম আ. হলেন মানবজাতির পিতা। আল্লাহ তাআলা তাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেন, তাঁর মধ্যে নিজের রূহ সঞ্চার করেন। ফেরেশতাদেরকে তাঁর সম্মুখে সিজদাবনত করান। তাঁকে যাবতীয় বস্তুর নাম শিক্ষা দেন ও তাঁকে জান্নাতে বসবাস করতে দেন।

✪ ইবনে হিব্বান রহ. তাঁর সহি গ্রন্থে আবু যর রাযি. সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : আমি বললাম, আল্লাহর রাসূল! নবীর সংখ্যা কত? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এক লাখ চব্বিশ হাজার। আমি বললাম, আল্লাহর রাসূল! তাঁদের মধ্যে রাসূলের সংখ্যা কত? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তিন শ তেরজন। আমি বললাম, তাঁদের প্রথম কে ছিলেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আদম আ.। আমি বললাম, আল্লাহর রাসূল! তিনি কি প্রেরিত নবী? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ! আল্লাহ তাঁকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তাঁর মধ্যে তাঁর রূহ সঞ্চার করেছেন। তারপর তাঁকে নিজেই সুঠাম করেছেন। কাবে আহবার বলেন, জান্নাতে কারো দাড়ি থাকবে না। কেবল আদম আ.-এর নাভি পর্যন্ত দীর্ঘ কালো দাড়ি থাকবে। আর জান্নাতে কাউকে উপনামে ডাকা হবে না। শুধু আদম আ. কেই উপনামে ডাকা হবে। দুনিয়াতে তাঁর উপনাম হলো আবুল বাশার। জান্নাতে হবে আবু মুহাম্মদ।

✪ সহি বোখারি ও মুসলিম শরিফে বর্ণিত মেরাজ সংক্রান্ত হাদিসে আছে– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নিম্ন আকাশে আদম আ.-এর কাছে গমন করেন; তখন আদম আ. তাঁকে বলেছিলেন : পুণ্যবান পুত্র ও পুণ্যবান নবীকে স্বাগতম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ডানে একদল এবং বাঁয়ে একদল লোক দেখতে পান। আদম আ. ডানদিকে দৃষ্টিপাত করে হেসে দেন ও বামদিকে দৃষ্টিপাত করে কেঁদে ফেলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : আমি তখন বললাম, জিবরাইল, এ সব কী? উত্তরে জিবরাইল আ. বললেন, ওনি আদম এবং এরা তাঁর বংশধর। ডানদিকের লোকগুলো হলো জান্নাতী। তাই সেদিকে দৃষ্টিপাত করে তিনি হেসে দেন। আর বামদিকের লোকগুলো হলো জাহান্নামী। তাই ওদের দিকে দৃষ্টিপাত করে তিনি

কেঁদে ফেলেন। আবুল বায্যার বর্ণনা করেন, আদম আ.-এর জ্ঞানবুদ্ধি তাঁর সমস্ত সন্তানের জ্ঞানবুদ্ধির সমান ছিল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হাদিসে আরো বলেন, তারপর আমি ইউসুফ আ.-এর কাছে গমন করি। দেখলাম, তাকে অর্ধেক রূপ দেওয়া হয়েছে। আলেমগণ এর অর্থ প্রসঙ্গে বলেন, ইউসুফ আ. আদম আ.-এর রূপের অর্ধেকের অধিকারী ছিলেন। এ কথাটা যুক্তিসঙ্গত। কারণ, আল্লাহ তাআলা আদম আ. কে নিজের পবিত্র হাতে সৃষ্টি করেছেন। আকৃতি দান করেছেন। এবং তাঁর মধ্যে নিজের রূহ সঞ্চার করেছেন। অতএব এমন লোকটি অন্যদের থেকে অধিক সুন্দর হওয়াই স্বাভাবিক।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. এবং ইবনে আমর রাযি. থেকে মওকূফ ও মারফূরূপে বর্ণনা করা হয়েছে– আল্লাহ তাআলা যখন জান্নাত সৃষ্টি করেন, তখন ফেরেশতাগণ বলেছিল : হে আমাদের রব, এটি আপনি আমাদেরকে দিয়ে দিন। কারণ, আদম আ.-এর সন্তানদের জন্য তো দুনিয়াই সৃষ্টি করেছেন। যাতে তারা সেখানে পানাহার করতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার সম্মান ও মহিমার শপথ! যাকে আমি নিজ হাতে সৃষ্টি করলাম, তার সন্তানদেরকে আমি তাদের সমান করব না, যাদেরকে আমি কুন (হও) বলতে হয়ে গেছে।"

বোখারি ও মুসলিমে বিভিন্ন সূত্রে আছে : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ তাআলা আদম আ.-কে তাঁর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। এ হাদিসের ব্যাখ্যায় অনেকে অনেক অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

হযরত ইদরীস আ.

নাম ও বংশ পরিচয়

হযরত ইদরীস আ.-এর নাম ও বংশ পরিচয় এবং তাঁর যুগ সম্প… ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। উক্তিগুলোকে একত্র করলে অন্ততপ… কোনো মীমাংসা বা প্রবল অভিমত প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না। কারণ, প্রথমত কোরআ… মাজিদে শুধু নসিহত ও হেদায়েতের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তাঁর নবুয়ত, উচ্চ মর্যা… ও মহৎ গুণাবলীর উল্লেখ করেছে। দ্বিতীয়ত হাদিসের বর্ণনাগুলোও এর চেয়ে বে… অগ্রসর হয় নি। তাই এ সম্পর্কে যা কিছু পাওয়া যায়, তা শুধু ইসরাইলি রেওয়ায়েত… তদুপরি সেগুলোও পরস্পরবিরোধী। এ সব মতানৈক্যসহ মোটামুটি যা কিছু পাও… যায়, নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো–

একদল বলেন : তিনি নূহ আ.-এর দাদা। তাঁর নাম আখনুখ। ইদরীস তাঁর লকব… উপাধি। অথবা আরবি ভাষায় ইদরীস আর হিব্রু ও সুরিয়ানি ভাষায় তাঁর নাম আখনুখ… অপর দল বলেন : ইদরীস আ. ছিলেন বনি ইসরাইল বংশীয় আমবিয়ায়ে কেরামে… একজন। তা ছাড়া ইদরীস ও ইলয়াস আ. একই ব্যক্তির নাম ও উপাধি।

তৃতীয় দল বলেন : ইদরীস আ. বাবেলে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানেই প্রতিপালি… হন ও বেড়ে উঠেন। প্রথম জীবনে তিনি হযরত শীষ ইবনে আদম আ. থেকে জ্ঞান… অর্জন করেন। আকায়েদ শাস্ত্রের বিখ্যাত আলেম আল্লামা শাহরেস্তানি বলেন, আগুস… যাইমুন ছিল হযরত শীষ আ.-এরই নাম।

পবিত্র কোরআনে হযরত ইদরীস আ.

পবিত্র কোরআনুল কারিমের মাত্র দু জায়গায় হযরত ইদরীস আ. সম্পর্কে আলোচনা… করা হয়েছে। সূরা মরিয়ম ও আম্বিয়ায়।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا (٥٦) وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا

"আর স্মরণ করুন, কোরআনে উল্লিখিত ইদরীসকে। তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ নবী। আমি তাকে উন্নীত করেছিলাম উচ্চ মর্যাদায়।" (সূরা মরিয়ম : ৫৬-৫৭)

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ

"আর ইসমাইল ইদরীস ও যুলকিফল– তাদের প্রত্যেকেই ছিলেন ধৈর্যশীল।"

(সূরা আম্বিয়া : ৮৫)

হাদিস পাকে হযরত ইদরীস আ.-এর আলোচনা

এক হাদিসে আছে, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেউ জ্যোতির্বিদ্যার নকশা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন, "এ জ্ঞান জনৈক নবীকে

দান করা হয়েছিল। অতএব কোনো ব্যক্তির অঙ্কিত নকশা যদি সেই নকশার মতো হয়ে যায়, তবেই তা সঠিক হবে; অন্যথায় নয়।"

বোখারি ও মুসলিমে মেরাজের হাদিসে উল্লেখ আছে, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চতুর্থ আসমানে হযরত ইদরীস আ.-এর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। ইমাম বোখারি রহ. বলেন : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, ইলিয়াস নবীর নামই ছিল ইদরীস। কিন্তু কোরআন মাজিদে হযরত ইদরীস ও হযরত ইলিয়াস আ. কে আলাদা আলাদা নবী বর্ণনা করায় তাঁর এ রেওয়ায়েত গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

হযরত ইদরীস আ.-এর গঠনাকৃতি

হযরত ইদরীস আ. ছিলেন বাদামী রংয়ের সুঠামদেহী, সুদর্শন ও সুশ্রী, ঘন দাড়ি, কমনীয় রং-রূপ ও চেহারার অধিকারী। শক্ত বাহু ও প্রশস্ত কাঁধ, মজবুত হাড় ও হালকা পাতলা গঠন ও উজ্জ্বল সুরমা চোখ। কথাবার্তায় গম্ভীর। নীরবতাপ্রিয়। দৃঢ়চেতা। চলাফেরায় নিচুদৃষ্টি, চিন্তাশীল ও অনুসন্ধানী। ক্রোধের সময় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ। কথা বলার সময় তর্জনী অঙ্গুলি দ্বারা বারবার ইশারা করতে অভ্যস্ত। হযরত ইদরীস আ. ৮২ বছর বয়স পেয়েছিলেন। তাঁর আংটির ওপর একটি বাক্য অঙ্কিত ছিল–

اَلصَّبْرُ مَعَ الْاِيْمَانِ بِاللهِ يُوْرِثُ الظَّفَرَ۔

"আল্লাহর প্রতি ঈমানের সঙ্গে সঙ্গে ধৈর্যধারণ বিজয়ের কারণ হয়ে থাকে।"

কোমরবন্দের বা বেল্টের ওপর লেখা ছিল–

اَلْاَعْيَادُ فِيْ حِفْظِ الْفُرُوْضِ وَالشَّرِيْعَةُ مِنْ تَمَامِ الدِّيْنِ وَتَمَامُ الدِّيْنِ كَمَالُ الْمُرُوَّةِ۔

"প্রকৃত আনন্দ আল্লাহ পাকের ফরযগুলো সংরক্ষণের মধ্যে নিহিত। ধর্মের পূর্ণতা শরিয়তের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আর মানবতার পূর্ণতা অর্জনে ধর্মের পূর্ণতা সাধিত হয়।"

জানাযার নামাযের সময় যে পাগড়ি বাঁধতেন, তাতে লিখা ছিল–

اَلسَّعِيْدُ مَنْ نَظَرَ لِنَفْسِهٖ وَشَفَاعَتُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ اَعْمَالُهُ الصَّالِحَةُ۔

"ভাগ্যবান সেই ব্যক্তি, যে নিজের নফসের প্রতি দৃষ্টি রাখে। আর পালনকর্তার দরবারে মানুষের জন্য সুপারিশকারী হলো, তার নেকআমলসমূহ।"

হযরত ইদরীস আ.-এর তাবলীগে দীন

আল্লামা জামালুদ্দীন কাতফী রহ. রচিত 'তারিখুল হুকামা' কিতাবে লিখেছেন : "হযরত ইদরীস আ. সম্বন্ধে তাফসিরকারক ও ঐতিহাসিকগণের কথাগুলো প্রসিদ্ধ। তাঁর সম্পর্কে দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের বিশেষ কথাগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

হযরত ইদরীস আ. জ্ঞান বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়ার বয়সে উপনীত হলে আল্লাহ পাক তাঁকে নবুয়ত প্রদান করেন। তখন তিনি দুষ্টপ্রকৃতির ও ফাসাদ বিস্তারকারীদের হেদায়েতের

পথে আহ্বান করেন। ফাসাদ বিস্তারকারীরা তাঁর কোনো কথাই কর্ণপাত করল না। হযরত আদম ও শীষ আ.-এর শরিয়তের বিরোধিতাই করতে থাকল। অবশ্য ক্ষুদ্র একটি দল ইমান গ্রহণ করল। হযরত ইদরীস আ. এ অবস্থা দেখে সেখান থেকে অন্যত্র হিজরতের মনস্থ করলেন। নিজের অনুগামীদেরকে হিজরত করতে বললেন। তাঁর অনুসারীরা তখন আপন জন্মভূমি ত্যাগ করাকে দুঃসহ ও কষ্টসাধ্য মনে করে বলল, 'বাবেল' শহরের মতো এমন সুন্দর বাসস্থান আমাদের ভাগ্যে আর কোথায় হতে পারে! (বাবেল অর্থ নহর) বাবেল যেহেতু দজলা ও ফোরাত নদীদ্বয়ের পানিতে সবুজ-শ্যামল ছিল, তাই একে 'বাবেল' নাম দেওয়া হয়েছিল। এটা ছিল ইরাকের অন্তর্গত একটি বিখ্যাত শহর। কালক্রমে তা বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

হযরত ইদরীস আ. তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "তোমরা যদি আল্লাহ তাআলার পথে এতটুকু কষ্ট সহ্য কর, তবে তাঁর রহমত সুপ্রসন্ন। তিনি তোমাদেরকে এর চেয়ে উত্তম প্রতিদান প্রদান করবেন। সাহস হারিও না। আল্লাহ পাকের আদেশের সামনে অনুগত হও।"

মুসলমানদের সম্মতি লাভের পর হযরত ইদরীস আ. এবং তাঁর অনুসারীগণ বাবেল থেকে হিজরত করলেন। এ ক্ষুদ্র দলটি যখন নীলনদের প্রবহমান এবং পার্শ্বস্থ অববাহিকার সবুজ সতেজ দৃশ্য দেখতে পেল, তখন প্রফুল্ল ও আনন্দিত হলো। হযরত ইদরীস আ. তাঁর অনুসারীদের বললেন, "বাবলিউন" অর্থাৎ এ বিশাল নদীটির উপকূলীয় ভূমি তোমাদের বাবেলের মতোই সবুজ শ্যামল।

অনন্তর তারা একটি উৎকৃষ্ট স্থান নির্বাচন করে নীলনদের পার্শ্বেই বসবাস করতে লাগল। হযরত ইদরীস আ.-এর 'বাবলিউন' শব্দটি বিরাট খ্যাতি লাভ করল। আরবরা ছাড়া প্রাচীনকালে সব জাতিই এ ভূখণ্ডটিকে 'বাবলিউন' বলে ডাকত। আরবরা বলত একে 'মিসর'। এ নামকরণের কারণ তাঁরা বলেছেন, হযরত নূহ আ.-এর তুফানের পর এ স্থানটুকু মেছের ইবনে হাম-এর বংশধরদের বাসস্থান হয়েছিল।

হযরত ইদরীস আ. ও তাঁর অনুসারীগণ মিসরে বসবাস শুরু করেন। এখানেও তিনি আল্লাহ তাআলার পয়গাম প্রচার, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ অব্যাহত রাখেন। কথিত আছে, তাঁর সময় ৭২ টি ভাষা প্রচলিত ছিল। তিনি আল্লাহ পাকের অনুগ্রহে সব ভাষাতেই অভিজ্ঞ ছিলেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের নিজ নিজ ভাষায় হেদায়েত ও ইমান-ইসলামের দাওয়াত প্রদান করতেন।

হযরত ইদরীস আ.-এর অন্যান্য শিক্ষা

হযরত ইদরীস আ.-ই সর্বপ্রথম বিজ্ঞান শাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যার প্রচলন করেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে আসমানসমূহ এবং এদের পাস্পরিক আকর্ষণের গুরুত্ব ও রহস্য শিক্ষা দিয়েছিলেন। এ ছাড়া তাঁকে গণিত শাস্ত্রে অভিজ্ঞ বানান। বস্তুত আল্লাহ তাআলার এ পয়গম্বর দ্বারা এ সকল শাস্ত্রের বিকাশ না হলে মানুষের স্বভাব-প্রকৃতির পক্ষে সে

পর্যন্ত পৌঁছনো দুষ্কর ছিল। তিনি বিভিন্ন দল ও সম্প্রদায়ের জন্য তাদের অবস্থানুযায়ী আইনকানুন ও রীতিনীতি নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন। ভূমণ্ডলকে চারভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেক ভাগে একজন করে গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। তারাই ছিল উক্ত ভূখণ্ডের শাসক ও যিম্মাদার। সেই সঙ্গে ওইসব ভূখণ্ডের জন্য এ সমস্ত আইন ও রীতিনীতির ওপর আল্লাহ প্রদত্ত অহির আইনকানুন ও রীতিনীতি অগ্রগণ্য থাকবে বলে চূড়ান্ত করে দেওয়া হয়েছিল।

হযরত ইদরীস আ.-এর শিক্ষাদানের বিষয়বস্তু

হযরত ইদরীস আ. তাঁর অনুসারীদের যে সকল বিষয়ে শিক্ষা দিতেন, সেগুলো হলো–

(১) আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব ও একত্বের ওপর ইমান আনয়ন করা।

(২) একমাত্র বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ পাকের ইবাদত করা।

(৩) পরকালের আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নেকআমল করা।

(৪) দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ও বিমুখতা।

(৫) যাবতীয় কাজে ইনসাফ ও ন্যায়ের মানদণ্ডকে সমুন্নত রাখা।

(৬) নির্ধারিত নিয়মে আল্লাহর ইবাদত করা।

(৭) আইয়্যামে বীয অর্থাৎ প্রত্যেক (চাঁদ) মাসের ১৪, ১৫, ১৬ তারিখে রোযা রাখা।

(৮) ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা।

(৯) যাকাত দেওয়া ও পাক-পবিত্র থাকা।

(১০) শুয়োর, কুকুর ও সকল প্রকার নেশাকর দ্রব্য হতে দূরে থাকা।

হযরত ইদরীস আ.-এর পার্থিব খেলাফত

হযরত ইদরীস আ.-কে যখন আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর খলিফা ও অধিপতি বানালেন, তখন তিনি আল্লাহর বান্দাগণকে ইলম ও আমলের প্রেক্ষিতে তিনভাগে বিভক্ত করে দিলেন। জ্যোতিষী, বাদশা ও প্রজা। পর্যায়ক্রমিকভাবে তাদের মর্যাদা নির্ধারণ করে দিলেন। জ্যোতিষীর মর্যাদা সবার ঊর্ধ্বে। কেননা তাকে আল্লাহ পাকের দরবারে নিজেকে ছাড়াও বাদশা ও প্রজাদের ব্যাপারেও জবাবদিহি করতে হবে। দ্বিতীয় মর্যাদাবান হলেন বাদশা। কেননা তাকে নিজেকে এবং রাজত্বসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের জবাবদিহি করতে হবে। তৃতীয় পর্যায়ে প্রজা। কেননা তাকে শুধু নিজের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে। কিন্তু এ পর্যায়ক্রমিক মর্যাদাভেদ কর্তব্যের ভিত্তিতে ছিল। বংশ ও খান্দানের পার্থক্যের ভিত্তিতে নয়। সারকথা, হযরত ইদরীস আ. আল্লাহর কাছে উত্থিত হওয়া পর্যন্ত শরিয়ত ও রাষ্ট্রনীতির এ সমস্ত কানুন প্রচার করতে থাকেন।

আল্লাহর নামে কোরবানি

হযরত ইদরীস আ. তাঁর অনুসারীদের জন্য আল্লাহ তাআলার আদেশে কয়েকটি ঈদ উৎসবের দিন নির্ধারণ করেন। কয়েকটি নির্দিষ্ট সময়ে আল্লাহর নামে কোরবানি করা ফরয করে দিয়েছিলেন। তন্মধ্যে একটি ঈদ নতুন চাঁদ দেখার পর উদযাপন করা হতো।

আল্লাহর নামে কোরবানি করার জন্য হযরত ইদরীস আ.-এর কাছে তিনটি বস্তু গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সেগুলো হলো– সুগন্ধি বস্তুর ধোঁয়া, জীব কোরবানি করা এবং শরাব।

দার্শনিকদের বিপরীতমুখী এই বর্ণনায় বিস্মিত হতে হয়। তারা একদিকে হযরত ইদরীস আ.-এর শরিয়তে শরাব হারাম বলে উক্তি করেন। অপরদিকে আল্লাহর দরবারে শরাব নিবেদন করাকে গ্রহণযোগ্য বলেন। এটা নিশ্চয়ই বিস্ময়কর! এ ছাড়াও ফল-ফুল থেকে মৌসুমের প্রথমটি আল্লাহর নামে নিবেদন করা একান্ত প্রয়োজনীয় মনে করা হতো। তবে ফলের মধ্যে আপেল, শস্যের মধ্যে গম এবং ফুলের মধ্যে গোলাপের অগ্রাধিকার ছিল।

পরবর্তী নবীগণ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী

হযরত ইদরীস আ. তাঁর উম্মতদের বলেছিলেন– মানবজাতির ধর্মীয় ও পার্থিব সংশোধনের জন্য আমার মতো বহু আম্বিয়ায়ে কেরাম আগমন করবেন। তাঁদের প্রকাশ্য বৈশিষ্ট্য হলো–

(১) তাঁরা মন্দকাজ হতে পবিত্র থাকবেন।

(২) অন্যান্য প্রশংসনীয় গুণাবলিতে পরিপূর্ণ হবেন।

(৩) যমিন ও আসমানের অবস্থাবলী এবং যে সমস্ত বিষয়ে বিশ্বের সকল সৃষ্টির জন্য কল্যাণ বা অকল্যাণ রয়েছে, সেসব সম্পর্কে অহির মাধ্যমে এমনভাবে ওয়াকিফহাল থাকবেন, কোনো প্রশ্নকারী অতৃপ্ত থাকবে না। তাঁদের দোয়া কবুল হবে। তাঁদের ধর্মপ্রচারের সারমর্ম হবে বিশ্ববাসীর সংশোধন।

হযরত ইদরীস আ.-এর কিছু নসিহত

হযরত ইদরীস আ.-এর বহু উপদেশ, নসিহত, চালচলন ও আখলাক সম্বন্ধীয় বাক্যাবলী বিভিন্ন ভাষায় প্রবাদ, রহস্য কথা ও সূক্ষ্মতত্ত্বরূপে প্রচলিত। তন্মধ্যে কয়েকটি বাণী হলো–

(১) আল্লাহর অফুরন্ত নেয়ামতসমূহের শোকর আদায় করা মানব ক্ষমতার বাইরে।

(২) যে ব্যক্তি জ্ঞানে পূর্ণতা ও নেকআমলের আকাঙ্ক্ষা করে, তার জন্য মূর্খতার কারণসমূহ এবং অসৎকাজের কাছেও যাওয়া উচিত নয়। তুমি কি দেখ না, প্রত্যেক দর্জি সেলাই করার ইচ্ছা করলে সুঁই হাতে নেয়; বর্শা হাতে নেয় না। অতএব সব সময় এ বাক্যটির প্রতি যেন লক্ষ থাকে– "আল্লাহকেও পেতে চাইবে আর সেই সঙ্গে দুনিয়ার মোহেও মত্ত থাকবে –এটা কল্পনা ও পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়।"

(৩) দুনিয়ার ধন-সম্পদের পরিণাম আক্ষেপ এবং মন্দকাজের পরিণাম অনুতাপ।

(৪) আল্লাহ পাকের যিকির এবং নেকআমলে খালেছ নিয়ত থাকা শর্ত।

(৫) মিথ্যা শপথ করবে না। আল্লাহ তাআলার পবিত্র নামকে কসমের অনুশীলনের জন্য ব্যবহার করবে না। মিথ্যাবাদীদের কসম খাওয়ার প্রতি প্রণোদিত করবে না। কেননা এরূপ করলে তুমিও তার পাপের অংশীদার হয়ে যাবে।

(৬) হীন পেশা অবলম্বন করবে না। যেমন- শিঙ্গা লাগানো, গরু-ছাগল ইত্যাদির পাল দেখিয়ে বিনিময় গ্রহণ করা ইত্যাদি।

(৭) শরিয়তের বিধান জারি করার জন্য পয়গম্বর কর্তৃক নিয়োজিত বাদশাকে মান্য করবে। নিজের মুরব্বি ও বড়দের সম্মুখে অবনত থাকবে। সব সময় আল্লাহর প্রশংসা দ্বারা জিহবাকে সজীব রাখবে।

(৮) জ্ঞান আত্মার জীবন।

(৯) অন্যের স্বচ্ছল জীবিকার প্রতি হিংসা পোষণ করবে না। কেননা এ আনন্দময় জীবন-যাপন ক্ষণস্থায়ী।

(১০) যে জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনের অধিক বাসনা করে, সে কখনো তৃপ্ত হয় না।

বিবিধ প্রসঙ্গ

✪ সহি ইবনে হিব্বানে বর্ণিত আছে : হযরত ইদরীস আ. সর্বপ্রথম কলম ব্যবহার করেন।

✪ তারিখুল হুকামায় বর্ণিত আছে। একদল আলেম বলেন : দর্শনশাস্ত্রের পুস্তকগুলিতে যে সমস্ত জ্ঞানগর্ভ আলোচনা এবং নক্ষত্রসমূহের গতিবিধির বিবরণ দেখা যায়, তা সর্বপ্রথম হযরত ইদরীস আ.-এর যবান থেকে বের হয়েছে।

✪ আল্লাহ তাআলার ইবাদতের জন্য ইবাদতখানা নির্মাণ, চিকিৎসা শাস্ত্রের আবিষ্কার, যমিন ও আসমানের যাবতীয় বস্তু সম্বন্ধে যথোপযুক্ত কবিতার মাধ্যমে মতামত প্রকাশ সর্বপ্রথম তাঁরই অবদান।

✪ তিনিই সর্বপ্রথম তুফানের সংবাদ প্রদান করে আল্লাহর বান্দাদের ভয় প্রদর্শন করেছিলেন। বলেছিলেন, "আমাকে দেখানো হয়েছে একটি আসমানি বিপদ; যা যমিনকে পানি ও আগুনের মধ্যে জড়িয়ে ধরছে।"

এ ঘটনা দেখে তিনি সমস্ত ইলমের বিনাশ, সমস্ত শিল্প ও পোশাক ধ্বংস হওয়া সম্বন্ধে শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। সুতরাং তিনি মিসরে চৌবাচ্চা এবং চারদিক থেকে বন্ধ গুহাসমূহ নির্মাণ করে এতে সকল শিল্প এবং এ সম্পর্কিত নতুন আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতিসমূহের চিত্র আঁকলেন। আর সমস্ত ইলম ও শাস্ত্রের তথ্যাবলী ও বিবরণ অঙ্কন করলেন। যাতে এ সমস্ত শিল্প ও বিদ্যা চিরকালের জন্য স্থায়ী থাকে। এবং এগুলো হারিয়ে না যায়।

হযরত নূহ আ.

বংশ পরিচয় ও জন্মকাল

ইতিহাসবিদগণ হযরত নূহ আ.-এর বংশ ও নসবনামা বলেছেন– নূহ ইবনে লা-মাক ইবনে মুতাওশালেহ ইবনে আখনুখ ইবনে ইয়ারুদ ইবনে মাহলাইল ইবনে কিনান ইবনে আনুশ ইবনে শীষ আ. ইবনে আদম আ.। যদিও ঐতিহাসিকগণ এবং তাওরাত এটা শুদ্ধ মেনে নিয়েছে; কিন্তু এর বিশুদ্ধতা নিয়ে বেশ সন্দেহ রয়েছে। ইবনে জারির অন্যদের মতে হযরত নূহ আ.-এর জন্ম হয় হযরত আদম আ.-এর ওফাতের এক ছাব্বিশ বছর পর।

আহলে কিতাবদের মতে হযরত আদম আ.-এর ওফাতের পর থেকে হযরত নূহ আ.-এর জন্মের মধ্যবর্তী সময়ের দূরত্ব একশ ছিচল্লিশ বছর। ইবনে হিব্বান রহ.-এর বর্ণনা মতে হযরত আদম আ.-এর ওফাত ও হযরত নূহ আ.-এর জন্মের মধ্যবর্তী দশ যুগের ব্যবধান ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, হযরত আদম আ. ও হযরত নূহ আ.-এর মাঝখানে ব্যবধান ছিল দশ যুগের। (বোখরি)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যুগসমূহের মধ্যে আমার যুগই সর্বোত্তম যুগ।"

হাদিসে বর্ণিত এ যুগ দ্বারা যদি মানবগোষ্ঠীকে বুঝানো হয়ে থাকে, তা হলে দশ যুগ হবে দশ প্রজন্ম আর দশ প্রজন্ম হবে কয়েক হাজার বছর। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

হযরত নূহ আ.-এর আবির্ভাবের সময়কাল

হযরত শীষ ও ইদরীস আ.-এর পরে পৃথিবীতে যখন মূর্তি ও শয়তানের পূঁজা শুরু হয়ে গেল, মানুষ যখন বিভ্রান্তির চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেল, তখন আল্লাহ তাআলা মেহেরবানি করে মানুষের হেদায়েতের জন্য হযরত নূহ আ. কে 'রাসূল' হিসেবে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। বিশ্ববাসীর কাছে তিনিই সর্বপ্রথম রাসূল।

হযরত নূহ আ. যখন নবুয়তের দায়িত্ব লাভ করেন, তখন তাঁর বয়স কত ছিল, এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, পঞ্চাশ বছর। কেউ বলেন, তিন শ পঞ্চাশ বছর। আবার কারো মতে চার শ আশি বছর। তৃতীয় অভিমতটি ইবনে জারির রহ. ও হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এর।

পবিত্র কোরআনে হযরত নূহ আ.

পবিত্র কোরআনুল কারিমে হযরত নূহ আ.-এর ঘটনা সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিতভাবে মোট ৪৩ জায়গায় এসেছে। কিন্তু ঘটনার বিস্তারিত গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ শুধু সূরা আরাফ, সূরা হূদ, সূরা মুমিনূন, সূরা শুআরা, সূরা কামার ও সূরা নূহের মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। আর তা-ই আমাদের মূল আলোচ্য বিষয়।

সূরা আরাফে আল্লাহ তাআলা বলেন–

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (٥٩) قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٦٠) قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٦١) أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٦٢) أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٦٣) فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ

"আমি তো নূহকে পাঠিয়েছিলাম তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে এবং সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই। আমি তোমাদের জন্য মহা দিনের শাস্তির আশঙ্কা করছি।"

তাঁর সম্প্রদায়ের প্রধানরা বলল, আমরা তো তোমাকে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখছি। তিনি বলেন, হে সম্প্রদায়! আমাতে কোনো ভ্রান্তি নেই। আমি তো জগতসমূহের প্রতিপালকের রাসূল। আমার প্রতিপালকের বাণী আমি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি এবং তোমাদের সৎ উপদেশ দিচ্ছি। আর তোমরা যা জানো না, আমি তা আল্লাহর কাছ থেকে জানি। তোমরা কি বিস্মিত হচ্ছ, তোমাদেরই একজনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমাদের কাছে উপদেশ এসেছে, যাতে সে তোমাদের সতর্ক করে। তোমরা সাবধান হও এবং তোমরা অনুকম্পা লাভ কর। এরপর তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলে। তাকে ও তাঁর সঙ্গে যারা নৌকায় ছিল, আমি তাদের উদ্ধার করি এবং যারা আমার নির্দেশ প্রত্যাখান করেছিল তাদেরকে নিমজ্জিত করি। তারা ছিল এক অন্ধ সম্প্রদায়।" (সূরা আরাফ : ৫৯-৬৪)

সূরা হুদে আল্লাহ তাআলা বলেন– "আমি তো নূহকে তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, আমি তোমাদের জন্য প্রকাশ্য সতর্ককারী, যাতে তোমরা আল্লাহ ছাড়া অপর কিছুর ইবাদত না কর। আমি তোমাদের জন্য এক ভয়ঙ্কর দিবসের শাস্তির আশঙ্কা করি। তাঁর সম্প্রদায় প্রধানরা –যারা ছিল কাফের, তারা বলল– আমরা তোমাকে তো আমাদের মতোই মানুষ দেখছি। আমরা তো দেখছি, অনুধাবন না করে তোমার অনুসরণ করছে তারাই, যারা আমাদের মধ্যে অধম (নীচ) এবং আমরা আমাদের ওপর তোমাদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব দেখছি না; বরং আমরা তোমাদের মিথ্যাবাদী মনে করি।

তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে বল, আমি যদি আমার প্রতিপালক প্রেরিত স্পষ্ট নিদর্শনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তাঁর

নিজ অনুগ্রহ দান করে থাকেন, অথচ এ বিষয়ে তোমরা জ্ঞান শূন্য হও, আমি কি এ বিষয়ে তোমাদের বাধ্য করতে পারি, যখন তোমরা এটা অপছন্দ কর?

হে আমার সম্প্রদায়! এর পরিবর্তে আমি তোমাদের কাছে ধন-সম্পদ চাই না; আমার পারিশ্রমিক তো আল্লাহরই কাছে। মুমিনদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া আমার কাজ নয়। তারা নিশ্চিতভাবে তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ লাভ করবে। কিন্তু আমি দেখছি তোমরা এক অজ্ঞ সম্প্রদায়!

হে আমার সম্প্রদায়! আমি যদি তাদের তাড়িয়ে দিই, তবে আল্লাহর শাস্তি থেকে আমাকে কে রক্ষা করবে? তবুও কি তোমরা চিন্তা কর না? আমি তোমাদের বলি না আমার কাছে আল্লাহর ধনভাণ্ডার আছে আর না অদৃশ্য সম্বন্ধে আমি অবগত এবং আমি এটাও বলি না, আমি ফেরেশতা। তোমাদের দৃষ্টিতে যারা হেয় তাদের সম্বন্ধে আমি বলি না, আল্লাহ তাদের কখনোই কল্যাণ দান করবেন না। তাদের অন্তরে যা আছে, তা আল্লাহ ভালোভাবেই অবগত। তা হলে আমি অবশ্যই যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবো।

তারা বলল, হে নূহ! তুমি আমাদের সঙ্গে বিতণ্ডা করছ; তুমি বিতণ্ডা করছ আমাদের সঙ্গে অতিমাত্রায়। সুতরাং তুমি সত্যবাদী হলে আমাদেরকে যার ভয় দেখাচ্ছ তা আনয়ন কর। তিনি বললেন, ইচ্ছা করলে আল্লাহই তা তোমাদের কাছে উপস্থিত করবেন এবং তোমরা তাকে ব্যর্থ করতে পারবে না। আমি তোমাদের উপদেশ দিতে চাইলেও আমার উপদেশ তোমাদের উপকারে আসবে না, যদি আল্লাহ তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে চান। তিনিই তোমাদের প্রতিপালক এবং তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে। তারা কি বলে, সে এটা রচনা করেছে? বলুন! আমি যদি এটা রচনা করে থাকি, তবে আমিই আমার অপরাধের জন্য দায়ী হব। তোমরা যে অপরাধ করছ, তার জন্য আমরা দায়ী নই।

নূহের প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছিল, যারা ইমান এনেছে তারা ছাড়া কোনো সম্প্রদায়ের অন্য কেউ কখনো ইমান আনবে না। সুতরাং তারা যা করে, তার জন্যে আপনি রাগ করবেন না। আপনি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার প্রত্যাদেশ অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ করুন এবং যারা সীমালঙ্ঘন করেছে, তাদের সম্পর্কে আপনি আমাকে কিছু বলবেন না; তারা তো নিমজ্জিত হবে।

তিনি নৌকা নির্মাণ করতে লাগলেন এবং যখনই তাঁর সম্প্রদায়ের প্রধানরা তাঁর কাছ দিয়ে যেত, তাঁকে উপহাস করত। তিনি বলতেন : তোমরা যদি আমাকে উপহাস কর, তবে আমরাও তোমাদের উপহাস করব; যেমন তোমরা উপহাস করছ এবং তোমরা অচিরেই জানতে পারবে, কার ওপর আসবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আর কার ওপর আপতিত হবে স্থায়ী শাস্তি।

অবশেষে যখন আমার আদেশ আসল এবং উনুন (চুলা) উথলে উঠল, আমি বললাম; এতে উঠিয়ে নাও প্রত্যেক শ্রেণীর যুগল, যাদের বিরুদ্ধে পূর্বে সিদ্ধান্ত হয়েছে

তারা ছাড়া তোমার পরিবার-পরিজনকে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে। তাঁর সঙ্গে ঈমান এনেছিল অল্প কয়েকজন। তিনি বললেন, এতে আরোহণ কর! আল্লাহর নামে এর গতি ও স্থিতি। আমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। পর্বত-প্রমাণ তরঙ্গের মধ্যে তা তাদের নিয়ে বয়ে চলল।

নূহ আ. তাঁর পুত্র, যে তাদের থেকে পৃথক ছিল, তাকে আহ্বান করে বললেন– হে আমার পুত্র! আমাদের সঙ্গে আরোহণ কর এবং কাফেরদের সাথী হয়ো না। সে বলল, 'আমি এমন এক পর্বতে আশ্রয় নেব, যা আমাকে প্লাবন হতে রক্ষা করবে। তিনি (নূহ আ.) বললেন, আজ আল্লাহর বিধান থেকে রক্ষা করার কেউ নেই, যাকে আল্লাহ দয়া করবেন সে ছাড়া! এরপর তরঙ্গ তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিল এবং সে নিমজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত হল। এরপর বলা হল, হে পৃথিবী! তুমি তোমার পানি গ্রাস করে লও; হে আকাশ! ক্ষান্ত হও। এরপর বন্যা প্রশমিত হল এবং কার্য সমাপ্ত হল।

নৌকা জুদী পাহাড়ের ওপর স্থির হল এবং বলা হল, যালিম সম্প্রদায় ধ্বংস হোক! নূহ তাঁর প্রতিপালককে সম্বোধন করে বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার পুত্র আমার পরিবারর্ভুক্ত এবং আপনার প্রতিশ্রুতি সত্য এবং আপনি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক। তিনি বললেন, হে নূহ! সে তোমার পরিবারভূক্ত নয়। সে অসৎ কর্মপরায়ণ। সুতরাং যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে আমাকে অনুরোধ করো না। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, তুমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক! যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে যাতে আপনাকে অনুরোধ না করি– এ জন্য আমি আপনার আশ্রয় নিচ্ছি। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন এবং আমাকে দয়া না করেন, তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।

বলা হল, হে নূহ! আমার দেওয়া শান্তিসহ অবতরণ কর। এবং তোমার প্রতি ও যে সকল সম্প্রদায় তোমার সঙ্গে আছে তাদের প্রতি কল্যাণসহ। অপর সম্প্রদায়সমূহকে জীবন উপভোগ করতে দেব, পরে আমার পক্ষ হতে কঠিন শাস্তি তাদের স্পর্শ করবে। এ সকল অদৃশ্যলোকের সংবাদ আমি আপনাকে অহির দ্বারা জানিয়েছি। যা এর আগে আপনি জানতেন না এবং আপনার সম্প্রদায়ও জানত না। সুতরাং ধৈর্য ধারণ করুন, শুভ পরিণাম মুত্তাকিদের জন্য।" (সূরা হূদ : ২৫-৪৯)

সূরা মুমিনুনে আল্লাহ তাআলা বলেন– "আমি নূহকে পাঠিয়েছিলাম তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে। তিনি বলেছিলেন, হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই। তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না? তাঁর সম্প্রদায়ের প্রধানরা, যারা কুফরি করেছিল তারা বলল– এ তো তোমাদের মতো একজন মানুষই। সে তোমাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে চাচ্ছে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে ফেরেশতা পাঠাতেন। আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদের সময়ে এরূপ ঘটেছে বলে শুনি নি। এ তো এমন এক লোক, যাকে পাগলামী পেয়ে বসেছে। সুতরাং এর সম্পর্কে

কিছুকাল অপেক্ষা কর। নূহ আ. বলেছিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহ করুন! কারণ, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে। এরপর আমি তাঁর কাছে পাঠালাম, তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার অহি অনুযায়ী নৌযান নির্মাণ কর। এবং যখন আমার আদেশ আসবে ও উনুন (চুলা) উথলে উঠবে, তখন তাতে (নৌযানে) উঠিয়ে নিও প্রত্যেক জীবের এক এক জোড়া এবং তোমার পরিবার-পরিজনকে। তাদের মধ্যে যাদের বিরুদ্ধে আগে সিদ্ধান্ত হয়েছে, তাদের সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু বলো না। তারা তো নিমজ্জিত হবে। যখন তুমি ও তোমার সাথীরা নৌযানে আসন গ্রহণ করবে তখন বলবে- সকল প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি আমাদের উদ্ধার করেছেন যালিম সম্প্রদায় থেকে। আরো বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমনভাবে অবতরণ করান যা হবে কল্যাণকর। আর আপনিই শ্রেষ্ঠ অবতরণকারী। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। আমি তো তাদের পরীক্ষা করেছিলাম।" (সূরা মুমিনুন : ২৩-৩০)

সূরা শুআরায় আল্লাহ তাআলা বলেন-

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ (١٠٥) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ (١٠٦) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٠٧) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٠٨) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٠٩) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١١٠) قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ (١١١) قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١١٢) إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ (١١٣) وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ (١١٤) إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ (١١٥) قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ (١١٦) قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ () فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (١١٨) فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (١١٩) ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ (١٢٠) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (١٢١) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

"নূহের সম্প্রদায় রাসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল। যখন তাদের ভাই নূহ তাদের বললেন, তোমরা কি সাবধান হবে না? আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। অতএব আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোনো প্রতিদান চাই না। আমার পুরস্কার তো জগতসমূহের প্রতিপালকের কাছেই আছে। সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। তারা বলল, আমরা কি তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব, অথচ ইতরজনেরা তোমার অনুসরণ করছে? নূহ বললেন : তারা কি করত, তা আমার জানা নেই। তাদের হিসাব গ্রহণ তো আমার প্রতিপালকের কাজ; যদি তোমরা বুঝতে! মুমিনগণকে তাড়িয়ে দেওয়া আমার কাজ নয়। আমি তো কেবল একজন স্পষ্ট সতর্ককারী। তারা বলল, হে নূহ! তুমি যদি

নিবৃত্ত না হও তবে তুমি অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে নিহতদের শামিল হবে। নূহ বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায়তো আমাকে অস্বীকার করছে। সুতরাং আমার ও তাদের মধ্যে স্পষ্ট মীমাংসা করে দাও এবং আমাকে ও আমার সঙ্গে যে সব মুমিন আছে, তাদেরকে রক্ষা কর। অতএব আমি তাঁকে ও তাঁর সঙ্গে যারা ছিল, তাদের রক্ষা করলাম বোঝাইকৃত নৌযানে। আর বাকিদের ডুবিয়ে দিলাম। এতে অবশ্যই রয়েছে নিদর্শন। কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়; আর আপনার প্রতিপালক; তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।" (সূরা শুআরা : ১০৫-১২২)

সূরা কামারে আল্লাহ তাআলা বলেন–

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ (٩) فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ (١٠) فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ (١١) وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ (١٢) وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ (١٣) تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ (١٤) وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (١٥) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (١٦) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (١٧) كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ "

এদের আগে নূহের সম্প্রদায়ও মিথ্যা আরোপ করেছিল। মিথ্যা আরোপ করেছিল আমার বান্দার প্রতি এবং বলেছিল, 'এ তো এক পাগল!' আর তাকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল, তখন সে তাঁর প্রতিপালককে আহ্বান করে বলেছিল– 'আমি তো অসহায়। অতএব তুমি প্রতিবিধান কর!' ফলে আমি উন্মুক্ত করে দিলাম আকাশের দ্বার, প্রবল বারিবর্ষণে এবং মাটি থেকে উৎসারিত করলাম ঝরনা। সকল পানি মিলিত হলো এক পরিকল্পনা অনুসারে। তখন নূহকে আরোহণ করালাম কাঠ ও পেরেক নির্মিত এক নৌযানে, যা চলত আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। এটা পুরস্কার তার জন্য যে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। আমি একে রেখে দিয়েছি এক নিদর্শনরূপে। অতএব উপদেশ গ্রহণকারীরা কেউ আছে কি? কী কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী! কোরআন আমি সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, কে আছে উপদেশ গ্রহণকারী? (সূরা কামার : ৯-১৭)

সূরা নূহে হযরত নূহ আ.-এর আলোচনা বিস্তারিত এসেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন– "নূহকে আমি প্রেরণ করেছিলাম তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতি এ নির্দেশসহ– তুমি তোমার সম্প্রদায়কে সতর্ক কর তাদের প্রতি শাস্তি আসার আগে। সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী এ বিষয়ে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং তিনি তোমাদের অবকাশ দেবেন এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত। নিশ্চয় আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত কাল উপস্থিত হলে, তা বিলম্বিত হয় না; যদি তোমরা তা জানতে! তিনি বলেছিলেন; হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার সম্প্রদায়কে দিবা-

রাত্রি আহ্বান করেছি। কিন্তু আমার আহ্বানে তাদের পলায়ন প্রবণতাই বৃদ্ধি করেছে। আমি যখনই তাদেরকে আহ্বান করি, যাতে তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর, তারা কা আঙ্গুলি দেয়, বস্ত্রাবৃত করে নিজেদেরকে ও জিদ করতে থাকে এবং অতিশয় ঔদ্ধ প্রকাশ করে।

এরপর আমি তাদেরকে আহ্বান করেছি প্রকাশ্যে, পরে আমি উচ্চস্বরে প্রচার করে ও উপদেশ দিয়েছি গোপনে। বলেছি, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষ প্রার্থনা কর, তিনিই তো মহা ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন তিনি তোমাদের সমৃদ্ধ করবেন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতিতে এবং তোমাদের জ স্থাপন করবেন উদ্যান ও প্রবাহিত করবেন নদী-নালা। তোমাদের কি হয়েছে, তোমা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে চাচ্ছ না? অথচ তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছে পর্যায়ক্রমে, তোমরা লক্ষ কর নি? আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টি করেছেন সপ্ত স্তরে বিন্য আকাশমণ্ডলী? এবং সেখানে চাঁদকে স্থাপন করেছেন আলোকরূপে ও সূর্যকে স্থাপ করেছেন প্রদীপরূপে। তিনি তোমাদেরকে উদ্ভুত করেছেন মাটি থেকে। এরপর তাতে তিনি তোমাদেরকে প্রত্যাবৃত্ত করবেন ও পরে পুনরুত্থিত করবেন এবং আল্লা তোমাদের জন্য ভূমিকে করেছেন বিস্তৃত, যাতে তোমরা চলাফেরা করতে পার প্রশ পথে। নূহ বলেছিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো আমাকে অমান্য করেছে এবং অনুসরণ করেছে এমন লোকের, যার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি তা ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করে নি।

তারা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করেছিল এবং বলেছিল, তোমরা কখনো পরিত্যাগ করো না তোমাদের দেব-দেবীকে; পরিত্যাগ করো না ওয়াদ, সূওয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নাসরকে। তারা অনেককে বিভ্রান্ত করেছে। সুতরাং জালিমদের বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করে না। তাদের অপরাধের জন্য তাদের নিমজ্জিত করা হয়েছিল এবং পরে তাদের দাখিল করা হয়েছিল অগ্নিতে। এরপর তারা কাউকেই আল্লাহর মুকাবিলায় পায় নি সাহায্যকারীরূপে।

নূহ আরও বলেছিলেন, হে আমার প্রতিপালক! পৃথিবীতে কাফিরদের মধ্য হতে কোনো গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিও না। তুমি তাদের অব্যাহতি দিলে, তারা তোমার বান্দাদের বিভ্রান্ত করবে এবং জন্ম দিতে থাকবে কেবল দুষ্কৃতিকারী ও কাফির। হে আমার প্রতিপালক! তুমি ক্ষমা কর আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং যারা মুমিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করে তাদেরকে এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের। আর জালিমদের শুধু ধ্বংসই বৃদ্ধি কর। (সূরা নূহ : ১-২৮)

কোরআন মাজিদের আরো কিছু সূরায় আল্লাহ তাআলা হযরত নূহ আ.-এর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। যেমন সূরা ইউসুফ : ৭১-৭৩, সূরা আম্বিয়া : ৭৬-৭৭, সূরা আনকাবুত : ১৪-১৫, সূরা সাফফাত : ৭৫-৮২ নং আয়াতসমূহ। তদ্রুপ কোরআন মাজিদের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ তাআলা হযরত নূহ আ.-এর প্রশংসা এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণকারীদের নিন্দা করা হয়েছে। যেমন : সূরা নিসায় আল্লাহ তাআলা বলেন–

اأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا (١٦٣) وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا (١٦٤) رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

"হে নবী! আপনার কাছে অহি প্রেরণ করেছি, যেমন নূহ ও তাঁর পরবর্তী নবীগণের কাছে প্রেরণ করেছিলাম। ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর বংশধরগণ, ঈসা, আইয়ূব, ইউনুস, হারুন এবং সুলাইমানের কাছে অহি প্রেরণ করেছিলাম। অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি, যাদের কথা পূর্বে আপনাকে বলেছি এবং অনেক রাসূল, যাদের কথা আপনাকে বলি নি। এবং মূসার সাথে আল্লাহ সাক্ষাৎ-বাক্যালাপ করেছিলেন। সুসংবাদবাহী ও সাবধানকারীরূপে রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি। যাতে রাসূল আসার পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোনো অভিযোগ না থাকে এবং আল্লাহ প্রবাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।" (সূরা নিসা : ১৬৩-১৬৪)

সূরা আনআমে আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (٨٣) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (٨٤) وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ (٨٥) وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ (٨٦) وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

"এটা আমার যুক্তি প্রমাণ, যা ইবরাহীমকে দিয়েছিলাম তার সম্প্রদায়ের মোকাবিলায়। যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় আমি উন্নীত করি। আপনার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানী। এবং তাকে দান করেছিলাম ইসহাক ও ইয়াকুব এবং তাদের প্রত্যেককে সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম। পূর্বে নূহকেও সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম এবং তাঁর বংশধর দাউদ, সুলাইমান, আইয়ূব, ইউসুফ, মূসা এবং হারূনকেও। আর এভাবেই সৎকর্ম পরায়ণদের পুরস্কৃত করি। এবং যাকারিয়া, ঈসা এবং ইলিয়াসকেও সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম। তারা সকলে পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত। আরও সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম ইসমাইল, আল ইয়াসাআ, ইউনুস ও লুতকে এবং শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম বিশ্বজগতের উপর প্রত্যেককে এবং তাদের কিছুসংখ্যক পিতৃপুরুষ, বংশধর এবং ভ্রাতৃবৃন্দকে। তাদেরকে মনোনীত করেছিলাম এবং সরল পথে পরিচালিত করেছিলাম।"

(সূরা আনআম : ৮৩-৮৭)

সূরা তওবায় আল্লাহ্ তাআলা বলেন–

أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

"তাদের পূর্ববর্তী নূহ, আদ ও ছামুদের সম্প্রদায়, ইবরাহীমের সম্প্রদায় এবং মাদায়েন ও বিধ্বস্ত নগরের অধিবাসীদের সংবাদ কি তাদের কাছে আসে নি? তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের রাসূলগণ এসেছিলেন। আল্লাহ্ এমন নন, তাদের উপর জুলুম করেন। কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করে।" (সূরা তাওবা : ৭০)

সূরা ইবরাহীমে আল্লাহ্ তাআলা বলেন–

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ

"তোমাদের কাছে কি সংবাদ আসে নি তোমাদের পূর্ববর্তীদের; (অর্থাৎ) নূহের সম্প্রদায়ের, আদ ও ছামুদের?"

সূরা বনি ইসরাইলে আল্লাহ্ তাআলা বলেন–

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا

"হে তাদের বংশধর! যাদের আমি নূহের সাথে আরোহণ করিয়েছিলাম; সে তো ছিল পরম কৃতজ্ঞ বান্দা।" (সূরা বনী ইসরাঈল : ৩)

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا

"নূহের পর আমি কত মানবগোষ্ঠী ধ্বংস করেছি! তোমার প্রতিপালকই তাঁর বান্দাদের পাপাচারের সংবাদ রাখা ও পর্যবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট।"

(সূরা বনি ইসরাইল : ১৭)

সূরা আম্বিয়া, সূরা মুমিনূন, সূরা শুরা ও সূরা আনকাবূতে তাঁর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। সূরা আহযাবে আল্লাহ্ তাআলা বলেন–

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

"হে নবী! স্মরণ করুন, যখন আমি নবীদের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম এবং আপনার কাছ থেকেও এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা, মরিয়ম-তনয় ঈসার কাছ থেকে। তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলাম দৃঢ় অঙ্গীকার।" (সূরা আহযাব : ৭)

সূরা সোয়াদে আল্লাহ্ তাআলা বলেন–

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ (١٢) وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ (١٣) إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ

"এদের পূর্বেও রাসূলদের মিথ্যাবাদী বলেছিল নূহের সম্প্রদায়, আদ ও বহুঅট্টালিকার অধিপতি ফেরাউন। ছামূদ, লূত সম্প্রদায় ও আয়কার অধিবাসী। তারা ছিল এক একটি বিশাল বাহিনী। তাদের প্রত্যেকেই রাসূলগণকে মিথ্যা বলেছে। ফলে তাদের ক্ষেত্রে আমার শাস্তি হয়েছে বাস্তব। (সূরা সোয়াদ : ১২-১৪)

সূরা মুমিনে আল্লাহ তাআলা বলেন–

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ (٥) وَكَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ

"এদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায় এবং তাদের পরে অন্যান্য দলও মিথ্যা আরোপ করেছিল। প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ রাসূলকে আবদ্ধ করার অভিসন্ধি করেছিল এবং তারা অসার তর্কে লিপ্ত হয়েছিল সত্যকে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য। ফলে আমি তাদের পাকড়াও করলাম এবং কত কঠোর ছিল আমার শাস্তি! এভাবে কাফেরদের ক্ষেত্রে সত্য হলো আপনার প্রতিপালকের বাণী এরা জাহান্নামী।" (সূরা মুমিন : ৫-৬)

সূরা শুরায় আল্লাহ তাআলা বলেন–

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

"তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দীন, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে আর যা আমি অহি করেছি আপনাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই বলে, তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠা কর এবং তাতে মতভেদ করো না। আপনি মুশরিকদের যার প্রতি আহ্বান করছেন, তা তাদের কাছে দুর্বল মনে হয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা দীনের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং যে তাঁর অভিমুখী তাকে দীনের দিকে পরিচালিত করেন।" (সূরা শুরা : ১৩)

সূরা ক্বাফে আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ (١٣) وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ

"তাদের পূর্বেও সত্য প্রত্যাখান করেছিল নূহের সম্প্রদায়, রাস ও ছামূদ সম্প্রদায় আদ, ফেরাউন ও লূত সম্প্রদায় এবং আইকার অধিবাসী ও তুব্বা সম্প্রদায়। তাঁরা সকলেই রাসূলকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। ফলে তাদের ওপর আমার শাস্তি আপতিত হয়েছে।" (সূরা কাফ : ১২-১৪)

সূরা যারিয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ

"আমি ধ্বংস করেছিলাম এদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কে। তারা ছিল সত্য ত্যাগী সম্প্রদায়।" (সূরা যারিয়াত : ৪৬)

সূরা নাজমে আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى

"আর এদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কেও (ধ্বংস করেছিলাম)। তারা ছিল অতিশয় জালিম অবাধ্য।" (সূরা নাজ্‌ম : ৫২)

সূরা হাদিদে আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ

"আমি নূহ এবং ইবরাহীমকে রাসূলরূপে প্রেরণ করেছিলাম এবং আমি তাদের বংশধরগণের জন্য স্থির করেছিলাম নবুয়ত ও কিতাব; কিন্তু তাদের অল্পই সৎপথ অবলম্বন করেছিল এবং অধিকাংশই ছিল সত্যত্যাগী।" (সূরা হাদীদ : ২৬)

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ

"আল্লাহ কাফেরদের জন্য নূহ ও লূতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। তারা ছিল আমার বান্দাদের মধ্যে দুই সৎকর্মপরায়ণ বান্দার অধীন। কিন্তু তারা তাদের প্রতি বিশ্বাস ঘাতকতা করেছিল। ফলে নূহ ও লূত তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারে নি এবং তাদের বলা হলো, জাহান্নামে প্রবেশকারীদের সাথে তোমরাও তাতে প্রবেশ কর।"(সূরা তাহরীম : ১০)

হাদিস শরিফে হযরত নূহ আ.

সহি বোখারি ও মুসলিম শরিফে আছে, উম্মে সালমা ও উম্মে হাবিবা রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে তাদের হাবশায় দেখে আসা 'মারিয়া' নামক গির্জা এবং তার সৌন্দর্য ও তাতে স্থাপন করে রাখা প্রতিকৃতির কথা উল্লেখ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তাদের নিয়ম ছিল তাদের মধ্যে সৎকর্মপরায়ণ কেউ মারা গেলে তার কবরের উপর তারা একটি উপাসনালয় নির্মাণ করত। তারপর তাতে তার প্রতিকৃতি স্থাপন করে রাখত। আল্লাহর কাছে তারা ছিল সৃষ্টির সবচেয়ে নিকৃষ্ট জাতি।

অবক্ষয় যখন পৃথিবীতে ছড়িয়ে ...
ঘটে, তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দা ও র...
লা-শরীক আল্লাহর প্রতি আহ্বান জানান এবং আল্ল... ...পূজার ব্যাপক প্রসার
নিষেধ করেন। ...রেন। তিনি এক

ইমাম বোখারি রহ. বর্ণনা করেন। হযরত আবু সাঈদ খুদার্যসনা করতে
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (কেয়ামতের দিন) নূহ আ.
উম্মত উপস্থিত হবেন। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি কি দীনের বা...
পৌঁছিয়েছিলে? নূহ আ. বলবেন : জী হাঁ, হে আমার রব! তারপর আল্লাহ তাআলা তাঁর উম্মতকে জিজ্ঞাসা করবেন, নূহ কি তোমাদের কাছে দীনের দাওয়াত পৌঁছিয়েছিল? তারা বলবে, না। আমাদের কাছে কোনো নবী আসেন নি। তখন আল্লাহ তাআলা নূহ আ. কে বলবেন, তোমার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে কে? তিনি বলবেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর উম্মত। তখন উম্মতে মুহাম্মদী সাক্ষ্য দিয়ে বলবে, 'নূহ আ. তাঁর তাবলীগের দায়িত্ব পালন করেছেন।

ইমাম বোখারি রহ. আরো বর্ণনা করেন, ইবনে উমর রাযি. বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন জনসাধারণের মধ্যে দাঁড়িয়ে আল্লাহ তাআলার শানে উপযুক্ত প্রশংসা বর্ণনা করেন। তারপর দাজ্জালের কথা উল্লেখ করে বললেন, "তোমাদেরকে আমি তার ব্যাপারে সাবধান করছি। এমন কোনো নবী নেই, যিনি আপন সম্প্রদায়কে তার ব্যাপারে সাবধান করেন নি। নূহ আ.ও আপন সম্প্রদায়কে তার ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছিলেন। তবে তার ব্যাপারে তোমাদেরকে আমি এমন একটি কথা বলে দিই, যা কোনো নবী তাঁর সম্প্রদায়কে বলেন নি। তোমরা জেনে রেখ, সে এক-চক্ষু বিশিষ্ট। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এক চক্ষুবিশিষ্ট নন।"

ইমাম আবু হাতেম হযরত আসলাম রহ.-এর সূত্রে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : নূহ আ. নৌযানে প্রতি জীবের এক জোড়া তুলে নিলে তাঁর সঙ্গীরা বলল, সিংহের সাথে আমরা কিংবা বলল, গৃহপালিত প্রাণীরা কীভাবে নিরাপদ বোধ করবে? তখন আল্লাহ তাআলা সিংহকে জ্বরাক্রান্ত করে দেন। পৃথিবীতে এটাই ছিল সর্বপ্রথম জ্বরের আবির্ভাব। তারপর তাঁরা ইঁদুরের ব্যাপারে অনুযোগ করে বললেন, "পাজিগুলো তো আমাদের খাদ্যদ্রব্য ও জিনিসপত্র সব নষ্ট করে ফেলল! তখন আল্লাহ তাআলার নির্দেশে সিংহ হাঁচি দেয়। এতে বিড়াল বের হয়ে আসে। বিড়াল দেখে ইঁদুররা সব আত্মগোপন করে।"

ইমাম আবু জাফর ইবনে জারির ও আবু মুহাম্মদ ইবনে আবু হাতিম আপন তাফসিরে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাযি.-এর বরাতে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "নূহের সম্প্রদায়ের কারো প্রতি যদি আল্লাহ দয়া করতেন, তা হলে অবশ্যই শিশুর মায়ের প্রতি দয়া করতেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "নূহ আ. তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে পঞ্চাশ কম এক হাজার [সাড়ে নয় শ] বছর অবস্থান করেন এবং বৃক্ষরোপণ করে একশ বছর অপেক্ষা করেন। বৃক্ষটি বড় হয়ে পোক্ত হলে তা কেটে নৌকা নির্মাণ করেন। নৌকা নির্মাণকালে সম্প্রদায়ের লোকেরা যখন তাঁর কাছ দিয়ে অতিক্রম করত, তখন তাঁকে ঠাট্টা করে বলত, তুমি ডাঙ্গায় নৌকা নির্মাণ করছ! এটা চলবে কীভাবে? নূহ আ. বলতেন, অচিরেই তোমরা জানতে পারবে।

প্রথম রাসূল হযরত নূহ আ.

হযরত আদম আ.-এর পর হযরত নূহ আ.-কে আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে সর্বপ্রথম রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেন। বোখারি ও মুসলিম শরিফের হাদিস দ্বারা তা সুস্পষ্ট প্রমাণিত। মুসলিম শরিফের শাফায়াতের অধ্যায়ে হযরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে একটি দীর্ঘ রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে–

يَا نُوحُ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى الْأَرْضِ

"হে নূহ! তোমাকে পৃথিবীতে সর্বপ্রথম রাসূল বানানো হয়েছে।"

আল্লাহ তাআলা হযরত নূহ আ.-কে পৃথিবীতে রাসূল হিসেবে প্রেরণের পর, তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে আল্লাহ তাআলার ইবাদত ও তাওহিদের দাওয়াত দেন। অনুরূপভাবে অন্যান্য পয়গম্বরগণও তাওহিদ ও অন্যান্য বিষয়ের দাওয়াত দিয়েছেন। তাঁরা সকলে তাঁরই বংশধর ছিলেন। কোরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে–

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ

"তাঁর (নূহ আ.-এর) বংশধরকেই আমি বিদ্যমান রেখেছি বংশ পরম্পরায়।" (সূরা সাফ্‌ফাত : ৭৭)

وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ

"আমি তাঁদের (নূহ ও ইবরাহীম আ.-এর) বংশধরদের জন্য স্থির করেছিলাম নবুয়ত ও কিতাব।" (সূরা হাদিদ : ২৬)

হযরত নূহ আ.-এর পরে আগত সকল নবী ও রাসূলই তাঁর বংশধর ছিলেন। তেমনিভাবে তাঁর বংশধর ছিলেন হযরত ইবরাহীম আ.ও। আর তাঁর মাধ্যমে তাঁর পরবর্তীকালের সকল নবী-রাসূলই হযরত নূহ আ.-এর বংশধর।

হযরত নূহ আ.-এর একত্ববাদের দাওয়াত

পৃথিবীতে আগমনকারী সকল নবী-রাসূলগণের প্রতি তাওহিদের দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ ছিল। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

(১) "আল্লাহর ইবাদত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেওয়ার জন্য আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি।" (সূরা নাহ্‌ল : ৩৬)

وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَٰنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ

(২) "আপনার পূর্বে যে সকল রাসূল প্রেরণ করেছিলাম, তাদের আপনি জিজ্ঞাসা করুন! আমি কি দয়াময় আল্লাহ ছাড়া কোনো দেবতা স্থির করেছিলাম, যার ইবাদত করা যায়?"(সূরা যুখরুফ : ৪৫)

এমনিভাবে হযরত নূহ আ.-এর ওপরও ছিল সেই নির্দেশ। কাজেই তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন :

يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

"হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো ইলাহ নেই। আমি তোমাদের জন্য মহা দিনের শাস্তির আশঙ্কা করছি।" (সূরা আরাফ : ৫৯)

তিনি আরো বলেছিলেন–

أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ

"তোমরা আল্লাহ ছাড়া অপর কিছুর ইবাদত কর না। আমি তোমাদের জন্য এক যন্ত্রণাদায়ক দিবসের শাস্তির আশঙ্কা করছি।" (সূরা হূদ : ২৬)

তিনি আরো বলেছিলেন–

قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (٢) أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ

"হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী এ বিষয়ে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁকে ভয় করো আর আমার আনুগত্য করো।"

(সূরা মুমিনূন : ২৩)

তবে সূরা নূহে সবিশেষ স্বজাতির প্রতি তাঁর দাওয়াতের বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। তিনি রাত-দিন গোপনে ও প্রাকশ্যে লোকদের দাওয়াত দিয়েছেন। তিনি কখনো উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে আবার কখনো ভয়-ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে লোকদেরকে বুঝিয়েছেন।

কিন্তু আক্ষেপ তাদের ওপর! সম্প্রদায়ের লোকেরা কোনো অবস্থাতেই তাঁর দাওয়াতে সাড়া দিল না। বরং অধিকাংশ লোক হযরত নূহ আ.-এর প্রকাশ্যে বিরোধিতা শুরু করল। তারা গোমরাহীতে আরো নিমজ্জিত হয়ে হযরত নূহ আ.-এর বিরুদ্ধে উঠে-পড়ে লাগল। তারা হযরত নূহ আ.-এর অনুসারীদের ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে লাগল। তাঁদেরকে মেরে ফেলার এবং দেশ থেকে বিতাড়িত করার ভয় দেখাতে থাকল। শুধু তা-ই নয়; বরং তাঁদের উপর চালাল বিভিন্নভাবে নির্যাতন। কোরআন মাজিদে এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে–

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٦٠) قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٦١) أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"তার সম্প্রদায় প্রধানগণ বলেছিল, আমরা তো তোমাকে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখছি। (নূহ আ.) বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! আমার মধ্যে কোনো ভ্রান্তি নেই। আমি তো জগতসমূহের প্রতিপালকের রাসূল। আমার প্রতিপালকের বাণী আমি তোমাদের কাছে পৌঁছাচ্ছি ও তোমাদের হিতোপদেশ দিচ্ছি এবং তোমরা যা জানো না, আমি তা আল্লাহর পক্ষ থেকে জানি।"

হযরত নূহ আ.-এর অনুসারীদেরকে কাফেররা কটাক্ষ করত; ওরা অধম ও নীচ বলে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ

"তার সম্প্রদায়ের কাফের নেতৃবৃন্দ বলল, আমরা তো তোমাকে আমাদের মতোই মানুষ দেখছি। আমরা তো দেখছি, যারা বুঝে না, তারাই তোমার অনুসরণ করছে। যারা আমাদের মধ্যে অধম এবং আমরা আমাদের ওপর তোমাদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব দেখছি না বরং আমরা তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করি।" (সূরা হূদ : ২৭)

নূহ আ.-এর সম্প্রদায়ের লোকেরা বিস্মিত হলো। একজন মানুষ কীভাবে রাসূল হতে পারে! তদুপরি তারা তাঁর অনুসারীদের নানা দোষে অভিযুক্ত করত। অথচ তাঁর অনুসারীরা অত্যন্ত বিনয়ী, নম্র ও দুর্বল ছিল বলেই বর্ণিত আছে। তাঁরা নূহ আ.-এর দাওয়াত শুনেই তা কবুল করে নিয়েছিল। তাই কাফেররা তাদেরকে 'বিবেচনাহীন' বলে মন্তব্য করেছিল।

উপরে উল্লিখিত আয়াত (সূরা হূদ : ২৯) দ্বারা এ কথা প্রতীয়মান হয়, সম্পদশালী ও প্রভাবশালী কাফেররা হযরত নূহ আ.-এর কাছে তাঁর অসহায় ও দুর্বল আনসারী ব্যক্তিদের তাড়িয়ে দিলে আমরা তোমার কথা শুনতে পারি বলে দাবি করেছিল। যেমনিভাবে কোরাইশদের অহঙ্কারী কাফেররা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছিল : আপনার দরবার হতে হযরত আম্মার, সুহাইব, বেলাল, খাব্বাব রাযি. প্রমুখ গরীব, দুর্বল ও অসহায়দের তাড়িয়ে দিন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁকে এরূপ কাজ থেকে বিরত থাকার এবং মুমিনগণের দিকেই নিবিষ্ট থাকতে নির্দেশ দেন।

হযরত নূহ আ. বলেন— মুমিনগণকে তাড়িয়ে দেওয়া আমার কাজ নয়। আমি তো কেবল একজন স্পষ্ট সতর্ককারী। তিনি তাদের মধ্যে অবস্থান করেছিলেন পঞ্চাশ কম হাজার [৯৫০] বছর। এরপর প্লাবন তাদের গ্রাস করে। কারণ, তারা ছিল জালিম।

এভাবে হযরত নূহ আ. তাঁর সম্প্রদায়কে দীনের দাওয়াত দিতেন এবং একত্ববাদের প্রতি আহ্বান করতেন। কিন্তু তাঁর সম্প্রদায় তাঁকে বরাবরই মিথ্যা প্রতিপন্ন করত এবং তাঁর অনুসারীগণকে উপহাস করত। কাফেররা এতটাই ভ্রান্তির মধ্যে ছিল, হযরত নূহ আ. এত দীর্ঘকালের দাওয়াতি পরিশ্রমের পর কিছুসংখ্যক লোক হযরত নূহ আ.-এর আনিত দীনের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল।

হযরত নূহ আ.-এর কওমের নাফরমানি

হযরত নূহ আ.-এর কওম তাঁর দাওয়াত কবুল করল না। তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে এবং তার সকল আহ্বান ঘৃণা ও অবজ্ঞার সাথে প্রত্যাখ্যান করল। হযরত নূহ আ. তাঁর কওমের জন্য দিবা-রাত্রি পরিশ্রম করতেন। কিন্তু তারা তাঁকে অপমান ও হেয় করার যাবতীয় পন্থাই গ্রহণ করত। বিস্ময় প্রকাশ করে বলত, যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ ও স্বচ্ছলতায় আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়, মান-মর্যাদায় ফেরেশতাদের চেয়ে উচ্চ নয়, আমাদের নেতা ও পরিচালক হওয়ার কী অধিকার আছে তার? তারা হযরত নূহ আ.-এর অনুসারীদের দেখলে তাচ্ছিল্যের সাথে বলত– আমরা এদের মতো নই, তোমার আদেশানুগত হয়ে যাব; তোমাকে নিজেদের অনুসরণীয় নেতা হিসেবে মেনে নেব। মনে করত, এই দুর্বল ও নীচ শ্রেণী তো নূহ আ.-এর অন্ধ অনুসারী। কদাচই তারা হযরত নূহ আ.-এর কথার প্রতি মনোযোগ দিত। তথাপি তাঁর কাছে জেদ করত, আগে এ সমস্ত হীন ও গরীব লোকদের তোমার কাছ থেকে বিতাড়িত কর! তবেই আমরা তোমার কথা শুনব। কেননা তাদেরকে দেখলে আমাদের ঘৃণা হয়। তারা এবং আমরা এক স্থানে বসতে পারি না।

হযরত নূহ আ.-এর বলতেন, এটা কখনো হতে পারে না। কেননা তারা আল্লাহর খাঁটি বান্দা। হযরত নূহ আ. সর্বোচ্চ চেষ্টা করলেন, যাতে হতভাগা কওম বুঝতে পারে এবং আল্লাহ পাকের রহমত লাভের উপযোগী হয়ে যায়। কিন্তু কওম তাঁর হেদায়েত মানল না। বরং তাঁর পক্ষ থেকে যে পরিমাণ হেদায়েত ও সত্যের দাওয়াত হতো, কওমের পক্ষ থেকে সে পরিমাণ শত্রুতা ও বিরোধিতা হতো। এবং হযরত নূহ আ.-কে দুঃখ প্রদানের সর্বপ্রকার উপায় অবলম্বন করত। তাদের সর্দার প্রধানরা সাধারণ লোকদের পরিষ্কার বলে দিত, তোমরা কোনো প্রকারেই ওয়াদ, সুওয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নাসর মূর্তিগুলোর পূঁজা ত্যাগ করবে না। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে সূরা নূহ : ২৩ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বৃত্তান্ত দিয়েছেন। শুরুর দিকে আমরা তা উদ্ধৃত করেছি।

এমনকি পরিশেষে তারা বিরক্ত হয়ে বলতে লাগল, হে নূহ! আর আমাদের সঙ্গে ঝগড়া-কলহ করো না। এবং আমাদের এ অমান্য করার দরুন তোমার খোদাকে বলে যে আযাব আনতে পার, নিয়ে এসো! (সূরা হূদ : ৩২)

যখন কওমের সকল অপচেষ্টা ও হঠকারিতা প্রকাশ হয়ে গেল এবং কোরআন পাকের স্পষ্ট বর্ণনা অনুযায়ী সাড়ে নয় শ বছর অক্লান্ত ও অবিরাম হেদায়েত এবং

তাবলিগ করায় তাদের মধ্যে কোনো পরিবর্তন দেখলেন না, তখন তিনি নিতান্ত ব্যথিত হলেন। আল্লাহ তাআলা তখন তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন :

أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

"যারা ঈমান আনার ছিল, এনেছে। তারা ছাড়া অন্যরা কেউই ঈমান আনবে না। অতএব তাদের কার্যকলাপের জন্য দুঃখ করবে না।" (সূরা হূদ : ৩৬)

হযরত নূহ আ. বুঝতে পারলেন, তাঁর সত্য প্রচারে ত্রুটি হয় নি। এরা কট্টর অমান্যকারী নাফরমান। তখন তিনি তাদের কার্যকলাপ ও জঘন্যাচারে ব্যথিত হয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করলেন :

رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا (٢٦) إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا

"হে আমার প্রতিপালক! আপনি কাফেরদের কাউকে যমিনের ওপর অবশিষ্ট রাখবেন না। যদি আপনি তাদের এভাবেই ছেড়ে দেন, তবে তারা আপনার বান্দাদের গোমরাহ করে ফেলবে আর তাদের বংশধরও তাদেরই মতো পাপিষ্ঠ ও নাফরমান পয়দা হবে।" (সূরা নূহ : ২৬-২৭)

নৌকা তৈরি

আল্লাহ পাক হযরত নূহ আ.-এর দোয়া কবুল করলেন এবং আমলের প্রতিফলের নিয়মানুযায়ী অবাধ্যদের অবাধ্যতার শাস্তি ঘোষণা করে দিলেন। আর মুমিনদের রক্ষার জন্য প্রথমে হযরত নূহ আ. কে নির্দেশ দিলেন, একটি নৌযান তৈরি করুন। যাতে বাহ্যিক কারণ হিসেবে তিনি এবং অনুগত মুমিনগণ সেই শাস্তি হতে সুরক্ষিত থাকে আর তা অবাধ্য ও নাফরমান লোকদের প্রতি অচিরেই নাযিল হবে।

হযরত নূহ আ. আল্লাহ পাকের আদেশ অনুযায়ী নৌকা তৈরি শুরু করলে কাফেররা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে লাগল। যখনই নির্মাণাধীন নৌযানের কাছ দিয়ে যেত, তখন বলত-চমৎকার! আমরা যখন নিমজ্জিত হতে আরম্ভ করব, তখন তুমি ও তোমার অনুসারীরা এই নৌকায় আরোহণ করে সুরক্ষিত থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে। কেমন নির্বোধসুলভ কল্পনা!

হযরত নূহ আ.ও তাদের অপরিণামদর্শিতা এবং আল্লাহ তাআলার নাফরমানির দুঃসাহস দেখে তাদের অনুরূপ জবাব দিতেন। এবং নিজের কাজে মনোযোগী থাকতেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে সতর্ক করে দিয়ে ছিলেন।

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ

"হে নূহ! তুমি আমারই তত্ত্বাবধানে আমার অহি অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ করতে থাকো। আর এখন আমাকে সম্বোধন করে জালিমদের ব্যাপারে কোনো সুপারিশ করবে না। নিঃসন্দেহে তারা নিমজ্জিত হবে।" (সূরা হূদ : ৩৭)

অবশেষে নূহ আ.-এর নৌযান প্রস্তুত হয়ে গেল। এখন আল্লাহ তাআলা প্রতিশ্রুত আযাব নাযিল হওয়ার সময় নিকটবর্তী হলো। নূহ আ. প্রথম আলামত (নিদর্শন) দেখতে পেলেন, যা তাঁকে বলে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, ভূগর্ভ হতে পানি উত্থিত হতে আরম্ভ করল। তখন আল্লাহ পাক আদেশ করলেন– "নিজের বংশধরদেরকে নৌকায় আরোহণের আদেশ দাও। আর সমস্ত প্রাণীকূল হতে প্রত্যেক প্রকারের এক এক জোড়াও নৌকায় উঠিয়ে নাও। (প্রায় ৪০ জনের) সেই ক্ষুদ্র দলটিকেও (যারা তোমার ওপর ঈমান আনয়ন করেছে) নৌকায় আরোহণের আদেশ দাও।"

যখন আল্লাহ পাকের অহি সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী হলো, তখন আসমানের প্রতি আদেশ হলো, পানি বর্ষণ করতে আরাম্ভ করো আর যমিনের ফোয়ারাসমূহের প্রতি আদেশ হলো, পূর্ণ মাত্রায় উত্থিত হতে থাকো। আল্লাহ পাকের আদেশে যখন এসব কিছু হতে থাকল, তখন নৌকা তাঁর (আল্লাহ তাআলার) প্রত্যক্ষ হেফাযতে ভাসতে থাকল সে পর্যন্ত, যে পর্যন্ত না সমস্ত অবিশ্বাসী ও অবাধ্য লোকেরা পানিতে ডুবে গেল এবং আল্লাহ তাআলার বিধি-ব্যবস্থা কর্মফল অনুযায়ী নিজেদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করল।

হযরত নূহ আ.-এর সময়কার এ প্লাবনকে দীর্ঘদিন অনেকের কাছে সাজানো কাহিনী বলে অভিহিত ছিল। কিন্তু বর্তমান বিজ্ঞানীরাও স্বীকার করেছেন, সে সময় ভয়াবহ ভারি বর্ষণ ও প্লাবনের মুখে পড়েছিল পৃথিবী। বিজ্ঞানীরা কেউ কেউ নূহ আ.-এর নৌকার ধ্বংসাবশেষ অনুসন্ধানেও ব্যস্ত আছেন। তুরস্কের এক পাহাড়ে গত শতাব্দীর শেষ দিকে হাজার হাজার বছর আগে তৈরি করা বিশালাকারের নৌকার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিকদের ধারণা মতে এটাই নূহের নৌকা।

নূহ আ.-এর নৌকার বিস্তারিত ঘটনা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, "হযরত ঈসা আ.-এর অনুসারীগণ তাঁকে বললেন : কতই না ভালো হতো যদি আপনি এমন এক ব্যক্তিকে জীবিত করে দিতেন, যিনি নূহ আ.-এর নৌকার বিস্তারিত কাহিনী আমাদের বলে দিতেন! হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, এরপর হযরত ঈসা আ. তাঁর অনুসারীদেরকে নিয়ে মাটির একটি ঢিবির কাছে গেলেন। সে ঢিবি (স্তূপ) থেকে এক মুঠো মাটি হাতে নিয়ে অনুসারীদের বললেন : তোমরা কি জান, এ মাটি কার? তাঁরা জবাব দিলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই এ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। তখন হযরত ঈসা আ. বললেন, এ মাটি হচ্ছে নূহ আ.-এর পুত্র হামের পায়ের পিঠ!

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন : এরপর হযরত ঈসা আ. সেই মাটির স্তূপের ওপর তাঁর লাঠি দিয়ে আঘাত করে বললেন, 'আল্লাহর নির্দেশে দাঁড়িয়ে যাও।' সাথে সাথে তিনি (হাম) তাঁর (মাথার) সাদা চুল থেকে মাটি ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে দাঁড়ালেন। হযরত ঈসা আ. তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি এ (সাদা চুল) অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ

করেছিলেন? তিনি জবাব দিলেন– না, আমি যুবক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছি। আমি মনে করেছিলাম, কিয়ামত সংঘটিত হয়ে গেছে। এ (কেয়ামতের) ভয়ে আমি হয়ে গেছি। এরপর হযরত ঈসা আ. তাঁকে বললেন, আমাদেরকে হযরত নূহ আ.-এর নৌকা সম্পর্কে কিছু অবহিত করুন। তিনি বললেন, হযরত নূহ আ.-এর নৌকার দৈর্ঘ্য ছিল বার শ গজ এবং প্রস্থ ছিল ছয় শ গজ। এতে তিনটি তলা (স্তর) ছিল। প্রথম তলায় ছিল গৃহপালিত ও জংলী (হিংস্র) জীব-জন্তু। দ্বিতীয় তলায় ছিল মানুষ। আর সর্বোচ্চ তলায় ছিল পাখ-পাখালী।

নৌকাটিতে যখন জীব-জন্তুর মল-বিষ্ঠা, আবর্জনা ইত্যাদি খুব জমা হয়ে গেল, তখন আল্লাহ তাআলা হযরত নূহ আ.-এর প্রতি অহি প্রেরণ করলেন, আপনি হাতির লেজ স্পর্শ করুন। হযরত নূহ আ. হাতির লেজ স্পর্শ করলে, হাতি থেকে একটি শূকর ও একটি শূকরীর জন্ম হয়। তারা সাথে সাথে জীব-জন্তুর মল-মূত্র খেতে শুরু করে। ইঁদুরগুলো যখন নৌকার কাঠ কাটতে শুরু করে দেয়, তখন আল্লাহ তাআলা নূহ আ.-এর প্রতি অহি প্রেরণ করলেন, "তুমি সিংহের নাকের ওপর আঘাত কর"। নূহ আ. তাকে মোতাবেক আঘাত করলেন। সিংহের নাক থেকে একটি বিড়াল ও একটি বিড়ালী বেরিয়ে আসে। তারা সাথে সাথে ইঁদুরগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

ইবনে আহমাদ হযরত ইকরামা রাযি. থেকে এবং ইকরামা হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেন : হযরত নূহ আ.-এর সাথে নৌকায় ৮০ জন লোক ছিলেন। প্রত্যেকের সাথে তাদের পরিবার-পরিজনও ছিল। নৌকায় তারা প্রায় ১ শ ২৫ দিন থাকেন। আল্লাহ তাআলা নৌকার গতি মক্কা শরিফের দিকে ফিরিয়ে দেন। এরপর এর গতি জুদি পাহাড়ের দিকে ফিরিয়ে দেন। সেখানে পৌঁছে নৌকা থেমে যায়। এরপর হযরত নূহ আ. পৃথিবীর খবর জানার জন্য একটি কাক প্রেরণ করেন। কাক একটি মৃতদেহ দেখে তার উপর দ্রুত ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ফিরে যেতে দেরি করে। এ বিলম্বের কারণে হযরত নূহ আ. কবুতর প্রেরণ করেন। কবুতর পায়ে কাদামাখা অবস্থায় যয়তুন বৃক্ষের একটি পাতা নিয়ে নূহ আ.-এর কাছে আসে। এতে হযরত নূহ আ. বুঝতে পারলেন, ভূপৃষ্ঠ থেকে পানি নেমে গেছে। এরপর হযরত নূহ আ. জুদি পাহাড় থেকে ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করে একটি জনপদ গড়ে তোলেন। সে জনপদের নাম রাখেন 'ছামানীন' (আশি)। অর্থাৎ আশি জন লোকের জনপদ। এ সময় হঠাৎ এক সকালবেলা তাদের সকলের মুখের ভাষা পরিবর্তন হয়ে আশিটি ভাষায় পরিণত হয়ে যায়। তার মধ্যে একটি ভাষা ছিল আরবি। কেউ কারো ভাষা বুঝতে পারত না। হযরত নূহ আ. প্রত্যেকের কথা প্রত্যেককে বুঝিয়ে দিতেন।

হযরত কাতাদা রহ. ও অন্যান্যরা বলেন, নূহ আ.-এর সম্প্রদায়ের এই (বিশ্বাসী) দলটি রজব মাসের ১০ তারিখে নৌকায় আরোহণ করে ১ শ ২০ দিন তাতে অবস্থান করেন। এ সময়ের মধ্যে তাঁরা একমাস জুদি পাহাড়ের ওপর থাকেন। এরপর মহররম মাসের ১০ তারিখে তাঁরা নৌকা থেকে বাইরে আসেন।

পুত্রের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে সুপারিশ

হযরত নূহ আ. নিজ পুত্রের ক্ষমা ও মুক্তির জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে আবেদন করেছিলেন : হে পরওয়ারদেগার! আপনি আমার কাছে আমার পরিবার-পরিজনকে (মসিবত থেকে) রক্ষা করার ওয়াদা করেছেন। আর এ পুত্রটিও তো আমার পরিবারের একজন। অথচ সে তো এখন ডুবে যাচ্ছে। আমার কাছে তাই সুস্পষ্ট নয়, এ পুত্রটি কি আমার পরিবারভুক্ত, না আমার থেকে বিচ্ছিন্ন?

জবাবে বলা হয়, সে তাদের অর্থাৎ যাদেরকে আমি রক্ষা করার ওয়াদা করেছি, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ, আমি তোমাকে বলেছিলাম তোমার পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করব; কিন্তু তাকে নয় যার ব্যাপারে পূর্বে আমার শাস্তির সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে (অর্থাৎ কাফেরদের)। সুতরাং তোমার পুত্র কেনান তোমার পরিবারভুক্ত নয়। তার ব্যাপারে আগেই সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে, সে নিমজ্জিত হবে এবং কুফরির স্বাদ ভোগ করবে।

হযরত নূহ আ.-এর সন্তানসন্তুতি

আল্লাহ তাআলা বলেন :

قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ
ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ

"বলা হলো, হে নূহ! অবতরণ করো আমার দেওয়া শান্তিসহ এবং তোমার ও তোমার সঙ্গে থাকা উম্মতের প্রতি কল্যাণসহ। আর অপর সম্প্রদায়সমূহকে জীবন উপভোগ করতে দেবো। পরে আমার পক্ষ হতে মর্মন্তুদ শাস্তি তাদের স্পর্শ করবে।"

(সূরা হূদ : ৪৮)

অর্থাৎ, তোমার ও তোমার বংশধরদের থেকে যে সকল উম্মত আসবে সবার প্রতিই শান্তি। এখানে নূহ আ.-এর বংশধর বলার কারণ, পৃথিবীর সকল লোক হযরত নূহ আ.-এর বংশধর। আজ পৃথিবীতে যত মানুষ রয়েছে, তারা সকলেই হযরত নূহ আ.-এর তিন পুত্র সাম, হাম ও ইয়াফিসের কারো না কারো সন্তান।

হযরত সামুরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "সাম আরবের আদি পিতা, হাম আবিসিনিয়ার আদি পিতা এবং ইয়াফিস রোমের আদি পিতা। অর্থাৎ এ দেশসমূহে লোকদের আদি পিতা।

হযরত ইমরান বিন হুসাইন রাযি.ও অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। হযরত ইমরান রাযি. বলেন, রোম দ্বারা এখানে প্রথম রোম বুঝানো হয়েছে। যারা ইউনানী বা গ্রিক জাতি। এদের বংশতালিকা রোমী ইবনে সাবতী ইবনে ইউনান ইবনে ইয়াফিস ইবনে নূহ আ.।

হযরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "নূহ আ.-এর তিন সন্তান ছিল। যাদের নাম সাম, হাম ও ইয়াফিস।

সামের থেকে আরব, ইরান (পারস্য) ও রুম দেশীয় লোকেরা জন্মগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে ছিল কল্যাণ নিহিত। ইয়াফিস থেকে ইয়াজুজ-মাজুজ, তুর্ক ও সাকালিবাদের জন্ম হয়। এদের মধ্যে কোনো কল্যাণ নিহিত ছিল না। আর হাম থেকে কিবতী, তাতারী ও সুদানীদের জন্ম হয়।

এক বর্ণনা মতে হযরত নূহ আ.-এর তিন পুত্রের জন্ম নূহ আ.-এর প্লাবনের পরে হয়েছিল। আর কিনানের জন্ম হয়েছিল প্লাবনের আগে। প্লাবনের সময় সে (কিনান) নিমজ্জিত হয়। আবের নামে নূহ আ.-এর আরেকটি পুত্র ছিল। সে কিনানের পূর্বে মারা গেছে। তবে সঠিক কথা হল, নূহ আ.-এর তিন পুত্র সাম, হাম ও ইয়াফিস এবং তাঁর স্ত্রী সন্তানসন্ততিসহ নৌকায় ছিলেন।

জুদি পাহাড়

আল্লাহ তাআলা কোরআন শরিফে জুদি পাহাড়ের উল্লেখ করেছেন। সে কি বিরাট পাহাড়! দজলার পাশে জাজিরা ইবনে উমরের পূর্ব অংশে এর অবস্থান। মাওসিলের কাছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে তার দৈর্ঘ্য হলো, তিন দিনের পথ আর উচ্চতা আধা দিনের পথ। সবুজ বর্ণ। পাহাড়টি ওক জাতীয় গাছে পরিপূর্ণ। তার পাশে আছে একটি গ্রাম। নাম করিআতুস সামানিন (৮০ জনের গ্রাম)। একাধিক মুফাসসিরের মতে তা নূহ আ.-এর সঙ্গে মুক্তিপ্রাপ্ত লোকজনের আবাসস্থল ছিল। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মোটকথা, আল্লাহ পাকের আদেশে আযাব সমাপ্ত হলে নূহ আ.-এর নৌকা জুদি পাহাড়ে গিয়ে থামল। তাওরাত কিতাবে আছে, জুদি আরারাত পর্বত শ্রেণীর অন্যতম। আরারাত হলো দ্বীপের নাম। এটা সেই অঞ্চলের নাম, যা 'দজলা' ও 'ফোরাত' নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী 'দিয়ারে বিক্‌র' হতে বাগদাদ পর্যন্ত বিস্তৃত।

এরপর প্লাবনের পানি আস্তে আস্তে শুকাতে আরম্ভ করল। এবং নৌকার আরোহীরা পুনরায় শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে আল্লাহর যমিনে পা রাখল। এ কারণেই নূহ আ.-কে 'দ্বিতীয় আদম' অর্থাৎ মানব জাতির দ্বিতীয় পিতা বলা হয়। খুব সম্ভব এ হিসেবে তাঁকে হাদিস শরীফে 'প্রথম রাসূল' বলা হয়েছে। যদিও এ পর্যন্ত এসেই নূহ আ.-এর ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা সমাপ্ত হয়ে যায়। তথাপি এ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় যে সমস্ত জ্ঞানগর্ভ ও ঐতিহাসিক প্রশ্নের উদ্ভব হয় কিংবা উত্থাপন করা হয়েছে, তাও আলোচনাযোগ্য।

নূহ আ.-এর প্লাবনের বিস্তৃতি

নূহ আ.-এর প্লাবন কি সমগ্র পৃথিবীর উপর এসেছিল, না কি পৃথিবীর নির্দিষ্ট কোনো অংশের উপর এসেছিল– এ সম্বন্ধে প্রাচীন ও আধুনিক যুগের আলেমদের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে। ওলামায়ে ইসলামের এক জামাত, ইহুদি-খৃস্টান সম্প্রদায়ের আলেমগণ এবং জ্যোতির্বিদ ও ভূ-তত্ত্ববিদ জড়জগতের ঐতিহাসিকদের অভিমত হলো, এ প্লাবন সমগ্র পৃথিবীর উপর আসে নি। বরং পৃথিবীর সেই অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, যেখানে হযরত নূহ আ.-এর কওম বসবাস করত। সেই অঞ্চলটির আয়তন ১ লাখ ৪০ হাজার

বর্গ কিলোমিটার। তাঁদের মতে নূহ আ.-এর প্লাবন নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে হওয়ার কারণ হলো, এ প্লাবন ব্যাপক হলে তার চিহ্নসমূহ ভূগোলকের বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন পর্বতচূড়ায় পরিলক্ষিত হওয়া উচিত ছিল। অথচ এরূপ হয় নি। তা ছাড়াও সে সময় মানুষের বসতি খুব সীমিত ছিল এবং তা ছিল সেই অঞ্চলেই, যেখানে হযরত নূহ আ. ও তাঁর কওম বাস করত। তখনও হযরত আদম আ.-এর সন্তানদের সংখ্যা সেই অঞ্চলের বসবাসকারীদের চেয়ে অধিক ছিল না। সেখানকার অধিবাসীরা ছিল আদম আ.-এর সমস্ত সন্তান। ওই অঞ্চলের বাইরে কোথাও কোনো মানুষের বসতি ছিল না। সুতরাং সেই অঞ্চলটিই আযাবের উপযোগী ছিল এবং তাদের উপর এই আযাব প্রেরিত হয়েছিল। পৃথিবীর অন্যান্য অংশের সাথে এ আযাবের বা প্লাবনের কোনো সম্পর্ক ছিল না।

আবার কোনো কোনো ওলামায়ে ইসলাম, বিচক্ষণ ভূতত্ত্ববিদ এবং কোনো কোনো জড়বাদী ঐতিহাসিকদের মতে এ প্লাবন সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠের উপর ব্যাপক ছিল। আর ব্যাপক-প্লাবন শুধু এই একটিই নয় বরং তাঁদের মতে ভূ-পৃষ্ঠের উপর এ ধরনের বহু প্লাবন এসেছিল। তন্মধ্যে এটাও একটি।

পৃথিবীর উচ্চ পর্বতসমূহের উপর এমন প্রাণীসমূহের দেহ এবং হাড়সমূহ পাওয়া গেছে, যার সম্বন্ধে ভূতাত্ত্বিকগণের অভিমত হলো, এগুলো জলজ প্রাণী। শুধু পানিতেই জীবিত থাকতে পারত। পানির বাইরে তাদের এক মুহূর্তও জীবিত থাকা কঠিন। সুতরাং পৃথিবীর সুউচ্চ পর্বতমালার উপর ওসব বস্তুর অস্তিত্বই প্রমাণ করে, কোনোকালে পানির এমন এক বিশাল প্লাবন এসেছিল, যা সে সকল পর্বতসমূহকে নিমজ্জিত করেছিল।

বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে বিশুদ্ধ মতে এ প্লাবন নির্দিষ্ট অঞ্চলে হয়েছিল; ব্যাপক ছিল না। কোরআন মাজিদে আল্লাহ তাআলার নীতি অনুযায়ী উপদেশ ও শিক্ষণীয় দিকগুলোই উল্লেখ করা হয়েছে। এর বাইরের কোনো কথা নেই। কোরআন শুধু এতটুকুই বলতে চায়, ইতিহাসের এ ঘটনা জ্ঞানীদের ভুলে যাওয়া উচিত নয়। স্মরণ রাখা উচিত, আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগে একটা সম্প্রদায় আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতার কারণে তুফান ও জলোচ্ছ্বাসে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল; শুধু হযরত নূহ আ. ও তাঁর কতিপয় অনুসারী ছাড়া।

আল্লাহ তাআলার প্রশংসায় হযরত নূহ আ.

কোরআন মাজিদের আল্লাহ তাআলা হযরত নূহ আ.-এর প্রশংসা করে বলেন :

إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا

"নিশ্চয় সে ছিল আমার অত্যন্ত কৃতজ্ঞ বান্দা।"

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি এমন ব্যক্তির প্রতি রয়েছে, যে আহার

ও পানাহারের পরে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করে। অনুরূপভাবে মুসলিম, তিরমিযি ও নাসায়ি শরিফেও আবু উসামা রাযি. থেকে এ হাদিসটি বর্ণিত রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে 'কৃতজ্ঞ' সে ব্যক্তিকে বলা হয়, যার অন্তর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ সর্বদা আল্লাহ তাআলার ইবাদত ও আনুগত্যে ব্যয় করে থাকে।

হযরত নূহ আ.-এর রোযা পালন

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, হযরত নূহ আ. ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন ছাড়া সারা বছর রোযা রাখতেন। (ইবনে মাজাহ)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, "হযরত নূহ আ. ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন ছাড়া সারা বছর রোযা রাখতেন। হযরত দাউদ আ. বছরের অর্ধেক সময় রোযা রাখতেন। (অর্থাৎ একদিন পরপর রোযা রাখতেন।) হযরত ইবরাহীম আ. প্রত্যেক মাসে তিন দিন করে রোযা রাখতেন। কখনো রোযা রাখতেন, কখনো রোযা ভাঙতেন।" (তাবারানি)

হযরত নূহ আ.-এর হজপালন

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম "উসফান" উপত্যাকা অতিক্রম করছিলেন। এ সময় হযরত আবু বকর রাযি. বললেন, আল্লাহর রাসূল ! এটি 'উসফান' উপত্যকা। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : এটি এমন এক জায়গা, যেখান থেকে হযরত নূহ আ., হুদ আ. ও ইবরাহীম আ. তাঁদের লাল উটে চড়ে অতিক্রম করেছিলেন। এ উটগুলোর লাগাম ছিল খেজুর পাতার তৈরি। এ সময় তাঁদের পরনে থাকত পশমের তৈরি লম্বা জুব্বা ও চাদর। এ অবস্থায় তাঁরা পবিত্র গৃহের হজপালন করতেন।

ছেলের প্রতি হযরত নূহ আ.-এর অসিয়ত

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে বসা ছিলাম। এ সময় এক বেদুঈন এসে সেখানে উপস্থিত হলো। তার পরনে ছিল ইবাদতকারীদের একটি জুব্বা। কিন্তু সে জুব্বাটি ছিল রেশমী কাপড়ের নকশাযুক্ত। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমরা কি জানো, তোমাদের এ সাথীটি অশ্বারোহীর পুত্র?

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই বেদুঈন লোকটির জুব্বার আঁচল ধরে বললেন, হে বেদুঈন! আমি তোমার পরনে নির্বোধদের পোশাক দেখছি। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর নবী নূহ আ. ওফাতের পূর্বে তাঁর নিজ পুত্রকে বলেছিলেন, "আমি তোমাকে দুটি কাজ

করার জন্য এবং দুটি কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য অসিয়ত করছি। আমি তোমাকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর (তাসবিহ পাঠ করার জন্য) আদেশ করছি। জেনে রেখো, যদি সাত আসমান ও সাত জমিন এক পাল্লায় রেখে অপর পাল্লায় কালিমা রাখা হয়, তবে কালিমা (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) এর পাল্লাটি অবশ্যই ভারি হবে। আর যদি সাত আসমান ও সাত জমিন একটি লোহার গোলাকার ধনুকও হয়ে যায়, তবুও কালিমা (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) তার উপর ভারি হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয়ত আদেশ করছি 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী' বলতে। সব কিছু পাওয়ার জন্য এ তাসবিহই যথেষ্ট এবং এর উসিলায়ই গোটা সৃষ্টিজীব রিযিক লাভ করে থাকে। আর আমি তোমাকে দুটি বিষয় থেকে বিরত থাকার জন্য আদেশ করছি। একটি হচ্ছে শিরক। দ্বিতীয়টি হচ্ছে অহঙ্কার।

বর্ণনাকারী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, বা অন্য কেউ বলল, আল্লাহর রাসূল, শিরক সম্পর্কে তো আমাদের জানা আছে; কিন্তু অহঙ্কার কাকে বলে? আমাদের কারো কাছে সুন্দর জুতা এবং এর উপর সুন্দর চামড়ার ফিতা রয়েছে, এগুলো কি অহঙ্কার? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, না। (এরপর আরয করা হলো,) তবে কি আমাদের কারো কাছে যে সুন্দর পোশাক রয়েছে, যেগুলো তারা পরিধান করে থাকে, সেটা কি অহঙ্কার?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, না। এরপর আরজ করা হল, তবে কি কারো অনেক বন্ধু-বান্ধব ও সঙ্গী-সাথী হওয়া, যারা তার কাছে এসে বসে, সেটা কি অহঙ্কার? (অর্থাৎ নেতা হওয়ার কারণে তার চারপাশে বহু লোকের সমাগম হওয়াটা কি অহঙ্কার?) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, না। এরপর আরয করা হলো, আল্লাহর রাসূল, অহঙ্কার জিনিসটা কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "সত্যকে অস্বীকার করা এবং মানুষকে তুচ্ছ করা।"

হযরত নূহ আ.-এর বয়স

হযরত নূহ আ.-এর বয়স সম্পর্কে আহলে কিতাবগণ বলেন : তিনি যখন নৌকায় আরোহণ করেছিলেন, তখন তাঁর বয়স ছিল ৬ শ বছর। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকেও এরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে। তবে সেসঙ্গে অতিরিক্ত আছে, নৌকা থেকে অবতরণের পর তিনি ৩ শ বছর বেঁচে ছিলেন। কিন্তু এ বক্তব্যটি যদি কোরআনের বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করা না যায়, তবে অবশ্যই তা ভ্রান্ত। কোরআন বলে :

فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا

"তিনি তাদের মধ্যে অবস্থান করেছিলেন পঞ্চাশ কম হাজার বছর। (সূরা আনকাবূত : ১৪)

কিন্তু নৌকা থেকে অবতরণের পর হযরত নূহ আ. কত বছর বেঁচে ছিলেন, তা আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। অবশ্য হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.-এর বর্ণনাটি গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকলে হযরত নূহ আ. ১২শ ৮০ বছর বয়সে নবুয়ত প্রাপ্ত হন এবং

প্লাবনের পর তিনি ৩ শ পঞ্চাশ বছর বেঁচে থাকেন। তখন এ হিসাব মতে তাঁর বয়স ১ হাজার ৭ শ আশি বছর। আল্লাহ তাআলাই সর্বজ্ঞ।

হযরত নূহ আ.-এর ওফাতলাভ

ইবনে জারির, আযরাকি, আবদুর রহমান ইবনে ছাবিত রহ. এবং অন্যান্য তাবেঈন থেকে বর্ণিত আছে, 'নূহ আ.-এর কবর মসজিদে হারামে'। এ বর্ণনাটি পরবর্তী যুগের অধিকাংশ আলেমগণের অভিমত অপেক্ষা জোরালো ও সুস্পষ্ট। তারা বলেন, নূহ আ.-এর কবর 'বিকা' শহরে অবস্থিত। যেটি বর্তমানে 'কারক-ই-নূহ' নামে সুপরিচিত। এ কবর থাকার কারণে সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে।

কতিপয় শিক্ষনীয় বিষয়

১। প্রত্যেক মানুষকে নিজের কার্যকলাপ ও আমলের জন্য নিজেকেই আল্লাহ পাকের দরবারে জবাবদিহি করতে হবে। সুতরাং পিতার বুযুর্গী ও উচ্চ মর্যাদা দ্বারা পুত্রের পাপের প্রতিকার হতে পারে না এবং পুত্রের নেকআমল ও পারলৌকিক সৌভাগ্য পিতার অবাধ্যতাচরণের বিনিময় বা বদলাও হতে পারে না। হযরত নূহ আ.-এর নবুয়ত ও পয়গম্বরী পুত্র কেনানের কুফরের শাস্তি প্রতিরোধ করতে পারে নি এবং হযরত ইবরাহীম আ.-এর পয়গম্বরী ও উচ্চ মর্যাদা পিতা আযরের শিরকের জন্য মুক্তির কারণ হতে পারে না।

২। খারাপ সম্পর্ক বিষের চেয়েও মারাত্মক। এর প্রতিফল ও পরিণতি কেবলই অপমান, লাঞ্ছনা ও ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষের জন্য নেকআমল যেমনি অত্যন্ত জরুরি, তদপেক্ষা অধিক জরুরি নেককারদের সংশ্রব। পক্ষান্তরে মন্দকার্য থেকে আত্মরক্ষা করা মানুষের জীবনের উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য। তার চেয়ে অধিক প্রয়োজনীয় অসৎ সঙ্গ হতে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা।

* নূহের পুত্র পাপাচারীদের সাথে উঠাবসা করত। ফলে সে নবীবংশের মর্যাদা হারিয়ে ফেলে। (নবী বংশে জন্মলাভ তার কোনো কাজে আসে নি।)
* আসহাবে কাহাফের কুকুর কিছুদিন নেককারদের সংশ্রব লাভ করে মানব (এর মতো মর্যাদাশালী) হয়ে গেছে।
* নেককারের সংশ্রব তোমাকে নেককার বানিয়ে দেবে। বদকারের সঙ্গ তোমাকে বদকার বানিয়ে ছাড়বে।

৩। আল্লাহ তাআলার ওপর পূর্ণ নির্ভর ও ভরসা রাখার সাথে বাহ্যিক উপকরণের ব্যবহার তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়। বরং আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের জন্য সঠিক কর্মপন্থা। সে কারণেই প্লাবন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নূহ আ.-এর নৌকার প্রয়োজন হয়েছিল।

৪। আল্লাহ তাআলার পয়গম্বর নিষ্পাপ হওয়া সত্ত্বেও মানবীয় স্বভাবসুলভ কারণে আম্বিয়া আলাইহিস সালামগণের পদস্খলন বা ত্রুটি-বিচ্যুতি সংঘটিত হতে পারে। কিন্তু তারা সেই ত্রুটি-বিচ্যুতির উপর স্থায়ী থাকেন না। বরং আল্লাহ পাকের তরফ হতে তাদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হয়। এবং সেই ত্রুটি হতে তাঁদেরকে দূরে সরিয়ে নেওয়া হয়। হযরত আদম আ. ও হযরত নূহ আ.-এর ঘটনাগুলো এর সঠিক সাক্ষ্য। এতদ্ভিন্ন তাঁরা গায়েব সম্পর্কীয় জ্ঞানের অধিকারী নন। যেমন এ ঘটনায় নূহ আ.-কে আল্লাহ বলেছেন : "আমার নিকট এমন বিষয়ের সুপারিশ করো না, যা সম্বন্ধে তুমি অবহিত নও।" এতে পরিষ্কারভাবে উপর্যুক্ত কথাটি বুঝা যায়।

৫। 'কর্মফল' সম্বন্ধীয় আল্লাহ পাকের কানুন যদিও প্রত্যেক ক্ষেত্রেই নিজের কাজ করে যাচ্ছে, কিন্তু প্রত্যেক অপরাধের শাস্তি কিংবা প্রত্যেক নেককাজের বিনিময় দুনিয়াতেই পাওয়া যাওয়া জরুরি নয়। কেননা এ বিশ্বজগৎ কর্মক্ষেত্র। আর কর্মফলের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে পরকালকে। তথাপি জুলুম ও অহঙ্কার এ দুটি মন্দকর্মের শাস্তি কোনো না কোনো প্রকারে দুনিয়াতেও পাওয়া যায়।

ইমাম আবু হানিফা রহ. বলতেন, "জালিম ও অহঙ্কারী লোকেরা মৃত্যুর আগেই নিজেদের জুলুম ও অহঙ্কারের কিছু-না-কিছু শাস্তি পেয়ে থাকে এবং অপমান ও ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়। যেমন আল্লাহ পাকের সত্য পয়গম্বরগণকে কষ্ট প্রদানকারী সম্প্রদায়সমূহের এবং ইতিহাসে উল্লিখিত জালিম ও অহঙ্কারীদের উপদেশমূলক ধ্বংসলীলার ঘটনাসমূহ এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

কওমে নূহ-এর এলাকা ও জুদী পাহাড়

হযরত হূদ আ.

হযরত হূদ আ.-এর বংশধারা

হযরত হূদ আ.-এর বংশতালিকা হচ্ছে, হূদ ইবনে শালিখ ইবনে আরফাখশায ইবনে সাম ইবনে নূহ আ.। মতান্তরে হূদ-এর নাম ছিল আবির ইবনে আরফাখশায ইবনে সাম ইবনে নূহ আ.। অন্যমতে হূদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে রাবা ইবনুল-জারূদ ইবনে আয ইবনে আওস ইবনে ইরাম ইবনে সাম ইবনে নূহ আ.। ইবনে জারির রহ. এ মতভেদের কথা উল্লেখ করেছেন।

হূদ আ.-এর গোত্রের নাম আদ (ইবনে আওস ইবনে সাম ইবনে নূহ)। তারা ছিল আহকাফ তথা বালুকাময় টিলা অঞ্চলের অধিবাসী। যা ইয়ামানের ওমান ও হাজরা মাওতে অবস্থিত। এটি ছিল শাহর জলাশয়ের তীরবর্তী জনপদ। তাদের উপত্যকার নাম ছিল মুগিছ। উঁচু উঁচু খুঁটির ওপর তাবু খাঁটিয়ে তারা বসবাস করত।

পবিত্র কোরআনে হযরত হূদ আ.

কোরআনুল কারিমের ৭ জায়গায় হযরত হূদ আ.-এর নাম এসেছে। সূরা আরাফ : ৬৫, সূরা হূদের ৫০, ৫৩, ৫৮, ৬০, ৮৯ নং আয়াতে এবং সূরা শুআরার ১২৪ নং আয়াতে।

পূর্বে বলা হয়েছে, হযরত হূদ আ.-এর সম্প্রদায়ের নাম ছিল আদ। এরা তাদের রাজত্বের জাঁকজমকে, দৈহিক শক্তির অহঙ্কারে এতই বিভোর মত্ত ছিল, আল্লাহ তাআলাকে সম্পূর্ণরূপে ভুলতে বসেছিল এবং নিজ হাতে গড়া মূর্তিসমূহকে মাবুদ [উপাস্য] মেনে সর্বপ্রকার শয়তানি কাজ নির্ভয়ে ও নিশ্চিন্তে করতে লাগল। হযরত নূহ আ.-এর মহা প্লাবনের পরে আদে উলা সর্বপ্রথম মূর্তিপূজা আরম্ভ করে। তাদের মূর্তি ছিল তিনটি। (১) সাদদা (২) সামুদা (৩) হাররা। আল্লাহ তাদের মাঝে হূদ আ.-কে নবীরূপে প্রেরণ করেন। তিনি তাদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করেন। সূরা আরাফে নূহ আ.-এর ঘটনার শেষে আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ (٦٥) قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٦٦) قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ (٦٨) أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٦٩) قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

(٧٠) قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (٧١) فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ

আদ জাতির কাছে তাদের ভাই হূদকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই। তোমরা কি সাবধান হবে না? তার সম্প্রদায়ের কাফের সর্দাররা বলল, আমরা তো দেখছি তুমি নির্বুদ্ধিতায় ডুবে রয়েছ আর তোমাকে তো আমরা মিথ্যাবাদী মনে করি। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আমার মধ্যে কোনো নির্বুদ্ধিতা নেই, আমি তো রাব্বুল আলামিনের প্রেরিত রাসূল। আমি আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি এবং আমি তোমাদের একজন বিশ্বস্ত হিতাকাঙ্ক্ষী। তোমরা কি বিস্মিত হচ্ছ, তোমাদের প্রভুর কাছ থেকে তোমাদেরই মধ্য থেকে একজনের মাধ্যমে তোমাদের সতর্ক করার জন্য উপদেশবাণী এসেছে? আর স্মরণ করো, আল্লাহ তোমাদের নূহের সম্প্রদায়ের পরে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তোমাদের অবয়বে অন্যলোক অপেক্ষা শক্তিতে অধিকতর সমৃদ্ধ করেছেন। অতএব তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর। হয়তো তোমরা সফলকাম হবে। তারা বলল, তুমি কি আমাদের কাছে এ উদ্দেশ্যে এসেছ যে, আমরা যেন শুধু এক আল্লাহর ইবাদত করি আর আমাদের পূর্ব-পুরুষগণ যাদের উপাসনা করত, তা বর্জন করি? সুতরাং তুমি সত্যবাদী হলে আমাদেরকে যে জিনিসের ভয় দেখাচ্ছ, তা নিয়ে এসো! সে বলল, তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তা তোমাদের জন্যে শাস্তি ও গযব নির্ধারিত হয়েই আছে; তবে কি তোমরা আমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাও এমন কতগুলো (দেব-দেবীর) নাম সম্বন্ধে যা তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষগণ সৃষ্টি করেছ! আল্লাহ এ সম্বন্ধে, কোনো সনদ পাঠান নি। সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি। তারপর আমি তাকে ও তার সঙ্গীদেরকে আমার অনুগ্রহে উদ্ধার করি; আর যারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং মুমিন ছিল না, তাদেরকে নির্মূল করেছিলাম। (সূরা আরাফ : ৬৫-৭২)

সূরা হূদে আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ (٥٠) يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٥١) وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ (٥٢) قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ

(٥٣) إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (٥٤) مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ (٥٥) إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٥٦) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ (٥٧) وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ (٥٨) وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (٥٩) وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ (٦٠)

আদ জাতির প্রতি তাদের ভাই হূদকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই। তোমরা তো কেবল মিথ্যা রচনাকারী। হে আমার সম্প্রদায়! এ জন্য আমি তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাই না। আমার পারিশ্রমিক তো তাঁরই কাছে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তোমরা কি তবুও অনুধাবন করবে না? হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা চাও। তারপর তাঁর দিকেই ফিরে এসো। তিনি তোমাদের জন্যে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং আরো শক্তি দিয়ে তোমাদের শক্তি বৃদ্ধি করে দেবেন। অপরাধী হয়ে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিও না।

তারা বলল, হে হূদ! তুমি আমাদের কাছে কোনো স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসো নি। তোমার কথায় আমরা আমাদের উপাস্যদের পরিত্যাগ করার নই। আর আমরা তোমার প্রতি বিশ্বাসী নই। আমরা তো এটাই বলি, তোমার উপর আমাদের কোনো উপাস্যের অশুভ নজর পড়েছে। হূদ বলল, আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখছি আর তোমরাও সাক্ষী থাকো যে, আল্লাহ ছাড়া তোমরা আর যেসব শরিক বানিয়ে রেখেছ, সে সবের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। তোমরা সকলে মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাও এবং আমাকে মোটেই অবকাশ দিও না। আমি নির্ভর করি আল্লাহর ওপর, যিনি আমার এবং তোমাদের প্রতিপালক। কোনো জীব-যন্তু এমন নেই, যা তাঁর নিয়ন্ত্রণে নয়। নিঃসন্দেহে আমার প্রতিপালক সরল পথে আছেন। তারপর তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলেও আমি যে পয়গামসহ তোমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছি, তা আমি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। আমার প্রতিপালক ভিন্ন কোনো সম্প্রদায়কে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। আর তোমরা তাঁর কোনোই ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। আমার প্রতিপালক নিশ্চয়ই সব কিছুর রক্ষণাবেক্ষণকারী। পরে যখন আমার ফরমান এসে পৌঁছল, তখন আমি আমার রহমতের দ্বারা হূদকে এবং তার সাথে যারা ঈমান এনেছিল, তাদেরকে রক্ষা করলাম এবং এক কঠিন আযাব থেকে তাদেরকে রক্ষা করলাম। এই হল আদ জাতি, তারা

তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে এবং তাঁর নবী-রাসূলগণকে অমান্য করেছিল এবং তারা প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারীর অনুসরণ করত। এই দুনিয়াও তাদের ওপর লানত হয়েছিল। আর তারা কিয়ামতের দিনও লানতগ্রস্ত হবে। জেনে রেখো! আদ সম্প্রদায় তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করেছিল। জেনে রেখো! ধ্বংসই হলো হূদের সম্প্রদায় আদ জাতি। (সূরা হূদ : ৫০-৬০)

সূরা মুমিনূনে আল্লাহ তাআলা বলেন :

ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ (٣١) فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ (٣٢) وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ (٣٣) وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ (٣٤) أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ (٣٥) هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ (٣٦) إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (٣٧) إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ (٣٨) قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ (٣٩) قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ (٤٠) فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

তারপর তাদের পরে অন্য এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছিলাম এবং তাদেরই একজনকে তাদের প্রতি রাসূল করে পাঠিয়েছিলাম। সে বলল, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই। তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না? তার সম্প্রদায়ের প্রধানরা যারা কুফরি করেছিল এবং আখেরাতের সাক্ষাৎকারকে অস্বীকার করেছিল এবং যাদেরকে আমি পার্থিব জীবনে প্রচুর ভোগ-সম্ভার দান করেছিলাম, তারা বলল : এ তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ। তোমরা যা খাও, সে-ও তাই খায় আর যা তোমরা পান কর, সে-ও তাই পান করে। যদি তোমরা তোমাদের মতোই একজন মানুষের আনুগত্য কর, তবে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সে কি তোমাদের এই প্রতিশ্রুতি দেয় যে, তোমাদের মৃত্যু হলে এবং তোমরা মাটি ও হাড়ে পরিণত হয়ে গেলেও তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে? অসম্ভব! তোমাদেরকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে, তা অসম্ভব! একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন। আমরা মরি-বাঁচি এখানেই। আর কখনো আমরা পুনরুত্থিত হব না। সে তো এমন এক ব্যক্তি, যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে এবং আমরা কখনোই তাকে বিশ্বাস করব না। সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য কর। কারণ, এরা আমাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে। আল্লাহ তাআলা বললেন,

অচিরেই এরা অনুতপ্ত হবে। তারপর সত্য সত্যই বিকট আওয়াজ তাদেরকে আঘাত করবে এবং আমি তাদেরকে তরঙ্গ তাড়িত আবর্জনা সদৃশ করেছিলাম। সুতরাং ধ্বংস হয়ে গেল জালিম সম্প্রদায়। (সূরা মুমিনুন : ৩১-৪১)

সূরা শুআরায় আল্লাহ তাআলা বলেন :

كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ (١٢٣) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ (١٢٤) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٢٥) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٢٦) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٢٧) أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ (١٢٨) وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ (١٢٩) وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ (١٣٠) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٣١) وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ (١٣٢) أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ (١٣٣) وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (١٣٤) إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٣٥) قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ (١٣٦) إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ (١٣٧) وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (١٣٨) فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (١٣٩) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (١٤٠)

আদ সম্প্রদায় নবী-রাসূলগণকে অস্বীকার করেছে। যখন তাদের ভাই হূদ আ. তাদের বলল, তোমরা কি সাবধান হবে না? আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুগত্য কর। আমি এ জন্য তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না। আমার পুরস্কার তো রাব্বুল আলামিনের কাছে আছে। তোমরা কি প্রতিটি উচ্চ স্থানেই অর্থহীনভাবে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করছ? তোমরা কি প্রাসাদ নির্মাণ করছ এই মনে করে, তোমরা চিরস্থায়ী হবে? আর যখন তোমরা আঘাত হানো, তখন তোমরা আঘাত হেনে থাক কঠোরভাবে।

তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। ভয় কর তাঁকে যিনি তোমাদেরকে সেই সব কিছুই দিয়েছেন, যা তোমরা জান। তিনি তোমাদের দিয়েছেন জীব-জন্তু, সন্তান-সন্ততি, বাগ-বাগিচা এবং প্রস্রবণ। তোমাদের ব্যাপারে আমি এক মহাদিবসের আযাবের আশঙ্কা করছি। তারা জবাব দিল, তুমি নসিহত কর আর না-ই কর, আমাদের জন্য সবই সমান। এসব তো পূর্ববর্তীদেরই স্বভাব। আর আমরা শাস্তি প্রাপ্ত হওয়ার লোক নই। তারপর তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করল এবং আমি তাদের ধ্বংস করলাম। নিঃসন্দেহে এতে একটি নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই মুমিন নয়। আর তোমার প্রতিপালক, তিনি তো প্রবল পরাক্রমশালী এবং পরম দয়ালুও। (সূরা শুআরা : ১২৩-১৪০)

সূরা হা-মীম-সিজদায় আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ (١٥) فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ (١٦)

আদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার এই, তারা পৃথিবীতে অযথা অহঙ্কার করত এবং বলত, আমাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী আর কে আছে? তারা অশুভ দিনসমূহকে কি লক্ষ্য করে নি, যে আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী, আর তারা আমার নিদর্শনাবলি অস্বীকার করত। তারপর আমি তাদের পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করানোর জন্যে তাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া তাদের উপর পাঠিয়েছিলাম। আর পরকালের আযাব তো এ থেকেও অধিক লাঞ্ছনাদায়ক এবং তাদেরকে সাহায্য করা হবে না। (সূরা হা-মীম-সিজদা : ১৫-১৬)

সূরা আহকাফে আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (٢١) قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٢٢) قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ (٢٣) فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (٢٤) تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (٢٥)

স্মরণ কর, আদ সম্প্রদায়ের ভাইয়ের কথা! যার পূর্বে এবং পরেও সতর্ককারীরা এসেছিল। সে তার আহকাফ বা বালুকাময় উচ্চ উপত্যকার অধিবাসী সম্প্রদায়কে এ মর্মে সতর্ক করেছিল, আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করো না। আমি তোমাদের ব্যাপারে এক ভয়াবহ দিনের আযাবের আশঙ্কা করছি। তারা বলেছিল, তুমি কি আমাদেরকে আমাদের উপাস্য দেব-দেবীদের থেকে নিবৃত্ত করতে এসেছ? তুমি সত্যবাদী হলে আমাদেরকে যে ব্যাপারে ভয় দেখাচ্ছ, তা নিয়ে আস। সে বলল, এর জ্ঞান তো আল্লাহর কাছেই রয়েছে! আমি যা সহ প্রেরিত হয়েছি, কেবল তা-ই তোমাদের কাছে প্রচার করি। কিন্তু আমি লক্ষ করছি, তোমরা একটি মূর্খ সম্প্রদায়। পরে তারা যখন তাদের উপত্যকার দিকে মেঘ আসতে দেখল, তখন তারা বলতে লাগল– এ তো মেঘপুঞ্জ, আমাদেরকে বৃষ্টি দেবে। না, বরং এটা তো তা-ই, যা তোমরা তাড়াতাড়ি চেয়েছিলে। এতে রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তিবাহী এক ঝড়। তার প্রতিপালকের নির্দেশে সে সবকিছু ধ্বংস করে দেবে। তারপর তারা এমন হয়ে গেল, তাদের

বসতিগুলো ছাড়া আর কিছুই রইল না। বস্তুত অপরাধী সম্প্রদায়কে আমি এমনিভাবে প্রতিফল দিয়ে থাকি। (সূরা আহকাফ : ২১-২৫)

সূরা যারিয়াতে আল্লাহ তাআলার বাণী :

وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ (٤١) مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ

"আর নিদর্শন রয়েছে আদ জাতির ঘটনায়। যখন আমি তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম অকল্যাণকর বায়ু; তা যে জিনিসের ওপর দিয়েই প্রবাহিত হয়েছিল, তা-ই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিল।"

সূরা নাজমে আল্লাহ তাআলার বাণী :

وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى (٥٠) وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى (٥١) وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى (٥٢) وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى (٥٣) فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى (٥٤) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى (٥٥)

"প্রথম আদকে তিনিই ধ্বংস করেছেন। এবং ছামূদ সম্প্রদায়কেও। কাউকে তিনি বাকি রাখেন নি। আর তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কেও। তারা ছিল অতিশয় জালিম ও অবাধ্য। উৎপাটিত আবাসভূমিকে উল্টিয়ে নিক্ষেপ করেছিলেন। ওটাকে আচ্ছন্ন করে নিল কী সর্বগ্রাসী শাস্তি! তবে তুমি তোমার প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করবে? (সূরা নাজ্‌ম : ৫০-৫৫)

সূরা কামারে আল্লাহ তাআলার বাণী :

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (١٨) إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ (١٩) تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ (٢٠) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (٢١) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ

"আদ সম্প্রদায় সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল। ফলে কী কঠোর হয়েছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী! তাদের উপর আমি প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্ঝা-বায়ু নিরবিচ্ছিন্ন দুর্ভোগের দিনে। মানুষকে তা উৎখাত করেছিল। উন্মোলিত খেজুর কাণ্ডের মতো। কী কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী। কোরআন আমি সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি? (সূরা নাজ্‌ম : ১৮-২২)

সূরা আল-হাক্কায় আল্লাহ তাআলার বাণী :

وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ (٦) سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ (٧) فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ (٨)

"আর আদ সম্প্রদায়– তাদের ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা-বায়ু দ্বারা, যা তিনি ওদের উপর প্রবাহিত করেছিলেন সাত রাত ও আট দিন বিরামহীনভাবে। তখন

(উক্ত সম্প্রদায়কে) দেখতে পেতে, তারা সেখানে লুটিয়ে পড়ে রয়েছে সারশূন্য বিক্ষিপ্ত খেজুর কাণ্ডের মতো। এরপর এদের কাউকে তুমি বিদ্যমান দেখতে পাও কি?

(সূরা হাক্কা : ৬-৮)

সূরা আল-ফাজ্‌রে আল্লাহ তাআলা বলেন :

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (٦) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (٧) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ (٨) وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ (٩) وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ (١٠) الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ (١١) فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ (١٢) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ (١٣) إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ

"তুমি কি লক্ষ কর নি, তোমার প্রতিপালক আদ বংশের ইরাম গোত্রের সাথে কী করেছিলেন– যারা অধিকারী ছিল সুউচ্চ প্রাসাদের? যার সমতুল্য কোনো দেশে নির্মিত হয় নি এবং ছামূদের প্রতি– যারা উপত্যকায় পাথর কেটে ঘর নির্মাণ করেছিল এবং বহু সৈন্য শিবিরের অধিপতি ফেরাউনের প্রতি– যারা দেশে সীমালঙ্ঘন করেছিল এবং সেখানে প্রচুর অশান্তি সৃষ্টি করেছিল। এরপর তোমার প্রতিপালক তাদের ওপর শাস্তির কষাঘাত হানলেন। তোমার প্রতিপালক অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।"

(সূরা ফাজর : ৭-১৪)

কওমে আদ

কওমে আদ সম্পর্কে আলোচনা করার আগে জানা জরুরি, পবিত্র কোরআন মাজিদ কোনো ইতিহাস গ্রন্থ বা তাওরাত গ্রন্থ কওমে আদ সম্বন্ধে আলোকপাত করে নি। সুতরাং এ কওমের আলোচনা কেবল কোরআন মাজিদ দ্বারা করা সম্ভব। কোরআন মাজিদ যেহেতু নিশ্চিত সত্য, তাই তাতে বর্ণিত তথ্যাবলীও নিঃসন্দেহে সত্য। এ ছাড়া অনেক গ্রন্থতত্ত্ববিদ অনুমান নির্ভর তথ্য পরিবেশন করেছেন, যা সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়।

কওমে আদ আরব দেশের প্রাচীন গোত্র কিংবা 'সামের' সঙ্গে সম্পর্কিত সম্প্রদায় হতে বিশেষ শক্তি ও পরাক্রমশালী একটি দলের নাম। প্রাচীন ইতিহাসের কোনো কোনো ইউরোপীয় ঐতিহাসিক আদকে একটি কাল্পনিক কাহিনি বলে মনে করে। তাদের এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভুল এবং অলীক কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। কেননা নতুন গবেষণায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এরূপ, আরবের আদি অধিবাসীরা সংখ্যাধিক্য এবং বহুগোষ্ঠী হিসাবে এক মহৎ ও জাঁকালো দলরূপে বিদ্যমান ছিল। এরা আরব দেশ হতে বের হয়ে সিরিয়া, মিশর ও বাবেলের দিকে অগ্রসর হয়ে সেখানে শক্তিশালী রাজত্বের ভিত্তি স্থাপন করেছিল। পার্থক্য শুধু এতটুকু, আরবরা এ সমস্ত অধিবাসীগণকে 'উমামে বায়েদাহ' বা ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায় কিংবা 'আরবে আরেবাহ' বা খাঁটি আরব বলত। আর এদের বিভিন্ন গোত্র বা দলকে আদ, সামুদ, তাসাম এবং জাদিস নামে আখ্যায়িত করত। কোরআন মাজিদে এদের বলা হয়েছে প্রথম আদ। যা দ্বারা একথা পরিষ্কার হয়ে যায়, আরবের প্রাচীন অধিবাসীরা 'সামের বংশধর এবং প্রথম আদ'। এটা একই মূল বস্তুর দুটি নাম।

আদ সম্প্রদায়ের যামানা

অনুমান করা হয়, আদ সম্প্রদায়ের যুগ ছিল হযরত ঈসা আ.-এর প্রায় দুই হাজার বছর আগে। আর কোরআন মাজিদে আদ সম্প্রদায়কে 'নূহের সম্প্রদায়ের পরে' বলে উল্লেখ করা হয়। তাই আদ সম্প্রদায়কে নূহ আ.-এর পরবর্তী সম্প্রদায়গুলোর অন্যতম গণ্য করা হয়েছে। এ হতেও প্রমাণিত হয়, সিরিয়া অঞ্চলে দ্বিতীয়বার আবাদ হওয়ার পরে 'উমামে সামিয়ার' তথা সামের বংশধরদের উন্নতি আদ সম্প্রদায় হতেই আরম্ভ হয়।

আদ সম্প্রদায়ের বাসস্থান

আদ সম্প্রদায়ের কেন্দ্রস্থল 'আহকাফ' অঞ্চল। এ অঞ্চলটি হাযরা মাউতের উত্তরে অবস্থিত। বর্তমানে এখানে বালুকাস্তূপ ছাড়া আর কিছু নেই। আর কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেন, তাদের বসতি আরবের সর্বোৎকৃষ্ট অংশ হাযরা মাউত ও ইয়ামানে পারস্য সাগরের তীরে ইরাকের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইয়ামান ছিল তাদের রাজধানী।

কওমে আদের ধর্ম

আদ সম্প্রদায় ছিল মূর্তিপূজক। তাদের পূর্ববর্তী নূহ আ.-এর কওমের মতো মূর্তিপূজা এবং মূর্তি নির্মাণের কাজে তারা ছিল অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ। প্রাচীন ঐতিহাসিকদের মধ্যে কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ বলেন, এদের বাতিল মাবূদগুলোও নূহ আ.-এর কওমের বাতিল মাবূদগুলোর মতো ওয়াদ, সুওয়া, ইয়াগূছ এবং নাসর-ই ছিল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে একটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত আছে। বর্ণিত আছে, তাদের একটি মূর্তির নাম ছিল ছামুদ এবং অন্য একটি নাম ছিল হাতার।

আদ সম্প্রদায়ের ধ্বংস

আদ সম্প্রদায়ের ধ্বংসের ব্যাপারে মুফাসসিরিনে কেরাম ও অন্যান্য লেখকগণ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক যাশ্‌শারের বর্ণিত একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি হলো,

হূদ আ.-এর কওমের লোকেরা ঈমান গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়ে যখন কুফরির ওপর দৃঢ় হয়ে থাকল। তখন আল্লাহ একাধারে তিন বছর পর্যন্ত তাদের ওপর বৃষ্টিপাত বন্ধ রাখেন। ফলে তারা দুর্ভিক্ষে পতিত হয়। ওই সময়ের নিয়ম ছিল যখন দুর্ভিক্ষ দেখা দিত, তখন তারা মুক্তির জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করত এবং তা করা হতো আল্লাহর ঘরের কাছে হারাম শরিফে। সে যুগের মানুষের কাছে এটা ছিল একটি সুবিদিত রেওয়াজ। তখন সেখানে আমালিক জাতি বাস করত। আমালিকরা হলো আমলিক ইবনে লাওজ ইবনে সাম ইবনে নূহ আ.-এর বংশধর। সেকালে তাদের সর্দার ছিল মুআবিয়া ইবনে বকর। মুআবিয়ার মা ছিলেন আদ গোত্রের। তার নাম ছিল জালহাযা বিনতে খায়বরি।

আদ সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রায় ৭০ জনের একটি দলকে বৃষ্টির জন্যে দোয়া করতে হারাম শরিফে পাঠায়। তারা মক্কার উপকণ্ঠে মুআবিয়া ইবনে বকরের বাড়িতে গিয়ে ওঠে। মুআবিয়াও তাদের মেহমানদারি করে। তারা সেখানে এক মাস অবস্থান করে। সেখানে তারা মদ পান করত। আর মুআবিয়ার দুই গায়িকার গান শুনত। নিজেদের দেশ থেকে মুআবিয়ার কাছে যেতে তাদের এক মাস সময় লেগেছিল। এদের দীর্ঘদিন অবস্থানের ফলে আপন লোকদের দুর্গতির কথা ভেবে মুআবিয়ার মনে করুণা হয়। অথচ তাদের ফিরে যাওয়ার ব্যাপারেও তিনি সঙ্কোচ বোধ করেন। তাই তিনি একটি কবিতা রচনা করে তাদের দেন এবং গানের মাধ্যমে তা শুনানোর জন্যে গায়িকাদের নির্দেশ দেন। কবিতাটিতে তিনি আদ জাতির খরাজনিত দুরাবস্থার বর্ণনা দিয়ে প্রতিনিধিদলকে তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার জন্য অভিযুক্ত করেন এবং তাদেরকে তাদের দায়িত্ব পালনে উৎসাহিত করেন।

তখন দলের সবাই তাদের আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন হলো। সুতরাং সকলে হারাম শরিফে গিয়ে উপস্থিত হলো এবং গোত্রের লোকেরা দোয়া করতে লাগল। দোয়া পরিচালনা করলেন কায়লা ইবনে আনায। তখন আল্লাহ সাদা, লাল ও কালো তিন ধরনের মেঘ সৃষ্টি করলেন। পরে আকাশ থেকে একটি ঘোষণা শোনা গেল, কায়লা! এ মেঘগুলোর মধ্য থেকে যে কোনো একটি তোমার নিজের এবং তোমার গোত্রের লোকদের জন্য বেছে নাও। কায়লা বলল, আমি কালোটা বেছে নিলাম। কেননা কালো মেঘে বৃষ্টি বেশি হয়। পুনরায় গায়েবি আওয়াজে তাকে জানানো হলো, তুমি ছাই-ভস্ম পছন্দ করেছ; ধ্বংসটাই বাছাই করে নিয়েছ। এ মেঘ আদ গোত্রের কাউকে রেহাই দেবে না; পিতা-পুত্র কাউকে ছাড়বে না। এটা বনু লুদিয়া ছাড়া সবাইকে ধ্বংস করবে।

বনু লুদিয়া আদ গোত্রেরই একটি শাখা। এরা মক্কায় বসবাস করত। তারা এ আযাবের আওতায় পড়ে নি। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেন, দ্বিতীয় আদ বা ছামূদ জাতি এদেরই বংশধর। তারপর কায়লা ইবনে আনায যে কালো মেঘটি পছন্দ করেছিল, আল্লাহ তা আদ গোত্রের দিকে প্রেরণ করেন। মেঘ মুগিছ নামক উপত্যকায় পৌঁছলে তা লোকদের দৃষ্টিগোচর হয়। মেঘ দেখেই তারা একে অপরকে আনন্দবার্তা পৌঁছাতে থাকে, এই তো মেঘ এসে গেছে! এখনই বৃষ্টি হবে! আল্লাহ তাআলা বলেন :

بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (٢٤) تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا

বরং এটা তো তা-ই, যা তোমরা তাড়াতাড়ি চেয়েছিলে। এটা একটা ঝঞ্ঝা। এর মধ্যে আছে মর্মন্তুদ শাস্তি। তার প্রতিপালকের নির্দেশে তা সবকিছুকে ধ্বংস করে ফেলবে। (সূরা আহকাফ : ২৪-২৫)

অর্থাৎ যেসব জিনিসকে ধ্বংস করার নির্দেশ আসবে, তা সেসব জিনিসকেই ধ্বংস করবে। এ মেঘ যে আসলে একটা ঝঞ্ঝাবায়ু এবং তার মধ্যে শাস্তি লুকিয়ে আছে। তা

সর্বপ্রথম ফাহদ নাম্নী আদ গোত্রীয় এক মহিলার চোখে ধরা পড়ে। তা স্পষ্টভাবে দেখতে পেয়েই সে চীৎকার করে বেহুঁশ হয়ে পড়ে। চেতনা ফিরে আসার পর লোকজন বলল, 'ফাহদ! তুমি কী দেখেছিলে?' সে বলল, 'দেখলাম একটা ঝঞ্ঝাবায়ু! তার মধ্যে যেন অগ্নিশিখা জ্বলছে! তার অগ্রভাগে কয়েকজন লোক তা ধরে টেনে আনছে।'

তারপর আল্লাহ তাআলা তাদের উপর সে আযাব একটানা সাত রাত ও আট দিন পর্যন্ত অব্যাহত রাখেন। চিরদিনের জন্য তারা সমূলে ধ্বংস হয়ে যায়। তাদের একজন লোকও অবশিষ্ট থাকে নি। হূদ আ. মুমিনদের সঙ্গে নিয়ে একটি প্রাচীর বেষ্টিত স্থানে চলে যান। এ ঝড়ের আঘাত তাদের স্পর্শ করে নি বরং সে বাতাসের স্পর্শে তাঁদের ত্বক আরো কোমলতা লাভ করে এবং তাঁদের মনে স্ফূর্তি আসে। অথচ ঝঞ্ঝাবায়ু আদ সম্প্রদায়ের ওপরে আসমান-জমিন জুড়ে আঘাত হেনেছিল এবং পাথর নিক্ষেপ করে তাদেরকে বিনাশ করেছিল। ইবনে ইসহাক রহ. এ ঘটনা বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন।

হযরত হূদ আ.-এর ওফাত

আরববাসী হযরত হূদ আ.-এর ওফাত এবং তাঁর কবর সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকারের দাবি করে থাকে। হাযরা মাউতের অধিবাসীরা দাবি করে, আদ সম্প্রদায় বিধ্বস্ত হওয়ার পর তিনি হাযরা মাউতের দিকে হিজরত করে চলে আসেন এবং সেখানেই তাঁর ইনতেকাল হয় আর ওয়াদিয়া বারহুতের কাছে হাযরা মাউতের পূর্বাংশে 'তারিম' শহরের প্রায় দুই মাইলের মাথায় তাঁকে দাফন করা হয়।

হযরত আলি রাযি. থেকে এক রেওয়ায়েত আছে, তাঁর কবর হাযরা মাউতে 'কাসিরে আহমার' অর্থাৎ লালটিলার চূড়ায় অবস্থিত এবং তার শিয়রে একটি ঝাউগাছ দণ্ডায়মান।

ফিলিস্তিনবাসীরা বলেন, তিনি ফিলিস্তিনে সমাহিত হয়েছেন। তারা সেখানে তাঁর কবর পাকা করে রেখেছে এবং সেখানে বার্ষিক ওরসও করে থাকে। কিন্তু এ রেওয়ায়েতগুলোর মধ্যে হাযরা মাউতের রেওয়ায়েতটিই শুদ্ধ বলে ধারণা হয়। কেননা কওমে আদের বস্তিগুলো হাযরা মাউতের কাছে ছিল। সুতরাং স্থানীয়দের ভাষ্যমতে বুঝা যায়, আদ সম্প্রদায়ের ধ্বংসের পর হযরত হূদ আ. কাছের বস্তিগুলোতেই অবস্থান করে থাকবেন এবং সেখানেই ইহকাল ত্যাগ করে থাকবেন। আর তা হাযরা মাউত-ই।

উপদেশমূলক দৃষ্টান্ত

যে ব্যক্তি আদ সম্প্রদায়ের ঘটনা পাঠ করবে, তার চোখের সামনে এমন একটি সত্তার কল্পনা এসে যাবে, যিনি গাম্ভীর্য ও দৃঢ়তার এক মূর্তপ্রতীক এবং যার চেহারা মুবারকে ভদ্রতা সুস্পষ্ট। তিনি যা কিছু বলেন, তা পূর্বেই ওজন করে নেন; পরিণাম ভালো না মন্দ হবে, তা চিন্তা করে নেন এবং কওমের কঠোর ও কর্কশ ব্যবহার ও ঠাট্টা-বিদ্রুপের জবাব ধৈর্যের সঙ্গে প্রদান করেন। অকপটতা ও নেকনিয়ত তার ললাট হতে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। অথচ তাঁর কওম তাকে বলল : "নিঃসন্দেহে আমরা তোমাকে নির্বোধ দেখছি এবং নিঃসন্দেহে আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদীদের মধ্যে গণ্য করছি।" কিন্তু হযরত হূদ আ. তাদেরকে ভারি দরদমাখা জবাবই দিলেন :

يَاقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٦٧) أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ (٦٨)

"হে আমার কওম! আমি নির্বোধ নই বরং আমি রাব্বুল আলামিনের কাছ থেকে প্রেরিত রাসূল। তোমাদের কাছে আমার রবের পয়গাম পৌঁছে দিচ্ছি এবং আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত হিতাকাঙ্ক্ষী।"

সুতরাং বুঝা যাচ্ছে, আল্লাহ পাকের মনোনীত বান্দা যখন কারো কল্যাণ কামনা করেন এবং বাঁকা পথের পথিকদের সরল পথে আনার জন্য উপদেশ প্রদান করেন, তখন তাঁর অন্তর্দৃষ্টি নির্বোধ লোকদের অর্থহীন উক্তি, ঠাট্টা-বিদ্রুপ এবং হীন প্রতিপন্ন করার কোনো পরোয়া করেন না। অন্তরে ব্যথা ও দুঃখ নিয়ে সত্য প্রচার হতে মুখ ফিরিয়ে নেন না বরং চরিত্র মাধুর্য, নম্রতা এবং দয়ার সঙ্গে আধ্যাত্মিক রোগীদের চিকিৎসায় মগ্ন থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে তারা তাদের এ নসিহত ও কল্যাণ কামনার জন্য কওমের কাছ থেকে কোনো বিনিময়ের প্রত্যাশা করেন না। তাই বলে তাঁর জীবনের এ পরিশ্রম পারিশ্রমিক শূন্য কিংবা বদলা শূন্য নয়। যেমন কোরআনে ঘোষিত হয়েছে :

لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ

"আর আমি তোমাদের কাছে এই নসিহতের জন্য কোনো বিনিময় চাই না। আমার বিনিময় তো কেবল আল্লাহ পাকের দায়িত্বেই রয়েছে।"

হযরত নূহ আ. বড় মহব্বতের সঙ্গে আপন কওমকে আল্লাহ পাকের একত্ববাদের প্রতি ঈমান আনার প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন। তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন চিরস্থায়ী নেয়ামতসমূহের কথা এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ভবিষ্যতের জন্য; কিন্তু হতভাগ্য কওম কোনো প্রকারেই তাঁর কথা মেনে নিল না।

এর কারণ হলো, তাদের মূর্খতাসুলভ আকিদা অর্থাৎ পূর্বপুরুষদের রসম-রেওয়াজ, তাদের নিজ হাতে গড়া মূর্তিসমূহের বিরুদ্ধে যে ব্যক্তি আওয়াজ তুলবে, সে-ই উক্ত মূর্তিসমূহের অভিশাপে পতিত হবে। এ মূর্খ আকিদা পোষণকারী প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ব্যবহারই তাদের কাছে প্রেরিত নবী ও রাসূল আ.-এর সঙ্গে এরূপ হয়েছে।

সকল নবী-রাসূলগণের একটি উত্তম আদর্শ রীতি ছিল, তাবলিগ এবং সত্য প্রচারের পথে যত মন্দ ব্যবহারই আসুক না কেন, তার বদলা সর্বোত্তম ব্যবহার দ্বারা দেওয়া। কর্কশ ও কঠোর কথার উত্তর মধুরবাণী দ্বারা প্রদান। তারা স্বজাতিকে অবিরত পাপাচার ও অবাধ্যতার উপর আল্লাহর বিধান এবং ভবিষ্যতের ভয়াবহ পরিণামের ব্যাপারে সতর্ক করে দিতেন। অনবরত দাওয়াত ও তাবলিগের পরও কোনো সম্প্রদায় যখন চূড়ান্তভাবে অবাধ্যতা ও হঠকারিতা প্রদর্শন করে, তখন তাদের ওপর পতিত হয় আল্লাহর ক্রোধ ও গজব। ধরাপৃষ্ঠ থেকে তাদের অস্তিত্ব মুছে যায়, অন্য কোনো সম্প্রদায়কে তাদের

স্থূলাভিষিক্ত করে দেয়। যেমন হযরত নূহ আ. ও হযরত হূদ আ.-এর সম্প্রদায়ের ঘটনাই এর বাস্তব এবং উপদেশমূলক দৃষ্টান্ত। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তার অবাধ্যতার ক্রোধ থেকে রক্ষা করুন। আমিন।

হযরত হূদ আ. সম্পর্কে কিছু তথ্য

- হযরত হূদ আ. আজ থেকে ৬ হাজার বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন।
- তাঁর জন্মস্থানের বর্তমান নাম আহকাব বা উবার নগরী।
- হযরত হূদ আ. আদ জাতির সর্বাপেক্ষা সম্মানিত শাখা 'খুলদ'-এর একজন ছিলেন।
- তিনি সাদা-লাল বর্ণের এবং গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন। তাঁর দাড়ি সুদীর্ঘ ছিল।
- তাঁর কবর হাযরা মাউতের কাসিরে আহমার অর্থাৎ লাল টিলার চূড়ায় অবস্থিত।
- তিনি নূহ আ.-এর পুত্র শামের বংশধর বনি আদ গোত্রকে আল্লাহর পথে দীনের দাওয়াত দেন।
- আদ জাতির রাজধানী ছিল ইয়ামেন।
- বনি আদ গোত্রকে আমালিকা সম্প্রদায়ও বলা হয়।
- আদ শব্দের অর্থ উচ্চ।
- সময়ের স্বৈরাচারী বাদশা শাদ্দাদকে তিনি দীনের দাওয়াত দিয়েছিলেন।
- এ জালিম বাদশা শাদ্দাদই ইয়ামান প্রদেশে বেহেশত তৈরি করেছিল।

হযরত সালেহ আ.

হযরত সালেহ আ.-এর বংশ পরিচয়

ওলামায়ে কেরাম হযরত সালেহ আ.-এর বংশ পরিচয় বর্ণনায় একাধিক মত পেশ করেছেন। হাফেযে হাদিস ইমাম বাগাবি রহ. তাঁর বংশ পরিচয় বর্ণনা করেছেন : "সালেহ ইবনে ওবাইদ ইবনে আসেক ইবনে মাশেহ ইবনে উবাইদ ইবনে হাদের ইবনে সামুদ"। বিখ্যাত তাবেয়ি হযরত ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ বলেছেন : সালেহ ইবনে উবাইদ ইবনে জাবের ইবনে সামুদ।

বাগাবি রহ. কালক্রমের হিসাবে ওহাব রহ.-এর চেয়ে অনেক পরবর্তীকালের লোক। ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ তাওরাতের বড় আলেমও বটে। তবুও হযরত সালেহ আ. থেকে সামুদ পর্যন্ত যে সমস্ত যোগসূত্র বাগাবি রহ. বলছেন, নসব সম্বন্ধীয় আলেমদের কাছে তা-ই ঐতিহাসিক দিক দিয়ে প্রবল এবং সত্যসংলগ্ন। এই নসবনামা হতে পরিষ্কার হয়ে যায়, সেই কওমটিকে– যার মধ্যে হযরত সালেহ আ.ও একজন, সামুদ এ জন্য বলা হয়, সেই বংশের আদি পুরুষের নাম সামুদ এবং এ কওম বা গোত্র তার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। সামুদ হতে হযরত নূহ আ. পর্যন্ত নসবনামা সম্বন্ধে একাধিক মত রয়েছে। (১) সামুদ ইবনে আমের ইবনে এরাম ইবনে সাম ইবনে নূহ আ. (২) সামুদ ইবনে আদ ইবনে আওছ ইবনে এরাম ইবনে সাম ইবনে নূহ আ.।

সাইয়েদ মাহমুদ আলুসি রহ. তাফসিরে রূহুল মাআনিতে (৯/১৪২) বলেন : 'ইমাম সালাবি দ্বিতীয় মতটিকে প্রবল মনে করেন।'

যা হোক। দুনো রেওয়ায়েতের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়, সামুদ সম্প্রদায়ও সামের বংশধরগণের একটি শাখা। এবং নিশ্চিত করেই বলা যায়, এরাই সে সমস্ত লোক, যারা ১ম আদ সম্প্রদায় বিধ্বস্ত হওয়ার কালে হযরত হুদ আ.-এর সঙ্গে রক্ষা পেয়েছিল এবং এ বংশই দ্বিতীয় আদ নামে পরিচিত। আর নিঃসন্দেহে এ কওমই "আরবে বায়েদাহ" বা বিধ্বস্ত আরব বংশ এর অন্তর্গত।

সামুদ একটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ জাতি। তাদের পূর্ব-পুরুষ 'সামুদ' এর নামানুসারে এ জাতির নামকরণ করা হয়েছে। সামুদের এক ভাই ছিল জুদায়স। তারা উভয়ে আবির ইবনে ইরাম ইবনে সাম ইবনে নূহ–এর পুত্র। এরা ছিল আরবে আরিবা তথা আদি আরব সম্প্রদায়ের লোক। হিজায ও তাবুকের মধ্যবর্তী 'হিজর' নামক স্থানে তারা বসবাস করত। তাবুক যুদ্ধে যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ পথ দিয়ে অতিক্রম করেছিলেন। এর বর্ণনা পরে আসছে। আদ জাতির পর সামুদ জাতির অভ্যুদয় ঘটে। তাদের মতো এরাও মূর্তিপূজা করত। এদের মধ্য থেকে আল্লাহ তাঁর এক বান্দা সালেহ আ. কে রাসূলরূপে প্রেরণ করেন। তাঁর বংশ তালিকা হচ্ছে : 'সালেহ ইবনে আবদ ইবনে মাসিহ ইবনে উবায়দা ইবনে হাজির ইবনে সামুদ ইবনে

আবির ইবনে ইরাম ইবনে সাম ইবনে নূহ আ.। তিনি তাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদত করতে, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক না করতে এবং মূর্তিপূজা ও শিরক বর্জনের নির্দেশ দেন। ফলে কিছুসংখ্যক লোক তাঁর প্রতি ঈমান আনে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই কুফরিতে লিপ্ত থাকে এবং কথায়-কাজে তাঁকে কষ্ট দেয়। এমনকি একপর্যায়ে তাঁকে হত্যা করতেও উদ্যত হয়। তারা নবীর সেই উটনীটিকে হত্যা করে ফেলে, যা আল্লাহ তাআলা নবুওয়াতের প্রমাণস্বরূপ প্রেরণ করেছিলেন।

সামুদ গোত্রের বস্তিসমূহ

কওমে সামুদ কোথায় বাস করত এবং ভূ-পৃষ্ঠের কোন অংশে ছড়িয়ে পড়েছিল, এ সম্পর্কে মীমাংসিত কথা হলো, তাদের বসতিগুলো 'হিজর' নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। হেজায ও সিরিয়ার মধ্যস্থলে ওয়াদিউল কোরা পর্যন্ত যেই প্রান্তরটি দেখা যায়, এই সমুদয়ই তাদের বাসস্থান ছিল। বর্তমানে ফাজজুন-নাকাহ নামে প্রসিদ্ধ। কওমে সামুদের বসতিসমূহের ধ্বংসাবশেষ এবং এর চিহ্নসমূহ আজও দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। এ কালেও কোনো কোনো মিসরীয় তত্ত্বজ্ঞানীরা তা স্বচক্ষে দর্শন করেছেন। তাঁদের বর্ণনা মতে, তাঁরা এমন একটি বাড়িতে প্রবেশ করেছিলেন, যাকে 'শাহি হাবিলি' অর্থাৎ রাজপ্রসাদ বলা হতো। তাতে বহু কামরা রয়েছে। প্রাসাদের সঙ্গে একটি বিরাট হাউজ রয়েছে। গোটা বাড়িটি পাহাড় কেটে নির্মিত।

আরবের বিখ্যাত ঐতিহাসিক মাসউদি লিখেছেন :

وَرِمَنُهُمْ بَاقِيَةٌ وَاٰثَارُهُمْ بَادِيَةٌ فِىْ طَرِيْقِ مَنْ وَرَدَ مَنَ الشَّامِ (ج ٣ ص ١٣٩)

"যারা সিরিয়া থেকে হেজাযে আগমন করেন, রাস্তায় কওমে সামুদের বিধ্বস্ত বসতিসমূহের ভগ্নাবশেষ এবং তার পুরাতন চিহ্নসমূহ তাদের দৃষ্টিগোচর হয়।"

হিজরের এ স্থানটি– যা হিজরে সামুদ বলে পরিচিত– মাদায়েন শহর থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এমনভাবে অবস্থিত, 'আকাবা' উপসাগর তার সম্মুখে পড়ে। আদ সম্প্রদায়কে যেমন 'আদে এরাম' বলা হয়েছে, (এমনকি কোরআন মাজিদ তো 'এরাম' শব্দটিকে তাদের স্বতন্ত্র বিশেষণ বানিয়ে দিয়েছে।) তেমনি আদে এরামের ধ্বংসের পরবর্তী সম্প্রদায়কে 'সামুদেদ-এরাম' বা দ্বিতীয় আদ বলা হচ্ছে।

প্রাচ্যবিদগণ (পাশ্চাত্যের সে সমস্ত জ্ঞানীবৃন্দ যারা প্রাচ্যের জ্ঞানবিজ্ঞান ও ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা করে থাকেন) প্রাচ্য বিশেষত আরব সম্বন্ধে যেমন নিজেদের ঐতিহাসিক জ্ঞানের গভীরতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে গিয়ে তত্ত্বজ্ঞানের নামে ভুল বিবরণ পরিবেশনে অভ্যস্ত, তদ্রুপ তারা সামুদ সম্প্রদায়কেও নিজেদের অনুশীলনীর শ্লেট বানিয়েছে। তাদের প্রশ্ন হলো সামুদের মূল কী এবং কোথায়? তাদের আবির্ভাব কখন এবং কোন যুগে হয়েছে? এ প্রশ্নের উত্তরে তারা দুই দলে বিভক্ত হয়েছে। একদল বলে, এরা ইহুদিদের একটি সম্প্রদায় ছিল, যারা ফিলিস্তিনে প্রবেশ করে নি।

ঐতিহাসিকরা এ কথায় একমত, সামুদ সম্প্রদায়ের লোকেরা জনবসতি থেকে বের হয়ে যাওয়ার আগেই ধ্বংস হয়ে গেছে। তাদের সমূলে ধংবস করে দেওয়া হয়েছিল। কোরআন মাজিদ পরিষ্কার ভাষায় বর্ণনা করছে : যখন মূসা আ. কে ফেরাউন ও তার কওম অবিশ্বাস করল, তখন ফেরাউনের বংশের একজন মুমিন ব্যক্তি এ কথা বলে নিজ কওমকে ভয় প্রদর্শন করেছিল, 'তোমাদের এই মিথ্যাচারিতার পরিণাম যেন এমন না হয়, যা তোমাদের পূর্বে নূহ আ. আদ ও সামুদের এবং তাদের পরবর্তী সম্প্রদায়সমূহের নিজ পয়গম্বরদের সঙ্গে মিথ্যাচারিতার কারণে হয়েছিল।'

ঐতিহাসিকদের এক দল বলেন, সামুদ সম্প্রদায় ছিল আমালেকা সম্প্রদায়ের একটি শাখা। তারা ফোরাতের পশ্চিম তীরের বসতি ত্যাগ করে এখানে এসে বসতি স্থাপন করেছিল।

তাদের মধ্যে কারো কারো ধারণা, এরা সেই আমালেকা সম্প্রাদায়ের একটি দল, যাদেরকে মিসরের বাদশাহ্ আহমাস তৎকালে মিসর হতে বের করে দিয়েছিল। যেহেতু মিসরে অবস্থানকালে তারা পাথর কেটে গৃহনির্মাণ শিল্প আয়ত্ত করেছিল। তাই হিজর নামক স্থানে গমন করে পাহাড় ও পাথরসমূহ কেটে কেটে তারা অনুপম প্রাসাদসমূহ নির্মাণ করল এবং সাধারণ প্রচলিত নিয়মেও বিরাট অট্টালিকা নির্মাণ করল।

কিন্তু আমরা আদ সম্প্রদায়ের ঘটনায় প্রমাণ করে এসেছি, আদ ও সামুদ উভয় সম্প্রদায়ই সামের আওলাদভুক্ত। আরবরা ইহুদিদের ভুল অনুসরণে এদেরকে আমালেকা সম্প্রদায়ভুক্ত বলে ফেলে। অথচ আমলিক ইবনে উদ্দের সঙ্গে এ বংশের কোনো সম্পর্কই পাওয়া যায় না। অতএব এরূপ বলাও ঠিক নয়।

এ সমস্ত মতের বিপরীত প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানীদের মতে, এরা হূদ আ.-এর কালে বিধ্বস্ত সম্প্রদায়েরই অবশিষ্ট লোক। যারা হযরত হূদ আ.-এর সাথে হাযরা মাউতবাসীদের দাবি, সামুদ সম্প্রদায়ের বসতি ও অট্টালিকাগুলো আদ সম্প্রদায়ের কারিগরি ও শিল্পবিদ্যার উৎকর্ষতার ফল। সামুদ সম্প্রদায় অট্টালিকা নির্মাণ শিল্পে বিশেষ দক্ষ ও পারদর্শী ছিল এবং তাদের কালের এই অট্টালিকগুলি তাদের নিজেদেরই নির্মিত এ দাবির বিপরীত নয়। কেননা প্রথম আদ ও দ্বিতীয় আদ সর্বাবস্থায় আদই বটে। হযরত সালেহ্ আ. নিজ কওমকে এরূপ সম্বোধন করাও তা-ই প্রমাণ করে :

وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا
وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

"আর স্মরণ কর, আল্লাহ্ পাক যখন আদ জাতির পর তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করলেন এবং তোমাদেরকে যমিনে আবাস দিলেন। তোমরা তার সমতল ভূমিতে প্রাসাদ নির্মাণ করছ এবং পাহাড় কেটে বাড়ি বাড়ি বানাচ্ছ। সুতরাং তোমরা আল্লাহর নেয়ামতসমূহকে স্মরণ কর এবং যমিনে ফাসাদকারীরূপে ঘুরে বেড়িয়ো না।"

(সূরা আরাফ : ৭৪)

বাকি রইল সামুদ সম্প্রদায়ের যুগ সম্বন্ধীয় বিষয়টি। এ সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোনো সময়ের কথা বলা যায় না। কেননা ইতিহাস এ সম্বন্ধে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারে নি। অবশ্য এ কথা নিশ্চিতরূপে বলা যেতে পারে, এদের যুগ হযরত ইবরাহীম আ.-এর পূর্বেকার যুগ। এরা এ মহান মর্যাদার অধিকারী পয়গম্বরের নবুয়তের বহু পূর্বে ধ্বংসপ্রাপ্তা হয়েছিল।

এটাও লক্ষণীয়, সামুদ সম্প্রদায়ের বসতিগুলোর কাছে এমন কতগুলো কবর দেখা যায়, যার উপর 'আরমি' ভাষায় লিখিত ফলক সংযোজিত রয়েছে। সেই ফলকসমূহে যে তারিখ খোদিত রয়েছে, তা হযরত ঈসা আ.-এর জন্মের পূর্বের। অতএব এতে এই ভুল ধারণা জন্মে, এ সম্প্রদায়টি হযরত মূসা আ.-এর পরে অস্তিত্ব লাভ করেছে। অথচ ব্যাপারটি এরূপ নয়।

এগুলো আসলে ওই সমস্ত লোকের কবর, যারা এ কওম ধ্বংস হওয়ার হাজার হাজার বছর পরে অবলীলাক্রমে এখানে বসতি করেছিল। তারা স্বীয় পূর্বপুরুষদের প্রাচীনতার নিদর্শন প্রকাশ করার উদ্দেশ্য 'আরামী' অক্ষরে (যা বহু প্রাচীন যুগের প্রচলিত অক্ষর) নিজেদের ফলকসমূহে লিখে লাগিয়ে দিয়েছিল। যেন প্রাচীনকালের স্মৃতি রক্ষিত থাকে। অন্যথায় সেই কবরগুলি সামুদ সম্প্রদায়েরও নয় এবং তাদের যুগও এটা ছিল না।

মিসরের ঐতিহাসিক 'জোর্জিযায়দান' রচিত "আল-আরব কাবলাল ইসলাম" গ্রন্থে প্রায় অনুরূপ লিখেছেন :

"কবরসমূহের নামফলক পাঠ করলে যা-কিছু প্রকাশ পায়, তা হলো– সালেহ আ.-এর কওমের বসতিসমূহ ঈসা আ.-এর জন্মের কিছুকাল আগে নাবতীদের ক্ষমতাধীন হয়ে গিয়েছিল। এরা 'বাতরা' নামক স্থানের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। (সামনে তাদের আলোচনা আসবে।) তাদের বসতির চিহ্ন ও টিলাসমূহ প্রাচ্যবিদ্যায় আগ্রহী বহু ইউরোপীয় ঐতিহাসিক স্বচক্ষে দেখেছেন। সামুদ সম্প্রদায়ের পরিচয়পত্র তারা পাঠ করেছেন, যা পাথরসমূহের ওপর খোদিত ছিল। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ সেই প্রাসাদের ভগ্নাবশেষগুলো, যা কেলআত ও বুরজ নামে নামস্কৃত। এ সব যা কিছু লেখা হয়েছে, তা নাবতি অক্ষরে লিখিত। এগুলোর কোনো কোনোটি কিংবা সবগুলোতে সেই লেখাই বিদ্যমান, যা বিভিন্ন কবরের উপরে লিখিত বা খোদিত রয়েছে।"

প্রাচ্যবিদ ঐতিহাসিকগণ এখানে যা কিছু পেয়েছেন, তন্মধ্যে একটি কবরফলক নাবতী অক্ষরে পাথরে খোদিত হযরত ঈসা আ.-এর জন্মের পূর্বেকার লেখা। বাক্যগুলোর অর্থ হলো : "মকবারা কুমকুম বিনতে ওয়ায়েলাহ বিনতে হারাম"। কুমকুমের মেয়ে কালিবা নিজের ও নিজের সন্তানের জন্য নির্মাণ করিয়েছে। এর নির্মাণকাজ মোবারক মাসে শুরু করা হয়েছে। এটা নাবতিদের বাদশা হারেসের সিংহাসন আরোহণের নবম বর্ষ। তিনি সেই হারেস, যিনি নিজ গোত্রের প্রতি সত্যিকারের মহব্বত রাখেন।

"على ذوالشرى وعرشة"? بِلَ (ফলকে লেখা এ আরবি বাক্যটি পরিষ্কার পড়া যায় নি বলে শব্দগুলো অবিকল উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।) লাত মানাত আমান্দ ও কায়সের লানত তার প্রতি, যে এ কবরগুলো বিক্রয় করবে। বা দায়বদ্ধ রাখবে। কিংবা তা হতে কোনো দেহ বা অঙ্গ বের করবে কিংবা এখানে কুমকুম, কালিবা বা তার কন্যা কিংবা তার সন্তানদের ছাড়া অন্য কাউকে দাফন করবে।

আর যে ব্যক্তিই এর উপর লিখিত বিষয়ের বিপরীত করবে, তার উপর 'যুশ শরা, হোবাল ও মানাতের পাঁচটি লানত হোক। আর যে যাদুকর এর বিপরীত করে তার ওপর এক হাজার হাবসি দিরহাম জরিমানা ওয়াজিব হবে। কিন্তু যদি তার হাতে কুমকুম, কালিবা বা তার আওলাদের মধ্য হতে কারো হাতের লিপিকা থাকে, যাতে এ অনাত্মীয় কবরের জন্য পরিষ্কার ও স্পষ্ট কথায় অনুমতি বিদ্যমান থাকে এবং আসল হয়, নকল না হয় (তবে এ জরিমানা ওয়াজিব হবে না)। এ সমাধিস্থান ওয়াহবুল্লাহ ইবনে উবায়দা নির্মাণ করেন।

আল্লাহ তাআলার উটনী

হযরত সালেহ আ. বারবার তাঁর কওমকে বুঝাতে থাকলেন। তাঁর নসিহত কওমের ওপর কোনোই ক্রিয়া করল না। বরং তাদের শত্রুতা ও বিরোধিতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পেতে থাকল। তারা কোনো প্রকারেই মূর্তিপূজা থেকে হতে বিরত হলো না। যদিও দুর্বল ও নগণ্য একটি দল ঈমান আনয়ন করল এবং মুসলমান হলো, কিন্তু কওমের নেতৃস্থানীয় বড় বড় লোকেরা আগের মতো মূর্তিপূজার ওপরই অবিচল রইল। তারা খোদাপ্রদত্ত সর্বপ্রকারের স্বচ্ছলতা ও শান্তির শোকরগুযারি করার বদলে নেয়ামতের না-শোকরি করাকে নিজেদের অভ্যাসে পরিণত করে নিল। তারা হযরত সালেহ আ.-কে বিদ্রুপ করে বলত, আমরা যদি ধর্মে অবিশ্বাসীই হতাম এবং পছন্দনীয় পন্থার উপর প্রতিষ্ঠিত না হতাম, তবে আমরা এত প্রচুর ধন-সম্পদ, সবুজ-শ্যামল বাগানসমূহ, সোনা-রূপার প্রাচুর্য, সুউচ্চ ও সুদৃঢ় আলিশান অট্টালিকা ও নহরসমূহ এবং উত্তম নানা জাতীয় সুস্বাদু ফলমূলসমূহ, মিঠাপানির নহর এবং উত্তম চারণভূমিসমূহ পেতাম না। তুমি তোমার নিজেকে এবং তোমার অনুসারীদের দেখ! এরপর তাদের সঙ্কীর্ণ ও দারিদ্র্যপূর্ণ অবস্থার প্রতি লক্ষ কর। এবং বল, আল্লাহর প্রিয় ও মকবুল কারা! আমরা না তোমরা?

হযরত সালেহ আ. বলতেন, তোমরা নিজেদের এই আরাম ও আনন্দময় জীবিকার সাজসরঞ্জামের জন্য গর্ব প্রকাশ করো না। আল্লাহ পাকের সত্য রাসূল এবং তাঁর সত্য ধর্মের সঙ্গে বিদ্রুপ করো না। যদি তোমাদের গর্ব, অহঙ্কার ও বিরোধিতার অবস্থা এরূপই থাকে, তবে এক নিমিষে এর সবকিছুই বিলীন হয়ে যাবে। এরপর তোমরাও থাকবে না এবং তোমাদের এ সমস্ত সাজ-সরঞ্জামও থাকবে না। নিঃসন্দেহে এই সমস্তই আল্লাহ পাকের নেয়ামত। যে ব্যক্তি এ সমস্ত নেয়ামত পেয়েও আল্লাহর শোকর আদায়

করে না, তাঁর ইবাদত করে না, নিঃসন্দেহে এগুলোই তার জন্য আযাব ও লানতের কারণ হয়ে যায়। যদি এ নেয়ামত প্রাপ্তিতে গর্ব ও অহঙ্কার করা হয়। সুতরাং এরূপ মনে করা নিতান্ত ভুল, প্রত্যেক আনন্দময় জীবিকার সরঞ্জাম আল্লাহ্ পাকের খুশি থাকার ফল।

কওমে সামুদ এ ভাবনায় পেরেশান ছিল, এটা কীভাবে সম্ভব, আমাদেরই মধ্যকার একজন লোক আল্লাহ তাআলার পয়গম্বর হবেন! সে আল্লাহর আহকাম শুনাতে আরম্ভ করবেন? তারা অত্যন্ত বিস্ময়ের সাথে বলত :

أَنُزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا

"আমরা বিদ্যমান থাকতে কি এ লোকটির ওপর আল্লাহর উপদেশগ্রন্থ নাযিল হয়?"

অর্থাৎ মানুষকেই যদি নবী করা হতো, তবে এর যোগ্য ছিলাম আমরা, সালেহ নয়। আবার কোনো কোনো সময় নিজেদের কওমের দুর্বল লোকদেরকে যারা মুসলমান হয়েছিল, তাদের লক্ষ করে বলত :

أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ

"সত্যই কি তোমরা বিশ্বাস কর, নিঃসন্দেহে সালেহ তাঁর রবের প্রেরিত রাসূল?"

قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ

"আর মুসলমানগণ উত্তর করত, নিঃসন্দেহে আমরা তাঁর আনীত পয়গামের ওপর বিশ্বাস রাখি।" (সূরাতুল আরাফ : ৭৫)

তখন সেই অহঙ্কারী নেতারা ক্রোধান্বিত হয়ে বলত :

إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ

"নিঃসন্দেহে আমরা তো ওই বস্তুকে অবিশ্বাস করছি, যার উপর তোমরা ঈমান আনয়ন করেছ।" (সূরাতুল আরাফ : ৭৬)

হযরত সালেহ আ.-এর কওম তাঁর নবীসুলভ তাবলিগ ও নসিহতকে মেনে নিতে অস্বীকার করল। তারা তাঁর কাছে আল্লাহ পাকের মেজেযা (কুদরতি নিদর্শন) দাবি করল। সালেহ আ. আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করলেন। দোয়া কবুল হওয়ার পর তিনি কওমকে বললেন, তোমাদের দাবিকৃত নিদর্শন (মোজেযা) উষ্ট্রীর আকারে এই যে উপস্থিত। যদি তোমরা এই উষ্ট্রীকে কোনো প্রকার কষ্ট প্রদান কর, তবে এটাই তোমাদের ধ্বংসের আলামত বলে সাব্যস্ত হবে। আল্লাহ তাআলা তোমাদের ও উষ্ট্রীটির মধ্যে কূপের পানির জন্য পালা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। একদিন তোমাদের, একদিন উটনীর। এর ব্যতিক্রম যেন না হয়।

কোরআন মাজিদে এটিকে نَاقَةُ اللهِ (আল্লাহর উটনী) বলা হয়েছে। যেন তাদের স্মরণে থাকে, এমনি তো সমস্ত মাখলূকই আল্লাহ তাআলার অধীন; কিন্তু ছামুদ

সম্প্রদায় যেহেতু এটিকে আল্লাহ পাকের একটি নিদর্শনস্বরূপ দাবি করেছিল। তাই এর বর্তমান বৈশিষ্ট্য এবং মর্যাদা একে "নাকাতুল্লাহ" নামে ভূষিত করল।

কোরআন মাজিদ থেকে এ প্রসঙ্গে শুধু দুটি বিষয় প্রমাণিত হয়। প্রথমত সামুদ সম্প্রদায় হযরত সালেহ আ.-এর কাছে নিদর্শন-মোজেযা চেয়েছিল। হযরত সালেহ আ. 'উটনী'টিকে মোজেযা স্বরূপ পেশ করলেন। দ্বিতীয়ত, হযরত সালেহ আ. কওমকে বলে দিয়েছিলেন, তারা যেন উটনীটির কোনো ক্ষতি না করে। আর তাদের ও উটনীটির পানি পানের পালা নির্ধারণ করে দেন। একদিন উটনীর, একদিন কওমের। যদি তারা উটনীটির কোনো ক্ষতি করে, তবে তাই হবে কওমের ধ্বংস হওয়ার সূচনা ও নিদর্শন। কিন্তু তারা উটনীটি হত্যা করল। এবং আল্লাহর আযাব দ্বারা নিজেরাও ধ্বংস হলো।

এ ঘটনা সম্পর্কে এর চেয়ে অতিরিক্ত যা কিছু রয়েছে, তার ভিত্তি হয়তো ওই সমস্ত হাদিসের ওপর, যা "খবরে ওয়াহেদ" (অর্থাৎ রেওয়ায়েতের ধাপসমূহের কোনো একটি ধাপে মাত্র একজন রাবি কর্তৃক রেওয়ায়েতকৃত হাদিসসমূহের পর্যায়ভুক্ত) বা বাইবেল ও প্রাচীন ইতিহাসের রেওয়ায়েতগুলোর ওপর। যতটুকু বিবরণ 'খবরে ওয়াহিদগুলো থেকে পাওয়া যায়, মুহাদ্দিসিনের মতে তার কোনো কোনোটি সহি, কোনো কোনোটি দুর্বল হাদিস। এ কারণে হাফেয ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসির সূরা আরাফের তাফসিরে 'নাকতুল্লাহ' অস্তিত্বপ্রাপ্ত হওয়া সম্বন্ধীয় রেওয়ায়াতগুলোকে সনদ রেওয়ায়েত করার নিয়ম অনুযায়ী উদ্ধৃত করেন নি। বরং একটি ঐতিহাসিক ঘটনারূপে লিপিবদ্ধ করেছেন।

ঘটনাটির বিস্তৃত বিবরণ হলো– হযরত সালেহ আ. যখন ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন, তখন নেতৃস্থানীয়রা কওমের লোকদের সামনে হযরত সালেহ আ.-এর কাছে দাবি করল– হে সালেহ! যদি তুমি বাস্তবিকই আল্লাহর প্রেরিত রাসূল হও, তবে কোনো নিদর্শন দেখাও! যাতে আমরা তোমার সত্যতা বিশ্বাস করতে পারি। হযরত সালেহ আ. বললেন : এমন যেন না হয়, নিদর্শন আসার পরেও অবিশ্বাসের উপরই হঠকারিতা এবং অবাধ্যতাচরণ করতে থাক। কওমের নেতারা দৃঢ়তার সঙ্গে ওয়াদা করল, নিদর্শন আসলে আমরা তৎক্ষণাৎ ঈমান আনব। হযরত সালেহ আ. তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কী নিদর্শন চাও। তারা দাবি করল, সামনের এ পাহাড় থেকে একটি উষ্ট্রী বের কর, যা গর্ভবতী হবে এবং এক্ষুনি বাচ্চা প্রসব করবে। হযরত সালেহ আ. আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করলেন। তৎক্ষণাৎ পাহাড় থেকে সবার সামনে একটি গর্ভবতী উষ্ট্রী প্রকাশিত হলো এবং সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চা প্রসব করল। এ দেখে নেতৃবৃন্দের মধ্য হতে জোন্দো ইবনে আমর তো তখনই ইসলাম গ্রহণ করেন। অন্যান্য নেতারাও তাঁর অনুসরণে ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা করেন। তখন মূর্তিপূজারী অন্য সরদাররা তাদের বিরত রাখে। এরূপে তারা অন্যদেরও ইসলাম গ্রহণ করতে নিষেধ করে।

এখন হযরত সালেহ আ. কওমের সকল লোকদের সতর্ক করে বললেন, দেখ! এ নিদর্শন তোমাদের দাবির প্রেক্ষিতে প্রেরিত হয়েছে। আল্লাহ পাকের সিদ্ধান্ত হলো,

কূপের পানি পান করার জন্য পালা নির্ধারিত হোক। একদিন এ উষ্ট্রীটির আর একদিন তোমাদের ও তোমাদের প্রাণীদের। কিন্তু সাবধান! উষ্ট্রীটি যেন কোনো কষ্ট না পায়। যদি তাকে কোনো কষ্ট দেওয়া হয়, তবে তোমাদেরও মঙ্গল নেই। কওম যদিও এই বিস্ময়কর মোজেযা দেখেও ঈমান আনল না, কিন্তু মনে মনে একে মোজেযা বলেই স্বীকার করেছিল। তাই একে কষ্ট প্রদান করা থেকে বিরত রইল। অনন্তর এ প্রথাই চালু রইল, পানি পান করার পালা একদিন উষ্ট্রীটির থাকত আর সমুদয় কওমের লোকেরা এর দুগ্ধ দ্বারা উপকৃত হত। দ্বিতীয় দিবসে কওমের পালা হতো। এই উষ্ট্রীটি ও এর বাচ্চা নির্বিঘ্নে চারণভূমিতে চরে বেড়াত এবং তৃপ্তি লাভ করত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে এটাও তাদের অন্তরে বাধতে লাগল।

তাদের মধ্যে পরামর্শ হতে লাগল, উষ্ট্রীটিকে খতম করে দেওয়া হোক। তা হলে এই পালার ব্যাপারটির অবসান ঘটবে এবং আমরা ঝামেলামুক্ত হবো। কেননা আমাদের পশুগুলোর জন্য এবং আমাদের নিজেদের জন্য এই শর্তটি অসহনীয়। এরূপ কথার্বাতা চলছিল ঠিক, কিন্তু কেউই উষ্ট্রীটিকে হত্যা করতে সাহস পাচ্ছিল না।

যে লোক উটনী হত্যার দায়িত্ব গ্রহণ করে তার নাম কিদার ইবনে সালিফ ইবনে জানদা। সে ছিল সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা। সে ছিল গৌরবর্ণ, নীল চোখ ও পিঙ্গল চুল বিশিষ্ট। কথিত আছে, কিদার ছিল সালিফের যারজ সন্তান। সায়বান নামক এক ব্যক্তির ঔরসে তার জন্ম হয়।

ইবনে জারির ও প্রমুখ মুফাসসির লিখেছেন : সামুদ সম্প্রদায়ের দুই মহিলা- এক জনের নাম সাদুকা। সে মাহইয়া ইবনে যুহায়ের ইবনে মুখতারের কন্যা। মহিলা ছিল প্রচুর ধন-সম্পদ ও বংশীয় গৌরবের অধিকারী। তার স্বামী ইসলাম গ্রহণ করে। ফলে স্ত্রী তাকে ত্যাগ করে এবং নিজের চাচাতো ভাই মিসরা ইবনে মিহরাজ ইবনে মাহইয়াকে বলল, যদি তুমি উটনীটি হত্যা করতে পার, আমি তোমাকে বিবাহ করব।

অপর মহিলার নাম উনায়যা বিনতে গুনায়েম ইবনে মিজলায। তাকে উম্মে উসমান নামে ডাকা হতো। মহিলা ছিল বৃদ্ধা ও কাফের। তার স্বামী ছিল সম্প্রদায়ের অন্যতম সরদার যুওয়াব ইবনে আমর। এই স্বামীর ঔরসে তার ৪টি মেয়ে ছিল। মহিলাটি কিদার ইবনে সালিফকে প্রস্তাব দিল, সে যদি উটনীটি হত্যা করতে পারে তবে তার এ চার কন্যার মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছে বিয়ে করতে পারবে। তখন এ দুই যুবক (কিদার ও মিসরা) উটনী হত্যার দায়িত্ব গ্রহণ করে। স্থির হলো, তারা পথে ওঁৎপেতে বসে থাকবে। উটনীটি চারণভূমির দিকে গমনকালে উভয়ে আক্রমণ করবে। অন্যরা তাদের সাহায্য করবে।

পুরা কাজটা তারা চক্রান্ত মোতাবেক করল। ষড়যন্ত্র করে উটনীটিকে হত্যা করে ফেলল। এরপর পরস্পর শপথ করল, রাত হলে আমরা সবাই মিলে সালেহ ও তাঁর পরিবারের সকলকেও হত্যা করে ফেলব। এরপর তার স্বজন-বন্ধুদের শপথ করে

বিশ্বাস করাব, এটা আমাদের কাজ না। উটনীর বাচ্চাটি মায়ের হত্যাকাণ্ড দেখে পালিয়ে পাহাড়ে আরোহণ করল। এবং চিৎকার করতে করতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হযরত সালেহ আ. এ সংবাদ পেয়ে আফসুসের সঙ্গে কওমকে সম্বোধন করে বললেন, পরিশেষে তা-ই হলো, যা আমি আশঙ্কা করেছিলাম। এখন তোমরা আল্লাহ তাআলার আযাবের অপেক্ষা করতে থাক। যা তিন দিন পরে তোমাদের নিপাত করে দেবে। এরপর বিদ্যুতের চমক ও বজ্রধ্বনির আযাব এসে এক রাতেই সবাইকে ধ্বংস করে দিল এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির সবক দিয়ে গেল।

এ ঘটনার সঙ্গে ইবনে কাসির রহ. কয়েকটি হাদিস উল্লেখ করেছেন। যেমন : তাবুক যুদ্ধের সময় হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হিজর নামক স্থানে পৌছলেন, তখন সাহাবায়ে কেরাম কওমে সামুদের কূপ থেকে পানি নিয়ে তা দ্বারা আটা গুলে রুটি তৈরি করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা জানতে পেরে পানি ফেলে দিতে, হাড়ি পাতিলগুলো উপুড় করে ফেলতে এবং আটাগুলি অনুপযুক্ত করে দিতে আদেশ করলেন। আর বললেন, এটা সেই জনপদ, যার উপর আল্লাহ তাআলার আযাব নাযিল হয়েছিল। এখানে অবস্থানও করো না। এখানকার কোনো বস্তু কাজেও লাগিও না। সম্মুখে অগ্রসর হয়ে শিবির স্থাপন কর। পাছে না তোমরাও কোনো বিপদে আক্রান্ত হয়ে পড়।

অন্য রেওয়ায়েতে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : তোমরা এ হিজরের বসতিগুলোতে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে বিনয়-নম্রতার সঙ্গে রোদন করতে করতে প্রবেশ করো। নচেৎ এসব বসতিতে প্রবেশই করো না। পাছে না তোমরাও নিজেদের অসর্তকতার দরুন আযাবে পতিত হয়ে যাও।

অন্য হাদিসে আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হিজর নামক স্থানে প্রবেশ করলেন, তখন বললেন : আল্লাহ তাআলার কাছে নিদর্শন চেয়ো না। দেখ! সালেহ আ.-এর কওম নিদর্শন দাবি করেছিল। এবং সেই উটনীটি এখানকার পাহাড়ের গুহা থেকে বের হয়ে নিজের পালার দিন পানাহার করে সেখানেই চলে যেত। আর যেদিন তার পালার দিন হতো, সেদিন সামুদ সম্প্রদায়কে নিজের দুগ্ধ দ্বারা পরিতৃপ্ত করত। কিন্তু সামুদ গোত্র পরিশেষে নাফরমানি করল। তারা উটনীটির পায়ের গোছা কেটে হত্যা করে ফেলল। ফলে আল্লাহ পাক তাদের ওপর বিকট ধ্বনির আযাব চাপিয়ে দিলেন। এ আযাবের ফলে তারা নিজ নিজ ঘরের মধ্যেই মরে পড়ে রইল। কেবল আবু রাগাল নামক এক ব্যক্তি অবশিষ্ট রইল। সে হারাম শরিফে গিয়েছিল। কিন্তু যখনই সে হারামের সীমানা হতে বের হল, তখনই সেই আযাবের শিকার হলো। হাফেয ইবনে কাসির রহ. এ রেওয়ায়েত তিনটি সনদের সঙ্গে মুসনাদে আহমাদ থেকে নকল করে এগুলোকে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাস্য বলেছেন।

এ বিস্তারিত বিবরণের সারমর্ম হলো, কোরআন মাজিদ থেকে তো নিশ্চিত প্রমাণিত হলো, 'নাকতুল্লাহ' (আল্লাহ তাআলার উষ্ট্রী) আল্লাহ পাকের একটি নিদর্শন ছিল। সেটি নিজের মধ্যে অবশ্যই এমন কোনো বৈশিষ্ট্য ধারণ করত যার কারণে তাকে আল্লাহর নিদর্শন বলা যেতে পারে। কোরআন মাজিদ যাকে এরূপ গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করছে– "هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً" এই নাকাতুল্লাহ তোমাদের জন্য নিদর্শন।" এরপর পানি পান করার পালা যেভাবে উটনী ও কওমে সামুদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন, তা স্বয়ং স্বতন্ত্র একটি প্রমাণ, এ উটনীটি এমন বিশেষত্ব ধারণ করত, যা আল্লাহর নিদর্শন নামে আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য। কিন্তু এর অস্তিত্ব কিরূপ হলো? কী কারণে তা আল্লাহর নিদর্শন ও নবীর মোজেযা হলো, কোরআন মাজিদে তার কোনো উল্লেখ নেই।

অবশ্য বিভিন্ন সহি 'খবর ওয়াহেদ' দ্বারা এ ব্যাপারটির ওপর আলোকপাত হচ্ছে। যার বিবরণ ইবনে কাসির থেকে ওপরে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ঘটনাটির বিস্তৃত বিবরণ সেখানেও পরিষ্কার বর্ণিত হয় নি। বরং তাফসিরের কিতাবসমূহে ইসরাইলি রেওয়ায়েত থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে কিংবা হাদিসের দুর্বল রেওয়ায়েত থেকে গৃহীত হয়েছে।

সুতরাং ঘটনাটির মোটামুটি বিবরণ ও বিস্তৃত বিবরণের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্যের প্রতি অবশ্যই খেয়াল রাখা উচিত। যে পরিমাণ ঘটনা কোরআন মাজিদ স্পষ্ট বর্ণনা করেছে কোনো প্রকার ব্যাখ্যা না করে এর প্রতি বিশ্বাস রাখা ওয়াজিব। আর সহি হাদিসে (তা খবরে ওয়াহেদই হোক না কেন) বর্ণিত উক্ত মোটামুটি বিবরণের যে পরিমাণ বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়, তা মোটামুটি কথার বিস্তারিত বিবরণ হিসাবে গ্রহণীয়। যদিও তা কোরআন মাজিদের বর্ণনার স্তরে পৌঁছতে পারে না। এর চেয়ে অধিক অবশিষ্ট বিস্তারিত বিবরণের মর্যাদা তা-ই, যা সাধারণ ঐতিহাসিক ঘটনা ও ইসরাইলি রেওয়ায়েতসমূহের মর্যাদা।) এছাড়া একে "لَكُمْ اٰيَةً" অর্থাৎ "তোমাদের জন্য নিদর্শন" বলে বুঝানো হয়েছে, এই নিদর্শনটিতে বিশেষ কোনো গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু হতভাগ্য কওমে সামুদ বেশি সময় পর্যন্ত একে বরদাশত করতে পারল না। তারা সেটিকে হত্যা করে ফেলল।

সাইয়েদ মাহমুদ আলুসি রহ. তাঁর তাফসিরে রুহুল মাআনিতে লিখেছেন : সামুদ সম্প্রদায়ের প্রতি আযাব আগমনের লক্ষণ আগের দিন সকাল থেকেই শুরু হয়ে গেল। প্রথম দিবসে তাদের সকলের চেহারা এমন ফেকাশে বর্ণ হয়ে গেল, যেমন কোনো ভীত ব্যক্তির প্রাথমিক অবস্থা হয়ে থাকে। দ্বিতীয় দিবসে সকলের চেহারা লাল হয়ে গেল, যেন তা ভীত হয়ে গিয়েছিল। এ যেন ভীত ব্যক্তির দ্বিতীয় অবস্থা। তৃতীয় দিবসে তাদের সকলের চেহারা কালো বর্ণের হয়ে পড়ল। এ ভীত ব্যক্তির সেই তৃতীয় স্তর, যার পরে মৃত্যুর স্তর বাকি থাকে। তিনদিন পর্যন্ত আযাবের এই আলামতসমূহ যদিও তাদের চেহারাকে ফেকাশে, লাল ও কালো বর্ণের করে দিয়েছিল; কিন্তু এই বর্ণসমূহের পর্যায়ক্রমিক বিশেষত্ব পরিষ্কার বুঝাচ্ছে, তাদের অন্তর সালেহ আ.-কে সত্য নবী বলে বিশ্বাস করত, শুধু হিংসা এবং শত্রুতাবশত অস্বীকার করত। এখন যেহেতু আল্লাহর

হুকুমের বিপরীত 'অপরাধ' করে ফেলেছে এবং তার বিনিময়ে সালেহ আ.-এর মুখে ভয়াবহ আযাবের সংবাদ শ্রবণ করেছে, তখন তাদের উপর ভয়ের সেই প্রাকৃতিক বর্ণ ও ছবি প্রকাশ পেতে লাগল, যা মৃত্যুর দৃঢ় বিশ্বাস হওয়ার সময়ে ভয়ে অপরাধী গুনাহগার ব্যক্তির মধ্যে প্রকাশ পেয়ে থাকে।

তিন দিনের পর প্রতিশ্রুত সময় এসে পৌছল। রাত্রিকালে এক ভয়াবহ বিকট ধ্বনি স্ব স্ব অবস্থায়ই প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিধ্বংস করে দিল। কোরআন মাজিদ এই ধ্বংসাত্মক বিকট ধ্বনিটিকে কোনো স্থানে বজ্রধ্বনিওয়ালা বিদ্যুৎ, কোনো ক্ষেত্রে রাজফাহ অর্থাৎ ভূকম্পন সৃষ্টিকারী বস্তু, কোনো স্থানে 'ত্বয়াগিয়াহ' অর্থাৎ ভয়ঙ্কর ধ্বনি এবং কোনো জায়গায় 'ছাইহাহ' অর্থাৎ চিৎকার নামে আখ্যায়িত করেছে। কেননা এই ব্যাখ্যাগুলি একই মূল বস্তুর বিভিন্ন প্রকার বিশেষণের প্রেক্ষিতে প্রদান করা হয়েছে। যেন লোকে বুঝতে পারে, আল্লাহ তাআলার সেই আযাব কত প্রকার ও কত ভয়ঙ্কর ছিল। তোমরা এমন একটি দীপ্তিমান বিদ্যুতের কল্পনা কর, যা বারবার চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করার সাথে প্রদীপ্ত হয়, বজ্রপাত করে এবং গর্জন করে। আর এরূপে বারবার প্রদীপ্ত হয়, কখনো পূর্ব দিকে কখনো বা পশ্চিম দিকে। আর যখন এই সমস্ত অবস্থার সাথে পুনঃ পুনঃ প্রদীপ্ত হতে, গর্জন করতে এবং কম্পন করতে করতে এক ভয়ঙ্কর ধ্বনির সাথে কোনো এক স্থানের উপর পতিত হয়, তখন সেই স্থান ও তার আশপাশের স্থানসমূহের কেমন অবস্থা হবে? এটা সেই আযাবের তুলনায় একটি অতি সাধারণ অনুমান মাত্র, যা সামুদ কওমের ওপর নাযিল হয়েছিল। তাদের ও তাদের বস্তিসমূহকে ভবিষ্যৎ বংশধরদের সম্মুখে একটি উপদেশমূলক দৃষ্টান্ত রেখে গেছে।

এক দিকে কওমে সামুদের ওপর এই আযাব নাযিল হলো আর অপর দিকে সালেহ আ. ও তার অনুসারী মুসলমানদের আল্লাহ তাআলা নিজের হেফাযতে গ্রহণ করলেন এবং তাদেরকে এই আযাব হতে সুরক্ষিত রাখলেন। হযরত ছালেহ আ. মনঃক্ষুণ্ণ ও বিষণ্ন বদনে বিধ্বস্ত কওমকে সম্বোধন করে বললেন :

يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ

"হে কওম! আমি আমার পালনকর্তার পয়গাম তোমাদের কাছে পৌঁছিয়েছি এবং তোমাদেরকে নসিহত ও উপদেশ প্রদান করেছি; কিন্তু তোমরা উপদেষ্টাগণকে পছন্দই করতে না।" (সুরা আরাফ : ৭৯)

বিধ্বস্ত কওমের উদ্দেশ্যে হযরত ছালেহ আ.-এর সম্বোধন এই প্রকারের সম্বোধন ছিল, যেমন বদরের ময়দানে মুশরিক সর্দারদের ধ্বংস হওয়ার পর মৃত লাশদের গর্তের কাছে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন :

«يَا فُلَانُ بْنَ فُلَانٍ، وَيَا فُلَانُ بْنَ فُلَانٍ، أَيَسُرُّكُمْ أَنَّكُمْ أَطَعْتُمُ اللهَ وَرَسُولَهُ، فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟»

'হে অমুকের পুত্র অমুক! অমুকের পুত্র অমুক! তোমাদের কি আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য পছন্দ হয়েছিল? নিঃসন্দেহে আমরা সেই সবকিছুই প্রাপ্ত হয়েছি, যা আমাদের প্রতিপালক আমাদের সঙ্গে ওয়াদা করেছিলেন। তোমরাও কি তা প্রাপ্ত হয়েছ যা তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের সঙ্গে ওয়াদা করেছিলেন? (বোখারি)

এ জাতীয় সম্বোধন সম্বন্ধে আলেমদের দ্বিমত রয়েছে :

(১) এ জাতীয় সম্বোধন আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের বৈশিষ্ট্যসসমূহের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই আল্লাহ পাক তাঁদের এ সমস্ত কথা মৃত ব্যক্তিদের কানে অবশ্যই পৌঁছিয়ে দেন। যদিও তারা উত্তর প্রদানে অক্ষমই থাকে। সুতরাং যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুশরিকদের মৃতদেহকে এরূপে সম্বোধন করলেন, তখন হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রাযি. বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞাসা করলেন, "এরা কি শুনছে?" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : হ্যাঁ, তোমাদের চেয়ে অধিক শুনছে। কিন্তু জওয়াব দিতে অক্ষম।

(২) এরূপ সম্বোধন মনের দুঃখ ও অন্তরের ব্যথা প্রকাশের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। যেমন : তুমি কোনো ব্যক্তিকে সতর্ক করেছিলে, এই বাগানে যেও না, প্রচুর সাপ রয়েছে, দংশিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। কিন্তু সেই ব্যক্তি বাগানে প্রবেশ করল এবং সর্পদংশিত হয়ে মারা গেল। তখন এই সতর্ককারী ব্যক্তি সেই দংশিত ব্যক্তির লাশের নিকট গিয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে হঠাৎ বলে উঠল, আফসূস! আমি কি তোমাকে বলিনি বাগানে প্রবেশ করো না! অন্যথায় সর্পদংশিত হওয়ার আশঙ্কা আছে? পরিশেষে তাই হলো।

(৩) এরূপ সম্বোধনের সম্বোধিত ব্যক্তি আসলে সেই জীবিত লোকেরাই হয়ে থাকে, যারা সেই মৃত লাশকে দেখছে। যাতে তাদের উপদেশ লাভ হয় এবং এ জাতীয় অবাধ্যতাচরণ করতে সাহস না পায়।

সামুদ জাতির প্রতি তাদের নবীর উপদেশ

এখন সামুদ জাতির অবস্থা ও তাদের ঘটনা বর্ণনা করা আমাদের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তাদের নবী হযরত সালেহ আ. কে এবং যারা তাঁর উপর ঈমান এনেছিল, তাদেরকে কীভাবে আযাব থেকে বাঁচিয়ে রাখলেন আর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারী, অত্যাচারী কাফেরদের কীভাবে নির্মূল করেছিলেন, এখন তা বর্ণনা করা হবে। পূর্বেই বলা হয়েছে, সামুদ সম্প্রদায় জাতিতে ছিল আরব। আদ সম্প্রদায়ের ধ্বংস হওয়ার পর সামুদ সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়। তারা তাদের অবস্থা থেকে কোনো শিক্ষা গ্রহণ করে নি। এ কারণে তাদের নবী তাদের বলেছিলেন :

يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٧٣) وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ

خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই। তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে। আল্লাহর এই উটনী তোমাদের জন্যে একটি নিদর্শন। একে আল্লাহর জমিনে চরে খেতে দাও এবং একে কোনো কষ্ট দিও না, দিলে কঠিন শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হবে। স্মরণ কর, আদ জাতির পর তিনি তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন, তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তোমরা সমতল ভূমিতে প্রাসাদ ও পাহাড় কেটে বাসগৃহ নির্মাণ করছ। সুতরাং আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটিয়ো না। (সূরা আরাফ : ৭৩-৭৪)

অর্থাৎ আদ জাতিকে ধ্বংস করে তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করার উদ্দেশ্য হল, তাদের ঘটনা থেকে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে এবং তারা যে সব অন্যায় আচরণ করত, তোমরা তা করবে না। এ জমিন তোমাদের আয়ত্তাধীন করে দেওয়া হয়েছে। তাই এর সমতলভূমিতে তোমরা অট্টালিকা নির্মাণ করছ আর পাহাড় কেটে সুনিপুণভাবে তাতে ঘরবাড়ি তৈরি করছ। অতএব এর অনিবার্য দাবি হিসেবে এসব নিয়ামতের শোকর আদায় কর, সৎকর্মে তৎপর থাক, একনিষ্ঠভাবে এক আল্লাহর বন্দেগী কর, যাঁর কোনো শরীক নেই। তাঁর নাফরমানী ও দাসত্ব থেকে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে সাবধান থাক। কেননা এর পরিণতি খুবই জঘন্য। হযরত সালেহ আ. তাঁর কওমকে বললেন :

أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ (١٤٦) فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (١٤٧) وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ

তোমাদেরকে কি এ জগতের ভোগ-বিলাসের মধ্যে নিরাপদে রেখে দেওয়া হবে? উদ্যানসমূহের মধ্যে ও ঝরনাসমূহের মধ্যে? শস্যক্ষেত্রের মধ্যে ও মঞ্জুরিত খেজুর বাগানের মধ্যে? (সূরা শুআরা : ১৪৬-১৪৮)

وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ (١٤٩) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٥٠) وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ (١٥١) الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (١٥٢)

তোমরা পাহাড় কেটে জাঁকজমকপূর্ণ ঘরবাড়ি নির্মাণ করছ। সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর ও আমার আনুগত্য কর এবং সীমালজ্ঘনকারীদের আদেশ মান্য করো না; যারা পৃথিবীতে বিপর্য সৃষ্টি করে এবং শান্তি স্থাপন করে না। (সূরা শুআরা : ১৪১-১৪২)

يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কবুল কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই। তিনিই তোমাদেরকে যমীন থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার

মধ্যেই বসবাস করার সুবিধা দিয়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং যমীন থেকে উদ্ভাবন করেছেন। তারপর তোমাদেরকেই যমীনের আবাদকারী বানিয়েছেন। অর্থাৎ পৃথিবীর যাবতীয় শস্য এবং ফল-ফলাদি তোমাদেরকে প্রদান করেছেন। এভাবে তিনিই তোমাদের সৃষ্টিকারী ও রিযিকদাতা। সুতরাং ইবাদত পাওয়ার হকদার একমাত্র তিনিই, অন্য কেউ নয়। فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ অতএব তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তওবা কর। অর্থাৎ তোমাদের বর্তমান কর্মনীতি পরিহার করে তার ইবাদতের দিকে ধাবিত হও! তোমাদের ইবাদত-ইসতিগফার কবুল করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন।

إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ (٦١) قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا

আমার প্রতিপালক নিকটেই আছেন। তিনি তওবা কবুল করবেন এতে কোনো সন্দেহ নেই। তারা বলল, হে সালেহ! ইতোপূর্বে তোমার উপর আমাদের বড় আশা ছিল। অর্থাৎ তোমার এই জাতীয় কথাবার্তা বলার পূর্বে আমাদের আশা ছিল, তুমি একজন প্রজ্ঞাবান লোক হবে। কিন্তু আমাদের সে আশা ভুলুণ্ঠিত হল, এখন তুমি আমাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদত করতে, আমরা যে দেবতাদের পূজা করছি সেগুলো বর্জন করতে এবং বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করতে বলছ!

সামুদ জাতির জবাব

أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ (٦٢) قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ

আমাদের বাপ-দাদারা যাদের পূজা করত, তুমি কি আমাদেরকে তাদের পূজা করতে নিষেধ করছ? তুমি আমাদেরকে যে আহবান জানাচ্ছ, তাতে আমরা বিভ্রান্তিকর সন্দেহ পোষণ করি। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কি ভেবে দেখেছ আমি যদি আমার প্রতিপালক প্রেরিত স্পষ্ট প্রামাণসহ প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকি আর তিনি যদি আমাকে তাঁর নিজ অনুগ্রহ দান করে থাকেন, তারপর আমি যদি তাঁর অবাধ্যতা করি, তবে তাঁর শাস্তি থেকে আমাকে কে রক্ষা করবে? তোমরা তো কেবল আমার ক্ষতিই বাড়িয়ে দিচ্ছ। (সূরা হূদ : ৬২-৬৩)

এ হচ্ছে হযরত সালেহ আ.-এর কোমল ভাষা ব্যবহার ও সৌজন্যমূলক আচরণের মাধ্যমে তাদেরকে কল্যাণের পথে আহ্বান। অর্থাৎ তোমাদের কি ধারণা, যদি আমি তোমাদেরকে যেদিকে আহ্বান জনাচ্ছি, তা প্রকৃতপক্ষে সত্য হয়ে থাকে, তবে আল্লাহর নিকট তোমাদের কি ওজর থাকবে এবং তখন তোমাদেরকে কী-সে মুক্তি দিবে? অথচ তোমরা আমাকে আল্লাহর দিকে দাওয়াতের কাজ পরিহার করতে বলছ আর তা

কোনোক্রমেই আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা এটি আমার অপরিহার্য কর্তব্য। আমি যদি তা ত্যাগ করি, তবে তাঁর পাকড়াও থেকে না তোমরা আমাকে বাঁচাতে পারবে, না অন্য কেউ, না কেউ আমাকে সাহায্য করতে সক্ষম হবে। সুতরাং তোমাদের ও আমার মধ্যে আল্লাহর ফয়সালা আসার পূর্ব পর্যন্ত আমি এক আল্লাহর দিকে আহ্বান করতে থাকব। সালেহ আ. কে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা বলল :

إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ (١٥٣)

"তুমি তো একজন জাদুগ্রস্ত লোক"।

অর্থাৎ তোমার উপর জাদুর প্রভাব পড়েছে, তাই সকল দেবতাকে বাদ দিয়ে এক আল্লাহর ইবাদত করার জন্যে তুমি যে আমাদের আহ্বান জানাচ্ছ। তাতে কী বলছ তা তুমি নিজেই বুঝতে পারছ না। আলেমগণ 'مُسَحَّرِينَ' অর্থ করেছেন مسحورين

কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন, তোমার কাছে জাদু আছে। অর্থাৎ তুমি জাদুকর ممن له سحر তারা বলছে, তুমি একজন মানুষ। তোমার জাদু জানা আছে। তবে প্রথম অর্থই অধিকতর স্পষ্ট। কেননা পরেই তাদের কথা আসছে, তারা বলেছে :

مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا (তুমি তো আমাদের মতোই মানুষ।) فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (তুমি কোনো একটা নিদর্শন নিয়ে আসো, যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক।) তারা নবীর কাছে দাবি জানায়, যে কোনো একটা অলৌকিক জিনিস দেখিয়ে তিনি যেন নিজের দাবির সত্যতার পক্ষে প্রমাণ উপস্থাপিত করেন।

قَالَ هَٰذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (١٥٥) وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٥٦)

সালেহ আ. বললেন : এই উটনী, এর জন্যে আছে পানি পানের পালা এবং তোমাদের জন্য আছে পানি পানের পালা, নির্দিষ্ট এক এক দিনের। তোমরা একে কোনো কষ্ট দিও না, তা হলে তোমাদেরকে মহা দিবসের আযাব পাকড়াও করবে।

(সূরা শুআরা : ১৫৩)

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন :

قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে। আল্লাহর এ উটনী তোমাদের জন্যে একটি নিদর্শন। অতএব, একে আল্লাহর জমিন চরে খেতে দাও। একে কোনো ক্লেশ দিও না; দিলে মর্মন্তুদ শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হবে।

(সূরা আরাফ : ৭৩)

আল্লাহর বাণী :

وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا

"আমি শিক্ষাপ্রদ নিদর্শনস্বরূপ ছামূদ জাতিকে উটনী দিয়েছিলাম। কিন্তু ওরা তার প্রতি জুলুম করেছিল।" (সূরা বনি ইসরাইল : ৫৯)

মুফাসসিরগণ উল্লেখ করেন, সামুদ সম্প্রদায়ের লোকেরা একবার এক স্থানে সমবেত হয়। ওই সমাবেশে আল্লাহর নবী হযরত সালেহ্ আ. আগমন করেন। তিনি তাদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানান, উপদেশ দান করেন, ভীতি প্রদর্শন করেন, নসিহত করেন এবং তাদেরকে সৎ কাজের নির্দেশ দেন। উপস্থিত লোকজন তাঁকে বলল : ওই যে একটা পাথর দেখা যায়, ওর মধ্য থেকে যদি অমুক অমুক গুণসম্পন্ন একটি দীর্ঘকায় দশ মাসের গর্ভবতী উটনী বের করে দেখাতে পার, তবে দেখাও। সালেহ্ আ. বললেন : তোমাদের বর্ণিত গুণসম্পন্ন উটনী যদি আমি বের করে দিই, তা হলে কি তোমরা আমার আনীত দীন ও আমার নবুয়তের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে? তারা সবাই বলল : হ্যাঁ, বিশ্বাস করব। তখন তিনি এ কথার উপর তাদের থেকে অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। এরপর সালেহ আ. নামায আদায়ের জন্যে দাঁড়িয়ে যান এবং নামায শেষে আল্লাহর নিকট তাদের আবদার পূরণ করার জন্য দোয়া করেন। আল্লাহ ওই পাথরকে ফেঁটে গিয়ে অনুরূপ গুণসম্পন্ন একটি উটনী বের করে দেওয়ার নির্দেশ দেন। যখন তারা স্বচক্ষে এরূপ উটনী দেখতে পেল, তখন তারা সত্যি সত্যি এক বিস্ময়কর বিষয়, ভীতিপ্রদ দৃশ্য, সুস্পষ্ট কুদরত ও চূড়ান্ত প্রমাণই প্রত্যক্ষ করল। এ দৃশ্য দেখার পর উপস্থিত বহু লোক ঈমান আনল বটে, কিন্তু অধিকাংশ লোকই তাদের কুফুরী, গুমরাহী ও বিরোধিতার উপর অটল থাকল।

এ জন্যেই কুরআনে বলা হয়েছে : فَظَلَمُوا بِهَا (তারা তার সাথে জুলুম করল) অর্থাৎ তাদের অধিকাংশই মানতে অস্বীকার করল এবং সত্যকে গ্রহণ করল না। যারা ঈমান এনেছিল, তাদের প্রধান ছিল জানদা ইবনে মুহাল্লাত ইবনে লবীদ ইবনে জুওয়াস। সে ছিল সামুদ সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা। সম্প্রদায়ের অবশিষ্ট শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিবর্গও ইসলাম গ্রহণে উদ্যত হয়। কিন্তু তিন ব্যক্তি তাদেরকে তা থেকে বিরত রাখে। তারা হল (১) যাওয়াব ইবনে উমর ইবনে লবীদ (২) খাববাব। এ দুইজন ছিল তাদের ধর্মগুরু। (৩) রাবার ইবনে সামআর ইবনে জালমাস। জানদা ইসলাম গ্রহণ করার পর আপন চাচাত ভাই শিহাব ইবনে খলীফাকে ঈমান আনার জন্যে আহ্বান জানায়। সে-ও ছিল সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় লোক। তার ইসলাম গ্রহণ করার জন্যে মিহরাশ ইবনে গানামা ইবনে যুমায়ল নামক জনৈক মুসলমান কবি তাঁর কবিতায় বলেন :

"আমার পরিবারের একদল লোক শিহাবকে নবীর দীন কবুল করার জন্যে আহ্বান জানায়। এরা সকলেই সামুদ সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট লোক। শিহাবও সে আহ্বানে সাড়া দিতে আগ্রহী হয়। যদি সে সাড়া দিত তা হলে নবী সালেহ্ আ. আমাদের মাঝে বিপুল

ক্ষমতার অধিকারী হয়ে যেত। জুওয়াব তার সঙ্গীর সাথে সুবিচার করে নি বরং হিজর উপত্যকার কতিপয় নির্বোধ লোক আলোর পথ দেখার পরেও মুখ ফিরিয়ে থাকে।"

উল্লেখ্য, হযরত সালেহ আ. যে তাদের বললেন : هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً (এটি আল্লাহর উটনী, তোমাদের জন্যে নিদর্শন)। এখানে আল্লাহর উটনী শব্দটি বলা হয়েছে উটনীটির মর্যাদা নির্দেশের উদ্দেশ্যে। যেমন : বলা হয় بيت الله –আল্লাহর ঘর, عبد الله –আল্লাহর বান্দা, لَكُمْ آيَةً তোমাদের জন্যে নিদর্শন। অর্থাৎ আমি তোমাদের কাছে যে দাওয়াত নিয়ে এসেছি, এটা তার সত্যতার প্রমাণ।

فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ

'একে আল্লাহর জমিনে চরে খেয়ে বেড়াতে দাও এবং এর অনিষ্ট করো না। অন্যথায় এক নিকটবর্তী আযাব তোমাদেরকে পাকড়াও করবে।' এ ঘোষণার পর এ উটনীটি তাদের মধ্যে স্বাধীনভাবে যেখানে ইচ্ছা চরে বেড়াত। একদিন পর পর পানির ঘাটে অবতরণ করত। যেদিন সে পানি পান করত, সেদিন কূপের সমস্ত পানি নিঃশেষ করে ফেলত। তাই সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের পালার দিনে পরের দিনের জন্যে প্রয়োজনীয় পানি উত্তোলন করে রাখত। কথিত আছে, সম্প্রদায়ের লোকজন এ উটনীটির দুধ পর্যাপ্ত পরিমাণ পান করত।

আল্লাহ তাআলা বলেন : إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ (٢٧) (আমি এ উটনী পাঠিয়েছি তাদের পরীক্ষার জন্যে) পরীক্ষা ছিল, তারা কি এতে ঈমান আনে, না-কি কুফরী করে। আর প্রকৃতপক্ষে তারা কি করবে, তা আল্লাহই ভালো জানেন। فَارْتَقِبْهُمْ (অতএব, তুমি তাদের আচরণের প্রতি লক্ষ রাখ।) এবং প্রতীক্ষায় থাক وَاصْطَبِرْ (এবং ধৈর্যধারণ কর) তাদের থেকে যে কষ্ট আসে তা সহ্য কর। অচিরেই তোমার নিকট সুস্পষ্ট খবর এসে পড়বে। সুতরাং কোরআনের অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে :

وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ

(এবং তাদের জানিয়ে দাও, তাদের মধ্যে পানি বণ্টন নির্ধারিত এবং পানির অংশের জন্যে প্রত্যেকে উপস্থিত হবে পালাক্রমে। (সূরা কামার : ২৭-২৮)

দীর্ঘ দিন যাবত এ অবস্থা চলতে থাকায় সম্প্রদায়ের লোকেরা অধৈর্য হয়ে পড়ে। এর থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্যে তারা একদিন এক স্থানে সমবেত হয়ে পরামর্শ করে। তারা সম্মিলিতভাবে এই সিদ্ধান্ত করে, উটনীটিকে হত্যা করবে। ফলে তারা উটনীটির কবল থেকে নিষ্কৃতি পাবে এবং সমস্ত পানির উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব তাদের প্রতিষ্ঠিত হবে। শয়তান তাদেরকে এ কাজের যুক্তি ও সুফল প্রদর্শন করল। আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ

এরপর তারা সেই উটনীটি বধ করে এবং আল্লাহর আদেশ অমান্য করে এবং বলে : হে সালেহ, তুমি রাসূল হয়ে থাকলে আমাদেরকে যে ভয় দেখাচ্ছ, তা নিয়ে এসো।

(সূরা আরাফ : ৭৭)

উটনী হত্যাকারী

যে লোক উটনী হত্যার দায়িত্ব গ্রহণ করে তার নাম কিদার ইবনে সালিফ ইবনে জানদা। সে ছিল সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা। সে ছিল গৌরবর্ণ, নীলচোখ ও পিঙ্গল চুল বিশিষ্ট। কথিত মতে সে ছিল সালিফ এর জারজ সন্তান। সায়বান নামক এক ব্যক্তির ঔরসে তার জন্ম হয়। কিদার একাই হত্যা করলেও যেহেতু সম্প্রদায়ের সকলের ঐকমত্যে কাজটি করেছিল তাই হত্যা করার দায়িত্ব সবার প্রতি আরোপিত হয়েছে।

ইবেন জারীর রহ. প্রমুখ মুফাসসির লিখেছেন : সামুদ সম্প্রদায়ের দুই মহিলা একজনের নাম সাদুক। সে মাহয়া ইবনে যুহায়র ইবনে মুখতারের কন্যা এবং প্রচুর ধন-সম্পদ ও বংশীয় গৌরবের অধিকারী। তার স্বামী ইসলাম গ্রহণ করে। ফলে স্ত্রী তাকে ত্যাগ করে এবং নিজের চাচাত ভাই মিসরা ইবনে মিহরাজ ইবনে মাহয়াকে বলে, যদি তুমি উটনীটি হত্যা করতে পার, তবে তোমাকে আমি বিবাহ করব। অপর মহিলাটি ছিল বৃদ্ধা এবং কাফির। তার স্বামী ছিল সম্প্রদায়ের অন্যতম সর্দার যুওয়াব ইবনে আমর। এই স্বামীর ঔরসে তার চারটি কন্যা ছিল। মহিলাটি কিদার ইবনে সালিফকে প্রস্তাব দেয়, সে যদি উটনীটি হত্যা করতে পারে, তবে তার এ চার কন্যার মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা বিয়ে করতে পারবে। তখন ওই যুবকদ্বয় উটনী হত্যার দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং সম্প্রদায়ের লোকদের সমর্থন লাভের চেষ্টা চালায়। সে মতে অপর সাত ব্যক্তি তাদের ডাকে সাড়া দেয়। এভাবে তারা নয়জন ঐক্যবদ্ধ হয়। কোরআনে সে কথাই বলা হয়েছে :

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ

আর সেই শহরে ছিল এমন নয় ব্যক্তি, যারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করত এবং কোনো সৎকর্ম করত না। (সূরা নামল : ৪৮)

তারপর এ নয়জন গোটা সম্প্রদায়ের কাছে যায়। এবং উটনী হত্যার উদ্যোগের কথা জানায়। এ ব্যাপারে সকলেই তাদেরকে সমর্থন করে। সহযোগিতার আশ্বাস দেয়। এরপর তারা উটনীর সন্ধানে বের হয়। তারা দেখতে পেল, উটনীটি পানির ঘাট থেকে ফিরে আসছে। মিসরা আগে থেকে থেকে ওঁৎ পেতে বসে ছিল। সে একটা তীর তার দিকে ছুঁড়ে মারে। তীরটি উটনীর পায়ের গোছা ভেদ করে চলে যায়। এদিকে মহিলারা তাদের মুখমণ্ডল আবৃত করে গোটা কবিলার মধ্যে উটনী হত্যার কথা ছড়িয়ে তাদেরকে উৎসাহিত করতে থাকে। কিদার ইবনে সালিফ অগ্রসর হয়ে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করে উটনীটির পায়ের গোছার রগ কেটে দেয়। সাথে সাথে উটনীটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং বিকট শব্দে চিৎকার দিয়ে ওঠে। চিৎকারের মাধ্যমে সে তার পেটের বাচ্চাকে সতর্ক করে। কিদার পুনরায় বর্শা দিয়ে উটনীটির বুকে আঘাত করে এবং তাকে হত্যা করে। ওদিকে বাচ্চাটি একটি দুর্গম পাহাড়ে আরোহণ করে তিনবার ডাক দেয়।

আবদুর রাজ্জাক রহ. হাসান থেকে বর্ণিত সনদে বলেন : উটনীটির বাচ্চার ডাক ছিল, হে আমার রব! আমার মা কোথায় ? এরপর সে একটি পাথরের মধ্যে প্রবেশ করে

অদৃশ্য হয়ে যায়। কারো কারো মতে লোকজন ওই বাচ্চার পশ্চাদ্ধাবন করে তাকেও হত্যা করেছিল। আল্লাহ তাআলা বলেন:

فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ (٢٩) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ

এরপর তারা তাদের এক সঙ্গীকে আহ্বান করল এবং সে এসে উটনীটিকে ধরে হত্যা করল। দেখ, কি কঠোর ছিল আমার শাস্তিও সতর্কবাণী। (সূরা কামার : ২৯-৩০)

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا (١٢) فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا

'ওদের মধ্যে যে সর্বাধিক হতভাগ্য, সে যখন তৎপর হয়ে উঠল। তখন আল্লাহর রাসূল বলল, আল্লাহর উটনী ও তার পানি পান করার বিষয়ে সাবধান হও।' অর্থাৎ তোমরা একে ভয় কর। কিন্তু তারা রাসূলকে অস্বীকার করল এবং উটনীটিকেও হত্যা করে ফেলল।

فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا (١٤) وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا

"তাদের পাপের জন্যে তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে একাকার করে দিলেন এবং এর পরিণামের জন্য আল্লাহর আশঙ্কা করার কিছু নেই।"

(সূরা শামস : ১২-২৫)

ইমাম আহমদ রহ. আবদুল্লাহ ইবনে নুমায়ের রহ. সূত্রে আবদুল্লাহ ইবনে যামআ রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার ভাষণ দিতে গিয়ে উটনী ও তার হত্যাকারীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছিলেন : إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا ("তাদের মধ্যে যে সর্বাধিক হতভাগা সে যখন তাৎপর হয়ে উঠল।")

যে লোকটি তৎপর হয়েছিল, সে অত্যন্ত কঠিন, রূঢ় ও কওমের সর্দার। আবু যামআর মতো মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক লিখেছেন, ইয়াযীদ ইবনে মুহাম্মদ আম্মার ইবনে ইয়াসির রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : হে আলী! আমি কি তোমাকে মানব গোষ্ঠীর সবচেয়ে বড় দুই হতভাগার কথা শুনাব? আলী রাযি. বললেন : বলুন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন : একজন হল ছামূদ সম্প্রদায়ের সেই গৌরবর্ণ লোকটি, যে উটনী হত্যা করেছিল আর দ্বিতীয়জন হল সেই ব্যক্তি, যে তোমার এই স্থানে (অর্থাৎ মস্তকের পার্শ্বে) আঘাত করবে, যার ফলে এটা অর্থাৎ দাড়ি ভিজে যাবে। ইবনে আবু হাতিম রহ. এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

হযরত সালেহ আ.-এর জাতি বলল : "হে সালিহ! তুমি রাসূল হয়ে থাকলে আমাদেরকে যার ভয় দেখাচ্ছ তা আনয়ন কর।" (সূরা আরাফ : ৭৭)

এ উক্তির মধ্যে তারা কয়েকটি জঘন্য কুফরী কথা বলেছে। যথা :

(১) আল্লাহ যে উটনী তাদের জন্যে নিদর্শনরূপে পাঠিয়েছেন, তাকে কোনো প্রকার কষ্ট দিতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছিলেন। তারা তাকে হত্যা করে আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে।

(২) আযাব আনয়নের জন্যে তারা অতি বেশি তাড়াহুড়া করে। এরপর দুই কারণে তারা সে আযাবে গ্রেফতার হয়।

(ক) তাদের উপর আরোপিত শর্ত وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ (একে কোনোরূপ কষ্ট দিও না, অন্যথায় অতি শীঘ্রই আযাব তোমাদেরকে পাকড়াও করবে।)। অন্য এক আয়াতে আছে– عذاب عظيم (ভয়াবহ আযাব), অন্য এক আয়াতে আছে– عذاب اليم (পীড়াদায়ক আযাব)-এর প্রতিটিই যথার্থরূপে দেখা দেয়।

(খ) আযাব তাড়াতাড়ি এনে দেওয়ার জন্য তাদের পীড়াপীড়ি করা।

(৩) তারা তাদের নিকট প্রেরিত রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, অথচ তিনি তাঁর নবুয়তের দাবির সত্যতার পক্ষে চূড়ান্ত প্রমাণ দিয়েছেন। কিন্তু তাদের এ হীন মানসিকতা ও আযাবে গ্রেফতার হওয়ার যোগ্যতাই তাদেরকে ভ্রান্তি ও কুফুরী পথে যেতে এবং বিদ্বেষী হয়ে চলতে উদ্বুদ্ধ করে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ

কিন্তু ওরা তাকে বধ করল। ফলে সালেহ বললেন, তোমরা তোমাদের বাড়িতে তিনদিন জীবন উপভোগ করে নাও। এ এমন একটি ওয়াদা, যা মিথ্যা হওয়ার নয়।

(সূরা হূদ : ৬৫)

মুফাসসিরগণ লিখেছেন, উটনীটির উপর প্রথম যে ব্যক্তি হামলা করে তার নাম কিদার ইবনে সালিফ (তার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক)। প্রথম আঘাতেই উটনীটির পায়ের গোছা কেটে যায় এবং সে মাটিতে পড়ে যায়। এরপর অন্যরা দৌড়ে গিয়ে তরবারি দ্বারা কেটে উটনীটির দেহ খণ্ড-বিখণ্ড করে। উটনীটির সদ্য প্রসূত বাচ্চা এ অবস্থা দেখে দৌড়ে নিকটবর্তী এক পাহাড়ে গিয়ে ওঠে এবং তিনবার আওয়াজ দেয়। এ জন্য সালেহ আ. তাদের বললেন : تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ (তোমরা তিনদিন পর্যন্ত তোমাদের ঘরবাড়িতে জীবন উপভোগ কর। অর্থাৎ ঘটনার ওইদিন বাদ দিয়ে পরবর্তী তিন দিন। কিন্তু এত কঠোর সতর্কবাণী শুনানো সত্ত্বেও তারা এ কথা বিশ্বাস করল না। বরং ওই রাতেই নবীকেও হত্যা করার ষড়যন্ত্র আঁটল এবং উটনীর মতো তাকেও খতম করার পরিকল্পনা করল।

قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ

"তারা পরস্পরে বলল, আল্লাহর নামে কসম কর! আমরা সালেহ ও তার পরিবারসহ লোকদের উপর রাত্রিবেলায় আক্রমণ চালাব।" অর্থাৎ আমরা তার বাড়িতে হামলা করে

সালেহকে তার পরিবার-পরিজনসহ হত্যা করব। পরে তার অভিভাবকরা যদি রক্তপণ চায়, তবে আমরা হত্যা করার কথা অস্বীকার করব। এ কথাই কোরআনে বলা হয়েছে :

ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ

পরে তার অভিভাবককে বলব, আমরা তার পরিবারের হত্যা প্রত্যক্ষ করি নি।

(সূরা নামল : ৪৯)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন :

وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (٥٠) فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (٥١) فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٥٢) وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (٥٣)

তারা এক চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও এক কৌশল অবলম্বন করলাম, কিন্তু ওরা বুঝতে পারে নি। অতএব দেখ, ওদের চক্রান্তের পরিণতি কি হয়েছে! আমি অবশ্যই ওদের এবং ওদের সম্প্রদায়ের সকলকে ধ্বংস করেছি। এই তো ওদের ঘরবাড়ি। সীমালঙ্ঘন করার কারণে, যা জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে। এতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্যে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। আর যারা মুমিন-মুত্তাকী ছিল, তাদেরকে আমি উদ্ধার করেছি। (সূরা নামাল : ৫০-৫৩)

সামুদ জাতির ধ্বংসলীলা

যে কয় ব্যক্তি হযরত সালেহ আ. কে হত্যা করতে সংকল্পবদ্ধ হয়, আল্লাহ প্রথম তাদের উপর পাথর নিক্ষেপ করে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেন। পরে গোটা সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেন। যে তিনদিন তাদেরকে অবকাশ দেওয়া হয়েছিল, তার প্রথমদিন ছিল বৃহস্পতিবার। এই দিন আসার সাথে সাথে সম্প্রদায়ের সকলের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায়। সন্ধ্যা হলে পরস্পর বলাবলি করল, 'জেনে রেখ! নির্ধারিত সময়ের প্রথম দিন শেষ হয়ে গেছে। দ্বিতীয় দিন শুক্রবারে সকলের চেহারা লাল রং ধারণ করে। সন্ধ্যায় তারা বলাবলি করে, শুনে রেখ! নির্ধারিত সময়ের দুদিন কেটে গেছে। তৃতীয়দিন শনিবারে সকলের চেহারা কালো রং ধারণ করে। সন্ধ্যায় তারা বলাবলি করে, জেনে নাও! নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে গেছে। রবিবার সকালে তারা খোশবু লাগিয়ে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষায় থাকল কী শাস্তি ও আযাব-গযব নাযিল হয় তা দেখার জন্যে। তাদের কোনো ধারণাই ছিল না, তাদেরকে কী করা হবে এবং কোন দিক থেকে আযাব আসবে। কিছু সময় পর সূর্য যখন উপরে এসে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তখন আসমানের দিক থেকে বিকট আওয়াজ এলো এবং নিচের দিক থেকে প্রবল ভূকম্পন শুরু হল। সাথে সাথে তাদের প্রাণবায়ু উড়ে গেল। সকল নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেল। শোরগোল স্তব্ধ হল এবং যা সত্য তাই বাস্তবে ঘটে গেল। ফলে সবাই লাশ হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে রইল।

ইতিহাসবিদগণ লিখেছেন, সামুদ সম্প্রদায়ের এ আযাব থেকে একজন মাত্র মহিলা ছাড়া আর কেউই মুক্তি পায় নি। মহিলার নাম কালবা বিনতে সালাকা। ডাকনাম যারিআ। সে ছিল কট্টর কাফের এবং হযরত সালেহ আ.-এর চরম দুশমন। আযাব আসতে দেখেই সে দ্রুত বের হয়ে দৌড়ে এক আরব গোত্রে গিয়ে উঠল। এবং তার সম্প্রদায়ের উপর পতিত যে আযাব সে প্রত্যক্ষ করে এসেছে– তার বর্ণনা দিল। পিপাসায় কাতর হয়ে সে পানি পান করতে চাইল। কিন্তু পানি পান করার সাথে সাথেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। আল্লাহ তা'আলার বাণী كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا (যেন সেখানে তারা কোনো দিন বসবাস করে নাই।) আল্লাহ তাআলা বলেন :

أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ

"জেনে রেখ! সামুদ সম্প্রদায় তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করেছিল। জেনে রেখ! ধ্বংসই হল সামুদ সম্প্রদায়ের পরিণাম।" (সূরা হূদ : ৬৮)

ইমাম আহমাদ হযরত জাবের রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার হিজর উপত্যকা দিয়ে অতিক্রম করার সময় বলেন : তোমরা আল্লাহর নিদর্শন অর্থাৎ মুজিযা দেখার আবদার করো না। সালেহ আ.-এর সম্প্রদায় এরূপ আবদার জানিয়েছিল। সেই নিদর্শনের উটনী এই গিরিপথ দিয়ে পানি পান করার জন্যে যেত এবং পান করার পর এই পথ দিয়েই উঠে আসত।

فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَعَقَرُوهَا

(তারা আল্লাহর হুকুমের অবাধ্য হল ও উটনীটিকে বধ করল)।

উটনী একদিন তাদের পানি পান করত এবং তারা একদিন উটনীর দুধ পান করত। পরে তারা উটনীটিকে বধ করে। ফলে এক বিকট আওয়াজ তাদেরকে পাকড়াও করে। এতে সামুদ সম্প্রদায়ের শুধু একজন লোক ব্যতীত আসমানের নিচে তাদের যত লোক ছিল, সবাইকে আল্লাহ ধ্বংস করে দেন। সেই লোকটা হারাম শরিফে অবস্থান করছিল। সঙ্গীরা জিজ্ঞেস করল, কে সেই লোকটা ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন, তার নাম আবু রাগাল। পরে হারাম শরিফ থেকে বের হওয়ার পর ওই আযাব তাকে ধ্বংস করে, যে আযাব তার সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছিল।

এ হাদিসটি ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সংগৃহীত। কিন্তু হাদীসের প্রসিদ্ধ ছয়টি কিতাবের কোনোটিতেই এর কোনো উল্লেখ নেই। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

আবদুর রাজ্জাক রহ. ইসমাইল ইবনে উমাইয়া রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন। একবার নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু রাগালের কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা কি জান, এই কবরবাসী কে? তারা বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সম্যক জানেন। তিনি বললেন, এটা আবু রাগালের কবর। সে সামুদ সম্প্রদায়ের লোক। হারাম শরিফে অবস্থান করছিল। আল্লাহ পাক

হারাম শরিফকে আযাব পতিত হওয়া থেকে মুক্ত রেখেছেন। আবু রাগাল যখন হারামের সীমানা থেকে বের হলো, সেই আযাব তাকে ধ্বংস করে দেয়, যে আযাব তার সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছিল। তারপর এখানে তাকে দাফন করা হয় এবং তার সাথে স্বর্ণনির্মিত একটি ডালও দাফন করা হয়। এ কথা শুনে কাফেলার সবাই বাহন থেকে নেমে এসে তরবারি দ্বারা কবর খুঁড়ে স্বর্ণের ডাল বের করে নিয়ে আসে।

আবদুর রাজ্জাক রহ. যুহরি থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু রাগালের অপর নাম আবু সাকিফ। বর্ণনার এ সূত্রটি মুরসাল। এ হাদিসটি মুত্তাসিল সনদেও বর্ণিত হয়েছে। যেমন মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক রহ. তাঁর সিরাত গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. প্রমুখ থেকে বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর তায়েফ গমনের সময় আমরাও সাথে ছিলাম। একটি কবর অতিক্রম করার সময় তিনি বললেন, এটি আবু রাগালের কবর, যাকে আবু সাকিফও বলা হয়। সে সামুদ সম্প্রদায়ের লোক। হারাম শরিফে অবস্থান করায় তার ওপর তাৎক্ষণিকভাবে আযাব আসে নি। পরে যখন হারাম থেকে বেরিয়ে এই স্থানে আসে, তখন সেই আযাব তার উপর পতিত হয়, যে আযাব তার সম্প্রদায়ের উপর পতিত হয়েছিল। এখানেই তাকে দাফন করা হয়। এর প্রমাণ হলো, তার সাথে স্বর্ণের একটি ডালও দাফন করা হয়েছিল। তোমরা তার কবর খুঁড়লে সাথে ওই ডালটিও পাবে। তখনই লোকজন কবরটি খুঁড়ে ডালটি বের করে আনে। আবু দাউদ রহ. মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক রহ. সূত্রে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। হাফেজ আবুল হাজ্জাজ মাযযী একে হাসান ও আযিয পর্যায়ের হাদিস বলেছেন।

আমার (ইবনে কাসীর রহ. এর) মতে এ হাদিসটি বুজায়ের ইবনে আবু বুজায়ের একাই বর্ণনা করেছেন। এ হাদিস ব্যতীত অন্য কোনো হাদিসের বর্ণনাকারী হিসেবে তাকে দেখা যায় না। এ ছাড়া ইসমাইল ইবনে উমাইয়া ব্যতীত অন্য কেউ এটা বর্ণনা করেন নি। শায়খ আবুল হাজ্জাজ বলেছেন, এ হাদিসকে মারফূ বলা অমূলক। এটা আসলে আবদুল্লাহ ইবনে আমরের উক্তি। তবে পূর্বে বর্ণিত মুরসাল ও জাবের রাযি.-এর হাদিসে এর সমর্থন পাওয়া যায়।

সম্প্রদায়ের ধ্বংসের পর হযরত সালেহ আ. তাঁর সম্প্রদায়ের এলাকা থেকে অন্যত্র যাওয়ার সময় তাদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন :

يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ

"হে আমার সম্প্রদায়! আমার রবের পয়গাম আমি তোমাদের নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েছিলাম এবং তোমাদেরকে উপদেশও দিয়েছিলাম"। অর্থাৎ তোমাদের হিদায়াতের জন্যে আমি আমার সাধ্যমত চেষ্ট করেছিলাম। কথা, কাজ ও সদিচ্ছা দিয়ে তা একান্ত ভাবে কামনা করেছিললাম। وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ (কিন্তু হিতাকাঙ্ক্ষীদেরকে তোমরা পছন্দ কর না।) অর্থাৎ সত্য তোমরা কবূল কর নি আর না কবুল করতে প্রস্তুত ছিলে।

এ কারণেই আজ তোমরা চিরস্থায়ী আযাবের মধ্যে পড়ে রয়েছ। এখন আমার কিছু করার নেই। তোমাদের থেকে আযাব দূর করার কোনো শক্তি আমার আদৌ নেই। আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়ে দেওয়া ও উপদেশ দেওয়ার দায়িত্বই আমার উপর ন্যাস্ত ছিল। সে দায়িত্ব আমি পালন করেছি। কিন্তু কার্যত সেটাই হয়, যেটা আল্লাহ চান।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও অনুরূপভাবে বদর প্রান্তরে অবস্থিত কূপে নিক্ষিপ্ত নিহত কাফের সরদারদের লাশগুলো সম্বোধন করে ভাষণ দিয়েছিলেন। বদর যুদ্ধে নিহত কুরায়েশ সর্দারকে বদরের কূপে কূপে নিক্ষেপ করা হয়। তিনদিন পর শেষ রাতে ময়দান ত্যাগ করার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত কূপের নিকট দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, 'হে কূপবাসীরা! তোমাদের সাথে তোমাদের প্রভু যে ওয়াদা করেছিলেন, তার সত্যতা দেখতে পেয়েছ তো? আমার সাথে আমার প্রভুর যে ওয়াদা ছিল, তা আমি পুরোপুরি সত্যরূপে পেয়েছি। 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন, "তোমরা হচ্ছ নবীর নিকৃষ্ট পরিজন। তোমরা তো তোমাদের নবীকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করেছ। কিন্তু অন্য লোকেরা আমাকে সত্য বলে স্বীকার করেছে। তোমরা আমাকে দেশ থেকে বের করে দিয়েছ। অন্যরা আমাকে আশ্রয় দিয়েছে। তোমরা আমার বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছ, পক্ষান্তরে অন্যরা আমাকে সাহায্য করেছে, তোমরা তোমাদের নবীর কত জঘন্য পরিজন ছিলে!"

হযরত ওমর রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বললেন : আল্লাহর রাসুল! আপনি এমন একদল লোকের সাথে কথা বলছেন, যারা লাশ হয়ে পড়ে আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "যে মহান সত্তার হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ করে বলছি : আমি যেসব কথাবার্তা বলছি, তা ওদের চেয়ে তোমরা মোটেও বেশি শুনছ না; কিন্তু তারা উত্তর দিচ্ছে না এই যা।"

কথিত আছে, হযরত সালেহ আ. এ ঘটনার পর হারাম শরিফ চলে যান। এবং ইনতেকাল পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন।

ইমাম আহমাদ হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. সূত্রে বর্ণনা করেন, বিদায় হজের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন উসফান উপত্যকা অতিক্রম করেন, তখন জিজ্ঞেস করেন : আবু বকর! এটা কোন উপত্যকা? আবু বকর রাযি. বলেন, এটা উসফান উপত্যকা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এ স্থান দিয়ে হূদ ও সালেহ আ. নবীদ্বয় অতিক্রম করেছিলেন। তাদের বাহন ছিল উটনী। লাগাম ছিল খেজুর গাছের ছাল দ্বারা তৈরি রশি। পরনে ছিল জুব্বা এবং গায়ে ছিল চাদর। হজের উদ্দেশ্যে তালবিয়া (لبيك) পড়তে পড়তে তাঁরা আল্লাহর ঘর তওয়াফ করছিলেন। এ হাদিসের সনদ হাসান পর্যায়ের। হযরত নূহ নবীর আলোচনায় তাবারানি থেকে এ হাদিসটি উদ্ধৃত করা হয়েছে। সেখানে হযরত নূহ হূদ ও ইবরাহীম আ.-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

কওম ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর হযরত সালেহ আ.

একটা ঐতিহাসিক প্রশ্ন, সামুদ সম্প্রদায় যখন ধ্বংস প্রাপ্ত হল, তখন হযরত সালেহ আ. ও তাঁর অনুগামী ঈমানদার লোকেরা কোথায় বসতি স্থাপন করলেন? এ প্রশ্নের উত্তর নিশ্চিত ও নির্দিষ্টরূপে প্রদান করা অসম্ভব। প্রবল ধারণা হল, তারা কওমের ধ্বংস প্রাপ্তির পর ফিলিস্তিন অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করেন। কেননা হিজর এর নিকটবর্তী এই স্থানটিই এরূপ ছিল, যা সবুজ-সতেজ এবং গৃহপালিত পশুদের দানা-পানির জন্যও উত্তম ছিল। আর ফিলিস্তিন অঞ্চলে এই স্থানটি সম্ভবত 'রামলা' হবে কিংবা অন্য কোনো স্থান। তাফসিরকারগণ এ প্রশ্নের জওয়াবে কয়েকটি মত পোষণ করেন :

১। তাঁরা ফিলিস্তিনের 'রামলা' নামক স্থানের নিকটে বসতি স্থাপন করেন। তাফসিরে খাযেনে এরূপই উল্লেখ আছে।

২। হাযরা মাউতে বসবাস করেন। এটাই তাদের আদি ও আসল ব্যাসস্থান ছিল। কারণ, এটা আহকাফেরই একটি অংশ। এখানে একটি কবর রয়েছে, যা সালেহ আ.-এর কবর বলে প্রসিদ্ধ।

৩। সামুদ সম্প্রদায় ধ্বংসের পর মক্কা মুআযযামায় এসে এখানেই বাস করতে থাকেন। এখানেই ইনতেকাল করেন। তাঁদের কবর কাবা ঘরের পশ্চিম দিকে হারাম শরিফের মধ্যেই অবস্থিত। সাইয়েদ মাহমুদ আলুসি রহ. তাঁর তাফসিরে রুহুল মাআনিতে উদ্ধৃত করেছেন, হযরত সালেহ আ.-এর ওপর ঈমান আনয়নকারী মুসলমানগণ, যাঁরা তাঁর সাথে আযাব হতে রক্ষিত ছিলেন, তাঁদের সংখ্যা একশ বিশ জন ছিল। আর ধ্বংস প্রাপ্ত সংখ্যা ছিল, প্রায় দেড় হাজার পরিবার।

কোরআন মাজিদে হযরত সালেহ আ.

বিভিন্নমুখী আলোচনার পর এখন এ ঘটনা সম্বন্ধীয় কোরআন মাজিদের আয়াতগুলো পাঠ করুন। যা উপরে বর্ণিত ঘটনাগুলির প্রকৃত উৎস এবং উপদেশ ও নসিহতের অনুপম রসদ সরবরাহ করছে :

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٧٣) وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٧٤) قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ (٧٥) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (٧٦) فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ

الْمُرْسَلِينَ (٧٧) فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ (٧٨) فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ (٧٩)

১। "আর (এরূপে) আমি সামুদ সম্প্রদায়ের প্রতি তাদেরই ভাইদের মধ্য হতে সালেহকে প্রেরণ করলাম। সে বলল, হে আমার কওম! আল্লাহ্ পাকের বন্দেগী কর, তিনি ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই। দেখ, তোমাদের প্রতিপালকের তরফ হতে তোমাদের সম্মুখে এক একটি (চরম মীমাংসাকারী) নিদর্শন। অতএব একে স্বাধীনভাবে মুক্ত ছেড়ে দাও। সে খোদার জমিনে যথেচ্ছা বিচরণ করবে। এর কোনো প্রকারের ক্ষতি করো না। তা হলে (এর প্রতিফল স্বরূপ) মারাত্মক প্রাণবিনাশী আযাব এসে তোমাদের পাকড়াও করবে। আর সেই সময়টুকু স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে আদ সম্প্রদায়ের পরে তাদের স্থলবর্তী করেছিলেন এবং এই ভূ-খণ্ডে এমনভাবে বসতি করতে দিয়েছেন, মুক্ত ময়দানেও বাড়ি-ঘর নির্মাণ করেছ এবং পাহাড়সমূহকেও কেটে নিজেদের বাসগৃহ নির্মাণ করেছ, (এটা তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ) অতএব আল্লাহ তাআলার নেয়ামতসমূহ স্মরণ কর এবং দেশে অবাধ্যতার সাথে ফাসাদ বিস্তার করো না। কওমের যে সমস্ত নেতৃস্থানীয় লোকের মধ্যে (নিজেদের ধন-সম্পদ ও শক্তি-সামর্থ্যের) অহঙ্কার ছিল, তারা মুমিনদের বলল, আর এই মুমিনগণ এমন লোক ছিল, যাদেরকে (দারিদ্র্য ও নিরাশ্রয়তার দরুন) দুর্বল ও হীন মনে করা হতো। তোমরা কি সত্যিকারভাবেই জেনে নিয়েছ, সালেহ খোদার প্রেরিত? (অর্থাৎ আমরা তো তাঁর মধ্যে এমন কোনো বিষয় দেখতে পাই না!) তারা বলল : হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে তিনি যেই সত্যের পয়গামসহ প্রেরিত হয়েছেন, আমরা তার উপর পূর্ণ ঈমান রাখি। এতে অহঙ্কারীরা বলল, তোমরা যে বিষয়ের উপর ঈমান এনেছ, আমরা তা অবিশ্বাস করি।

তারা উটনীটিকে হত্যা করে ফেলল এবং নিজেদের প্রতিপালকের নির্দেশ অমান্য করল ও অবাধ্য হলো। তারা বলল, হে সালেহ! যদি তুমি বাস্তবিকই পয়গম্বরদের মধ্য হতে হও, তবে সেই বিষয়টি আমাদের ওপর এনে দেখাও, যে বিষয়ের তুমি আমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করেছিলে। এরপর প্রকম্পিতকারী ভয়াবহ বস্তু এসে তাদেরকে পাকড়াও করল। যখন তাদের উপর সকাল হলো, তখন তারা সবাই (মৃত অবস্থায়) উপুড় হয়ে পড়ে ছিল। এরপর সালেহ আ. তাদের থেকে সরে গেলেন। (এবং মৃতলাশসমূহকে লক্ষ্য করে) বললেন, হে আমার কওম! আমি আমার প্রতিপালকের পয়গাম তোমাদের পৌঁছিয়ে দিয়েছি, কিন্তু তোমাদের জন্য আফসোস! তোমরা নসিহতকারীদের পছন্দ করতে না। (সূরা আরাফ : ৭৩-৭৯)

وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ (٦١) قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ

فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ (٦٢) قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ (٦٣) وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ (٦٤) فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ (٦٥) فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ (٦٦) وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ (٦٧) كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ (٦٨)

২। “আর আমি কওমে সামুদের প্রতি তাদের ভাইগণের মধ্য হতে সালেহকে প্রেরণ করলাম। সে (কওমের নিকট গিয়ে) বলল, হে আমার কওম! আল্লাহ তাআলার বন্দেগী করো। তিনি ব্যতীত অন্য কেউই তোমাদের মাবুদ নয়। তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছিলেন এবং এই মাটিতেই তোমাদেরকে বসতি করতে দিয়েছেন। অতএব তোমাদের উচিত তাঁর সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং তাঁর দিকে রুজু হয়ে থাকা। দৃঢ় বিশ্বাস রাখ, আমার প্রতিপালক (প্রত্যেকের) নিকট রয়েছে এবং (প্রত্যেকের) প্রার্থনাসমূহের জবাব দিতেছেন। সেই লোকেরা বলল, হে সালেহ! পূর্বে তো তুমি এমন একজন লোক ছিলে, আমাদের সকলেরই আশা ভরসা তোমার সাথে সম্পৃক্ত ছিল। তুমি কি আমাদেরকে সেসমস্ত মাবুদের পূজা থেকে বারণ করছ, যাদেরকে আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা পূজা-আরাধনা করে আসছে? (এ কেমন কথা?) এ কথার প্রতি তো আমাদের ঘোরতর সন্দেহ রয়েছে, যার প্রতি তুমি আমাদের আহ্বান করছ। আমাদের অন্তরে প্রত্যয় হচ্ছে না। সালেহ আ. বললেন : হে আমার কওম! তোমরা কি এটাও ভেবে দেখেছ, আমি যদি আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক উজ্জ্বল প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি আর তিনি নিজ হতে আমাকে রহমত দান করে থাকেন, তবে এমন কে আছে, যে আল্লাহর (আযারেব) মুকাবিলায় আমাকে সাহায্য করে– যদি আমি তাঁর হুকুমের নাফরমানি করি? তোমরা (নিজেদের বাসনানুযায়ী কাজের প্রতি আহ্বান করে) আমার কোনো উপকার করছ না; ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে চাচ্ছ। আর হে আমার কওম! এটা আল্লাহ তাআলার উটনী তোমাদের জন্য একটি মীমাংসাকারী নিদর্শন। অতএব একে ছেড়ে দাও! আল্লাহর জমিনে বিচরণ করুক একে কোনো প্রকার কষ্ট দিও না। অন্যথায় তাৎক্ষণিক আযাব এসে তোমাদের পাকড়াও করবে। কিন্তু লোকেরা (আরো অধিক হঠকারিতা করে) একে হত্যা করে ফেলল।

তখন সালেহ আ. বললেন, (এখন তোমাদের জন্য শুধু) তিন দিনের অবকাশ, নিজেদের ঘরে থেকে পানাহার করে নাও। এটা আল্লাহর ওয়াদা, কখনও মিথ্যা হবে

না। এরপর যখন আমার নির্ধারিত বিষয়ের সময় আসল, তখন আমি সালেহকে এবং ওই সমস্ত লোককে, যারা সালেহ-এর সাথে ঈমান আনয়ন করেছিলেন, নিজের রহমতে রক্ষা করলাম এবং সেই দিনের অপমান হতে মুক্তি দিলাম। হে পয়গম্বর! আপনার প্রতিপালকই হচ্ছেন যিনি মহাক্ষমতাশালী (এবং) সর্বজয়ী। আর যারা জুলুম (অর্থাৎ কুফর) করেছিল, তাদের এরূপ অবস্থা হলো, একদিন বজ্রধ্বনি এসে তাদেরকে পাকড়াও করল। যখন ভোর হলো, তখন সকলে নিজেদের ঘরে উপুড় হয়ে (মৃত অবস্থায়) পড়ে রইল (তারা হঠাৎ করে এমনভাবে মরে রইল; যেন সে সমস্ত ঘরে তারা কোনো দিন বাসই করে নি)। জেনে রাখ, নিশ্চয় সামুদ জাতি তাদের রবের সঙ্গে কুফরি করেছে। জেনে রাখ, সামুদ জাতির জন্য রয়েছে ধ্বংস। (সূরা হূদ : ৬১-৬৮)

قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ (٧٠) قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ (٧١) لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ (٧٢) فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ (٧٣) فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ (٧٤) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ (٧٥) وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ (٧٦) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ (٧٧) وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ (٧٨) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ (٧٩) وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ (٨٠) وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (٨١) وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ (٨٢) فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ (٨٣)

৩। "আর দেখ, হিজরের লোকেরাও রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। আমি আমার নিদর্শনসমূহ তাদের দেখালাম। কিন্তু তারা (সত্য হতে) মুখ ফিরাতেই থাকল। তারা পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করত। যেন সুরক্ষিত থাকে; কিন্তু (এ সুরক্ষা কোনো কাজ দিলো না।) একদিন ভোরে এক ভয়ঙ্কর ও বিকট ধ্বনি এসে তাদেরকে পাকড়াও করল। (এবং সকলে নিজ গৃহে ধ্বংস হয়ে গেল।) আর তারা নিজেদের চেষ্টা তদবীর দ্বারা যা-কিছু উপার্জন করেছিল, তা তাদের কোনোই কাজে এলো না।" (সূরা হিজর : ৮০-৮৩)

فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ (٤١) قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (٤٢) قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ (٤٣) فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ (٤٤) فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (٤٥) فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (٤٦) قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٤٧) رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ (٤٨) قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ (٤٩) قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ (٥٠) إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ (٥١) وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ (٥٢) فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (٥٣) إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ (٥٤) وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ (٥٥) وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ (٥٦) فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (٥٧) وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (٥٨) كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ (٥٩)

৪। সামুদ সম্প্রদায় পয়গম্বরগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। যখন তাদের ভাই সালেহ আ. তাদেরকে বললেন, "তোমরা কি ভয় কর না? আমি তোমাদের প্রতি বিশ্বস্ত পয়গম্বর। অতএব আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মান্য কর। আর আমি এই কাজের জন্য তোমাদের নিকট হতে কোনো পারিশ্রমিক দাবি করছি না। আমার বিনিময় তো রাব্বুল আলামিনের হাতে রয়েছে। তোমাদেরকে কি ইহলোকের এ সমস্ত বস্তুর মধ্যে নিরাপদে ছেড়ে রাখা হবে? উদ্যান ও ঝরণায়, আর ক্ষেত-খামার ও কোমল শীষবিশিষ্ট খেজুর বাগানে? আর তোমরা পাহাড়গুলো কেটে জাঁকজমকপূর্ণ বাসগৃহ নির্মাণ করছ। অতএব আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মানো। আর এই বেপরোয়া লোকদের কথা মান্য কর না, যারা দেশে ফাসাদ বিস্তার করছে এবং সংশোধন করে না। তারা (পয়গম্বরকে) বলল, তোমার উপর তো কেউ যাদু করেছে। তুমিও তো আমাদের মতো একজন মানুষই। অতএব (নিজের নবুয়তের) নিদর্শন আনয়ন কর। যদি সত্যবাদী হও। (সালেহ আ.) বললেন, এই একটি উটনী। এর জন্য পানি পান করার একটি পালা আর তোমাদের জন্য একটি পালা এক নির্দিষ্ট দিনে। আর একে বিরক্ত কর না অন্যায়ভাবে, অন্যথায় তোমাদেরকে এক কঠিন দিবসের আযাব এসে পাকড়াও করবে। এরপর তারা এর পা কেটে (হত্যা করে) ফেলল, অনন্তর পরের দিন অনুতাপ করতে লাগল। তৎক্ষণাৎ আযাব এসে তাদের পাকড়াও করল। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে। আর তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই ঈমান আনয়ন করে না। আর নিঃসন্দেহ আপনার রবই মহা শক্তিমান (এবং) দয়ালু। (সূরা শুআরা : ১৪১-১৫৯)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ (٤٥) قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٤٦) قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ (٤٧) وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (٤٨) قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ

لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (٤٩) وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (٥٠) فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (٥١) فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٥٢) وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ

৫। আমি সামুদ সম্প্রদায়ের প্রতি তাদের ভাই সালেহ আ. কে প্রেরণ করলাম (তিনি সেখানে গিয়ে বললেন,) আল্লাহ তাআলার বন্দিগি কর। এরপর তারা দুই দলে বিভক্ত হয়ে ঝগড়া করতে লাগল। সালেহ আ. বললেন, হে আমার কওম! তোমরা কেন তাড়াতাড়ি কামনা করছ মঙ্গলের পূর্বে অমঙ্গলকে। অপরাধ কেন ক্ষমা করিয়ে নাও না আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে। হয়তো তোমাদের প্রতি রহমত হয়ে যাবে। (কওম) বলল, আমরা তোমার ও তোমার সঙ্গীদের থেকে অশুভ পদক্ষেপ দেখছি। তিনি বললেন, তোমাদের বদ কিসমত (দুর্ভাগ্য) আল্লাহর নিকট রয়েছে। তোমাদের কথা ঠিক নয় বরং তোমাদের পরীক্ষা করা হচ্ছে। আর সেই শহরে নয়জন লোক ছিল, যারা দেশে ফাসাদ বিস্তার করত; ভালো কাজ করত না। তারা বলাবলি করল, "আল্লাহর নামে কসম কর, অবশ্যই আমরা রাত্রিযোগে তাকে ও তার পরিবারবর্গকে আক্রমণ করব। এরপর তার খুনের বদলা দাবিকারীকে বলব, আমরা দেখি নাই কখন তার পরিবার ধ্বংস হয়েছে এবং আমরা সত্যই বলছি। আর তারা এক গোপন ষড়যন্ত্র করল। আমিও এক গোপন ষড়যন্ত্র করলাম। তারা তা টেরই পেল না। এরপর দেখে নাও, তাদের সেই ষড়যন্ত্রের পরিণাম ফল কেমন হল! আমি ধ্বংস করে দিলাম তাদেকে এবং তাদের কওমের সকলকে। অতএব এই দেখ, তাদের কুফরের দরুন তাদের বাসগৃহসমূহ বিধ্বস্ত অবস্থায় পতিত রয়েছে। অবশ্যই এর মধ্যে সেসমস্ত লোকের জন্য নিদর্শন রয়েছে যারা জ্ঞানী। আর আমি রক্ষা করলাম তাদেরকে, যারা ঈমান এনেছিল এবং (অবাধ্যচারণ থেকে) আত্মরক্ষা করেছিল।

(সূরা নামল : ৪৫-৫৩)

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (١٧) وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (١٨)

৬. "আর সামুদ গোত্রকে আমি পথপ্রদর্শন করলাম। এরপর তারা পথ দেখার চেয়ে অন্ধ থাকাকেই পছন্দ করল। অনন্তর তাদের অর্জিত কর্মের প্রতিফল স্বরূপ অপমানকর শাস্তির বজ্রধ্বনি এসে তাদেরকে পাকড়াও করল। আর যারা ঈমান আনয়ন করেছিল এবং (অপকর্ম থেকে) আত্মরক্ষা করেছিল, আমি তাদেরকে নাজাত দিলাম।"

(সূরা হা-মীম সাজদা : ১৭-১৮)

وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ (٤١) مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ (٤٢) وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ (٤٣) فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (٤٤) فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ

৭। আর নিদর্শন রয়েছে সামুদ সম্প্রদায়ের মধ্যে। যখন তাদেরকে বলা হল, এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত উপভোগ করে নাও। এরপর তারা রবের আদেশ লজ্ঘন করতে লাগল। অনন্তর তাদেরকে বজ্রধ্বনি এসে পাকড়াও করল এবং তারা তা দেখছিল, এরপর দাঁড়াতে বা উঠতে সক্ষম হল না এবং প্রতিশোধ নেওয়ারও ক্ষমতা হল না। (সূরা যারিয়াহ : ৪৩-৪৫)

وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى (٥٠) وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى

৮। আর এই যে, তিনি প্রথম আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিলেন এবং সামূদকেও, এরপর (তাদের) কাউকেও অবশিষ্ট রাখলেন না। (সূরা নাজম : ৫০-৫১)

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ (٢٣) فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ (٢٤) أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ (٢٥) سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ (٢٦) إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ (٢٧) وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ (٢٨) فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ (٢٩) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (٣٠) إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ (٣١) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (٣٢)

৯। সামুদ সম্প্রদায় ভয় প্রদর্শনকারী (রাসূল)দের মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। অনন্তর বলল, আমাদেরই মধ্য হতে একজন মাত্র লোক, আমরা সকলে তারই অনুসরণ করব? তা হলে তো আমরা বিভ্রান্তিতে পতিত হলাম এবং আগুনের প্রতি ঝুঁকলাম। আমাদের সকলের মধ্যে কি তারই উপর নসিহত নাযিল হল? (আমাদের মধ্য হতে আর কেউ কি এর উপযুক্ত নেই?) এ ব্যক্তি বড় মিথ্যাবাদী, শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করছে। আগামীকাল তারা জানতে পারবে, কে মিথ্যা গর্ব প্রকাশকারী। আমি তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য উটনী পাঠাচ্ছি। অতএব (হে নবী!) তাদের জন্য অপেক্ষা কর এবং ধৈর্যধারণ করতে থাক। আর তাদেরকে শুনিয়ে দাও, পানি পান করার জন্য তাদের মধ্যে পালা বণ্টন করে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকে নিজ নিজ পালাক্রমে পানির নিকট হাজির হবে। অনন্তর তারা নিজেদের (বন্ধু বা সাথী)কে ডাকল। এরপর হাত চালাল এবং (উটনীটিকে) হত্যা করে ফেলল। অনন্তর কেমন হল আমার আযাব ও ভয় প্রদর্শন? আমি তাদের প্রতি প্রেরণ করলাম এক (ভয়ঙ্কর) গর্জন। এরপর তারা পদদলিত (পুরাতন) কাঁটার বেড়ার মতো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়ে রইল। আর আমি বুঝার জন্য কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি। এরপর আছে কি কেউ চিন্তাশীল (ও উপদেশ গ্রহণকারী)? (সূরা কামার : ২৩-৩২)

كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ (٤) فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ

১০। সামুদ ও আদ সম্প্রদায় সজোরে আঘাতকারী (কেয়ামত)কে অস্বীকার করেছিল। আর সামুদ সম্প্রদায়, তাদেরকে বিকট শব্দ দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছিল।

(সূরা হাককা : ৪-৫)

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا (١١) إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا (١٢) فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا (١٣) فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا (١٤) وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا (١٥)

১১। সামুদ সম্প্রদায় (নবী ও নবীর মোজেযাকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করল দুষ্কর্মহেতু। যখন তাদের মধ্যকার (সর্বাপেক্ষা অধিক) হতভাগ্য ব্যক্তি (উটনীকে হত্যা করার জন্য) উত্তেজিত হয়ে উঠল, তখন আল্লাহ্র রাসূল তাদেরকে (সতর্ক করে) বললেন : আল্লাহ্র উটনীর ব্যাপারে সতর্ক থাক এবং এর পানি পান করার পালা সম্পর্কে। কিন্তু তারা নবীকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করল। তারপর এর পা কেটে ফেলল। এরপর তাদের পাপের দরুন তাদের প্রতিপালক তাদেরকে ধ্বংস করে দিলেন। অনন্তর সকলকে সমান করে দিলেন। আর আল্লাহ্ পাক বদলা নিতে ভয় করেন না।

(সূরা আশ্-শামস : ১১-১৫)

সামুদ জাতির আবাসভূমি দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গমন

ইমাম আহমাদ হযরত ইবনে ওমর রাযি.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, তাবুক অভিযানকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামসহ হিজর উপত্যকায় অবতরণ করেন। যেখানে সামুদ জাতি বসবাস করত। সামুদ সম্প্রদায় যেসব কূপের পানি পান করত, সাহাবায়ে কেরাম সেসব কূপের পানি ব্যবহার করেন। পানি দিয়ে আটার খামির বানিয়ে ডেকচি চুলায় চড়ান। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশ আসায় তাঁরা ডেকচির খাদ্য ফেলে দিয়ে খামির উটকে খেতে দেন। তারপর তিনি সেখান থেকে রওনা হয়ে যে কূপ থেকে আল্লাহ্র উষ্ট্রী পানি পান করত, সে কূপের নিকট অবতরণ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকজনকে সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির বাসস্থানে যেতে নিষেধ করেন। তিনি বললেন, "আমার আশঙ্কা হয় তোমাদের উপর না তাদের মতো আযাব আপতিত হয়। সুতরাং তোমরা তাদের সেস্থানে প্রবেশ করো না।"

ইমাম আহমদ রহ. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে অন্য এক বর্ণনায় বলেন, হিজরে অবস্থানকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন : তোমরা আল্লাহ্র গযবে ধ্বংস প্রাপ্তদের ওইসব বাসস্থানে কান্নারত অবস্থায় ছাড়া যেয়ো না, যদি একান্তই কান্না না আসে, তা হলে সেখানে আদৌ যেয়ো না। যে আযাব তাদের উপর এসেছিল, সেরূপ আযাব তোমাাদের উপরও না পতিত হয়ে যায়।

বুখারী ও মুসলিমে একাধিক সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ছামূদ জাতির

এলাকা অতিক্রম করেন, তখন মাথা ঢেকে রাখেন। বাহনকে দ্রুত চালান এবং কান্নারত অবস্থায় ব্যতীত কাউকে তাদের বাসস্থানে প্রবেশ করতে নিষেধ করেন।

অন্য বর্ণনায় এতটুকু বেশি আছে, 'যদি একান্তই কান্না না আসে, তবে কান্নার ভঙ্গি অবলম্বন কর এই ভয়ে, তাদের ওপর যে আযাব এসেছিল, অনুরূপ আযাব তোমাদের ওপরও না এসে পড়ে।

ইমাম আহমদ রহ. আমের ইবনে সাদ রাযি. থেকে বর্ণনা করেন : তাবুক যুদ্ধে গমনকালে লোকজন দ্রুত অগ্রসর হয়ে হিজরবাসীর বাসস্থানে প্রবেশ করতে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি মধ্যে ঘোষণা করে দেন, الصلاة جامعة অর্থাৎ নামায আদায় করা হবে। আমের রাযি. বলেন, এ সময় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত হই। তিনি তখন নিজের উট থামাচ্ছিলেন এবং বলছিলেন : তোমরা কেন ওইসব লোকের বাসস্থানে প্রবেশ করছ, যাদের ওপর আল্লাহ গযব নাযিল করেছেন। এক ব্যক্তি আশ্চর্য হয়ে বলল, আল্লাহর রাসূল! আমরা আশ্চর্যজনক বস্তু হিসেবে এগুলো দেখছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি কি এর চেয়ে অধিক আশ্চর্যের কথা তোমাদের বলব না? তা হল, তোমাদের মধ্যেই এক ব্যক্তি তোমাদেরকে সেসব ঘটনা বলে দেয়, যা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়ে গেছে এবং সেসব ঘটনার কথাও বলে, যা ভবিষ্যতে ঘটবে। অতএব তোমরা সত্যের উপর অটল-অবিচল থাক। তা না হলে আল্লাহ তোমাদেরকে শাস্তি দিতে বিন্দুমাত্র পরোয়া করবেন না। শীঘ্রই এমন এক জাতির আবির্ভাব হবে, যারা তাদের উপর আগত শাস্তি থেকে নিজেদের বিন্দুমাত্র রক্ষা করতে পারবে না। এ হাদিসের সনদ 'হাসান' পর্যায়ের। কিন্তু অন্যরা হাদিসটি বর্ণনা করেন নি।

কথিত আছে, সালেহ আ.-এর সম্প্রদায়ের লোকজন দীর্ঘায়ু হত। মাটির ঘর বানিয়ে তারা বাস করত। কিন্তু কারো মৃত্যুর আগে তার ঘর বিনষ্ট হয়ে যেত। এ কারণে তারা পাহাড় কেটে প্রাসাদ নির্মাণ করত।

ইতিহাসবিদগণ লিখেছেন, হযরত সালেহ আ.-এর নিকট নিদর্শন দাবি করলে আল্লাহ ওই কওমের জন্যে উটনী প্রেরণ করেন। একটি পাথর থেকে উটনীটি বের হয়ে আসে। এ উটনী ও তার পেটের বাচ্চার সাথে দুর্ব্যবহার করতে তাদেরকে তিনি নিষেধ করেন। দুর্ব্যবহার করলে আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি আসবে বলেও তিনি জানিয়ে দেন। তিনি আরও জানিয়ে দেন, শীঘ্রই এরা উটনীটিকে হত্যা করবে এবং এর কারণেই তারা ধ্বংস হবে। যে ব্যক্তি উটনীটিকে হত্যা করবে, তিনি তার পরিচয়ও তুলে ধরেন। তার গায়ের রং হবে গৌর, চোখের রং নীল এবং তার চুল হবে পিঙ্গল বর্ণের। সম্প্রদায়ের লোকজন এ বৈশিষ্ট্যের কোনো শিশু জন্মগ্রহণ করলে সাথে সাথে তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে গোটা জনপদে ধাত্রীদের নিয়োজিত করে। এ অনুসন্ধান দীর্ঘকাল পর্যন্ত

অব্যাহত থাকে। এভাবে এক প্রজন্মের পর অন্য প্রজন্মের অবসান ঘটে। তারপর একসময়ে উক্ত সম্প্রদায়ের এক সর্দার ব্যক্তির পুত্রের সাথে আর এক সর্দার ব্যক্তির কন্যার বিবাহ প্রস্তাব দেয়। সেমতে বিবাহও হয়। এ দম্পতির ঘরেই উটনীর হত্যাকারীর জন্ম হয়। শিশুটির নাম রাখা হয় কিদার ইবনে সালিফ। সন্তানের পিতা-মাতা ও বাপ-দাদা সম্ভ্রান্ত ও প্রভাবশালী হওয়ার কারণে ধাত্রীদের পক্ষে তাকে হত্যা করা সম্ভব হল না। শিশুটি দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। অন্য শিশুরা এক মাসে যতটুকু বড় হয়, সে এক সপ্তাহে ততটুকু বড় হয়ে যায়।

এভাবে সে সম্প্রদায়ের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। সবাই তাকে নেতা হিসেবে মেনে চলে। একপর্যায়ে তার মনের মধ্যে উটনী হত্যা করার বাসনার উদ্রেগ হয়। সম্প্রদায়ের আরও আট ব্যক্তি এ ব্যাপারে তাকে অনুসরণ করে। এ নয়জন লোকই হযরত সালেহ আ.কেও হত্যার ষড়যন্ত্র করে। সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় কারো দ্বারা এ ঘটনা ঘটে নি। ওই কয়েকজন অল্প বয়সী যুবক এ ঘটনাটি ঘটিয়েছে।

কথিত আছে, তখন সালেহ আ.-এর প্রতিকার হিসাবে উটনীটির বাচ্চাটিকে নিয়ে এসে তার সাথে উত্তম ব্যবহার করার নির্দেশ দেন। লোকজন বাচ্চাকে ধরে আনার জন্যে অগ্রসর হলে বাচ্চাটি পাহাড়ে উঠে যায়। লোকজনও পিছু পিছু পাহাড়ে উঠল। কিন্তু বাচ্চা আরও উপরে উঠে পাহাড়ের শীর্ষে চলে যায়। যেখানে তারা পৌঁছতে সক্ষম হয় নি। বাচ্চা সেখানে গিয়ে তিনবার ডাক দেয়। তখন সালেহ আ. সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা তিনদিন পর্যন্ত বাড়িতে বসে জীবন উপভোগ কর! এ এমন এক ওয়াদা, যা মিথ্যা হওয়ার নয়। নবী তাদেরকে আরও জানালেন, আগামীকাল তোমাদের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে যাবে পরের দিন রক্তিম এবং তৃতীয় দিন কালো রং ধারণ করবে। চতুর্থ দিনে এক বিকট শব্দ এসে তাদেরকে আঘাত হানে। ফলে তারা নিজ নিজ ঘরে মরে উপুড় হয়ে পড়ে থাকে। এ বর্ণনার সঙ্গে কোনো কোনো দিক সম্পর্কে প্রশ্নের অবকাশ রয়েছে এবং কোরআনের স্পষ্ট বর্ণনার সাথে সংঘর্ষপূর্ণ। যা ইতোপূর্বে আমরা আলোচনা করে এসেছি। সঠিক তত্ত্ব আল্লাহই জানেন।

কয়েকটি উপদেশমূলক দৃষ্টান্ত

১। 'নাক্বাতুল্লাহ' যদিও সালেহ আ.-এর একটি মোজেযা। অর্থাৎ তাঁর নবুয়তের সত্যতার একটি নিদর্শন ছিল, তবুও কোরআন মাজিদ বলে এটা সামুদ সম্প্রদায়ের জন্য পরীক্ষা ছিল এবং পরিণামে তাদের ধ্বংসের নিদর্শন প্রমাণিত হল। যেমন আল্লাহ পাক বলেন :

إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ

"নিঃসন্দেহে আমি তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য উটনী পাঠিয়েছি। অতএব হে নবী! এর অপেক্ষায় থাকুন এবং ধৈর্যধারণ করতে থাকুন।" (সূরা আলকামার ; ২৭)

২। আল্লাহ পাকের প্রচলিত রীতি হল, যদি তিনি কোনো কওমের হেদায়েতের জন্য তাঁর নবীকে প্রেরণ করেন এবং কওম তাঁর হেদায়েতের প্রতি কর্ণপাত না করে, তবে ওই কওমকে ধ্বংসই করে দেওয়া জরুরি হয়ে যায় না। কিন্তু যেই কওম নিজেদের নবীর নিকট মোজেযা তলব করে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়, যদি তাদের দাবিকৃত মোজেযা প্রকাশিত হয়ে যায়, তবে তারা অবশ্যই ঈমান আনয়ন করবে। এরপর যদি তারা ঈমান আনয়ন না করে, তবে সেই কওমের ধ্বংস সুনিশ্চিত হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা তাদের ক্ষমা করেন না, যদি না তারা তওবা করে এবং আল্লাহর দীন কবুল করে, কিংবা আল্লাহর আযাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে অন্যান্য লোকদের জন্য উপদেশমূলক দৃষ্টান্ত হয়।

৩। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পয়গাম্বরী আল্লাহ তাআলার এ নিয়মের উর্ধ্বে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আমি আল্লাহ পাকের দরবারে প্রার্থনা করেছি, তিনি যেন আমার (বর্তমান ও ভবিষ্যতের উম্মতদের উপর ব্যাপক আযাব নাযিল না করেন এবং কোরআন মাজিদে আল্লাহ পাক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম.-এর সেই দোয়া এই বলে মনযুর করেছেন :

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ

"হে রাসূল! আপনি তাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকাকালে আল্লাহ তাআলা এ উম্মতের উপর ব্যাপক আযাব নাযিল করবেন না।"

৪। একটি মারাত্মক ভুল এবং নফসের ধোঁকা হলো, মানুষ স্বচ্ছলজীবিকা, আরামের যিন্দেগি এবং দুনিয়াবি মান-মর্যাদাকেই নিরাপত্তা মনে করে। যে সম্প্রদায় বা ব্যক্তির কাছে এ সমস্ত বিদ্যমান রয়েছে, তারা অবশ্যই আল্লাহ তাআলার আশ্রয়ে আছে। এমনকি তাদের স্বচ্ছলতাই প্রমাণ করে আল্লাহ তাআলার সন্তোষ ও সম্মতি তাদের সাথে ছিল।

এ ধারণা ভুল এবং ধোঁকা এ জন্য, এই সামুদের ঘটনাটিতে স্থানে স্থানে বর্ণিত আছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেশি স্বচ্ছলতা ও সুখ-শান্তি অধিকতর আযাব ও ধ্বংসের পূর্বাভাস বলে সাব্যস্ত হয়ে থাকে। যদিও কওমসমূহের জন্য এর মেয়াদ কয়েক মাস কিংবা কয়েক বছর নয় বরং ভীত করে দেওয়ার মতো দীর্ঘকালই হোক না কেন। কিন্তু সর্বপ্রকারের পার্থিব সফলতা এবং আনন্দময় জীবনের সাথে যখন কুফর, অবাধ্যচারণ এবং অহঙ্কার কোনো কওমের একান্ত অভ্যাসে পরিণত হয়, তখন মনে করবে, কওমের ধ্বংস হওয়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে। মনে রাখবে :

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ

"তোমার রবের ধরা বড় কঠিন।"

অবশ্য যদি এ সমস্ত শান্তি ও আনন্দময় জীবনের সাথে কওমের অধিকাংশ লোক আল্লাহ পাকের শোকর আদায়কারী হয়, তাঁর বান্দাগণের সাথে সদাচারী হয় এবং পরস্পর নেকনিয়ত ও হিতাকাঙ্ক্ষার উপর কাজ করতে থাকে, তবে নিঃসন্দেহ তারা আল্লাহ পাকের দরবারে প্রিয়। তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। আর তাদের জন্য এই পার্থিব জীবনের অসীম নেয়ামতের ঘোষণা রয়েছে। যেমন আল্লাহ পাক বলেন :

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا

"আল্লাহ পাক ওই সমস্ত লোকের সাথে ওয়াদাবদ্ধ হয়েছেন, যারা তোমাদের মধ্য হতে ইমান এনেছে এবং নেকআমল করেছে এই মর্মে, তাদেরকে জমিনের প্রতিনিধিত্ব দান করবেন। যেমনি তাদের পূর্ববর্তী লোকদের প্রতিনিধি বানিয়েছিলেন। আর তাদের জন্য তাদের দীন ও ঈমান মযবুত করে দিবেন, যেরূপ তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছিলেন। আর তাদের ভয়-ভীতিকে নিরাপত্তায় রূপান্তরিত করে দেবেন। তারা আমার ইবাদত করবে এবং আমার সাথে (কাউকেও কোনো প্রকারেই) শরিক করবে না।" (সূরা নূর : ৫৫)

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ

"আর নিঃসন্দেহ আমি নসিহতের পর যাবুর কিতাবে লিখে দিয়েছি, জমিনের উত্তরাধিকারিত্ব আমার নেককার বান্দাগণ লাভ করবে।" (সূরা আম্বিয়া : ১০৫)

এ আয়াতগুলো স্পষ্টরূপে প্রমাণ করছে, শাসনক্ষমতা ও রাষ্ট্রপরিচালনার অধিকার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রদানের ওয়াদা তাদেরই প্রাপ্য, যারা মুমিনও হয় এবং আল্লাহ্ পাকের আহকাম অনুযায়ী আমল করে 'সালেহীন' তথা নেককার লোকদের দলভুক্তও হয়। অর্থাৎ যাদের সামগ্রিক জীবন একসঙ্গে এ দুটি গুণে গুণান্বিত, তাদের জন্য নিঃসন্দেহে এ শাসনক্ষমতা ও রাষ্ট্রপরিচালনা ক্ষমতা আল্লাহ্ পাকের পুরস্কার ও অনুগ্রহ স্বরূপ হবে।

আর যদি এ গুণের অধিকারী না হয়, তবে শাসন-ক্ষমতা ও রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য মুমিন ও কাফেরের কোনো বৈশিষ্ট্য নাই। আল্লাহ্ পাকের প্রজ্ঞা ও কল্যাণকামনার প্রেক্ষিতে এটা পার্থিব উপকরণ হিসেবে সচল ছায়াও বটে। আর এরূপ শাসনক্ষমতা ও রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য এর প্রতি আল্লাহ্ পাকের সন্তোষ এবং সম্মতি থাকা জরুরি নয়।

হযরত ইবরাহীম আ.

হযরত ইবরাহীম আ.-এর বংশ পরিচয়

হযরত ইবরাহীম আ.-এর নসবনামা : ইবরাহীম ইবনে তারেখ (২৫০) ইবনে নাহূর (১৪৮) ইবনে সারূগ (২৩০) ইবনে রাউ (২৩৯) ইবনে ফালিগ (৪৩৯) ইবনে আবির (৪৬৪) ইবনে শালিহ (৪৩৩) ইবনে আরফাখশাদ (৪৩৮) ইবনে সাম (৬০০) ইবনে নূহ আ.। আহলে কিতাবদের গ্রন্থে এভাবেই হযরত ইবরাহীম আ.-এর নসবনামা উল্লেখ করা হয়েছে। উপরে বন্ধনীর মধ্যে বয়স দেখানো হয়েছে। হযরত নূহ আ.-এর বয়স ইতোপূর্বে তাঁর আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এখানে পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নেই।

হাফেয ইবনে আসাকির রহ. তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে ইসহাক ইবনে বিশর কাহিলীর 'আল-মাবদা' গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, ইবরাহীম আ.-এর মায়ের নাম ছিল উমায়লা। এরপর তিনি ইবরাহীম আ.-এর জন্মের এক দীর্ঘ কাহিনীও লিখেছেন। কালবী লিখেছেন, ইবরাহীম আ.-এর মায়ের নাম বুনা বিনতে কারবানা ইবনে কুরসি। তিনি ছিলেন আরফাখশাদ ইবনে সাম ইবনে নূহের বংশধর।

ইবনে আসাকির হযরত ইকরামা রাযি.-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত ইবরাহীম আ.-এর কুনিয়াত-উপনাম ছিল আবুয যায়ফান। বর্ণনাকারীগণ বলেছেন, তারেখের বয়স যখন ৭৫ বছর তখন তার ঔরসে ইবরাহীম, নাহূর ও হারান-এর জন্ম হয়। হারানের পুত্রের নাম ছিল লূত আ.। বর্ণনাকারীদের মতে ইবরাহীম ছিলেন তিন পুত্রের মধ্যে মেজ। হারান পিতার জীবদ্দশায় নিজ জন্মস্থান কালদান অর্থাৎ বাবেলে (ব্যাবিলনে) মৃত্যুবরণ করেন। ঐতিহাসিক ও জীবনীকারদের নিকট এ মতই প্রসিদ্ধ ও যথার্থ।

ইবনে আসাকির হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন : ইবরাহীম আ. গুতায়ে দামেশকের বুরযা নামক গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। যা কাসিয়ুন পর্বতের সন্নিকটে অবস্থিত। এরপর ইবনে আসাকির বলেন : সঠিক মতে হযরত লূত আ. কে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে যখন তিনি এখানে আগমন করেছিলেন, তখন তিনি সেখানে সালাত আদায় করেছিলেন। ইবরাহীম আ. বিবি সারাহকে এবং নাহূর আপন ভাই হারানের কন্যা মালিকাকে বিবাহ করেন।

সারাহ ছিলেন বন্ধ্যা। তার কোনো সন্তান হত না। ইতিহাসবেত্তাদের মতে তারাখ নিজ পুত্র ইবরাহীম তার স্ত্রী সারাহ ও হারানের পুত্র লূতকে নিয়ে কালাদানীদের এলাকা থেকে কেনানের উদ্দেশে রওনা হন। হারান নামক স্থানে তারা অবতরণ করেন। এখানেই তারেখের মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল দুই শ পঞ্চাশ বছর।

এ বর্ণনা থেকে প্রমাণ হয়, ইবরাহীম আ.-এর জন্ম হারানে হয় নি বরং কাশদানী জাতির ভূ-খণ্ডই তার জন্মস্থান। এ স্থানটি হল বাবেল ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা। এরপর

তারা সেখান থেকে কেনানের আবাসভূমির উদ্দেশে যাত্রা করেন। এটা হল বায়তুল মুকাদ্দাসের এলাকা। তারপর তারা হারানে বসবাস শুরু করেন। হারান হল সেকালের কাশদানী জাতির আবাসভূমি। জাসীরা এবং শামও এর অন্তর্ভুক্ত।

এখানকার অধিবাসীরা সাতটি নক্ষত্রের পূজা করত। সেই জাতির লোকেরা দামেশক শহর নির্মাণ করেছিল। তারা এই দীনের অনুসারী ছিল। তারা উত্তর মেরুর দিকে মুখ করে বিভিন্ন ধরনের ক্রিয়াকলাপ বা মন্ত্রের দ্বারা সাতটি তারকার পূজা করত। এই কারণেই প্রাচীন দামেশকের সাতটি প্রবেশ দ্বারের প্রতিটিতে উক্ত সাত তারকার এক একটি তারকার বিশাল মূর্তি স্থাপিত ছিল। এদের নামে তারা বিভিন্ন পর্ব ও উৎসব পালন করত। হারানের অধিবাসীরাও নক্ষত্র ও মূর্তি পূজা করত।

মোটকথা, সে সময় ভূ-পৃষ্ঠে যত লোক ছিল, তাদের মধ্য থেকে শুধু ইবরাহীম আ., তাঁর স্ত্রী (সারা) ও ভাতিজা লূত আ. ব্যতীত সবাই ছিল কাফের। আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহীম আ. দ্বারা সেসব দুষ্কৃতি ও ভ্রান্তি বিদূরিত করেন। কেননা আল্লাহ তাকে বাল্যকালেই সঠিক পথের সন্ধান দেন। রাসূল হওয়ার গৌরব দান করেন এবং বৃদ্ধ বয়েসে খলীল বা বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন।

তাওরাতে হযরত ইবরাহীম আ.

ইবরাহীম ইবনে তারেখ ইবনে নাহুর ইবনে সারূজ ইবনে রাউ ইবনে ফালেহ ইবনে আবের ইবনে ছালেহ ইবনে আরফাকশায ইবেন সাম ইবনে নূহ আ.। এ বিবরণটি তাওরাত এবং ইতিহাসের অনুরূপ। কিন্তু কোরআন মাজিদে তাঁর পিতার নাম 'আযর' বলা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে :

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً

"আর (স্মরণ করুন সে সময়ের কথা) যখন ইবরাহীম নিজের পিতা 'আযর'কে বললেন, আপনি কি মূর্তিসমূহকে খোদা সাব্যস্ত করছেন।" (সূরা আনআম : ৭৪)

তাওরাত বলে, ইবরাহীম আ. ইরাকের 'আত্তর' নামক স্থানের অধিবাসী এবং 'ফাদ্দান' গোত্রের লোক ছিলেন। আর তাঁর কওম ছিল মূর্তিপূজক।

ইঞ্জীল বর্ণনাতে বর্ণিত আছে, তাঁর পিতা ছুতারের কাজ করতেন এবং নিজ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন গোত্রের জন্য কাঠের মূর্তি নির্মাণ করে বিক্রয় করতেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহীম আ.-কে প্রথম হতেই সত্যের উপলব্ধি এবং সত্যপথের সন্ধান ও হেদায়েত দান করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস রাখতেন, মূর্তিগুলি শুনতেও পারে না, দেখতেও পারে না এবং কারো ডাকে সাড়া দিতেও পারে না কারো ক্ষতি বা উপকার সাধনের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্কও নেই।

বস্তুত কাঠের এ পুতুলগুলো এবং অন্যান্য হস্তনির্মিত পদার্থগুলির মধ্যে কোনো পার্থক্যও নেই। তিনি প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় স্বচক্ষে দেখতেন, এ সমস্ত নিষ্প্রাণ

মূর্তিগুলোকে আপন পিতা নিজ হাতে নির্মাণ করে থাকেন। এবং যেরূপ তাঁর ইচ্ছা হয় নাসিকা, কর্ণ, চক্ষু এবং দেহাবয়ব কর্তন ও কুন্দন করে নির্মাণ করেন। এরপর ক্রেতাদের নিকট যে সমতুল্য ও সমকক্ষ বলা যেতে পারে? কখনও না। এরপর নবুয়ত লাভ করে সর্বপ্রথম তিনি এদিকেই মনোযোগ প্রদান করলেন।

আযর শব্দের বিশ্লেষণ

যেহেতু ইতিহাস ও তাওরাত হযরত ইবরাহীম আ.-এর পিতার নাম 'তারেখ' বলছে আর কোরআন মাজিদ বলছে, 'আযর'। তাই মুফাসসিরগণ এর তথ্য-বিশ্লেষণে দ্বিমত পোষণ করেছেন : (১) এমন ছুরত বের করতে হবে, যাতে উভয় নাম এক হয়ে অনৈক্য দূর হয়ে যায়। (২) তথ্য বিশ্লেষণপূর্বক মীমাংসিত কথা বলে দেওয়া অর্থাৎ এ দুটি নামের মধ্যে কোনটি সঠিক আর কোনটি ভুল অথবা দুটি নামই ঠিক, কিন্তু দুজন পৃথক পৃথক লোকের নাম কি না?

প্রথমদল আলেমগণের মতে, দুটি নামই এক ব্যক্তির। তবে 'তারেখ' ব্যক্তিবাচক নাম আর আযার 'গুণবাচক নাম।' এদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, 'আযর' হিব্রু ভাষায় মূর্তির প্রেমিককে বলা হয়। আর যেহেতু তারেখের মধ্যে মূর্তিনির্মাণ ও মূর্তিপূজা উভয় গুণই বিদ্যমান ছিল। এ কারণে তাকে 'আযার' নামে অভিহিত করা হয়েছে। আবার কেউ কেউ ধারণা করেন, 'আযর' শব্দের অর্থ 'আওয়ায'। অর্থাৎ স্বল্প বুদ্ধি বা নির্বোধ এবং অতিশয় দুর্বল বৃদ্ধ। যেহেতু তারেখের মধ্যে এ বিষয়গুলো বিদ্যমান ছিল, তাই তাকে এ বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে। কোরআন মাজিদ তার ওই গুণবাচক প্রসিদ্ধ নামটিকে বর্ণনা করেছে। সোহাইল 'রাওযুল আনফ' নামক কিতাবে এই মতই গ্রহণ করেছেন।

আর দ্বিতীয় দল আলেমগণের বিশ্লেষণ মতে, 'আযর' একটি মূর্তির নাম। 'তারেখ' সেই মূর্তিটির পূজারী ও মোহন্ত ছিল। যেমন মুজাহিদ রহ. থেকে রেওয়ায়েত আছে, কোরআন মাজিদে উপর্যুক্ত আয়াতের অর্থ হল :

أَتَتَّخِذُ آزَرَ الها اى أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً

"আপনি কি 'আযর'কে খোদা বলে মান্য করেন। অর্থাৎ মূর্তিগুলিকে খোদা বলে মানেন।"

আর 'ছাগানীর' মতও প্রায় এরূপই। শুধু ব্যাকরণের দিক দিয়ে তিনি উহ্য শব্দ সম্বন্ধে অন্য পথ অবলম্বন করেছেন। মোটকথা, তাদের উভয়ের নিকট آزر শব্দটি أَبِيهِ শব্দের بدل অর্থাৎ noun of opposition নয় বরং মূর্তির নাম। এ বর্ণনানুযায়ী ইবরাহীম আ.-এর পিতার নাম কোরআন মাজিদে উল্লেখ নেই।

একটি প্রসিদ্ধ কথাও আছে, হযরত ইবরাহীম আ.-এর পিতার নাম তারেখ ছিল এবং তার চাচার নাম ছিল 'আযর'। যেহেতু 'আযার'ই তাকে সন্তানের মতো প্রতিপালন

করেছিলেন, এ জন্য কোরআন মাজিদ 'আযর'কে তার পিতা বলে সম্বোধন করেছে। যেমন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, "চাচা পিতারই অনুরূপ।"

আল্লামা আবদুল ওহ্হাব বোখারী বলেন : এ সমস্ত অভিমতের মধ্যে মুজাহিদ রহ.-এর অভিমতই যুক্তিসঙ্গত ও গ্রহণযোগ্য। কেননা মিসরবাসীদের একটি পুরাতন দেবতার নাম 'আযওয়ারীস'ও পাওয়া যায়। এর অর্থ 'শক্তিমান ও নামানুকরণ খোদা।' মূর্তিপূজক জাতিগুলোর নামানুসারেই নতুন দেবতাগুলির নাম 'আযর' রাখা হয়েছে। তবে হযরত ইবরাহীম আ.-এর পিতার নাম 'তারেখ'ই ছিল।

আমাদের মতে এ সমস্ত উক্তি অযথা জটিলতা সৃষ্টি করা ছাড়া অন্য কিছুই নয়। কেননা কোরআন মাজিদ যখন পরিষ্কারভাবে 'আযর'কে ইবরাহীম আ.-এর পিতাই বলেছে, তখন বংশপরিচয় বিশারদের এবং বাইবেলের আনুমানিক যুক্তিতে প্রভাবিত হয়ে কোরআন মাজিদের নিশ্চিত বিবৃতিকে রূপক অর্থে নেওয়ার কিংবা তা হতেও অগ্রসর হয়ে অযথা কোরআন মাজিদে ব্যাকরণ শাস্ত্রের উহ্য শব্দ মানার জন্য শরিয়তসম্মত কোনো প্রকৃত প্রয়োজন বাধ্য করছে?

যদি মেনে নেওয়া হয়, আযর মূর্তির প্রেমিককে বলা হয়। কিংবা কোনো মূর্তির নাম। এ দু কারণে আযরের নাম 'আযর' রাখা হয়েছে। যেমন : মূর্তিপূজক কওমগুলির মধ্যে প্রাচীনকাল হতে এ রীতি চলে আসছে, তারা কোনো কোনো সময় নিজেদের সন্তানের নাম 'দেবতার গোলাম' অর্থ প্রকাশ করে রাখত। আবার কোনো কোনো সময় দেবতা বা মূর্তির নামেই নাম রেখে দিত।

বস্তুত কালদী ভাষায় ادار 'আদার' শ্রেষ্ঠ পূজারীকে বলা হয়, আরবী ভাষায় একেই آزر'আযর' বলা হয়েছে। 'তারেখ' যেহেতু মূর্তি নির্মাতা ও শ্রেষ্ঠ মূর্তিপূজক ছিল, তাই সে 'আযর' নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এটা তার ব্যক্তিগত নাম ছিল না; বরং গুণবাচক উপাধি ছিল। উপাধি যখন নামের স্থান দখল করে ফেলেছে, তাই কোরআন মাজিদেও তাকে এ নামেই সম্বোধন করা হয়েছে। এছাড়াও সেই পবিত্র মানব ইবরাহীম আ.-এর চরিত্র এত উন্নত ছিল, মূর্তিপূজার নিন্দা প্রসঙ্গে যখন আযরের সঙ্গে তাঁর বিতর্ক হয়ে গেল এবং আযর বিরক্ত হয়ে বলল :

أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا

"ইবরাহীম! তুমি কি আমার খোদাদের প্রতি অসন্তুষ্ট? তুমি যদি এরূপ কার্য হতে নিবৃত্ত না হও, তবে নিশ্চয় তোমাকে প্রস্তর নিক্ষেপে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিব। যাও, আমার সম্মুখ হতে দূর হয়ে যাও।" (সূরা মারইয়াম : ৪৬)

এমন কঠোর ও বেদনাদায়ক কথোপকথনের সময়ও হযরত ইবরাহীম পিতৃসম্পর্কের মর্যাদা রক্ষা করে শুধু এতটুকুই বলেছিলেন :

سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا

"আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। অচিরেই আপনার জন্য আমি আমার পালনকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব। নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি অতি দয়ালু।

(সূরা মারইয়াম : ৪৭)

অতএব ইতিহাসের 'তারেখ'-ই মূলত আযর। এটা তার ব্যক্তিগত নাম, গুণবাচক নাম নয়। 'তারেখ' হয়ত ভুল নাম অথবা 'আযর' শব্দের অনুবাদ, যা তাওরাতের অন্যান্য নামের মতো শেষ পর্যন্ত অনুবাদ থাকে নি বরং আসল নামে পরিণত হয়ে গেছে।

'মারাতশী' সপ্তদশ শতাব্দীর একজন খৃস্টান শিক্ষাবিদ। তিনি কোরআন মাজিদের অনুবাদ করেছেন এবং কোরআন মাজিদের ওপর খুবই সূক্ষ্ম ও পক্ষপাতমূলক আক্রমণ করেছেন। তিনি এ ক্ষেত্রেও নিজের অভ্যাসানুযায়ী একটি অনর্থক ও দুর্বল প্রশ্নের অবতারণা করেছেন। তার সারমর্ম হল, "ইউযবিউসের গির্জার ইতিহাসের একটি বাক্যে এ শব্দটি এসেছে। যাকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভুল শব্দরূপের সাথে কোরআন মাজিদে যোগ করে দিয়েছেন।"

কথাটি নেহাৎ হাস্যকরই বটে। কারণ, মারাতশী নিজের এ দাবি প্রমাণে গির্জার ইতিহাসের সেই বাক্যাংশটুকুও উল্লেখ করে নি, যা হতে এ বাক্যাংশটুকু গৃহীত বলে উল্লেখ করেছে। এমনকি সেই মূল শুদ্ধ শব্দটিরও সন্ধান দেয় নি, যা হতে এই ভুল শব্দটি চয়িত হয়েছে। তা ছাড়া এটা বলে নি, কী প্রয়োজনে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বাক্যাংশটি উদ্ধৃত করেছিলেন? সুতরাং মারাতশীর এ উক্তিটি সম্পূর্ণ প্রমাণ বিহীন অনর্থক কথা, যা শুধু পক্ষপাতিত্ব ও মূর্খতার কারণে বলা হয়েছে। বস্তুত সত্য তা-ই, যা আমরা শুরুতে আলোচনা করেছি।

কোরআনের উক্ত আয়াত ও বর্ণিত হাদিসগুলো থেকে প্রমাণিত হয়, ইবরাহীম আ.-এর পিতার নাম আযর। ইবনে আব্বাস রাযি.-সহ অধিকাংশ বংশবিশারদদের মতে ইবরাহীম আ.-এর পিতার নাম তারেখ। আহলে কিতাবদের মতে তারেখ একটি মূর্তির নাম। ইবরাহীম আ.-এর পিতা এর পূজা করত আর এরই নামানুসারে তাকে তারেখ উপাধি দেওয়া হয়। কিন্তু প্রকৃত নাম আযর। ইবনে জারির লিখেছেন : সঠিক কথা হলো, 'আযর' তার প্রকৃত নাম অথবা 'আযর' ও 'তারেখ' দুটোই তার আসল নাম কিংবা এর কোনো একটা উপাধি এবং অপরটা নাম। ইবনে জারিরের উক্তিটি সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আল্লাহই অধিকতর জ্ঞাত।

হযরত নূহ আ. পর্যন্ত ইবরাহীম আ.-এর বংশধারা

তাওরাত ও ইতিহাস গ্রন্থে হযরত ইবরাহীম আ. হতে হযরত নূহ আ. পর্যন্ত বংশধারা গণনা করা হয়েছে। এ বর্ণনার শুদ্ধতা-অশুদ্ধতার ব্যাপারটি আনুমানিক ও ধারণাপ্রসূত মতের অধিক কিছু নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-

এর বংশ সম্বন্ধে যদিও সুনিশ্চিত, তিনি ইবরাহীম আ.-এর বংশধর, তবুও 'আদনান' হতে উপরের দিকের ক্রমধারাগুলো সম্বন্ধে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ফায়সালা হল, "বংশ সূত্রে বিজ্ঞগণ নামগুলোর নির্দিষ্টকরণে ভুল বর্ণনা করেছেন। অতএব হযরত ইবরাহীম আ. হতে হযরত নূহ আ. পর্যন্ত বংশধারা এই ভুল থেকে কেমন করে বিশুদ্ধ থাকতে পারে?

গণনানুযায়ী হযরত ইবরাহীম আ.-এর জন্মকাল হতে হযরত নূহ আ. পর্যন্ত ৮৯০ বছর। হযরত নূহ আ.-এর পূর্ণ বয়স যখন ৯৫০ বছর বলা হয়, তখন এর অর্থ এ দাঁড়ায়, হযরত নূহ আ.-এর বয়স ৬০ বছর বাকি থাকতে তাঁর জীবদ্দশায়ই হযরত ইবরাহীম আ.-এর জন্ম হয় এবং তাঁরা উভয়ে এই ষাট বছর সময়ে সমসাময়িকভাবে জীবন যাপন করেন। নিঃসন্দেহে এটা ভিত্তিহীন কথা। এবং নিশ্চিতরূপে ভুল ও অর্থহীন। কাজেই একথা মানতেই হবে, তাওরাতের গণনার মধ্যে বানোয়াটি রয়েছে। বাস্তবেই প্রাচীনকালে ইহুদিদের নিকট ইতিহাসের অধ্যায় এ জাতীয় কাহিনী এবং রেওয়ায়েতের ওপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। এতে ঐতিহাসিক সত্যতা এবং সময়ের বৈপরিত্বে মতানৈক্যের প্রতি বিন্দুমাত্র লক্ষ রাখা হয় নি।

নবুয়ত প্রাপ্তি

কোরআন মাজিদে হযরত ইবরাহীম আ.-এর জ্ঞানচক্ষু উন্মোচনকারী হেদায়েত ও সৎপথ প্রাপ্তির বিষয় এরূপে বর্ণনা করা হয়েছে :

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ (٥١) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ (٥٢) قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ (٥٣) قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٥٤) قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ (٥٥) قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ

"নিঃসন্দেহে আমি ইবরাহীমকে প্রথম হতেই হেদায়েত ও সৎপথের জ্ঞান দান করেছিলাম এবং তাঁর (কার্যকলাপ) সম্বন্ধে খুব পরিজ্ঞাত ছিলাম। যখন তিনি তাঁর পিতা ও কওমকে বললেন, এই মূর্তিগুলি কি, যা নিয়ে তোমরা বসে আছ? তারা বলল, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষগণকে এদেরই পূজা করতে দেখেছি। ইবরাহীম আ. বললেন, নিঃসন্দেহে তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষগণ প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছ। তারা উত্তর দিল– তুমি কি আমাদের জন্য কোনো সত্য নিয়ে এসেছ, নাকি এমনি বিদ্রুপকারীদের মতো বলছ? ইবরাহীম আ. বললেন, (এ সমস্ত মূর্তি তোমাদের প্রতিপালক নয়) বরং তোমাদের প্রতিপালক জমিন ও আসমানসমূহের পালনকর্তা এই সমুদয়কে সৃষ্টি করেছেন। আর আমি এ বিশ্বাসই পোষণ করেছি।

(সূরা আম্বিয়া : ৫১-৫৬)

যখন হযরত ইবরাহীম আ.-এর ওপর আল্লাহ তাআলার অবারিত অনুগ্রহ ও দানের স্রোত অবিরত ধারায় প্রবাহিত হল, তখন তিনি আম্বিয়ায়ে কেরামের সারিতে বিশিষ্ট স্থান লাভ করলেন এবং তাঁর দাওয়াত ও তাবলিগ কেন্দ্রটি 'দীনে হানিফ' নামে অভিহিত হল।

তিনি যখন দেখলেন, কওম মূর্তিপূজা, নক্ষত্রপুজা এবং বিভিন্ন জড়পদার্থের পূজায় এমনভাবে মশগুল রয়েছে, আল্লাহ তাআলার অসীম কুদরত ও তাঁর একত্ব এবং তাঁর অভাব-শূন্যতার কল্পনাও তাদের অন্তরে অবশিষ্ট নেই। তাদের নিকট আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের বিশ্বাসের চেয়ে অধিক বিস্ময়কর এবং আজগুবি কথা আর কিছুই নেই। এমনি সময়ে হযরত ইবরাহীম আ. এক আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করে কওমের সম্মুখে সত্যের পয়গাম উপস্থিত করলেন এবং ঘোষণা করলেন :

"হে কওম! ইহা আমি কি দেখছি? তোমরা স্বহস্তে নির্মিত মূর্তিসমূহের পূজায় মগ্ন রয়েছ! তোমরা কি এমনই অজ্ঞতার নিদ্রায় বিভোর রয়েছ, সে সমস্ত কাঠ নিজেরা যন্ত্রপাতির সাহায্যে কেটেকুটে মূতি প্রস্তুত করছ। যদি তা তোমাদের মর্জি অনুযায়ী তৈরি না হয়, তবে একে ভেঙ্গে দিয়ে অন্য একটি নির্মাণ করছ। নির্মাণের পর তাকেই আবার পূজা কর এবং উপকার ও ক্ষতি সাধনের মালিক মনে কর। তোমরা এ সমস্ত অনর্থক কর্ম হতে বিরত হও। আল্লাহ তাআলার একত্ববাদ স্বীকার করে নাও। এবং একমাত্র সেই প্রকৃত মালিকের সম্মুখে বিনয়ের সঙ্গে মাথা নত কর, যিনি আমার ও তোমাদের এবং সমগ্র বিশ্ব জগতের স্রষ্টা ও মালিক।

কিন্তু কওম তাঁর আহ্বানের প্রতি একটুও কর্ণপাত করল না। আর যেহেতু তারা সত্য গ্রহণকারী কর্ণ এবং সত্য দর্শনকারী চক্ষু হতে বঞ্চিত ছিল, তাই তারা এমন উচ্চ মর্যাদাশালী পয়গম্বরের সত্যের দাওয়াত নিয়ে উপহাস করল এবং আরও অধিক অবাধ্যতা ও নাফরমানি করতে লাগল।

পিতাকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান এবং পিতা-পুত্রে বিতর্ক

হযরত ইবরাহীম আ. দেখলেন, শিরকের সর্বাপেক্ষা প্রধান কেন্দ্র তাঁর নিজের ঘরে বর্তমান। আর আযরের মূর্তিনির্মাণ ও মূর্তিপূজা গোটা কওমের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র ও মেরুদণ্ড হয়ে রয়েছে। তাই তিনি ভাবলেন, সুকৌশল হচ্ছে সত্যের প্রতি আহ্বান এবং সত্যের পয়গাম প্রচারের কর্তব্য পালন নিজ ঘর হতেই আরম্ভ করা। অতএব ইবরাহীম আ. সর্বপ্রথম নিজের পিতা আযারকেই লক্ষ্য করে বললেন : পিতা! আল্লাহর এবাদত এবং আল্লাহকে চেনার জন্য আপনি যে পন্থা অবলম্বন করেছেন এবং যাকে পূর্বপুরুষদের পুরাতন পন্থা বলেন, এটা প্রকাশ্য ভ্রান্তি এবং বাতেল পন্থা। সিরাতুল মুস্ত াকীম ও সত্যপথ হলো, আমি যেদিকে আহ্বান করছি। পিতা! এক আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্বে বিশ্বাস করাই নাজাতের উৎস; আপনার হাতে গড়া এ সমস্ত মূর্তিপূজা নয়।

আপনি এই পন্থা ত্যাগ করুন এবং আল্লাহর একত্বের পথকে দৃঢ়তার সঙ্গে গ্রহণ করুন। তাতে আপনি আল্লাহ তাআলার সন্তোষ এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্য লাভ করতে পারবেন। কিন্তু আফসোস! আযরের উপর ইবরাহীম আ.-এর এ উপদেশ ও নসিহতের কোনোই ক্রিয়া হল না বরং সত্য কবুল করার পরিবর্তে আযর তার পুত্রকে ধমকাতে লাগল :

"তুমি যদি মূর্তিসমূহের নিন্দাবাদ হতে বিরত না হও, তবে আমি তোমাকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করব।"

হযরত ইবরাহীম আ. দেখলেন, বিষয়টা সীমা ছাড়িয়ে গেছে। একদিকে যদি পিতার সম্মান রক্ষা করার প্রশ্ন হয়, তবে অন্যদিকে কর্তব্য পালন, সত্যের সংরক্ষণ ও আল্লাহর আদেশ পালনের প্রশ্ন। অতএব তিনি চিন্তা করলেন এবং শেষ পর্যন্ত তা-ই করলেন, যা এরূপ একজন মনোনীত মানুষ এবং আল্লাহ পাকের উচ্চ মর্যাদাশালী পয়গম্বরের মর্যাদার উপযোগী ছিল। তিনি পিতার কঠোর উক্তির উত্তর কঠোরতার দ্বারা দিলেন না, হীনতা ও নীচতার পন্থা অবলম্বন করলেন না। বরং নিছক নম্রতা, কোমলতা এবং মহান চরিত্রের সাথে উত্তর দিলেন : পিতা! যদি আমার কথার উত্তর এটাই হয়, তবে আজ থেকে আপনাকে সালাম করে পৃথক হয়ে যাচ্ছি। আমি আল্লাহ তাআলার সত্য ধর্ম ত্যাগ করতে পারি না। এবং কোনো অবস্থাতেই মূর্তিসমূহের পূজা করতে পারি না। আমি আজ হতে আপনার সংশ্রব থেকে পৃথক হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু আপনার অগোচরে আপনার জন্য আল্লাহ তাআলার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকব। যাতে আপনার হেদায়েত লাভের সৌভাগ্য হয় এবং আপনি আল্লাহর আযাব হতে নাজাত পান।

হযরত ইবরাহীম আ. সর্বপ্রথম আপন পিতাকে ঈমানের দাওয়াত দিলেন। তার পিতা ছিল মূর্তিপূজারী। কাজেই কল্যাণের দিকে আহ্বান পাওয়ার অধিকার তারই সবচাইতে বেশি। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا (٤١) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا (٤٢) يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا (٤٣) يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا (٤٤) يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا (٤٥) قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا (٤٦) قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا (٤٧) وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا -

স্মরণ কর! এ কিতাবে উল্লিখিত ইবরাহীম আ.-এর কথা! সে ছিল সত্যনিষ্ঠ নবী। যখন সে তার পিতাকে বলল, 'হে আমার পিতা! তুমি কেন তার ইবাদত কর- যে শুনে

না, দেখে না এবং তোমার কোনো কাজেই আসে না? হে আমার পিতা! আমার নিকট তো এসেছে জ্ঞান, যা তোমার নিকট আসে নি। সুতরাং আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাকে সঠিক পথ দেখাব। হে আমার পিতা! শয়তানের ইবাদত কর না; শয়তান তো দয়াময়ের অবাধ্য। হে আমার পিতা! আমি আশঙ্কা করছি, তোমাকে দয়াময়ের শাস্তি স্পর্শ করবে এবং তুমি শয়তানের বন্ধু হয়ে পড়বে। পিতা বলল, 'হে ইবরাহীম! তুমি কি আমার দেব-দেবী হতে বিমুখ? যদি তুমি নিবৃত্ত না হও, তবে আমি পাথরের আঘাতে তোমার প্রাণনাশ করবই। তুমি চিরদিনের জন্যে আমার নিকট হতে দূর হয়ে যাও!' ইবরাহীম আ. বলল, 'তোমার প্রতি সালাম। আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব, তিনি আমার প্রতি অতিশয় অনুগ্রহশীল। আমি তোমাদের হতে ও তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত কর, তাদের হতে পৃথক হচ্ছি। আমি আমার প্রতিপালককে আহ্বান করি, আশা করি আমার প্রতিপালককে আহ্বান করে আমি ব্যর্থ হব না। (সূরা মারইয়াম : ৪১-৪৮)

এখানে আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম আ. ও তাঁর পিতার মধ্যে যে কথোপকথন ও বিতর্ক হয়েছিল, তা উল্লেখ করেছেন। সত্যের দিকে পিতাকে তিনি কোমল ভাষায় ও উত্তম ভঙ্গিতে আহ্বান করেছেন, তা এখানে সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে। তিনি পিতার মূর্তিপূজার অসারতা তুলে ধরেছেন, তা হলে এরা কিভাবে উপাসকদের উপকার করবে? কিভাবে তাদের খাদ্য ও সাহায্য দান করে তাদের কল্যাণ করবে? তারপর আল্লাহ তাকে যে হেদায়েত ও উপকারী জ্ঞান দান করেছেন, তার ভিত্তিতে পিতাকে সর্তক করে দেন, যদিও বয়সে তিনি স্বভাবতই পিতার চেয়ে ছোট।

يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا

"হে আমার পিতা! আমার কাছে জ্ঞান এসেছে, যা আপনার নিকট আসে নি। সুতরাং আপনি আমার অনুসরণ করুন! আমি আপনাকে সরল সঠিক পথ দেখাব। অর্থাৎ এমন পথ যা অতি সুদৃঢ়, সহজ ও সরল। যে পথ অবলম্বন করলে দুনিয়া ও আখিরাতে আপনাকে কল্যাণের পথে নিয়ে যাবে। ইবরাহীম আ. যখন পিতার নিকট এই সত্য পথ ও উপদেশ পেশ করলেন। পিতা তা গ্রহণ করল না বরং উল্টো তাঁকে ধমকাল ও ভয় দেখাল। সে বলল :

قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا

"হে ইবরাহীম! তুমি কি আমার দেব-দেবী থেকে বিমুখ? যদি তুমি নিবৃত্ত না হও, তবে আমি পাথরের আঘাতে তোমার প্রাণনাশ করবই।"

কেউ কেউ বলেন, মৌখিকভাবে। আবার কেউ কেউ বলেন, বাস্তবেই পাথর মারব। وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا (চিরতরের জন্যে দূর হয়ে যাও) অর্থাৎ আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে দীর্ঘকালের জন্যে চলে যাও। ইবরাহীম আ. তখন বলেছিলেন : سَلَامٌ عَلَيْكَ ঃ অর্থাৎ

আমার পক্ষ থেকে কোনো রকম কষ্টদায়ক ব্যবহার তুমি পাবে না। আমার তরফ থেকে তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ। ইবরাহীম আ. অতিরিক্ত আরও বললেন :

سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا –আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। তিনি আমার প্রতি অতিশয় অনুগ্রহশীল।

ইবনে আব্বাস রাযি. প্রমুখ বলেছেন– حَفِيًّا অর্থ, لطيفا অর্থাৎ দয়ালু। কেননা তিনি আমাকে সত্য পথের সন্ধান দিয়েছেন। একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করার তাওফিক দিয়েছেন। কাজেই তিনি বললেন :

وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا

"আমি তোমাদেরকে পরিত্যাগ করছি এবং আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের পূজা তোমরা করছ, তাদেরও পরিত্যাগ করছি। আমি কেবল আমার পালনকর্তাকেই আহ্বান করি। আশা করি, আমার প্রতিপালককে আহ্বান করে আমি ব্যর্থ-নিষ্ফল হব না।"

এ ওয়াদা অনুযায়ী ইবরাহীম আ. পিতার জন্যে সর্বদা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন। পরে যখন জানলেন, তাঁর পিতা আল্লাহর দুশমন; তখন তিনি তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে দেন। যেমন আল্লাহ্ তাআলা বলেন :

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ
عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ

ইবরাহীম আ. তাঁর পিতার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন, তাকে এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বলে, এরপর যখন এটা তার নিকট সুস্পষ্ট হল, সে আল্লাহর শত্রু, তখন ইবরাহীম আ. তার সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। ইবরাহীম আ. তো কোমলপ্রাণ ও সহনশীল। (সূরা তাওবা : ১১৪)

ইমাম বোখারি রহ. হযরত আবু হোরায়রা রাযি. সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন কেয়ামতের দিন ইবরাহীম আ.-এর সাথে তাঁর পিতা আযরের সাক্ষাৎ হবে। আযরের চেহারা মলিন ও কালিমালিপ্ত দেখে ইবরাহীম আ. বলবেন : আমি কি আপনাকে দুনিয়ায় বলি নি, আমার অবাধ্য হবেন না? পিতা বলবে, 'আজ আর আমি তোমার অবাধ্য হব না।' তখন ইবরাহীম আ. বলবেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, পুনরুত্থান দিবসে আমাকে লাঞ্ছিত করবেন না। কিন্তু আমার পিতা যেখানে আপনার দয়া ও ক্ষমা থেকে দূরে থাকছে, সেখানে এর চেয়ে অধিক লাঞ্ছনা আর কি হতে পারে? আল্লাহ বলবেন, আমি কাফেরদের উপর জান্নাত হারাম করে দিয়েছি। তারপর বলা হবে : হে ইবরাহীম! তোমার পায়ের নিচে কি? নিচের দিকে তাকিয়ে তিনি দেখবেন, একটি জবাইকৃত পশু রক্তাপ্লুত অবস্থায় পড়ে আছে। তারপর পশুটির পাগুলি ধরে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

ইমাম বোখারি রহ. 'কিতাবুত তাফসিরে' ভিন্ন সূত্রে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম নাসায়িও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। এসব বর্ণনায় ইবরাহীম আ.-এর পিতা আযর বলে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

স্মরণ কর! ইবরাহীম আ. তার পিতা আযরকে বলেছিলেন, আপনি কি মূর্তিকে ইলাহরূপে গ্রহণ করেছেন? আমি আপনাকে ও আপনার সম্প্রদায়কে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখছি! (সূরা আনআম : ৭৪)

কওমকে ইসলামের প্রতি আহ্বান

পিতা ও পুত্রের মধ্যে যখন ঐক্য হওয়ার কোনোই উপায় হল না এবং আযর কোনোক্রমেই ইবরাহীম আ.-এর হেদায়াত ও নসিহত কবুল করল না, তখন হযরত ইবরাহীম আ. আযর হতে পৃথক হয়ে গেলেন এবং নিজে সত্যের দাওয়াত ও ধর্মপ্রচারকে ব্যাপক করে দিলেন। এখন শুধু আযরই সম্বোধনস্থল রইল না বরং গোটা কওমকে সম্বোধনস্থল করে নিলেন। কিন্তু কওম নিজেদের পূর্বপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করতে প্রস্তুত হল না। তারা ইবরাহীম আ.-এর কোনো কথাই শুনল না। বরং সত্যের দাওয়াতের সম্মুখে নিজেদের বাতেল মাবুদগুলোর মতোই বোবা, অন্ধ এবং বধির হয়ে রইল।

তাদের কান ছিল কিন্তু সত্যের আওয়াজ শ্রবণের জন্য বধির ছিল। চোখের পুতলিগুলি যথাস্থানেই জীবিত মানুষের চক্ষুর মতো অবশ্যই নড়াচড়া করত, কিন্তু সত্য দর্শন হতে বঞ্চিত ছিল। মুখ বাকশক্তি সম্পন্ন অবশ্যই ছিল, কিন্তু সত্যকথা উচ্চারণ হিসাবে বোবা ছিল। এই মর্মে সূরা আরাফে আল্লাহ তাআলা বলেন :

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

"তাদের অন্তর আছে কিন্তু তা দিয়ে বুঝে না, তাদের চক্ষু আছে কিন্তু তা দিয়ে দেখে না। এবং তাদের কান আছে কিন্তু তা দিয়ে শুনে না; এরা চতুষ্পদ জন্তুর মতো বরং তার চেয়েও অধিক পথভ্রষ্ট। তারা গাফলত এবং অমনোযোগিতার মধ্যে মত্ত-বিহ্বল। (সূরা আরাফ : ১৭৯)

আর যখন ইবরাহীম আ. তাদেরকে শক্তভাবে জিজ্ঞাসা করলেন : বল! তোমরা যাদের পূজা করছ, তারা তোমাদের কোনো উপকার বা ক্ষতি করতে পারে কি না? তারা বলল, আমরা এ সমস্ত বিষয়ের ঝগড়ায় লিপ্ত হতে চাই না। আমরা তো জানি, আমাদের পূর্বপুরুষগণ এটা করে আসছেন। অতএব আমরাও তা করছি। তখন হযরত ইবরাহীম আ. তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে বলতে লাগলেন, আমি তো তোমাদের

এ সমস্ত মূর্তিকে আমার শত্রু মনে করছি। অর্থাৎ তাদের হতে নির্ভীক হয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করছি। এরা যদি আমার কোনো ক্ষতি করতে সক্ষম হয়, তবে নিজেদের সখ ও আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে নিক।

অবশ্য আমি শুধু সেই সত্তাকে আমার মালিক মনে করছি, যিনি সারা জাহানের প্রতিপালক। যিনি আমাকে পয়দা করেছেন এবং সত্য ও সরল পথ প্রদর্শন করেছেন, যিনি আমাকে খাদ্য-পানীয় দান করেন। অর্থাৎ রিযিক প্রদান করেন। যখন আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি, তখন আমাকে সুস্থতা দান করেন। যিনি আমার জীবন ও মৃত্যুর মালিক। আমি কোনো অপরাধ বা ত্রুটি করে ফেললে তাঁর দরবারে আশা রাখি, তিনি আমাকে কিয়ামতের দিন ক্ষমা করে দিবেন। আমি তাঁর দরবারে প্রার্থনা করি, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে সঠিক মীমাংসার শক্তি দান করুন, আমাকে মুখের সত্যতা দান করুন আর আমাকে জান্নাতুন নাঈমের উত্তরাধীকারীদের শামিল করুন।

নসিহত ও উপদেশাবলীর ক্রিয়াশীল পদ্ধতিতে হযরত ইবরাহীম আ. নিজের পিতা ও কওমের সম্মুখে যা কিছু পেশ করলেন, সূরা শুআরায় বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে :

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ (٦٩) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ (٧٠) قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ (٧١) قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (٧٢) أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ (٧٣) قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (٧٤) قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (٧٥) أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ (٧٦) فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ (٧٧) الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ (٧٨) وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (٧٩) وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (٨٠) وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ (٨١) وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ (٨٢) رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (٨٣) وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ (٨٤) وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ (٨٥) وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ (٨٦) وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ (٨٧) يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (٨٨) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

"আর তাদেরকে ইবরাহীম আ.-এর সংবাদ পাঠ করে শুনিয়ে দিন, যখন তিনি নিজের পিতাকে ও নিজের কওমকে বললেন– কীসের পূজা করছ? তারা বলল, মূর্তিসমূহের পূজা করছি। অতএব তাদের নিকট অনবরত বসে থাকি। ইবরাহীম আ. বললেন : যখন তোমরা এদের ডাক, তখন এরা তোমাদের কথা কি কিছু শুনে? তোমাদের কি কোনো উপকার কিংবা কোনো ক্ষতি করতে পারে? তারা বলল : না, তবে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের এ কাজ করতে দেখেছি। তিনি বললেন, তোমরা কি চিন্তা করে দেখেছ, যাদের পূজা করছ তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা?

অতএব এরা আমার শত্রু; কিন্তু রাব্বুল আলামিন আল্লাহ যিনি আমাকে পয়দা করেছেন, অনন্তর তিনি আমাকে সৎপথ প্রদর্শন করেছেন, আমাকে খাদ্য দান করেছেন, পানীয় দান করেছেন আর যখন আমি পীড়িত হয়ে পড়ি, তখন তিনিই আমাকে সুস্থতা দান করেন। আর তাঁর নিকট আমি এ আশা রাখি, আমার ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি তিনি কেয়ামতের দিন ক্ষমা করবেন। হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ধর্মীয় জ্ঞানের শক্তি দান করুন। আর আমাকে নেককারদের সঙ্গে মিলিত করুন আর পরবর্তী লোকদের মধ্যে আমার কথাবার্তা সত্য রাখুন! আমাকে জান্নাতুন নাঈমের ওয়ারিসদের দলভুক্ত করুন এবং আমার পিতাকে ক্ষমা করুন! তিনি পথভ্রষ্টদের মধ্যে রয়েছে। আর যে দিন সকলে পুনরায় জীবিত হয়ে উঠবে, সেদিন আমাকে লজ্জিত করবেন না। যে দিন ধন–সম্পদও কোনো কাজে আসবে না এবং কোনো ছেলে-সন্তানও না। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর দরবারে নিরোগ অন্তর নিয়ে আসবে। (সে ব্যক্তি হবে সফলকাম)।

(সূরা শুআরা : ৬৯-৮৯)

আযর ও আযরের কওমের অন্তর কোনো ক্রমেই সত্যকে কবুল করার জন্য নরম হল না এবং তারা অবিশ্বাস ও অস্বীকৃতির সীমা ছাড়িয়ে যেতে লাগল। ইতোপূর্বে বলে এসেছি, হযরত ইবরাহীম আ.-এর কওম মূর্তিপূজার সাথে সাথে নক্ষত্রপূজাও করত। তাদের বিশ্বাস ছিল মানুষের মৃত্যু ও জীবন, তাদের রিযিক, তাদের লাভ-লোকসান, দুর্ভিক্ষ, জয়-পরাজয় মোটকথা জগতের যাবতীয় কাজের শৃঙ্খলা নক্ষত্রসমূহ এবং তাদের গতিবিধির প্রভাবেই চলছে। এবং এ প্রভাব এগুলোর নিজস্ব একটি বৈশিষ্ট্য। সুতরাং ওগুলোকে সন্তুষ্ট রাখা অবশ্য কর্তব্য। আর তা এদেরকে পূজা করা ভিন্ন সম্ভব নয়।

হযরত ইবরাহীম আ. যেভাবে তাদের নিম্নজগতের বাতেল মাবুদগুলোর স্বরূপ উদঘাটিত করে দিয়ে তাদের সত্য পথের দিকে আহ্বান করলেন, তদ্রুপ তারা ঊর্ধ্বজগতের (আসমানের) বাতেল মাবুদগুলোরও অস্থায়িত্ব এবং ধ্বংসশীল হওয়ার দৃশ্য তাদের সম্মুখে পেশ করে এই তথ্যটিও জানিয়ে দেওয়াও জরুরি মনে করলেন, তোমাদের এই উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান নক্ষত্র চন্দ্র ও সূর্য গ্রহগুলির খোদায়ী শক্তির আধিপত্য থাকার ধারণাটিও নিশ্চিত ভ্রান্ত। ব্যাপারটা কখনও তা নয়; এটা ভুল ধারণা এবং ভুল বিশ্বাস। কিন্তু এই বাতিলের পূজকেরা যখন নিজেদের স্বহস্তে নির্মিত মূর্তিকে এত ভয় করত, এদের নিন্দুকেরা এদের কোপে পতিত হয়ে ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে যাবে বলে ভাবত। তখন এ কল্পনাপূজারীদের অন্তরে ঊর্ধ্বজগতের সেই নক্ষত্রপূজার বিপরীত প্রেরণা সৃষ্টি করা কোনো সহজ কাজ ছিল না। সুতরাং মুজাদ্দিদে আম্বিয়া হযরত ইবরাহীম আ. তাদের মস্তিষ্কের উপযোগী এক বিচিত্র ও চিত্তাকর্ষণ বর্ণনা পদ্ধতি অবলম্বন করলেন। রাত্রি ছিল নক্ষত্রপূর্ণ। একটি নক্ষত্র ছিল অত্যন্ত দীপ্তিমান। হযরত ইবরাহীম আ. তাকে দেখে বললেন, এটি কি আমার খোদা? কোনো নক্ষত্র যদি খোদায়িত্বের শক্তি রাখে, তবে কি এটি তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এবং উজ্জ্বল।

কিন্তু যখন তা নিজের নির্ধারিত সময়ে দৃষ্টির বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল এবং তা আরও একটি মুহূর্ত অন্যান্য নক্ষত্রগুলির জন্য নিজের দীপ্তি প্রকাশ করার সাধ্য তার হল না, সম্ভব হল না বিশ্বজগতের শৃঙ্খলার অন্যথা করে নিজের পূজকদের সাক্ষাতের কেন্দ্রস্থল হয়ে থাকা, তখন হযরত ইবরাহীম আ. বললেন, আমি আত্মগোপনকারীদের পছন্দ করি না। অর্থাৎ যে বস্তু পরিবর্তনের প্রভাবে আমার চেয়েও অধিক প্রভাবিত হয় এবং যা তাড়াতাড়ি ওই সমস্ত পরিবর্তনের প্রভাব গ্রহণ করে, তা আমার মাবুদ কেমন করে হতে পারে?

আবার তাকিয়ে দেখতে পেলেন, চন্দ্র অতিশয় দীপ্তি ও আলো নিয়ে সম্মুখে বিদ্যমান। (কোরআন মাজিদে এ কথা উল্লেখ নেই, এই কথোপকথন কয়েক রাত্রিতে হয়েছিল না কি এক রাত্রিতে। যদি একই রাত্রিতে হয়ে থাকে, তবে মনে হয় এটা এমন এক রাত্রের ঘটনা, যে রাতের কিছু অংশ গত হওয়ার পর চাঁদ উদয় হয়েছিল।)

তিনি চন্দ্রকে দেখে বললেন, এ কি আমার খোদা? কেননা এটা খুব উজ্জ্বল এবং নিজের স্নিগ্ধ আলোকে সারা বিশ্বকে আলোময় করে দিয়েছে। অতএব যদি নক্ষত্রসমূহকে খোদা বানানো হয়, তবে এ চন্দ্রকেই কেন বানানো হবে না। একেই তো খোদা হওয়ার অধিক উপযোগী দেখা যাচ্ছে।

ভোর ঘনিয়ে এলে ক্রমেই চন্দ্রের আলোও নিভে যেতে লাগল। তারও আত্মগোপন করার সময় হয়ে গেল। আর যতই সূর্যোদয়ের সময় ঘনিয়ে আসতে লাগল, ততই চাঁদের অস্তিত্ব দর্শনার্থীর দৃষ্টি হতে অদৃশ্য হতে লাগল। এ দেখে ইবরাহীম আ. এমন একটি বাক্য বললেন, যাতে চাঁদের খোদা হওয়ার উপর নেতিবাচক পর্দা টেনে দেওয়ার সাথে সাথে এক আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বের দিকে কওমের দৃষ্টি এমন নীরবতার সাথে ফিরিয়ে দেওয়া হয়, যাতে কওম তা অনুভবই করতে না পারে। আর এ কথোপকথনের যে একক উদ্দেশ্য অর্থাৎ এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা, তা তাদের অন্তরে অনিচ্ছাকৃতভাবে বসে যায়। তিনি বললেন, "আমার প্রকৃত পরওয়ারদিগার যদি আমাকে পথ প্রর্দশন না করতেন, তবে আমিও অবশ্যই পথভ্রষ্ট কওমেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম।"

এতটুকু বলেই তিনি নীরব হয়ে গেলেন। কেননা এই শৃঙ্খলের আরও একটি কড়া এখনও অবশিষ্ট রয়েছে। কওমের সঙ্গে মোকাবেলা করার জন্য আরও একটি অস্ত্র বাকী আছে। অতএব এর চেয়ে অতিরিক্ত কিছু বলা সমচীন ছিল না। নক্ষত্রপূর্ণ রাত্রির অবসান হল। নক্ষত্র, চন্দ্র সবকিছুই দৃষ্টি হতে অদৃশ্য হয়ে গেল কেন? কারণ বিশ্ব উজ্জ্বলকারী সূর্যের দ্বীপ্তিমান চেহারা এখন সম্মুখে আসছে। দিবা উদ্ভাসিত হল এবং সূর্য পূর্ণ আলো ও দ্বীপ্তির সাথে দীপ্তিমান হতে লাগল।

ইবরাহীম আ. তা দেখে বললেন, এটাই আমার খোদা। কেননা গ্রহগুলোর মধ্যে এটা সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সৌরজগতে এর চেয়ে বড় গ্রহ আমাদের সম্মুখে দ্বিতীয়টি নেই।

কিন্তু সারা দিন দীপ্তিমান ও আলোময় থাকার এবং সমগ্র বিশ্বকে আলোকিত করার পর নির্ধারিত সময়ে তা-ও ইরাকের ভূখণ্ড হতে সরে পড়তে লাগল। অন্ধকার রাত্রি ক্রমেই সম্মুখে আসতে লাগল এবং অবশেষে সূর্যও দৃষ্টিপথ হতে অদৃশ্য হয়ে গেল! এখন সময় আসে, ইবরাহীম আ. প্রকৃত তথ্য ঘোষণা করে দিয়ে কওমকে নিরুত্তর করে দেওয়ার।

তারা যেন ভাবতে বাধ্য হয়, তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী যদি এ সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্রাদি খোদা ও মাবুদ হওয়ার অধিকারী হয়, তবে কি কারণে তাদের মধ্যে আমাদের চেয়েও অধিক পরিবর্তন ও অস্থায়িত্ব দেখা যায়? এবং কেন তারা অতি তাড়াতাড়ি পরিবর্তনের ও অস্থায়িত্বের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে যায়। যদি এরা মাবুদ হয়ে থাকে, তবে তারা অস্তমিত হয় কেন? তথা যেমনিভাবে দীপ্তিমান ও উজ্জ্বল দৃষ্ট হচ্ছিল, তদ্রুপ উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান থাকে না কেন? ক্ষুদ্র তারকাগুলির আলোকে চাঁদের আলো অনুজ্জ্বল করে দিল কেন? চন্দ্রের উজ্জ্বল চেহারাকে সূর্যের আলো কেন আলো বিহীন করে দিল?

অতএব হে কওম! আমি এসমস্ত শিরকমূলক বিশ্বাস হতে পবিত্র এবং শিরকের বন্দিগীর প্রতি অসন্তুষ্ট। নিঃসন্দেহে আমি আমার মনোযোগকে শুধু এক আল্লাহ তাআলার দিকে নিবিষ্ট করছি, যিনি আসমানসমুহ এবং জমিনকে সৃষ্টি করেছেন। আমি সত্যের প্রতি আকৃষ্ট, মুশরিক নই।

এখন কওম বুঝতে পারল, এ কী হলো। ইবরাহীম আ. আমাদের সকল অস্ত্র অকেজো করে দিলেন এবং আমাদের সমুদয় প্রমাণকে পদদলিত করে দিলেন। এখন আমরা ইবরাহীম আ.-এর এই মযবুত ও কঠিন প্রমাণকে কেমন করে খণ্ডন করি এবং তাঁর এই স্পষ্ট প্রমাণের কি উত্তর দিই? তারা এর জন্য সম্পূর্ণ অক্ষম ও অপারগ ছিল। যখন কোনো উপায়ই খুঁজে পেল না, তখন কিছু বলা এবং সত্যের আওয়াজকে কবুল করার পরিবর্তে ইবরাহীম আ.-এর সাথে ঝগড়া করতে এবং তাদের বাতেল মাবুদদের ভয় দেখাতে আরম্ভ করল– এরা এই অপমানের প্রতিশোধ অবশ্যই তোমার থেকে গ্রহণ করবে এবং তোমাকে এর দণ্ড অবশ্যই ভুগতে হবে।

হযরত ইবরাহীম আ. বললেন, তোমরা আমার সাথে ঝগড়া করছ এবং আমাকে মূর্তিসমূহের ভয় দেখাচ্ছ, অথচ আল্লাহ তাআলা আমাকে সঠিক পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। আমি কোনো পরোয়া করি না। আমার পালনকর্তা যা চাইবেন, তা-ই হবে। তোমাদের মূর্তিগুলি কিছুই করতে পারবে না। এ সমস্ত কথায় তোমাদের কি কিছুই উপদেশ লাভ হয় না? তোমরা তো আল্লাহ পাকের নাফরমানি করতে এবং তাঁর সাথে শরিক সাব্যস্ত করতে ভয় কর না।

অথচ এই শরিক সাব্যস্ত করার পক্ষে তোমাদের নিকট দলিলও নাই। অথচ আমার থেকে আশা কর, এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে এবং বিশ্বের নিরাপত্তার যিম্মাদার হয়ে আমি তোমাদের মূর্তিসমূহকে ভয় করব। আহা! কতই না ভালো হত যদি তোমরা বুঝতে পারতে– কে ফাসাদ বিস্তারকারী আর কে সংশোধনকারী? সঠিক নিরাপত্তার

জীবন সে ব্যক্তিই লাভ করেছে, যে ব্যক্তি এক আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে এবং শিরক হতে পবিত্র থাকে; সেই ব্যক্তিই সৎপথ প্রাপ্ত হয়েছে।

মোটকথা, আল্লাহ তাআলার এ সকল প্রমাণের মাধ্যমে হযরত ইবরাহীম আ. মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে দলিল ও প্রমাণ পেশ করেছেন। এবং হেদায়েত ও তাবলিগের পূর্ণাঙ্গ দাওয়াত প্রদান করে তাঁর দায়িত্ব যথাযথ আদায় করে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে সূরা আনআমের নিচের আয়াতগুলি অবতীর্ণ :

وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ (٧٥) فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ (٧٦) فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ (٧٧) فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ (٧٨) إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٧٩) وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ (٨٠) وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (٨١) الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ (٨٢) وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

"আর এরূপে আমি ইবরাহীম আ. কে আসমানসমূহের এবং জমিনের রাজত্বের ঝলক দেখিয়ে দিলাম, যাতে সে বিশ্বাসকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এরপর (দেখুন,) যখন তাঁর উপর রাত্রির অন্ধকার ছেয়ে গেল, তখন তিনি (আসমানে) একটি নক্ষত্র (দীপ্তিমান) দেখলেন। তিনি বললেন, (তোমাদের মতানুসারে) এটা আমার পালনকর্তা! (কেননা সকলে এর পূজা করে থাকে।) কিন্তু যখন তা ডুবে গেল, তখন বললেন : না, আমি অস্তাচলে গমনকারীদের পছন্দ করি না। (অর্থাৎ যারা উদিত ও অস্তমিত হয়।) এরপর যখন চন্দ্র উজ্জ্বল দীপ্তি সহকারে উদিত হল। তখন ইবরাহীম আ. বললেন : এটা আমার পালনকর্তা! কিন্তু যখন এটাও অস্তমিত হল, তখন বললেন– যদি আমার পালনকর্তা আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন না করতেন, তবে আমি অবশ্যই সেই দলেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়তাম, যারা সত্যপথ হতে ভ্রষ্ট হয়ে গেছে। এরপর যখন প্রভাত হল এবং সূর্য (সর্বাপেক্ষা অধিক) প্রদীপ্ত হয়ে উদিত হল, তখন ইবরাহীম আ. বললেন : এটা আমার পালনকর্তা! এ সকলের চেয়ে বড়। কিন্তু যখন এটা অস্তমিত হয়ে গেল, তখন তিনি বললেন : (হে আমার কওম!) তোমরা যে সমস্তকে আল্লাহ তাআলার শরীক

সাব্যস্ত করছ, আমি তৎসমুদয়ের প্রতি অসন্তুষ্ট। আমি তো সবকিছু হতে বিমুখ হয়ে শুধু সেই সত্তার দিকে মুখ করেছি, যিনি (কারও দ্বারা সৃষ্ট নন বরং তিনিই) আসমানসমূহ এবং জমিনকে সৃষ্টি করেছেন (এবং যাঁর আদেশ অনুযায়ী আসমান জমিন ও সমস্ত সৃষ্ট বস্তুসমূহ চলছে।) আর আমি তাদের দলভুক্ত নই, যারা আল্লাহর সঙ্গে শরীক সাব্যস্ত করে এবং (এর পর) ইবরাহীম আ.-এর সাথে তাঁর কওম ঝগড়া করতে লাগল।

ইবরাহীম আ. বললেন, তোমরা কি আমার সঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা সম্বন্ধে ঝগড়া করছ? অথচ তিনি আমাকে সত্যপথ দেখিয়েছেন। যাদেরকে তোমরা আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করেছ, আমি তাদেরকে ভয় করি না। আমি জানি যে, এরা আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তবে হ্যাঁ, যদি আমার পালনকর্তাই আমার কোনো ক্ষতি করতে ইচ্ছা করেন। (তবে সেই ক্ষতি রোধ করার সাধ্য কারো নেই।) আমার পালনকর্তা নিজের জ্ঞানে'র গণ্ডি দ্বারা সমুদয় বস্তুকে বেষ্টন করে রেখেছেন। তবে কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর না? আর (দেখ!) আমি সে সমস্ত বস্তুকে কেমন করে ভয় করতে পারি, যাদেরকে তোমরা আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করে রেখেছ।

যখন তোমরা আল্লাহর সাথে অন্যান্য বস্তুকে শরীক সাব্যস্ত করতে ভয় কর না? যার জন্য তিনি সনদ এবং দলিল তোমাদের উপর নাযিল করেন নি? এখন বল, আমাদের উভয়ের মধ্যে কার পথ নিরাপত্তার পথ হল? যদি তোমাদের জ্ঞান ও অন্তরচক্ষু থাকে! যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে এবং নিজের ঈমানকে জুলুমের (অর্থাৎ শিরকের) সাথে মিশ্রিত করে নি, তবে তাদেরই জন্য নিরাপত্তা আর সেই হক পথের উপর রয়েছে। আর (দেখ) এটা আমার প্রমাণ, যা আমি ইবরাহীমকে সেই কওমের উপর দান করেছিলাম। আমি যার মর্যাদাকে উচ্চ করতে ইচ্ছা করি, তাদেকে ইলম ও দলীল-প্রমাণের পরিচয়-জ্ঞান দিয়ে উচ্চ মর্যাদাশালী করে দিই আর নিশ্চয়ই তোমার পালনকর্তা প্রজ্ঞাময় জ্ঞানময়। (সূরা আনআম : ৭৫-৮৩)

সমাধানপূর্ণ তাফসির

যদিও এ কথার উপর সকলের ঐকমত্য রয়েছে, হযরত ইবরাহীম আ. কখনও গ্রহ-নক্ষত্রের পূজা করেন নাই এবং তাঁর গোটা জীবন শিরকের অপবিত্র পরশ হতে পবিত্র। তথাপি সূরা আনআমের উপর্যুক্ত আয়াতগুলির তাফসিরে উলামায়ে কেরামের বিভিন্ন মত রয়েছে। এই আয়াতগুলির সূচনায় যা কিছু লেখা হয়েছে, তা সেই মতগুলির মধ্যে অন্যতম মতানুযায়ী লিখা হয়েছে। তার সারমর্ম হলো, ইবরাহীম আ.-এর এই কথাগুলি ছিল কওমের নক্ষত্রপূজা খণ্ডন সম্বন্ধে তাদেরকে নিরুত্তর করে দেওয়ার জন্য।

কেননা দুটি দল যখন কোনো বিষয়ে মতভেদ করে বসে, তখন সত্যকে প্রমাণিত করার জন্য বিতর্কসুলভ দলিলসমূহের এক প্রকারের দলিল হল, নিজেদের দাবি প্রমাণে শুধু থিওরিসমূহ পেশ না করে, বরং চাক্ষুশ দর্শনের এমন একটি পথ অবলম্বন করা হয়, যাতে বিপক্ষ তার দাবির সামনে সম্পূর্ণ নিরুত্তর হয়ে যায়। প্রথম পক্ষের প্রমাণ খণ্ডনের সকল পথ তার সম্মুখে বন্ধ হয়ে যায়।

এখন যদি বিপক্ষের মধ্যে হঠকারিতা না থাকে বরং ন্যায়ের পথ অবলম্বনের স্পৃহা অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ তার অন্তরে সত্য গ্রহণের সম্ভাবনা থাকে, তবে সে তা গ্রহণ করে নেয়। অন্যথায় বিনা প্রমাণে লড়াই-ঝগড়া করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। তখন এরূপ হক-বাতিলের মধ্যে পার্থক্য ফুটে উঠে এবং মূল ও প্রকৃত বিষয়টি ছেঁকে পরিষ্কার হয়ে যায়।

হযরত ইবরাহীম আ. অতি উচ্চ মর্যাদাশালী পয়গাম্বর। তাই তাঁর মিশন তর্কশাস্ত্রের নিয়ম-কানুনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না বরং প্রকৃত তথ্যকে প্রাকৃতিক প্রমাণসমূহের সরলতা দ্বারা প্রকাশ করে দেওয়াই ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। সুতরাং তিনি এ পথই অবলম্বন করলেন এবং কওমের সম্মুখে পরিষ্কার করে দিলেন, গ্রহাদি চাই সূর্য হোক কিংবা চন্দ্র, এগুলোর কোনোটা রব তথা মাবুদ হওয়ার যোগ্য নয়। বরং এর যোগ্য জমিনের ও আসমানের তথা নিম্ন জগতের ও ঊর্ধ্ব জগতের সমুদয় সৃষ্টির স্রষ্টা ও মালিক।

যেহেতু কওমের নিকট এই উৎকৃষ্ট প্রমাণের কোনো জবাব ছিল না, তাই তারা বিরক্ত হয়ে সত্য বিষয়কে গ্রহণ করার পরিবর্তে লড়াই ও ঝগড়া করতে প্রস্তুত হয়ে গেল। কিন্তু তাদের অন্তর মানতে বাধ্য হল যে, ইবরাহীম আ. যা কিছু বলেছেন, তা সত্য। আমাদের নিকট এর কোনো সঠিক জবাব নেই। হযরত ইবরাহীম আ.-এরও উদ্দেশ্য ছিল এটা এবং তাঁর কর্তব্য পালনের সীমাও ছিল এ পর্যন্তই। কেননা হৃদয় চিরে সত্যকে তার ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া ছিল তাঁর সাধ্যের বাইরে।

এই তাফসির অনুযায়ী কোরআন মাজিদের এই আয়াতগুলিতে কোনো ব্যাখ্যারও প্রয়োজন হয় না। কোনো উহ্য এবারতও মানতে হয় না। এতদ্ভিন্ন গ্রহাদির চাক্ষুশ দর্শন সম্বন্ধে আয়াতগুলির পূর্ব ও পরের কথা সহজেই এ তাফসিরের পোষকতা করছে। যেমন এ সম্পর্কিত (সূরা আনআম : ৭৪-৭৫) পূর্বের দুটি আয়াত ছিল :

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٧٤) وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ

"যখন ইবরাহীম আ. তাঁর পিতা আযরকে বললেন, আপনি কি মূর্তিগুলিকে খোদা বানাচ্ছেন? আমি আপনাকে ও আপনার কওমকে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতার মধ্যে দেখছি। আর এরূপে আমি ইবরাহীম আ. কে আসমানসমূহ ও জমিনের রাজত্বের চাক্ষুশ দর্শন দিয়েছি, যাতে তিনি বিশ্বাসীদের দলভুক্ত হয়ে যান।" (সূরা আন'আম : ৭৪-৭৫)

আয়াত দুটির ফলাফল

১। গ্রহাদি দর্শন ব্যাপারটি হযরত ইবরাহীম আ.-এর সঙ্গে এরূপ সময়ে ঘটেছে, যখন তিনি আপন পিতা ও কওমের সঙ্গে সত্যধর্ম প্রচার সম্বন্ধীয় বিতর্কে লিপ্ত ছিলেন। কেননা প্রথম আয়াতটির পরে দ্বিতীয় আয়াতটিকে "আর এরূপে" বলে আরম্ভ করার দ্বারা তাই বুঝা যায়। আর তৃতীয় আয়াতটির শুরুতে "এরপর যখন" কথায় "এরপর" শব্দটি বুঝাচ্ছে, এটা দ্বিতীয় আয়াতটির সংশ্লিষ্ট এবং এরূপে তিনটি আয়াতই একটির সঙ্গে অপরটি সম্পৃক্ত।

২। আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম আ. কে যেভাবে মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে উজ্জ্বল প্রমাণ দান করেছিলেন, যেন তিনি আযর এবং তার কওমকে নিরুত্তর করে দিতে পারেন এবং হেদায়েতের পথ দেখান; এরূপে গ্রহাদি পূজার বিরুদ্ধেও তিনি ইবরাহীম আ. কে আসমানসমূহ ও জমিনের রাজত্ব চাক্ষুষ দেখিয়ে দিয়েছেন, যেন তিনি সমুদয় সৃষ্টির গূঢ়তত্ত্ব সম্বন্ধে অবহিত হয়ে যান এবং তিনি দিব্য স্তরের জ্ঞান লাভ করেন।

এরপর তিনি গ্রহাদির পূজার বিরুদ্ধেও উৎকৃষ্ট প্রমাণ পেশ করতে পারেন এবং এ বিষয়েও কওমকে সত্যপথ দেখিয়ে তাদের এই ভুলপন্থা সম্বন্ধে তাদেরকে নিরুত্তর করে দিতে পারেন। এ তো "দেখিয়ে দেওয়ার" আয়াতটি ছিল পূর্বের আয়াত। এখন শেষের আয়াতটি অনুধাবনযোগ্য। যখন ইবরাহীম আ. পরিশেষে সূর্যের প্রতি দৃষ্টি করলেন এবং তা-ও পরে দৃষ্টিপথ হতে অদৃশ্য হতে আরম্ভ করল, তখন এ আয়াতেই নিম্নোক্ত বাক্যটি দেখা যায়।

قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ

"ইবরাহীম বললেন, হে আমার কওম! আমি অংশীবাদীদের হতে সম্পূর্ণ মুক্ত।"

সেই সঙ্গে এ আয়াতটিও উল্লিখিত রয়েছে :

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

"নিঃসন্দেহ আমি আমার চেহারা শুধু সেই খোদার দিকে ফিরাচ্ছি, যিনি আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, এই অবস্থায়, আমি সবকিছু হতে বিরত হয়ে এক আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট এবং আমি অংশীবাদী নই।" (সূরা আনআম : ৭৯)

এরপরেই আছে :

وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ

"আর ইবরাহীমের কওম তাঁর সাথে ঝগড় করতে আরম্ভ করলে, তিনি বললেন, তোমরা কি আল্লাহ সম্বন্ধে আমার সাথে ঝগড়া করছ?"

আর সর্বশেষ আয়াতে বলা হয়েছে :

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

"আর তা আমার দলিল-প্রমাণ, যা আমি ইবরাহীমকে তাঁর কওমের মোকাবেলায় দান করেছি। আমি যার মর্যাদা উন্নত করতে ইচ্ছা করি, উন্নত করে দিই। নিঃসন্দেহ আপনার রব হেকমতওয়ালা জ্ঞানময়।" (সূরা আনআম : ৮৩)

মোটকথা, দেখা যাচ্ছে :

(১) গ্রহাদি দর্শনের ব্যাপারটি কওমের সঙ্গে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট ছিল। সুতরাং তৃতীয় দফায় ইবরাহীম আ. নিজেকে সম্বোধন করার পরিবর্তে তৎক্ষণাৎ কওমকে সম্বোধন আরম্ভ করে দিলেন।

(২) আর কওমও সবকিছু শুনে প্রমাণের উত্তর প্রমাণ দ্বারা দেওয়ার পরিবর্তে ইবরাহীম আ.-এর সাথে ঝগড়া-বিবাদ করতে আরম্ভ করল।

(৩) কওমের সাথে ইবরাহীম আ.-এর এই কথোপকথন তথা প্রমাণ প্রদানকে আল্লাহ তাআলা নিজের পক্ষ হতে প্রমাণ প্রদান সাব্যস্ত করেছেন। "ইবরাহীমের রেসালাতের মর্যাদা বহু উর্ধ্বে এবং বহু উন্নত।" সুতরাং কওম তাঁর পথ প্রদর্শনের একান্ত মুখাপেক্ষী। আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম আ. সম্বন্ধে আরও বলেছেন :

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ

"আর নিঃসন্দেহ আমি ইবরাহীমকে পূর্বে হতেই হেদায়েত প্রদান করে ছিলাম। আর তার সম্বন্ধে আমি ছিলাম অবহিত।" (আম্বিয়া : ৫১)

সুতরাং এ ব্যাপারটি হযরত ইবরাহীমের বাল্যকালের ঘটনাও হতে পারে না এবং তার নিজের আকীদা এবং ঈমানের ব্যাপারও হতে পারে না। এ বিস্তারিত বিবরণ হতে অনুমান করা যেতে পারে, বর্ণিত তাফসিরই আয়াতগুলির বিশুদ্ধ তাফসির। আর নিঃসন্দেহে এটা ইবরাহীম আ.-এর পক্ষ হতে কওমের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রমাণ ছিল তাদের গ্রহাদির পূজা করা, এদের জন্য মন্দির নির্মাণ করা, নিজেদের নিম্নজগতের দেবতাসমূহের নাম উক্ত গ্রহাদির নামানুযায়ী রাখা বিপক্ষে। মোটকথা, এদেরকে, মাবুদ, খোদা ও রব মনে করা নিশ্চিতরূপে বাতেল এবং পথভ্রষ্টতা। কেননা এই সমুদয় গ্রহ-নক্ষত্র সকলেই এক বিশেষ শৃঙ্খলে জড়িত এবং দিবা ও রাত্রির পরিবর্তনের সাথে নানা প্রকার পরিবর্তন গ্রহণ করে। এই পূর্ণ শৃঙ্খলার মালিক এবং স্রষ্টা শুধু সেই মহা শক্তিমান সত্তাই, যাঁর কুদরতের হস্ত এসব কিছুকে বশীভূত করে রেখেছে আর তিনি "আল্লাহ"। আল্লাহর বশীভূত থাকার ফলে :

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

"সূর্যেরও সাধ্য নাই, সে চন্দ্রকে ধরতে পারে এবং রাত্রেরও সাধ্য নাই যে, সে দিনকে পিছে হটিয়ে দিয়ে তার স্থান নিজে গ্রহণ করবে। (সূরা ইয়াসীন : ৪০)

এ সমস্ত উজ্জ্বল প্রমাণ ও অকাট্য দলিলের পরেও যখন কওম ইসলামের দাওয়াত কবুল করল না, মূর্তিপূজা ও নক্ষত্রাদি পূজায় পূর্ববৎ বহাল রইল, তখন হযরত ইবরাহীম আ. একদিন সর্ব সাধারণের সম্মুখে যুদ্ধ ঘোষণা করে দিলেন, আমি তোমাদের এই মূর্তিগুলি সম্বন্ধে এমন এক চাল চালব, যা তোমাদিগকে উত্ত্যক্ত করেই ছাড়বে :

وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ

"আর আল্লাহর কসম! তোমাদের অনুপস্থিতিতে আমি অবশ্যই তোমাদের মূর্তিসমূহের সাথে এক গোপন চাল চালব।" (সূরা আম্বিয়া : ৫৭)

সর্বসাধারণকে মূর্তিপূজার দোষ প্রকাশ করে তা হতে বিরত রাখার চেষ্ট করলেন এবং সর্বপ্রকার উপদেশ ও নসিহত দ্বারা তাদেরকে একথা বিশ্বাস করাতে পূর্ণশক্তি

প্রযোগ করলেন, এ সমস্ত মূর্তি কোনো উপকারও করতে পারে না, ক্ষতিও না। তোমাদের গণকেরা ও নেতারা এদের সম্বন্ধে তোমাদের মনে অমূলক ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছে। যেমন যদি এদেরকে অবিশ্বাস কর, তবে এরা রাগান্বিত হয়ে তোমাদেরকে ধ্বংস করে ফেলবে। এরা তো নিজেদের সম্মুখে বিপদ উপস্থিত হলে তাও দূর করতে সক্ষম নয়। কিন্তু আযর এবং কওমের অন্তরে কোনোই ক্রিয়া হল না। তারা নিজেদের দেবতাদের খোদায়ী শক্তি সম্বন্ধীয় বিশ্বাস হতে কোনোক্রমেই বিরত হল না এবং হযরত ইবরাহীম আ.-এর নসিহতের প্রতি কর্ণপাত করতে কঠোরভাবে বারণ করে দিল।

তখন হযরত ইবরাহীম আ. ভাবলেন, এখন আমাকে হেদায়েত ও নসিহতের এমন উপায় বের করতে হবে, যাতে বাস্তবিকই তারা মনে করে, আমাদের দেবতা শুধু কাষ্ঠ ও প্রস্তরের মূর্তি। যা বোবা, বধীর এবং অন্ধও। আর তাদের অন্তরে এই ধারণা যেন দৃঢ় হয়, এ পর্যন্ত আমাদের গণক ও নেতারা এদের সম্বন্ধে যা-কিছু বলত, তা সম্পূর্ণই ভুল এবং ভিত্তিহীন। ইবরাহীমের কথাই সত্য। যদি এরূপ কোনো ব্যবস্থা হয়ে যায়, তবে আমার সত্য প্রচারের জন্য সহজ পন্থা আবিষ্কৃত হয়ে যাবে। এই ভেবে একটি কর্মপদ্ধতি প্রস্তুত করলেন। কারও নিকটেই তা প্রকাশ করলেন না। এই কার্যটি এভাবে আরম্ভ করলেন যে, কথা প্রসঙ্গে নিজ কওমের লোকদেরকে বলে ফেললেন, "আমি তোমাদের দেবতাদের সাথে এক গোপন চাল চালব।"

যেন এই উপায়ে তাদেরকে একথা জানিয়ে দেওয়া উদ্দেশ্য ছিল যে, যদি তোমাদের দেবতাদের মধ্যে কোনো ক্ষমতা থাকে, যেমনটি তোমরা দাবি করে থাক, তবে তারা আমার চালকে বাতিল এবং আমাকে অক্ষম করে দিক; যেন এরূপ করতে না পারি। কিন্তু তাঁর কথা যেহেতু পরিষ্কার ছিল না, কাজেই কওমের লোকেরা এদিকে কোনো মনোযোগই দিল না। একটা সুবর্ণ সুযোগও পাওয়া গেল। অনতিপরেই কওমের এক ধর্মীয় মেলা আসল। সকলেই উক্ত মেলায় যোগদানের জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল। হযরত ইবরাহীম আ. প্রথমে অস্বীকার করলেন।

এরপর যখন তাদের পক্ষ হতে খুব বেশি চাপ দিতে লাগল, তখন তিনি নক্ষত্রসমূহের প্রতি দৃষ্টি করে বললেন, "আমি আজ কিছু পীড়িত বোধ করছি।" ইবরাহীম আ.-এর কওম গ্রহাদির পূজারী হওয়ার কারণে নক্ষত্রসমূহের প্রতি বিশ্বাসী ছিল। সুতরাং নিজেদের ভক্তি ও বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে তারা মনে করল, ইবরাহীম আ. আজ কোনো অশুভ নক্ষত্রের অশুভ ক্রিয়ায় রয়েছে। অতএব তারা এ ভেবে অবস্থার কোনো বিস্তারিত বিবরণ জিজ্ঞাসা না করে ইবরাহীম আ.-কে শহরে রেখেই মেলায় চলে গেল। কুরআন মাজীদে এ ঘটনাটি নিম্নরূপে বর্ণিত হয়েছে :

فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ (٨٨) فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ (٨٩) فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ

"এরপর তিনি (ইবরাহীম আ.) উপরের দিকে নযর উঠিয়ে নক্ষত্রসমূহের প্রতি দৃষ্টি করলেন এবং বললেন, 'আমি পীড়িত।' অতএব তারা তাঁকে ছেড়ে চলে গেল।

(সূরা সাফফাত : ৮৮-৯০)

অনন্তর যখন গোটা কওম, বাদশা মোহন্ত ও ধর্মীয় নেতারা সকলেই মেলার আনন্দে মত্ত এবং শরাবে ও কাবাবে মশগুল। তখন হযরত ইবরাহীম আ. ভাবলেন, এখন উপযুক্ত সময় এসে গেছে। কাজেই আমি আমার কল্পিত কর্ম সম্পন্ন করে ফেলি এবং চাক্ষুষ দর্শনের আকারে সর্ব সাধারণের নিকট স্পষ্টরূপে প্রকাশ করে দিই, তাদের দেবতার স্বরূপ কী? তিনি উঠলেন এবং শ্রেষ্ঠ দেবতার মন্দিরে প্রবেশ করে দেখলেন, সেখানে দেবতাদের সম্মুখে নানা রকমের মিষ্টি, ফলমূল এবং হালুয়া উৎসর্গ করে রাখা হয়েছে।

ইবরাহীম আ. বিদ্রুপের সুরে চুপিচুপি সেই মূর্তিসমূহকে সম্বোধন করে বললেন : তোমাদের সামনে এতসব সুস্বাদু খাদ্য বিদ্যমান। এগুলো খাচ্ছ না কেন? এরপর সবগুলি মূর্তিকে ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেললেন এবং হাতের কুঠারখানি সকলের বড় মূর্তিটির কাঁধে ঝুলিয়ে রাখলেন। এই ঘটনাটি কুরআন মাজীদে এরূপে বর্ণনা করেছেন :

فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (٩١) مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ (٩٢) فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ

"এরপর ইবরাহীম আ. চুপিচুপি গিয়ে তাদের মূর্তিসমূহের মন্দিরে প্রবেশ করলেন এবং তাদের মূর্তিসমূহকে বললেন, (তোমাদের সম্মুখে স্তরে স্তরে সাজানো এ সমস্ত সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য) তোমরা খাচ্ছ না কেন? তোমাদের কি হল, কথা বলছ না কেন ? এরপর নিজের ডান হাত দ্বারা সমস্ত মূর্তিগুলিকে ভেঙে ফেললেন।"

(সূরা সাফফাত : ৯১-৯৩)

فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ

"এরপর এদের খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেললেন। কিন্তু তাদের বড় দেবতাটিকে ত্যাগ করলেন, যেন কওমের লোকেরা এসে (নিজেদের আকিদা অনুযায়ী) তার দিকে রুজু করে। (এবং জিজ্ঞাসা করে, এ কী হয়ে গেল?)" (সূরা আম্বিয়া : ৫৯-৬০)

লোকেরা মেলা হতে ফিরে এসে যখন মন্দিরে দেবতাদের এ অবস্থা দেখল, তখন অত্যন্ত রাগান্বিত হল এবং পরস্পর বলাবলি করতে লাগল কি হল, এমন কাজ কে করল? তাদের মধ্যে ওই ব্যক্তিও ছিল, যার সম্মুখে হযরত ইবরাহীম আ. "আল্লাহর কসম আমি তোমাদের মূর্তিসমূহের সহিত এক গোপন ষড়যন্ত্র করব।" কথাটি বলেছিলেন, সে তৎক্ষণাৎ বলে উঠল, এটা সেই ইবরাহীম নামক লোকটিরই কাজ। সে-ই আমাদের দেবতাদের শত্রু। কুরআন মাজীদে এ কথাটি নিম্নরূপে ব্যক্ত হয়েছে :

قَالُوا مَن فَعَلَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ (٥٩) قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ

"তারা বলতে লাগল, আমাদের দেবতাদের সাথে এরূপ ব্যবহার কে করল? নিঃসন্দেহ সে অবশ্যই জালিম, (তাদের মধ্যে কেউ) বলল, আমি জনৈক যুবককে এই

মূর্তিসমূহের (নিন্দার সাথে) আলোচনা করতে শুনেছি। তাকে ইবরাহীম বলা হয়। (অর্থাৎ এটা তারই কাজ।)

মোহন্ত ও নেতৃবৃন্দ একথা শুনে দুঃখে ও ক্রোধে লাল হয়ে বলতে লাগল, তাকে জনগণের সম্মুখে নিয়ে এসো! সকলে দেখুক অপরাধী কোন ব্যক্তি। ইবরাহীম আ.-কে সম্মুখে আনয়ন করা হল। বড়ই ভীতিপ্রদ প্রভাবের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, ইবরাহীম! আমাদের দেবতাদের সঙ্গে তুমি এসব আচরণ কেন করলে ? এই মর্মে কোরআন মাজিদে এরূপ বর্ণিত আছে :

قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ (٦١) قَالُوا أَأَنتَ فَعَلْتَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ

"তারা বলল, ইবরাহীমকে জনতার সম্মুখে নিয়ে এসো! যেন তারা (অপরাধীকে) দেখতে পায়, (ইবরাহীম আ. জনসমক্ষে উপস্থিত হওয়ার পর) তারা বলল, "তুমিই কি আমাদের দেবতাদের সঙ্গে এরূপ আচরণ করেছ?" (সূরা আম্বিয়া : ৬১-৬২)

ইবরাহীম আ. দেখলেন, এখন সুবর্ণ সুযোগ এসে পড়েছে। যার জন্য আমি এই উপায়টি অবলম্বন করেছি। জনসমাবেশ বিদ্যমান, সর্বসাধারণ লোকেরা দেখছে, তাদের দেবতাদের কি দুর্দশা ঘটেছে। অতএব এখন মোহন্ত ও নেতৃবৃন্দকে সর্বসাধারণের সমক্ষে তাদের বাতেল আকিদার উপর লজ্জিত করে দেওয়ার সময়, যাতে সাধারণ লোকেরা চোখে দেখে বুঝতে পারে যে, আজ পর্যন্ত দেবতাদের সম্বন্ধে মোহন্তগণ ও নেতৃবৃন্দ আমাদেরকে যা কিছু বলেছে, সবকিছুই তাদের ধোঁকা ও প্রতারণা ছিল। আমার এখন তাদেকে বলা উচিত, এই সমস্ত হল বড় মূর্তিটির কাজ, তাকেই জিজ্ঞাসা কর। তখনই আমার উদ্দেশ্য সফল হয়ে যাবে। তখন আমি তাদের আকিদা-বিশ্বাসের অসারতা সর্বসাধারণের নিকট প্রকাশ করে দিয়ে সঠিক ও বিশুদ্ধ বিশ্বাসের শিক্ষা প্রদান করতে পারব। বলে দিব, তারা কিরূপে বাতেল মতবাদ ও পথভ্রষ্টতার মধ্যে লিপ্ত রয়েছে। তখন মোহন্ত এবং পূজারীদের নিকট লজ্জা ছাড়া কি থাকবে? অতএব হযরত ইবরাহীম আ. উত্তর করলেন :

قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَٰذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ

ইবরাহীম আ. বললেন : বরং এদের মধ্যে এ বড় মূর্তিটি এই কাজ করেছে। অতএব যদি তোমাদের এই দেবতাদের বাকশক্তি থাকে, তবে তাকেই জিজ্ঞাসা করে নাও।"

(সূরা আম্বিয়া : ৬৩)

ইবরাহীম আ.-এর এই সুনিশ্চিত প্রমাণের বিরুদ্ধে মোহন্ত ও পূজারীদের আর কি জবাব হতে পারত! তারা লজ্জায় নিমজ্জিত ছিল। মনে মনে হীন ও অপমানিত হয়ে পড়েছিল এবং ভাবছিল কি জবাব দিবে? জনসাধারণও আজ সবকিছু বুঝে গেল এবং তারা স্বচক্ষে সেই দৃশ্য দেখে নিল, যার জন্য তারা প্রস্তুত ছিল না এবং পরিশেষে ছোট-বড় সকলকেই মনে মনে স্বীকার করতে হল, ইবরাহীম অন্যায়কারী নয় বরং

অন্যায়কারী আমরা। কারণ, এমন প্রমাণবিহীন বাতেল আকিদার উপর বিশ্বাস রাখছি, তখন তারা অত্যন্ত লজ্জায় মস্তক অবনত করে বলতে লাগল, ইবরাহীম! তুমি তো ভালো করেই জান, এ সমস্ত দেবতার মধ্যে বাকশক্তি নাই। এরা তো বানানো মূর্তি মাত্র। এ ঘটনাটিকে কোরআন মাজিদ এরূপে ব্যক্ত করছে :

فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ (٦٤) ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَٰؤُلَاءِ يَنطِقُونَ

"এরপর তারা নিজেদের অন্তরে চিন্তা করল এবং বলতে লাগল, নিঃসন্দেহ তোমরাই (অর্থাৎ আমরাই) অন্যায়কারী। এরপর (লজ্জায়) নিজেদের মস্তক অবনত করে বলতে লাগল, (হে ইবরাহীম!) তুমি খুব ভালো করেই জান, এ দেবতাগুলির বাকশক্তি নাই।"

(সূরা আম্বিয়া: ৬৪-৬৫)

এরূপে হযরত ইবরাহীম আ.-এর দলিল ও প্রমাণ সফলকাম হল এবং শত্রুরা স্বীকার করল, "অন্যায়কারী আমরাই" এবং তাদেরকে জনসাধারণের সম্মুখে নিজেদের মুখে স্বীকার করতে হল, আমাদের এই দেবতাসমূহের জবাব দেওয়ার ও কথা বলার শক্তি নেই আর উপকার ও ক্ষতি করার শক্তি থাকা তো দূরেরই কথা।

অতএব এখন ইবরাহীম আ. সংক্ষিপ্ত ব্যাপকার্থকবোধক শব্দে তাদের উপদেশ প্রদান করলেন এবং তিরস্কারও করলেন। সাথে সাথে বললেন, যখন তোমাদের এ দেবতারা উপকারও করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না, তবে এরা খোদা এবং মাবুদ কেমন করে হতে পারে? আফসোস! এতটুকু কথাও তোমরা বুঝ না? কিংবা জ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে লাগাও না? এ মর্মে কুরআন মাজিদে উল্লেখ হয়েছে :

قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ (٦٦) أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

"তোমরা কি আল্লাহকে ছেড়ে ওই সমস্ত উপাস্যের পূজা করছ, যারা তোমাদের কোনো উপকারও করতে পারে না এবং কোনো ক্ষতিও করতে পারে না? তোমাদের উপর আফসুস এবং তোমাদের সেই বাতেল মাবুদগুলির উপরও; যাদেরকে তোমরা আল্লাহকে ছাড়া পূজা করছ। তোমরা কি জ্ঞান খাটিয়ে কাজ কর না।"

(সূরা আম্বিয়া : ৬৬-৬৭)

"এরপর সকলে হৈ-হল্লা করে ইবরাহীম আ.-এর চতুর্দিকে সমবেত হয়ে গেল। ইবরাহীম আ. বললেন, তোমরা কি তোমাদের গড়া মূর্তিসমূহের পূজা করছ? আসল কথা এই যে, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে পয়দা করেছেন এবং ওই সমস্ত কাজকেও, যা তোমরা করছ?" (সূরা সাফফাত : ৯৪, ৯৫)

হযরত ইবরাহীম আ.-এর নসিহত এবং উপদেশের ফলে কওমের সমস্ত লোক নিজেদের বাতেল আকিদা হতে তওবা করে হানাফী ধর্ম গ্রহণ করে নেওয়া এবং

বক্রপথ ত্যাগ করে সিরাতুল মুস্তাকিমের ওপর চলা উচিত ছিল। কিন্তু অন্তরসমূহের বক্রতা, নফসের অবাধ্যতা, নাফরমানিমূলক মনোবৃত্তি এবং আভ্যন্তরীণ অপবিত্রতা ও হীনতা তাদেরকে এদিকে অগ্রসর হতে দিল না। উল্টো তারা সকলে ইবরাহীম আ.-এর শত্রুতা ও দুশমনির আওয়াজ তুলল। একে অন্যকে বলল, যদি দেবতাদের সন্তোষ কামনা কর, তবে এ ব্যক্তিকে এই ধৃষ্টতা ও অপরাধকর্মের জন্য কঠোর শাস্তি প্রদান কর এবং জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে পুড়িয়ে ফেল। যাতে তার এই তাবলিগ ও দাওয়াতের ব্যাপারই খতম হয়ে যায়। কুরআনে আল্লাহ তাআলা সেকথাই জানিয়ে দিলেন, ইবরাহীম আ. তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের মূর্তিপূজার সমালোচনা করেন এবং তাদের কাছে ওগুলোর অসারতা ও অক্ষমতার কথা তুলে ধরেন। সুতরাং তিনি বলেছেন

مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ

"এই মূর্তিগুলো কি? যাদের পূজায় তোমরা রত রয়েছ?" অর্থাৎ এদের নিকট নিষ্ঠার সাথে বসে থাক ও কাতর হয়ে পড়ে থাক। তারা উত্তর দিল,

قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ

"আমরা আমাদের পূর্ব-পুরুষদের এদের পূজারীরূপে পেয়েছি।" তাদের যুক্তি ছিল একটাই, তাদের বাপ-দাদারা এরূপ দেবদেবীর পূজা-অর্চনা করত।

قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

সুতরাং তিনি বললেন, তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছ। যেমন আল্লাহ বলেছেন :

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ (٨٥) أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ (٨٦) فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ

"যখন সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে জিজ্ঞেস করেছিল, তোমরা কিসের পূজা করছ? তোমরা কি আল্লাহর পরিবর্তে অলীক ইলাহগুলোকে চাও? তা হলে জগতসমূহের প্রতিপালক সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি?"

কাতাদা রহ. এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা করেছেন, বিশ্ব জাহানের পালনকর্তা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যখন তোমরা অন্যদের ইবাদত করছ, তখন যেদিন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হবে, সেদিন তিনি তোমাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করবেন বলে মনে কর?

ইবরাহীম আ. যখন তাদেরকে বলেছেন :

قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (٧٢) أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ (٧٣) قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ

তোমরা প্রার্থনা করলে ওরা কি শোনে? অথবা ওরা কি তোমাদের উপকার কিংবা অপকার করতে পারে? তারা বলল, না! তবে আমাদের বাপ-দাদাদেরকে এরূপই করতে দেখেছি। (সূরা শুআরা : ৭২-৭৪)

তারা স্বীকার করে নিল, আহ্বানকারীর ডাক ওরা শোনে না, কারও কোনো উপকারও করতে পারে না; অপকারও করতে পারে না। তারা এরূপ করছে কেবল তাদের মূর্খ পূর্ব-পুরুষের অন্ধ আনুগত্য হিসেবে। এ জন্যেই তিনি তাদেরকে বলে দেন,

أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (٧٥) أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ (٧٦) فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ

তোমরা কি তাদের সম্পর্কে ভেবে দেখেছে, যাদের পূজা করে আসছ? তোমরা ও তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃ-পুরুষেরা; কেননা রাব্বুল আলামিন ব্যতীত তারা সবাই আমার দুশমন। (সূরা শুআরা: ৭৫-৭৭)

তারা মূর্তির উপাস্য হওয়ার যে দাবি করত, তা যে বাতিল ও ভ্রান্ত, উল্লিখিত আয়াতেসমূহে তার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়। কেননা হযরত ইবরাহীম আ. এগুলোকে পরিত্যাগ করেন ও হেয়প্রতিপন্ন করেন। এতে যদি তাদের ক্ষমতা থাকত ক্ষতি করার, তা হলে অবশ্যই তারা তাঁর ক্ষতি করত অথবা যদি আদৌ কোনো প্রভাবের অধিকারী হত, তবে অবশ্যই তাঁর উপর সে ধরনের প্রভাব ফেলত।

قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ

"তারা বলল, তুমি কি আমাদের নিকট সত্যসহ আগমন করেছ, না কি তুমি কৌতুকচ্ছলে উপাস্যদেরকে তিরস্কার করছ!"

হে ইবরাহীম! তুমি আমাদের নিকট যা কিছু বলছ, আমাদের উপাস্যদেরকে তিরস্কার করছ এবং আমাদের পূর্ব-পুরুষদের সমালোচনা করছ, এ সব কি তুমি সত্যি সত্যিই বলছ, নাকি কৌতুক করছ?

قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ

"সে বলল : না, তোমাদের প্রতিপালক তো তিনি, যিনি আসমান ও জমীনের প্রতিপালক, যিনি এগুলো সৃজন করেছেন এবং আমিই এর উপর অন্যতম সাক্ষী।"

অর্থাৎ আমি তোমাদের নিকট যা কিছু বলছি, সবই সত্য ও যথার্থ বলছি। বস্তুত তোমাদের উপাস্য সেই একজনই, যিনি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই। তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং আসমান-জমিনেরও প্রতিপালক। পূর্বদৃষ্টান্ত ছাড়াই তিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং ইবাদতের যোগ্য একমাত্র তিনিই, তাঁর কোনো শরীক নেই এবং আমি নিজেই এর সাক্ষী।

فَأَقْبَلُوٓا۟ إِلَيْهِ يَزِفُّونَ

"তারপর তারা ইবরাহীমের দিকে তেড়ে আসল।"

মুজাহিদ রহ. বলেছেন, "يَزِفُّونَ" অর্থ, "يَسرعون" তথা দ্রুত ধেয়ে যাওয়া, ক্রোধে তেড়ে আসা।

أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ

তোমরা কি সেই সব দেবতাদের পূজা কর, যেগুলো তোমরা নিজেরাই খোদাই করে তৈরি কর?

অর্থাৎ তোমরা কিভাবে এমন সব মূর্তির পূজা কর, যেগুলো নিজেরাই খোদাই করে তৈরি কর?) অর্থাৎ তোমরা কি সেই সব দেবতাদের পূজা কর, যেগুলো তোমরা স্বহস্তে কাঠ অথবা পাথর খোদাই করে নির্মাণ করে থাক এবং নিজেদের ইচ্ছামতো আকৃতি দান কর।

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

অথচ আল্লাহই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাদেরকে তোমরা তৈরি করে থাক।

এখানে ما অক্ষরটি মাছদারিয়াও হতে পারে; আবার মাওছূলাও হতে পারে। যেটাই হোক, এখানে যেকথা বলা উদ্দেশ্য, তা হল, তোমরাও সৃষ্টি আর এই মূর্তিগুলোও সৃষ্টি। এখন একটি সৃষ্টি অপর একটি সৃষ্টির ইবাদত কিভাবে করতে পারে। কেননা তোমরা তাদের উপাস্য না হয়ে তারা তোমাদের উপাস্য হবে এই অগ্রাধিকারের কোনো ভিত্তি নেই। এটাও যেমন ভিত্তিহীন, তেমনি এর বিপরীতটা অর্থাৎ তোমার উপাস্য হওয়াও ভিত্তিহীন। কারণ, ইবাদত-উপাসনা পাওয়ার অধিকারী কেবল সৃষ্টিকর্তাই; এ ব্যাপারে কেউ তাঁর শরীক নেই।

বাদশাকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান

এখন এ ব্যাপারে পরামর্শ হচ্ছিল, কী করা যায়? ক্রমে তৎকালীন বাদশার কান পর্যন্ত এ সমস্ত কথা গিয়ে পৌঁছাল। তৎকালে ইরাকের বাদশার উপাধি হত নমরূদ আর সে প্রজাবৃন্দের শুধু রাজাই হত না বরং নিজেকে তাদের খোদা ও মালিক মনে করত। আর প্রজাবৃন্দও অন্যান্য দেবতার মতো তাকেও নিজেদের মাবুদ এবং খোদা বলে মানত; তাকেও দেবতার মতোই পূজা করত। এমনকি দেবতাদের চেয়েও অধিকতর আদব রক্ষা করে চলত। কেননা সে জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমানও হত আর শাহী সিংহাসন এবং রাজমুকুটের মালিকও।

নমরূদ তা জানতে পেরে ক্রোধে অধীর হয়ে পড়ল এবং চিন্তা করতে লাগল, এই ব্যক্তির পয়গম্বরসুলভ তাবলীগ ও দাওয়াত যদি এভাবেই চলতে থাকে, তবে এ ব্যক্তি

আমার খোদায়িত্ব, রাজত্ব এবং দেবত্ব হতেও সমস্ত প্রজাকে বিগড়িয়ে দিবে। এরূপে পূর্বপুরুষের ধর্মের সাথে সাথে আমার এ রাজত্বেরও অবসান ঘটবে। সুতরাং অঙ্কুরেই এ ব্যাপারটি খতম করে দেওয়া উত্তম।

এই ভেবে সে আদেশ করল, ইবরাহীমকে আমার দরবারে হাজির কর। ইবরাহীম আ. কে নমরূদের দরবারে পৌঁছালে নমরূদ কথা প্রসঙ্গে ইবরাহীম আ. কে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি পূর্বপুরুষের ধর্মের বিরোধিতা কেন করছ? আর আমাকে খোদা মানতে তোমার অস্বীকৃতি কেন? ইবরাহীম আ. বললেন, আমি এক আল্লাহ তাআলার ইবাদত করছি। তাঁকে ছাড়া তাঁর সঙ্গে আর কাউকেও শরীক মানি না। সমুদয় সৃষ্টি এবং সমগ্র জগৎ তাঁরই সৃষ্ট। তিনিই সকলের স্রষ্টা ও মালিক।

তুমিও তেমনি একজন মানুষ যেমন আমরা মানুষ। তবে তুমি কিভাবে রব কিংবা খোদা হতে পার? আর কিভাবে এই বোবা, বধির ও অন্ধ কাষ্ঠ মূর্তিগুলি খোদা হতে পারে? আমি সঠিক পথের উপর আছি। আর তোমরা সকলে ভুল পথে রয়েছ। কাজেই আমি সত্যের প্রচার কিভাবে ত্যাগ করতে পারি? তোমাদের পূর্বপুরুষের মনগড়া ধর্মকে কিভাবে গ্রহণ করতে পারি?

নমরূদ ইবরাহীম আ. কে জিজ্ঞাসা করল, যদি আমি ছাড়া তোমার কোনো খোদা থাকে, তবে তার এমন গুণ বর্ণনা কর, যে শক্তি আমার মধ্যে নেই। তখন ইবরাহীম আ. বললেন : আমার খোদা সেই মহান সত্তা, যাঁর কবলে রয়েছে মৃত্যু ও জীবন, তিনিই মৃত্যু দান করে থাকেন এবং তিনিই জীবন দান করেন। বক্র বুদ্ধির নমরূদ মৃত্যু ও জীবনের নিগূঢ়তা সম্বন্ধে ছিল অজ্ঞ। নমরূদ বলতে লাগল, এরূপে মৃত্যু ও জীবন তো আমার কবলেও রয়েছে। এই বলে তখনই একজন নির্দোষ ব্যক্তিকে এনে জল্লাদকে আদেশ করল, তাকে হত্যা করে ফেল এবং মৃত্যুর ঘাটে নামিয়ে দাও। জল্লাদ তৎক্ষণাৎ আদেশ পালন করল। আর জনৈক মৃত্যুর দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীকে জেলখানা হতে ডেকে এনে আদেশ করল, যাও! আমি তোমার জীবন দান করলাম। এরপর ইবরাহীম আ. কে লক্ষ্য করে বলল, দেখলে আমিও কীভাবে জীবন ও মৃত্যু দান করে থাকি, তবে আর তোমার খোদার বিশেষত্ব কি রইল?

ইবরাহীম আ. বুঝলেন, নমরূদ হয়ত মৃত্যু ও জীবনের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত না কিংবা জনসাধারণ ও প্রজাবৃন্দকে ভুল বুঝাতে চাচ্ছে। যেন তারা এই পার্থক্যটুকু বুঝতে না পারে যে, জীবন দান করা এর নাম নয় বরং অনস্তিত্ব হতে অস্তিত্বে আনয়ন করার নাম জীবন দান করা। আর এরূপে হত্যা কিংবা ফাঁসি হতে রক্ষা করার নাম মৃত্যুর মালিক হওয়া নয় মৃত্যুর মালিক তিনিই, যিনি মানুষের রূহকে তার দেহ হতে বের করে নিজের কবলে আনয়ন করেন।

এ জন্যই বহু শূলিতে চড়ানো এবং তরবারির আঘাত প্রাপ্ত মানুষ জীবন প্রাপ্ত হয়ে যায়। আর বহু শূলি ও হত্যা হতে রক্ষিত মানুষ মৃত্যুর গ্রাসে পরিণত হয়। কোনো শক্তি

তাকে রোধ করতে পারে না। আর যদি মৃত্যুকে রোধ করা সম্ভব হত, তবে ইবরাহীম আ.-এর সঙ্গে বিতর্ককারী নমরূদ রাজ্যের সিংহাসন অলঙ্কৃত করত না বরং তার বংশের প্রথম ব্যক্তিকেই আজ পর্যন্তও এই মুকুট ও সিংহাসনের মালিক দেখা যেত। কিন্তু জানা নেই, ইরাকের এই রাজত্বের কত দাবিদার মাটির নিচে সমাহিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও কতজনের পালা আসবে?

তবুও ইবরাহীম আ. ভাবলেন, আমি যদি এখন হায়াত মউতের সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা করি, তবে নমরূদের উদ্দেশ্য সফল হয়ে যাবে। সে সর্বসাধারণকে ভুলে ফেলে আসল ব্যাপারটিকে গড়বড় করে দিবে এবং এরূপে আমার সৎ উদ্দেশ্যটি সফল হতে পারবে না। আর সত্যের প্রচার প্রসঙ্গে জানতার সম্মুখে নমরূদকে নিরুত্তর করে দেওয়ার সুযোগ নষ্ট হয়ে যাবে। কেননা আলোচনা ও সমালোচনা এবং ঝগড়া ও বিতর্ক আমার আসল উদ্দেশ্য নয় বরং মানুষের মগজে ও অন্তরে এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস জন্মানোই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। সুতরাং তিনি এ প্রমাণটি ত্যাগ করে তাকে বুঝানোর জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করলেন। তিনি এমন প্রমাণ উপস্থিত করলেন, যা প্রত্যেকটি মানুষই চাক্ষুশ দর্শন করতে থাকে এবং কোনো তর্কশাস্ত্রের প্রমাণ ব্যতীত দৈনন্দিন জীবনে তা দেখতে পায়।

ইবরাহীম আ. বললেন : আমি সেই মহান সত্তাকে আল্লাহ বলে মানি, যিনি প্রতি দিন সূর্যকে পূর্ব দিক হতে উদিত করেন এবং পশ্চিম দিকে নিয়ে যান। তুমিও যদি তদ্রুপ খোদায়িত্বের দাবি কর, তবে এর বিপরীত সূর্যকে পশ্চিম দিক হতে উদিত কর এবং পূর্ব দিকে অস্তমিত কর। একথা শুনে নমরূদ হতবাক ও নিরুত্তর হয়ে গেল। আর এরূপে ইবরাহীম আ.-এর মুখে আল্লাহ তাআলার প্রমাণ পূর্ণ হলে গেল।

নমরূদ এ প্রমাণ শুনে হতবাক কেন হল এবং তার নিকট এ প্রমাণের বিরুদ্ধে ভুল বুঝানোর অবকাশ কেন ছিল না, এর কারণ ইবরাহীম আ.-এর প্রমাণটির সারর্মম ছিল : আমি এমন এক সত্তাকে আল্লাহ মানছি, যাঁর সম্বন্ধে আমার আকীদা হল, এর কোনো বস্তু নির্ধারিত সময়ের পূর্বে নিজের স্থান হতে সরতেও পারে না এবং এদিক-সেদিকও হতে পারে না। তোমরা সেই পূর্ণ ব্যবস্থাপনার মধ্য হতে সূর্যকেই দেখ, এই অধঃজগৎ এর দ্বারা কি পরিমাণ ফায়দা লাভ করছে? এত কিছু সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা এর উদয়-অস্তেরও একটি শৃঙ্খলা নির্ধারিত করে দিয়েছেন।

অতএব সূর্য যদি লক্ষবারও এই শৃঙ্খলার বাইরে যেতে চায়, তবে সে তাতে সক্ষম হবে না। কেননা তার লাগাম আল্লাহ পাকের কুদরতের হাতে রয়েছে। নিঃসন্দেহে তাঁর এই ক্ষমতা রয়েছে, তিনি যা ইচ্ছা করবেন, তা-ই করে ছাড়বেন। কিন্তু তিনি করেন তা-ই, যা তাঁর হেকমতের চাহিদা অনুযায়ী হয়।

সুতরাং নমরূদের জন্য এখন জবাব দেওয়ার তিনটি ছুরতই হতে পারত। হয়ত সে বলত, সূর্যের উপর আমারও পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে এবং আমিই এ সমস্ত শৃঙ্খলা সৃষ্টি

করেছি, কিন্তু এই উত্তর সে দেয় নাই। কারণ, সে নিজেও কোনো সময় বলত না যে, এই সমুদয় সৃষ্টি আমিই সৃষ্টি করেছি এবং সূর্যের গতিবিধি আমার ক্ষমতাধীন বরং সে তো শুধু নিজেকে নিজের প্রজাবৃন্দের খোদা ও দেবতা বলে পরিচয় দিত; আর কিছুই না।

দ্বিতীয়ত হতে পারত সে বলত, আমি এই জগতকে কারও সৃষ্টি বলে মানি না। আর সূর্য তো নিজেই স্বতন্ত্র দেবতা। তার ক্ষমতাধীনেই তো অনেক কিছু রয়েছে। কিন্তু এটাও সে বলে নাই। কারণ, যদি সে এরূপ বলত, তবে হযরত ইবরাহীম আ.-এর সেই প্রশ্নই সম্মুখে এসে পড়ত, যা তিনি জনসাধারণের সম্মুখে সূর্যের খোদায়িত্ব সম্বন্ধে উত্থাপন করেছিলেন অর্থাৎ যদি সূর্য খোদা হয়ে থাকে, তবে ভক্ত ও পূজারীদের চেয়ে অধিক এই মাবুদ ও দেবতার মধ্যে পরিবর্তন এবং ধ্বংসের লক্ষণসমূহ কেন বিদ্যমান? যিনি খোদা হবেন, তাঁর সঙ্গে ধ্বংস ও পরিবর্তনের কি সম্পর্ক? আর তার নির্ধারিত সময়ের পূর্বে কিংবা পরে উদিত বা অস্তমিত হওয়ার কী সাধ্য আছে?

তৃতীয়ত সে ইবরাহীম আ.-এর চ্যালেঞ্জকে কবুল করে নিতে এবং পশ্চিম দিক হতে সূর্যকে উদিত করে দেখাতে পারত। কিন্তু নমরূদ যেহেতু এই তিন অবস্থার কোনোভাবেই জবাব দিতে পারছিল না, তাই হতবাক ও নিরুত্তর হয়ে যাওয়া ছাড়া তার জন্য অন্য কোনো উপায়ই ছিল না।

(ঈসায়ী পাদ্রীরা এবং তাদের অন্ধ অনুসরণে আর্য সমাজ ইবরাহীম আ.-এর উপরিউক্ত বিতর্কের উপর প্রশ্ন করছে, "যদি নমরূদ এরূপ বলে বসে, ইবরাহীম তুমিই তোমার খোদার সাহায্যে সূর্যকে পশ্চিম দিক হতে উদিত করে দাও! তবে ইবরাহীমের নিকট কি উত্তর ছিল? এই প্রশ্নটি খুবই দুর্বল ও হালকা। কেননা আমি ইবরাহীম আ.-এর বিতর্কের যেই ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছি এবং যা প্রকৃত তথ্য, এরপর এরূপ প্রশ্নের উদ্ভবই হয় না। কেননা নমরূদ জানত, সে এরূপ মোটেও বলতে পারে না।

কারণ, তা হলে প্রথমে তাকে নিজের অক্ষমতা ও অপারগতা স্বীকার করতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে এটাও মেনে নিতে হয়, সূর্য আমাদের দেবতাও নয় এবং তার মধ্যে এ ক্ষমতাও নেই, সে আমাদের এ দাবিকে ইবরাহীমের মোকাবেলায় মনযুর করে নিবে। এ কারণেই সে নীরবতাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। আর যদি সে এরূপ প্রশ্ন করেই বসত, তবে ইবরাহীম আ.-এর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এরূপ চ্যালেঞ্জের সময় আল্লাহ তাআলা নিজের সত্য পয়গম্বরকে অপমানিত করবেন না। ইবরাহীম আ.-এর দোয়ায় নিঃসন্দেহে তিনি সূর্যকে পশ্চিম দিক হতে উদিত করে ইবরাহীম আ.-এর সত্যতা প্রকাশ করে দিবেন। অবশ্য এ বিষয়টি জড়বাদীদের জন্য এবং আল্লাহর কুদরতের উপর নিয়ন্ত্রণারোপকারীদের জন্য অবশ্যই বিস্ময়কর হতে পারে।

কিন্তু যাদের আকিদা, সৃষ্টিজগতের এ সমস্ত শৃঙ্খলা যদি নির্দিষ্ট নিয়মাবলীর চাপাকলের সঙ্গে দৃঢ়রূপে আবদ্ধই হয়, তবে তার এ চাপাকল ওই বস্তুসমূহের নিজস্ব

বৈশিষ্ট্যের কারণে না বরং এ চাপাকলকে কষে বাঁধা ও দৃঢ় করা অন্য এক মহা ক্ষমতাশীল সত্তার কাজ। যিনি সকলের ঊর্ধ্বে এবং সমস্ত পদার্থের ক্রিয়া ও বৈশিষ্ট্য তাঁরই কুদরতের অধীন।

অতএব তিনি ইচ্ছা করলে যাবতীয় বস্তুর ক্রিয়া ও বৈশিষ্ট্যসমূহকে পরিবর্তিতও করে দিতে পারেন, ধ্বংসও করে দিতে পারেন। সেই পূর্ণ ক্ষমতাশীল, নিরঙ্কুশ মালিক ও সর্বাধিপতির নাম 'আল্লাহ'। এরূপ বিশ্বাস পোষণকারীদের দৃষ্টিতে এটা বিস্ময়কর নয়। নমরূদের সঙ্গে হযরত ইবরাহীম আ.-এর বিতর্কটির কথা সূরা বাকারায় সংক্ষিপ্ত কিন্তু নমনীয়ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

"আপনি কি দেখেন নি সেই ব্যক্তির ঘটনা, যাকে আল্লাহ তাআলা রাজত্ব দান করেছিলেন। সে কেমনভাবে ইবরাহীম আ.-এর সাথে তার প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্ক করল? যখন ইবরাহীম আ. বললেন, আমার রব তো জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দান করেন। তখন বাদশা বলল, আমি জীবন দান করি এবং মৃত্যু দান করি। ইবরাহীম আ. বললেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা সূর্যকে পূর্বদিক হতে উদয় করেন; তুমি তাকে পশ্চিম দিক হতে বের করে দেখাও! এরপর সেই কাফের বাদশা হতবাক ও নিরুত্তর হয়ে গেল। আর আল্লাহ তাআলা অনাচারীদের পথ দেখান না। (সূরা বাকারা : ২৫৮)

মোটকথা, হযরত ইবরাহীম আ. সর্বপ্রথম নিজ পিতা আযরকে ইসলাম গ্রহণের উপদেশ প্রদান করলেন, সত্যের পয়গাম শুনালেন, সরল পথ দেখালেন। এরপর সাধারণ লোককে জনসমাবেশে ব্যাপক আহ্বান জানালেন। আল্লাহর আদেশ মেনে নেওয়ার জন্য প্রকৃতির উৎকৃষ্ট নিয়মাবলী এবং প্রমাণসমূহ পেশ করলেন। নম্রতা, মিষ্টি কথা অথচ মযবুত ও দৃঢ় এবং উজ্জ্বল দলিল-প্রমাণের সঙ্গে সত্যকে তাদের সম্মুখে প্রকাশ করলেন। সর্বশেষ বাদশা নমরূদের সাথে বিতর্ক করলেন। তার নিকট একথা স্পষ্ট করে দিলেন, খোদা ও মাবুদ হওয়ার দাবি একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যই শোভা পায়।

বড় হতে বড় সম্রাট এবং রাজাধিরাজেরও তাঁর সমকক্ষতার দাবি করার অধিকার নেই। কেননা সে এবং সমগ্র সৃষ্টি তাঁর সৃষ্টি এবং অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাদশা, আযর এবং দেশের আপামর জনসাধারণ হযরত ইবরাহীম আ.-এর দলিল-প্রমাণাদির সম্মুখে নিরুত্তর ছিল। মনে মনে তাঁর সত্যতায় স্বীকারকারী; এমনকি মূর্তিসমূহের ব্যাপারে তো মুখেও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে, ইবরাহীম যা বলছে, তাই সত্য এবং সঠিক। তথাপি তাদের মধ্য হতে কেউই সরল পথ গ্রহণ করল না; সত্য গ্রহণে বিরতই থাকল।

শুধু এতটুকুই নয় বরং তার বিপরীত নিজেদের লজ্জা ও অপমানের প্রতিক্রিয়ার প্রভাবিত হয়ে অত্যন্ত রাগান্বিত ও ক্রোধান্বিত হয়ে গেল। রাজা হতে প্রজাবৃন্দ পর্যন্ত সকলে ঐকমত্যে সিদ্ধান্ত করে ফেলল, দেবতাদের অপমান করা এবং পূর্বপুরুষের ধর্মের বিরোধিতা করার প্রতিফল স্বরূপ ইবরাহীমকে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে ফেলে পুড়িয়ে ফেলা কর্তব্য। কেননা এমন ভীষণ অপরাধীর শাস্তি এটাই হতে পারে আর দেবতাদের অপমান করার প্রতিশোধ এরূপেই নেওয়া যেতে পারে।

قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ (٩٧) فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ

"তারা বলল, এর জন্যে এক ইমারত তৈরি কর। তারপর একে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ কর। তারা ইবরাহীমের বিরুদ্ধে চক্রান্তের সংকল্প করেছিল, কিন্তু আমি তাদেরকে অতিশয় হেয় করে দিলাম।"

ইবরাহীম আ.-এর সাথে তারা যখন যুক্তি ও বিতর্কে পেরে উঠতে পারল না, তাদের পক্ষে উপস্থাপন করার মতো কোনোই দলিল-প্রমাণ থাকল না, তখন তারা বিতর্কের পথ এড়িয়ে শক্তি ও ক্ষমতা প্রয়োগের পথ অবলম্বন করল, যাতে করে নিজেদের নির্বুদ্ধিতা ও হঠকারিতা টিকিয়ে রাখতে পারে। আল্লাহ্ তাআলাও তাদের চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দেওয়ার কৌশল নিলেন। আল্লাহ্ বলেন :

قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ (٦٨) قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ (٦٩) وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ

"তারা বলল, ইবরাহীমকে পুড়িয়ে দাও এবং তোমাদের দেবতাদেরকে সাহায্য কর, যদি তোমরা কিছু করতে চাও। আমি বললাম, হে আগুন! তুমি ইবরাহীমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও। তারা ইবরাহীমের ক্ষতিসাধন করতে চেয়েছিল; কিন্তু আমি তাদেরকে করে দিলাম সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা আম্বিয়া : ৬৮-৭০)

তারা বিভিন্ন স্থান থেকে সম্ভাব্য চেষ্টার মাধ্যমে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে থাকে। দীর্ঘ দিন পর্যন্ত তারা এ সংগ্রহের কাজে রত থাকে। তাদের মধ্যে কোনো মহিলা পীড়িত হলে মানত করত, যদি সে আরোগ্য লাভ করে, তবে ইবরাহীম আ. কে পোড়ানোর লাকড়ি সংগ্রহ করে দিবে। এরপর তারা বিরাট এক গর্ত তৈরি করে তার মধ্যে লাকড়ি নিক্ষেপ করে অগ্নি সংযোগ করে। ফলে তীব্র দহনে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা এত উপরে উঠতে থাকে, যার কোনো তুলনা হয় না।

তারপর ইবরাহীম আ. কে মিনজানিকের মতো নিক্ষেপণ যন্ত্রে বসিয়ে দেয়। এই যন্ত্রটি কুর্দি সম্প্রদায়ের হাযান নামক এক ব্যক্তি তৈরি করে ছিল। মিনজানিক যন্ত্র সে-ই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করে। আল্লাহ্ তাকে মাটির মধ্যে ধসিয়ে দেন। কেয়ামত পর্যন্ত সে মাটির মধ্যে তলিয়ে যেতে থাকবে। তারপর তারা ইবরাহীম আ. কে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। তখন তিনি বলতে থাকেন :

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ

"আপনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ্ নেই। আপনি মহা পবিত্র। বাদশাহির মালিক কেবল আপনিই। আপনার কোনো শরিক নেই।"

ইবরাহীম আ.-কে মিনজানিকের পাল্লায় হাত-পা বাঁধা অবস্থায় রেখে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়। তখন তিনি বলেন :

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

"আমার জন্যে আল্লাহ্ই যথেষ্ট, তিনিই উত্তম অভিভাবক!"

হযরত ইবরাহীম আ.-এর সঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মিল

বোখারি শরিফে হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. সূত্রে বর্ণিত হয়েছে : ইবরাহীম আ.-কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয়, তখন তিনি বলেছিলেন : حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন এ দোয়াটি পড়েছিলেন, যখন তাঁকে বলা হয়েছিল :

إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (١٧٣) فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ

"তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জামায়েত হয়েছে। সুতরাং তাদেরকে ভয় কর; কিন্তু এটা তাঁদের ঈমানকে আরও দৃঢ় করে দিয়েছিল। আর তারা বলেছিল, আল্লাহ্ই আমাদের জন্যে যথেষ্ট এবং তিনি বড়ই উত্তম কর্মবিধায়ক। তারপর তারা আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহসহ ফিরে এসেছিল। কোনোরূপ ক্ষতি তাদের স্পর্শ করতে পারে নি।"

(সূরা আলে-ইমরান : ১৭৩-১৭৪)

আবু ইয়ালা রহ. ... হযরত আবু হোরায়রা রাযি.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ইবরাহীম আ.-কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয়, তখন তিনি বলেন : "হে আল্লাহ! আপনি আকাশ-রাজ্যে একা, আর জমিনে আমি একাই আপনার ইবাদত করছি।"

আল্লাহর অপূর্ব সাহায্য

কোনো কোনো আলেম বলেন, জিবরাইল আ. শূন্যে থেকে হযরত ইবরাহীম আ.-কে বলেছিলেন : আপনার কোনো সাহায্যের প্রয়োজন আছে কি? উত্তরে ইবরাহীম আ. বলেছিলেন– 'সাহায্যের প্রয়োজন আছে, তবে আপনার কাছে নয়।'

ইবনে আব্বাস ও সাঈদ ইবনে যোবায়ের রাযি. থেকে বর্ণিত– সে সময় বৃষ্টির ফেরেশতা মিকাঈল আ. বলেছিলেন : আমাকে যখনই নির্দেশ দেওয়া হবে, তখনই বৃষ্টি প্রেরণ করব। কিন্তু আল্লাহর নির্দেশবাণী অধিক দ্রুত গতিতে পৌঁছে যায় :

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ

"আমি হুকুম করলাম, হে আগুন! তুমি ইবরাহীমের উপর শীতল ও শান্তিদায়ক হয়ে যাও!"

হযরত আলী ইবনে আবি তালেব রাযি. سَلَامًا এর অর্থ করেছেন, তাকে কষ্ট দিও না। ইবনে আব্বাস রাযি. ও আবুল আলিয়া রহ. বলেছেন, আল্লাহ যদি وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ না বলতেন, তা হলে ঠাণ্ডা ও শীতলতায় ইবরাহীম আ.-এর কষ্ট হত। কাবে আহবার বলেছেন, পৃথিবীর কোনো লোকই সেদিন আগুন থেকে কোনোরূপ উপকৃত হতে পারে নি এবং ইবরাহীম আ.-এর বন্ধনের রশি ছাড়া আর কিছুই জ্বলে নি। যাহহাক রহ. বলেছেন, সে সময় হযরত জিবরাঈল আ. ইবরাহীম আ.-এর সঙ্গে ছিলেন। এবং তাঁর শরীর থেকে ঘাম মুছে দিচ্ছিলেন। এই ঘাম নির্গমন ছাড়া আগুনের আর কোনো প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায় নি।

সুদ্দী রহ. বলেছেন : ইবরাহীম আ.-এর সাথে ছায়াদানের ফেরেশতাও ছিলেন। হযরত ইবরাহীম আ. যখন প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যকার উক্ত গহ্বরে অবস্থান করছিলেন, তখন তাঁর চারপাশে আগুনের লেলিহান শিখা দাউদাউ করছিল। অথচ তিনি ছিলেন শ্যামল উদ্যানে শান্তি ও নিরাপদে। লোকজন এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছিল; কিন্তু না তারা ইবরাহীম আ.-এর নিকট যেতে পারছিল; আর না ইবরাহীম আ. বেরিয়ে তাদের কাছে আসতে পারছিলেন।

আবু হোরায়রা রাযি. বলেন : হযরত ইবরাহীম আ.-এর পিতা আপন পুত্রের এ অবস্থা দেখে একটি সুন্দর কথা বলেছিল :

نِعْمَ الرَّبُّ رَبُّكَ يَا إِبْرَاهِيمُ

হে ইবরাহীম! তোমার প্রতিপালক কতই না উত্তম প্রতিপালক!

হযরত ইবরাহীম আ.-এর প্রতি মাতৃস্নেহ

ইবনে আসাকির রহ. ইকরামা রাযি. সূত্রে বর্ণনা করেন : ইবরাহীম আ.-এর মা পুত্রকে এ অবস্থায় দেখে ডেকে বলেছিলেন, হে আমার প্রিয় পুত্র! আমি তোমার নিকট আসতে চাই। আল্লাহর কাছে একটু বল, যাতে তোমার চারপাশের আগুন থেকে আমাকে রক্ষা করেন। ইবরাহীম আ. বললেন, হ্যাঁ বলছি। তারপর মা পুত্রের নিকট চলে গেলেন। আগুন তাঁকে স্পর্শ করল না। কাছে গিয়ে মাতা আপন পুত্রকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করলেন এবং পুনরায় অক্ষতভাবে সেখান থেকে বের হয়ে এলেন।

মিনহাল ইবনে আমর রাযি. বর্ণনা করেছেন : হযরত ইবরাহীম আ. আগুনের মধ্যে চল্লিশ কিংবা পঞ্চাশ দিন অবস্থান করেন। এই সময় সম্পর্কে হযরত ইবরাহীম আ. বলেন : আগুনের মধ্যে আমি যতদিন ছিলাম, ততদিন এমন শান্তি ও আরামে কাটিয়েছি, তার চেয়ে অধিক আরামের জীবন আমি কখনো উপভোগ করি নি।

তিনি আরো বলেন : আমার গোটা জীবন যদি ওইরূপ অবস্থায় কাটত, তবে কতই না উত্তম হত! এভাবে হযরত ইবরাহীম আ.-এর সম্প্রদায় শত্রুতাবশত প্রতিশোধ নিতে

চেয়েছিল; কিন্তু তারা ব্যর্থ হল। তারা গৌরব অর্জন করতে চেয়েছিল, কিন্তু লাঞ্ছিত হল। তারা বিজয়ী হতে চেয়েছিল, কিন্তু পরাজিত হল। আল্লাহ বলেন :

وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ

"তারা চক্রান্ত করে ক্ষতি করতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি তাদের অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত করে দেই।

অপর আয়াতে আছে : فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ "আমি তাদেরকে হীনতম করে দিই।" এরূপ দুনিয়ার জীবনে তারা ক্ষতি ও লাঞ্ছনাপ্রাপ্ত হয় আর আখিরাতের জীবনে তাদের ওপর আগুন না শীতল হবে, না শান্তিদায়ক হবে বরং সেখানকার অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا

"জাহান্নাম হল তাদের জন্যে নিকৃষ্ট আবাস ও ঠিকানা।" (সূরা ফুরকান : ৬৬)

গিরগিটি হত্যা করা

ইমাম বোখারি রহ. উম্মে শারিক রহ. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গিরগিটি মারার আদেশ দিয়েছেন। বলেছেন, ইবরাহীম আ.-এর বিরুদ্ধে এটি আগুনে ফুঁক দিয়েছিল। ইমাম মুসলিম রহ. ইবনে জুরায়জ রহ. সূত্রে এবং বোখারি, মুসলিম, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ রহ. সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না রহ.-এর সূত্রে এ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমাদ রহ. আয়েশা রাযি.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা গিরগিটি হত্যা কর! কারণ, সে ইবরাহীম আ.-এর বিরুদ্ধে আগুনে ফুঁক দিয়েছিল। তাই হযরত আয়েশা রাযি. গিরগিটি হত্যা করতেন।

ইমাম আহমাদ রহ. নাফে রহ. এর সূত্রে বর্ণনা করেন, জনৈক মহিলা হযরত আয়েশা রাযি. এর গৃহে প্রবেশ করে একটি বর্শা দেখে জিজ্ঞেস করলেন : এ বর্শা দ্বারা আপনি কি করেন ? উত্তরে আয়েশা রাযি. বললেন, এর দ্বারা আমি গিরগিটি নিধন করি। তারপর তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ইবরাহীম আ.-কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয়, তখন সমস্ত জীব-জন্তু ও কীট-পতঙ্গ আগুন নিভাতে চেষ্টা করেছিল। কেবল গিরগিটি তা করে নি। উল্টো সে আগুনে ফুঁক দিয়েছিল। উপর্যুক্ত হাদিস দুটি ইমাম আহমাদ রহ. ছাড়া আর কেউ বর্ণনা করেন নি।

ইমাম আহমদ ... ফাকিহ ইবনুল মুগিরার মুক্ত দাসী সুমামা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আমি একদা আয়েশা রাযি. এর গৃহে গেলাম। তখন সেখানে একটা বর্শা রাখা আছে দেখতে পেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, হে উম্মুল মুমিনীন! এ বর্শা দিয়ে আপনি কী করেন? তিনি বললেন, এটা দিয়ে আমি গিরগিটি বধ করি। কারণ, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন : ইবরাহীম আ.-কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয়, তখন জমীনের উপর এমন কোনো জীব ছিল না, যারা আগুন নেভাতে চেষ্টা করে নি, কেবল এই গিরগিটি ব্যতীত। সে ইবরাহীম আ.-এর উপরে আগুনে ফুঁক দিয়েছিল। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে এগুলো হত্যা করতে আদেশ করেছেন। ইবনে মাজাহ রহ. ... জারির ইবনে হাযেম রাযি.-এর সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

খোদায়ি দাবিদার

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

এ বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি। আরও কিছু বিষয় এখানে আলোচনা করা হবে। এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহীম আ.-এর সাথে সেই সীমালঙ্ঘন কারী নিজেকে প্রতিপালক দাবিকারী প্রতাপশালী রাজার বিতর্কের কথা উল্লেখ করেছেন। হযরত ইবরাহীম খলীল আ. তার উপস্থাপিত যুক্তির অসারতা প্রমাণ করেন, তার মূর্খতা ও স্বল্পবুদ্ধিতা প্রকাশ করে দেন এবং নিজের দলিল দ্বারা তাকে নিরুত্তর করে দেন।

তাফসীরবিদ, ঐতিহাসিক ও বংশবিদদের মতে এ রাজা ছিল ব্যাবিলনের। মুজাহিদ রহ. তার নাম নমরূদ ইবনে কিনান ইবনে কূশ ইবনে সাম ইবনে নূহ বলে উল্লেখ করেছেন। অন্যরা তার বংশধারা বলেছেন : নমরূদ ইবনে ফালিহ ইবনে আবির ইবনে সালিহ ইবনে আরফাখশাদ ইবনে সাম ইবনে নূহ।

মুজাহিদ রহ. ও প্রমুখ বলেছেন, যেসব রাজা-বাদশা দুনিয়া জোড়া রাজত্ব করেছে, এ ছিল তাদের অন্যতম। ঐতিহাসিকদের মতে এরূপ বাদশার সংখ্যা ছিল চারজন। দু'জন মুমিন ও দু'জন কাফির। মুমিন দু'জন হলেন, (১) যুলকারনাইন ও (২) সুলাইমান আ. আর কাফির দুজন হল (১) নমরূদ ও (২) বুখতে নসর। ঐতিহাসিকদের মতে নমরূদ চার শ বছরকালব্যাপী রাজত্ব করেছিল। ফলে সে জুলুম-অত্যাচার, দাম্ভিকতা ও সীমালঙ্ঘনের চরমে গিয়ে পৌঁছে এবং পার্থিব জীবনকেই সে চরম লক্ষ্য বলে বেছে নেয়। ইবরাহীম আ. যখন তাকে এক ও লা-শরীক আল্লাহর ইবাদতের জন্যে আহ্বান জানালেন, তখন তার মূর্খতা, পথ-ভ্রষ্টতা ও উচ্চাভিলাষ তাকে সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করতে প্ররোচিত করে। এ ব্যাপারে সে ইবরাহীম আ.-এর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয় এবং নিজেই প্রতিপালক হওয়ার দাবি করে। হযরত ইবরাহীম আ. যখন বললেন : আমার প্রতিপালক তো তিনি, যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। নমরূদ বলল, আমিও তো জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই।

কাতাদা, সুদদী ও মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক রহ. লিখেছেন : নমরূদ ওই সময় মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত দু ব্যক্তিকে ডেকে আনে। এরপর একজনকে হত্যা করে ও অপরজনকে ক্ষমা করে দেয়। এর দ্বারা সে বোঝাতে চায়, সে-ও একজনকে জীবন দান করল এবং অন্যজনের মৃত্যু দিল। এ কাজটি ইবরাহীম আ.-এর দলীলের কোনো মুকাবিলাই ছিল না বরং তা বিতর্কের সাথে সামাঞ্জস্যহীন একটা উদ্ভট দুষ্কর্ম ছাড়া কিছুই নয়। কেননা হযরত ইবরাহীম আ. বিদ্যমান সৃষ্ট বস্তুর দ্বারা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব প্রমাণ করছেন। আবার কিছু দিন পর সেগুলো মৃত্যুবরণ করছে।

এ থেকেই বোঝা যায়, এ কাজের একজন কর্তা আছেন। যিনি প্রাণীকে সৃষ্টি করছেন ও মৃত্যু দিচ্ছেন। কারণ, কর্তা ছাড়া আপনা-আপনি কোনো কিছু হওয়া অসম্ভব। সুতরাং বিশ্বজগতে প্রাণী-অপ্রাণী যা কিছু আছে, তা একবার অস্তিত্বে আসা ও দ্বিতীয়বার অস্তিত্ব লোপ পাওয়া, সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করা; নক্ষত্র, বায়ু, মেঘমালা ও বৃষ্টি পরিচালনা করা ইত্যাদি কাজের জন্যে অবশ্যই একজন কর্তা আছেন। সে জন্যে ইবরাহীম আ. বললেন,

رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ

"আমার প্রতিপালক তিনিই, যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান।" অতএব এ মূর্খ বাদশার এই যে দাবি "আমিও জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই"– এর দ্বারা যদি বোঝানো হয়ে থাকে, সে-ই দৃশ্যমান জগতের কর্তা, তবে এটা বৃথা দম্ভ ও বাস্তবকে অস্বীকার করা ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্যথায় এ কথার দ্বারা যদি তা-ই বোঝানো হয়ে থাকে, যার উল্লেখ মুজাহিদ, সুদদী ও ইবনে ইসহাক রহ. করেছেন, তা হলে এ কথার কোনো মূল্যই নেই। কেননা ইবরাহীম আ.-এর পেশকৃত দলীলের খণ্ডন তাতে হয় না।

বাদশাহ নমরূদের এই যুক্তির অসারতা উপস্থিত অনেকের কাছে অস্পষ্ট হওয়ায় এবং অনুপস্থিতদের নিকট অস্পষ্ট হওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকায় হযরত ইবরাহীম আ. আরো একটি যুক্তি পেশ করেন, যার দ্বারা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব ও নমরূদের মিথ্যা দাবি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ

"ইবরাহীম আ. বললেন, আল্লাহ তো সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদিত করেন, তুমি একে পশ্চিম দিক থেকে উদিত করাও দেখি!"

অর্থাৎ এই সূর্য আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে প্রত্যহ পূর্ব দিক থেকে উদিত হয় এবং নির্দিষ্ট কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করে। এই আল্লাহ এক, অন্য কোনো ইলাহ নেই। তিনিই সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা। এখন তোমার জীবন দান ও মৃত্যু ঘটানোর দাবি যদি যথার্থ হয়, তবে এ সূর্যকে তুমি পশ্চিম দিক থেকে উদিত কর। কেননা যিনি জীবন দান ও মৃত্যু ঘটাতে পারেন, তিনি যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারেন। তাঁর ইচ্ছাকে কেউ বাধা দিতে পারে না, তাঁকে কেউ অক্ষম করতে পারে না। বরং সব কিছুর উপরই তাঁর কর্তৃত্ব চলে সব কিছুই তাঁর নির্দেশ মানতে বাধ্য।

অতএব নিজের দাবি অনুযায়ী তুমি যদি প্রতিপালক হয়ে থাক, তা হলে এটা করে দেখাও। আর যদি তা করতে না পার, তবে তোমার দাবি মিথ্যা। কিন্তু তুমিও জান এবং অন্যান্য প্রত্যেকেই জানে, এ কাজ করতে তুমি সক্ষম নও। এ তো দূরের কথা, একটা সামান্য মশা সৃষ্টি করাও তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। এ যুক্তি প্রদর্শনের পরে নমরূদের ভ্রষ্টতা, মুর্খতা, মিথ্যাচার ও মূর্খ সমাজের কাছে তার দাম্ভিকতা স্পষ্ট হয়ে যায়। সে কোনো উত্তর দিতে সক্ষম হল না; নীরব-নিশ্চুপ হয়ে গেল। আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

কাফির লোকটি হতভম্ব হয়ে গেল। আর জালিম সম্প্রদায়কে আল্লাহ সুপথ দেখান না। (সূরা বাকারা : ২৫৮)

সুদ্দী রহ. লিখেছেন, নমরূদ ও ইবরাহীম আ.-এর মধ্যে এ বিতর্ক অগ্নি থেকে বের হয়ে আসার দিনের ঘটনা। এবং সেখানে লোকের কোনো জামায়েত ছিল না। কেবল দুজনের মধ্যেই বির্তক অনুষ্ঠিত হয়।

আব্দুর রাজ্জাক হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম রাযি. সূত্রে বর্ণনা করেছেন : নমরূদের নিকট সঞ্চিত খাদ্যভাণ্ডার ছিল। লোকজন দলে দলে তার নিকট খাদ্য আনার জন্যে যেত। হযরত ইবরাহীম আ.ও এরূপ একদলের সাথে খাদ্য আনতে যান। সেখানে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। ফলে নমরূদ ইবরাহীম আ.-কে খাদ্য না দিয়ে ফিরিয়ে দেয়। ইবরাহীম আ. শূন্যপাত্র নিয়ে বেরিয়ে আসেন। বাড়ির কাছে এসে তিনি দুটি পাত্রে মাটি ভর্তি করে আনেন এবং মনে মনে ভাবেন, বাড়ি পৌঁছে সাংসারিক কাজে জড়িয়ে পড়বেন। বাড়ি পৌঁছে বাহন রেখে তিনি ঘরে প্রবেশ করে দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে বসে পড়েন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। ইবরারহীম আ.-এর স্ত্রী সারাহ পাত্র দুটির কাছে গিয়ে উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য দ্বারা তা ভর্তি দেখতে পান এবং তা দ্বারা খাদ্য তৈরি করেন। ঘুম থেকে জেগে হযরত ইবরাহীম আ. রান্না করা খাদ্য দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এ তোমরা কোত্থেকে পেলে? সারাহ জানালেন, আপনি যা এনেছেন তা থেকেই তৈরি করা হয়েছে। এ সময় ইবরাহীম আ. বুঝতে পারলেন, আল্লাহ তাআলা বিশেষ খাদ্য হিসেবে তাদেরকে এ রিযিক দান করেছেন।

যায়েদ ইবনে আসলাম রাযি. বর্ণনা করেছেন, উক্ত অহংকারী বাদশাহর নিকট আল্লাহ একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। ফেরেশতা তাকে আল্লাহর উপর ঈমান আনতে বললে সে অস্বীকার করে। পুনরায় দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার আহ্বান জানালে প্রত্যেকবারেই সে অস্বীকৃতি জানায় এবং বলে দেয়, তুমি তোমার বাহিনী একত্র কর আর আমি আমার বাহিনী একত্র করি। পরের দিন সূর্যোদয়ের সময় নমরূদ তার সৈন্য-সামন্তের সমাবেশ ঘটায়। অপরদিকে আল্লাহ অগণিত মশা প্রেরণ করলেন। মশার

সংখ্যা এত বেশি ছিল, তাতে তারা সূর্যের মুখ পর্যন্ত দেখতে সক্ষম হয় নি। আল্লাহ মশা বাহিনীকে তাদের উপর লেলিয়ে দেন। ফলে মশা তাদের রক্তমাংস খেয়ে সাদা হাড্ডি বের করে ফেলে। একটি মশা নমরূদের নাকের ছিদ্রপথে প্রবেশ করে। চারশ বছর এই মশা তার নাকের ছিদ্রে অবস্থান করে দংশন করতে থাকে। এই দীর্ঘ সময়ে সে হাতুড়ি দ্বারা নিজের মাথা ঠুকাতে থাকে। অবশেষে এভাবেই আল্লাহ তাকে ধ্বংস করেন।

সিরিয়া মিসর ও ফিলিস্তিন সফর

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٢٦) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ

লূত তার (ইবরাহীম) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করল। ইবরাহীম বলল, আমি আমার প্রতিপালকের উদ্দেশে দেশ ত্যাগ করছি। তিনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আমি ইবরাহীমকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব এবং তাঁর বংশধরদের জন্যে স্থির করলাম নবুয়ত ও কিতাব। আর আমি তাকে দুনিয়ায় পুরস্কৃত করেছিলাম। আখিরাতেও সে নিশ্চয়ই সৎকর্ম পরায়ণদের অন্যতম হবে। (সূরা আনকাবূত : ২৬-২৭)

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ (٧١) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ (٧٢) وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

এবং আমি তাকে ও লূতকে উদ্ধার করে সেই দেশে নিয়ে গেলাম, যেখানে আমি কল্যাণ রেখেছি বিশ্ববাসীর জন্য। এবং আমি ইবরাহীমকে দান করেছিলাম ইসহাক এবং পৌত্ররূপে ইয়াকুব। আর প্রত্যেককেই করেছিলাম সৎকর্মপরায়ণ। এবং তাদেরকে করেছিলাম নেতা। তারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথপ্রদর্শন করত। তাদেরকে ওহী প্রেরণ করেছিলাম সৎকর্ম করতে, সালাত কায়েম করতে এবং যাকাত প্রদান করতে; তারা আমারই ইবাদত করত। (সূরা আম্বিয়া : ৭১-৭৩)

হযরত ইবরাহীম আ. নিজের দেশ ও জাতিকে ত্যাগ করে আল্লাহর রাহে হিজরত করেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন বন্ধ্যা। তাঁর কোনো সন্তান হত না এবং তাঁর কোনো পুত্র সন্তান ছিল না। বরং ভাতিজা লূত ইবনে হারান ইবনে আযর তাঁর সঙ্গে ছিল। এমতাবস্থায় আল্লাহ তাঁকে একাধিক পুত্র সন্তান দান করেন এবং তাদের সকলেই পুণ্যবান ছিলেন। ইবরাহীম আ.-এর বংশে নবুয়ত এবং কিতাব প্রেরণের ধারা চালু রাখেন।

সুতরাং ইবরাহীম আ.-এর পরে যিনিই নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন, তাঁর বংশ থেকেই হয়েছেন এবং তাঁর পরে যে কিতাবই আসমান থেকে কোনো নবীর উপর

অবতীর্ণ হয়েছে, তা তাঁর বংশধরদের উপরই অবতীর্ণ হয়েছে। এ সব পুরস্কার আল্লাহ তাঁকে দিয়েছেন তাঁর ত্যাগ ও কুরবানী এবং আল্লাহর জন্যে দেশ, পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনকে পরিত্যাগ করার বিনিময়ে। এমন দেশের উদ্দেশে তিনি হিজরত করেছেন, যেখানে আল্লাহর ইবাদত এবং বান্দাদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বানের সুযোগ ছিল। তাঁর সেই হিজরতের দেশটি হল শাম বা সিরিয়া। এ দেশ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন :

وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ

'সে দেশের দিকে, যেখানে আমি বিশ্ববাসীর জন্য বরকত রেখে দিয়েছি।'

উবাই ইবনে কাব ও কাতাদা প্রমুখ এ মত পোষণ করেন। কিন্তু আওফীর সূত্রে ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, উপর্যুক্ত আয়াতে যে দেশের কথা বলা হয়েছে, সে দেশ হল মক্কা। সাথে সাথে এর সমর্থনে তিনি নিম্নের আয়াত উল্লেখ করেন :

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ

"নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের জন্যে স্থাপিত হয়েছে, সেটাই হচ্ছে এ ঘর, যা মক্কায় অবস্থিত এবং সারা জাহানেরর জন্যে হিদায়াত ও বরকতময়।" (আলে ইমরান : ৯৬)

কাব আহবার এর মতে সে দেশটি ছিল হারান। ইতঃপূর্বে আমরা আহলে কিতাবদের বরাত দিয়ে বলে এসেছি, হযরত ইবরাহীম আ. তাঁর ভাতিজা লূত আ., ভাই নাহূর, স্ত্রী সারাহ ও ভাইয়ের স্ত্রী মালিকাসহ বাবেল থেকে রওনা হন এবং হারানে পৌঁছে সেখানে বসবাস শুরু করেন। সেখানে ইবরাহীম আ.-এর পিতা 'তারেখ'-এর মৃত্যু হয়।

সুদ্দী রহ. লিখেছেন, ইবরাহীম আ. ও লূত আ. সিরিয়ার উদ্দেশে রওনা হন। পথে সারাহর সাথে সাক্ষাৎ হয়। সারাহ ছিলেন হারানের রাজকুমারী। তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের ধর্মকে কটাক্ষ করতেন। ইবরাহীম আ. তাঁকে এই শর্তে বিবাহ করেন, তাঁকে ত্যাগ করবেন না। ইবনে জারীর রহ. এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন; কিন্তু ঐতিহাসিকগণের আর কেউ এ কথা বর্ণনা করেন নি।

প্রসিদ্ধ মতে সারাহ হযরত ইবরাহীম আ.-এর চাচা হারান-এর কন্যা। যার নামে হারান রাজ্যের পরিচিত। সুহায়লী রহ. কুতায়বী ও নাফফাসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, সারাহ্ হযরত ইবরাহীম আ.-এর সহোদর হারানের কন্যা লূত এর ভগ্নি। এ মত সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অমূলক।

এ মত পোষণকারীরা দাবি করেছেন, সে সময় ভাতিজী বিবাহ করা বৈধ ছিল। কিন্তু এ দাবির পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। যদি ধরেও নেওয়া হয়, কোনো একসময় ভাতিজী বিবাহ করা বৈধ ছিল। যেমন ইহুদি পণ্ডিতরা বলে থাকে, তবুও এটা সম্ভব নয়। কেননা নিরুপায় অবস্থায় কোনো কিছু বৈধ হলেও তার সুযোগ গ্রহণ নবী-রাসূলগণের উন্নত চরিত্রের মর্যাদার পক্ষে শোভনীয় নয়। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

প্রসিদ্ধ মত হল, হযরত ইবরাহীম আ. যখন বাবেল থেকে হিজরত করেন, তখন সারাহকে সাথে নিয়েই বের হয়েছিলেন। যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহই সম্যক জ্ঞাত। আহলে কিতাবদের বর্ণনা মতে হযরত ইবরাহীম আ. যখন সিরিয়ায় যান তখন আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে জানান, তোমার পরে এ দেশটি আমি তোমার উত্তরসূরীদের আয়ত্ত করে দেব। এই অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশস্বরূপ তিনি সেখানে কুরবানীর একটি কেন্দ্র নির্মাণ করেন এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের পূর্ব প্রান্তে তিনি নিজের থাকার জন্যে একটি গুম্বুজ বিশিষ্ট প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করেন। এরপর তিনি জীবিকার অন্বেষণে বের হন। এ সময় বায়তুল মুকাদ্দাস অঞ্চলে ছিল প্রচণ্ড আকাল ও দুর্ভিক্ষ, তাই সবাইকে নিয়ে তিনি মিসরে চলে যান। এই সাথে আহলে কিতাবরা সারাহ এবং তথাকার রাজার ঘটনা, সারাহকে নিজের বোন বলে পরিচয় দিতে শিখিয়ে দেওয়া, রাজা কর্তৃক সারাহ এর খিদমতের জন্যে হাজেরাকে দান, এরপর সেখান থেকে তাদেরকে বহিষ্কার করা এবং বরকতময় বায়তুল মুকাদ্দাস অঞ্চলে বহু জীব-জন্তু, দাস-দাসী ও ধন-সম্পদসহ প্রত্যাগমন করার কথা উল্লেখ করেছেন।

ইবরাহীম আ. মিথ্যা বলেছেন কি না?

ইমাম বুখারী রহ. আবু হোরায়রা রাযি. সূত্রে বর্ণনা করেন, হযরত ইবরাহীম আ. তিনবার অসত্য উক্তি করেছিলেন। দুটি আল্লাহ সংক্রান্ত।

(১) তিনি বলেছিলেন, إِنِّي سَقِيمٌ। আমি পীড়িত।

(২) আরেকবার বলেছিলেন, بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا। এর বড় মূর্তিটিই এ কর্মটি করেছে।

(৩) উক্তিটি করেছিলেন নিজের ব্যাপারে।

ঘটনা হল, হযরত ইবরাহমীম আ. স্ত্রী সারাহসহ এক জালেম বাদশার এলাকা অতিক্রম করছিলেন। বাদশার নিকট সংবাদ গেল, এই এলাকায় একজন লোক আছে যার সাথে রয়েছে এক পরমা সুন্দরী নারী। জালিম বাদশা হযরত ইবরাহীম আ.-এর নিকট লোক পাঠাল। আগন্তুক এসে হযরত ইবরাহীম আ.-কে সারাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল, ওনি কে? উত্তরে তিনি বললেন : আমার বোন। এরপর হযরত ইবরাহীম আ. সারাহর কাছে এসে বললেন, দেখ সারাহ! এই ধরাপৃষ্ঠে আমি এবং তুমি ব্যতীত আর কোনো মুমিন নেই। এই আগন্তুক তোমার সাথে আমার সম্পর্কের কথা জানতে চেয়েছে। আমি তাকে বলে দিয়েছি, তুমি আমার বোন। এখন আমাকে তুমি মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করো না। এরপর ওই জালিম বাদশাহ সারাহকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে লোক পাঠাল।

সারাহ বাদশাহর দরবারে নীত হলে, বাদশাহ তাঁর প্রতি হাত বাড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে সে খোদার গযবে পতিত হয়। বাদশা বলল, সারাহ আমার জন্যে দুআ কর! আমি তোমার কোনো ক্ষতি সাধন করব না। সারাহ দুআ করলেন। ফলে বাদশাহ ছাড়া পায়। কিন্তু দ্বিতীয়বার সে সারাহর প্রতি হাত বাড়ায়। এবারও সে পূর্বের মতো কিংবা তদপেক্ষা

কঠিনভাবে তার ওপর শাস্তি নেমে আসে। পুনর্বার বাদশা বলল, আমার জন্যে দুআ কর! আমি তোমার কোনো অনিষ্ট করব না। সারাহ দুআ করলে সে পুনরায় রক্ষা পায়। তখন বাদশা তার উজিরকে ডেকে বলে, তুমি তো আমার কাছে কোনো মানবী আন নি, এনেছ এক দানবী। পরে বাদশা সারাহর খেদমতের জন্যে হাজেরাকে দান করল। সারাহ ইবরাহীম আ.-এর কাছে ফিরে এসে তাঁকে সালাত আদায় করতে দেখতে পান। হযরত ইবরাহীম আ. সালাতে থেকেই হাতের ইশারা দ্বারা ঘটনা জানতে চাইলেন। সারাহ বললেন, আল্লাহ অনাচারী কাফিরের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দিয়েছেন এবং ওই জালিম আমার খেদমতের জন্যে হাজেরাকে দিয়েছে।

আবু হোরায়রা রাযি. বলেন, হে বেদুঈন আরব সন্তানরা! এই হাজেরাই তোমাদের আদি মাতা। ইমাম বুখারী রহ. একক সূত্রে হাদিসটি মওকূফরূপে বর্ণনা করেছেন।

হাফিজ আবু বকর আল বাযযার রহ. আবু হোরায়রা রাযি. সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : হযরত ইবরাহীম আ. মাত্র তিনবার ছাড়া কখনও অসত্য উক্তি করেন নি। ওই তিনটি উক্তিই ছিল আল্লাহ সংক্রান্ত।

(১) নিজেকে إِنِّي سَقِيمٌ (আমি পীড়িত) বলা।

(২) بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ (এদের বড়টাই এ কাজ করেছে) বলা।

(৩) হযরত ইবরাহীম আ.-কোনো এক জালিম রাজার এলাকা দিয়ে সফর করার সময় কোনো এক মঞ্জিলে অবতরণ করেন। জালিম রাজা তথায় আগমন করে। তাকে জানানো হয় যে, এখানে একজন লোক এসেছেন। যার সাথে এক পরমা সুন্দরী রমণী আছে। রাজা তখনই ইবরাহীম আ.-এর নিকট লোক প্রেরণ করে। সে এসে মহিলাটি সম্পর্কে ইবরাহীম আ.-কে জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন, সে আমার বোন। এরপর ইবরাহীম আ. তাঁর স্ত্রীর কাছে আসেন এবং বলেন, একটি লোক তোমার সম্পর্কে আমার কাছে জিজ্ঞেস করেছে। আমি তোমাকে আমার বোন বলে পরিচয় দিয়েছি। এখন আমি আর তুমি ছাড়া পৃথিবীতে আর কোনো মুসলমান নেই। এ হিসেবে তুমি আমার বোনও বটে। সুতরাং রাজার কাছে আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করো না যেন। রাজা তাঁর দিকে হাত বাড়াতেই আল্লাহর পক্ষ থেকে এক আযাব এসে তাকে পাকড়াও করে। রাজা বলল, তুমি আল্লাহর কাছে দুআ কর! আমি তোমার কোনো ক্ষতি করব না। তিনি দুআ করেন। ফলে সে মুক্ত হয়। কিন্তু পরক্ষণে আবার তাঁকে ধরার জন্যে হাত বাড়ায়।

এবারও আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্বের মতো কিংবা তদপেক্ষা শক্তভাবে পাকড়াও হয়। রাজা পুনরায় বলল, আমার জন্যে আল্লাহর নিকট দুআ কর, তোমার কোনো ক্ষতি আমি করব না। সুতরাং তিনি দুআ করায় সে মুক্তি পেয়ে যায়। এরূপ তিনবার ঘটে। এরপর রাজা তার সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ অনুচরকে ডেকে বলল, তুমি তো কোনো মানবী আন নি; এনেছ দানবী। একে বের করে দাও এবং হাজেরাকেও সাথে দিয়ে দাও।

বিবি সারাহ্ ফিরে আসলেন। ইবরাহীম আ. তখন সালাতে রত ছিলেন। সারাহর শব্দ পেয়েই তিনি তাঁর দিকে ফিরে তাকালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, ঘটনা কি? সারাহ্ বললেন, 'আল্লাহ্ জালিমের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়েছেন। আর সে আমার খিদমতের জন্যে হাজেরাকে দান করেছে।'

বাযযার রহ. বলেছেন, মুহাম্মদ রহ.-এর সূত্রে আবু হোরায়রা রাযি. থেকে হিশাম ব্যতীত কেউ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন বলে আমার জানা নেই। অন্যরা একে 'মওকূফ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমদ রহ. আবু হোরায়রা রাযি. এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : হযরত ইবরাহীম আ. তিনবার ছাড়া কখনও মিথ্যা কথা বলেন নি।

(১) কাফিররা যখন তাদের মেলায় যাওয়ার জন্যে আহ্বান জানায়, তখন তিনি বলেছিলেন, إِنِّي سَقِيمٌ (আমি পীড়িত)।

(২) তিনি মূর্তি ভেঙ্গে বলেছিলেন, بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَٰذَا (এদের মধ্যে এই বড়টিই এ কাজ করেছে।)

(৩) নিজের স্ত্রী সারাহর পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন : انها اختى (এ আমার বোন)।

বর্ণনাকারী বলেন : হযরত ইবরাহীম আ. একবার কোনো এক জনপদে প্রবেশ করেন। সেখানে ছিল এক জালিম রাজা। তাকে জানানো হল, এ রাত্রে ইবরাহীম এক পরমা সুন্দরী নারীসহ এখানে এসেছে। রাজা তাঁর কাছে দূত পাঠাল। দূত হযরত ইবরাহীম আ.-কে জিজ্ঞেস করল। আপনার সাথী এ রমণীটি কে? ইবরাহীম আ. বললেন, আমার বোন। দূত বলল, একে রাজার কাছে পাঠিয়ে দিন।

হযরত ইবরাহীম আ. পাঠিয়ে দিলেন এবং বলে দিলেন, আমার উক্তিকে তুমি মিথ্যা প্রতিপন্ন করো না। কারণ, রাজাকে আমি জানিয়েছি, সম্পর্কে তুমি আমার বোন। বাস্তবে এ পৃথিবীর বুকে আমি এবং তুমি ছাড়া আর কোনো মুমিন নেই। সারাহ্ রাজার দরবারে পৌঁছলে সে সারাহর দিকে অগ্রসর হল। সারাহ্ তখন অযু করে সালাত আদায় করে এ দোয়াটি পড়লেন–

اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّىْ اٰمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُوْلِكَ وَاَحْصَنْتُ فَرْجِىْ اِلَّا عَلٰى زَوْجِىْ فَلَا تُسَلِّطْ عَلَىَّ الْكَافِرَ.

'হে আল্লাহ! আপনি অবশ্যই অবগত আছেন, আমি আপনার উপর ও আপনার রাসূলের উপর ঈমান এনেছি। আমার স্বামী ব্যতীত অন্য সবার থেকে আমার লজ্জাস্থানকে হিফাজত করেছি। অতএব কোনো কাফিরকে আমার উপর হস্তক্ষেপ করতে দিবেন না।

জালিম রাজাকে তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে এমনভাবে টুঁটি চেপে ধরা হল যে, পায়ের সাথে পা ঘর্ষণ করে ছটফট করতে লাগল। আবুয যিনাদ রহ. হযরত আবু হোরায়রা রাযি.-এর সূত্রে বলেন, সারাহ তখন পুনরায় দোয়া করেন, 'হে আল্লাহ! লোকটি এভাবে মারা গেলে লোকে বলবে আমিই তাকে হত্যা করেছি। অতএব রাজা শাস্তি থেকে মুক্তি লাভ করল।

কিন্তু পুনরায় রাজা তার দিকে অগ্রসর হল। সারাহও পূর্বের মতো অযু ও সালাত শেষে ওই দোয়াটি পড়লেন। রাজা পুনরায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে ছটফট করতে থাকে। এ দেখে সারাহ বললেন, "হে আল্লাহ! এ যদি মারা যায় তবে লোকে বলবে ওই মহিলাটিই তাকে হত্যা করেছে।" এরপর সে মুক্তি লাভ করে। এভাবে তৃতীয় বা চতুর্থ বারের পর জালিম রাজা তার লোকদেরকে ডেকে বলল, তোমরা আমার কাছে তো একটা দানবী পাঠিয়েছ। একে ইবরাহীমের নিকট ফিরিয়ে দাও আর হাজেরাকেও এর সাথে দিয়ে দাও। বিবি সারাহ ফিরে এসে হযরত ইবরাহীম আ.কে জানালেন, আপনি কি জানতে পেরেছেন, আল্লাহ কাফিরদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়েছেন এবং ওই জালিম একজন দাসীকেও দান করেছে?

কেবল ইমাম আহমদ রহ. এ সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। সহি সনদের শর্ত অনুযায়ী। ইমাম বুখারী রহ. আবু হোরায়রা রাযি.-এর সূত্রে মারফুভাবে হাদিসটি সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেছেন।

ইবনে আবু হাতেম হযরত আবু সাঈদ রাযি. সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : হযরত ইবরাহীম আ. যে তিনটি কথা বলেছিলেন, তার প্রতিটিই আল্লাহর দীনের গ্রন্থি উম্মোচন করে। তাঁর প্রথম কথা : إِنِّي سَقِيمٌ (আমি পীড়িত), দ্বিতীয় কথা : بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا (বরং এদের বড়জনই এ কাজ করেছে), তৃতীয় কথা : যখন রাজা তার স্ত্রীকে কামনা করেছিল, তখন বলেছিলেন, هي اختي (সে আমার বোন) অর্থাৎ আল্লাহর দীনের সম্পর্কে বোন।

কোনো মহিলা নবী ছিলেন কি না

কোনো কোনো বিজ্ঞ আলেমের মতে তিনজন মহিলা নবী ছিলেন। (১) সারাহ (২) হযরত মূসা আ.-এর মা (৩) মরিয়াম। কিন্তু অধিকাংশের মতে তাঁরা তিনজন সিদ্দীকা (সত্যপরায়ণা) ছিলেন। আমি কোনো কোনো বর্ণনায় দেখেছি। বিবি সারাহ যখন ইবরাহীম আ.-এর নিকট থেকে জালিম বাদশাহর কাছে যান, তখন থেকে তাঁর ফিরে আসা পর্যন্ত আল্লাহ ইবরাহীম আ. ও সারাহর মধ্যকার, পর্দা উঠিয়ে নেন। ফলে রাজার কাছে তাঁর থাকাকালীন যা যা ঘটছিল সবই তিনি প্রত্যক্ষ করছিলেন।

আল্লাহ এ ব্যবস্থা করেছিলেন, যাতে ইবরাহীম আ.-এর হৃদয় পবিত্র থাকে, চক্ষু শীতল থাকে এবং তিনি অন্তরে প্রশান্তি বোধ করেন। কেননা হযরত ইবরাহীম আ. সারাহকে তার দীনের জন্যে, আত্মীয়তার সম্পর্কের জন্যে ও অনুপম সৌন্দর্যের জন্যে

তাকে গভীরভাবে মহব্বত করতেন। কেউ কেউ বলেছেন, বিবি হাওয়ার পর থেকে সারাহর যুগ পর্যন্ত তাঁর চাইতে অধিক সুন্দরী কোনো নারীর জন্ম হয় নি। সকল প্রশংসা আল্লাহরই।

কে সেই রাজা!

কোনো কোনো ইতিহাসবিদ লিখেছেন, এই সময়ে মিসরের ফেরাউন ছিল বিখ্যাত জালিম বাদশাহ জাহহাকের ভাই। সে তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে মিসরের শাসনকর্তা ছিল। তার নাম কেউ বলেন, সিনান ইবনে আলওয়ান ইবনে উবায়দ ইবনে উওয়ায়জ ইবনে আমলাক ইবনে লাওদ ইবনে সাম ইবনে নূহ। ইবনে হিশাম 'তীজান' নামক গ্রন্থে বলেছেন, যে রাজা সারাহর উপর লোভ করেছিল, তার নাম আমর ইবনে ইমরুল কায়স ইবনে মাইলূন ইবনে সাবা। সে মিসরের শাসনকর্তা ছিল। আল্লাহই সম্যক জ্ঞাত।

এরপর হযরত ইবরাহীম আ. মিসর থেকে তাঁর পূর্ববর্তী বাসস্থান বরকতের দেশ তথা বায়তুল মুকাদ্দাস যান। তাঁর সাথে বহু পশু সম্পদ, গোলাম, বাঁদী ও ধন-সম্পদ ছিল। মিসরের কিবতী বংশোদ্ভুত হাজেরাও সাথে ছিলেন। এই সময় হযরত লুত আ. তাঁর ধন-সম্পদসহ হযরত ইবরাহীম আ.-এর আদেশক্রমে পাশের দেশে চলে যান। 'গাওরে-যাগার' নামে এ স্থানটি প্রসিদ্ধ ছিল। তিনি সে অঞ্চলে ওই যুগের প্রসিদ্ধ শহর সদূমে অবতরণ করেন। শহরের বাসিন্দারা ছিল কাফির, পাপাসক্ত ও দুষ্কৃতকারী। আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহীম আ.-কে দৃষ্টি প্রসারিত করে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব ও পশ্চিমে তাকাতে বলেন এবং সু-সংবাদ দেন, এই সমুদয় স্থান তোমাকে ও তোমার উত্তরসূরিদের চিরদিনের জন্য দান করব। তোমার সন্তানদের সংখ্যা এত বৃদ্ধি করে দেব, তাদের সংখ্যা পৃথিবীর বালুকণার সমান হয়ে যাবে। এই সুসংবাদ পূর্ণ মাত্রায় প্রতিফলিত হয়, বিশেষ করে এই উম্মতে মুহাম্মদিয়ার ক্ষেত্রে একটি হাদিস থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ আমার সম্মুখে পৃথিবীর এক অংশকে ঝুঁকিয়ে দেন। আমি তার পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত দেখে নিলাম। অচিরেই উম্মতের রাজত্ব এই দেখান সীমানা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করবে। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, কিছুদিন পর ঐ দুরাচার লোকেরা হযরত লূত আ.-এর উপর চড়াও হয় এবং তাঁর পশু ও ধন-সম্পদ কেড়ে নিয়ে তাঁকে বন্দী করে রাখে। এ সংবাদ হযরত ইবরাহীম আ.-এর নিকট পৌঁছলে তিনি তিন শ আঠারজন সৈন্য নিয়ে তাদের উপর আক্রমণ করেন এবং লূত আ.-কে উদ্ধার করেন, তাঁর সম্পদ ফিরিয়ে আনেন।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিপুল সংখ্যক শত্রুকে হত্যা করেন। শত্রু বাহিনীকে পরাজিত করেন ও তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে তিনি দামেশকের পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছেন। শহরের উপকণ্ঠে বারযাহ নামক স্থানে সেনাছাউনি স্থাপন করেন। আমার ধারণা এ স্থানকে "মাকামে ইবরাহীম" বলার কারণ এটাই, এখানে ইবরাহীম খলীলুল্লাহর সৈন্য বাহিনীর শিবির ছিল।

তারপর ইবরাহীম আ. আল্লাহর সাহায্যপুষ্ট অবস্থায় বিজয়ীর বেশে নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। বায়তুল মুকাদ্দাসের শহরসমূহের শাসকবর্গ শ্রদ্ধাভরে ও বিনীতভাবে এসে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। তিনি সেখানেই বসবাস করতে থাকেন।

হাজেরার গর্ভে ইসমাঈল আ.-এর জন্ম

আহলে কিতাবদের বর্ণনা মতে হযরত ইবরাহীম আ. আল্লাহর নিকট সুসন্তানের জন্য দুআ করেন। আল্লাহ তাঁকে এ বিষয়ে সুসংবাদ দানও করেন। কিন্তু এরপর বায়তুল মুকাদ্দাসে তাঁর বিশটি বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। এ সময় একদিন সারাহ হযরত ইবরাহীম আ.-কে বললেন, আমাকে তো আল্লাহ সন্তান থেকে বঞ্চিত রেখেছেন। সুতরাং আপনি আমার বাঁদীর সাথে মিলিত হন। তার গর্ভে আল্লাহ আমাকে একটা সন্তান দিতেও পারেন। সারাহ হাজেরাকে ইবরাহীমের জন্যে হেবা করে দিলে ইবরাহীম আ. তাঁর সাথে মিলিত হন। তাতে হাজেরা সন্তান-সম্ভবা হন।

এতে আহলে কিতাবগণ বর্ণনা করে থাকেন, হাজেরা অনেকটা গৌরববোধ করেন এবং আপন মনিব সারাহর তুলনায় নিজেকে ভাগ্যবতী বলে মনে করতে থাকেন। সারাহর মধ্যে আত্মমর্যাদা বোধ জাগ্রত হয়। তিনি এ সম্পর্কে ইবরাহীম আ.-এর নিকট অভিযোগ করেন। জবাবে ইবরাহীম আ. বললেন, "তার ব্যাপারে তুমি যে কোনো পদক্ষেপ নিতে চাও নিতে পার।" এতে হাজেরা শঙ্কিত হয়ে পলায়ন করেন এবং অদূরেই এক কূপের নিকটে অবতরণ করেন। সেখানে জনৈক ফেরেশতা তাঁকে বলে দেন, তুমি ভয় পেয় না; যে সন্তান তুমি ধারণ করেছ, আল্লাহ তাকে গৌরবময় করবেন।

ফেরেশতা তাঁকে বাড়িতে ফিরে যেতে বলেন এবং সুসংবাদ দেন, তুমি পুত্র-সন্তান প্রসব করবে। তাঁর নাম রাখবে ইসমাঈল। সে হবে এক অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব। সকল লোকের উপর তাঁর প্রভাব থাকবে এবং অন্য সবাই তাঁর দ্বারা শক্তির প্রেরণা পাবে। সে তার ভাইদের কর্তৃত্বাধীন সমস্ত এলাকার অধিকারী হবে। এসব শুনে হাজেরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন। এই সুসংবাদ হযরত ইবরাহীম আ.-এর অধঃস্তন সন্তান মুহাম্মদ এর ক্ষেত্রে পূর্ণমাত্রায় প্রযোজ্য। কেননা গোটা আরব জাতি তার দ্বারা গৌরবের অধিকারী হয়। পূর্ব-পশ্চিমের সমস্ত এলাকায় তাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁকে আল্লাহ এমন উন্নত ও কল্যাণকর শিক্ষা এবং সৎকর্ম-কুশলতা দান করেন, যা পূর্বে কোনো উম্মতকেই দেওয়া হয়নি। আরব জাতির এ মর্যদা পাওয়ার কারণ হচ্ছে, তাদের রাসূলের মর্যাদা যিনি হচ্ছেন নবীকুল শিরোমণি। তাঁর রিসালাত হচ্ছে বরকতময়। তিনি হচ্ছেন সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে রাসূল। তাঁর আনীত আদর্শ হচ্ছে পুণ্যতম আদর্শ। হাজেরা ঘরে ফেরার পর হযরত ইসমাঈল আ. ভূমিষ্ঠ হন। এ সময় ইবরাহীম আ.-এর বয়স হয়েছিল ছিয়াশি বছর। এটা হচ্ছে ইসহাক আ.-এর জন্মের তের বছর পূর্বের ঘটনা। ইসমাঈল আ.-এর জন্মের পর আল্লাহ হযরত ইবরাহীম আ.-কে সারাহর গর্ভে ইসহাক নামের সন্তান জন্মের সুসংবাদ দেন।

ইবরাহীম আ. তখন আল্লাহর উদ্দেশে শোকরানা সিজদা আদায় করেন। আল্লাহ তাঁকে জানান, আমি তোমার দুআ ইসমাঈলের পক্ষে কবুল করেছি। তাকে বরকত দান করেছি। তাঁর বংশের বিস্তৃতি দান করেছি। তার সন্তানদের মধ্য থেকে বারো জন প্রধানের জন্ম হবে। তাঁকে আমি বিরাট সম্প্রদায়ের প্রধান করব। এটাও এই উম্মতের জন্যে একটা সুসংবাদ। বারো জন প্রধান হলেন সেই বারজন খলিফায়ে রাশেদা যাঁদের কথা জাবির ইবনে সামুরা রাযি.-এর সূত্রে বর্ণিত হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'বারো জন আমীর হবে।'

জাবির রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর একটা শব্দ বলেছেন, কিন্তু আমি তা বুঝতে পারি নি। তাই সে সম্পর্কে আমার পিতার কাছে জিজ্ঞেস করি। তিনি বললেন, রাসূলের সে শব্দটি হল كلهم من قريش অর্থাৎ 'তারা সবাই হবেন কুরায়শ গোত্রের লোক।' বুখারী ও মুসলিম এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অপর এক বর্ণনায় আছে :

لَا يَزَالُ هٰذَا الْاَمْرُ قَائِمًا وَّفِيْ رِوَايَةٍ عَزِيْزًا حَتّٰى يَكُوْنَ اثْنَا عَشَرَةَ خَلِيْفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ

অর্থাৎ এই খিলাফত বারো জন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত বা শক্তিশালী থাকবে; এরা সবাই হবে কুরাইশ গোত্রের লোক। উক্ত বারজনের মধ্যে চারজন হলেন প্রথম চার খলিফা আবু বকর রাযি. উমর রাযি. উসমান ও আলী রাযি.। একজন উমর ইবনে আবদুল আযীয রহ. কতিপয় বনি আব্বসীয় খলীফা। বারজন খলিফা ধারাবাহিকভাবে হতে হবে এমন কোনো কথা নাই। বরং যে কোনোভাবে বারো জনের বিদ্যমান হওয়াটাই জরুরি। উল্লিখিত বারো জন ইমাম রাফিজী সম্প্রদায়ের কথিত 'বারো ইমাম' নয়। যাদের প্রথম জন আলী ইবনে তালিব রাযি. আর শেষ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান আসকারী। এই শেষোক্ত ইমামের ব্যাপারে তাদের বিশ্বাস হচ্ছে, তিনি সামেরার একটি ভূগর্ভস্থ প্রকোষ্ঠ থেকে বের হয়ে আসবেন। এরা তার প্রতীক্ষায় আছে।

কারণ, এ ইমামগণ হযরত আলী রাযি. ও তাঁর পুত্র হাসান ইবনে আলী অপেক্ষা অধিকতর কল্যাণকামী হতে পারেন না। বিশেষ করে যখন স্বয়ং হাসান ইবনে আলী রাযি. যুদ্ধ পরিত্যাগ করে হযরত মুআবিয়া রাযি. এর অনুকূলে খেলাফত ত্যাগ করেন। যার ফলে ফিৎনার আগুন নির্বাপিত হয়। মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক গৃহযুদ্ধ বন্ধ হয়। অবশিষ্ট ইমামগণ তো অন্যদের শাসনাধীন ছিলেন। উম্মতের উপরে কোনো বিষয়েই তাঁদের কোনো আধিপত্য ছিল না। সামিরার ভূগর্ভস্থিত প্রকোষ্ঠ সম্পর্কে রাফিজীদের যে বিশ্বাস তা নিতান্ত অবাস্তব কল্পনা ও হেঁয়ালী ছাড়া আর কিছুই নয়। এর কোনো ভিত্তি নেই।

হাজেরার গর্ভে ইসমাঈল আ.-এর জন্ম হলে সারাহর ঈর্ষা পায়। তিনি হযরত ইবরাহীম আ.-এর নিকট আবেদন জানান, যাতে হাজেরাকে তার চোখের আড়াল করে

দেন। সুতরাং ইবরাহীম আ. হাজেরা ও তাঁর পুত্রকে নিয়ে বের হয়ে পড়েন এবং মক্কায় নিয়ে রাখেন। বলা হয়ে থাকে যে, ইসমাঈল আ. তখন দুধের শিশু ছিলেন।

ইবরাহীম আ. যখন তাদেরকে সেখানে রেখে ফিরে আসার জন্যে উদ্যত হলেন, তখন হাজেরা উঠে তার কাপড় জড়িয়ে ধরে বললেন, আমাদেরকে এখানে খাদ্য-রসদহীন অবস্থায় রেখে কোথায় যাচ্ছেন? ইবরাহীম আ.-কোনো উত্তর দিলেন না। বারবার পীড়াপীড়ি করা সত্ত্বেও তিনি যখন জওয়াব দিলেন না, তখন হাজেরা জিজ্ঞেস করলেন : 'আল্লাহ কি এরূপ করতে আপনাকে আদেশ করেছেন?' ইবরাহীম আ. বললেন, হ্যাঁ। হাজেরা বললেন : 'তা হলে আর কোনো ভয় নেই। তিনি আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না।'

শায়খ আবু মুহাম্মদ ইবনে আবি যায়েদ রহ. 'নাওয়াদির' কিতাবে লিখেছেন : সারাহ হাজেরার ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে কসম করলেন, তিনি তাঁর তিনটি অঙ্গ ছেদন করবেন। ইবরাহীম আ. বললেন, দুটি কান ছিদ্র করে দাও ও খাৎনা করিয়ে দাও এবং কসম থেকে মুক্ত হয়ে যাও। সুহায়লী বলেছেন : 'হাজেরাই সর্বপ্রথম নারী, যার খাৎনা করা হয়েছিল, সর্বপ্রথম যার উভয় কান ছিদ্র করা হয়। এবং তিনিই সর্বপ্রথম দীর্ঘ আঁচল ব্যবহার করেন।"

মক্কায় হিজরত ও কাবা গৃহ নির্মাণ

ইমাম বুখারী রহ. ইবনে আব্বাস রাযি.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন : নারী জাতি সর্বপ্রথম কোমরবন্দ ব্যবহার শিখে ইসমাঈল আ.-এর মায়ের থেকে। হাজেরা কোমরবন্দ ব্যবহার করতেন সারাহর দৃষ্টি থেকে নিজের পদচিহ্ন গোপন রাখার জন্যে।

হযরত ইবরাহীম আ. হাজেরা ও ইসমাঈল আ.কে নিয়ে যখন মক্কায় যান, হাজেরা তখন তাঁর শিশুপুত্রকে দুধ পান করাতেন। মসজিদে হারামের উঁচু অংশে বায়তুল্লাহর কাছে যমযম কূপের নিকটে অবস্থিত একটি বড় গাছের নিচে তিনি তাঁদেরকে রেখে আসেন। মক্কায় তখন না ছিল কোনো মানুষ, না ছিল কোনো পানি। এখানেই তিনি তাঁদেরকে রেখে এলেন। একটি থলের মধ্যে কিছু খেজুর ও একটি মশকে কিছু পানিও রাখলেন।

তারপর ইবরাহীম আ. যেদিক থেকে এসেছিলেন, সেদিকে ফিরে চললেন। হাজেরাও তাঁর পিছু পিছু ছুটে যান এবং জিজ্ঞেস করেন : 'আমাদেরকে এই শূন্য প্রান্তরে রেখে কোথায় যাচ্ছেন? যেখানে নেই কোনো মানুষজন, নেই কোনো খাদ্য-পানীয়। হাজেরা বারবার একথা বলা সত্ত্বেও ইবরাহীম আ. তাঁর দিকে ফিরে তাকালেন না। তখন হাজেরা জিজ্ঞেস করলেন : 'আল্লাহ কি এরকম করতে আপনাকে আদেশ করেছেন?' ইবরাহীম আ. বললেন, 'হ্যাঁ'। হাজেরা বললেন : 'তা হলে আল্লাহ আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না। একথা বলে হাজেরা ফিরে আসলেন এবং ইবরাহীম আ.ও চলে গেলেন। যখন তিনি 'ছানিয়া' (গিরিপথ) পর্যন্ত পৌঁছলেন, যেখান থেকে

তাকে আর দেখা যাচ্ছিল না। তখন তিনি কাবামুখী হয়ে দাঁড়ালেন। দু হাত তুলে এ দোয়া করলেন :

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ

'হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার বংশধরদের কতককে বসবাস করালাম অনুর্বর উপত্যকায় তোমার পবিত্র ঘরের নিকট। হে আমাদের প্রতিপালক! তারা যেন সালাত কায়েম করে। অতএব, তুমি কিছু লোকের অন্তর তাদের দিকে অনুরাগী করে দাও এবং ফলাদি দ্বারা ওদের জীবিকার ব্যবস্থা করে দাও। যাতে ওরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।'

(সূরা ইবরাহীম : ৩৭)

হাযেরা ইসমাঈল আ.-কে স্তনের দুধ পান করাতেন। নিজে মশকের পানি পান করতেন। শেষে মশকের পানি ফুরিয়ে গেলে মা ও শিশু উভয়ে পিপাসায় কাতর হয়ে পড়েন। শিশুর দিকে তাকিয়ে দেখেন, পিপাসায় তার বুক ধড়ফর করছে। শিশু পুত্রের এ করুণ অবস্থা দেখে সহ্য করতে না পেরে মা সেখান থেকে উঠে গেলেন এবং নিকটবর্তী সাফা পর্বতে আরোহণ করলেন। সেখান থেকে প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে কাউকে দেখা যায় কি না লক্ষ করলেন। কিন্তু কাউকেই দেখতে পেলেন না।

তারপর সাফা পর্বত থেকে হাজেরা নেমে নিম্ন ভূমিতে চলে আসলে তিনি তাঁর জামার আঁচলে একদিকে উঠিয়ে ক্লান্ত-শ্রান্ত ব্যক্তির মত ছুটে চললেন। নিচু ভূমি পাড়ি দিয়ে তিনি মারওয়া পাহাড়ে উঠেন। চতুর্দিকে চোখ বুলিয়ে দেখতে লাগলেন, কাউকে দেখা যায় কি না। কিন্তু কাউকেই দেখতে পেলেন না। এভাবে তিনি সাতবার আসা-যাওয়া করেন। ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এ জন্যেই লোকজন হজ ও উমরায় উভয় পাহাড়ের মাঝে সাতবার সাঈ করে থাকেন। মারওয়া পাহাড়ে উঠে তিনি একটি আওয়াজ শুনতে পান। তিনি তখন নিজেকে লক্ষ করে বলেন : চুপ কর! তারপর কান পেতে পুনরায় ওই একই আওয়াজ শুনতে পেলেন। হাজেরা তখন বললেন : তোমার আওয়াজ শুনেছি, যদি সাহায্য করতে পার, তবে সাহায্য কর! এমন সময় তিনি দেখতে পেলেন, কূপের স্থানে একজন ফেরেশতা দাঁড়িয়ে আছেন। ফেরেশতা নিজের পায়ের গোড়ালি দ্বারা কিংবা তার ডানা দ্বারা মাটিতে আঘাত করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত পানি বের হয়ে আসে। তখন হাজেরা এর চারপাশে আপন হাত দ্বারা বাঁধ দিয়ে হাউজের মতো করে দিলেন এবং আঁজলা ভরে মশকে পানি তোলার পরও উপচে পড়তে লাগল।

ইবনে আব্বাস রাযি. বলনে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ইসমাঈল আ.-এর মাকে আল্লাহ রহম করুন। যদি তিনি যমযমকে বাঁধ না দিয়ে এভাবে ছেড়ে দিতেন কিংবা তিনি বলেছেন : যদি তিনি আঁজলা ভরে পানি মশকে জমা

না করতেন, তা হলে যমযম একটি কূপ না হয়ে প্রবহমান ঝর্ণায় পরিণত হত। তারপর হাজেরা পানি পান করলেন এবং শিশুপুত্রকে দুধ পান করালেন। ফেরেশতা তাকে বললেন, আপনি ধ্বংসের কোনো আশঙ্কা করবেন না। কেননা এখানেই আল্লাহর ঘর রয়েছে। এই শিশু ও তাঁর পিতা ঘরটি পুনরায় নির্মাণ করবেন।

ওই সময় বাইতুল্লার চেয়ে উঁচু কিছু টিলা ছিল। বন্যার পানির ফলে তার ডান ও বা দিকে ভাঙন ধরেছিল। হাজেরা সেখানে দিনযাপন করছিলেন। শেষে জুরহুম গোত্রের (ইয়েমেন দেশীয়) একদল লোক তাঁদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিল। অথবা জুরহুম পরিবারের কিছু লোক ওই পথ ধরে এদিকে আসছিল। তারা মক্কার নিচু ভূমিতে অবতরণ করল এবং তারা দেখতে পেল, একটা পাখি চক্রাকারে উড়ছে।

তখন তারা বলাবলি করল, নিশ্চয় এ পাখিটি পানির ওপরই উড়ছে। অথচ আমরা এ উপত্যকায় বহুদিন কাটিয়েছি, এখানে কোনো পানি ছিল না। তখন তারা একজন কি দু'জন মশকধারী লোক সেখানে পাঠায়। তারা সেখানে গিয়ে পানি দেখতে পেল। ফিরে এসে সবাইকে পানির সংবাদ দিল। সংবাদ পেয়ে সবাই সেদিকে অগ্রসর হল। ইসমাঈল আ.-এর মা ওই সময় পানির নিকট বসা ছিলেন। তারা তাঁর নিকটবর্তী স্থানে বসবাস করার অনুমতি চাইল। হাজেরা বললেন, থাকতে পার। তবে এ পানির উপর তোমাদের কোনো অধিকার থাকবে না। তারা তা মেনে নিল।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : এ ঘটনা ইসমাঈল আ.-এর মাকে একটি সুযোগ এনে দিল। তিনিও জনমানুষের উপস্থিতি চাচ্ছিলেন। এরপর তারা সেখানে বসতি স্থাপন করল এবং তাদের পরিবার-পরিজনের কাছেও সংবাদ পাঠাল। তারাও এসে তাদের সাথে বসবাস করতে লাগল। পরিশেষে সেখানে তাদের কয়েকটি পরিবারের বসতি স্থাপিত হল।

এদিকে ইসমাঈল আ. যৌবনে উপনীত হলেন। এবং তাদের থেকে আরবি ভাষা শিখলেন। যৌবনে পৌঁছে তিনি তাদের কাছে আকর্ষণীয় ও প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। যখন তিনি পূর্ণ যৌবন লাভ করলেন তখন তারা তাঁর সঙ্গে তাদেরই একটি মেয়েকে বিবাহ দিল। এরই মধ্যে ইসমাঈল আ.-এর মা হাজেরার ইনতেকাল করেন। ইসমাঈল আ.-এর বিবাহের পর ইবরাহীম আ. তাঁর পরিবারকে দেখার জন্যে এখানে আসেন। কিন্তু ইসমাঈল আ.কে পেলেন না।

তখন তার স্ত্রীকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। স্ত্রী জানালেন, তিনি আমাদের জীবিকার খোঁজে বেরিয়ে গেছেন। তখন তিনি তাদের জীবনযাত্রা ও অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। সে জানায়, আমরা অতি কষ্টে, অভাব-অনটনে আছি। সে তাঁর কাছে নিজেদের দুর্দশার অভিযোগ করল। তখন ইবরাহীম আ. বললেন, তোমার স্বামী বাড়ি ফিরে এলে আমার সালাম জানাবে এবং তাঁকে দরজার চৌকাঠ বদলে ফেলতে বলবে।

ইসমাঈল আ. বাড়ি ফিরে এলে তিনি যেন কিছু একটা ঘটনার আভাস পেলেন। স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কাছে কি কোনো লোক এসেছিল? স্ত্রী বলল, হ্যাঁ!

এই এই আকৃতির একজন বৃদ্ধ লোক এসেছিলেন। তিনি আপনার সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন। আমি তা জানিয়েছি। আমাদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমি বলেছি, আমরা খুব কষ্টে ও অভাবে আছি। ইসমাঈল আ. জিজ্ঞেস করলেন, তিনি তোমাকে কোনো উপদেশ দিয়েছেন কি ? স্ত্রী বলল : হ্যাঁ, আপনাকে তাঁর সালাম জানাতে বলেছেন এবং আপনাকে দরজার চৌকাঠ বদলাতে বলেছেন। ইসমাঈল আ. বললেন, তিনি আমার পিতা। তোমাকে ত্যাগ করার জন্যে আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং তুমি তোমার আপনজনদের কাছে চলে যাও। তখন তিনি স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিলেন এবং জুরহুম গোত্রের অন্য এক মহিলাকে বিবাহ করেন। ইবরাহীম আ. দীর্ঘদিন পর্যন্ত দূরেই রইলেন। তারপর হযরত ইবরাহীম আ. তাদের পুনরায় দেখতে এলেন। কিন্তু এবারও তিনি ইসমাঈল আ.-কে বাড়িতে পেলেন না। পুত্রবধূকে জিজ্ঞেস করলে জানালেন, 'তিনি আমাদের জীবিকার অন্বেষণে বাইরে গেছেন।'

ইবরাহীম আ. বললেন, তোমরা কেমন আছ? তোমাদের জীবনযাত্রার অবস্থা কেমন? জবাবে পুত্রবধূ বললেন : আলহামদুলিল্লাহ, আমরা ভালো আছি। সুখে আছি। ইবরাহীম আ. জিজ্ঞেস করলেন, সাধারণত তোমাদের খাদ্য কী? তিনি বললেন : গোশত। পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন : তোমাদের পানীয় কি? তিনি বললেন, পানি। ইবরাহীম আ. দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ! এদের গোশত ও পানিতে বরকত দান করুন।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ওই সময় তাদের ওখানে খাদ্যশস্য উৎপাদিত হত না। যদি হত তা হলে তিনি তাদের জন্য সে বিষয়েও দোয়া করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, মক্কা ব্যতীত অন্য কোথাও কেউ শুধু গোশত ও পানি দ্বারা জীবন ধারণ করতে পারে না। কেননা শুধু গোশত ও পানি জীবন যাপনের জন্য যথেষ্ট হতে পারে না। ইবরাহীম আ. বললেন, তোমার স্বামী যখন বাড়িতে আসবে. তখন আমার সালাম জানাবে এবং দরজার চৌকাঠ অপরিবর্তিত রাখতে বলবে।

ইসমাঈল আ. যখন বাড়িতে আসলেন, তখন স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের নিকট কেউ এসেছিল কি? স্ত্রী বললেন : হ্যাঁ, একজন সুন্দর আকৃতির বৃদ্ধলোক এসেছিলেন। স্ত্রী আগন্তুকের প্রশংসা করলেন। তিনি আপনার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছেন। আমি তাঁকে আপনার সংবাদ জানিয়েছি। তিনি আমাদের জীবনযাত্রা সম্পর্কেও জানতে চেয়েছেন। আমি জানিয়েছি, আমরা ভালো আছি।

ইসমাঈল আ. বললেন, তিনি কি তোমাকে আর কোনো উপদেশ দিয়েছেন? স্ত্রী বললেন : হ্যাঁ, তিনি আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং আপনার দরজার চৌকাঠ ঠিক রাখতে বলেছেন। ইসমাঈল আ. বললেন, তিনি আমার পিতা। তোমাকে স্ত্রীরূপে বহাল রাখতে আদেশ করেছেন।

পুনরায় ইবরাহীম আ. এদের থেকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত দূরেই থাকলেন। তারপর ইবরাহীম আ. পুনরায় তথায় আসলেন। দেখলেন, ইসমাঈল যমযম কূপের নিকটে

বিরাট এক বৃক্ষের নিচে বসে তীর চাঁছছিলেন। পিতাকে দেখে তিনি তাঁর দিকে এগিয়ে আসলেন। এরপর উভয়ে এমনভাবে পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন, যেমন সাধারণত পিতাপুত্রের মধ্যে হয়ে থাকে। ইবরাহীম আ. বললেন : ইসমাঈল, আল্লাহ আমাকে একটি কাজের আদেশ করেছেন। ইসমাঈল আ. বললেন, আল্লাহ যে আদেশ করেছেন তা বাস্তবায়িত করুন। ইবরাহীম আ. বললেন, তুমি আমাকে সাহায্য করবে? ইসমাঈল আ. বললেন : নিশ্চয়ই আমি আপনাকে সাহায্য করব। ইবরাহীম আ. পার্শ্বে অবস্থিত উঁচু টিবির দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, আল্লাহ আমাকে এ স্থানটি ঘিরে একটি ঘর নির্মাণের আদেশ দিয়েছেন। তখন তাঁরা উভয়ে কাবা ঘরের দেয়াল উঠাতে লেগে গেলেন। ইসমাঈল আ. পাথর আনতেন ও ইবরাহীম আ. গাঁথুনী দিতেন।

হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইসমাঈল আ.-এর দোয়া

যখন দেয়াল উঁচু হয়ে গেল, তখন ইসমাঈল আ. 'মাকামে ইবরাহীম' নামে প্রসিদ্ধ পাথরটি আনলেন এবং সেখানে রাখলেন। ইবরাহীম আ.-এর ওপর দাঁড়িয়ে ইমারত তৈরি করতে লাগলেন আর ইসমাঈল আ. তাঁকে পাথর যোগান দিতে থাকেন। এ সময় তাঁরা উভয়ে নিম্নের দোয়াটি পাঠ করেন :

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

হে আমাদের রব! আমাদের থেকে এ কাজ কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সবকিছু শোনেন ও জানেন। (সূরা বাকারা : ১২৭)

এভাবে তারা দুজনে কাবাঘর নির্মাণ কাজ শেষ করেন এবং কাজ শেষে ঘরের চারদিকে তাওয়াফ করেন এবং উক্ত দুআ পাঠ করেন। ইমাম বুখারী রহ. ইবনে আব্বাস রাযি. সূত্রে বর্ণনা করেন : যখন ইবরাহীম আ. ও তাঁর স্ত্রী সারাহর মধ্যে যা ঘটার ঘটে গেল, তখন তিনি ইসমাঈল আ. ও তাঁর মাকে নিয়ে বের হয়ে যান। তাদের সাথে পানি ভর্তি একটি মশক ছিল।

তারপর ইমাম বুখারী রহ. পূর্বোল্লিখিত হাদিসের অনুরূপ ঘটনার বিবরণ দেন। হাদিসটি ইবনে আব্বাসের উক্তি। এর কিছু অংশ 'মারফূ' আর কিছু 'গরীব' পর্যায়ের। ইবনে আব্বাস রাযি. সম্ভবত ইসরাঈলী বর্ণনা থেকে এগুলো সংগ্রহ করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখ আছে, ইসমাঈল আ. ঐ সময় দুগ্ধপোষ্য শিশু ছিলেন।

তাওরাতপন্থীরা বলেন, আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহীম আ.-কে পুত্র ইসমাঈলসহ সবাইকে খতনার নির্দেশ দেন। তিনি এ নির্দেশ পালন করেন। অন্যদেরও খতনা করান। এ সময় ইবরাহীম আ.-এর বয়স হয়েছিল নিরানব্বই বছর এবং ইসমাঈল আ.-এর বয়স ছিল তের বছর। খতনা করাটা ছিল আল্লাহর নির্দেশ পালনার্থে। এতে প্রতীয়মান হয়, অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হিসেবেই তিনি তা পালন করেন। এ কারণেই ওলামায়ে কেরাম খতনা করা ওয়াজিব বলেছেন। এ মতই সঠিক।

বুখারী শরীফে আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ইবরাহীম আ. আশি বছর বয়সে (ছুঁতারের) বাইসের সাহায্যে নিজের খতনা করেন। আবদুর রহমান ইবনে ইসহাক, আজলান, মুহাম্মদ ইবনে আমর ও ইমাম মুসলিম ভিন্ন ভিন্ন সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। উক্ত বর্ণনায় ব্যবহৃত 'কুদূম' শব্দটির অর্থ, ধারাল অস্ত্র। কেউ কেউ এটি একটি স্থানের নাম বলেছেন।

এ সব হাদিসের শব্দের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য আছে। ইবনে হিব্বান রহ. আবু হোরায়রা রাযি. সূত্রে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ইবরাহীম আ. একশ বিশ বছর বয়সে খতনা করেন। এর পরও আশি বছর জীবিত থাকেন। এসব বর্ণনায় ইসমাঈল আ.-কে 'যাবীহ' বলে উল্লেখ করা হয় নি। এবং এতে ইবরাহীম আ.-এর তিনবার আগমনের কথা বলা হয়েছে।

প্রথমবার আগমন করেন, যখন হাজেরার মৃত্যু হয় ও ইসমাঈল আ. বিবাহ করেন। শিশুকালে রেখে আসার পর থেকে ইসমাঈল আ.-এর বিবাহ করা পর্যন্ত তিনি আর তাদের খোঁজ-খবর নেন নি। বলা হয়, সফরকালে ইবরাহীম আ.-এর জন্যে জমিনের দূরত্ব সঙ্কুচিত হয়ে যেত। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি যখন আসতেন তখন বিদ্যুতের গতিসম্পন্ন বাহন বোরাকে চড়ে আসতেন। এ যদি হয়, তা হলে হযরত ইবরাহীম আ. তাদের সংবাদ না নিয়ে কিভাবে দূরে পড়ে থাকতে পারেন? অথচ নিজের পরিজনের সংবাদ রাখা একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। বিশেষ করে যে অবস্থায় তাদের রেখে এসেছিলেন। এসব ঘটনার কিছু অংশ ইসরাঈলী বর্ণনা থেকে নেওয়া। অবশ্য কিছু আছে মারফূ হাদিস থেকে। এতে 'যাবীহ'-এর ঘটনার উল্লেখ নেই। কিন্তু তাফসিরের মধ্যে সূরা সাফফাতে আমরা দলিলসহ উল্লেখ করেছি, 'যাবীহ হলেন হযরত ইসমাঈল আ.।

হযরত ইবরাহীম আ.-এর হাক্কুল ইয়াকীনের অন্বেষণ

মধ্যস্থলে যেহেতু হযরত ইসমাঈল আ. ও হযরত ইসহাক আ.-এর আলোচনা চলে এসেছিল, তাই তাঁদের দুজনের ঘটনাবলী বর্ণনা করে দেওয়া সঙ্গত মনে হল। যাতে ঘটনার ধারাবাহিকতায় রক্ষা হয়। এতদ্ভিন্ন এই ঘটনাগুলিও হযরত ইবরাহীম আ.-এরই যিন্দেগীর সাথে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং তার উল্লেখ উপযুক্ত ক্ষেত্রেই হয়েছে। এখন হযরত ইবরাহীম আ.-এর জীবনের অবশিষ্ট অবস্থাবলীর প্রতি মনোযোগ দেওয়া যেতে পারে।

বস্তুসমূহের স্বরূপ বা মূল তথ্যের অন্বেষণ ও অনুসন্ধান হযরত ইবরাহীম আ.-এর স্বভাবগত রুচি ছিল। তিনি প্রত্যেক বস্তুর তথ্য পর্যন্ত পৌঁছতে চেষ্টা করাকে নিজের জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য মনে করতেন। যাতে তার তথ্যাবলীর দ্বারা একমাত্র সত্তা আল্লাহ সুমহান সত্তা, তাঁর একত্ব এবং তাঁর অসীম ক্ষমতা সম্বন্ধে দিব্য বিশ্বাস লাভের পর বাস্তব বিশ্বাস লাভ করতে পারেন।

contents

হযতর ইবরাহীম আ. পিতা আযর, কওম ও নমরূদের সঙ্গে বিতর্ক করার সময়ে তাঁর এই স্বভাবগত রুচির ভালোরূপে পরিচয় পাওয়া যায়। এ কারণে হযরত ইবরাহীম আ. "মৃত্যুর পর জীবিত হওয়া" সম্বন্ধে আল্লাহ পাকের দরবারে প্রার্থনা জানালেন, "আপনি কেমন করে মৃতদেরকে জীবন দান করবেন, দয়া করে আমাকে একটু দেখিয়ে দিন।" আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম আ.-কে বললেন, হে ইবরাহীম! তুমি কি এই বিষয়টির উপর ঈমান এবং দৃঢ় বিশ্বাস রাখ না? ইবরাহীম আ. তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, কেন রাখব না? আমি নিঃসঙ্কোচে এর ওপর ঈমান রাখছি। কিন্তু আমার এই প্রার্থনা ঈমান ও ইয়াকীনের বিরোধী এই জন্যে নয়, আমি দৃঢ় জ্ঞানমূলক দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে সাথে দিব্য বিশ্বাস এবং বাস্তব বিশ্বাসের প্রার্থী। আমার আকাঙ্ক্ষা, আমাকে দিব্য চক্ষে দেখিয়ে দিন।

মৃত্যুর পরে জীবিত হওয়ার আকৃতি এবং রূপ কী হবে? তখন আল্লাহ তাআলা বললেন, আচ্ছা যদি তুমি চাক্ষুষ দেখতে চাও, তবে কয়েকটি পাখি আনয়ন কর এবং তাদেরকে খণ্ড খণ্ড করে সামনের পাহাড়ের উপর রেখে আসো। এরপর দূরে দাঁড়িয়ে তাদেরকে ডাক। হযরত ইবরাহীম আ. তা-ই করলেন। এরপর ইবরাহীম আ. যখন তাদেরকে ডাকলেন, তখন তাদের দেহের খণ্ডগুলি পৃথক পৃথকভাবে তৎক্ষণাৎ নিজেদের আকৃতিতে এসে গেল এবং জীবিত হয়ে হযরত ইবরাহীম আ.-এর নিকট উড়ে চলে আসল। কুরআন মাজীদের সূরা বাকারায় এ ঘটনাটি নিম্নরূপে বর্ণনা করা হয়েছে :

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"(স্মরণ করুন) যখন ইবরাহীম বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দেখান, আপনি কিভাবে মৃতদিগকে জীবিত করেন? আল্লাহ পাক বললেন, তুমি কি (এ বিষয়ের উপর) ঈমান রাখ না? ইবরাহীম বললেন, কেন রাখব না? কিন্তু আমার মনের তৃপ্তি চাচ্ছি। আল্লাহ বললেন, তবে চারটি পক্ষী লও এবং এদেরকে খণ্ড খণ্ড করে নিকটস্থ পাহাড়গুলির উপর তাদের এক এক খণ্ড রেখে দাও। এরপর তাদেরকে ডাক, তারা দৌড়িয়ে তোমার নিকটে চলে আসবে। আর তুমি জেনে রাখ, আল্লাহ তাআলা মহাশক্তিমান প্রজ্ঞাময়।" (সূরা বাকারা : ২৬০)

বনি কাতুরা

হযরত ইবরাহীম আ. হযরত সারাহ ও হযরত হাজেরা ছাড়াও অন্য এক বিবাহ করেছিলেন। সেই বিবির নাম ছিল কাতুরা। তাঁর গর্ভ হতে হযরত ইবরাহীম আ.-এর ছয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিল।

"আর ইবরাহীম আ. আরেকটি বিবাহ করেছিলেন। তাঁর নাম কাতুরা। তাঁর গর্ভ হতে যামরান, ইয়াকসান, মাদ্দান, মাদইয়ান, ইয়াশবাক এবং শাওহা জন্মগ্রহণ করেন। ইয়াকসানের ঔরসে দুই পুত্র ছাবা ও দুওয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাদের সন্তান ছিল আসূরী, লাতুসী ও লুওয়াই। আর মাদায়েনের সন্তান ছিল আইফা, গাফার, খায়ুক, আবীদা ও দাআ। এরা ছিলেন বনি কাতুরা বংশের।" (তাওরাত)

হযরত ইবরাহীম আ.-এর প্রশংসা

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي

قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

"স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম আ.-কে তাঁর প্রতিপালক কয়েকটি কথা দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন এবং সেগুলো সে পূর্ণ করেছিল। আল্লাহ বললেন, আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা করছি। সে বলল, আমার বংশধরগণের মধ্য হতেও? আল্লাহ বললেন, আমার প্রতিশ্রুতি জালিমদের প্রতি প্রযোজ্য নয়।" (সূরা বাকারা : ১২৪)

আল্লাহ হযরত ইবরাহীম আ.-কে যেসব কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছিলেন। তিনি সেসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর আল্লাহ তাঁকে মানব নেতৃত্ব দান করেন। যাতে তারা তাঁর অনুকরণ ও অনুসরণ করতে পারে। ইবরাহীম আ. এ নিয়ামত তাঁর পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে অব্যাহত রাখার জন্যে আল্লাহর নিকট দোয়া করেন। আল্লাহ তাঁর প্রার্থনা শোনেন এবং জানিয়ে দেন, তাঁকে যে নেতৃত্ব দেওয়া হল, তা জালিমরা লাভ করতে পারবে না। এটা কেবল তাঁর সন্তানদের মধ্যে আলিম ও সৎকর্মশীলদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا

وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ

আমি ইবরাহীমকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব এবং তার বংশধরদের জন্যে স্থির করলাম নবুয়ত ও কিতাব, আমি তাকে দুনিয়ায় পুরস্কৃত করেছিলাম। আখিরাতেও সে নিশ্চয়ই সৎকর্মশীলদের অন্যতম হবে। (সূরা আন-কাবুত : ২৭)

আল্লাহর বাণী :

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (٨٤) وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ (٨٥) وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ (٨٦) وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٨٧)

এবং তাকে দান করেছিলাম ইসহাক ও ইয়াকুব– তাদের প্রত্যেককে সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম; পূর্বে নূহকেও সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম এবং তার বংশধর দাঊদ, সুলাইমান, আইয়ুব, ইউসুফ, মূসা ও হারূনকেও। আর এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করি এবং যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা এবং ইলয়াসকেও; আর এভাবেই সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম, এরা সকলেই ছিলেন নেককার। আরও সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম ইসমাঈল, আলইয়াসাআ, ইউনুস ও লূতকে এবং শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম বিশ্বজগতের উপর প্রত্যেককে এবং এদের পিতৃপুরুষ, বংশধর এবং ভ্রাতৃবৃন্দের কতককে, তাদেরকে মনোনীত করেছিলাম এবং সরল পথে পরিচালিত করেছিলাম। (সূরা আনআম : ৮৪-৮৭)

প্রসিদ্ধ মতে وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ (তাঁর বংশধরদের) বলতে এখানে হযরত ইবরাহীম আ.-কে বুঝান হয়েছে। হযরত লূত আ. যদিও হযরত ইবরাহীম আ.-এর ভাতিজা তবুও অন্যদের প্রাধান্য হেতু তাঁকেও বংশধর হিসাবে বলা হয়েছে। অপর একদল আলিমের মতে 'তাঁর' বলতে হযরত নূহ আ.-কে বুঝান হয়েছে। পূর্বে আমরা নূহ আ.-এর আলোচনায় এ বিষয়ের উল্লেখ করেছি। আল্লাহই সর্বজ্ঞ। আল্লাহর বাণী :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ

আমি নূহ এবং ইবরাহীমকে রাসূলরূপে প্রেরণ করেছিলাম এবং তাদের বংশধরগণের জন্যে স্থির করেছিলাম নবুওয়াত ও কিতাব। (সূরা হাদিদ : ২৬)

হযরত ইবরাহীম আ.-এর পরে আসমান থেকে যত কিতাব যত নবীর ওপর নাযিল হয়েছে, তাঁরা সকলেই নিশ্চিতভাবে তাঁর বংশধরদের অন্তর্ভুক্ত। এটা এমন একটা সম্মান, যার কোনো তুলনা হয় না। এমন একটা সুমহান মর্যাদা যার তুল্য আর কিছুই নেই। কারণ, হযরত ইবরাহীম আ.-এর ঔরসে দুই মহান পুত্র-সন্তানের জন্ম হয়। হাজেরার গর্ভে ইসমাঈল আ. এবং সারাহর গর্ভে ইসহাক আ.। ইসহাক আ.-এর পুত্র ইয়াকুব আ.। তাঁর অপর নাম ছিল ইসরাঈল। পরবর্তী বংশে এত বিপুল সংখ্যক নবীর আগমন ঘটে, যাদের সঠিক সংখ্যা তাঁদেরকে প্রেরণকারী আল্লাহ ব্যতীত আর কেউই জানেন না।

অব্যাহতভাবে এ বংশেই নবী-রাসূলগণ আসতে থাকেন এবং হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম আ. পর্যন্ত পৌঁছে সে ধারার সমাপ্তি ঘটে। অর্থাৎ ঈসা ইবনে মারইয়াম আ. ইসরাঈল বংশের শেষ নবী। অপরদিকে হযরত ইসমাঈল আ.-এর সন্তানগণ আরবের বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত হয়ে আরবভূমিতেই বসবাস করতে থাকেন। তাঁর সন্তানদের মধ্যে সর্বশেষ নবী খাতামুল আম্বিয়া, বনী আদমের শ্রেষ্ঠ সন্তান, দুনিয়া ও আখিরাতের গৌরব নবী মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম আল কুরায়শী আল

মক্কী ওয়াল মাদানী ছাড়া অন্য কোনো নবীর আগমন ঘটে নি। তিনিই হলেন সেই মহামানব যাঁর দ্বারা সমগ্র মানবজাতি গৌরবান্বিত। আদি-অন্ত সকল মানুষের ঈর্ষার পাত্র। সহি মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

سَأَقُوْمُ مَقَامًا يَّرْغَبُ إِلَيَّ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ، حَتَّى إِبْرَاهِيمُ

"আমি এমন এক মর্যাদাপূর্ণ স্থানে প্রতিষ্ঠিত হব, আমার কাছে পৌঁছার জন্যে প্রত্যেকেই লালায়িত হবে; এমনকি ইবরাহীম আ.-ও।"

এ বাক্যের দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রকারান্তরে হযরত ইবরাহীম আ.-এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এ থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর পরে অন্য সব মানুষের মধ্যে দুনিয়া ও আখিরাতে হযরত ইবরাহীম আ.-ই শ্রেষ্ঠ মানুষ ও সম্মানিত পুরুষ।

ইমাম বোখারি রহ. হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসান রাযি.-কে কোলে নিয়ে বলতেন : আমি তোমাদের দুই ভাইয়ের জন্যে সেরূপ আশ্রয় চাই, যেরূপ আশ্রয় চেয়েছিলেন তোমাদের আদি পিতা ইবরাহীম আ. ইসমাঈল ও ইসহাকের জন্যে। আমি আশ্রয় চাই আল্লাহর পরিপূর্ণ কালেমাহ দ্বারা প্রত্যেক শয়তান ও বিষাক্ত সরীসৃপ থেকে এবং প্রত্যেক ক্ষতিকর চোখের দৃষ্টি থেকে। সুনান হাদিসের গ্রন্থকারগণও মানসূর রহ. সূত্রে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

জান্নাতে হযরত ইবরাহীম আ.-এর প্রাসাদ

হাফেজ আবু বকর আল বাযযার রহ. আবু হোরায়রা রাযি. সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : জান্নতের মধ্যে মণি-মুক্তা দ্বারা নির্মিত একটি অতি মনোরম প্রাসাদ রয়েছে। কোনো ফাটল তাতে নেই। আল্লাহ তাঁর খলীলের জন্যে এটি তৈরি করেছেন। আল্লাহর মেহমান হিসেবে তিনি তাতে থাকবেন। এরপর বাযযার রহ. বলেন, এ হাদীসের বর্ণনাকারী হাম্মাদ ইবনে সালামা থেকে কেবল ইয়াযীদ ইবনে হারুন ও নযর ইবনে শুমায়লী মারফূ হিসেবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ওই দুজন বাদে অন্য সবাই মওকুফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এ ত্রুটি না থাকলে হাদীসটি 'সহি'-এর শর্তে উত্তীর্ণ হত, কিন্তু ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহ. এটি বর্ণনা করেন নি।

ইবরাহীম আ.-এর গঠনাকৃতি

ইমাম আহমদ রহ. জাবের রাযি.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আমার সম্মুখে পয়গম্বরগণকে পেশ করা হয়। তন্মধ্যে মূসা আ.-কে শানুয়া গোত্রের লোকদের অনুরূপ দেখতে পাই। ঈসা ইবনে মারইয়াম আ.-কে অনেকটা উরওয়া ইবনে মাসউদের মতো এবং ইবরাহীম আ.-কে অনেকটা

দাহইয়া কালবীর মতো দেখতে পাই। এ সনদে ও এ পাঠে ইমাম আহমদ রহ একাই এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ রহ. আসওয়াদ ইবনে আব্বাস রাযি. সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আমি ঈসা ইবনে মারইয়াম, মূসা ও ইবরাহীম আ.-কে দেখেছি। তন্মধ্যে ঈসা আ. ছিলেন গৌরবর্ণ, চুল ঘন কালো, বক্ষদেশ প্রশস্ত। সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাদের সাথীর দিকে তাকাও অর্থাৎ তাঁর নিজের দিকে ইঙ্গিত করেন।

ইমাম বুখারী মুজাহিদ সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে শুনেছেন, লোকজন তাঁর সম্মুখে দাজ্জালের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করছিল এবং বলছিল, দাজ্জালের চক্ষুদ্বয়ের মধ্যখানে লিখিত থাকবে কাফির। ইবনে আব্বাস রাযি. বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এ কথা শুনি নি। বরং তিনি বলেছেন– ইবরাহীম আ.-কে যদি দেখতে চাও, তবে তোমাদের সাথীর প্রতি তাকাও।

আর মূসা আ. হলেন, ধূসর বর্ণের। ঘন চুল বিশিষ্ট। তিনি একটি লাল উটের ওপর উপবিষ্ট– যার নাকের রশি খেজুর গাছের ছালের তৈরি। আমি যেন দেখতে পাচ্ছি, তিনি এ অবস্থায় উপত্যকার দিকে নেমে আসছেন। বুখারী ও মুসলিম রহ. এ হাদীসটি ভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী রহ. 'কিতাবুল হজ' ও 'কিতাবুল লিবাস'-এ এবং মুসলিম রহ. ও আবদুল্লাহ ইবনে আওন সূত্রে এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

হযরত ইবরাহীম আ.- সম্পর্কে আরো কিছু

ইবনে জারীর রহ. তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত ইবরাহীম আ. নমরূদ (ইবনে কিনআন) এর যুগে জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে, এ নমরূদ ছিল প্রসিদ্ধ বাদশা যাহ্হাক। সে দীর্ঘ এক হাজার বছর যাবত বাদশাহী করেছিল বলে মনে করা হয়ে থাকে। তার শাসনামল ছিল জুলুম-অত্যাচারে পূর্ণ। কোনো কোনো ইতিহাসবিদের মতে এ নমরূদ ছিল বনু রাসিব গোত্রের লোক। এ গোত্রেই হযরত নূহ আ. প্রেরিত হয়েছিলেন। নমরূদ সে সময় সমগ্র দুনিয়ার বাদশা ছিল। ইতিহাসবিদগণ উল্লেখ করেছে, একবার আকাশে একটি নক্ষত্র উদিত হয়। তার জ্যোতির সম্মুখে সূর্য ও চন্দ্র আলো হারিয়ে ফেলে। এ অবস্থায় লোকজন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। নমরূদ বিচলিত হয়ে দেশের সব গণক ও জ্যোতির্বিদদের একত্র করে এর কারণ জিজ্ঞেস করে। তারা জানাল, আপনার রাজত্বের মধ্যে এমন এক শিশুর জন্ম হবে, যার হাতে আপনার বাদশাহীর পতন ঘটবে। নমরূদ তখন রাজ্যব্যাপী ঘোষণা দিল, এখন থেকে কোনো পুরুষ স্ত্রীর কাছে যেতে পারবে না এবং এখন থেকে কোন শিশুর জন্ম হলে তাকে হত্যা করা হবে। এ সময়ই হযরত ইবরাহীম আ. জন্মগ্রহণ করেন। আল্লাহ তাঁকে হিফাজত করেন ও পাপিষ্ঠদের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করেন। তিনি তাঁকে উত্তমভাবে লালন-পালনের ব্যবস্থা করেন।

হযরত ইবরাহীম আ.-এর জন্মভূমি ছিল 'সূস'। কারও মতে 'বাবেল', কারও মতে 'কূছায়'র পার্শ্ববর্তী 'সাওয়াদ' নামক গ্রামে। ইতোপূর্বে হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.-এর একটি বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, হযরত ইবরাহীম আ. দামেশকের পূর্ব পার্শ্বে বারযাহ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।

আল্লাহ হযরত ইবরাহীম আ.-এর হাতে নমরূদের পতন ঘটানোর পর তিনি প্রথমে হারান এবং পরে সেখান থেকে শাম দেশে হিজরত করেন এবং সেখান থেকে ঈলিয়ায় গিয়ে বসবাস করেন। অতঃপর ইসমাঈল আ. ও ইসহাক আ.-এর জন্ম হয়। তারপর কিনআনের অন্তর্গত হিবরূন নামক স্থানে সারাহর ইনতিকাল হয়।

আহলে কিতাবরা উল্লেখ করেছে, মৃত্যুকালে সারাহর বয়স হয়েছিল একশ' সাতাশ বছর। ইবরাহীম আ. সারাহর মৃত্যুকালে অত্যন্ত মর্মাহিত হন এবং দুঃখ প্রকাশ করেন। বনূ হায়ছ গোত্রের আফরূন ইবনে সাখার নামক এক ব্যক্তির কাছ থেকে চারশ' মিছকালের বিনিময়ে তিনি একটি জায়গা ক্রয় করেন এবং সারাহকে সেখানে দাফন করেন। এরপর ইবরাহীম আ.-এর পুত্র ইসহাককে রুফাকা বিনতে বাতুঈল ইবনে নাহূর ইবনে তারাহ্-এর সাথে বিবাহ করান। পুত্রবধূকে আনার জন্যে তিনি নিজের ভৃত্যকে পাঠিয়ে দেন। সে রুফাকা ও তার দুধমা ও দাসীদেরকে উটের উপর সওয়ার করে নিয়ে আসে।

আহলে কিতাবদের বর্ণনা : হযরত ইবরাহীম আ.-এরপর কাতুরা নামে এক মহিলাকে বিবাহ করেন। তাঁর গর্ভে যামরান, ইয়াকশান, মাদান, মাদইয়ান, শায়াক ও শূহ-এর জন্ম হয়। এদের প্রত্যেকের সন্তান-সন্ততি সম্পর্কেও বিবরণ রয়েছে।

ইবনে আসাকির বিভিন্ন প্রাচীন পণ্ডিতদের বরাতে ইবরাহীম আ.-এর কাছে মালাকুল মওতের আগমন সম্পর্কে আহলে কিতাবদের উপাখ্যানসমূহ বর্ণনা করেছেন। সঠিক অবস্থা আল্লাহই ভালো জানেন। কেউ কেউ বলেছেন, হযরত দাউদ আ. ও হযরত সুলাইমান আ.-এর মতো হযরত ইবরাহীম আ.-ও আকস্মিকভাবে ইনতেকাল করেন। কিন্তু আহলে কিতাব ও অন্যদের বর্ণনা এর বিপরীত।

তারা বলে, ইবরাহীম আ. পীড়িত হয়ে এক শ পঁচাত্তর বছর মতান্তরে একশ নব্বই বছর বয়সে ইনতেকাল করেন। এবং তাঁর সহধর্মিনী সারাহর কবরের পাশেই তাঁকে দাফন করা হয়। ইসমাঈল আ. ও ইসহাক আ. উভয়ে দাফনকার্য সম্পাদন করেন। ইবনুল কালবী বলেছেন, ইবরাহীম আ. দুইশ বছর বয়সে ইনতেকাল করেন। আবু হাতেম ইবনে হিব্বান তাঁর 'সহি' গ্রন্থে মুফাযযল... আবু হোরায়রা রাযি.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন। হযরত ইবরাহীম আ. বাটালীর সাহায্যে খতনা করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল একশ বিশ বছর। এরপর তিনি আশি বছর জীবিত থাকেন। হাফেজ ইবনে আসাকির রহ. আবু হোরায়রা রাযি.-এর সূত্রে এ হাদিসখানা মওকূফরূপে বর্ণনা করেছেন। তারপর ইবনে হিব্বান রহ. এ হাদীস যারা মারফূভাবে বর্ণনা করেছেন,

তাদের বর্ণনাকে বাতিল বলে অভিহিত করেছেন। যেমন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ রহ. আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইবরাহীম আ. যখন একশ বিশ বছর বয়সে উপনীত হন, তখন খতনা করান। এরপর আশি বছর জীবিত থাকেন। আর তিনি কাদূম (ছুঁতারের বাইস) দ্বারা খতনা করিয়েছিলেন।

হাফেজ ইবনে আসাকির রহ. আবু হোরায়রা রাযি.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ইবরাহীম আ. যখন খতনা করান, তখন তাঁর বয়স ছিল আশি বছর।

ইবনে হিব্বান আবদুর রাযযাক থেকে বর্ণনা করেছেন, কাদূম একটা গ্রামের নাম। আমার জানা মতে 'সহি' গ্রন্থে যা এসেছে, তা হল : ইবরাহীম আ. যখন খতনা করেন, তখন তিনি আশি বছর বয়সে পৌঁছেন। অন্য বর্ণনায় তাঁর বয়স ছিল আশি বছর।

মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল 'তাফসিরে ওকি'র মধ্যে 'যিয়াদাত' থেকে উদ্ধৃত করেছেন, আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে– তিনি বলেছেন : ইবরাহীম আ. সর্বপ্রথম পায়জামা পরিধান করেন। সর্বপ্রথম মাথায় চুলে সিঁথি কাটেন। সর্বপ্রথম ক্ষৌরকর্ম করেন। সর্বপ্রথম খতনা করান কাদূমের সাহায্যে। তখন তাঁর বয়স ছিল একশ বিশ বছর। এবং তারপর আশি বছর জীবিত থাকেন। তিনিই সর্বপ্রথম অতিথিকে আহার করান, সর্বপ্রথম প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হন। এ মওকূফ হাদীসটি মারফূ' হাদীসের অনুরূপ। ইবনে হিব্বান রহ. এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন।

ইমাম মালিক রহ. সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব রহ. থেকে বর্ণনা করেন। ইবরাহীম আ. প্রথম ব্যক্তি, যিনি অতিথিকে আহার করান এবং প্রথম মানুষ, যিনি খতনা করান। সর্বপ্রথম তিনিই গোঁফ ছাটেন। সর্বপ্রথম তিনিই পৌঢ়ত্বের শুভ্রতা প্রত্যক্ষ করেন। ইবরাহীম আ. বললেন, হে আমার প্রতিপালক! এটা কী? আল্লাহ বললেন, এ হল মর্যদা। ইবরাহীম আ. বললেন, হে প্রতিপালক! তা হলে আমার মর্যাদা আরও বৃদ্ধি করে দিন।

ইয়াহইয়া ও সাঈদ ব্যতীত অন্য সবাই আরো কিছু বাড়িয়ে বলেছেন। যেমন : তিনিই সর্বপ্রথম লোক, যিনি গোঁফ ছোট করেন, সর্বপ্রথম ক্ষৌরকর্ম করেন, সর্বপ্রথম পায়জামা পরিধান করেন। হযরত ইবরাহীম আ.-এর কবর, তাঁর পুত্র ইসহাক আ.-এর কবর ও তাঁর পৌত্র ইয়াকুব আ.-এর কবর 'মুরাব্বা' নামক গোরস্তানে। যা হযরত সুলাইমান ইবনে দাউদ আ. হিবরূন শহরে তৈরি করেছিলেন। বর্তমানে এর নাম 'বালাদুল খলীল' (খলীলের শহর) বনী ইসরাঈলের যুগ থেকে আমাদের এ যুগ পর্যন্ত বংশ ও জাতি পরম্পরায় ধারাবাহিকভাবে এ কথাই চলে আসছে, হযরত ইবরাহীম আ.-এর কবর মুরাব্বাতে অবস্থিত। সুতরাং কথাটা যে সঠিক, তা নিশ্চিতভাবে বলা চলে। তবে কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্রে তাঁর কবর কোনটি তা নির্ণিত হয় নি। সুতরাং ওই

স্থানটির যত্ন করা এবং তার সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করা সকলের কর্তব্য। এ স্থানটি পদদলিত করা উচিত নয়। কেননা হতে পারে যে স্থানটি পদদলিত করা হচ্ছে, তারই নিচে হযরত ইবরাহীম খলীল আ. বা তাঁর কোনো পুত্রের কবর রয়েছে।

ইবনে আসাকির ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ রহ.-এর সূত্রে বলেছেন : হযরত ইবরাহীম আ.-এর কবরের কাছে একটি প্রাচীন শিলা পাওয়া গেছে। যার ওপর এ কবিতাটি লেখা ছিল :

إِلٰهِيْ جهُوْلا اَمَلُهٗ ـ يَمُوْتُ مَنْ جَاءَ اَجَلُهٗ

وَمَنْ دَنَا مِنْ حَتْفِهٖ ـ لَمْ تُغْنِ عَنْهُ حِيَلُهٗ

وَكَيْفَ يَبْقٰى اٰخِرُ ـ مَنْ مَاتَ عَنْهُ اَوَّلُهٗ

وَالْمَرْءُ لَا يَصْحَبُهٗ ـ فِى الْقَبْرِ اِلَّا عَمَلُهٗ

অর্থ : হে আল্লাহ! যে ব্যক্তির নির্ধারিত সময় ঘনিয়ে আসে, তার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা জলাঞ্জলি দিয়ে মৃত্যুর কাছে সে আত্মসমর্পণ করে। মৃত্যু যার দুয়ারে এসে যায়, তাকে কোনো কলাকৌশল আর বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। পূর্বের লোকই যখন গত হয়ে গেছে, তখন আর শেষের লোকটিকে কোন উপায়ে। মানুষ তার কবরের সাথী নিজের আমল ভিন্ন কাউকেই পাবে না।

হযরত ইবরাহীম আ.-এর সন্তান-সন্ততি

হযরত ইবরাহীম আ.-এর প্রথম সন্তান ইসমাঈল আ.। যিনি মিসরের কিবতী বংশীয় হাজেরার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এরপর ইবরাহীম আ.-এর স্ত্রী তাঁর চাচাত বোন সারাহর গর্ভের দ্বিতীয় পুত্র ইসহাক আ. জন্মগ্রহণ করেন। তারপর হযরত ইবরাহীম আ. কিনআনের কাতুরা বিনতে ইয়াকতানকে বিবাহ করেন। তাঁর গর্ভে ছয়টি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা হলেন (১) মাদইয়ান (২) যামরান (৩) সারাজ (৪) য়াকশান (৫) নাশুক (৬) অজ্ঞাতনামা পুত্র। এরপর হযরত ইবরাহীম আ. হাজুন বিনতে আমীনকে বিবাহ করেন। এই পক্ষে পাঁচটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন : (১) কায়সান (২) সুরাজ (৩) উমায়স (৪) লূতান (৫) লাফিস। আবুল কাসেম সুহায়লী তার "আত-তারীফ ওয়াল আলাম" গ্রন্থে এরূপই উল্লেখ করেছন।

হযরত ইবরাহীম আ.-এর ইনতেকাল

হযরত ইবরাহীম আ. বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর যখন বার্ধক্যে উপনীত হলেন, তখন তিনি আপন পুত্রগণকে আহ্বান করে বললেন : বৎসগণ! দয়াময় আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য ইসলামকে ধর্মরূপে পছন্দ করেছেন। সুতরাং তোমরা মহান আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করার পূর্বে মৃত্যুবরণ কর না।

আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে বিপদ-আপদ দিয়ে তাঁর আনুগত্যের দিকে আকর্ষণ করেন। ধৈর্যহারা হলে মানুষ আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করতে সক্ষম হয় না। অতএব তোমরা বিপদে ধৈর্য রক্ষা করবে এবং কল্যাণ ও মঙ্গলে আল্লাহ্ তাআলার শোকরগুযারী করবে। অনন্তর একদিন হযরত আযরাঈল আ. হযরত ইবরাহীম আ.-এর নিকট আগমন করলেন।

হযরত ইবরাহীম আ. তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন : আযরাঈল, তুমি কি আমার প্রাণ বের করে নিতে এসেছ? হযরত আযরাঈল আ. বললেন : হ্যাঁ! ইবরাহীম আ. বললেন, তুমি আমার রবকে জিজ্ঞাসা কর, "কেউ কি কখনো প্রাণপ্রিয় বন্ধুর প্রাণ হরণ করে? তিনি যে আমার প্রাণ হরণের নির্দেশ দিয়েছেন!" তৎক্ষণাৎ আযরাঈল আ.-এর প্রতি আদেশ হল, তুমি আমার বন্ধুকে জিজ্ঞেস কর, সে কি কখনো এরূপ শুনেছ, কোনো বন্ধু বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করতে চাইলে বন্ধু তাতে অসম্মত হয়?

এ কথা শুনে হযরত ইবরাহীমের মধ্যে এক অপূর্ব অবস্থার উদয় হল। তিনি আযরাঈল আ.-কে বললেন, শিগগির তোমার কর্তব্য পালন কর! আমি আমার রবের কাছে আত্মসমর্পণ করলাম। আযরাঈল আ. হযরত ইবরাহীম আ.-এর প্রাণবায়ু বের করে নিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল এক'শ পঁচিশ বছর। তাঁর লাশ মোবারক জেরুযালেমে (বাইতুল মুকাদ্দাসে) সমাহিত করা হয়।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর হিজরতের পথ

হজ্জের পবিত্র স্থানসমূহের চিত্র

বাবে উমরা
বাবে ইবরাহীম
বাবে বিদা
বাবে সালাম
বাবে নবী (স)
হাতিম
খানায়ে কা'বা
কাবার দরজা
মুলতাজিম
হাজরে আসওয়াদ
রোকনে ইয়ামানী
রোকনে শামী
মাকামে ইবরাহীম
জমজম
মাতাফ
মিলিনে আখদারিন
সাফা
মারওয়া
বাবে সাফা
সাফা মারওয়া সায়ির পথ
পশ্চিম
উত্তর
দক্ষিণ
পূর্ব

কা'বা শরীফের নক্‌সা
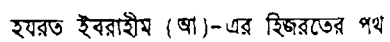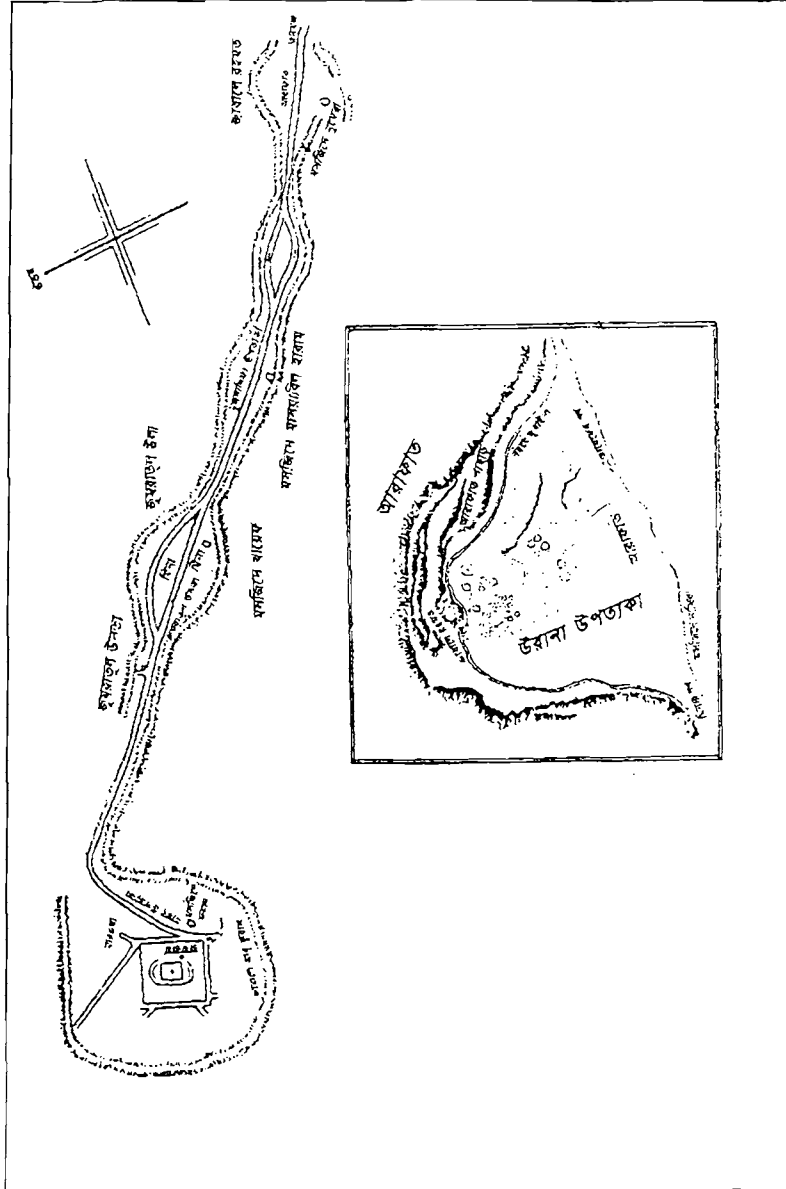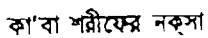
হযরত লূত আ.

হযরত লূত আ.-এর বংশধারা

হযরত লূত আ. ইবরাহীম আ.-এর ভ্রাতুষ্পুত্র। তাঁর পিতার নাম হারান। হযরত লূত আ. শৈশবে হযরত ইবরাহীম আ.-এর তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হন। এ কারণে তিনি ও হযরত সারাহ ইবরাহীম আ.-এর ধর্মের প্রথম দিককার মুসলমান। 'আস-সাবিকুনাল আউওয়ালিন–প্রথম শ্রেণীভুক্ত। কোরআন মাজিদে উল্লেখ রয়েছে :

فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي

"এরপর লূত ঈমান আনল ইবরাহীমের (মিল্লাতে ইবরাহীমীর) ওপর এবং বলল, আমি আমার রবের দিকে হিজরতকারী।"

[হিজরত দুই প্রকার। ১. স্থানগত ২. আন্তরিক। এখানে দুনো হিজরতই উদ্দেশ্য। আল্লাহ তাআলার দীনের হেফাযতের জন্য হযরত ইবরাহীম আ.-এর সঙ্গে এক জায়গা হতে অন্য জায়গা স্থানান্তরিত হওয়া স্থানগত হিজরত। বাসস্থান পরিবর্তন করা। পূর্বপুরুষের পৌত্তলিক ধর্ম পরিত্যাগপূর্বক হানীফী ধর্ম অবলম্বন করা আত্মিক হিজরত।]

হযরত লূত আ. ও তাঁর স্ত্রী হযরত ইবরাহীম আ.-এর সকল হিজরতে সর্বদা তাঁর সাথে ছিলেন। হযরত ইবরাহীম আ. যখন মিসরে ছিলেন, তখনও এঁরা তাঁর সাথে ছিলেন।

তাওরাতে উল্লেখ রয়েছে, মিসরে যেহেতু তাঁদের উভয়ের নিকটে যথেষ্ট পরিমাণে সাজসরঞ্জাম ছিল এবং গৃহপালিত পশুর বড় বড় পাল ছিল, তাই তাঁদের রাখাল ও রক্ষীদের মধ্যে বিশেষ মানসিকতা কাজ করত। হযরত ইবরাহীম আ.-এর রাখালরা চাইত, আমাদের পশুপাল এই চারণভূমি হতে আগে উপকৃত হোক। আর লূত আ.-এর রাখালদের ইচ্ছা হত, তাদের দাবী অগ্রগণ্য মনে করা হোক। হযরত ইবরাহীম আ. এই অবস্থা বুঝতে পেরে হযরত লূত আ.-এর সাথে পরামর্শ করে উভয়ে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন, পারস্পরিক সম্পর্ক, সদ্ভাব, মহব্বত ও সম্প্রীতি অটুট রাখার জন্য সমীচীন হবে, হযরত লূত আ.- মিসর থেকে হিজরত করে ওর্দুনের পূর্বাঞ্চলে সাদুম ও আমরায় চলে যাওয়া এবং সেখানে হানিফী ধর্মের ও হযরত ইবরাহীম আ.-এর পয়গম্বরীর সত্যতা প্রচার করতে থাকা। এদিকে হযরত ইবরাহীম আ. পুনরায় ফিলিস্তিনে ফিরে যান। সেখানে তিনি মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করতে থাকেন।

সাদুম ও মৃত সাগর

ওর্দুনের [জর্দানের] যে অঞ্চলে বর্তমানে বাহরে মাইয়্যেত [মৃত সাগর] বা বাহরে লূত অবস্থিত, এখানেই সাদুম ও আমুরা গোত্রদ্বয়ের বস্তিগুলো বিদ্যমান ছিল। এর নিকটবর্তী এলাকার বাসিন্দাগণের বিশ্বাস হল, বর্তমানে সমুদ্ররূপে পরিদৃষ্ট এই সম্পূর্ণ অঞ্চলটি কোনো এককালে শুষ্কভূমি ছিল এবং সেখানে শহর বিদ্যমান ছিল। সামুদ এবং আমুরা

সম্প্রদায়গুলোর বসতি ছিল, এই স্থানেই প্রথম হতেই এটা সমুদ্র ছিল না। বরং যখন লূত সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহর আযাব আসল এবং সেই ভূ-খণ্ডকে উল্টিয়ে দেওয়া হল এবং ভীষণ ভূমিকম্প আসল, তখন এই ভূখণ্ড চারশ মিটার সমুদ্রের নিচে চলে যায় এবং পানি উপরে উথলিয়ে উঠে, তখন থেকে তা সমুদ্ররূপ ধারণ করে। এজন্য এর নাম মৃত সাগর ও বাহরে লূত হয়েছে। এই বিশ্বাস ঠিক হোক বা ভুল হোক, সর্বাবস্থায় সত্য কথা হল, এই মৃত সাগরের তীরেই সেই ঘটনাটি ঘটেছিল, যা "লূত সম্প্রদায়ের আযাব" নামে অভিহিত। দীর্ঘ দুই বছরের ভূতত্ত্বানুসন্ধান মৃত সাগরের তীরে লূত সম্প্রদায়ের বস্তিসমূহের কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করে এই জ্ঞান ও বিশ্বাসের সম্মুখে আত্মসমর্পণ করেছেন।

লূত আ.-এর জাতি

লূত আ. সাদুম এলাকায় এসে বসবাস আরম্ভ করল। তারা দেখতে পেল, এখানকার অধিবাসীরা অশ্লীল ও নাফরমানিমূলক কাজে এমনভাবে লিপ্ত যার থেকে সর্বরক্ষক আল্লাহ্ পাকের দরবারে আশ্রয় কামনা করি। দুনিয়ার এমন কোনো মন্দ কার্য নেই, যা তাদের মধ্যে ছিল না এবং এমন কোনো ভালো কাজ নেই, যা তাদের মধ্যে পাওয়া যেত। দুনিয়ার সকল অবাধ্য, নাফরমান, হীনস্বভাব ও মন্দচরিত্র জাতিগুলোর সমস্ত দোষ এবং অশ্লীল কার্যকলাপ ছাড়াও এ জাতি একটি কলুষিত কাজের আবিষ্কার করেছিল। নিজেদের কামরিপু চরিতার্থ করার জন্য তারা এমনি কুকর্মের উদ্ভাবন করেছিল, তখন পর্যন্ত যার প্রচলন কোথাও কোনো জাতির মধ্যে ছিল না। এ হতভাগ্য জাতির সেই কুকর্মটি লাওয়াতাত নামে খ্যাত। অধিকন্তু তারা নিজেদের এই নির্লজ্জ কুকর্মকে কোনো দোষ মনে করত না বরং প্রকাশ্যভাবে গর্বের সাথে এটা করত। কুরআন পাকে আছে :

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (٨٠) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (٨١) وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (٨٠) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (٨١)

আবদুল ওয়াহহাব নাজ্জার বলেন, আমি হিব্রু ভাষার একটি সাহিত্য পুস্তকে তাদের কতিপয় অপকর্মের অবস্থা পাঠ করেছি। তার সারমর্ম হল, সাদুমবাসীদের অভ্যাস ছিল, বহিরাগত ব্যবসায়ী ও বণিকদের পণ্যদ্রব্যকে এক নতুন ও অভিনব পদ্ধতিতে লুণ্ঠন করে নিত। তাদের পদ্ধতি ছিল, বিদেশ হতে কোনো বণিক সাদুমে এসে অবতরণ করলে, তারা মাল দেখার বাহানায় প্রত্যেক ব্যক্তি অল্প অল্প পরিমাণ হাতে উঠিয়ে নিত এবং ঘরে চলে যেত। নিরীহ বণিক বেচারা অস্থির ও পেরেশান হয়ে বসে থাকত। এরপর সে যদি তার পণ্যদ্রব্য খোয়া যাওয়ার অভিযোগ করত এবং কান্নাকাটি আরম্ভ

করত, তবে সেই লুণ্ঠনকারীদের মধ্যে দু'-এক জন এসে লুণ্ঠনকৃত দু'-একটি বস্তু দেখিয়ে বলত, ভাই! আমি তো মাত্র এটা নিয়েছিলাম। নাও, এই তোমার মাল। সে ব্যক্তি ভারাক্রান্ত মনে বলত, আমি এটা নিয়ে কি করব? যেখানে আমার সমুদয় মালই লুণ্ঠন হয়েছে, সেখানে এটাও যাক। যাও, এটা তুমিই নিয়ে যাও। এরপর অন্য একজন এসে মামুলি কোনো বস্তু দেখিয়ে তেমনি কথা বলত, যেকথা পূর্বোক্ত ব্যক্তি বলেছে। আর বণিক ব্যক্তিও নেহাৎ ভারাক্রান্ত হয়ে ক্রোধে তাকেও তা-ই বলে দিত। এরূপে বেচারার সম্পূর্ণ মালই লুট করে নিত এবং সওদাগরকে নিঃস্ব করে ভাগিয়ে দিত।

কিতাবটিতে একটি বিচিত্র কাহিনীও উদ্ধৃত আছে। একবার হযরত ইবরাহীম আ. ও হযরত সারাহ এর বাঁদীর পুত্র ইয়ারাযকে সাদুমে পাঠালেন। তিনি যখন বস্তির নিকটে পৌঁছলেন, তখন তাঁকে বিদেশী মনে করে জনৈক সাদুমী তাঁর মাথায় এক খণ্ড প্রস্তর ছুড়ে মারল। ইয়ারাযের মাথা থেকে রক্ত ছুটল। তখন সাদুমী ব্যক্তি অগ্রসর হয়ে বলল : আমার প্রস্তরাঘাতে এই যে তোমার মস্তক লালবর্ণ ধারণ করেছে, কাজেই আমাকে তুমি এর বিনিময় দাও। তার এই দাবির জন্য টেনে তাঁকে সাদুমের আদালতে নিয়ে যায়। সাদুমের বিচারক বাদীর জবানবন্দী শুনে বলল, নিশ্চয়ই ইয়ারায সাদুমীকে তার পাথর মারার পারিশ্রমিক দিতে হবে। এটা শুনে ইয়ারায রাগান্বিত হলেন এবং এক খণ্ড পাথর নিয়ে সজোরে বিচারকের মাথায় ছুড়ে মারলেন। এরপর বললেন, এই পাথর মারার জন্য আমি তোমার নিকট পারিশ্রমিক পাওনা হলাম, তা তুমি এই সাদুমীকে দিয়ে দাও। এতটুকু বলেই তিনি সেখান থেকে চলে আসেন।

এ ঘটনা সত্য হোক বা মিথ্যা, এতে প্রতীয়মান হয়, সাদুমবাসীরা ইত্যাকার জুলুম-অন্যায়, অশ্লীল কাজ, নির্লজ্জতা, অসৎচরিত্র এবং নানা প্রকার জঘন্য কাজে লিপ্ত ছিল। তাই সেকালের লোকেরা এ জাতীয় ঘটনাকে তাদের দিকেই সম্বন্ধ করত। হযরত ইবরাহীম আ.-এর জীবদ্দশায় যে-সব বড় বড় ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, তন্মধ্যে লূত আ.-এর সম্প্রদায়ের ঘটনা ও তাদের উপর আল্লাহর আযাবের ঘটনা অন্যতম। ঘটনাটি নিম্নরূপ :

হযরত লূত আ. ছিলেন হারান ইবনে তারেখ এর পুত্র। এই তারেখকেই আযরও বলা হত। যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত লূত আ. ছিলেন হযরত ইবরাহীম আ.-এর ভাতিজা। ইবরাহীম আ. ছিলেন তিন ভাই। তাঁর দুই ভাইয়ের নাম হারান ও নাজুর। হারানের বংশধরকে বনু হারান বলা হয়। কিন্তু আহলে কিতাবদের ইতিহাস এ মতকে সমর্থন করে না। হযরত লূত আ. চাচা ইবরাহীম খলীল আ.-এর নির্দেশক্রমে গওর যাগার অঞ্চলে সাদুম শহরে চলে যান। এটা ছিল ওই অঞ্চলের প্রাণকেন্দ্র। অনেক গ্রাম, মহল্লা ও ক্ষেত-খামার এবং ব্যবসাকেন্দ্র এ শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত ছিল। এখানকার অধিবাসীরা ছিল দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট, পাপাসক্ত, দুশ্চরিত্র, সঙ্কীর্ণমনা ও জঘন্য কাফের। তারা দস্যুবৃত্তি করত। প্রকাশ্যে অশ্লীল ও বেহায়াপনা কাজ করত। কোনো পাপ থেকেই তারা বিরত থাকত না। অতি নিকৃষ্ট ছিল তাদের

কাজ-কারবার। তারা এমন একটি অশ্লীল কাজের জন্ম দেয়, যা ইতোপূর্বে কোনো আদম সন্তান করে নি। তারা নারীদেরকে ত্যাগ করে সমকামিতায় লিপ্ত হতো। হযরত লূত আ. তাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান জানান এবং এ সব ঘৃণিত অভ্যাস, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা ত্যাগ করতে বলেন। কিন্তু তারা তাদের ভ্রান্তি, বিদ্রোহ, পাপ ও কুফরের প্রতি অবিচল থাকে। ফলে আল্লাহ তাদের উপর এমন কঠিন আযাব নাযিল করলেন, যা ফেরানোর সাধ্য কারোরই থাকে না। এ শাস্তি ছিল তাদের ধারণা ও কল্পনাতীত। আল্লাহ তাদেরকে সমূলে বিনাশ করে দিলেন। বিবেকবানদের জন্যে এটা শিক্ষনীয় উপাখ্যান হয়ে থাকল। এ কারণেই আল্লাহ তাঁর মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এ ঘটনার উল্লেখ করেছেন।

হযরত লূত আ. সম্পর্কে আল-কোরআন

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (٨٠) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (٨١) وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ (٨٢) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (٨٣) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ

১. এবং লূতকে পাঠিয়েছিলাম। সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা এমন কুকর্ম করছ, যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেউ করে নি; তোমরা তো কামতৃপ্তির জন্যে নারীদের ছেড়ে পুরুষের কাছে গমন কর। নিশ্চয় তোমরা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।' উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু বলল, 'এদেরকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও। এরা তো এমন লোক, যারা অতি পবিত্র হতে চায়।' তারপর তাকে ও তার স্ত্রী ব্যতীত তার পরিজনদেরকে উদ্ধার করেছিলাম। তার স্ত্রী ছিল পিছেনে থেকে যাওয়া লোকদের অন্ত র্ভুক্ত। তাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম। সুতরাং অপরাধীদের পরিণাম কি হয়েছিল তা লক্ষ কর! (সূরা আরাফ : ৮০-৮৪)

সূরা হূদে আল্লাহ বলেন :

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ (٦٩) فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ (٧٠) وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ (٧١) قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ (٧٢) قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (٧٣) فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ (٧٤) إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ

(৭৫) يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ (٧٦) وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ (٧٧) وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ (٧٨) قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ (٧٩) قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ (٨٠) قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ (٨١) فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ (٨٢) مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ (٨٣).

২. আর অবশ্যই আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ সুসংবাদসহ ইবরাহীম আ.-এর নিকট আসল। তারা বলল, 'সালাম'। সেও বলল, 'সালাম'। সে অবিলম্বে এক ভুনা করা বাছুর আনল। সে যখন দেখল, তাদের হাত সেটির দিকে প্রসারিত হচ্ছে না, তখন তাদেরকে অবাঞ্ছিত মনে করল এবং তাদের সম্বন্ধে তার মনে ভীতি সঞ্চার হল। তারা বলল,'ভয় করো না, আমরা লূতের জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছি। তখন তার স্ত্রী দাঁড়িয়েছিল এবং সে হাসল। তারপর আমি তাকে ইসহাকের ও ইসহাকের পরবর্তী ইয়াকুবের সুসংবাদ দিলাম। সে বলল, 'কি আশ্চর্য! সন্তানের মা হব আমি যখন বৃদ্ধা এবং এই আমার স্বামী বৃদ্ধ! এটা অবশ্যই এক অদ্ভুত ব্যাপার। তারা বলল, 'আল্লাহর কাজে তুমি বিস্ময় বোধ করছ? হে পরিবারবর্গ! তোমাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহর অনুগ্রহ ও কল্যাণ। তিনি নিশ্চয় প্রশংসিত ও মহিমাময়।

তারপর যখন ইবরাহীম আ.-এর ভীতি দূরীভূত হল এবং তার নিকট সুসংবাদ আসল, তখন সে লূতের সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে আমার সাথে বাদানুবাদ করতে লাগল। ইবরাহীম আ. তো অবশ্যই সহনশীল। কোমল-হৃদয়, সতত আল্লাহ অভিমুখী। হে ইবরাহীম! এ থেকে বিরত হও। তোমার প্রতিপালকের বিধান এসে পড়েছে। ওদের প্রতি তো আসবে শাস্তি, যা অনিবার্য এবং যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ লূতের নিকট আসল, তখন তাদের আগমনে সে বিষণ্ণ হল এবং নিজেকে তাদের রক্ষায় অসমর্থ মনে করল এবং বলল, 'এটি নিদারুণ দিন' তার সম্প্রদায় তার নিকট উদভ্রান্ত হয়ে ছুটে আসল এবং পূর্ব থেকে তারা কুকর্মে লিপ্ত ছিল।

সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! এরা আমার কন্যা, তোমাদের জন্যে এরা পবিত্র। সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার মেহমানদের প্রতি অন্যায় আচরণ করে আমাকে হেয় কর না। তোমাদের মধ্যে কি কোনো ভালো মানুষ নেই? তারা বলল, 'তুমি তো

জান, তোমার কন্যাদেরকে আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই, আমরা কি চাই তা তুমি জানই।' সে বলল, তোমাদের উপর যদি আমার শক্তি থাকত অথবা যদি আমি পারতাম কোনো শক্তিশালী আশ্রয়! তারা বলল, হে লূত! আমরা তোমার প্রতিপালক প্রেরিত ফেরেশতা। ওরা কখনই তোমার নিকট পৌঁছতে পারবে না। সুতরাং তুমি রাতের কোনো একসময়ে তোমার পরিবারবর্গসহ বের হয়ে পড় এবং তোমাদের মধ্যে কেউ পেছন দিকে তাকাবে না, তোমার স্ত্রী ব্যতীত। ওদের যা ঘটবে তারও তাই ঘটবে। প্রভাত ওদের জন্যে নির্ধারিতকাল। প্রভাত কি নিকটবর্তী নয়? তারপর যখন আমার আদেশ আসল, তখন আমি জনপদকে উল্টিয়ে দিলাম এবং তাদের উপর ক্রমাগত বর্ষণ করলাম পাথর-কঙ্কর, যা তোমার প্রতিপালকের কাছে চিহ্নিত ছিল। এটি জালিমদের থেকে দূরে নয়। (সূরা হূদ : ৬৯-৮৩)

সূরা হিজরে আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ (٥١) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ (٥٢) قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (٥٣) قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ (٥٤) قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ (٥٥) قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ (٥٦) قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ (٥٧) قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (٥٨) إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ (٥٩) إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ (٦٠) فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ (٦١) قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (٦٢) قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ (٦٣) وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (٦٤) فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ (٦٥) وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ (٦٦) وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ (٦٧) قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ (٦٨) وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ (٦٩) قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ (٧٠) قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ (٧١) لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ (٧٢) فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ (٧٣) فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ (٧٤) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ (٧٥) وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ (٧٦) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ (٧٧)

৩. এবং ওদেরকে বল, ইবরাহীমের অতিথিদের কথা। যখন ওরা তার কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, 'সালাম'। তখন সে বলেছিল, 'আমরা তোমাদের আগমনে আতঙ্কিত।' ওরা বলল, 'ভয় করো না,! আমরা তোমাকে এক জ্ঞানী পুত্রের শুভ সংবাদ দিচ্ছি।' সে বলল, তোমরা কি আমাকে শুভ সংবাদ দিচ্ছ আমি বার্ধক্যগ্রস্ত হওয়া

সত্ত্বেও? ওরা বলল, 'আমরা সত্য সংবাদ দিচ্ছি। সুতরাং তুমি হতাশ হয়ো না।' সে বলল, যারা পথভ্রষ্ট তারা ব্যতীত আর কে তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ হতে হতাশ হয়? সে বলল, 'হে প্রেরিতগণ! তোমাদের আর বিশেষ কি কাজ আছে? ওরা বলল, 'আমাদেরকে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়েছে, তবে লূতের পরিবারবর্গের বিরুদ্ধে নয়; আমরা অবশ্যই ওদের সকলকে রক্ষা করব। কিন্তু তার স্ত্রীকে নয়। আমরা স্থির করেছি যে, 'সে অবশ্যই পিছনে রয়ে যাওয়া লোকদের অন্ত র্ভুক্ত।

ফেরেশতাগণ যখন লূত পরিবারের কাছে আসল, তখন লূত বলল : তোমরা তো অপরিচিত লোক। তারা বলল, 'না, বরং ওরা যে বিষয়ে সন্দিহান ছিল, আমরা তোমার নিকট তাই নিয়ে এসেছি। আমরা তোমার কাছে সত্য সংবাদ নিয়ে এসেছি এবং অবশ্যই আমরা সত্যবাদী। সুতরাং তুমি রাতের কোনো একসময়ে তোমার পরিবারবর্গসহ বের হয়ে পড় এবং তুমি তাদের পশ্চাদানুসরণ কর এবং তোমাদের মধ্যে কেউ যেন পেছন দিকে না তাকায়। তোমাদেরকে যেখানে যেতে বলা হচ্ছে তোমরা সেখানে চলে যাও। আমি তাকে এ বিষয়ে প্রত্যাদেশ দিলাম যে, প্রত্যুষে ওদেরকে সমূলে বিনাশ করা হবে।

নগরবাসী উল্লাসিত হয়ে উপস্থিত হল। সে বলল, 'ওরা আমার অতিথি! সুতরাং তোমরা আমাকে বে-ইজ্জত করো না। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও আমাকে হেয় কর না।' তারা বলল, 'আমরা কি দুনিয়াশুদ্ধ লোককে আশ্রয় দিতে তোমাকে নিষেধ করি নি? লূত বলল, একান্তই যদি তোমরা কিছু করতে চাও, তবে আমার এই কন্যাগণ রয়েছে। তোমার জীবনের শপথ! ওরা তো মত্ততায় বিমূঢ় হয়েছে। তারপর সূর্যোদয়ের সময় মহানাদ তাদের আঘাত করল এবং আমি জনপদকে উল্টিয়ে উপর-নিচ করে দিলাম এবং ওদের উপর প্রস্তর-কঙ্কর বর্ষণ করলাম। অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে পর্যবেক্ষণ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য। তা লোক চলাচলের পথের পাশে এখনও বিদ্যমান। অবশ্যই এতে মুমিনদের জন্যে রয়েছে নিদর্শন। (সূরা হিজর : ৫১-৭৭)

সূরা শুআরায় আল্লাহ বলেন :

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ (١٦٠) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ (١٦١) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٦٢) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٦٣) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٤) أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ (١٦٥) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ (١٦٦) قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ (١٦٧) قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ (١٦٨) رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ (١٦٩) فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (١٧٠) إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ (١٧١) ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ (١٧٢) وَأَمْطَرْنَا

عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ (١٧٣) إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (١٧٤) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (١٧٥)

৪. লূতের সম্প্রদায় রাসূলগণকে অস্বীকার করেছিল। যখন ওদের ভাই লূত ওদেরকে বলল, তোমরা কি সাবধান হবে না? আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি এর জন্যে তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না। আমার পুরস্কার তো জগতসমূহের প্রতিপালকের কাছেই আছে। সৃষ্টির মধ্যে তোমার তো কেবল পুরুষের সাথেই উপগত হও এবং তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্যে যে স্ত্রীলোক সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকে তোমরা বর্জন করে থাক। বরং তোমরা তো সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়। ওরা বলল, 'হে লূত! তুমি যদি নিবৃত্ত না হও, তবে অবশ্যই তুমি নির্বাসিত হবে।'

লূত বলল, 'আমি তোমাদের এ কাজকে ঘৃণা করি।' হে আমার প্রতিপালক! 'আমাকে এবং আমার পরিবার-পরিজনকে ওরা যা করে, তা থেকে রক্ষা কর।' এরপর আমি তাকে এবং তার পরিবার-পরিজন সকলকে রক্ষা করলাম এক বৃদ্ধা ব্যতীত– যে ছিল পিছনে রয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত। তারপর অপর সকলকে ধ্বংস করলাম। তাদের উপর শাস্তিমূলক বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম। তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল। তাদের জন্যে এই বৃষ্টি ছিল কত নিকৃষ্ট! এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু ওদের অধিকাংশই মুমিন নয়। তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

(সূরা শুআরা : ১৬০-১৭৫)

সূরা নামলে আল্লাহ্ বলেন :

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (٥٤) أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (٥٥) فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ (٥٦) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ (٥٧) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ (٥٨)

৫. স্মরণ কর! লূতের কথা সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমরা জেনেশুনে কেন অশ্লীল কাজ করছ? অথচ তোমরা এর পরিণতি অবগত। তোমরা কি কাম-তৃপ্তির জন্যে নারীকে ছেড়ে পুরুষে উপগত হবে? তোমরা তো এক অজ্ঞ সম্প্রদায়। উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু বলল, লূত পরিবারকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও। এরা তো এমন লোক, যারা পবিত্র সাজতে চায়। তারপর তাকে ও তার পরিবারবর্গকে উদ্ধার করলাম, তার স্ত্রী ব্যতীত। তাকে করেছিলাম ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। তাদের উপর ভঙ্ককর বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম; যাদের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল, তাদের জন্য এই বর্ষণ ছিল কত মারাত্মক! (সূরা নামল : ৫৪-৫৮)

সূরা আনকাবূতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন :

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (٢٨) أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٢٩) قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ (٣٠) وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ (٣١) قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (٣٢) وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (٣٣) إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (٣٤) وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (٣٥)

৬. স্মরণ কর লূতের কথা, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল : 'তোমরা তো এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেউ করে নি। তোমরাই তো পুরুষে উপগত হচ্ছ! তোমরাই তো রাহাজানী করে থাক এবং তোমরাই তো নিজেদের মজলিসে প্রকাশ্যে ঘৃণ্য কাজ করে থাক।" উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু এই বলল, 'আমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি নিয়ে এসো যদি তুমি সত্যবাদী হও।' সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর।' যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ সুসংবাদসহ ইবরাহীম আ.-এর কাছে আসল, তারা বলেছিল : আমরা এই জনপদের অধিবাসীদেরকে ধ্বংস করব। এর অধিবাসীরা তো জালিম। ইবরাহীম আ. বলল, এই জনপদে তো লূত আ. রয়েছে। তারা বলল, 'সেখানে কারা আছে তা আমরা ভালো জানি। আমরা তো লূতকে ও তার পরিবার-পরিজনবর্গকে রক্ষা করবই, তবে তার স্ত্রী ব্যতীত। সে তো পিছনে রয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত।

এবং যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ লূতের কাছে আসল, তখন তাদের জন্যে সে বিষণ্ন হয়ে পড়ল এবং নিজকে রক্ষায় অসমর্থ মনে করল। তারা বলল : ভয় করো না, দুঃখও কর না। আমরা তোমাকে ও তোমার পরিজনবর্গকে রক্ষা করব, তোমার স্ত্রী ব্যতীত। সে তো পিছনে রয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত। আমরা এই জনপদবাসীদের উপর আকাশ থেকে শাস্তি নাযিল করব। কারণ, তারা পাপাচার করেছিল। আমি বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্যে এতে একটি স্পষ্ট নিদর্শন রেখেছি।

(সূরা আনকাবূত : ২৮-৩৫)

সূরা সাফফাতে (১৩৩-১৩৮) আল্লাহ্ বলেন :

وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (١٣٣) إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (١٣٤) إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ (١٣٥) ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ (١٣٦) وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ (١٣٧) وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (١٣٨)

৭. লূতও ছিল রাসূলগণের একজন। আমি তাকে ও তার পরিবারের সকলকে উদ্ধার করেছিলাম এক বৃদ্ধা ব্যতীত, সে ছিল পেছনে রয়ে যাওয়া লোকদের অন্তর্ভুক্ত। তারপর অবশিষ্টদেরকে আমি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করেছিলাম। তোমরা তো ওদের ধ্বংসাবশেষগুলো অতিক্রম করে থাক সকাল-সন্ধ্যায়। তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবে না?

সূরা যারিয়াতে (৩১-৩৭) হযরত ইবরাহীম আ.-এর মেহমান ও পুত্রের সুসংবাদের ঘটনা উল্লেখ করার পর আল্লাহ তাআলা বলেন :

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ (٣١) قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (٣٢) لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ (٣٣) مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ (٣٤) فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٣٥) فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٣٦) وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (٣٧)

৮. ইবরাহীম আ. বললেন, 'হে ফেরেশতাগণ! তোমাদের বিশেষ কাজ কী? ওরা বলল, 'আমাদেরকে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে, ওদের উপর নিক্ষেপ করার জন্যে মাটির শক্ত ঢিল, যা সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্যে চিহ্নিত, তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে। সেখানে যে-সব মুমিন ছিল আমি তাদেরকে উদ্ধার করেছিলাম এবং সেখানে একটি পরিবার ব্যতীত কোনো আত্মসমর্পণকারী আমি পাই নি, যারা কঠিন শাস্তিকে ভয় করে, আমি তাদের জন্যে তাতে একটি নিদর্শন রেখেছি। (সূরা যারিয়াত : ৩১-৩৭)

সূরা কামারে আল্লাহ তাআলা বলেন :

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ (٣٣) إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ (٣٤) نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ (٣٥) وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ (٣٦) وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ (٣٧) وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ (٣٨) فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ (٣٩) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ

৯. লূত সম্প্রদায় প্রত্যাখ্যান করেছিল সতর্ককারীদেরকে, আমি ওদের উপর পাঠিয়েছিলাম পাথরবাহী প্রচণ্ড ঝড়। কিন্তু লূত পরিবারের উপর নয়। তাদেরকে আমি উদ্ধার করেছিলাম রাতের শেষাংশে আমার বিশেষ অনুগ্রহ স্বরূপ; যারা কৃতজ্ঞ আমি তাদেরকে এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি। লূত ওদেরকে সতর্ক করেছিল আমার কঠোর শাস্তি সম্পর্কে; কিন্তু ওরা সতর্কবাণী সম্বন্ধে বিতণ্ডা শুরু করল। ওরা লূতের কাছ থেকে তার মেহমানদেরকে দাবি করল। তখন আমি ওদের দৃষ্টিশক্তি লোপ করে দিলাম এবং আমি বললাম, 'আস্বাদন কর আমার শাস্তি এবং সতর্কবাণীর পরিণাম। ভোরে বিরামহীন

শাস্তি তাদেরকে আঘাত করল এবং আমি বললাম, আস্বাদন কর আমার শাস্তি এবং পরিণাম। আমি কুরআন সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্যে। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি? (সূরা কামার : ৩৩-৪০)

তাফসীর গ্রন্থে এ সূরার যথাস্থানে এই ঘটনার বিশদ বিবরণ রয়েছে। আল্লাহ তাআলা এভাবেই হযরত লূত আ. ও তাঁর সম্প্রদায়ের ঘটনা কুরআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করেছেন। কওমে নূহ, কওমে আদ ও কওমে সামুদ-এর আলোচনায়ও সেসব উল্লেখ আছে। এখন আমরা তাদের কর্মনীতি ও পরিণতি সম্পর্কে কুরআন, হাদীস ও ইতিহাসে বর্ণিত বিষয়াবলী নিয়ে আলোচনা করব। আল্লাহই একমাত্র সাহায্যকারী।

প্রথম কথা হল, হযরত লূত আ. তাঁর সম্প্রদায়কে এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান জানান। সেসব অশ্লীল কাজ করতে নিষেধ করেন, যার উল্লেখ স্বয়ং আল্লাহ তাআলা করেছেন। কিন্তু একজন লোকও তার আহ্বানে সাড়া দেয় নি এবং তার উপর ঈমান আনে নি। নিষিদ্ধ কর্ম থেকে কেউ বিরত থাকে নি বরং তারা স্বঅবস্থায় অনড় থাকে। নিজেদের ভ্রষ্টতা ও মূর্খতা থেকে মোটেও বিরত হয় নি। এমনকি তার তাদের রাসূলকে তাদের সমাজ থেকে বহিষ্কার করার উদ্যোগ গ্রহণ করে।

তাদের রাসূল যখন তাদেরকে উপদেশ দেন, তখন তারা বিবেকহীনভাবে একই উত্তর দিতে থাকে– তোমার লূত পরিবারকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও। কেননা তারা এমন মানুষ, যারা পাক-পবিত্র সাজতে চায়। এ কথার মধ্য দিয়ে তারা লূত পরিবারের নিন্দা করতে গিয়ে নিজেদের চরম শত্রুতা ও ঘৃণা প্রকাশ করে। কিন্তু আল্লাহ হযরত লূত আ.-কে ও তাঁর পরিবারবর্গকে পবিত্র রাখলেন এবং সসম্মানে সেখান থেকে মুক্ত করে আনেন, তবে তার স্ত্রীকে নয়। আর তাঁর সম্প্রদায়ের সবাইকে আপন বাসভূমিতে চিরস্থায়ী করে দিলেন, দুর্গন্ধময় সমুদ্র তরঙ্গের আঘাতে লীন করে। যা ছিল প্রকৃতপক্ষে উত্তপ্ত আগুন ও তাপ প্রবাহ এবং তার পানি তিক্ত ও লবণাক্ত।

তারা নবীকে এরূপ উত্তর তখনই দিয়েছে, যখন তিনি তাদেরকে ইতোপূর্বে বিশ্বের কোনো লোক করে নি, এমনই জঘন্য পাপ ও চরম অশ্লীলতা থেকে নিবৃত্ত থাকতে বলেছেন। এ কারণেই তারা বিশ্ববাসীর জন্যে উদাহরণ ও শিক্ষাপ্রদ হয়ে রয়েছে। এ পাপকর্ম ছাড়াও তারা ছিনতাই, রাহাজানি করত। পথচারীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করত। প্রকাশ্য মজলিসে বিভিন্ন নির্লজ্জ কথা ও কাজে লিপ্ত হত। যেমন সশব্দে বায়ু ত্যাগ করা। এতে কোনো লজ্জা বোধ করত না। অনেক সময় বড় বড় জঘন্য কাজও করত। কোনো উপদেশদানকারীর উপদেশ ও জ্ঞানী লোকের পরামর্শের প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ করত না। এ জাতীয় কাজের মাধ্যমে তারা চতুষ্পদ জন্তুর মতো বরং তার চেয়েও নিকৃষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তারা তাদের বর্তমান কাজ থেকে বিরত থাকে নি, বিগত পাপ থেকে অনুশোচনা করে নি এবং ভবিষ্যতে আত্মসংশোধনের ইচ্ছাও করে নি। ফলে আল্লাহ তাদেরকে শক্ত হাতে পাকড়াও করলেন। তারা যখন হযরত লূত আ.-কে বলেছিল :

ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

"তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকলে আমাদের জন্যে আল্লাহর আযাব নিয়ে এস!"

অর্থাৎ নবী তাদের যে কঠিন আযাবের ভয় দেখাচ্ছিলেন, তারা সেই আযাব কামনা করছিল এবং ভয়াবহ শাস্তির আবেদন জানাচ্ছিল। তখন দয়ালু নবী নিরূপায় হয়ে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানান। তিনি বিশ্ব প্রভু ও রাসূলগণের ইলাহ-এর নিকট অনাচারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য কামনা করেন। ফলে নবীর মর্যাদাহানিতে আল্লাহর ক্রোধের উদ্রেক হয়। নবীর ক্রোধের জন্যে আল্লাহ ক্রোধান্বিত হন। অবশেষে নবীর দোয়া কবুল করেন এবং তাঁর প্রার্থিত বস্তু দান করেন। প্রেরণ করেন আপন দূত ও ফেরেশতাগণকে। তারা আল্লাহর খলীল ইবরাহীম আ.-এর কাছে আগমন করেন। তাকে এক জ্ঞানী পুত্রের সুসংবাদ দেন এবং তারা যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নিয়ে এসেছেন, সে বিষয়টিও তাঁকে জানান।

ইবরাহীম আ. বলল, হে ফেরেশতাগণ! আপনাদের আগমনের উদ্দেশ্য কী? তারা বলল, আমরা এক অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। যাতে তাদের উপর শক্ত ঢিলা নিক্ষেপ করি, যা সীমালঙ্ঘনকারীদের শাস্তি দেওয়ার জন্যে, আপনার প্রতিপালকের কাছে চিহ্নিত রয়েছে। আল্লাহ বলেন :

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ (٧٤) إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ (٧٥) يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ (٧٦)

"যখন ইবরাহীম আ.-এর ভীতি দূর হল ও সুসংবাদ জানান হল, তখন সে লূতের প্রসঙ্গ নিয়ে আমার সাথে বিতর্ক করা আরম্ভ করল"। কেননা ইবরাহীম আ. আশা করেছিলেন যে, তারা খারাপ পথ পরিহাব করে ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। "নিশ্চয়ই ইবরাহীম আ. বড়ই ধৈর্যশীল, কোমলহৃদয় ও একনিষ্ঠ ইবাদতকারী। হে ইবরাহীম! এ জাতীয় কথাবার্তা থেকে বিরত থাক। তোমার পালনকর্তার নির্দেশ এসে গেছে এবং তাদের উপর সে আযাব অবশ্যই পতিত হবে।"

অর্থাৎ এ প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে অন্য প্রসঙ্গে কথা বল। কেননা, তাদের ধ্বংস ও নির্মূল করার আদেশ চূড়ান্ত হয়ে গেছে। তোমার পালনকর্তার নির্দেশ এসে গেছে। অর্থাৎ এ ব্যাপারে নির্দেশ হয়ে গেছে। তাঁর এ নির্দেশ ও শাস্তি ফেরানোর ও প্রতিহত করার সাধ্য কারও নেই। এ নির্দেশ অপ্রতিরোধ্যভাবে আসবেই। (সূরা হূদ : ৭৪-৭৫)

সাঈদ ইবনে জুবায়ের, সুদ্দী কাতাদা ও মুহাম্মদ ইবনে ইসহাস রহ. উল্লেখ করেছেন যে, হযরত ইবরাহীম আ. ফেরেশতাদেরকে বলেছিলেন : আপনারা কি এমন কোনো জনপদ ধ্বংস করবেন, যেখানে তিন শ মুমিন রয়েছে? তারা বললেন, না। তিনি বললেন, যদি দু শ থাকে? তারা বললেন, না। ইবরাহীম আ. বললেন, যদি চল্লিশ জন

মুমিন থাকে? তারা বললেন, না। তিনি বললেন, যদি চৌদ্দজন মুমিন থাকে? তারা বললেন, তবুও না।

ইবনে ইসহাক লিখেছেন : এমনকি ইবরাহীম আ. বলেছিলেন : যদি একজন মুমিন থাকে, তবে সেই জনপদ ধ্বংস করার ব্যাপারে আপনাদের অভিমত কি? জবাবে তারা বললেন, তবুও ধ্বংস করা হবে না। তখন তিনি বললেন, সেখানে তো লূত রয়েছে। তারা বলল, قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا সেখানে কে আছে, তা আমাদের ভালোভাবেই জানা আছে।

আহলে কিতাবদের বর্ণনায় এসেছে, ইবরাহীম আ. বলেছিলেন : হে আল্লাহ! লূত সম্প্রদায়ের মধ্যে পঞ্চাশজন সৎকর্মশীল লোক থাকলেও কি আপনি তাদেরকে ধ্বংস করবেন? এভাবে উভয়ের কথোপকথন দশজন পর্যন্ত নেমে আসে। আল্লাহ বলেন, তাদের মধ্যে দশজন সৎকর্মশীল লোক থাকলেও আমি তাদেরকে ধ্বংস করব না। আল্লাহর বাণী :

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ (٧٧)

আর যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ লূতের কাছে আগমন করল, ... ।"

(সূরা হূদ : ৭৭)

মুফাসসিরগণ বলেছেন, এই ফেরেশতাগণ ছিলেন জিবরাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফীল আ.। তাঁরা ইবরাহীম আ.-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসেন এবং সাদুম শহরে এসে উপস্থিত হন। লূত আ.-এর সম্প্রদায়ের পরীক্ষাস্বরূপ এবং তাদের শাস্তিযোগ্য হওয়ার চূড়ান্ত প্রমাণস্বরূপ তাঁরা সুদর্শন তরুণ বেশে হাযির হন। হযরত লূত আ. তাদের দেখে অতিথি মনে করেন। তখন ছিল সূর্য ডোবার সময়। হযরত লূত আ. তাদের দেখে ভীত হলেন। মনে মনে ভাবলেন, যদি তিনি আতিথ্য প্রদান না করেন, তবে অন্য কেউ তা করবে। তিনি তাদেরকে মানুষই ভাবলেন। দুশ্চিন্তা তাঁকে ঘিরে ধরল। তিনি বললেন, আজ একটা বড় কঠিন দিন।

ইবনে আব্বাস রাযি. সূত্রে মুজাহিদ, কাতাদা ও মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক রহ. হযরত লূত আ.-এর এ কঠিন পরীক্ষার বর্ণনা দিয়েছেন। হযরত লূত আ. অন্যান্য সময়ে তাঁর সম্প্রদায়কে নিজের মেহমানদের কাছে ঘেঁষতে নিষেধ করতেন। এ কারণে তারা লূত আ.-এর উপর শর্ত আরোপ করেছিল, তিনি যেন নিজের বাড়িতে কাউকে মেহমান হিসেবে না রাখেন। কিন্তু সেদিন তিনি এমন লোকদেরকেই মেহমানরূপে দেখতে পেলেন, যাদেরকে সরিয়ে দেওয়ার উপায়ও ছিল না।

কাতাদা রহ. বলেন, হযরত লুত আ. নিজের ক্ষেতে কাজ করছিলেন। এমন সময় মেহমানগণ তাঁর কাছে উপস্থিত হন এবং তাঁর বাড়িতে মেহমান হওয়ার আবেদন জানান। তিনি তা প্রত্যাখ্যান করতে লজ্জাবোধ করেন এবং সেখান থেকে তাঁদেরকে সাথে নিয়ে রওনা হন ও তাঁদের আগে আগে হাঁটতে থাকেন। তাঁদের সাথে তিনি এমন

ইঙ্গিতপূর্ণ কথা বলতে থাকেন, যাতে তাঁরা এ জনপদ ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যান। হযরত লূত আ. তাঁদেরকে বললেন, হে ভাইয়েরা! এ জনপদের লোকের চেয়ে নিকৃষ্ট ও দুশ্চরিত্র লোক ধরাপৃষ্ঠে আর আছে কি-না আমার জানা নেই। কিছুদূর অগ্রসহ হয়ে তিনি আবার এ কথা উল্লেখ করেন। এভাবে চারবার তাঁদেরকে কথাটি বলেন। কাতাদা রহ. বলেন : ফেরেশতাগণ এ ব্যাপারে আদিষ্ট ছিলেন, যতক্ষণ নবী তাঁর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য না দিবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা যেন তাদেরকে ধ্বংস না করেন।

সুদ্দী রহ. বলেন, ফেরেশতাগণ ইবরাহীম আ.-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে লূতের সম্প্রদায়ের উদ্দেশে রওনা হন। দুপুর বেলা তাঁরা সেখানে পৌঁছেন। সাদুম নদীর তীরে উপস্থিত হলে হযরত লূত আ.-এর এক মেয়ের সাথে তাঁদের দেখা হয়। বাড়িতে পানি নেওয়ার জন্যে সে এখানে এসেছিল। লূত আ.-এর ছিল দুই কন্যা। বড়জনের নাম রায়চা এবং ছোট জনের নাম যারাতা। মেয়েটিকে তাঁরা বললেন, এখানে মেহমান হওয়া যায় এমন কারও বাড়ি আছে কি? মেয়েটি বললেন, আপনারা এখানে অপেক্ষা করুন! আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত জনপদে প্রবেশ করবেন না। নিজের সম্প্রদায়ের ব্যাপারে মেয়েটির অন্তরে লোকগুলোর প্রতি করুণার উদ্রেক হয়। বাড়ি এসে মেয়েটি পিতাকে সম্বোধন করে বললেন : পিতা নগর তোরণে কয়েকজন তরুণ আপনার অপেক্ষায় আছেন। তাঁদের মতো সুদর্শন লোক আমি কখনও দেখি নি। আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদেরকে না লাঞ্ছিত করে! ইতঃপূর্বে সম্প্রদায়ের লোকজন হযরত লূত আ.-কে কোনো পুরুষ লোককে মেহমান রাখতে নিষেধ করে দিয়েছিল।

যা হোক! হযরত লূত আ. তাঁদেরকে নিজ বাড়িতে নিয়ে আসেন এবং নিজের পরিবারবর্গের লোকজন ছাড়া আর কেউ বিষয়টি জানতে পারে নি। কিন্তু লূতের স্ত্রী বাড়ি থেকে বের হয়ে জনপদের লোকদের কাছে খবরটি পৌঁছিয়ে দেয়। সে জানিয়ে দেয়, লুতের বাড়িতে এমন কতিপয় সুশ্রী তরুণ এসেছে, যাদের মতো সুন্দর-সুঠাম লোক আর হয় না। তখন লোকজন খুশিতে লূত আ.-এর বাড়ির দিকে ছুটে আসে। আল্লাহর বাণী :

وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ

"ইতোপূর্বে তারা বিভিন্ন রকম পাপকর্মে লিপ্ত ছিল।" অর্থাৎ বহু বড় বড় গুনাহর সাথে এ জঘন্য পাপ কাজও তারা করত।

قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ

লূত আ. বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! এই যে আমার কন্যারা আছে, যারা তোমাদের জন্যে পবিত্রতম।' এ কথা দ্বারা হযরত লূত আ. তাঁর ধর্মীয় ও দীনী কন্যাদের অর্থাৎ তাদের স্ত্রীদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কেননা নবীগণ তাদের উম্মতের জন্যে পিতৃতুল্য। আল্লাহ তাআলা বলেন :

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ

নবী মুমিনদের জন্যে তাদের নিজেদের চেয়েও ঘনিষ্ঠতর আর তাঁর স্ত্রীগণ মুমিনদের মা।

কোনো কোনো সাহাবা ও আলেমের মতে নবী মুমিনদের পিতা। তা ছাড়া তেমনি একটি আয়াতে আছে :

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ (١٦٥) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ (١٦٦)

"তোমরা বিশ্বের পুরুষদের কাছে গমন করছ। আর তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্যে যে স্ত্রীকুল সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকে পরিত্যাগ করছ! বরং তোমরা এক সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।"

মুজাহিদ, সাঈদ ইবনে জুবায়র, রাবী ইবনে আনাস, কাতাদা, সুদ্দী ও মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক রহ. আয়াতের অনুরূপ ব্যাখ্যাই করেছেন আর এ ব্যাখ্যাই সঠিক। দ্বিতীয় মতটি অর্থাৎ তাঁর নিজের কন্যাগণ হওয়া ভুল। এটা আহলে কিতাবদের গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। আর তাদের কিতাবে অনেক বিকৃতি ঘটেছে।

এ ছাড়া তাদের আরেকটি ভুল উক্তি হল, ফেরেশতারা সংখ্যায় ছিলেন দুজন এবং রাত্রে তাঁরা লূত আ.-এর বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করেন। তদুপরি আহলে কিতাবগণ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে অনেক অদ্ভুত মিথ্যা উপখ্যান উদ্ধৃত করেছে। আল্লাহর বাণী :

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ (٧٨)

'অতএব আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার মেহমানদের প্রতি অন্যায় আচরণ করে আমাকে হেয় কর না। তোমাদের মধ্যে কি কোনো ভালো মানুষ নেই?'

হযরত লূত আ. নিজ জাতিকে অশ্লীল কাজ থেকে বারণ করেছেন। তিনি এ সাক্ষ্যও দিচ্ছেন, তাদের সমাজের একজন লোকও সুস্থ রুচির বা ভালো স্বভাবের ছিল না বরং সমাজের সমস্ত লোকই ছিল নির্বোধ, জঘন্য পাপাসক্ত ও নিরেট কাফির। ফেরেশতাগণও চাচ্ছিলেন, সম্প্রদায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পূর্বেই নবীর কাছ থেকে তাদের সম্পর্কে তাঁরা কিছু শুনত। কিন্তু সম্প্রদায়ের অভিশপ্ত লোকেরা নবীর উত্তম কথার উত্তরে চরম ঘৃণ্য জবাবই দিল–

لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ

আপনি ভালো করেই জানেন, আপনার কন্যাদের দিয়ে আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। আপনি এও জানেন, আমরা কি চাচ্ছি।

তারা বলল : হে লূত! আপনি অবগত আছেন, স্ত্রীদের প্রতি আমাদের কোনো আকর্ষণ নেই। আমাদের উদ্দেশ্য কী, তা আপনি ভালো করেই জানেন। নবীকে উদ্দেশ্য করে তারা এরূপ ঘৃণিত ভাষা ব্যবহার করতে সেই আল্লাহকে একটুও ভয় পায় নি, যিনি কঠিন শাস্তিদাতা। এ কারণে হযরত লূত আ. তাদেরকে বলেছিলেন :

لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ

অর্থাৎ, হযরত লূত আ. কামনা করেছিলেন সম্প্রদায়কে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা যদি তাঁর থাকত অথবা তাঁকে সাহায্যকারী ধনবল বা জনবল যদি থাকত, তা হলে তাদের অন্যায় দাবির উপযুক্ত শাস্তি তিনি দিতে পারতেন।

ইমাম যুহরী রহ. আবু হোরায়রা রাযি.-এর সূত্রে মারফূরূপে হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : সন্দেহ প্রকাশের ব্যাপারে আমরা ইবরাহীম আ.-এর চাইতে বেশি হকদার। আল্লাহ লূত আ.-এর উপর রহম করুন। কেননা তিনি শক্তিশালী অবলম্বনের আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন। আমি যদি হযরত ইউসুফ আ.-এর মতো এমনই সু-দীর্ঘকাল জেলখানায় অবস্থান করতাম, তবে আমি অবশ্যই আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিতাম।

এ হাদীসখানা আবুয যিনাদ ভিন্ন সূত্রেও বর্ণনা করেছেন আর মুহাম্মদ ইবনে আমর রহ. আবু হোরায়রা রাযি.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, আল্লাহ লূত আ.-এর উপর রহমত বর্ষণ করুন। কেননা তিনি শক্তিশালী অবলম্বন অর্থাৎ আল্লাহর নিকট আশ্রয় কামনা করেছিলেন। এরপর থেকে আল্লাহ যত নবী প্রেরণ করেছেন, তাঁদেরকে নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে শক্তিশালী ও প্রভাবশালী করে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর বাণী :

وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ (٦٧) قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ (٦٨) وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ (٦٩) قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ (٧٠) قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ (٧١)

হযরত লূত আ. সম্প্রদায়ের লোকজনকে তাদের স্ত্রীদের কাছে যেতে আদেশ দেন এবং তাদের কু-অভ্যাসের উপর অবিচল থাকার মন্দ পরিণতির কথা জানিয়ে দেন, অচিরেই যা তাদের উপর পতিত হবে। কিন্তু কোনো কিছুতেই তারা নিবৃত্ত হল না বরং নবী যতই তাদের উপদেশ দেন, তারা ততই উত্তেজিত হয়ে মেহমানদের কাছে পৌঁছার চেষ্টা করে। কিন্তু রাতের শেষে তাকদীর তাদেরকে কোথায় পৌঁছিয়ে দিবে, তা তাদের আদৌ জানা ছিল না। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনের কসম করে বলেন :

لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ

তোমার জীবনের শপথ! ওরা তো মত্ততায় বিমূঢ় হয়েছে।

আল্লাহর বাণী :

وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ (٣٦) وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ (٣٧) وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ

"লূত আ. ওদেরকে আমার কঠোর শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করেছিল। কিন্তু ওরা সর্তকবাণী সম্বন্ধে বিতণ্ডা শুরু করল। তারা লূতের কাছ থেকে তার মেহমানদেরকে দাবি করল। তখন আমি ওদের দৃষ্টিশক্তি লোপ করে দিলাম এবং আমি বললাম,

আস্বাদন কর আমার শাস্তি ও সতর্কবাণীর পরিণাম। প্রত্যুষে বিরামহীন শাস্তি তাদেরকে আঘাত করল।"

আলেমগণ বলেন : হযরত লূত আ. তাঁর সম্প্রদায়কে তাঁর ঘরে প্রবেশ করতে নিষেধ করেন এবং তাদেরকে বাধা দেন। ঘরের দরজা বন্ধ ছিল। তারা তা খুলে ভিতরে প্রবেশ করতে উদ্যত হল। আর হযরত লূত আ. দরজার বাইরে থেকে তাদেরকে উপদেশ দিতে এবং ভিতরে যেতে বারণ করতে থাকেন। উভয় পক্ষের মধ্যে বাদানুবাদ চলতে থাকে। অবস্থা যখন চরমে গিয়ে পৌঁছাল এবং ঘটনা লূত আ.-এর নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার উপক্রম হল, তখন তিনি বললেন : তোমাদের প্রতিহত করার শক্তি যদি আমার থাকত অথবা কোনো শক্তিশালী অবলম্বনের আশ্রয় নিতে পারতাম, তবে তোমাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করতাম। এ সময় ফেরেশতাগণ বললেন,

يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ

"হে লূত! আমরা তোমার প্রতিপালক প্রেরিত ফেরেশতা। ওরা কখনই তোমার কাছে পৌঁছুতে পারবে না।"

মুফাসসিরগণ উল্লেখ করেন, জিবরাঈল আ. ঘর থেকে বেরিয়ে তাদের সম্মুখে আসেন এবং নিজ ডানার এক প্রান্ত দ্বারা হালকাভাবে তাদের চেহারায় আঘাত করেন। ফলে তাদের দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়ে যায়। কেউ কেউ বলেছেন, তাদের চোখ সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এমনকি চেহারায় চোখের কোনো চিহ্নই অবশিষ্ট থাকে নি। তারপর তারা দেয়াল হাতড়িয়ে কোনোমতে সেখান থেকে ফিরে গেল। সেইসঙ্গে আল্লাহর নবী লূত আ.-কে ধমক দিতে দিতে বলতে থাকে, কাল সকালে আমাদের ও তোমার মধ্যে বোঝাপড়া হবে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন :

وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ (٣٧)

وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ

"ওরা লূত আ.-এর কাছ থেকে তার মেহমানদেরকে দাবি করল। তখন আমি তাদের দৃষ্টিশক্তি লোপ করে দিলাম এবং আমি বললাম, এখন আমার শাস্তি ও সর্তকবাণীর পরিণাম আস্বাদন কর। প্রত্যুষে বিরামহীম শাস্তি তাদের উপর আঘাত হানল।"

ফেরেশতাগণ হযরত লূত আ.-এর কাছে দুটি প্রস্তাব পেশ করেন। (১) পরিবার-পরিজন নিয়ে রাতের শেষে রওনা হয়ে যাবেন। (২) কেউ পিছনের দিকে ফিরে তাকাবেন না। অর্থাৎ সম্প্রদায়ের উপর যখন আযাব পতিত হবে এবং আযাবের শব্দ শোনা যাবে, তখন কেউ যেন পশ্চাতে ফিরে না তাকায়। ফেরেশতাগণ আরও জানান, তিনি যেন সকলের পিছনে থেকে সবাইকে পরিচালনা করেন। কুরআনের إلا امرءتك –এই বাক্যাংশের দুটি অর্থ হতে পারে। যথা–

بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا

(১) যাওয়ার সময় তোমার স্ত্রীকে সাথে নিবে না। এ অবস্থায় اِمْرَأَةٌ এর উপর যবর দিয়ে পড়তে হবে এবং فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ থেকে সে ব্যতিক্রমভুক্ত হবে।

(২) যাওয়ার পথে দলের কেউ পিছনের দিকে তাকাবে না; কিন্তু কেবল তোমার স্ত্রীই এ নির্দেশ অমান্য করে পিছনের দিকে তাকাবে। ফলে সম্প্রদায়ের উপর যে আযাব অত্যাসন্ন, ওই আযাবে সে-ও গ্রেফতার হবে। এ অবস্থায় اِمْرَأَةٌ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ থেকে মুসতাসনা (ব্যতিক্রমভুক্ত) হবে। পেশ যুক্ত পাঠ (اِمْرَأَتُكَ) এ অর্থকে সমর্থন করে। কিন্তু প্রথম অর্থই অধিকতর স্পষ্ট।

সুহায়লী বলেন, লূত আ.-এর স্ত্রীর নাম ওয়ালিহা। আর নূহ আ.-এর স্ত্রীর নাম ওয়ালিগা। আগন্তুক ফেরেশতাগণ ওইসব বিদ্রোহী পাপিষ্ঠ, সীমালঙ্ঘনকারী নির্বোধ অভিশপ্ত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা হবে মর্মে সুসংবাদ শোনান লূত আ.-কে, যারা পরবর্তী যুগের লোকদের জন্যে দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। আল্লাহর বাণী :

إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ (٨١)

"তাদের প্রতিশ্রুত সময় প্রভাতকাল। আর প্রভাতকাল খুব নিকটে নয় কি?"

হযরত লূত আ. নিজ পরিবারবর্গ নিয়ে বের হয়ে আসেন। পরিবারবর্গ বলতে তাঁর দুটি মাত্র কন্যাই ছিল। সম্প্রদায়ের অন্য কোনো একটি লোকও তার সাথে আসে নি। কেউ কেউ বলেছেন, তার স্ত্রীও একই সাথে বের হয়েছিল। কিন্তু সঠিক খবর আল্লাহই ভালো জানেন। তাঁরা যখন সে এলাকা অতিক্রম করে চলে আসেন এবং সূর্য উদিত হয়, তখন আল্লাহর অলঙ্ঘনীয় নির্দেশ ও অপ্রতিরোধ্য আযাব তাদের উপর নেমে আসে। আহলে কিতাবদের মতে ফেরেশতাগণ হযরত লূত আ.-কে তথায় অবস্থিত একটি পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে বলেন। কিন্তু হযরত লূত আ.-এর নিকট তা অত্যন্ত দুঃসাধ্য বলে মনে হয়। তাই তিনি নিকটবর্তী কোনো গ্রামে চলে যাওয়ার প্রস্তাব করেন। ফেরেশতাগণ বললেন, তাই করুন। গ্রামে পৌঁছে সেখানে স্থিত হওয়া পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করব এবং তারপরই আমরা আযাব অবতীর্ণ করব। আহলে কিতাবগণ বলেন, সে মতে হযরত লূত আ. গওরযাগর নামক একটি ছোট গ্রামে চলে যান আর সূর্যোদয়ের সাথে সাথে তাঁর অবাধ্য জাতির উপর আল্লাহর আযাব নেমে আসে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ (٨٢) مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ (٨٣)

"তারপর যখন আমার আদেশ আসল, তখন আমি জনপদকে উল্টিয়ে দিলাম এবং ওদের উপর ক্রমাগত বর্ষণ করলাম পাথর-কঙ্কর, যা তোমার প্রতিপালকের কাছে চিহ্নিত ছিল। এটি জালিমদের থেকে দূরে নয়।"

contents

মুফাসসিরগণ বলেন, হযরত জিবরাঈল আ. আপন ডানার এক প্রান্ত দিয়ে লূত সম্প্রদায়ের আবাসভূমি গভীর নিচ থেকে উপড়ে দেন। মোট সাতটি নগরে তারা বসবাস করত। কারও মতে তাদের সংখ্যা চারশ' কারও মতে চার হাজার। সে এলাকার সমস্ত মানুষ, জীব-জন্তু, ঘরবাড়ি ও ধন-সম্পদ যা কিছু ছিল সব কিছুসহ উঠিয়ে নেওয়া হয়। উপরে আকশের সীমানা পর্যন্ত উত্তোলন করা হয়। আসমানের এত কাছে নিয়ে যাওয়া হয় যে, সেখানকার ফেরেশতাগণ মোরগের ডাক ও কুকুরের ঘেউ আওয়াজ পর্যন্ত শুনতে পান। তারপর সেখান থেকে উল্টিয়ে নিচে নিক্ষেপ করা হয়।

মুজাহিদ রহ. বলেন : সর্বপ্রথম যা নিচে এসে পতিত হয়, তা হল তাদের উঁচু অট্টালিকাসমূহ। وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ (তাদের উপর পাথর কঙ্কর বর্ষণ করলাম।) سِجِّيل ফাসী শব্দ, একে আরবিতে রূপান্তর করা হয়েছে। অর্থ, অত্যধিক শক্ত ও কঠিন। منضوض অর্থ, ক্রমাগত। অর্থাৎ আকাশ থেকে একের পর এক যা তাদের উপর আসতে থাকে। مُسَوَّمَةً অর্থ, চিহ্নিত। প্রতিটি পাথরের গায়ে সেই ব্যক্তির নাম লেখা ছিল, যার উপর তা পতিত হওয়ার জন্যে নির্ধারিত ছিল। আল্লাহ তাআলা বলেছেন : مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ (তোমার প্রতিপালকের নিকট চিহ্নিত যা সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্যে নির্ধারিত।) আল্লাহর বাণী :

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ

তাদের উপর শাস্তিমূলক বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম। যাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল, তাদের জন্যে এ বৃষ্টি কতই না নিকৃষ্ট।

আল্লাহর বাণী :

وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى (٥٣) فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى

উৎপাটিত আবাসভূমিকে উল্টিয়ে নিক্ষেপ করেছিলেন। তারপর তা আচ্ছন্ন করে ফেলল কী সর্বগ্রাসী শাস্তি!

অর্থাৎ আল্লাহ সেই জনপদের ভূখণ্ডকে উপরে তুলে নিচের অংশকে উপরে ও উপরের অংশকে নিচে করে উল্টিয়ে দেন। তারপর শক্ত পাথর-কঙ্কর বর্ষণ করেন অবিরামভাবে, যা তাদের সবাইকে ছেঁয়ে ফেলে। প্রতিটি পাথরের উপর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম লেখা ছিল। এ পাথরগুলো উক্ত জনপদে উপস্থিত সকলের উপর পতিত হয়। অনুরূপ যারা তখন সেখানে অনুপস্থিত ছিল অর্থাৎ মুসাফির, পথিক ও দূরে অবস্থনকারী সকলের উপরই তা পতিত হয়।

কথিত আছে, হযরত লূত আ.-এর স্ত্রী তার সম্প্রদায়ের লোকদের সাথে থেকে যায়। আরেক মতে সে তার স্বামী ও দুই কন্যার সাথে বেরিয়ে যায়। কিন্তু যখন সে আযাব ও শহর ধ্বংস হওয়ার শব্দ শুনতে পায়, তখন সে পিছনে সম্প্রদায়ের দিকে ফিরে তাকায় এবং আগে-পরের আল্লাহর সকল নির্দেশ অমান্য করে। 'হায়! আমার সম্প্রদায়' বলে সে বিলাপ করতে থাকে। তখন উপর থেকে একটি পাথর এসে তার মাথায় পড়ে এবং

তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলে। এভাবে সে নিজ সম্প্রদায়ের ভাগ্যের সাথে একীভূত হয়ে যায়। কারণ, সে ছিল তার সম্প্রদায়ের ধর্মে বিশ্বাসী; তাদের সংবাদ সরবরাহকারিণী। হযরত লূত আ.-এর বাড়িতে মেহমান আসলে সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে সে সংবাদ পৌঁছিয়ে দিত। আল্লাহ তাআলা বলেন :

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ

"আল্লাহ কাফেরদের জন্যে নূহ ও লূতের স্ত্রীকে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। ওরা ছিল আমার বান্দাগণের মধ্যে দুজন সৎকর্মপরায়ণ বান্দার অধীন। কিন্তু ওরা তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। ফলে নূহ ও লূত তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে কিছু মাত্র রক্ষা করতে পারল না। তাই ওদেরকে বলা হল, জাহান্নামে প্রবেশকারীদের সাথে তোমরাও ওতে প্রবেশ কর।"

অর্থাৎ তারা নবীদের সাথে দীনের ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল; নবীর দীন গ্রহণ করে নি। এখানে প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য কোনো অর্থকে নির্ধারণ করা হয় নি। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.-সহ অন্যান্য প্রবীণ ও পরবর্তীকালের ইমাম ও মুফাসসিরগণ এ কথাই বলেছেন। 'ইফকের' ঘটনায় কতিপয় ব্যক্তি হযরত আয়েশা রাযি. এর প্রতি অপবাদ দিলে আল্লাহ তাআলা আয়েশা রাযি.-এর পবিত্রতা ঘোষণা করে যে আয়াত নাযিল করেন, তাতে ওইসব মুমিন লোকদেরকে কঠোরভাবে সর্তক করেন। আল্লাহর বাণী :

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ (١٥) وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ (١٦)

"যখন তোমরা মুখে মুখে এ কথা ছড়াচ্ছিলে এবং এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করছিলে, যার কোনো জ্ঞান তোমাদের ছিল না আর তোমরা একে হালকা বিষয় মনে করছিলে– যদিও আল্লাহর কাছে এটা ছিল গুরুতর; তোমরা যখন এ কথা শুনলে, তখন কেন বললে না 'এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়'! আল্লাহ পবিত্র মহান। এ তো এক গুরুতর অপবাদ। (সূরা নূর : ১৫-১৬) অর্থাৎ হে আল্লাহ! আপনার নবীর স্ত্রী এ দোষে জড়িত হবে, এ থেকে আপনি পবিত্র।

আল্লাহর বাণী : وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ (আর এটা জালিমদের থেকে বেশি দূরে নয়) অর্থাৎ এ শাস্তি বেশি দূরে নয় সেসব লোকদের থেকে, যারা লূত আ.-এর সম্প্রদায়ের মতো কুকর্মে লিপ্ত হবে। এ কারণে কোনো কোনো আলেম বলেছেন, পুরুষের সাথে সমকামিতায় লিপ্ত ব্যক্তিকে 'রজম' বা পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা হবে, চাই সে বিবাহিত হোক কিংবা অবিবাহিত। ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল

রহ. প্রমুখ ইমাম এ মত পোষণ করেন। তাঁরা সেই হাদীস দ্বারাও দলীল প্রদান করেন, যা ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে মুসনাদে আহমদ ও সুনান গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে। তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : এমন কোনো লোক যদি তোমরা পাও, যে লূত আ.-এর সম্প্রদায়ের অনুরূপ পাপ কাজে লিপ্ত, তখন সংশ্লিষ্ট উভয় ব্যক্তিকেই হত্যা কর। ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, পুরুষের সাথে সমকামীকে পাহাড়ের উপর থেকে নিচে ফেলে দিয়ে তার উপর পাথর নিক্ষেপ করতে হবে, যেভাবে লূতের সম্প্রদায়ের সাথে করা হয়েছিল। তিনি দলীলরূপে নিম্নোক্ত আয়াত পেশ করেছেন :

وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ

(এটা জালিমদের থেকে বেশি দূরে নয়!)

আল্লাহ তাআলা লূত আ.-এর সম্প্রদায়ের গোটা এলাকাকে দুর্গন্ধময় সমুদ্রে পরিণত করেন। ওই সমুদ্রের পানি ও সমুদ্রের পার্শ্ববর্তী এলাকার মাটি ব্যবহারের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। এভাবে স্মরণীয় বিধ্বস্ত এলাকাটি পরবর্তীকালের সেসব মানুষের জন্যে শিক্ষণীয় ও উপদেশ বস্তুতে পরিণত হয়েছে, যারা আল্লাহর অবাধ্য হয়, রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে প্রবৃত্তির অনুসরণ করে ও আপন মনিবের নাফরমানী করে। এ ঘটনায় আরো প্রমাণ হয়, আল্লাহ তাঁর মুমিন বান্দাদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন এবং তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসেন। আল্লাহর বাণী :

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ (٧٣) فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ (٧٤) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ (٧٥) وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ (٧٦) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ

مُتَوَسِّمِينَ বলা হয় সেসব লোকদেরকে, যারা দূরদর্শী হয়ে থাকে। এখানে দূরদর্শিতার অর্থ হল, এ জনপদটি ও তার বাসিন্দারা আবাদ হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে আল্লাহ তা ধ্বংস ও বিধ্বস্ত করে দিলেন, এ বিষয়ে চিন্তা করা। তিরমিযি প্রভৃতি হাদীসগ্রন্থে মারফূরূপে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

«اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ»

মুমিনের দূরদর্শিতাকে তোমরা সমীহ করবে। কেননা সে আল্লাহপ্রদত্ত নূরের সাহায্যে দেখতে পায়।

একথা বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন : إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ (দূরদর্শী মুমিনদের জন্যে এতে নিদর্শন রয়েছে।) আল্লাহর বাণী : وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ (পথের পাশে তা এখনও বিদ্যমান) অর্থাৎ যাতায়াতের চালু পথে ওই জনপদের ধ্বংসাবশেষ এখনো বিদ্যমান রয়েছে। যেমন অপর আয়াতে বলা হয়েছে :

وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ (١٣٧) وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (١٣٨)

"তোমরা তো তাদের ধ্বংসাবশেষগুলো সকাল-সন্ধ্যায় অতিক্রম করে থাক। তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবে না?"

অপর আয়াতে আল্লাহ বলেন :

وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্যে আমি এতে একটি স্পষ্ট নিদর্শন রেখেছি।

আল্লাহর বাণী :

فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٣٥) فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٣٦) وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (٣٧)

অর্থাৎ লূত আ.-এর সম্প্রদায়ের জনপদটিকে আমি শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের জন্যে রেখে দিয়েছি সেসব লোকের জন্যে, যারা আখিরাতের আযাবকে ভয় করে। না দেখেই আল্লাহকে ভয় করে, মহান প্রতিপালকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার ব্যাপারে ভীত সন্ত্রস্ত থাকে, প্রবৃত্তি পরায়ণতা থেকে বিরত থাকে, আল্লাহর নিষিদ্ধ জিনিস থেকে দূরে থাকে, তাঁর নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকে এবং লূত আ.-এর সম্প্রদায়ের মতো হওয়ার ব্যাপারে অন্তরে ভয় রাখে। কেননা من تشبه بقوم فهو منهم অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোনো জাতির সাথে সাদৃশ্য রাখে, সে তাদের দলভুক্ত। সকল ব্যাপারে পূর্ণ সাদৃশ্য হতে হবে এমন কোনো কথা নেই বরং কোনো কোনো ব্যাপারে সাদৃশ্য থাকলেই হয়। যেমন কেউ কেউ বলেছেন : তোমরা যদি সম্পূর্ণরূপে কওমে লূত না হয়ে থাক, তবে কওমে লূত তোমাদের থেকে খুব বেশি ভিন্ন নয়। অতএব যে লোক জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ও আল্লাহভীরু, সে আল্লাহর যাবতীয় নির্দেশ মেনে চলবে এবং রাসূলের আদর্শকে অনুসরণ করবে; অবশ্যই সে হালাল স্ত্রী ও যুদ্ধবন্দী দাসী কেবল ভোগ করবে। শয়তানের পথে চলতে সে ভয় পাবে। অন্যথায় সে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হবে এবং নিম্নোক্ত আয়াতের আওতাভুক্ত হয়ে যাবে–

وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ

(জালিমদের থেকে তা বেশি দূরে নয়।)

উল্লেখ্য, উপরে উল্লিখিত আয়াতসমূহে হযরত লূত আ.-এর এ বাক্যগুলি রয়েছে :

هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ . هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ

"এই আমার কন্যাগণ বিদ্যমান রয়েছে, তারা তোমাদের জন্য পবিত্র।' "এই আমার কন্যাসমূহ বিদ্যমান রয়েছে, (তাদের প্রতি লক্ষ কর) যদি তোমাদের কিছু (কামরিপু চরিতার্থ) করতে হয়।"

অর্থাৎ হযরত লূত আ. কওমের কোলাহল এবং মেহমানদেরকে তাদের হাতে সোর্পদ করে দেওয়ার দাবিতে অপারগ হয়ে একথা বলেছেন, "তোমরা এ মেহমানদেরকে বিরক্ত কর না। যদি নফসের স্বাভাবিক কামনা পূর্ণ করতে চাও, তবে এই আমার কন্যাগণ বিদ্যমান রয়েছে; এরা তোমাদের জন্য পবিত্র।" –একথার অর্থ কি? একজন নিষ্পাপ ও মর্যাদাশালী মানুষ, তিনি আবার নিষ্পাপ কন্যাদেরকে এমন নির্লজ্জ অপবিত্র স্বভাব মানুষদের সম্মুখে পেশ করেছেন? এই প্রশ্নের জবাবে বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম কয়েকটি জবাব দিয়েছেন :

(ক) হযরত লূত আ. ছিলে একজন নবী আর প্রত্যেক নবীই নিজ নিজ সম্প্রদায়ের পিতা হয়ে থাকেন। কওম মুসলমান হয়ে তাঁর অনুসারী হোক কিংবা তাঁকে অবিশ্বাস করে তাঁর থেকে বিমুখ এবং তাঁর অবাধ্যই থাকুক, উভয় অবস্থায়ই তারা সকলে তাঁর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত। যদিও বিশ্বাসী অনুসরণকারীরা উম্মতে ইজাবত এবং অবিশ্বাসকারীরা উম্মতে দাওয়াত নামে অভিহিত হয়ে থাকে। এ কারণে সমস্ত উম্মতবৃন্দ আম্বিয়ায়ে কেরামের আওলাদ হয়ে থাকে। নবী ও রাসূল তাদের রূহানী আধ্যাত্মিক পিতা।

সূতরাং হযরত লূত আ.-এর উদ্দেশ্য ছিল, হতভাগার দল! তোমাদের ঘরে ঘরে এইতো আমার কন্যা তোমাদের জীবনসঙ্গিনী রয়েছে এবং তোমাদের জন্য হালাল। তবে তোমরা তাদেরকে ছেড়ে এই অভিশপ্ত কুকর্মে আসক্ত হচ্ছ কেন? এরূপ কর না। নাউযুবিল্লাহ, তাঁর উদ্দেশ্য এরূপ ছিল না, তিনি নিজের ঔরসজাত কন্যাদেরকে তাদের সম্মুখে পেশ করছেন!

(খ) তাওরাত এবং অন্যান্য রেওয়ায়ত দ্বারা জানা যায়, মাত্র তিনজন ফেরেশতাই হযরত ইবরাহীম আ.-কে ইসহাকের সুসংবাদ প্রদান করে লূত-সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার জন্য এসেছিল। সুতরাং মাত্র তিনজনের উদ্দেশ্যে পূর্ণ বস্তির সমস্ত লোক কামাতুর হয়ে দৌড়িয়ে আসা, যাদের সংখ্যা ছিল হাজার হাজার– এটা অসম্ভব কথা বরং আসল কথা হল, সেই কওমের দুজন সর্দার ছিল। তারা দুজনেই লূত আ.-এর মেহমানদের তলব করেছিল। কওমের অবশিষ্ট লোকেরা নিজেদের সর্দারদের এই অশ্লীল কাজের সাহায্যার্থে এসে সমবেত হয়েছিল। আর যেহেতু হযরত লূত আ.-এর দুটি কন্যা ছিল অবিবাহিতা, তাই তিনি উক্ত দুই সর্দারদেরকে বুঝালেন, তোমরা তোমাদের এই অপবিত্র ও মন্দ দাবি হতে বিরত হও এবং আমি আমার কন্যা দুটিকে তোমাদের বিবাহ বন্ধনে দান করতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু তারা পরিস্কার অস্বীকার করল এবং বলল, লূত! তুমি জান যে, নারীদের প্রতি আমাদের আগ্রহ নাই।

(গ) হযরত লূত আ. নিঃসন্দেহে এই বাক্যটি নিজের কন্যাদের সম্বন্ধেই বলেছিলেন; কিন্তু এটা সেই বুযুর্গের কথার মতো ছিল, যিনি কোনো উৎপীড়িত ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে উৎপীড়িত হতে দেখে উৎপীড়নকারীকে বললেন : একে মের না! এর পরিবর্তে আমাকে মার। অথচ তিনি খুব ভালো করেই জানেন, সে কখনো এমন দুঃসাহস করবে না।

কেননা সে তার চেয়ে কনিষ্ঠ কিংবা তাঁর অধীনস্থ। অতএব যেমনি ওই বুযুর্গের উদ্দেশ্য ছিল, জালিম উৎপীড়নকারীকে লজ্জা দেওয়া, তেমনিভাবে হযরত লূত আ.-ও তাদেকে লজ্জা দেওয়ার জন্য এবং মন্দ কর্মের উপর লজ্জিত ও অনুতপ্ত করার জন্য এই বাক্যটি বলেছিলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এই হতভাগারা এদিকে আগ্রহও করবে না এবং কার্যতও এরূপ করবে না।

ইমাম রাযী, ইস্পাহানী ও আবুস সউদ এ ব্যাখ্যাটিকে পছন্দ করেছেন। আর আবদুল ওয়াহহাব নাজ্জার মিসরীর মতও এটাই। কারো কারো মতে প্রথম মতটিই সুন্দর।

কয়েকটি উপদেশমূলক দৃষ্টান্ত

১। মানুষ যখন জ্ঞান ও বিশ্বাসের আলোকে কোনো আকিদা কায়েম করে নেয় আর তা তার অন্তরে বসে তার আত্মার সাথে মিশে যায় এবং তার সীনার মধ্যে প্রস্তরাঙ্কনের মতো দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হয়ে যায়, তখন তার চিন্তা ও কল্পনা, তার ভাবনা ও বিচার এবং তাতে তার মগ্নতা এমনই শক্তিশালী ও সুদৃঢ় হয়ে যায় যে, বিশ্বের কোনো আকস্মিক ঘটনা, কোনো নিদারুন কঠিন বিপদও তাকে তার স্থান হতে একবিন্দু সরাতে পারে না। সে তার জন্য নিশ্চিন্ত মনে আগুনে লাফিয়ে পড়ে, বিনা দ্বিধায় সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং নির্ভয়ে শূলিকাষ্ঠে চড়ে প্রাণ বিসর্জন দেয়। হযরত ইবরাহীম আ.-এর দৃঢ় সংকল্প ও অটলতা এমনই একটি জীবন্ত ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

২। সত্যকে রক্ষা করার জন্য এমন প্রমাণ পেশ করা উচিত, যা শত্রু এবং মিথ্যার পূজকের অন্তরের অন্তঃস্থলে পৌঁছে যায় এবং সে মুখে যদিও সত্যকে স্বীকার না করে; কিন্তু তার অন্তর সত্যকে স্বীকার করতে বাধ্য হয় বরং কোনো কোনো সময় মুখেও ইচ্ছার বিরুদ্ধে সত্য ঘোষণা না করে পারে না। কুরআন মাজীদের আয়াত : وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ "অর্থাৎ বিতর্ক কর উত্তমরূপে" এই অমূল্য তথ্যেরই ঘোষণা করছে।

৩। পয়গম্বর ও রাসূলদের নীতি হল, তারা ঝগড়া ও বিতর্কে তর্কশাস্ত্রের পথে চলেন না। তাদের দলিল ও প্রমাণসমূহের ভিত্তি উপলব্ধি ও চাক্ষুস দর্শনের উপর হয়ে থাকে; কিন্তু সহজবোধ্য যুক্তির ওপর। হযরত ইবরাহীম আ.-এর কওমের সর্বসাধারণের সাথে মূর্তিপূজা ও নক্ষত্রপূজা সম্পর্কিত বিতর্ক এবং নমরূদের সাথে বিতর্ক এর স্পষ্ট ও উজ্জ্বল প্রমাণ।

৪। কোনো সত্য বিষয়কে প্রমাণিত করার জন্য দলীলের মধ্যে বিরোধী পক্ষের ভ্রান্ত আকিদাকে কাল্পনিকভাবে মেনে নেওয়া মিথ্যা বা সেই ভ্রান্ত আকীদা স্বীকার করা নয় বরং তা "শত্রু পক্ষকে পরাভূত করার জন্য সাময়িকভাবে বাতেলকে মেনে নেওয়া" কিংবা 'মাআরীয' বা 'পরোক্ষ ইঙ্গিত' বলা হয়। এরূপ প্রমাণ উপস্থাপন প্রতিপক্ষকে নিজের ভুল স্বীকার করতে বাধ্য করে। হযরত ইবরাহীম আ. সর্বসাধারণের সাথে বিতর্কের ক্ষেত্রে প্রমাণের এই দিকটাই অবলম্বন করেছিলেন, যা মূর্তিপূজকদেরকে

স্বীকার করতে বাধ্য করেছিলেন, মূর্তি কোনো অবস্থায়ই শোনেও না জবাবও দিতে পারে না।

৫। যদি কোনো মুসলামানের পিতা-মাতা উভয়েই মুশরিক হয় এবং কোনোক্রমেই শিরক হতে বিরত না হয়, তবে তাদের মুশরেকি জীবন হতে অসন্তুষ্ট এবং পৃথক থেকেও তাদের সাথে দুনিয়াবী কাজ-কারবারে ও আচরণ এবং আখেরাতের উপদেশ ও নসিহত সম্মান ও ইজ্জতের সাথে করা উচিত। কঠোর ও কর্কশ ভাষা ব্যবহার করা অনুচিত। হযরত ইবরাহীম আ.-এর ব্যবহার তাঁর পিতা আযরের সাথে এবং হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কর্মপদ্ধতি চাচা আবু তালেবের সঙ্গে এ বিষয়ে অকাট্য প্রমাণ।

৬। যদি মুমিনের অন্তর বিশুদ্ধ আকিদার উপর নিশ্চিন্তে একইসাথে মুখ ও অন্তরে পূর্ণ ঈমান রাখে, কিন্তু চাক্ষুস জ্ঞান লাভের জন্য কিংবা যথার্থ বিশ্বাসের স্তরে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে কোনো ঈমান বা বিশ্বাসের মাসআলায়ও প্রশ্ন করে অন্তরের তৃপ্তি অন্বেষণকারী হয়, তবে এই অন্বেষণ সন্দেহ এবং কুফর নয় বরং প্রকৃত ঈমান। হযরত ইবরাহীম আ.-এর জবাব وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي বাক্যটি দ্বারা এই গূঢ়তত্ত্ব পরিষ্কার হয়ে যায়।

৭। **দস্তরখানের সম্প্রসারণ যদি রিয়াকারী ও লোক দেখানোর জন্য না হয় এবং প্রকৃতির চাহিদা মাফিক অতিথি সেবায় অন্তরে আনন্দ বোধ হয়, তবে এ দানশীলতায় খুবই** ফযিলত থাকে এবং তা বদান্যতা নামে অভিহিত হয়। এই মহৎ গুণটি হযরত ইবরাহীম আ.-এর আত্মার সাথে মিশে গিয়েছিল; এটা ছিল তাঁর প্রকৃতিগত গুণ। অতিথি আপ্যায়ন, দস্তরখানের সম্প্রসারণ, আগন্তুক অতিথিদের সম্মান প্রদর্শন এ জাতীয় গুণগুলি হযরত ইবরাহীম আ.-এর মধ্যে উচ্চস্তরের দৃষ্টান্ত হয়ে গিয়েছিল।

কোনো কোনো কিতাবে হযরত ইবরাহীম আ.-এর অতিথি সেবার বর্ণনা প্রসঙ্গে একটি চমৎকার ঘটনা উল্লেখ আছে। একবার নিজের সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী হযরত ইবরাহীম আ.-কোনো অতিথি আগমনের অপেক্ষায় ময়দানে দণ্ডায়মান ছিলেন। কেননা মেহমান ব্যতীত তাঁর দস্তরখানও বিছানো হত না; তিনি আহারও গ্রহণ করতেন না। এমন সময় সামনের দিকে একজন অতি দুর্বল বৃদ্ধ লোককে দেখা গেল। যার কোমর বাঁকা হয়ে গিয়েছিল। সে লাঠির উপর ভর করে অনেক কষ্টে পথ চলছিল। ইবরাহীম আ. সম্মুখে অগ্রসর হলেন এবং আনন্দের সাথে তাকে সাহায্য করে গৃহে নিয়ে আসলেন।

দস্তরখান বিছানো হল। খাদ্যদ্রব্য সাজানো হল। আহার পর্ব সমাপ্ত হলে হযরত ইবরাহীম আ. বললেন, সেই একক আল্লাহর শোকর আদায় কর, যিনি আমাদেরকে এ সমস্ত নেয়ামত দান করেছেন। বৃদ্ধ লোকটি রাগান্বিত হয়ে বলল : আমি জানি না, তোমার একক আল্লাহ কে? আমি আমার মাবুদের (মূর্তির) শোকর আদায় করে থাকি। যা আমার গৃহে রক্ষিত রয়েছে। এ উত্তরটি হযরত ইবরাহীম আ.-এর মনে

খুব কষ্ট দিল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে ঘর হতে বের করে দিলেন। কিন্তু একটু পরেই হযরত ইবরাহীম আ.-এর অন্তরে নিজের এই অশোভনীয় কাজের জন্য অনুশোচনা উদয় হলে তিনি ভাবলেন, যেই একক আল্লাহর শোকর আমি এই লোকটির দ্বারা আদায় করাতে চেয়েছিলাম, তাঁর মহিমা তো এতই, তিনি এ বৃদ্ধকে তার এই সুদীর্ঘ আয়ুষ্কালব্যাপী অনবরত নানাবিধ নেয়ামত প্রদান করে আসছেন; তার মূর্তিপূজা ও কুফরের কারণে তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে এক বেলার জন্যও তার উপর নিজের রিযিকের দরজা বন্ধ করেন নি। তবে আমার কী অধিকার ছিল, আমার কথা অমান্য করা এবং আল্লাহর বাণী কবুল না করার দরুন রাগান্বিত হয়ে আমি তাকে ঘর থেকে বের করে দিলাম।

ঘটনাটি ঐতিহাসিক দিক থেকে গ্রহণযোগ্য হোক বা না হোক; কিন্তু তা এ সত্যটিই প্রমাণ করছে, হযরত ইবরাহীম আ.-এর বদান্যতা তার উচ্চ সীমায় গিয়ে পৌঁছেছিল। হয়ে গিয়েছিল মানুষের মুখে প্রবাদ বাক্যস্বরূপ। নিঃসন্দেহ তাঁর এ চিন্তা সত্যের পয়গাম এবং ইসলামের দাওয়াতের সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ।

৮। আল্লাহ তাআলা যে সমস্ত মহাপুরুষকে নিজের সত্য প্রচারের জন্য নির্বাচন করে থাকেন তাঁদের সম্মুখে আল্লাহর মহব্বত এবং সততা ব্যতীত অন্য কোনো বস্তু বাকি থাকে না। এ কারণে প্রথম হতেই তাঁদের মধ্যে এই যোগ্যতা প্রদান করা হয়, তাঁরা শৈশবকাল হতেই নিজেদের সমসাময়িকদের মধ্যে বিশিষ্ট ও উজ্জ্বলরূপে পরিদৃষ্ট হন এবং আল্লাহর রাস্তায় সকল পরীক্ষায় আনন্দের সাথে চরম ধৈর্য-সহ্য ও সন্তুষ্টির উত্তম আদর্শ প্রদর্শন করেন। হযরত ইসমাঈল আ.-এর ঘটনাটি এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ ও নেহায়েত শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত।

৯। হযরত লূত আ. যদিও হযরত ইবরাহীম আ.-এর ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন এবং তাঁর অনুগামীও ছিলেন, সেইসঙ্গে আবার নবুয়তও লাভ করেছিলেন। তাঁকে আল্লাহ পাকের দূত করা হয়েছিল। সুতরাং সাদুম ও আমুরায় সর্বপ্রকারের বিপদ এবং বিদেশে শত্রুদের কবলে নানা প্রকার কষ্ট ভোগ সত্ত্বেও তিনি ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে কাজ করেছেন। নিজের বুযুর্গ চাচা ও খানদানের সাহায্য চাওয়ার পরিবর্তে শুধু আল্লাহরই উপর ভরসা রাখতেন। তাঁর আদেশসমূহের সামনে আনুগত্যের প্রমাণ দিয়েছেন। এটাই সান্নিধ্যপ্রাপ্ত আম্বিয়ায়ে কেরামের সম্মান।

ফিলিস্তিন
লূত সাগর (মৃতসাগর)
জর্দান নদী
পূর্ব জর্দান
লূত জাতির এলাকা
আস সাফী

মিসর
লোহিত সাগর
মাদয়ানবাসী
আইকাবাসী
মদীনা
খাইবার
তাবুক
তাইমা
সামুদ জাতির এলাকা
সুয়েজ খাল
সিনাই উপত্যকা

হযরত ইসমাঈল আ.
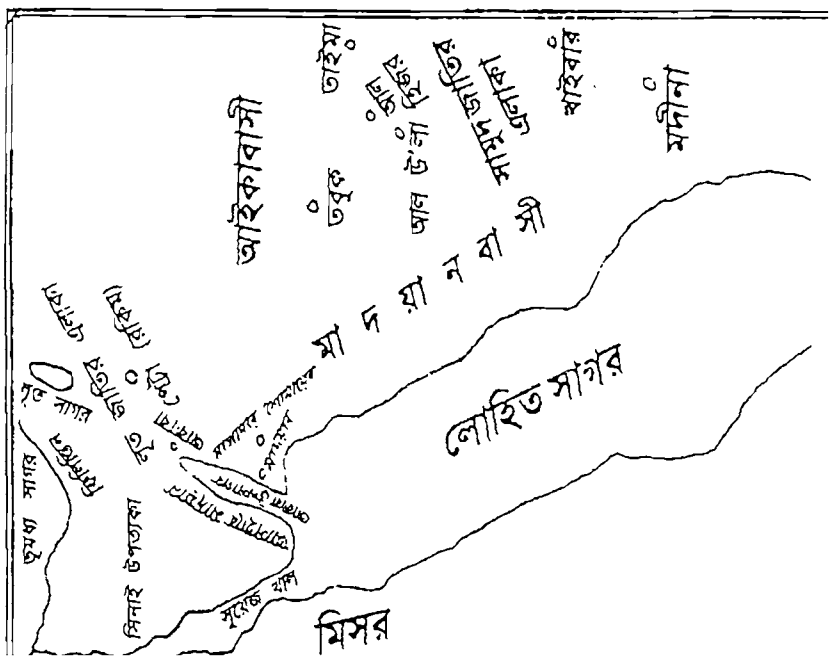
ইসমাঈল আ.-এর জন্ম

হযরত ইবরাহীম আ. প্রথম দিকে নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁর বাসগৃহের মালিক ছিল **এক বাঁদির গর্ভজাত গোলাম ইয়ারায দামেশকি। একদিন হযরত ইবরাহীম** আ. আল্লাহ তাআলার দরবারে একটি সন্তানের জন্য দোয়া করেন। আল্লাহ পাক তাঁর দোয়া কবুল করলেন এবং তাঁকে সান্ত্বনা প্রদান করলেন। 'এ দোয়ার পর তিনি হাজেরার নিকট গেলেন এবং তিনি (হাজেরা) গর্ভধারণ করলেন।'

হযরত সারাহ যখন এটা জানতে পারলেন, তখন তিনি মানবসুলভ প্রকৃতির তাড়নায় হযরত হাজেরার প্রতি ঈর্ষান্বিতা হলেন। তিনি হযরত হাজেরাকে নানা প্রকারে উত্ত্যক্ত করতে লাগলেন। হযরত হাজেরা বাধ্য হয়ে তাঁর নিকট হতে চলে গেলেন।

পবিত্র কোরআনে হযরত ইসমাঈল আ.

হযরত ইসমাঈল আ.-এর আলোচনা কোরআন মাজিদে বহুবার হয়েছে। তন্মধ্যে শুধু এক জায়গায় তাঁর গুণাবলী বর্ণিত হয় নি। আয়াতটি তাঁর "যাবীহ" হওয়ার বর্ণনা সম্বলিত আয়াত। দুই জায়গায় সেই সুসংবাদ প্রদানের ক্ষেত্রে তাঁর উলেখ হয়েছে। যাতে ইবরাহীম আ.-কে পুত্র সন্তানের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। সূরা-মারইয়ামে তাঁর নাম উলেখ করে তাঁর উৎকৃষ্ট গুণাবলীর উলেখ করা হয়েছে :

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا (٥٤) وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ

بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا (٥٥)

"আর স্মরণ করুন, কোরআন মাজিদে ইসমাঈল আ.-এর আলোচনা। তিনি ওয়াদা পালনে সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি ছিলেন নবী ও রাসূল। তিনি নিজের পরিবারবর্গকে নামায ও যাকাতের আদেশ করতেন, এবং তিনি স্বীয় পরওয়ারদিগারের নিকট পছন্দনীয় ও প্রিয় ছিলেন।" (সূরা-মারইয়াম : ৫৪-৫৫)

শস্য শ্যামলবিহীন প্রান্তর এবং হাজেরা ও ইসমাঈল

বোখারি শরিফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত আছে : ইবরাহীম আ. তাঁর স্ত্রী হাজেরা শিশু সন্তান ইসমাঈলকে নিয়ে চললেন। যেখানে বর্তমান কাবাগৃহ অবস্থিত, সেখানে একটি গাছের নিচে যমযম কূপের বর্তমান স্থানের উপরের অংশে তাঁদেরকে রেখে যান। স্থানটি তখন অনাবাদী ও জনমানবহীন ছিল। পানির নামচিহ্ন পর্যন্ত ছিল না।

ইবরাহীম আ. এক মশক পানি ও এক থলি খেজুর তাঁর নিকট রেখে দিলেন। এরপর রওনা হলেন। হযরত হাজেরা ইবরাহীম আ.-এর পেছনে পেছনে এই বলতে বলতে চললেন, আপনি আমাদের উপত্যকা ভূমিতে কোথায় ছেড়ে যাচ্ছেন? যেখানে মানুষও নেই, কোনো সহায় নেই, কোনো দুঃখের সাথীও নেই। হাজেরা অনবরত এরূপ

বলে চললেন। ইবরাহীম আ. নীরবে চলছেনই। অবশেষে হাজেরা জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার রবই কি আপনাকে এরূপ আদেশ করেছেন। হযরত ইবরাহীম আ. বললেন, "হ্যাঁ, আল্লাহ পাকের আদেশেই।"

হাজেরা এটা শুনে বললেন, যদি এটা আল্লাহর হুকুম হয়ে থাকে, তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই, তিনি আমাদেরকে ধ্বংস ও বিনষ্ট করবেন না। এরপর ফিরে আসলেন, ইবরাহীম আ. চলতে চলতে একটি টিলার উপর এমন স্থানে পৌঁছলেন, তাঁর পরিবারবর্গ (হযরত হাজেরা ও ইসমাঈল আ.) দৃষ্টিপথ হতে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তখন বর্তমান কাবা গৃহের তদানীন্তন শূন্য স্থানের দিকে মুখ করে এবং হাত উঠিয়ে এই দুআ করলেন,

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ
أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ

"হে আমাদের পরওয়ারদিগার! (আপনি দেখছেন,) আমি আমার কতক আওলাদকে এমন এক ময়দানে রেখে এসেছি, যেখানে ক্ষেতি-কৃষির নাম চিহ্নও নেই। আপনার সম্মানিত ঘরের নিকটে এনে বসবাস করতে রেখে দিলাম, যেন তারা নামায কায়েম রাখে (যাতে এই সম্মানিত ঘরটি তাওহীদের অনুসারীদের থেকে খালি না থাকে)। অতএব, আপনি (স্বীয় অনুগ্রহ ও দয়ায়) এমন করে দিন যেন লোকদের অন্তর তাদের দিকে আকৃষ্ট হয়ে যায় এবং তাদের জন্য জমিন হতে উৎপন্ন শস্যাদির মাধ্যমে রিযিকের ব্যবস্থা করে দিন, যেন তারা আপনার শোকর আদায়কারী হয়।" (সূরা ইবরাহীম : ৩৭)

হাজেরা কয়েকদিন পর্যন্ত মশক হতে পানি এবং থলি থেকে খেজুর খান। এবং শিশু ইসমাঈলকে দুধ পান করাতে থাকেন। শেষে এমন সময় এসে গেল, পানিও রইল না খেজুরও না। তখন তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন। যেহেতু তিনি তৃষ্ণার্ত ও ক্ষুধার্ত হওয়ায় তাঁর বুকের দুধও শুকিয়ে গিয়েছিল। ফলে শিশুটি তৃষ্ণার্ত এবং ক্ষুধার্ত হয়ে গেল। অবস্থা যখন অন্যরকম হতে লাগল এবং শিশু ইসমাঈলও অস্থির হতে লাগল।

হাজেরা তখন নিকটস্থ 'ছাফা' পাহাড়ের উপর আরোহণ করলেন। হয়তো কোনো আল্লাহর বান্দাকে দেখতে পাবেন, কিংবা পানি দেখতে পাবেন। কিন্তু কিছুই দেখতে পেলেন না। এরপর শিশুর মহব্বতে দৌড়ে তার নিকটে আসলেন। এরপর অপরদিকে নিকটস্থ পাহাড় মারওয়ার ওপর আরোহণ করলেন। সেখানেও যখন কিছুই দেখতে পেলেন না, পুনরায় দ্রুত দৌড়িয়ে শিশুর নিকটে ফিরে এলেন। এভাবে সাতবার করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই স্থানে পৌছিয়ে বললেন, এটাই সেই "ছাফা ও মারওয়ার মধ্যস্থলের দৌড়" যাহা হজের সময় লোকে করে থাকে।

সর্বশেষবারে যখন হাজেরা মারওয়ার উপর ছিলেন, তখন কানে একটি আওয়ায আসল। তিনি চমকিয়ে উঠলেন এবং মনে মনে ভাবলেন, "কেউ ডাকছে।" কর্ণপাত করলেন, পুনরায় সেই আওয়ায শুনলেন। হাজেরা বললেন, "যদি তুমি কিছু সাহায্য করতে পার, তবে সম্মুখে আস তোমার আওয়ায শুনতে পেয়েছি। এরপর দেখলেন,

আল্লাহর ফেরেশতা জিবরাইল আ.। ফেরেশতা নিজের পায়ের গোড়ালি দ্বারা সেই স্থানে আঘাত করলেন, যেখানে বর্তমান যমযম কূপ রয়েছে। তৎক্ষণাৎ সেই স্থান হতে পানি উথলে উঠতে লাগল। হাজেরা পানির চতুর্দিকে বাঁধ দিয়ে দিলেন। কিন্তু পানি উথলাতে থাকল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "আল্লাহ তাআলা ইসমাঈলের মাতার উপর রহম করুন, যদি তিনি যমযমকে এরূপে না রুখতেন এবং এর চতুর্দিকে বাঁধ না বাঁধতেন তবে আজ পর্যন্ত উহা মহা শক্তিশালী ঝরণায় পরিণত হত।" হাজেরা পানি পান করলেন এবং এরপর ইসমাঈলকে দুধপান করালেন। ফেরেশতা হাজেরাকে বললেন, ভয় ও চিন্তা করো না, আল্লাহ তোমাকে এবং এই শিশুকে বিনষ্ট করবেন না। এটা বাইতুল্লাহ শরীফের স্থান। যা নির্মাণ করার ভার এই শিশু ও তার পিতা ইবরাহীম আ.-এর জন্য নির্ধারিত রয়েছে। এ কারণে আল্লাহ এই খান্দানকে ধ্বংস করবেন না। বাইতুল্লাহর সেই স্থানটি কাছেই ছিল। যমযমের স্রোত ডানে ও বাঁয়ে গিয়ে জায়গাটি সমতল করে দিল।

সে সময় বনি জুরহামের একটি গোত্র সেই উপত্যকার নিকটে এসে থামল। তারা দেখল, অনতিদূরেই পাখি উড়ছে। জুরহামিরা বলল, এটা পানির লক্ষণ। সেখানে অবশ্যই পানি আছে। তারা এসে হযরত হাজেরার নিকট সেই স্থানে বসবাস করার অনুমতি চাইল। হযরত হাজেরা বললেন, অবস্থান করতে পার, কিন্তু পানিতে মালিকানা সত্ত্বের অংশীদার হতে পারবে না। জুরহামিরা আনন্দের সাথে তা মেনে নিল এবং সেখানেই বসবাস করতে লাগল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হাজেরা নিজেও পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সঙ্গ লাভের জন্য চাচ্ছিলেন, কেউ এখানে এসে বসবাস করুক। সুতরাং তিনি আনন্দের সাথে বনি জুরহামকে সেখানে বসবাস করার অনুমতি প্রদান করলেন। জুরহামিরা লোক পাঠিয়ে নিজ নিজ বংশের অবশিষ্ট লোকদেরকে নিয়ে আসল। অনন্তর এখানে ঘরবাড়ি নির্মাণ করে বসবাস করতে লাগল। তাদের সঙ্গে মিশে ইসমাঈল আ. তাদের ভাষা শিখে নিলেন। তিনি বড় হলে তাঁর চালচলন ও সৌন্দর্য জুরহামিদের খুব পছন্দ হল। তারা আপন বংশের এক মেয়ের সাথে তাঁর বিবাহ করিয়ে দিল। এর কিছুকাল পরেই হযরত হাজেরার ইন্তেকাল হল।

হযরত ইবরাহীম আ. মাঝেমধ্যে পরিবারবর্গকে দেখার জন্য আগমন করতেন। একবার তিনি তাশরিফ আনলে ইসমাঈল আ. ঘরে ছিলেন না। তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, জীবিকার তালাশে বাইরে গিয়েছেন। ইবরাহীম আ. বললেন, তোমাদের দিনাতিপাত কিভাবে চলছে? সে বলল, নিতান্ত মুসিবত ও পেরেশানির মধ্যে চলছে এবং অত্যন্ত দুঃখ ও কষ্টের মধ্যে আছি। ইবরাহীম আ. এটা শ্রবণ করে বললেন, ইসমাঈলকে আমার সালাম দিও, এবং বলো, তার দরজার চৌকাঠ পরিবর্তন করতে। ইসমাঈল আ. ঘরে ফিরে এলে ইবরাহীম আ.-এর নূরে নবুয়তের চিহ্ন ও আভাষ পেয়ে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেউ কি এখানে এসেছিল? বিবি সমুদয় ঘটনা বর্ণনা করে

শুনালেন এবং তাঁর পয়গামও জানালেন। ইসমাঈল আ. বললেন, তিনি আমার পিতা ইবরাহীম আ. ছিলেন। তাঁর পরামর্শ এই, আমি তোমাকে তালাক প্রদান করি। সুতরাং আমি তোমাকে আমার বিবাহ বন্ধন হতে বিচ্ছিন্ন করে দিলাম।

ইসমাঈল আ.-এরপর দ্বিতীয় বিবাহ করলেন। আরেক দিন ইবরাহীম আ. পুনরায় ইসমাঈল আ.-এর অনুপস্থিতিতে তাশরিফ আনলেন। পূর্বের মতো তাঁর বিবিকে জিজ্ঞাসা করলেন। বিবি বললেন, আল্লাহ তাআলার শোকর, আমাদের দিন ভালোই চলছে। জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কী খাও ? ইসমাঈল আ.-এর বিবি বললেন, গোশত। ইবরাহীম আ. জিজ্ঞাসা করলেন, কী পান করো ? তিনি বললেন, 'পানি'।

হযরত ইবরাহীম আ. দুআ করলেন– আল্লাহ, তাদের গোশত এবং পানিতে বরকত দান করুন। এরপর বিদায়কালে পয়গাম দিয়ে গেলেন, তোমার স্বামীকে বলো, সে যেন তার ঘরের দরজার চৌকাঠ সংরক্ষিত রাখে। হযরত ইসমাঈল ঘরে ফিরে এলে তাঁর বিবি সমুদয় ঘটনা শুনালেন এবং পয়গামটিও পৌঁছালেন। ইসমাঈল আ. বললেন, তিনি আমার পিতা ইবরাহীম আ. এবং তাঁর পয়গাম, তুমিই যেন সারা জীবন আমার জীবন সঙ্গিনী থাক।

এ রেওয়ায়েতটি বোখারির কিতাবুর রুইয়া ও কিতাবুল আম্বিয়ায় দুই জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে। রেওয়ায়েত দুটি থেকে প্রমাণিত হয়, ইসমাঈল আ. মক্কায় দুধের বয়সে পৌঁছেছিলেন।

কুরআন মাজিদের এই আয়াত তার প্রমাণ পেশ করছে :

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ (١٠٠) فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ (١٠١) فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (١٠٢) فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (١٠٣) وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ (١٠٤) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١٠٥) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (١٠٦) وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (١٠٧) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (١٠٨) سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ (١٠٩) كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١١٠) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (١١١) وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (١١٢) وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ

"হে পরওয়ারদিগার! আমাকে একটি নেককার (পুত্র) সন্তান দান করুন। সুতরাং আমি তাকে এক ধৈর্যশীল বালকের সুসংবাদ দান করলাম। অনন্তর যখন সে এই বয়সে পৌঁছল, পিতার সঙ্গে দৌড়াতে পারে, তখন পিতা বললেন, বৎস! আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি তোমাকে যবাহ করছি। ভেবে দেখ, তুমি কি বুঝ। পুত্র বলল– পিতা, আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে আপনি তা পালন করুন, আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন।"

.... "আর আমি ইবরাহীমকে ইসহাক-এর সুসংবাদ দিলাম। সে নবী হবে এবং নেককারদের দলভুক্ত হবে। আর তাঁর উপর ও ইসহাকের ওপর বরকত নাযিল করলাম।" (সূরা আছ-ছফফাত : ১০০-১০২/১১২-১১৩)

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার কতক আওলাদকে বসতি করতে দিয়েছি- ক্ষেতি-কৃষিবিহীন উপত্যকায় আপনার সম্মানিত গৃহের সন্নিকটে।" (সূরা ইবরাহীম : ৩৭)

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি আমাকে দান করলেন বৃদ্ধকালে ইসমাঈল ও ইসহাক।" (সূরা ইবরাহীম : ৩৯)

সূরা-ছফ্ফাতের মধ্যে ইসমাঈল আ. সম্বন্ধে যেই ঘটনাটির উল্লেখ হয়েছে তা "যাবহে আযীমের" অর্থাৎ কুরবানীর ঘটনা, মক্কা পৌঁছার ঘটনা নয়। অবশ্য কুরবানীর ঘটনাটি নিঃসন্দেহে ইসমাঈল আ.-এর জ্ঞান বুদ্ধির বয়সের সময়কার ঘটনা এবং ইসহাক আ. তখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

ইবরাহীম আ. যদিও হযরত হাজেরা ও ইসমাঈল আ.-কে মক্কার মরুপ্রান্তরে রেখে এসেছিলেন, কিন্তু তিনি পিতা ছিলেন, নবী ও পয়গম্বর ছিলেন। স্ত্রী ও পুত্রকে কেমন করে ভুলে থাকতে পারতেন এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণ হতে কেমন করে বেপরোয়া হতে পারতেন? তিনি সর্বদা সেই পানি ও উদ্ভিদবিহীন প্রান্তরে আসতেন ও নিজের খান্দানের দেখাশুনা করে থাকতেন। আর 'فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ' আয়াতটির অর্থ এটাই। সুতরাং ইসহাক আ.-এর সুসংবাদের উল্লেখ সম্পূর্ণরূপে যথাস্থানেই হয়েছে।

এরূপে সূরা-ইবরাহীমের আয়াতে عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ "আপনার সম্মানিত ঘরের নিকটে" কথার পরে এই বাক্যটি রয়েছে :

رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ

"হে আমাদের পরওয়ারদিগার আমি তাদেরকে কাবা গৃহের নিকট এই জন্য বসতি করতে রেখে গেলাম, যেন, তারা নামায কায়েম রাখে। অতএব, মানুষের অন্তরসমূহ তাদের দিকে ফিরিয়ে দিন।"

এতে বুঝা যায়, ইবরাহীম আ.-এর এই দুআ বাইতুল্লাহ শরীফ নির্মিত হওয়ার পরের ঘটনা। আর আয়াতটির পূর্বাপর সম্পর্ক পরিষ্কার এটাই বুঝাচ্ছে। এতে নামায কায়েম করার উল্লেখ আছে। এতে হজের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। এতে এখানকার অধিবাসীদের জন্য রিযিকের স্বচ্ছলতার কামনা প্রকাশ পাচ্ছে। আর এ সমস্ত বিষয়ের দোয়া করা তখনই সমীচীন হতে পারে, যখন বাইতুল্লাহ শরীফ পূর্ণ নির্মিত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। অবশ্য ইবনে আব্বাস রাযি.-এর রেওয়ায়তেও এই দুআটির উল্লেখ রয়েছে।

তাতে বুঝা যায় যে, নিজের খানদানকে এখানে রেখে যাওয়ার সময় হযরত ইবরাহীম আ. যেই দুআ করেছিলেন তাও এই দুআর কাছাকাছি ছিল। এই কারণে ইবনে আব্বাস রাযি.-এর রেওয়ায়ত এই আয়াতটি বুঝার জন্য প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করে দেওয়া হয়েছে। এই অর্থ নয়, এটাই অবিকল সেই দুআ যা তিনি তখন করেছিলেন। আর তাতে ইসহাকেরও উল্লেখ ছিল। যখন ইবনে আব্বাস রাযি. নিজেই রেওয়ায়ত করছেন, এই ঘটনাটি ইসমাঈল আ.-এর দুধপানকালীন ঘটনা। তখন তিনি কিভাবে একথা বলতে পারেন, ইবরাহীম আ. তখন এরূপ দুআ করেছিলেন? যার শেষের দিকে ইসমাঈলের সাথে ইসহাক আ.-এর জন্মেরও উল্লেখ রয়েছে?

তৃতীয়ত:, এই অনাবাদী ভূখণ্ড মক্কার প্রত্যেকটি খণ্ডে খণ্ডে ও আনাচে-কানাচে লবণাক্ত পানি ছাড়া মিঠা পানির নামগন্ধও নাই। বর্তমানকালেও নতুন নতুন যন্ত্রপাতির সাহায্য নেওয়া সত্ত্বেও সেখানকার জমিন হতে মিঠা পানি বের করা অসম্ভব হয়ে রয়েছে। তবে যমযমের অস্তিত্ব এখানে কেমন করে হল? ধর্মীয় এবং ঐতিহাসিক উভয় দিক হতে এটা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। অতএব এ সম্পর্কে কুরআন মাজিদের আয়াত যখন কিছুই বলে না, কিন্তু বোখারী শরীফে ইবনে আব্বাস রাযি. হতে বর্ণিত এই দুইটি হাদিস এই কূপটির অস্তিত্বের ইতিহাস বর্ণনা করছে। যাতে তৎকালে ইসমাঈল আ. স্তন্যপায়ী শিশু বলে প্রকাশ করা হয়েছে। আর তাওরাতেও যেভাবে এই ঘটনাটির উল্লেখ হয়েছে তা তাওরাতের ওই সমস্ত আয়াতে রয়েছে যা ইসমাঈল আ. দুগ্ধপোষ্য শিশু হওয়া প্রকাশ পাচ্ছে।

যা হোক যদিও কুরআন মাজিদের কোনো আয়াতের দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় না, ইসমাঈল আ.-কে কোন বয়সে মক্কা ভূমিতে পৌঁছান হয়েছে। কিন্তু বোখারী শরীফের রেওয়ায়েতসমূহ বলে, সেই সময়টুকু হযরত ইসমাঈল আ.-এর মাতৃস্তন পানের সময় ছিল, আর এটাই সঠিক। অতএব, ইবনে আব্বাস রাযি.-এর এই রেওয়ায়তটি ইসরাঈলী রেওয়ায়তসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং ওহির মুখপাত্র হাদিসের বর্ণিত বিস্তারিত বিবরণই বিশুদ্ধ বর্ণনা।

কুরআন মাজিদ হযরত ইসমাইল আ.-এর জন্ম সম্পর্কে তাঁর নাম নিয়ে কোনো কথা বলে নি। অবশ্য নাম উল্লেখ না করে তাঁর জন্ম গ্রহণের সুসংবাদ বিদ্যমান রয়েছে। ইবরাহীম আ. যখন নিঃসন্তান, সুতরাং আল্লাহ পাকের দরবারে একজন নেককার সন্তানের জন্য দোয়া করছেন। আর আল্লাহ তাআলা তাঁর দোয়া মনযুর করে সন্তান জন্ম গ্রহনের সুসংবাদ দিলেন :

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ (١٠٠) فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ (١٠١)

"(ইবরাহীম আ. দুআ করলেন) হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি নেককার পুত্র সন্তান দান করুন। ফলে আমি তাকে একটি ধৈর্যশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।"

(সূরা সাফফাত : ১০০)

এই ধৈর্যশীল পুত্র কে? সেই ইসমাঈল, যিনি হাজেরার গর্ভ হতে জন্মগ্রহণ করেছেন। কেননা, কুরআন মাজিদের এই আয়াতের পরবর্তী আয়াতে হযরত ইসহাক আ.-এর জন্মের সুসংবাদ উল্লেখ হয়েছে :

وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (١١٢) وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ

"আর আমি তাকে সুসংবাদ প্রদান করলাম ইসহাকের (জন্মলাভের)। যিনি নেককারদের মধ্যে– নবী হবেন। আর আমি বরকত প্রদান করলাম তার ওপর এবং ইসহাকের উপর।" (সূরা সাফফাত : ১১২-১১৩)

আর যখন ইবরাহীম আ. হাজেরা ও ইসমাঈল আ.-কে মক্কায় রেখে গিয়েছিলেন, তখন তাদের জন্য দুআ করে এইরূপে শোকর আদায় করেছিলেন :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ

"সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি বৃদ্ধকালে আমাকে ইসমাঈল এবং ইসহাক দান করেছেন।" (সূরা-ইবরাহীম)

এই আয়াতও সাক্ষ্য দিচ্ছে, সূরা-ছফফাতের আয়াতে যেই পুত্রের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে, সে হযরত ইসমাঈল আ.।

খতনা

হযরত ইবরাহীম আ.-এর বয়স যখন ৯৯ বছর হল তখন হযরত ইসমাঈল আ.-এর বয়স ১৩ বছর। তখন আল্লাহ তাআলার আদেশ এলো, "খতনা কর"। এই আদেশ পালনে প্রথমে ইবরাহীম আ. নিজে খতনা করলেন। এরপর হযরত ইসমাঈল আ.-এর এবং পরিবারের অন্যদের এবং গোলামদের খতনা করালেন। এই খতনাই ইবরাহিমি ধর্মের প্রতীক এবং সুন্নতে ইবরাহিমি নামে অবিহিত।

হযরত ইসমাঈল আ.

ইসমাঈল আ.-ই হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহর প্রথম সন্তান। সুতরাং সর্বাবস্থায় তিনিই ছিলেন একক সন্তান। এ সময়ের মধ্যে অন্য কোনো সন্তানের জন্ম হয় নি। আর তাৎপর্যগত দিক থেকে একক এ হিসেবে, পিতা ইবরাহীম আ. শিশু পুত্র ইসমাঈল আ. ও তার মা হাজেরাকে নিয়ে হিজরত করেন। এবং মক্কার ফারান পর্বতের উপত্যকায় উভয়কে নির্বাসিত করেন। তাঁদেরকে যখন তিনি রেখে আসেন তখন তাঁদের সাথে যৎসামান্য পানি ও রসদ ব্যতীত কিছুই ছিল না। এটা তিনি করেছিলেন আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও ভরসা রেখে। আল্লাহ তাআলা আপন অনুগ্রহ ও করুণার দ্বারা তাঁদেরকে বেষ্টন করে নেন। বস্তুত তিনিই প্রকৃত অনুগ্রহকারী, সাহায্যকারী ও অভিভাবক। অতএব, প্রমাণিত হল, হযরত ইসমাঈল আ.-ই বাহ্যিক ও তাৎপর্যগত উভয় দিক থেকে একক সন্তান। কিন্তু কে বুঝবে এই সূক্ষ্ণ তত্ত্ব এবং কে খুলবে এই শক্ত গিট। আল্লাহ যাকে গভীর তত্ত্বজ্ঞান দান করেছেন, তিনিই কেবল এটা উপলব্ধি করতে সক্ষম। আল্লাহ

তাআলা হযরত ইসমাঈল আ.-এর বিভিন্ন গুণাগুণের প্রশংসা করেছেন। যেমন : তিনি ছিলেন ধৈর্যশীল, সহনশীল, ওয়াদা পালনকারী, সালাতের হেফাজতকারী। পরিবারবর্গকে সালাত আদায়ের নির্দেশ দানকারী– যাতে তারা আযাব থেকে রক্ষা পায় এবং মহান প্রভুর ইবাদতের দিকে মানুষকে আহবানকারী।

যবহে আযীম বা কুরবানী

আল্লাহ পাকের দরবারে সান্নিধ্যপ্রাপ্ত মহাপুরুষের সাথে আল্লাহ পাকের ব্যাপার তদ্রুপ হয় না যেরূপ সাধারণ মানুষের সাথে হয়ে থাকে। তাঁদেরকে পরীক্ষা এবং আযমাইশের কঠিন হতে কঠিনতর ধাপসমূহ অতিক্রম করতে হয়। আর প্রতি পদক্ষেপে আল্লাহর জন্য প্রাণ সোপর্দ করে দেওয়া, আত্মসমর্পণ এবং আল্লাহর আদেশের উপর সম্মতি ও সন্তুষ্টির পরিচয় দিতে হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আম্বিয়ায়ে কেরামের প্রত্যেকটি দলকে নিজেদের মর্যাদা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষা ও কঠিন কষ্টের মধ্যে নিপতিত করা হয়।" ইবরাহীম আ.-ও যেহেতু উচ্চ মর্যাদাশালী নবী ও পয়গাম্বর ছিলেন, এ জন্য তাঁকেও বিভিন্ন পরীক্ষা ও আযমাইশের সম্মুখীন হতে হয়েছে। এবং মর্যাদার উচ্চতার প্রেক্ষিতে প্রতিবারই পরীক্ষায় পূর্ণ সফলকাম প্রমাণিত হয়েছেন।

যখন তাঁকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, তখন যেই ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা এবং আল্লাহর ফয়ছালায় ও নির্ধারিত তকদীরে সন্তুষ্টির প্রমাণ দিয়েছেন। যেই দৃঢ়তা ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন, সেটি তাঁরই যোগ্য কাজ ছিল। এরপর যখন ইসমাঈল আ. ও হাজেরাকে মক্কার অনাবাদ জঙ্গলে ছেড়ে আসার আদেশ হল, তাও সাধারণ পরীক্ষা ছিল না। তখন আযমাইশ বরং কঠিন আযমাইশের সময় ছিল। বার্ধক্য এবং বুড়ো বয়সের নানাবিধ আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্র, দিবা-রাত্রির দোয়ার ফল এবং পরিবারের আশার আলো ইসমাঈলকে শুধু আল্লাহর নির্দেশ পালনার্থে পানি ও তৃণলতাবিহীন মরুপ্রান্তরে ত্যাগ করে আসছেন। একবার পিছনের দিকে ফিরে তার দিকে তাকাচ্ছেন না, পাছে এমন না হয় যে, পিতৃস্নেহ উথলে ওঠে এবং আল্লাহর আদেশ পালনে কোনো প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে যায়। এই দুইটি পরীক্ষার কঠিন মঞ্জিল অতিক্রম করার পর একটি তৃতীয় পরীক্ষার প্রস্তুতি চলছে, যা গত দুই পরীক্ষার চেয়েও অধিক পিতৃহৃদয় বিগলনকারী ও হৃদয় বিদারক পরীক্ষা। এটাই একাধারে তিন রাত্রি পর্যন্ত হযরত ইবরাহীম আ. স্বপ্নে দেখছেন। আল্লাহ পাক বলছেন, হে ইবরাহীম! তুমি আমার রাস্তায় তোমার একমাত্র পুত্রকে কুরবানী কর!

আম্বিয়ায়ে কেরামের স্বপ্ন 'সত্য স্বপ্ন' এবং আল্লাহর ওহি হয়ে থাকে। সুতরাং ইবরাহীম আ. সম্মতি ও আত্মসমর্পণের মূর্তিমান প্রতীক হয়ে আল্লাহ পাকের আদেশ যথাসম্ভব জলদি পালনের নিমিত্তে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। কিন্তু এই ব্যাপারটি যেহেতু একাকী নিজের ব্যক্তিত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল না; বরং এই পরীক্ষার অন্য একটি অংশ ছিল তাঁর পুত্র, যাকে কুরবানী করার আদেশ করা হয়েছে। সুতরাং পুত্রের নিকট নিজের

স্বপ্ন বৃত্তান্ত এবং আল্লাহ পাকের আদেশ বর্ণনা করলেন। পুত্র ছিলেন ইবরাহীম আ.-এর মতো। তৎক্ষণাৎ আত্মসমর্পণের মস্তক অবনত করে দিলেন। বললেন, যদি এটাই আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হয়ে থাকে, তবে ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। এই কথোপকথনের পরে পিতা-পুত্র নিজেদের কুরবানী পেশ করার জন্য মাঠের দিকে রওনা হয়ে গেলেন। পিতা পুত্রের সম্মতি পেয়ে যবাহের জন্তুর মত পুত্রের হাত-পা বেঁধে নিলেন। ছুরি ধার দিলেন এবং পুত্রকে উপুড় করে শোয়ায়ে যবাহ শুরু করেন। তৎক্ষণাৎ ইবরাহীম আ.-এর ওপর আল্লাহর ওহী নাযিল হল : "হে ইবরাহীম! তুমি নিজের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছ। নিঃসন্দেহ, এটি বড় কঠিন পরীক্ষা ছিল। এখন পুত্রকে ছেড়ে দাও এবং তোমার নিকট এই যে দুম্বাটি দাঁড়ান রয়েছে, পুত্রের পরিবর্তে তা যবাই কর। আমি নেককারদেরকে এরূপে বিনিময় প্রদান করে থাকি। ইবরাহীম আ. পেছন দিকে তাকালে দেখতে পেলেন, অদূরে একটি দুম্বা দাঁড়ানো। হযরত ইবরাহীম আ. আল্লাহর শোকর আদায় করে দুম্বাটি যবাহ করলেন।

এটাই সেই কুরবানী যা আল্লাহ পাকের দরবারে এমনভাবে কবুল হল, এর স্মৃতিস্বরূপ সর্বদার জন্য ইবরাহীমী ধর্মের প্রতীক সাব্যস্ত হয়ে রইল এবং আজও প্রতি বছর ১০ যিলহজ ইসলামী দুনিয়ায় এটি পালন করা হয়।

কিন্তু এ ঘটনা দ্বারা একথা প্রমাণিত হল না, ইবরাহীম আ.-এর আওলাদের মধ্য হতে কুরবানীর পাত্র কে– হযরত ইসমাঈল না ইসহাক আ. ? কুরআন মাজিদ যদিও যবাহকৃত পুত্রের নাম উল্লেখ করে নি, কিন্তু যেভাবে ঘটনাটির আলোচনা করেছে, তাতে অবাধে প্রকাশ পায়, কুরআন মাজিদের ইবারত ইসমঈল আ.-কেই 'যবাহ' অর্থাৎ কুরবানীর পাত্র বলছে। এবং এটিই সঠিক। সূরা সাফফাতে এ ঘটনাকে বর্ণনা করা হয়েছে :

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ (١٠٠) فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ (١٠١) فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (١٠٢) فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (١٠٣) وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ (١٠٤) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١٠٥) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (١٠٦) وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (١٠٧) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (١٠٨) سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ (١٠٩) كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١١٠) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (١١١) وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (١١٢) وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ

"আয় পরওয়ারদিগার! আমাকে একটি নেককার পুত্র সন্তান দান করুন। ফলে আমি তাকে এক ধৈর্যশীল বালকের সুসংবাদ দিলাম। এরপর (পুত্র) যখন এমন বয়সে পৌঁছল, পিতার সঙ্গে দৌড়াতে পারে। ইবরাহীম পুত্রকে বলল, বৎস! স্বপ্নে দেখলাম,

আমি তোমাকে যবাহ করছি। সুতরাং তুমি ভেবে দেখ, তোমার কেমন মনে হয়। পুত্র বললেন, পিতা! যে বিষয়ে আপনি আদিষ্ট হয়েছেন, তা করে ফেলুন। ইনশাআল্লাহ আমাকে সহিষ্ণু পাবেন। এরপর যখন তাঁরা উভয়ে সম্মত হয়ে আত্মসমর্পণ করলেন এবং পুত্রকে উপুড় করে শোয়ালেন। তখন আমি তাঁকে ডেকে বললাম, ইবরাহীম! তুমি স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছ।

নিঃসন্দেহ, আমি নেককারদেরকে এইরূপে বিনিময় দান করে থাকি। অবশ্যই এটা এক প্রকাশ্য পরীক্ষা। আর আমি বিনিময় দান করেছি এক মহান কুরবানী (দুম্বা) দ্বারা। আর আমি ভবিষ্যতের বংশধরদের জন্য তার সম্বন্ধে একথা স্থায়ী রেখে দিলাম, "ইবরাহীমের ওপর শান্তি বর্ষিত হউক।" এরূপে আমি নেককারদের বিনিময় প্রদান করে থাকি। নিঃসন্দেহ, সে আমার মুমিন বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত। আর আমি তাকে ইসহাকের (জন্মের) সুসংবাদ দিলাম, যিনি নবী হবেন এবং নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। আর আমি বরকত প্রদান করলাম তার উপর এবং ইসহাকের ওপর।"

(সূরা সাফফাত : ১০০-১১৩)

এই আয়াতগুলিতে ইবরাহীম আ.-এর দুই পুত্রের সুসংবাদের কথা উল্লেখ রয়েছে। প্রথম পুত্রের নাম নেওয়া হয় নাই, শুধু ধৈর্যশীল বালক বলেই তার মহান কুরবানীর ঘটনার আলোচনা করেছেন এবং এরপর দ্বিতীয় পুত্রের সুসংবাদ নাম নিয়েই প্রদান করলাম, "আমি তাকে ইসহাকের সুসংবাদ প্রদান করলাম।" আর এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা, ইবরাহীম আ.-এর দুই পুত্র ইসমাঈল আ. ও ইসহাক আ.-এর মধ্যে ইসমাঈল আ. বয়সে বড় এবং ইসহাক আ. ছোট। অতএব, শেষের আয়াতে যখন ছোট পুত্রের উল্লেখ নাম নিয়েই করে দেওয়া হল, তখন প্রথম আয়াতে ইসমাঈল ছাড়া আর কার আলোচনা হতে পারে?

নিঃসন্দেহে তিনি ইসমাঈল আ., যিনি 'ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে সহিষ্ণু পাবেন' বলে এবং "আর তাঁকে মুখমণ্ডলের উপর শোয়ালেন।" কথাটি প্রকাশ করে এবং "তার পরিবর্তন করে দিলাম এক মহান কুরবানীর জন্তু দুম্বা দ্বারা"-এর সম্মান লাভ করলেন। এতদ্ভিন্ন শুধু কুরআন মাজিদই ইসমাঈলকে 'যবাহের পাত্র' বলে না; বরং তাওরাতের এবারতকে গভীর দৃষ্টিতে পাঠ করলে, তাওরাতও এটাই বলে, ইসমাঈল এবং শুধু ইসমাঈলই 'যবাহের পাত্র'।

ইসমাঈল যাবিহুল্লাহ আ.-এর ঘটনা

এ সম্পর্কে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। এখানে কিছু আয়াতে কারিমা নিয়ে আলোচনা করা হবে। আল্লাহ বলেছেন, তাঁর একনিষ্ঠ বন্ধু নবী ইবরাহীম আ. যখন নিজ সম্প্রদায় ও জন্মভূমি ত্যাগ করে যান, তখন তিনি আল্লাহর নিকট একটি নেককার পুত্র সন্তানের দোয়া করলেন। আল্লাহ তাঁকে একজন ধৈর্যশীল পুত্রের সুসংবাদ দান করেন। তিনি হলেন ইসমাঈল আ.। কেননা, তিনিই হলেন প্রথম পুত্র। হযরত ইবরাহীম আ.-এর ৮৬ বছর বয়সে তাঁর জন্ম হয়। এ ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই। فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ

السَّعْيَ' (সে যখন তার পিতার সাথে কাজ করার মত বয়সে উপনীত হল) অর্থাৎ 'যখন যুবক হল ও পিতার ন্যায় নিজের কাজকর্ম করার বয়সে পৌঁছল।' মুজাহিদ রহ. এর অর্থ করেছেন : তিনি যখন যুবক হলেন, স্বাধীনভাবে পিতার ন্যায় চেষ্টা-সংগ্রাম ও কাজকর্ম করার উপযোগী হলেন। যখন ইবরাহীম আ. তাঁর স্বপ্ন থেকে বুঝতে পারলেন, আল্লাহ তাঁর পুত্রকে যবেহ করার হুকুম দিয়েছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে এক মারফূ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে : رؤيا الانبياء وحى (নবীদের স্বপ্ন ওহী)। উবায়দ ইবনে উমায়রও এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এ নির্দেশ ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে ইবরাহীম খলীল আ.-এর প্রতি এক বিরাট পরীক্ষা। কেননা, তিনি এই প্রিয় পুত্রটি পেয়েছিলেন তাঁর বৃদ্ধ বয়সে। তা ছাড়া এ শিশুপুত্র ও তার মাকে এক জনমানবহীন শূন্য প্রান্তরে রেখে এসেছিলেন, যেখানে না ছিল কোনো কৃষি ফসল, না ছিল তরুলতা। ইবরাহীম খলীল আ. আল্লাহর নির্দেশ পালন করলেন। আল্লাহর উপর ভরসা রেখে তাদেরকে সেখানে রেখে আসেন। আল্লাহ তাদেরকে মুক্তির ব্যবস্থা করলেন। এমন উপায়ে পানাহারের ব্যবস্থা করে দিলেন, যা ছিল তাদের ধারণাতীত। এরপর যখন আল্লাহ এই একমাত্র পুত্রধনকে যবেহ করার নির্দেশ দেন, তখন তিনি দ্রুত সে নির্দেশ পালনে এগিয়ে আসেন। ইবরাহীম আ. এ প্রস্তাব তাঁর পুত্রের সামনে পেশ করেন। যাতে এ কঠিন কাজ সহজভাবে ও প্রশান্ত চিত্তে করতে পারেন। চাপ প্রয়োগ করে ও বাধ্য করে যবেহ করার চাইতে এটা ছিল সহজ উপায়।

قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى

ইবরাহীম বলল, 'বৎস! আমি স্বপ্নে দেখেছি, তোমাকে আমি যবেহ করছি। এখন তোমার অভিমত কি বল।'

ধৈর্যশীল পুত্র পিতার নির্দেশ পালন করার জন্যে খুশি মনে প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তিনি বললেন, হে আমার পিতা! আপনি যে ব্যাপারে আদিষ্ট হয়েছেন তা-ই করুন। আল্লাহর ইচ্ছায় আপনি আমাকে ধৈর্যশীলই পাবেন। এ জবাব ছিল চূড়ান্ত পর্যায়ের আন্তরিকতার পরিচায়ক। তিনি পিতার আনুগত্য ও আল্লাহর হুকুম পালনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন : فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করল এবং তার পুত্রকে কাত করে শুইয়ে দিল)। এ আয়াতাংশের কয়েকটি অর্থ বলা হয়েছে;

(১) তাঁরা উভয়ে আল্লাহর হুকুম পালনের উদ্দেশ্যে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন ও মনোবল দৃঢ় করেন।

(২) এখানে পূর্বের কাজ পরে ও পরের কাজ পূর্বে বলা হয়েছে। অর্থাৎ পিতা ইবরাহীম আ. পুত্র ইসমাঈল আ.-কে উপুড় করে শোয়ালেন।

(৩) ইবরাহীম আ. পুত্রকে উপুড় করে শোয়ান এ জন্য, যবেহ করার সময় তাঁর চেহারার উপর যাতে দৃষ্টি না পড়ে। ইবনে আব্বাস রাযি. মুজাহিদ, সাঈদ ইবনে জুবায়ের, কাতাদা ও যাহহাক রহ. এ মত পোষণ করেন।

(৪) লম্বাভাবে চিৎ করে শায়িত করান, যেমন পশু যবেহ করার সময় শায়িত করানো হয়। এ অবস্থায় কপালের এক অংশ মাটির সাথে লেগে থাকে। أَسْلَمَا অর্থ ইবরাহীম আ. যবেহ্ করার জন্য বিসমিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার বলেন। আর পুত্র মৃত্যুর জন্যে কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করেন।

সুদ্দী রহ. প্রমুখ বলেছেন, হযরত ইবরাহীম আ. গলায় ছুরি চালান কিন্তু তাতে বিন্দুমাত্রও কাটল না। কেউ বলেছেন, গলার নিচে তামার পাত রাখা হয়েছিল। কিন্তু তাতেও কাটা যায় নি। আল্লাহই সম্যক অবগত।

এ সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় : أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ (١٠٤) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا (ইবরাহীম! তুমি স্বপ্নকে সত্যই পালন করলে) অর্থাৎ তোমাকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে। তুমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছ। আল্লাহর নির্দেশ পালন করার জন্যে তোমার আগ্রহ ও আনুগত্য প্রমাণিত হয়েছে। তুমি পুত্রকে কুরবানীর জন্যে পেশ করেছ। যেমন ইতিপূর্বে তুমি আগুনে নিজের দেহকে সমর্পণ করেছিলে এবং মেহমানদের জন্যে প্রচুর অর্থ-সম্পদ ব্যয় করেছিলে।

আল্লাহ তাআলা বলেন : إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (নিশ্চয়ই এ ছিল স্পষ্ট পরীক্ষা) প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট পরীক্ষা। আল্লাহর বাণী :

وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ

(আমি তাকে মুক্তি দিলাম এক মহান কুরবানীর বিনিময়ে।)

অর্থাৎ একটি সহজ বিনিময় দ্বারা আমি ইবরাহীম আ.-এর পুত্রকে যবেহ করা থেকে মুক্ত করে দিলাম। অধিকাংশ আলেমের মতে, এ বিনিময়টি ছিল শিং বিশিষ্ট একটি সাদা দুম্বা– যাকে ইবরাহীম আ. ছাবীর পর্বতে একটি বাবলা বৃক্ষে বাঁধা অবস্থায় দেখতে পেয়েছিলেন। ইমাম ছাওরী রহ. ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, ঐ দুম্বাটি জান্নাতে চল্লিশ বছর পর্যন্ত বিচরণ করেছিল। সাঈদ ইবনে জুবায়র রাযি. বলেছেন : দুম্বাটি জান্নাতে চরে বেড়াত। এক সময়ে এটা ছাবীর পর্বত ভেদ করে বের হয়ে আসে। তার শরীরে ছিল লাল বর্ণের পশম। ইবনে আব্বাস রাযি. সূত্রে বর্ণিত, শিংযুক্ত একটি দুম্বা ছাবীর পাহাড় থেকে নেমে ইবরাহীম আ.-এর নিকট হেঁটে আসে এবং ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে ডাকতে থাকে। ইবরাহীম আ. তাকে ধরে যবেহ করেন। এই দুম্বাটি হযরত আদম আ.-এর পুত্র হাবিলও কুরবানী করেছিলেন এবং আল্লাহ তা কবুলও করেছিলেন। ইবনে আবী হাতিম রহ. এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

কুরআনে একে ذِبْحٍ عَظِيمٍ 'মহান যবেহ' বলা হয়েছে এবং 'সুস্পষ্ট পরীক্ষা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসে দুম্বার কথা বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমদ রহ. সাফিয়া বিনতে শায়রা রাযি.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বনি সুলাইমের এক মহিলা আমাকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উসমান ইবনে তালহাকে ডেকে পাঠান। বর্ণনাকারী উসমান রাযি. কে জিজ্ঞেস করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে কেন সংবাদ দিয়েছিলেন? উসমান রাযি. বললেন, আমি যখন কাবা ঘরে প্রবেশ করি তখন সেই দুম্বার দুটি শিং দেখতে পাই। এটা ঢেকে রাখার জন্যে তোমাকে বলতে আমি ভুলে যাই। তখন তিনি শিং দুটি ঢেকে দেন। কেননা, আল্লাহর ঘরে এমন কিছু থাকা উচিত নয় যা মুসল্লিদের একাগ্রতা বিনষ্ট করে। সুফিয়ান রাযি. বলেছেন, ইবরাহীম আ.-এর দুম্বার শিং দুটি সর্বদা কাবা ঘরে সংরক্ষিত ছিল। যখন খানায়ে কাবায় আগুন লেগে যায় তখন শিং দুটি পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। ইবনে আব্বাস রাযি. সূত্রে বর্ণিত দুম্বাটির মাথা সর্বদা কাবার মীযাবে (কার্ণিশে) ঝুলান থাকত এবং রৌদ্রে তা শুকিয়ে যায়। কেননা, তিনিই মক্কায় বসবাস করতেন। হযরত ইসহাক আ. শিশুকালে মক্কায় এসেছিলেন কিনা আমাদের জানা নেই। আল্লাহই উত্তমরূপে অবগত।

কুরআন থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, বরং বলা যায় এ উদ্দেশ্যেই আয়াত নাযিল হয়েছে, ইসমাঈল আ.-ই যাবীহুল্লাহ। কেননা, আল্লাহ কুরআনে প্রথমে যাবিহ-এর ঘটনা উল্লেখ করে পরে বলেছেন :

وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ

(আমি ইবরাহীমকে ইসহাকের সুসংবাদ দিলাম। সে ছিল নবী, সৎকর্মশীলদের একজন।)

বাক্যটিতে যারা একে حال বলেছেন, তাদের এরূপ ব্যাখ্যা মনগড়া। ইসহাক আ.-কে যাবীহুল্লাহ বলা ইহুদি চক্রান্ত ছাড়া আর কিছু নয়। তারা তাদের কিতাবে এ স্থানে নিঃসন্দেহে বিকৃত করেছে। তাদের মতে, আল্লাহ ইবরাহীম আ.-কে আদেশ করেন তাঁর একক ও প্রথম পুত্র ইসহাককে যবেহ করতে। ইসহাক শব্দটি এখানে জোর করে ঢুকানো হয়েছে। যা মিথ্যা ও কাল্পনিক। কেননা, ইসহাক আ. একক পুত্রও নন, প্রথম পুত্রও নন। বরং একক ও প্রথম পুত্র ছিলেন ইসমাঈল আ.। ইহুদিরা আরব মুসলমানদের প্রতি হিংসার বশবর্তী হয়ে এমনটি করেছে। কারণ ইসমাঈল আ. হলেন আরবদের পিতৃপুরুষ– যারা হিজাযের অধিবাসী এবং যাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্মগ্রহণ করেন। পক্ষান্তরে, ইসহাক আ. হলেন ইয়াকুব আ.-এর পিতা। ইয়াকুব আ.-কে ইসরাঈলও বলা হত। বনি ইসরাঈলরা তাঁর দিকেই নিজেদের সম্পর্কিত করে থাকে। তারা আরবদের এই গৌরব নিজেদের পক্ষে নিতে চেয়েছিল। এ উদ্দেশ্যে তারা আল্লাহর কালাম পরিবর্তন করে এবং মিথ্যা ও বাতিল কথার অনুপ্রবেশ ঘটায়। কিন্তু তারা বুঝল না, সম্মান ও মর্যাদার চাবিকাঠি আল্লাহর হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন। প্রাচীন আলেমদের একটি দল ইসহাক আ.-কে যাবীহুল্লাহ বলেছেন। তারা এ মত গ্রহণ করেছেন সম্ভবত কাব আহবারের বর্ণনা থেকে, কিংবা আহলে কিতাবদের সহিফা থেকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ ব্যাপারে কোনো সহি হাদিস বর্ণিত হয় নি। সুতরাং এসব

মতামতের দ্বারা আমরা কুরআনের স্পষ্ট বর্ণনাকে ত্যাগ করতে পারি না। কুরআনের বর্ণনা থেকে ইসহাক আ.-কে যাবীহুল্লাহ বলার কোনোই অবকাশ নেই। বরং কুরআন থেকে যা বোঝা যায়– কুরআনের উক্তি ও সুস্পষ্ট বর্ণনা এই, তিনি হলেন ইসমাঈল আ.। মুহাম্মদ ইবনে কাব আল কুরাজি রহ. এ প্রসঙ্গে একটি সুন্দর যুক্তি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যাবীহুল্লাহ হযরত ইসমাঈল আ.; ইসহাক আ. নয়। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ

আমি ইবরাহীমের স্ত্রী সারাহকে ইসহাকের এবং ইসহাকের পরে ইয়াকুবের জন্মের সুসংবাদ দিলাম।

এখানে ইসহাকের জন্ম হওয়ার এবং তার থেকে পুত্র ইয়াকুবের জন্ম হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই সাথে যদি ইয়াকুব আ.-এর জন্মের পূর্বেই ইসহাক আ.-কে বাল্যকালে যবেহের নির্দেশও দেওয়া হয়, তবে পূর্বের সুসংবাদ আর এ সুসংবাদ থাকে কি করে? বরং এটা হয়ে যায় সুসংবাদের বিপরীত।

ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে দুটি মত বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি মত উপরের অনুরূপ। কিন্তু তাঁর সঠিক মত ও অধিকাংশ সাহাবা, তাবিঈ ও আলিমদের মতে হযরত ইসমাঈল আ.-ই যাবীহুল্লাহ। মুজাহিদ, সাঈদ, শাবী, ইউসুফ ইবনে মাহরান, আতা প্রমুখ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি হলেন ইসমাঈল আ.। ইবনে জারীর রহ. আতা ইবনে আবি রবাহ রহ.-এর সূত্রে ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন, যার পরিবর্তে দুম্বা যবেহ হয়েছে তিনি হযরত ইসমাঈল আ.। অথচ ইহুদিরা বলে থাকে ইসহাক আ.-এর কথা। এটা তারা মিথ্যা বলে। ইমাম আহমদের পুত্র আবদুল্লাহ রহ. বলেছেন, আমার পিতার মত হলো, যাবীহুল্লাহ হযরত ইসমাঈল আ.। ইবনে আবী হাতিম রহ. বলেন, আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করেছি, যাবীহুল্লাহ.কে? তিনি বলেছেন, যথার্থ কথা হল– তিনি হযরত ইসমাঈল আ.। ইবনে আবী হাতিম রহ. বলেন : হযরত আলী, ইবনে ওমর, আবু হোরায়রা রাযি. আবুত-তুফায়ল, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব, সাঈদ ইবনে জুবায়র, হাসান, মুজাহিদ, শাবী, মুহাম্মদ ইবনে কাব, আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে আলী ও আবু সালেহ সকলেই বলেছেন– যাবীহুল্লাহ হযরত ইসমাঈল আ.। ইমাম বগবী রহ.-ও উপরোক্ত মত রাবী ইবনে আনাস রাযি., কালবী ও আবু আমর ইবনে আলা রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন। হযরত মুআবিয়া রাযি. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সম্বোধন করল এভাবে– يَا ابْنَ ذِى الذَّبِيحَتَيْن হে দুই যাবীহার পুত্র! একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেসে দিলেন। উমর ইবনে আবদুল আযীয রহ. ও মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক রহ.-ও এই কথা বলেছেন। হাসান বসরী রহ. বলেন, এ বর্ণনায় কোনো সন্দেহ নেই। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক মুহাম্মদ ইবনে কাব সূত্রে বর্ণনা করেন– তিনি

বলেন, উমর ইবনে আবদুল আযীয রহ. যখন খলিফা, তখন আমি সিরিয়ায় ছিলাম। আমি ইসমাঈল আ. যাবীহুল্লাহ হওয়ার পক্ষে খলিফার নিকট দলিল স্বরূপ এই আয়াত পেশ করলাম :

فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ

(আমি তাকে ইসহাকের ও ইসহাকের পরে ইয়াকুবের জন্মের সুসংবাদ দিলাম)।

তখন খলিফা উমর ইবনে আবদুল আযীয রহ. বললেন, এটা তো একটা চমৎকার দলীল, এ দিকটা আমি লক্ষ করি নি। এখন দেখছি তুমি যা বলছ তাই সঠিক। এরপর খলিফা সিরিয়ায় বসবাসকারী এক লোককে ডেকে আনতে বলেন। ঐ লোকটি পূর্বে ইহুদি ছিল। পরে ইসলাম গ্রহণ করে এবং একজন ভালো মুসলমান হয়। লোকটি ইহুদি সম্প্রদায়ের আলিম ছিল। খলিফা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ইবরাহীম আ.-এর দুই পুত্রের মধ্যে কোন্ পুত্রকে যবেহ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। সে বলল, আল্লাহর শপথ ইসমাঈল আ.-কে। আমীরুল মুমিনীন! ইহুদিরা একথা ভালোরূপেই জানে। কিন্তু তারা আরবদের প্রতি হিংসা পোষণ করে এ কারণে, তাদের পিতৃপুরুষ এমন এক ব্যক্তি যার ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ রয়েছে এবং যবেহের নির্দেশ পেয়ে ধৈর্য ধরার কারণে যার সম্মান ও মর্যাদার উল্লেখ করা হয়েছে। এ কারণেই ইহুদিরা জেনে-বুঝে তাকে অস্বীকার করে এবং বলে, ইসহাক আ.কেই যবেহ করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। কেননা, ইসহাক আ. তাদের পিতৃপুরুষ।

কাবা গৃহ নির্মাণ

হযরত ইবরাহীম আ. যদিও ফিলিস্তিনে অবস্থান করতেন, কিন্তু সর্বদা ইসমাঈল আ. ও হাজেরাকে দেখবার জন্য মক্কায় আগমন করতেন। এ সময়ের ভেতরে হযরত ইবরাহীম আ.-এর প্রতি আল্লাহ তাআলার আদেশ হল, বাইতুল্লাহ নির্মাণ কর। হযরত ইবরাহীম আ. হযরত ইসমাঈল আ.-এর সাথে আলোচনা করে পিতা-পুত্র মিলে বাইতুল্লাহর নির্মাণ কাজ শুরু করে দিলেন।

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. ফাতহুল বারী কিতাবে (৮/১৩৮) একটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। যাতে প্রকাশ পায়, বাইতুল্লাহ শরীফের সর্বপ্রথম ভিত্তি হযরত আদম আ.-এর হাতে স্থাপিত হয়েছিল। ফেরেশতারা তাঁকে সেই স্থানটি দেখিয়ে দিয়েছিলেন, যেখানে কাবাগৃহ নির্মিত হওয়ার ছিল। কিন্তু হাজার হাজার বৎসরের ঘটনাবলী বহুকাল পূর্বে তা নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল। অবশ্য হযরত ইবরাহীম আ.-এর কালে নিশ্চিহ্ন গৃহটি একটি টিলা কিংবা মাটির ঢিপির আকারে বিদ্যমান ছিল। আল্লাহ পাক অহির মাধ্যমে ইবরাহীম আ.-কে বাইতুল্লাহর স্থান জানিয়ে দিলেন। তিনি হযরত ইসমাঈল আ.-এর সহায়তায় তা খুঁড়তে শুরু করেন। পূর্ব নির্মাণের ভিত্তিমূল দৃষ্ট হতে লাগল। সেই ভিত্তিমূলের ওপরই ইবরাহীম আ. কর্তৃক বাইতুল্লাহ নির্মিত হল। কিন্তু কুরআন মাজিদ বাইতুল্লাহ নির্মাণের ব্যাপারটি হযরত ইবরাহীম আ. হতেই আরম্ভ করেছে এবং এর পূর্ববর্তী অবস্থার কোনো আলোচনা করে নি। কুরআন মাজিদ বলে :

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ

"নিঃসন্দেহ, সর্বপ্রথম ঘরটি যা (আল্লাহ পাকের স্মরণ করার উদ্দেশ্যে) মানুষের জন্য নির্মিত হয়েছে, তা সেই ঘর যা মক্কায় অবস্থিত। এটি আপাদমস্তক বরকতময়। আর দুনিয়াবাসীদের জন্য হেদায়ত (এর উৎস)।" (সূরা-আলে-ইমরান : ৯৬)

এবারকার নির্মাণের এই বুযুর্গী রয়েছে, ইবরাহীম আ.-এর ন্যায় আল্লাহর দোস্ত, অতি উচ্চ মর্যাদাশালী পয়গম্বর এর রাজমিস্ত্রী। আর ইসমাঈল আ.-এর ন্যায় নবী এবং আল্লাহর যাবীহ (আল্লাহর নামে কুরবানীর জন্য উৎসর্গিত) এর যোগালদার। পিতা-পুত্র উভয়ে সর্বদা এর নির্মাণ কার্যে রত। যখন এর দেওয়ালগুলো গাঁথতে গাঁথতে উপরে উঠয়া গেল এবং বুযুর্গ পিতার হস্ত উপরে গাঁথতে অক্ষম হয়ে গেল তখন আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ অনুসারে একখণ্ড প্রস্তরকে 'ভারবাহী' বানানো হলো। হযরত ইসমাঈল আ. এটি নিজের হাতে ধরে রাখতেন এবং হযরত ইবরাহীম আ.-এর ওপর আরোহণ করে গেঁথে যেতেন।

এই সেই স্মৃতিচিহ্ন যা আজ মাকামে ইবরাহীম নামে পরিচিত। যখন নির্মাণ কার্য এই সীমায় পৌঁছল যেখানে বর্তমানে হাজরে আসওয়াদ (কৃষ্ণপাথর) লাগানো রয়েছে, তখন জিবরাঈল আ. হযরত ইবরাহীম আ.-কে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন এবং নিকটস্থ একটি পাহাড় হতে হাজরে আসওয়াদকে, যা বেহেশত হতে আনা পাথর বলে কথিত, সুরক্ষিত অবস্থায় বের করে তার সম্মুখে রেখে দিলেন, যেন যথাস্থানে স্থাপন করা যায়।

'বাইতুল্লাহ'– আল্লাহর ঘর যখন নির্মিত হয়ে গেল, তখন আল্লাহ্ পাক হযরত ইবরাহীম আ.-কে বললেন : এটি ইবরাহীমী ধর্মের কেবলা এবং আমার সম্মুখে মস্তক অবনত করার প্রতীক। সুতরাং একে তাওহিদ তথা একত্ববাদের কেন্দ্র সাব্যস্ত করা হল। তখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল আ. দুআ করলেন, আল্লাহ্ তাআলা যেন তাদেরকে এবং তাদের সন্তানদেরকে নামায কায়েম করা ও যাকাত প্রদান করার হেদায়ত দান করেন। এর ওপর দৃঢ়তা ও স্থায়িত্বও দান করেন। আর তাদের জন্য নানাবিধ ফল, মেওয়া ও রিযিকের বরকত দান করেন। আর সমগ্র বিশ্বের দিক দিগন্তের বাসিন্দাগণ হতে হেদায়েতপ্রাপ্তদের দলকে এদিকে আকৃষ্ট করে দেন। যেন তারা দূর-দূরান্ত থেকে এসে হজের আহকাম আদায় করে এবং হেদায়ত ও সৎপথ প্রাপ্তির এই কেন্দ্রস্থলে একত্র হয়ে নিজেদের জীবনের সৌভাগ্য লাভ করে।

কুরআন মাজিদ বাইতুল্লাহ শরীফ নির্মাণকালে হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল আ.-এর মুনাজাত, নামায কায়েম করা ও হজের করণীয় কাজগুলো সম্পন্ন করার জন্য আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ এবং বাইতুল্লাহ তাওহীদের কেন্দ্রস্থল হওয়ার ঘোষণা স্থানে স্থানে উল্লেখ করেছে। এবং নতুন নতুন ভঙ্গীতে এর মহত্ত্ব ও উচ্চ মর্যাদাকে নিম্নোক্ত আয়াতগুলোতে ব্যক্ত করেছে :

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ (٩٦) فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

"নিঃসন্দেহ, সর্বপ্রথম ঘর, যা মানুষের জন্য (আল্লাহর ইবাদতের ইবাদতখানা ও কেন্দ্রস্থলে) বানানো হয়েছে, তা এটিই (ইবাদতখানই) যা মক্কায় অবস্থিত, বরকতমত এবং সমস্ত মানুষের জন্য হেদায়তের উৎস, (সত্য ধর্মের) উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ, তন্মধ্যে মাকামে ইবরাহীম অন্যতম। (ইবরাহীম আ.-এর দাঁড়ানো ও ইবাদত করার স্থান, যা সেকাল হতে আজ পর্যন্ত নিঃসন্দেহে প্রসিদ্ধ ও নির্দিষ্ট রয়েছে।) আর (তন্মধ্য হতে এই বিষয়টিও) যে কেউ এর সীমায় প্রবেশ করে সে নিরাপত্তা ও হেফাযতের মধ্যে এসে যায়। আর (তন্মধ্য হতে এটাও) আল্লাহর তরফ হতে মানুষের জন্য এই বিষয়টি অবশ্য কর্তব্য হয়েছে, যদি সেই ঘর পর্যন্ত পৌছার সামর্থ প্রাপ্ত হয়, সে যেন হজ করে। এতকিছু সত্ত্বেও যে কেউ (এ সত্যকে) অবিশ্বাস করে (এবং এ স্থানের পবিত্রতা ও ফযিলতের প্রতি বিশ্বাস না করে) তবে স্মরণ রেখো, আল্লাহ পাকের সত্তা সারা দুনিয়া হতে অমুখাপেক্ষী (তিনি নিজের কাজের জন্য কোনো ব্যক্তি বা দলের মুহতাজ নন)।
(সূরা-আলে ইমরান : ৯৬-৯৭)

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (١٢٥) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (١٢٦) وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١٢٧) رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (١٢٨) رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

"আর (দেখ,) যখন আমি (মক্কার) সেই ঘরটিকে (কাবাগৃহকে) মানুষের সমবেত হওয়ার কেন্দ্রস্থল ও নিরাপত্তার স্থান সাব্যস্ত করলাম এবং আদেশ করলাম, মাকামে ইবরাহীমকে যেন (চিরকালের) নামাযের স্থান করা হয়। আর আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করলাম, আমার নামে যে ঘর নির্মাণ করা হয়েছে তা তার তাওয়াফকারী, তার মধ্যে ইবাদতকারী এবং রুকু ও সেজদাকারীদের জন্য (সর্বদা)

পবিত্র রেখো-(কুফর এবং নাফরমানির দ্বারা অপবিত্র করো না)। আর যখন ইবরাহীম আল্লাহর দরবারে দোয়া করল- পরওয়ারদিগার! এই স্থানটিকে (যা দুনিয়ার আবাদ ও উর্বর ভূখণ্ডগুলো হতে দূরে এবং সবুজ ও সতেজ শূন্য) শান্তি ও নিরাপত্তার একটি শহর করে দিন। নিজ দয়া ও অনুগ্রহে এরূপ করে দিন, যেন এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে যারা আপনার ওপর এবং কেয়ামত দিবসের উপর ঈমান আনয়নকারী হয়, তাদের জীবিকার জন্য সর্বপ্রকারের উৎপন্ন শস্যাদি সংগৃহীত হয়ে যায়। এই দোয়ার জবাবে আল্লাহ পাক বলেছিলেন, (তোমার দোয়া মনযুর করা হল এবং এখানকার অধিবাসীদের মধ্য হতে) যে কুফরি এখতিয়ার করবে, তাদেরও আমি (জীবিকার সরঞ্জামাদি দ্বারা) উপভোগ করতে দিব। অবশ্য এই উপভোগ অতি অল্পকালের জন্য হবে। কেননা, পরিশেষে তাকে (কর্মফল ভোগ করার জন্য) বাধ্য হয়ে দোযখে যেতে হবে। (যে হতভাগা নেয়ামতের পথ ত্যাগ করে আযাবের পথ এখতিয়ার করে, কতই না মন্দ তার সেই পথ, আর) কতই না মন্দ তার বাসস্থান। আর (দেখ, তা কেমন আযিমুশশান এবং বিপ্লবের সময় ছিল), যখন ইবরাহীম আ. কাবাগৃহের বুনিয়াদ উন্নত করছিলেন এবং ইসমাঈল আ. তাঁর সাথে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, (তাঁদের হাত তো কাজ করছিল আর অন্তরে ও মুখে এ দুআ উচ্চারিত হচ্ছিল), হে আমাদের পরওয়ারদিগার! (আমরা আপনার দুইজন দুর্বল বান্দা আপনার পবিত্র নামে এই ঘরের ভিত্তি স্থাপন করছি,) আমাদের এই কাজটি কবুল করে নিন।

নিঃসন্দেহ, আপনিই (দুআসমূহ) শ্রবণকারী এবং (দুনিয়ার সুযোগ-সুবিধা সম্বন্ধে) পরিজ্ঞাত। হে পরওয়ারদিগার! আপনি (নিজ দয়া ও অনুগ্রহে) আমাদেরকে এমন তাওফিক দান করুন, যেন আমরা সত্যিকারের মুসলিম (অর্থাৎ আপনার হুকুমের অনুগত) হয়ে যাই। হে খোদা! আমাদেরকে আপনার এবাদতের (সঠিক) পন্থা বলে দিন, আর আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করুন। নিঃসন্দেহ, আপনিই একমাত্র সত্তা, যিনি স্বীয় রহমতে ক্ষমা করে থাকেন। যাঁর 'রাহিম' সুলভ ক্ষমার কোনো সীমা নাই। আর হে আমাদের পরওয়ারদিগার! (নিজ দয়ায় ও অনুগ্রহে) এই জনপদের অধিবাসীদের মধ্যে আপনার এমন একজন রাসূল প্রেরণ করুন, তিনি যেন তাদেরই মধ্য হতে হন, তিনি আপনার আয়াতসমূহ পাঠ করে লোকদেরকে শুনান, তাদেরকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেন, আর নিজের পয়গম্বর সুলভ শিক্ষা ও উপদেশ দ্বারা তাদের অন্তরসমূহকে পরিষ্কার ও মার্জিত করে দেন। হে পরওয়ারদিগার! নিঃসন্দেহ, আপনার সত্তাই হেকমতওয়ালা, সর্বজয়ী।" (সূরা বাকারা : ১২৫-১২৯)

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (٢٦) وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (٢٧) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (٢٨) ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٢٩) ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (٣٠) حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ (٣١) ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (٣٢) لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٣٣)

"আর (সেই সময়টুকু স্মরণ করুন) যখন আমি ইবরাহীমের জন্য কাবাগৃহের সঠিক স্থান নির্ধারণ করে দিলাম। (এবং আদেশ করলাম) আমার সাথে কোনো বস্তুকে শরীক সাব্যস্ত করো না এবং আমার এই ঘরটিকে ঐ সমস্ত লোকের জন্য পবিত্র রাখ, যারা তওয়াফকারী হয়, ইবাদতে খুব তৎপর হয়, রুকু ও সেজদায় মস্তক অবনতকারী হয় এবং (আদেশ করলাম), লোকদের মধ্যে হজের ঘোষণা করে দাও, লোকেরা তোমার নিকট দুনিয়ার দূর-দূরান্তের পথ হতে আসতে থাকবে– পদব্রজে এবং সর্বপ্রকারের যানবাহনে আরোহণ করে। যারা (সফরের কষ্টে) শ্রান্ত ও ক্লান্ত থাকবে। তারা এই জন্য আসবে, নিজেদের উপকার বা স্বার্থ লাভের স্থানে সমবেত হবে। আর আমি যে সমস্ত গৃহপালিত পশু তাদের জন্য সংগ্রহ করে দিয়েছি, তাদের কুরবানী করার সময় নির্ধারিত দিনসমূহে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে। এরপর তোমরা কুরবানীর গোশত নিজেরা খাও এবং ক্ষুধাতুর মিসকিনদেরও খাওয়াও। অনন্তর কুরবানী করার পরে তারা যেন নিজেদের শরীরের ও পোশাকের ময়লা আবর্জনা দূর করে ফেলে (অর্থাৎ এহরাম ভঙ্গ করে পোশাক খুলে ফেলে) আর নিজের মানতসমূহও পূর্ণ করে

এবং পুরাতন গৃহের (অর্থাৎ কাবা ঘরের) চারদিকে তওয়াফ করে, অতএব দেখ, (হজের) বিষয়টি এইরূপ হল, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্ধারিত সম্মানিত বস্তুগুলির সম্মান করে, তার জন্য তার পরওয়ারদিগারের দরবারে তা খুবই উত্তম। আর (এটাও স্মরণ রাখ,) ঐ সমস্ত জন্তু ব্যতীত যা কুরআন মাজিদে অবৈধ বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, অন্যান্য সকল চতুষ্পদ জন্তুই তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। অতএব, তোমাদের কর্তব্য– প্রতিমাসমূহের অপবিত্রতা হতে বেঁচে থাক, মিথ্যা বলা হতেও দূরে থাক, শুধু আল্লাহর হয়ে থাক। তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করো না। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক সাব্যস্ত করেছে, তবে তার অবস্থা মনে কর– যেমন সে বহু উচ্চস্থান হতে নীচে পড়ে গিয়েছে। যে বস্তু এভাবে পতিত হবে, তাকে হয়তো কোনো পক্ষী ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে, কিংবা বায়ুর একটা ঝাপটা এসে তাকে উঠিয়ে দূর-দূরান্তের কোনো কোণায় নিয়ে ফেলে দিবে। (প্রকৃত অবস্থা এই) অতএব, (স্মরণ রেখ,) যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতীকসমূহের সম্মান করে, তবে বাস্তবিকই তা অন্তরের

পরহেযগারীমূলক বিষয়সমূহের অন্তর্গত। এ সমস্ত চতুষ্পদ জন্তুগুলোর মধ্যে এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তোমাদের জন্য (বিভিন্ন প্রকারের) উপকার রয়েছে, এরপর (সেই পুরাতন ঘরের অর্থাৎ কাবা গৃহের নিকট পৌঁছিয়ে তাদের কুরবানী করতে হবে।"

(সূরা-হজ : ২৬-৩৩)

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٣٦) لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ (٣٧)

"আর (দেখ,) কুরবানীর এই যে উট, (যাকে দূর-দূরান্ত হতে হজের স্থানে আনয়ন করা হয়) আমি একে সে সমস্ত বস্তুর মধ্যে নির্ধারিত করে দিয়েছি, যা তোমাদের জন্য আল্লাহ পাকের (এবাদতের) নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম। এতে তোমাদের জন্য মঙ্গল রয়েছে। অতএব, তোমাদের কর্তব্য– সারি সারি যবাই করার সময় তাদের উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর। এরপর যখন তা কোনো এক পার্শ্বের দিকে পড়ে যাবে (অর্থাৎ যবাহ হয়ে যাবে) এরপর এদের গোশত হতে নিজেও খাও এবং অভাবীদেরকে এবং সাক্ষাৎকারী অতিথিবৃন্দকেও খাওয়াও। এইরূপে আমি সেই জন্তুগুলিকে তোমাদের জন্য বশীভূত করে দিয়েছি, যেন (আল্লাহর অনুগ্রহের) শোকর আদায় কর। স্মরণ রেখো, আল্লাহর দরবার পর্যন্ত এই কুরবানীর গোশতও পৌঁছে না এবং এর রক্তও না। তাঁর দরবারে শুধু তোমাদের তাকওয়াই পৌঁছতে পারে। অর্থাৎ তোমাদের অন্তরের নিয়ত)। সেই জন্তুগুলিকে এমনভাবে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, যেন আল্লাহ পাকের হেদায়তের শোকরগুযার থাক এবং তাঁর নামের শ্রেষ্ঠত্বের আওয়াজ উচ্চ কর। আর নেককারদের জন্য (তাদের আমল কবুল হওয়ার) সুসংবাদ রয়েছে।"

(সূরা-হজ : ৩৬-৩৭)

কাবাঘর বায়তুল মামূরের সোজা নিচে যমীনে অবস্থিত। যদি বায়তুল মামুর নিচে পতিত হতো তবে তা অবশ্যই কাবা ঘরের উপরে পড়তো। শুধু তাই নয়, কোনো কোনো পূর্বসূরী আলেমের মতে, সাত আসমানের প্রতিটি ইবাদত গৃহ এই একই বরাবরে অবস্থিত। তাঁরা বলেছেন, প্রতিটি আসমানে একটি করে ঘর আছে। আসমানবাসীরা সেই ঘরে আল্লাহর ইবাদত করে থাকেন। আসমানবাসীদের জন্যে সেগুলো পৃথিবীর অধিবাসীদের কাবারই অনুরূপ। তাই আল্লাহ ইবরাহীম আ.-কে পৃথিবীর অধিবাসীদের জন্যে একটি ঘর নির্মাণ করতে আদেশ দেন, যেমনি আকাশের ফেরেশতাদের জন্যে ইবাদতখানা রয়েছে, আল্লাহ তাঁকে সে স্থান দেখিয়ে দেন। আকাশ ও যমীন সৃষ্টির পর থেকেই এই স্থানটিকে উক্ত ঘরের জন্যে নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছিল। বুখারী ও মুসলিমে এ কথাই বর্ণিত হয়েছে, এই শহরকে আল্লাহ সেদিনই 'হারাম'-

মর্যাদাসম্পন্ন করেছেন, যেদিন তিনি আসমান ও যমিন সৃষ্টি করেছিলেন। সুতরাং আল্লাহ প্রদত্ত মর্যাদায় কেয়ামত পর্যন্ত এটি হারাম-সম্মানিত থাকবে। কোনো সহি বর্ণনায় পাওয়া যায় নি, ইবরাহীম খলীল আ.-এর নির্মাণের পূর্বে এ ঘরের কোনো নির্মিতরূপ ছিল।

আয়াতে উল্লিখিত مَكَانَ الْبَيْتِ(ঘরের স্থান) শব্দ থেকে কেউ কেউ প্রমাণ করতে চেয়েছেন, এ ঘরের ভিত্তি পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তাঁদের এ দলীল যথার্থ নয়। কেননা, ঘরের স্থান বলে বোঝানো হয়েছে সেই স্থানকে যা আল্লাহর জ্ঞানে নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট ছিল এবং তাঁরই কুদরতে হযরত আদম আ. থেকে ইবরাহীম খলীল আ.-এর সময় পর্যন্ত সকল নবীর নিকট তা পরিচিত ছিল। আমরা আগেই বলেছি, হযরত আদম আ. এ ঘরের উপর গম্বুজ নির্মাণ করেছিলেন। ফেরেশতাগণ তাঁকে বলেছিলেন, আমরা আপনার পূর্বেই এ ঘর তাওয়াফ করেছি। নূহ আ.-এর কিশতী এ ঘরের চারদিকে চল্লিশ দিন (বা তার কাছাকাছি সময়) ধরে প্রদক্ষিণ করে। কিন্তু এগুলো ইসরাঈলি বর্ণনা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা বলেছি, ইসরাঈলী বর্ণনাকে আমরা সত্যও জানাবো না, মিথ্যাও বলবো না। সুতরাং এর দ্বারা কোনো প্রমাণ দেওয়া যাবে না। তবে যদি তা সত্যের বিপরীত হয় তবে অবশ্যই তা বর্জনীয়।

আল্লাহ বলেন :

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ

"নিশ্চয়ই সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের ইবাদতের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে, যা মক্কায় অবস্থিত তা অতি বরকতময় ও বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়েতের মাধ্যম।"

অর্থাৎ প্রথম ঘর যা সর্বসাধারণের কল্যাণার্থে নির্মাণ করা হয়েছে, তা ছিল বরকতের জন্যে ও হেদায়েতের জন্যে। بَكَّةَ শব্দ দ্বারা ২টি অর্থ বোঝা যায় (১) মক্কা, (২) কাবা যে জায়গার ওপর দাঁড়িয়ে আছে তা। فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ- (এতে রয়েছে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ।) কেননা, এটা নির্মাণ করেছেন ইবরাহীম খলীল আ.- যিনি তাঁর পরবর্তী সকল নবীর পিতা। নিজ বংশধরদের মধ্যে যারা তাঁকে অনুসরণ করেছে ও তাঁর রীতি-নীতি গ্রহণ করেছে, তাদের তিনি ইমাম।

এ কারণেই আল্লাহ বলেছেন مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ (ইবরাহীমের দাঁড়াবার স্থান) অর্থাৎ যে পাথরের উপর দাঁড়িয়ে তিনি কাবাঘর নির্মাণ করেছিলেন। কাবা ঘরের দেওয়াল যখন তাঁর চেয়ে উঁচু হয়ে যায়, তখন পুত্র ইসমাঈল আ. এ প্রসিদ্ধ পাথরখানা এনে পিতার পায়ের নিচে স্থাপন করেন, যাতে তার উপর দাঁড়িয়ে দেওয়াল উঁচু করতে পারেন। ইবনে আব্বাস রাযি.-এর দীর্ঘ হাদীসে এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ পাথরটি সেই প্রাচীনকাল থেকে হযরত ওমর রাযি.-এর খেলাফতকাল পর্যন্ত কাবার দেওয়াল সংলগ্ন ছিল। তিনি এটাকে কাবা ঘর থেকে কিছু পিছিয়ে দেন। যাতে সালাত আদায়কারী ও তাওয়াফকারীদের অসুবিধা না হয়। এ ব্যাপারে হযরত উমর রাযি.-এর পদক্ষেপকে সকলে মেনে নেন।

কেননা, যেসব বিষয়ে হযরত ওমর রাযি.-এর মতামত আল্লাহ তাআলার আনুকূল্য লাভ করে তন্মধ্যে এটি একটি। একবার তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট বলেছিলেন :

لَوِ اتَّخَذْنَا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

কতই না ভালো হত, যদি মাকামে ইবরাহীমকে আমরা সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ করতাম!

তখন আল্লাহ আয়াত নাযিল করেন :

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

(তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থান রূপে গ্রহণ কর।)

ইসলামের প্রাথমিক যুগ পর্যন্ত ঐ পাথরের উপর হযরত ইবরাহীম আ.-এর পায়ের দাগ অবশিষ্ট ছিল। অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম আ. যে পাথরের উপর দাঁড়িয়ে কাবাঘর নির্মাণ করেছিলেন, সেই পাথরের উপর তাঁর পায়ের চিহ্ন অঙ্কিত হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন :

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ

(স্মরণ কর যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল বায়তুল্লাহর প্রাচীর তুলছিল।)

তখন তারা এই দুআ পাঠ করেছিলেন :

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এ কাজ গ্রহণ কর। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত।

এ থেকে সহজেই বোঝা যায়, আল্লাহর নির্দেশ পালনে তাঁরা উভয়ে ছিলেন একান্ত নিষ্ঠাবান। তাই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা আল্লাহর নিকট তাঁরা দুআ করেছেন তাঁদের এ মহৎ কাজ ও প্রচেষ্টা কবুল করার জন্যে। আল্লাহর বাণী :

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا

إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের উভয়কে তোমার একান্ত অনুগত কর এবং আমাদের বংশধর হতে তোমার এক অনুগত উম্মত কর। আমাদেরকে ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি দেখিয়ে দাও এবং আমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হও। তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা বাকারা : ১২৭-২৮)

হযরত ইবরাহীম খলীল আ. বিশ্বের সবচেয়ে অধিক সম্মানিত মসজিদকে সবচেয়ে অধিক সম্মানিত স্থানে প্রতিষ্ঠা করেন। সে স্থানটি এমন একটি উপত্যকা, যেখানে

কোনো ফসল উৎপাদিত হয় না। তিনি তথাকার অধিবাসীদের জন্যে বরকতের দুআ করেন। ফলের দ্বারা তাদের রিযিকের ব্যবস্থা করতে দুআ করেন। যদিও সেখানে পানির স্বল্পতা এবং বৃক্ষ, ফল ও ফসলের শূন্যতা ছিল। তিনি আল্লাহর কাছে দুআ করেন এ স্থানকে সম্মানিত ও নিরাপদ স্থানে পরিণত করতে। আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করেন, আহবানে সাড়া দেন ও প্রার্থিত বস্তু দান করেন। আল্লাহ বলেন :

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ

"ওরা কি দেখে না, আমি হারামকে নিরাপদ স্থান করেছি, অথচ এর চারপাশে যে সব মানুষ আছে তাদের উপর হামলা করা হয়।" (সূরা আনকাবূত : ৬৭)

আল্লাহ আরও বলেন :

أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا

"আমি কি ওদেরকে এক নিরাপদ হারামে প্রতিষ্ঠিত করি নি, যেখানে সর্বপ্রকার ফলমূল আমদানী হয় আমার দেওয়া রিযিক স্বরূপ?" (সূরা কাসাস : ৫৭)

হযরত ইবরাহীম আ. আল্লাহর কাছে তাদের মধ্যে একজন রাসূল প্রেরণ করার জন্যে দুআ করেন। অর্থাৎ তাদের স্বজাতির মধ্য থেকে তাদেরই উন্নত ভাষাশৈলীতে পারদর্শী কোনো ব্যক্তিকে। যাতে করে দীন ও দুনিয়ার উভয় নিয়ামতের পূর্ণ অধিকারী হতে পারে। আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করেন। তিনি তাদের মধ্য থেকে রাসূল প্রেরণ করেন। যিনি ছিলেন সর্বশেষ নবী, তাঁর পরে আর কোনো নবী-রাসূল আসবেন না। তাঁর দীনকে পূর্ণতা দান করেন, যা ইতিপূর্বে কারও ক্ষেত্রে করেন নি। তাঁর দাওয়াতকে সর্বকালে সর্বদেশে পৃথিবীর সকল ভাষাভাষীর জন্যে ব্যাপক ও বিস্তৃত করে দিয়েছেন। কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর দীনই বলবৎ থাকবে।

সকল নবীর মধ্যে এটা ছিল তাঁর একক বৈশিষ্ট্য, তাঁর ব্যক্তিত্বের মর্যাদা, তাঁর আনীত দীনের পূর্ণতা, জন্মভূমির গৌরব, ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব, উম্মতের উপর তার অশেষ দয়া ও মমতা, বংশ মর্যাদা এবং তাঁর আচার-আচরণ। এ কারণে হযরত ইবরাহীম আ. যখন দুনিয়াবাসীর জন্যে কাবা নির্মাণ করেন, তখন তা সম্মান ও মর্যাদায় সপ্তম আকাশের অধিবাসী ফেরেশতাগণের কাবা বায়তুল মামুরের সমমর্যাদা লাভ করে। বায়তুল মামুরে প্রত্যহ সত্তর হাজার ফেরেশতা ইবাদত করে থাকেন এবং একবার যারা এ সুযোগ পান তাঁরা কিয়ামত অবধি আর দ্বিতীয়বার সে সুযোগ পান না।

সুদ্দী বলেছেন, আল্লাহ যখন ইবরাহীম আ. ও ইসমাঈল আ.-কে কাবা নির্মাণের আদেশ করেন, তখন তাঁরা কাবার স্থানটি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। আল্লাহ তখন খাজুজ নামক একটি বায়ু প্রেরণ করেন। তার ছিল দু'টি পাখা ও সর্পাকৃতির মস্তক। সে বায়ু প্রাচীন কাবার স্থানটি আবর্জনামুক্ত করে দেয়। তখন ইবরাহীম আ. ও ইসমাঈল আ. তা অনুসরণ করে কোদাল দ্বারা মাটি খুঁড়ে সেখানে ভিত্তি স্থাপন করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ

(যখন আমি ইবরাহীমকে ঘরের স্থান নির্ধারন করে দিলাম।)

ভিত্তির উপর দেয়াল উঠানোর সময় ঘরের স্তম্ভ নির্মাণ করেন। ইবরাহীম আ. ইসমাঈল আ.-কে বললেন, প্রিয় বৎস! এখন তুমি আমার জন্যে ভারতবর্ষ থেকে 'হাজরে আসওয়াদ' নিয়ে এস। মূলত এটা ছিল শুভ্র ইয়াকুত পাথর, দেখতে উট পাখির মতো। হযরত আদম আ. এ পাথরসহ জান্নাত থেকে অবতরণ করেন। মানুষের পাপ স্পর্শে এটা কালো হয়ে যায়। ইসমাঈল আ. একটি পাথর নিয়ে পিতার নিকট এসে উক্ত হাজরে আসওয়াদকে রুকনে কাবার নিকট দেখতে পান। পিতাকে জিজ্ঞেস করেন, আব্বাজান! এ পাথরটি কে নিয়ে এসেছে? তিনি বললেন, এটা এমন একজন নিয়ে এসেছেন যিনি তোমার চাইতে অধিক গতিসম্পন্ন। এরপর উভয়ে পুনরায় নির্মাণ কাজে মনোনিবেশ করেন ও দুআ পাঠ করতে থাকেন :

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

হে আমাদের রব! আমাদের পক্ষ থেকে কবূল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।

ইবনে আবু হাতেম রহ. বলেছেন, ইবরাহীম আ. পাঁচটি পাহাড়ের পাথর দ্বারা কাবা নির্মাণ করেছিলেন। ইবরাহীম ও ইসমাঈল আ. যখন নির্মাণ কাজ করছিলেন, তখন গোটা পৃথিবীর বাদশা যুলকারনাইন ঐ পথ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদেরকে এ কাজ করতে কে নির্দেশ দিয়েছে? জবাবে ইবরাহীম আ. বললেন, আল্লাহই আমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন। যুলকারনাইন বললেন, আপনার কথার যথার্থতা কি করে বুঝবো? তখন পাঁচটি ভেড়া সাক্ষ্য দিল, আল্লাহই এ নির্দেশ দিয়েছেন। তখন যুলকারনাইন ঈমান আনলেন এবং তার সত্যতা স্বীকার করে নিলেন।

আযরাকী রহ. লিখেছেন, তিনি ইবরাহীম খলীলুল্লাহ আ.-এ সাথে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেছেন। হযরত ইবরাহীম খলীল আ.-এর তৈরি কাবা দীর্ঘকাল যাবত অক্ষত থাকে। পরবর্তীকালে কুরায়েশরা ঘরটি পুনঃনির্মাণ করে। তখন ঘরের উত্তর দিক থেকে যেদিকে শাম দেশ অবস্থিত, হযরত ইবরহীম আ.-এর ভিত্তি থেকে কিছুটা কমিয়ে দেওয়া হয়, বর্তমানে সেই অবস্থার উপরেই কাবাঘর আছে।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার তাঁকে বলেছিলেন, আয়েশা! তুমি তোমার সম্প্রদায়ের লোকদের ব্যাপারটি ভেবে দেখেছ কি? তারা যখন কাবা পুনঃনির্মাণ করে, তখন ইবরাহীম আ.-এর ভিত্তি থেকে ছোট করে ফেলে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কেন তা ইবরাহীম আ.-এর ভিত্তির উপর ফিরিয়ে আনেন না? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার সম্প্রদায়ের লোকজন যদি নও-

মুসলিম না হত। ভিন্ন বর্ণনায়– যদি তোমার লোকজন জাহিলী যুগের কিংবা কুফরি যুগের কাছাকাছি সময়ের লোক না হত, তা হলে আমি কাবার মধ্যে রক্ষিত সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে দিতাম, ঘরের দরজা নিচু করে যমীনের সমতলে নিয়ে আসতাম এবং (বাদ-পড়া) হিজর অংশ হাতিম অংশটুকু বায়তুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত করে দিতাম। পরবর্তীকালে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি. তাঁর শাসনামলে কাবাঘর সেভাবেই পুনঃনির্মাণ করেন। যেদিকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইঙ্গিত করেছেন বলে তাঁর খালা উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযি. তাঁকে বলেছিলেন।

৭৩ হিজরিতে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ হযরত ইবনে যুবায়ের রাযি.-কে হত্যা করে তদানীন্তন খলিফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের নিকট পত্র লেখে। আবদুল মালিকের সভাসদগণের ধারণা ছিল, ইবনে যুবায়ের রাযি. আপন খেয়াল-খুশি মতেই কাবার সংস্কার করেছিলেন। সুতরাং খলিফা তা ভেঙ্গে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিতে নির্দেশ দেন। এ নির্দেশ মত খলিফার লোকজন কাবার উত্তর-দেয়াল ভেঙ্গে ফেলে, হাতীম অংশকে ভিতর থেকে বের করে দেয় এবং অন্যান্য পাথর কাবা ঘরের ভিতরে রেখে দেয়াল উঠিয়ে দেয়। ফলে পূর্ব দিকের দরজা উঁচু হয়ে যায় এবং পশ্চিমের দরজা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়। বর্তমানে এই অবস্থায়ই আছে।

পরে আবদুল মালিক রহ.-এর লোকজন যখন জানলো, ইবনে যুবায়ের রাযি. হযরত আয়েশা রাযি.-এর বর্ণনা অনুসারে কাবা সংস্কার করেছিলেন, তখন তারা দুঃখ প্রকাশ করে এবং অনুশোচনা করেন– এরূপ করা না হলে ভালো হতো। এরপর খলিফা মাহদী ইবনে মানসুর খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়ে ইমাম মালিক ইবনে আনাসের নিকট পরামর্শ চান– আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি.-এর ভিত্তির উপর কাবা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলে কেমন হয়? ইমাম মালিক রহ. বলেন, এতে আমার আশঙ্কা হয়, রাজা-বাদশারা কাবাকে খেলার বস্তুতে পরিণত করবে। অর্থাৎ প্রত্যেক বাদশা তার ইচ্ছামত কাবাঘর সংস্কার করতে চাইবে। সুতরাং কাবাকে সেই অবস্থার উপর বহাল রাখা হয় এবং আজও পর্যন্ত সেই একই অবস্থায় আছে।

ইসমাঈল আ.-এর আওলাদ

ইসমাঈল আ.-এর আওলাদ সম্বন্ধে কুরআন মাজিদে কিংবা নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদিসে বিস্তারিত কোনো আলোচনা নেই। অবশ্য তাওরাতে তাঁর আওলাদের নামসমূহ বিস্তারিত বিবরণসহ উল্লেখ আছে। তাওরাতের বর্ণনা অনুসারে ইসমাঈল আ.-এর বারো জন পুত্র ছিলেন। যাঁরা বারো সরদার নামে অভিহিত ও প্রসিদ্ধ ছিলেন। এবং তাঁরা আরবের ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের আদি পুরুষ হয়েছেন। আর হযরত ইসমাঈল আ.-এর একজন কন্যা ছিলেন– বাসমা বা মুহাল্লাত।

এদের মধ্যে নাবেত বা নাবায়ুত ও কিদার নামে বড় দুই পুত্র প্রসিদ্ধ। এ দুজনের উল্লেখ তাওরাতের মধ্যে খুব বেশি দেখা যায়। আরব ঐতিহাসিকগণ তাদের উপর

বিশেষভাবে আলোকপাত করে থাকেন। ইনিই সেই নাবেত বা নাবায়ুত যার বংশধরগণ "আছহাবুল হিজর" নামে অভিহিত ও প্রসিদ্ধ হয়েছিল। আর কিদারের বংশধরগণ "আছহাবুর রাস্সে" নামে বিখ্যাত হয়েছিল। এই দুজন ব্যতীত বাকি দশভাই ও তাদের বংশের পরিচয় কম পাওয়া যায়।

হযরত ইসমাঈল আ.-এর ইনতেকাল

হযরত ইসমাঈল আ. ১৩৬ বছর বয়সে ইনতেকাল করেন। তখন তাঁর আওলাদ ও বংশধরগণ বহু বিস্তৃতি লাভ করেছিল। হেজায, শাম, ফিলিস্তিন এবং মিসর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। তাওরাতে রয়েছে, হযরত ইসমাঈল আ. ফিলিস্তিনে সমাহিত হয়েছেন। এখানেই তাঁর ইনতেকাল হয়েছিলেন। আরব ঐতিহাসিকগণ বলেন, তিনি এবং তাঁর মাতা হাজেরা বাইতুল্লাহ শরীফের পাশেই সমাহিত রয়েছেন।

প্রসিদ্ধ মতে, হযরত ইসমাঈল আ.-কে হিজর নামক স্থানে মায়ের কবরের পাশে সমাহিত করা হয়। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ১৩৭ বছর। ওমর ইবনে আবদুল আযিয রহ. থেকে বর্ণিত : ইসমাঈল আ. মক্কার প্রচণ্ড গরম সম্পর্কে আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। আল্লাহ পাক অহির মাধ্যমে তাঁকে জানান, যেখানে তোমাকে দাফন করা হবে, সে স্থানের দিকে আমি জান্নাতের একটি দরজা খুলে দেব। কিয়ামত পর্যন্ত সেখানে জান্নাতের সুশীতল হাওয়া প্রবাহিত থাকবে।

contents

হযরত ইসহাক আ.

হযরত ইসহাক আ. জন্ম বৃত্তান্ত

হযরত ইবরাহীম আ.-এর বয়স যখন ১০০ বছর এবং তাঁর স্ত্রী হযরত সারার বয়স ৯০ (নব্বই) বছর, এ সময় আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে সুসংবাদ শুনালেন, সারার গর্ভে একটি পুত্র সন্তান জন্মলাভ করবে, তার নাম ইসহাক রেখ। তাওরাত বলে :

"আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম আ.-কে বললেন, তোমার স্ত্রীকে 'সারী' বলা হয়, এখন থেকে তাকে আর 'সারী' বলো না; বরং তার নাম 'সারাহ'। আমি তাকে বরকত প্রদান করব। তার গর্ভ থেকেও তোমাকে একটি পুত্র দান করব, নিশ্চয়ই আমি তাকে বরকত দান করবে। কেননা, সে বহু সম্প্রদায়ের মাতা হবে এবং বহু রাজ্যের রাজা তাঁর বংশে জন্ম লাভ করবে।" (তাওরাত)

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ () فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ (٧٠) وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ (٧١) قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ (٧٢) قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (٧٣)

"নিঃসন্দেহে, আমার দূত (ফেরেশতা) ইবরাহীম আ.-এর নিকট সুসংবাদ নিয়ে আগমন করল, তারা এসে ইবরাহীমকে সালাম করল, ইবরাহীমও সালাম বলল। কিছুক্ষণ পরে ইবরাহীম গরুর বাছুরের ভাজা গোশত মেহমানদের সম্মুখে উপস্থিত করল। যখন সে দেখল, মেহমানদের হাত গোশতের দিকে অগ্রসর হচ্ছে না, তখন তিনি তাদেরকে অপরিচিত বুঝতে পেরে একটু ভীত হলেন। আগন্তুকরা বললেন, ভয় করবেন না, আমরা লূত আ.-এর কওমকে শাস্তি দেওয়ার জন্য প্রেরিত হয়েছি। আর ইবরাহীম আ.-এর বিবি (সারাহ) দাঁড়িয়ে হাসছিল। তখন আমি তাঁকে ইসহাক এবং তার পরে (তার পুত্র) ইয়াকুবের সুসংবাদ দান করলাম। সারাহ বলল, আমি একজন (নব্বই বছর বয়স্কা) বৃদ্ধা, সন্তান প্রসব করব! আর আমার স্বামীও তো (একশ বছরের) বৃদ্ধ! এটা বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার। ফেরেশতারা বললেন, 'তুমি কি আল্লাহর আদেশের ওপর বিস্ময় প্রকাশ করছ? (হে আহলে বাইত!) তোমাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার রহমত ও বরকত বর্ষণ হোক। নিঃসন্দেহ, আল্লাহ পাক সর্বপ্রকারে প্রশংসনীয় এবং অসীম মর্যাদাশালী। (সূরা হূদ : ৬৯-৭৩)

فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (٢٨) فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ (٢٩) قَالُوا كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (٣٠)

"অতঃপর ইবরাহীম তাদের থেকে ভয় অনুভব করলেন, তারা (ফেরেশতারা) বললেন, ভীত হবেন না এবং তাঁকে সুসংবাদ প্রদান করলেন এক জ্ঞনবান পুত্রের।' অতঃপর ইবরাহীমের স্ত্রী (সারাহ) নেহায়েত বিস্ময় প্রকাশ করতে করতে আগমন করলেন এবং মুখমণ্ডলের ওপর হাত মারতে লাগলেন। বললেন, বন্ধ্যা, বৃদ্ধা! ফেরেশতারা বললেন, তোমার পরওয়ারদিগার এরূপই বলেছেন (সুতরাং হবেও তাই)। তিনি জ্ঞানময় হেকমতওয়ালা।" (আযযারিয়াত : ২৮-৩০)

قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ (٥٢) قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (٥٣) قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ (٥٤) قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ (٥٥) قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ (٥٦)

"ইবরাহীম বললেন, নিঃসন্দেহ, আমি আপনারদের ভয় করছি। ফেরেশতারা বললেন, আমাদের ভয় করবেন না। আমরা আপনাকে একজন জ্ঞানবান পুত্রের সুসংবাদ দিতে এসেছি। ইবরাহীম বললেন, তোমরা কি এই বার্ধক্যেও (পুত্রের) সুসংবাদ দিতে এসেছ ? এ কেমন সুসংবাদ! ফেরেশতারা বললেন, আমরা আপনাকে সত্য বিষয়ের সুসংবাদ দিচ্ছি। আপিন নিরাশ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। ইবরাহীম বললেন, "পথভ্রষ্ট লোকেরা ছাড়া কেউ নিজের পরওয়ারদেগারের রহমত থেকে নিরাশ হয় না।" (সূরা হিজর : ৫১-৫৫)

হযরত ইসহাক আ.-এর নামকরণ

হযরত ইসহাক আ. ৮ দিনের বয়সে পৌঁছলে হযরত ইবরাহীম আ. তাঁর খতনা করিয়ে দেন। ইসহাক শব্দের উচ্চারণ يصحك (ইয়াছহাক)। এটি হিব্রু ভাষার শব্দ। এর আরবি অনুবাদ হয় يضحك (ইয়াদহাক) অর্থ হাসছে। আল্লাহর ফেরেশতারা যখন একশ বছর বয়স্ক ইবরাহীম আ.-কে এবং নব্বই বছর বয়স্কা সারাহকে পুত্র সন্তানের সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন, তখন হযরত ইবরাহীম আ. এটাকে বিস্ময়কর ব্যাপার মনে করেছিলেন। এবং হযরত সারাহও এটা শুনে হেসে দিলেন। এ কারণেই পুত্রের এই নাম মনোনীত হয়েছে। কিংবা এ কারণে নাম রাখা হয়েছে, ইসহাক আ.-এর জন্ম হযরত সারাহর খুশি ও আনন্দের কারণ হয়েছিল। আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী يضحك (ইয়াদহাকু) ফেলে মুযারের সিগা। আরবদের দস্তুর হলো, তারা ফেলে মুযারের সিগা নাম হিসাবে ব্যবহার করত। যেমন ইয়ারাব, ইয়ামলেক জাতীয় নাম আরবদেশে বেশ প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ।

ইসহাক আ.-এর বিবাহ

কুরআন মাজিদে এ সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ নেই। তাওরাতে এ প্রসঙ্গে একটি দীর্ঘ কাহিনি উল্লিখিত আছে। তার সারমর্ম হলো– হযরত ইবরাহীম আ. তাঁর বাঁদির পুত্র ইয়ারাযকে বললেন, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, ইসহাকের বিবাহ ফিলিস্তিনের কেনান খানদানের মধ্যে করাব না। আমরা ইচ্ছা, নিজের খানদান এবং পিতামহের বংশের মধ্যে বিবাহ করাব। অতএব, তুমি বিয়ের উপকরণ নিয়ে 'ফাদ্দানে আরামে' যাও। আমার ভ্রাতা বতুঈল ইবনে নাহুরের নিকট গিয়ে আমার পয়গাম পৌঁছিয়ে দাও– সে যেন নিজের কন্যার বিবাহ আমার পুত্র ইসহাকের সঙ্গে করিয়ে দেয়। যদি সে সম্মত হয়, তবে তাকে এটাও বলো, আমি ইসহাককে আমার কাছ থেকে দূরে যেতে দিতে চাই না। সুতরাং সে যেন তার কন্যাকে তোমার সাথে রওনা করিয়ে দেয়।

ইয়ারায হযরত ইবরাহীম আ.-এর নির্দেশ অনুযায়ী 'আরাম' অভিমুখে যাত্রা করলেন। বসতির নিকটবর্তী হলে আপন উটটিকে বসালেন। উদ্দেশ্য আগে অবস্থা জেনে নেবেন। ইয়ারায যেখানে উট বসিয়েছিলেন, এর কাছেই হযরত ইবরাহীম আ.-এর ভ্রাতা বতুঈলের খান্দান বসবাস করত। এ সময় ইয়ারায একজন সুশ্রী বালিকা দেখতে পেলেন। সে পানির কলসি ভরে বাড়ির দিকে ফিরছে। ইয়ারায তার কাছে পানি চাইলে সে তাকে পানি পান করাল, তার উটকেও পানি পান করাল। ইয়ারায তার কাছে বতুঈলের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলেন। বালিকাটি বলল, তিনি আমার পিতা। ইয়ারাযকে সে তাদের বাড়িতে অতিথিরূপে নিয়ে গেল। বাড়িতে পৌঁছিয়ে নিজের ভাই লাবানকে সংবাদ দিল। লাবান ইয়ারাযকে অনেক সমাদর করলেন এবং আগমনের কারণ জানতে চাইলেন। ইয়ারায হযরত ইবরাহীম আ.-এর পয়গাম শুনালেন। লাবান এ পয়গামে অসীম আনন্দিত হলেন। তিনি বহু সাজ-সরঞ্জাম সঙ্গে দিয়ে নিজ ভগ্নি 'রাফকা'কে ইয়ারাযের সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন।

হযরত ইসহাক আ.-এর আওলাদ

রাফকার গর্ভে হযরত ইসহাক আ.-এর যমজ দুই পুত্র যথাক্রমে ঈস এবং ইয়াকুব জন্মগ্রহণ করেন। তখন হযরত ইসহাক আ.-এর বয়স ষাট বছর। হযরত ইসহাক, ঈস ও রাফকা হযরত ইয়াকুব আ.কে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। ঈস শিকারী ছিলেন। তিনি বৃদ্ধ মাতা-পিতাকে শিকারের গোশত এনে দিতেন। ইয়াকুব আ. তাঁবুতেই থাকতেন।

একদিন ঈস ক্লান্ত হয়ে এসে ইয়াকুবকে বললেন, আমি ক্লান্ত। শিকারও পাওয়া যায় নি। তোমার খাদ্য মুশুর ও লেপসি থেকে আমাকেও কিছু খেতে দাও। ইয়াকুব বললেন, ফিলিস্তিনবাসীদের দস্তুর হলো, মিরাস শুধু বড় ছেলে পায়। সুতরাং পিতার ওয়ারিস থেকে তুমি যদি সেই অধিকার ত্যাগ করো, তবে আমি তোমাকে খানা খাওয়াব। ঈস বললেন, আমার সেই মিরাসের কোনো পরোয়া নেই, তুমিই ওয়ারিস হয়ো। তখন ইয়াকুব ঈসকে খানা দিলেন।

একবার হযরত ইসহাক আ. (যখন অতি বৃদ্ধ এবং দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল) ইচ্ছা করলেন, ঈসকে বরকত প্রদান করবেন। তিনি তাকে বললেন, যাও শিকার করে আনো এবং উত্তম খানা পাকিয়ে আমার সম্মুখে পেশ কর। রাফকা এটা শুনে মনে মনে বললেন, এ বরকত ইয়াকুব প্রাপ্ত হোক। তৎক্ষণাৎ ইয়াকুবকে ডেকে বললেন, তাড়াতাড়ি উত্তম খানা পাকিয়ে তোমার পিতার সম্মুখে হাজির করো এবং বরকতের দুআ চাও। ইয়াকুব নাম না বলে তদ্রুপ করলেন। এবং ইসহাক আ. থেকে বরকতের দুআ লাভ করলেন। অতঃপর ঈস যখন ঘরে এলো, সমস্ত ঘটনা শুনতে পেল। তখন অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হল এবং ইয়াকুবের প্রতি হিংসা পোষণ করতে লাগল। তখন রাফকা ইয়াকুবকে পরামর্শ দিলেন, সে যেন এখান থেকে কিছু দিনের জন্যে মামা লাবানের কাছে চলে যায়। ইয়াকুব তাই করেন। সেখানে গিয়ে কিছুকাল কাটালেন। একাদিক্রমে লাবানের লায়্যা ও রাহিল নামের দুই কন্যাকে বিবাহ করলেন।

এটা ইসলাইলি রেওয়ায়েত। বিষয়বস্তুর প্রেক্ষিতে নির্ভরের অযোগ্য। এতে যে চারিত্রিক জীবন পেশ করা হয়েছে, তা তাওরাতের অন্যান্য বিকৃত বর্ণনাগুলোর মতোই আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং তাঁদের খানদানের শানের উপযোগী নয়। এর থেকে এটুকু তথ্য পাওয়া যায়, হযরত ইয়াকুব আ.-এর বিবাহ তাঁর মাতুল বাড়িতে হয়েছিল। তিনি এক দীর্ঘকাল পর্যন্ত সেখানে ছিলেন।

আর ঈস তাঁর চাচা ইসমাঈল আ.-এর কাছে চলে গেল। সেখানে তাঁর কন্যা বাসমা বা মুহাল্লাতকে বিবাহ করলেন। এ ছাড়া তিনি আরো কয়েকটি বিবাহ করলেন। এরপর আপন পরিবারবর্গকে নিয়ে সাঈর নামক স্থানে গিয়ে নিজেদের বাসস্থান স্থির করে নিলেন। তিনি এখানে 'আদওয়াম' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করলেন। এ কারণে তাঁর বংশধরগণ বনি আদওয়াম নামে প্রসিদ্ধ হলো।

ইসহাক আ.-এর জন্ম

এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী :

وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (١١٢) وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ (١١٣)

"আমি তাকে সুসংবাদ দিয়েছিলাম ইসহাকের, সে ছিল একজন নবী, সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম। আমি তাকে বরকত দান করেছিলাম এবং ইসহাককেও। তাদের বংশধরদের মধ্যে কিছু সৎকর্মপরায়ণ এবং কিছু নিজেদের প্রতি স্পষ্ট অত্যাচারী।" (সূরা সাফফাত : ১১২-১১৩)

মাদায়েন অঞ্চলের অধিবাসী লূত আ.-এর সম্প্রাদায়ের কুফরি ও পাপাচারের শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে আল্লাহর ফেরেশতাগণ সেখানে যাওয়ার পথে হযরত ইবরাহীম আ. ও সারাহকে আল্লাহ তাআলার এ সুসংবাদ শুনিয়ে যান :

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ (٦٩) فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ (٧٠) وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ (٧١) قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ (٧٢) قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (٧٣)

আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ ইবরাহীম আ.-এর কাছে সুসংবাদ নিয়ে এসেছিল। তারা বলল, 'সালাম'। সেও বলল, 'সালাম'। সে অবিলম্বে এক কাবাব করা বাছুর নিয়ে এলো। সে যখন দেখল, তাদের হাত সেটার দিকে প্রসারিত হচ্ছে না, তখন তাদের অপরিচিত মনে হতে লাগল। এবং তাদের সম্বন্ধে তার মনে ভীতি সঞ্চার হল। তারা বলল, ভয় করো না। আমরা লূত আ.-এর সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। তখন তার স্ত্রী দাঁড়িয়েছিল এবং সে হাসল। তারপর আমি তাকে ইসহাকের ও ইসহাকের পরবর্তী ইয়াকুবের সুসংবাদ দিলাম। সে বলল, কি আশ্চর্য! সন্তানের জননী হব আমি যখন আমি বৃদ্ধা এবং আমার স্বামী বৃদ্ধ! এটি অবশ্যই এক অদ্ভুত ব্যাপার। তারা বলল, আল্লাহর কাজে তুমি বিস্ময় বোধ করছ? হে পরিবারবর্গ! তোমাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহর অনু ও কল্যাণ। তিনি প্রশংসিত ও সম্মানিত। (সূরা হূদ : ৬৯-৭৪)

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ (٥١) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ (٥٢) قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (٥٣) قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ (٥٤) قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ (٥٥) قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ (٥٦)

এবং ওদের বলো, ইবরাহীমের অতিথিদের কথা, যখন ওরা তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, 'সালাম'। তখন সে বলেছিল, 'আমরা তোমাদের আগমনে আতঙ্কিত।' তারা বলল, 'ভয় করো না, আমরা তোমাকে এক জ্ঞানী পুত্রের শুভ সংবাদ দিচ্ছি।' সে বলল, 'তোমরা কি আমাকে শুভ সংবাদ দিচ্ছ আমি বার্ধক্যগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও? তোমরা কি বিষয়ে শুভ সংবাদ দিচ্ছ? ওরা বলল, 'আমরা সত্য সংবাদ দিচ্ছি, সুতরাং তুমি হতাশ হয়ো না।' সে বলল, 'যারা পথভ্রষ্ট তারা ছাড়া আর কে তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ হতে হতাশ হয়? (সূরা হিজর : ৫১-৫৬)

আল্লাহ তাআলার বাণী :

إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (٢٥) فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ (٢٦) فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (٢٧) فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ

بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (٢٨) فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ (٢٩) قَالُوا كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (٣٠)

তোমার নিকট ইবরাহীম আ.-এর সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত এসেছে কি? যখন ওরা তার কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, 'সালাম'। উত্তরে সে বলল, 'সালাম'। এরা তো অপরিচিত লোক। তারপর ইবরাহীম আ. তার স্ত্রীর নিকট গেল এবং একটি মাংসল গরুর বাছুর ভাজা অবস্থায় নিয়ে এনে তাদের সামনে রাখল। বলল, 'তোমরা খাচ্ছ না কেন? এতে ওদের সম্পর্কে তার মনে ভীতির সঞ্চার হল। ওরা বলল, 'ভীত হয়ো না। তারপর ওরা তাকে এক জ্ঞানী পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিল। তখন তার স্ত্রী চিৎকার করতে করতে আসল এবং গাল চাপড়িয়ে বলল, এই বৃদ্ধা-বন্ধ্যার সন্তান হবে? তারা বলল, তোমার প্রতিপালক এরূপই বলেছেন, তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।

(সূরা যারিয়াত : ২৪-৩০)

এখানে মেহমান অর্থ ফেরেশতা। যারা মানুষের আকৃতি ধারণ করে এসেছিলেন, এরা সংখ্যায় ছিলেন তিনজন। হযরত জিবরাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফীল আ.। হযরত ইবরাহীম আ.-এর বাড়িতে এলে তিনি মেহমানরূপে গণ্য করেন এবং মেহমানদের সাথে যে রকম আচরণ করা হয় সে রকম আচরণ করেন। সুতরাং তিনি তাঁর গোয়ালের সবচেয়ে হৃষ্টপুষ্ট একটি বাছুর ভুনা করে তাদের সামনে পেশ করেন। কিন্তু তিনি আহারের প্রতি তাদের কোনো আগ্রহ দেখতে পেলেন না। কেননা, ফেরেশতাদের আহারের কোনো প্রয়োজন হয় না। ইবরাহীম আ. তাদেরকে অপরিচিত লোক মনে করলেন।

نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ

'তাদের সম্বন্ধে তার মনে ভীতির সঞ্চার হল। তারা বলল, 'ভীত হয়ো না, আমরা লূতের সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।

অর্থাৎ তাদেরকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে এ সময় স্ত্রী সারাহ আল্লাহর ক্রোধে লূতের সম্প্রদায়ের শাস্তির কথা শুনে আনন্দিত হন। সারাহ মেহমানদের সামনেই দণ্ডায়মান ছিলেন যেমনি আরব ও অনারবদের মধ্যে নিয়ম প্রচলিত আছে। সারাহ যখন ঐ সংবাদ শুনে হেসে দেন তখন আল্লাহ তাকে সুসংবাদ দেন :

فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ

(তারপর আমি তাকে ইসহাকের ও ইসহাকের পরবর্তী ইয়াকূবের সুসংবাদ দিলাম) অর্থাৎ, ফেরেশতারা তাকে এ বিষয়ে সুসংবাদ দেন। فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ (তখন তার স্ত্রী চিৎকার করতে করতে সম্মুখে আসল।) فَصَكَّتْ وَجْهَهَا (এবং নিজের গাল চাপড়িয়ে বলতে লাগল।) অর্থাৎ যেভাবে মেয়ে লোকেরা অবাক হলে করে থাকে।

قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا

(কী আশ্চর্য! আমি জননী হব, অথচ এখন আমি বৃদ্ধা এবং এই আমার স্বামী বৃদ্ধ)

অর্থাৎ আমার মত একজন বৃদ্ধা ও বন্ধ্যা মহিলা কী করে সন্তান জন্ম দিতে পারে! আর আমার স্বামীও এই বৃদ্ধ! এ অবস্থায় সন্তান হওয়ার সংবাদে তিনি আশ্চর্যবোধ করেন। তাই তিনি বলেন : إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ (এটা অবশ্যই এক অদ্ভুত ব্যাপার।)

قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

(ওরা বলল, আল্লাহর কাজে আপনি বিস্ময়বোধ করছেন? হে পরিবারবর্গ! তোমাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহর অনুগ্রহ ও কল্যাণ। তিনি প্রশংসার অধিকারী ও সম্মানের অধিকারী।)

ইবরাহীম আ. এ সুসংবাদ পেয়ে স্ত্রীর খুশির সঙ্গে শরীক হন। এবং স্ত্রীর মনে দৃঢ়তা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নিজেও আশ্চর্যবোধ করেন।

قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ (٥٤) قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ

ইবরাহীম বলল, তোমরা কি আমাকে শুভ সংবাদ দিচ্ছ আমি বার্ধক্যগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও? তোমরা কি বিষয়ে শুভ সংবাদ দিচ্ছ? তারা বলল, আমরা সত্য সংবাদ দিচ্ছি। সুতরাং আপনি হতাশ হবেন না।

এই বাক্য দ্বারা সুসংবাদকে দৃঢ় করা হয়েছে। তারপর ফেরেশতাগণ ইবরাহীম আ. ও সারাহকে এক জ্ঞানী পুত্র সন্তানের (بِغُلَامٍ عَلِيمٍ) সুসংবাদ দিলেন। অর্থাৎ ইসহাক আ. ও তার ভাইয়ের কথা। ইসমাঈল আ.-কে আল্লাহ বিভিন্ন গুণ ও মর্যাদার অধিকারী বলে কুরআনে উল্লেখ করেছেন। যেমন حَلِيمٍ বা ধৈর্যশীল। যা তাঁর অবস্থার সাথে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাছাড়া ওয়াদাপালনকারী এবং সহনশীল বলেও তাঁর উল্লেখ করা হয়েছে।

সংশয় নিরসন

আল্লাহ তাআলার বাণী– فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ এর দ্বারা মুহাম্মদ ইবনে কাব আল কুরজি রহ. প্রমুখ দলিল পেশ করে বলেন, যাকে যবেহের হুকুম করা হয়েছিল তিনি হলেন ইসমাঈল আ.। ইসহাক আ. নন। কেননা সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে, তিনি বেঁচে থাকবেন এবং তাঁর ইয়াকুব নামে একজন সন্তানও জন্মগ্রহণ করবে। আর يَعْقُوبَ শব্দটি عقب শব্দ থেকে নির্গত। যার অর্থ পরে পাওয়া বা পরে আসা।

আহলে কিতাবদের মতে, আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহীম আ.-কে বলেন : তোমার স্ত্রীকে 'সারী' ডেকো না, বরং সে হচ্ছে 'সারাহ'। আমি তাকে বরকত দান

করব এবং তাকে পুত্র সন্তান দান করব। সে পুত্রকেও বরকতময় করব। তার বংশ থেকে অনেক গোত্র হবে এবং সে বংশে অনেক রাজা-বাদশার জন্ম হবে। একথা শুনে হযরত ইবরাহীম আ. শোকর আদায় করেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করে হাসেন এবং বলেন, আমার বয়স যখন একশর উপরে এবং সারাহর বয়স নব্বই; এখন আমাদের সন্তান হবে! আল্লাহ বলেন : হে ইবরাহীম! আমি আমার নিজের কসম করে বলছি, তোমার স্ত্রী সারাহ অবশ্যই পুত্র সন্তান প্রসব করবে। তার নাম হবে ইসহাক। পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে :

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا

আমি তাকে দান করেছি ইসহাক ও ইয়াকুব। প্রত্যেককেই আমি পথ-প্রদর্শন করেছি। (সূরা আনআম : ৮৪)

অন্যত্র বলা হয়েছে :

فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

এরপর ইবরাহীম যখন তাদেরকে এবং আল্লাহ ব্যতীত তারা আর যাদের পূজা করত তাদের সবাইকে পরিত্যাগ করল। তখন আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকূব। (সূরা মারইয়াম : ৮৯)

এ আয়াতটি উল্লিখিত অভিমতকে আরো শক্তিশালী করেছে। বুখারী ও মুসলিমের একটি হাদিসও এই মতকে সমর্থন করে। হযরত আবু যর রাযি. বলেন : আমি একদিন জিজ্ঞেস করলাম– আল্লাহর রাসুল, সর্বপ্রথম নির্মিত মসজিদ কোনটি? তিনি বললেন, মসজিদুল হারাম। আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, মসজিদুল আকসা। আমি বললাম, এ দু মসজিদের নির্মাণের মধ্যে ব্যবধান কত? তিনি বললেন, চল্লিশ বছর। আমি বললাম, এর পরবর্তী মর্যাদাসম্পন্ন মসজিদ কোনটি? তিনি বললেন, এর পরে সব জায়গা সমান। যেখানেই নামাযের সময় হয়, সেখানেই পড়ে নাও। কেননা সকল জায়গাই নামায আদায়ের উপযুক্ত।

আহলে কিতাবদের মতে হযরত ইয়াকুব আ. মসজিদে আকসা নির্মাণ করেন। এর অপর নাম মসজিদে ঈলয়া ও বায়তুল মুকাদ্দাস। এটাও উল্লিখিত হাদিসের বর্ণনার সত্যতার প্রমাণ। এ হিসাবে ইবরাহীম আ. ও ইসমাঈল আ. কর্তৃক মসজিদুল হারাম নির্মাণের চল্লিশ বছর পর ইয়াকুব (যার অপর নাম ইসরাঈল) আ. কর্তৃক মসজিদে আকসা নির্মাণের তথ্য পাওয়া যায়। সাথে সাথে আরো প্রমাণিত হয়, ইবরাহীম আ. ও ইসমাঈল আ. যখন মসজিদুল হারাম নির্মাণ করেন তখন ইসহাক আ. বর্তমান ছিলেন। কেননা ইবরাহীম আ. যখন দুআ করেছিলেন, তখন বলেছিলেন :

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ (٣٥) رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٦) رَبَّنَا إِنِّي

أَسْكَنتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (٣٧) رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (٣٨) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ (٣٩) رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ (٤٠) رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ (٤١)

স্মরণ কর! ইবরাহীম যখন বলল– 'হে আমার প্রতিপালক! এই নগরীকে নিরাপদ করো এবং আমাকে ও আমার পুত্রগণকে প্রতিমা পূজা থেকে দূরে রাখো। হে আমার প্রতিপালক! এ প্রতিমাগুলো বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে সেই আমার দলভুক্ত, কিন্তু কেউ আমার অবাধ্য হলে তুমি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার বংশধরদের কতককে বসবাস করালাম অনুর্বর উপত্যকায় তোমার পবিত্র ঘরের নিকট, হে আমাদের প্রতিপালক! এজন্যে যে, ওরা যেন সালাত কায়েম করে। অতএব তুমি কিছু লোকের অন্তর ওদের প্রতি অনুরাগী করে দাও এবং ফল-ফলাদি দ্বারা ওদের রিযিকের ব্যবস্থা করো, যাতে ওরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তো জান, যা আমরা গোপন করি এবং যা আমরা প্রকাশ করি; আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কিছুই আল্লাহর নিকট গোপন থাকে না। প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য, যিনি আমাকে আমার বার্ধক্যে ইসমাঈল ও ইসহাককে দান করেছেন। আমার প্রতিপালক অবশ্যই প্রার্থনা শুনে থাকেন। হে আমার প্রতিপালক! আমার দোয়া কবুল করো। হে আমাদের প্রতিপালক! যেদিন হিসাব হবে সেদিন আমাকে আমার পিতামাতাকে এবং মুমিনগণকে ক্ষমা করো!

হযরত ইবরাহীম আ.-এর একশ বছর বয়সকালে এবং ইসমাঈল আ.-এর জন্মের চৌদ্দ বছর পর ইসহাক আ.-এর জন্ম হয়। তাঁর মাতা সারাহকে যখন পুত্র হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হয় তখন তাঁর সয়স ছিল নব্বই বছর। আল্লাহ পাক কুরআনের অনেক আয়াতে ইসহাক আ.-এর প্রশংসা করেছেন। আর হযরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত হাদিস রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : একজন সম্মানিত ব্যক্তি, যার পিতাও ছিলেন সম্মানিত, তাঁর পিতাও ছিলেন সম্মানিত এবং তাঁর পিতাও ছিলেন সম্মানিত। তিনি হলেন ইউসূফ ইবনে ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম।

আহলে কিতাবরা বলেন, ইসহাক আ. তাঁর চল্লিশ বছর বয়সে পিতার জীবদ্দশায় রুফাকা বিনতে লাবানকে বিবাহ করেন। রুফাকা ছিলেন বন্ধ্যা। তাই ইসহাক আ. সন্তানের জন্যে আল্লাহর কাছে দুআ করেন। এরপর তার স্ত্রী সন্তান-সম্ভবা হন এবং তিনি জময দুই পুত্র সন্তান প্রসব করেন। তাদের প্রথমজনের নাম রাখা হয় 'ঈসু'। আরবরা যাকে 'ঈস' বলে তাকে। এ ঈস হচ্ছেন রূমের পিতা। দ্বিতীয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার

সময় তাকে তার ভাইয়ের গোড়ালি আঁকড়ে থাকতে দেখা যায়। এ কারণে তার নাম রাখা হয় ইয়াকুব। কেননা এ শব্দটির মূলধাতু (عقب) অর্থ গোড়ালি বা পশ্চাতে আগমণকারী। তাঁর অপর নাম ইসরাঈল, যার নামে বনি ইসরাঈল বংশের নামকরণ করা হয়েছে।

আহলে কিতাবরা বলে : হযরত ইসহাক আ. ইয়াকুবের তুলনায় ঈসকে অধিক ভালোবাসতেন। কারণ, ঈস ছিলেন প্রথম সন্তান। পক্ষান্তরে তাঁদের মা রুফাকা ইয়াকুবকে বেশি ভালোবাসতেন। কেননা তিনি ছিলেন কনিষ্ঠ। হযরত ইসহাক আ. যখন বয়োবৃদ্ধ হন এবং তাঁর দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পায়, একদিন তিনি পুত্র ঈসকে নির্দেশ দেন– একটি পশু শিকার করে রান্না করে আনার জন্য। যা আহার করে তিনি তার জন্যে বরকত ও কল্যাণের দুআ করবেন। ঈস ছিলেন শিকারে পারদর্শী। তিনি শিকারে বেরিয়ে পড়লেন। এদিকে রুফাকা তার প্রিয়পুত্র ইয়াকুবকে পিতার দুআ লাভের জন্যে পিতার চাহিদা অনুযায়ী দুটি উৎকৃষ্ট ছাগল ছানা যবেহ করে খাদ্য প্রস্তুত করে ভাইয়ের পূর্বেই পিতার সম্মুখে পেশ করার আদেশ দেন। খাদ্য তৈরি হওয়ার পর রুফাকা ইয়াকুবকে ঈসের পোশাক পরিয়ে দেন। এবং উভয় হাতে ও কাঁধের উপরে ছাগলের চামড়া জড়িয়ে দেন। কারণ, ঈসের শরীরে বেশি পরিমাণ পশম ছিল। ইয়াকুবের শরীরে সেরূপ পশম ছিল না। তারপর যখন খাদ্য নিয়ে ইয়াকুব আ. পিতার কাছে হাযির হলেন, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কে? উত্তরে তিনি বললেন : আপনার ছেলে। তখন পিতা তাকে কাছে টেনে নেন ও আলিঙ্গন করেন। তিনি বললেন, কণ্ঠস্বর তো ইয়াকুবের মতো, শরীর ও পোশাক ঈসের বলে মনে হয়। আহার শেষে তিনি দুআ করলেন। ভাইদের মধ্যে তিনি যেন অধিকতর ভাগ্যবান হন। ভাইদের উপরে ও পরবর্তী বংশধরদের উপরে যেন তাঁর নির্দেশ ও প্রভাব কার্যকরী হয় এবং তিনি অধিক পরিমাণ জীবিকা ও সন্তানের অধিকারী হন।

পিতার নিকট থেকে ইয়াকুব আ. চলে আসার পর তাঁর ভাই ঈস খাদ্য নিয়ে পিতার কাছে হাযির হন, যা খাওয়ানোর জন্যে তিনি তাকে আদেশ করেছিলেন। পিতা জিজ্ঞেস করলেন, বৎস! এ আবার তুমি কি নিয়ে এসেছ? ঈস বললেন : এ তো সেই খাদ্য, যা আপনি খেতে চেয়েছিলেন। পিতা বললেন, এই কিছুক্ষণ পূর্বে কি তুমি খাদ্য নিয়ে আসো নি এবং তা আহার করে কি তোমার জন্যে আমি দুআ করি নি? ঈস বললেন : আল্লাহর কসম! আমি আসি নি। তিনি তখন বুঝতে পারলেন, ইয়াকুবই আমার আগে এসে এ কাজ করে গেছে। তিনি ইয়াকুবের উপর ভীষণ ক্ষুব্ধ হলেন। কিতাবীদের বর্ণনা মতে এমনকি পিতার মৃত্যুর পর তাকে হত্যা করার হুমকিও দেন। তারপর পিতার নিকট দুআ চাইলে পিতা তাঁর জন্যে ভিন্ন দুআ করেন। তিনি দুআ করলেন, যেন ঈসের সন্তানরা শক্ত যমীনের অধিকারী হয়, তাদের জীবিকা ও ফল-ফলাদি যেন বৃদ্ধি পায়।

ইয়াকুব আ.-এর প্রতি ঈসের হুমকির কথা তাদের মার শ্রুতিগোচর হলে তিনি ইয়াকুব আ.-কে তাঁর ভাই অর্থাৎ ইয়াকুবের মামা লাবানের কাছে চলে যেতে নির্দেশ

দেন। লাবান হারানে বসবাস করতেন। ঈসের ক্রোধ প্রশমিত না হওয়া পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করার জন্যে তিনি তাঁকে পরামর্শ দেন। এ ছাড়া তিনি লাবানের কন্যাকে বিয়ে করতেও তাঁকে বলে দেন। এরপর তিনি তাঁর স্বামী ইসহাক আ.-কে এ ব্যাপারে অনুমতি ও প্রয়োজনীয় উপদেশ দান এবং তার জন্য দুআ করতে বলেন। হযরত ইসহাক আ. তাই করলেন। ইয়াকুব আ. ওইদিন বিকালেই তাদের কাছ থেকে বিদায় নেন।

তারপর যেখানে পৌঁছলে সন্ধ্যা হয়, সেখানে একটি পাথর মাথার নিচে রেখে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখেন, যমিন থেকে আসমান পর্যন্ত একটি সিঁড়ি স্থাপিত রয়েছে। ফেরেশতাগণ সেই সিঁড়ি বেয়ে ওঠানামা করছেন। আর আল্লাহ তাঁকে ডেকে বলছেন : আমি তোমাকে বরকতে পরিপূর্ণ করব, তোমার সন্তানসন্ততি বৃদ্ধি করব, তোমাকে ও তোমার বংশধরদেরকে এই যমিনের অধিকারী বানাব। ঘুম থেকে জেগে এরূপ একটি স্বপ্নের জন্যে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং মানত করেন, আল্লাহ যদি আমাকে নিরাপদে পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেন, তা হলে এ স্থানে আল্লাহর উদ্দেশ্যে একটি ইবাদতখানা নির্মাণ করব আর যা কিছু রিযিক পাবো তার এক-দশমাংশ আল্লাহর রাহে দান করব। তারপর সেই পাথরটি চেনার সুবিধার্থে তার উপর কিছু তেল ঢেলে দেন। তিনি এ স্থানের নাম রাখেন বায়তু-ঈল অর্থাৎ বায়তুল্লাহ। এটাই বর্তমানে বায়তুল মুকাদ্দাস, যা হযরত ইয়াকুব আ. পরবর্তীকালে নির্মাণ করেছিলেন।

হযরত ইয়াকুব আ. হারানে পৌঁছে মামার কাছে উপস্থিত হন। মামা লাবানের ছিল দুই কন্যা। বড়জনের নাম লায়্যা এবং ছোটজনের নাম রাহিল। রূপ-লাবণ্যে ছোটজনই শ্রেষ্ঠ। তাই ইয়াকুব আ. মামার কাছে ছোটজনকে বিবাহের প্রস্তাব দেন। মামা সাত বছর পর্যন্ত তাঁর মেষপালের দেখাশোনা করার শর্তে তাকে বিবাহ দিতে রাজি হন। সাত বছর অতীত হওয়ার পর লাবান বিবাহের আয়োজন করেন। লোকজনকে দাওয়াত দিয়ে আপ্যায়িত করেন এবং রাতে জ্যৈষ্ঠ কন্যা লায়্যাকে ইয়াকুব আ.-এর নিকট বাসরঘরে প্রেরণ করেন। ল্যায়্যাকে দেখে মামার নিকট তিনি অভিযোগ করলেন, আপনি কেন আমার সাথে প্রতারণা করলেন? আমি তো আপনার কাছে রাহিলের প্রস্তাব দিয়েছিলাম। উত্তরে মামা বললেন, এটা আমাদের সামাজিক রীতি নয়, জ্যেষ্ঠা কন্যাকে রেখে কনিষ্ঠা কন্যাকে বিয়ে দেব? এখন যদি তুমি এর বোনকে বিয়ে করতে চাও তবে আরো সাত বছর কাজ করো, তা হলে তাকেও তোমার সাথে বিয়ে দেব। সুতরাং ইয়াকুব আ. আরো সাত বছর কাজ করলেন। তারপর তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যার সাথে কনিষ্ঠা কন্যাকেও ইয়াকুব আ.-এর কাছে বিবাহ দেন। এরূপ দুই কন্যাকে একই ব্যক্তির সাথে বিবাহ দেওয়া তাদের শরিয়তে বৈধ ছিল।

পরবর্তীকালে তাওরাতের মাধ্যমে এ বিধান রহিত হয়ে যায়। হযরত ইয়াকুব আ.-এর কর্মই এটা বৈধ ও মুবাহ হওয়ার প্রমাণ। কারণ, তিনি ছিলেন নিষ্পাপ। লাবান তাঁর

উভয় কন্যার সাথে একটি করে দাসি দিয়েছিলেন। লায়্যার দাসির নাম ছিল যুলফা এবং রাহিলের দাসির নাম ছিল বালহা। লায়্যার যে ঘাটতি ছিল আল্লাহ তাকে কয়েকটি সন্তান দান করে সে ঘাটতি পূরণ করেন। সুতরাং লায়্যার গর্ভে ইয়াকূব আ.-এর প্রথম সন্তান রূবীল দ্বিতীয় সন্তান শামউন, তৃতীয় সন্তান লাবী এবং চতুর্থ সন্তান ইয়াহুদা। রাহিলের কোনো সন্তান হতো না। তাই তিনি ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়লেন এবং নিজের দাসী বালহাকে ইয়াকুব আ.-এর কাছে সমর্পন করলেন।

ইয়াকুব আ. দাসীর সাথে মিলিত হলে এক পুত্র সন্তান জন্ম হয়। তার নাম রাখা হয় নায়ফতালী। এবার লায়্যাও তাঁর দাসি যুলফাকে ইয়াকুব আ.-এর কাছে সমর্পণ করেন। যুলফার গর্ভে দুই পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। একজনের নাম হাদ, অপরজনের নাম আশীর। তারপর লায়্যা নিজেও সন্তান-সম্ভবা হন এবং পঞ্চম পুত্রের মা হন। এ পুত্রের নাম রাখা হয় আয়সাখার। পুনরায় ল্যায়া গর্ভবতী হলে ষষ্ঠ পুত্রের জন্ম হয় যার নাম রাখা হয় দিনা। এভাবে লায়্যার গর্ভে ইয়াকুব আ.-এর সাত সন্তানের জন্ম হয়। তারপর স্ত্রী রাহিল একটি পুত্র সন্তানের জন্যে আল্লাহর কাছে দুআ করেন। আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করেন। ফলে আল্লাহর নবী ইয়াকুব আ.-এর ঔরসে তাঁর গর্ভে এক সুন্দর সুশ্রী মহান পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করেন। যাঁর নাম রাখা হয় ইউসুফ।

এ পরিবারের সকলেই হারানে বসবাস করতে থাকেন। ইয়াকুব আ. মামার উভয় কন্যাকে বিবাহ করার পর আরো ছয় বছর পর্যন্ত তাঁর মেষ চরান। অর্থাৎ সর্বমোট বিশ বছর তিনি মামার কাছে অবস্থান করেন। তখন হযরত ইয়াকুব আ. নিজ পরিবারবর্গের কাছে ফিরে যাওয়ার জন্যে মামার কাছে অনুমতি চান। মামা তাঁকে বললেন, তোমার কারণে আমার ধন-সম্পদে অনেক বরকত হয়েছে। অতএব, আমার সম্পদের যে পরিমাণ ইচ্ছে, তুমি আমার কাছে চেয়ে নাও। ইয়াকুব আ. বললেন, তাহলে এবার আপনার বকরির যতগুলো বাচ্চা হবে সাদা-কালো ফোঁটা বিশিষ্ট, সাদা-কালো মিশ্রিত, কালো অংশ বেশি ও সাদা অংশ কম কিংবা মাথার দুদিকে টাকপড়া সাদা এ জাতীয় বাচ্চাগুলো আমাকে দিন। মামা তার দাবি মেনে নেন। সে মতে মামার ছেলেরা পিতার মেষ-পাল থেকে এ জাতীয় বকরিগুলো বেছে বেছে আলাদা করে নিলেন এবং সেগুলোকে পিতার মেষ-পাল থেকে তিন দিনের দূরত্বে নিয়ে যান। যাতে করে ওই জাতীয় বাচ্চা জন্ম হতে না পারে। এ দেখে ইয়াকুব আ. সাদা রং এর তাজা বাদাম ও দালাব নামক ঘাস সংগ্রহ করলেন এবং সেগুলো ছিঁড়ে ওসব বকরির খাওয়ার পানিতে ফেলে দেন। উদ্দেশ্য ছিল বকরি ওই দিকে তাকালে ভীত হবে এবং পেটের বাচ্চা নড়াচড়া করবে। ফলে সে সব বাচ্চা উপরিউক্ত রং-বিশিষ্ট হয়ে জন্মাবে। বস্তুত এটা ছিল একটি অলৌকিত ব্যাপার এবং ইয়াকুব আ.-এর নবী হওয়ার অন্যতম মুজিযা। এভাবে নবী ইয়াকুব আ. প্রচুর সংখ্যক বকরী, পশু ও দাস-দাসির মালিক হন এবং এ কারণে তাঁর মামার ও মামার ছেলেদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায়, যেন ইয়াকুব আ.-এর কারণে তারা কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন।

আল্লাহ ওহিযোগে ইয়াকুব আ.-কে নির্দেশ দেন, তুমি তোমার জন্মভূমিতে নিজ জাতির কাছে চলে যাও। এ সময় আল্লাহ তাঁকে সাহায্যের আশ্বাস প্রদান করেন। এরপর ইয়াকুব আ. নিজ স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের কাছে বিষয়টি পেশ করেন। তাঁরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর আনুগত্যের পক্ষে সাড়া দেন।। সুতরাং ইয়াকুব আ. তাঁর পরিবরবর্গ ও ধন-সম্পদ সাথে নিয়ে রওনা হয়ে পড়েন। আসার সময় স্ত্রী রাহিল তার পিতার মূর্তিসমূহ লুকিয়ে নিয়ে আসেন। তাঁরা যখন ওই এলাকা অতিক্রম করেন, তখন লাবান (রাহিলের পিতা) ও তাঁর সম্প্রদায় তাঁদের কাছে এসে উপস্থিত হন। লাবানকে না জানিয়ে আসার জন্যে তিনি ইয়াকুব আ.-কে মৃদু ভৎসনা করে বললেন, আমাকে জানিয়ে আসলে ধুমধামের সাথে কন্যাদের ও তাদের সন্তানদের বিদায় সম্বর্ধনা জানাতে পারতাম। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আমার মূর্তি কেন নিয়ে এসেছ? মূর্তির ব্যাপারে ইয়াকুব আ. কিছুই জানতেন না। তাই তিনি অস্বীকার করে বললেন, আমরা তো মূর্তি আনি নি। লাবান তার কন্যা ও দাসিদের অবস্থানস্থল ও জিনিসপত্র তল্লাশি করলেন। কিন্তু কিছুই পেলেন না। রাহিল এ মূর্তিটি নিজ বাহনের পৃষ্ঠদেশে বসার স্থানে গদির নিচে রেখে দিয়েছিলেন। তিনি সে স্থান থেকে উঠলেন না। ওযর পেশ করলেন, তিনি ঋতুবতী। সুতরাং তিনি তা উদ্ধার করতে ব্যর্থ হলেন।

অবশেষে শ্বশুর-জামাতা উভয়ে তথায় অবস্থিত জালআদ নামক একটি টিলার কাছে পরস্পরে এ মর্মে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন, ইয়াকুব আ. লাবানের কন্যাদেরকে ত্যাগ করবেন না এবং তাঁদের বর্তমানে অন্য কাউকে বিয়ে করবেন না এবং এই টিলা অতিক্রম করে লাবান ও ইয়াকুব আ. কেউই অন্যের দেশে যাবেন না। এরপর খাবার পাক হল। উভয় পক্ষ একত্রে আহার করলেন এবং একে অপরকে বিদায় জানিয়ে প্রত্যেকে স্ব-স্ব দেশের পানে যাত্রা করলেন। ইয়াকুব আ. সাঈদ এলাকা পর্যন্ত পৌঁছলে ফেরেশতাগণ এসে ইয়াকুব আ.-কে অভ্যর্থনা জানান। ইয়াকুব আ. সেখান থেকে একজন দূতকে তাঁর ভাই ঈসের নিকট প্রেরণ করেন। যাতে ভাই তাঁর প্রতি সদয় হন এবং কোমল আচরণ করেন। দূত ফিরে এসে ইয়াকুব আ.-কে এই সংবাদ দিল, ঈস চারশ পদাতিক সৈন্যসহ আপনার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এ সংবাদ পেয়ে ইয়াকুব আ. ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। আল্লাহর কাছে দুআ করেন, নামায আদায় করেন, কাকুতি-মিনতি জানান এবং ইতোপূর্বে প্রদত্ত সাহায্যের প্রতিশ্রুতি উল্লেখ করেন এবং ঈসের অনিষ্ট থেকে তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। এ ছাড়া তিনি তাঁর ভাইকে দেওয়ার জন্যে বিপুল পরিমাণ উপঢৌকন তৈরি রাখলেন। উপঢৌকনের মধ্যে ছিল দুশ ছাগী, বিশটা ছাগল, দুশ ভেড়ি, বিশটা ভেড়া, ত্রিশটা দুধেল উটনী, চল্লিশটা গাই, দশটা ষাঁড়, বিশটা গাধী ও দশটা গাধা। তারপর তিনি এ পশুগুলোর প্রত্যেক শ্রেণীকে আলাদা আলাদাভাবে হাঁকিয়ে নেওয়ার জন্যে রাখালদের নির্দেশ দেন এবং এর এক-একটি শ্রেণী থেকে আর একটি শ্রেণীর মাঝে দূরত্ব বজায় রাখার নির্দেশ দেন। এরপর তাদের বলে দেন, ঈসের সাথে প্রথমে যার সাক্ষাৎ হবে এবং ঈস বলবেন, তুমি কার লোক এবং এ পশুগুলো

কার? তখন উত্তর দিবে, আপনার দাস ইয়াকুবের। মনিব ঈসের জন্যে তিনি এগুলো হাদিয়াস্বরূপ পাঠিয়েছেন। এরপর যার সাথে দেখা হবে এবং তার পরে যার সাথে সাক্ষাৎ হবে সবাই ওই একই উত্তর দিবে। আর তোমরা প্রত্যেকেই বলবে, তিনি আমাদের পেছনে আসছেন।

সবাইকে বিদায় করার দুদিন পর ইয়াকুব আ. তাঁর দুই স্ত্রী, দুই দাসী এবং এগারো পুত্র যাত্রা শুরু করেন। তিনি রাত্রিকালে পথ চলতেন এবং দিনের বেলা বিশ্রাম নিতেন। যাত্রার দ্বিতীয় দিন প্রভাতকালে ইয়াকুব আ.-এর সম্মুখে জনৈক ফেরেশতা মানুষের আকৃতিতে দেখা দেন। ইয়াকুব আ. তাঁকে একজন পুরুষ মানুষ বলে ধারণা করেন। ইয়াকুব আ. তাঁকে পরাস্ত করার জন্যে অগ্রসর হন এবং ধস্তাধস্তির মাধ্যমে বাহ্যিক দৃষ্টিতে ইয়াকুব আ. জয়ী হন। তবে ফেরেশতার দ্বারা ইয়াকুব আ. তাঁর উরুতে আঘাত প্রাপ্ত হন। তখন তিনি খোঁড়াতে থাকেন। প্রভাতের আলো ফুটে উঠলে ফেরেশতা ইয়াকুব আ.-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার নাম কি? উত্তরে তিনি বললেন, আমার নাম ইয়াকুব আ.। ফেরেশতা বললেন, এখন থেকে আপনার নাম হবে ইসরাঈল। ইয়াকুব আ. জিজ্ঞেস করলেন, আপনার পরিচয় কি এবং আপনার নাম কি? প্রশ্ন করার সাথেই ফেরেশতা অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তখন ইয়াকুব আ. বুঝতে পারলেন, ওনি ফেরেশতা। পায়ে আঘাত পেয়ে ইয়াকুব আ. খোঁড়া হয়ে আছেন। বনি-ইসরাঈলগণ এ কারণে উরু-হাঁটুর মাংস খায় না।

তারপর ইয়াকুব আ. দেখতে পান, তাঁর ভাই ঈস চারশ লোকের এক বাহিনী নিয়ে তাঁর দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। তিনি পরিবারবর্গকে পেছনে রেখে সম্মুখে যান। ঈস সম্মুখে উপস্থিত হলে তাকে দেখেই ইয়াকুব আ. সাতবার সিজদা করেন। এ সিজদা ছিল সে যুগে সাক্ষাৎকালের সালাম বা অভিবাদন (সম্মানসূচক) এবং তাঁদের শরিয়তে বৈধ। যেমন ফেরেশতারা হযরত আদম আ.-কে সম্মানসূচক সিজদা করেছিলেন এবং হযরত ইউসুফ আ.-কে তাঁর পিতা-মাতা ও ভাইয়েরা সিজদা করেছিলেন। ইয়াকুব আ.-এর এ আচরণ দেখে ঈস তাঁকে আলিঙ্গন করে চুমো খেলেন এবং কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। তারপর চোখ তুলে তাকাতেই নারী ও বালকদের দেখে ঈস ইয়াকুব আ.-কে লক্ষ্য করে বললেন, এদেরকে তুমি কোথায় পেলে? ইয়াকুব আ. বললেন, আল্লাহই আপনার দাসকে এ সব দান করেছেন। এ সময় দাসীদ্বয় ও তাদের সন্তানরা ঈসকে সিজদা করল। এরপর লায়্যা ও তার সন্তানরা সিজদা করে শেষে রাহিল ও তার পুত্র ইউসুফ এসে সিজদা করেন। এরপর ইয়াকুব আ. তাঁর ভাইকে দেওয়া হাদিয়াগুলো গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানালে ঈস তা গ্রহণ করেন। এরপর ঈস সেখান থেকে বাড়ির দিকে রওনা হলেন, তখন তিনি আগে আগে ছিলেন এবং ইয়াকুব ও তাঁর পরিবার-পরিজন, দাস-দাসী ও পশু সম্পদসহ তার পিছে পিছে সাঈর পর্বতের উদ্দেশে যাত্রা করেন।

সাহুর নামক স্থান অতিক্রমকালে তিনি সেখানে একটি ঘর নির্মাণ করেন এবং পশুগুলোর জন্যে ছাউনি তৈরি করেন। এরপর শাখীম এলাকার উর-শালীম (اور شليم)

নামক গ্রামের সন্নিকটে অবতরণ করেন এবং শাখীম ইবনে জামুরের এক খণ্ড জমি একশ' ভেড়ার বিনিময়ে ক্রয় করেন। সেই জমিতে তিনি তাঁবু স্থাপন করেন এবং একটি কুরবানীগাহ্ তৈরি করেন। তিনি এর নাম রাখেন 'ঈস-ইলাহে ইসরাঈল। এ কুরবানীগাহটি আল্লাহ তাঁর মাহাত্ম্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে নির্মাণ করার আদেশ দিয়েছিলেন। এটাই বর্তমান কালের বায়তুল মুকাদ্দাস। পরবর্তীকালে সুলাইমান ইবনে দাউদ আ. এ ঘরের সংস্কার করেন। এটাই সেই চিহ্নিত পাথরের জায়গা যার উপর তিনি ইতোপূর্বে তেল রেখেছিলেন।

আহলে কিতাবরা এখানে একটি ঘটনা বর্ণনা করে। ইয়াকুব আ.-এর স্ত্রী লায়্যার পক্ষের কন্যা দীনা সম্পর্কে। ঘটনা হল, শাখীম ইবন জামুর দীনাকে জোরপূর্বক তার বাড়িতে ধরে নিয়ে যায়। তারপর দীনার পিতা ও ভাইদের কাছে তাকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়। দীনার ভাইয়েরা বলে : তোমরা যদি সকলে খতনা করো, তা হলে আমাদের সাথে তোমাদের বৈবাহিক সম্পর্ক হতে পারে। কেননা খতনাবিহীন লোকদের সাথে আমরা বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করি না। শাখীমের সম্প্রদায়ের সবাই সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে খতনা করল। খতনা করার পর তৃতীয় দিবসে তাদের ভীষণ যন্ত্রণা শুরু হয়। এ সুযোগে ইয়াকুব আ.-এর সন্তানগণ তাদের উপর হামলা করে। শাখীম ও তার পিতা জামুরসহ সকলকে হত্যা করে ফেলে। হত্যা' কারণ ছিল তাদের অসদাচরণ। তদুপরি তারা ছিল মূর্তিপূজারী, কাফির। এ কারণে ইয়াকুব আ.-এর সন্তানরা তাদের হত্যা করে, তাদের ধন-সম্পদ গনিমত হিসেবে লাভ করে।

এরপর ইয়াকুব আ.-এর কনিষ্ঠ স্ত্রী পুনরায় সন্তান-সম্ভবা হন এবং পুত্র বিনইয়ামীন জন্মগ্রহণ করেন। রাহিল বিনইয়ামীনকে প্রসব করতে গিয়ে খুবই কষ্ট পান। ফলে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই রাহিল ইনতিকাল করেন। ইয়াকুব আ. আফরাছ অর্থাৎ বায়তু-লাহমে (বেথেলহামে) তাঁকে দাফন করেন। তিনিই তার কবরের উপর একটি পাথর রেখে দিয়েছিলেন, যা আজও বিদ্যমান আছে। হযরত ইয়াকুব আ.-এর সন্তানের মধ্যে বারজন পুত্র। এদের মধ্যে লায়্যার গর্ভে যাঁদের জন্ম হয় তাঁরা হচ্ছেন (১) রুবীল, (২) শামঊন (৩) লাবী (৪) ইয়াহুদা (৫) আয়াখার ও (৬) যায়িলূন। রাহীলের গর্ভে হয় (৭) ইউসুফ ও (৮) বিন-য়ামীনের। রাহিলের দাসীর গর্ভে জন্ম হয় (৯) দান ও (১০) নায়ফতালী এর। লায়্যার দাসির গর্ভে জন্ম হয় (১১) হাদ ও (১২) আশীর এর। এরপর হযরত ইয়াকুব আ. কেনানের হিবরূন গ্রামে চলে আসেন। এবং তথায় পিতার সান্নিধ্যে থাকেন। হযরত ইবরাহীম আ.ও এখানেই বসবাস করতেন।

রোগাক্রান্ত হয়ে হযরত ইসহাক আ. একশ আশি বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। তাঁর পুত্রদ্বয় ঈস ও ইয়াকুব আ. তাকে তাঁর পিতার পূর্বোল্লেখিত তাদের কেনা জমিতে হযরত ইবরাহীম আ.-এর কবরের পাশে সমাহিত করেন।

হযরত ইয়াকুব আ.

হযরত ইয়াকুব আ.-এর বংশ পরিচয়

হযরত ইয়াকুব আ. হযরত ইসহাক আ.-এর পুত্র এবং হযরত ইবরাহীম আ.-এর পৌত্র আর হযরত ইবরাহীম আ.-এর ভ্রাতা বতুঈলের দৌহিত্র। তাঁর মাতার নাম রাফাকা। তিনি তাঁর মাতার অত্যধিক স্নেহের পাত্র ছিলেন। আর তাঁর সহোদর ভ্রাতা ঈস পিতা হযরত ইসহাক আ.-এর অত্যন্ত স্নেহভাজন। তাওরাতে বর্ণিত তাঁদের উভয় ভ্রাতার পারস্পরিক মনোমালিন্যের ঘটনা ইতোপূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে। হযরত ইয়াকুব আ. যখন তাঁর মাতার ইঙ্গিতে 'ফাদ্দান আরাম' চলে গেলেন, তখন তাঁর মাতুল লাবান তাঁর থেকে এ প্রতিশ্রুতি নিলেন, তিনি তার কাছে ৭/১০ বছর বকরি চরাবেন। এ মেয়াদকে মহর সাব্যস্ত করে নিজের কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ করিয়ে দেবেন। ইয়াকুব আ. সেই মেয়াদ পূর্ণ করলেন। তখন লাবান তার জ্যৈষ্ঠা কন্যা লাইয়ার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তুতি নিলেন। কিন্তু হযরত ইয়াকুব আ. মামার কাছে তাঁর ছোট কন্যা রাহিলকে বিবাহ করার আগ্রহ পেশ করলেন। লাবান বললেন, এখানকার প্রথানুসারে বড় কন্যার বিবাহের আগে ছোট কন্যার বিবাহ হতে পারে না। সুতরাং তুমি এ সম্বন্ধ মনযুর করো। এবং এখানে আরো দশ বছর অবস্থান করে আমার খেদমতে থাকো। তা হলে রাহিলকেও তোমার বিবাহাধীনে দেওয়া হবে। (সেসময় দুই বোনকে বিবাহের মধ্যে একত্র করা শরিয়তে নিষেধ ছিল না।) হযরত ইয়াকুব আ. মামার প্রস্তাবিত ১০ বছর মেয়াদ পূর্ণ করে রাহিলকেও বিবাহ করলেন। এছাড়া লাইয়ার খাদেমা যুলফা এবং রাহিলের খাদেমা বাহলাও তাঁর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেল। অনন্তর সকল স্ত্রীর গর্ভ থেকেই তাঁর সন্তান জন্মগ্রহণ করল। বিনইয়ামিন ছাড়া তাঁর অন্য সব সন্তান মাতুল গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। ইয়াকুব আ. জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তন করার পর বিনইয়ামিন জন্মগ্রহণ করেন। লাবান ২০ বছর কাল ইয়াকুব আ.-কে নিজের কাছে রাখার পর বহু মাল-দৌলত এবং গৃহপালিত পশুরপাল প্রদান করে বিদায় জানালেন। এরপর তিনি পুনরায় নিজ পিতামহের 'দারুল হিজরত' ফিলিস্তিনে এসে অবস্থান করতে লাগলেন।

ইয়াকুব আ. যে সময়ে ফাদ্দান চলে গিয়েছেন, তখন 'ঈস' অসন্তুষ্ট হয়ে চাচা ইসমাঈল আ.-এর কাছে মক্কায় গিয়ে অবস্থান করতে থাকেন। অবশেষে তাঁর কন্যাকে বিবাহ করে নিকটেই বসবাস করতে থাকেন। তার বংশধরগণ 'আদওয়াম' নামে প্রসিদ্ধ। এ সময়ের মধ্যে উভয় ভ্রাতার মধ্যকার মনোমালিন্যও দূর হয়ে যায়। উভয়ের মধ্যে পুনরায় মহব্বতের সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। উভয়ে একে অন্যের কাছে হাদিয়া-তোহফা প্রেরণের ধারাও প্রচলিত রাখলেন।

এ সমস্ত ঘটনাবলী তাওরাতে বর্ণিত কাহিনি। কোরআন মাজিদ এ ব্যাপারে নীরব। শুধু এটুকুই উল্লেখ করেছে : ইয়াকুব আ. একজন উচ্চ মর্যাদাশালী পয়গম্বর। ধৈর্য ও দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী এবং হযরত ইউসুফ আ.-এর পিতা।

ইসরাঈল

ইবরানি ভাষায় ইয়াকুব আ.-এর নাম ইসরাঈল। ইসরা শব্দের অর্থ عبد (দাস) এবং ايل অর্থ, আল্লাহ। দুই শব্দের সমন্বয়ে গঠিত ইসরাঈল-এর আরবি অর্থ : আবদুল্লাহ- আল্লাহর বান্দা। হযরত ইবরাহীম আ.-এর পুত্র ইসহাক আ.-এর বংশধরগণ যারা ইয়াকুব আ.-এর বংশোদ্ভূত তাদেরকে তাঁর ইবরানী নামানুসারে বনি ইসরাঈল বলা হয়। আজও ইহুদি-খৃস্টানদের প্রাচীন খান্দান এর সঙ্গেই সম্বন্ধযুক্ত।

ইয়াকুব আ.-এর আওলাদ

ইয়াকুব আ.-এর ১২ পুত্র ছিল। বিনইয়ামিন ছাড়া তাঁর সকল পুত্রই 'ফাদ্দানে' জন্মগ্রহণ করেন। শুধু বিনইয়ামিন ফিলিস্তিনে (কেনানে) জন্মগ্রহণ করেন। ইয়াকুব আ.-এর এ পুত্রগণ বিভিন্ন বিবির গর্ভজাত সন্তান।

১। লাইয়া বিনতে লাবান হতে – রাতবীন, শামঊন, লাওয়া, ইয়াহূদ, দাইসাকার ও যালুবুন =	৬
২। রাহিল বিনতে লাবান – ইউসুফ ও বিনইয়ামিন =	২
৩। বালহা, রাহিলের খাদেমা – দান, নাফতালা =	২
৪। যুলকা, লাইয়ার খাদেমা – যাদ, আশীর =	২
মোট =	১২

নবুয়ত লাভ

হযরত ইয়াকুব আ. ছিলেন আল্লাহ তাআলার মনোনীত পয়গম্বর। তিনি কেনানবাসীদের হেদায়তের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। বহু বছর পর্যন্ত তিনি মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করেন। কোরআন মাজিদে তাঁর আলোচনা হযরত ইউসুফ আ.-এর সঙ্গেও করা হয়েছে।

ইনতেকাল

ইবনে ইসহাক রহ. আহলে কিতাবদের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন : হযরত ইয়াকুব আ. মিসরে পুত্র ইউসূফ আ.-এর কাছে ১৭ বছর থাকার পর ইনতেকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি ইউসুফ আ.-কে অসিয়ত করেন, তাঁকে যেন তাঁর পিতৃ-পুরুষ ইবরাহীম আ. ও ইসহাক আ.-এর পাশে দাফন করা হয়। সুদ্দী রহ. লিখেছেন, হযরত ইউসুফ আ. এ অসিয়ত পালন করেন। পিতার মৃতদেহ তিনি সিরিয়ায় পাঠিয়ে দেন এবং পিতা ইসহাক আ. ও পিতামহ ইবরাহীম খলীলুল্লাহ আ.-এর কবরের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।

আহলে কিতাবদের মতে হযরত ইয়াকুব আ. যখন মিসরে যান, তখন তাঁর বয়স ছিল ১শ ৩০ বছর। তাদের মতে তিনি মিসরে ১৭ বছর জীবিত থাকেন। তা হলে তাঁর বয়স হয় ১৪৭ বছর। কিন্তু তারা হযরত ইয়াকুব আ.-এর বয়স লিখেছে সর্বমোট ১৪০ বছর। নিঃসন্দেহে এটা তাদের কিতাবের লিপিগত ভুল কিংবা তাদের হিসেবের ভুল

অথবা তারা চল্লিশের উপরের খুচরা বছরগুলোকে ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু এ রকম করা তাদের নীতি নয়। কেননা অনেক স্থানে তারা খুচরা সংখ্যাসহ উল্লেখ করেছে। এখানে কীভাবে এর ব্যতিক্রম করল, তা বোধগম্য নয়।

আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে বলেন :

أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

তবে কি তোমরা উপস্থিত ছিলে যখন ইয়াকুবের মৃত্যু নিকটবর্তী হয়? যখন সে সন্তানদের বলল: আমার পর তোমরা কার ইবাদত করবে? তারা বলল : আমরা আপনার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের ইলাহের ইবাদত করব। তিনি একক মাবুদ। আর আমরা সবাই তাঁর কাছে আত্মসমর্পণকারী। (সূরা বাকারা : ১৩৩)

হযরত ইয়াকুব আ. আপন সন্তানদেরকে যে খালেস দীনের প্রতি অসিয়ত করেন, তা হল দীন ইসলাম। যে দীনসহ সমস্ত নবীকে তিনি প্রেরণ করেছেন। আহলে কিতাবরা উল্লেখ করে, হযরত ইয়াকুব আ. তাঁর পুত্রদেরকে একজন একজন করে অসিয়ত করেন। এবং তাদের অবস্থা ভবিষ্যতে কেমন হবে, সে সম্পর্কে অবহিত করেন। পুত্র ইয়াহুদাকে তিনি তাঁর বংশ থেকে এক মহান নবীর আগমনের সুসংবাদ দেন, বংশের সবাই যার আনুগত্য করবে। তিনি হলেন সায়্যিদুনা ঈসা ইবনে মারইয়াম আ.। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

আহলে কিতাবদের বর্ণনা মতে হযরত ইয়াকুব আ.-এর মৃত্যুতে মিসরবাসী সত্তর দিন পর্যন্ত শোক পালন করে। হযরত ইউসুফ আ. চিকিৎসাবিদদেরকে উৎকৃষ্ট সুগন্ধি দ্বারা পিতার মরদেহ অক্ষুণ্ন রাখতে আদেশ দিলে তারা তাই করে। এভাবে চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়। এরপর হযরত ইউসুফ আ. মিসরের বাদশার কাছে মিসরের বাইরে যাওয়ার অনুমতি চান, তিনি পিতাকে পিতৃ-পুরুষদের পাশে দাফন করবেন। বাদশা অনুমতি দিলেন। ইউসুফ আ.-এর সাথে মিসরেরর গণ্যমান্য ও প্রভাবশালী লোকদের এক বিরাট দল গমন করে। হিবরূন নামক স্থানে পৌঁছে পিতাকে গুহায় দাফন করেন, যেখানে হযরত ইবরাহীম আ. ইফরূন ইবনে সাখারের কাছ থেকে খরিদ করে নিয়েছিলেন। সাত দিন সেখানে অবস্থান করার পর সকলেই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। পিতার মৃত্যুতে ইউসুফ আ.-এর ভাইগণ ইউসুফ আ.-কে অত্যধিক সান্ত্বনা দেন ও সম্মান দেখান। ইউসুফ আ.-ও তাদের সম্মানিত করেন এবং প্রত্যাবর্তনের পর উত্তমভাবে তাদেরকে মিসরে থাকার ব্যবস্থা করেন।

হযরত ইউসুফ আ.

হযরত ইউসুফ আ.-এর বংশ পরিচয়

ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম আ.। তাঁর মাতার নাম রাহিল বিনতে লাবান। হযরত ইয়াকুব আ. তাঁকে অত্যধিক স্নেহ করতেন। মহব্বত করতেন। কোনো সময়ই তাঁর বিচ্ছেদ বরদাশত করতে পারতেন না। হযরত ইউসুফ আ.-ও বয়োপ্রাপ্ত হয়ে নিজ পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহের মতো আল্লাহ তাআলার উচ্চ মর্যাদাশালী পয়গম্বর হন। তিনি হানিফি ধর্মের দাওয়াত ও তাবলিগের কর্তব্য পালন করেছেন। এ কারণে জীবনের শুরু থেকেই তাঁর মেধা ও প্রকৃতিগত যোগ্যতা অন্যান্য ভাইদের তুলনায় সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম ছিল। ইয়াকুব আ.- তাকে বেশি মহব্বতের একটি কারণ ছিল, তিনি ইউসুফ আ.-এর ললাটে দীপ্তিমান 'নূরে নবুয়ত' দেখেছিলেন এবং আল্লাহ পাকের অহির মাধ্যমে তা জানতে পেরেছিলেন।

ইউসুফ আ.-এর স্বপ্ন এবং তাঁর ভাইদের আচরণ

হযরত ইয়াকুব আ. যেহেতু নিজের আওলাদের মধ্যে হযরত ইউসুফ আ.-কে অত্যন্ত স্নেহ মহব্বত করতেন, তাই তা ভাইদের পক্ষে অসহনীয় ছিল। তাঁরা সর্বক্ষণ কিভাবে হযরত ইয়াকুব আ.-এর অন্তর থেকে এ মহব্বত দূর করা যায় বা ইউসুফ আ.-কেই নিজেদের পথ থেকে সরিয়ে দেয়া যায় এ চিন্তায় লেগে থাকত। তারা ভাবত, তা হলেই সব কিছুর অবসান হয়ে যাবে।

ভাইদের এই হিংসাত্মক মনোভাবের ওপর অতিরিক্ত একটি ইন্ধন পড়ল হযরত ইউসুফ আ.-এর স্বপ্ন। তিনি স্বপ্নে দেখলেন, এগারোটি নক্ষত্র, সূর্য ও চাঁদ তাকে সেজদা করছে। হযরত ইয়াকুব আ. প্রিয়পুত্রের এ স্বপ্ন শুনে কঠোরভাবে তাঁকে নিষেধ করে দিলেন, এ স্বপ্ন পুনর্বার কারো সম্মুখে বর্ণনা করো না। নতুবা তোমার ভাইয়েরা তা শুনে তোমার প্রতি দুর্ব্যবহার আরম্ভ করে দেবে। কেননা শয়তান মানুষের পিছনে লেগেই আছে আর তোমার স্বপ্নের ফল নিতান্ত স্পষ্ট ও পরিষ্কার। কোরআন মাজিদ এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছে :

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ (٤) قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ (٥) وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦)

"যখন ইউসুফ আপন পিতাকে বললেন : পিতা, আমি স্বপ্নে এগারটি নক্ষত্র এবং সূর্য ও চন্দ্রকে দেখলাম, তারা আমাকে সেজদা করছে। তিনি বললেন : বৎস! তুমি তোমার ভাইদেরকে তোমার এ স্বপ্ন শুনিও না। পাছে না তারা তোমার সাথে কোনো

ষড়যন্ত্র করে। নিঃসন্দেহে শয়তান মানুষের জন্য প্রকাশ্য শত্রু। আর এরূপে তোমার পালনকর্তা তোমাকে মনোনীত করবেন এবং তোমাকে স্বপ্নফল বর্ণনা শিক্ষা দেবেন। নিজের নেয়ামত তোমার ওপর এবং ইয়াকুবের আওলাদের ওপর পূর্ণ করবেন। যেমন তিনি (নবুয়তের) এ নেয়ামত পূর্ব থেকে তোমার পূর্বপুরুষগণের ওপর পূর্ণ করেছিলেন (অর্থাৎ ইয়াকুব ও ইসহাক আ.-এর ওপর)। নিঃসন্দেহে তোমার পালনকর্তা মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

এ স্থলে তাওরাতের বর্ণনায় কোরআনের বিপরীত বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন :

(১) কুরআন মাজিদ বর্ণনা করছে : হযরত ইউসুফ আ. তাঁর স্বপ্নটি হযরত ইয়াকুব আ.-কে শুনানোর সময় অন্যান্য ভাইয়েরা সেখানে উপস্থিত ছিল না। অথচ তাওরাত বলে, ভাইয়েরা উপস্থিত ছিল।

(২) কুরআন মাজিদ বলে, ইয়াকুব আ. এ স্বপ্ন শুনে ইউসুফ আ.-এর প্রতি খুবই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তাঁকে নবুয়ত এবং আল্লাহ প্রদত্ত ইলমের সুসংবাদ শুনিয়েছিলেন। কিন্তু তাওরাত বলে, ইয়াকুব আ. স্বপ্নটি শুনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, হয়তো এ স্বপ্ন বর্ণনায় তোমার উদ্দেশ্য আমি ও তোমার মা এবং তোমার ভাইয়েরা তোমার সম্মুখে সেজদায় পতিত হই!

ঘটনাবলীর পর্যায়ক্রমিক বর্ণনার প্রেক্ষিতে পরিষ্কার বুঝা যায়, কুরআন মাজিদের বর্ণনাই সঠিক এবং সত্য। এতদ্ভিন্ন প্রকৃতির দাবিও ইউসুফ আ. নিজের এ স্বপ্নটিকে ভাইদের থেকে পৃথক হয়েই বর্ণনা করেছেন। এবং ইয়াকুব আ. পুত্রের এ স্বপ্ন শ্রবণ করে আনন্দিত হয়েছেন। কেননা প্রত্যেক পিতাই আপন সন্তানের পদোন্নতি ও উচ্চমর্যাদা কামনা করেন। বিশেষত হযরত ইয়াকুব আ. নবী হওয়ার কারণে যখন স্বপ্নকালের মধ্যে ইউসুফ আ.-এর যেই উচ্চ মর্যাদা দেখতে পাচ্ছিলেন, তা শত-সহস্র খুশি ও আনন্দের কারণ ছিল; মোটেও ব্যথা বা মনোকষ্টের কারণ নয়।

পরিশেষে হিংসার আগুন একদিন ইউসুফ আ.-এর ভাইদেরকে ইউসুফ আ.-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে বাধ্য করল। সুতরাং সব ভাই মিলে এ "বিষকাটা" সরানোর জন্য শলায় বসল। কুরআন মাজিদে ইরশাদ হচ্ছে :

إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (٨) اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ (٩) قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ (١٠)

"যখন তারা বলতে লাগল : অবশ্যই ইউসুফ এবং তার ভাই (বিনইয়ামিন) আমাদের পিতার অধিক স্নেহভাজন অথচ আমরা তাদের চেয়ে শক্তিশালী। নিঃসন্দেহে আমাদের পিতা প্রকাশ্য ভুলের মধ্যে রয়েছে। হয়তো ইউসুফকে হত্যা করে ফেল অথবা কোনো দূর দেশে নিয়ে ফেলে আসো। যাতে তোমাদের পিতার মনোযোগ তোমাদের

প্রতি ঘুরে আসে। এরপর তোমরা নেককার কওম হয়ে থাকো। তাদের মধ্যে হতে একজন বলে উঠল, ইউসুফকে হত্যা করো না। যদি তোমাদের কিছু করতেই হয়, তবে তাঁকে একটি কূপে ফেলে দাও। যেন কোনো পথিক তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে যায়।"

(সূরা ইউসুফ : ৮-১০)

উক্ত পরামর্শের পর সকলে একত্র হয়ে হযরত ইয়াকূব আ.-এর কাছে গিয়ে বলল, আপনি ইউসুফকে আমাদের সাথে বাইরে বেড়াতে পাঠান না কেন? আমাদের উপর কি আপনার বিশ্বাস নেই? তাঁর সংরক্ষণের ব্যাপারে আমাদের চেয়ে অধিক হিতাকাঙ্ক্ষী আর কে হতে পারে? এ সম্পর্কে কুরআন মাজিদ বলে :

مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ (١١) أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (١٢)

"(তারা এসে বলল, পিতা!) এর কারণ কি, আপনি ইউসুফের বিষয়ে আমাদের বিশ্বাস করেন না? অথচ আমরা তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষী। আগামীকাল তাঁকে আমাদের সঙ্গে প্রেরণ করুন। সে পানাহার করবে এবং খেলাধুলা করবে। নিঃসন্দেহে আমরা তাঁর হেফাযতকারী।" (সূরা ইউসুফ : ১১-১২)

পুত্ররা পিতার কাছে আবদার করল, তিনি যেন তাদের সাথে ভাই ইউসুফকে যেতে দেন। তাদের উদ্দেশ্য বলল, সে তাদের সাথে পশু চরাবে, খেলাধুলা ও আনন্দ-ফূর্তি করবে। তারা অন্তরে এমন কথা গোপন করে রাখল, যে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবগত ছিলেন। বৃদ্ধ পিতা তাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে উত্তর দিলেন, হে পুত্রগণ! আমার কাছ থেকে সামান্য সময়ের জন্যেও তার বিচ্ছিন্ন হওয়া আমাকে বড়ই পীড়া দেয়। এ ছাড়া আমার আরো আশঙ্কা হয়, তোমরা খেলাধুলায় মত্ত হয়ে পড়লে সেই সুযোগে নেকড়ে এসে তাকে খেয়ে ফেলবে। আর তোমরা তা প্রতিহত করতে পারবে না অসতর্ক থাকার কারণে এবং সে-ও পারবে না অল্প বয়স্ক হওয়ার কারণে।

আহলে কিতাবদের মতে হযরত ইয়াকুব আ. পুত্র ইউসুফকে তাঁর ভাইদের পিছনে পিছনে প্রেরণ করেন। কিন্তু ইউসুফ পথ হারিয়ে ফেলেন। পরে অন্য এক ব্যক্তি তাকে তার ভাইদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়। কিন্তু এটি তাদের একটি ভ্রান্তি বিশেষ। কেননা ইয়াকুব আ. ইউসুফকে এতই বেশি ভালবাসতেন, তিনি তাঁকে তাদের সাথে পাঠাতেই চাচ্ছিলেন না। সুতরাং তিনি তাঁকে একা পাঠাবেন কী করে?

হযরত ইয়াকুব আ. বুঝতে পারলেন, তাদের মনে দুরভিসন্ধি রয়েছে। তারা ইউসুফের অনিষ্ট সাধনের পিছনে লেগেছে। কিন্তু তিনি পরিষ্কার কথায় সে মনোভাব প্রকাশ করলেন না। কেননা তাতে তারা আরো ক্রুদ্ধ হয়ে ইউসুফের সাথে প্রকাশ্য শত্রুতায় প্রবৃত্ত হতে পারে। ভাবলেন, ইশারা-ইঙ্গিতে বললে হয়তো তারা নিজেদের জালিমসুলভ ষড়যন্ত্র হতে বিরত হতে পারে। কাজেই ইঙ্গিতে তাদের সম্মুখে প্রকৃত

অবস্থা প্রকাশ করে দিলেন, বাস্তবিকই আমি ইউসুফ আ. সম্বন্ধে তোমাদের পক্ষ থেকে আশঙ্কা করছি। যেমন কুরআন মাজিদে ইরশাদ হচ্ছে :

قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ (١٣)

"ইয়াকুব আ. বললেন, এ বিষয়টি আমাকে দুঃখিত ও চিন্তান্বিত করছে, তোমরা (নিজেদের সঙ্গে) নিয়ে যাও। আমি আশঙ্কা করছি, নেকড়ে বাঘ এসে তাঁকে খেয়ে ফেলে এবং তোমরা তার থেকে অসতর্ক থাকো।" (সূরা ইউসূফ : ১৩)

এ কথা শুনে ইউসুফ আ.-এর ভাইয়েরা সমস্বরে বলে উঠল :

لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ

"যদি তাঁকে নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলে, অথচ আমরা সকলে শক্তিশালী, তবে তো আমরা সব কিছুই খোয়ালাম।" (সূরা ইউসুফ : ১৪)

মুফাস্সিরীনে কেরাম ও আলেমগণ লেখেন, হযরত ইউসুফ আ. বালক বয়সে একবার স্বপ্নে দেখেন- এগারোটি নক্ষত্র তথা তাঁর এগারো ভাই এবং সূর্য ও চন্দ্র অর্থাৎ তাঁর পিতা-মাতা তাঁকে সেজদা করছেন। স্বপ্ন দেখে তিনি শঙ্কিত হন। ঘুম থেকে জেগে ওঠে পিতার কাছে স্বপ্নটি বর্ণনা করেন। পিতা বুঝতে পারলেন, অচিরেই তিনি দুনিয়া ও আখিরাতের উচ্চ মর্যাদায় আসীন হবেন আর তাঁর পিতা-মাতা এবং ভাইগণ হবেন তাঁর অনুগত। পিতা তাঁকে এ স্বপ্নের কথা গোপন রাখতে বলেন এবং তা ভাইদের কাছে বর্ণনা করতে নিষেধ করেন। যাতে তারা হিংসাবশত ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করতে না পারে।

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (١٥) وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ (١٦) قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ (١٧) وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (١٨)

এরপর ওরা যখন তাকে নিয়ে গেল এবং তাকে গভীর কূপে নিক্ষেপ করতে একমত হল, এমতাবস্থায় আমি তাকে জানিয়ে দিলাম, তুমি ওদেরকে ওদের এ কর্মের কথা অবশ্যই বলে দেবে, যখন ওরা তোমাকে চিনবে না। ওরা রাতে কাঁদতে কাঁদতে পিতার নিকট আসল। তারা বলল, হে আমাদের পিতা! আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করছিলাম এবং ইউসুফকে আমাদের মালপত্রের কাছে রেখে গিয়েছিলাম, এরপর নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলেছে; কিন্তু তুমি তো আমাদেরকে বিশ্বাস করবে না, যদিও আমরা সত্যবাদী। ওরা তার জামায় মিথ্যা রক্ত লেপন করে এনেছিল। সে বলল : না,

তোমাদের মন তোমাদের জন্যে একটি কাহিনী সাজিয়ে দিয়েছে। সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়, তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্যস্থল।

(সূরা ইউসুফ : ১৫-১৮)

ইউসুফের ভাইয়েরা পিতাকে পীড়াপীড়ি করতে থাকলে তিনি ইউসুফ আ.-কে তাদের সাথে পাঠিয়ে দেন। পিতার দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেলে তারা ইউসুফকে মুখে গালাগালি করতে থাকে এবং হাতের দ্বারা মারতে থাকে। অবশেষে এক গভীর কূপে নিক্ষেপ করার ব্যাপারে একমত হয় এবং কূপের মুখে যে পাথরের উপর দাঁড়িয়ে পানি তোলা হয়, সেই পাথরের উপর দাঁড়িয়ে তারা ইউসুফ আ.-কে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করে দেয়। তখন আল্লাহ অহির মাধ্যমে তাঁকে জানিয়ে দেন, তোমাকে এ দুরবস্থা থেকে অবশ্যই উদ্ধার করা হবে এবং তাদের এই দুষ্কর্মের কথা এমন এক অবস্থায় তাদেরকে তুমি জানানোর সুযোগ পাবে, যখন তুমি হবে ক্ষমতাশালী আর তারা হবে তোমার মুখাপেক্ষী এবং ভীত-সন্ত্রস্ত। কিন্তু তারা টেরও পাবে না।

তারা বকরির বাচ্চা যবেহ করে জামায় রক্ত মাখিয়ে আনে। যাতে আগেই ধারণা দিতে পারে, তাঁকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে। কিন্তু জামা ছিড়তে ভুলে গিয়েছিল। বস্তুত মিথ্যার সমস্যাই হল ভুলে যাওয়া (آفَةُ الْكِذْبِ النِّسْيَانُ) তাদের উপর সন্দেহের লক্ষণাদি যখন স্পষ্ট হয়ে উঠল, তখন তাদের এ কাজ পিতাকে আর প্রতারিত করতে পারে নি।

কেননা ইউসুফ আ.-এর মধ্যে শিশুকালেই যেসব মহৎ গুণাবলী ও নবীসুলভ লক্ষণাদি ফুটে উঠেছিল, সেসব কারণে পিতা তাঁকে অন্যদের তুলনায় অধিক ভালবাসতেন। এ কারণে আসল ঘটনা আড়াল করে তারা পিতার কাছে এলে পিতা বললেন : তোমারা বরং নিজেরাই একটা বিষয় সাজিয়ে নিয়েছ। এরপর আল্লাহ বলেন,

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (١٩) وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ (٢٠) وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٢١) وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (٢٢)

এক যাত্রীদর এলো। তারা তাদের পানি সংগ্রাহককে প্রেরণ করল, সে তার পানির ডোল নামিয়ে দিল। সে বলে উঠল, কী সুখবর! এ যে এক কিশোর! ওরা তাকে পণ্য রূপে লুকিয়ে রাখল। ওরা যা করছিল সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত ছিলেন। ওরা তাকে বিক্রি করল স্বল্পমূল্যে মাত্র কয়েক দিরহামের বিনিময়ে। মিসরের যে ব্যক্তি তাকে ক্রয় করেছিল, সে তার স্ত্রীকে বলল : 'সম্মানজনকভাবে এর থাকার ব্যবস্থা কর, সম্ভবত সে আমাদের উপকারে আসবে অথবা আমরা ওকে পুত্ররূপেও গ্রহণ করতে পারি।' এবং

এভাবে আমি ইউসুফকে সে দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম, তাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেওয়ার জন্যে। আল্লাহ তাঁর কার্য সম্পাদনে অপ্রতিহত, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা অবগত নয়। সে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হল, তখন আমি তাকে হিকমত ও জ্ঞান দান করলাম। আর এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কৃত করি।

(সূরা ইউসুফ : ১৯-২২)

কেনানের কূপ

ইউসুফ আ.-এর ভায়েরা তাকে ময়দানে বেড়ানোর বাহানা দিয়ে নিয়ে গেল। পূর্ব পরামর্শনুযায়ী এমন একটি কূপের মধ্যে তাঁকে ফেলে দিল, যাতে পানি ছিল না; দীর্ঘকাল শুষ্ক অবস্থায় ছিল। আর গৃহ প্রত্যাবর্তনের সময় তাঁর জামাটিতে কোনো জন্তুর রক্ত মাখিয়ে ক্রন্দন করতে করতে হযরত ইয়াকুব আ.-এর নিকট এসে বলল, আব্বা! যদিও আমরা আমাদের সত্যতা আপনাকে বিশ্বাস করানোর জন্য যতই চেষ্টা করি না কেন, আপনি কখনও বিশ্বাস করবেন না। আমরা দৌড় প্রতিযোগিতায় একে অন্যের আগে গন্তব্য স্থানে পৌঁছার চেষ্টায় ব্যস্ত ছিলাম। হঠাৎ একটি নেকড়ে বাঘ এসে ইউসুফকে উঠিয়ে নিয়ে গেল। হযরত ইয়াকুব আ. ইউসুফ আ.-এর জামাটি দেখলেন তাতে রক্ত মাখানো আছে; কিন্তু কোথাও ছেঁড়া ছিল না কিংবা আচলও ফাঁড়া ছিল না। তৎক্ষণাৎ তিনি প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পারলেন। কিন্তু ধমক দেওয়া বা তিরস্কার করা, নিন্দ করা, ঘৃণা ও অপদস্থ করার পদ্ধতি অবলম্বনের পরিবর্তে পয়গম্বরসুলভ জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি, ধৈর্য ও মার্জনার স্বরে বললেন, প্রকৃত অবস্থা গোপন করার চেষ্টা সত্ত্বেও তোমরা এটাকে গোপন করতে পার নি বরং তোমাদের নফস তোমাদের জন্য একটি কথা সাজিয়ে দিয়েছে। এখন ধৈর্যই উত্তম। আর যে কথা তোমরা প্রকাশ করছ, সে বিষয়ে আল্লাহ পাকের নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করছি।

ইউসুফ আ.-এর দাসত্বের জীবন

এখানে পিতা ও পুত্রদের মধ্যে এরূপ কথাবার্তা চলছিল। আর ওদিকে ইউসুফ আ.-এর সঙ্গে একের পর এক ঘটনা ঘটল। হেজাযবাসী ইসমাঈলী খানদানের একটি কাফেলা শাম থেকে সুগন্ধি, মসলা ইত্যাদি বোঝাই করে মিসরে যাচ্ছিল। কূপ দেখে তারা পানির জন্য বালতি ফেলল। ইউসুফ মনে করলেন, হয়তো ভাইদের অন্তরে দয়ার সঞ্চার হয়েছে। কাজেই তিনি বালতি ধরে ঝুলে থাকলেন। বণিকরা বালতি উঠিয়ে ইউসুফ আ.-কে দেখে সজোরে বলে উঠল :

يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ

"সুসংবাদ! একটি গোলাম হস্তগত হল।"

তাওরাতে বর্ণিত আছে : ইউসুফ আ.-এর ভাইয়েরা ইসমাঈলী কাফেলাকে দেখে পরস্পরে বলাবলি করতে লাগল, ইউসুফকে কূপ থেকে উঠিয়ে এ ব্যবসায়ীদের হাতে

বিক্রি করে ফেল। কিন্তু এর পূর্বেই ইসমাঈলীরা তাঁকে বের করে গোলাম বানিয়ে নিয়েছে। আর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাতবীন যখন কূপের নিকট পৌঁছল এবং দেখল, ইউসুফ আ. সেখানে নেই, তখন ক্রন্দন করতে করতে ফিরে এল। রাতবীনকে এ পরামর্শ দিয়েছিল ইয়াহুদা। রাতবীন আগে থেকেই ভাবছিল, ইউসুফকে কূপ থেকে তুলে চুপিচুপি পিতার হাতে সোর্পদ করে দেবে। এ কারণেই সে ইউসুফকে হত্যা করে ফেলার ঘোর বিরোধিতা করেছিল।

কোনো কোনো মুফাসসির লিখেছেন, ইউসুফ আ.-এর ভাইয়েরা তাকে কূপ থেকে বের করে কাফেলার নিকট বিক্রয় করেছিল। কিন্তু তাদের এ উক্তিটি কুরআন মাজিদ বা তাওরাতের সঙ্গে কোনো মিল নেই। দুনোটির দ্বারা বুঝা যায়, কাফেলার লোকেরা হযরত ইউসুফ আ.-কে গোলাম বানিয়ে নিজেদের পণ্য দ্রব্যাদির সঙ্গে তাঁকেও মিসর নিয়ে যায়।

হযরত ইউসুফ আ.-এর জীবনের এ দিকটি কত মহত্বের অধিকারী, তা সে ব্যক্তিই বুঝতে পারে, যার অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে। অল্প বয়স, মাতার ইনতেকাল হয়ে গেছে। পিতার মহব্বতের কোলে ছিলেন, তাও ছুটে গেল। জন্মভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হলেন। ভাইয়েরা বিশ্বাসঘাতকা করল। স্বাধীনতার পরিবর্তে দাসত্ব ভাগ্যে জুটল। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও তাঁর কোনো হৈ-হল্লা নেই। কোনো হায়-মাতমও নেই। না কোনো অস্থিরতা আছে, না কোনো ক্রন্দন ও বিলাপ। ভাগ্যের প্রতি শোকরগুযার। বিপদে ধৈর্যশীল, আল্লাহ পাকের ফয়সালায় সন্তুষ্ট, বিনয়ে মস্তক অবনত। মিসরের বাজারে বিক্রিত হওয়ার জন্য যাচ্ছেন। কবি যথার্থই বলেছেন, "সান্নিধ্যপ্রাপ্তগণের হয়রানি অনেক বেশি"।

ইউসুফ আ. মিসরে

খৃস্টপূর্ব ২ হাজার বছর পূর্বে মিসরকে তাহযিব ও তামাদ্দুনের কেন্দ্রভূমি মনে করা হতো। তথাকার শাসক ছিল আমালেকা গোত্রের 'হিকসুস'। যেসময়ে হযরত ইউসুফ আ. কেনান থেকে যাযাবর জাতির ক্রীতদাস অবস্থায় মিসরে প্রবেশ করলেন, তৎকালে মিসরের রাজধানী ছিল 'রামাসিস' নামক স্থানে। এটা খুব সম্ভব তথায় অবস্থিত ছিল, যেখানে আজ 'ছানা' নামক বস্তিটি আবাদ রয়েছে। ভৌগোলিক বিবরণ হিসাবে এ স্থানটি পূর্বদিকে 'নীল' নদের নিকটে বলে কথিত। 'ফোতিকার' মিসরীয় সেনাবহিনীর প্রধান সেনাপতি, তিনি ছিলেন শাহি খান্দানের জনৈক রঈস লোক। তিনি বেড়াতে বের হয়ে মিসরের বাজারের উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় ইউসুফ আ.-এর উপর তাঁর দৃষ্টি পড়ল। তিনি অতি সাধারণ মূল্যে তাঁকে ক্রয় করে নিলেন। উপরে বর্ণিত হয়েছে, মিসরীয়রা তৎকালে নিজেদেরকে বিশ্বের সেরা সুসভ্য ও সুশৃঙ্খল জাতি বলে মনে করত। মরুবাসী যাযাবর গোত্রগুলোকে অত্যন্ত হীন ও তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখত। নিজ শহরে তাদের সাথে অস্পৃশ্যের মতো ব্যবহার করত। এ গোত্রগুলোর মধ্যেই একটি গোত্র ইবরাহীমী বংশের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ কেনানে বসবাস করত। এ অঞ্চলে শহুরে পরিবেশ

এবং স্থায়ী অধিবাসের নামচিহ্ন পর্যন্ত ছিল না। শিকারের ওপর তাদের জীবনযাপন নির্ভর করত। খড়ের ছাউনিযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটিরে ছিল তাদের বসতি। আর বকরির পাল ছিল তাদের ধন-দৌলত।

এমতাবস্থায় ইউসুফ আ. সম্বন্ধে আল্লাহ তাআলার অভাবনীয় মোয়ামালা দেখুন। একজন গ্রামীণ সে আবার অল্প বয়স্ক গোলাম। তিনি যখন একজন সুসভ্য, প্রতাপশালী ও আড়ম্বরপূর্ণ ধনবান লোকের গৃহে পৌঁছলেন, তখন নিজের নিষ্পাপ জীবন, ধৈর্য ও গাম্ভীর্য এবং বিশ্বস্ততা ও যোগ্যতারূপী পবিত্র গুণাবীলর বদৌলতে, তাঁর প্রভুর চোখের মণি এবং প্রাণের মালিক হয়ে যান। লোকটি তার বিবিকে বলল : "একে সসম্মানে রাখ। বিচিত্র নয়, আমরা তার দ্বারা উপকৃত হব কিংবা আমরা তাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করব।" (সূরা ইউসুফ : ২২)

মোটকথা, ফোতিকার হযরত ইউসুফের সঙ্গে গোলামের মতো ব্যবহার করেন নি বরং নিজের সন্তানের মতো স্নেহসুলভ সম্মান ও মর্যাদার সাথে রাখলেন। বরং নিজের জমিদারী, ধন-দৌলত ও গৃহ জীবনের যাবতীয় দায়িত্ব তাঁকে সোপর্দ করে দিলেন এবং সে সমস্ত বিষয়ের আমানতদার বানিয়ে দিলেন। এ যেন কেনানের একজন পশুপালকের উপর যে অদূর ভবিষ্যতে রাজ্য পরিচালনার ভার অর্পিত হতে যাচ্ছে, তারই সূচনা ছিল। এটা ছিল আল্লাহর বিশেষ রহমত, করুণা ও অনুগ্রহ! এ ব্যবস্থার মাধ্যমে তিনি তাঁকে উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে এবং দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ দান করতে চেয়েছিলেন।

আহলে কিতাবরা বলে, ওই খরিদকারী ছিলেন মিসরের 'আযিয' অর্থাৎ অর্থমন্ত্রী। সে সময় মিসরের বাদশা ছিলেন রাইয়ান ইবনে ওয়ালিদ। তিনি ছিলেন আমালিক বংশোদ্ভূত। ইবনে ইসহাকের মতে আযীযের স্ত্রীর নাম ছিল রাঈল বিনতে রাআঈল। অন্যদের মতে যুলায়খা।

বলা বাহুল্য, যুলায়খা ছিল তার উপাধি। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক রহ. ইবনে আব্বাস রাযি. সূত্রে বর্ণনা করেন : যে ব্যক্তি ইউসুফ আ.-কে মিসরে নিয়ে বিক্রি করেছিলেন, তার নাম মালিক ইবনে যাআর ইবনে নুওয়াব ইবনে আফাকা ইবনে মাদয়ান ইবনে ইবরাহীম আ.। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইবনে ইসহাক রহ. ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন : মানবজাতির মধ্যে তিনজন লোক ছিলেন সব চাইতে দূরদর্শী।

(১) মিসরের আযীয যখন তিনি তাঁর স্ত্রীকে বলেছিলেন, একে সযত্নে রাখ!

(২) সেই বালিকা, যে তাঁর পিতাকে মূসা আ.-এর সম্পর্কে বলেছিল,

يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

হে পিতা! তাকে কাজে নিযুক্ত করুন। কারণ, আপনার মজুর হিসেবে সে ব্যক্তিই উত্তম হবে, যে হবে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত। (সূরা কাসাস : ২৬)

(৩) হযরত আবু বকর রাযি. যখন হযরত ওমর রাযি.-কে খলিফা নিযুক্ত করেন।

কথিত আছে, আযীয হযরত ইউসুফ আ.-কে বিশ দীনারের বিনিময়ে ক্রয় করেছিলেন। কিন্তু কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর সমওজনের মেশক, সম ওজনের রেশম ও সম ওজনের রূপার বিনিময়ে ক্রয় করেছিলেন। আল্লাহই সম্যক জ্ঞাত।

মোটকথা, আল্লাহ তাআলা এভাবে হযরত ইউসুফ আ.-কে সে দেশে প্রতিষ্ঠিত করলেন। অর্থাৎ আযীয ও তাঁর স্ত্রীকে ইউসুফ আ.-এর সেবাযত্নে ও সাহায্য-সহযোগিতার জন্য নির্ধারণ করে মিসরের বুকে তাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। তাকে শিক্ষা দিলেন স্বপ্নের ব্যাখ্যা ও তত্ত্বজ্ঞান। আর আল্লাহ তাঁর কার্য-সম্পাদনে অপ্রতিহত। তিনি যখন কোনো সিদ্ধান্ত নেন, তখন তা বাস্তবায়িত হয়েই থাকে। কেননা তিনি তা বাস্ত বায়নের জন্যে এমন উপায় নির্ধারণ করে দেন, যা মানুষের কল্পনার বাইরে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা অবগত নয়।

আযীযে মিসরের স্ত্রী ও ইউসুফ আ.

ইবনে আতাউল্লাহ সিকান্দারি রহ. বলেছেন : আল্লাহ তাআলার অধিকাংশ অনুগ্রহ ও দয়া বিপদ-আপদের ভিতরে নিহিত থাকে। হযরত ইউসুফ আ.-এর পূর্ণ জীবনটি এ উক্তিটিরই বাস্তবক্ষেত্র। কেননা শৈশবকালের প্রথম বিপদ তাঁকে কেনানের গ্রাম্য জীবন হতে বের করে তাহযিব ও তামাদ্দুনের কেন্দ্রভূমি মিসরের উন্নত ও শ্রেষ্ঠ পরিবারের মালিক বানিয়ে দিল। একেই বলে, দাসত্বের মধ্যে থেকে প্রভুত্ব করা।

এখন দ্বিতীয় ও কঠিন পরীক্ষা আরম্ভ হল। হযরত ইউসুফ আ. তখন পূর্ণ-যৌবনে পদার্পণ করেছিলেন। রূপ-সৌন্দর্যের এমন কোনো দিক ছিল না, যা তার মধ্যে ছিল না। রূপমাধুর্য, কমনীয়তা, উজ্জ্বল মুখমণ্ডল ছিল চাঁদের মতো দীপ্তিমান। নিষ্কলুষতা ও লজ্জার আধিক্য সোনায় সোহাগার মতো কাজ করছিল। তদুপরি এক পরিবারে থাকায় আযীযে মিসরের বিবি নিজের হৃদয়কে বশে রাখতে পারলেন না। ইউসুফের রূপশিখার উপর পতঙ্গের মতো কুরবান হতে লাগলেন। কিন্তু ইবরাহীম আ.-এর প্রপৌত্র, ইসহাক ও ইয়াকুব আ.-এর চোখের জ্যোতি, নবী পরিবারের প্রদীপ ও আশা-ভরসা, নবুয়ত পদের জন্য মনোনীত এমন মহাপুরুষ দ্বারা কি করে সম্ভব ছিল অপবিত্র ও অশ্লীল কাজে লিপ্ত হওয়া এবং আযীযের স্ত্রীর অপবিত্র কামনা পূর্ণ করা?

কিন্তু মিসরের সেই স্বাধীনা রমণী যখন দেখল, তার এ রূপে কোনো জাদু ক্রিয়া করছে না, তখন একদিন আত্মহারা হয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে অনুরোধ করল, আমার অভিলাষ পূর্ণ কর। হযরত ইউসূফ আ.-এর জন্য এ সময়টুকু মহা পরীক্ষার সময় ছিল। একদিকে রাজ পরিবারের যুবতী রমণী, রূপশিখার আভামণ্ডিত রক্তবর্ণের চেহারা, রূপ ও সাজ-সজ্জার নান্দনিক প্রদর্শনী, প্রেয়সীসুলভ ভাবভঙ্গির দৃষ্টি। আর এদিকে ইউসুফ আ. নিজেও নব যুবক, রূপবান, রূপের মাধুর্য সম্বন্ধে পরিচিত, দরজা বন্ধ, প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বীর ভয় সম্বন্ধে রাণী স্বয়ং জিম্মাদার। কিন্তু এতসব অনুকূল অবস্থা

কি ইউসূফ আ.-এর অন্তরে এক মুহূর্তের জন্যও আযীযে মিসরের বিবির কামাগ্নিতে উনুন যুগিয়ে ছিল?

তাঁর অন্তর কি অশান্ত, অস্থির ও চঞ্চল হয়ে উঠেছিল? তাঁর নফস কি অন্তর জগতে এক মুহূর্তের জন্যও কম্পন সৃষ্টি করেছিল? না, কখনই না বরং তার বিপরীত সেই পবিত্রতা প্রতিমূর্তি, নবুয়তের আমানতদার, আল্লাহ পাকের ওহী অবতীর্ণ হওয়ার স্থল, এমন দুটি চিত্তাকর্ষক ও মযবুত দলিল দ্বারা মিসরের সেই নারীকে বুঝালেন, যা তাঁরই মতো এক ব্যক্তির দ্বারা সম্ভব ছিল, যার শিক্ষা ও প্রতিপালন সরাসরী আল্লাহ্ পাকের আশ্রয়ে থেকেই হয়েছে। তিনি আযীযে মিসরের স্ত্রীকে উত্তর দিলেন, এটা অসম্ভব। আমি আল্লাহ্ পাকের আশ্রয় চাই। আমি কি তাঁর নাফরমানি করব, যাঁর মহা প্রতাপশালী নাম "আল্লাহ" এবং তিনি সমগ্র সৃষ্টজগতের মালিক। তা ছাড়া আমি কি আমার সেই মুরুব্বি আযীযে মিসরের আমানতে বিশ্বাসঘাতকতা করব? যিনি আমাকে গোলামরূপে রাখার পরিবর্তে এ সম্মান ও মর্যাদা দান করছেন? যদি আমি এরূপ অশ্লীল কর্ম করি, তবে তো জালিম বলে সাব্যস্ত হবো। আর জালিমদের জন্য কখনো মঙ্গল নেই।

কিন্তু আযীযে মিসরের বিবির ওপর এ নসিহতের কোনোই ক্রিয়া হল না বরং সে নিজের কামনাকে কার্যকর রূপদানের ওপর জেদই ধরল। তখন ইউসুফ আ. আপন রবের প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রতি লক্ষ করে পরিষ্কার ভাষায় তা অস্বীকার করলেন। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে :

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (٢٣) وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ

"আর ইউসুফকে ফুসলাল সেই স্ত্রীলোকটি, যার গৃহে তিনি অবস্থান করতেন, নিজের নফসের ব্যাপারে এবং ঘরে দরজাগুলি বন্ধ করে দিল এবং বলতে লাগল, আসো! আমার নিকট আসো। ইউসুফ বললেন, আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি! নিঃসন্দেহ তিনি (আযীযে মিসর) আমার মুরব্বী, যিনি আমাকে সসম্মানে রেখেছেন। নিঃসন্দেহ জালিম লোক মঙ্গল লাভ করতে পারে না। অবশ্য সেই স্ত্রীলোকটি ইউসুফের সঙ্গে অসৎ ইচ্ছা করেছিল আর তিনিও অসদিচ্ছা করতেন যদি আল্লাহ্ পাকের প্রমাণ না দেখতে পেতেন। এরূপ এ জন্য হয়েছিল, যেন আমি তার থেকে অসৎ ইচ্ছা, ও নির্লজ্জতাকে দূরে রাখি। নিঃসন্দেহ তিনি আমার খাঁটি বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত।" (সূরা ইউসুফ : ২৩-২৪)

উল্লেখ্য, কুরআন মাজিদ প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত এ ঘটনায় আযীযে মিসরের বিবির অপবাদ এবং হযরত ইউসুফ আ.-এর পবিত্রতা ও উচ্চ মর্যাদার কথাই বর্ণনা করেছে। যেমন দেখুন– আযীযের স্ত্রী ছিলেন অত্যন্ত রূপসী, ঐশ্বর্যশালী এবং উচ্চ সামাজিক মর্যাদার ও যৌবনের অধিকারিণী। তিনি মূল্যবান বাহারি পোশাক পরিধান ও অঙ্গ-সজ্জা

করে ইউসুফ আ.-কে আপন কক্ষে রেখে ভবনের সমস্ত দরজা বন্ধ করে তাকে আহ্বান জানান। সর্বোপরি তিনি ছিলেন মন্ত্রীর স্ত্রী। অপরদিকে হযরত ইউসুফ আ. ছিলেন অত্যধিক রূপ-সৌন্দর্যে দীপ্তিমান নওজোয়ান। কিন্তু তিনি ছিলেন নবী বংশোদ্ভূত একজন নবী। তাই আল্লাহ তাঁকে এ অশ্লীল কাজ থেকে হেফাজত করেন এবং নারীদের ছলনা থেকে রক্ষা করেন। কাজেই তিনি হাদিসে বর্ণিত মুত্তাকীর সাত শ্রেণীর অন্যতম বলে প্রতিপন্ন হন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : যে দিন আল্লাহর (আরশের) ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না, সে দিন সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ তাঁর ছায়া দান করেবেন :

(১) ন্যায়পরায়ণ শাসক। (২) যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে অশ্রু ঝরায়। (৩) যে ব্যক্তি সালাত শেষে মসজিদ থেকে বের হয়ে আসার পর পুনরায় মসজিদে না যাওয়া পর্যন্ত তার অন্তর মসজিদের সাথে বাঁধা থাকে। (৪) যে দুই ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পর মহব্বত করে। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একত্র হয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তারা বিচ্ছিন্ন হয়। (৫) যে ব্যক্তি এমন গোপনীয়তার সাথে সদকা করে, তার ডান হাত কি দিল বাম হাত তার খবর রাখে না। (৬) যে যুবক তার উঠতি বয়সটা আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে কাটায়। (৭) পুরুষকে কোনো সুন্দরী ও সম্ভ্রান্ত মহিলা কু-কর্মের প্রতি আহ্বান করে; কিন্তু সে বলে আমি আল্লাহকে ভয় করি।(বুখারী ও মুসলিম)

মোটকথা, আযীযের স্ত্রী ইউসুফ আ.-এর প্রতি আসক্ত হয়ে ও অত্যধিক লোভাতুর হয়ে আপন কামনা চরিতার্থ করার জন্য আহ্বান জানায়।

হযরত ইউসুফ আ. বললেন, "আমি আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করছি! নিঃসন্দেহ তিনি (আযীযে মিসর) আমাকে সম্মানের সাথে রেখেছেন। নিশ্চই জালিমরা মঙ্গল লাভ করতে পারে না।" কিন্তু হযরত ইউসুফ আ.-এর মুখে আল্লাহ তাআলার প্রমাণ শোনার পরেও সে বিরত হল না; নিজের কামনার উপর জেদই করতে লাগল। হযরত ইউসুফ আ. তার কামনাকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করলেন। আল্লাহর প্রমাণের সম্মুখে তার কামনার আদৌ পরোয়া করলেন না। সুতরাং তিনি তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দরজার দিকে দৌড়ে গেলেন এবং আযীযে মিসরের বিবিও তাঁর পেছনে ছুটল।

যদি হযরত ইউসুফ আ. আল্লাহ তাআলার প্রমাণ লাভ না করতেন, তবে তিনি অসদিচ্ছা করেই ফেলতেন; কিন্তু তিনি সেই বুরহানে রব দেখেছিলেন বলেই অসদিচ্ছা করেন নি।

এখানে প্রশ্ন হয়, সেই বুরহানে রব; আল্লাহর প্রমাণ কী ছিল? উত্তর হল- কুরআন মাজিদ্ব তার সময়োচিত, স্থানোচিত মার্জিত এবং অলৌকিক ভাষায় এমনভাবে বিষয়টি বর্ণনা করে দিয়েছে, যার পর আর কোনো প্রশ্নের অবকাশ থাকে না। দরজা বন্ধ করা হলে হযরত ইউসুফ আ. আযীযের বিবিকে যে জবাব দিলেন, এরূপ ক্ষেত্রে এর চেয়ে

উত্তম জবাব আর কি হতে পারত! সুতরাং এটাই সেই বুরহানে রব, যা ইউসুফ আ.-কে দান করা হয়েছিল এবং যা ইউসুফ আ.-এর পবিত্রতাকে নিষ্কলঙ্ক রেখেছে। হযরত ইউসূফ আ. অসদিচ্ছা থেকে পবিত্র থাকলেন। কারণ, আল্লাহ্ তাআলা তাকে পবিত্রতার মীমাংসা প্রথম থেকেই করে দিয়েছেন। তাঁর পবিত্রতা আল্লাহ তাআলার হেফাযতে ছিল। এরপর সেই পবিত্রতার গিলাফে অপবিত্রতার গন্ধও পাওয়া যাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল।

সারকথা, "হযরত ইয়াকুব আ.-এর ছবি দৃষ্ট হওয়া এবং তাঁর ইঙ্গিতে নিষেধ করা, ফেরেশতা প্রকাশিত হয়ে তাঁকে তা হতে বারণ করা, কিংবা আযীযে মিসরের গৃহে রক্ষিত মূর্তির উপর তার স্ত্রী পর্দা ফেলে দেওয়া এবং হযরত ইউসুফ আ. তা হতে উপদেশ লাভ করা" এ জাতীয় সমুদয় উক্তির চেয়ে 'বুরহানে রব'-এর সর্বোত্তম অর্থটি স্বয়ং কুরআন মাজিদের এবারত ও বর্ণনাভঙ্গি থেকে প্রমাণিত হয়। (১) আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমানের সত্যিকার কল্পনা, (২) মুরব্বির অনুগ্রহকে বুঝতে পারা এবং বিশ্বস্ততার গুণ অর্থাৎ আযীযে মিসর হযরত ইউসুফ আ.-এর সম্বন্ধে নিজের বিবিকে যে বলেছিলেন, "একে সম্মানের সঙ্গে রেখ" সে কথাটির প্রতি পূর্ণ লক্ষ রাখাই ছিল সেই 'বুরহানে রব'।

যা হোক, হযরত ইউসুফ আ. যখন দরজার দিকে দৌড়ালেন, তখন আযীযে মিসরের বিবিও তাঁর পিছনে পিছনে দৌড়াল। দরজা কোনো প্রকারে খুলে গেল, সম্মুখেই দেখতে পেলেন আযীযে মিসর ও স্ত্রীলোকটির চাচাত ভাই দণ্ডায়মান। রমণী ইশকে তখনো অপরিপক্ব ছিল। সুতরাং সে সঠিক অবস্থা বলতে সক্ষম হল না এবং প্রকৃত অবস্থা গোপন করার উদ্দেশ্যে ক্রোধান্বিত হয়ে বলতে লাগল, এমন ব্যক্তির শাস্তি জেলখানা কিংবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ছাড়া আর কি হতে পারে– যে ব্যক্তি তোমার স্ত্রীর সাথে অসদিচ্ছা পোষণ করে! হযরত ইউসুফ আ. তার প্রবঞ্চনা ও প্রতারণামূলক উক্তি শ্রবণ করে বললেন, এ তো সম্পূর্ণ মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হচ্ছে। প্রকৃত পক্ষে স্বয়ং সে নিজেই আমার সাথে অসদিচ্ছা প্রকাশ করেছিল। কিন্তু আমি কোনোক্রমেই স্বীকার করি নি এবং পালিয়ে ঘর হতে বের হয়ে যেতে চাচ্ছিলাম। সে আমার পিছনে পিছনে দৌড়িয়ে এসেছে এবং সম্মুখে আপনাকে দেখে সে মিথ্যা রচনা করে নিল।

আযীযের বিবির চাচাত ভাই খুব মেধাবী ও বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি বললেন, ইউসুফের জামা দেখতে হবে, যদি তা সম্মুখের দিকে ছেঁড়া হয়ে থাকে, তবে স্ত্রীলোকটি সত্যবাদী, আর যদি পেছন দিকে ছেঁড়া হয়ে থাকে, তবে ইউসুফের কথাই সত্য এবং স্ত্রীলোকটি মিথ্যাবাদিণী।

وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا

ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, যে সাক্ষ্য দিয়েছিল সে ছিল একান্তই দোলনার এক শিশু। আবু হোরায়রা রাযি., হিলাল ইবনে আসাফ, হাসান বসরী, সাঈদ ইবনে জুবায়র ও যাহ্হাক থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনন্তর পরখ করে দেখা গেল, হযরত ইউসুফ আ.-এর জামাটি পিছনের দিকে ছেঁড়া। সুতরাং আযীযে মিসর প্রকৃত অবস্থা বুঝে ফেললেন। কিন্তু নিজের সম্মান ও মর্যাদার খাতিরে ব্যাপারটির যবনিকা টেনে বললেন, "ইউসুফ তুমিই সত্যবাদী এবং স্ত্রীলোকটির ব্যাপারটা ক্ষমা কর। এ ব্যাপারটিকে এখানেই শেষ করে দাও। এরপর বিবিকে বললেন, এ সমস্ত তোমারই প্রবঞ্চনা ও ধোঁকা। তোমাদের স্ত্রী জাতির প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা খুবই জঘন্য। নিঃসন্দেহ তুমিই অপরাধী। সুতরাং তোমার এ কাজের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা কর এবং মাফ চাও। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজিদে ইরশাদ হচ্ছে :

قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٢٥) قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٢٦) وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٢٧) فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ (٢٨) يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ

"(স্ত্রীলোকটি) বলতে লাগল, সেই ব্যক্তির শাস্তি জেলখানা অথবা যন্ত্রণাদায়ক আযাব ছাড়া আর কি হতে পারে, যে ব্যক্তি তোমার স্ত্রীর সাথে অসৎ কাজের ইচ্ছা পোষণ করে। ইউসুফ আ. বললেন, সেই আমাকে আমার নফস সম্বন্ধে ফুসলাচ্ছিল। আর মীমাংসা করে দিল স্ত্রীলোকটিই পরিবারের এক ব্যক্তি। যদি ইউসুফের জামা সম্মুখের দিক হতে ছেঁড়া থাকে, তবে স্ত্রীলোকটি সত্যবাদিণী এবং ইউসুফ মিথ্যাবাদী আর যদি পিছনের দিক হতে ছেঁড়া থাকে, তবে স্ত্রীলোকটি মিথ্যাবাদিণী এবং ইউসুফ সত্যবাদী। এরপর যখন ইউসূফের জামা দেখা হল, তখন দেখা গেল তা পিছনের দিকে ছেঁড়া। [আযীয] বলল, হে রমণী! নিঃসন্দেহ এটা তোমারই প্রবঞ্চণা ও প্রতারণা। নিঃসন্দেহ তোমাদের প্রতারণা বড়ই জঘন্য। ইউসুফ! তুমি এ ব্যাপারটি ক্ষমা কর আর হে রমণী! তুমি তোমার অপরাধের মাগফেরাত প্রার্থনা কর। নিঃসন্দেহ তুমি অপরাধী।

(সূরা ইউসূফ : ২৫-২৯)

আযীযে মিসর যদিও অপমানের হাত হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য এ ব্যাপারটিকে এখানেই শেষ করে দিলেন; কিন্তু কথা গোপন রইল না। একে একে রাজবংশের সমস্ত স্ত্রীলোকদের মধ্যে বিষয়টির চর্চা হতে লাগল। সবাই বলাবলি করতে লাগল, আযীযে মিসরের বিবি কত নির্লজ্জ! নিজের গোলামের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছে। এত উচ্চ মর্যাদার নারী এবং গোলামের সাথে মেলামেশা! একসময় এ গোপন চর্চার খবর আযীযে মিসরের বিবি পর্যন্তও এসে পৌঁছল। এ সমালোচনা তার নিকট অত্যন্ত কষ্টদায়ক হল। অতএব সে এর প্রতিশোধ নিতে এবং এমন প্রতিশোধ নিতে মনস্থ করল, যাতে যে বিষয়ে তারা আমাকে ভৎর্সনা করছে, তাতেই তাদেরকেও লিপ্ত করে দেওয়া যায়। এ

চিন্তা করে একদিন সে রাজবংশের এবং শহরের নেতৃস্থানীয় লোকদের বিবিগণকে দাওয়াত করল। যখন সকলে এসে দস্তরখানে বসল এবং সকলে আহার্য গ্রহণের লক্ষ্যে ছুরি হাতে নিল গোশত-লেবু ইত্যাদি কাটতে, তখন আযীযে মিসরের বিবি ইউসুফকে ঘরের বাইরে আসার জন্য আদশে করল।

হযরত ইউসুফ আ. প্রভুপত্নীর আদেশে বের হয়ে এলে সব মহিলা ইউসুফ আ.-এর রূপ দেখে হতবাক হয়ে গেল এবং তারা তাঁর উজ্জ্বল চেহারার দীপ্তি ও জ্যোতিতে এত প্রভাবিত হল, নিজের আহার্য বস্তুটি কাটার পরিবর্তে সকলেই ছুরি দ্বারা নিজেদের হাত কেটে ফেলল এবং অজ্ঞাতসারে হঠাৎ বলে উঠল, কে বলে ও মানুষ? আল্লাহর কসম! ও তো নূরের পুতুল এবং বুযুর্গ ফেরেশতা। তা দেখে আযীযে মিসরের বিবি খুবই আনন্দ বোধ করল এবং নিজের সফলতা আর তাদের পরাজয়ের জন্য গর্ব করে বলতে লাগল– ওই তো সেই গোলাম, যার প্রেমাসক্তি নিয়ে তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করে যাচ্ছ। এখন তাকে দেখে তোমাদের এরূপ অবস্থা কেন? বলো! আমার এ প্রেমাসক্তি সঙ্গত, না অসঙ্গত? আর তোমাদের তিরস্কার ঠিক হয়েছে, না বেঠিক? এ প্রসঙ্গে কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে :

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٣٠) فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ (٣١) قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ

"আর নগরীতে মহিলারা বলাবলি করল, আযীযের স্ত্রী তার যুবক গোলাম থেকে অসৎকর্ম কামনা করছে। যুবকের প্রতি গভীর প্রেমে সে আত্মহারা হয়ে পড়েছে। আমাদের ধারণা সে তো প্রকাশ্য মন্দ স্বভাবে পতিত হয়েছে। অনন্তর আযীযে মিসরের বিবি যখন তাদের ষড়যন্ত্রের কথা শুনতে পেল, তখন তাদেরকে ডেকে পাঠাল এবং তাদের জন্যে বিস্তৃত আসনসমূহ সজ্জিত করল এবং (যথারীতি) প্রত্যেককে এক একটি ছুরি প্রদান করল। এরপর ইউসুফকে বলল, তাদের সকলের সম্মুখে বের হয়ে আসো। ইউসুফকে যখন সেই মহিলারা দেখতে পেল, তখন তারা শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করল। তারা নিজেদের হাত কেটে ফেলল। হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, ও তো মানুষ নয়; নিশ্চয়ই কোনো বুযুর্গ ফেরেশতা। বড়ই মর্যাদাশীল ফেরেশতা। আযীযে মিসরের বিবি বলল : তোমরা যাকে দেখলে এ-ই সেই ব্যক্তি, যার সম্বন্ধে তোমরা আমাকে তিরস্কার করছ।"

(সূরা ইউসূফ : ৩০-৩২)

শহরের নারী সমাজ তথা আমীর, উমারা ও অভিজাত লোকদের স্ত্রী-কন্যারা আযীযের স্ত্রী নিজের ক্রীতদাসের প্রতি প্রেমে আত্মহারা হয়ে প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে ছলনা করার জন্য তারা তাকে ভর্ৎসনা করছিল; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে আযীযের

স্ত্রী এ ব্যাপারে ছিল নেহায়েত অক্ষম। তাই সে ভর্ৎসনাকারী ওই মহিলাদের বুঝিয়ে দিতে চাইল, এ যুবক দাসটি তাদের ধারনার উর্ধ্বে; সাধারণ যে কোনো যুবকের মতো নয়। সুতরাং সে শহরের মহিলাদের নিমন্ত্রণ করল এবং সকলকে বাড়িতে ডেকে আনল। সে একটি ভোজসভার আয়োজন করল। ভোজসভায় যে-সব খাদ্য-দ্রব্য পরিবেশন করা হয়, তার মধ্যে এমন কিছু দ্রব্য ছিল যা ছুরি দিয়ে কেটে খেতে হয়। যেমন, লেবু ইত্যাদি।

উপস্থিত প্রত্যেককে একটি করে ছুরি দেওয়া হল। আযীযের স্ত্রী পূর্বেই ইউসুফ আ.-কে উৎকৃষ্ট পোশাক পরিয়ে প্রস্তুত রেখে ছিলেন। তখন তিনি ছিলেন পূর্ণ যৌবনে দীপ্তিমান। এ অবস্থায় মহিলাটি ইউসুফ আ.-কে তাদের সম্মুখে বেরিয়ে আসার নির্দেশ দিলে তিনি বের হয়ে আসেন। ইউসুফ আ.-কে তখন পূর্ণিমার চাঁদের চাইতেও অধিকতর সুন্দর দেখাচ্ছিল। فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ (যখন তারা তাকে দেখল, তখন ওরা তার গরিমায় অভিভূত হল)। অর্থাৎ তারা ইউসুফ আ.-এর সৌন্দর্য দর্শনে বিস্মিত হয়ে ভাবল, কোনো আদম সন্তান তো এ রকম রূপ-লাবণ্যের অধিকারী হতে পারে না। ইউসুফ আ.-এর সৌন্দর্যের দীপ্তিতে অভিভূত হয়ে তারা চেতনা হারিয়ে ফেলে। এমনকি নিজ হাতের ওই ছুরি দ্বারা নিজেদের হাতই কেটে ফেলে। অথচ যখমের কোনো অনুভূতিই তাদের ছিল না।

সুহায়লী রহ. ও অন্যান্য ইমাম বলেছেন, হযরত ইউসুফ আ.-কে অর্ধেক সৌন্দর্য দেওয়া হয়েছিল এ কথার অর্থ হল আদম আ.-এর যে সৌন্দর্য ছিল তার অর্ধেক ইউসুফ আ.-কে দেওয়া হয়েছিল। কারণ, আল্লাহ নিজ হাতে আদম আ.-কে সৃষ্টি করে তাঁর মধ্যে রূহ ফুঁকে দিয়েছেন। তিনিই ছিলেন সবার চাইতে বেশি সুন্দর। এ জন্যে জান্নাতবাসী আদম আ.-এর দৈহিক মাপ ও সৌন্দর্য নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর ইউসুফ আ.-এর সৌন্দর্য ছিল আদম আ.-এর সৌন্দর্যের অর্ধেক। এ দু'জনের মাঝখানে আর কোনো সৌন্দর্যবান ব্যক্তি হবে না। যেমন, হযরত হাওয়া আ.-এর পরে হযরত ইবরাহীম খলীল আ.-এর স্ত্রী সারাহ ভিন্ন আর কেউ হাওয়ার সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। এরপর মহিলাটি হযরত ইউসুফ আ.-এর পূতঃচরিত্রের কথা স্বীকার করে বলে :

وَلَقَدْ رَاوَدْتُّهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ

"আমি তার থেকে অসৎকর্ম কামনা করেছি; কিন্তু সে নিজেকে পবিত্র রেখেছে অর্থাৎ রক্ষা করেছে"।

وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ

"এ যদি আমার কথা না শোনে, তবে তাকে কয়েদ করা হবে এবং লাঞ্ছিত করা হবে।)"

এ সময় অন্যান্য মহিলা ইউসুফ আ.-কে তাঁর মনিব-পত্নীর প্রস্তাব মেনে নিতে উৎসাহ যোগায়, কিন্তু তিনি তা কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ, তাঁর দেহে নবুয়তের ধমনী প্রবাহিত ছিল। তিনি রাব্বুল আলামীনের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেন।

আযীযে মিসরের বিবি আরো বলল : নিঃসন্দেহে আমি তার অন্তরকে নিজের বসে আনতে চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু সে সংযমহীন হয় নি। তদুপরি আমি বলে দিয়েছি, যদি সে শেষ পর্যন্ত কথা মান্য না করে আর আমার বাসনা পূর্ণ না করে, তবে তার করুণ পরিণতি হবে, তাকে জেলখানায় আবদ্ধ করে রাখা হবে এবং সে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে। হযরত ইউসুফ আ. যখন এটা শ্রবণ করলেন, তদুপরি আযীযে মিসরের বিবি ছাড়াও অন্যান্য নারীদের হাবভাব দেখতে পেলেন, তখন দুআর জন্য আল্লাহর দরবারে হাত উঠিয়ে বলতে লাগলেন, "ইয়া আল্লাহ! এ রমণীগুলি আমাকে যে বিষয়ের প্রস্তাব করছে, তার তুলনায় জেলখানায় বাস করাকেই আমি হাজারগুণে শ্রেয় মনে করি। যদি আপনি আমাকে সাহায্য না করেন এবং আমাকে এদের ষড়যন্ত্র হতে রক্ষা না করেন, তবে বিচিত্র নয় যে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।" ইউসূফ আ.-এর দুআ আল্লাহ তাআলার দরবারে কবুল হল এবং আল্লাহ তাআলা সেই রমণীদের সমস্ত ষড়যন্ত্র ও প্রতারণাকে নস্যাৎ করে দিলেন। এ সম্পর্কে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হচ্ছে :

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ (٣٣) فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٣٤)

ইউসুফ বললেন, হে আমার পালনকর্তা! এ রমণীরা যে বিষয়ের প্রতি আমাকে আহ্বান করছে, তার তুলনায় জেলখানাই আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়। আপনি যদি তাদের ষড়যন্ত্র থেকে আমাকে উদ্ধার না করেন এবং আমার সাহায্য না করেন, তবে পাছে না আমি তাদের দিকে ঝুঁকে পড়ি এবং মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাই। এরপর তাঁর পালনকর্তা তাঁর দুআ কবুল করলেন এবং তাঁর থেকে তাদের ষড়যন্ত্রকে দূর করে দিলেন। নিঃসন্দেহে তিনিই খুব শ্রবণকারী সবিশেষ জ্ঞাত। (সূরা ইউসুফ : ৩৩-৩৪)

আযীযের নিকট যেহেতু হযরত ইউসুফ আ.-এর সততা প্রকাশ পেয়েছিল, তাই তাঁর ইচ্ছা ছিল না, ইউসুফ আ.-এর কোনো ক্ষতি হোক। কিন্তু তাঁর স্ত্রীর কাঁধে প্রেমের ভূত বড় সাংঘাতিকরূপে চেপে বসেছিল। খোশামোদ-তোষামোদ, প্রতারণা ও ষড়যন্ত্রের কোনো প্রকারেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল না তার। তখন ধমক প্রদান দ্বারা কার্যোদ্ধার করতে চেষ্টা চালাল। তাতে যখন দৃঢ়তার পর্বতে মোটেও কম্পন আসল না, তখন আযীযে মিসর ইউসুফ আ.-এর সততার সমুদয় নিদর্শন দেখা এবং বুঝা সত্ত্বেও নিজের বিবির অপমান ও দুর্নাম হচ্ছে বিধায় সিদ্ধান্ত নিলেন, ইউসুফকে এক নির্দিষ্টকালের জন্য জেলখানায় রাখবেন। যেন এ ব্যাপারটির কথা মানুষের অন্তর হতে মুছে যায় এবং চর্চা বন্ধ হয়ে যায়। এরূপে হযরত ইউসুফ আ.-কে জেলখানায় যেতে হল।

হযরত শাহ্ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. লিখেছেন : ইউসুফ আ. যেহেতু নিজের দুআর সাথে বলেছিলেন, "তাদের এ নির্লজ্জ আহ্বানের মোকাবেলায় জেলখানাই আমার অধিক পছন্দনীয়", তাই আল্লাহ তাআলা স্ত্রীলোকদের ষড়যন্ত্র হতে তো তাঁকে রক্ষা করলেন; কিন্তু জেল তাঁর অদৃষ্টে নির্ধারিত করে দিলেন। এ বাক্যটি না বলা এবং বিপদ ও পরীক্ষাকে আহ্বান না করাই উচিত ছিল। হযরত শাহ্ ছাহেব (নাউওয়ারাল্লাহু মারকাদাহু)-এর এ সূক্ষ্ম কথাটিকে শক্তিশালী করার জন্য অপর একজন তত্ত্বজ্ঞানী মুফাসসির একটি হাদিসের উদ্ধৃতিও দিয়েছেন। যার সারমর্ম হল, এক ব্যক্তি আল্লাহ পাকের দরবারে প্রার্থনা করত : "ইয়া আল্লাহ! আমি আপনার দরবারে ছবর প্রার্থনা করছি।"

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা শুনে বললেন, "তুমি বালা-মসিবত কেন প্রার্থনা করছ? এভাবে না করে বালা-মসিবত হতে নিরাপদে থাকার প্রার্থনা কেন করছ না?"

এ দু বুযুর্গের উচ্চ মর্যাদার প্রতি লক্ষ করে যদিও তাঁদের কথার উপর সমালোচনা করতে সাহস হচ্ছে না, তথাপি হযরত ইউসুফ আ.-এর মতো একজন অতি উচ্চস্তরের পয়গম্বরের জীবনের এই নযীরবিহীন মহৎকার্যকে শুধু একটি কৌতুকবাণীর সম্মুখে কুরবান হয়ে যেতে দেখে আর চুপ থাকা গেল না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলতে হচ্ছে, হযরত ইউসুফ আ.-এর এ বাক্যটি رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ "তাদের আহ্বানের মোকাবিলায় জেলখানাই আমার নিকট অধিক প্রিয়" তাঁর শানের উচ্চতা, আল্লাহ পাকের সান্নিধ্য, ধর্ম-কর্মে দৃঢ়তা, সত্যের উপর দৃঢ় সংকল্প এবং আল্লাহর বিধানে সন্তুষ্ট থাকা ও আত্মসমর্পণরূপী গুণাবলীর এমন অনুপমতাই প্রকাশ করছে, যা তাঁর মতো উচ্চশ্রেণীর পয়গম্বরের কাজ।

গভীরভাবে লক্ষ করুন, আযীযে মিসরের বিবি খোশামোদ তোষামোদের কোনো পন্থা গ্রহণ করতেই বাদ রাখে নি, যা দ্বারা ইউসুফ আ.-কে বশীভূত করা যায়। অবশেষে তাতে বিফল হওয়ার পর অন্যান্য স্ত্রীলোকদের সাহায্যও গ্রহণ করেছে। তারা নিজেদের দ্বারা সম্ভাব্য সর্বপ্রকারের কৌশল ইউসুফ আ.-এর উপর ব্যবহার করেছে, কিন্তু তবুও বিফলই হয়েছে। এখন সর্বশেষ পর্যায়ে সে এক ধমক দিল, হয়তো ইউসুফ তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবে, অন্যথায় তাকে জেলখানায় অবরুদ্ধ করা হবে। এমতাবস্থায় একজন আল্লাহওয়ালা ব্যক্তি, সৎকর্মে দৃঢ়, স্থৈর্য-ধৈর্য বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং আল্লাহর ভয়কে সমগ্র মাখলুকাতের ক্রোধ ও কোপের ওপর প্রাধান্য দানকারী মানুষ এর চেয়ে উৎকৃষ্ট উত্তর আর কি দিতে পারতেন– হে খোদা! আমি এ গর্হিত ও নির্লজ্জ কাজের চেয়ে জেলখানাকেই প্রাধান্য এবং অগ্রাধিকার প্রদান করছি। জেল ও বন্দিদশা সবকিছুই আমার মঞ্জুর, কিন্তু আপনার নাফরমানি মঞ্জুর নয়। কে বলতে পারে এটা জেলখানার প্রার্থনা, বন্দি হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ, বালা ও মসিবতের আহ্বান? কখনো নয় বরং

এখানে তো সূক্ষ্ম উপায়ে তা-ই বলা হচ্ছে, যা সত্যের ঘোষণা এবং আল্লাহর দরবারে পৌঁছার সঠিক স্তর।

ইউসুফ আ. এটাও পছন্দ করেন নি, আযীযে মিসরের পত্নীকে সম্বোধন করবেন কিংবা আমন্ত্রিত মহিলাদেরকে কথার লক্ষ্যস্থল হওয়ার সুযোগ প্রদান করবেন। বরং তিনি নিজের খোদাকে ডাকলেন। কিন্তু সেই অসৎ প্রকৃতির স্ত্রীলোকদের নিকট এ কথা প্রকাশ করে দেওয়া জরুরি মনে করলেন, যেভাবে তাদের ধোঁকা প্রবঞ্চনা খোশামোদ-তোষামোদ বিফল হয়েছে, তদ্রুপ তাদের ধমকি ও শাস্তি আমার সত্যের ইচ্ছা এবং আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছাকে বাতিল করতে পারবে না। যুলায়খা বলল : "ইউসুফ হয়তো আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবে অন্যথায় কারাগারে প্রেরণ করা হবে।" অতএব আমি জেলখানাকে তার অসদিচ্ছার মুকাবেলায় লক্ষ বার প্রাধান্য দান করব।

এখন বলুন, এই সত্যের ঘোষণা এবং দৃঢ়তা প্রকাশের সাথে সেই দুআর কি সম্পর্ক, যা এক ব্যক্তি অযথা নিজের জন্য 'ছবর' কামনা করে নিজেকে বালা-মসিবতের পরীক্ষায় পতিত হওয়ার আহ্বান করছিল? সেখানে তো পরীক্ষাও ছিল না বরং অযথা বালা-মসিবত ডেকে আনছিল। আর এখানে পরীক্ষা মাথার উপর, মসিবতের ধমক প্রদান করা হয়েছে, কষ্ট-বিপদ আরোপের ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে। এমন করুণ অবস্থায় কি শুধু এই উত্তর যথেষ্ট হত, ইউসুফ আ. কাকুতি-মিনতি সহকারে "আল্লাহ" পাকের দরবারে আযীযে মিসরের বিবি হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য দুআ করতেন? বরং আর কিছুরই প্রয়োজন ছিল না? যদি এরূপ হত, তবে পরীক্ষা আযমাইশ এবং বালা মুসিবতের সময় দৃঢ়তা, সত্যের ঘোষণা, নির্ভীকতা এবং দুনিয়ার মদ-মত্ততার সামনে "আল্লাহর কালেমাকে উচ্চ করে ধরার" সবক কে শিখাতো? দৃঢ় সংকল্পের জীবন যাপন পদ্ধতি কে বলে দিত? বাতিলের সম্মুখে নির্ভীকতার শিক্ষা কার নিকট পাওয়া যেত এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যের পরিস্থিতি কে সৃষ্টি করত?

যৌবন লাভের বয়স

কত বছর বয়সে পূর্ণ যৌবন লাভ হয় এ ব্যাপারে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম মালেক, রবিয়া, যায়দ ইবনে আসলাম ও শাবী বলেন : পূর্ণ যৌবন প্রাপ্তি বলতে বালেগ হওয়া বুঝায়। সাঈদ ইবনে জুবায়েরের মতে তা ১৮ বছর। ইবনে আব্বাস রাযি. মুজাহিদ ও কাতাদা রহ. এর মতে ৩৩ বছর। হাসান বসরী রহ. এর মতে ৪০ বছর। কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত হাসান বসরী রহ. এর মতকে সমর্থন করে। যেমন—

حَتّٰٓى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهٗ وَبَلَغَ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً

"যখন সে যৌবন প্রাপ্ত হল এবং চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হল। আল্লাহ তাআলা তাঁর দুআ কবুল করেন।"

কারাগারে হযরত ইউসুফ আ.

ইউসুফ আ.-কে কারাগারে প্রেরণ করা হল। একজন নির্দোষীকে দোষী এবং একজন নিরপরাধ লোককে অপরাধী বানিয়ে দেওয়া হল। যেন আযীযের স্ত্রী অপমান ও দুর্নাম হতে রক্ষা পায় এবং অপরাধীকে 'হে অপরাধী!' বলতে না পারে।

এরপর কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে :

ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ (٣٥) وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (٣٦) قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (٣٧) وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (٣٨) يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (٣٩) مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٤٠) يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ (٤١)

নিদর্শনাবলী দেখার পর তাদের মনে হল, তাকে কিছুকালের জন্য কারারুদ্ধ করতে হবে। তার সাথে দুজন যুবক কারাগারে প্রবেশ করল। ওদের একজন বলল : আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি আঙুর নিংড়িয়ে রস বের করছি এবং অপরজন বলল : 'আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি আমার মাথার উপর রুটি বহন করছি এবং পাখি তা থেকে খাচ্ছে। আমাদেরকে তুমি এর তাৎপর্য জানিয়ে দাও, আমরা তোমাকে সৎকর্মপরায়ণ দেখেছি।

ইউসুফ বলল : 'তোমাদেরকে যে খাদ্য দেওয়া হয়, তা আসার পূর্বে আমি তোমাদের স্বপ্নের তাৎপর্য জানিয়ে দেব। আমি যা তোমাদের বলব, তা আমার প্রতিপালক আমাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন, তা হতে বলব। যে সম্প্রদায় আল্লাহকে বিশ্বাস করে না ও পরলোকে অবিশ্বাসী আমি তাদের মতবাদ বর্জন করেছি। আমি আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের মতবাদ অনুসরণ করি। আল্লাহর সাথে কোনো বস্তুকে শরিক করা আমাদের কাজ নয়। এটা আমাদের ও সমস্ত মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

'হে কারাসঙ্গীরা! ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রতিপালক শ্রেয়, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ? তাকে ছেড়ে তোমরা কেবল কতকগুলো নামের ইবাদত করছ, যে নাম তোমাদের

পিতৃপুরুষ ও তোমরা রেখেছ, এগুলোর কোনো প্রমাণ আল্লাহ্ পাঠান নি। বিধান দেওয়ার অধিকার কেবল আল্লাহর। তিনি আদেশ দিয়েছেন অন্য কারও ইবাদত না করতে কেবল তাঁর ব্যতীত। এটাই সরল দীন কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা অবগত নয়। 'হে কারাসঙ্গীদ্বয়! তোমাদের একজনের সম্বন্ধে কথা হলো– একজন তার মনিবকে মদ পান করাবে এবং অপরজন শূলবিদ্ধ হবে। তারপর তার মাথা থেকে পাখি আহার করবে। যে বিষয়ে তোমরা জানতে চেয়েছ, তার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে!

(সূরা ইউসুফ : ৩৫-৪১)

তাওরাতে বর্ণিত আছে, "ইউসুফ আ.-এর ইলম ও আমলের নৈপুণ্য জেলখানায়ও গুপ্ত থাকে নি। কারারক্ষী তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে জেলখানায় যাবতীয় শৃঙ্খলা বিধান এবং সমাধান তাঁর হাতে সোর্পদ করে দিল। ফলে জেলখানা সম্পূর্ণরূপে তাঁর স্বাধীন পরিচালনাধীনে এসে যায়। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে সেখানেও তাঁর যাবতীয় কাজে সৌভাগ্যশালী করে দিলেন।"

কুরআন মাজিদ থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। কেননা সেকালের জেলখানাগুলির অবস্থার পরিদৃষ্টিতে ইউসুফ আ.-এর নিকট বন্দিদের এরূপ অবাধ যাতায়াত এবং তাঁর মাহাত্ম্য ও সৎস্বভাবের স্বীকৃতি এটাই প্রকাশ করে, জেলখানায় ইউসুফ আ.-এর পবিত্র গুণাবলীর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল।

দাওয়াত ও তাবলীগ

ঘটনাক্রমে ইউসুফ আ.-এর সাথে আরো দুজন যুবক জেলখানায় প্রবেশ করল। তাদের মধ্যে একজন বাদশার শরাব পরিবেশনকারী; দ্বিতীয়জন বাদশার পাকশালার দারোগা। একদিন তারা উভয়ে হযরত ইউসুফ আ.-এর খেদমতে হাযির হল। তাদের মধ্যে শরাব পরিবেশক বলল : আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি শরাব প্রস্তুত করার জন্য আঙ্গুর নিংড়িয়ে রস বের করছি। অপরজন বলল : আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমার মাথার উপর রুটির খাঞ্চা রয়েছে; পক্ষীরা তা হতে খাচ্ছে।

হযরত ইউসুফ আ. ছিলেন নবীর পুত্র। ইসলাম প্রচারের রুচি তাঁর স্নায়ুমণ্ডলীর সাথে সংমিশ্রিত ছিল। তদুপরি আল্লাহ্ তাআলা তাঁকেও নবুয়তের জন্য মনোনীত করেছেন। সুতরাং সত্যধর্মের প্রচারই ছিল তাঁর জীবনের মূখ্য উদ্দেশ্য। যদিও জেলখানায় ছিলেন, কিন্তু জীবনের উদ্দেশ্যকে কেমন করে ভুলতে পারেন? আর যদিও বিপদে ও মসিবতে ছিলেন, কিন্তু আল্লাহর বাণী সমুন্নত করাকে ভুলে যাবেন, এটা কি করে সম্ভব হতে পারে? তাই এ সময়টিকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে নম্রতা ও মহব্বতের সাথে তাদের বললেন : নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ তাআলা আমাকে যে সমস্ত বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন, তন্মধ্যে এ জ্ঞানটিও তিনি আমাকে দান করেছেন। সুতরাং তোমাদের নিকট তোমাদের নির্ধারিত খাদ্যদ্রব্য আসার আগেই আমি তোমাদের স্বপ্নের ফলাফল বলে দিব; কিন্তু তোমাদেরকে একটি বিশেষ কথা বলছি। তা গভীর মনোযোগের সাথে বুঝতে চেষ্টা কর।

আমি ওই সমস্ত লোকের ধর্ম অবলম্বন করি নি, যারা আল্লাহ তাআলার ওপর ঈমান রাখে না এবং আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। আমি আমার পিতা ও পিতামহ ইয়াকুব, ইসহাক ও ইবরাহীম আ.-এর ধর্মের অনুসরণ করছি। আমি কখনো আল্লাহ পাকের সঙ্গে কোনো বস্তুকেই শরিক সাব্যস্ত করতে পারি না। এটা আল্লাহ পাকের একটি অনুগ্রহ, যা তিনি আমার উপর এবং আরো বহু লোকের উপর করেছেন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এর শোকরগুযারী করে না।

বন্ধুগণ! তোমরা কি ভেবে দেখছ, ভিন্ন ভিন্ন বহু মাবুদ হওয়া উত্তম, না একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলাই মাবুদ হওয়া উত্তম? তোমরা তাঁকে ছাড়া আর যাদের ইবাদত করছ, তাদের স্বরূপ এর চেয়ে অধিক কিছুই নয়, তা কয়েকটি নাম মাত্র। যা তোমাদের বাপ-দাদারা মনগড়া স্থির করে নিয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য কখনও কোনো সনদ নাযিল করেন নি। শাসনক্ষমতা তো শুধু আল্লাহ পাকের জন্যই রয়েছে। তিনি হুকুম করেছেন, তাঁকে ছাড়া আর কারো ইবাদত করো না। এটাই সত্য-সরল ধর্ম কিন্তু অধিকাংশ মানুষ নির্বোধ, তারা জানে না।

কেননা এ দিকে তাদের অন্তরে ইউসুফ আ.-এর প্রভাব ও মহত্ত্ব আসন গেড়ে বসেছিল। তিনি যা বলবেন, তাই গ্রহণ করার জন্যে তারা ছিল উদগ্রীব। সুতরাং তারা যে বিষয়ে জানতে চেয়েছে, প্রথমে তার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অধিক কল্যাণকর বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানানোই তিনি সঙ্গত মনে করেছেন। এরপর তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা দান করে বলেন :"হে আমার জেলখানার সাথীরা। তোমাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা হলো, তোমাদের দুজনের মধ্যে একজন আপন মনিবকে মদ পান করাবে।" সে লোকটি ছিল সাকী। "আর দ্বিতীয়জনকে শূলে চড়ানো হবে এবং পাখিরা তার মাথা থেকে আহার করবে।" সে ব্যক্তিটি ছিল রুটি প্রস্তুতকারী। "যে বিষয়ে তোমরা জানতে চেয়েছিলে, তার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে।" অর্থাৎ যা বলে দেওয়া হল, তা অবশ্যম্ভাবীরূপে কার্যকর হবে এবং যেভাবে বলা হল সেভাবেই হবে। তাই হাদিসে এসেছে, স্বপ্নের ব্যাখ্যা যতক্ষণ করা না হবে, ততক্ষণ তা ঝুলন্ত থাকে। যখন ব্যাখ্যা করা হয় তখন তা বাস্তবায়িত হয়। যেমন :

الرؤيا عليق جل طائر مالم تعبر فاذا عبرت وقعت

ইবনে মাসউদ, মুজাহিদ ও আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম রাযি. থেকে বর্ণিত : কয়েদি দুজন স্বপ্নের কথা বললেও ইউসুফ আ.-এর ব্যাখ্যা দানের পরে বলেছিল, আসলে আমরা কোনো স্বপ্ন দেখি নি। তখন ইউসুফ আ. বলেছিলেন, 'যে বিষয়ে তোমরা জিজ্ঞাসা করেছ, সে বিষয়ের ফয়সালা চূড়ান্ত হয়ে গেছে।'

সেসময় যে ব্যক্তি সম্পর্কে ইউসুফ আ.-এর ধারণা ছিল মুক্তি পাবে। তাকে তিনি বলে দিলেন, তোমার প্রভুর কাছে আমার কথা বলবে। অর্থাৎ আমি যে বিনা অপরাধে জেলখানায় আছি, এ বিষয়ে বাদশার কাছে আলোচনা করবে। এ থেকে প্রমাণ পাওয়া

যায়, উপায় অবলম্বনের চেষ্ট করা বৈধ এবং তা আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়। কিন্তু ওই মুক্তিলাভকারী যে লোকটিকে ইউসুফ আ. এ অনুরোধ করেছিলেন, সে বাদশার কাছে আলোচনা করতে শয়তান তাকে ভুলিয়ে দিল।

কথিত আছে, শরাব পরিবেশক ও পাকশালার দারোগার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তারা পানীয় ও খাদ্যদ্রব্যের সাথে বিষ মিশিয়েছিল। যখন তদন্ত সমাপ্ত হল, তখন দারোগার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ প্রমাণিত হয়ে গেল এবং শরাব পরিবেশক নির্দোষ সাব্যস্ত হল।

উল্লেখ্য, যদিও বিপদ ও প্রয়োজনের ক্ষেত্রে মানুষ মানুষের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা যথার্থ, চেষ্টা ও তাকওয়ার খেলাফ নয়, তথাপি নেককারদের কোনো কোনো ভালো কাজও আল্লাহ তায়ালার সান্নিধ্যপ্রাপ্তগণের শানের উপযুক্ত নয়। বাক্যটি অনুযায়ী হযরত ইউসুফ আ.-এর মতো মহামানবের পক্ষে আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা রাখার সাথে সাথে পার্থিব কারণসমূহের উপরও ভরসা রাখা মোটেও সঙ্গত ছিল না। তেমনি বাদশার নিকট নিজের দুরবস্থা দূরীকরণের প্রার্থী হওয়াও সঙ্গত ছিল না। সুতরাং আল্লাহ পাকের মীমাংসায় তাঁকে আরও কয়েক বছর জেলখানায় রাখা চূড়ান্ত হল। শয়তান শরাব পরিবেশককে এমনভাবে ভুলিয়ে দিল, সে ইউসুফ আ.-এর কথা কিছুই উল্লেখ করতে পারল না।

কোনো কোনো তাফসিরকারক বলেন, হযরত ইউরুফ আ. বলেছেন : বাদশার সম্মুখে আমার কথা উল্লেখ করে বলবে, আমাদেরকে এরূপ এক ব্যক্তি এমন সত্য ধর্মের শিক্ষা প্রদান করেছে এবং সে নিজের ধর্মকে আমাদের ধর্ম হতে পৃথক বলছে আবার তার উপর উত্তম প্রমাণও পেশ করছে। আর এ তাফসীরটি বিশুদ্ধতার পক্ষে তারা বলেন, এ স্থলে কুরআন মাজিদে ইউসুফ আ. ও উক্ত দুই ব্যক্তির মধ্যে মাত্র দুটি বিষয়ের আলোচনাই পাওয়া যায়। এক. ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগ। দুই. স্বপ্ন ও তার ফলাফল বর্ণনা। এ ছাড়া তৃতীয় কোনো বিষয়ের ইঙ্গিত পর্যন্ত নেই। অর্থাৎ কোনো ইশারা-ইঙ্গিত দ্বারাও প্রকাশ পায় না, হযরত ইউসুফ আ. সেই দুই ব্যক্তির সম্মুখে নিজের কাহিনী বর্ণনা করেছিলেন এবং তাদের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করেছিলেন। অতএব পূর্বে উল্লেখ করা ব্যতীত এরূপে 'তোমার প্রভুর নিকট আমার কথা বলবে!" বাক্যে অস্পষ্টতার কি অর্থ? এতদ্ব্যতীত যদি হযরত ইউসুফ আ. জেলখানা হতে বের হয়ে আসার ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা এরূপেই হত, তবে শরাব পরিবেশকের স্মরণ হওয়া এবং বাদশার স্বপ্নের ফল বলে দেওয়ার পর বাদশাহ যখন তাঁর কারামুক্তির হুকুম দিয়ে দিলেন, তখন তিনি তৎক্ষণাৎ বের হয়ে এলেন না কেন? উল্টো অবস্থার তদন্ত ও অনুসন্ধান করার দাবি কেন উত্থাপন করলেন? এ তদন্ত তো পরেও হতে পারত এবং পবিত্রতা ও নির্দোষিতার মীমাংসা বের হয়ে এসেও করা যেত। আয়াতগুলোর পর্যায়ক্রমিক সমাবেশের প্রতি লক্ষ করলে এ তাফসিরটি অগ্রগণ্য হওয়ার যোগ্য।

এ প্রসঙ্গে তাওরাতে উদ্ধৃত হয়েছে : "তখন ইউসুফ আ. বললেন, এর তাবীর ছিল– মনে কর, এ তিনটি ডাল তিনটি দিন। এখন হতে তিন দিনের মধ্যে বাদশাহ তোমার মোকদ্দমার রায় প্রদান করবেন এবং তোমাকে চাকরির পদ পুনরায় প্রদান করবেন এবং পূর্বে যেমনি তুমি ফেরাউনের শরাব পরিবেশক ছিলে, তদ্রুপ আবার তুমি শরাবের পেয়ালা ফেরাউনের হাতে দেবে। আর যখন তুমি খোশহাল হবে, তখন আমাকে স্মরণ কর এবং জেলখানা থেকে আমার মুক্তির কথা বলো। কেননা কাফেলার লোকেরা ইরানীদের দেশ হতে আমাকে অপহরণ করে নিয়ে এসেছে আর এখানেও আমি এমন কোনো কাজ করে নি, তারা আমাকে এ জেলখানায় আটকে রাখবে।

ফেরাউনের স্বপ্ন

হযরত ইউসুফ আ.-এর এ ঘটনা মিসরের ফেরাউনের যমানার সাথে সম্পৃক্ত। এ খান্দানটি শাহি বংশের হিসাবে আমালেকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইতিহাসে এদেরকে হিকসূস নামে অভিহিত করা হয়েছে। এদের আদি মূল সম্বন্ধে বলা হয়েছে, এরা রাখালদের একটি গোত্র ছিল। আধুনিক গবেষণায় জানা যায়, এ গোত্রটি আরব হতে এসেছিল। মূলে যাযাবর আরবদেরই একটি শাখা ছিল। এতদ্ভিন্ন প্রাচীন কিবতি ও আরবি ভাষার পারস্পরিক সাদৃশ্য এদের আরবী হওয়ার অধিক প্রামাণ।

মিসরের ধর্মীয় কল্পনার ভিত্তিতে তাদের উপাধি ছিল ফারা (ফেরাউন)। কেননা মিসরীয় দেবতাদের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র দেবতা আ-মানারা' (সূর্য দেবতা) ছিল। তৎকালীন বাদশা তার অবতার এবং ফারা' নামে কথিত হত। এ ফারাই হিব্রু ভাষায় ফা-রাআন এবং আরবি ভাষায় 'ফেরাউন' বলা হয়। হযরত ইউসুফ আ.-এর সময়কার ফেরাউনের ব্যক্তিগত নাম ঐতিহাসিকগণ 'রাইয়ান' বলেছেন। মিসরীয় বর্ণনাসমূহে তিনি 'আইয়ূনী' নামে অভিহিত হয়েছেন।

মোটকথা, হযরত ইউসুফ আ. এখনও কারাগারেই আছেন। ইতোমধ্যে সেই যুগের ফেরআউন এক স্বপ্ন দেখল, সাতটি খুব মোটা তাজা স্থূলকায় গাভী আর সাতটি কৃশকায় গাভী। কৃশ ও দুর্বল গাভীগুলি মোট ও স্থূলকায় গাভীগুলিকে গিলে ফেলল। আরও দেখল, সাতটি সতেজ ও সবুজ শস্যের শীষ আর সাতটি শুষ্ক শস্যের শীষ। শুষ্ক শীষগুলি সতেজ শীষগুলিকে খেয়ে ফেলল। বাদশা শয্যাত্যাগ করে অত্যন্ত অস্থির ও বিচলিত হয়ে পড়লেন এবং বিচিত্র ও আশ্চর্যজনক স্বপ্নের জন্য খুব পেরেশান হলেন। তৎক্ষণাৎ দরবারের উপদেষ্টাদের নিকট স্বপ্নটি বর্ণনা করে তার ফলাফল জানতে চাইলেন। দরবারীরাও তা শ্রবণ করে বিচলিত ও অস্থির হয়ে পড়ল। যখন কেউই সামাধান করতে পারল না, তখন নিজেদের অক্ষমতা ও অপারগতা গোপন করার জন্য বলল : বাদশা! এটা স্বপ্ন নয়; মনের বাজে কল্পনা, যার কোনো নির্দিষ্ট অর্থ নেই। আমরা প্রকৃত স্বপ্নের তাবীর তো বলতে পারি, কিন্তু বাজে কল্পনাসমূহের সমাধান দিতে পারি না। বাদশা দরবারীদের এ উত্তরে তৃপ্ত হতে পারলেন না। এমন সময়ে বাদশার

শারাব পরিবেশনকারীরর নিজের স্বপ্ন এবং ইউসুফ আ.-এর তাবীরের কথা স্মরণ হল। সে বাদশার খেদমতে আরয করল, একটু অবকাশ দিলে আমি এ স্বপ্নের তাবীর এনে দিতে পারি। আমাকে এখান হতে যেতে অনুমতি দিন। বাদশা অনুমতি পেয়ে তৎক্ষণাৎ জেলখানায় পৌঁছে হযরত ইউসুফ আ.-কে বাদশাহর স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনাল এবং বলল, এর সমাধান দিন। কেননা আপনি সততা ও পবিত্রতার মূর্তপ্রতীক। আপনিই এই স্বপ্নের ফলাফল বলতে পারেন। হয়তো যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন, আমি যখন সঠিক তাবীর নিয়ে তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তন করব তখন তিনি আপনার সত্যিকার সম্মান ও মর্যাদা উপলব্ধি করবেন।

হযরত ইউসুফ আ.-এর পূর্ণ ধৈর্য-সহ্য ও উচ্চ মর্যাদা অনুমান করুন! শরাব পরিবেশককে তিরস্কারও করলেন না এবং বহু বছর পর্যন্ত ভুলে থাকার জন্য ধমকও দিলেন না আর ইলম বিতরণে কার্পণ্যও করলেন না। এরূপও ভাবলেন না, জালেমরা বিনা দোষে আমাকে জেলখানায় আবদ্ধ করে রেখেছে। তারা যদি এ স্বপ্নের সমাধান না পেয়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তা হলে ভালো এই তাদের শাস্তি। না, এরূপ কিছুই করলেন না, তৎক্ষণাৎ স্বপ্নের তাবীর বলে দিলেন এবং নিজের তরফ হতে এ প্রসঙ্গে সঠিক তদবীরও বলে দিলেন এবং শরাব পরিবেশককে পূর্ণরূপে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন :

"এ স্বপ্নের তাবীর এবং এর ভিত্তিতে তোমাদের যা করতে হবে, তা হল, তোমরা একাধারে সাত বছর পর্যন্ত ক্ষেতি-কৃষি করতে থাকবে আর এ সাত বছর তোমাদের স্বচ্ছলতার বছর হবে। ক্ষেতের শস্য কাটার সময় যখন আসবে, তখন তোমাদের সারা বছরে খাদ্যের জন্য যে পরিমাণ শস্য প্রয়োজন, তা পৃথক করে নিবে। অবশিষ্ট শস্যগুলোকে শীষের মধ্যেই রেখে দেবে। তাতে তা কীট ইত্যাদি থেকে সংরক্ষিত থাকবে; নষ্টও হবে না। এ সাত বছরের পরে সাতটি বৎসর আসবে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের ও দুঃখ কষ্টের। তা তোমাদের পূর্ব সঞ্চিত সমস্ত শস্য নিঃশেষ করে দেবে। এরপর আবার একটি বছর আসবে, প্রচুর বৃষ্টিপাত বর্ষিবে। ক্ষেতি-কৃষি বেশ সবুজ এবং সতেজ হবে। লোকে নানা প্রকার ফল ও বীজ থেকে আরক এবং তৈল প্রচুর পরিমাণে বের করবে অর্থাৎ মোটাতাজা গাভীগুলো তাজা শীষগুলো স্বচ্ছল অবস্থার বছর আর দুর্বল ও কৃশ গাভীগুলো এবং শুষ্ক শীষগুলো দুর্ভিক্ষের বৎসর, যা স্বচ্ছলতার বৎসরের উৎপন্ন শস্যসমূহ খেয়ে নিঃশেষ করবে।

মোটকথা, ফেরাউনের উপরিউক্ত স্বপ্নের বর্ণনা দিয়ে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে :

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ (٤٣) قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ (٤٤) وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ

فَأَرْسِلُونِ (٤٥) يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (٤٦) قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ (٤٧) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ (٤٨) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ (٤٩)

রাজা বলল, 'আমি স্বপ্নে দেখলাম, সাতটি স্থূলকায় গাভী ওদেরকে সাতটি শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করছে এবং দেখলাম সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক। হে প্রধানগণ! যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পার তবে আমার স্বপ্ন সম্বন্ধে অভিমত দাও।' ওরা বলল, 'এটা অর্থহীন স্বপ্ন এবং আমরা এরূপ স্বপ্ন-ব্যাখ্যায় অভিজ্ঞ নই।'

দুজন কারাবন্দির মধ্যে যে মুক্তি পেয়েছিল এবং দীর্ঘকাল পরে যার স্মরণ হল, সে বলল : আমি এর তাৎপর্য তোমাদেরকে জানিয়ে দিব। সুতরাং তোমরা আমাকে পাঠাও। সে বলল, হে ইউসুফ! হে সত্যবাদী! সাতটি স্থূলকায় গাভী, তাদেরকে সাতটি শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক শীষ সম্বন্ধে তুমি আমাদেরকে ব্যাখ্যা দাও। যাতে আমি তাদের কাছে ফিরে যেতে পারি এবং তারা অবগত হতে পারে। ইউসুফ বলল, 'তোমরা সাত বছর একাধিক্রমে চাষ করবে। তারপর তোমরা যে শস্য সংগ্রহ করবে, তার মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ তোমরা ভক্ষণ করবে, তা ব্যতীত সমস্ত শীষ সমেত রেখে দেবে এবং এরপর আসবে সাতটি কঠিন বছর, এ সাত বছর যা পূর্বে সঞ্চয় করে রাখবে লোকে তা খাবে, কেবল সামান্য কিছু যা তোমরা সংরক্ষণ করবে তা ব্যতীত এবং এরপর আসবে এক বছর, সে বছর মানুষের জন্যে প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে এবং সে বছর মানুষ প্রচুর ফলের রস নিংড়াবে।

(সূরা ইউসুফ : ৪৩-৪৯)

আহলে কিতাবরা বলেন : বাদশা স্বপ্নে দেখেন, তিনি এক নদীর তীরে দাঁড়িয়ে আছেন। হঠাৎ সেখান থেকে সাতটি মোটাতাজা গাভী উঠে এসে নদী তীরের সবুজ বাগিচায় চরতে শুরু করে। এরপর ওই নদী থেকে আরও সাতটি দুর্বল ও শীর্ণকায় গাভী উঠে এসে পূর্বের গাভীদের সাথে চরতে থাকে। এরপর এ দুর্বল গাভীগুলো মোটাতাজা গাভীদের কাছে গিয়ে সেগুলোকে খেয়ে ফেলে।

এ সময় ভয়ে বাদশার ঘুম ভেঙ্গে যায়। কিছুক্ষণ পর বাদশা পুনরায় ঘুমিয়ে পড়েন। এবার আবার স্বপ্নে দেখেন, একটি ধান গাছে সাতটি সবুজ শীষ। আর অপর দিকে আছে সাতটি শুকনো ও শীর্ণ শীষ। শুকনো শীষগুলো সবুজ সতেজ শীষগুলোকে খেয়ে ফেলছে। বাদশা এবারও ভয়ে ভীত হয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠেন। পরে বাদশা পরিষদ ও সভাসদবর্গের কাছে স্বপ্নের বর্ণনা দিয়ে এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু তারা

কেউই স্বপ্নের ব্যাখ্যায় পারদর্শী ছিল না। তাই তারা বলল, এটা তো অর্থহীন স্বপ্ন অর্থাৎ এটা হয়ত রাত্রিকালের স্বপ্ন বিভ্রাট। এর কোনো ব্যাখ্যা নেই। এ ছাড়া স্বপ্নের ব্যাখ্যা দানে আমরা পারদর্শীও নই।

এ সময় সেই কয়েদিটির ইউসুফ আ.-এর কথা স্মরণে পড়ল যে কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেছিল এবং যাকে হযরত ইউসুফ আ. অনুরোধ করেছিলেন তাঁর মনিবের নিকট ইউসুফ আ.-এর কথা আলোচনা করতে। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত সে ঐ কথা ভুলে রয়েছিল। আহলে কিতাবদের মতে "বাদশার কাছে সাকী ইউসুফ আ.-এর আলোচনা করে। বাদশা ইউসুফ আ.-কে দরবারে ডেকে এনে স্বপ্নের বৃত্তান্ত তাঁকে জানান এবং ইউসুফ আ. তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে শুনান" এটা ভুল। আহলে কিতাবদের পণ্ডিত ও রাব্বানীদের মনগড়া কথা। সঠিক সেটাই, যা আল্লাহ্ কুরআনে বলেছেন। মোটকথা, সাকীর কথার উত্তরে ইউসুফ আ. কোনো শর্ত ছাড়াই এবং আশুমুক্তি কামনা না করেই তাৎক্ষণিকভাবে বাদশার স্বপ্নের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে শুনালেন এবং বলে দিলেন, প্রথম সাত বছর স্বাচ্ছন্দ্যময় হবে এবং তারপরের সাত বছর দুর্ভিক্ষ থাকবে।

সেই সাথে হযরত ইউসুফ আ. সচ্ছলতার সময় ও দুর্ভিক্ষকালে তাদের করণীয় সম্পর্কে পথনির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন, প্রথম সাত বছরের ফসলের প্রয়োজনের অতিরিক্ত অংশ শীষসহ সঞ্চয় করে রাখবে। পরের সাত বছরে সঞ্চিত ফসল অল্প অল্প করে খরচ করবে। কেননা এর পরে ফসলের জন্যে বীজ পাওয়া দুষ্কর হতে পারে। এ থেকে হযরত ইউসুফ আ.-এর প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়।

যা হোক! শরাব পরিবেশক বাদশার দরবারে প্রত্যাবর্তন করে এ সমস্ত বিবরণ শুনাল। বাদশা ইতোপূর্বে তার মুখে হযরত ইউসুফ আ.-এর প্রশংসার কয়েকটি বাক্য শুনেছিলেন। স্বপ্নফল বর্ণনার ব্যাপারটি দেখে তাঁর এল্‌ম, জ্ঞান, বুদ্ধি ও উচ্চমর্যাদা স্বীকার করে নিলেন এবং না দেখা বস্তুকে দেখার আগ্রহী হয়ে বললেন, এমন ব্যক্তিকে আমার নিকট নিয়ে আস।

অবস্থা শুনে হযরত ইউসুফ আ. জেলখানা হতে বাইরে আসতে অস্বীকৃতি জানালেন এবং বললেন : এভাবে তো আমি যাওয়ার জন্য প্রস্তুত নই। তুমি তোমার প্রভুর নিকট যাও এবং তাঁকে বল, তিনি যেন এর অনুসন্ধান করেন, সেই স্ত্রীলোকদের কি হয়েছিল, যারা নিজেদের হাত কেটে ফেলেছিল? প্রথমে এ কথা পরিষ্কার হয়ে যাক, তারা কেমন ষড়যন্ত্র ও প্রতারণা করেছিল আর পালনকর্তা তো তাদের ধোঁকাবাজী ও প্রতারণা সম্বন্ধে খুব অবগত রয়েছেন।

হযরত ইউসুফ আ. বিনা দোষে বিনা অপরাধে বহু বছর যাবৎ জেলখানায় আবদ্ধ ছিলেন এবং বিনা কারণে তাঁকে কয়েদ করা হয়েছিল। এখন বাদশা যখন দয়াপরবশ হয়ে তাঁকে মুক্তির সুসংবাদ শুনালেন। তাই উচিত তো ছিল তিনি আনন্দ ও খুশির সাথে জেলখানা হতে বের হয়ে আসবেন; কিন্তু তিনি তদ্রূপ করলেন না বরং অতীত বিষয়ের

অনুসন্ধান দাবি করলেন। এর কারণ, হযরত ইউসুফ আ. নবী বংশের সন্তান ছিলেন এবং নিজেও তিনি নিজেও মনোনীত নবী ও পয়গম্বর। সুতরাং আত্মমর্যাদাবোধ এবং আত্মসম্মানের পূর্ণ মাত্রারই অধিকারী। তিনি ভাবলেন, যদি আমি বাদশার এ মেহেরবানির কারণে মুক্ত হয়ে গেলাম, তবে এটা বাদশার মেহেরবানী ও দয়া বলে বিবেচিত হবে। অথচ আমার নির্দোষ ও পবিত্র হওয়া পর্দার অন্তরালে থেকে যাবে। আর এভাবে মুক্ত হলে শুধু আত্মসম্মানেই আঘাত লাগবে না বরং ধর্মের দাওয়াত ও তাবলীগের সেই মহা গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যেরও ক্ষতি হবে, যা আমার জীবনের মূখ্য উদ্দেশ্য। অতএব এখনই আসল ব্যাপারটি সম্মুখে উপস্থিত করার এবং সত্য প্রকাশিত হওয়ার উৎকৃষ্ট সময়। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে :

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ (٥٠) قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٥١) ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ (٥٢) وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥٣)

রাজা বলল, তোমরা ইউসুফকে আমার নিকট নিয়ে এস। দূত যখন তাঁর নিকট উপস্থিত হল তখন সে বলল : তুমি তোমার প্রভুর নিকট ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস কর, যে নারীগণ হাত কেটে ফেলেছিল তাদের অবস্থা কী? আমার প্রতিপালক তাদের ছলনা সম্পর্কে সম্যক অবগত। রাজা নারীগণকে বলল, 'যখন তোমরা ইউসুফ থেকে অসৎকর্ম কামনা করেছিলে, তখন তোমাদের কী হয়েছিল! তারা বলল, অদ্ভুত আল্লাহর মাহাত্ম্য! আমরা ওর মধ্যে কোনো দোষ দেখি নি। আযীযের স্ত্রী বলল, এক্ষণে সত্য প্রকাশ হল। আমিই তার থেকে অসৎকর্ম কামনা করেছিলাম; সে তো সত্যবাদী। সে বলল : আমি এটা বলেছিলাম, যাতে সে জানতে পারে, তার অনুপস্থিতিতে আমি তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করি নি এবং আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র সফল করেন না। সে বলল, আমি আমাকে নির্দোষ মনে করি না। মানুষের মন অবশ্যই মন্দকর্মপ্রবণ। কিন্তু সে নয়, যার প্রতি আমার প্রতিপালক দয়া করেন। আমার প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

বুখারী ও মুসলিম শরীফের রেওয়ায়েতে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ঘটনাটির উল্লেখ করে ইউসুফ আ.-এর ধৈর্য ও সহ্যকে খুব প্রশংসা করেছেন এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের বিনয়-নম্রতা একে বাড়িয়ে ইরশাদ করেন :

وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ مَا لَبِثَ يُوسُفُ لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ

"আমি যদি এত দীর্ঘকাল জেলখানায় অবস্থান করতাম, যত দীর্ঘকাল ইউসুফ আ. অবস্থান করেছিলেন, তবে আহবানকারীর ডাক তৎক্ষণাৎ কবুল করে নিতাম। (অর্থাৎ জেলখানা হতে বের হয়ে আসতাম।)

এ স্থলে এ কথাটিও লক্ষণীয়, যদিও ইউসুফ আ.-এর ব্যাপারটি সরাসরি আযীযে মিসরের বিবির সাথে ঘটেছিল, কিন্তু হযরত ইউসুফ আ. এখানে তা উল্লেখ করলেন না। বরং সেই মিসরীয় রমণীদের কথা বললেন, যারা নিজেদের হাত কেটে ফেলেছিল। হযরত ইউসুফ আ.-এরূপ কেন করলেন? এর দুটি কারণ ছিল। প্রথমত হযরত ইউসুফ আ. যদিও আযীযে মিসরের পত্নীর দ্বারাই অধিক কষ্ট পেয়েছিলেন, কিন্তু জেলখানায় প্রেরণের ব্যাপারটিতে সেই রমণীরেদও ষড়যন্ত্র ছিল। কেননা তাদের মধ্যে প্রত্যেকেই ইউসুফ আ.-এর আশেক এবং তাঁকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার অভিলাষী ছিল। পরিশেষে বিফল মনোরথ হওয়ার কারণে সকলে মিলে আযীযে মিসরের বিবিকে এ জেলখানায় প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্ররোচিত করেছে এবং একে কার্যে পরিণত করে ছেড়েছে। এ কারণেই জেলখানায় প্রেরণের ব্যাপারটি সেই রমণীদের ঘটনার পরে ঘটেছিল।

দ্বিতীয়ত হযরত ইউসুফ আ. মনে করতেন আযীযে মিসর আমার সাথে যথাসাধ্য সদ্ব্যবহার করেছেন, আমার সম্মান করেছেন ও মর্যাদা দান করেছেন। সুতরাং আমার জন্য তাঁর বিবির নাম উল্লেখ করে তাঁর অপমান ও দুর্নামের কারণ হওয়া সঙ্গত নয়।

ফলকথা, বাদশা এটা শ্রবণ করে সেই রমণীদেরকে ডেকে এনে বললেন, পরিষ্কার এবং সত্য করে বল, এ ব্যাপারটির প্রকৃত তথ্য কি? যখন তোমরা ইউসুফকে প্রেমে ফাঁসাতে চেষ্টা করেছিলে, যাতে তোমরা তাকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করতে পার? তারা সকলে সমস্বরে বলে উঠল :

قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْءٍ

"আল্লাহ্ না করুন, আমরা তার মধ্যে কোনো অসৎ প্রবৃত্তি দেখতে পাই নি।"

সেই মজলিসে আযীযে মিসরের বিবিও উপস্থিত ছিলেন। সে এখন মহব্বতের চুলায় অপক্ক ছিল না, পক্ক হয়ে উজ্জ্বল স্বর্ণে পরিণত হয়েছিল এবং অপমান ও দুর্নামের ভয়কে অতিক্রম করে অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গেছে। সে যখন দেখতে পেল, ইউসুফ আ.-এর ইচ্ছা প্রকৃত অবস্থা প্রকাশিত হয়ে পড়ুক, তখন সে বেএখতিয়ার বলে উঠল :

الْاٰنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ اَنَا رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ

"যা প্রকৃত ব্যাপার ছিল, তা এখন প্রকাশ পেয়েছে। আমিই তাকে প্রেমে ফাঁসানোর জন্য ফুসলিয়েছিলাম। কেননা আমি আত্মহারা হয়ে পড়েছিলাম। নিঃসন্দেহ সে (নিজের বর্ণনায়) সত্যবাদী।"

সে আরও বলল :

ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ (٥٢) وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥٣)

"এটা আমি এ জন্য বললাম, যেন সে (আযীয) জানতে পারে, আমি তার অগোচরে (এর চেয়ে অধিক আর) কোনো বিশ্বাসঘাতকতা করি নি (যতটুকু অবস্থা সে-ও জানে) আর নিঃসন্দেহ আল্লাহ তাআলা বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্রকে সফলকাম করেন না। (অতএব আমি যদি এর চেয়ে অধিক বিশ্বাসঘাতকতা করতাম, তবে তাও প্রকাশ হয়ে পড়ত।) আর আমি আমার নফসের পবিত্রতার দাবি করি না। নিঃসন্দেহ নফস অবশ্যই মন্দ কাজের প্রতি বড়ই প্ররোচনা প্রদানকারী। তবে হ্যাঁ, (সেই ব্যক্তির প্রতি নফসের প্ররোচনা কার্যকরী হয় না) যার প্রতি আমার রব রহম করেন। নিঃসন্দেহ আমার পালনকর্তা বড়ই ক্ষমাশীল, বড়ই দয়ালু।" (সূরা ইউসুফ : ৫২-৫৩)

মোটকথা, হযরত ইউসুফ আ.-এর পবিত্রতা, নিষ্পাপতা ও সততার ব্যাপারটি অপবাদ প্রদানকারিণীদের মুখ দ্বারাই প্রকাশিত হওয়ার সময় এসে গিয়েছিল। সুতরাং স্পষ্টরূপে প্রকাশ পেয়ে গেল এবং বাদশার দরবারে অপরাধীরা অপরাধ স্বীকার করে বলে দিল, ইউসুফ সর্বপ্রকারের আবিল্য হতে পবিত্র।

দীর্ঘ সময় কারাবাসের কারণ

সহি ইবনে হিব্বানে ইউসুফ আ.-এর কারাগারে অধিককাল পর্যন্ত আবদ্ধ থাকার কারণ সম্পর্কে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। হাদিসটি আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ ইউসুফের প্রতি রহম করুন! তিনি যদি اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ "তোমার প্রভুর কাছে আমার কথা বলবে" কথাটি না বলতেন, তবে তাকে এতদিন কারাগারে থাকতে হত না। আল্লাহ তাআলা হযরত লূত আ.-এর প্রতিও রহম করুন! কারণ, তিনি তাঁর কওমকে বলেছিলেন– তোমাদের মুকাবিলায় আমার যদি আজ শক্তি থাকত কিংবা কোনো শক্ত অবলম্বনের আশ্রয় পেতাম। যেমন ইরশাদ হচ্ছে :

لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ

এরপর আল্লাহ যত নবী প্রেরণ করেছেন, তাদেরকে বিপুল সংখ্যক লোক বিশিষ্ট গোত্রেই প্রেরণ করেছেন।

কিন্তু এ হাদিসটি এ সনদে মুনকার। তা ছাড়া মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে আলকামা সমালোচিত রাবী। তাঁর বেশ কিছু একক বর্ণনায় বিভিন্ন রকম দুর্বলতা রয়েছে। বিশেষত এ শব্দগুলো একান্তই মুনকার। ইমাম বুখারী ও মুসলিমের হাদীসও উক্ত হাদীসকে ভুল সাব্যস্ত করে।

একটি জ্ঞাতব্য

ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ

"আমি এটি বলছিলাম, যাতে সে জানতে পারে যে, তার অগোচরে আমি তার বিশ্বাসঘাতকতা করি নি। আর আল্লাহ্ তাআলা বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র সফল করেন না।"

কারো কারো মতে এটা হযরত ইউসুফ আ.-এর কথা। তখন অর্থ হবে : আমি এ বিষয়টি যাঁচাই করতে চাই এ উদ্দেশ্যে, যাতে আযীয জানতে পারে, তার অনুপস্থিতিতে আমি তার সাথে কোনো বিশ্বাসঘাতকতা করি নি। আবার কারো কারো মতে এটা যুলায়খার উক্তি। তখন অর্থ হবে, আমি একথা স্বীকার করছি এ উদ্দেশ্যে, যাতে আমার স্বামী জানতে পারে, আমি মূলত তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতার কোনো কাজ করি নি। এটা অবশ্য তার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু আমার সাথে কোনো অশ্লীল কাজ সংঘটিত হয় নি। পরবর্তীকালের অনেক ইমামই এই মতকে সমর্থন করেন। তদ্রূপ

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ

উক্তিটিও কেউ বলেছেন ইউসুফ আ.-এর; আবার কেউ বলেছেন যুলায়খার। তবে এটা যুলায়খার বক্তব্য হওয়াটাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত ও সঙ্গত।

এরপর আল্লাহ্ পাক কুরআনে বলেন :

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ (٥٤) قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (٥٥) وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (٥٦) وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (٥٧)

রাজা বলল, ইউসুফকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাকে আমার একান্ত সহচর নিযুক্ত করব। তারপর রাজা যখন তার সাথে কথা বলল, তখন রাজা বলল, আজ তুমি আমাদের কাছে মর্যাদাশালী ও বিশ্বাসভাজন হলে। ইউসুফ আ. বললেন, 'আমাকে দেশের ধন-সম্পদের উপর কর্তৃত্ব প্রদান করুন! আমি বিশ্বস্ত রক্ষক ও সুবিজ্ঞ।' এভাবে ইউসুফ আ.-কে আমি সে দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম। সে সেদেশে যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করতে পারত। আমি যাকে ইচ্ছা তার প্রতি দয়া করি; আমি সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করি না। যারা মুমিন এবং মুত্তাকী তাদের পরলোকের পুরস্কারই উত্তম।

(সূরা ইউসুফ : ৫৪-৫৭)

এতে বুঝা যাচ্ছে, হযরত ইউসুফ আ.-এর উপর যে অপবাদ দেওয়া হয়েছিল, তা থেকে যখন তাঁর মুক্ত ও পবিত্র থাকার কথা বাদশার কাছে সুস্পষ্ট হল, তখন তিনি

বললেন : ইউসুফকে আমার কাছে নিয়ে এসো, আমি তাকে আমার একান্ত সহচর করে রাখব। অর্থাৎ আমি তাঁকে আমার বিশেষ পরিষদ ও রাষ্ট্রীয় উচ্চমর্যাদা দিয়ে আমার পরিষদভুক্ত করে রাখব। তারপর বাদশা যখন ইউসুফ আ.-এর সাথে কথা বললেন এবং তাঁর কথাবার্তা শুনে তাঁর অবস্থাদি সম্যক জানলেন, তখন বললেন : আজ তুমি আমাদের কাছে মর্যাদাশীল ও বিশ্বাসভাজন হলে!

হযরত ইউসুফ আ. বাদশার কাছে ধন-ভাণ্ডারের উপর তদারকির দায়িত্বভার চাইলেন। কারণ, প্রথম সাত বছর পর দুর্ভিক্ষের কালে সংকট সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা ছিল। সুতরাং সে সময় আল্লাহর পছন্দ অনুযায়ী মানুষের কল্যাণ সাধন ও তাদের প্রতি সদয় আচরণ করার ব্যাপারে যাতে ত্রুটি না হয়, সে লক্ষ্যে তিনি এ পদ কামনা করেন। বাদশাকে তিনি আশ্বস্ত করেন যে, তাঁর দায়িত্ব যা দেওয়া হবে, তা তিনি বিশ্বস্ততার সাথে সংরক্ষণ করবেন এবং রাজত্বের বিষয়ে উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধনে তিনি বিশেষ অভিজ্ঞতার পরিচয় দিবেন।

এতে প্রমাণিত হয়, যে ব্যক্তি নিজের আমানতদারী ও দায়িত্ব পালনের প্রতি দৃঢ় আস্থাশীল, সে তার যোগ্য পদের জন্য আবেদন করতে পারে।

আহলে কিতাবদের মতে ফিরাউন (মিসরের বাদশাহ) ইউসুফ আ.-কে পরম মর্যাদা দান করেন এবং সমগ্র মিসর দেশের কর্তৃত্ব তাঁর হাতে তুলে দেন। নিজের বিশেষ আংটি ও রেশমী পোশাক তিনি তাঁকে পরিয়ে দেন। তাঁকে স্বর্ণের হারে ভূষিত করে মসনদের দ্বিতীয় আসনে আসীন করেন। তারপর বাদশার সম্মুখেই ঘোষণা করা হয় 'আজ থেকে আপনিই দেশের প্রকৃত শাসক। কেবল নিয়মতান্ত্রিক প্রধানরূপে রাজ সিংহাসনের অধিকারী হওয়া ছাড়া অন্য কোনো দিক দিয়েই আমি আপনার চেয়ে অধিক ক্ষমতাশালী নই। তারা বলেন, ইউসুফ আ.-এর বয়স তখন ত্রিশ বছর এবং এক অভিজাত বংশীয়া মহিলা ছিলেন তাঁর স্ত্রী।

বিখ্যাত মুফাসসির সালাবি রহ. বলেছেন, মিসরের বাদশা আযীযে মিসর কিতফীরকে পদচ্যুত করে ইউসুফ আ.-কে সেই পদে বসান। কথিত আছে, কিতফীরের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী যুলায়খাকে বাদশা ইউসুফের সাথে বিবাহ দেন। ইউসুফ আ. যুলায়খাকে কুমারী অবস্থায় পান। কেননা যুলায়খার স্বামী স্ত্রী সংসর্গে যেতেন না। যুলায়খার গর্ভে ইউসুফ আ.-এর দুই পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। তাদের নাম আফরাইন ও মানশা। এভাবে ইউসুফ আ. মিসরের কর্তৃত্ব লাভ করে সে দেশে ন্যায়বিচার কায়েম করেন এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের কাছেই বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

কথিত আছে, ইউসুফ আ. যখন কারাগার থেকে বের হয়ে বাদশার সম্মুখে আসেন, তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ত্রিশ বছর। বাদশা সত্তরটি ভাষায় তাঁর সাথে কথা বলেন। যখন যে ভাষায় তিনি কথা বলেন, ইউসুফ আ. তখন সেই ভাষায়ই তার উত্তর দিতে থাকেন। অল্প বয়স হওয়া সত্ত্বেও তাঁর এ অসাধারণ যোগ্যতা দেখে বাদশা বিস্মিত হন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক রহ. বলেন, মিসরের বাদশা ওলীদ ইবনে রাইয়ান ইউসুফ আ.-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

এরপর পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন :

وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (٥٨) وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ (٥٩) فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ (٦٠) قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ (٦١) وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

ইউসুফের ভাইয়েরা এল এবং তার কাছে উপস্থিত হল। সে তাদের চিনল; কিন্তু তারা তাকে চিনতে পারল না এবং সে যখন ওদের সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিল, তখন সে বলল, 'তোমরা আমার কাছে তোমাদের বৈমাত্রেয় ভাইকে নিয়ে এসো। তোমরা কি দেখছ না, আমি মাপে পূর্ণ মাত্রায় দিই? আমি উত্তম মেযবান। কিন্তু তোমরা যদি তাকে আমার কাছে নিয়ে না আস, তবে আমার কাছে তোমাদের জন্য কোনো বরাদ্দ থাকবে না এবং তোমরা আমার নিকটবর্তী হবে না।' তারা বলল, 'তার বিষয়ে আমরা তার পিতাকে সম্মত করার চেষ্টা করব এবং আমরা নিশ্চয়ই এটা করব।' ইউসুফ তার ভৃত্যদেরকে বলল, 'ওরা যে পণ্যমূল্য দিয়েছে, তা তাদের মালপত্রের মধ্যে রেখে দাও; যাতে স্বজনদের কাছে প্রত্যাবর্তনের পর তারা বুঝতে পারে, এটা প্রত্যার্পণ করা হয়েছে; তা হলে তারা পুনরায় আসতে পারে।' (সূরা ইউসুফ : ৫৮-৬২)

এখানে জানা যাচ্ছে, হযরত ইউসুফ আ.-এর ভাইয়েরা মিসরে যখন দুর্ভিক্ষের বছরগুলোতে সমগ্র দেশ ও জাতি তার করাল গ্রাসে পতিত হয়, তখন খাদ্য সংগ্রহের জন্যে মিসরে আগমন করে। ইউসুফ আ. সে সময় মিসরের দীনী ও দুনিয়াবী সার্বিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। ভাইয়েরা ইউসুফ আ.-এর কাছে উপস্থিত হলে তিনি তাদের চিনে ফেলেন; কিন্তু তারা তাঁকে চিনতে পারে নি। কারণ, ইউসুফ আ. এত বড় উচ্চ পদ-মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে পারেন, এটা তাদের কল্পনাতীতই ছিল।

আহলে কিতাবদের মতে ইউসুফ আ.-এর ভাইয়েরা তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সিজদা করে। এ সময় ইউসুফ আ. তাদেরকে চিনে ফেলেন। তবে তিনি চাচ্ছিলেন, তারা যেন তাঁকে চিনতে না পারে। সুতরাং তিনি তাদের প্রতি কঠোর ভাষা ব্যবহার করেন এবং বলেন, তোমরা গোয়েন্দা বাহিনীর লোক। আমার দেশের গোপন তথ্য নেওয়ার জন্যে তোমরা এখানে এসেছ! তারা বলল, আল্লাহর কাছে পানাহ চাই! আমরা তো ক্ষুধা ও অভাবের তাড়নায় পরিবারবর্গের জন্যে খাদ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই এখানে এসেছি। আমরা একই পিতার সন্তান। বাড়ি কেনান। আমরা মোট বার ভাই। একজন আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। সর্ব কনিষ্ঠজন পিতার কাছেই আছে। এ কথা শুনে ইউসুফ আ. বললেন, আমি তোমাদের বিষয়টি অবশ্যই তদন্ত করে দেখব।

আহলে কিতাবরা আরও বলে, ইউসুফ আ. ভাইদেরকে তিনদিন পর্যন্ত বন্দি করে রাখেন। তিনদিন পর তাদেরকে মুক্তি দেন। তবে শামউন নামক এক ভাইকে আটক করে রাখেন। যাতে তারা অপর ভাইটিকে পরবর্তী সময় নিয়ে আসে। আহলে কিতাবদের এ বর্ণনার কোনো কোনো দিক আপত্তিকর। কারণ, আল্লাহর বাণী : ইউসুফ যখন তাদের রসদের ব্যবস্থা করে দিলেন অর্থাৎ তিনি কাউকে এক উট বোঝাইয়ের বেশি খাদ্য রসদ প্রদান করতেন না। সে নিয়ম অনুযায়ী তাদের প্রত্যেককে এক উট বোঝাই রসদ প্রদান করলেন। আর বললেন, "তোমরা তোমাদের বৈমাত্রেয় ভাইটিকে আমার কাছে নিয়ে এসো!" ইউসুফ আ. তাদেরকে তাদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তারা বলেছিল, আমরা বার ভাই ছিলাম। আমাদের মধ্যকার একজন চলে গেছে। তার সহোদরটি পিতার কাছে রয়েছে।

ইউসুফ আ. বললেন : আগামী বছর যখন তোমরা আসবে, তখন তাকে সাথে নিয়ে এসো! তোমরা কি দেখছ না, আমি মাপে পূর্ণ মাত্রায় দিই এবং মেহমানদেরকে সমাদর করি? অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে উত্তমভাবে মেহমানদারী করেছি, তোমাদের থাকার ভালো ব্যবস্থা করেছি। এ কথা দ্বারা তিনি অপর ভাইকে আনার জন্যে তাদেরকে উৎসাহিত করেন। যদি তারা তাকে না আনে, তবে তাদেরকে তার পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে বলেন :

"যদি তাকে আমার কাছে নিয়ে না আস, তা হলে আমার কাছে তোমাদের কোনো বরাদ্দ থাকবে না এবং তোমরা আমার নিকটবর্তী হবে না"। অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে রসদও দিব না। আমার কাছে ঘেঁষতেও দিব না। তাদেরকে প্রথমে যেভাবে বলেছিলেন, এটা তার সম্পূর্ণ বিপরীত। সুতরাং উৎসাহ ও ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে তাকে হাযির করার জন্যে তিনি এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

তারা বলল : আমরা তার সম্পর্কে পিতাকে সম্মত করার চেষ্টা করব। অর্থাৎ আমাদের সাথে তাকে আনার জন্যে এবং আপনার কাছে হাযির করার জন্যে সম্ভাব্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাব এবং আমরা তা অবশ্যই করব। অর্থাৎ তাকে আনতে আমরা অবশ্যই সক্ষম হব। তারপর হযরত ইউসুফ আ. তাদের প্রদত্ত পণ্যমূল্য এমনভাবে তাদের মালামালের মধ্যে রেখে দেওয়ার জন্যে ভৃত্যদেরকে নির্দেশ দেন, যাতে তারা তা টের না পায়।

মূল্য ফেরত দেওয়ার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কেউ বলেছেন, হযরত ইউসুফ আ.-এর ইচ্ছা ছিল, যখন তারা দেশে গিয়ে তা লক্ষ্য করবে, তখন তা ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। আবার কেউ বলেছেন, হযরত ইউসুফ আ. আশঙ্কা করছিলেন, দ্বিতীয়বার আসার মতো অর্থ হয়তো থাকবে না। কারও মতে ভাইদের নিকট থেকে খাদ্যদ্রব্যের বিনিময় গ্রহণ করা তাঁর কাছে নিন্দনীয় বলে মনে হচ্ছিল।

তাদের পণ্যমূল্য কি জিনিস ছিল, সে ব্যাপারে মুফসসিরদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। পরে সে সম্পর্কে আলোচনা আসছে। আহলে কিতাবদের মতে তা ছিল রৌপ্য ভর্তি থলে। এ মতই যথার্থ মনে হয়।

فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٦٣) قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (٦٤) وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ (٦٥) قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (٦٦) وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (٦٧) وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٦٨)

"তারপর তারা যখন তাদের পিতার কাছে ফিরে আসল তখন তারা বলল : 'হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্যে বরাদ্দ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সুতরাং আমাদের ভাইকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন; যাতে আমরা রসদ পেতে পারি। আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষণ করব। সে বলল, আমি কি তোমাদেরকে তার সম্বন্ধে সেরূপ বিশ্বাস করব, যেরূপ বিশ্বাস পূর্বে তোমাদেরকে করেছিলাম তাঁর সম্বন্ধে? আল্লাহই রক্ষণাবেক্ষণে শ্রেষ্ঠ এবং তিনি দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু। যখন তারা তাদের মালপত্র খুলল, তখন তারা দেখতে পেল তাদের পণ্যমূল্য তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তারা বলল, 'হে আমাদের পিতা! আমরা আর কি প্রত্যাশা করতে পারি? এ তো আমাদের প্রদত্ত পণ্যমূল্য, আমাদরেকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে; পুনরায় আমরা আমাদের পরিবারবর্গকে খাদ্য-সামগ্রী এনে দিব এবং আমরা আমাদের ভ্রাতার রক্ষণাবেক্ষণ করব এবং আমরা অতিরিক্ত আর এক উট বোঝাই পণ্য আনব; যা এনেছি, তা পরিমাণে অল্প। পিতা বলল, আমি ওকে কখনই তোমাদের সাথে পাঠাব না; যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহর নামে অঙ্গীকার কর যে, তোমরা তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবেই; অবশ্য যদি তোমরা একান্ত অসহায় হয়ে না পড়। তারপর যখন তারা তার কাছে প্রতিজ্ঞা করল, তখন সে বলল : 'আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি, আল্লাহ তার বিধায়ক।

সে বলল, হে আমার পুত্রগণ! তোমরা এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো না। ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে আমি তোমাদের জন্য কিছু করতে পারি না। বিধান আল্লাহরই। আমি তাঁরই ওপর ভরসা করি এবং যারা ভরসা করতে চায়, তারা আল্লাহরই উপর ভরসা করুক। এবং যখন তারা তাদের পিতা

তাদেরকে যেভাবে আদেশ করেছিল সেভাবেই প্রবেশ করল। তখন আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে তা তাদের কোনো কাজে আসল না; ইয়াকুব কেবল তার মনের একটি অভিপ্রায় পূর্ণ করেছিল এবং সে অবশ্যই জ্ঞানী ছিল। কারণ, আমি তাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটি অবগত নয়। (সূরা ইউসুফ : ৬৩-৬৮)

এতে জানা যায়, মিসর থেকে তারা তাদের পিতার কাছে ফিরে এসে বলল : আমাদের জন্য বরাদ্দ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ বছরের পরে আপনি যদি আমাদের ভাইকে আমাদের সাথে না পাঠান, তবে আমাদের বরাদ্দ দেওয়া হবে না। আর যদি আমাদের সাথে পাঠান, তা হলে বরাদ্দ বন্ধ করা হবে না। আর "যখন তারা তাদের মালপত্র খুলল, তখন দেখতে পেল, তাদের পণ্যমূল্য ফেলত দেওয়া হয়েছে। তারা বলল, পিতা! আমাদের পণ্যমূল্যটাও ফেরত দেওয়া হয়েছে। এরপর আমরা আর কি আশা করতে পারি? পুনরায় আমরা আমাদের পরিবারবর্গের জন্যে খাদ্য-সামগ্রী আনব। যাতে আমাদের পুরা বছরের সংস্থান হতে পারে। আমরা আমাদের ভাইকে রক্ষণাবেক্ষণ করব। তার কারণে আরো এক উট বোঝাই পণ্য বেশি আনতে পারব। এখন আমরা যা এনেছি, অন্য ভাইটি গেলে যা পাওয়া যেত তার তুলনায় তা অল্প।

হযরত ইয়াকুব আ. আপন পুত্র বিনয়ামিনের ব্যাপারে অত্যন্ত কুণ্ঠিত ছিলেন। কারণ, তার মাঝে তিনি তার ভাই ইউসুফ আ.-এর ঘ্রাণ পেতেন, সান্ত্বনা লাভ করতেন এবং তিনি থাকায় ইউসুফ আ.-কে কিছুটা ভুলে থাকতেন। তাই তিনি বললেন :

"আমি তাকে কখনই তোমাদের সাথে পাঠাব না যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহর নামে অঙ্গীকার কর, তোমরা তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবেই। অবশ্য যদি তোমরা বিপদে পরিবেষ্ঠিত হয়ে একান্ত অসহায় হয়ে না পড়। অর্থাৎ তোমরা সকলেই যদি তাকে আনতে অক্ষম হও, তবে ভিন্ন কথা। এভাবে তাদের পিতা হযরত ইয়াকুব আ. পুত্রদের থেকে অঙ্গীকারনামা পাকাপোক্ত করে নেন। তাদের এবং পুত্রের ব্যাপারে সম্ভাব্য সাবধানতা অবলম্বন করেন। কিন্তু কোনো সতর্কতাই তাদেরকে ঠেকাতে পারল না। হযরত ইয়াকুব আ. তাঁর নিজের ও তাঁর পরিবার-পরিজনের খাদ্য-সামগ্রীর প্রয়োজন না হলে কখনো তাঁর প্রিয় পুত্রকে পাঠাতেন না। কিন্তু তাকদীরেরও কিছু বিধান রয়েছে। আল্লাহ যা চান তা-ই নির্ধারণ করেন, যা ইচ্ছা তাই গ্রহণ করেন। যে রকম ইচ্ছা সে রকম আদেশ দেন। তিনি প্রজ্ঞাময়, সুবিজ্ঞ। এরপর পিতা আপন পুত্রদেরকে শহরে প্রবেশের সময় এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে নিষেধ করেন বরং বিভিন্ন প্রবেশদ্বার দিয়ে যেতে বলেন। এর কারণ হিসেবে ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন : তাদের উপর যাতে কারও কুদৃষ্টি না পড়ে, সে জন্যে তিনি এরূপ নির্দেশ দিয়েছিলেন। কেননা তাদের অবয়ব ও চেহারা ছিল অত্যধিক আকর্ষণীয় ও সুশ্রী।

অবশ্য ইবরাহীম নাখঈ রহ. বলেছেন : তিনি তাদেরকে বিক্ষিপ্ত করে দিতে চেয়েছিলেন। ফলে হয়তো তারা কোথাও ইউসুফ আ.-এর সংবাদ পেয়ে যেতে পারে

কিংবা এভাবে তারা বেশি সংখ্যক লোকের কাছে ইউসুফ আ.-এর সন্ধান জিজ্ঞেস করতে পারবে। কিন্তু প্রথম মতই প্রসিদ্ধ।

মোটকথা, ইয়াকুব আ. যা কিছু করেছেন, নিজ ইলম অনুযায়ী তাঁর এরূপই করা উচিত ছিল। ইলমের এ দৌলত আমিই তাঁকে দান করেছিলাম। কিন্তু এটা জরুরি নয়, সাবধানতামূলক তদবীর প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সঠিক কার্যকরীই হবে। যদি আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা তার বিপরীত কল্যাণ মনে করে, তবে তাই হয়ে থাকে এবং সমস্ত তদবীর বিফল হয়ে যায়। যেমন, সম্মুখে বিনইয়ামিনের সাথে সংঘটিত ঘটনায় দেখা যায়, তাঁকে আবদ্ধ করে রাখা হল। কিন্তু এমনি কল্যাণের উদ্দেশ্যে, পরে যার পরিণাম ইয়াকুব আ.-এর গোটা খানদানের জন্য কল্যাণ প্রমাণিত হল। কুরআন মাজিদে ইরশাদ হচ্ছে :

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٦٩) فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ (٧٠) قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ (٧١) قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (٧٢) قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ (٧٣) قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ (٧٤) قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (٧٥) فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ (٧٦) قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ (٧٧) قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (٧٨) قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ (٧٩)

"ওরা যখন ইউসুফের সম্মুখে উপস্থিত হল, তখন ইউসুফ তার সহোদরকে নিজের কাছে রাখল এবং বলল : আমিই তোমার সহোদর। সুতরাং তারা যা করত, তার জন্যে দুঃখ করো না। তারপর সে যখন তাদের সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিল, তখন সে তার সহোদরের মালপত্রের মধ্যে পানপাত্র রেখে দিল। তারপর এক আহ্বায়ক চিৎকার করে বলল, যাত্রীদল! তোমরা নিশ্চয়ই চোর। তারা তাদের দিকে ফিরে বলল, তোমরা কী হারিয়েছ? তারা বলল, আমরা রাজার পানপাত্র হারিয়েছি; যে ওটা এনে দিবে, সে এক উট বোঝাই মাল পাবে এবং আমি এর জামিন। তারা বলল, আল্লাহর শপথ! তোমরা তো জান, আমরা এ দেশে দুষ্কৃতি করতে আসি নি এবং আমরা চোরও নই। তারা

বলল, যদি মিথ্যাবাদী হও তবে তার শাস্তি কী? তারা বলল, এর শাস্তি যার মালপত্রের মধ্যে পাত্রটি পাওয়া যাবে, সে-ই তার বিনিময়। এভাবে আমরা সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি।

তারপর সে তার সহোদরের মালপত্র তল্লাশির পূর্বে তাদের মালপত্র তল্লাশি করতে লাগল। পরে তার সহোদরের মালপত্রের মধ্য হতে পাত্রটি বের করল। এভাবে আমি **ইউসুফের জন্যে কৌশল করেছিলাম**। রাজার আইনে তার সহোদরকে সে আটক করতে **পারত না, আল্লাহ ইচ্ছা না করলে। আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নীত করি। প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তির উপর আছে সর্বজ্ঞানী।** তারা বলল, সে যদি চুরি করে থাকে, তার সহোদরও তো পূর্বে চুরি করেছিল। কিন্তু ইউসুফ প্রকৃত ব্যাপার নিজের মনে গোপন রাখল এবং তাদের কাছে প্রকাশ করল না; সে মনে মনে বলল, তোমাদের অবস্থা তো হীনতর এবং তোমরা যা বলছ, সে সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। ওরা বলল, হে আযীয! এর পিতা আছেন– অতিশয় বৃদ্ধ। সুতরাং এর স্থলে আপনি আমাদের একজনকে রাখুন! আমরা তো আপনাকে দেখছি মহানুভব ব্যক্তিদের একজন। সে বলল, যার কাছে আমরা আমাদের মাল পেয়েছি তাকে ছাড়া অন্যকে রাখার অপরাধ হতে আমরা আল্লাহর আশ্রয় নিচ্ছি। এরূপ করলে আমরা অবশ্যই সীমালঙ্ঘনকারী হব।' (সূরা ইউসুফ : ৬৯-৭৯)

এখানে আল্লাহ বলেন, ইউসুফ আ.-এর ভাইয়েরা তাঁর সহোদর বিনয়ামিনকে নিয়ে মিসরে উপস্থিত হল। ইউসুফ আ. তাঁকে একান্তে নিয়ে জানান, তিনি তাঁর আপন সহোদর ভাই। সাথে সাথে তাঁকে তিনি এ কথা গোপন রাখতে বলেন এবং ভাইদের দুর্ব্যবহারের ব্যাপারে সান্ত্বনা দেন আর অন্য ভাইদের বাদ দিয়ে কেবল বিনয়ামিনকে কাছে রাখার জন্যে ইউসুফ আ. কৌশল অবলম্বন করেন। সুতরাং তিনি নিজের পানপাত্র বিনয়ামিনের মালপত্রের মধ্যে গোপনে রেখে দেওয়ার জন্যে ভৃত্যদেরকে আদেশ দেন। উক্ত পানপাত্রটি পানি পান এবং লোকজনকে তাদের খাদ্যদ্রব্য মেপে দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হত। এরপর তাদের মধ্যে ঘোষণা দেওয়া হয়, তারা বাদশার পানপাত্র চুরি করেছে। যে ব্যক্তি তা ফিরিয়ে দিবে, তার জন্যে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঘোষণাকারী তার জন্যে যিম্মাদার হল। কিন্তু তারা ঘোষণাকারীর দিকে তাকিয়ে আরোপিত দোষ প্রত্যাখ্যান করল।

তাওরাতে আছে, ইউসুফ আ. ভাইদের খুবই সমাদর ও খাতির যত্ন করলেন এবং ভৃত্যদের আদেশ করলেন, তাঁদেরকে রাজকীয় অতিথিশালায় স্থান করে দাও, এরপর তাঁদের জন্য আড়ম্বরপূর্ণ খাদ্যের আয়োজন করলেন। কয়েক দিন অবস্থানের পর যখন তাঁরা বিদায় গ্রহণ করছিলেন, তখন ইউসুফ আ. ভৃত্যদেরকে আদেশ করলেন– তাঁদের উটগুলি এ পরিমাণে বোঝাই করে দাও, যতটুকু ওগুলো বহন করে নিতে পারে। হযরত ইউসুফ আ.-এর ইচ্ছা ছিল, কোনো প্রকারে আপন প্রিয় ভ্রাতা বিনইয়ামিনকে নিজের

নিকট রেখে দেবেন। কিন্তু চরম আগ্রহ এবং অস্থিরতা সত্ত্বেও তাঁর পক্ষে এরূপ করা সম্ভব হচ্ছিল না। কেননা মিসরের বিধান অনুযায়ী কোনো বহিরাগতকে কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া আটক করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। হযরত ইউসুফ আ. কোনো প্রকারেই চাইতেন না, তখনই সাধারণ লোকদের নিকট কিংবা তাঁর ভাইদের নিকট মূল রহস্য প্রকাশ হয়ে পড়ুক। এ কারণে তিনি নীরব রইলেন। যখন কাফেলা যাত্রা করতে লাগল, তখন কাউকেও না জানিয়ে, চিহ্নস্বরূপ নিজের রৌপ্যের পেয়ালা বিনইয়ামিনের হাওদার মধ্যে রেখে দিলেন।

কেনানের এ কাফেলা মাত্র সামান্য পথই অতিক্রম করেছে। এমন সময় ইউসুফ আ.-এর কর্মচারীরা শাহী বাসন-পত্রের তত্ত্বানুসন্ধান করে দেখল, এতে একটি রৌপ্যের পেয়ালা নেই। মনে করল, রাজমহলে কেনানি কাফেলা ছাড়া অন্য কেউই আসে নি। সুতরাং তারাই এ চুরি করেছে। তৎক্ষণাৎ দৌড়াল এবং ডেকে বলল- হে কাফেলার লোকেরা, থাম! তোমরা চোর! ইউসুফ আ.-এর ভাইয়েরা কর্মচারীদের প্রতি মুখ করে বললেন, আমাদেরকে অযথা কেন দোষারোপ করছ? আমাদেরকে বল, তোমাদের কী বস্তু হারিয়েছে? কর্মচারীরা বলল, যে ব্যক্তি এ চুরির মালটির সন্ধান দেবে, সে পুরস্কারস্বরূপ এক উট বোঝাই খাদ্যশস্য প্রাপ্ত হবে এবং আমি এ প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য যিম্মাদার রইলাম।

ইউসুফ আ.-এর ভাইয়েরা বলল, আল্লাহ তাআলা মহাজ্ঞানী। তিনি জানেন, আমরা মিসরে ফাসাদ এবং দুষ্টামির উদ্দেশ্যে আসি নি। তোমরা জান, আমরা ইতোপূর্বেও খাদ্যশস্য নেওয়ার জন্য এসেছিলাম। আমাদের মধ্যে মোটেই চুরির অভ্যাস নেই। কর্মচারীরা বলল, আচ্ছা যার নিকট হতে এ চুরির মালটি পাওয়া যাবে, তার কি শাস্তি হওয়া উচিত? তারা জবাব দিল, সে নিজেই নিজের শাস্তি অর্থাৎ তাকে তোমাদের হাতে সোপর্দ করা হবে। যেন সে নিজের অপরাধের প্রতিফলস্বরূপ বন্দি হয়। আমরা আমাদের এ শ্রেণীর অপরাধীদেরকে এরূপ শাস্তিই দিয়ে থাকি।

কর্মচারীরা এটা শ্রবণ করে প্রথমে অন্যান্য ভাইদের বস্তাসমূহের অনুসন্ধান করল। সেগুলির মধ্যে পেয়ালাটি পাওয়া গেল না। তখন সর্বশেষে বিনইয়ামিনের বস্তার তল্লাশি করল। এতে পেয়ালাটি পাওয়া গেল। তারা পেয়ালাটি বের করে নিল এবং কাফেলাকে শহরের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে আযীযে মিসর হযরত ইউসুফ আ.-এর খেদমতে ব্যাপারটি পেশ করল। হযরত ইউসুফ আ. ঘটনাটি শ্রবণ করে মনে মনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন এবং আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করলেন। কারণ, যে জন্য তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন অর্থাৎ কোনো উপায়ে বিনইয়ামিন আমার নিকট থেকে যাক; তা তার দ্বারা কোনোক্রমেই হয়ে উঠে নি। কিন্তু সেই উদ্দেশ্য অসীম ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ তাআলা এ কৌশলে পূর্ণ করে দিলেন এই মনে করে সম্পূর্ণ নীরব রইলেন। প্রকাশ করলেন না, এ পেয়ালাটি আমিই নিজে বিনইয়ামিনের থলিতে নিজের স্মৃতি চিহ্নস্বরূপ রেখে দিয়েছিলাম। ওদিকে

বিনইয়ামিনও যেহেতু পূর্বেই নিজের বড় ভ্রাতা ইউসুফ আ. সম্বন্ধে জানতে পেরেছিলেন, তাই এ ঘটনাকে নিজের মনের মতো ঘটছে দেখে নীরব রইলেন।

ইউসুফ আ.-এর ভাইয়েরা যখন এটা দেখলেন, তখন তাদের হিংসাসুলভ ধমনী নেচে উঠল। তারা এই মিথ্যা কথা বলার দুঃসাহস করল, যদি বিনইয়ামিন এ চুরি করেই থাকে, তবে বিস্ময়ের ব্যাপার কিছু নয়। কেননা ইতোপূর্বে তার বড় ভাই ইউসুফও চুরি করেছিল। হযরত ইউসুফ আ. ভাইদেরকে তাঁর মুখের উপর মিথ্যা বলতে দেখেও কিছু বললেন না। ধৈর্যের সাথে নীরব রইলেন; রহস্য প্রকাশ করলেন না। মনে মনে বলতে লাগলেন, তোমাদের জন্য রয়েছে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট স্থান। কেননা তোমরা স্পষ্ট মিথ্যা দোষারোপ করছ। যা কিছু তোমরা বলছ, আল্লাহ তাআলা এর প্রকৃত তথ্য খুব অবগত আছেন। অথবা তাদেরকেই সম্বোধন করে অর্থাৎ তাদেরকে লজ্জিত করে বললেন : এইমাত্র তোমরা বলছিলে, আমরা চুরির কাছেও না। আর এখন নিজের অনুপস্থিত ভাইয়ের উপরও চুরির দোষারোপ করছ! এর অর্থ এই দাঁড়াল, চৌর্যবৃত্তি তোমাদের খানদানেরই পেশা। এ কেমন জঘন্য কাজ তোমরা অবলম্বন করেছ।

হযরত ইউসুফ আ.-এর ভাইয়েরা এরূপ মনোভাব দেখে খুব ভয় পেয়ে গেল এবং পিতার সাথে কৃত প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ হল। নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতে লাগল, কী উপায়ে বিনইয়ামিনকে উদ্ধার করা যায়? আমরা তো প্রথম কথায়ই হেরে গেলাম। শুধু একটি দিকই অবশিষ্ট আছে, বিনয় ও খোশামোদপূর্ণ আবেদন-নিবেদন করে আযীযে মিসরকে বিনইয়ামিনকে ছেড়ে দিতে উদ্বুদ্ধ করা। তাই বলতে লাগল, হে আযীযে মিসর! আমাদের পিতা অতিশয় বৃদ্ধ। তিনি বিনয়ামীনের বড় ভাইয়ের জন্য অত্যন্ত শোকাতুর। এ কারণেই বিনয়ামিনের জন্য বেশি আসক্ত এবং মাতোয়ারা। অতএব এই দুর্বল বৃদ্ধের প্রতি দয়া করুন এবং বিনয়ামিনের স্থলে আমাদের মধ্য হতে কাউকেও রেখে দিন এবং শাস্তি প্রদান করুন। আপনি প্রথম হতেই আমাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করে আসছেন। নিশ্চয় আপনি অনুগ্রহশীলদের অন্তর্ভুক্ত।

আযীযে মিসর হযরত ইউসুফ আ. বললেন, আল্লাহ পাকের আশ্রয়! এটা কেমন করে সম্ভব? আমি যদি এরূপ করি, তবে অনাচারী হয়ে যাব।

এরপর আল্লাহ পাক কুরআনে কারীমে বলেন :

فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (٨٠) ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ (٨١) وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (٨٢) قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ

جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (٨٣) وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ (٨٤) قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ (٨٥) قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٨٦) يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ (٨٧)

তারপর যখন তারা তার নিকট হতে সম্পূর্ণ নিরাশ হল, তখন তারা নির্জনে গিয়ে পরামর্শ করতে লাগল। তাদের মধ্যে যে বয়সে বড় ছিল, সে বলল, তোমরা কি জান না, তোমাদের পিতা তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহর নামে অঙ্গীকার নিয়েছেন এবং পূর্বেও তোমরা ইউসুফের ব্যাপারে ক্রটি করেছিলে। সুতরাং আমি কিছুতেই এ দেশ ত্যাগ করব না, যতক্ষণ না আমার পিতা আমাকে অনুমতি দেন অথবা আল্লাহ আমার জন্য কোনো ব্যবস্থা করেন এবং তিনিই বিচারকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 'তোমরা তোমাদের পিতার কাছে ফিরে যাও এবং বলবে, হে আমাদের পিতা! আপনার পুত্র চুরি করেছে এবং আমরা যা জানি তারই প্রত্যক্ষ বিবরণ দিলাম। অদৃশ্যের ব্যাপারে আমরা অবহিত ছিলাম না। যে জনপদে আমরা ছিলাম তার অধিবাসীদের জিজ্ঞাসা করুন এবং যে যাত্রীদলের সাথে আমরা এসেছি তাদেরও। আমরা অবশ্যই সত্য বলছি।

ইয়াকুব বলল, না, তোমাদের মন তোমাদের জন্যে একটি কাহিনী সাজিয়ে দিয়েছে। সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়; হয়তো আল্লাহ তাদেরকে এক সঙ্গে আমার কাছে এনে দেবেন। তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।' সে তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল, 'আফসোস ইউসুফ এর জন্যে।' শোকে তার চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গেল এবং সে ছিল অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিস্ট। তারা বলল, 'আল্লাহর শপথ! আপনি তো ইউসুফ এর কথা ভুলবেন না যতক্ষণ না আপনি মুমূর্ষ হবেন অথবা মৃত্যুবরণ করবেন।' সে বলল, 'আমি আমার অসহনীয় বেদনা, আমার দুঃখ শুধু আল্লাহর কাছে নিবেদন করছি এবং আমি আল্লাহর কাছ থেকে জানি যা তোমরা জান না। 'হে আমার পুত্রগণ! তোমরা যাও, ইউসুফ ও তার সহোদরের অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহর রহমত থেকে তোমরা নিরাশ হয়ো না। কারণ আল্লাহর রহমত থেকে কেউই নিরাশ হয় না, কাফিরগণ ব্যতীত।

(সূরা ইউসুফ : ৮০-৮৭)

মোটকথা, যখন তারা এদিক হতে নিরাশ হয়ে পড়ল, তখন পৃথক স্থানে নির্জনে বসে পরামর্শ করতে লাগল। তাদের মধ্যে বয়সে বড়জন বলল- তোমরা জান, পিতা বিনয়ামিন সম্বন্ধে আমাদের থেকে কেমন কঠিন ও পাকা প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন আর ইতোপূর্বে তোমরা ইউসুফের উপর যেই জুলুম করেছ, তা-ও জানা রয়েছে। সুতরাং আমি তো এস্থান হতে তখন পর্যন্ত নড়ব না, যে পর্যন্ত না পিতা আমাকে কেনানে

যাওয়ার অনুমতি প্রদান করবেন অথবা আল্লাহ তাআলা আমার জন্য কোনো উপায় বের করে দেবেন। যাও! তোমরা সকলে মিলে তাঁর নিকট চলে যাও এবং আবেদন কর, আপনার পুত্র বিনইয়ামিন চুরি করেছে। আমরা যা জানতে পেরেছি, তা-ই সত্য সত্য আপনার সম্মুখে বলে দিলাম। আমাদের তো কোনো গায়েবি এলম ছিল না, আমরা পূর্বেই জানতে পারব, তার দ্বারা এমন জঘন্য কাজ হবে। আর এটাও বলো, আপনি মিসরের লোক দ্বারা এ কথার সত্যতা যাচাই করে নিন। এতদ্ভিন্ন ওই কাফেলার নিকট জেনে নিন, যাদের সাথে আমরা মিসর হতে এখানে এসেছি। তা হলেই বুঝতে পারবেন, আমরা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ সত্য বলছি।

এ পরামর্শ অনুযায়ী তারা কেনান ফিরে আসল এবং হযরত ইয়াকুব আ.-কে কিছুমাত্র বেশকম না করে সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করে শুনালো। হযরত ইউসুফ আ.-এর বৈমাত্রেয় ভ্রাতাগণ যে কথোপকথন আপন পিতার সাথে এ প্রসঙ্গে করছে, তা কুরআন মজীদে নিম্নরূপে ব্যক্ত হয়েছে :

فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ

"অনন্তর তারা [তাদের পিতার কাছে গিয়ে] বলল, পিতা! আপনার পুত্র (বিনইয়ামিন) চুরি করেছে।" (সূরা ইউসুফ : ৮১)

এ উক্তিটি উল্লেখ করে কুরআন পাক বলতে চায়, ইউসুফের বৈমাত্রিয় ভাইদের নির্মমতার মাত্রা অনুমান করুন! তারা এমন করুণ সময়েও বৃদ্ধ পিতাকে তিরস্কার, নিন্দাবাদ ও গালি না দিয়ে ছাড়ল না। বলল না, আমাদের ছোট ভাইটি দ্বারা এ ত্রুটি হয়ে গেছে। বরং তাঁরই দিকে সম্বন্ধ আরোপ করে বলল, আপনার পুত্র! হ্যাঁ, আপনার একান্ত প্রিয় আদরের পুত্র চুরি করে আমদের সকলকে অপমানিত করেছে। আমরা কি জানতাম, তার মধ্যে এ দোষটিও বিদ্যমান রয়েছে? হযরত ইয়াকুব আ. ইউসুফ আ.-এর ব্যাপারে আগেই তাদের সত্যতার অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। কাজেই তাদের কথা শুনে বললেন : না, তোমরা নিজেদের মন হতে একটি কথা গড়ে নিয়েছ। ঘটনা কখনো এরূপ নয়। বিনইয়ামিন এবং চুরি –এটা কখনো সম্ভব নয়। আচ্ছা! এখন ধৈর্য ছাড়া কোনো গতি নেই। এমন সবর যা উত্তম হতেও উত্তম। আল্লাহ তাআলার পক্ষে বিচিত্র কি ছিল, তিনি একদিন এ হারানো পুত্রদেরকে পুনরায় একত্র করে দেবেন এবং একই সঙ্গে আমার সাথে দুই পুত্রকেই মিলিয়ে দেবেন। নিঃসন্দেহে তিনি মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। এই বলে তাদের দিক হতে নিজের মুখ ফিরিয়ে নিলেন। বলতে লাগলেন, হায়! ইউসুফের বিচ্ছেদজনিত শোক।

হযরত ইয়াকুব আ.-এর চক্ষুদ্বয় শোকাধিক্যে ক্রন্দন করতে করতে সাদা হয়ে গিয়েছিল। শোকবহ্নির দহনে অন্তর জ্বলে পুড়ে ছাই হচ্ছিল। কিন্তু ধৈর্যের সঙ্গে আল্লাহর উপর ভরসা করে বসেছিলেন। পুত্রগণ এ অবস্থা দেখে বলতে লাগল, আল্লাহর কসম! আপনি ইউসুফের শোকে সর্বদা এরূপে বিচলিত হতে থাকবেন কিংবা এ শোকে শেষ

পর্যন্ত জীবনই বিসর্জন দেবেন। হযরত ইয়াকুব আ. তা শুনে বললেন : আমি তো তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করছি না; তোমাদেরকে বিরক্তও করছি না। বরং আমি তো আমার প্রয়োজন এবং মনোকষ্ট আল্লাহ পাকেরই দরবারে নিবেদন করছি। আমি আল্লাহ পাকের তরফ হতে এমন কথা অবগত আছি, যা তোমরা জান না।

মোটকথা, হযরত ইয়াকুব আ. তাঁর পুত্রদের বললেন : তোমরা পুনরায় একবার মিসরে গমন কর এবং ইউসুফ ও তার ভাই বিনইয়ামিনের অনুসন্ধান কর। আল্লাহ তাআলার রহমত হতে নিরাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিও না। কেননা আল্লাহ তাআলার রহমত হতে নিরাশ হওয়া কাফেরের স্বভাব।

এরপর কুরআনে কারীমে ইরশাদ হচ্ছে :

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ (٨٨) قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ (٨٩) قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (٩٠) قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ (٩١) قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (٩٢) اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ

যখন তারা তার কাছে উপস্থিত হল, তখন বলল : 'হে আযীয! আমরা ও আমাদের পরিবার-পরিজন বিপন্ন হয়ে পড়েছি এবং আমরা তুচ্ছ পণ্য নিয়ে এসেছি। আপনি আমাদের রসদ পূর্ণমাত্রায় দিন এবং আমাদের দান করুন; আল্লাহ দাতাগণকে পুরস্কৃত করে থাকেন। সে বলল : তোমরা কি জান, তোমরা ইউসুফ ও তার সহোদরের প্রতি কিরূপ আচরণ করেছিলে? যখন তোমরা ছিলে অজ্ঞ? ওরা বলল, তবে কি তুমিই ইউসুফ? সে বলল, আমিই ইউসুফ এবং এ আমার সহোদর; আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। যে ব্যক্তি মুত্তাকী এবং ধৈর্যশীল, আল্লাহ সেরূপ সৎকর্ম পরায়নদের শ্রমফল নষ্ট করেন না। ওরা বলল, আল্লাহর শপথ! আল্লাহ নিশ্চয় তোমাকে আমাদের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং আমরা নিশ্চয়ই অপরাধী ছিলাম। সে বলল, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন এবং তিনি দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু। তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও এবং এটি আমার পিতার মুখমণ্ডলের ওপর রাখবে। তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। আর তোমাদের পরিবারবর্গের সবাইকে আমার কাছে নিয়ে আসবে।" (সূরা ইউসুফ : ৮৮-৯৩)

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ (٩٤) قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ (٩٥) فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي

أَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٩٦) قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ (٩٧) قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

তারপর যাত্রীদল যখন বের হয়ে পড়ল, তখন তাদের পিতা বলল : 'তোমরা যদি আমাকে অপ্রকৃতিস্থ মনে না কর, তবে বলি– আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি। তারা বলল, আল্লাহর শপথ! আপনি তো আপনার পূর্ব বিভ্রান্তিতেই রয়েছেন। তারপর যখন সুসংবাদবাহক উপস্থিত হল এবং তার মুখমণ্ডলের ওপর জামাটি রাখল, তখন সে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল। সে বলল : আমি কি তোমাদের বলি নি, আমি আল্লাহর কাছ থেকে জানি, যা তোমরা জান না? ওরা বলল, 'হে আমাদের পিতা! আমাদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আমরা তো অপরাধী। সে বলল, 'আমি আমার প্রতিপালকের কাছে তোমাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করব। তিনি তো অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(সূরা ইউসুফ : ৯৪-৯৮)

হযরত ইয়াকুব আ. এখানে বিনইয়ামিনের সাথে ইউসুফের নামও উল্লেখ করলেন, অথচ বাহ্যত এ স্থলের সাথে হযরত ইউসুফ আ.-এর অনুসন্ধানের কোনো সম্পর্কই নেই। কেননা দীর্ঘকাল হতে তাঁর কোনো সন্ধান নেই। হযরত ইয়াকুব আ.-কে জানানো হয়েছিল, ইউসুফ আ.-কে বাঘে খেয়েছে। কাজেই এখানে বিনইয়ামিনের সাথে ইউসুফের নাম উল্লেখ করার কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না। অতএব বোধ হয় আল্লাহ তাআলা এখন হযরত ইয়াকুব আ.-এর শোক ও দুঃখময় জীবনের অবসান ঘটাতে ইচ্ছা করেছেন এবং হযরত ইয়াকুব আ.-কে এরূপ ইঙ্গিত করে দিয়েছেন, বিনইয়ামিনের এ ঘটনায় ইউসুফ আ.-এর সাক্ষাৎ লাভের রহস্যও নিহিত রয়েছে এবং সে কারণেই তো হযরত ইউসুফ আ.-এর সুসংবাদের পয়গাম আসার সঙ্গে সঙ্গে হযরত ইয়াকুব আ. বলেছেন :

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"আমি কি বলেছিলাম না, আমি আল্লাহ তাআলার তরফ হতে এমন সবকিছু অবগত হয়ে থাকি, যা তোমরা জান না।" (সূরা ইউসুফ : ৯৬)

যা হোক, ইউসুফ আ.-এর ভাইয়েরা কিছুটা পিতার পীড়াপীড়ি এবং কিছুটা বাস্তবিকই দুর্ভিক্ষের চরম ভয়াবহতা এবং আশেপাশে শস্যের নাম গন্ধ পর্যন্ত ছিল না বলে তৃতীয়বার মিসর সফরে যাত্রা করল এবং শাহি দরবারে পৌঁছে বলতে লাগল, হে আযীয! আমাদেরকে এবং আমাদের পরিবারবর্গকে দুর্ভিক্ষ চরম দুরবস্থায় পতিত করেছে। এবার আমরা মূল্যও খুব সামান্যই এনেছি। এটুকুই গ্রহণ করুন। এখন ক্রয়-বিক্রয় এবং লেনদেনের ব্যাপার নয়। আমাদের দ্বারা মূল্য পরিশোধ হওয়া সম্ভব নয়। কাজেই আপনার খেদমতে আমাদের আবেদন অনুগ্রহপূর্বক খাদ্য-শস্য পূর্ণ মাত্রায় ওজন করে দিন এবং আমাদেরকে অভাবী মনে করে নিজের তরফ হতে দয়া করুন। আল্লাহ পাক দানশীলদের উত্তম বিনিময় দান করেন।

হযরত ইউসুফ আ. যখন পিতামাতা ও ভাইদের এ দুরবস্থার কথা শুনলেন এবং তাদের বিনীত আবেদন ও অভাবমূলক প্রার্থনার বাধ্যকারী অবস্থা চিন্তা করলেন, তখন তাঁর অন্তর দয়ায় বিগলিত হয়ে গেল। এবার আর সহ্য করতে পারলেন না, নিজেকে গোপন রাখবেন এবং রহস্য প্রকাশ করবেন না। অবশেষে বলতে লাগলেন :

قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ

"কেন ভাইয়েরা! তোমরা কি জান, তোমরা ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছ, যখন তোমরা মূর্খতায় মদমত্ত ছিলে।" (সূরা ইউসুফ : ৮৯)

ভাইয়েরা এ স্থলে অপ্রত্যাশিত কথাবার্তা শ্রবণ করে চমকে উঠল। কথার ধরনের উপর গভীরভাবে লক্ষ করে হঠাৎ তাদের কিছু খেয়াল হল এবং বলে উঠল, قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ "বাস্তবেই কি আপনি ইউসুফ?"

বস্তুত তারা এবার অস্থিরতা ও পেরেশানীর মধ্যে পড়ে গেল, "আমরা তো আযীযে মিসরের দরবারে দণ্ডায়মান, তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলছি। এখানে অপ্রাসঙ্গিকরূপে ইউসুফের আলোচনা কেন? আকার-আকৃতি ও কথা বলার ভঙ্গিকে এখন তারা অন্য উদ্দেশ্যে চিন্তা করে দেখল, তখন ইউসুফেরই আকৃতি চোখের সম্মুখে ভেসে উঠল। বুঝতে পারল, নিঃসন্দেহে তিনি ইউসুফ! কিন্তু বর্তমান অবস্থার প্রতি লক্ষ করে স্বভাবতই বলতে সাহস পেল না, আপনি ইউসুফ। বরং এরূপ ক্ষেত্রেরই উপযোগী স্বর ও সুরে বলে উঠল, আপনি কি বাস্তবিকই ইউসুফ!

হযরত ইউসুফ আ. বললেন :

أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ
فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

"হ্যাঁ, আমি ইউসুফ এবং এই বিনইয়ামিন আমার সহোদর ভাই। আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আর যে মন্দ কাজ হতে নিজেকে রক্ষা করে এবং (মুছীবতে) ছবর করে, তা হলে আল্লাহ তাআলা নেককার লোকদের কর্মফল নষ্ট করেন না।" (সূরা ইউসুফ : ৯০)

এখন হযরত ইউসুফ আ.-এর ভাইয়েরা ইউসুফ আ.-এর নিকট অনুতপ্ত, লজ্জিত ও অপদস্থ হওয়া এবং দোষ-ত্রুটি স্বীকার করা ছাড়া আর কি করতে পারে! তৎসঙ্গেই হযরত ইউসুফ আ.-কে ধ্বংস করার জন্য নিজেদের সমস্ত অপচেষ্টার ছবি চোখের সম্মুখে ভেসে উঠল। আর যখন এই সত্যটি তারা পরিষ্কার বুঝতে পারল –যাকে কাল কেনানের কূপের মধ্যে ফেলে এসেছিল, তিনি আজ আযীযে মিসর বরং মিসরের রাজমুকুট ও সিংহাসনের মালিক– তখন মস্তক অবনত করে বলে উঠল :

قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ

"(তারা বলল,) আল্লাহর কসম! এতে কোনো সন্দেহ নেই, আল্লাহ আপনাকে আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। আর নিঃসন্দেহ আমরা আপাদমস্তক দোষীই ছিলাম।" (সূরা ইউসুফ : ৯১)

হযরত ইউসুফ আ. নিজের বৈমাত্রেয় ভাইদের এই দুরবস্থা ও লজ্জা দেখে তাঁর উন্নত চরিত্র, পয়গম্বরসুলভ রহমত ও দয়া জেগে উঠল। তিনি ক্ষমা, ধৈর্য ও দয়ার সাথে তৎক্ষণাৎ বললেন :

لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

"আজ আমার তরফ হতে আপনাদের প্রতি কোনো তিরস্কার নেই। আল্লাহ তাআলা আপনাদের ত্রুটি ক্ষমা করুন। আর তিনিই সমস্ত অনুগ্রহকারীদের চেয়ে অধিক অনুগ্রহকারী।" (সূরা ইউসুফ : ৯২)

অর্থাৎ যা কিছু হওয়ার ছিল, তা হয়ে গেছে। এখন আমাদের সকলেরই এ ঘটনা ভুলে যাওয়া উচিত। আল্লাহ পাকের দরবারে দুআ করছি, তিনি যেন আপনাদের এ ভুল ক্ষমা করে দেন। কেননা তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহশীল ও দয়ালু। এখন আপনারা কেনানে ফিরে যান এবং আমার এ জামাটি নিয়ে যান! এটা আমার পিতার চোখের উপর রাখুন! ইনশাআল্লাহ! ইউসুফের গন্ধ তাঁর চক্ষুদ্বয়কে দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন করে দিবে। এরপর সমস্ত পরিবারবর্গকে মিসরে নিয়ে আসুন।

ইউসুফ আ.-এর ভাইদের জন্যও এর চেয়ে অধিক সৌভাগ্য আর কি হতে পারে? ইউসুফ আ.-কে কেনানের কূপে নিক্ষেপ করে ইয়াকুব আ.-এর নিকট রক্ত মাখা জামা নিয়ে এসেছিল এবং মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার দ্বারা তাঁর অন্তর ও কলিজাকে আহত করেছিল। আজও তাদেরকে ইউসুফের জামা নিয়ে যেতে হবে, যাতে সেই যখমের শান্তি হয় এবং সেই শোক-দুঃখ আজ আনন্দ ও খুশিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

এখানে এ সমস্ত আলোচনা সমাপ্ত হয়ে ইউসুফ আ.-এর ভাইদের কাফেলা ইউসুফ আ.-এর জামা নিয়ে কেনআনের দিকে যাত্রা করলেন। ওদিকে আল্লাহ তাআলার মনোনীত পয়গম্বর হযরত ইয়াকুব আ.-কে আল্লাহ তাআলা অহির মাধ্যমে ইউসুফ আ.-এর গন্ধ শুঁকিয়ে দিল। তিনি বললেন, হে ইয়াকুবের খান্দান! তোমরা যদি না বল, বৃদ্ধকালে আমার জ্ঞান লোপ পেয়েছে, তবে আমি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলছি– আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি। তারা সকলে বলতে লাগল, আল্লাহর কসম! আপনি আপনার সেই পুরাতন বিভ্রান্তির মধ্যেই পতিত রয়েছেন। অর্থাৎ এত দীর্ঘকাল অতীত হওয়ার পর যখন ইউসুফের নামচিহ্ন পর্যন্ত মুছে গেছে। আপনি সেই ইউসুফের কথাই বলছেন।

কেনানগামী কাফেলা পূর্ণ মঙ্গল ও নিরাপত্তার সাথে কেনানে পৌঁছল। ইউসুফ আ.-এর নির্দেশানুযায়ী তাঁর জামা ইয়াকুব আ.-এর চক্ষুদ্বয়ের উপর রাখতেই তৎক্ষণাৎ ইয়াকুব আ. দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন। বলে উঠলেন, দেখ! আমি বলছিলাম না, আমি

আল্লাহ পাকের তরফ হতে এমন বিষয় জানতে পারি, যা তোমরা জান না। কুরআন মাজিদ তা-ই বলছে :

فَلَمَّآ أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَىٰهُ عَلَىٰ وَجْهِهِۦ فَٱرْتَدَّ بَصِيرًا ۖ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّىٓ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"এরপর যখন সুসংবাদদাতা (কেনানের কাফেলা নিরাপদে) এসে পৌছল, তখন সে ইউসুফ আ.-এর জামাটি হযরত ইয়াকুব আ.-এর চক্ষুদ্বয়ের উপর রাখামাত্রই তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন। ইয়াকুব আ. বললেন : আমি কি তোমাদের বলি নি, আমি আল্লাহ তাআলার তরফ হতে সে কথা জানতে পারি, যা তোমরা জান না"?

(সূরা ইউসুফ : ৯৬)

ইউসুফ আ.-এর ভাইদের জন্য এ সময়টা ছিল বড় কঠিন। অনুতাপ ও লজ্জায় নিমগ্ন মস্তক অবনত করে তারা বলল, পিতা! আল্লাহ তাআলার দরবারে আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করার জন্য দুআ করুন। কেননা এখন তো প্রকাশ হয়েই পড়ল, আমরা ভীষণ অপরাধী ও দোষী। হযরত ইয়াকুব আ. বললেন :

سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّىٓ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ

"শিগগিরই আমি আমার পালনকর্তার দরবারে তোমাদের মাগফেরাতের জন্য দুআ করব। নিঃসন্দেহে তিনি বড়ই ক্ষমাশীল, দয়ালু।" (সূরা ইউসুফ : ৯৮)

টিকা : তাফসিরকারকগণ বলেন, ইউসুফ আ.-এর ভাইয়েরা মিসরে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে ইউসুফ আ.-এর নিকটও মাগফেরাতের দুআ চাচ্ছিলেন এবং কেনানে এসে হযরত ইয়াকুব আ.-এর নিকটও সেই আবেদনই করলেন। কিন্তু হযরত ইউসুফ আ. তো তখনই তাদের আবেদন মঞ্জুর করে বললেন : يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ "আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন!" কিন্তু ইয়াকুব আ.-এরূপ না করে বললেন : سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ "শীঘ্রই আমি তোমাদের মাগফেরাতের জন্য আমার প্রতিপালকের দরবারে দুআ করব।" তিনি শুধু দুআ করবেন বলে আশা প্রদান করলেন। এই পার্থক্যের কারণ কী? তাফসিরকারকগণ এ প্রশ্নের দুটি উত্তর প্রদান করেছেন।

(১) ইউসুফ আ.-এর ভাইদের সমস্ত অপরাধের ব্যাপারে সরাসরি হযরত ইউসুফ আ. সংশ্লিষ্ট ছিলেন। আর হযরত ইয়াকুবের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল তাঁর মাধ্যমে। অতএব হযরত ইউসুফ আ. নিজের সদয় স্বভাববশত তৎক্ষণাৎ তাঁদের সান্ত্বনা প্রদান করলেন। কিন্তু ইয়াকুব আ. মনে করলেন, যে ব্যাপারটির সম্পর্ক ইউসুফের সাথে, তাতে তার মতামতও জেনে নেওয়া উচিত। কাজেই এরূপ জবাব দিলেন, যেন কথাটা আশা এবং সম্ভাবনা পর্যন্ত থাকে। সঙ্গে সঙ্গে আবার নিজের মনের ঝোঁকও প্রকাশ করে দিলেন, আমার ইচ্ছা আল্লাহ তাআলা তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দিন।

(২) হযরত ইউসুফ আ. যুবক ছিলেন। তাঁর দয়াগুণে দৃঢ়তা ও সতর্কতার দিকটি প্রবল ছিল না। কাজেই তিনি দয়ার্দ্র হয়ে তৎক্ষণাৎ ক্ষমা করে দিলেন। কিন্তু হযরত ইয়াকুব আ. ছিলেন অভিজ্ঞ ও সাবধানতা অবলম্বনকারী। তদুপরি সকলের পিতা। সুতরাং তিনি পুত্রদের ভালোরূপে পরীক্ষা করে দেখতে ইচ্ছা করলেন– দেখা যাক, এদের এ অনুতাপ ও লজ্জা প্রকাশ সাময়িক কি-না? এটা শুধু বর্তমানের অবস্থাকে আয়ত্তে আনার চেষ্টা না কি সত্যিই তাদের মনে প্রকৃত অনুতাপ ও লজ্জা ভাবের উৎপত্তি হয়েছে এবং তারা বাস্তবিকই নিজেদের অপরাদের জন্য সততার সাথে অনুতপ্ত হয়েছে? সুতরাং তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে নিরাশও করলেন না, আবার মনের ঝোঁক প্রকাশ করে শুধু আশা ও সম্ভাবনা পর্যন্ত ব্যাপারটি শেষ করে দিলেন।

ইয়াকুব আ.-এর খান্দান মিসরে

অবশেষে হযরত ইয়াকুব আ. নিজের খান্দানের লোকদেরকে নিয়ে মিসর যাত্রা করলেন। তাওরাতে এ ঘটনাটির বিস্তৃত বিবরণ এভাবে প্রকাশ করা হয়েছে : "আর এ আলোচনাই ফেরাউনের গৃহে শোনা গেল, ইউসুফের ভাই এসেছে এবং এতে ফেরাউন ও তাঁর আমলাগণ খুবই সন্তুষ্ট হল। আর ফেরাউন ইউসুফকে বললেন, তোমার ভাইদেরকে বল– "তোমরা এক কাজ কর, নিজেদের বাহন পশুগুলিকে বোঝাই কর এবং দেশে গিয়ে নিজেদের পিতামাতা ও পরিবারবর্গকে নিয়ে আমার নিকট চলে এসো! আমি তোমদেরকে মিসরের ভালো ভালো বস্তু প্রদান করব। তোমরা এ দেশের হাদিয়া তোহফাসমূহ খাবে। এখন তুমি আদেশপ্রাপ্ত হয়েছ। অতএব তাদের বলো, তোমরা তোমাদের পিতামাতা ও নিজেদের স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে আসো। নিজেদের মালপত্রের জন্য কোনো প্রকার আফসোস করো না। মিসরে আনন্দ তোমাদের কারণেই। ইসরাঈল নিজ পরিবারের সবাইকে মিসরে এলেন। তিনি নিজের পুত্র ও পৌত্রদেরকে, যারা তার সাথে ছিলেন এবং নিজ কন্যাদেরকে, কন্যার কন্যাদেরকে ও সমস্ত বংশধরগণকে নিজের সঙ্গে নিয়ে মিসরে আসলেন। অতএব ইয়াকুবের পরিবারে যারা ছিল, তারা সকলেই মিসরে চলে এলেন। তারা সংখ্যায় ছিলেন সত্তর জন। (তাওরাত)

হযরত ইউসুফ আ. যখন জানতে পারলেন, তাঁর পিতা খান্দানের সকলকে নিয়ে শহরের নিকটে এসে পৌঁছেছেন, তখন তিনি তৎক্ষণাৎ অভ্যর্থনার জন্য বের হলেন। হযরত ইয়াকুব আ. যখন দীর্ঘকাল যাবৎ বিচ্ছিন্ন কলিজার টুকরাকে দর্শন করলেন, তখন তাঁকে টেনে নিয়ে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলেন। যখন এ আনন্দঘন সাক্ষাৎ হল, তখন হযরত ইউসুফ আ. বুযুর্গ পিতার খেদমতে আরয করলেন : এখন আপনি সম্মান, মর্যাদা, নিরাপত্তা এবং হেফাযতের সাথে শহরের দিকে তাশরিফ নিয়ে চলুন। তৎকালে মিসরের রাজধানী ছিল রামাসিস। একে বলা হতো 'উৎসবের শহর'। হযরত ইউসুফ আ. বুযুর্গ পিতাকে এবং খান্দানের সমস্ত লোককে অত্যন্ত সাড়ম্বরে শাহি সওয়ারীর উপর বসিয়ে মহা সমারোহে শহরে এনে রাজপ্রাসাদে নামালেন।

এ সমস্ত কাজ শেষ করে তিনি 'আম-দরবারের' অনুষ্ঠান করতে ইচ্ছা করলেন, যেন তাঁর বুযুর্গ পিতা ও খান্দানের সাথে সমগ্র মিসরবাসীর পরিচয় হয়ে যায় এবং দরবারের আমীর-ওমারাগণও তাঁদের মান মর্যাদা সম্বন্ধে অবহিত হয়ে যান। দরবার বসল। সমস্ত রাজকর্মচারীরা নিজ নিজ নির্দিষ্ট আসনে বসে গেলেন। হযরত ইউসুফের আদেশে তাঁর পিতা-মাতাকে রাজসিংহাসনেই স্থান দেওয়া হল এবং খান্দানের অন্যান্য লোকেরা নিজ নিজ মর্যাদানুযায়ী নিচে বসলেন। এ সমস্ত যখন পূর্ণ হয়ে গেল, তখন হযরত ইউসুফ আ. রাজমহল হতে বের হয়ে রাজসিংহাসন অলংকৃত করলেন। তৎক্ষণাৎ সমস্ত দরবারীগণ রাজ্যের প্রথানুযায়ী সিংহাসনের সম্মুখে সম্মান প্রদর্শনসূচক সিজদা করলেন। উপস্থিত অবস্থা দেখে ইউসুফ আ.-এর খান্দানের সকল লোকও অনুরূপভাবে সেজদা করলেন। এটা দেখে ইউসুফ আ.-এর শৈশবকালের স্বপ্নটির কথা স্মরণ হল এবং নিজের পিতাকে সম্বোধন করে বললেন :

وَقَالَ يَا أَبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

"পিতা! এটা হল সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা, যা দীর্ঘকাল পূর্বে আমি দেখেছিলাম। আমার প্রতিপালক একে বাস্তবায়িত করে দেখালেন। এটা তাঁরই অনুগ্রহ! তিনি আমাকে জেলখানা হতে বের করেছেন। আপনাদের মরুপ্রান্তর হতে আমার নিকট এনে পৌঁছিয়েছেন। এ সবকিছুই হয়েছে তার পরে, যখন শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মাঝখানে অনৈক্য সৃষ্টি করে দিয়েছিল। নিঃসন্দেহ আমার পালনকর্তার সে সমস্ত কাজের জন্য, যা তিনি করতে ইচ্ছা করেন উত্তম ব্যবস্থাপক। কেননা তিনি সবকিছুই অবগত আছেন। (এবং নিজের সমুদয় কাজে) মহা প্রজ্ঞাময়।" (সূরা ইউসুফ : ১০০)

হযরত ইউসুফ আ. যখন তাঁর জীবনের ঘটনাগুলোকে বিস্ময়কর ও অভিনবরূপ ঘটে আসতে দেখলেন, এবং প্রতি পদক্ষেপে আল্লাহ তাআলার মহিমা ও প্রজ্ঞার অতুলনীয় বহিঃপ্রকাশ হতে লাগল, তখন এ সব কিছুর শুরু ও সুন্দর সমাপ্তি দেখে আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করলেন—

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ

"হে পালনকর্তা! আপনি আমাকে রাজ্য দান করেছেন। আর কথাসমূহের (স্বপ্নের) অর্থ ও ফল বের করাও শিখিয়েছেন। হে আসমান ও জমিনসমূহের সৃষ্টিকর্তা! আপনি আমার কার্যনির্বাহক, দুনিয়াতেও এবং আখেরাতেও। অতএব আমি যখন দুনিয়া হতে [বিদায় নিয়ে] যাব, তখন যেন আপনার ফরমাবরদার অবস্থায় যেতে পারি এবং যেন সেই সমস্ত লোকের অন্তর্ভুক্ত হই, যারা আপনার নেক বান্দা।" (সূরা ইউসুফ : ১০১)

তাওরাতে বর্ণিত আছে, এ ঘটনার পর হযরত ইউসুফ আ.-এর খান্দানের সমস্ত লোকই মিসরে বসবাস করতে থাকেন। কেননা ফেরাউন হযরত ইউসুফ আ.-কে খুব অনুরোধ করে বললেন, "আপনি আপনার খান্দানকে মিসরেই বসবাস করার ব্যবস্থা করে দিন, আমি তাদেরকে খুব উত্তম জমিন দান করব এবং তাদের সর্বপ্রকার সম্মান করব।"

এ দেখে হযরত ইউসুফ আ. আপন বুযুর্গ পিতা এবং খান্দানের অন্যান্য সকলকে বুঝিয়ে দিলেন, ফেরাউন যখন আপনাদেরকে মিসরে বসবাস করার জন্য অনুরোধ করবেন এবং জমিন ও স্থান নির্বাচন করার জন্য বলবেন, তখন আপনারা অমুক অংশের জমি চাইবেন এবং বলবেন, যেহেতু আমরা যাযাবর জীবন যাপনে অভ্যস্ত এবং গৃহপালিত পশু চরাতে আগ্রহী, তাই সাধারণ শহুরে জীবন হতে পৃথক থাকাই আমাদের পছন্দনীয়।

আর যখন ফেরাউন তোমাদের ডাকবে এবং জিজ্ঞাসা করবে তোমাদের পেশা কি? তখন তোমরা বলো, আপনার গোলামেরা যৌবন হতে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত চতুষ্পদ জন্তু প্রতিপালন ও পশু চরিয়ে আসছে। আমাদের পূর্বপুরুষেরাও তা-ই করতেন। ফেরাউন বলল, তোমরা আনন্দময় জমিনে থাকবে। কেননা মিসরবাসীরা সর্বপ্রকার চতুষ্পদ জন্তুকে ঘৃণা করে।

হযরত ইউসুফ আ.-এর উদ্দেশ্য ছিল, এরূপে মিসরবাসীগণ হতে পৃথক থাকলে বনি ইসরাঈল নিজেদের ধর্মীয় জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, মূর্তিপূজক মিসরবাসীদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করবে। মিসরের অসৎ চরিত্র এবং নিম্নমানের শহুরী অভ্যাস ও স্বভাব হতে সুরক্ষিত থাকতে পারবে। সুতরাং নিজেদের সাহসিকতাপূর্ণ যাযাবর জীবনকে কখনো ভুলবে না।

অনন্তর ফেরাউন হযরত ইউসুফ আ.-কে বললেন, "আপনার ভাইদেরকে বলুন! তোমরা এক কাজ কর, তোমাদের বাহন জন্তু বোঝাই করে নাও এবং কেনান দেশে যেয়ে পৌঁছ। এরপর নিজেদের পিতাকে এবং পরিজনের সকলকে নিয়ে আমার নিকট এসো। আমি তোমাদেরকে মিসর দেশের ভালো ভালো জিনিস প্রদান করব। তোমরা জমিনের উৎপন্ন শস্য ভোগ করবে। এখন আপনাকে আদেশ দেওয়া হল, আপনি তাদের বলুন! তোমরা তোমাদের পিতামাতা ও নিজেদের স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে আসো। নিজেদের মাল-পত্রের জন্য কোনো চিন্তা করো না। কেননা আজ মিসরের সমস্ত খুশি তোমাদেরই জন্য।" অবশেষে ইসরাঈলের সন্তানগণ তা-ই করলেন।

আর যখন ফেরাউন তোমাদেরকে ডাকবে এবং জিজ্ঞাসা করবে তোমাদের পেশা কি? তখন তোমরা বলো, আপনার গোলামেরা যৌবন হতে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত চতুষ্পদ জন্তু প্রতিপালন ও পশু চরিয়ে আসছে। আমাদের পূর্বপুরুষেরাও তা-ই করতেন। ফেরাউন বলল, তোমরা আনন্দময় জমিনে থাকবে। কেননা মিসরবাসীরা সর্বপ্রকার চতুষ্পদ জন্তুকে ঘৃণা করে।

হযরত ইউসুফ আ.-এর উদ্দেশ্য ছিল, এরূপে মিসরবাসীগণ হতে পৃথক থাকলে বনী ইসরাঈল নিজেদের ধর্মীয় জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, মূর্তিপূজক মিসরবাসীদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করবে, মিসরের অসৎ চরিত্র এবং নিম্নমানের শহরী অভ্যাস ও স্বভাব হতে সুরক্ষিত থাকতে পারবে। সুতরাং নিজেদের সাহসিকতাপূর্ণ যাযাবর জীবনকে কখনও ভুলবে না।

গুরুত্বপূর্ণ চারিত্রিক বিষয়সমূহ

হযরত ইউসুফ আ.-এর এ বিস্ময়কর ও অভিনব ঘটনাবলীর মধ্যে ধী-সম্পন্ন লোকদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কতগুলো চারিত্রিক বিষয় নিহিত আছে। আসলে এটি শুধু একটি জীবনীই নয়; ফযিলত ও আখলাকের এমন একটি আশ্চর্য সুন্দর আখ্যান, যার প্রতিটা দিক নসিহত ও জ্ঞানের মণি-মুক্তায় কানায় কানায় পূর্ণ।

ঈমানী শক্তি, ধৈর্য, আত্মসংযম, সবর, শোকর, পবিত্রতা, দীনদারী, বিশ্বস্ততা, ক্ষমা, তাবলীগের অনুপ্রেরণা, আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার আকুলতা, আত্মসংশোধন ও খোদাভীতির মতো উচ্চপর্যায়ের আখলাক ও মহৎ গুণাবলীর এক দুর্লভ স্বর্ণশৃঙ্খল। যা হযরত ইউসুফ আ. সমূহ ঘটনার পরতে পরতে দেখা যায়। তন্মধ্য হতে নিম্নবর্ণিত কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১. যদি কোনো ব্যক্তির নিজস্ব প্রকৃতি ও স্বভাব উত্তম হয় এবং তার পরিবেশও পবিত্র নিষ্কলঙ্ক হয়, তবে সেই ব্যক্তির জীবন হবে মহৎ চরিত্রে সুস্পষ্ট; উচ্চস্তরের গুণাবলীতে বিশিষ্ট এবং তিনি হবেন সর্বপ্রকারের মাহাত্ম্য ও বুযুর্গীর ধারক ও বাহক।

   হযরত ইউসুফ আ.-এর পবিত্র যিন্দেগির উত্তম দৃষ্টান্ত। তিনি ইয়াকুব, ইসহাক এবং ইবরাহীম আ.-এর মতো উচ্চ মর্যাদাশীল নবী ও পয়গাম্বরগণের সন্তান ছিলেন। তিনি প্রতিপালিত হন নবুয়ত ও রিসালতের দোলনায়। শিক্ষাদীক্ষা লাভ করেন নবুয়ত ও রিসালাতের পরিবার-পরিবেশে। তাঁর নিজস্ব নেকপ্রকৃতি এবং স্বভাবগত পবিত্রতা যখন এমনি নির্মল পরিবেশ পেল, তখন তাঁর সমুদয় প্রশংসনীয় স্বভাব-প্রকৃতি ও গুণাবলী প্রদীপ্ত হয়ে উঠল! ফলে তাঁর জীবনের সব অবস্থায় পরহেযগারী, সাধুতা, ধৈর্য-সহ্য, দীনদারী এবং খোদাপ্রেমের এমন উজ্জ্বল বিকাশ হল, যা দেখে মানুষ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল।

২. যদি কোনো ব্যক্তির মধ্যে আল্লাহর প্রতি ঈমান সঠিক ও সুদৃঢ় হয় এবং তাঁর প্রতি তার বিশ্বাস যবুত ও দৃঢ় হয়, তবে এ পথের সমস্ত জটিলতা ও কঠিনতা তার জন্য সহজ বরং সহজতর হয়ে যায়। সত্য দর্শনের পর সমস্ত বিপদাপদ অতি তুচ্ছ হয়ে যায়। হযরত ইউসুফ আ.-এর জীবনে এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে পরিদৃষ্ট হয়।

৩. পরীক্ষাটা বিপদ-মুসিবত ও ধ্বংসের আকৃতিতেই হোক কিংবা ধন-দৌলত ও রিপুর কামনা-বাসনার সুন্দর উপকরণের আকারেই হোক। সর্বাবস্থায় মানুষের উচিত

আল্লাহ পাকের দিকে রুজু করা, আল্লাহর দরবারেই কাকুতি মিনতি করা। যেন তিনি সত্যের ওপর দৃঢ়পদ রাখেন এবং ধৈর্য-সহ্য দান করেন।

আযীযে মিসরের বিবি এবং মিসরের সুন্দরী রমণীদের অসৎ প্ররোচনা এবং তাদের মনষ্কামনা পূর্ণ না করলে জেলে আবদ্ধ করার ধমক, এরপর জেলখানার নানাপ্রকার কষ্ট ইত্যাদি সমস্ত অবস্থায় হযরত ইউসুফ আ.-এর ভরসা, তাঁর দুআ মিনতিসমূহের কেন্দ্রস্থল কেবলমাত্র আল্লাহ তাআলা। তিনি আযীযে মিসরের সম্মুখে আবেদন করেন নি কিছুর। ফেরাউনের দরবারেও না। তিনি মিসরের সুন্দরী রমণীদের সঙ্গেও মন লাগাচ্ছেন না, নিজের প্রভুর সুন্দরী স্ত্রীর সঙ্গেও না। বরং প্রত্যেক ক্ষেত্রে শুধু আল্লাহ তাআলার সাহায্য প্রার্থী হিসেবেই তাকে দেখা যায়। যেমন তিনি বলেছেন :

رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ

"হে আমার প্রতিপালক! এ রমণীরা আমাকে যেদিকে আহ্বান করছে, এর চেয়ে জেলখানাই আমার নিকট শ্রেয়।"

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

"আল্লাহর আশ্রয় ভিক্ষা চাচ্ছি। নিঃসন্দেহে তিনি (আযীযে মিসর) আমার মুরব্বি, আমাকে সম্মান ও মর্যাদার সাথে রাখছেন।"

৪. যখন আল্লাহ তাআলার মহব্বত এবং ইশক অন্তরের গভীরে প্রবেশ করে, তখন মানুষের জীবনের সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য একমাত্র তিনিই হয়ে যান। তাঁর দীনের দাওয়াত, তাবলীগের ইশক সর্বক্ষণ ধমনীসমূহে ও শিরায় শিরায় ধাবিত হতে থকে। যেমন জেলখানার কঠিন বিপদের সময় নিজের সাথীদের সাথে ইউসুফ আ.-এর সর্বপ্রথম কথা ছিল এটাই–

يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

"হে আমার জেলখানার বন্ধুদ্বয়! পৃথক পৃথক বহু দেবতার উপাসনাই কি ভালো, না-কি এক মহা শক্তিমান আল্লাহর ইবাদত উত্তম?

৫. দীনদারী ও বিশ্বস্ততা এমন একটি নেয়ামত, একে মানুষের ধর্মীয় ও পার্থিব সৌভাগ্যের চাবিকাঠি বলা যেতে পারে। আযীযে মিসরের কাছে হযরত ইউসুফ আ. যেরূপে প্রবেশ করেছিলেন –ঘটনাবলীর বিস্তৃত বিবরণে যেমনটি জানা গেছে– এটা ইউসুফ আ.-এর দীনদারী এবং বিশ্বস্ততারই সুফল ছিল। অর্থাৎ প্রথম তিনি আযীযে মিসরের দৃষ্টিতে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ও প্রিয় হন। তারপর একেবারে সমগ্র মিসর রাজ্যের মালিকই হয়ে বসেন।

৬. আত্মনির্ভশীলতা মানুষের উচ্চ শ্রেণীর গুণাবলীর অন্তর্গত একটি মহৎ গুণ। আলাহ তাআলা যাকে এ দৌলত দান করেন, সে ব্যক্তিই দুনিয়ার সর্বপ্রকার বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্ট অতিক্রম করে দুনিয়া ও আখেরাতের উন্নতি লাভ করতে পারে।

আত্মনির্ভশীলতার বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে একটি প্রকার হচ্ছে আত্মসম্মানবোধ। যার আত্মসম্মানবোধ নেই, সে মানুষই নয়; একখণ্ড মাংসপিণ্ড মাত্র। হযরত ইউসুফ আ.-এর আত্মসম্মান রক্ষার অবস্থা ছিল এমনই, বহু বছর পরে যখন জেলখানার বন্দিদশা হতে মুক্তির আদেশ প্রাপ্ত হন এবং তৎকালীন বাদশার তরফ হতে সম্মানজনক পয়গাম লাভ করেন, তখন আনন্দ ও খুশির সাথে তৎক্ষণাতই একে অভিনন্দন জানান নি বরং পরিষ্কার ভাষায় অস্বীকার করে বসেন– "আমি তখন পর্যন্ত জেলখানা হতে বের হব না, যে পর্যন্ত না মীমাংসা হয়ে যায় যে, মিসরীয় রমণীরা ষড়যন্ত্রমূলকভাবে আমার সাথে যে ব্যবহার করেছে, তার প্রকৃত স্বরূপ কি?" যেমন, কুরআন মাজিদে বর্ণিত রয়েছে :

فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ

إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ

"যখন বাদশার প্রেরিত দূত (মুক্তির আদেশ নিয়ে) তাঁর নিকট আসল, তখন তিনি বললেন : তুমি তোমার প্রভুর নিকট ফিরে যাও এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা কর, সেই রমণীদের কি অবস্থা, যারা নিজেদের হাত কেটে ফেলে ছিল?"

৭. সবর একটি অতি উচ্চ মানের স্বভাব এবং বহু মন্দ কাজের জন্য বাধা ও ঢাল স্বরূপ। কুরআন মাজিদে সত্তরেরও বেশি জায়গায় ফযিলতের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। আর আল্লাহ তাআলা বহু উচ্চ মর্যাদার মূলসূত্র এ ফযিলতের ওপরই প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন।

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

"আর আমি তাদের মধ্য হতে অনুসরণীয় ও বরেণ্য বানিয়েছি যাঁরা আমার আহকাম প্রচারকারী হয়েছেন, যখন তাঁরা ছবরের ফযিলতরূপী অলঙ্কারে ভূষিত হয়েছেন।"

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا

"আর বনি ইসরাঈলের উপর আপনার রবের উত্তমবাণী পূর্ণ হয়েছে এ কারণে, তারা ধৈর্যধারণকারী ছিল।" (সূরা আরাফ)

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (١٥٥) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

"আর সুসংবাদ দিন সেই ধৈর্যশীলদের, যখন তাদের ওপর কোনো বিপদাপদ অবতীর্ণ হয়, তখন তারা বলে উঠে :

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

"নিঃসন্দেহ আমরা আল্লাহ তাআলারই জন্য এবং নিঃসন্দেহ, আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।" (সূরা বাকারা)

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ

"(হে নবী) ! আপনি তেমনি সবর করুন, যেমন উচ্চ সংকল্পশালী পয়গম্বরগণ সবর করেছিলেন। (সূরা আহকাফ)

اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ

"আর (আল্লাহ হতে) সাহায্য চাও সবর ও নামায দ্বারা।" (সূরা বাকারা)

اَلصَّبْرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "সবর ঈমানের অর্ধাংশ।" (বায়হাকি)

اَلصَّبْرُ وَالسَّمَاحَةُ

বায়হাকি শরিফে আছে– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে একবার কেউ ঈমানের সূত্র জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, 'সবর এবং বদান্যতা।'

বাস্তবিক পক্ষে সবর এমন একটি গুণের নাম, যার দ্বারা মানুষ যাবতীয় মন্দ কাজ থেকে নিবৃত্ত থাকতে পারে। খারাপির থেকে বিরত থাকতে পারে। এটি শুধু মানুষেরই বিশেষত্ব। এ গুণটিই মানুষকে অন্যান্য সকল প্রাণী হতে পৃথক করে দিয়েছে। সবরের বিভিন্ন প্রকারভেদ রয়েছে। যে সব বিষয়ের সঙ্গে সবরের সম্পর্ক সেগুলোর প্রতি লক্ষ করে সবরকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। যেমন :

(ক) যদি পেট ও লজ্জাস্থান কামনার বিপরীতে সবর করা হয়, তবে এর নাম 'ইফ্ফাৎ'। অর্থাৎ পবিত্রতা-সংযম।

(খ) যদি বিপদাপদে সবর করা হয়, তবে এর নাম সবর বা ধৈর্য। এর বিপরীত অবস্থার নাম "জযআ" অর্থাৎ অস্থিরতা বা অধৈর্য।

(গ) যদি ধন-দৌলতের প্রাচুর্যের সময় সবর করা হয়, তবে এর নাম 'যবতে নফস' বা আত্মসংযম। এর বিপরীত 'বাতার' বা গর্ব-অহমিকা।

(ঘ) যুদ্ধের ময়দানের ভয়াবহ অবস্থায় সবর করার নাম 'শাজাআত' বা সাহসিকতা। এর বিপরীত 'যুবন' বা কাপুরুষতা।

(ঙ) ক্রোধের অবস্থায় সবর করার নাম 'হেলম' বা সহিষ্ণুতা। এর বিপরীত 'তাযাম্মুর' (বেশামাল হয়ে পড়া)।

(চ) চরম অবস্থায় সবর করার নাম 'ওয়াস্আতে সদ্র'– উদারতা। এর বিপরীত 'যাজ্র' তথা অন্তরের সঙ্কীর্ণতা ও অসহিষ্ণুতা।

(ছ) অন্যের গুপ্ত রহস্য গোপন করার জন্য সবর করার নাম 'কেতমানে সির' তথা অন্যের গুপ্ত রহস্য গোপন রাখা।

(জ) জীবন রক্ষা হয় পরিমাণ জীবিকার উপর সবর করার নাম 'কানাআত' বা অল্পেতুষ্টি।

(ঝ) সর্ববিধ আমোদ-আহলাদ ও ভোগ-বিলাসের ক্ষেত্রে সবর করার নাম 'যুহুদ' তথা দুনিয়া-বিমুখতা বা অনীহা।

সবরের এ সমস্ত প্রকার (ব্যাপকতাকে) সংক্ষেপে ও অলৌকিক উপায়ে কুরআন মাজিদের নিম্নোক্ত আয়াততে বলা হয়েছে :

وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

"আর যারা ধৈর্যধারণ করে সর্বপ্রকার মসিবত ও কষ্টে এবং যুদ্ধের ময়দানের ভয়াবহ অবস্থায়; তারাই প্রকৃতপক্ষে সাদেক। এবং এরাই মুত্তাক্বি ও পরহেযগার।"

আল্লাহ তাআলা হযরত ইউসুফ আ.-কে সবর ও সন্তুষ্টির এ সমস্ত ক্ষেত্রে সেই পূর্ণতা দান করেছেন, যাকে উচ্চশ্রেণীর গুণ বলা হয়। যেমন :

(১) ভাইদের কষ্ট প্রদানের অবস্থায় সবর।

(২) আযাদ হওয়া সত্ত্বেও গোলাম হয়ে থাকা এবং এমন দেশ ও এমন কওমের হাতে বিক্রি হওয়ার ওপর ছবর, যারা সামাজিক আচরণে এবং জীবিকা নির্বাহের ধরনেও বিপরীত আর দীন ও ঈমানের দিক দিয়ে শত্রু।

(৩) আযীযে মিসরের স্ত্রী এবং মিসরীয় রমণীদের ষড়যন্ত্রপূর্ণ প্ররোচনার ওপর ছবর।

(৪) জেলখানার মসিবতের ওপর সবর।

(৫) আযীযে মিসরের সমস্ত ধন-সম্পদের উকিল হওয়ার ওপর সবর করা। অর্থাৎ আল্লাহর শোকরগুযারী প্রকাশ এবং অহঙ্কার ও আস্ফালন থেকে বেঁচে থাকা।

(৬) মিসর রাজ্যের একচ্ছত্র শাসক হওয়ার ওপর সবর করা। অর্থাৎ অহঙ্কার, জুলুম-অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষা করা। সর্বাবস্থায়ই দুনিয়াবিমুখতা ও অল্পেতুষ্টির জীবন প্রাধান্য দেওয়া।

(৭) কষ্টদানকারী ভাইদের অনুতপ্ত হওয়ার সময়ে সবর অবলম্বন করা। অর্থাৎ উদারতার পরিচয় দান। যেমন তিনি বলেছিলেন :

لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ

"আজ আপনাদের প্রতি কোনো তিরস্কার নেই। আল্লাহ আপনাদের ক্ষমা করুন।"

(৮) উত্তম চরিত্রসমূহের মধ্যে 'শোকর'ও একটি উত্তম স্বভাব। কেননা এটা খোদায়ি স্বভাবসমূহের মধ্য হতে একটি অতি উচ্চ স্বভাব। কুরআন মাজিদে বর্ণিত আছে : والله شكور حليم, মানুষের গুণাবলীর মধ্যে শোকর এমন গুণের নাম, যার দ্বারা প্রকৃত নেয়ামতদাতার নেয়ামতের স্বীকার করা হয়। তার ওপর আনন্দ ও খুশি প্রকাশ করা হয় এবং সেই নেয়ামতকে নেয়ামতদাতা ও অনুগ্রহকারীর পছন্দনীয় উপায়ে ব্যবহার করা হয়। কুরআন মাজিদে আছে :

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

"অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর! আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব। আর তোমরা আমার (নেয়ামতের) শোকর কর এবং না-শোকরি করো না।" (সূরা বাকারা)

مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيمًا

"আল্লাহ্ তোমাদের আযাব দেবেন না, যদি তোমরা তাঁর শোকরকারী এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনয়নকারী থাক।" (সূরা নিসা)

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

তোমরা যদি শোকরগুযার হও, তবে আমি (তোমাদের নেয়ামতসমূহ) বাড়িয়ে দেব। (সূরা ইবরাহীম)

কিন্তু আফসোসের বিষয় হল, প্রকৃত শোকরগুযার খুবই কম। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন :

وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ

"আমার বান্দাগণের মধ্য হতে প্রকৃত শোকরগুযার খুবই অল্প।" (সূরা সাবা)

কিন্তু ইউসুফ আ.-কে আল্লাহ্ তাআলা এ গুণটি পূর্ণমাত্রায় দান করেছিলেন। তাঁর জীবনের প্রতিটি অবস্থায় তিনি শোকরগুযারি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষ করে ঘটনার শেষভাগে তাঁর যে দুআটি উল্লেখ করা হয়েছে, এটা তাঁর এ গুণটিকে অধিক সুস্পষ্ট করে দিচ্ছে। ইরশাদ হচ্ছে :

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ

"হে পালনকর্তা! নিঃসন্দেহ আপনি আমাকে রাজত্ব দান করেছেন এবং আমাকে কথাসমূহের (স্বপ্নের) মর্মার্থের জ্ঞান ও বিবেক দান করেছেন। হে আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা! আপনিই পৃথিবী ও আখেরাতে আমার সহায়। আপনি আমাকে আপনার আনুগত্যের ওপর মৃত্যু দান করুন এবং নেককার বান্দাগণের দলে শামিল করুন।" (সূরা ইউসুফ)

৯. হিংসা-বিদ্বেষের পরিণাম হিংসুক-বিদ্বেষীর জন্যই ক্ষতিকর হয়ে থাকে। যদিও কোনো কোনো সময় হিংসাকৃত ব্যক্তির পার্থিব ক্ষতি হয়ে যাওয়া সম্ভব; কিন্তু হিংসুকের কোনো অবস্থায়ই মঙ্গল হয় না। خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ– "সে দুনিয়া-আখেরাত উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। অবশ্য যদি তওবা করে নেয় এবং হিংসুটে জীবন পরিত্যাগ করে। হযরত ইউসুফ আ.-এর ভাইদের ঘটনাবলী আমাদের চোখের সম্মুখে বিদ্যমান এবং তাদের পরিণামও; কিন্তু অর্ন্তদৃষ্টির জন্য চক্ষু থাকা শর্ত।

১০. সততা, দীনদারি, বিশ্বস্ততা, সবর, শোকর-এর মতো উচ্চস্তরের গুণাবলীসমৃদ্ধ জীবনই প্রকৃত জীবন। যদি মানুষের মধ্যে এ সমস্ত গুণাবলী না থাকে, তবে সে মানুষ নয়। যেমন কুরআন মাজিদে আছে :

أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ

"তারা (অবাধ্য ও নাফরমানরা) পশুতুল্য, বরং (পশুর চেয়ে) আরো অধম।"
(সূরা আনআম)

১১. হযরত ইউসুফ আ.-এর মহৎ স্বভাব এবং উচ্চস্তরের গুণাবলীর প্রশংসা ও ফযিলতের সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ সেই বাক্যটি, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন :

اَلْكَرِيْمُ بْنُ الْكَرِيْمِ بْنِ الْكَرِيْمِ بْنِ الْكَرِيْمِ-

"ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম আ.। অর্থাৎ সেই বংশধারা, যা চার পুরুষ ধরে নবুয়তের বুযুর্গী থেকে ফয়েয লাভ করেছে, তা ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম আ.-এর বংশধারা।

বুখারীর কিতাবুত তাফসিরে অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে :

اَكْرَمُ لنَّاسِ يُوْسُفُ نَبِيُّ اللهِ بْنُ نَبِيِّ اللهِ بْنِ نَبِيِّ اللهِ بْنِ خَلِيْلِ اللهِ

অন্তিমকাল

হযরত ইউসুফ আ. যখন দেখলেন, তাঁর প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ পরিপূর্ণ হয়েছে। তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়ে গেছে। তখন উপলব্ধি করলেন, এ পৃথিবীতে কোনো কিছুরই স্থায়িত্ব নেই। যা কিছু আছে, সবই ধ্বংস হবে। আর 'পূর্ণতার পরেই আসে ক্ষয়ের পালা'। তখন তিনি আল্লাহর যথাযোগ্য প্রশংসা করলেন। আল্লাহর অনেক অনুগ্রহ ও করুণার কথা স্বীকার করলেন এবং মুসলিম অবস্থায় মৃত্যু দান এবং সৎলোকদের অন্তর্ভুক্ত রাখার জন্য দুআ করলেন। তার এ দুআ ছিল এমন পর্যায়ের, যেমন অন্যান্য সময় দুআর মধ্যে বলা হয় -

اَللّٰهُمَّ اَحْيِنَا مُسْلِمِيْنَ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ

(হে আল্লাহ! আমাদেরকে মুসলিমরূপে জীবিত রাখুন এবং মুসলিমরূপে মৃত্যু দান করুন!) অর্থাৎ, যখন আপনি আমাদের মৃত্যু দেবেন, তখন যেন আমরা মুসলমান থাকি।

আবার বলা যায়, তিনি এ দুআ করেছিলেন মৃত্যুশয্যায় থাকা অবস্থায়। যেমনিভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মৃত্যুশয্যায় দোয়া করেছিলেন তাঁর রূহকে উর্ধ্বজগতে উঠিয়ে নিতে এবং নবী-রাসূল ও সালিহীনদের অন্তর্ভুক্ত করতে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন :

اَللّٰهُمَّ فِي الرَّفِيْقِ الْأَعْلَى

এ দুআটি তিনবার বলার পর তিনি ইনতিকাল করেন। আবার হতে পারে হযরত ইউসুফ আ. শরীর ও দেহের সুস্থ থাকা অবস্থার ওপর ইসলামের সাথে মৃত্যু কামনা করেছিলেন। আর এটা তাদের শরিয়তে বৈধ ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত :

مَا تَمَنَّى نَبِيٌّ قَطُّ الْمَوْتَ قَبْلَ يُوْسُفَ

অর্থাৎ, হযরত ইউসুফ আ.-এর পূর্বে কোনো নবী মৃত্যু কামনা করেন নি। কিন্তু আমাদের শরিয়তে মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে ফিৎনা-ফাসাদের সময় তা জায়েয আছে। যেমন ইমাম আহমদ রহ. হযরত মুআয রাযি.-এর দুআ সম্বলিত হাদিস বর্ণনা করেছেন :

فَإِذَا أَرَدْتَّ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنَا إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُوْنِيْنَ

"হে আল্লাহ! আপনি যখন কোনো সম্প্রদায়কে পরীক্ষায় ফেলতে চান, তখন ওই পরীক্ষায় আমাকে না ফেলে আপনার কাছেই উঠিয়ে নিয়েন।"

অন্য হাদিসে আছে : হে আদম সন্তান! ফিতনায় জড়িয়ে পড়ার চেয়ে মৃত্যুই তোমার জন্যে শ্রেয়। হযরত মারইয়াম আ. বলেছিলেন :

يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا

হায়! আমি যদি এর পূর্বে মরে যেতাম এবং মানুষের স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেতাম। (সূরা মারইয়াম : ২৩)

হযরত আলি রাযি.ও মৃত্যু কামনা করেছিলেন। যখন রাজনৈতিক অস্থিরতা চরমে ওঠে গিয়েছিল। ফিতনা-ফাসাদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠেছিল।

ইমাম বোখারি রহ.ও মৃত্যু কামনা করেছিলেন। যখন তাঁর বিরোধীরা সর্বত্র বিরোধিতার বিভীষিকা ছড়িয়ে দিয়েছিল। এবং তিনি চরম মানসিক যাতনায় ভুগছিলেন।

স্বাভাবিক অবস্থায় মৃত্যু কামনা সম্পর্কে ইমাম বোখারি ও মুসলিম রহ. তাঁদের সহি গ্রন্থদ্বয়ে হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযি.-এর হাদিস বর্ণনা করেছেন। যাতে আছে– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ. فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا فَلْيَقُلْ: اللّٰهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي. وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي"

"বিপদে ও দুঃখে পড়ে তোমরা মৃত্যু কামনা করো না। আর যদি একান্ত কামনা করতেই হয় তাহলে বলা উচিত– হে আল্লাহ! যতদিন বেঁচে থাকা আমার জন্যে কল্যাণকর হয়, ততদিন আমাকে জীবিত রাখুন আর মৃত্যু যখন আমার জন্যে মঙ্গলময় হয়, তখন আমাকে মৃত্যু দান করুন।

অন্যত্র বর্ণিত আছে,

«لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ يَزْدَادُ. وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ».

তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে কেননা বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি যদি নেককার হয়, তা হলে (বেঁচে থাকলে) তার নেকি বেড়ে যাবে। আর যদি সে পাপিষ্ঠ হয়, তা হলে (যদি সে সংযত হয়ে যায়) তার পাপ কমে যাবে।

এখানে ضُرٌّ বলতে মানুষের দেহের রোগ বা অনুরূপ অবস্থা বোঝানো হয়েছে। দীন সম্পর্কীয় নয়। এটা স্পষ্ট, হযরত ইউসুফ আ. তখনই মৃত্যু কামনা করেছিলেন, যখন তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত বা তার নিকটবর্তী হয়েছিলেন।

ওফাত লাভ

হযরত ইউসুফ আ. তাঁর জীবনের অধিকাংশ বয়সই মিসরে কাটিয়েছেন। তিনি যখন একশ দশ বছর বয়সে পদার্পণ করেন, তখন তাঁর ইনতেকাল হয়। হযরত ইউসুফ আ. ইনতেকালের আগে আপন খান্দানের লোকদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন, তারা যেন তাঁকে মিসরের মাটিতে দাফন না করে। বরং আল্লাহ তাআলার ওয়াদা পূর্ণ হয়ে গেলে বনি ইসরাঈলরা যেন পুনরায় ফিলিস্তিনে (বায়তুল মুকাদ্দাসে) পূর্বপুরুষদের দেশে ফিরে যায়। তারা হাড়গুলো যেন সেখানে নিয়ে মাটির নিচে দাফন করে। সুতরাং তদনুযায়ী তাঁরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন। হযরত ইউসুফ আ.-এর ইনতেকাল হলে তাঁকে মমি করে সিন্দুকের মধ্যে রেখে দেয়। যখন মূসা আ.-এর যুগে বনি ইসরাঈলরা মিসর থেকে বের হয়, তখন সেই সিন্দুকটিকেও সঙ্গে নিয়ে যায়। এবং পূর্বপুরুষদের দেশ ফিলিস্তিনের 'নাবলুসের' অন্তর্গত 'বালতা' গ্রামে নিয়ে গিয়ে দাফন করে। এ কবরটি একটি বৃক্ষের নিচে।

আহলে কিতাবদের মতে মৃত্যুকালে হযরত ইউসুফ আ.-এর বয়স হয়েছিল একশ দশ বছর। আহলে কিতাবদের এ লেখাটি আমি দেখেছি। ইবনে জারীর রহ.-ও তা নকল করেছেন। মুবারক ইবনে ফুযালা হাসানের সূত্রে বর্ণনা করেছেন : ইউসুফ আ.-কে যখন কূপে নিক্ষেপ করা হয়, তখন তাঁর বয়স ছিল সতের বছর। পিতার কাছ থেকে অনুপস্থিত ছিলেন আশি বছর এবং পিতার সাথে মিলনের পরে জীবিত ছিলেন তেইশ বছর। সুতরাং সেমতে মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল (১৭+৮০+২৩) একশ বিশ বছর।

তাওরাতে বর্ণিত আছে : ইউসুফ এবং তাঁর পিতার পরিবারবর্গ মিসরে বসবাস করেছেন। ইউসুফ আ. একশ দশ বছর জীবিত ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর ভাইদের বললেন : আমি মরছি, আল্লাহ নিশ্চয়ই তোমাদেরকে মিসর থেকে সেই স্থানের দিকে নিয়ে যাবেন, যার সম্বন্ধে তিনি ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুব আ.-এর সঙ্গে কসম দিয়ে ওয়াদা করেছেন। ইউসুফ আ. তাদের বললেন, আল্লাহ নিশ্চয়ই তোমাদেরকে স্মরণ করবেন। তোমরা আমার হাড়গুলোকে এখান থেকে সঙ্গে নিয়ে যেও।

এরপর ইউসুফ আ. একশ দশ বছর বয়সে পৌঁছে ইনতেকাল করেন। বনি ইসরাঈলগণ মিসরে তাঁর কবরের মধ্যে সুগন্ধিদ্রব্য পূর্ণ করে একটি সিন্দুকের ভিতরে রেখে দেন। মূসা আ. বনি ইসরাঈলকে নিয়ে মিসর থেকে বের হওয়ার সময় ইউসুফ আ.-এর হাড়গুলোকে সঙ্গে নিলেন। কেননা ইউসুফ আ. বনি ইসরাঈলকে কসম দিয়ে বলেছিলেন, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তোমাদের খবর নেবেন। তোমরা এখান থেকে আমার হাড়গুলো নিজেদের সঙ্গে নিয়ে যেও।" (তাওরাত)

হযরত ইউসুফ আ.-এর কাহিনী সংক্রান্ত মানচিত্র
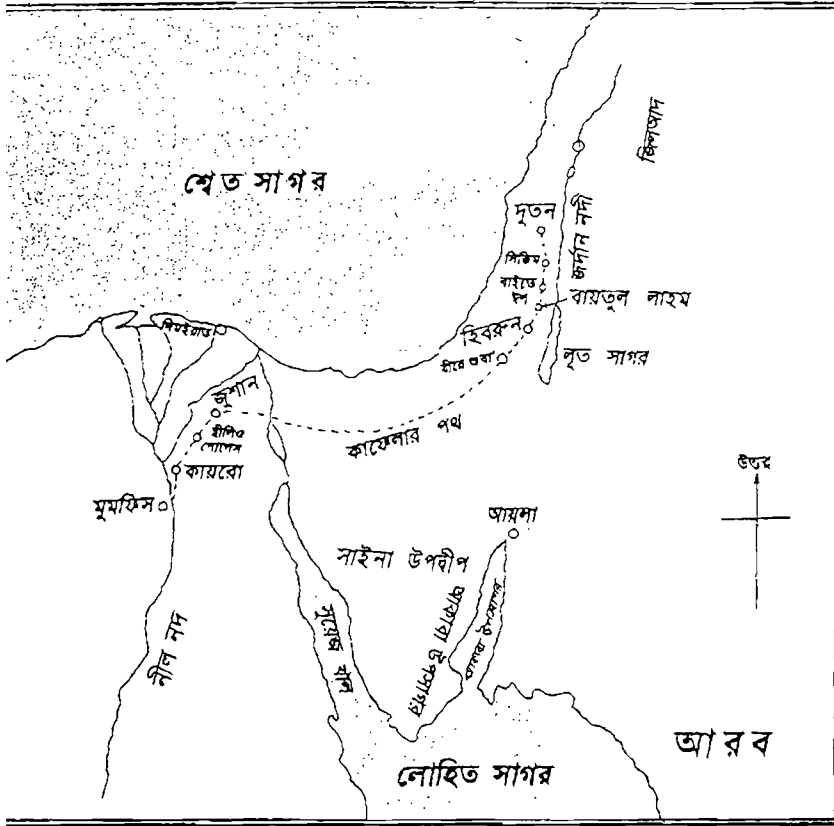
: বাইবেলের মতে এ স্থানেই হযরত ইউসুফ কূপে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল।
ম : এখানে হযরত ইয়াকূবের পৈতৃক সম্পত্তি ছিল। বর্তমানে এর নাম নাবলূস।
ন : এখানে হযরত ইয়াকূব বসবাস করতেন। এর আর এক নাম 'আল-খলীল।'
। : হযরত ইউসুফ এখানে বনী ইসরাঈলদেরকে পূনর্বাসিত করেন।

হযরত শুআইব আ.

শুআইব আ.-এর কওম

হযরত শুআইব আ. মাদায়েনে নবীরূপে প্রেরিত হয়েছিলেন। মাদায়েন কোনো স্থানের নাম নয়; একটি গোত্রের নাম। এ গোত্রের নামানুসারেই তাদের বস্তিটির নাম মাদায়েন বলে বিখ্যাত হয়েছিল। এ গোত্রটি হযরত ইবরাহীম আ.-এর পুত্র মাদইয়ানের বংশ হতে উদ্ভূত। হযরত ইবরাহমী আ.-এর তৃতীয় স্ত্রী কাতুরার গর্ভে মাদইয়ানের জন্ম হয়। এতে হযরত ইবরাহীম আ.-এর এ গোত্র বনি কাতুরা নামে অভিহিত হয়।

“মাদইয়ান তার স্ত্রী পুত্র পরিজনসহ নিজের বৈমাত্রেয় ভাই হযরত ইসামঈল আ.-এর পার্শ্বেই হেজাযে বসবাস করত। এই খানদানই পরবর্তীকালে একটি বিরাট গোত্র বা গোষ্ঠীর রূপ ধারণ করেছিল। শুআইব আ. যেহেতু এই খানদান ও গোত্রেরই ছিলেন। সুতরাং তাঁর নবীরূপে প্রেরিত হওয়ার পর হতে এই গোত্রটি “কওমে শুআইব” নামে অভিহিত হতে লাগল।

শুআইব আ.-এর নসবনামায় বিভিন্ন মত দেখতে পাওয়া যায়। কেউ বলেন, শুআইব ইবনে য়াশখার ইবনে লাবায় ইবনে ইয়াকূব। কেউ বলেছেন, শুআয়ব ইবনে নুওয়াব ইবনে আয়ফা ইবনে মাদইয়ান ইবনে ইবরাহীম। কারও মতে, শুআয়ব ইবনে দায়ফুর ইবনে আয়ফা ইবনে ছাবিত ইবনে মাদইয়ান ইবনে ইবরাহীম। এ ছাড়া আরো বিভিন্ন মত রয়েছে।

আবু উমর ইবনে আবদুল বার রহ. ‘ইসতিআব’ গ্রন্থে সালামা ইবনে সাদ আল আনাযী প্রসঙ্গে লিখেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আগমন করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর আনাযা পর্যন্ত তিনি তাঁর বংশ পঞ্জিকাও উল্লেখ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কতই না উত্তম এ আনাযা গোত্র, তারা ছিল নির্যাতিত এবং এরাই সেই সাহায্যপ্রাপ্ত শুআইবের অনুসারী এবং মূসা আ.-এর শ্বশুর গোষ্ঠী। এ বর্ণনা সঠিক হলে প্রমাণিত হয়, হযরত শুআইব মূসা আ.-এর সমগোত্রীয় এবং তিনি আদি আরবদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর কবিলার নাম আনাযা। তবে এরা আনাযা ইবনে আসাদ ইবনে রবিয়া ইবনে নাযার ইবনে মাদ ইবনে আদনান গোত্র নয়। কেননা, এই আনাযা উপরোক্ত আনাযার দীর্ঘকাল পরে এসেছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

সহি ইবনে হিব্বান গ্রন্থে আমবিয়া ও রসূলগণের বিবরণ অধ্যায়ে হযরত আবু যর রাযি.-এর বর্ণিত একটি হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আবু যর, নবীদের মধ্যে চারজন নবী আরবের। যথা– হূদ, সালেহ, শুআইব ও তোমাদের নবী।

কোনো কোনো প্রাচীন বিজ্ঞ আলেম হযরত শুআইব আ.-কে ‘খতিবুল আম্বিয়া’ বলে আখ্যায়িত করেছেন। কেননা, তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে ঈমান গ্রহণের জন্যে যে দাওয়াত

পেশ করেন তার শব্দ ও ভাষা ছিল অতি উচ্চাঙ্গের এবং বক্তব্য ও উপস্থাপনা ছিল অতি প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী। ইবনে ইসহাক রহ. ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই হযরত শুআইব আ.-এর উল্লেখ করতেন তখনই তিনি বলতেন : তিনি ছিলেন খতিবুল আম্বিয়া (নবীগণের খতীব)। মাদায়েনবাসীরা ছিল কাফের। ডাকাতি ও রাহাজানি করত। পথচারীদেরকে ভয়-ভীতি দেখাত এবং আইকার উপাসনা করত। আইকা ছিল পার্শ্ববর্তী অরণ্যের একটি ঘন শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট গাছের নাম। তাদের লেন-দেনের ক্ষেত্রে তারা ছিল অত্যন্ত জঘন্য। ওজনে এবং মাপে তারা খুবই কম দিত। পক্ষান্তরে কারো থেকে নেওয়ার সময় বেশি বেশি নিত। আল্লাহ তাদেরই মধ্য থেকে শুআইব আ.-কে তাদের রসূলরূপে প্রেরণ করেন। তিনি তাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহবান জানান। মাপে ও ওজনে কম দেওয়া এবং পথিকদের ভয়-ভীতি প্রদর্শন প্রভৃতি দুষ্কর্ম থেকে নিষেধ করেন। কিছু লোক তাঁর প্রতি ঈমান আনল, কিন্তু অধিকাংশই কুফরির ওপর অটল থাকল। ফলে আল্লাহ তাদের উপর কঠিন আযাব নাযিল করেন। আল্লাহর বাণী :

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ

جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ

মাদায়েনবাসীদের কাছে তাদের স্ব-গোত্রীয় শুআইবকে প্রেরণ করেছি। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কবুল কর। তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই। তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট দলীল এসে গেছে। (সূরা আরাফ : ৮৫)

অর্থাৎ আমি তোমাদের নিকট যা কিছু বিধি-বিধান নিয়ে এসেছি তার সত্যতার উপর সুস্পষ্ট দলীল ও অকাট্য প্রমান এসে গেছে। আর তিনি যে আমাকে রসূল করে পাঠিয়েছেন, তার প্রমাণও এসে গেছে। এই দলীল ও প্রমাণ হল সেই সব মুজিযা যা হযরত শুআইব আ.-এর হাতে আল্লাহর প্রকাশ করেন। সেই মুজিযাসমূহের বিস্তারিত বিবরণ আমাদের কাছে না পৌছলেও আয়াতে ব্যবহৃত بَيِّنَةٌ থেকে মোটামুটি এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

মাদায়েন বা আসহাবে আইকা

মাদায়েনবাসী বা আসহাবে আইকার অবস্থান স্থল সম্পর্কে আবদুল ওয়াহাব নাজ্জার বলেন, এরা মূলকে হেজাযে শামের সঙ্গে সম্মিলিত এমন এক স্থানে থাকত। যার পরিধি আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের মরুভূমির পরিধি বরাবর অবস্থিত। কেউ কেউ বলেন, শামের সঙ্গে মিলিত 'মাআন' নামক ভূখণ্ডে বসবাস করত। কুরআন মাজিদ এ গোত্রের বাসভূমি সম্বন্ধে দুইটি কথা জানিয়ে দিয়েছে। ১. তারা ইমামে মুবিনের উপর বসবাস করত। যেমন কোরআনে উল্লেখ আছে وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ

অর্থাৎ, "কওমে লূত ও কওমে মাদায়েন উভয় কওমই এক বিরাট রাজ সড়কের পার্শ্বে বসবাস করত।"

আরব দেশের ভূগোলে যেই রাজ সড়কটি হেজাযের ব্যবসায়ী কাফেলাগুলিকে শাম, ফিলিস্তিন, ইয়ামান বরং মিসর পর্যন্ত নিয়ে যায় এবং লোহিত সাগরের পূর্ব তীর দিয়ে চলে যেত; কুরআন মাজিদ সেই সড়কটিকে 'ইমামে মুবীন অর্থাৎ, মুক্ত ও পরিষ্কার রাজসড়ক বলছে। কেননা, صَيْفٌ গ্রীষ্মকাল এবং شِتَآءٌ শীতকাল উভয় মৌসুমেই কোরাইশ সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ী কাফেলাগুলির জন্য এটা বিখ্যাত ও বিরাট বাণিজ্য পথ ছিল। তাদের অত্যধিক যাতায়াতে পথটির স্থলভাগের সীমা জলভাগের সীমারেখার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায়।

'আসহাবে আইকা'কে ঝোপ ঝাড়ের অধিবাসী বলেও অভিহিত হত। আরবি ভাষায় 'আইকা' সবুজ বনের ঝোপ ঝাড়কে বলা হয়। যা সবুজ ও সতেজ বৃক্ষলতার প্রাচুর্যের দরুন বন-জঙ্গলে উৎপন্ন হয়ে থাকে এবং ঝোপের আকৃতি ধারণ করে।

এ দুইটি কথা জেনে নেওয়ার পর মাদায়েন গোত্রের বসতির সন্ধান সহজেই জানা যেতে পারে। তা হল মাদায়েন গোত্রটি লোহিত সাগরের পূর্ব তীরে এবং আরব দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এমন জায়গায় বসবাস করত যা শামদেশের সাথে সংযুক্ত হিজাজের শেষাংশ বলা যেতে পারে। আর হিজাজবাসীরা শাম, ফিলিস্তিন বরং মিসর পর্যন্ত যাতায়াতকালে 'আসহাবে মাদায়েনের' বস্তির ভগ্নাবশেষগুলি পথে পড়ত যা তাবুকের বিপরীত দিকে অবস্থিত ছিল।

তাফসিরকারকগণ এ সমন্ধে বিভিন্ন প্রকার মত পোষণ করেন 'আছহাবে মাদইয়ান' এবং আসহাবে আইকা' একই গোত্রের দুইটি নাম, না কি এরা দুটি পৃথক পৃথক গোত্র? কারো মতে এরা দুটি পৃথক পৃথক গোত্র। মাদায়েন ছিল একটি সভ্য ও শহরী গোত্র। আর আসহাবে আইকা ছিল গ্রাম্য ও যাযাবর গোত্র। যারা বনে জঙ্গলে বসতি করত। এ কারণে তাদেরকে 'আসহাবে আইকা' অর্থাৎ বন-জঙ্গলের অধিবাসী বলা হয়েছে। এই মতাবলম্বী তাফসিরকারকদের মতে إِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِيْنٍ আয়াতে هُمَا দ্বিবচনের সর্বনামটির লক্ষ্যস্থলে এ দুইটি গোত্র অর্থাৎ মাদায়েন ও আসহাবে আইকা উদ্দেশ্য; মাদায়েন এবং কওমে লূত নয়।

অন্য তাফসিরকারকগণ গোত্র দুটিকে একই গোত্র সাব্যস্ত করে বলেন, জলবায়ুর পরিচ্ছন্নতা-পবিত্রতা ও নদী-নালার প্রাচুর্য এ স্থানটিকে এতই সরস ও মনোমুগ্ধকর করে দিয়েছিল এবং এখানে ফল, মেওয়া ও সুগন্ধিযুক্ত ফুলের এত বাগবাগিচা ছিল, যদি কেউ বস্তির বাইরে দাঁড়িয়ে তার দৃশ্য অবলোকন করত, তবে তার বোধ হত এটা যেন অতি সুন্দর ও সরস ঘন বৃক্ষরাজির একটি ঝোপ। এ কারণেই কুরআন মাজিদ এটাকে আইকা বলে পরিচয় দিয়েছে।

এ তাফসিরকারকগণের মধ্যে হাফেয ইবনে কাসীরের ধারণা হলো, এ বসতিতে 'আইকা' নামে একটি বৃক্ষ ছিল। গোত্রের লোকেরা যেহেতু উক্ত বৃক্ষের পূজা করত; এ

সম্পর্কের কারণে মাদায়েন গোত্রকেই আসহাবে আইকা বলা হয়েছে। তাছাড়া এ সম্বন্ধটি বংশের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল না; বরং ধর্মসংক্রান্ত সম্বন্ধ ছিল।

তবে প্রবল অভিমত হলো– মাদায়েন ও আসহাবে আইকা একই গোত্র। যাদেরকে পৈত্রিক সম্পর্কের কারণে মাদায়েন বলা হয়েছে। আর বসত ভূমির স্বাভাবিক ও ভৌগোলিক অবস্থান হিসাবে তারা 'আসহাবে আইকা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

সত্যের ডাক

হযরত শুআইব আ. নিজ কওমের কাছে নবী হিসেবে প্রতি প্রেরিত হয়েছেন। তিনি দেখতে পেলেন, আল্লাহ তাআলার নাফরমানি ও পাপানুষ্ঠান শুধু গুটিকতক লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং গোটা কওমই ধ্বংসের ঘুর্ণিপাকে আক্রান্ত ও লিপ্ত। তারা নিজেদের অসৎ কর্মে এতই মত্ত রয়েছে, মুহূর্তের জন্যও তাদের এই অনুভব হত না, তাদের কৃতকার্যসমূহ নাফরমানি ও গুনাহের কাজ। বরং তারা তাদের ঐ কার্যসমূহকে গর্বের বিষয় বলে মনে করত। তাদের ভূরিভূরি অসৎকাজ ও নাফরমানির দিকে দৃষ্টিপাত না করলেও কেবল যে সমস্ত মন্দকার্য বিশেষভাবে তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তা হলো–

১. মূর্তিপূজা ও মুশরিকি রীতিনীতি।
২. ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে নিজে পূর্ণ মাত্রায় মেপে নেওয়া এবং অপরকে দেওয়ার সময় ওযনে কম দেওয়া।
৩. তারা অন্যের সম্পদ ডাকাতি করত।

কওমসমূহের সাধারণ রীতি অনুসারে প্রকৃতপক্ষে তাদের শান্তি, স্বচ্ছলতা ধন-দৌলতের প্রাচুর্য, জমিন ও বাগ-বাগিচার উৎপাদন শক্তি বা উর্বরতা এবং সতেজতা ও সরসতা তাদের এত গর্বিত করে দিয়েছিল, তারা ঐ সমস্ত বিষয়কে নিজেদের ব্যক্তিগত উত্তরাধিকার এবং বংশগত কৌশল মনে করে বসেছিল। এক মুহূর্তের জন্যও তাদের অন্তরে এ ধারণা উদয় হত না, এ সবকিছুই বিশ্বপালক আল্লাহ তাআলার দান। তা হলে তারা শোকর আদায় করত এবং অবাধ্যতাচরণ থেকে বিরত থাকত। তাদের এই নিশ্চিন্ততা তাদের মধ্যে বিভিন্ন রকমের অসৎ চরিত্রতা এবং নানা প্রকারের দোষ সৃষ্টি করে দিয়েছিল।

অবশেষে আল্লাহ পাকের আত্মমর্যাদাবোধ নাড়া দিয়ে উঠল। আল্লাহ পাকের রীতি অনুসারে তাদেরকে সত্য পথ দেখাবার, পাপানুষ্ঠান ও অসৎ কার্যাবলী হতে রক্ষা করার এবং আমানতদার, পরহেযগার ও চরিত্রবান বানাবার জন্য তাদেরই মধ্য হতে একজনকে মনোনীত করে নবুয়ত ও রিসালাত প্রদান করে তাঁকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান এবং আল্লাহ পাকের পয়গাম পৌঁছাবার জন্য ইমাম নিযুক্ত করে দিলেন। তিনি হযরত শুআইব আ.। আল্লাহ তাআলার একত্ববাদ এবং শিরকের প্রতি অসন্তোষের আকিদা তো সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামের শিক্ষার ভিত্তি ও মূল। যার অংশ হযরত শুআইব

আ.-ও প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু কওমের বিশেষ বিশেষ অসৎ চরিত্রাবলী থেকে বিরত থাকার জন্য সর্তকবাণী এবং তাদেরকে সৎপথে আনয়নের জন্য তিনি এই বিধানের প্রতিও গুরুত্ব প্রদান করলেন, ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে এ কথার প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখতে হবে, প্রত্যেকের প্রাপ্য হক প্রত্যেকে পূর্ণ মাত্রায় দিতে হবে। কেননা, পার্থিব কাজ-কারবারে এটা এমন একটি ভিত্তি, যা টলটলায়মান হয়ে পড়লে সর্বপ্রকার যুলুম, পাপানুষ্ঠান, অসৎ কার্যাবলী এবং মারাত্মক দোষসমূহ ও মন্দ চরিত্রাবলীর কারণ হয়ে যায়।

সারকথা, হযরত শুআইব আ.-ও নিজ কওমের অসৎ কার্যাবলী দেখে অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করলেন এবং সৎপথ ও হেদায়েত শিক্ষা প্রদান করে কওমকে ঐ সমস্ত মূলনীতির প্রতিই আহবান করলেন, যা আম্বিয়ায়ে কেরামের দাওয়াত ও নসিহতের সারমর্ম। তিনি বললেন, "হে আমার কওম! (মূর্তিপূজা ছেড়ে) আল্লাহ তাআলার ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত আর কোনো বস্তুই ইবাদতের যোগ্য নয়। ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে ওযন ও মাপ পুরাপুরি এবং সঠিক রাখ। আর মানুষের সাথে কাজে-কারবারে কৃত্রিমতা করো না। গতকাল পর্যন্ত হয়তো তোমরা এ সমস্ত অসৎ চরিত্রতার মন্দ পরিণামের অবস্থা জানতে পারো নি, কিন্তু আজ তোমাদের নিকট আল্লাহ তাআলার প্রমাণ ও নিদর্শন এসে পৌঁছেছে। এখন আর অজ্ঞতা ও না-জানা ক্ষমার যোগ্য হবে না। সত্যকে গ্রহণ কর এবং বাতিল ও মিথ্যা হতে নিবৃত্ত হও। এটাই সফলকাম হওয়ার একমাত্র পথ। আর খোদার যমিনে ফেতনা ফাসাদ ও অনর্থ সৃষ্টি করো না, যখন আল্লাহ তাআলা এতে কল্যাণ ও মঙ্গলের সমস্ত উপকরণ প্রস্তুত করে দিয়েছেন। যদি তোমাদের মধ্যে ঈমান ও বিশ্বাসের সত্যতা বিদ্যমান থাকে তবে বুঝে নাও, এটা কল্যাণ ও মঙ্গলের পথ। আর দেখ, এরূপ কখনও করো না, সত্য প্রচারের পথকে বন্ধ করার জন্য এবং মানুষকে লুণ্ঠন করার জন্য প্রত্যেক পথের উপর গিয়ে বস এবং যে ব্যক্তিই ঈমান আনে তাঁকে আল্লাহর পথ অবলম্বন করার দরুন ধমক দিতে থাক এবং তাকে পুনরায় বিপথগামী করার পিছনে লেগে যাও। হে আমার কওমের লোকেরা! সেই সময়টুকু স্মরণ কর এবং আল্লাহর অনুগ্রহ স্বীকার কর, তোমরা সংখ্যায় খুবই নগণ্য ছিলে। এরপর আল্লাহ তাআলা শান্তি ও নিরাপত্তা দান করে তোমাদের সংখ্যাকে অধিক সংখ্যায় বৃদ্ধি করে দিয়েছেন।

হে আমার কওম! এ কথার প্রতিও চিন্তা কর, যারা আল্লাহর যমিনে ফাসাদ বিস্তার করেছে, তাদের পরিণাম কেমন উপদেশমূলক হয়েছে। যদি তোমাদের মধ্য হতে একদল আমার প্রতি ঈমান আনে এবং অন্যদল ঈমান না আনে, তবে ব্যাপারটি শুধু এতটুকুতেই খতম হয়ে যাবে না বরং ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা কর, যে পর্যন্ত না আল্লাহ আমাদের মধ্যে শেষ মীমাংসা করে দেন এবং তিনিই উত্তম মীমাংসাকারী।"

হযরত শুআইব আ. নেহায়েত মার্জিতভাষী ও স্থানোচিত বক্তা ছিলেন। তিনি সুমধুরবাণী, সুন্দর সম্ভাষণ, বর্ণনা পদ্ধতি ও বক্তৃতায় অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। এ কারণেই তাফসিরকারকগণ তাঁকে 'খতিবুল আম্বিয়া' উপাধিতে ভূষিত করে থাকেন।

অতএব, তিনি নরম ও গরম উভয় প্রকারেই কওমকে হেদায়েত ও নসিহতের এই কথাগুলি বললেন। কিন্তু সেই হতভাগ্য কওমের ওপর এর কোনোরূপ ক্রিয়াই হল না। গুটিকতক দুর্বল লোক ব্যতীত কেউই আল্লাহ পাকের এ পয়গামের প্রতি কর্ণপাত করল না। তারা নিজেরাও পূর্ববৎ অসৎকাজে লিপ্ত রইল এবং অন্যান্য লোকদের পথেও বাধা প্রদান করতে লাগল। তারা পথে পথে বসে থাকত এবং হযরত শুআইব আ.-এর নিকট যাতায়াতকারীদেরকে সত্য গ্রহণে বাঁধা দিত। সুযোগ পেলে জনগণের সম্পদ লুটপাট করত। এত কিছু সত্ত্বেও যদি কোনো সৌভাগ্যবান সত্যের ডাকে সাড়া দিত এবং সত্যকে গ্রহণ করে নিত, তবে তাকে ভয় প্রদর্শন ও ধমকি দিত এবং নানা প্রকারে বিপথগামী করার চেষ্টা করত। কিন্তু এ সমস্ত ব্যাপার সত্ত্বেও হযরত শুআইব আ.-এর সত্যের ডাক সর্বদা অব্যাহত রইল। অতএব, তাদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় লোকেরা, যারা নিজেদের শক্তি ও মর্যাদার জন্য গর্বিত ছিল, হযরত শুআইব আ.-কে বলল, "হে শুআইব! দুইটি বিষয়ের মধ্যে একটি বিষয় অবশ্যই হবে, হয়তো আমরা তোমাকে এবং তোমার প্রতি ঈমান আনয়নকারীদেরকে নিজেদের বস্তি হতে বের করে দিব এবং তোমাদেরকে দেশান্তরিত করে দিব। অথবা তোমাদেরকে পুনরায় আমাদের ধর্মের প্রতি ফিরে আসতে বাধ্য করব।

হযরত শুআইব আ. বললেন, যদি আমরা তোমাদের ধর্মকে মিথ্যা ও বাতিল বলে মনে করি, তবুও আমাদেরকে তা মান্য করতে হবে, এটা তো বড়ই যুলুমের কথা। আর যখন আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা তোমাদের এই বাতিল ধর্ম হতে নাজাত প্রদান করেছেন, এরপর যদি আমরা সেই ধর্মেরই দিকে পুনরায় ফিরে যাই, তবে এর অর্থ এই দাঁড়াবে, আমরা মিথ্যা বলে আল্লাহ তাআলার প্রতি অসত্যের অপবাদ আরোপ করলাম। এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তবে হ্যাঁ, (আমাদের পরওয়ারদিগার) আল্লাহ তাআলার যদি তাই ইচ্ছা হয়, তবে তিনি যা ইচ্ছা তাই করবেন। আমাদের রবের জ্ঞান যাবতীয় বস্তুকে বেষ্টনকারী ও ব্যাপক। আমরা তো শুধু তাঁরই উপর ভরসা রাখব। হে পরওয়ারদিগার! আপনি আমাদের ও আমাদের কওমের মধ্যে সত্যের সাথে মীমাংসা করে দিন। নিঃসন্দেহ, আপনিই উত্তম মীমাংসাকারী।

কওমের নেতৃস্থানীয় লোকেরা যখন হযরত শুআইব আ.-এর মধ্যে এই দৃঢ়তা ও অটুট সংকল্প দেখতে পেল, তখন তারা কথার মোড় ঘুরিয়ে কওমকে সম্বোধন করে বলতে লাগল, সাবধান! তোমরা যদি শুআইবের কথা মান্য কর, তবে তোমরা ধ্বংস ও বিনাশ প্রাপ্ত হবে।

হযরত শুআইব আ. এটাও বললেন– দেখ, আল্লাহ তাআলা আমাকে এই জন্য প্রেরণ করেছেন, যেন আমি আমার সাধ্যানুযায়ী তোমাদেরকে সংশোধন করার চেষ্টা করি। আর আমি যা কিছু বলছি, এটার সত্যতার জন্য আল্লাহ তাআলার প্রমাণ এবং নিদর্শনও পেশ করছি। কিন্তু আফসোস! তোমরা এ স্পষ্ট দলিল-প্রমাণ দেখেও

অবাধ্যাচরণ-এবং নাফরমানির উপরই স্থায়ী রয়েছ। অবাধ্যচরণ ও বিরোধিতার কোনো দিক বা অংশই তোমার ত্যাগ করো নি। আমি আমার নসিহত ও হেদায়েতের বিনিময়ে তোমাদের নিকট কোনো পারিশ্রমিকও দাবি করছি না এবং দুনিয়ার কোনো স্বার্থও তোমাদের নিকট চাচ্ছি না। আমার বিনিময় তো আল্লাহ তাআলার নিকট রয়েছে, যদি তোমরা এখনও অমান্য করতেই থাক, তবে আমার আশংকা– পাছে আল্লাহর আযাব এসে তোমাদেরকে ধ্বংস ও বিনষ্ট করে না ফেলে। আল্লাহর ফয়সালা অটল। তা প্রতিরোধ বা খণ্ডন করার সাধ্য কারো নেই।

কওমের সরদার ক্রোধান্বিত হয়ে বলল, তোমার নামায কি আমাদের নিকট এটাই চায়, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের দেবতার পূজা ত্যাগ করি এবং নিজেদের মাল-দৌলতে আমাদের এই স্বাধীনতা না থাকে, যেরূপ ইচ্ছা লেনদেন করি! যদি আমরা ওযনে কম দেওয়া ছেড়ে দেই এবং মানুষের সঙ্গে কারবারে কম দিয়ে তার ক্ষতি না করি, তবে তো দরিদ্র এবং কাঙ্গাল হয়ে পড়ব! অতএব, এরূপ শিক্ষা প্রদানে তোমাকে কি কেউ সত্যিকারের পথ প্রদর্শক বলে মানতে পারে?

হযরত শুআইব আ. অত্যন্ত মনোব্যথা ও মহব্বতের সাথে বললেন, হে আমার কওম! আমার এই ভয় হচ্ছে, তোমাদের এই বেপরোয়া ভাব এবং আল্লাহ পাকের বিরুদ্ধে নাফরমানি তোমাদেরও সেই পরিণামই করে না দেয়, যা তোমাদের পূর্বে নূহ, হূদ, সালেহ ও লূত আ.-এর কওমগুলির হয়েছিল। এখনো সময় যায় নি। আল্লাহ পাকের সম্মুখে নত হয়ে পড় এবং নিজেদের অসৎকার্যসমূহের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা কর এবং ভবিষ্যতে সর্বদার জন্য ঐ সমস্ত অসৎ কার্য হতে তওবা কর। নিঃসন্দেহ, আমার পরওয়ারদিগার খুবই দয়ালু অত্যন্ত মেহেরবান। তিনি তোমাদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন। কওমের সরদাররা এ কথা শুনে জবাব দিল, হে শুআইব! আমাদের বুঝে কিছুই আসে না, তুমি কি বলছ? তুমি আমাদের সকলের চেয়ে বেশি দরিদ্র ও দুর্বল। তোমার কথাগুলি যদি সত্য হত, তবে তোমার যিন্দেগী আমাদের সকলের যিন্দেগীর চেয়ে উত্তম হত। আমরা শুধু তোমার খানদানকে ভয় করছি, অন্যথায় তোমাকে পাথর মেরে হত্যা করে ছাড়তাম, তুমি আমাদের উপর কখনও জয়ী হতে পারতে না।

হযরত শুআইব আ. বললেন, তোমাদের প্রতি আফসোস! তোমাদের জন্য কি খোদার মুকাবিলায় খোদার চেয়ে আমার খানদান অধিক ভয়ের কারণ হচ্ছে? অথচ আমার পরওয়ারদিগার তোমাদের যাবতীয় কাজকে বেষ্টন করে রয়েছেন এবং তিনি সবকিছুই জানেন এবং সবকিছুই দেখছেন। আচ্ছা, যদি তোমরা আমার উপদেশ না মান, তোমরাই জান, তোমরা সেই সমস্ত কাজই করতে থাক, যা করছ, অচিরেই আল্লাহ পাকের মীমাংসা বলে দেবেন, আযাবের উপযোগী কারা? আর কে মিথ্যাবাদী? তোমরাও অপেক্ষা করতে থাক আমিও অপেক্ষা করতে রইলাম।

অবশেষে তাই হল, যা আল্লাহ পাকের বিধানের চিরন্তন ফয়সালা ও মীমাংসা। দলীল প্রমাণের আলো আসার পরেও যখন বাতিলের ওপর হটকারিতা করা হয় এবং দলিল প্রমাণের সত্যতা নিয়ে বিদ্রূপ করা হয়, সত্যের প্রচারে ও অনুসরণে বাধা সৃষ্টি

করা হয়, তখন আল্লাহর আযাব সেই অপরাধী জীবনের অবসান ঘটিয়ে দেন এবং ভবিষ্যতের লোকদের জন্য তা উপদেশমূলক দৃষ্টান্ত বানিয়ে দেন।

আযাবের ধরন

কুরআন মাজিদ বলে, নাফরমানী এবং অবাধ্যতার প্রতিফলে হযরত শুআইব আ.-এর কওমের উপর দুই প্রকারের আযাব এসে তাদেরকে বেষ্টন করে ফেলল। একটি ভূ-কম্পনের আযাব এবং দ্বিতীয়টি অগ্নিবৃষ্টি। যখন তারা নিশ্চিন্ত মনে নিজ নিজ ঘরে আরাম করছিল, তখন হঠাৎ এক ভয়ঙ্কর ভূ-কম্পন আরম্ভ হল এবং এই ভয়ঙ্কর অবস্থা শেষ হতে না হতেই উপর হতে অগ্নি বর্ষণ আরম্ভ হয়ে গেল। ফল এই দাঁড়াল, সকালবেলা দর্শকরা দেখতে পেল, গত কালের অবাধ্য ও অহঙ্কারী আজ বিদগ্ধ হয়ে উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে।

কওমে শুআইব বা মাদায়েনবাসীর ঘটনা

সূরা হূদের মধ্যে লূত আ.-এর সম্প্রদায়ের ঘটনা বলার পর আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ (٨٤) وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٨٥) بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (٨٦) قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ (٨٧) قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (٨٨) وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ (٨٩) وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ (٩٠) قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ (٩١) قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (٩٢) وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ (٩٣) وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ (٩٤) كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ (٩٥)

মাদায়েনবাসীদের নিকট তাদের স্ব-গোত্রীয় শুআইবকে পাঠিয়েছিলাম; সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই। মাপে ও ওজনে কম করো না। আমি তোমাদেরকে সমৃদ্ধিশালী দেখছি, কিন্তু আমি তোমাদের জন্যে আশংকা করছি এক সর্বগ্রাসী দিনের শাস্তি। হে আমার সম্প্রদায়! ন্যায়-সঙ্গতভাবে মাপবে ও ওজন করবে। লোকদেরকে তাদের প্রাপ্যবস্তু কম দিবে না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাবে না, 'যদি তোমরা মুমিন হও তবে আল্লাহ অনুমোদিত যা বাকি থাকবে তোমাদের জন্যে তা উত্তম; আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নই।' ওরা বলল, 'হে শুআইব! তোমার সালাত কি তোমাকে নির্দেশ দেয়, আমাদের পিতৃ-পুরুষেরা যার ইবাদত করত, আমাদেরকে তা বর্জন করতে হবে এবং আমরা ধন-সম্পদ সম্পর্কে যা করি তাও না? তুমি তো অবশ্যই সহিষ্ণু, সদাচারী।'

সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা ভেবে দেখেছ কি, আমি যদি আমার প্রতিপালক-প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকি এবং তিনি যদি তাঁর কাছ থেকে আমাকে উৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ দান করে থাকেন, তবে কি করে আমি আমার কর্তব্য হতে বিরত থাকব? আমি তোমাদেরকে যা নিষেধ করি, আমি নিজে তা করতে ইচ্ছা করি না। আমি আমার সাধ্যমত সংস্কার করতে চাই। আমার কার্য-সাধন তো আল্লাহরই সাহায্যে; আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং আমি তাঁরই অভিমুখী। 'হে আমার সম্প্রদায়! আমার সাথে বিরোধ যেন কিছুতেই তোমাদেরকে এমন অপরাধ না করায় যাতে তোমাদের উপর তার অনুরূপ বিপদ আপতিত হবে যা আপতিত হয়েছিল নূহের সম্প্রদায়ের উপর, হূদের সম্প্রদায়ের উপর কিংবা সালেহের সম্প্রদায়ের উপর, আর লূতের সম্প্রদায় তো তোমাদের থেকে দূরে নয়। তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন কর; আমার প্রতিপালক পরম দয়ালু, প্রেমময়।' তারা বলল, 'হে শুআইব! তুমি যা বল তার অনেক কথা আমরা বুঝি না এবং আমরা তো তোমাকে আমাদের মধ্যে দুর্বলই দেখছি। তোমার স্বজনবর্গ না থাকলে আমরা তোমাকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলতাম, আমাদের উপর তুমি শক্তিশালী নও।' সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের কাছে কি আমার স্বজনবর্গ আল্লাহর চাইতে অধিক শক্তিশালী? তোমরা তাঁকে সম্পূর্ণ পেছনে ফেলে রেখেছ। তোমরা যা কর আমার প্রতিপালক তা পরিবেষ্টন করে আছেন।

'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা নিজ নিজ অবস্থায় কাজ করতে থাক, আমিও আমার কাজ করছি; তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে কার উপর আসবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি এবং কে মিথ্যাবাদী? সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি।' যখন আমার নির্দেশ আসল তখন আমি শুআইব ও তার সঙ্গে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমার অনুগ্রহে রক্ষা করেছিলাম। তারপর যারা সীমালঙ্ঘন করেছিল মহানাদ

তাদেরকে আঘাত করল, ফলে তারা নিজ নিজ ঘরে নতজানু অবস্থায় শেষ হয়ে গেল; যেন তারা সেখানে কখনও বসবাস করে নি। জেনে রেখ, ধ্বংসই ছিল মাদায়েনবাসীদের পরিণাম; যেভাবে ধ্বংস হয়েছিল সামুদ সম্প্রদায়।

(সূরা হূদ : ৮৪-৯৫)

সূরা আল-হিজরে লূত আ.-এর সম্প্রদায়ের ঘটনা বর্ণনার পর বলা হয়েছে :

وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ (٧٨) فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ

আর আয়কাবাসীরাও তো ছিল সীমালংঘনকারী। সুতরাং আমি ওদেরকে শাস্তি দিয়েছি, এরা উভয়ই তো প্রকাশ্য পথের পাশে অবস্থিত। (১৫ : ৭৮-৭৯)

সূরা শুআরায় উক্ত ঘটনার পর আল্লাহ্ বলেন :

كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ (١٧٦) إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ (١٧٧) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٧٨) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٧٩) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٨٠) أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (١٨١) وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ (١٨٢) وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (١٨٣)

আইকাবাসীরা রাসূলগণকে অস্বীকার করেছিল, যখন শুআইব ওদেরকে বলেছিল, তোমরা কি সাবধান হবে না? আমি তোমাদের জন্যে এক বিশ্বস্ত রাসূল। সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর ও আমার আনুগত্য কর। এর জন্যে আমি তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না। আমার পুরস্কার তো জগতসমূহের প্রতিপালকের কাছেই আছে। মাপে পূর্ণমাত্রায় দেবে; যারা মাপে ঘাটতি করে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না এবং ওজন করবে সঠিক দাঁড়ি-পাল্লায়। লোকদেরকে তাদের প্রাপ্ত বস্তু কম দিবে না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাবে না। এবং ভয় কর তাঁকে, যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।' তারা বলল, তুমি তো জাদুগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত; আমাদের মত একজন মানুষ। আমরা মনে করি, তুমি মিথ্যাবাদীদের অন্যতম। তুমি যদি সত্যবাদী হও, তবে আকাশের এক খণ্ড আমাদের উপর ফেলে দাও। সে বলল, 'আমার প্রতিপালক ভালো জানেন তোমরা যা কর।' তারপর ওরা তাকে প্রত্যাখ্যান করল, পরে ওদেরকে মেঘাচ্ছন্ন দিনের শাস্তি গ্রাস করল। এ তো ছিল এক ভীষণ দিনের শাস্তি। এতে অবশ্যই রয়েছে নিদর্শন, কিন্তু ওদের অধিকাংশই মুমিন নয়। এবং তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। (সূরা শুআরা : ১৭৬-১৯১)

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

মাপে ও ওজনে পুরোপুরি দাও। মানুষের প্রাপ্য বস্তু কম দিও না এবং সমাজকে সংস্কারের পর ফিৎনা ফাসাদ সৃষ্টি করো না। (সূরা আরাফ : ৮৫)

এ আয়াতে আল্লাহ তাদেরকে জুলুমের পথ পরিহার করে ইনসাফের পথে চলার নির্দেশ দেন। অন্যথায় তাদেরকে কঠোর শাস্তির ভয় প্রদর্শন করেন। এরপর বলেন :

ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (٨٥) وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ

'তোমরা মুমিন হলে এটাই তোমাদের জন্যে কল্যাণকর এবং ভয় দেখাবার উদ্দেশ্যে প্রতিটি রাস্তায় বসে থেকো না।' অর্থাৎ পথের উপর বসে পথিকদেরকে ভয় দেখিয়ে তাদের সম্পদ ও শুল্ক আদায় করো না।

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় সাহাবীদের বরাত দিয়ে সুদ্দী রহ. বলেছেন, তারা পথিকদের থেকে তাদের পণ্য দ্রব্যের এক-দশমাংশ টোল আদায় করত। ইসহাক ইবনে বিশর ... ইবনে আব্বাস রাযি.-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, শুআইব আ.-এর সম্প্রদায় ছিল সীমালংঘনকারী, বিদ্রোহী। তারা রাস্তার উপরে বসে থাকত تَبْخَسُوا النَّاسَ অর্থাৎ তারা মানুষের নিকট থেকে তাদের এক-দশমাংশ উসুল করত। এ প্রথা তারাই সর্বপ্রথম চালু করে।

وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا

'আল্লাহর প্রতি যারা ঈমান পোষণ করে তাদেরকে আল্লাহর পথে চলতে বাধা দিও না আর আল্লাহর পথের মধ্যে বক্রতা তালাশ করো না।' আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার ডাকাতি ও দীনের ডাকাতি উভয়টা থেকে নিষেধ করে দেন।

وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ

'স্মরণ কর, সেই সময়ের কথা যখন তোমরা সংখ্যায় কম ছিলে। এরপর আল্লাহ তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে দেন, আর তোমরা লক্ষ্য করে দেখ, ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের পরিণতি কেমন হয়!' (সূরা আ'রাফ : ৮৫-৮৬)

প্রথমে তারা সংখ্যায় কম ছিল, পরে আল্লাহ তাআলাই তাদের বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেন– এই নিয়ামতের কথা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। এরপর যদি তারা আল্লাহর প্রদর্শিত পথের বিরুদ্ধে যায় তা হলে সে জন্যে যে শাস্তি আসবে তার হুমকি দেওয়া হয়।

وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٨٥) بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ (٨٦)

হে আমার সম্প্রদায়! ন্যায়সঙ্গতভাবে মাপবে ও ওজন করবে। লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দেবে না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাবে না। যদি তোমরা মুমিন হও, তবে আল্লাহ অনুমোদিত যা বাকি থাকবে তোমাদের জন্যে তাই উত্তম। আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নই। (সূরা হূদ : ৮৪-৮৬)

ইবনে আব্বাস রাযি. ও হাসান বসরী রহ. بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন : رزق الله خير من اخذ اموال الناس অর্থাৎ– 'আল্লাহ যা কিছু রিযিক তোমাদেরকে দান করেন তা ওই সব সম্পদের তুলনায় অনেক ভালো যা তোমরা মানুষের থেকে জোরপূর্বক আদায় কর।'

ইবনে জারীর রহ. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন; ওজনে কম দিয়ে মানুষের সম্পদ নেওয়ার চাইতে মাপ ও ওজন সঠিকভাবে পুরোপুরি দেওয়ার পর যা কিছু মুনাফা অবশিষ্ট থাকে, তা–ই তোমাদের জন্যে বহুগুণে উত্তম। ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে এরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। হাসান বসরী রহ. যে ব্যাখ্যা করেছেন নিম্নের আয়াত তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ : قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ

'বল, পবিত্র বস্তু ও অপবিত্র বস্তু সমান হয় না, যদিও অপবিত্র বস্তুর আধিক্য তোমার কাছে আকর্ষণীয় হোক না কেন।' অর্থাৎ হালাল জিনিস যদি কমও হয় তবুও তা তোমাদের জন্যে ভালো, হারাম জিনিস থেকে; যদিও তা বেশি হয়। কেননা হালাল জিনিস কম হলেও তা বরকতময়; পক্ষান্তরে হারাম জিনিস বেশি হলেও তা বরকত শূন্য। আল্লাহ বলেছেন :

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ

"আল্লাহ সুদকে বিলুপ্ত করেন এবং দান-সদকাকে বৃদ্ধি করেন।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সুদের মাল যতই বেশি হোক না কেন, ক্রমান্বয়ে তা ফুরিয়ে যায়। ইমাম আহমদ রহ. তাঁর মুসনাদে এ হাদিস বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, ক্রয়-বিক্রয়ে ক্রেতা ও বিক্রেতার জন্যে গ্রহণ ও বর্জনের ইখতিয়ার থাকে যতক্ষণ তারা আলাদা হয়ে না যায়। যদি তারা সততার সাথে বেচা-কেনা করে এবং পণ্যের দোষ-গুণ প্রকাশ করে দেয় তা হলে এ ব্যবসায়ে উভয়কে বরকত দান করা হয়। আর যদি তারা পণ্যের দোষ-গুণ গোপন রাখে এবং মিথ্যার আশ্রয় নেয়, তা হলে উভয়ের থেকে এ বেচা-কেনায় বরকত উঠিয়ে নেওয়া হয়। মোটকথা, হালাল মুনাফা কম হলেও তাতে বরকত হয়, কিন্তু হারাম মুনাফা বেশি হলেও তাতে বরকত থাকে না। এ কারণেই নবী শুআইব আ. বলেছিলেন :

بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

আল্লাহর অনুমোদিত যা-ই বাকি থাকে তা-ই তোমাদের জন্যে উত্তম, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

আল্লাহর বাণী : وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ 'আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নই' অর্থাৎ তোমাদেরকে আমি যা করার নির্দেশ দিয়েছি তোমরা তা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে কর, আমাকে বা অন্যকে দেখাবার জন্যে নয়।

আল্লাহর বাণী :

قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ

তারা বলল, হে শুআইব! তোমার সালাত কি তোমাকে নির্দেশ দেয়, আমাদের পিতৃ-পুরুষরা যার ইবাদত করতো আমাদেরকে তা বর্জন করতে হবে এবং আমরা ধন-সম্পদ সম্পর্কে যা করি তাও না? তুমি তো অবশ্যই সহিষ্ণু, সদাচারী। (সূরা হূদ : ৮৭)

শুআইব আ.-এর সম্প্রদায় এ কথাটি ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও উপহাসস্বরূপ বলেছে। তারা বলেছে, এই যে সালাত তুমি পড়ছ, তা কি তোমাকে আমাদের বিরোধিতা করতে বলে, আমরা কেবল তোমার আল্লাহরই ইবাদত করব এবং আমাদের পূর্ব-পুরুষগণ যাদের ইবাদত করত, তাদেরকে ত্যাগ করে দেব? কিংবা তুমি যেভাবে চাও সেভাবে আমরা আমাদের লেনদেন করব আর যেভাবে চাও না সেভাবে আমাদের পছন্দনীয় লেনদেন করা ছেড়ে দেব? إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ (নিশ্চয় তুমি একজন ধৈর্যশীল, সত্যপন্থী) এ প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস রাযি., মায়মুন ইবনে মিহরান, ইবনে জুরায়জ, যায়েদ ইবনে আসলাম রাযি. এবং ইবনে জারীর রহ. বলেন, এ উক্তি তারা ঠাট্টা ও বিদ্রূপাত্মকভাবে করেছে।

قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (٨٨)

শুআইব বলল, হে আমার সম্প্রদায়! এ ব্যাপারে তোমরা ভেবে দেখেছ কি, আমি যদি আমার পালনকর্তার সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি, আর তিনি যদি আমাকে তাঁর কাছ থেকে উত্তম রিযিক দান করেন, তবে কি করে আমি আমার কর্তব্য থেকে বিরত থাকবো? আমি তোমাদেরকে যা নিষেধ করি, আমি নিজে তা করতে ইচ্ছা করি না। আমি আমার সাধ্যমত সংস্কার করতে চাই। আমার কার্য-সাধন তো আল্লাহরই সাহায্যে। আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং আমি তাঁরই অভিমুখী। (সূরা হূদ : ৮৮)

এখানে হযরত শুআইব আ. কোমল ভাষায় কিন্তু সুস্পষ্ট ইংগিতে তাঁর সম্প্রদায়কে সত্যের দিকে দাওয়াত দিচ্ছেন। তিনি বলছেন– তোমরা কি একটু চিন্তা করে দেখেছ, হে মিথ্যাবাদীর দল! أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي 'আমি যদি আমার রবের প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি।' অর্থাৎ আল্লাহর সুস্পষ্ট নির্দেশের উপর, তিনি আমাকে তোমাদের নিকট রাসূলরূপে প্রেরণ করেছেন : وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا 'এবং তাঁর কাছ থেকে আমাকে উত্তম রিযিক দান করেছেন' উত্তম রিযিক অর্থ নবুয়ত ও রিসালাত।

অর্থাৎ তোমরা যদি তা বুঝতে না পার, তবে তোমাদের ব্যাপারে আমার আর কি করার আছে? এ কথাটি ঠিক তদ্রূপ যা নূহ আ. তাঁর জাতিকে বলেছিলেন :

وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ

'যে কাজ করতে আমি তোমাদেরকে নিষেধ করি আমি সে কাজ নিজে করতে ইচ্ছা করি না।' অর্থাৎ তোমাদেরকে যে কাজ করতে আদেশ করি সে কাজ সর্বপ্রথম আমিই করি; আর যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করি তা থেকে সর্বপ্রথম আমি-ই বিরত থাকি। বস্তুত পক্ষে এটা একটা উৎকৃষ্ট ও মহৎ গুণ। এর বিপরীত আচরণ অত্যন্ত জঘন্য ও নিকৃষ্ট। বনি ইসরাঈলের শেষ দিকের আলেম ও ধর্মোপদেশদাতারা এই দোষে দুষ্ট ছিলেন। আল্লাহ বলেন :

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

'তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মের আদেশ দাও এবং নিজেদেরকে বিস্মৃত হও? অথচ তোমরাই তো কিতাব অধ্যয়ন করো। তবে কি তোমরা বুঝ না?' (সূরা বাকারা : ৪৪)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় সহি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। তার পেট থেকে নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে যাবে এবং তা নিয়ে সে ঘুরপাক খেতে থাকবে, যেমনটি গাধা আটা পেষার চাক্কি নিয়ে চক্রাকারে ঘুরতে থাকে। দোযখবাসীরা বলবে, তুমি না দুনিয়াতে আমাদেরকে সৎকাজের আদেশ দিতে এবং অসৎকাজে নিষেধ করতে? সে বলবে, হ্যাঁ, আমি সৎকাজের আদেশ করতাম, কিন্তু নিজে তা করতাম না এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করতাম, কিন্তু আমি নিজেই তা করতাম। এ আচরণ নবীদের নীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী– পাপিষ্ঠ ও দুর্বৃত্তদের নীতি। পক্ষান্তরে জ্ঞানী-গুণী ওলামা যাঁরা না দেখেই আল্লাহকে ভয় করে চলে, তাঁদের অবস্থা হয় সেই রকম, যেমন নবী শুআইব আ. বলেছেন :

وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ

"আমার যাবতীয় কর্মতৎপরতার উদ্দেশ্য হল, সাধ্য অনুযায়ী কথা ও কাজের সংশোধন ও সংস্কার করা।

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

অর্থাৎ– 'সর্বাবস্থায় আল্লাহই আমাকে সাহায্য ও ক্ষমতা দান করবেন। সকল বিষয়ে তাঁর উপরই আমি ভরসা রাখি এবং সকল ব্যাপারে তাঁর দিকেই আমি প্রত্যাবর্তন করি।'

এ হল তারগীব বা উৎসাহ প্রদান। এরপর হযরত শুআইব আ. কিছুটা তারহীব বা ধমকের সুরে বলেন :

وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ

وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ (٨٩)

হে আমার সম্প্রদায়! আমার বিরোধিতা যেন কিছুতেই তোমাদেরকে এমন অপরাধ না করায়, যাতে তোমাদের উপর তার অনুরূপ বিপদ আসবে, যেরূপ বিপদ আপতিত হয়েছিল কওমে নূহ, কওমে হূদ কিংবা কওমে সালেহের উপর আর কওমে লূত তো তোমাদের থেকে খুব দূরে নয়। (সূরা হূদ : ৮৯)

এরপর ভয় ও আগ্রহ সৃষ্টি সমন্বিত আহ্বানস্বরূপ বলেন :

وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ (٩٠)

'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, তাঁর কাছে তওবা কর। আমার প্রতিপালক নিশ্চয় দয়ালু প্রেমময়।' (সূরা হূদ : ৯০)

অর্থাৎ তোমরা যেসব অপরাধে জড়িত আছ, তা বর্জন কর এবং দয়াময় প্রেমময় প্রতিপালকের নিকট তওবা কর। কেননা, যে ব্যক্তি তাঁর কাছে তওবা করে, তিনি তার তওবা কবুল করেন। কারণ সন্তানের প্রতি মাতার স্নেহের চেয়ে বান্দাহর প্রতি আল্লাহর দয়া অধিকতর।

قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا

তারা বলল, হে শুআইব! তুমি যা বল তার অধিকাংশই আমরা বুঝি না, আমরা তো তোমাকে আমাদের মধ্যে দুর্বল– শক্তিহীন দেখতে পাচ্ছি। (সূরা হূদ : ৯১)

ইবনে আব্বাস, সাঈদ ইবনে জুবায়র রাযি. ও সাওরি রহ. বলেছেন, হযরত শুআইব আ.-এর চোখে দৃষ্টিশক্তি ছিল না। মারফু হাদিসে বর্ণিত, আল্লাহর মহব্বতে নবী শুআইব আ. এত অধিক পরিমাণ কান্নাকাটি করেন, তিনি অন্ধ হয়ে যান। আল্লাহ তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেন। আল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, হে শুআইব! তোমার কান্নাকাটি কি জাহান্নামের ভয়ে, নাকি জান্নাতের লোভে? শুআইব আ. বলেন বরং আপনার মহব্বতেই কাঁদি। আমি যখন আপনাকে দেখব, তখন আমার প্রতি কি করা হবে তার পরোয়া আমি করি না। আল্লাহ তখন অহির মাধ্যমে জানালেন, হে শুআইব! আমার সাথে তোমার সাক্ষাৎ খুবই আনন্দময় হবে। এ জন্যে আমি ইমরানের পুত্র মূসা কালীমুল্লাহকে তোমার খিদমতে নিয়োগ করেছি।

وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ (٩١)

তোমার আত্মীয়বর্গ না থাকলে আমরা তোমাকে পাথর মেরে হত্যা করতাম। তুমি আমাদের উপর শক্তিশালী নও। (সূরা হূদ : ৯১)

শুআইব আ. বললেন :

قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ

(হে আমার সম্প্রদায়! আমার আত্মীয়-স্বজন কি আল্লাহর চাইতেও তোমাদের উপর অধিক শক্তিশালী?)।

অর্থাৎ তোমরা আমার গোত্র ও স্বজনদেরকে ভয় কর এবং তাদের কারণে আমাকে খাতির করছ, অথচ আল্লাহর পাকড়াওকে ভয় করছ না এবং আল্লাহর রাসূল হওয়ার কারণে আমাকে খাতির করছ না। ফলে প্রমাণিত হচ্ছে, আমার গোত্র ও আত্মীয়-স্বজনই তোমাদের উপর আল্লাহর চাইতে অধিক শক্তিশালী।

وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا

(আর আল্লাহকে তোমরা পশ্চাতে ফেলে রেখেছ) অর্থাৎ আল্লাহর দিকে তোমরা পিঠ দিয়ে রেখেছে।

إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (٩٢)

(তোমরা যা-ই কর, আমার প্রতিপালক তা পরিবেষ্টন করে আছেন।)

অর্থাৎ তোমরা যা কিছু কাজ-কর্ম কর না কেন, সে সব বিষয়ে আল্লাহ পূর্ণভাবে অবগত আছেন। যখন তাঁর কাছে ফিরে যাবে, তখন তিনি এর প্রতিফল দান করবেন।

وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ

وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيب

হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের অবস্থানের উপর থেকে কাজ কর, আমি আমার কাজ করতে থাকি। অচিরেই জানতে পারবে, আযাব কার উপর আসে, যা তাকে লাঞ্ছিত করে ছাড়বে? এবং আরও জানতে পারবে যে, মিথ্যাবাদী কে? তোমরা অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় থাকলাম। (সূরা হূদ : ৯৩)

আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তাতে যদি তোমাদের কোনো দল বিশ্বাস করে এবং কোনো দল বিশ্বাস না করে, তবে ধৈর্যধারণ কর, যতক্ষণ না আল্লাহ্ আমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেন। আর তিনিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী। তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক প্রধানরা বলল, 'হে শুআইব। তোমাকে ও তোমার সাথে যারা বিশ্বাস করেছে তাদেরকে আমাদের জনপদ থেকে বের করে দেবই। অথবা তোমাদেরকে আমাদের ধর্মাদর্শে ফিরে আসতে হবে।' সে বলল, আমরা তা ঘৃণা করলেও? তোমাদের ধর্মাদর্শ থেকে আল্লাহ্ আমাদেরকে উদ্ধার করার পর যদি আমরা তাতে ফিরে যাই তবে তা আমরা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করব। আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ ইচ্ছা না করলে আর ওতে ফিরে যাওয়া আমাদের কাজ নয়। সব কিছুই আমাদের প্রতিপালকের জ্ঞানায়ত্ত। আমরা আল্লাহর প্রতি নির্ভর করি; হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায্যভাবে মীমাংসা করে দিন এবং আপনিই মীমাংসাকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। (সূরা আরাফ : ৮৭-৮৯)

এভাবে হযরত শুআইব আ. তাঁর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেন। আর আল্লাহর রাসূলদের যারা অস্বীকার করে, অবাধ্য হয় ও বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের

বিরুদ্ধে রাসূলদের প্রার্থনা তিনি প্রত্যাখ্যান করেন না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সম্প্রদায়ের লোক যে নীতির উপর ছিল তার উপরই তারা অটল অবিচল হয়ে রইল।

আল্লাহর বাণী :

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ

'অনন্তর তাদেরকে ভূমিকম্প পাকড়াও করল। ফলে তারা সকালবেলায় ঘরের মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।' (সূরা আ'রাফ : ৯০-৯১)

সূরা আরাফে বলা হয়েছে, ভূমিকম্প তাদেরকে পাকড়াও করেছিল।এক মহাকম্পন তাদের গোটা আবাসভূমিকে সজোরে আঘাত করে। ফলে তাদের দেহ থেকে রূহ উধাও হয়ে যায়। গোটা এলাকার জীব-জন্তুর মতো নিশ্চল হয়ে পড়ে। তাদের শবদেহগুলো নিথর হয়ে যত্রতত্র পড়ে থাকে। উক্ত জনগোষ্ঠীর উপর আল্লাহ বিভিন্ন প্রকার আযাব ও শাস্তি নাযিল করেন।

যখন তারা বিভিন্ন প্রকার অন্যায় ও জঘন্য পাপাচারে লিপ্ত হল, তখন আল্লাহ তাদের উপর মহাকম্পন পাঠালেন। যার ফলে সকল চলাচল মুহূর্তে বন্ধ হয়ে যায়। বিকট আওয়াজ পাঠান যার ফলে অপর সকল আওয়াজ নীরব হয়ে যায়। আগুনের মেঘ পাঠান, যার লেলিহান শিখা চতুর্দিক থেকে তাদেরকে বেষ্টন করে ফেলে।

বিভিন্ন সূরায় আলোচনার পূর্বাপরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে যেখানে যেমন প্রয়োজন আল্লাহ সেখানে ততটুকুই উল্লেখ করেছেন। সূরা আরাফের বক্তব্যে কাফের সর্দাররা আল্লাহর নবী ও তাঁর সাথীদেরকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে। এলাকা থেকে বহিষ্কারের হুমকি দেয় বা তাদেরকে তাদের পূর্বের কুফরি ধর্ম গ্রহণ করতে হবে। এই পটভূমিতে আল্লাহ বলেন :

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ

'এরপর ভূমিকম্প তাদেরকে আঘাত করল। ফলে তারা তাদের ঘরের মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।'

এখানে তাদের বহিষ্কারের হুমকি ও ধমকের মোকাবিলায় ভূমিকম্পের কথা এবং ভীতি প্রদর্শনের মোকাবিলায় ভয়ের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং পূর্বাপর আলোচনার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়েছে। অপর দিকে সূরা হূদে বলা হয়েছে– এক বিকট শব্দ তাদেরকে আঘাত করে। ফলে তারা নিজেদের ঘর-বাড়িতে উপুড় হয়ে পড়ে থাকে। আল্লাহ বলেন :

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

এরপর তারা তাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করলো। ফলে তাদেরকে মেঘাচ্ছন্ন দিবসের আযাব পাকড়াও করল। নিশ্চয়ই সেটা ছিল এক ভীষণ দিবসের আযাব।

(সূরা শুআরা : ১৮৯)

মুফাসসিরগণ বলেছেন : শুআইব আ.-এর সম্প্রদায় প্রচণ্ড গরমে আক্রান্ত হয়। আল্লাহ সাত দিন পর্যন্ত তাদের ওপর বায়ু প্রবাহ বন্ধ রাখেন। ফলে পানি, ছায়া ও ঝর্ণাধারা তাদের কোনো কাজে আসে নি। তখন তারা ঘর-বাড়ি ছেড়ে উন্মুক্ত প্রান্তরে চলে যায়। এক টুকরো মেঘ এসে তাদেরকে ছায়াদান করে। সম্প্রদায়ের সবাই ঐ মেঘের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণের উদ্দেশ্যে সমবেত হয়। সকলে যখন সমবেত হল তখন আল্লাহ তাদের উপর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও জ্বলন্ত অঙ্গার নিক্ষেপ করেন। গোটা এলাকায় প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয় এবং আকাশ থেকে এক ভয়াবহ নাদ আসে। ফলে সকলের প্রাণ বায়ু উড়ে যায়, ঘরবাড়ি উজাড় হয়ে যায়। যারা শুআইব আ.-কে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করেছিল, তারা এভাবে নিশ্চিহ্ন হলো, এখানে যেন তারা কোনো দিনই বসবাস করে নি। যারাই শুআইব আ.-কে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করেছে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হল। পক্ষান্তরে আল্লাহ শুআইব আ.-কে ও তাঁর সঙ্গের মুমিনদের আযাব থেকে রক্ষা করেন। আল্লাহ বলেন :

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ (٩٤) كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ

যখন আমার নির্দেশ এল, তখন আমি শুআইব ও তার সঙ্গী ঈমানদারগণকে আমার অনুগ্রহে রক্ষা করেছিলাম। তারপর যারা সীমালংঘন করেছিল, মহানাদ তাদেরকে আঘাত হানলো। ফলে তারা নিজ নিজ ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। যেন তারা সেখানে কখনও বসবাসই করে নি। জেনে রেখো, ধ্বংসই ছিল মাদায়েনবাসীদের পরিণাম, যেভাবে ধ্বংস হয়েছিল সামুদ সম্প্রদায়। (সূরা হূদ : ৯৪-৯৬)

সম্প্রদায়ের ধ্বংসের পর হযরত শুআইব আ. দুঃখ করে যে কথা বলেছিলেন সে প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী :

يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ

'হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদেরকে আমার প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছিয়ে দিয়েছি এবং তোমাদের উপদেশ দিয়েছি। এখন আমি কাফের সম্প্রদায়ের জন্যে কী করে আক্ষেপ করি।' (সূরা আ'রাফ : ৯৩)

অর্থাৎ তাদের ধ্বংসের পরে তিনি তাদের এলাকা থেকে এই কথা বলে চলে আসেন : যে,

يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ

(হে আমার সম্প্রদায়! আমি আমার প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছিয়ে দিয়েছি এবং তোমাদেরকে উপদেশ দান করেছি।)

অর্থাৎ, আল্লাহর পয়গাম পৌঁছিয়ে দেওয়ার ও উপদেশ দেওয়ার যে দায়িত্ব আমার ওপর অর্পণ করা হয়েছিল তা আমি পূর্ণরূপে আদায় করেছি। তোমাদের হেদায়েতের

জন্যে আমি সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমার এ সব প্রচেষ্টা তোমাদের কোনো উপকারে আসে নি। কেননা যে ব্যক্তি ভ্রান্ত পথে চলে আল্লাহ তাকে হেদায়েত করেন না। আর তার কোনো সাহায্যকারীও থাকে না। অতএব, এরপর আমি তোমাদের ব্যাপারে আক্ষেপ করব না।

হাফেয ইবনে আসাকির রহ. তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.-এর উক্তি উল্লেখ করেছেন– হযরত শুআইব আ. হযরত ইউসুফ আ.-এর পরবর্তীকালের লোক।

ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ রহ. থেকে বর্ণিত, হযরত শুআইব আ. ও তাঁর সঙ্গী মুমিনগণ সকলেই মক্কা শরীফে ইনতিকাল করেন এবং তাঁদের কবর কাবা গৃহের পশ্চিম পাশে দারুন নদওয়া ও দারে বনি সাহমের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত।

শুআইব আ.-এর কবর

হাযরা মাউত নামক স্থানে একটি কবর রয়েছে, যা বিশিষ্ট ও সাধারণ সকল মুসলমানের যেয়ারতের স্থান হয়ে রয়েছে। তথাকার অধিবাসীদের দাবি– এটি হযরত শুআইব আ.-এর মাযার। হযরত শুআইব আ. মাদায়েন ধ্বংস হয়ে গেলে এখানে এসে বসতি করেন। এখানেই তাঁর ইনতেকাল হয়। হাযরা মাউতের বিখ্যাত শহর 'শিউন'-এর পশ্চিম দিকে একটি জায়গা আছে যাকে 'শাবাম' বলে। সেখানে যদি কোনো ভ্রমনকারী 'ওয়াদিয়ে ইবনে আলী'র পথ ধরে উত্তর দিকে চলতে থাকে, তবে উক্ত ওয়াদীর পরে সেই স্থানটি আসে, যেখানে এই কবরটি অবস্থিত। এখানে কোনো বসতি নেই। যারাই এখানে আসে শুধু যিয়ারতের উদ্দেশ্যেই এসে থাকে।

আবদুল ওয়াহাব নাজ্জার বলেন, আমার সন্দেহ রয়েছে, এটা হযরত শুআইব আ.-এর কবর কি না। কিন্তু তিনি এই সন্দেহের কোনো কারণ বর্ণনা করেন নি।

হযরত আইয়ুব আ.

হযরত আইয়ুব আ.-এর পরিচয়

ইবনে ইসহাক রহ. বলেন, হযরত আইয়ুব আ. ছিলেন রোমের বাসিন্দা। তাঁর বংশধারা হলো : আইয়ুব ইবনে মূস ইবনে যারাহ ইবনুল ঈস ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম খলীল আ.। কেউ কেউ বলেছেন, আইয়ুব ইবনে মূস ইবনে রাবীল ইবনুল ঈস ইবনে ইসহাক ইবনে ইয়াকুব আ.। এ ছাড়া অন্য মতও আছে।

ইবনে আসাকির রহ. লিখেছেন, আইয়ুব আ.-এর মা ছিলেন হযরত লূত আ.-এর কন্যা। কেউ কেউ বলেছেন, হযরত আইয়ুব আ.-এর পিতা সেই ঈমানদারদের একজন, যারা হযরত ইবরাহীম আ.-কে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপের দিন ঈমান এনেছিলেন। কিন্তু প্রথম মতই অধিক প্রসিদ্ধ। কেননা তিনি ছিলেন ইবরাহীম আ.-এর বংশধর। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে :

وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

আর তার (ইবরাহীমের) বংশধরদের মধ্যে রয়েছে দাউদ, সুলাইমান, আইয়ুব, ইউসুফ, মূসা ও হারূন। (সূরা আনআম : ৮৪)

সঠিক মতানুসারে এ আয়াতে ذرية বলতে ইবরাহীম আ.-এর বংশধরদের বোঝানো হয়েছে; নূহ আ.-এর বংশধর নয়। হযরত আইয়ুব আ. ছিলেন সেসব নবীদের অন্যতম, যাদের নিকট ওহি পাঠানো হয়েছে বলে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ

"আমি তোমার কাছে 'ওহি' প্রেরণ করেছি, যেমন নূহ ও তার পরবর্তী নবীগণের কাছে প্রেরণ করেছিলাম। ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার বংশধরগণ, ঈসা, আইয়ুব, হারূন এবং সুলাইমানের কাছে ওহি প্রেরণ করেছিলাম।"

(সূরা নিসা : ১৬৩)

সুতরাং বিশুদ্ধ মতে, হযরত আইয়ুব আ. ছিলেন ঈস ইবনে ইসহাক আ.-এর বংশধর। আবার তাঁর স্ত্রীর নামের ব্যাপারেও বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। কারো মতে লাইয়া বিনতে ইয়াকুব। কারো মতে রুহমা বা রহিমা বিনত আফরাইম। কারো মতে মানশা বিনতে ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব। শেষোক্ত মতই বেশি প্রসিদ্ধ। এ কারণে আমরা এখানে এ মতেরই উল্লেখ করেছি।

কোরআন মাজিদে হযরত আইয়ুব আ.

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন :

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (٨٣) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ

"এবং স্মরণ কর আইয়ুবের কথা! যখন সে তার প্রতিপালককে আহ্বান করে বলেছিল, আমি দুঃখ-কষ্টে পড়েছি। তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম। তার দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত করে দিলাম। ফিরিয়ে দিলাম তাকে তার পরিবার-পরিজন এবং তাদের সঙ্গে তাদের মতো আরো দিয়েছিলাম আমার বিশেষ রহমতরূপে। আর এটি ইবাদতকারীদের জন্যে উপদেশস্বরূপ।"

(সূরা আম্বিয়া : ৮৩-৮৪)

সূরা ছোয়াদে আল্লাহ বলেন :

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ (٤١) ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ (٤٢) وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ (٤٣) وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ

"স্মরণ কর আমার বান্দা আইয়ুবকে! যখন সে তার প্রতিপালককে আহ্বান করে বলেছিল, শয়তান তো আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলেছে। আমি তাকে বললাম, তুমি তোমার পা দিয়ে ভূমিতে আঘাত কর! এই তো গোসলের সুশীতল পানি আর পানীয়। আমি তাকে দিলাম তার পরিজনবর্গ ও তাদের মতো আরো আমার অনুগ্রহস্বরূপ। এটি বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্যে উপদেশস্বরূপ। আমি তাকে আদেশ করলাম, এক মুঠো তৃণ লও এবং তা দিয়ে আঘাত কর; শপথ ভঙ্গ করো না। আমি তাকে পেলাম ধৈর্যশীল। কত উত্তম বান্দা সে! সে ছিল আমার অভিমুখী।" (সূরা ছোয়াদ : ৪১-৪৪)

নবুয়তের ক্রমধারা

ইবনে আসাকির রহ. কালবি রহ. সূত্রে বর্ণনা করেছেন, সর্বপ্রথম প্রেরিত নবী হযরত ইদরিস আ.। তার পরে নূহ, তারপর ইবরাহীম আ.। তারপর ইসমাইল, তারপর ইসহাক, তারপর ইয়াকুব, তারপর ইউসুফ আ.। তারপর লূত, তারপর হূদ, তারপর সালেহ, তারপর শুআইব, তারপর মূসা ও হারূন, তারপর ইলিয়াস, তারপর আল-ইয়াসা, তারপর উরফী ইবনে সুওয়ায়লিখ ইবনে আফরাইম ইবনে ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব আ.। তারপর ইউনুস আ. ইবনে মাত্তা– ইয়াকুবের বংশধর। তারপর আইয়ুব ইবনে যারাহ ইবনে আমুস ইবনে লায়ফারাম ইবনুল ঈস ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম আ.। উক্ত ক্রমধারায় কোনো কোনো নামের ক্ষেত্রে আপত্তি আছে। কেননা প্রসিদ্ধ মতে হূদ ও সালেহ আ.-এর আগমন হযরত নূহ আ.-এর পরে ও ইবরাহীম আ.-এর পূর্বে হয়েছিল।

ধন-সম্পদ ও পরীক্ষা

তাফসিরকারকগণ বলেছেন, হযরত আইয়ুব আ. ছিলেন সেকালের একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি। সকল প্রকার সম্পদের অধিকারী। চতুষ্পদ প্রাণী, গৃহপালিত পশু, দাস-দাসী এবং হাওরান অঞ্চলের বুছায়না এলাকার বিশাল জমির মালিকানা।

ইবনে আসাকির রহ. বর্ণনা করেন, হযরত আইয়ুব আ.-এর এ সব সম্পদ ছাড়াও আরো ছিল প্রচুর সন্তান ও পরিবার-পরিজন। পরে এ সব কিছু তাঁর থেকে ছিনিয়ে নিয়ে নানা প্রকার দৈহিক ব্যাধি দ্বারা তাকে পরীক্ষায় ফেলা হয়। শরীরের সর্বাঙ্গে রোগ ছিল। শুধু জিহবা ও হৃৎপিণ্ড ব্যতীত কোনো একটি স্থানও অক্ষত ছিল না। এ দুই অঙ্গ দ্বারা তিনি আল্লাহর যিকির করতেন। এতসব মুসিবত সত্ত্বেও তিনি ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা দেখান। রাত-দিন আল্লাহর যিকিরে রত থাকেন। রোগ দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় বন্ধু-বান্ধব, আপনজন তাঁর কাছ থেকে সরে যেতে থাকে। একে একে সবাই তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অবশেষে তাঁকে শহরের বাইরে এক আবর্জনাময় স্থানে ফেলে রাখা হয়।

স্ত্রীর স্বামীভক্তি

একমাত্র স্ত্রী ছাড়া অন্য কেউ তার খোঁজ-খবর রাখত না। সুতরাং স্বামীর অধিকার, তার পূর্বের ভালোবাসা ও অনুগ্রহের কথা মনে রেখে স্ত্রী তাঁর সেবায় নিয়োজিত থাকেন। স্ত্রী তাঁর অবস্থার প্রতি লক্ষ রাখতেন। পেশাব-পায়খানায় সাহায্য করতেন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেবা করতেন। এভাবে স্ত্রীও ক্রমশ দুর্বল হতে থাকেন। অর্থাভাব দেখা দেয়। ফলে তিনি মানুষের বাড়িতে কাজ করে সেই পারিশ্রমিক দ্বারা স্বামীর আহার্য ও ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করতে বাধ্য হন। এক সময় স্ত্রীর জন্য সামান্য অর্থও যোগাড় করা কষ্টসাধ্য হয়ে গেল। তবুও তিনি অসীম ধৈর্যের পরিচয় দেন। সম্পদ ও সন্তানাদি হারিয়েছেন, স্বামীর করুণ অবস্থা, অর্থের অভাব, মানুষের সাহায্য-সহানুভূতিও নেই, এ সব প্রতিকূল অবস্থা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে মুকাবিলা করেন। অথচ সম্পদ-ঐশ্বর্য, বন্ধু-বান্ধব ইতোপূর্বে সবই তাঁদের ছিল। সহি হাদিসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الصَّالِحُوْنَ، ثُمَّ الأَمْثَلُ فَالأَمْثَلُ، فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِيْنِهِ، فَإِنْ كَانَ دِيْنُهُ صَلَابَةً زِيْدَ فِيْ بَلَائِهِ.

"সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা হয় নবীগণের। তারপর সত্যপন্থী লোকদের। এরপর দীনদারী বা ধার্মিকতার স্তরভেদে পর্যায়ক্রমে এ পরীক্ষা চলে। যদি সে দৃঢ়তার সঙ্গে দীনের আনুগত্য করতে থাকে, তবে তার পরীক্ষাও কঠোরতর হয়।"

পরম ধৈর্য

উল্লিখিত বিপদ-আপদ হযরত আইয়ুব আ.-এর ক্ষেত্রে যতই বৃদ্ধি পেয়েছে ততই তাঁর ধৈর্যসহ্য এবং আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনকি তাঁর ধৈর্য ও বিপদাপদ পরবর্তীকালে প্রবাদে পরিণত হয়ে যায়। ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ ও অন্য অনেকে ইসরাঈলী ওলামাদের বরাতে হযরত আইয়ুব আ.-এর সম্পদ ও সন্তানাদি নিঃশেষিত হওয়া ও দেহের রোগ সম্পর্কে দীর্ঘ বর্ণনা দান করেছেন। আল্লাহ পাক সেগুলোর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।

রোগ-ব্যাধি

মুজাহিদ রহ. বলেছেন, পৃথিবীতে হযরত আইয়ুব আ.-এরই সর্বপ্রথম বসন্ত রোগ হয়। তবে ঠিক কতদিন তা স্থায়ী হয়েছিল, এ সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। ওহাবের মতে, তা ছিল তিন বছর– এর কম-বেশি নয়। হযরত আনাস রাযি. বলেন, সাত বছর কয়েক মাস পর্যন্ত তাঁর পরীক্ষা চলে। এ সময়ে তাঁকে বনি ইসরাঈলের একটি আবর্জনাময় স্থানে ফেলে রাখা হয়। বিভিন্ন রকম কীট তাঁর দেহের ওপর দিয়ে চলাচল করত। এরপর আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। এবং বিপুলভাবে তাকে পুরস্কৃত করেন এবং তাঁর প্রশংসাও করেন।

আঠার বছরের কথাও বর্ণিত আছে। সুদ্দী রহ. বলেছেন, আইয়ুব আ.-এর দেহ থেকে গোশত খসে খসে পড়ে। এমনকি তাঁর হাড় ও শিরা ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। তাঁর স্ত্রী তাঁর দেহের নিচে ছাই বিছিয়ে দিতেন। এ অবস্থা যখন দীর্ঘ দিন ধরে চলতে থাকে, তখন একবার স্ত্রী বললেন : হে আইয়ুব! আপনি যদি আপনার প্রতিপালকের কাছে দুআ করতেন, তা হলে তিনি এ বিপদ থেকে আপনাকে উদ্ধার করতেন। তদুত্তরে আইয়ুব আ. বললেন, আমি সত্তর বছর সুস্থ দেহে জীবন যাপন করেছি। এখন তার জন্যে সত্তর বছর সবর করলেও তা নগণ্যই হবে। স্বামীর মুখে এ কথা শুনে স্ত্রী ঘাবড়ে যান। তখন থেকে তিনি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মানুষের কাজকর্ম করে আইয়ুব আ.-এর আহার্যের বন্দোবস্ত করতেন।

স্ত্রীর চুল বিক্রি

কিছুদিন পর লোকজন যখন জানল, এ মহিলাটি আইয়ুব আ.-এর স্ত্রী, তখন আর তারা তাঁকে কাজে নিত না। তাদের ভয় হল, এর কারণে আইয়ুব আ.-এর রোগ হয়তো তাদের মধ্যে সংক্রমিত হবে। কাজেই একবার স্ত্রী কোথাও কাজ খুঁজে না পেয়ে অবশেষে জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কন্যার কাছে খুব উন্নতমানের খাদ্যের বিনিময়ে নিজের চুলের দুটি বেনীর একটি বিক্রি করে দেন। উক্ত খাদ্য নিয়ে তিনি স্বামীর কাছে উপস্থিত হন। আইয়ুব আ. জিজ্ঞেস করলেন, এ খাদ্য কোথায় পেয়েছ? স্ত্রী জানালেন, অন্যের কাজ করে এ খাদ্য সংগ্রহ করেছি। পরের দিনও স্ত্রী কোথাও কাজ না পেয়ে অবশিষ্ট বেনীটিও খাদ্যের বিনিময়ে বিক্রি করে দেন। উক্ত খাদ্য আইয়ুব আ.-এর কাছে নিয়ে এলে এবারও তিনি অসন্তুষ্ট হন এবং কসম করেন, কোথা থেকে কিভাবে এ খাদ্য তিনি পেলেন, না বলা পর্যন্ত তিনি তা খাবেন না। তখন স্ত্রী নিজ মাথা থেকে ওড়না সরিয়ে দেখান। আইয়ুব আ. স্ত্রীর মাথা মুণ্ডিত দেখে আল্লাহর কাছে দুআ করেন :

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

"হে আমার প্রতিপালক! আমি দুঃখে-কষ্টে পতিত হয়েছি আর আপনি তো সকল দয়ালুদের শ্রেষ্ঠ দয়ালু।" (সূরা আম্বিয়া : ৮৩)

ভাইদের সামনে সত্যতা প্রকাশ

ইবনে আবি হাতেম রহ. আবদুল্লাহ ইবনে উবায়েদ ইবনে উমায়ের রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আইয়ুব আ.-এর দুই ভাই ছিল। একবার তারা তাদের এ ভাইকে দেখতে আসে। কিন্তু আইয়ুব আ.-এর দেহের দুর্গন্ধের কারণে তারা তাঁর কাছে যেতে সক্ষম হল না; দূরে দাঁড়িয়ে থাকল। তখন একজন অপরজনকে বলল : আইয়ুবের মধ্যে কোনো কল্যাণ আছে বলে যদি আল্লাহ্ জানতেন, তা হলে তিনি এভাবে তাকে এরূপ কঠিন পরীক্ষায় ফেলতেন না। তাদের এ কথায় তিনি যারপরনাই মর্মাহত হন; এমনটি আর কখনো হন নি।

এরপর তিনি আল্লাহর কাছে দুআ করলেন, "হে আল্লাহ! আপনি যদি জানেন এমন একটি রাতও যায় নি, যে রাত্রে আমি পেট ভরে খানা খেয়েছি আর আমার জানা মতে কোনো ব্যক্তি ক্ষুধার্ত অবস্থায় থেকেছে। তা হলে আমার সত্যতা প্রকাশ করুন।" তখন আকাশ থেকে তাঁর কথার সত্যতা ঘোষণা করা হয় এবং ওই দুই ভাই শ্রবণও করে। তিনি পুনরায় বললেন, "হে আল্লাহ! আপনি যদি জানেন বস্ত্রহীন লোকের খবর পাওয়ায় আমি কখনো দুটি জামা গ্রহণ করি নি, তা হলে আমার সত্যতা প্রকাশ করুন।" তখন আকাশ থেকে তাঁর সত্যতা ঘোষণা করা হয়। দুই ভাই তাও শ্রবণ করেছিল। এরপর তিনি বলেন, "হে আল্লাহ! আপনার ইজ্জতের কসম! –এরপর সিজদায় পড়ে যান এবং বলেন– হে আল্লাহ! আপনার ইজ্জতের কসম! আমার বিপদ দূর না করা পর্যন্ত আমি মাথা উঠাব না।" সত্যই বিপদমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি আর মাথা উঠান নি।

ইবনে আবি হাতিম রহ. ও ইবনে জারীর রহ. উভয়ে হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযি. সূত্রে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আল্লাহর নবী আইয়ুব আ.-এর রোগ ১৮ বছর স্থায়ী ছিল। কাছের ও দূরের সকল লোক তাঁকে পরিত্যাগ করে যায়। কিন্তু দুই ব্যক্তি পরিত্যাগ করে নি। তারা ছিল তাঁর দুই ভাই। এ দুই ভাই ছিল তাঁর খুবই আদরের পাত্র। সকালে ও বিকালে তারা আইয়ুব আ.-এর কাছে আসত। একদিন এক ভাই অপরজনকে বলে, দেখ– আল্লাহ্ জানেন, আইয়ুব এমন কোনো পাপ করেছে, যা অন্য কোনো লোক কখনো করে নি। অপরজন বলল, কি সে পাপ? সে বলল, আজ ১৮টি বছর সে রোগে ভুগছে। আল্লাহ্ তাকে রহমত করেন নি। রোগ থেকে মুক্তি দেন নি।

বিকেলে যখন তারা আসল, তখন দ্বিতীয় ভাইটি আর ধৈর্য ধরতে পারল না। আইয়ুব আ.-এর কাছে তা বলে দিল। হযরত আইয়ুব আ. বললেন : তুমি কি বলছ, তা আমি বুঝি না। তবে আল্লাহ্ জানেন, একবার আমি দুই ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তারা পরস্পর ঝগড়া করছিল এবং আল্লাহর যিকির করছিল। আমি বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করলাম এবং তারা যে অনুপযুক্ত পরিবেশে আল্লাহর যিকির করেছে সে জন্যে তাদের পক্ষ থেকে আমি কাফ্‌ফারা আদায় করলাম।

রোগমুক্তি ও হারানো সম্পদ পুনর্লাভ

হযরত আইয়ুব আ. প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে যেতেন। প্রয়োজন শেষ হলে স্ত্রী তাঁর হাত ধরে নিয়ে আসতেন এবং স্ব-স্থানে রাখতেন। একবার স্বামীর কাছে আসতে স্ত্রীর দেরি হয়। এ সময়ে আল্লাহ আইয়ুব আ.-এর কাছে ওহি পাঠালেন :

ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ

"হে আইয়ুব! তোমার পা দ্বারা মাটিতে আঘাত কর। এই তো গোসলের ও পান করার ঠাণ্ডা পানি!"

বেশ কিছু সময় দেরি করে স্ত্রী আজ আইয়ুব আ.-এর কাছে আসলেন ও তাঁকে দেখতে লাগলেন। হযরত আইয়ুব আ. পূর্বের চেয়েও অধিক সুন্দর ও সুস্বাস্থ্যবান হয়েছেন। তিনি এ অবস্থায় স্ত্রীর সম্মুখে আসলেন। স্ত্রী তাকে চিনতে না পেরে বললেন, আল্লাহ তোমাকে বরকতময় করুন! এখানে আল্লাহর নবী রোগগ্রস্ত অবস্থায় অবস্থান করছিলেন, তাঁকে কি তুমি দেখেছ? আল্লাহর কসম! ওই নবী রোগে পড়ার পূর্বে যখন সুস্থ ছিলেন, তখন তাঁর যে চেহারা ছিল সে চেহারার সাথে তোমার চেহারার মতো অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ চেহারার লোক আমি আর কাউকে দেখি নি। হযরত আইয়ুব আ. বললেন, আমিই সেই লোক।

হযরত আইয়ুব আ.-এর বাড়িতে দুটি উঠান ছিল। একটি গম মাড়ানোর এবং আরেকটি যবের। আল্লাহ দুই খণ্ড মেঘ পাঠিয়ে দেন। এক খণ্ড গমের উঠানের উপর এসে স্বর্ণ বর্ষণ করে। পর্যাপ্ত বর্ষণের ফলে তা পরিপূর্ণ হয়ে গড়িয়ে যেতে থাকে। অপর খণ্ডটি যবের উঠানের উপর রৌপ্য বর্ষণ করে। তাও পরিপূর্ণ হয়ে গড়িয়ে যেতে থাকে। উপর্যুক্ত সকল বর্ণনা ইবনে জারীর রহ.-এর। তবে এ হাদিসের মারফূ বর্ণনা একান্তই 'গরীব' পর্যায়ের। এটা মওকুফ হওয়াই সঠিক।

ইবনে আবি হাতিম রহ. ইবনে আব্বাস রাযি. সূত্রে বর্ণনা করেন, আল্লাহ হযরত আইয়ব আ.-কে জান্নাতের পোশাক পরিধান করান। আইয়ুব আ. জান্নাতী পোশাক পরে একটু দূরে গিয়ে পথের পাশে বসে থাকেন। তারপর তাঁর স্ত্রী যখন সেখানে আসেন, তখন তিনি তাঁকে চিনতে না পেরে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর বান্দা! এখানে রোগগ্রস্ত যে লোকটি ছিল, তাঁকে সম্ভবত কুকুরে বা বাঘে নিয়ে গেছে! এভাবে লোকটির সাথে কিছু সময় ধরে স্ত্রী কথা বলতে থাকেন। লোকটি বলল, সম্ভবত আমিই সেই আইয়ুব। স্ত্রী বললেন, হে আল্লাহর বান্দা! আপনি কি আমার সাথে উপহাস করছেন? তখন তিনি বলে উঠলেন, আল্লাহ তোমাকে রহম করুন। আমিই তো আইয়ুব। আল্লাহ আমার সুস্বাস্থ্য ফিরিয়ে দিয়েছেন।

ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, আল্লাহ হযরত আইয়ুব আ.-কে পূর্বের সম্পদ ও সন্তান অবিকল ফিরিয়ে দেন এবং সেই সাথে সমপরিমাণ অতিরিক্ত দান করেন। ওহাব ইবনে

মুনাব্বিহ রহ. বলেন, আল্লাহ তাঁকে ওহির মাধ্যমে জানান : আমি তোমার সন্তানাদি ও ধন-সম্পদ ফিরিয়ে দিয়েছি এবং আরো সমপরিমাণ দান করেছি। এখন এই পানি দ্বারা তুমি গোসল কর। কারণ, এর দ্বারা তুমি আরোগ্য লাভ করবে। তোমার আপনজন ও আত্মীয়-স্বজনদের পক্ষ থেকে কুরবানি দাও এবং তাদের জন্যে ক্ষমা চাও। কেননা তোমার ব্যাপারে তারা আমার অবাধ্যতা করেছে।

ইবনে আবি হাতিম রহ. এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি হযরত আবু হোরায়রা রাযি. সূত্রে আরো বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ আইয়ুব আ.-কে রোগ থেকে মুক্তি দেওয়ার পর তাঁর প্রতি স্বর্ণ বর্ষণ করেন। আইয়ুব আ. তা অঞ্জলি ভরে উঠিয়ে কাপড় ভর্তি করতে থাকেন। তখন অদৃশ্যলোক থেকে তাঁকে বলা হল, হে আইয়ুব! তুমি কি তৃপ্ত হও নি? আইয়ুব আ. বললেন, হে আমার প্রতিপালক! কে এমন আছে, যে আপনার রহমতে তৃপ্ত হয়ে তা চাওয়া বন্ধ করতে পারে? এ হাদিসখানা সহি। অবশ্য সিহাহ সিত্তার কোনো গ্রন্থে এটি বর্ণিত হয় নি। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

ইমাম আহমদ রহ. আবু হোরায়রা রাযি.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, "জনৈক লোকের মাধ্যমে আইয়ুব আ.-এর কাছে কতগুলো স্বর্ণ-পাত্র পাঠানো হয়। তিনি সেগুলো নিজের কাপড়ে ভরে রাখতে থাকেন। তখন আওয়াজ হল, হে আইয়ুব! যা তোমাকে দেওয়া হয়েছে, তা কি তোমার জন্যে যথেষ্ট নয়? আইয়ুব আ. বললেন, হে আমার পালনকর্তা! আপনার অনুগ্রহ থেকে কে হাত গুটাতে পারে?" হাদিসটি উক্ত সূত্রে মওকুফ; অন্য সূত্রে আবু হোরায়রা রাযি. থেকে এটি মারফু রূপেও বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আহমদ রহ. আবু হোরায়রা রাযি.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : একবার আইয়ুব আ. বিবস্ত্র অবস্থায় গোসল করছিলেন (আগেকার শরিয়তে এটি বৈধ ছিল)। এমন সময় তাঁর সামনে এক ঝাঁক স্বর্ণের পঙ্গপাল পতিত হল। তিনি সেগুলো হাতে ধরে কাপড়ে রাখতে লাগলেন। তখন তাঁর প্রতিপালক তাঁকে ডেকে বললেন, হে আইয়ুব! তুমি যা দেখতে পাচ্ছ, তা থেকে আমি কি তোমাকে অমুখাপেক্ষী করে দেই নি? তিনি উত্তর দিলেন, অবশ্যই হে আমার প্রতিপালক! কিন্তু আমি আপনার বরকতের অমুখাপেক্ষী নই।" ইমাম বুখারি রহ. আবদুর রাযযাক রহ. সূত্রে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

রোগের প্রতিষেধক ও আল্লাহর রহমত

اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ

(তুমি তোমার পা দ্বারা আঘাত কর।) আইয়ুব আ. আল্লাহর এ নির্দেশ মোতাবেক আপন পা দ্বারা মাটিতে আঘাত করলেন। আল্লাহ তাআলা সেখান থেকে একটি ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করে দিলেন। যার পানি ছিল সুশীতল। আল্লাহ তাঁকে এ পানি দ্বারা গোসল করতে ও তা পান করতে হুকুম দেন। আইয়ুব আ. তা-ই করলেন। ফলে তার

সমস্ত ব্যথা-বেদনা ও তাঁর দেহের প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল রোগ-শোক ও ক্ষত দূর হয়ে গেল। আল্লাহ তাঁকে সু-স্বাস্থ্য দান করেন, তাঁর চেহারাকে সুদর্শন চেহারায় পরিবর্তন করে দেন। এ ছাড়া তাঁকে প্রচুর ধন-সম্পদও দান করেন। এমনকি স্বর্ণের পঙ্গপালও বর্ষণ করেন। তাঁকে আল্লাহ সন্তান-সন্তুতিও প্রদান করেন। কারো কারো মতে আল্লাহ তাআলা হযরত আইয়ুব আ.-এর সন্তানদেরকে জীবিত করে দেন। আর কারো মতে পূর্বের সন্তানদের বিনিময়ে তাঁকে সওয়াব দান করেন এবং তাদের স্থলে সমসংখ্যক নতুন সন্তান দুনিয়ায় দান করেন। আর তাদের সকলকে আল্লাহ কেয়ামতের দিন তাঁর সঙ্গে একত্র করবেন।

যাহ্হাক রহ. ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ আইয়ুব আ.-এর স্ত্রীকে যৌবন ফিরিয়ে দেন এবং স্ত্রীকে পূর্বাপেক্ষা অধিক সুশ্রী করে দেন। এমনকি আরো ২৬ জন পুত্র সন্তান তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। রোগ থেকে মুক্তি লাভের পর আইয়ুব আ. ৭০ বছর জীবিত ছিলেন। তিনি রোম দেশে বসবাস করতেন। দীনে হানিফ তথা সত্যধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এরপর পরবর্তী লোকজন এসে হযরত ইবরাহীম আ.-এর দীনের বিকৃতি ঘটায়।

স্ত্রীকে প্রহারের শপথ পূরণ

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ

"হে আইয়ুব! তুমি স্ব-হস্তে তৃণশলা ধারণ কর এবং তা দ্বারা স্ত্রীকে প্রহার কর। তবুও কসম ভঙ্গ করো না। আমি আইয়ুবকে ধৈর্যশীল পেয়েছি। কতই না উত্তম বান্দা সে! নিঃসন্দেহে সে ছিল আমার অভিমুখী। (সূরা ছোয়াদ : ৪৪)

এটি ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে আইয়ুব আ.-এর প্রতি সুদৃষ্টি। তিনি স্ত্রীকে একশ বেত্রাঘাত করার শপথ করেছিলেন। এর কারণ হিসেবে কেউ বলেছেন, স্ত্রী চুল বিক্রি করায় তিনি এ শপথটি করেছিলেন। কেউ বলেছেন, একবার শয়তান নবীর স্ত্রীর কাছে চিকিৎসকের বেশ ধরে আইয়ুব আ.-এর ব্যাধির নির্দিষ্ট ওষুধের বর্ণনা দিয়েছিল। স্ত্রী তাঁর কাছে এসে উক্ত ওষুধের কথা ব্যক্ত করেন। তিনি তখন বুঝতে পারলেন, এটা শয়তানের কাজ। তখন তিনি কসম করেন, স্ত্রীকে একশটি বেত মারবেন।

রোগ মুক্তির পর আল্লাহ তাঁকে জানালেন, শস্যের গোছার মতো এক গোছা তৃণ একত্রে বেঁধে একবার স্ত্রীকে মারো। এতে একশটি বেত মারা হয়েছে বলে গণ্য হবে। এতেই কসমের কাফফারা হয়ে যাবে। কসম ভাঙার গুনাহ হবে না। এটা হল মুক্তির সহজ ব্যবস্থা এবং এমন ব্যক্তির কসম থেকে নিষ্কৃতি লাভের উপায়, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর আনুগত্য করে। বিশেষ করে একজন ধৈর্যশীল সতী-সাধ্বী, সত্যপন্থী নেককার স্ত্রী লোকের ক্ষেত্রে। তাই আল্লাহ তাআলা এ সুযোগ দেওয়ার কারণ হিসেবে সঙ্গে সঙ্গেই উল্লেখ করেছেন :

إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ

"আমি তাকে সবরকারীরূপে পেয়েছি। কত ভালো বান্দা সে! নিশ্চয়ই সে আল্লাহর ইবাদতকারী।"

কাজেই বহু সংখ্যক ফেকাহবিদ এ রেওয়ায়েতকে শপথ ও মান্নত অধ্যায়ে দলিলরূপে প্রয়োগ করেছেন। আবার কিছুসংখ্যক ফকিহ এর ব্যাপ্তি আরো বাড়িয়ে দিয়ে শপথ থেকে বাঁচার উপায় ও মাধ্যম অধ্যায়ে সংযোজন করেছেন। এবং كِتَابُ الْحِيَلِ فِي الْخَلَاصِ مِنَ الْأَيْمَانِ এটিকে দলিল হিসেবে নিয়ে বিভিন্ন মাসআলা বের করেছেন।

ইনতেকাল

ইবনে জারীর রহ. প্রমুখ ইতিহাসবেত্তা লিখেছেন, হযরত আইয়ুব আ. ৯৩ বছর বয়সে ইনতেকাল করেন। কারো মতে তিনি এর চেয়ে বেশিদিন জীবিত ছিলেন। মুজাহিদ রহ. সূত্রে লাইস রহ. বর্ণনা করেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ দলিল হিসেবে বিপদগ্রস্তদের মুকাবিলায় আইয়ুব আ.-কে পেশ করবেন। ইবনে আসাকির রহ.-ও এরূপ বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।

মৃত্যুকালে হযরত আইয়ুব আ. তাঁর পুত্র হাওমালকে অসিয়ত করে যান। তার পরে বিশর ইবনে আইয়ুব তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। অনেকের ধারণা মতে এ বিশরই কুরআনে বর্ণিত যুল-কিফল। এদের ধারণা হিসেবে তিনি নবী এবং ৭৫ বছর বয়সে তিনি ইনতেকাল করেন। কিছু লোক আইয়ুব আ.-এর পুত্র বিশরকে যুল-কিফ্ল বলেছেন। সামনে আমরা যুল-কিফল আ.এর জীবনী আলোচনা করব।

দৃষ্টান্তমূলক উপদেশাবলী

হযরত আইয়ুব আ.-এর ঘটনায় ধৈর্য-সহ্য, অটলতা ও দৃঢ়তা এবং অসীম বিপদাপদে সবর ও শোকরগুযারির যেসব রহস্য ও হেকমত রয়েছে, তা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞানীদের জন্য বিরাট শিক্ষণীয়ই বটে। আমরা তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকটি কথা লিপিবদ্ধ করছি। যথা–

১। আল্লাহ পাকের বান্দাগণের মধ্য হতে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে যার যতটুকু সান্নিধ্য আছে, সেই তুলনায়ই তাকে বিপদাপদের ভাট্টিতে দগ্ধ করা হয়। আর যখন তিনি উক্ত দহনের সম্মুখীন হয়ে ধৈর্যসহ্যের সঙ্গে অবিচল থাকেন, তখন সেই বিপদসমূহই তার চরম সান্নিধ্য লাভের কারণ হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الصَّالِحُوْنَ۔ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ۔ (الحديث)

"বিপদে সর্বাপেক্ষা অধিক কঠিন পরীক্ষা হয় আম্বিয়ায়ে কেরামের, এরপর নেককার মুমিনদের, এরপর ধার্মিকতার স্তর ও শ্রেণী অনুযায়ী।"

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى قَدْرِ دِيْنِهٖ فَإِنْ كَانَ فِيْ دِيْنِهٖ صَلَابَةً زِيْدَ فِيْ بَلَائِهٖ. (الحديث)

"মানুষ তার ধার্মিকতার স্তরভেদে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে থাকে। সুতরাং যদি সে ধর্মে দৃঢ় ও পরিপক্ক হয়, তবে তার বিপদের পরীক্ষা ও অপরাপর হতে কঠিনই হবে।"

২। মান-সম্মান, ধনদৌলত, সচ্ছল ও শান্তিময় অবস্থায় আল্লাহ তাআলার শোকরগুযারী এবং অনুগ্রহের মূল্যায়ন তেমন কোনো কঠিন কাজ নয়। যদি অহঙ্কার ও আমিত্ব পিছনে কাজ না করে, তবে তো খুবই সহজ। কিন্তু বালা-মুসিবত, দুঃখ-কষ্ট এবং সংকটকালে আল্লাহ তাআলার বিধানের উপর সন্তুষ্ট থেকে অভিযোগের একটি অক্ষরও উচ্চারণ না করা এবং ধৈর্যসহ্যের প্রমাণ দেওয়া অতি কঠিন। সুতরাং যখন আল্লাহর কোনো নেককার বান্দা এরূপ দুরাবস্থায় ধৈর্যসহ্যের আঁচল না ছেড়ে অবিরত সবর ও শোকর প্রকাশ করতে থাকেন, তবে আল্লাহ তাআলার 'রহমত' গুণও উদ্বেলিত হয়ে ওঠে এবং এরূপ ব্যক্তির ওপর অনুগ্রহ ও দয়ার বৃষ্টি বর্ষণ করেন। সে আশাতীতরূপে অসীম অনুগ্রহ ও দয়া দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতের সাফল্য লাভ করে। হযরত আইয়ুব আ.-এর উজ্জ্বল প্রমাণ।

إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (٨٣) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ

"যখন (আইয়ুব আ.) তাঁর রবকে ডাকলেন– আমাকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করেছে আর আপনি অতিশয় দয়ালু। তখন আমি তার দুআ কবূল করলাম এবং দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত করলাম এবং আমি তাকে তার পরিজন দান করলাম। তৎসঙ্গে তৎপরিমাণ আরো, আমার পক্ষ হতে রহমতস্বরূপ। আর এটি ইবাদতকারীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ।" (সূরা আম্বিয়া)

৩। কোনো অবস্থাতেই মানুষ আল্লাহ তাআলার রহমত থেকে নিরাশ হওয়া উচিত না। কেননা আল্লাহর রহমত থেকে নৈরাশ হওয়া কাফেরের অভ্যাস। তদ্রূপ কেউ যেন মনে না করে, বিপদাপদ শুধু গুনাহের সাজাস্বরূপ এসে থাকে। বরং অনেক সময় তা পরীক্ষাস্বরূপও এসে থাকে। আর সবর ও শোকরকারীর জন্য আল্লাহ পাক রহমতের ভাণ্ডার খুলে দেন। হাদিসে কুদসিতে আছে : আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাগণকে সম্বোধন করে বলেন, أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ (الحديث) "বান্দা তার মনে আমার সম্বন্ধে যেরূপ ধারণা পোষণ করে, আমি তার ধারণা পূর্ণ করে দেই।" –আল হাদীস

৪। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্কসমূহের মধ্যে খেদমত ও ধৈর্য সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয় ব্যাপার। এক হাদিসে বর্ণিত আছে : শয়তানের কুমন্ত্রণাসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ও ইবলিসের খুবই প্রিয় হল, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে কুধারণা, মনোমালিন্য, শত্রুতা

ও ঘৃণার বীজ বপন করা। তাই সহি হাদিসে ওই স্ত্রীলোককে বেহেশতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে, যে স্ত্রীলোক নিজের স্বামীর জন্য নেককার ও খেদমতকারিণী সাব্যস্ত হয়। আর সেই খেদমত ও মহব্বতের মর্যাদা ও মূল্য তখন আরো বেশি হয়ে যায়, যখন স্বামী বিপদ ও দুঃখ-কষ্টে পতিত হয় এবং তার আত্মীয়-স্বজনেরা তাকে ত্যাগ করে দূরে সরে যায়। যেমন হযরত আইয়ুব আ.-এর পবিত্র ও সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর মুসিবতের সময় যে অক্লান্ত সেবা, আনুগত্য, সমবেদনা ও সহানুভূতির পরিচয় দিয়েছেন, আল্লাহ তাআলা তার সম্মান রক্ষার্থে তাঁর সম্বন্ধে হযরত আইয়ুব আ.-এর কসমকে পূর্ণ করার জন্য সাধারণ কসমের বিধান হতে পৃথক এমন একটি বিধান প্রদান করলেন, যা দ্বারা সেই পুণ্যবতী স্ত্রীর সম্মান ও মর্যাদা যে আল্লাহ তাআলার দরবারে কতটুকু, তা অতি সহজে অনুমেয়।

৫। আনন্দ ও শান্তির সময় বিনয় ও শোকর এবং দুঃখ-কষ্ট ও বিপদের সময় আত্মনিয়ন্ত্রণ ও সবর এমন দুটি অমূল্য নেয়ামত, যার কপালে এটি জোটে সে দুনিয়া ও আখেরাতে কখনো বিফল হতে পারে না। আল্লাহ তাআলার সম্মতি ও সন্তোষ সর্বাবস্থায় তার সাথী হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

"আর (স্মরণ কর) যখন তোমার প্রতিপালক সতর্ক করলেন, যদি তোমরা শোকরগুযারী কর, তবে আমি (আমার নেয়ামত) তোমাদেরকে আরো অধিক করে দিব।" (সূরা ইবরাহীম)

আল্লাহ পাক আরো বলেন :

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (١٥٥) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (١٥٦) أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

"আপনি ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন– যারা তাদের ওপর যখন কোনো বিপদ-আপদ পতিত হয়, তখন তারা বলে : আমরা তো আল্লাহরই এবং আমরা তাঁর দিকেই প্রত্যাগমনকারী। এরাই হল ওই সকল লোক : যাদের উপর তাঁদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অনুগ্রহ ও রহমত আছে এবং এরাই হেদায়েতপ্রাপ্ত।"

(সূরা বাকারা)

হযরত যুল-কিফ্ল আ.

হযরত যুল-কিফ্ল আ.-এর বংশ পরিচয়

কুরআন মাজিদ হযরত যুল-কিফ্ল আ.-এর নাম ছাড়া অন্য কিছু উল্লেখ করে নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেও তাঁর সম্পর্কে কিছু বর্ণিত নেই। অতএব কুরআন ও হাদিসের আলোকে তাঁর সম্বন্ধে এর চেয়ে অধিক কিছু বলার নেই- হযরত যুল-কিফ্ল আ. আল্লাহ পাকের মনোনীত ও নির্বাচিত একজন পয়গম্বর ছিলেন এবং কোনো এক কওমের হেদায়েতের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। এর অধিক বিবরণ প্রদানে কোরআন মাজিদ ও হাদিস শরিফ নীরব।

দ্বিতীয় স্তর হলো জীবনী ও ইতিহাস গ্রন্থ। যথেষ্ট অনুসন্ধানের পরেও এ সম্বন্ধে এমন কিছু জানতে পারি নি, যা দ্বারা হযরত যুল-কিফ্ল আ.-এর অবস্থা ও ঘটনাবলীর আলোকপাত হতে পারে। তাওরাতও এ সম্বন্ধে নীরব এবং ইসলামি ইতিহাসও। একদল মনে করেন, যুল-কিফ্ল হযরত আইয়ুব আ.-এর পুত্র। আল্লাহ তাআলা সূরা আম্বিয়ায় আইয়ুব আ.-এর ঘটনার শেষে বলেন :

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ (٨٥) وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ

"এবং ইসমাইল, ইদরীস ও যুল-কিফ্লের কথা স্মরণ কর! তারা প্রত্যেকেই ছিল সবরকারী। আমি তাদেরকে আমার রহমতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। তারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ।" (সূরা আম্বিয়া : ৮৫-৮৬)

সূরা ছোয়াদেও আইয়ুব আ.-এর ঘটনা বলার পরে আল্লাহ বলেন :

وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ

স্মরণ কর, ইসমাইল, আল-ইয়াসাআ ও যুল-কিফ্লের কথা। এরা প্রত্যেকেই ছিল সজ্জন। (সূরা ছোয়াদ : ৪৭- ৪৮)

কুরআনের এসব আয়াতে উল্লিখিত মহান নবীগণের সাথে যুল-কিফ্লের নাম ও প্রশংসা একত্রে উল্লেখ থাকায় স্পষ্টত বোঝা যায়, তিনিও নবী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে এ মতই প্রসিদ্ধ। কারো কারো ধারণা, যুল-কিফ্ল নবী ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন একজন পুণ্যবান ও ন্যায়পরায়ণ শাসক। ইবনে জারীর রহ. এ ব্যাপারে মতামত প্রকাশে বিরত রয়েছেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

ইবনে জারীর রহ. ও ইবনে আবু নাজিহ রহ. মুজাহিদ রহ. সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যুল-কিফ্ল নবী ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন একজন পুণ্যবান ব্যক্তি। তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত নবীর পক্ষ থেকে তিনি এ দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তিনি সম্প্রদায়ের লোকজনের দেখাশোনা করবেন এবং ন্যায়নিষ্ঠার সাথে তাদের বিচার-মীমাংসা করবেন। এ কারণে তাকে যুল-কিফ্ল (জিম্মাদার) নামে অভিহিত করা হয়।

ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতিম রহ. মুজাহিদ রহ. সূত্রে বর্ণনা করেন : হযরত ইয়াসাআ যখন বয়োবৃদ্ধ হন, তখন তিনি ভাবলেন– যদি আমার জীবদ্দশায় একজন লোককে সমাজে কাজ করার জন্য দায়িত্ব দিতে পারতাম এবং কিভাবে সে দায়িত্ব পালন করে তা স্বচক্ষে দেখতে পারতাম, তা হলে মনে শান্তি পেতাম। এরপর তিনি লোকজনকে জড়ো করে বললেন : তোমাদের মধ্যে কে আছ, যে তিনটি কাজ করার অঙ্গীকার করবে, তাকে আমি আমার স্থলাভিষিক্ত করব ? কাজ তিনটি হল : দিনে রোযা পালন করবে, রাতে জেগে ইবাদত করবে এবং কখনো রাগান্বিত হতে পারবে না। এ কথার পর বাহ্যদৃষ্টিতে সাধারণ বলে গণ্য এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল– আমি পারব। তখন তিনি বললেন, তুমি কি দিনে রোযা পালন করতে, রাত্রি জেগে ইবাদত করতে ও রাগান্বিত না হয়ে থাকতে পারবে? সে বলল, হ্যাঁ! পারব। এরপর সেদিনের মতো সবাইকে বিদায় দিলেন। পরের দিন পুনরায় লোকদেরকে জড়ো করে আবার সেই প্রস্তাব রাখেন। সবাই নীরব, কিন্তু ওই লোকটি দাঁড়িয়ে বলল, আমি পারব। এরপর নবী আল-ইয়াসাআ ওই ব্যক্তিকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন।

ইবলীস তখন শয়তানদের ডেকে বলল, ওই ব্যক্তিকে পথভ্রষ্ট করার দায়িত্ব তোমাদের নিতে হবে। কিন্তু তারা সকলে তাতে ব্যর্থ হল। তখন ইবলীস বলল : আচ্ছা আমিই তার দায়িত্ব নিলাম। পরে ইবলীস এক বৃদ্ধ দরিদ্রের বেশে লোকটির কাছে এল। সে এমন সময়ই এলো, যখন তিনি দুপুরের বিশ্রামের জন্যে শয্যা গ্রহণ করেছিলেন। আর তিনি ওই বিশেষ সময় ছাড়া দিনে বা রাতের অন্য কোনো সময়ই নিদ্রা যেতেন না। তিনি যখন ঘুমানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, এমন সময় ইবলীস এসে দরজা ধাক্কা দিল। ভিতর থেকে তিনি বললেন, দরজায় কে? ইবলীস বলল, আমি একজন অসহায় মজলুম বৃদ্ধ লোক। তিনি দরজা খুলে দিলেন। বৃদ্ধ তার ঘটনা বলতে লাগল। সে জানাল, আমার সাথে আমার গোত্রের লোকদের বিবাদ আছে। তারা আমার ওপর এই এই জুলুম করেছে। বৃদ্ধ তার ঘটনার বিবরণ দিতে দিতে বিকাল হয়ে গেল। দুপুরের নিদ্রার সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। তিনি বলে দিলেন, সন্ধ্যার পরে আমি যখন দরবারে বসব তখন তুমি এসো। তোমার হক আমি আদায় করে দেব। বৃদ্ধ চলে গেল। সন্ধ্যার পরে দরবারে বসে বৃদ্ধ আসছে কি না দেখলেন। কিন্তু তাকে উপস্থিত পেলেন না। তালাশ করেও তার কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না।

পরের দিন সকালে বিচারাসনে বসে বৃদ্ধের জন্যে অপেক্ষা করেও তাকে দেখলেন না। মজলিস শেষে তিনি যখন দুপুরের শয্যা গ্রহণে গেলেন। তখন বৃদ্ধ এসে দরজায় ধাক্কা দিল। ভিতর থেকে জিজ্ঞেস করলেন, দরজায় কে? বলল, অসহায় এক মজলুম বৃদ্ধ। দরজা খুলে দেওয়া হল। বললেন, আমি কি তোমাকে বলি নি, যখন আমি দরবারে বসব তখন তুমি আসবে? সে বলল, আমার গোত্রের লোকেরা অত্যন্ত জঘন্য প্রকৃতির। যখন তারা জানল আপনি দরবারে বসা, তখন তারা আমাকে হক প্রদান

করার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু যখন আপনি দরবার ছেড়ে উঠে যান, তখন তারা সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। তিনি বললেন, এখন চলে যাও। সন্ধ্যার পরে যখন দরবারে বসব তখন এস। কিন্তু বৃদ্ধের সাথে কথা বলতে বলতে তার আজকের দুপুরের নিদ্রাও আর হল না। রাত্রে দরবারে বসে বৃদ্ধের অপেক্ষা করলেন, কিন্তু তাকে দেখা গেল না। অধিক রাত্রি হওয়ায় তন্দ্রা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। তিনি বাড়ির একজনকে বললেন, আমার দারুণ নিদ্রা পাচ্ছে। আমি এখন ঘুমাব। সুতরাং কেউ যদি দরজার কাছে আসতে চায়, তাকে আসতে দিও না। এ কথা বলে যাওয়ার পর মুহূর্তেই বৃদ্ধ সেখানে উপস্থিত হল। পাহারাদার লোকটি বলল, পিছনে সরো! পিছনে সরো! বৃদ্ধ বলল, আমি হুজুরের কাছে গতকাল এসেছিলাম এবং আমার সমস্যার কথা বলেছিলাম। কিন্তু পাহারাদার বলল, কিছুতেই দেখা করা যাবে না। আল্লাহর কসম! আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন কোনো লোককে তার কাছে যেতে না দিই। এভাবে পাহারাদার তাকে নিবৃত্ত করল।

বৃদ্ধ তখন ঘরের পানে তাকিয়ে দেওয়ালের এক স্থানে একটি ছিদ্রপথ লক্ষ করল। তখন বৃদ্ধরূপী ইবলীস ওই ছিদ্রপথ দিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে গেল। এবার ভিতরের দিক থেকে দরজা ধাক্কা দিল। শব্দ শুনে যুল-কিফ্‌ল আ.-এর ঘুম ভেঙে যায়। তিনি বললেন : ওহে, আমি কি তোমাকে এ সময় আসতে বারণ করি নি? সে বলল, আমি আমার নিজ প্রচেষ্টায় এসেছি। আপনি তো আমাকে আসতে দেন নি। লক্ষ করে দেখুন, কিভাবে আমি এসেছি। তিনি দরজার কাছে এসে দেখলেন, তা সেভাবেই বন্ধ রয়েছে যেভাবে তিনি বন্ধ করেছিলেন। অথচ সে ঘরের ভিতরে তার কাছেই রয়েছে। তিনি এতক্ষণে তাকে চিনতে পারলেন এবং বললেন, তুমি তো আল্লাহর দুশমন। সে বলল, হ্যাঁ! প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আপনি আমাকে পরাজিত ও নিরাশ করে দিয়েছেন। আপনাকে রাগান্বিত করার জন্য আমি এসব কাজ করেছি– যা আপনি দেখতে পাচ্ছেন। এরপর আল্লাহ এ ব্যক্তির নাম রাখেন যুল-কিফ্‌ল। কারণ তিনি যে কাজ করার জিম্মাদারী গ্রহণ করেছিলেন তা পূরণ করেছেন।

একটি ভুল সংশোধন

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. তাঁর মুসনাদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. থেকে একটি রেওয়ায়েত নকল করেছেন। একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বনি ইসরাঈলদের মধ্যে কিফ্‌ল নামে এক ব্যক্তি ছিল। সে ছিল চরমস্তরের ফাসেক ও পাপিষ্ঠ দুরাচার। একদিন তার কাছে পরমা সুন্দরী এক মহিলা এল। কিফ্‌ল তাকে ষাট (৬০) স্বর্ণ-মুদ্রার বিনিময়ে যিনার জন্য রাজি করে নিল। কিন্তু সে যখন স্ত্রীলোকটির সঙ্গে মিলিত হওয়ার ইচ্ছা করল, তখন সে কম্পিত হয়ে ভীষণভাবে কাঁদতে আরম্ভ করল। কিফ্‌ল তাকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করল। বলল, তুমি কি আমাকে ঘৃণা কর? স্ত্রীলোকটি বলল, ঘৃণার জন্য নয়। আসলে আমি জীবনে কখনও

এমন গর্হিত কাজ করি নি। কিন্তু আজ প্রয়োজনে অর্থাৎ পেটের দায়ে নিজের সতীত্বকে বিনষ্ট করছি। এ চিন্তা আমার অন্তরে ছুরির মতো বিদ্ধ হচ্ছে। এ কারণেই আমি ক্রন্দন করছি। কিফ্‌ল এ কথা শুনে তৎক্ষণাৎ তার কাছ থেকে দূরে সরে দাঁড়াল। বলল, "যে গর্হিত কাজ তুমি জীবনে কখনো কর নি, আজ তা শুধু পেটের দায়ে পড়ে করবে, এটা কখনো হতে পারে না। যাও, তুমি নিজের সতীত্ব ও পবিত্রতা নিয়ে ঘরে ফিরে যাও। আর এ দিনারগুলোও তোমার। এগুলি নিজের প্রয়োজনে ব্যয় কর।"

এরপর কিফ্‌ল বলল– আল্লাহ পাকের কসম! আজকের এ মুহূর্তে থেকে কিফ্‌ল আর কখনো আল্লাহ পাকের নাফরমানি করবে না। ঘটনাক্রমে সে রাতেই তার ইনতেকাল হল। সকালে মানুষ দেখতে পেল, অদৃশ হাত তার দরজায় এ সুসংবাদ লিখে রেখেছে– "নিশ্চয় কিফ্‌লকে আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দিয়েছেন।"

এ বর্ণিত রেওয়ায়েতটিতে যুল-কিফ্‌ল নয়; শুধু 'কিফ্‌ল' উল্লেখ আছে। এ ব্যক্তি হযরত যুল-কিফ্‌ল নয়। সুতরাং কেউ যেন মনে না করে, এটি হযরত যুল-কিফ্‌ল আ.-এর ঘটনা।

উপদেশ

একমাত্র ইসলামই এমন একটি ধর্ম, যা তার দাওয়াতে হকের ভিত্তি এমন মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত রেখেছে, যাতে দেশ ও জাতি এবং গোত্র ও বংশের বিভেদসমূহের ঊর্ধ্বে থেকে এ কথা স্বীকার করতেই হয়, পয়গামে হক তার ভিত্তি ও বুনিয়াদে কোনো সীমাবদ্ধতা ও দলীয়বদ্ধতার মুখাপেক্ষী নয়। আর এটা কোনো দলীয় ইযারাদারীকেও গ্রহণ করে না। কেননা হকের সত্তা মহান আল্লাহ তাআলা যখন এক ও অদ্বিতীয়, তখন নিঃসন্দেহে তাঁর পয়গামও একই। এ পয়গামে হকের বাণী আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত সাদা-কালো, আরব ও অনারব এবং ভৌগোলিক সীমার সকল বন্ধন হতে মুক্ত করে, কোনো বিবর্তন ও পরিবর্তন ব্যতীত সকলকে বেষ্টন করে চলেছে এবং সকলের মাঝেই প্রবাহিত রয়েছে। অবশ্য প্রত্যেক কালের গতি ও অবস্থা এবং সাময়িক প্রয়োজনে, গোত্র ও জাতির ক্রমবর্ধমান উন্নতি এবং তাদের চিন্তার বিকাশ ও কার্য যোগ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে এ তারতম্যের প্রয়োজন আছে এবং থাকাও চাই। ভিত ও মূলের কোনো পরিবর্তন হওয়া ছাড়া ওই পয়গামে হকের ব্যাখ্যা ও বিধানসমূহ পৃথক পৃথক হয়। এমনকি আধ্যাত্মিক ক্রমবর্ধন ও উন্নতি তার পূর্ণতার সীমায় পৌঁছে যায়। পরম উন্নতি লাভ করে মানবীয় ধ্যান ও চিন্তার অনুভূতি। বস্তুত ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক পরিভাষায় পয়গামে হক, সত্যের আহ্বানের এই অপরিবর্তনীয় সত্যকেই দীন বা ধর্ম বলে। আল্লাহ তাআলা একেই ইসলাম বলেছেন :

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

"নিঃসন্দেহে ইসলামই হল আল্লাহ তাআলার নিকট দীন বা ধর্ম।" (সূরা আলে ইমরান)

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"যে কেউই 'ইসলাম' ছাড়া ধর্মের নামে অন্য কিছুর অন্বেষী হয়, তার এ প্রবৃত্তি আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় নয়।" (সূরা আলে ইমরান)

هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا

"তিনি(আল্লাহ)ই তোমাদের (মানুষের) নাম কুরআন নাযিলের পূর্বেই মুসলমান রেখেছেন এবং কুরআনেও এ নামকরণ করা হয়েছে।" (সূরা হজ)

এ বাস্তব সত্যের পরিবর্তিত পদ্ধতি ও সময়ের আবর্তনে প্রদত্ত বিধান এবং ব্যাখ্যা সমূহের নামই "মিনহাজ" ও "শরিয়ত" :

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

"তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমি পৃথক পৃথক পন্থা (শরিয়ত) এবং পদ্ধতি নির্ধারণ করেছি।"(সূরা মায়েদা)

আর আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় ক্রমবর্ধন ও উন্নতির পূর্ণতার সীমাকে বলেছেন 'দীনকে পরিপূর্ণ করা' এবং 'নেয়ামত পূর্ণ করা' :

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

"হে মুসলমানগণ! আজ আমি তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম আর তোমাদের ওপর আমার নেয়ামতকে পুরা করে দিলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে দীনরূপে পছন্দ করলাম।" (সূরা মায়েদা)

মোটকথা, হযরত আদম আ. থেকে নিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময় পর্যন্ত সকল নবী ও রাসূলের ধর্ম এবং আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত 'পয়গামে হক' সর্বকালে একই ছিল, যার নাম 'ইসলাম'। অবশ্য নবী ও রাসূলগণের নিজ নিজ যুগে নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিধাসমূহ ও ব্যাখ্যাসমূহ পৃথক পৃথক ছিল। যাকে 'শরিয়ত ও মিনহাজ" বলা হয়। আধ্যাত্মিক উন্নতি ও ধর্মীয় চিন্তা এবং অনুভূতি যখন পূর্ণতার সীমায় পৌঁছে যায়, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে ওই সমস্ত শরিয়তকে সর্বশেষ শরিয়তে মুহাম্মদীর অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয় এবং চিরকালের জন্য এর পরিধি ভৌগোলিক সীমারেখার ঊর্ধ্বে রেখে সমগ্র বিশ্বজগতের ওপর ব্যাপক করে দেওয়া হয়। যেমন বলা হয়েছে :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

"আর আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদ প্রদানকারী ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করেছি।" (সূরা সাবা)

সুতরাং এ শরিয়তের শিক্ষার উল্লেখ্য দিক হল- দুনিয়ার আনাচে-কানাচে প্রত্যেক কওমের প্রতি আল্লাহ পাকের সত্য সুসংবাদ প্রদানকারী ও ভয় প্রদর্শনকারী এ "সত্যের

পয়গাম" নিয়ে সে আগমন করেছে। অতএব, একজন মুমিন মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য হল- ঘোষণা করা, আমরা আল্লাহর কোনো নবী-রাসূলের মধ্যেই পার্থক্যকরণ বৈধ মনে করি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর প্রতি যেরূপ ঈমান রাখি, তদ্রুপই আল্লাহর প্রত্যেক নবী ও রাসূল আ.-এর প্রতিও ঈমান রাখি। চাই আমরা তাঁর নাম, স্থান ও অবস্থা জানি বা না-জানি।

২। সম্ভবত যুল কিফ্‌ল আ. বনি ইসরাইল বংশীয় নবীগণের একজন ছিলেন। বনি ইসরাঈলদের সে-সমস্ত অবস্থা ও ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ অন্যান্য নবীদের উল্লেখ প্রসঙ্গে কুরআন মাজিদ বর্ণনা করেছে, তা ছাড়া তাঁর যমানায় এমন কোনো বিশেষ ঘটনা ঘটে 'নি, যা সাধারণ তাবলিগ ও হেদায়েতের অতিরিক্ত উপদেশ ও নসিহত গ্রহণের সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং কুরআন মাজিদ শুধু তাঁর নামই উল্লেখ করেছে; অবস্থা ও ঘটনাবলীর পিছনে পড়ে নি। কেননা কাসাসুল কোরআনের আলোচনাটি কয়েক জায়গায় এসেছে- অতীতকালের উম্মত ও জাতিসমূহের ঘটনা ও সংবাদ বর্ণনা করার মধ্যে কোরআন মাজিদের উদ্দেশ্য শুধু হেদায়েত ও নসিহতের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা। নতুবা ইতিহাস কোরআনের আলোচ্য বিষয়ও নয়; উদ্দেশ্যও নয়। যেমন কুরআন মাজিদে আল্লাহ পাক বলেন :

كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا

"(হে পয়গাম্বর)! এরূপে অতীতের বিশেষ ঘটনাগুলি আমি শুনাচ্ছি এবং নিঃসন্দেহ আমি নিজের তরফ থেকে আপনাকে নসিহতের একটি মূল বস্তু দান করেছি।"

(সূরা তহা)

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ

"নিঃসন্দেহ সেই নবীদের ঘটনাবলীতে বিবেকসম্পন্ন ও জ্ঞানীদের জন্য রয়েছে শিক্ষা।"

(সূরা ইউসুফ)

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ

"তারা কি ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণ ও ভ্রমণ করে নি? যাতে দেখতে পেত, তাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের কি পরিণতি হয়েছে। আর নিঃসন্দেহে পরলোক তাদের জন্য উত্তম যারা পরহেযগার। তারা কি বুঝে না? (সূরা ইউসুফ)

وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ

'আর রাসূলদের এ সকল সংবাদ আমি তোমার কাছে বর্ণনা করছি যার দ্বারা আমি তোমার মনকে স্থির করি আর এতে তোমার কাছে এসেছে সত্য এবং মুমিনদের জন্য উপদেশ ও স্মরণ।' (সূরা হূদ : ১২০)

হযরত ইউনুস আ.

হযরত ইউনুস আ.-এর বংশপরিচয়

ইসলামী ঐতিহাসিক ও আহলে কিতাবগণের ঐকমত্য অভিমত হলো- হযরত ইউনুস আ.-এর বংশপরিচয় সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। (ফতহুল বারি : ৬/৩৫১)

হযরত ইউনুস আ.-এর পিতার নাম 'মাত্তা'। কেউ কেউ বলেছেন, 'মাত্তা' হযরত ইউনুস আ.-এর মাতার নাম। কিন্তু এটা নির্জলা ভুল। কেননা বোখারির এক রেওয়ায়েতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে স্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে- 'মাত্তা' তাঁর পিতার নাম। (কিতাবুল আম্বিয়া)।

আহলে কিতাবরা বলে ইউনুস আ.-এর নাম 'ইউনাহ' এবং তাঁর পিতার নাম 'আম্‌তা'। আমাদের ধারণায় ইউনুস ইবনে মাত্তা এবং ইউনা ইবনে আম্‌তার মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। শুধু আরবি ও হিব্রু ভাষার পার্থক্য।

আবির্ভাবকাল

হাফেয ইবনে হাজার রহ. বলেন, ইউনুস আ.-এর আবির্ভাবকাল নির্দিষ্টকরণ ইতিহাসের আলোকে কঠিন। অবশ্য কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেছেন, যখন ইরানের পারস্য রাজ্যে বিদ্রোহ ও রাজত্বের বিশৃঙ্খলার যুগ চলছিল, সে সময়ে নীনাওয়া নামক স্থানে হযরত ইউনুস আ. আবির্ভূত হয়েছিলেন। (ফাতহুল বারি : ৬/৩৫০)

আধুনিক যুগের তত্ত্ববিদগণ পারস্য রাজত্বকে তিনটি যুগে বিভক্ত করেছেন। এক যুগ সেকান্দার যুলকারনাইনের আক্রমণের পূর্ব যুগ। দ্বিতীয়, পার্থবী রাজত্বের যুগ। অর্থাৎ বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলার যুগ। তৃতীয় 'সাসান' যুগ। প্রথম যুগটি উন্নতির যুগ বলে গণ্য। এর প্রারম্ভকাল আনুমানিক ৫৫৯ খৃস্টাব্দ ধারণা করা হয়। সেই উন্নতির যুগটি আনুমানিক ৩৭২ খৃস্টাব্দে দুই শতাব্দিতে গিয়ে খতম হয়ে যায়। আর দ্বিতীয় যুগ ওই সময় হতে আরম্ভ করে ১৫০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত চলতে থাকে। একেই বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলার যুগ বলা হয়। এর পর সাসানী রাজত্বের যুগ আরম্ভ হয়।

এ বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে হাফেয ইবনে হাজার রহ.-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ইউনুস আ.-এর যমানা ৩৭২ খৃস্টাব্দ থেকে আরম্ভ করে হযরত ঈসা আ.-এর জন্মকালের মধ্যবর্তী সময়ে হওয়া উচিত। কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ উক্তিটি ভুল। কেননা ঐতিহাসিকগণ একমত- ৬১২ খৃস্টাব্দে বাবেলনীয়দের হাতে আশূরীদের এ প্রসিদ্ধ শহর নীনাওয়া বিধ্বস্ত হয়েছিল। এছাড়া কিতাবী সম্প্রদায়ের রেওয়ায়েতসমূহ সাক্ষ্য দেয়, হযরত ইউনুস আ.-এর যমানার পরে ৬৯০ খৃস্টাব্দে নীনাওয়াবাসীরা যখন পুনরায় কুফর-শিরক ও অত্যাচার-উৎপীড়ন আরম্ভ করল এবং তাদের অবাধ্যতাচরণ সীমালঙ্ঘন করল, তখন 'নাহূম' নামক একজন ইসরাঈলী নবী পুনরায় তাদেরকে বুঝালেন এবং হেদায়েত ও সৎপথের দাওয়াত প্রদান করলেন। কিন্তু যখন তারা কোনো

পরোয়াই করল না, তখন তিনি নীনাওয়া বিধ্বস্ত হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করলেন এবং এর ৭০ বছর পরে ৬১২ খৃস্টাব্দে নীনাওয়া বিধ্বস্ত ও ধ্বংস হয়ে যায়। সুতরাং হযরত ইউনুস আ.-এর যমানা ৬৯০ খৃস্টাব্দের আগে হওয়া উচিত। খুব সম্ভব হযরত শাহ্ আবদুল কাদের দেহলবি রহ. এর উক্তিই সঠিক। তিনি বলেছেন, হযরত ইউনুস আ. হযরত হেযকীল আ.-এর সমসাময়িক ছিলেন। তিনি তাঁর তাফসিরে লিখেছেন :

"ইউনুস আ. ছিলেন হিযকীল আ.-এর বন্ধুবর্গের একজন। তিনি অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে এবাদত করেছেন এবং দুনিয়াদারীর আবিল্য থেকে মুক্ত ছিলেন। হিযকীলের প্রতি নির্দেশ হল তাঁকে নীনাওয়ার দিকে প্রেরণ কর। মুশরিকদেরকে মূর্তিপূজা থেকে বারণ করুক।"

কিন্তু এখানে হিযকীল নামে আরব ঐতিহাসিকগণ ধোঁকায় পড়েছেন। তাঁরা একে হিযকীল বাদশা বুঝেছেন। অথচ বনি ইসরাইলদের মধ্যে এ নামের কোনো বাদশা ছিলেন না। এ জন্য প্রকৃতপক্ষে এ স্থলে প্রসিদ্ধ পয়গম্বর হিযকীল আ.-ই উদ্দেশ্য।

এ বিশ্লেষণ থেকে আরো পরিষ্কার হয়ে গেল, ইউনুস আ. একজন ইসরাইলী নবী। ইমাম বুখারী কিতাবুল আম্বিয়াতে নবীগণের আলোচনায় নিজের তত্ত্বানুসন্ধান অনুযায়ী যে পর্যায়ক্রমিকতা লিখেছেন, তাতে ইউনুস আ.-এর উল্লেখ করেছেন হযরত মূসা ও হযরত শুআইব আ. ও হযরত দাউদ আ.-এর মধ্যস্থলে।

ধর্মপ্রচারের স্থান

ইরাকের বিখ্যাত ও সুপ্রসিদ্ধ জনপদ নীনাওয়ার অধিবাসীদের হেদায়েতের জন্য তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল। নীনাওয়া আশূরী রাজ্যের রাজধানী এবং মুসেল এলাকার কেন্দ্রীয় শহর ছিল। যে সময়ে ইউনুস আ. নীনাওয়াবাসীদের হেদায়েতের জন্য প্রেরিত হন, সে যুগটি ছিল রাজত্বের উন্নতির যুগ। কিন্তু তাদের শাসনপদ্ধতি ছিল গোত্রভিত্তিক। এক এক গোত্রের পৃথক পৃথক শাসনকর্তা বা রাজা থাকত। আর নীনাওয়া ছিল সেই গোত্রভিত্তিক রাজত্বগুলির রাজধানীসমূহের কেন্দ্রীয় মর্যাদার অধিকারী। এ কারণেই "নীনাওয়া" তার উন্নতি ও সৌভাগ্যে প্রসিদ্ধ ছিল।

কুরআন মাজিদে এ শহরের জনসংখ্যা লক্ষাধিক বলা হয়েছে। ইমাম তিরমিযি রহ. দুর্বল সনদে একটি মারফু হাদিস নকল করেছেন। তাতে এ সংখ্যা এক লাখ বিশ হাজার বলা হয়েছে। আর তাওরাত সমষ্টিতে যে গ্রন্থটি ইউনুস আ.-এর নামে নামকৃত হয়েছে, তাতেও এ সংখ্যাই উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু ইবনে আব্বাস রাযি. সাঈদ ইবনে জুবায়ের ও মাকহুল প্রমুখ থেকে اَوْ يَزِيْدُوْنَ শব্দের তাফসিরে লাখের ওপর দশ হাজার থেকে সত্তর হাজার পর্যন্ত উদ্ধৃত করেছেন। আমাদের মতে প্রথম মতটিই প্রবল।

হযরত ইউনুস আ.-এর ঘটনা

কুরআন মাজিদের আলোকে ইউনুস আ.-এর ঘটনাটি যদিও সংক্ষিপ্ত এবং ঘটনা প্রকাশে পরিষ্কার ও স্পষ্ট, কিন্তু কোনো কোনো ব্যাখ্যামূলক আলোচনায় ওটার অংশ

বিশেষকে জটিল করে দিয়েছে। সুতরাং প্রথমে কুরআন পাকের আয়াতসমূহের আলোকে ঘটনাটিকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দেওয়া সমীচীন মনে হচ্ছে। এরপর ব্যাখ্যামূলক আলোচনা করা হবে, যাতে ঘটনাটির প্রকৃত তথ্য অবগত হওয়ার ব্যাপারে সহায়ক হয়।

আল্লাহ তাআলা হযরত ইউনুস আ.-কে ২৮ বছর বয়সে নবুয়ত দান করেন। এবং নীনাওয়াবাসীকে দাওয়াত দেওয়ার আদেশ করেন। হযরত ইউনুস আ. এক সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত তাদের মধ্যে তাওহিদের দাওয়াত প্রদান করতে থাকেন। কিন্তু তারা সত্যের প্রতি কর্ণপাত করল না। বরং নাফরমানি ও অবাধ্যতাচরণের সঙ্গে শিরক ও কুফরের ওপর হঠকারিতা করতে থাকল। অতীতকালের নাফরমান উম্মতদের মতো আল্লাহ তাআলার সত্য পয়গম্বরের সত্য-প্রচারকেও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে থাকল। তাদের অনবরত বিরুদ্ধাচরণ ও শত্রুতার কারণে কওমের ওপর ইউনুস আ. ব্যথিত ও অসন্তুষ্ট হলেন। ক্রোধভরে তাদের ওপর আল্লাহ তাআলার আযাবের বদ দুআ করে তাদের থেকে অন্যত্র চলে গেলেন।

ইউনুস আ. যখন ফোরাত নদীর তীরে পৌছলেন, (তাফসিরে রূহুল মাআনী) তখন তিনি যাত্রীভর্তি একটি নৌকা পেয়ে তাতে আরোহণ করলেন। নৌকাটি নঙ্গর উঠিয়ে গন্তব্য পথে যাত্র করল। পথিমধ্যে ঝড়তুফান এসে নৌকাটিকে ঘেরাও করল। যখন নৌকাটি ভীষণভাবে টলতে লাগল এবং নৌকারোহীদের বিশ্বাস জন্মাল, তারা ডুবে মরবে, তখন তারা নিজেদের আকিদা অনুযায়ী বলতে লাগল, 'মনে হয় নৌকার মধ্যে মনিব থেকে পলাতক কোনো গোলাম আছে। তাকে নৌকা থেকে নামিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত মুক্তি পাওয়া কঠিন হবে।' এটা শুনে ইউনুস আ.-এর চেতনা হল, আল্লাহ তাআলার অহির অপেক্ষা না করে নীনাওয়া থেকে এভাবে আমার চলে আসা আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন নি। এ দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া আমার পরীক্ষার আলামত। এ চিন্তা করে তিনি নৌকার আরোহীবৃন্দকে বললেন, সেই পলাতক গোলাম আমি। আমিই নিজ মনিব থেকে পালিয়ে এসেছি। সুতরাং আমাকে নৌকার বাইরে ফেলে দাও।

কিন্তু নৌকার মাঝি ও আরোহীগণ তাঁর সততা ও পবিত্রতায় অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে পড়ল। তারা এরূপ করতে সম্মত হল না। পারস্পরিক পরামর্শক্রমে 'লটারি' দেওয়ার সিদ্ধান্ত হল। ফলত তিনবার লটারি করা হল, প্রতিবারই লটারিতে হযরত ইউনুস আ.-এর নাম আসল। তখন বাধ্য হয়ে তারা ইউনুস আ.-কে নদীতে নিক্ষেপ করল কিংবা তিনি নিজেই নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সেই মুহূর্তেই আল্লাহ তাআলার আদেশে একটি মাছ তাঁকে গিলে ফেলল। মাছের ওপর আদেশ ছিল, শুধু গিলে ফেলার অনুমতি আছে; কিন্তু ইউনুস তোমার খাদ্য নয়। সুতরাং তার দেহের যেন কোনো প্রকার ক্ষতি না হয়।

(ফাতহুল বারি : ৬/৫১)

ইউনুস আ. যখন মাছের পেটে নিজেকে জীবিত দেখতে পেলেন, তখন তিনি আল্লাহ তাআলার দরবারে লজ্জা ও অনুতাপ প্রকাশ করলেন, কেন আমি আল্লাহ তাআলার

ওহির অপেক্ষা না করে এবং তাঁর অনুমতি না নিয়ে, উম্মতের প্রতি ধর্মপ্রচার থেকে অসন্তুষ্ট হয়ে নীনাওয়া থেকে বেরিয়ে এলাম। তাই ত্রুটি মার্জনার জন্য আল্লাহ তাআলার দরবারে এরূপে দোয়া করতে লাগলেন :

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

"ইয়া আল্লাহ! আপনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। আপনি অদ্বিতীয়। আমি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। নিঃসন্দেহে আমি নিজ নফসের ওপর নিজেই যুলুম করেছি।" আল্লাহ তাআলা ইউনুস আ.-এর এ করুণ দোয়া শ্রবণ করে তা কবুল করলেন এবং মাছকে আদেশ করলেন : ইউনুস তোমার উদরে আমার আমানত রয়েছে, তাকে উগলিয়ে বের করে দাও। ফলে মাছ ইউনুস আ.-কে নদীর তীরে উগলে দিল।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, মাছের পেটে অবস্থানের দরুন তাঁর দেহের অবস্থা এরূপ হয়ে গিয়েছিল, যেমন পাখির একটি নবজাত বাচ্চা। যার দেহ অত্যন্ত কোমল ও নরম হয়ে থাকে। (তাফসিরে ইবনে কাসীর : সূরা আস-সফ্ফাত) দেহে পালক বা লোমও থাকে না। মোটকথা, মাছটি হযরত ইউনুস আ.-কে অত্যন্ত দুর্বল ও নিশ্চল অবস্থায় স্থলভাগের ওপর রেখে গেল। এরপর আল্লাহ তাআলা তাঁর জন্য একটি লতাগুল্মবিশিষ্ট গাছ উৎপন্ন করে দিলেন। (কথিত আছে, তা ছিল লাউগাছ।) ওটার ছায়াতলে তিনি অবস্থান করলেন। কয়েকদিন পর আল্লাহ পাকের নির্দেশে উক্ত গাছের শিকড়ে পোকা ধরে ওটাকে কর্তন করে ফেলল।

লতা যখন শুকাতে আরম্ভ করল, ইউনুস আ. চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তখন আল্লাহ তাআলা ওহি দ্বারা তাঁকে সম্বোধন করে বললেন, "ইউনুস! এ গাছটি শুকিয়ে যাওয়ার কারণে তুমি দুঃখিত হয়েছ, অথচ এটা একটা সামান্য গাছ। কিন্তু তুমি ভেবে দেখলে না, নীনাওয়ার অধিবাসী –যাতে লক্ষাধিক মানুষ বাস করছে, তাছাড়া বহু প্রাণীও বাস করে– ওটাকে ধ্বংস ও বরবাদ করে দিতে আমার একটুও অপছন্দ হবে না! এ লাউগাছের লতাটির প্রতি তোমার যতটুকু মমতা, আমি কি নীনাওয়াবাসীদের প্রতি এর চেয়ে অধিক সদয় ও মেহেরবান নই? অথচ তুমি ওহির অপেক্ষা না করে কওমের জন্য বদদুআ করে তাদের মধ্য হতে বেরিয়ে আসল? এটা একজন নবীর সম্মানের জন্য অসঙ্গত কাজ, সে কওমের জন্য আযাবের বদদুআ করে, এবং তাদেরকে ঘৃণা করে তাদের থেকে পৃথক হয়ে যেতে তাড়াহুড়া করে। ওহিরও অপেক্ষা করে না।"

হযরত ইউনুস আ. বদদুআ করে নীনাওয়াবাসীদের থেকে পৃথক হয়ে চলে গেলেন। তিনি চলে যাওয়ার পর লোকেরা তাঁর বদদুআ প্রতিফলিত হওয়ার কিছু লক্ষণ প্রত্যক্ষ করল। এছাড়া ইউনুস আ. বসতি ত্যাগ করে চলে যাওয়ার পর তাদের দৃঢ় বিশ্বাস হল, তিনি অবশ্যই আল্লাহ তাআলার যথার্থ পয়গম্বর। সুতরাং এখন আমাদের ধ্বংস অনিবার্য। এই ভেবে রাজা হতে আরম্ভ করে প্রজাবৃন্দ সকলের অন্তর ভয়ে কম্পমান হয়ে উঠল এবং ইউনুস আ.-এর অনুসন্ধান করতে লাগল, যাতে তাঁর হাতে ইসলাম

গ্রহণ করতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে তারা সকলে আল্লাহ পাকের দরবারে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগল। সর্বপ্রকারের পাপ কার্য ত্যাগ করে বসতির বাইরে খোলা মাঠে বেরিয়ে আসল। এমনকি গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুগুলিকেও সঙ্গে নিয়ে আসল। দুগ্ধপোষ্য শিশুদেরকেও তাদের মাতা হতে পৃথক করে দিল। এরূপে দুনিয়ার যাবতীয় সম্পর্ক হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে কান্নাকাটি করতে লাগল। সকলে মিলে অঙ্গীকার করতে লাগল, হে আমাদের পালনকর্তা! ইউনুস আ. আপনার যে পয়গাম নিয়ে আমাদের নিকট এসেছিলেন, আমরা তার সত্যতার প্রতি ঈমান আনয়ন করছি। অবশেষে আল্লাহ তাআলা তাদের তওবা কবুল করলেন, তাদেরকে ঈমানের অমূল্য ধনে ধনবান করে দিলেন এবং তাদেরকে আযাব থেকে রক্ষা করলেন।

পরে ইউনুস আ.-এর প্রতি পুনরায় নির্দেশ হল, তিনি যেন নীনাওয়ায় চলে যান এবং কওমের মধ্যে অবস্থান করে তাদেরকে হেদায়েত করতে থাকেন। আল্লাহ তাআলার এত অধিক সংখ্যক মানুষ তাঁর ফয়েয থেকে বঞ্চিত না থাকে। ফলে ইউনুস আ. আল্লাহ পাকের এ আদেশ মান্য করলেন এবং নীনাওয়ায় ফিরে এলেন। কওমের লোকেরা তাঁকে দেখে অসীম আনন্দ প্রকাশ করল। তারা হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়ে দীন ও দুনিয়ার সফলতা অর্জন করতে লাগল। এটা হল ঘটনার সেই পর্যায়ক্রমিক বিবরণ, যা কুরআন মাজিদের আয়াতসমূহের তাফসিরের অপব্যাখ্যা থেকে পবিত্র ও সঠিক অর্থ। বিভিন্ন সূরায় এ সম্পর্কিত আয়াতসমূহের আলোচনা দ্বারা এটি পরিষ্কার বোধগম্য। যেমন কুরআন মাজিদে ইরশাদ হচ্ছে :

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ

عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ

"তবে ইউনুসের সম্প্রদায় ব্যতীত কোনো জনপদবাসী কেন এমন হল না, যারা ঈমান আনত এবং তাদের ঈমান তাদের উপকারে আসত? তারা যখন বিশ্বাস করল, তখন আমি তাদেরকে পার্থিব জীবনে লজ্জাজনক শাস্তি হতে মুক্ত করলাম এবং কিছুকালের জন্যে জীবনোপভোগ করতে দিলাম।" (সূরা ইউনুস : ৯৮)

সূরা আম্বিয়ায় আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي

كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (٨٧) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ

"এবং স্মরণ কর যুন-নূন এর কথা! যখন সে ক্রোধভরে বের হয়ে গিয়েছিল এবং মনে করেছিল আমি তার জন্যে শাস্তি নির্ধারণ করব না। এরপর সে অন্ধকার থেকে আহ্বান করেছিল– তুমি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই; তুমি পবিত্র মহান! আমি তো সীমালঙ্ঘনকারী। তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে উদ্ধার করেছিলাম দুশ্চিন্তা থেকে। আর এভাবেই আমি মুমিনদের উদ্ধার করে থাকি।"

(সূরা আম্বিয়া : ৮৭-৮৮)

সূরা সাফ্ফাতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (١٣٩) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (١٤٠) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (١٤١) فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ (١٤٢) فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ (١٤٣) لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (١٤٤) فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ (١٤٥) وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ (١٤٦)

"ইউনুসও ছিল রাসূলগণের একজন। স্মরণ কর! যখন সে পলায়ন করে বোঝাই নৌযানে পৌঁছল। এরপর সে লটারিতে যোগদান করল এবং পরাভূত হল। পরে এক বৃহদাকার মাছ তাকে গিলে ফেলল। তখন সে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল। সে যদি আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা না করত, তা হলে তাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত থাকতে হত এর উদরে। এরপর ইউনুসকে আমি নিক্ষেপ করলাম এক তৃণহীন প্রান্তরে এবং সে ছিল রুগ্‌ণ। পরে আমি তার ওপর এক লাউ গাছ উদ্‌গত করলাম।

(সূরা সাফ্ফাত : ১৩৯-১৪৬)

সূরায়ে সাফ্ফাতে আল্লাহ তাআলা আরো বলেন :

وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ (١٤٧) فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ (١٤٨)

"তাকে (ইউনুস) আমি এক লাখ বা ততোধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম। ফলে তারা ঈমান এনেছিল। আর আমি তাদেরকে কিছুকালের জন্য জীবনোপভোগ করতে দিলাম।" (সূরা সাফ্ফাত : ১৪৭-১৪৮)

সূরা কলমে আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ (٤٨) لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ (٤٩) فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٥٠)

"অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায়, তুমি মৎস্য সহচরের মতো অধৈর্য হয়ো না, সে বিষাদগ্রস্ত অবস্থায় কাতর প্রার্থনা করেছিল। তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ তার নিকট না পৌঁছুলে সে লাঞ্ছিত হয়ে নিক্ষিপ্ত হত উন্মুক্ত প্রান্তরে। পুনরায় তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন এবং তাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করলেন।" (সূরা কলম : ৪৮-৫০)

উল্লিখিত আয়াতসমূহের ব্যাখ্যায় তাফসিরকারকগণ বলেন, আল্লাহ তাআলা তৎকালীন মুসেল প্রদেশের নীনাওয়া নামক জায়গার অধিবাসীদের নিকট ইউনুস আ.-কে প্রেরণ করেন। তিনি তাদেরকে মহান আল্লাহ তাআলার দিকে আহ্বান করেন। তারা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং তারা তাদের কুফুরি ও অবাধ্যতায় নিমগ্ন থাকে। এরপর যখন নবীর বিরুদ্ধে তাদের অবাধ্যতা ও নাফরমানী দীর্ঘায়িত হয় তখন তিনি

তাদের মধ্য হতে বের হয়ে পড়েন এবং তিন দিন পর তাদের প্রতি আযাব নাযিল হবে বলে সতর্ক করে দেন।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. মুজাহিদ, সাঈদ ইবনে জুবাইর, কাতাদা রহ. প্রমুখ মনীষী বলেন, ইউনুস আ. যখন তাঁর উম্মতদের মধ্য হতে চলে গেলেন এবং তাঁর সম্প্রদায় আল্লাহ তাআলার আযাব তাদের ওপর অত্যাসন্ন বলে নিশ্চিত হল, আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরে তওবার অনুভূতি সৃষ্টি করেন এবং তারা তাদের নবীর প্রতি কৃত অপকর্মের জন্যে লজ্জিত হয়ে পড়ল। তারপর তারা দৈন্যের প্রতীক মোটা কাপড় পরে নিল এবং প্রত্যেকটি পশু শাবককে তাদের মা থেকে পৃথক করে দিল। অন্যদিকে নিজেরা আল্লাহ তাআলার দরবারে কাতর হয়ে প্রার্থনা করতে লাগল। করুণ স্বরে তারা ফরিয়াদ করতে লাগল। অনুনয় বিনয় করতে লাগল। নিজেদেরকে প্রতিপালকের প্রতি সমর্পণ করে দিল। ছেলে-মেয়ে স্ত্রী-পুরুষ সকলেই আল্লাহ তাআলার দরবারে কান্নাকাটি করতে লাগল। প্রতিটি জীব-জন্তু কাতরাতে লাগল। উট ও তার বাচ্চাগুলো চিৎকার করতে লাগল। গাভী, গরু ও বাছুরগুলো হাম্বা হাম্বা ডাক ছাড়তে লাগল। ছাগল ও তার ছানাগুলো ভ্যাঁ ভ্যাঁ করতে লাগল। এক প্রচণ্ড ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হল। তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর কুদরত, রহমত ও করুণাবশে তাদের ওপর থেকে আযাব রহিত করে দিলেন। আল্লাহ তাআলার আযাব তাদের মাথার উপর এসে গিয়েছিল এবং রাতের তিমির রাশির মতো মাথার উপর ঘুরছিল। এ ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ

عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ

এতে বোঝা যায়, পরিপূর্ণরূপে কেউ ঈমান আনয়ন করে নি। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ

"যখনই আমি কোনো জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করেছি, তখনই এটার বিত্তশালী অধিবাসীরা বলেছে, তোমরা যা সহকারে প্রেরিত হয়েছ আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি।" (সূরা সাবা : ৩৪)

এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ

এতে বুঝা যায়, পরে তারা পরিপূর্ণভাবে ঈমান এনেছিল। তবে এ ধরনের ঈমান কি আখেরাতেও তাদের কোনো উপকারে আসবে এবং আখেরাতের আযাব থেকে তাদেরকে মুক্ত করবে? যেমন পার্থিব জীবনে এ ঈমান তাদেরকে পার্থিব শাস্তি থেকে

রক্ষা করেছে? এ ব্যাপারে দ্বিমত আছে। বাক্যের বাচনভঙ্গিতে প্রকাশ্যতর মত হচ্ছে, আখেরাতেও এ ঈমান উপকারে আসবে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন : لَّمَّا آمَنُوا। অর্থাৎ– যখন তারা ঈমান আনলো। আবার আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ (١٤٧) فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ

এতে বুঝা যায়, উল্লিখিত কিছুকালের জন্যে জীবনোভোগ ও আখেরাতে আযাব রহিত হওয়ার মধ্যে কোনো বৈপরিত্য নেই। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

যে সকল লোকের হেদায়েতের জন্যে ইউনুস আ.-কে প্রেরণ করা হয়েছিল, তাদের সংখ্যা সুনিশ্চিত এক লাখ ছিল। তবে তাফসীরকারকগণের মধ্যে এক লাখের অতিরিক্ত সংখ্যা নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। মাকহুল রহ.-এর বর্ণনা মতে এ সংখ্যাটি ছিল দশ হাজার। তিরমিযি, ইবনে জারীর তাবারী ও ইবনে আবু হাতিম রহ. প্রমুখ উবাই ইবনে কাব রাযি. থেকে বর্ণনা করেন :

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ আয়াতাংশের তাফসির সম্পর্কে প্রশ্ন করায় তিনি বলেন, তারা এক লাখের উর্ধ্বে বিশ হাজার ছিল। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত আছে : তারা ছিলেন ১ লাখ ৩০ হাজার। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে অন্য এক সূত্রে বর্ণিত আছে : তাদের সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৩০ হাজারের উর্ধ্বে। অন্য এক সূত্রে বর্ণিত আছে : ১ লাখ ৪০ হাজারের উর্ধ্বে। সাঈদ ইবনে জুবাইর রাযি. বলেন : "তারা সর্বসাকুল্যে ১ লাখ ৭০ হাজার ছিল।"

এ সংখ্যা মাছ সংক্রান্ত ঘটনার পূর্বে ছিল না-কি পরে, এ ব্যাপারেও তাফসিরকারকগণের মতভেদ রয়েছে। এ লোকসংখ্যা একটি সম্প্রদায়ের নাকি পৃথক পৃথক দুটি সম্প্রদায়ের এ নিয়েও মতভেদ আছে। এ তিনটি বিষয়ে তাফসির গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

মোটকথা, যখন ইউনুস আ. আপন সম্প্রদায়ের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তার নিজ জনপদ ত্যাগ করে অন্যত্র রওনা হলেন, তখন তিনি সাগর পার হবার জন্যে অন্যদের সাথে নৌকায় উঠলেন। নৌকাটি কিছুক্ষণ পর যাত্রীদের নিয়ে উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে পড়ল। নৌকাটি ঘুরপাক খেতে লাগল এবং ডুবুডুবু অবস্থায় পতিত হল। তাফসীরকারদের বর্ণনা মতে তাদের সকলের ডুবে মরার উপক্রম হল। সুতরাং নাবিক ও যাত্রীরা মিলে পরামর্শক্রমে লটারির মাধ্যমে পলাতক অপরাধী সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছতে মনস্থ করল। তারা স্থির করল, লটারিতে যার নাম উঠবে অন্যদেরকে রক্ষা করার জন্যে তাকে নৌকা থেকে ফেলে দিতে হবে। লটারিতে আল্লাহর নবী ইউনুস আ.-এর নাম উঠল। এতে তারা তাঁকে নৌকা থেকে ফেলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত না করে পুনরায় লটারি দেয়। কিন্তু এবারও তাঁর নাম উঠে। আল্লাহর নবী অন্যদেরকে রক্ষা করার জন্যে আপন কাপড় খুলে ঝাঁপ দিতে তৈরি হলেন; কিন্তু নাবিক ও যাত্রীরা তাঁকে বাধা দিল এবং

তারা পুনরায় লটারি করল। তৃতীয় বারেও আল্লাহ তাআলার কোনো মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে তাঁরই নাম ওঠল। আল্লাহ তাআলা এ ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন সূরা সাফফাত : ১৩৯-৪১ নং আয়াতে।

পরে যখন লটারিতে বারবার ইউনুস আ.-এর নাম উঠল তখন তাকে নদীতে ফেলে দেওয়া হল। আল্লাহ তাআলা তার জন্যে সবুজ সাগর থেকে একটি বিরাট মাছ প্রেরণ করেন। মাছটি তাঁকে গিলে ফেলে। আল্লাহ তাআলা মাছকে হুকুম দেন, যেন সে তার অস্থি-মাংস কিছুই না খায়। কেননা এটা তার রিযিক নয়। তারপর মাছটি তাঁকে নিয়ে সমস্ত সাগরময় ঘুরে বেড়ায়। কেউ কেউ বলেন, এ মাছটিকে তার চেয়ে বড় আকারের মাছ গিলে ফেলে। তাফসীরকারকগণ বলেন, যখন তিনি মাছের পেটে অবস্থান করছিলেন, তখন তিনি নিজকে মৃত বলেই মনে করছিলেন এবং তিনি নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাড়া দিয়ে এগুলো নড়ছে দেখে নিশ্চিত হন, তিনি জীবিত রয়েছেন। তিনি আল্লাহ তাআলার দরবারে সিজদায় পড়লেন এবং বললেন, "হে আমার প্রতিপালক! আমি এমন এক স্থানে আপনার দরবারে সিজদা করলাম, যেরূপ স্থানে এর আগে আর কেউই কোনো দিন সিজদা করে নি।"

ইউনুস আ.-এর মাছের পেটে অবস্থানের মেয়াদ নিয়ে তাফসীরকারকগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। মুজাহিদ হযরত শাবী রহ. থেকে বর্ণনা করেন, দিনের প্রথম প্রহরে মাছ তাঁকে গিলেছিল আর শেষ প্রহরে বমি করে ডাঙ্গায় নিক্ষেপ করেছিল। কাতাদা রহ. বলেন, তিনদিন; জাফর সাদিক রহ. বলেন, সাত দিন আর সাঈদ ইবনে আবুল হাসান রহ. ও আবু মালিক রহ. বলেন, ৪০ দিন। আল্লাহ তাআলাই অধিক জানেন, কত সময় ছিলেন।

মোটকথা, যখন মাছটি তাকে নিয়ে সাগরের তলদেশে ভ্রমণ করছিল এবং উত্তাল তরঙ্গমালায় বিচরণ করছিল, তখন তিনি আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে নিবেদিত মাছের তাসবিহ শুনতে পেলেন। সাত আসমান ও সাত জমিনের প্রতিপালক, এতদুভয়ের মধ্যে ও মাটির নিচে যা কিছু রয়েছে এদের প্রতিপালকের জন্যে নিবেদিত পাথরের তাসবিহও তিনি শুনতে পান। তখন তিনি মুখে ও তার অবস্থার দ্বারা যে আকুতি জানান, সে সম্পর্কে সর্বজ্ঞানী আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন :

وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (٨٧) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ

উল্লেখ্য, আয়াতাংশ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ এর ব্যাখ্যায় আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. ও সাঈদ ইবনে জুবায়ের প্রমুখ মুফাস্‌সির বলেন, আয়াতে উল্লিখিত ظلمات দ্বারা মাছের পেটের অন্ধকার, সমুদ্রের অন্ধকার এবং রাতের অন্ধকারকে বুঝানো হয়েছে। সালিম ইবনে আবুল জাদ রহ. বলেন, যে মাছটি ইউনুস আ.-কে গিলে ফেলেছিল, অন্য একটি

মাছ আবার ওটাকে গিলে ফেলে। এ দুই ধরনের অন্ধকার এবং তৃতীয়ত সমুদ্রের অন্ধকারের সাথে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ (١٤٣) لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ

"সে যদি আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা না করত, তা হলে তাকে পুনরুত্থিত দিবস পর্যন্ত তার পেটে থাকতে হত।" (সূরা সাফ্ফাত : ১৪৩-১৪৪)

কাজেই কেউ কেউ বলেন, তিনি যদি সেখানে আল্লাহর পবিত্রতা ও তাঁর মহিমা ঘোষণা না করতেন, অনুনয় বিনয় সহকারে আপন ত্রুটি স্বীকার না করতেন, কৃতকর্মের জন্যে লজ্জিত হয়ে আল্লাহর প্রতি ঝুঁকে না পড়তেন, তবে মাছের পেটে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত থাকতেন। মাছের পেট থেকেই তাকে পুনরুত্থিত করা হত। সাঈদ ইবনে জুবাইর রাযি. হতে বর্ণিত দুটি বর্ণনার একটি উপরোক্ত বর্ণনার মর্মার্থ প্রকাশ করে।

আবার কেউ কেউ বলেন, মাছ তাঁকে গিলে ফেলার পূর্বে যদি তিনি আল্লাহ তাআলার অধিক স্মরণকারী, মুসল্লী ও আনুগত্য স্বীকারকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হতেন ...। এটা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. সহ বহু তাফসীরকারকের মত। ইমাম আহমদ রহ. এবং সুনান গ্রন্থের সংকলক কর্তৃক আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত একটি রেওয়ায়েতও এর প্রমাণ বহন করে। ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সম্বোধন করে বলেন, হে বালক! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শেখাব। এগুলো তুমি সংরক্ষণ করবে। আল্লাহ তাআলা তোমার হেফাজত করবেন। আল্লাহ তাআলার হুকুমের প্রতি লক্ষ রাখলে আল্লাহ তাআলাকে তোমার প্রতি সন্তুষ্ট পাবে। সচ্ছলতার সময় আল্লাহ তাআলাকে চিনলে তোমার সংকটকালে আল্লাহ তাআলা তোমাকে চিনবেন।

ইবনে জারীর তাবারী রহ. তাঁর তাফসির গ্রন্থে এবং বায্যার রহ. তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যখন আল্লাহ তাআলা মাছের পেটে ইউনুস আ.-কে বন্দী করতে ইচ্ছে করলেন, তখন তিনি মাছকে নির্দেশ দিলেন, ইউনুস আ.-কে ধর! তবে তার শরীর জখম করবে না এবং তার হাড়ও ভাঙবে না। মাছ যখন তাকে নিয়ে সাগরের তলদেশে চলে গেল, ইউনুস আ. তখন মাছের পেটে আওয়াজ শুনতে পেলেন এবং মনে মনে বলতে লাগলেন, একি ব্যাপার? আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি এ মর্মে ওহি প্রেরণ করলেন, এগুলো হচ্ছে সাগরের প্রাণীদের তাসবিহ। ফেরেশতাগণ বললেন, হে আমাদের প্রতিপালক! এই জনমানবহীন স্থানে আমরা একটি আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। জবাবে আল্লাহ তাআলা বললেন, এ আমার বান্দা ইউনুস আ.। সে আমার নাফরমানি করেছে তাই আমি তাকে সাগরের মাছের পেটে কয়েদ করেছি। ফেরেশতারা বললেন, "তিনি কি ওই সৎ বান্দা নন, যার নেকআমল প্রতিদিনই আপনার দরবার পৌছত?" আল্লাহ তাআলা বললেন : 'হ্যাঁ'।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তখন ফেরেশতাগণ আল্লাহ তাআলার দরবারে তাঁর জন্যে সুপারিশ করলেন। সুপারিশ মঞ্জুর করে আল্লাহ তাআলা তাঁকে সাগরের কিনারে রেখে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন মাছকে। সেমতে মাছ তাঁকে সাগরের কিনারায় রেখে চলে গেল। এ অবস্থার কথাই আল্লাহ তাআলা বলেন, وَهُوَ سَقِيمٌ অর্থাৎ সে ছিল রুগ্‌ণ। (সূরা সাফ্‌ফাত : ১৪৩)

এ হল ইবনে জারীর রহ.-এর ভাষ্য। বায্‌যার রহ. বলেন, এ সনদ ছাড়া আর কোনো সনদে এ হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। ইবনে হাতিম রহ. তাঁর তাফসীরে বলেন, আনাস ইবনে মালিক রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইউনুস আ. মাছের পেটে অবস্থানরত অবস্থায় নিম্ন বর্ণিত শব্দমালার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করেন :

اللَّهُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

"হে আল্লাহ! তুমি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই; তুমি পবিত্র, মহান! আমি তো সীমালঙ্ঘনকারী।" (সূরা আম্বিয়া : ৮৭)

এ দুআর গুণগুণ আওয়াজ আল্লাহ তাআলার আরশে পৌঁছলে ফেরেশতাগণ বললেন, হে আমাদের প্রতিপালক! জনমানবহীন ভূমি থেকে যে ক্ষীণ আওয়াজ আসছে, তা যেন পরিচিত। আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমরা কি এ শব্দ চেন না? তারা বললেন, হে আমাদের প্রতিপালক! তিনি কে? আল্লাহ তাআলা বললেন, আমার বান্দা ইউনুস। তাঁরা বললেন, আপনার বান্দা সেই ইউনুস, যাঁর আমল সব সময়ই গ্রহণীয়রূপে আপনার দরবারে উত্থিত হত? তারা আরো বললেন, হে আমাদের প্রতিপালক! তিনি স্বাচ্ছন্দ্যের সময় যে আমল করতেন এর বিনিময়ে আপনি কি দুঃখের সময় তাঁর প্রতি সদয় হবেন না এবং সংকট থেকে তাঁকে উদ্ধার করবেন না? আল্লাহ তাআলা বললেন : হ্যাঁ। তখন মাছকে তিনি নির্দেশ দিলেন। তখন মাছ তাঁকে এক তৃণহীন প্রান্তরে নিক্ষেপ করল। আবু হোরায়রা রাযি. থেকে অতিরিক্ত বর্ণনায় রয়েছে, সেখানে আল্লাহ তাআলা তাঁর জন্যে একটি লাউ গাছ জন্মালেন এবং তাঁর জন্যে একটি পোকামাকড় ভোজী বন্য ছাগলের ব্যবস্থা করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, প্রাণীটি তাঁর জন্যে গা এলিয়ে দিত এবং সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁকে তৃপ্ত করে দুধ পান করাত, যতদিন না সেখানে ঘাঁসপাতা গজিয়ে ওঠে।

লাউ গাছের উপকারিতা

ওলামাগণ বলেন : লাউগাছ উদগত করার মধ্যে অনেক হেকমত রয়েছে। লাউ গাছের পাতা খুবই কোমল, সংখ্যায় বেশি, ছায়াদার। মাছি এর কাছে যায় না। এর ফল ধরার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তা খাওয়া যায়, কাঁচা ও রান্না করে খাওয়া যায়, বাকল খাওয়া যায়। আবার বীচিও খাওয়া যায়। এটা মস্তিষ্কের বলবর্ধক এবং তাতে অন্য অনেক গুণাগুণ রয়েছে।

ইবনে জারীর রহ. সাদ ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণনা করেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি– ইউনুস ইবনে মাত্তার দুআয় ব্যবহৃত আল্লাহ তাআলার নাম নিয়ে দুআ করা হলে তিনি তাতে সাড়া দেন এবং কিছু চাওয়া হলে তিনি তা দান করেন।

বর্ণনাকারী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করলাম, আল্লাহর রাসূল! এটা কি শুধু ইউনুস আ.-এর জন্যে খাস ছিল, না কি সকল মুসলমানের জন্যেও?' উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এটা ইউনুস আ.-এর জন্যে বিশেষভাবে এবং সাধারণভাবে মুসলমানদের জন্যে– যদি তারা এ দুআ করে। তুমি কি আল্লাহর বাণী লক্ষ কর নি ? যাতে তিনি বলেছেন :

فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (٨٧)

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ

কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে দুআ করবে তার জন্যে হযরত ইউনুস আ. যে দুআটি করেছেন, সে দুআ করা শর্ত। অন্য এক সূত্রে সাদ ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত হয়েছে : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– যে ব্যক্তি ইউনুস আ.-এর দুআর শব্দ দিয়ে দুআ করে, তার দুআ কবুল করা হয়। বর্ণনাকারী বলেন, এ হাদিসের দ্বারা وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ এর দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ইমাম মুহাম্মদ রহ. সাদ ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণনা করেন : একদিন আমি উসমান ইবনে আফ্ফান রাযি.-এর সঙ্গে মসজিদে দেখা করলাম। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তাঁকে আমার প্রতি সন্তুষ্টই মনে হল, কিন্তু তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন না। আমি ওমর রাযি.-এর কাছে গেলাম। বললাম, আমিরুল মুমিনিন! সালামের সম্বন্ধে কি কিছু ঘটে গেছে? তিনি বললেন, না। কী হয়েছে ? আমি বললাম, কিছুই না। আমি উসমান রাযি.-এর সঙ্গে এ মাত্র মসজিদে দেখা করলাম, তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট মনে হল, কিন্তু আমার সালামের উত্তর দেন নি।

বর্ণনাকারী বলেন, ওমর রাযি. উসমান রাযি.-এর কাছে একজন লোক পাঠালেন। হযরত ওমর রাযি. এবার হযরত উসমান রাযি.কে বললেন, তুমি আমার ভাইয়ের সালামের উত্তর কেন দিলে না কেন? উসমান রাযি. বললেন– না, আমি এরূপ কাজ করি নি। সাদ রাযি. বললেন, না, তিনি এরূপ করেছেন। এতে দুজনই শপথ করে নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করেন। বর্ণনাকারী বলেন, পরে যখন উসমান রাযি.-এর স্মরণ হয় তখন তিনি বললেন– হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলার কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। আল্লাহর কাছে আমি তওবা করছি। তুমি আমার সাথে এই মাত্র দেখা করেছিলে। কিন্তু আমি মনে মনে এমন একটি কথা নিয়ে চিন্তামগ্ন ছিলাম, যা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি। আল্লাহর কসম! যখনই আমি এটা স্মরণ করি, তখনই তা যেন আমার

চোখ, মুখ ও অন্তরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। সাদ রাযি. বললেন, আমি আপনাকে একটি হাদিস সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আমাদের সামনে উত্তম দুআ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এমন সময় এক বেদুঈন এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অন্যদিকে নিবিষ্ট করে ফেলল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে দাঁড়ালেন, আমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করলাম। যখন আমার আশঙ্কা হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি পৌছানোর পূর্বেই আপন ঘরে পৌঁছে যাবেন। আমি তখন মাটিতে জোরে পা দিয়ে আঘাত করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার দিকে ফিরে তাকালেন। বললেন, কে? আবু ইসহাক না কি? জবাবে আমি বললাম : জি, আল্লাহর রাসূল ! তিনি বললেন, কী জন্য এই আওয়াজ? বললাম : মারাত্মক কিছুই না। আল্লাহর শপথ! আপনি আমাদের কাছে উত্তম দুআ সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন। ইতোমধ্যে বেদুঈনটি এল। এবং আপনার কথায় ব্যাঘাত ঘটাল। তিনি বললেন : হ্যাঁ, এটা হচ্ছে মৎস্য-সহচরের মাছের পেটে অবস্থানকালীন দুআ। দুআটি হচ্ছে :

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

যখনই কোনো মুসলিম কোনো বিষয়ে আপন প্রতিপালকের কাছে এই দুআ করে তখনই তা কবুল করা হয়। এ হাদিসটি ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সাদ সূত্রে তিরমিযি ও নাসাঈ রহ. বর্ণনা করেছেন।

ইনতেকাল

শাহ আবদুল কাদের দেহলবি (আল্লাহ পাক তাঁর সমাধিকে নূর-পূর্ণ করুন) বলেন, ইউনুস আ. নবুয়ত প্রাপ্ত হয়ে যেই নীনাওয়া শহরে প্রেরিত হন, সেখানেই তাঁর ইনতেকাল করেন। সেখানেই সমাহিত হন।

আবদুল ওয়াহ্হাব নাজ্জার রহ. বলেন, ফিলিস্তিনের খলিল নামক শহরের কাছে হালহুল নামে প্রসিদ্ধ একটি বসতি আছে। তাতে একটি কবর আছে। ওটিকে ইউনুস আ.-এর কবর বলা হয়। সেই কবরটির কাছে আরো একটি কবর রয়েছে। যার সম্বন্ধে জনমত হলো– এটি ইউনুস আ.-এর পিতা মাত্তার কবর।

আমাদের মতে হযরত শাহ আবদুল কাদের দেহলবি রহ. এর উক্তিটিই সঠিক। কেননা হযরত ইউনুস আ. সম্বন্ধে যতটুকু জানা গেছে, তাতে সকলের ঐকমত্য হল, তিনি পুনরায় নীনাওয়া শহরে ফিরে গিয়েছিলেন এবং নিজ কওমের মধ্যেই অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেছেন। সুতরাং এটাই সঠিক বলে মনে হয়, তাঁর ইনতেকাল নীনাওয়া শহরেই হয়েছিল এবং সেখানেই তাঁর সমাধি হয়ে থাকবে। নীনাওয়া শহরটি বিধ্বস্ত হওয়ার পর সম্ভবত সেই সমাধিটিও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। পরে শ্রদ্ধাবশত হালহুলের অপরিচিত দুটি কবরকে ইউনুস আ. ও তাঁর পিতা মাত্তা-এর কবর বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

আজও কোনো কোনো বিখ্যাত আওলিয়ায়ে কেরামের নামে একজন বুযুর্গ লোকের বহু জায়গায় কবর বিদ্যমান আছে। আর এরূপ তো অনেকেই দেখা যায়, অপ্রসিদ্ধ বুযুর্গানের নামের সাথে বহু কবরকে মিছামিছি সম্পর্কিত করে পার্থিব স্বার্থ হাছিল করা হচ্ছে।

ইউনুস আ.-এর মর্যাদা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইউনুস আ.-এর আলোচনা করে তাঁর মাহাত্ম্য-মর্যাদা বিশেষভাবে প্রকাশ করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: إِنِّي خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ" زَادَ مُسَدَّدٌ: «يُونُسَ بْنِ مَتَّى»

"তোমাদের মধ্য থেকে কেউই এ কথা যেন কখনো না বলে, আমি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইউনুস ইবনে মাত্তা থেকে উত্তম।"

হযরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে : একবার এক ইহুদি কিছু মাল বিক্রয় করছিল। কোনো এক ব্যক্তি কিছু খরিদ করে যেই মূল্য প্রদান করতে চাইল, তা ইহুদির পছন্দ হল না। ইহুদি বলল, সেই খোদার কসম! যিনি মূসা আ.-কে মানবজাতির মধ্যে সর্বোত্তম সৃষ্টি করেছেন, আমি এ মূল্যে কখনো মাল বিক্রয় করব না। একজন আনসারি সাহাবি এ কথা শুনে ক্রোধে ইহুদিকে চপেটাঘাত করলেন। এবং বললেন, তুই এমন কথা বলছিস, অথচ আমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদ্যমান রয়েছেন। ইহুদি তৎক্ষণাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে ফরিয়াদ করল : আবুল কাসেম ! আমি যখন আপনার প্রতিশ্রুতি ও দায়িত্বের অধীন রয়েছি, তখন এ আনসারি আমার মুখে চপেটাঘাত কেন করল? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারি সাহাবিকে কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তিনি পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করলেন :

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারক ক্রোধে রঙ্গিন বর্ণ ধারণ করল। তিনি বললেন, তোমরা কখনো আম্বিয়া আ.-এর মধ্য থেকে কাউকেও কারো ওপর অধিক ফযিলত প্রদান করো না। কেননা যখন প্রথমবার শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, তখন যমিন ও আসমানের মধ্যবর্তীস্থানে যত প্রাণীই আছে, সকলেই বেহুঁশ হয়ে পড়বে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা যাকে মুক্ত রাখেন সে ছাড়া। এরপর দ্বিতীয় বার শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হলে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি হুঁশ প্রাপ্ত হবে, সে ব্যক্তি হব আমি। কিন্তু আমি বেহুঁশ অবস্থা হতে সচেতন হয়েই দেখতে পাব, মূসা আ. আরশে ঠেস দিয়ে দণ্ডায়মান রয়েছেন। এখন আমি বলতে পারি না, তাঁর বেহুঁশ হওয়ার ব্যাপারটি তূর পাহাড়ের ঘটনার মধ্যে ধরা হয়েছে কি-না? যে কারণে আজ তিনি বেহুঁশ হতে রক্ষা

পেয়ে গেলেন অথবা আজ তিনি আমার পূর্বেই হুঁশ প্রাপ্ত হয়েছেন। আর আমি বলি না, কোনো নবীই হযরত ইউনুস আ. অপেক্ষা অধিক ফযিলতের অধিকারী। (বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া)

সূরায়ে সাফ্ফাতে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ

নিশ্চয় ইউনুস ছিল রাসূলদের একজন।

অনুরূপভাবে সূরায়ে নিসা ও আনআমে তাকে আম্বিয়ায়ে কেরামের অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁদের উপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক। ইমাম আহমদ রহ. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. সূত্রেও এরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন :

وَمَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُوْلَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتَّى

তাবারানীর বর্ণনায় عند الله শব্দটি অতিরিক্ত রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর নিকট উত্তম। বর্ণনাটির সনদ ত্রুটিমুক্ত।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে :

لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُفَضِّلَنِي عَلَى يُوْنُسَ بْنِ مَتَّى

"আমাকে (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) ইউনুস আ. ইবনে মাত্তা থেকে উত্তম মনে করা সমীচীন নয়।"

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

لَا تُفَضِّلُوْنِي عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَلَا عَلَى يُوْنُسَ بْنِ مَتَّى

"আমাকে অন্যান্য নবীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিও না, ইউনুস আ.-এর উপরও নয়।"

এটা অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিনয় প্রকাশের জন্যে বলেছেন। আল্লাহর রহমত ও শান্তি তাঁর প্রতি ও অন্যান্য নবী-রাসূলগণের প্রতি বর্ষিত হোক!

এ সমস্ত রেওয়ায়েতে বিশেষভাবে হযরত ইউনুস আ.-এর যে ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে, এতে সমস্ত ওলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে একমত– হযরত ইউনুস আ.-এর ঘটনা পাঠকারীর মনে তাঁর পবিত্র ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কোনো প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতির সন্দেহ না জন্মে। সুতরাং সেই পন্থা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর শানের মাহাত্ম্যকে এরূপ স্পষ্টভাবে তুলে ধরা প্রয়োজন মনে করেছেন।

হযরত মূসা আ.

বংশ পরিচয় ও জন্ম

হযরত মূসা আ.-এর বংশধারা কয়েক পুরুষের মাধ্যমে হযরত ইয়াকুব আ. পর্যন্ত পৌঁছে। তাঁর পিতার নাম ইমরান ও মাতার নাম ইউকাবাদ। পিতার বংশ-পরম্পরা এরূপ– ইমরান ইবনে কামাত ইবনে লাওয়া ইবনে ইয়াকুব আ.। হযরত হারূন আ. হযরত মূসা আ.-এর সহোদর ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। ইমরানের গৃহে হযরত মূসা আ.-এর জন্ম হয়েছিল এমন সময়ে, যখন ফেরাউন বনি ইসরাঈল বংশের নবজাতক বালক শিশুদেরকে হত্যা করে ফেলার সিদ্ধান্ত করেছিল। এ কারণে তাঁর মাতা এবং পরিবারের লোকেরা তাঁর জন্মের সময় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও বিচলিত হয়ে পড়েছিল। কেমন করে শিশুটিকে হত্যাকারীদের দৃষ্টি থেকে রক্ষা করা যায়। যা হোক, তিন মাস পর্যন্ত তাঁকে সকলের দৃষ্টি হতে গোপন রাখা হল। তাঁর জন্মগ্রহণের সংবাদ কাউকেও জানতে দেওয়া হল না। কিন্তু গুপ্তচরদের অনুসন্ধান এবং অবস্থা গুরুতর হওয়ার কারণে বেশি দিন এ ঘটনা গোপন রাখার ভরসা করা গেল না। সুতরাং তাঁর মাতার অস্থিরতা বৃদ্ধি পেতে লাগল। এ কঠিন এবং করুণ অবস্থায় অবশেষে আল্লাহ তাআলা সাহায্য করলেন এবং মূসা আ.-এর জননীর মনে একটি কৌশলের উদ্ভব করে দিলেন– তিনি যেন একটি সিন্দুক নির্মাণ করেন। এরপর ওটার ওপর আলকাতরা ও তেলের পালিশ করেন। যাতে ভিতরে পানি প্রবেশ করতে না পারে। এরপর শিশুটিকে তাতে রেখে দেন। অনন্তর সিন্দুকটিকে নীল নদের স্রোতে ভাসিয়ে দেন।

মূসা আ.-এর মাতা তাই করলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজের জ্যেষ্ঠ কন্যা মূসা আ.-এর সহোদরা ভগ্নিকে আদেশ করলেন, তিনি যেন সেই সিন্দুকটি ভাসিয়ে দেওয়ার সাথে সাথে তীরের ওপর দিয়ে হেঁটে সিন্দুকটির প্রতি দৃষ্টি রাখেন এবং দেখেন, আল্লাহ তাআলা তাকে হেফাযত করার ওয়াদা কিভাবে পূর্ণ করেন। কেননা মূসা আ.-এর মাতাকে আল্লাহ তাআলা এ সুসংবাদ পূর্বেই শুনিয়ে দিয়েছিলেন, আমি এ শিশুকে তোমার কোলেই ফিরিয়ে দিব এবং এ শিশু কালক্রমে পয়গম্বর ও রাসূল হবে।

ফেরাউনের গৃহে প্রতিপালন

হযরত মূসা আ.-এর ভগ্নি নদীর তীর ধরে ভাসমান সিন্দুকটির প্রতি দৃষ্টি রেখে হাঁটছিলেন। তিনি দেখলেন, সিন্দুকটি ভেসে শাহি মহলের নিকটে এসে থেমে গেল। ফেরাউনের পরিবারের একজন রমণী নিজ চাকরদের দ্বারা সিন্দুকটি উঠিয়ে শাহি মহলে নিয়ে গেল। হযরত মূসা আ.-এর বোন তা দেখে খুব আনন্দিত হলেন। সঠিক অবস্থা ভালোরূপে জানার জন্য তিনি রাজ-মহলের চাকরাণীদের সঙ্গে মিশে গেলেন। এই রমণী ছিলেন ফেরাউনের স্ত্রী। কোরআন মাজিদে এ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে : فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ "এরপর ফেরাউনের পরিবারস্থ লোকেরা তাঁকে উঠিয়ে নিল।"

তদ্রূপ পুত্র বানানোর আকাঙ্ক্ষা এবং হত্যা না করার জন্য সুপারিশকারী সম্বন্ধে বলেছে : وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ "আর ফেরাউনের স্ত্রী বলল।" হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে এরূপই বর্ণিত রয়েছে। যা হোক। ফেরাউনের পরিবারের লোকেরা সিন্দুকটি খুলে দেখতে পেল, একটি সুন্দর ও স্বাস্থ্যবান শিশু। ভিতরে আরামে শুয়ে বৃদ্ধাঙ্গুলি চুষছে। তৎক্ষণাৎ তাকে রাজমহলে নিয়ে গেল। ফেরাউনের স্ত্রী শিশুটিকে দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লেন এবং নিতান্ত মহব্বতের সাথে তাকে আদর করলেন।

রাজমহলের চাকরদের মধ্যে কেউ বলে উঠল, "এ শিশুটিকে তো ইসরাঈলী বলে মনে হচ্ছে। আমাদের শত্রু ওই খান্দানের শিশু। একে হত্যা করে ফেলা আবশ্যক। পাছে না আবার এ শিশুই আমাদের স্বপ্নের বাস্তব ব্যাখ্যা হয়ে দাঁড়ায়।" এটা শুনে ফেরাউনেরও তদ্রূপ ইচ্ছা হল। ফেরাউনের স্ত্রী ফেরাউনের হাবভাব দেখে বললেন, এমন একটি সুদর্শন শিশুকে হত্যা করো না। বিচিত্র কি, এ শিশুটিই তোমার ও আমার জন্য চক্ষু শীতলকারী হবে কিংবা আমরা তাকে আমাদের পুত্রই করে নেব এবং তার অস্তিত্ব আমাদের জন্য হিতকর প্রমাণিত হবে। অর্থাৎ এ শিশুটি যদি সেই ইসরাঈলী শিশুই সাব্যস্ত হয়, যে তোমার স্বপ্নের তাবীর হবে, তবে আমাদের মহব্বত এবং প্রতিপালনের ক্রোড় হয়তো তাকে ক্ষতিকর হওয়ার পরিবর্তে হিতকর করে দেবে। কিন্তু ফেরাউন এবং তার খান্দানের লোকেরা কি জানে, আল্লাহ পাকের অদৃষ্টলিপি তাদের প্রতি রসিকতা করছে। রাব্বুল আলামিনের অপার মহিমা! ফেরাউনকে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও বেখবর রেখে তাকে তার শত্রুর রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করে দিলেন।

এখন প্রশ্ন উঠল, শিশুর জন্য দুগ্ধদানকারিণী ধাত্রী নিযুক্ত করার। কিন্তু আল্লাহ তাআলা মূসার মাতার সঙ্গে কৃতওয়াদা পূর্ণ করার জন্য শিশুর প্রকৃতি এরূপ করে দিলেন, কোনো রমণীর স্তনে মুখই লাগায় না। ধাত্রীরা চেষ্টা করে ব্যর্থ হল। মূসা আ. কোনো স্তন হতেই দুগ্ধ পান করলেন না। মূসা আ.-এর ভগ্নি মারইয়াম সমস্ত অবস্থা দেখছিলেন। তিনি বললেন, অনুমতি পেলে আমি এমন একজন ধাত্রীর সন্ধান বলে দিতে পারি, যিনি নিতান্ত সৎ স্বভাবের নারী এবং এ কাজের জন্য খুবই উপযোগী। আদেশ পেলে আমি বরং এখনই তাকে সঙ্গে নিয়ে আসতে পারি। ফেরাউনের বিবি ধাত্রীকে আনার জন্য আদেশ করলেন। মূসা আ.-এর বোন মাকে নিয়ে আসার জন্য আনন্দিত মনে বাড়ির দিকে চলে গেলেন।

এদিকে এরূপ কথাবার্তা চলছিল আর ওদিকে মূসা আ.-এর মাতার অবস্থা ছিল বড়ই শোচনীয়। একটি 'এলহামি' কল্পনায় শিশুকে নদীতে তো সোপর্দ করে আসলেন, কিন্তু এখন মাতৃস্নেহ ও মমতা বড়ই প্রবল হয়ে উঠল। তিনি অস্থির হয়ে নিজের এই গুপ্ত রহস্যকে প্রকাশ করে দিতে উদ্যত হলেন। এ অস্থিরতা ও অশান্ত অবস্থার মধ্যেই আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি আপন দয়া ও অনুগ্রহ বর্ষণ করলেন। এবং তাঁর অন্তরের

মধ্যে শান্তি নাযিল করলেন। এখন তিনি গায়েবি দয়া ও অনুগ্রহের অপেক্ষায় পথ চেয়ে বসে রইলেন। এমনি সময়ে কন্যা এসে সম্পূর্ণ ঘটনা শুনিয়ে বললেন, এখন আপনি গিয়ে নিজের শিশুকে বুকে তুলে নিয়ে প্রাণ ঠাণ্ডা এবং চক্ষু শীতল করুন। আর আল্লাহ্ পাকের শোকর করুন। কেননা তিনি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন। এ সম্পর্কে কোরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে :

وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (٧) فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ (٨) وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (٩) وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (١٠) وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (١١) وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ (١٢) فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (١٣)

"আর আমি মূসার মাতাকে (ইলহামযোগে) আদেশ করলাম, এ শিশুকে দুগ্ধ পান করাতে থাক! এরপর যখন তুমি তার সম্বন্ধে আশঙ্কা করবে, তখন তাকে নদীতে ফেলে দাও। কোনো ভয় করো না, চিন্তাও করো না। আমি তাকে তোমার নিকট পৌঁছিয়ে দেব এবং তাকে রাসূলদের মধ্যে শামিল করব। এরপর ফেরাউনের ঘরের লোকেরা তাকে (নদী হতে) উঠিয়ে নিল, (ভবিষ্যতে) যেন তাদের শত্রু ও চিন্তার কারণ হয়। নিঃসন্দেহ ফেরাউন, হামান এবং তাদের সৈন্য-সামন্তরা ভুল পথে ছিল। আর ফেরাউনের স্ত্রী বলল, এ শিশুটি তো চক্ষু শীতলকারী আমার জন্য এবং তোমার জন্য। একে হত্যা করো না। বিচিত্র নয়, সে আমাদের কাজে আসবে, কিংবা আমরা তাকে পুত্র করে নিব। অথচ (এ শিশুর ও তাদের নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে) তাদের খবরই ছিল না। আর প্রাতঃকালে মূসার মাতার অন্তরে শান্তি রইল না। নিতান্ত অস্থিরতাবশত গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করে দেওয়ার উপক্রম হয়েছিল, যদি না বিশ্বাসকারীদের অন্তর্ভুক্ত থাকার জন্য আমি তার অন্তরকে মযবুত ও দৃঢ় করে দিতাম। আর (মূসার মাতা) বলে দিয়েছিলেন তার (মূসার) বোনকে (সিন্দুকটির) পিছনে পিছনে যাও! এরপর সে অপরিচিতের মতো তার (মূসার) প্রতি লক্ষ রাখতে লাগল এবং তারা (ফেরাউনের পরিবারের লোকেরা) জানতেও পারল না। আর আমি মূসা হতে ধাত্রীদেরকে পূর্ব থেকেই নিবৃত্ত রেখেছিলাম। এরপর (মূসার বোন) বলল : আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি পরিবারের সংবাদ বলে দিব, যারা এ শিশুকে তোমাদের হয়ে প্রতিপালন করবে? তারা এ শিশুর

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। এরপর আমি তাকে তার মায়ের নিকট পৌঁছিয়ে দিলাম। যেন তার চক্ষু শীতল থাকে এবং সে চিন্তান্বিত না থাকে আর জেনে নেয় যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।" (সূরা কাছাছ : ১ম রুকু)

এ সম্পর্কে সূরা ত্বহায় আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى (٣٧) إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى (٣٨) أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي (٣٩) إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ

"আর (হে মূসা তুমি জান,) আমি পূর্বেও একবার তোমার প্রতি কেমন অনুগ্রহ করেছিলাম? আমি তোমাকে বলছি : তখন কি ঘটেছিল, যখন আমি তোমার মায়ের অন্তরে প্রক্ষিপ্ত করেছিলাম, শিশুটিকে একটি সিন্দুকে স্থাপন কর এবং সিন্দুকটিকে নদীতে ছেড়ে দাও। নদী তাকে তীরের দিকে ঠেলে দিবে। এরপর তাকে উঠিয়ে নিবে এমন ব্যক্তি, যে আমার (অর্থাৎ আমার মুসলিম সম্প্রদায়ের) শত্রু এবং এ শিশুরও শত্রু। আর (হে মূসা!) আমি নিজের বিশেষ অনুগ্রহে ও দয়ায় তোমার উপর আমার তরফ হতে মহব্বতের ছায়াপাত করেছিলাম। (যেন অপরিচিত পরমানুষও তোমাকে মহব্বত করতে থাকে) এবং এটা ছিল এ জন্য, আমার ইচ্ছা ছিল, তুমি যেন আমারই তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হও। তোমার ভগ্নি যখন সেখানে গমন করল, তখন (এটা আমারই কর্ম ছিল) সে (ফেরাউনের কন্যাকে) বলল, আমি কি তোমাদেরকে এমন একজন মহিলার কথা বলে দিব, যিনি এ শিশুকে পালন-পোষণ করবেন? এরূপে আমি তোমাকে পুনরায় তোমার মায়ের কোলে পৌঁছিয়ে দিলাম। যেন তার চক্ষু শীতল থাকে এবং (শিশুর বিচ্ছেদে) চিন্তান্বিত না থাকে।" (সূরা তহা : ২য় রুকূ)

মূসা আ.-এর মিসর হতে বহির্গমন

হযরত মূসা আ. দীর্ঘ একটা সময় পর্যন্ত রাজমহলে রাজকীয় আদর-যত্নে দিনাতিপাত করতে করতে যৌবনে পদার্পণ করলেন। তিনি একজন সবল দেহী সাহসী যুবকে পরিণত হলেন। মুখমণ্ডল থেকে গাম্ভীর্য প্রস্ফুটিত হতে লাগল। কথাবার্তায় এক বিশেষ ধরনের মহত্তের প্রকাশ পাচ্ছে। তা ছাড়া তিনি জানতে পেরেছিলেন, তিনি বনি ইসরাঈল বংশীয়। মিসরীয় খান্দানের সাথে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই। তিনি আরো দেখলেন, বনি ইসরাঈলদের প্রতি অত্যন্ত জুলুম করা হচ্ছে এবং তারা মিসরে অনেক অপমান ও গোলামীর জীবন অতিবাহিত করছে। এটা দেখে রাগে তাঁর রক্ত টগবগ করত। সুযোগ পেলে তিনি বনি ইসরাঈলদের সাহায্য ও সংরক্ষণে এগিয়ে যেতেন।

ইমাম তাবারী রহ. তাঁর ইতিহাসে লিখেছেন : মূসা আ. যখন যৌবনে পদার্পণ করেন এবং শক্তিশালী যুবক সাব্যস্ত হন, তখন বনি ইসরাঈলদের ব্যাপারে তাঁর সাহায্য ও

সংরক্ষণের সুফলে বনি ইসরাঈলদের উপর মিসরী কর্মচারীদের অত্যাচার হ্রাস পেতে লাগল। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই, বনি ইসরাঈলদের অপমান ও দাসত্বের জন্য মূসা আ.-এর রাগান্বিত ও চিন্তান্বিত হওয়া এবং তাদের সাহায্য-সংরক্ষণের জন্য তাঁর অন্তরে গভীর ও অতিশয় আবেগ থাকা একটি স্বভাবজাত খোদাপ্রদত্ত বিষয় ছিল।

এখন আল্লাহ্ পাকের দানের হাত আরও অগ্রসর হল। তিনি মূসা আ.-কে দৈহিক শক্তির সাথে সাথে হেকমত এবং জ্ঞানের অলঙ্কারেও ভূষিত করলেন। এখন পরিপক্ক বয়সে পৌঁছে তাঁর মীমাংসা শক্তি, সূক্ষ্ম জ্ঞান ও চিন্তাশক্তি উচ্চস্তরে উপনীত হল। তিনি দৈহিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে পূর্ণতা লাভ করলেন। যেমন আল্লাহ্ তাআলা বলেন :

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

"আর যখন (মূসা) নিজের দৈহিক শক্তি ও জ্ঞান-শক্তিতে এক সীমা পর্যন্ত পৌঁছল, তখন আমি তাকে মীমাংসা (শক্তি) এবং জ্ঞান দান করলাম। এরূপেই আমি সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।" (সূরা কাছাছ)

মোটকথা, মূসা আ. শহরে ভ্রমণকালে এ সমস্ত অবস্থা দেখতেন এবং কোনো কোনো সময় বনী ইসরাঈলের সাহায্য করতেন।

একদিন তিনি শহরের লোকালয় ছেড়ে শহরের এক প্রান্তের দিকে গমনকালে দেখলেন, একজন মিসরী একজন ইসরাঈলীকে বেগার খাটানোর জন্য টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। ইসরাঈলী ব্যক্তি মূসা আ.-কে দেখে সাহায্য চাইল। মিসরী ব্যক্তির এ জুলুম দেখে হযরত মূসা আ. ক্রোধান্বিত হয়ে তাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু মিসরী ব্যক্তি তাঁর কথায় কর্ণপাত করল না। মূসা আ. ক্রোধে সজোরে এক চপেটাঘাত করলেন তাকে। মিসরী সেই আঘাত সহ্য করতে না পেরে তৎক্ষণাৎ মরে গেল। অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে মনে মনে বললেন, এটা নিশ্চয়ই শয়তানের কাজ। সে-ই মানুষকে ভুল পথে চালিত করে। তিনি আল্লাহ্ পাকের দরবারে প্রার্থনা করতে লাগলেন– যা কিছু হয়েছে অনিচ্ছাক্রমে অজ্ঞতার কারণে হয়েছে, আমি আপনার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন এবং ক্ষমার সুসংবাদও প্রদান করলেন। এদিকে শহরে মিসরীয় ব্যক্তির হত্যার খবর ছড়িয়ে পড়ল, কিন্তু হত্যাকারীর কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না, অবশেষে মিসরীরা ফেরাউনের নিকট ফরিয়াদ জানাল, এ কাজ নিশ্চয়ই কোনো ইসরাঈলী ব্যক্তি করেছে। অতএব আপনি এর বিচার করুন। ফেরাউন বলল, এভাবে সমগ্র কওম হতে তো প্রতিশোধ নেওয়া সম্ভব নয়। তোমরা হত্যাকারীর সন্ধান কর। আমি অবশ্যই তাকে কর্মের প্রতিফল ভোগ করাব।

ঘটনাক্রমে পরের দিনও হযরত মূসা আ. শহরের শেষ প্রান্তে ভ্রমণ করছিলেন। দেখতে পেলেন, সেই ইসরাঈলী জনৈক কিবতীর (মিসরীর) সাথে ঝগড়া করছে এবং মিসরী ব্যক্তিকেই প্রবল মনে হচ্ছে। মূসা আ.-কে দেখে ইসরাঈলী ব্যক্তি গত দিনের মতো আজও তাঁর নিকট ফরিয়াদ করল এবং বিচারের প্রার্থনা করল।

এ ঘটনা দেখে হযরত মূসা আ. দ্বিগুণ অসন্তুষ্ট হলেন। একদিকে মিসরী ব্যক্তির জুলুম এবং অপরদিকে ইসলাঈলী ব্যক্তির চিৎকার এবং আগের ঘটনার স্মরণ, এ বিরক্তির মধ্যে একদিকে তিনি মিসরী ব্যক্তিকে নিবৃত্ত করার জন্য হাত বাড়ালেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইসরাঈলী ব্যক্তিকেও ধমক দিয়ে বললেন : إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ 'তুইও একজন প্রকাশ্য গোমরাহ লোক'। অর্থাৎ অযথা ঝগড়া বাঁধিয়ে সাহায্যের জন্য ফরিয়াদ করতে থাকিস।

ইসরাঈলী ব্যক্তি হযরত মূসা আ.-কে তার দিকে হাত বাড়াতে দেখে এবং নিজের সম্বন্ধে অসন্তোষমূলক কটুক্তি শ্রবণ করে মনে করল, উনি এখন তাকে মারার জন্যই হাত বাড়াচ্ছেন এবং ধরতে চাচ্ছেন। তখন সে উদ্বেগের সঙ্গে বলল :

أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ

"তুমি কি আমাকেও সেভাবে হত্যা করতে চাও, যেভাবে তুমি গত কাল এক (কিবতি) ব্যক্তিকে হত্যা করেছ?"

কিবতি লোকটি এ কথা শুনে তখনই ফেরাউন সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে সমুদয় ঘটনা বিবৃত করে শুনাল। তারা গিয়ে ফেরাউনকে জানাল, গতকালের মিসরী ব্যক্তির হত্যাকারী মূসা। ফেরাউন এটা শুনতেই জল্লাদকে আদেশ করল, এখনই গিয়ে মূসাকে গ্রেফতার করে আমার সম্মুখে উপস্থিত কর। মিসরীদের এ মজলিসে এমন একজন সম্মানিত ও পদস্থ ব্যক্তিও উপস্থিত ছিলেন, যিনি মনে-প্রাণে হযরত মূসা আ.-কে মহব্বত করতেন এবং ইসরাঈলী ধর্মকে সত্য মনে করতেন। তিনি ছিলেন ফেরাউনের খান্দানেরই একজন এবং দরবারের সভাসদ। তিনি ফেরাউনের এ আদেশ শ্রবণ করে জল্লাদের পূর্বেই দরবার থেকে বের হলেন। হযরত মূসা আ.-এর খেদমতে হাজির হয়ে তাকে পুরো বিষয়টি জানিয়ে পরামর্শ দিলেন, এখন আপনার জন্য মঙ্গলজনক হচ্ছে– নিজেকে মিসরীদের হাত থেকে রক্ষা করুন! এমন কোনো স্থানের দিকে হিজরত করুন, যেখানে ফেরাউনের ক্ষমতা চলবে না। হযরত মূসা আ. তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করলেন। এবং নীরবে মাদায়েন দেশের দিকে হিজরত করে চলে গেলেন।

এখানে লক্ষণীয়, কুরআন মাজিদ ওই লোকটি সম্বন্ধে শুধু বলেছে, وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ "আর শহরের শেষ প্রান্ত হতে একজন লোক দৌড়ে এল।"

আমরা অবশ্য তার সাথে 'সম্মানিত' ও 'পদস্থ' দুটি বিশেষ গুণ যোগ করে দিলাম। এর কারণ হল, আবদুল ওয়াহ্হাব নাজ্জার রহ. বলেন– কুরআন মাজিদ ফেরাউন বংশীয় আগন্তুক লোকটির সম্বন্ধে দুটি বিশেষণ উল্লেখ করেছে।

(১) লোকটি শহরের শেষপ্রান্ত থেকে এসেছিল। আরব দেশে এ প্রবাদ বাক্য প্রসিদ্ধ রয়েছে– الاطراف سكنى الاشراف "শহরের প্রান্ত ভাগ সম্মানিত লোকদের বাসস্থান।"

(২) লোকটি এসে হযরত মূসা আ.-কে বলল : إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ "রাজ-দরবারের লোকেরা আপনাকে হত্যা করার পরামর্শ করছে।" বলাবাহুল্য, এরূপ কথা

এমন ব্যক্তিই জানতে পারে, যে ব্যক্তি ফেরাউন ও তার সভাসদগণের মধ্যে বিশেষ পদ-মর্যাদার অধিকারী।

এ সম্পর্কে কুরআন মাজিদে ইরশাদ হচ্ছে :

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ (١٥) قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (١٦) قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ (١٧) فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ (١٨) فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ (١٩) وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ (٠) فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٢١)

"আর তিনি প্রবেশ করলেন, যখন তথাকার লোকেরা বেখবর ছিল। এরপর তথায় দুই ব্যক্তিকে দেখলেন পরস্পর ঝগড়া করছে। অনন্তর তাঁর বন্ধু গোত্রের লোকটি তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করল ওই লোকটির বিরুদ্ধে, যে ছিল তাঁর শত্রু দলের লোক। এরপর মূসা আ. সেই (শত্রু দলের) লোকটিকে এক মুষ্টাঘাত করলেন এবং তার কর্ম শেষ করে দিলেন। (অনন্তর অনুতপ্ত হয়ে মূসা) বললেন, এটা শয়তানের দ্বারা ঘটেছে। নিঃসন্দেহ সে প্রকাশ্য শত্রু, বিভ্রান্তকারী। মূসা আ. বললেন, হে আমার প্রতিপালক!। আমি নিজের ওপর জুলুম করেছি। অতএব আমাকে ক্ষমা করে দিন! অনন্তর আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন। নিঃসন্দেহে তিনি ক্ষমাশীল দয়ালু। (মূসা আ.) বললেন, হে আমার পালনকর্তা! যেমন আপনি আমার প্রতি দয়া করেছেন, তেমনি আমি আর কখনো পাপিষ্ঠদের সাহায্যকারী হব না। এরপর সেই শহরে সকালবেলা ভীত ও অপেক্ষমাণ অবস্থায় জাগলেন। এরপর হঠাৎ দেখতে পেলেন, যে ব্যক্তি গতকাল সাহায্য প্রার্থনা করেছিল, সে আজ আবার ফরিয়াদ করছে। মূসা আ. তাকে বললেন, নিঃসন্দেহ তুমি প্রকাশ্য বিপথগামী। এরপর যখন তিনি ধরতে চাইলেন সেই ব্যক্তিকে, যে ছিল উভয়ের শত্রু; তখন ফরিয়াদকারী বলে উঠল, হে মূসা! তুমি কি আমাকে খুন করে ফেলতে চাও, যেমনি গতকাল এক ব্যক্তিকে খুন করেছিলে। তোমার ইচ্ছে কি এটাই, দেশের মধ্যে বলপ্রয়োগ করে বেড়াবে এবং শান্তি স্থাপনকারী হতে চাও না!

আর শহরের শেষ প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এল। বলল, হে মূসা! সভাসদরা তোমার সম্বন্ধে পরামর্শ করছে, তোমাকে হত্যা করে ফেলবে। অতএব তুমি (মিসর থেকে) বের হয়ে যাও; আমি তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। এরপর মূসা আ. পথের দিকে তাকাতে তাকাতে ভীত অবস্থায় শহর থেকে বের হয়ে গেলেন। বললেন, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে এ জালেম কওম হতে নাজাত দিন।" (সূরা কাছাছ)

সূরা ত্বহাতেও এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে :

وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا

"আর (হে মূসা!) তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেললে। এরপর আমি তোমাকে চিন্তা থেকে পরিত্রাণ দিলাম। আর আমি পরীক্ষা করলাম তোমাকে, মামুলী পরীক্ষা।"

ফেরাউন স্বদেশে (মিসরে) পরাক্রমশালী, স্বৈরাচারী, নাফরমান ও বিদ্রোহী হয়েছিল। পার্থিব জগতকে দিয়েছিল অগ্রাধিকার। মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল মহা পরাক্রমশালী প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার ইবাদত ও আনুগত্য থেকে। বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিল সেখানকার অধিবাসীদেরকে। আবার তাদের মধ্য থেকে একশ্রেণী (বনি ইসরাঈল)কে নির্যাতন করছিল। তারা ছিলেন বনি ইসরাঈলের একটি দল এবং এঁরা ছিলেন আল্লাহর নবী ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম খলীলুল্লাহ আ.-এর বংশধর। সেকালে তাঁরাই ছিলেন পৃথিবীর সর্বোত্তম অধিবাসী। আল্লাহ তাআলা তাদের উপর এমন এক বাদশাকে আধিপত্য দান করেছিলেন, যে ছিল জালিম, অত্যাচারী, কাফির ও দুশ্চরিত্র। সে তাদেরকে তার দাসত্ব ও সেবায় নিয়োজিত রাখত। বাধ্য করত তাদেরকে নিকৃষ্টতম কাজকর্ম ও পেশায় নিয়োজিত থাকতে। উপরন্তু সে তাদের পুত্রদেরকে হত্যা করত, জীবিত রাখত নারীদের। সে ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। তার এ অমানবিক কর্মকাণ্ডের পিছনে পটভূমি ছিল নিম্নরূপ :

বনি ইসরাঈলগণ ইবরাহীম আ. থেকে প্রাপ্ত ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতেন- তাদের বংশধর থেকে এমন এক যুবকের আবির্ভাব ঘটবে, যার হাতে মিসরের জালেম বাদশা ধ্বংস হবে। কারণ, মিসরের তৎকালীন বাদশা হযরত ইবরাহীম আ.-এর স্ত্রী হযরত সারাহ-এর সম্ভ্রম নষ্ট করতে মনস্থ করেছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁর সম্ভ্রম রক্ষা করেছেন।

এ সুসংবাদটি বনি ইসরাঈলের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কিবতীরা এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করত। ধীরে ধীরে তা ফিরাউনের কানে যায়। সুতরাং তার কোনো পরামর্শদাতা কিংবা পরিষদ রাত্রিকালীন গল্পচ্ছলে এ প্রসঙ্গটি তোলে। তখন বাদশা বনি ইসরাঈলের পুত্রগণকে হত্যার নির্দেশ দেয় ।কিন্তু ভাগ্যের লিখন কে খণ্ডাতে পারে?

সুদ্দী রহ. হযরত ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ রাযি. ও প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণনা করেন- একদিন ফেরাউন স্বপ্নে দেখল, একটি অগ্নিশিখা বায়তুল মুকাদ্দাস

থেকে এসে মিসরের বাড়ি-ঘর ও কিবতীদের সকলকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিল। কিন্তু মিসরে বসবাসরত বনি ইসরাঈলের কোনো ক্ষতি করল না। ফিরাউন জেগে উঠে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। জ্যোতিষী ও জাদুকরদেরকে সমবেত করল এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইল। তারা বলল, এক যুবক বনি ইসরাঈল বংশে জন্মগ্রহণ করবে এবং তারই হাতে মিসরবাসী ধ্বংস হবে। এ কারণেই ফিরাউন বনি ইসরাঈলের পুত্রদের হত্যা করতে এবং নারীদের জীবিত রাখতে নির্দেশ দেয়।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, "আমি ইচ্ছা করলাম, সে দেশে যাদেরকে হীনবল করা হয়েছিল, তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে; তাদেরকে নেতৃত্ব দান ও দেশের অধিকারী করতে এবং তাদেরকে রাষ্ট্রক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করতে। আর ফিরাউন, হামান ও তাদের বাহিনীকে তা দেখিয়ে দিতে, যা এদের থেকে তারা আশঙ্কা করত।"

আল্লাহ তাআলার প্রতিশ্রুতি হচ্ছে, তিনি শিগগিরই হীনবলকে শক্তিশালী করবেন, পরাভূতকে করবেন বিজয়ী এবং অবনমিতকে করবেন শক্তিমান। ইতিহাস সাক্ষ্য, সবকিছুই বনি ইসরাঈলের ক্ষেত্রে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا

"যে সম্প্রদায়কে দুর্বল গণ্য করা হত, তাদেরকে আমি আমার কল্যাণপ্রাপ্ত রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী করেছি আর বনি ইসরাঈল সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালকের শুভবাণী সত্যে পরিণত হয়। কেননা তারা ধৈর্যধারণ করেছিল"। (সূরা আরাফ : ১৩৭)

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র ইরশাদ করেন :

كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (٢٥) وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (٢٦) وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ (٢٧) كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ

"তারা পশ্চাতে রেখে গিয়েছিল কত উদ্যান ও প্রস্রবণ, কত শষ্যক্ষেত্র, সুরম্য প্রাসাদ, কত বিলাস উপকরণ, যা তাদের আনন্দ দিত। এরূপই ঘটেছিল এবং আমি এ সমুদয়ের উত্তরাধিকারী করেছিলাম ভিন্ন এক সম্প্রদায়কে (অর্থাৎ, বনি ইসরাঈলকে)। (সূরা দুখান : ২৫)

ফেরাউন সম্ভাব্য সবরকম সতর্কতা অবলম্বন করল। যাতে মূসা আ. দুনিয়াতে আসতে না পারেন। সে কিছুসংখ্যক এমন পুরুষ ও স্ত্রীকে নিযুক্ত করল, যাতে তারা রাজ্যে ঘুরে ঘুরে গর্ভবতী নারীদের সন্ধান করত, এবং তাদের সন্তান প্রসবের নির্ধারিত সময় সম্বন্ধে অবগত হতো। আর যখনই কোনো গর্ভবতী নারী পুত্র সন্তান প্রসব করত, তখনই এসব হত্যাকারী তাদেরকে হত্যা করে ফেলত।

আহলে কিতাবরা বলে : ফেরাউন পুত্রসন্তানদের এ উদ্দেশ্যে হত্যা করার হুকুম দিত যাতে বনি ইসরাঈলের প্রভাব-প্রতিপত্তি হ্রাস পায়। সুতরাং কিবতিরা যখন তাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে প্রয়াস পাবে কিংবা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে তখন তারা তা প্রতিরোধ করতে সমর্থ হবে না। এ ভাষ্যটি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা তাদের পুত্রসন্তানদের হত্যা করার হুকুম দেওয়া হয়েছিল, মূসা আ.-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পর, জন্মলগ্নে নয়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ

"তারপর মূসা আমার নিকট হতে সত্য নিয়ে তাদের নিকট উপস্থিত হলে তারা বলল : মূসার প্রতি যারা ঈমান এনেছে, তাদের পুত্রসন্তানদেরকে হত্যা কর জীবিত রাখো তাদের নারীদের।" (সূরা মুমিন : ২৫)

আর তাই বনি ইসরাঈল মূসা আ.-কে বলেছিল :

قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا

"আমাদের নিকট তোমার আসার পূর্বে আমরা নির্যাতিত হয়েছি এবং তোমার আসার পরেও।" (সূরা আরাফ : ১২৯)

সুতরাং বিশুদ্ধ মতে মূসা আ.-এর দুনিয়ায় আগমন ঠেকানোর জন্যেই ফিরাউন বনি ইসরাঈলের পুত্রসন্তানদের প্রথমে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিল। তাকদীর যেন বলছিল, হে বিপুল সেনাবাহিনীর অধিকারী! পরম ক্ষমতা ও রাজত্বের অধিপতি বিধায় অহঙ্কারী পরাক্রমশালী সম্রাট! ওই অপ্রতিদ্বন্দ্বী, অপ্রতিরোধ্য এবং অসীম মহাশক্তির অধিকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন– যে সন্তানটি থেকে পরিত্রাণের আশায় অগণিত, অসংখ্য নিষ্পাপ সন্তান তুমি হত্যা করছ, সে সন্তান তোমার ঘরেই প্রতিপালিত হবে। তোমার ঘরেই সে লালিত-পালিত হবে। তোমার ঘরেই তোমার খাদ্য খেয়ে ও পানীয় পান করে বড় হয়ে উঠবে। তুমিই তাকে পালক-পুত্র হিসেবে গ্রহণ করবে ও তাকে লালন করবে। অথচ তুমি এ রহস্য উদঘাটন করতে সক্ষম হবে না। অবশেষে তার হাতেই তোমার দুনিয়া ও আখিরাত সর্বস্ব বিনাশ হয়ে যাবে। কারণ, সে যা কিছু প্রকাশ্য সত্য নিয়ে আসবে তুমি তার বিরোধিতা করবে এবং তার কাছে যে ওহি নাযিল হবে, তুমি তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে। যাতে তুমি এবং গোটা জগদ্বাসী জানতে পারে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের প্রতিপালক যা ইচ্ছা করেন, তা আঞ্জাম দিয়ে থাকেন। তিনিই মহাপরাক্রমশালী একক ক্ষমতার অধিকারী এবং তাঁর শক্তি ও ইচ্ছাকে কেউ প্রতিহত করতে পারে না।

তাফসিরকারকগণ বর্ণনা করেন– কিবতিরা ফেরাউনের কাছে অভিযোগ করল, বনি ইসরাঈলের পুত্রসন্তান হত্যা করার কারণে তাদের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। তারা আশঙ্কা বোধ করছে, ছোটদেরকে হত্যা করার কারণে বড়দের সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাবে। ফলে কিবতিদের ওইসব নিকৃষ্ট কাজ করতে হবে, যেগুলো করতে বনি ইসরাঈল বাধ্য ছিল।

এরূপ অভিযোগ ফেরাউনের কাছে পৌঁছার পর ফেরাউন এক বছর পর পর পুত্র-সন্তানদের হত্যা করতে নির্দেশ দিল। যে বছর পুত্রসন্তানদের হত্যা না করার কথা সেই বছর হারূন আ. জন্মগ্রহণ করেন। অন্যদিকে যে বছরে পুত্রসন্তানদের হত্যা করার কথা, সে বছরে মূসা আ. জন্মগ্রহণ করেন।

সুতরাং মূসা আ.-এর আম্মা মূসা আ.-কে নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তাই তিনি গর্ভবতী হওয়ার প্রথম দিন থেকে সাবধানতা অবলম্বন করতে লাগলেন এবং গর্ভের কথা প্রকাশ হতে দিলেন না। যখন তিনি সন্তান প্রসব করলেন, একটি সিন্দুক তৈরি করার জন্যে তাঁকে সংগোপনে নির্দেশ প্রদান করা হল। তিনি সিন্দুকটিকে একটি রশি দিয়ে বেঁধে রাখলেন। তাঁর বাড়ি ছিল নীলনদের তীরে। তিনি তাঁর সন্তানকে দুধ পান করাতেন এবং যখনই কারো আগমনের আশঙ্কা করতেন, তাকে সিন্দুকে রেখে সিন্দুক সমেত তাকে নদীতে ভাসিয়ে দিতেন। আর রশির এক প্রান্ত তিনি নিজে ধরে রাখতেন। যখন শত্রুরা চলে যেত, তখন তিনি তাকে টেনে নিজের কাছে নিয়ে আসতেন।

মূসা আ.-এর মাকে ওহি প্রেরণ

মূসা আ.-এর মায়ের কাছে যে ওহি পাঠানো হয়েছিল, তা ছিল এলহাম ও হৃদয়ে প্রক্ষিপ্ত নির্দেশনা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ()
ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا

"তোমার প্রতিপালক মৌমাছিকে তার অন্তরে ইঙ্গিতে নির্দেশ দিয়েছেন, ঘর তৈরি কর পাহাড়ে, গাছপালায় ও মানুষ যে ঘর তৈরি করে তাতে। এরপর প্রত্যেক ফল থেকে কিছু কিছু আহার কর এবং তোমার প্রতিপালকের সহজ পথ অনুসরণ কর।"

(সূরা নাহল : ৬৮)

এ ওহি নবুয়তের ওহি নয়। ইবনে হাযম রহ. এবং ইলমে আকাইদ বিশারদগণের অনেকেই একে তেমনি ওহি মনে করেন। কিন্তু প্রথম অভিমতটি বিশুদ্ধ। আর এটিই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মত বলে আবুল হাসান আশয়ারি রহ. বর্ণনা করেছেন।

সুহায়লি বলেছেন, মূসা আ.-এর মায়ের নাম ছিল আয়ারেখা। কেউ কেউ বলেন, তাঁর নাম ছিল আয়াযাখত। ওহির নির্দেশনা তাঁর অন্তরে ঢেলে দেওয়া হয়েছিল। তাঁর কলবে ইলহাম করা হয়েছিল– তুমি ভয় করো না এবং দুঃখিত হয়ো না। কেননা যদিও সন্তানটি এখন তোমার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। তথাপি আল্লাহ শীঘ্রই তাকে ফেরত দেবেন। আর আল্লাহ তাঁকে অচিরেই রাসূল হিসেবে মনোনীত করবেন। তিনি আল্লাহ তাআলার কিতাবকে দুনিয়া ও আখেরাতে সমুন্নত করবেন। এরপর মূসা আ.-এর মা তাই করলেন, যেভাবে তিনি আদিষ্ট হয়েছিলেন। একদিন তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন।

কিন্তু অভ্যাস মতো রশির প্রান্ত নিজের কাছে আটকে রাখতে ভুলে গেলেন। আর মূসা আ. ভেসে গেলেন নীলনদের স্রোতে। তারপর গিয়ে পৌঁছলেন ফেরাউনের বাড়ির ঘাটে। ফেরাউনের লোকজন তাকে উঠিয়ে নিল। এর পরিণাম তো ছিল, একদিন তিনি তাদের শত্রু ও দুঃখের কারণ হবেন। বস্তুত ফেরাউন, তার দুষ্ট উজির হামান এবং তাদের অনুচররা ভ্রান্তির মধ্যে ছিল। তাই তারা এ শাস্তি ও হতাশার যোগ্য হয়ে পড়ে।

মুফাসসিরগণ আরো উল্লেখ করেন, দাসিরা তাকে একটি বন্ধ সিন্দুকে দরিয়া থেকে উদ্ধার করে। কিন্তু তারা তা খুলতে সাহস পায় নি। তারা ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া বিনতে মুযাহিস ইবনে আসাদ ইবনে রাইয়ান ইবনুল ওলীদের সামনে বন্ধ সিন্দুকটি নিয়ে রাখল।

এ ওলীদই ছিল ইউসুফ আ.-এর যুগে মিসরের ফেরাউন। তৎকালীন মিসরের অধিপতীদের উপাধি ছিল ফিরাউন। আবার কেউ কেউ বলেন, আসিয়া ছিলেন বনি ইসরাঈল বংশীয় এবং মূসা আ.-এর গোত্রের মহিলা। আবার কেউ কেউ বলেন, তিনি ছিলেন মূসা আ.-এর ফুফু। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক সুহায়লিও এরূপ বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তাআলাই অধিক জ্ঞাত।

আসিয়া যখন সিন্দুকটির মুখ খুললেন, তখন দেখলেন মূসা আ.-এর চেহারা নবুয়তের উজ্জ্বল নূরে ঝলমল করছে। মূসা আ.-কে দেখামাত্র আসিয়ার হৃদয়মন তার প্রতি স্নেহ-মমতায় ভরে উঠল। ফেরাউন এসে শিশুটিকে জবাই করার নির্দেশ দিল। কিন্তু আসিয়া ফেরাউনের কাছ থেকে তাঁকে চেয়ে নিলেন। বললেন : এই শিশুটি তোমার ও আমার চোখ জুড়াবে। ফেরাউন বলল, এটা তোমার জন্যে হতে পারে, কিন্তু আমার জন্যে নয়। একে দিয়ে আমার কোনোই প্রয়োজন নেই। কথা বাড়ালে বিপত্তিই বাড়ে। আসিয়া বলেছিলেন :

"সে আমাদের উপকারে আসতে পারে।" আল্লাহ তাআলা তাঁর সে আশা পূর্ণ করেছিলেন। দুনিয়ায় আল্লাহ তাআলা তাঁকে মূসা আ.-এর দ্বারা হেদায়েত দান করেছেন এবং আখেরাতে তাঁকে মূসা আ.-এর প্রতি ঈমান আনার কারণে তিনি জান্নাতে যাবেন। আবার তিনি বলেছিলেন : "আমরা তাকে সন্তান হিসেবেও গ্রহণ করতে পারি।" তারা তাঁকে সন্তান হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। কেননা তাদের কোনো সন্তান ছিল না। আল্লাহ তাআলা বলেন, وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ অর্থাৎ তারা জানে না। মূসা আ. কে সিন্দুক থেকে উঠিয়ে নেওয়ার জন্যে ফেরাউন পরিবারকে নিযুক্ত করে আল্লাহ তাআলা ফেরাউন ও তার সৈন্যদের প্রতি কিরূপ মহাআযাব অবতীর্ণ করতে চেয়েছিলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. মুজাহিদ, ইকরামা, সাঈদ ইবনে জুবাইর প্রমুখ বলেন : "মূসা আ.-এর মায়ের অন্তর দুনিয়ার অন্যান্য চিন্তা ছেড়ে দিয়ে শুধু মূসা আ.-কে নিয়ে চিন্তায় অস্থির ছিল। আল্লাহ তাআলা যদি তাঁকে ধৈর্য দান না করতেন এবং তাঁর হৃদয়ে দৃঢ়তা দান না করতেন, তা হলে ব্যাপারটি তিনি প্রকাশ করে দিতেন। এবং

অন্যের কাছে প্রকাশ্যে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে ফেলতেন। তিনি তাঁর বড় মেয়ে, মূসা আ.-এর বোনকে তার পেছনে পেছনে গিয়ে খবরাখবর নেওয়ার জন্যে পাঠালেন। মুজাহিদ রহ. বলেন, সে দূর থেকে তাকে লক্ষ করছিল। আর কাতাদা রহ. বলেন, তিনি এমনভাবে তাঁর প্রতি লক্ষ্য করছিলেন যেন এ ব্যাপারে তাঁর কোনো আগ্রহ নেই। যখন ফেরাউনের ঘরে মূসা আ.-এর থাকা চূড়ান্ত হল, ফেরাউনের লোকজন প্রথমে তাঁকে দুধ পান করানোর চেষ্টা করল, কিন্তু তিনি কারো বুকের দুধ গ্রহণ করলেন না। অন্য কোনো খাদ্যও গ্রহণ করলেন না। তারা তাঁর ব্যাপারে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে যে প্রকারেই হোক তাঁকে যে কোনো খাদ্য খাওয়াতে চেষ্টা করল; কিন্তু তারা তাতে ব্যর্থ হল। আল্লাহ তাআলা বলেন :

"পূর্ব থেকেই আমি অন্যের বুকের দুধ গ্রহণ থেকে তাকে বিরত রেখেছিলাম।" তারা তাঁকে ধাত্রী ও অন্যান্য নারীসমেত বাজারে পাঠাল। যাতে তারা এমন লোক খুঁজে বের করতে পারে, যে তাকে দুধ পান করাতে সক্ষম। তারা তাঁকে নিয়ে ছিল ব্যস্ত এবং বাজারের লোকজনও তাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এমন সময় মূসা আ.-এর বোন মূসা আ.-এর দিকে তাকালেন কিন্তু তিনি তাঁকে চিনেন বলে পরিচয় প্রকাশ করলেন না, বরং বললেন :

هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ

"তোমাদের কি আমি এমন এক পরিবারের সন্ধান দিব, যারা তোমাদের হয়ে তাকে লালন-পালন করবে এবং তার মঙ্গলকামী হবে?"

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, "মূসা আ.-এর বোন যখন তাদেরকে এরূপ বললেন, তখন তারা তাকে বলল, তুমি কেমন করে জানো, তারা তার মঙ্গলকামী ও তার প্রতি মেহেরবান হবে? তিনি বললেন : বাদশার বেগমের ছেলের উপকার সাধনে সকলেই আগ্রহী। তখন তারা তাকে ছেড়ে দিল এবং তার সাথে তারা তাদের বাড়িতে গেল। তখন মূসা আ.-এর মা মূসা আ.-কে কোলে তুলে নিলেন ও তাঁকে নিজ বুকের দুধ খেতে দিলেন। মূসা আ. মায়ের স্তন মুখে নিলেন, চুষতে আরম্ভ করলেন এবং দুধ পান করতে লাগলেন। আসিয়া মূসা আ.-এর মাকে তাঁর মহলে ডেকে পাঠালেন এবং সেখানে অবস্থান করে তাঁকে উপকৃত করতে আসিয়া রাযি. আহ্বান জানালেন। কিন্তু মূসা আ.-এর মা তাতে রাযি হলেন না। বললেন, আমার স্বামী ও ছেলে-মেয়ে রয়েছে। তাই আমি তাদেরকে ছেড়ে মহলে থাকতে পারি না। তবে আপনি যদি তাকে আমার নিকট পাঠিয়ে দেন, তা হলে আমি তাকে দুধ পান করাতে পারি। তখন আসিয়া আ. মূসা আ.-কে তাঁর মায়ের সঙ্গে যেতে দিলেন। তিনি তাঁর জন্যে বহু মূল্যবান উপঢৌকন দিলেন ও তাঁর খোরপোশের জন্য ভাতা নির্ধারণ করে দিলেন। মূসার মা মূসা আ.-কে নিয়ে নিজ ঘরে ফিরে গেলেন এবং এভাবে আল্লাহ তাআলা পুনরায় মা-ছেলের মিলন ঘটালেন। মূসা-জননীর কাছে মূসা আ.-কে ফেরত প্রদানের মাধ্যমে একটি প্রতিশ্রুতি এভাবে পূর্ণ হল। আর এটাই নবুয়তের সুসংবাদের সত্যতার প্রমাণ হিসেবে বিবেচ্য।

তারপর তিনি যখন পূর্ণ যৌবন লাভ করেন এবং শারীরিক গঠন ও চরিত্রে উৎকর্ষ মণ্ডিত হলেন– অধিকাংশ উলামার মতে, যখন ৪০ বছর বয়সে উপনীত হলেন– তখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে হেকমত ও নবুয়তের জ্ঞান দান করেন। এ বিষয়ে তাঁর মাতাকে পূর্বেই আল্লাহ তাআলা সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ

তারপর আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা আ.-এর মিসর থেকে মাদায়েন শহর গমন, সেখানে নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত অবস্থান ও এর কারণ, মূসা আ. ও আল্লাহ তাআলার মধ্যকার কথোপকথন এবং আল্লাহ তাআলা তাঁকে যে মর্যাদা দান করেছেন, তার প্রতিও ইঙ্গিত করেছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا

" সে নগরীতে প্রবেশ করল, যখন তার অধিবাসীগণ ছিল অসতর্ক।"

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি., সাঈদ ইবনে জুবাইর রাযি. ইকরামা, কাতাদা ও সুদ্দী রহ. বলেন : তখন ছিল দুপুরবেলা। অন্য এক সূত্রে বর্ণিত আছে, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেছেন : তখন ছিল মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়। সেখানে তিনি দুজনকে সংঘর্ষে লিপ্ত পেলেন– একজন ছিল ইসরাঈলী, অন্যজন কিবতী। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি., কাতাদা; সুদ্দী ও মুহম্মদ ইবনে ইসহাক রহ. এ মত পোষণ করেন।

মূসা আ.-এর কওমের লোকটা শত্রু কওমের লোকটার বিরুদ্ধে মূসা আ.-এর সাহায্য চাইল। বস্তুত ফেরাউনের পালকপুত্র হওয়ার কারণে মিসরে মূসা আ.-এর প্রতিপত্তি ছিল। এতে বনি ইসরাঈলদেরও সম্মান বৃদ্ধি পায়। কেননা তারা মূসা আ.-কে দুধ পান করিয়েছিল এ হিসাবে তারা ছিল মূসা আ.-এর মামা গোত্রীয়। যখন ইসরাঈল বংশীয় লোকটি মূসা আ.-এর সাহায্য প্রার্থনা করল, তখন তিনি তার সাহায্যে এগিয়ে গেলেন।

মুজাহিদ রহ. فَوَكَزَهُ শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন : তিনি তাকে ঘুষি দিলেন। কাতাদা রহ. বলেন : তিনি তাকে লাঠি দিয়ে আঘাত করলেন। ফলে কিবতি লোকটা মারা যায়। আর সে ছিল কাফের ও মুশরিক। মূসা আ. তাকে প্রাণে বধ করতে চান নি। বরং তিনি তাকে সাবধান ও নিরস্ত্র করতে চেয়েছিলেন। তার পরও মূসা আ. বললেন :

هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ

"এটা শয়তানের কাণ্ড। সে তো প্রকাশ্য শত্রু ও বিভ্রান্তকারী।

এর পরের ঘটনা পূর্বে বলে এসেছি। বস্তুত আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিচ্ছেন, মূসা আ. মিসর শহরে ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গের ব্যাপারে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। পাছে

না তারা জেনে ফেলে, নিহত ব্যক্তির যে মামলাটি তাদের কাছে উত্থাপন করা হয়েছে, তাকে বনি ইসরাঈলদের এক ব্যক্তির সাহায্যার্থে মূসা আ.-ই হত্যা করেছেন। তা হলে তাদের ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যাবে, মূসা আ. বনি ইসরাঈলেরই একজন। এতে পরবর্তী সময়ে বিরাট অনর্থ ঘটে যেতে পারে। তাই তিনি ওইদিন ভোরে এদিক-ওদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলাফেরা করছিলেন। এমন সময় হঠাৎ তিনি শুনতে পেলেন, আগের দিন যে ইসরাঈলিটির তিনি সাহায্য করেছিলেন ওই ব্যক্তি আজও অন্য একজনের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে মূসা আ.-কে সাহায্যের জন্য আহ্বান করছে। মূসা আ. তাকে তার ঝগড়াটে স্বভাবের জন্য ভর্ৎসনা করলেন। আর কিবতিকে ধরার জন্য অগ্রসর হলেন। যাতে তিনি কিবতিকে প্রতিহত করতে ও ইসরাঈলিকে তার কবল থেকে রক্ষা করতে পারেন। মূসা আ.-এর অগ্রসর হওয়া দেখে ইসরাঈলি লোকটা বলে উঠল :

يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ

হে মূসা! গত কাল তুমি যেমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছ, সেভাবে আমাকেও কি হত্যা করতে চাচ্ছ! তুমি তো পৃথিবীতে স্বেচ্ছাচারী হতে চাচ্ছ, শান্তি স্থাপনকারী হতে চাও না।

কেউ কেউ বলেন, এ উক্তিটি বনি ইসরাইলের ওই লোকের, যে গত কালের ঘটনাটি জানতো। সে যখন মূসা আ.-কে কিবতির দিকে অগ্রসর হতে দেখল, তখন সে ধারণা করল, তিনি তার দিকেও আসবেন। কেননা তিনি তাকে প্রথমেই এই বলে ভর্ৎসনা করেছেন, إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ তুমি তো একজন বিভ্রান্ত লোক। তাই সে আগের দিনের ঘটনা প্রকাশ করে দিল। এ কথা শুনে কিবতি লোকটা তখনই ফেরাউনের দরবারে চলে গেল। গত কালের হত্যা সম্পর্কে মূসা আ.-এর নামে নালিশ দেওয়ার জন্য।

এ উক্তিটি কিবতিরও হতে পারে। কেননা সে যখন মূসা আ.-কে তার দিকে অগ্রসর হতে দেখল, তখন তাঁকে ভয় করতে লাগল। এবং মূসা আ.-এর মেযাজ থেকে ইসরাঈলি লোকের পক্ষে চরম প্রতিশোধের আশঙ্কা করে নিজ দূরদর্শিতার আলোকে কিবতিই এ উক্তিটা করেছিল। যেন সে বুঝতে পেরেছিল, সম্ভবত এ ব্যক্তিই গত কালের নিহত ব্যক্তির হত্যাকারী। অথবা সে বনি ইসরাইলের লোকটার হযরত মূসা আ.-এর কাছে সাহায্য চাওয়ার থেকেই ব্যাপারটি আঁচ করতে পেরেছিল। তখন সে এ বাক্যটি বলেছিল। আল্লাহই মহা জ্ঞানী।

ফেরাউনের কাছে সংবাদ পৌছে গেল। গত কালের খুনের জন্য মূসা দায়ী। কিন্তু গ্রেফতার করার জন্য ফেরাউনের পাঠানো লোক মূসা আ.-এর কাছে পৌছার আগেই শহরের দূরপ্রান্ত থেকে সংক্ষিপ্ত পথে একজন হিতাকাঙ্ক্ষী এসে বললেন, হে মূসা! ফেরাউনের পরিষদবর্গ আপনাকে হত্যা করার সলাপরামর্শ করছে। আপনি এখনই এই

শহর থেকে বের হয়ে পড়ুন! ফলে মূসা আ. তাৎক্ষণিকভাবে মিসর থেকে বের হয়ে পড়েন। কিন্তু তিনি রাস্তাঘাট চিনতেন না। তাই বলতে থাকেন :

رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

"হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জালিম সম্প্রদায় থেকে রক্ষা করুন।"

মূসা আ.-এর মাদায়েন গমন

হযরত মূসা আ. যখন মিসর থেকে বের হওয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন মাদায়েন দেশকেই মনোনীত করলেন। মাদায়েনের লোকালয়টি ছিল মিসর থেকে ৮ মনযিল দূরে অবস্থিত। খুব সম্ভব মাদায়েনবাসীদের এ গোত্রটি হযরত মূসা আ.-এর নিকটাত্মীয় ছিল। কেননা মূসা আ. ছিলেন হযরত ইসহাক ইবনে ইবরাহীম আ.-এর বংশধর। আর মাদায়েনবাসী হল হযরত ইসহাক আ.-এর ভ্রাতা মাদইয়ান ইবনে ইবরাহীমের বংশ থেকে উদ্ভূত। হয়তো এ কারণেই তিনি এদেশটি বেছে নেন।

হযরত মূসা আ. যেহেতু ফেরাউনের ভয়ে পলায়ন করেছিলেন; সুতরাং তাঁর সঙ্গে কোনো সাথী ছিল না। পথপ্রদর্শকও না। এবং কোনো পাথেয়ও ছিল না। আর দ্রুত চলার জন্য ছিলেন খালি পা।

ইমাম তাবারী হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর রাযি. থেকে রেওয়ায়েত করেছেন : পূর্ণ এ সফরে মূসা আ.-এর খাদ্য গাছের পাতা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। খালি পা হওয়ায় এ দীর্ঘ সফরে তাঁর পায়ের তলার চামড়া পর্যন্ত পড়ে গিয়েছিল। এমনি অস্থির ও পেরেশান অবস্থায় হযরত মূসা আ. মাদায়েনের ভূখণ্ডে প্রবেশ করলেন।

আল্লাহ পাক হযরত মূসা আ.-এর মিসর ত্যাগের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। ফেরাউন সম্প্রদায়ের কেউ তাকে দেখে ফেলে কি-না, এ ভয়ে চতুর্দিকে তাকাতে তাকাতে মূসা আ. শহর থেকে বের হয়ে পড়লেন। কিন্তু কোথায় যাবেন, কোন দিকে যাবেন, তিনি কিছুই জানেন না। তিনি ইতোপূর্বে মিসর থেকে আর কোনো দিন বের হন নি। যখন তিনি মাদায়েনের পথ ধরলেন– তখন তিনি বলে উঠলেন, আমি আশা করি আমার প্রতিপালক আমাকে সোজা রাস্তা প্রদর্শন করবেন। অর্থাৎ সম্ভবত আমি এবার মনযিলে মকসুদে পৌঁছুতে পারব। বাস্তবে হয়েছিলও তাই। এ পথই তাঁকে মনযিলে মকসুদে নিয়ে পৌঁছায়। কিন্তু কি সে মনযিলে মকসুদটি?

মাদায়েনে একটি কুয়া ছিল, যার পানি সকলে পান করত। মাদায়েন হল সেই শহর, যেখানে আল্লাহ তাআলা আইকাবাসীদের ধ্বংস করেছিলেন। আর তারা ছিল শুআইব আ.-এর সম্প্রদায়।

ওলামায়ে কেরামের একটি মতানুযায়ী মূসা আ.-এর যুগের পূর্বে তারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। যখন মূসা আ. মাদায়েনের পানির কূপের কাছে পৌঁছলেন, সেখানে একদল লোক পেলেন। নিজ নিজ পশুগুলোকে পানি পান করাচ্ছে তারা। তাদের পেছনে দুজন

বালিকাকে দেখলেন, নিজেদের ছাগলগুলোকে সামলে দাঁড়িয়ে আছে। যাতে সেগুলো সম্প্রদায়ের ছাগলের সঙ্গে মিশে না যায়।

কিতাবিদের মতে সেখানে সাতজন নারী ছিল। এটাও তাদের ভ্রান্ত ধারণা। তারা সাতজন হতে পারে, তবে তাদের মধ্য হতে পানি পান করাতে এসেছিল দুজন। তাদের বর্ণনা বিশুদ্ধ হলেই কেবল এ ধরনের সামঞ্জস্যসূচক উত্তর গ্রহণযোগ্য হতে পারে। এটা স্পষ্ট, শুআইব আ.-এর কেবল দুটি কন্যাই ছিল। মূসা আ.-এর প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা বললেন, আমাদের দুর্বলতার কারণে রাখালদের পানি পান করানোর আগে আমরা পানির কাছে পৌঁছুতে পারি না। আর এ সব পশু নিয়ে আমাদের আসার কারণ হচ্ছে, আমাদের পিতা বৃদ্ধ ও দুর্বল। তখন মূসা আ. তাদের পশুগুলোকে পানি পান করিয়ে দিলেন।

তাফসিরকারকগণ বলেন, রাখালরা যখন তাদের পশুগুলোর পানি পান করানো শেষ করত, তখন তারা কূয়ার মুখে একটি বড় ও ভারি পাথর রেখে দিত। তারপর আসতেন এ দুই নারী। লোকেরা তাদের পশুগুলোকে পানি পান করানোর পর যা উচ্ছিষ্ট থাকত, তা থেকে নিজেদের বকরিগুলোকে পানি পান করাতেন। আজ মূসা আ. একাই সেই পাথরটা উঠালেন। তারপর তিনি তাদেরকে ও তাদের বকরিগুলোকে পানি পান করালেন এবং পাথরটি আগের জায়গায় রেখে দিলেন।

আমিরুল মুমিনিন হযরত ওমর রাযি. বলেন, পাথরটি দশজনে মিলে উঠাতে হতো। হযরত মূসা আ. এক বালতি পানি তুললেন। এতে দুনো বালিকার প্রয়োজন মিটে গেল। এরপর পুনরায় তিনি গাছের ছায়ায় ফিরে আসেন। তাফসিরকারকগণ বলেন, এটা সামার গাছের ছায়া। ইবনে জারীর তাবারী রহ. ইবনে মাসউদ রাযি. সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি এ গাছটিকে সবুজ ও ছায়াদার দেখেছেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, মূসা আ. মিসর থেকে মাদায়েন ভ্রমণকালে শাক-সবজি ও গাছের পাতা ছাড়া অন্য কিছু খেতে পান নি। তাঁর পায়ে তখন জুতা ছিল না। জুতা না থাকায় দুই পায়ের তলায় জখম হয়ে গিয়েছিল। তিনি গাছের ছায়ায় বসলেন। তিনি ছিলেন সৃষ্টিকুলের মধ্যে আল্লাহ তাআলার মনোনীত ব্যক্তি। অথচ ক্ষুধার কারণে তাঁর পেট পিঠের সঙ্গে লেগে গিয়েছিল। এবং তাঁর দেহে এর প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট। এমনকি তিনি তখন এক টুকরো খেজুরের মুখাপেক্ষী ছিলেন।

قَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

এ আয়াত প্রসঙ্গে আতা ইবনে সাইব রহ. বলেন : তিনি নারীদেরকে শুনিয়ে এ দুআটি করেছিলেন। হযরত মূসা বুঝতে পেরেছিলেন, এখানে সেই সবকিছুই হচ্ছে, যা দুনিয়ার জ জালেম শক্তিগুলো করছে। আল্লাহ পাকের উত্তম বিধানকে লঙ্ঘন করে কওমগুলোর সমুদয় শৃঙ্খলা নষ্ট করছে। খুলে দিয়েছে অন্যায় জুলুমের দুয়ার। মনে হয়,

বালিকা দুটি কোনো দুর্বল পরিবারের মেয়ে। তাই শক্তিশালী ও জালেমেরা নিজেদের পশুগুলোকে পানি পান করিয়ে তৃপ্ত করে নিলে অবশিষ্ট কিছু পানিই দুর্বল বালিকাদের পশুগুলির জুটতে পারে। বস্তুত প্রত্যেক শক্তিশালীই দুর্বলের জন্য এ বিধান ধার্য করে রেখেছে, যে কোনো স্বার্থের বেলায় অগ্রাধিকার তাদের, আর দুর্বলদের পালা হয় পরে। আরবের বিখ্যাত কবি আমর ইবনে কুলসুম যেমনটা বলেছেন :

وَنَشْرَبُ إِنْ وَرَدْنَا الْمَاءَ صَفْوًا + وَيَشْرَبُ غَيْرُنَا كَدَرًا وَطِيْنًا۔

"আমরা যখন কোনো পানির কাছে গমন করি, তখন উত্তম ও পরিস্কার পানি আমাদের ভাগে আসে। আর আমরা ছাড়া অন্যান্যের (যারা আমাদের চেয়ে দুর্বল) ভাগে আসে ঘোলা পানি ও মাটি।"

প্রকৃতপক্ষে এ কবিতাটি শুধু আমর ইবনে কুলসুম ও তার গোত্রের অবস্থারই ছবি নয়; বরং সারা দুনিয়ার জালেম শাসনের অবিকল ছবি; হুবহু স্বচ্ছ দর্পন।

মোটকথা, হযরত মূসা আ. এ অবস্থা সহ্য করতে পারলেন না। তিনি অগ্রসর হয়ে বালিকাদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা তোমাদের পশুগুলোকে পানি পান করাচ্ছ না কেন? পেছনে দাঁড়িয়ে আছ কেন? উভয়ে উত্তর করল : আমরা দুর্বল-অক্ষম, পশুগুলোকে নিয়ে অগ্রসর হলে এই শক্তিমানেরা আমাদেরকে পিছনে হটিয়ে দেয়। আর আমাদের পিতা একজন দুর্বল বৃদ্ধ। তাঁর এখন শক্তি নেই, তিনি এদের ভিড় ঠেলে অগ্রসর হন। কাজেই যখন এরা পানি পান করিয়ে চলে যাবে, তখন অবশিষ্ট পানি যা কিছু থাকে, তা-ই পান করিয়ে আমরা বাড়ি ফিরব। এটাই আমাদের প্রতিদিনের নিয়ম।

হযরত মূসা আ. অগ্রসর হয়ে সমুদয় ভেড়ার পালকে ফাঁক করে কূপের কাছে গিয়ে পৌঁছলেন। বড় একটি বালতি ফেললেন কূপে; পানি ভর্তি করে একাই টেনে উঠান বালতিটি। এবং বালিকাদের পশুগুলোকে পানি পান করান। হযরত মূসা আ. নির্ভীকভাবে ভিড় ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করাতে যদিও উপস্থিত লোকদের মনে অসন্তোষ ও বিরক্তি ভাব জাগ্রত হয়েছিল, কিন্তু তাঁর গাম্ভীর্যপূর্ণ চেহারা ও দৈহিক শক্তি দেখে সকলেই ভীত হয়ে গেল এবং সবাই তাঁর শক্তির সম্মুখে পরাভব স্বীকার করল।

কোনো কোনো তাফসিরকারক মনে করেন, "মূসা আ. দেখলেন, কূপের মুখে একটি বিরাটকায় পাথর দিয়ে ঢাকা রয়েছে। একদল লোক একসঙ্গে শক্তি প্রয়োগ করলে তা স্থানচ্যুত হতে পারে। কিন্তু তিনি অগ্রসর হলেন, একাই ওটাকে সরিয়ে বালিকাদ্বয়ের পশুগুলোর জন্য পানিভর্তি বালতি টেনে উঠালেন এবং তাদের প্রয়োজন পূর্ণ করে দিলেন। আবদুল ওয়াহ্হাব নাজ্জার রহ. বলেন : এ উক্তিটি কুরআনে হাকিমের বর্ণনার বিরোধী। কুরআন মাজিদ বলে :

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ

"যখন তিনি (মূসা আ.) মাদায়েনের পানির কাছে পৌঁছলেন, তখন ওটার কাছে একদল লোককে দেখলেন, তারা (পশুগুলোকে) পানি পান করাচ্ছে।" (সূরা-কাছাছ)

সুতরাং কীভাবে শুদ্ধ হতে পারে, কূপের মুখ পাথর দ্বারা ঢাকা ছিল? (এ উক্তিটি যেমনি শুদ্ধ ও সঠিক নয়, তদ্রূপ এ ব্যাখ্যাও ঠিক নয়, সেখানে দুটি কূপ ছিল। একটি থেকে মাদায়েনের লোকেরা পানি পান করাচ্ছিল এবং অপরটির মুখ পাথর দ্বারা আবৃত ছিল।

এ ব্যাখ্যাটি শুদ্ধ ও সঠিক না হওয়ার কারণ হল, প্রথমত কুরআন মাজিদ আরেকটি কূপের কথা আদৌ উল্লেখ করে নি। বরং যা কিছু বর্ণনা করেছে একটি কূপের সম্বন্ধেই বর্ণনা করেছে। দ্বিতীয়ত পরবর্তীকালে তথায় দুটি কূপ বিদ্যমান পাওয়ার দ্বারা অবধারিত হয় না, তৎকালেও সেখানে দুটি কূপই ছিল। হয়তো দীর্ঘকাল পরে কিংবা ইসলামি যুগে প্রয়োজনবশত এখানে দ্বিতীয় কূপটি খনন করা হয়েছে। সুতরাং কুরআন মাজিদের পরিষ্কার সাদাসিধে বর্ণনাকে শুধু একটি অনির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েতের খাতিরে জটিল বানিয়ে নেওয়া সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

যখন সেই বালিকাদ্বয়ের বকরির পাল পানি পান করল, তখন তারা বাড়ির দিকে চলে গেল। অভ্যাসের বিপরীত তাড়াতাড়ি ফিরে আসায় তাদের পিতা খুবই আশ্চর্যান্বিত হলেন। 'কারণ' জিজ্ঞাসা করলে বালিকারা পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করে শুনাল। কেমন করে জনৈক মিসরী লোক তাদের সাহায্য করেছে। পিতা বালিকাদ্বয়ের একজনকে বললেন, শিগগির যাও, তাকে আমার কাছে নিয়ে আসো।

এখানে পিতা ও কন্যার মধ্যে এরূপ কথোপকথন হচ্ছিল, ওদিকে হযরত মূসা আ. পানি পান করানোর পর কাছেই একটি গাছের ছায়ায় বসে বিশ্রাম করছিলেন। তার মধ্যে তখন সফরের ক্লান্তি। তদুপরি ক্ষুৎ-পিপাসার তীব্রতা। হযরত মূসা আ. দোয়া করলেন : "হে আমার পালনকর্তা! এখন আপনি নিজ অনুগ্রহ ও কুদরতে আমার জন্য যে উত্তম রসদ ও দয়া অবতীর্ণ করবেন, আমি তার মুখাপেক্ষী।"

বালিকাটি দ্রুত সেখানে গিয়ে দেখল, কূপের কাছেই তিনি বসে রয়েছেন। লজ্জা ও শরমে দৃষ্টি অবনত করে বালিকা বলল, আপনি আমাদের বাড়ি চলুন। আব্বা আপনাকে ডাকছেন। তিনি আমাদের প্রতি আপনার অনুগ্রহের বিনিময় প্রদান করবেন। হযরত মূসা আ. ভাবলেন, হয়তো এ সুযোগে কোনো উত্তম উপায় উদ্ভাবিত হবে। তাই সেখানে যাওয়াই উচিত। দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করা সঙ্গত নয়! আল্লাহ পাক আমার দুআ শ্রবণ করেছেন এবং এটা তারই সূচনা। হযরত মূসা আ. উঠে দাঁড়ালেন। এবং বালিকাকে নির্দেশ দিলেন, "তুমি আমার সামনে নয়, আমার পেছনে পেছনে চল এবং ইশারা-ইঙ্গিতে পথপ্রদর্শন কর!"

মূসা আ. রওনা তো করলেন। কিন্তু স্বভাব ও প্রকৃতিগত মর্যাদাবোধ ও আত্মসম্মানের প্রতি লক্ষ করে বারবার এ বাক্যটির দ্বারা মনে মনে ব্যথা পাচ্ছিলেন : "আমার পিতা আপনাকে এই পরিশ্রমের বিনিময় দিতে চান।" সফর ও সংকটপূর্ণ অবস্থা শেষ পর্যন্ত তাকে এ অপছন্দনীয় বিষয়টিকে বরদাশত করে নিতে পরামর্শ দিল। কেননা তাতে এই নিঃসঙ্গতার সময়ে একজন সহানুভূতিশীল, সান্ত্বনাদাতা বন্ধুর স্বতন্ত্র সমবেদনা লাভ করা যেতে পারে।

হযরত মূসা আ. চলতে চলতে গন্তব্যস্থলে এসে পৌঁছুলেন। তিনি সেই আকৃতি ও স্বভাব-চরিত্রে বুযুর্গ লোকটির সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করলেন। বুযুর্গ ব্যক্তি প্রথমে তাঁকে খাবার খাওয়ালেন। এরপর নিশ্চিন্ত মনে বসিয়ে তাঁর যাবতীয় অবস্থা শ্রবণ করলেন। হযরত মূসা আ. পুঙ্খানুপুঙ্খ নিজের জন্মবৃত্তান্ত এবং বনি ইসরাঈলদের প্রতি ফেরাউন নানাবিধ অত্যাচার থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত সমুদয় ঘটনা বর্ণনা করে শুনালেন। সবকিছু শ্রবণ করার পর বুযুর্গ লোকটি মূসা আ.-কে সান্ত্বনা দিলেন এবং বললেন, আল্লাহ তাআলার শোকর কর! এখন তুমি যালেমের কবল থেকে মুক্তি লাভ করেছ। কোনো ভয়ের কারণ নেই।

এখানে যালেম কওমের যুলুম বলতে বনি ইসরাঈলের শিশুদেরকে হত্যা করা, বনি ইসরাইলকে গোলাম বানানো এবং নানা প্রকার দুর্দশাগ্রস্ত করে রাখার ঘটনাবলী কিংবা তাদের কুফর এবং যমিনে ফাসাদ ও অনর্থ বিস্তার করা উদ্দেশ্য হতে পারে। অন্যথায় কিবতিকে হত্যা করার ব্যাপারে তো স্বয়ং মূসা আ.-ও নিজের কাজের জন্য অনুতপ্ত ছিলেন এবং নিজেকে দোষী মনে করতেন। এ সম্পর্কেই কুরআন মাজিদে ইরশাদ হচ্ছে

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ (٢٢) وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ (٢٣) فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (٢٤) فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

“আর যখন মূসা আ. মাদায়েনের পথে যাত্রা করলেন, তখন বললেন– আশা করি, আমার রব আমাকে সরল পথে নিয়ে যাবেন। যখন তিনি মাদায়েনের কূপের কাছে পৌঁছলেন, সেখানে একদল লোককে দেখতে পেলেন (গৃহপালিত পশুদেরকে) পানি পান করাচ্ছে। আর দেখতে পেলেন, তাদের থেকে একটু দূরে দুজন নারীকে, নিজেদের বকরিগুলোকে পানির কাছে আসতে বারণ করে রাখছে। মূসা আ. বললেন, তোমাদের কী অবস্থা? তারা বলল, রাখালরা নিজ নিজ পশুগুলোকে পানি পান করিয়ে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত আমরা আমাদের পশুগুলোকে পানি পান করাতে পারি না। আর আমাদের পিতা অতি বয়স্ক ও দুর্বল বৃদ্ধ। এরপর তিনি (মূসা আ.) পানি পান করিয়ে দিলেন তাদের পশুগুলোকে। অনন্তর মূসা আ. গাছের ছায়ায় এসে বসলেন। দোয়া করলেন, “হে আমার রব! এখন আপনি আমার প্রতি যা কিছু নাযিল করবেন ভালো বস্তু থেকে, আমি তার মুখাপেক্ষী। এরপর উক্ত রমণীদ্বয়ের মধ্য থেকে একজন লজ্জাবনত অবস্থায়

চলতে চলতে মূসার কাছে আসল এবং বলল, আমার আব্বা আপনাকে ডাকছেন, আপনি যে আমাদের পশুগুলোকে পানি পান করিয়ে দিয়েছেন, আপনাকে এর বিনিময় প্রদান করবেন। অনন্তর যখন তিনি সেই বৃদ্ধের কাছে পৌঁছুলেন এবং তাঁর কাছে নিজের সম্যক অবস্থা বর্ণনা করে শুনালেন, তখন তিনি বললেন– ভয় করো না। তুমি সেই জালিম কওম থেকে রক্ষা পেয়েছ।" (সূরা কাছাছ; রুকু : ৩)

তাওরাতে এ ক্ষেত্রেও দুই জায়গায় অমিল রয়েছে : ১। তাওরাত বালিকাদের সংখ্যা দুয়ের স্থলে সাত বলেছে। ২। তাওরাত বলে, বালিকারা পানি উঠিয়ে হাউজ পূর্ণ করে নিয়েছিল, কিন্তু অন্যান্য লোকেরা বলপ্রয়োগ করে তাদের হটিয়ে দিয়ে নিজেদের পশুগুলোকে পানি পান করাতে শুরু করে দিল। এটা দেখে হযরত মূসা আ. ক্রোধান্বিত হয়ে উঠলেন।

আমরা এখানে কুরআন মাজিদের বর্ণনাকেই নির্ভরযোগ্য মনে করি। কারণ, প্রথমত পূর্ববর্তী অমিলগুলোতেও কুরআনের বর্ণনাসমূহই যুক্তিযুক্ত এবং প্রকৃতির অনুরূপ দেখা গেছে। দ্বিতীয়ত এ স্থানেও সংখ্যার ব্যাপারটি বাদ দিলেও তাওরাতের অন্যান্য বিষয় সঠিক নয়। কেননা বালিকারা মাদায়েন গোত্রের এবং সেই বস্তির বাসিন্দা বলেই মনে হয় এবং পানির এরূপ ব্যাপার দৈনিকই তাদের সাথে ঘটত। সুতরাং তাদের জানাই ছিল, এ শক্তিশালী দল কোনোক্রমেই আমাদেরকে অগ্রসর হতে দেবে না। আর আরব দেশের কবিদের কথা থেকেও প্রকাশ পায়, পানির ব্যাপারে তাদের দেশে দুর্বলদের ওপর শক্তিশালীদের অগ্রাধিকার ছিল। শুধু আরব কেন? দুনিয়ার প্রত্যেক অংশেরই এ অবস্থা ছিল। কাজেই তারা এখানে অগ্রসর হওয়ার সাহস কিরূপে করতে পারত? সঠিক কথা হল, তারা দুর্বল পরিবারের, তদুপরি স্ত্রীলোক হওয়ায় সকলে পানি পান করিয়ে চলে গেলে উদ্বৃত্ত পানিতে নিজেদের কাজ চালিয়ে নিয়েই তৃপ্ত থাকত।

বুযুর্গ ব্যক্তির সঙ্গে শ্বশুর-জামাতা সম্পর্ক

হযরত মূসা আ. ও মাদায়েনের ওই বুযুর্গ গৃহকর্তার কথাবার্তা হচ্ছিল। এমন সময়ে বৃদ্ধের কন্যা, যিনি মূসা আ.-কে ডেকে আনতে গিয়েছিলেন, নিজের পিতাকে বললেন– হে পিতা! আপনি এই মেহমানকে আপনার গৃহপালিত পশুগুলি চরানো এবং এদের পানি সংগ্রহ করার জন্য শ্রমিক নিযুক্ত করুন। শ্রমিক এমন ব্যক্তিই ভালো, যে শক্তিশালীও হয় এবং আমানতদারও হয়।

তাফসিরকারকগণ বলেন, কন্যার এ উক্তি পিতার কাছে একটু বিস্ময়কর বোধ হল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : এ মেহমানের শক্তি ও আমানতদারী তুমি কেমন করে জানতে পারলে? কন্যা উত্তর করল, আমি মেহমানের দৈহিক শক্তি তো এ থেকে অনুমান করলাম, কূপের বড় বালতিটি তিনি একাই টেনে উঠালেন। আর আমানতদারীর পরীক্ষা এ থেকে করলাম, যখন আমি তাঁকে ডাকতে গেলাম, তখন তিনি আমাকে দেখামাত্র দৃষ্টি অবনত করে নিলেন। আর কথোপকথনের সময়ে তিনি একবারও আমার দিকে

দৃষ্টিপাত করেন নি। এরপর যখন তাকে ডেকে নিয়ে আসতে গেলাম, তখন আমাকে তাঁর পিছনে চলতে বললেন এবং তিনি নিজে সম্মুখে সম্মুখে চললেন। এবং শুধু ইশারা-ইঙ্গিতে আমি তাঁকে পথ দেখাতে লাগলাম। বুযুর্গ পিতা কন্যার এ সমস্ত কথা শুনে অতিশয় আনন্দিত হলেন এবং হযরত মূসা আ.-কে বললেন, "যদি তুমি ৮ বছর আমার কাছে থেকে আমার বকরি চরাও, তবে আমি আমার এ কন্যাটিকে তোমার বিবাহ বন্ধনে প্রদান করতে প্রস্তুত আছি। আর যদি তুমি এ মেয়াদকে আরো ২ বছর বৃদ্ধি করে দশ বছর পূর্ণ কর, তবে আরো উত্তম হবে। এটিই হবে এ কন্যার মহর।" হযরত মূসা আ. এ শর্ত কবুল করে নিলেন এবং বললেন, "আমার খুশির উপর ছেড়ে দিন! আমি উক্ত দুই মেয়াদের যেটি ইচ্ছে পূর্ণ করব। আপনার পক্ষ থেকে এ বিষয়ে বাধ্য-বাধকতা থাকবে না।" উভয় পক্ষের পারস্পরিক সম্মতির পরে মাদায়েনের বুযুর্গ লোকটি বর্ণিত মেয়াদকে মহর সাব্যস্ত করে হযরত মূসা আ.-এর সঙ্গে নিজের এ কন্যাকে বিবাহ দিলেন। কোনো কোনো তাফসিরকারক ধারণা করেন, মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে বিবাহ বন্ধন সম্পন্ন হয়েছিল এবং আকদ হওয়ার পরক্ষণেই হযরত মূসা আ. নিজের স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে মাদায়েন ত্যাগ করেছেন। তা ছাড়া তাফসিরকারকগণ হযরত মূসা আ.-এর স্ত্রীর নাম বলেছেন সফুরা।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٢٧) قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

"তাদের একজন বলল, হে পিতা! তুমি একে মজুর নিযুক্ত কর! কারণ, তোমার মজুর হিসেবে উত্তম হবে সেই ব্যক্তি, যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত। সে মূসা আ.-কে বলল, আমি আমার এ কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সঙ্গে বিয়ে দিতে চাই এ শর্তে, তুমি আট বছর আমার কাজ করবে; যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ কর, সে তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তুমি আমাকে সদাচারী পাবে। মূসা আ. বলল, আমার ও আপনার মধ্যে এ চুক্তিই রইল। এ দুটি মেয়াদের কোনো একটি আমি পূর্ণ করলে আমার বিরুদ্ধে [আপনার] কোনো অভিযোগ থাকবে না। আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি, আল্লাহ তার সাক্ষী।" (সূরা কাসাস : ২৫-২৮)

অন্য এক বর্ণনা মতে মূসা আ. গাছের ছায়ায় বসে যখন বললেন :

رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

তখন নারীদ্বয় তা শুনতে পান। এরপর তারা তাদের পিতার কাছে চলে গেলেন।

নারীদ্বয়ের পিতা এই বৃদ্ধ কে? ওলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে একাধিক মত পেশ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, "তিনি হচ্ছেন শুআইব আ.।" এটাই অধিকাংশের কাছে সুপ্রসিদ্ধ অভিমত। হাসান বসরী, মালিক ইবনে আনাস রহ. এ মত পোষণ করেন। এ ব্যাপারে একটি হাদিসেও সুস্পষ্ট বর্ণনা এসেছে। তবে এর সনদে কিছু সন্দেহ রয়েছে। অন্য একজন মুফাসসির বলেছেন, শুআইব আ. তাঁর সম্প্রদায় ধ্বংস হওয়ার পরও অনেকদিন জীবিত ছিলেন। এরপর মূসা আ. তাঁর যুগ পান এবং তাঁর কন্যাকে বিবাহ করেন।

ইবনে আবু হাতিম রহ. প্রমুখ হাসান বসরী রহ. সূত্রে বর্ণনা করেন, মূসা আ.-এর ঘটনা সংশ্লিষ্ট এ ব্যক্তির নাম শুআইব। তিনি মাদায়েনে কূয়ার মালিক ছিলেন; কিন্তু তিনি মাদায়েনের নবী শুআইব আ. নন। কেউ কেউ বলেন, তিনি হচ্ছেন হযরত শুআইব আ.-এর ভাতিজা। কেউ কেউ বলেন, তিনি হচ্ছেন শুআইব আ.-এর চাচাত ভাই। কেউ কেউ বলেন, তিনি ছিলেন শুআইব আ.-এর সম্প্রদায়ের একজন মুমিন বান্দা। আবার কেউ কেউ বলেন, তিনি হচ্ছেন সাধারণ একজন লোক, যার নাম ইয়াসরূন। কিতাবীদের গ্রন্থাদিতে এরূপ বিবরণ রয়েছে। তাদের ভাষ্য মতে ইয়াসরূন ছিলেন একজন বড় জ্ঞানী ও জ্যোতিষী। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. ও আবু ওবায়দা ইবনে আবদুল্লাহ রহ. তাঁর নাম ইয়াসরূন বলে উল্লেখ করেছেন। আবু ওবায়দা আরো বলেন, তিনি ছিলেন শুআইব আ.-এর ভাতিজা। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. এ বর্ণনায় বাড়িয়ে বলেন, তিনি ছিলেন মাদায়েনের লোক।

মোটকথা, শুআইব আ. মূসা আ.-কে আতিথ্য ও আশ্রয় দান করলে তিনি তাঁর সমস্ত ঘটনাবলী শুআইব আ.-এর কাছে বর্ণনা করলেন। শুআইব আ. তাঁকে জালেমদের কবল থেকে পরিত্রাণ লাভের সুসংবাদ শুনালেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, তিন ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা অতি দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন

(১) ইউসুফ আ.-এর ক্রেতা; যখন তিনি তাঁর স্ত্রীকে বলেছিলেন, "সম্মানজনকভাবে তার থাকার ব্যবস্থা কর!"

(২) হযরত মূসা আ.-এর স্ত্রী। যখন তিনি বলেছিলেন, "হে আমার পিতা! তুমি তাকে মজুর নিযুক্ত কর! কারণ, তোমার মজুর হিসেবে উত্তম হবে সেই ব্যক্তি, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত।"

(৩) হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা। যখন তিনি ওমর রাযি. কে খলিফা মনোনীত করেন।

হযরত শুআইব আ. বলেন :

إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

এ আয়াত দ্বারা ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর কিছু সংখ্যক অনুসারী দলিল পেশ করেন : যদি কেউ বলে, আমি দুটি দাসের মধ্যে একটি, কিংবা কাপড় দুটির একটি, অনুরূপভাবে অন্যান্য বস্তুর ক্ষেত্রেও দুটির একটি বিক্রি করব, তা হলে এরূপ বলা শুদ্ধ হবে। কেননা শুআইব আ. বলেছিলেন : إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ

অর্থাৎ আমার এ কন্যাদ্বয়ের একজনকে। বস্তুত এ যুক্তিটি যথার্থ নয়। কেননা বিয়ের ক্ষেত্রটি পরস্পর সম্মতির ব্যাপার; ব্যবসায়ের মতো লেনদেনের ব্যাপার নয়। আল্লাহ তাআলাই সম্যক জ্ঞাত। এমনিভাবে এ আয়াত দ্বারা ইমাম আহমদ রহ.-এর অনুসারীগণ প্রচলিত প্রথা অনুসারে আহার ও বাসস্থানের বিনিময়ে মজুর নিযুক্তির বৈধতার প্রমাণ পেশ করেন। হযরত শুআইব আ.-এর জবাবে মূসা আ. বলেছিলেন :

ذَٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইমাম বুখারী রহ. সাঈদ ইবনে জুবায়র রাযি. সূত্রে বর্ণনা করেন : হীরার অধিবাসী একজন ইহুদি আমাকে প্রশ্ন করল : أَيَّ الْأَجَلَيْنِ قَضَيٰ موسى

অর্থাৎ, মূসা আ. কোন মেয়াদটি পূরণ করেছিলেন? বললাম, আমি জানি না! তবে আরবের মহান শিক্ষিত লোকটির কাছে জিজ্ঞাসা করব। এরপর আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.-এর কাছে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : দুটির মধ্যে যেটা অধিক ও বেশি পছন্দনীয়, সেটাই তিনি পূরণ করেছিলেন। কেননা আল্লাহর নবী যা বলেন তা অবশ্যই করেন।

এ সম্পর্কে ইমাম নাসাঈ, ইবনে জারীর তাবারী, মুজাহিদ রহ. প্রমূখ ইমামগণ বিভিন্ন সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেছেন। এখানে সেসব উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এমনিভাবে ইমাম বাযযার রহ. ও ইবনে আবু হাতিম রহ. আবু যর রাযি. সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একদিন প্রশ্ন করা হয়েছিল– মূসা আ. কোন মেয়াদটি পূরণ করেছিলেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যেটা অধিক পরিপূর্ণ ও অধিক কল্যাণকর। তিনি আরো বলেন, "যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, কোন কন্যাটিকে মূসা আ. বিয়ে করেছিলেন, তখন বলে দাও, ছোট কন্যাটিকে।"

আরেক হাদিসে আছে, হযরত মূসা আ. জীবিকা নির্বাহ ও চরিত্রের হেফাযতের জন্যে মজুরির মেয়াদটি পূর্ণ করে যখন শুআইব আ.-এর কাছ থেকে বিদায় গ্রহণের ইচ্ছা করেন, তখন তিনি তার স্ত্রীকে তাঁর পিতার কাছ থেকে কিছু বকরি চেয়ে নিতে বলেন। যাতে তারা এগুলো দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন। সুতরাং এ বছর যতগুলো বকরি মায়ের রং থেকে ভিন্ন রং-এ জন্ম নিয়েছে, তাঁর পিতা তাঁকে সেগুলো দান করলেন। তাঁর বকরিগুলো ছিল কালো ও সুন্দর। মূসা আ. লাঠি নিয়ে গেলেন এবং একদিক থেকে এগুলোকে পৃথক করলেন। এরপর এগুলোকে পানির চৌবাচ্চার কাছে নিয়ে গেলেন এবং পানি পান করালেন। মূসা আ. চৌবাচ্চার পাশে দাঁড়ালেন। কিন্তু

একটি বকরিও পানি পান শেষ করে নিজ ইচ্ছায় ছুটে গেল না। যতক্ষণ না তিনি এক একটিকে মৃদু প্রহার করেন। বর্ণনাকারী বলেন, দু-একটি ব্যতীত সকল বকরিই প্রতিটি যমজ বকনা এবং মায়ের রং থেকে ভিন্ন রং-এর বাচ্চা জন্ম দেয়। এগুলোর মধ্যে চওড়া বুক, লম্বা বাঁট, সঙ্কীর্ণ বুক, একেবারে ছোট বাঁট এবং হাতে ধরা যায় না এরূপ বাঁটের অধিকারী ছিল না। অর্থাৎ সবগুলোই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি তোমরা সিরিয়া পৌছতে পারতে, তা হলে তোমরা এখনো ওই জাতের বকরি দেখতে পেতে। এসব বকরি হচ্ছে সামেরীয়।

ইবনে জারীর তাবারী রহ. আনাস ইবনে মালিক রাযি. সূত্রে বর্ণনা করেন : যখন আল্লাহর নবী মূসা আ. তাঁর নিয়োগকর্তাকে মেয়াদপূর্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন, তখন তিনি বললেন, 'প্রতিটি বকরিই তোমার; যা তার মায়ের রং-এ জন্ম নেবে। মূসা আ. মানুষের একটি আকৃতি পানিতে দাঁড় করিয়ে রাখলেন, যখন বকরিগুলো মানুষের আকৃতি দেখল, ভয় পেয়ে গেল এবং ছুটাছুটি করতে লাগল। একটি ছাড়া সবগুলোই চিত্রা বাচ্চা জন্ম দিল। মূসা আ. ওই বছরের সব বাচ্চা নিয়ে নিলেন। এ বর্ণনার রাবীগণ বিশ্বস্ত। অনুরূপ ঘটনা হযরত ইয়াকুব আ. সম্পর্কেও বর্ণিত আছে। আল্লাহ সম্যক জ্ঞাত। এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (٢٩) فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٣٠) وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ (٣١) اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ

মূসা আ. যখন তাঁর মেয়াদ পূর্ণ করার পর সপরিবারে যাত্রা করল, তখন সে তূর পর্বতের দিকে আগুন দেখতে পেল। সে তার পরিবারবর্গকে বলল : 'তোমরা অপেক্ষা কর, আমি আগুন দেখেছি। সম্ভবত আমি সেখান থেকে তোমাদের জন্য খবর আনতে পারি অথবা এক খণ্ড জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড আনতে পারি, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার। যখন মূসা আ. আগুনের কাছে পৌছলেন, তখন উপত্যকার দক্ষিণ পার্শ্বে পবিত্র ভূমিস্থিত এক বৃক্ষের দিক থেকে তাকে আহ্বান করে বলা হল, হে মূসা! আমিই আল্লাহ, জগতসমূহের প্রতিপালক। আরো বলা হল, 'তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর! তারপর যখন সে এটাকে সাপের মতো ছুটোছুটি করতে দেখল, তখন পেছনের দিকে ছুটতে লাগল এবং ফিরে তাকাল না। তাকে বলা হল, হে মূসা! সম্মুখে আস, ভয় করো না, তুমি তো নিরাপদ। তোমার হাত তোমার বগলে রাখ, এটা বের হয়ে আসবে শুভ্র

সমুজ্জ্বল নির্দোষ হয়ে। ভয় দূর করার জন্য তোমার হাত দুটি নিজের দিকে চেপে ধর। এ দুটি তোমার প্রতিপালক প্রদত্ত প্রমাণ, ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের জন্য। ওরা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়। (সূরা কাসাস : ২৯-৩২)

পূর্বেই বলা হয়েছে, মূসা আ. পূর্ণতর মেয়াদ অর্থাৎ দশ বছর পূরণ করেছেন। মুজাহিদ রহ. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রথম তিনি ১০ বছর পূরা করেন, পরে আরো দশ বছর। আয়াতে উল্লিখিত وَسَارَ بِأَهْلِهِ এর অর্থ হচ্ছে, মূসা আ. তাঁর শ্বশুরের নিকট থেকে সপরিবারে রওনা হলেন। একাধিক মুফাসসির বর্ণনা করেন, মূসা আ. তাঁর আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেন। তাই তিনি গোপনে মিসরে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে মনস্থ করেন। যখন তিনি সপরিবারে রওনা হলেন, তখন তাঁর সাথে ছিল ছেলে-মেয়ে ও বকরিপাল। যা তিনি তাঁর অবস্থানকালে অর্জন করেছিলেন। ঐতিহাসিকগণ বলেন, ঘটনাচক্রে তাঁর যাত্রার রাতটি ছিল অন্ধকার ও ঠাণ্ডা। তদুপরি তাঁরা পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন; পরিচিত রাস্তা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। পথে বহুবার চকমকি ঠুকে আগুন জ্বালানোর চেষ্টা করেও তারা আগুন জ্বালাতে ব্যর্থ হন। ক্রমেই অন্ধকার ও ঠাণ্ডা তীব্র আকার ধারণ করে। এমতাবস্থায় হঠাৎ তিনি দূরে অগ্নিশিখা দেখতে পেলেন, যা ছিল তূর পর্বতের এক অংশে প্রজ্বলিত। এটা ছিল তূর পর্বতের পশ্চিমাংশ যা ছিল তাঁর ডান দিকে। তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে বললেন, 'তোমরা এখানে অপেক্ষা কর, আমি আগুন দেখতে পেয়েছি।' আল্লাহই ভালো জানেন।

সম্ভবত এ আগুন শুধু তিনিই দেখেছেন; অন্য কেউ দেখেন নি। কেননা এ আগুন প্রকৃতপক্ষে নূর ছিল, যা সকলের দৃষ্টিগোচর হয় না। তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে বললেন, 'আমি হয়তো সেখান থেকে সঠিক রাস্তার সন্ধান পাব কিংবা আগুনের কাষ্ঠখণ্ড নিয়ে আসব, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার। সূরা তহার আয়াত দ্বারাও প্রমাণিত হয়, সেখানে অন্ধকার ছিল এবং তাঁরা রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى (٩) إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا
بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى

"মূসার বৃত্তান্ত তোমার নিকট পৌঁছেছে কি? সে যখন আগুন দেখল, তখন তার পরিবারবর্গকে বলল : তোমরা এখানে থাক, আমি আগুন দেখেছি। হয়তো আমি তোমাদের জন্য তা থেকে কিছু জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে আসতে পারব অথবা আমি তার কাছে কোনো পথনির্দেশ পাব।" (সূরা তহা : ৯-১০)

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ
قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ

"স্মরণ কর সে সময়ের কথা! যখন মূসা তার পরিবারবর্গকে বলেছিল– আমি আগুন দেখেছি, সত্বর আমি সেখান থেকে তোমাদের জন্য কোনো খবর আনব অথবা তোমাদের জন্য আনব জ্বলন্ত অঙ্গার, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার।"

(সূরা নামল : ৭)

বাস্তবিকই তিনি তাঁদের কাছে সেখান থেকে সুসংবাদ নিয়ে এসেছিলেন। কী সে সুসংবাদ! তিনি সেখানে উত্তম পথনির্দেশ পেয়েছিলেন। কী সে উত্তম পথনির্দেশ! তিনি সেখান থেকে নূর নিয়ে এসেছিলেন, কী সে চমৎকার নূর! অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

"যখন মূসা আ. আগুনের নিকট পৌঁছল, তখন উপত্যকার দক্ষিণ পার্শ্বে পবিত্র ভূমিস্থিত এক বৃক্ষ থেকে তাকে আহবান করে বলা হল, হে মূসা! আমিই আল্লাহ, জগতসমূহের প্রতিপালক।" (সূরা কাসাস : ৩০)

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

"এরপর সে যখন তাঁর নিকট আসল, তখন ঘোষিত হল– ধন্য যারা রয়েছে এ আলোর মধ্যে এবং যারা রয়েছে তার চতুষ্পার্শে, জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ পবিত্র ও মহিমান্বিত।" (সূরা নামল : ৮)

অর্থাৎ তিনি যা ইচ্ছা, তা করেন এবং যা ইচ্ছা নির্দেশ করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

"হে মূসা! আমি তো আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

এ সম্পর্কে সূরা তহায় আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى (١١) إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى (١٢) وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى (١٣) إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (١٤) إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى (١٥) فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى

"এরপর যখন সে আগুনের কাছে আসল, তখন আহবান করে বলা হল– হে মূসা! আমিই তোমার প্রতিপালক। অতএব তোমার পাদুকা খুলে ফেল। কারণ, তুমি পবিত্র

তুওয়া উপত্যকায় রয়েছ এবং আমি তোমাকে মনোনীত করেছি। অতএব যা ওহি প্রেরণ করা হচ্ছে, তুমি তা মনোযোগের সঙ্গে শোন! আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তাই আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরণে সালাত কায়েম কর। কেয়ামত অবশ্যম্ভাবী। আমি এটা গোপন রাখতে চাই, যাতে প্রত্যেকেই নিজ কর্মানুযায়ী ফল লাভ করতে পারে। সুতরাং যে ব্যক্তি নেয়ামতে বিশ্বাস করে না এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, সে যেন তোমাকে এতে বিশ্বাস স্থাপনে নিবৃত্ত না করে; নিবৃত্ত হলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।" (সূরা তহা : ১১-১৬)

প্রাচীন যুগের ও পরবর্তীকালের একাধিক মুফাসসির বলেন : মূসা আ. যে আগুন দেখলেন, তার কাছে পৌঁছুতে তিনি মনস্থ করলেন। সেখানে পৌঁছে সবুজ কাঁটা গাছে আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে পেলেন। এ আগুনের মধ্যকার সবকিছু দাউ দাউ করে জ্বলছে; অথচ গাছের শ্যামলিমা ক্রমেই বেড়ে চলেছিল। অবাক হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। আর এ গাছটি ছিল পশ্চিম দিকের পাহাড়ে, তাঁর ডানদিকে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ

"মূসাকে যখন আমি বিধান দিয়েছিলাম, তখন তুমি পশ্চিম প্রান্তে উপস্থিত ছিলে না এবং তুমি প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলে না।" (সূরা কাসাস : ৪৪)

মূসা আ. যে উপত্যকায় ছিলেন, তার নাম হচ্ছে তুওয়া। তিনি তখন কিবলার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিলেন। আর এ গাছটি ছিল পশ্চিম পার্শ্বে তাঁর ডানদিকে। সেখানে অবস্থিত তুওয়া নামক পবিত্র উপত্যকায় তাঁর প্রতিপালক তাঁকে আহবান করলেন। প্রথমত তিনি তাকে ওই পবিত্র স্থানটির সম্মানার্থে পাদুকা খুলে ফেলার নির্দেশ দিলেন এবং বিশেষ করে ওই পবিত্র রাতের সম্মানার্থে।

কিতাবীদের মতে মূসা আ. এ নূরের তীব্রতার কারণে দৃষ্টিশক্তি লোপ পাওয়ার ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে নিজের চেহারার ওপর হাত রাখলেন। আল্লাহ তাআলা তাকে সম্বোধন করে বললেন, 'নিশ্চয়ই আমিই আল্লাহ, জগতসমূহের প্রতিপালক।'

এরপর ইরশাদ হচ্ছে :

إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

এরপর তিনি সংবাদ দেন, এ পৃথিবী স্থায়ী বাসস্থান নয় বরং স্থায়ী বাসস্থান হচ্ছে কিয়ামত দিবসের পরের বাসস্থান, যার অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব অবশ্যম্ভাবী, যাতে প্রত্যেকে নিজ নিজ আমল অনুসারে ভালো ও মন্দ কর্মফল ভোগ করতে পারে। এ আয়াতের মাধ্যমে উক্ত বাসস্থান লাভের জন্য আমল করার এবং মাওলার নাফরমান ও প্রবৃত্তির পূজারী এবং অবিশ্বাসী বান্দাদের থেকে দূরে থাকার জন্যে মূসা আ.-কে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। এরপর তাকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা সর্ববিষয়ে

সর্বশক্তিমান। যিনি কোনো বস্তুর সৃষ্টির পূর্বে নির্দেশ দেন 'হয়ে যাও' তখন তা হয়ে যায়। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ ইরশাদ করেন :

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى (١٧) قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى (١٨) قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى (١٩) فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى

"হে মূসা! তোমার ডান হাতে এটা কী? অর্থাৎ এটা কি তোমার লাঠি নয়, তোমার কাছে আসার পর থেকে যা তোমার পরিচিত? তিনি বললেন, এটা আমার লাঠি, যা আমি ভালোমতো চিনি। এটাতে আমি ভর দিই এবং এটা দ্বারা আঘাত করে আমি আমার মেষপালের জন্য গাছের পাতা ঝরিয়ে থাকি। আর এটা আমার অন্যান্য কাজেও লাগে। আল্লাহ তাআলা বললেন, হে মূসা! তুমি এটা নিক্ষেপ কর। এরপর তিনি এটা নিক্ষেপ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে এটা সাপ হয়ে ছুটতে লাগল।"

এটা একটি বিরাট অলৌকিক ব্যাপার এবং একটি অকাট্য প্রমাণ, যিনি মূসা আ.-এর সাথে কথা বলেছেন, তিনি যখন কোনো বস্তু সৃষ্টির পূর্বে বলেন– রূপ (হয়ে যাও), তখন তা হয়ে যায়। তিনি তার ইচ্ছা মুতাবিক কাজ আনযাম দিয়ে থাকেন।

কিতাবীরা বলেন, মিসরীয়রা মূসা আ.-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার আশঙ্কা থাকায় তাঁর নবুয়তের সত্যতা প্রমাণের জন্যে মূসা আ. আপন প্রতিপালকের কাছে কোনো প্রমাণ প্রার্থনা করেন। তখন মহান প্রতিপালক তাঁকে বললেন– তোমার হাতে এটা কী? তিনি বললেন, এটা আমার লাঠি। আল্লাহ্ তাআলা বললেন, 'এটা তুমি ভূমিতে নিক্ষেপ কর!' এরপর তিনি এটাকে নিক্ষেপ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে এটা সাপ হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল। মূসা আ. এটার সম্মুখ থেকে পলায়ন করেন। তখন মহান প্রতিপালক তাঁকে হাত বাড়াতে এবং এটার লেজে ধরতে নির্দেশ দিলেন। যখন তিনি এটাকে মজবুত করে ধরলেন, তাঁর হাতে সেটা পূর্বের মতো লাঠি হয়ে গেল।

সূরা কাসাসের ৩১ নং আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেছিলেন :

وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ

"আরো বলা হল, তুমি তোমার লাঠিটি নিক্ষেপ কর। এরপর যখন সে এটাকে সাপের মতো ছুটাছুটি করতে দেখল, তখন সে পিছনের দিকে ছুটতে লাগল এবং ফিরে তাকাল না।"

অর্থাৎ লাঠিটা ভয়ঙ্কর দাঁত বিশিষ্ট বড় এক অজগরে পরিণত হল। আবার এটা সাপের মতো দ্রুত ছুটাছুটি করতে লাগল। আয়াতে উল্লিখিত جَانٌّ শব্দটি جَنَانٌّ রূপেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে এটা খুবই সূক্ষ্ম কিন্তু অতি চঞ্চল ও দ্রুতগতিসম্পন্ন। এটার মধ্যে স্থূলতা ও তীব্র গতি লক্ষ করে মূসা আ. পিছনে ছুটতে লাগলেন। কেননা তিনি

মানবপ্রকৃতিতেই গড়া আর মানবপ্রকৃতি তা-ই চায়। তিনি আর কোনো দিকে দেখলেন না। তখন তাঁর প্রতিপালক তাঁকে আহবান করলেন, হে মূসা! সামনে অগ্রসর হও, তুমি ভয় করবে না, তুমি নিরাপদ। যখন মূসা আ. ফিরে আসলেন, তখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে সাপটি ধরার জন্যে নির্দেশ দিলেন। বললেন, এটাকে ধর, ভয় করো না, এটাকে আমি পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিব। কথিত আছে, মূসা আ. অত্যন্ত ভয় পেয়েছিলেন। তাই তিনি পশমের কাপড়ের আস্তিনে নিজের হাত রাখলেন। এরপর নিজের হাত সাপের মুখে রাখলেন। অবশ্য কিতাবীদের মতে সাপের লেজে হাত রেখেছিলেন। যখন তিনি এটাকে মজবুত করে ধরলেন, তখন এটা পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসল এবং দুই শাখাবিশিষ্ট পূর্বেকার লাঠিতে পরিণত হল। সুতরাং মহাশক্তিশালী এবং দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের নিয়ন্তা পাক-পবিত্র। এরপর আল্লাহ তাআলা তাঁর হাত তাঁর বগলে রাখার এবং তা বের করতে হুকুম দিলেন। অকস্মাৎ তা চাঁদের মতো শুভ্র-সমুজ্জ্বল হয়ে চক চক করতে লাগল। অথচ এটা কোনো রোগের কারণ নয়; এটা শ্বেত রোগের কারণে নয় বা অন্য কোনো চর্মরোগের কারণেও নয়।

এজন্য আল্লাহ তাআলা সূরা কাসাস ইরশাদ করেন :

اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ

"তোমার হাত তোমার বগলে রাখ, এটা বের হয়ে আসবে শুভ্র-সমুজ্জ্বল নির্দোষ হয়ে। ভয় দূর করার জন্যে তোমার হাত দুটি নিজের দিকে চেপে ধর।"

(সূরা কাসাস : ৩২)

কেউ কেউ বলেন, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, যখন তোমার ভয় করবে তোমার হাত তোমার হৃৎপিণ্ডের উপর রাখবে, তা হলে প্রশান্তি লাভ করবে। এ আমলটা যদিও বিশেষভাবে তার জন্যেই ছিল, কিন্তু এটার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে তাতে যে বরকত হবে তা যথার্থ। কেননা যে ব্যক্তি নবীদের অনুসরণের নিয়তে এটা আমল করবে, সে উপকার পাবে।

আল্লাহ তাআলা এ সম্পর্কে ইরশাদ করেন :

وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ
وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ

"এবং তোমার হাত তোমার বগলে রাখ। এটা বের হয়ে আসবে শুভ্র নির্মল অবস্থায়। এটা ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের কাছে আনীত নয়টি নিদর্শনের অন্তর্গত। তারা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।" (সূরা নামল : ১২)

অন্য কথায় লাঠি ও হাত দুটি নিদর্শন। যার দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তাআলা সূরায়ে কাসাসে ইরশাদ করেন :

فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ

"এ দুটি তোমার প্রতিপালক প্রদত্ত প্রমাণ, ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গের জন্যে। ওরা তো ছিল সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।" (সূরা কাসাস : ৩২)

এ দুটির সাথে রয়েছে আরো সাতটি। তা হলে মোট হবে নয়টি নিদর্শন। সূরা বনি ইসরাইলে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا (١٠١) قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا

"তুমি বনি ইসরাইলকে জিজ্ঞাসা করে দেখ, আমি মূসাকে নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছিলাম। যখন সে তাদের নিকট এসেছিল, ফেরাউন তাকে বলেছিল– হে মূসা! আমি মনে করি, তুমি তো জাদুগ্রস্ত। মূসা বলেছিল, তুমি অবশ্যই অবগত আছ, এ সমস্ত স্পষ্ট নিদর্শন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালকই অবতীর্ণ করেছেন– প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ। হে ফেরাউন! আমি তো দেখছি তোমার ধ্বংস আসন্ন।"

(বনি ইসরাইল : ১০১-১০২)

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (١٣٠) فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (١٣١) وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (١٣٢) فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ

"আমি তো ফেরাউনের অনুসারীদেরকে দুর্ভিক্ষ ও ফল-ফসলের ক্ষতি দ্বারা আক্রান্ত করেছি, যাতে তারা অনুধাবন করে। যখন তাদের কোনো কল্যাণ হত, তারা বলত– এটা আমাদের প্রাপ্য আর যখন তাদের কোনো অকল্যাণ হত, তখন তারা মূসা ও তার সঙ্গীদেরকে অলক্ষুণে গণ্য করত। শোন, তাদের অকল্যাণ আল্লাহর নিয়ন্ত্রাণাধীন, কিন্তু তাদের অধিকাংশ এটা জানে না। তারা বলল, আমাদেরকে জাদু করার জন্য তুমি যে কোনো নিদর্শন আমাদের নিকট পেশ কর না কেন, আমরা তোমাকে বিশ্বাস করব না। এরপর আমি তাদেরকে প্লাবন, পঙ্গপাল, উকুন ও রক্ত দ্বারা ক্লিষ্ট করি। এগুলো স্পষ্ট নিদর্শন কিন্তু তারা দাম্ভিকই রয়ে গেল। আর তারা ছিল এক অপরাধী সম্প্রদায়।"

(সূরা আরাফ : ১৩০-১৩৩)

এ হল নয়টি নিদর্শন। এ ছাড়া আরও দশটি নিদর্শন রয়েছে। এ নয়টি হল আল্লাহ তাআলার কুদরত সম্পর্কীয় আর অন্য দশটি আল্লাহ প্রদত্ত শরিয়ত বিষয়ক বাণী সম্পর্কিত। বলা বাহুল্য অনেক বর্ণনাকারীই এ ব্যাপারে বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। তাঁরা ধারণা করেন, এ নয়টিই হয়ত উক্ত দশটির অন্তর্ভুক্ত। সূরা বনি ইসরাঈলের শেষাংশের তাফসিরে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। বস্তুত আল্লাহ তাআলা যখন মূসা আ.-কে ফেরানের কাছে যাওয়ার জন্যে নির্দেশ দিলেন- যেমন কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে :

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (٣٣) وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ (٣٤) قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ (٣٥)

"মূসা বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো তাদের একজনকে হত্যা করেছি। ফলে আমি আশঙ্কা করছি, তারা আমাকে হত্যা করবে। আমার ভাই হারূন আমার চাইতে অধিকতর বাগ্মী। অতএব তাকে আমার সাহায্যকারীরূপে প্রেরণ কর, সে আমাকে সমর্থন করবে। আমি আশঙ্কা করছি, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দেবে। আল্লাহ বললেন, আমি তোমার ভাইয়ের দ্বারা তোমার বাহু শক্তিশালী করব এবং তোমাদের উভয়কে প্রাধান্য দান করব। তারা তোমাদের কাছে পৌঁছতে পারবে না। তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরা আমার নিদর্শন বলে তাদের উপর প্রবল হবে।

(সূরা কাসাস : ৩৩-৩৫)

অন্য কথায় আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দা, রাসূল ও কালিমুল্লাহ মূসা আ. সম্পর্কে জানিয়ে দিচ্ছেন, মূসা আ. আল্লাহর শত্রু ফেরাউনের জুলুম ও অত্যাচার থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য মিসর ত্যাগ করেছিলেন। কেননা তিনি অনিচ্ছাকৃত ভুলক্রমে এক কিবতীকে হত্যা করেন নি। সুতরাং আল্লাহ তাআলা যখন মূসা আ.-কে এভাবে ফেরাউনের কাছে যেতে হুকুম দিলেন, তখন মূসা আ. উত্তরে বলেন :

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (٣٣) وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ

"হে আল্লাহ! আমার ভাইকে আমার সাহায্যকারী, সমর্থনকারী ও উযিররূপে নিযুক্ত করুন; যাতে সে আমাকে আপনার রিসালাত পরিপূর্ণভাবে তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে সাহায্য করতে পারে, সে আমার চেয়েও বাগ্মী এবং বর্ণনার ক্ষেত্রে আমার থেকে অধিকতর সমর্থ।"

তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিতে উত্তরে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ

"আমার নিদর্শন তোমাদের কাছে থাকার দরুন তারা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।' কেউ কেউ বলেন, আমার নিদর্শনগুলোর বরকতে তারা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরা আমার নিদর্শন বলে তাদের ওপর প্রবল হবে। সূরায়ে তহায় ইরশাদ হচ্ছে :

اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (٢٤) قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (٢٥) وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي (٢٦) وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي (٢٧) يَفْقَهُوا قَوْلِي

"তুমি ফেরাউনের কাছে যাবে, সে সীমালঙ্ঘন করেছে। মূসা আ. বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও এবং আমার কর্ম সহজ করে দাও। আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও। যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।"

(সূরা তহা : ২৪-২৮)

কথিত আছে, মূসা আ. বাল্যকালে ফেরাউনের দাড়ি ধরেছিলেন। তাই ফিরআউন তাঁকে হত্যা করতে মনস্থ করেছিল। এতে আসিয়া আ. ভীত হয়ে পড়লেন এবং ফেরাউনকে বললেন, মূসা শিশুমাত্র। ফেরাউন মূসা আ.-এর সামনে খেজুর ও কাঠের অঙ্গার রেখে মূসা আ.-এর জ্ঞান-বুদ্ধি পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল। মূসা আ. খেজুর ধরতে উদ্যত হন, তখন ফেরেশতা এসে তাঁর হাত অঙ্গারের দিকে ফিরিয়ে দিলেন। তখন তিনি অঙ্গার মুখে পুরে দিলেন। অমনি তাঁর জিহবার কিছু অংশ পুড়ে যায় ও তাঁর জিহবায় জড়তার সৃষ্টি হয়। এরপর মূসা আ. আল্লাহ তাআলার কাছে এতটুকু জড়তা দূর করতে আবেদন করলেন, যাতে লোকজন তাঁর কথা বুঝতে পারে; তিনি পুরোপুরি জড়তা দূর করার জন্যে দরখাস্ত করেন নি।

হাসান বসরী রহ. বলেন, নবীগণ আল্লাহ তাআলার দরবারে প্রয়োজন মাফিক দরখাস্ত করে থাকেন। সে কারণে তাঁর জিহবায় তার কিছুটা প্রভাব রয়েই যায়। এজন্যে ফেরাউন বলত, এটা মূসার একটা বড় দোষ। এ জন্য মূসা নিজের বক্তব্য স্পষ্ট করে বলতে পারে না; তার মনের কথা উত্তমরূপে বিশ্লেষণ করে প্রকাশ করতে পারে না।

সূরা তহায় আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي (٢٩) هَارُونَ أَخِي (٣٠) اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي (٣١) وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي (٣٢) كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا (٣٣) وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا (٣٤) إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا (٣٥) قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى

"আমার জন্যে করে দাও একজন সাহায্যকারী আমার স্বজনবর্গের মধ্য থেকে; আমার ভাই হারূনকে; তার দ্বারা আমার শক্তি সুদৃঢ় কর এবং তাকে আমার কার্যে

অংশীদার কর। যাতে আমরা তোমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে পারি প্রচুর এবং তোমাকে স্মরণ করতে পারি অধিক। তুমি তো আমাদের সম্যক দ্রষ্টা। তিনি বললেন : হে মূসা! তুমি যা চেয়েছ তোমাকে তা দেওয়া হল।" (সূরা ত-হা : ২৯-৩৬)

অন্য কথায় তুমি যা কিছুর আবেদন করেছ, আমি তা মনযুর করেছি। তুমি যা কিছু চেয়েছ তা তোমাকে দান করেছি। আর এটা হয়েছে আপন প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার দরবারে তাঁর বিশিষ্ট মর্যাদার কারণে। তিনি তাঁর ভাইয়ের প্রতি ওহী প্রেরণের জন্যে সুপারিশ করায় আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি ওহি প্রেরণ করেন। এটা একটা বড় মর্যাদা। যেমন সূরায়ে আহযাবে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا

"আল্লাহর নিকট সে মর্যাদাবান।" (সূরা আহযাব : ৬৯)

সূরা মারইয়ামে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا

"আমি নিজ অনুগ্রহে তাকে দিলাম তার ভাই হারূনকে নবীরূপে।" (সূরা মারইয়াম : ৫৩)

একবার উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দিকা রাযি. এক ব্যক্তিকে তার সম্প্রদায়ের লোকদের প্রশ্ন করা শুনতে পেলেন। তারা সকলে হজের জন্যে সফররত ছিলেন। প্রশ্নটি হল, কোন ভাই তাঁর নিজের ভাইয়ের প্রতি সর্বাধিক ইহসান করেছেন? সম্প্রদায়ের লোকেরা নীরব রইল, তখন আয়েশা রাযি. তাঁর হাওদার পাশের লোকদের বললেন, তিনি ছিলেন মূসা আ. ইবনে ইমরান। তিনি যখন আপন ভাইয়ের নবুয়ত প্রাপ্তির সুপারিশ করেন, তখন তা আল্লাহ তাআলার দরবারে মঞ্জুর হয় এবং আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি ওহি নাযিল করেন।

আল্লাহ তাআলা এ সম্পর্কে সূরা শুআরায় ইরশাদ করেন :

وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (١٠) قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ (١١) قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ (١٢) وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ (١٣) وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (١٤) قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ (١٥) فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦) أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ (١٧) قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ (١٨) وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ (١٩)

"স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক মূসাকে ডেকে বললেন, তুমি জালেম সম্প্রদায়ের কাছে যাও– ফেরাউন সম্প্রদায়ের নিকট; ওরা কি ভয় করে না? তখন সে বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! আমি আশঙ্কা করি, ওরা আমাকে অস্বীকার করবে

এবং আমার হৃদয় সঙ্কুচিত হয়ে পড়বে, আমার জিহবা তো সচল নয়। সুতরাং হারূনের প্রতিও প্রত্যাদেশ পাঠান! আমার বিরুদ্ধে তো ওদের একটি অভিযোগ রয়েছে, আমি আশঙ্কা করি তারা আমাকে হত্যা করবে। আল্লাহ্ বললেন : না, কখনই নয়। অতএব তোমরা উভয়ে আমার নিদর্শনসহ যাও, আমি তো তোমাদের সাথে রয়েছি শ্রবণকারী। সুতরাং তোমরা উভয়ে ফেরাউনের কাছে যাও এবং বল, 'আমরা তো জগতসমূহের প্রতিপালকের রাসূল আর আমাদের সাথে যেতে দাও বনি ইসরাঈলকে।' ফেরাউন বলল, আমরা কি তোমাকে শৈশবে আমাদের মধ্যে লালন-পালন করি নি? তুমি তো তোমার জীবনের বহু বছর আমাদের মধ্যে কাটিয়েছ। তুমি তোমার কর্ম যা করার তা করেছ; তুমি অকৃতজ্ঞ।" (সূরা শুআরা : ১০-১৯)

মোটকথা, তাঁরা দুজন ফেরাউনের নিকট গমন করলেন এবং তাকে উপর্যুক্ত কথা বললেন। সেইসাথে তাদেরকে যা কিছু সহকারে প্রেরণ করা হয়েছিল, তার কাছে তাঁরা তা পেশ করলেন। তাঁরা তাকে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর ইবাদত করা এবং বনি ইসরাঈলদেরকে তার কর্তৃত্ব ও নির্যাতন থেকে মুক্ত করার আহবান করলেন। যাতে তারা যেখানেই ইচ্ছে গিয়ে আল্লাহর ইবাদত করতে, নিরঙ্কুশভাবে আল্লাহ্ তাআলার একত্ব স্বীকার করতে, আল্লাহ্ তাআলাকে একাগ্রচিত্তে ডাকতে এবং আপন প্রতিপালকের কাছে অনুনয়-বিনয় করে নিজেদের ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে পারেন। কিন্তু এতে ফেরাউন দাম্ভিকতার আশ্রয় নিল এবং জুলুম ও সীমালঙ্ঘন করল। সে মূসা আ.-এর দিকে তাচ্ছিল্যের নজরে তাকিয়ে বলতে লাগল, 'তুমি কি আমাদের মাঝে বাল্যকালে লালিত-পালিত হও নি? আমরা কি তোমাকে আমাদের ঘরে পুত্রের মত লালন-পালন করি নি? তোমার প্রতি ইহসান করি নি? এবং একটি নির্দিষ্ট মুহূর্ত পর্যন্ত তোমার প্রতি অনুগ্রহ করি নি?

ফেরাউনের কথার দ্বারা বোঝা যায়, যে ফেরাউনের কাছে মূসা আ.-কে নবীরূপে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং যে ফেরাউন থেকে মূসা আ. পলায়ন করেছিলেন, সে একই ব্যক্তি। আহলে কিতাবরা মনে করে, যে ফেরাউনের কাছ থেকে মূসা আ. পলায়ন করেছিলেন তিনি মাদায়েনে অবস্থানকালে সে ফেরাউন মারা গিয়েছিল। আর যে ফেরাউনের কাছে মূসা আ.-কে নবীরূপে প্রেরণ করা হয়েছিল, সে ছিল অন্য লোক।

আয়াতাংশ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ এর অর্থ হচ্ছে– তুমি কিবতি লোকটিকে হত্যা করেছ; আমাদের থেকে পলায়ন করেছ এবং আমাদের অনুগ্রহের প্রতি অস্বীকৃতি জানিয়েছ।

মূসা আ. প্রতি উত্তরে বলেন :

قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ (٢٠) فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ

"মূসা বলল, 'আমি যখন এটা করেছিলাম, তখন যখন আমি ছিলাম অজ্ঞ।' অর্থাৎ আমার কাছে ওহি অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আমি এটা করেছিলাম। এরপর আমি যখন তোমাদের ভয়ে ভীত ছিলাম, তখন আমি তোমাদের কাছ থেকে পলায়ন করলাম। তারপর আমার প্রতিপালক আমাকে জ্ঞান দান করেছেন এবং আমাকে রাসূলরূপে মনোনীত করেছেন।" (সূরা শুআরা : ১৯-২১)

মূসা আ. আরো বললেন :

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (٢٢) قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ (٢٣) قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ (٢٤) قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ (٢٥) قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (٢٦) قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ (٢٧) قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ

"আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করছ, তা তো এই যে, তুমি বনি ইসরাঈলকে দাসে পরিণত করেছ। (তুমি যে উল্লেখ করেছ, তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছ অথচ আমি বনি ইসরাঈলের একজন, আর এর পরিবর্তে তুমি গোটা একটা সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণরূপে আপন কাজে নিযুক্ত রেখেছ এবং তাদেরকে তোমার খেদমত করার কাজে দাসে পরিণত করে রেখেছ।) ফেরাউন বলল, 'জগতসমূহের প্রতিপালক আবার কী?' মূসা বলল, তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক, যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও। ফেরাউন তার পরিষদবর্গকে লক্ষ্য করে বলল, তোমরা শুনছ তো? মূসা বলল, তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষগণেরও প্রতিপালক। ফেরাউন বলল, তোমাদের প্রতি প্রেরিত তোমাদের রাসূলটি তো নিশ্চয়ই পাগল। মূসা বলল, তিনি পূর্ব-পশ্চিমের এবং এদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক যদি তোমরা বুঝতে।" (সূরা শুআরা : ২২-২৮)

ফেরাউন ও মূসা আ.-এর মধ্যে যে সব কথোপকথন, যুক্তিতর্কের অবতারণা ও বাদ-প্রতিবাদ হয়েছিল এবং মূসা আ. ফেরাউনের বিরুদ্ধে যেসব বুদ্ধিবৃত্তিক ও দৃষ্টিগ্রাহ্য যুক্তি-প্রমাণের অবতারণা করছিলেন; আল্লাহ তাআলা তার উল্লেখ করে বলেছেন, ফেরাউন মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলাকে অস্বীকার করেছিল। দাবি করেছিল, সে নিজেই মাবুদ ও উপাস্য। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

فَحَشَرَ فَنَادَى (٢٣) فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى (٢٢)

সে সকলকে সমবেত করল এবং উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করল, আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক।" (সূরা নাযিআত : ২৩-২৪)

অন্যত্র ইরশাদ করেছেন :

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي (٣٧)

"ফেরাউন বলল, হে পরিষদবর্গ! আমি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ আছে বলে আমি জানি না।" (সূরা কাসাস : ৩৮)

উপর্যুক্ত বক্তব্য উচ্চারণকালে সে জেনে-শুনেই গোয়ার্তুমি করেছে। কেননা সে স্পষ্ট জানত, সে নেহাৎ একজন গোলাম, আর আল্লাহই হচ্ছেন সৃজনকর্তা, উদ্ভাবন কর্তা, রূপদাতা, প্রকৃত উপাস্য। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (١٤)

"তারা অন্যায় ও ঔদ্ধত্যভাবে নিদর্শনগুলো প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর এগুলোকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। দেখ, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কী হয়েছিল?" (সূরা নামল : ১৪)

তাই সে মূসা আ.-এর রিসালাতকে অস্বীকার এবং তাঁকে রিসালাত প্রদানকারী কোনো প্রতিপালকই নেই দাবি করে বলেছিল, وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ অর্থাৎ জগতসমূহের প্রতিপালক আবার কে? কেননা তাঁরা দুজন [মূসা আ. ও হারুন আ.] তাকে বলেছিলেন, إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমরা জগতসমূহের প্রতিপালকের প্রেরিত রাসূল।' (সূরা শুআরা : ১৬) যেন তাদের দুজনকে বলছিল, তোমরা ধারণা করছ, জগতসমূহের প্রতিপালক তোমাদেরকে প্রেরণ করেছেন, এরূপ প্রতিপালক আবার কে? জবাবে মূসা আ. বলেছিলেন :

رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ

"জগতসমূহের প্রতিপালক এসব দৃশ্যমান আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর এবং এগুলোর মধ্যে যেসব সৃষ্টি বিদ্যমান রয়েছে, যেমন– মেঘ, বাতাস, বৃষ্টি, তৃণলতা, জীব-জন্তু ইত্যাদি সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। প্রতিটি বিশ্বাসী লোক জানে, এগুলি নিজে নিজে সৃষ্টি হয় নি; এদের একজন সৃষ্টিকর্তা অবশ্যই আছেন আর তিনিই হচ্ছেন আল্লাহ্ তাআলা। তিনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই; তিনিই জগতসমূহের প্রতিপালক। ফেরাউন তার আশে-পাশে উপবিষ্ট উজির-নাজির ও আমীর-উমারাকে মূসা আ.-এর সুপ্রমাণিত রিসালাত অবমাননা এবং খোদ মূসা আ.-কে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করার লক্ষ্যে বলল, তোমরা কি মূসার অযৌক্তিক কথাবার্তা শুনছ? মূসা আ. তখন তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন,

رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ

অর্থাৎ তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের পূর্বে তোমাদের বাবা, দাদা ও অতীতের সমস্ত সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করেছেন। কেননা প্রত্যেকেই জানে, সে নিজে নিজে সৃষ্টি হয় নি; তার পিতামাতা কেউই নিজে নিজে সৃষ্টি হয় নি। অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা ছাড়া কোনো কিছুই সৃষ্টি হয় নি। এবং প্রত্যেককেই জগতসমূহের প্রতিপালক সৃষ্টি করেছেন। এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে :

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ

"আমি ওদের জন্যে আমার নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করব বিশ্বজগতে এবং ওদের নিজেদের মধ্যে। ফলে ওদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে, এটাই সত্য।"

(সূরা হামীম সেজদা : ৫৩)

এসব নিদর্শন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠা সত্ত্বেও ফেরাউন তার গাফলতের নিদ্রা থেকে জাগল না। এবং নিজেকে পথভ্রষ্টতা থেকে বের করল না। বরং সে তার স্বেচ্ছাচারিতা, অবাধ্যতা ও পথভ্রষ্টতায় অটল রইল। অধিকন্তু মন্তব্য করল : "নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে প্রেরিত রাসূলটি পাগল।"

قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ

মূসা বলল, তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের এবং এগুলোর মধ্যবর্তী সব কিছুর প্রতিপালক যদি তোমরা বুঝতে। (সূরা শুআরা : ২৭-২৮)

তিনিই এসব উজ্জ্বল নক্ষত্রকে অনুগত করেছেন এবং ঘূর্ণায়মান কক্ষপথে এগুলোকে আবর্তিত করছেন। তিনিই অন্ধকার ও আলোর সৃষ্টিকর্তা, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক। সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, উপগ্রহ, চলন্ত ও স্থির তারকারাজির সৃজনকর্তা; রাতকে অন্ধকারসহ এবং দিনকে আলোসহ সৃষ্টিকারী; সবকিছু তাঁরই অধীনে, নিয়ন্ত্রণে ও এখতিয়ারে চলছে এবং নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণরত। সব সময়ই একে অন্যকে অনুসরণ করছে এবং নিজ নিজ কক্ষপথে ঘুরে চলেছে। সুতরাং তিনিই মহান সৃষ্টিকর্তা, মালিক, নিজ ইচ্ছেমাফিক আপন মাখলুকের কর্মকাণ্ডে হস্তক্ষেপকারী।

মোটকথা, এভাবে যখন ফেরাউনের বিরুদ্ধে দলিল-প্রমাণাদি পেশ করা হল, তার সন্দেহ দূরীভূত হল এবং হঠকারিতা ছাড়া তার কোনো যুক্তিই অবশিষ্ট রইল না, তখন সে জোর-জবরদস্তি ও ক্ষমতা প্রয়োগের কৌশল গ্রহণ করল। যেমন ইরশাদ হয়েছে :

قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ

"ফেরাউন বলল : তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে ইলাহরূপে গ্রহণ কর, আমি তোমাকে অবশ্যই কারারুদ্ধ করে রাখব।"

মূসা আ. প্রতি উত্তরে বলেন, قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ –"আমি তোমার নিকট স্পষ্ট কোনো নিদর্শন নিয়ে আসলেও?"

ফেরাউন বলল, قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ –"তুমি যদি সত্যবাদী হও, তবে তা উপস্থিত কর!"

আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন :

فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ (٣٢) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ

"এরপর মূসা তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করলে তৎক্ষণাৎ তা এক সাক্ষাৎ অজগর হয়ে গেল এবং মূসা হাত বের করল আর তৎক্ষণাৎ তা দর্শকদের দৃষ্টিতে শুভ্র উজ্জ্বল প্রতিভাত হল।" (সূরা শুআরা : ২৮-৩৩)

এ দুটি স্পষ্ট নিদর্শন যদ্বারা আল্লাহ তাআলা মূসা আ. ও হারূন আ.-কে শক্তিশালী করেছিলেন। নিদর্শন দুটি হচ্ছে লাঠি ও হাত। সকল মানবীয় জ্ঞান ও দৃষ্টি দুটি মুজিযার কাছে হার মেনে গেল। যখন তিনি হাত থেকে লাঠি নিক্ষেপ করলেন, তখন এটা বিরাট আকারের অত্যাশ্চর্য মোটা ভয়ঙ্কর ও বিস্ময়কর সাপে পরিণত হল। এমনকি কথিত আছে, ফেরাউন সাপটিকে দেখার পর এতই ভীত ও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল, তৎক্ষণাৎ তার দাস্ত হতে লাগল; একদিনেই তার চল্লিশ বার দাস্ত হল। অথচ এর পূর্বে সে চল্লিশ দিনে একবার পায়খানায় যেত।

অনুরূপভাবে যখন মূসা আ. তাঁর হাতটি নিজ বগলে রাখলেন এবং বের করলেন, তখন তা চাঁদের একটি টুকরার মতো সমুজ্জ্বল হয়ে বের হয়ে আসল। আর এমন আলো বিচ্ছুরিত করতে লাগল, যা চোখকে একেবারে ঝলসে দেয়। পুনরায় যখন হাত বগলের মধ্যে স্থাপন করলেন, তখন তা পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসল। কিন্তু এসব নিদর্শন দেখার পরও ফেরাউন এর থেকে কোনোভাবেই উপকৃত হল না। বরং সে যে অবস্থায় ছিল, সে অবস্থায়ই রয়ে গেল। সে বলতে লাগল, এসব জাদু ছাড়া অন্য কিছু নয়। তাই সে জাদুকরদের দ্বারা মূসা আ.-এর মোকাবেলা করার ইচ্ছায় তার রাজ্যের বিভিন্ন এলাকার সমস্ত জাদুকরের মাধ্যমে মূসা আ.-এর মোকাবেলা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করল। এরপর সে লোক পাঠিয়ে সমগ্র রাজ্যের তার নিয়ন্ত্রণাধীন জাদুকরদের সমবেত করল। এতে ফেরাউন, তার পরিষদবর্গ, আমীর-উমারা ও অনুসারীদের কাছে আল্লাহ তাআলার অসীম কুদরত, ক্ষমতা ও নিদর্শন প্রকাশ পেয়েছিল। আল্লাহ তাআলা সূরা তহায় ইরশাদ করেন :

فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى (٤٠) وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي (٤١) اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي (٤٢) اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (٤٣) فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى (٤٤) قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى (٤٥) قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى

"তুমি কয়েক বছর মাদায়েনবাসীর মধ্যে ছিলে হে মূসা! এর পরে তুমি নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলে এবং আমি তোমাকে আমার নিজের জন্য প্রস্তুত করিয়ে নিয়েছি। তুমি ও তোমার ভাই আমার নিদর্শনসহ যাত্রা কর এবং আমার স্মরণে শৈথিল্য করবে না। তোমরা দুজন ফেরাউনের কাছে যাও, সে তো সীমালঙ্ঘন করেছে। তোমরা তার সাথে নম্র কথা বলবে, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে। তারা বলল,

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আশঙ্কা করি সে আমাদের উপর বাড়াবড়ি করবে অথবা অন্যায় আচরণে সীমালঙ্ঘন করবে। তিনি বললেন, "তোমরা ভয় করবে না, আমি তো তোমাদের সঙ্গে আছি, আমি শুনি ও দেখি।" (সূরা তহা : ৪০-৪৬)

তারপর আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়ে বলেন :

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

তোমরা তার সাথে নম্র কথা বলবে; হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে।" (সূরা তহা : ৪৩)

ফেরাউনের কুফুরি জুলুম ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারটি আল্লাহ তাআলার জানা থাকা সত্ত্বেও তার সাথে নম্রভাবে কথা বলার নির্দেশ, বস্তুত মাখলুকের প্রতি আল্লাহ তাআলার পরম রহমত, বরকত, মেহেরবানী, নম্রতা ও ধৈর্যশীলতার প্রমাণ। ফেরাউন ছিল তখনকার যুগে আল্লাহ তাআলার নিকৃষ্টতম সৃষ্টি। অথচ আল্লাহ তাআলা ওই যমানার শ্রেষ্ঠতম মনোনীত ব্যক্তিত্বকে তার হেদায়েতের জন্যে তার কাছে প্রেরণ করেন। তথাপি তিনি মূসা আ. ও হারুন আ.-কে নম্র ভাষায় তাকে আল্লাহর পথে আহবান করার জন্যে নির্দেশ দেন। আবার তাদের দুজনকে তার সাথে এমন ব্যবহার করার জন্যে নির্দেশ দেন, যেমনটি হলে কারো পক্ষে উপদেশ গ্রহণ কিংবা ভয় করার সম্ভাবনা আছে।

এভাবে আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উদ্দেশ্যে ইরশাদ করেন :

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

"তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহবান কর হেকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে তর্ক করবে উত্তম পন্থায়।" (সূরা নাহল : ১২৫)

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র ইরশাদ করেন :

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ

"তোমরা উত্তম পন্থা ছাড়া কিতাবীদের সাথে বিতর্ক করবে না তবে তাদের সাথে করতে পার, যারা তাদের মধ্যে সীমালঙ্ঘনকারী।" (সূরা আনকাবুত : ৪৬)

হাসান বসরী রহ. বলেন : فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا আয়াতাংশের মাধ্যমে ফেরাউনের প্রতি বিশেষ বিবেচনা প্রদর্শনার্থে বলা হয়েছে– তোমরা দুজনে তাকে বলবে, তোমার রয়েছেন একজন প্রতিপালক, তোমার জন্যে রয়েছে মৃত্যুর পরে পুনরুত্থান এবং তোমার সামনে রয়েছে বেহেশত-দোযখ।

ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ রহ. বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে তোমরা দুজন তাকে বলে দাও, শাস্তি ও রোষের তুলনায় আমি আল্লাহর ক্ষমা ও দয়ার অধিকতর নিকটবর্তী। কিন্তু তারা যে বললেন,

قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আশঙ্কা করি সে আমাদের উপর বাড়াবাড়ি করবে অথবা অন্যায় আচরণে সীমালঙ্ঘন করবে।" (সূরা তহা : ৪৫)

এর কারণ ফেরাউন ছিল অত্যাচারী, অনমনীয়, শয়তান ও সীমালঙ্ঘনকারী। মিসরে তার শক্তি ছিল দুর্দম। সে ছিল অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং বিরাট ক্ষমতা ও সৈন্য-সামন্তের অধিকর্তা। তাই মানবীয় চরিত্রের দরুন তাঁরা দুজনই তার ব্যাপারে ভীত হলেন এবং প্রকাশ্যত তাদের উপর সে হামলা করতে পারে এরূপ আশঙ্কা করছিলেন। সুতরাং আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দৃঢ় থাকতে অনুপ্রাণিত করে বলেন, "তোমরা ভয় করবে না, আমি তোমাদের সাথে রয়েছি; আমি শুনি ও দেখি।"

অন্য এক আয়াতেও বলেন, إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ –"আমি তোমাদের সাথে শ্রবণকারী।"

এরপর সূরা তহায় ইরশাদ হচ্ছে :

فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى (٤٧) إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى

"সুতরাং তোমরা তার নিকট যাও এবং বল, আমরা তোমার প্রতিপালকের রাসূল। সুতরাং আমাদের সাথে বনি ইসরাঈলকে যেতে দাও এবং তাদেরকে কষ্ট দিও না, আমরা তো তোমার নিকট এনেছি তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে নিদর্শন এবং শান্তি তাদের প্রতি যারা অনুসরণ করে সৎপথ। আমাদের প্রতি ওহি প্রেরণ করা হয়েছে, শাস্তি তার জন্যে যে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়।" (সূরা তহা : ৪৭-৪৮)

উপর্যুক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁদের দুজনকে ফেরাউনের কাছে গমন, তাকে এক অদ্বিতীয় আল্লাহ তাআলার ইবাদত করা, বনি ইসরাইলকে তার কয়েদ ও নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি দানের আহ্বান জানাতে নির্দেশ করেন। সেই সঙ্গে তাঁদের প্রতিপালকের তরফ থেকে মহানিদর্শন নিয়ে এবং সত্য অস্বীকৃতির মন্দ পরিণতি সম্পর্কে হুঁশিয়ারি দিয়ে বললেন, আমাদের কাছে ওহি এসেছে, শাস্তি ওই ব্যক্তির জন্যে, যে সত্যকে অন্তর দিয়ে অবিশ্বাস করে এবং কার্যত তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

আলেমগণ বলেন, মূসা আ. যখন মাদায়েন থেকে প্রত্যাবর্তন করে আপন মাতা ও ভাই হারূনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তখন তাঁরা রাতের খাবার খাচ্ছিলেন। খাবারের মধ্যে ছিল শালগম। তিনি তাঁদের সাথে তা খেলেন। তারপর তিনি বললেন, "হে হারূন! আল্লাহ তাআলা আমাকে ও তোমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন আমরা ফেরাউনকে আল্লাহ তাআলার ইবাদতের দিকে আহবান করি। সুতরাং তুমি আমার সাথে চল।" তখন তারা দুজনেই ফেরাউনের মহলের উদ্দেশে রওনা হলেন। তাঁরা দরজা বন্ধ পেলেন। মূসা

আ. দারোয়ানদের বললেন, তোমরা ফেরাউনের কাছে সংবাদ নিয়ে যাও, আল্লাহর রাসূল তার দরজায় উপস্থিত। দারোয়ানরা মূসা আ.-কে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে লাগল।

কেউ কেউ বলেছেন, ফেরাউন তাঁদেরকে দীর্ঘক্ষণ পর প্রবেশ করার অনুমতি দিয়েছিল। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক রহ. বলেন, দুবছর পর তাদেরকে ফেরাউন অনুমতি দিয়েছিল। কেননা কেউ অনুমতি আনার জন্যে যেতে সাহস পায় নি। আল্লাহই সম্যক অবগত। এরূপও কথিত আছে, মূসা আ. দরজার দিকে অগ্রসর হয়ে লাঠি দ্বারা দরজায় আঘাত করেন। এতে ফেরাউন ভীষণ বিব্রত বোধ করল এবং তাদেরকে উপস্থিত করার জন্যে নির্দেশ দিল। তাঁরা দুজনেই তার সম্মুখে দাঁড়ালেন এবং তাকে আল্লাহ তাআলার নির্দেশ মোতাবেক তাঁর মহান সত্তার ইবাদতের প্রতি আহবান করলেন। আল্লাহ তাআলা এ সম্পর্কে সূরা তহায় ইরশাদ করেন :

قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى (٤٩) قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى (٥٠) قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى (٥١) قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى (٥٢) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى (٥٣) كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى (٥٤) مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى

"ফেরাউন বলল, হে মূসা! কে তোমাদের প্রতিপালক? মূসা বলল, আমাদের প্রতিপালক তিনি যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার আকৃতি দান করেছেন, এরপর পথনির্দেশ করেছেন। ফেরাউন বলল, তা হলে অতীত যুগের লোকদের অবস্থা কী? মূসা বলল, এটার জ্ঞান আমার প্রতিপালকের কাছে কিতাবে রয়েছে; আমার প্রতিপালক ভুল করেন না এবং বিস্মৃতও হন না। যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বিছানা এবং এতে করে দিয়েছেন তোমাদের চলার পথ, তিনি আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন এবং আমি তা দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উৎপন্ন করি। তোমরা আহার কর ও তোমাদের গবাদি পশু চরাও; অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে বিবেকসম্পন্নদের জন্য। আমি মাটি থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তাতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেব এবং তা থেকে আবার তোমাদেরকে বের করব।" (সূরা তহা : ৪৯-৫৫)

ফেরাউন মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে বলল, "হে মূসা! তোমার প্রতিপালক কে?" মূসা আ. প্রতিউত্তরে বলেন, আমাদের প্রতিপালক সমগ্র মাখলুক সৃষ্টি করেছেন, তাদের আমল, রিযিক ও মৃত্যুর সময় নির্ধারণ করেছেন। আর এগুলো তাঁর কাছে সংরক্ষিত কিতাবে বা লাওহে মাহফূযে লিখে রেখেছেন। এরপর প্রতিটি সৃষ্টিকে তার জন্যে নির্ধারিত বিষয় বস্তুর প্রতি পথনির্দেশ করেছেন। প্রত্যেক

মাখলুকের আমল আল্লাহ তাআলার পরিপূর্ণ ইলম, কুদরত ও তাকদির অনুযায়ী ঘটে থাকে। অন্য আয়াতে অনুরূপ ইরশাদ হচ্ছে :

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (٢) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى

"তুমি তোমার সুমহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। যিনি সৃষ্টি করেন ও সুঠাম করেন এবং যিনি পরিমিত বিকাশ সাধন করেন ও (মাখলুককে) সেদিকে পথনির্দেশ করেন।" (সূরা আলা : ১-৩)

ফেরাউন মূসা আ.-কে বলেছিল, "যদি তোমার প্রতিপালক সৃজনকর্তা, পরিমিত বিকাশকারী, মাখলুককে তার নির্ধারিত পথে পথ-প্রদর্শনকারী হয়ে থাকেন এবং তিনি ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্য না হয়ে থাকেন, তবে পূর্বেকার যুগের লোকেরা কেন তাঁকে ছেড়ে অন্যদের ইবাদত করল? তুমি তো জান, পূর্বেকার যুগের লোকেরা তারকারাজি ও দেবদেবিকে আল্লাহর সঙ্গে শরিক করত। তা হলে তাদেরকে কেন তিনি তোমার উল্লিখিত সঠিক পথে পরিচালনা করলেন না? মূসা আ. বললেন, তারা যদিও আল্লাহ ছাড়া অন্যের উপাসনা করেছে, এটা তোমার পক্ষের বা আমার বিপক্ষের কোনো দলিল হতে পারে না। কেননা তারা তোমার মতো মূর্খতার শিকার হয়ে যে সব অপকর্ম করেছে, কিতাবসমূহে তাদের ছোট বড় সব আমলের কথা লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং আমার মহান প্রতিপালক তাদের শাস্তি দান করবেন। এক অণু পরিমাণ কারো ওপর তিনি জুলুম করবেন না। কেননা বান্দাদের সব আমলই তাঁর কাছে একটি লিপিতে লিপিবদ্ধ রয়েছে, কিছুই বাদ পড়বে না এবং আমার প্রতিপালক কিছুই বিস্মৃত হবেন না। এরপর মূসা আ. ফেরাউনের কাছে আল্লাহ তাআলার শ্রেষ্ঠত্ব, বস্তুসমূহ সৃষ্টির শক্তি, ভূমিকে বিছানারূপ, আকাশকে ছাদরূপে সৃষ্টি করার শক্তি রয়েছে –এর উল্লেখ করেন। বান্দা ও জীব-জন্তুর রিযিকের জন্যে মেঘ ও বৃষ্টিকে যে তিনি নিয়ন্ত্রণাধীনে রেখেছেন, এটাও তিনি উল্লেখ করেন। আল্লাহ তাআলার বাণী :

كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ

তোমরা আহার কর ও গবাদি পশু চারণ কর, অবশ্যই তাতে নিদর্শন রয়েছে সহজ-সরল বিশুদ্ধ বিবেক ও সুস্থ প্রকৃতিসম্পন্ন লোকদের জন্যে। সুতরাং আল্লাহ তাআলা তোমাদের ও তোমাদের পূর্ব পুরুষদের সৃষ্টিকর্তা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (٢١) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদত কর, যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা মুত্তাকি হতে পার। যিনি

পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আকাশকে ছাদ করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তা দিয়ে তোমাদের জীবিকার জন্য ফল-মূল উৎপাদন করেন। সুতরাং তোমরা জেনেশুনে কাউকেও আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করো না।" (সূরা বাকারা : ২১-২২)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى (٥٦) قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى (٥٧) فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى (٥٨) قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى (٥٩)

"আমি তো আমার সমস্ত নিদর্শন দেখিয়েছিলাম; কিন্তু সে মিথ্যা আরোপ করেছে ও অমান্য করেছে। সে বলল, হে মূসা! তুমি কি আমাদের কাছে এসেছ তোমার জাদু দ্বারা আমাদেরকে আমাদের দেশ হতে বের করে দেওয়ার জন্যে? আমরাও অবশ্যই তোমার কাছে উপস্থিত করব তদনুরূপ জাদু। সুতরাং আমাদের ও তোমার মধ্যে নির্ধারণ কর এক নির্দিষ্ট সময় ও এক মধ্যবর্তী স্থান, যার ব্যতিক্রম আমরাও করব না এবং তুমিও করবে না। মূসা বললেন, তোমাদের নির্ধারিত সময় উৎসবের দিন এবং যেদিন পূর্বাহ্নে জনগণকে সমবেত করা হবে।" (সূরা : তহা : ৫৬-৫৯)

উপর্যুক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা ফেরাউনের দুর্ভাগ্য এবং আল্লাহ তাআলার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন ও অমান্য করে তার পাপিষ্ঠ হওয়া ও নির্বুদ্ধিতার উল্লেখ করছেন। ফেরাউন মূসা আ.-কে বলেছিল, মূসা আ. যা কিছু নিয়ে এসেছেন, তার সবটাই জাদু। কাজেই সেও এরূপ জাদু দ্বারা মূসা আ.-এর মোকাবেলা করবে। এরপর মোকাবেলার জন্যে মূসা আ.-কে সে একটি নির্দিষ্ট সময় ও স্থান নির্ধারণ করতে বলল। অপরদিকে মূসা আ.-এরও উদ্দেশ্য ছিল, জনতার সামনে আল্লাহ তাআলার প্রদত্ত নিদর্শন, দলিল ও প্রমাণাদি প্রতিভাত করা। তাই তিনি বললেন : 'তোমাদের নির্ধারিত সময় হচ্ছে তোমাদের উৎসবের দিন, যেদিন তারা সাধারণত সমবেত হয়। সেদিন দিবসের প্রথমভাগে সূর্যের আলো প্রখর হওয়ার সময় জনগণকে সমবেত করা হবে, যাতে সত্য সুস্পষ্টভাবে জনগণের সামনে তুলে ধরা যায়।"

এ মোকাবেলা রাতের বেলায় হওয়ার জন্যে মূসা আ. বলেন নি। যাতে তাদের মধ্যে কোনো সন্দেহ উদয় না হয় এবং তাদের জন্যে সত্যাসত্য বোঝা অসম্ভব না হয়ে পড়ে। তিনি বরং চেয়েছেন, এ মোকাবেলাটি প্রকাশ্য দিবালোকে অনুষ্ঠিত হোক। কেননা তিনি আপন প্রতিপালক প্রদত্ত অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা সুনিশ্চিত ছিলেন, এ মোকাবেলায় আল্লাহ তাআলা নিজের নিদর্শন ও দীনকে বিজয় মণ্ডিত করবেন; যদিও কিবতিরা তা কোনোমতেই মেনে নিতে পারবে না। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى (٦٠) قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى (٦١) فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى (٦٢) قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى (٦٣) فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى (٦٤)

"এরপর ফেরাউন উঠে গেল এবং পরে তার কৌশলসমূহ একত্র করল ও তারপর আসল। মূসা তাদের বলল, দুর্ভোগ তোমাদের! তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করবে না। করলে তিনি তোমাদেরকে শাস্তি দ্বারা সমূলে ধ্বংস করবেন। যে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে, সেই ব্যর্থ হয়েছে। ওরা নিজেদের মধ্যে নিজেদের কর্ম সম্বন্ধে বিতর্ক করল এবং ওরা গোপনে পরামর্শ করল। ওরা বলল : এ দুজন অবশ্যই জাদুকর, তারা চায় তাদের জাদু দ্বারা তোমাদেরকে তোমাদের দেশ হতে বহিষ্কার করতে এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবন ব্যবস্থা ধ্বংস করতে। অতএব তোমরা তোমাদের জাদু ক্রিয়া সংহত কর। এরপর সারিবদ্ধ হয়ে উপস্থিত হও এবং যে আজ জয়ী হবে, সে সফল হবে।" (সূরা তহা : ৬০-৬৪)

আল্লাহ তাআলা বলেন, ফেরাউন সত্যের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করার প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য চলে গেল। এবং তার রাজ্যের সমস্ত জাদুকরকে একত্র করল। মিসর দেশটি ছিল জাদুকরে ভরা। আর এ জাদুকররা ছিল তাদের পেশায় খুবই পটু। প্রতিটি শহর ও প্রতিটি স্থান থেকে খুঁজে খুঁজে জাদুকরদের সমবেত করা হল। এতে তাদের একটি বিরাট দল সমবেত হল। কেউ কেউ যেমন মুহাম্মদ ইবনে কাব রহ. বলেন : তারা ছিল সংখ্যায় আশি হাজার। কাসিম ইবনে আবু বুরদা রহ. বলেন : তারা ছিল সংখ্যায় সত্তর হাজার। সুদ্দী রহ. বলেন : তাদের সংখ্যা ছিল হাজার থেকে চল্লিশ হাজারের মধ্যে। আবু উমামা রহ. বলেন : তারা ছিল উনিশ হাজার। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক রহ. বলেন : তারা ছিল পনের হাজার। কাব আহবারের মতে, তারা ছিল বার হাজার। ইবনে আবু হাতিম রহ. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. সূত্রে বর্ণনা করেন : তারা ছিল সংখ্যায় সত্তরজন।

অন্য সূত্রে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত আছে– তারা ছিল বনি ইসরাঈল বংশীয় চল্লিশজন ক্রীতদাস। এদেরকে ফেরাউন তাদের গণকদের কাছে যেতে নির্দেশ দিয়েছিল এবং সেখানে জাদু শিক্ষা করার জন্যে হুকুম দিয়েছিল। এ জন্যই তারা আত্মসমর্পণের সময় বলেছিল, 'তুমি আমাদেরকে জাদু শিখতে বাধ্য করেছিলে।' অবশ্য এ অভিমতটি সন্দেহযুক্ত।

এরপর নির্দিষ্ট দিনে ফেরাউন, তার আমীর-উমারা, পারিষদবর্গ, সরকারি কর্মচারীবৃন্দ এবং নির্বিশেষে দেশের সকলেই মাঠে হাযির হল। কেননা ফেরাউন তাদের মধ্যে ঘোষণা করেছিল, তারা যেন সকলেই এই বিরাট মেলায় হাযির হয়। এরপর তারা

বের হয়ে বলাবলি করতে লাগল, জাদুকররা যদি জিতে যায়, তা হলে আমরা তাদেরই অনুসরণ করব। মূসা আ. জাদুকরদের দিকে অগ্রসর হয়ে তাদেরকে উপদেশ দিলেন এবং আল্লাহ তাআলার নিদর্শন ও দলিলাদির বিরুদ্ধে ভ্রান্ত জাদু নিয়ে মোকাবেলায় অবতরণের কারণে তাদের তিরস্কারও করলেন। বললেন– "দুর্ভোগ তোমাদের! তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করবে না। করলে তিনি তোমাদেরকে শাস্তি দ্বারা সমূলে ধ্বংস করে দেবেন। যে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে সেই ব্যর্থ হয়েছে। তারা নিজেদের মধ্যে নিজেদের কর্ম সম্বন্ধে বিতর্ক করল।"

কেউ কেউ বলেন, তাদের বিতর্কের অর্থ হচ্ছে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলল, এটা নবীর কথা; জাদু নয়। আবার কেউ কেউ বলল– না, বরং সে-ই জাদুকর। আল্লাহ তাআলাই সম্যক জ্ঞাত।

এ বিষয়ে এবং অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে তারা গোপনে সলাপরামর্শ করল এবং বলতে লাগল, মূসা ও তাঁর ভাই হারূন আ. দুজনই বিজ্ঞ ও দক্ষ জাদুকর। তারা তাদের জাদুবিদ্যায় অত্যন্ত সিদ্ধহস্ত। তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাদের ব্যাপারে যেন লোকজন সমবেত হয়। তারা বাদশা ও তার পরিষদবর্গের উপর চড়াও হতে পারে। তোমাদের সামগ্রিকভাবে নির্মূল করে দিতে পারে। আর এ জাদুবিদ্যা দিয়ে যেন তারা তোমাদের ওপর কর্তৃত্ব করতে পারে। তারা বলতে লাগল– "তোমরা তোমাদের জাদু ক্রিয়া সংহত কর, এরপর সারিবদ্ধ হয়ে উপস্থিত হও এবং যে আজ জয়ী হবে সে সফল হবে।"

প্রথম কথাটি তারা এজন্য বলল, যাতে তারা তাদের কাছে প্রাপ্ত সবধরনের চেষ্টা, তদবীর, ছলচাতুরী, অন্যের প্রতি অপবাদ, জাদু ও ধোঁকাবাজির আশ্রয় নেয়। আফসোস, আল্লাহর কসম! তাদের সমস্ত ধ্যান-ধারণা ও যুক্তি-তর্ক ছিল মিথ্যা ও ভ্রান্ত। অপবাদ, জাদু ও ভিত্তিহীন যুক্তি-তর্ক কেমন করে এমন সব মুজিযার মোকাবেলা করতে পারে, যেগুলো মহান আল্লাহ আপন বান্দা ও রাসূল মূসা আ.-এর মাধ্যমে প্রদর্শন করেছেন? রাসূলকে এমন দলিল দ্বারা শক্তিশালী করা হয়েছে, যার সামনে দৃষ্টি স্তিমিত হয়ে যায় এবং মানুষ হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। ফেরাউন বলতে লাগল, তোমাদের কাছে যা কিছু তদবির জানা রয়েছে সব কিছু নিয়ে মাঠে নেমে পড় এবং একতাবদ্ধ হয়ে মোকাবেলা কর।' এরপর তারা পরস্পরকে মোকাবেলার জন্যে অগ্রসর হতে অনুপ্রাণিত করতে লাগল। কেননা ফেরাউন তাদেরকে পদমর্যাদা ও উপঢৌকনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। অবশ্যই শয়তানের প্রতিশ্রুতি প্রতারণামূলক। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى (٦٥) قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى (٦٦) فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى (٦٧) قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى (٦٨) وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى (٦٩)

"তারা বলল, হে মূসা! হয় তুমি নিক্ষেপ কর অথবা প্রথমে আমরাই নিক্ষেপ করি। মূসা বলল, বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর। তাদের জাদু প্রভাবে অকস্মাৎ মূসার মনে হল তাদের দড়ি ও লাঠিগুলো ছুটাছুটি করছে। মূসা তার অন্তরে কিছু ভীতি অনুভব করল। আমি বললাম, 'ভয় করবে না, তুমিই হচ্ছো প্রবল। তোমার ডান হাতে যা রয়েছে, তা নিক্ষেপ কর; এটা ওরা যা করেছে তা গ্রাস করে ফেলবে। ওরা যা করেছে তা তো কেবল জাদুকরের কৌশল। জাদুকর যেখানেই আসুক, সফল হবে না।"

(সূরা তহা : ৬৫-৬৯)

এরপর জাদুকররা সারিবদ্ধ হলে মূসা আ. তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারা তখন মূসা আ.-কে বলল, 'হয় তুমি আমাদের আগে নিক্ষেপ কর, অথবা আমরা আগে নিক্ষেপ করি।' মূসা আ. বললেন : না, বরং তোমরাই প্রথম নিক্ষেপ কর। এরপর তারা দড়ি ও লাঠিগুলো নিক্ষেপ করার ঘোষণা দিল এবং এগুলোতে পারদ ও বিভিন্ন যন্ত্রপাতি স্থাপন করল। আর এ জন্যে দড়ি ও লাঠিগুলো দর্শকের চোখে মনে হচ্ছিল যেন নিজ ইচ্ছে মাফিক ছুটাছুটি করছে। অথচ এগুলো যন্ত্রের সাহায্যেই নড়াচড়া করছিল। এভাবে তারা মানুষের চোখকে জাদু করেছিল এবং তাদের মনের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করেছিল। তারা তাদের দড়ি ও লাঠিগুলো নিক্ষেপ করার সময় বলেছিল, ফেরাউনের মহা মর্যাদার শপথ! নিশ্চয় আমরাই বিজয়ী হব। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ

যখন তারা নিক্ষেপ করল, তখন তারা লোকের চোখে জাদু করল, তাদেরকে আতঙ্কিত করল এবং তারা এক বড় রকমের জাদু দেখাল। মূসা আ. জনগণের জন্যে একটু ভীত হয়ে পড়লেন। তিনি আশঙ্কা করতে লাগলেন, ওহি প্রাপ্তির পূর্বে তিনি তার হাতের লাঠি ছাড়তে পারছেন না; তাই লাঠি ছাড়ার পূর্বেই যদি জনগণ তাদের জাদুতে মুগ্ধ হয়ে প্রতারিত হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা নির্দিষ্ট মুহূর্তে লাঠি নিক্ষেপ করার জন্যে মূসা আ.-এর কাছে ওহি নাযিল করেন। মূসা আ. তখন হাতের লাঠি নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন। যেমনটা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ () وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

"তোমরা যা এনেছ তা জাদু, আল্লাহ তাআলা এটাকে শিগগিরই অসার করে দেবেন। আল্লাহ তাআলা অশান্তি সৃষ্টিকারীদের কর্ম সার্থক করেন না। অপরাধীরা অপ্রীতিকর মনে করলেও আল্লাহ তাআলা তার বাণী অনুযায়ী সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবেন।" (সূরা ইউনুস : ৮১-৮২)

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র ইরশাদ করেন :

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (١١٧) فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١١٨) فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ (١١٩) وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (١٢٠) قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (١٢١) رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ

"মূসার প্রতি আমি প্রত্যাদেশ করলাম, তুমিও তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর! এরপর সহসা এটা তাদের অলীক সৃষ্টিগুলোকে গ্রাস করতে লাগল। ফলে সত্য প্রতিষ্ঠিত হল এবং তারা যা করছিল, তা মিথ্যা প্রতিপন্ন হল। সুতরাং সেখানে তারা পরাভূত ও লাঞ্ছিত হল আর জাদুকররা হল সিজদাবনত। তারা বলল, আমরা ঈমান আনলাম জগতসমূহের প্রতিপালকের প্রতি, যিনি মূসা ও হারূনের প্রতিপালক।"

(সূরা আরাফ : ১১৭-১২২)

একাধিক পূর্বসূরী আলেম উল্লেখ করেছেন, মূসা আ. তাঁর হাতের লাঠিখানা নিক্ষেপ করলে তা পা, বড় গর্দান এবং ভয়ঙ্কর ও ভীতিপ্রদ আকৃতির এক বিরাট অজগরে পরিণত হল। জনতা এটাকে দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত ও বিহ্বল হয়ে পড়ল এবং ছুটে পালাতে লাগল। মানুষ যখন অজগর দেখে পিছনে সরে গেল, অজগর সম্মুখ পানে অগ্রসর হল এবং জাদুকরদের দড়ি ও লাঠি দিয়ে তৈরি অলীক সৃষ্টিগুলোকে একে একে অতি দ্রুত গ্রাস করতে লাগল। জনতা অজগরের প্রতি অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

অন্যদিকে জাদুকররা মূসা আ.-এর লাঠির কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে গেল এবং এমন একটি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করল, যা ছিল তাদের ধারণাতীত; তাদের বিদ্যার ও পেশার ঊর্ধ্বে। এখন তারা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারল, মূসা আ.-এর কর্মকাণ্ড ভিত্তিহীন জাদু নয়, অবাস্তব নয়, মায়া নয়, নিছক ধারণা নয়, মিথ্যা নয়, অপবাদ নয় পথভ্রষ্টতাও নয়। বরং এটাই সত্য বা যথার্থ। সত্যের আধার আল্লাহ পাকের পাঠানো রাসূল ছাড়া অন্য কারো পক্ষে এরূপ অত্যাশ্চর্য প্রদর্শন করা আর সম্ভব নয়। এভাবে আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তর থেকে অজ্ঞতার পর্দা দূর করে দিলেন এবং তাদের অন্তরকে হেদায়েতের নূর দ্বারা আলোকিত করে দিলেন। তাকে কাঠিন্যমুক্ত করে দিলেন। ফলে তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে ঝুঁকে পড়ল এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্যেই সিজদায় নত হল। তারা উপস্থিত জনতার পক্ষ থেকে কোনো প্রকার শাস্তি বা নির্যাতনের আশঙ্কা না করে প্রকাশ্যে উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে বলতে লাগল, "আমরা মূসা ও হারূন-এর প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম।"

আল্লাহ তাআলা সূরা তহায় ইরশাদ করেন :

فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ (٧٠) قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ (٧١) قَالُوا لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ

وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (٧٢) إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (٧٣) إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى (٧٤) وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى (٧٥) جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى (٧٦)

"তারপর জাদুকররা সিজদাবনত হল ও বলল, আমরা হারূন ও মূসার প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনলাম। ফেরাউন বলল : কী, আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়ার আগেই তোমরা মূসার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করলে! দেখছি, সে তো তোমাদের প্রধান, সে তোমাদেরকে জাদু শিক্ষা দিয়েছে। সুতরাং আমি অবশ্যই তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলব এবং আমি তোমাদেরকে খেজুর গাছের কাণ্ডে শূলবিদ্ধ করবই এবং তোমরা অবশ্যই জানতে পারবে– আমাদের মধ্যে কার শাস্তি কঠোর ও অধিক স্থায়ী। তারা বলল, আমাদের কাছে যে স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে, তার উপর এবং যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর উপর তোমাকে আমরা কিছুতেই প্রাধান্য দিব না। সুতরাং তুমি যা করতে চাও, তা করতে পার। তুমি তো কেবল এ পার্থিব জীবনের উপর কর্তৃত্ব করতে পার। আমরা নিশ্চয়ই আমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছি, যাতে তিনি ক্ষমা করেন আমাদের অপরাধ এবং তুমি আমাদেরকে যে জাদু করতে বাধ্য করছ, তা-ও। আর আল্লাহ শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী, যে তার প্রতিপালকের নিকট অপরাধী হয়ে উপস্থিত হবে তার জন্য তো রয়েছে জাহান্নাম; সেথায় সে মরবেও না, বাঁচবেও না। যারা তাঁর নিকট উপস্থিত হবে মুমিন অবস্থায় সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের জন্যে রয়েছে সমুচ্চ মর্যাদা-স্থায়ী জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, যেথায় তারা স্থায়ী হবে এবং এ পুরস্কার তাদেরই, যারা পবিত্র।" (সূরা ত্বহা : ৭০-৭৬)

সাঈদ ইবনে জুবাইর রাযি. ইকরামা, কাসিম ইবনে আবু বুরদা, আওযায়ী রহ. প্রমুখ বলেন : যখন জাদুকররা মূসা আ.-এর মুজিযা প্রত্যক্ষ করে সিজদায় অবনত হল, তখন তারা জান্নাতে তাদের বসবাসের জন্য তৈরি ও তাদের অভ্যর্থনার জন্যে সুসজ্জিত ও দালানকোঠা অবলোকন করলেন। আর তাই তারা ফেরাউনের ভয়ভীতি, শাস্তি ও হুমকির প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্র করলেন না। ফেরাউন যখন দেখতে পেল, জাদুকররা মুসলমান হয়ে গেছে এবং তারা মূসা আ. ও হারূন আ.-এর প্রচারিত বাণী লোকসমাজে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করছে, সে ভীত হয়ে পড়ল এবং ভবিষ্যত আশঙ্কায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ল। এতে সে হতবিহবল হয়ে নিজের অন্তর্দৃষ্টি ও দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলল। তার মধ্যে ছিল শঠতা, ধোঁকাবাজী, প্রতারণা, পথভ্রষ্টতা ও জনগণকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখার সুনিপুণ কৌশল। এজন্যই সে জনতার উপস্থিতিতে জাদুকরদের

বলল : কী আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়ার আগেই তোমরা মূসাতে বিশ্বাস স্থাপন করলে! অর্থাৎ আমার প্রজাদের সামনে এরূপ জঘন্য কাজটি করার পূর্বে কেন আমার সঙ্গে পরামর্শ করলে না। এরপর সে তাদেরকে ধমকি দিল, শাস্তির ভয় দেখাল এবং মিথ্যা অপবাদ দিয়ে বলতে লাগল, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রধান; সে-ই তোমাদরকে জাদু শিক্ষা দিয়েছে।

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে :

إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

"ফেরাউন বলল– কী, আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়ার আগেই তোমরা এটাতে বিশ্বাস করলে! এ তো এক চক্রান্ত। তোমরা সজ্ঞানে এ চক্রান্ত করেছ, নগরবাসীকে এখান থেকে বহিষ্কারের জন্যে। আচ্ছা, তোমরা শিগগিরই এটার পরিণাম জানবে।" (সূরা আরাফ : ১২৩)

এ সম্পর্কে সূরা আরাফে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (١٠٣) وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٠٤) حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (١٠٥) قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (١٠٦) فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ (١٠٧) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ (١٠٨) قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ (١٠٩) يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ (١١٠) قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (١١١) يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ (١١٢) وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ (١١٣) قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (١١٤) قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ (١١٥) قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ (١١٦) وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (١١٧) فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١١٨) فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ (١١٩) وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (١٢٠) قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (١٢١) رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ (١٢٢) قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (١٢٣) لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ (١٢٤)

قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ (١٢٥) وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ (١٢٦)

"তার পর মূসাকে আমার নিদর্শনসহ ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গের কাছে পাঠাই; কিন্তু তারা এটা অস্বীকার করে। বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হয়েছিল তা লক্ষ কর! মূসা বলল, হে ফেরাউন! আমি তো জগতসমূহের প্রতিপালকের কাছ থেকে প্রেরিত। এটা স্থির নিশ্চিত, আমি আল্লাহ সম্বন্ধে সত্য ছাড়া বলব না; তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ আমি তোমাদের কাছে এনেছি। সুতরাং বনি ইসরাঈলকে আমার সঙ্গে যেতে দাও। ফেরাউন বলল : যদি তুমি কোনো নিদর্শন এনে থাক, তুমি সত্যবাদী হলে তবে তা পেশ কর। তারপর মূসা তার লাঠি নিক্ষেপ করল এবং তৎক্ষণাৎ এটা এক সাক্ষাৎ অজগর হয়ে গেল। সে তার হাত বের করল আর তৎক্ষণাৎ এটা দর্শকদের দৃষ্টিতে শুভ্র উজ্জ্বল প্রতিভাত হল। ফেরাউন সম্প্রদায়ের প্রধানরা বলল, এ তো একজন সুদক্ষ জাদুকর! এ তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করতে চায়। এখন তোমরা কী পরামর্শ দাও?

তারা বলল, তাকে ও তার ভাইকে কিঞ্চিত অবকাশ দাও এবং নগরে নগরে সংগ্রাহকদের পাঠাও, যেন তারা তোমার কাছে প্রতিটি সুদক্ষ জাদুকরকে উপস্থিত করে। জাদুকররা ফেরাউনের কাছে এসে বলল : আমরা যদি বিজয়ী হই, তবে আমাদের জন্য পুরস্কার থাকবে তো? সে বলল : হ্যাঁ এবং তোমরা আমার সান্নিধ্য প্রাপ্তদেরও অন্তর্ভুক্ত হবে। তারা বলল, হে মূসা! তুমিই কি [প্রথমে] নিক্ষেপ করবে, না আমরাই নিক্ষেপ করব? সে বলল, তোমরাই নিক্ষেপ কর! যখন তারা নিক্ষেপ করল, তখন তারা লোকের চোখে জাদু করল; তাদেরকে আতঙ্কিত করল এবং তারা এক বড় রকমের জাদু দেখাল। আমি মূসার প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম, তুমিও তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর! সহসা এটা তাদের অলীক সৃষ্টিগুলোকে গ্রাস করতে লাগল। ফলে সত্য প্রতিষ্ঠিত হল এবং তারা যা করছিল, তা মিথ্যা প্রতিপন্ন হল। সেখানে তারা পরাভূত হল ও লাঞ্ছিত হল এবং জাদুকররা সিজদাবনত হল। তারা বলল : আমরা ঈমান আনলাম জগতসমূহের প্রতিপালকের প্রতি, যিনি মূসা ও হারুন-এরও প্রতিপালক।

ফেরাউন বলল– কী, আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়ার পূর্বে তোমরা এটাতে বিশ্বাস করলে! এ তো একটা চক্রান্ত। তোমরা সজ্ঞানে এ চক্রান্ত করেছ নগরবাসীদের নগর থেকে বহিষ্কারের জন্যে। আচ্ছা, তোমরা শীঘ্রই এর পরিণাম জানবে। আমি অবশ্য অবশ্যই তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কর্তন করব। তারপর তোমাদের সকলেরই শূলবিদ্ধও করব। তারা বলল : আমরা আমাদের প্রতিপালকের কাছে ফিরে যাব। তুমি তো আমাদেরকে শাস্তি দান করছ শুধু এ জন্য, আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনে ঈমান এনেছি, যখন তা আমাদের নিকট এসেছে। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ধৈর্য দান কর এবং মুসলমানরূপে আমাদের মৃত্যু ঘটাও।"

(সূরা আরাফ : ১০৩-১২৬)

আল্লাহ তাআলা এ সম্পর্কে সূরা ইউনুসে ইরশাদ করেন :

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ (٧٥) فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ (٧٦) قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ (٧٧) قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ (٧٨) وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ (٧٩) فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ (٨٠) فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ (٨١) وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

“পরে আমার নিদর্শনসহ মূসা ও হারুনকে ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গের কাছে প্রেরণ করি। কিন্তু ওরা অহঙ্কার করে এবং ওরা ছিল অপরাধী সম্প্রদায়। তারপর যখন ওদের কাছে আমার নিকট হতে সত্য এল, তখন ওরা বলল : এটা তো নিশ্চয়ই স্পষ্ট জাদু। মূসা বলল : সত্য যখন তোমাদের কাছে এল, তখন সে সম্পর্কে তোমরা এরূপ বলছ– এটা কি জাদু? জাদুকররা তো সফলকাম হয় না। ওরা বলল : আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণকে যাতে পেয়েছি, তুমি কি তা থেকে আমাদের বিচ্যুত করার জন্যে আমাদের কাছে এসেছ এবং যাতে দেশে তোমাদের দুজনের প্রতিপত্তি হয় এ জন্য? আমরা তোমাদের প্রতি বিশ্বাসী নই। ফেরাউন বলল, তোমরা আমার কাছে সকল সুদক্ষ জাদুকরকে নিয়ে এস। তারপর যখন জাদুকররা এল, তখন তাদেরকে মূসা বলল, তোমাদের যা নিক্ষেপ করার তা নিক্ষেপ কর! যখন তারা নিক্ষেপ করল, তখন মূসা বলল : তোমরা যা কিছু এনেছ, তা জাদু; আল্লাহ জাদুকে অসার করে দেবেন। আল্লাহ অশান্তি সৃষ্টিকারীদের কর্ম সার্থক করেন না। অপরাধীরা অপ্রীতিকর মনে করলেও আল্লাহ তাঁর বাণী অনুযায়ী সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবেন।” (সূরা ইউনুস : ৭৫-৮২)

মোটকথা, ফেরাউন জাদুকরদেরকে যেসব কথা বলেছে, তাতে ফেরাউন মিথ্যা বলেছে, অপবাদ দিয়েছে এবং চরম পর্যায়ের কুফরি করেছে। মূসা আ.-এর প্রতি ফেরাউনের এরূপ অপবাদ সর্বজনবিদিত। এসব আয়াতে তার সেই ধৃষ্টতা ও মূর্খতা সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। মুমিন জাদুকরগণ জবাবে ফেরাউনকে বলেছেন, ‘তুমি যা পার তা কর; তোমার আদেশ তো শুধু এই পার্থিব জীবনেই চলতে পারে। কিন্তু যখন আমরা এ নশ্বর জগত ছেড়ে আখেরাতে চলে যাব, তখন ওই সত্তার আদেশ বলবৎ থাকবে যার প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করছি এবং আমরা যার প্রেরিত রাসূলগণের অনুসরণ করছি।

এরপর তাঁরা তাকে উপদেশস্বরূপ মহান প্রতিপালকের শাস্তির প্রতি ভীতি প্রদর্শন করে বললেন :

إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ

"যে তার প্রতিপালকের কাছে অপরাধী হয়ে উপস্থিত হবে তার জন্য তো রয়েছে জাহান্নাম, সেখানে সে মরবেও না, বাঁচবেও না।" অর্থাৎ যেন তাঁরা বললেন, সাবধান! তুমি আবার এসব অপরাধীর অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। কিন্তু ফেরাউন বরাবরই তাঁদের উপদেশ অমান্য করল। তাঁরা তাকে আরো বললেন :

وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ (٧٥) جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّىٰ (٧٦)

"যারা তাঁর কাছে উপস্থিত হবে মুমিন অবস্থায় সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের জন্যে রয়েছে সমুচ্চ মর্যাদা; স্থায়ী জান্নাত, যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং এ পুরস্কার তাদেরই, যারা পবিত্র।" (সূরা তহা : ৭৫-৭৬)

সুতরাং তুমি এ দলের অন্তর্ভুক্ত হও। কিন্তু ফেরাউন ও তার আমলের মধ্যে ভাগ্যলিপি অন্তরায় হল, যা ছিল অখণ্ডনীয় ও অপরিবর্তনীয়। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলা তার দুষ্কর্মের জন্য আদেশ দিলেন, "অভিশপ্ত ফেরাউন জাহান্নামী, সে মর্মন্তুদ শাস্তি ভোগ করবে, তার মাথার ওপর গরম পানি ঢালা হবে এবং তাকে অপমানিত, লাঞ্ছিত ও তিরস্কৃত করার উদ্দেশ্যে বলা হবে- জাহান্নামের আযাব আস্বাদন কর, তুমি তো ছিলে সম্মানিত অভিজাত।" (সূরা দুখান : ৪৯)

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহের পূর্বাপর দৃষ্টে প্রতীয়মান হয়, ফেরাউন মুমিন জাদুকরদের শূলবিদ্ধ করেছিল ও তাদের মর্মন্তুদ শাস্তি দিয়েছিল। আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও উবায়েদ ইবনে উমায়ের রাযি. বলেন, তারা দিনের প্রথম অংশে ছিলেন জাদুকর। আর দিনের শেষাংশে পুণ্যবান শহিদ হিসেবে পরিগণিত হলেন। উপর্যুক্ত উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে মুমিন জাদুকরদের নিম্নোক্ত মুনাজাতে :

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ

'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ধৈর্যদান কর এবং মুসলিমরূপে আমাদের মৃত্যু ঘটাও।'

এ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাটি যখন ঘটে গেল, কিবতিরা যখন এই তুমূল প্রতিযোগিতায় পরাজয় বরণ করল আর জাদুকরগণ মূসা আ.-এর কাছে আত্মসমর্পণ করলেন ও নিজেদের প্রতিপালকের সাহায্যপ্রার্থী হলেন, তখন কিবতিদের কুফরী, হঠকারিতা ও সত্য বিমুখতাই কেবল বৃদ্ধি পেল। আল্লাহ তাআলা তাদের কথা বর্ণনা করে ইরশাদ করেন :

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ (١٢٧) قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (١٢٨) قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (١٢٩)

"ফেরাউনের সম্প্রদায়ের প্রধানরা বলল, আপনি কি মূসাকে ও তার সম্প্রদায়কে রাজ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে এবং আপনাকে ও আপনার দেবতাগণকে বর্জন করতে দেবেন? সে বলল, আমরা তাদের পুত্রদেরকে হত্যা করব এবং তাদের নারীদেরকে জীবিত রাখব আর আমরা তো তাদের ওপর প্রবল। মূসা তাঁর সম্প্রদায়কে বলল, আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ধৈর্যধারণ কর। জমিন তো আল্লাহরই; তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছে এর উত্তরাধিকারী করেন এবং শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য। তারা বলল, আমাদের কাছে তোমার আসার আগে আমরা নির্যাতিত হয়েছি এবং তোমার আসার পরেও। সে বলল, শিগগিরই তোমাদের প্রতিপালক তোমদের শত্রু ধ্বংস করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে যমীনে তাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন; তারপর তোমরা কী কর তা তিনি লক্ষ করবেন।" (সূরা আরাফ : ১২৭-১২৯)

এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, তারা ছিল ফেরাউনের পারিষদবর্গ ও গোত্রপ্রধান। তারা তাদের বাদশা ফেরাউনকে আল্লাহর নবী মূসা আ.-এর প্রতি অত্যাচার, অবিচার ও জুলুম করার এবং তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে প্ররোচিত করেছিল। তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করার পরিবর্তে তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান, নির্যাতন এবং অগ্রাহ্য করেছিল।

এক লা-শরীক আল্লাহ তাআলার ইবাদতের প্রতি আহবান করা এবং আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্যের ইবাদত থেকে নিষেধ করাকে তারা বিপর্যয় সৃষ্টি বলে আখ্যায়িত করল। মূসা আ. তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন : যখন তারা তোমাদেরকে দুঃখ-কষ্ট দিতে উদ্যত, তখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে সাহায্যের প্রার্থনা কর এবং তোমাদের দুঃখ-কষ্টে তোমরা ধৈর্যধারণ কর। জেনে রেখো, এ পৃথিবীর মালিক একমাত্র আল্লাহ তাআলা। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চান, এ পৃথিবীর উত্তরাধিকারী করেন। তবে শুভ পরিণতি মুত্তাকীদের জন্যেই। সুতরাং তোমরা মুত্তাকি হতে সচেষ্ট হও। যাতে তোমাদের পরিণাম শুভ হয়। আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন :

وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ (٨٤) فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٨٥) وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

contents

"মূসা বলল, হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহর ওপর ঈমান এনে থাক, যদি তোমরা আত্মসমর্পণকারী হও, তবে তোমরা তাঁরই ওপর নির্ভর কর। তারপর তারা বলল, আমরা আল্লাহর ওপর নির্ভর করলাম। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে জালিম সম্প্রদায়ের উৎপীড়নের পাত্র করো না এবং আমাদেরকে তোমার অনুগ্রহে কাফের সম্প্রদায় থেকে রক্ষা কর। (সূরা ইউনুস : ৮৪-৮৬)

আল্লাহ তাআলা সূরা মুমিনে ইরশাদ করেন :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ (٢٣) إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ

"আমি আমার নিদর্শন ও স্পষ্ট প্রমাণসহ মূসা আ.-কে প্রেরণ করেছিলাম ফেরাউন, হামান ও কারুনের কাছে, কিন্তু তারা বলেছিল– এ তো এক জাদুকর, চরম মিথ্যাবাদী।" (সূরা মুমিন : ২৩-২৪)

ফেরাউন ছিল রাজা, হামান ছিল তার মন্ত্রী এবং কারুন ছিল মূসা আ.-এর সম্প্রদায়ের একজন ধনাঢ্য ইহুদি। কিন্তু সে ছিল ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গের ধর্মের অনুসারী; প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করেন :

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ

وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ

"এরপর মূসা আমার কাছ থেকে সত্য নিয়ে তাদের নিকট উপস্থিত হলে তারা বলল, মূসার সঙ্গে যারা ঈমান আনয়ন করেছে, তাদের পুত্রদের হত্যা কর এবং তাদের নারীদের জীবিত রাখ। কিন্তু কাফেরদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবেই।" (সূরা মুমিন : ২৫)

মূসা আ.-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পর পুরুষদের হত্যার উদ্দেশ্য ছিল, বনি ইসরাঈলকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করা এবং তাদের কর্মক্ষমদের সংখ্যা হ্রাস করা। যাতে তাদের শান-শওকত লোপ পেয়ে যায় এবং তাদের কোনো প্রতিপত্তিই অবশিষ্ট না থাকে। তারা যেন কিবতিদের বিরুদ্ধে কোনো সময় মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে এবং কিবতিদেরকে প্রতিহত করতে না পারে। অন্যদিকে কিবতিরা অবশ্য তাদেরকে যমের মতো ভয় করত। তবে এতে তাঁদের কোনো লাভ হয় নি। তাদের ভাগ্যলিপি যা আল্লাহ তাআলার মহা হুকুম রূহ-এর মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে থাকে, তা তারা রদ করতে পারে নি। ফেরাউন বলতে লাগল :

ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ

"আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মূসাকে হত্যা করব। সে তার প্রতিপালকের শরণপন্ন হোক। আমি আশঙ্কা করছি, সে তোমাদের দীনের পরিবর্তন ঘটাবে অথবা সে পৃথিবীতে বিপর্যয় করবে।" (সূরা মুমিন : ২৬)

এ জন্যই জনগণ ঠাট্টার ছলে বলত, ফেরাউন নির্দেশদাতা হয়ে গেছে। কেননা ফেরাউন তার ধারণায় জনগণকে ভয় দেখাত। যেন মূসা আ. তাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে না পারে। আল্লাহ বলেন :

وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ

"মূসা বলল : যারা বিচার দিবসে বিশ্বাস করে না, সেই সকল ঔদ্ধত্য ব্যক্তি থেকে আমি আমার ও তোমাদের প্রতিপালকের শরণাপন্ন হচ্ছি।" (সূরা মুমিন : ২৭)

অর্থাৎ, আমি আল্লাহ তাআলার শাহি দরবারের শরণাপন্ন হচ্ছি, যাতে ফেরাউন ও অন্যরা আমার প্রতি অনিষ্টের উদ্দেশ্যে আক্রমণ করতে না পারে। তারা এতই ঔদ্ধত, তারা আমার প্রতি কোনোরূপ ভ্রূক্ষেপই করে না এবং আল্লাহ তাআলার আযাব ও গযবকে ভয় করে না। কেননা তারা আখেরাতে ও হিসাব-নিকাশে বিশ্বাস রাখে না।

এরপর আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ (٢٨) يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ

ফেরাউন বংশের এক ব্যক্তি যে মুমিন ছিল এবং নিজের ঈমান গোপন রাখত, সে বলল : তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এ জন্য হত্যা করবে, সে বলে– 'আমার প্রতিপালক আল্লাহ, অথচ সে তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ তোমাদের নিকট এসেছে? সে মিথ্যাবাদী হলে তার মিথ্যাবাদিতার জন্যে সে দায়ী হবে আর যদি সে সত্যবাদী হয়, সে তোমাদেরকে যে শাস্তির কথা বলে, তার কিছু তো তোমাদের ওপর আপতিত হবেই। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারী ও মিথ্যাবাদীকে সৎপথে পরিচালিত করেন না। হে আমার সম্প্রদায়! আজ কর্তৃত্ব তোমাদের, দেশে তোমরাই প্রবল; কিন্তু আমাদের ওপর আল্লাহর শাস্তি এসে পড়লে কে আমাদেরকে সাহায্য করবে? ফেরাউন বলল : আমি যা বুঝি, আমি তোমাদের তাই বলছি। আমি তোমাদের কেবল সৎপথই দেখিয়ে থাকি।" (সূরা মুমিন : ২৮-২৯)

এ ব্যক্তিটি ছিল ফেরাউনের চাচাতো ভাই। সে তার সম্প্রদায়ের কাছে ঈমান গোপন রাখত। কেননা সে তাদের তরফ থেকে তার জীবন নাশের ভয় করত। কেউ কেউ বলেন, এ লোকটি ছিল ইসরাইলী। এ অভিমতটি শুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ এবং পূর্বাপরের সঙ্গে শব্দ ও অর্থের কোনো মিল নেই। আল্লাহ তাআলাই অধিক জ্ঞাত।

তিনি তার সম্প্রদায়ের লোকজনকেও সতর্ক করেন, তোমাদের এ প্রাণপ্রিয় রাজ্য শিগগিরই হরণ করে নেওয়া হবে। কেননা কোনো বাদশা বা রাজা যদি ধর্মের বিরোধিতা করে, তা হলে তাদের রাজ্য হরণ করে নেওয়া হয় এবং তাদেরকে সম্মান প্রদানের পর লাঞ্ছিত করা হয়। যেমন ফেরাউনের সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে পরবর্তী সময় ঘটেছে।

এরপর মূসা আ.-এর আনীত বিষয়াবলী সম্পর্কে ফেরাউনের অনুসারীরা সন্দেহ প্রকাশ, বিরোধিতা ও বৈরীভাব পোষণ করায় তাদেরকে আল্লাহ তাআলা তাদের ঘরবাড়ি, সহায় সম্পদ, বিত্তবৈভব, রাজত্ব ও সৌভাগ্য থেকে বিতাড়িত করলেন। লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে তাদেরকে সাগরের দিকে ঠেলে দেওয়া হল। তাদেরকে উচ্চ মর্যাদা ও সম্মান দানের পর তাদের কৃতকর্মের দরুন তাদের রূহসমূহকে নিকৃষ্ট পর্যায়ে অধঃপতিত করা হয়। তাই তো আপন সম্প্রদায়ের পরম শুভাকাঙ্ক্ষী মুমিন বান্দাটি বললেন– হে আমার সম্প্রদায়! আজ কর্তৃত্ব তোমাদের হাতে, জনগণের মধ্যে তোমরা অধিক মর্যাদাসম্পন্ন। তাদের উপর তোমরা শাসন চালিয়ে যাচ্ছ। তোমরা সংখ্যায়, সামর্থ্যে, শক্তিতে ও দৃঢ়তায় যদি বর্তমানের চেয়েও অধিক গুণে প্রতিপত্তি অর্জন করে নাও, তথাপি তা আমাদের কোনো উপকারে আসবে না এবং আহকামুল হাকিমিন আল্লাহ তাআলার আযাবকে আমাদের থেকে প্রতিহত করতে পারবে না। কিন্তু জবাবে ফেরাউন বলল : 'আমি যা বুঝি, আমি তাই তোমাদের বলছি; আমি তোমাদের কেবল সৎপথই প্রদর্শন করে থাকি।' দুটি বাক্যেই ফেরাউন ছিল মিথ্যাবাদী। কেননা অন্তরের অন্তস্থল থেকে সে উপলব্ধি করত, মূসা আ.-এর আনীত বিষয়াদি নিশ্চিতভাবে আল্লাহ তাআলার তরফ থেকেই আগত। সে হঠকারিতা, শত্রুতা, সীমালঙ্ঘন ও কুফরির কারণে মুখে এর বিপরীত বলছে। আল্লাহ তাআলা মূসা আ.-এর উক্তির বিবরণ দিয়ে ইরশাদ করেন :

لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا (١٠٢) فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا (١٠٣) وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا

"তুমি অবশ্যই অবগত আছ, এ সমস্ত স্পষ্ট নিদর্শন, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালকই অবতীর্ণ করেছেন প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ। হে ফেরাউন! আমি তো দেখছি, তোমার ধ্বংস আসন্ন। তারপর ফেরাউন তাদেরকে দেশ থেকে উচ্ছেদ করার সংকল্প করল। তখন আমি ফেরাউন ও তার সঙ্গীদের সকলকে ডুবিয়ে দিলাম। এরপর আমি বনি ইসরাইলকে বললাম, তোমরা যমীনে বসবাস কর এবং যখন কেয়ামতের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে, তখন তোমাদের সকলকে আমি একত্র করে উপস্থিত করব।"

(বনি ইসরাঈল : ১০২-১০৪)

অন্যত্র আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন :

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ (١٣) وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ

"তারপর যখন তাদের কাছে আমার স্পষ্ট নিদর্শন আসল, তারা বলল : এটা স্পষ্ট জাদু। তারা অন্যায় ও ঔদ্ধত্যভাবে নিদর্শনগুলোকে প্রত্যাখ্যান করল। যদিও তাদের অন্তর এগুলোকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। দেখ, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল।" (সূরা নামল : ১৩-১৪)

ইতোপূর্বে ফেরাউন বলেছিল : "আমি তোমাদেরকে কেবল সৎপথই প্রদর্শন করে থাকি", এতেও সে মিথ্যাবাদী। কেননা সে সঠিক রাস্তায় ছিল না, সে ছিল পথভ্রষ্টতা, নিবুদ্ধিতা ও সন্ত্রাসের ওপর। সে প্রথমত নিজে দেবদেবী ও মূর্তিদের পূজা করত। এরপর তার মূর্খ ও পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়কে তার অনুকরণ ও অনুসরণ করতে এবং সে যে নিজেকে 'রব' বলে দাবি করেছিল, এ ব্যাপারে তাকে সত্য বলে স্বীকার করার জন্যে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করে। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ (٥١) أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ (٥٢) فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ (٥٣) فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (٥٤) فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ (٥٥) فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ

"ফেরাউন তার সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘোষণা করল, হে আমার সম্প্রদায়! মিসর রাজ্য কি আমার নয়? এই যে নদীগুলো আমার পাদদেশে প্রবাহিত, তোমরা কি তা দেখ না? আমি তো শ্রেষ্ঠ এই ব্যক্তি থেকে, যে হীন এবং স্পষ্ট কথা বলতেও অক্ষম। মূসাকে কেন দেওয়া হল না স্বর্ণবলয়, অথবা তার সাথে কেন আসল না ফেরেশতাগণ দলবদ্ধভাবে? এভাবে সে তার সম্প্রদায়কে হতবুদ্ধি করে দিল। ফলে ওরা তার কথা মেনে নিল। ওরা তো ছিল এক সত্যত্যাগী সম্প্রদায়। যখন ওরা আমাকে ক্রোধান্বিত করল, আমি তাদেরকে শাস্তি দিলাম এবং নিমজ্জিত করলাম ওদের সকলকে। এরপর পরবর্তীদের জন্যে আমি ওদেরকে করে রাখলাম অতীত ইতিহাস ও দৃষ্টান্ত।"

(সূরা যুখরুফ : ৫১-৫৬)

আল্লাহ্ তাআলা আরো ইরশাদ করেন :

فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى (٢٠) فَكَذَّبَ وَعَصَى (٢١) ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى (٢٢) فَحَشَرَ فَنَادَى (٢٣) فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى (٢٤) فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى (٢٥) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى

"এরপর মূসা ওকে (ফেরাউনকে) মহা নিদর্শন দেখাল। কিন্তু সে অস্বীকার করল এবং অবাধ্য হল। তারপর সে পিছন ফিরে প্রতিবিধানে সচেষ্ট হল। সে সকলকে সমবেত করল এবং উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করল আর বলল, 'আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক।' তারপর আল্লাহ তাকে ইহ ও পরলোকে কঠিন শাস্তিতে পাকড়াও করলেন। যে ভয় করে তার জন্য অবশ্যই এতে রয়েছে শিক্ষা।"(সূরা নাযিআত : ২০-২৬)

আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ (٩٦) إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ (٩٧) يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ (٩٨) وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ (٩٩)

"আমি তো মূসাকে আমার নিদর্শনাবলী ও স্পষ্ট প্রমাণসহ পাঠিয়ে ছিলাম ফেরাউন ও তার প্রধানদের কাছে। কিন্তু তারা ফেরাউনের কার্যকলাপের অনুরূপ করত এবং ফেরাউনের কার্যকলাপ ভালো ছিল না। সে কেয়ামতের দিনে তার সম্প্রদায়ের অগ্রভাগে থাকবে এবং সে তাদেরকে নিয়ে আগুনে ঢুকবে। যেখানে প্রবেশ করানো হবে তা কত নিকৃষ্ট স্থান! এ দুনিয়ায় তাদেরকে করা হয়েছিল অভিশপ্ত এবং অভিশপ্ত হবে তারা কেয়ামতের দিনেও। কত নিকৃষ্ট সে পুরস্কার, যা ওদেরকে দেওয়া হবে।"

(সূরা হূদ : ৯৬-৯৯)

ফেরাউনের ঔদ্ধত্য প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ (٣٦) أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ

"ফেরাউন বলল, হে হামান! আমার জন্য তুমি নির্মাণ কর এক সুউচ্চ প্রাসাদ, যাতে আমি পাই অবলম্বন; অবলম্বন আসমানে আরোহণের, যেন দেখতে পাই মূসার ইলাহকে; তবে আমি তো ওকে মিথ্যাবাদীই মনে করি। এভাবেই ফেরাউনের কাছে শোভনীয় করা হয়েছিল তার মন্দ কর্ম এবং তাকে নিবৃত্ত করা হয়েছিল সরল পথ থেকে আর ফেরাউনের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছিল সম্পূর্ণরূপে।" (সূরা মুমিন : ৩৬-৩৭)

এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা সূরা কাসাসে ইরশাদ করেন :

يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ

"হে পরিষদবর্গ! আমি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ্ আছে বলে আমি জানি না। হে হামান! তুমি আমার জন্য ইট পোড়াও এবং একটি সুউচ্চ প্রাসাদ তৈরি কর। হয়তো আমি তাতে চড়ে মূসার ইলাহ্‌কে দেখতে পাব। অবশ্য আমি তাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি।" (সূরা কাসাস : ৩৮)

মূসা আ. বলেছেন, ফেরাউন ছাড়া বিশ্বজগতের জন্যে অন্য কোনো প্রতিপালক আছে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে রসূলরূপে প্রেরণ করেছেন– এতদুভয় দাবিতে ফেরাউন তাঁকে মিথ্যাবাদী মনে করে। অধিকন্তু সে স্পষ্ট করেই বলে : وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ

এ দাবিতে আমি তাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি। বস্তুত এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য ছিল, লোকজনকে মূসা আ.-থেকে বিরত রাখা। তারা যেন মূসা আ.-কে বিশ্বাস না করে। সে ব্যর্থ হয়েছে। তার কোনো উদ্দেশ্যই হাসিল হয় নি। কেননা মানবজাতির পক্ষে নিজের শক্তি দ্বারা দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে উঠাই সম্ভব নয়, তা হলে কিভাবে তারা ঊর্ধ্ব আসমানে বা তারও ঊর্ধ্বের আসমানে উঠতে পারবে, যার সম্বন্ধে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ জ্ঞাত নন। একাধিক তাফসিরকারক বলেছেন, ফেরাউনের জন্য এ সুউচ্চ প্রাসাদটি ফেরাউনের মন্ত্রী হামান নির্মাণ করেছিল। এর চেয়ে উচ্চতর প্রাসাদ আর দ্বিতীয়টি দেখতে পাওয়া যায় নি। এটা ছিল পোড়া ইটের তৈরি।

কিতাবীদের মতে বনি ইসরাঈলকে ইট বানানোর কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং তারা ফেরাউনের অনুসারীদের দেওয়া বিভিন্ন ধরনের ক্লেশজনক কাজ আঞ্জাম দিতে বাধ্য হত। এমনকি সে-সব কাজে তাদেরকে কেউ সাহায্য পর্যন্ত করত না। বরং তারা নিজেরাই ফেরাউনের জন্যে মাটি, ভূষি ও পানি সংগ্রহ করত এবং ফেরাউন প্রতিদিন তাদের থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজ নিত। তারা যদি তা না করত, তা হলে তাদেরকে প্রহার করা হত, অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা হত এবং তাদেরকে চরম কষ্ট দেওয়া হত। এ জন্যই তারা মূসা আ.-কে লক্ষ্য করে বলেছিল :

قَالُوٓا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ
وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

"আমাদের কাছে তুমি আসার আগে আমরা নির্যাতিত হয়েছি এবং তোমার আসার পরেও। তিনি বললেন, শিগগিরই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে রাজ্যে তাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। এরপর তোমরা কি কর তা তিনি লক্ষ করবেন!"

এই যে হযরত মূসা আ. তার সম্প্রদায় বনি ইসরাঈলকে প্রতিশ্রুতি দিলেন, কিবতিদের বিরুদ্ধে অবশেষে তাদেরই জয় হবে, কালে এরূপই হয়েছিল। এ ছিল নবুয়তের সত্যতার একটি প্রমাণ। যা হোক। আমরা মুমিন বান্দার উপদেশ, নসিহত ও যুক্তি-প্রমাণের দিকে লক্ষ করি। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ (٣٨) يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ (٣٩) مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

"মুমিন ব্যক্তিটি বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালনা করব। হে আমার সম্প্রদায়! এ পার্থিব জীবন তো অস্থায়ী উপভোগের বস্তু এবং আখিরাতই হচ্ছে চিরস্থায়ী আবাস। কেউ মন্দকাজ করলে সে কেবল তার কর্মের অনুরূপ শাস্তি পাবে এবং পুরুষ কিংবা নারীর মধ্যে যারা মুমিন হয়ে সৎকর্ম করবে তারা দাখিল হবে জান্নাতে। সেখানে তাদেরকে দেওয়া হবে অপরিমিত জীবনোপকরণ।" (সূরা মুমিন : ৩৮-৪০)

অর্থাৎ, মুমিন বান্দাটি তাদেরকে সঠিক ও সত্য পথের দিকে আহবান করছেন। বলছেন, তোমরা আল্লাহর নবী মূসা আ.-এর অনুসরণ করো এবং তিনি আপন প্রতিপালকের কাছ থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন, তা সত্য বলে স্বীকার করো। সাথে সাথে তিনি তাদেরকে নশ্বর ও নিকৃষ্ট দুনিয়ার মোহ থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিচ্ছেন। তাদেরকে অনুপ্রাণিত করছেন আল্লাহ তাআলার কাছে সওয়াব অন্বেষণের জন্যে, যিনি কোনো আমলকারীর আমলকে বিনষ্ট করেন না। তিনি এমনই শক্তিশালী যাঁর কাছে প্রতিটি বস্তুর কর্তৃত্ব রয়েছে, যিনি কম আমলের জন্যে বেশি সওয়াব প্রদান করেন। কিন্তু মন্দ কর্মের প্রতিদান তার বেশি প্রদান করেন না। আরো বলছেন, আখিরাতই হচ্ছে চিরস্থায়ী আবাস, যারা আখেরাতের প্রতি অটল ঈমান রেখে সৎকাজ করে যায়, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতের সুউচ্চ ও নিরাপদ প্রাসাদমালা, অসংখ্য কল্যাণ। এবং চিরস্থায়ী অক্ষয় রিযিক ও ক্রমবর্ধমান কল্যাণসমূহ।

এরপর তারা যে মতবাদে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, তার অসারতা এবং যেখানে প্রত্যাবর্তন করবে, তার সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করে তিনি বলেন :

وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ (٤١) تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ (٤٢) لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ (٤٣) فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (٤٤) فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ (٤٥) النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ

"হে আমার সম্প্রদায়! কি আশ্চর্য আমি তোমাদেরকে আহবান করছি মুক্তির দিকে আর তোমরা আমাকে ডাকছ আগুনের দিকে! তোমরা আমাকে বলছ আল্লাহকে

অস্বীকার করতে এবং তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাতে, যার সম্পর্কে আমার কোনো জ্ঞান নেই। পক্ষান্তরে আমি তোমাদেরকে আহবান করছি, পরাক্রমশালী ক্ষমাশীল আল্লাহর দিকে। নিঃসন্দেহে তোমরা আমাকে আহবান করছ এমন বস্তুর দিকে, যা দুনিয়া ও আখিরাতের কোথাও আহ্বানযোগ্য নয়। বস্তুত আমাদের প্রত্যাবর্তন তো আল্লাহর কাছে এবং সীমালঙ্ঘনকারীরাই জাহান্নামের অধিবাসী। আমি তোমাদেরকে যা বলছি, তোমরা তা অচিরেই স্মরণ করবে এবং আমি আমার ব্যাপার আল্লাহ্ কাছে অর্পণ করছি। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন। তারপর আল্লাহ তাকে তাদের ষড়যন্ত্রের অনিষ্ট হতে রক্ষা করলেন আর কঠিন শাস্তি পরিবেষ্টন করল ফেরাউন সম্প্রদায়কে। তাদেরকে উপস্থিত করা হয় আগুনের সম্মুখে সকাল ও সন্ধ্যায় এবং যেদিন কেয়ামত ঘটবে। সেদিন বলা হবে ফেরাউন সম্প্রদায়কে নিক্ষেপ কর কঠিন শাস্তিতে।"

(সূরা মুমিন : ৪১-৪৬)

বস্তুত মুমিন বান্দাটি ফেরাউন সম্প্রদায়কে পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীর এমন প্রতিপালকের ইবাদতের প্রতি আহবান করছিলেন, যিনি কোনো বস্তুকে সৃষ্টি করতে হলে শুধু বলেন– 'হয়ে যাও' আর তখনই হয়ে যায়। অন্যদিকে তারা তাকে আহবান করছিল পথভ্রষ্ট মূর্খ ও অভিশপ্ত ফেরাউনের ইবাদতের প্রতি। এ জন্যই তিনি তাদের বলেছিলেন

وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ (٤١) تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ

এরপর তিনি তাদের কাছে তাদের অবস্থান তুলে ধরলেন। তোমরা এক আল্লাহ তাআলা ছাড়া এমন দেব-দেবীর ও মূর্তির পূজা-অর্চনা করছ, যারা তাদের কোনো প্রকার উপকার বা ক্ষতিসাধন করতে পারে না। কাজেই তিনি বলেন :

لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ

তোমাদের দেব-দেবীগুলো নিশ্চিত এ দুনিয়ায় কোনো প্রকার ক্ষমতা প্রয়োগ বা কর্তৃত্বের অধিকারী নয়। তা হলে চিরস্থায়ী আবাসস্থলে এরা কেমন করে এসবের অধিকারী হবে? অথচ আল্লাহ তাআলা মহা পরাক্রমশালী, সৃষ্টিকর্তা এবং নেককার ও বদকার সকলের রিযিকদাতা। তিনি বান্দাদের জীবিত করেন, মৃত্যুদান করেন এবং তাদের মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত করবেন। এরপর তাদের মধ্যে যারা নেককার, তাদেরকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করাবেন আর অবাধ্যদেরকে প্রবিষ্ট করাবেন জাহান্নামে।

এরপরও যখন তারা তাদের অবাধ্যতায় অটল থাকল, তখন তিনি তাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, "আমি তোমাদেরকে যা বলছি তা অচিরেই তোমরা স্মরণ করবে এবং আমি আমার ব্যাপার আল্লাহর কাছে অর্পণ করছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি সর্বশেষ দৃষ্টি রাখেন।" এভাবে মুমিন বান্দাটি ফেরাউন সম্প্রদায়ের অনুসরণকে

অস্বীকার করেন। কিন্তু তাদের কুফরির দরুন তাদের ওপর আল্লাহ তাআলা যে কঠিন আযাব-গযব অবতীর্ণ করেন তা থেকে আল্লাহ তাকে রক্ষা করেন। আর তারা তার বিরুদ্ধে ও আল্লাহ তাআলার সরল পথ থেকে জনগণকে বিপথে রাখার জন্যে বিভিন্ন মনগড়া ধ্যান-ধারণা প্রচার করে তারা মুমিন বান্দা ও বনি ইসরাঈলের অন্যান্য সদস্যের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেছিল তা থেকে তিনি তাঁকে নিরাপদে রাখলেন। অন্যদিকে তাদেরকে আল্লাহ তাআলার আযাব-গযব বেষ্টন করল। তা ছাড়া কবরে তাদের রূহসমূহকে সকাল-সন্ধ্যায় আগুনের সামনে উপস্থিত করা হয় আর যেদিন কিয়ামত ঘটবে সেদিন বলা হবে, "ফেরাউন সম্প্রদায়কে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর।"

মোটকথা হল, আল্লাহ তাআলা কোনো সম্প্রদায়কে দলিল পূর্ণকরণ ও রাসূল প্রেরণ ছাড়া ধ্বংস করেন না। সুতরাং ফেরাউন সম্প্রদায়ের কাছে দলিল-প্রমাণাদি ও রাসূল প্রেরণ করে আল্লাহ তাআলার প্রমাণাদির ব্যাপারে তাদের সন্দেহ নিরসন করেন। কখনো ভয়ভীতি প্রদর্শন আবার কখনো অনুপ্রেরণা দানের মাধ্যমে তাদের প্রতি রাসূল প্রেরণের পর তারা অমান্য করাতে তিনি তাদেরকে ধ্বংস করেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (١٣٠) فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (١٣١) وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (١٣٢) فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ

"আমি তো ফেরাউনের অনুসারীদেরকে দুর্ভিক্ষ ও ফল-ফসলের ক্ষতির দ্বারা আক্রান্ত করেছি, যাতে তারা অনুধাবন করে। যখন তাদের কোনো কল্যাণ হত, তারা বলত– এ তো আমাদের প্রাপ্য। আর যখন কোনো অকল্যাণ হত, তখন তারা মূসা ও তার সঙ্গীদেরকে অলুক্ষণে গণ্য করত। মনে রেখো! তাদের অকল্যাণ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন; কিন্তু তাদের অধিকাংশ এটা জানে না। তারা বলল, আমাদেরকে জাদু করার জন্যে তুমি যে কোনো নিদর্শন আমাদের নিকট পেশ কর না কেন, আমরা তোমাকে বিশ্বাস করব না। তারপর আমি তাদেরকে প্লাবন, পঙ্গপাল, উকুন, ভেক ও রক্ত দ্বারা ক্লিষ্ট করি। এগুলো স্পষ্ট নিদর্শন, কিন্তু তারা দাম্ভিকই রয়ে গেল। আর তারা ছিল এক অপরাধী সম্প্রদায়।" (সূরা আরাফ : ১৩০-১৩৩)

এখানে আল্লাহ তাআলা জানাচ্ছেন, তিনি ফেরাউনের সম্প্রদায় কিবতিদেরকে দুর্ভিক্ষ দ্বারা ক্লিষ্ট করেছেন। 'দুর্ভিক্ষের বছরগুলো বলতে এমন সব বছরকে বুঝানো হয়,

যেগুলোয় ফসল হয় না এবং গবাদি পশুর দুধ দ্বারাও মানুষ উপকৃত হতে পারে না। দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও তারা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে উপকৃত হতে পারে নি। বরং তারা আরো অবধ্য হয়ে উঠে এব কুফরি ও হঠকারিতার মধ্যে অবিচল থাকে। যখন তাদের কোনো কল্যাণ হত, প্রচুর ফসলাদি হত, তখন তারা বলত –এটা আমাদেরই, এটা আমাদের ন্যায্য পাওনা এবং আমরাই এর উপযুক্ত। আর যখন কোনো অকল্যাণ হত, তখন তারা বলত– এটা মূসা ও তার সঙ্গীরা অলক্ষুণে হওয়ার কারণে আমাদের ওপর আরোপিত হয়েছে। অথচ তারা কল্যাণের সময় বলত না, এটা মূসা ও তার সঙ্গীদের বরকতে কিংবা তাদের শুভ অবস্থানের দরুন হয়েছে। তাদের অন্তরসমূহ দাম্ভিক ও অস্বীকারকারী এবং সত্য থেকে বিমুখ। তাই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ

আল্লাহ তাদেরকে এ কথার জন্যে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করবেন। কিন্তু তারা কোনোভাবেই তাঁকে বিশ্বাস করল না। অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে এ সম্পর্কে ইরশাদ করেন :

إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ (٩٦) وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ

حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (٩٧)

"নিশ্চয়ই যাদের বিরুদ্ধে তোমার প্রতিপালকের বাক্য সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছে, তারা ঈমান আনবে না; যদিও তাদের কাছে প্রত্যেকটি নিদর্শন আসে, যতক্ষণ না তারা মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে।" (সূরা ইউনুস : ৯৬-৯৭)

পূর্বোক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাদের শাস্তি প্রসঙ্গে যে বলেছেন :

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ

এই الطُّوفَانَ শব্দের অর্থ সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, অধিকহারে বৃষ্টিপাত হওয়া। যাতে ফসলাদি ও ফলমূল বিনষ্ট হয়ে যায়। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে অন্য বর্ণনা মতে তুফানের অর্থ : বিপুলহারে মৃত্যুবরণ। মুজাহিদ রহ. বলেন, তুফান-এর অর্থ : সর্বাবস্থায়ই প্লাবন এবং প্লেগ। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে অন্য একটি বর্ণনা মতে তুফানের অর্থ হচ্ছে : প্রতিটি মুসিবত, যা জনগণকে বেষ্টন করে ফেলে। ইবনে জারীর ও ইবনে মারদূইয়্যাহ রহ. হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : 'তুফানের অর্থ মৃত্যু'। এ হাদিসটি গরীব পর্যায়ের।

আয়াতে উল্লিখিত اَلْجَرَادُ শব্দটির অর্থ যে পঙ্গপাল, তা সুবিদিত। সালমান ফারসী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ

প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলার বাহিনীসমূহের মধ্যে এগুলোর সংখ্যাই সর্বাধিক। এগুলো আমি খাই না এবং এগুলো খাওয়াকে হারামও বলি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রুচি-বিরুদ্ধ হওয়ার জন্যেই তিনি পঙ্গপাল খাওয়া থেকে বিরত থাকতেন। যেমন তিনি গুঁইসাপ খাওয়া থেকে বিরত ছিলেন এবং কাঁচা পেঁয়াজ-রসুন খাওয়া থেকেও বিরত থাকতেন।

বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ে আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা রাযি. হতে বর্ণিত : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাতটি যুদ্ধে যোগদান করেছি। সে সময় আমরা পঙ্গপাল খেতাম। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদিসসমূহ নিয়ে তাফসিরে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সারকথা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা তাদের শস্য-শ্যামল মাঠ ধ্বংস করে দিলেন। তাদের ফল-ফসলাদি ও গবাদি পশু কিছুই বাকি রইল না, সবই ধ্বংস হয়ে গেল।

আয়াতে উল্লিখিত اَلْقُمَّل এর অর্থ সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত আছে : قُمَّل হচ্ছে এমন একটি পোকা, যা গম থেকে বের হয়ে আসে। এ বর্ণনাকারী থেকে অন্য একটি বর্ণনা রয়েছে : قُمَّل -এর অর্থ হচ্ছে, এমন ছোট পঙ্গপাল, যার পাখা নেই। সাঈদ ইবনে জুবাইর রাযি. ও হাসান বসরী রহ. বলেন : قُمَّل হচ্ছে এমন একটি জীব, যা কালো ও ছোট।

আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম রহ. বলেন : قُمَّل হচ্ছে পাখাবিহীন মাছিসমূহ। ইবনে জারীর রহ. আরবি ভাষাভাষীদের বরাতে বর্ণনা করেছেন : قُمَّل অর্থ, উকুন বা পরজীবী কীট বিশেষ। উকুন দলে দলে তাদের ঘরে ও বিছানায় প্রবেশ করে এবং তাদের প্রতি অশান্তি ঘটায়। ফলে তাদের পক্ষে ঘুমানো সম্ভব হত না। তাদের জীবন একদম দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। وَالضَّفَادِعَ অর্থ, ব্যাঙ। এটা একটি বহুল পরিচিত প্রাণী। এগুলো তাদের খাবারে ও বাসনপত্রে লাফিয়ে পড়ত। এমনকি তাদের কেউ যদি খাওয়ার বা পান করার জন্যে মুখ খুলত, অমনি ওগুলো মুখে ঢুকে পড়ত। রক্তের ব্যাপারটিও ছিল অনুরূপ। যখন তারা পানি পান করতে যেত তখনই পানিকে রক্ত মিশ্রিত পেত। নীল নদের পানি পান করতে গেলেও তারা তার পানি রক্ত মিশ্রিত পেত। মোটকথা, কোনো নদী-নালা বা কূয়া ছিল না, যার পানি ব্যবহারের সময় রক্ত মিশ্রিত মনে না হত। বনি ইসরাঈল বংশীয়রা এসব উপদ্রব থেকে মুক্ত ছিল। এগুলো ছিল পরিপূর্ণ অলৌকিক ঘটনা ও অকাট্য প্রমাণাদি, যা মূসা আ.-এর কাজের মাধ্যমে তাদের জন্যে প্রকাশ পেয়েছিল। বনি ইসরাঈলের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই এভাবে লাভবান হয়েছিল। এসব ব্যাপার ছিল তাদের জন্য উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক রহ. বলেন, জাদুকররা যখন প্রতিযোগিতায় পরাস্ত ও ব্যর্থকাম হয়ে ঈমান আনয়ন করল তখনও আল্লাহর শত্রু ফেরাউন তার কুফরি ও দুষ্কর্মে অবিচল রইল। তখন আল্লাহ একে একে তার সম্মুখে নিদর্শনাদি প্রকাশ করেন। প্রথমে

দুর্ভিক্ষ এবং তারপর তুফান অবতীর্ণ করেন। এরপর পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ ও রক্ত স্পষ্ট নিদর্শন হিসেবে একটির পর একটি প্রেরণ করেন। প্লাবনের ফলে তারা ঘর থেকে বের হতে পারত না এবং কোনো প্রকার কাজ-কর্মও করতে পারত না। ফলে তারা দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হয়।

এরূপে তারা যখন দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হল, তখন তারা মূসা আ.-কে বলতে লাগল :

يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ

"হে মূসা! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্যে প্রার্থনা কর, তোমার সাথে তিনি যে অঙ্গীকার করেছেন। সে মতে যদি তুমি আমাদের উপর থেকে শাস্তি অপসারিত করতে পার, তবে আমরা তো তোমাও ঈমান আনবই এবং বনি ইসরাঈলকেও তোমার সাথে অবশ্যই যেতে দিব।" (সূরা আরাফ : ১৩৪)

তখন মূসা আ. তার প্রতিপালকের কাছে দোয়া করেন। আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর থেকে তার প্রেরিত শাস্তি অপসারিত করেন। কিন্তু তারা তখন নিজেদের অঙ্গীকার পূরণ করল না। বিধায় আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি পঙ্গপাল অবতীর্ণ করেন। পঙ্গপাল তাদের সব গাছপালা নিঃশেষ করে ফেলে। এমনকি তাদের ঘরের দরজাসমূহের লোহার পেরেকগুলো পর্যন্ত খেতে থাকে। ফলে তাদের ঘরবাড়িগুলো ধসে-খসে পড়তে থাকে। তখন তারা পূর্বের মতো মূসা আ.-কে আল্লাহ তাআলার দরবারে দোয়া করার জন্য অনুরোধ জানায়। মূসা আ. তাঁর প্রতিপালকের কাছে দোয়া করেন। ফলে তাদের ওপর থেকে এ আযাব রহিত হয়ে যায়। কিন্তু এবারও তারা তাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করল না। তখন আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি উকুন প্রেরণ করেন।

বর্ণনাকারী বলেন, মূসা আ.-কে একটি বালুর ঢিবির কাছে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আরো আদেশ দেওয়া হয়েছিল, তিনি যেন তাঁর লাঠি দ্বারা তাতে আঘাত করেন। তারপর মূসা আ. একটি বড় ঢিবির দিকে গিয়ে তাতে আপন লাঠি দ্বারা আঘাত করলেন। ফলে তাদের মধ্যে উকুন ছড়িয়ে পড়ল। এমনকি উকুন তাদের ঘরবাড়ি ও খাদ্য-সম্ভারের উপর ছড়িয়ে পড়তে লাগল। তাদের নিদ্রা ও শান্তি বিঘ্নিত হতে লাগল। যখন তারা এ মুসিবতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল, তখন তারা আবারো মূসা আ.-কে পূর্বের মতো আল্লাহর দরবারে দুআর জন্য অনুরোধ জানাল। এরপর মূসা আ. তাঁর প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর থেকে আযাব হটিয়ে দিলেন। কিন্তু তারা এখনো তাদের অঙ্গীকার কিছুই পূরণ করল না। তাই আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর ব্যাঙ প্রেরণ করেন। সুতরাং তাদের ঘরবাড়ি, খানাপিনা ও হাঁড়ি-পাতিল ব্যাঙে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। তাদের কেউ যখনই কোনো কাপড় কিংবা খাবারের ঢাকনা উঠাত, অমনি তারা দেখতে পেত, সেগুলো ব্যাঙে ভরে আছে। এ মুসিবতে যখন

তারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠল, তখন তারা আগের মতো মূসা আ.-এর কাছে দুআর জন্য অনুরোধ জানাতে লাগল। মূসা আ. তাঁর প্রতিপালককে ডাকলেন এবং তিনি তাদের ওপর থেকে আযাব বিদূরিত করলেন। কিন্তু তারা তাদের প্রতিশ্রুতি মোটেও রক্ষা করল না। তাই আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি রক্তের শাস্তি প্রেরণ করেন। ফেরাউন সম্প্রদায়ের পানি উৎসগুলো রক্তে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। তারা যখনই কোনো কূয়া, নদীনালা ও পাত্র থেকে পানি পান করতে ইচ্ছে করত এগুলো রক্তে পরিণত হয়ে যেত। যায়দ ইবনে আসলাম বলেন, উপর্যুক্ত আয়াতে উল্লিখিত دَمٌ শব্দটির অর্থ, رعاف বা নাক থেকে ঝরা রক্ত। বর্ণনাটি ইবনে আবী হাতিমের।

এ সম্পর্কে আল্লাহ ত'আলা ইরশাদ করেন :

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (١٣٤) فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ (١٣٥) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ

"এবং যখন তাদের উপর শাস্তি আসত তারা বলত, হে মূসা! তুমি তোমার প্রতিপালকের কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা কর, তোমার সাথে তিনি যে অঙ্গীকার করেছেন সে অনুযায়ী। যদি তুমি আমাদের উপর থেকে শাস্তি অপসারিত কর, তবে আমরা তো তোমাতে ঈমান আনবই এবং বনি ইসরাঈলকেও তোমার সাথে অবশ্যই যেতে দিব। এরপর আমি যখনই তাদের ওপর থেকে শাস্তি অপসারিত করতাম এবং নির্দিষ্ট কালের জন্যে যা তাদের উপর নির্ধারিত ছিল, তারা তখনই তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করত। সুতরাং আমি তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি এবং তাদেরকে অতল সমুদ্রে নিমজ্জিত করেছি। কারণ, তারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করত এবং এ সম্বন্ধে তারা ছিল গাফেল।" (সূরা আরাফ ১৩৪-১৩৬)

এ আয়াতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, যখনই তারা আল্লাহর কোনো নিদর্শন প্রত্যক্ষ করত এবং মুসিবতের শিকার হত, তখনই তারা মূসা আ.-এর কাছে শপথ করে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হত, তাদের ওপর থেকে যদি এসব মুসিবত দূরীভূত হয়ে যায়, তা হলে ফেরাউন মূসা আ.-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং মূসা আ.-এর দলের লোকদেরকে মূসা আ.-এর সাথে যেতে দেবে। অথচ যখনই তাদের উপর থেকে আযাব-গযব উঠিয়ে নেওয়া হত, তখনই তারা দুষ্কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ত এবং প্রেরিত সত্যকে প্রত্যাখ্যান করতে শুরু করত; মূসা আ.-এর দিকে ফিরেও তাকাত না। তখন আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি অন্য একটি নিদর্শন বা মুসিবত অবতীর্ণ করতেন, যা পূর্বের প্রেরিত নিদর্শন ও মুসিবত থেকে অধিকতর কষ্টদায়ক হত। তখন তারা আবারও মূসা আ.-এর প্রতি বিশ্বাস

স্থাপনের মৌখিক অঙ্গীকার করত। কিন্তু পরে তারা মিথ্যাচারে লিপ্ত হত এবং প্রতিশ্রুত অঙ্গীকার পূরণ করত না। পুনরায় তারা তাদের নিরেট মূর্খতা ও বোকামিতে ফিরে যেত। কিন্তু মহা পরাক্রমশালী, ধৈর্যশীল আল্লাহ তাআলা তাদেরকে অবকাশ দিতেন এবং তড়িঘড়ি করে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করতেন না, তাদেরকে দিতেন সংশোধনের সুযোগ, সতর্ক করতেন আযাব-গযবের ব্যাপারে। অবশেষে তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণাদি পূর্ণ করার পর তাদেরকে কঠোরভাবে পাকড়াও করলেন। যাতে এটা পরবর্তীদের জন্য শিক্ষণীয় এবং তাদের মতো অন্যান্য কাফেরের জন্য উপমা স্বরূপ আর মুমিন বান্দাদের মধ্য থেকে যারা নসিহত গ্রহণ করে তাদের জন্যে একটি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা সূরা যুখরুফে ইরশাদ করেন :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٤٦) فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ (٤٧) وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٤٨) وَقَالُوا يَا أَيُّهَ السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ (٤٩) فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ (٠) وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ (٥١) أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ (٥٢) فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ (٥٣) فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (٥٤) فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ () فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ

মূসাকে আমি আমার নিদর্শনসহ ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গের কাছে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, আমি তো জগতসমূহের প্রতিপালকের প্রেরিত। সে ওদের নিকট আমার নিদর্শনসহ আসা মাত্র তারা তা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতে লাগল। আমি তাদেরকে এমন কোনো নিদর্শন দেখাই নি, যা এটার অনুরূপ নিদর্শন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়। আমি তাদেরকে শাস্তি দিলাম যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে। তারা বলেছিল, হে জাদুকর! তোমার প্রতিপালকের নিকট তুমি আমাদের জন্য তা প্রার্থনা কর যা তিনি তোমার সাথে অঙ্গীকার করেছেন; তা হলে আমরা অবশ্যই সৎপথ অবলম্বন করব। তারপর যখন আমি তাদের ওপর থেকে শাস্তি বিদূরিত করলাম, তখনই তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে বসল। ফেরাউন তার সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বলে ঘোষণা করল, হে আমার সম্প্রদায়! মিসর রাজ্য কি আমার নয়? আর এ নদীগুলো আমার পাদদেশে প্রবাহিত, তোমরা এটা দেখ না? আমি তো শ্রেষ্ঠ এই ব্যক্তি থেকে, যে হীন এবং স্পষ্ট কথা বলতেও অক্ষম। মূসাকে কেন দেওয়া হল না স্বর্ণবলয় অথবা তার সঙ্গে কেন আসল না ফেরেশতাগণ দলবদ্ধভাবে? এভাবে সে তার সম্প্রদায়কে হতবুদ্ধি করে দিল। ফলে ওরা

তার কথা মেনে নিল। ওরা তো ছিল এক সত্যত্যাগী সম্প্রদায়! যখন ওরা আমাকে ক্রোধান্বিত করল আমি তাদেরকে শাস্তি দিলাম এবং নিমজ্জিত করলাম তাদের সকলকে। তারপর পরবর্তীদের জন্য আমি তাদেরকে করে রাখলাম উপাখ্যান ও দৃষ্টান্ত। (সূরা যুখরুফ : ৪৬-৫৬)

সেকালে কাউকে 'জাদুকর' সম্বোধন দোষণীয় বলে বিবেচিত হত না। কেননা আলেমদেরকে সে যুগে জাদুকর বলে আখ্যায়িত করা হতো। এ জন্যই তারা প্রয়োজনের সময় মূসা আ.-কে জাদুকর বলে সম্বোধন করে এবং তাঁর কাছে অনুনয়-বিনয় করে তাদের আরযি, পেশ করে। ফেরাউন তার রাজ্যের বিশালতা, সৌন্দর্য ও বহমান নদী-নালা নিয়ে গর্ববোধ করত। আবার তার নিজের দৈহিক সৌন্দর্য নিয়েও গর্ব করত। তাই একপর্যায়ে আল্লাহর রাসূল মূসা আ.-এর দোষত্রুটি বর্ণনা করতে শুরু করে। বাল্যকালের একটি ঐতিহাসিক ঘটনার কারণে স্পষ্ট কথাবার্তা বলতে মূসা আ. না পারাকেও সে ত্রুটিরূপে চিহ্নিত করে। অথচ এটা তাঁর সঙ্গে আল্লাহ তাআলার কথোপকথন, তাঁর কাছে ওহি প্রেরণ এবং তাঁর কাছে তাওরাত অবতীর্ণ করার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার অন্তরায় হয় নি।

তদুপরি সে মূসা আ.-এর স্বর্ণবলয় ও শরীরে সাজসজ্জা না থাকাকেও ত্রুটি বলে আখ্যায়িত করে। অথচ এটা হল নারীদের ভূষণ। তাই এসব কথা নবীদের সঙ্গে তো দূরের কথা সাধারণ পুরুষের জন্যও শোভনীয় নয়। কেননা নবীগণ জ্ঞান-বুদ্ধি, মারেফাত, সাহস, পরহেজগারী ও জ্ঞান ইত্যাদি সব দিক দিয়ে অধিকতর পরিপূর্ণ পুরুষ।

বলা বাহুল্য, ফেরেশতাগণ কেন মূসা আ.-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন না? এ আপত্তিটি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। কেননা মূসা আ.-এর চেয়ে কম মর্যাদাসম্পন্ন লোককেও ফেরেশতাগণ অনেক সময় সম্মান করে থাকেন। কাজেই ফেরেশতা দলবদ্ধভাবে মূসা আ.-এর সঙ্গে আগমন করা নবুয়তের মর্যাদার জন্য শর্ত নয়। হাদিস শরীফে রয়েছে–রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'যখন তালেবে ইলম-দীন শিক্ষার্থীগণ আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনে ইলম শিক্ষার জন্যে ঘর থেকে বের হয়, তখন তাদের সম্মানার্থে ফেরেশতাগণ তাদের চলার পথে তাদের পাখা বিস্তার করে দেন। সুতরাং মূসা আ.-এর প্রতি ফেরেশতাগণের সম্মান, বিনয় প্রদর্শন যে কী পর্যায়ের ছিল, তা সহজেই অনুমেয়। আর যদি প্রশ্ন করা হয়, মূসা আ.-এর নবুয়তের পক্ষে ফেরেশতাগণ সাক্ষীরূপে উপস্থিত হন না কেন ? তা হলে তার জেনে রাখা উচিত, আল্লাহ তাআলা মূসা আ.-এর রিসালাতকে এমন সব মুজিযা ও মজবুত দলিলাদি দ্বারা শক্তিশালী করেছেন, যা জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ এবং সত্য সন্ধানীদের কাছে সুপ্রমাণিত। কিন্তু এসব মুজিযা ও মজবুত দলিলাদির ব্যাপারে ওইসব ব্যক্তি অন্ধ, যারা সারবস্তু ছেড়ে কেবল ছাল-বাকল নিয়েই ব্যস্ত থাকে। যাদের অন্তরে আল্লাহ তাআলা মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তাদের অন্তর সংশয় সন্দেহের দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। যেমনটা ক্ষমতার মোহে অন্ধ ও মিথ্যাচারী কিবতি বংশীয় ফেরাউনের ক্ষেত্রে ঘটেছিল।

তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা সূরা কাসাসে বলেন :

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ (٣٦) وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (٣٧) وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٣٨) وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ (٣٩) فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ (٤٠) وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ (٤١) وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ

"মূসা আ. যখন ওদের কাছে আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনগুলো নিয়ে আসল, ওরা বলল– এটা তো অলীক ইন্দ্রজাল মাত্র। আমাদের পূর্ব-পুরুষেরকালে কখনো এরূপ কথা শুনি নি। মূসা বলল, আমার প্রতিপালক সম্যক অবগত, কে তাঁর কাছ থেকে পথ-নির্দেশ এনেছে এবং আখেরাতে কার পরিণাম শুভ হবে ? জালেমরা কখনো সফলকাম হবে না। ফেরাউন বলল, হে পরিষদবর্গ! আমি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ রয়েছে বলে আমি জানি না। হে হামান! তুমি আমার জন্য ইট পোড়াও এবং একটি সুউচ্চ প্রাসাদ তৈরি কর, হয়তো আমি এতে উঠে মূসার ইলাহকে দেখতে পাব। তবে আমি অবশ্য মনে করি, সে মিথ্যাবাদী। ফেরাউন ও তার বাহিনী অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে অহংকার করেছিল এবং ওরা মনে করেছিল, ওরা আমার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে না। অতএব, আমি তাকে ও তার বাহিনীকে ধরলাম এবং তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। দেখ, জালেমদের পরিণাম কী হয়ে থাকে। ওদেরকে আমি নেতা করেছিলাম। ওরা লোকদেরকে জাহান্নামের দিকে আহবান করত; কেয়ামতের দিন ওদেরকে সাহায্য করা হবে না। এ পৃথিবীতে আমি ওদের পশ্চাতে লাগিয়ে দিয়েছি অভিসম্পাত এবং কেয়ামতের দিন ওরা হবে ঘৃণিত।" (সূরা কাসাস : ৩৬-৪২)

যখন ফেরাউন ও তার দলের লোকদের উপর মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলার ক্রোধ তীব্র আকার ধারণ করল, যার বিরুদ্ধে কেউ জয়লাভ করতে পারে না এবং যাকে কেউ প্রতিহত করতে পারে না, তখনই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিলেন; একদিন প্রত্যুষে ডুবিয়ে দিলেন ফেরাউন ও তার সৈন্য-সামন্তকে। ফলে তাদের মধ্যকার কোনো ব্যক্তি বা তাদের বাসস্থানের কোনো অস্তিত্ব বাকি রইল না। তারা সকলে ডুবে গেল ও দোযখবাসী হল। এ পৃথিবীতে বিশ্ববাসীর মাঝে তারা অভিসম্পাতের শিকার হল এবং কেয়ামতের দিনেও। কেয়ামতের দিনে তাদের পুরস্কার কতই না নিকৃষ্ট হবে এবং তারা হবে চরম ঘৃণিত।

contents

ফেরাউন ও তার বাহিনী ধ্বংসের বিবরণ

বাদশা ফেরাউনের আনুগত্য স্বীকার এবং আল্লাহর নবী মূসা ইবনে ইমরান আ.-এর বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়ে মিসরের কিবতিরা যখন তাদের কুফরি, অবাধ্যতা ও সত্য বিমুখতায় অবস্থান দীর্ঘায়িত হতে লাগল; আল্লাহ তাআলা তখন মিসরবাসীর কাছে বিস্ময়কর ও সুস্পষ্ট প্রমাণাদি পেশ করেন এবং তাদেরকে এমন সব অলৌকিক ঘটনা দেখান যাতে চোখ ঝলসে যায় এবং মানুষ হতবিহ্বল হয়ে পড়ে। এতদসত্ত্বেও তাদের কিছু সংখ্যক ছাড়া কেউ বিশ্বাস স্থাপন করে নি; অন্যায় থেকে প্রত্যাবর্তন করে নি; জোর-জুলুম-অত্যাচার থেকে বিরত থাকে নি। কেউ কেউ বলেন, তাদের মধ্যে মাত্র তিন ব্যক্তি ঈমান এনেছিলেন। একজন হচ্ছেন ফেরাউনের স্ত্রী। কিবতীরা তাঁর সম্বন্ধে মোটেও অবহিত ছিল না। দ্বিতীয়জন হচ্ছেন ফেরাউনের সম্প্রদায়ের মুমিন ব্যক্তিটি, যার নসিহত প্রদান, পরামর্শ দান ও তাদের বিরুদ্ধে দলিলাদি পেশ করার বিষয়টি সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। তৃতীয়জন হচ্ছেন, শহরের দূর প্রান্ত থেকে ছুটে আসা ব্যক্তি, যিনি মূসা আ.-কে তাঁর বিরুদ্ধে সাজানো ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে অবহিত করেছিলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.-এর অভিমত হল, এ তিনজন হচ্ছেন জাদুকরদের বাইরে। কেননা জাদুকররাও কিবতিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেন, ফেরাউনের সম্প্রদায় কিবতিদের থেকে একটি দল ঈমান এনেছিল। জাদুকরদের সকলে এবং বনি ইসরাঈলদের সকল গোত্রই ঈমান এনেছিল। কুরআন মাজিদে নিম্নোক্ত আয়াতে এর ইঙ্গিত পাওয়া যায় :

فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ
لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ

"ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গ নির্যাতন করবে এ আশঙ্কায় তার সম্প্রদায়ের একদল ছাড়া আর কেউই তার প্রতি ঈমান আনে নি। যমিনে তো ফেরাউন পরাক্রমশালী ছিল এবং সে অবশ্যই সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত।" (সূরা ইউনুস : ৮৩)

মোটকথা, তারা ঈমান এনেছিল গোপনে। কেননা তারা ফেরাউন ও তার প্রতিপত্তি এবং তার সম্প্রদায়ের অত্যাচার, অবিচার ও নিষ্ঠুরতাকে ভয় করত। তারা আরো ভয় করত, যদি ফেরাউনের লোকেরা তাদের ঈমানের কথা জানতে পারে, তা হলে তারা তাদেরকে ধর্মচ্যুত করে ফেলবে। তদুপরি সে তার প্রতিটি কাজে, আচরণে ও ব্যবহারে ছিল সীমালঙ্ঘনকারী।

এক কথায় সে ছিল এমন একটি মারাত্মক জীবাণু, যার ধ্বংস ছিল সময়ের ব্যাপার মাত্র। সে ছিল এমন এক নিকৃষ্ট ফল, যার কাটার সময় ছিল অত্যাসন্ন। সে ছিল এমন অভিশপ্ত অগ্নিশিখা, যার নির্বাপন ছিল সুনিশ্চিত।

মূসা আ. যখন তাঁর সম্প্রদায়কে আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা, আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য প্রার্থনা এবং আল্লাহ তাআলার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করার জন্যে হুকুম

দিলেন, তাঁরা তা মান্য করলেন। তাই আল্লাহ তাআলাও তাদেরকে তাদের বিপদাপদ থেকে উদ্ধার করলেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

"আমি মূসা আ. ও তার ভাইয়ের নিকট প্রত্যাদেশ করলাম, মিসরে তোমাদের সম্প্রদায়ের জন্য গৃহ স্থাপন কর। তোমাদের গৃহগুলোকে ইবাদত গৃহ কর, সালাত কায়েম কর এবং মুমিনদেরকে সুসংবাদ দাও।" (সূরা ইউনুস : ৮৭)

অন্য কথায় আল্লাহ তাআলা মূসা আ. ও তাঁর ভ্রাতা হারূন আ.-কে ওহি মারফত নির্দেশ দিলেন, তারা যেন তাদের সম্প্রদায়ের জন্যে কিবতিদের থেকে আলাদা ধরনের গৃহ নির্মাণ করেন। যাতে তারা নির্দেশ পাওয়া মাত্রই ভ্রমণের জন্যে তৈরি হতে পারে এবং একে অন্যের ঘর সহজে চিনতে পারে ও প্রয়োজনে বের হয়ে পড়ার জন্যে সংবাদ দিতে পারে। এ ছাড়া তারা যেসব অসুবিধা, ক্লেশ, কষ্ট ও সঙ্কীর্ণতায় ভুগছে, তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে অধিকহারে নামায আদায় করে এবং আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। যেমন আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন :

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ

"ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর।" (সূরা বাকারা : ৪৫)

হাদিসে বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো কঠিন বিষয়ের সম্মুখীন হতেন, তখন তিনি নামায আদায় করতেন।

কেউ কেউ বলেন, ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের অত্যাচারের ভয়ে মসজিদ বা মজলিসে প্রকাশ্য ইবাদত কষ্টসাধ্য হওয়ায় ঘরের নির্দিষ্ট স্থানে তাদেরকে সালাত আদায়ের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (٨٨) قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

"মূসা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গকে যা দিয়ে পার্থিব জীবনে শোভা ও সম্পদ দান করেছ, হে আমাদের প্রতিপালক! তারা মানুষকে তোমার পথ থেকে ভ্রষ্ট করে। হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের সম্পদ বিনষ্ট কর, তাদের হৃদয় কঠিন করে দাও। তারা তো মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত ঈমান আনবে না। তিনি প্রতি উত্তরে বললেন, তোমাদের দুজনের দোয়া গৃহীত হল। সুতরাং তোমরা দৃঢ় থাক এবং তোমরা কখনো অজ্ঞদের পথ অনুসরণ করো না।"

(সূরা ইউনুস : ৮৮-৮৯)

অবশেষে আল্লাহ তাআলার শত্রু ফেরাউনের বিপক্ষে মূসা আ. আল্লাহ তাআলার আযাব-গযব অবতীর্ণ হওয়ার জন্যে বদদুআ করলেন। কেননা সে সত্যের অনুসরণ ও আল্লাহ তাআলা সহজ সরল পথ থেকে বিমুখ ও বিচ্যুৎ ছিল। আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত সৎ, সহজ-সরল পথের বিরোধিতা করত, অসত্যকে আঁকড়ে ধরেছিল, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণ এবং যুক্তিগ্রাহ্য দলিলাদি দ্বারা সুপ্রমাণিত বাস্তবতাকে সে অস্বীকার, অগ্রাহ্য ও উপেক্ষা করত। তাই মূসা আ. আরয করলেন, 'হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি ফেরাউন, তার সম্প্রদায় কিবতি ও তার অনুসারী এবং তার ধর্মকর্মের অনুগামীদেরকে পার্থিব জীবনে শোভা ও সম্পদ প্রদান করেছ। তারা পার্থিব সম্পদকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে এবং তারা অজ্ঞ। তারা এ সব সম্পদ, শোভা যথা দামি কাপড়-চোপড়, আরামপ্রদ সুন্দর সুন্দর যানবাহন, সুউচ্চ প্রাসাদ ও প্রশস্ত ঘরবাড়ি, উন্নতমানের সুপ্রসিদ্ধ খাবার-দাবার, শোভাময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, জনপ্রিয় রাজত্ব, প্রতিপত্তি ও পার্থিব হাঁকডাক ইত্যাদিকেই বিরাট কিছু মনে করে। কাজেই رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, اطْمِسْ। অর্থাৎ ধ্বংস করে দাও! কাতাদা রহ. বলেন, তাদের ক্ষেত-খামার সব কিছুই পাথরে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। মুহাম্মদ ইবনে কাব রহ. বলেন, তাদের চিনি জাতীয় দ্রব্যাদি পাথরে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। তিনি আরো বলেন, এরূপ হতে পারে, "তাদের সমুদয় সম্পদ পাথরে পরিণত হয়ে গিয়েছিল।" এ সম্পর্কে উমর ইবনে আবদুল আযীয রহ.-কে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল। তখন তিনি তাঁর এক গোলামকে বললেন, "আমার কাছে একটি থলে নিয়ে এস। নির্দেশানুযায়ী সে একটি থলে নিয়ে আসলে দেখা গেল থলের মধ্যকার ছোলা ও ডিমগুলো পাথরে পরিণত হয়ে আছে।" বর্ণনাটি ইবনে আবু হাতিম রহ.-এর।

মূসা আ. আরো বলেন, وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন : এর অর্থ তাদের অন্তরে মোহর করে দাও"। যা হোক, আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীর বদদুআ কবুল করেন এবং তার আযাব-গযব অবতীর্ণ করেন। যখন মূসা আ. ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের প্রতি অভিশাপ দিয়েছিলেন, তার ভাই হারূন আ. তাঁর দুআর সমর্থনে 'আমীন' বলেছিলেন এবং হারূন আ.-ও দুআ করেছেন বলে জানা যায়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

"তোমাদের দুজনের দুআ কবুল হল। সুতরাং তোমরা দৃঢ় থাক এবং তোমরা কখনো অজ্ঞদের পথ অনুসরণ করবে না।" (সূরা ইউনুস : ৮৯)

তাফসিরকারকগণ বলেছেন, বনি ইসরাঈল তাদের ঈদের উৎসব পালনের উদ্দেশ্যে শহরের বাইরে যাওয়ার জন্যে ফেরাউনের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলে ফেরাউন অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদেরকে অনুমতি প্রদান করল। তারা বের হওয়ার জন্যে প্রস্তুতি নিতে

লাগল এবং পুরোপুরি তৈরি হয়ে গেল। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের সঙ্গে বনি ইসরাঈলের একটি চালাকি মাত্র। যাতে তারা ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের অত্যাচার-অবিচার থেকে মুক্তি পেতে পারে।

তাফসিরকারকগণ বলেন, আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাঈলকে কিবতিদের থেকে স্বর্ণালংকার নেওয়ার জন্যে হুকুম দিয়েছিলেন; তাই তারা কিবতিদের থেকে বহু অলঙ্কার করয-ধার নিয়েছিল। এরপর রাতের অন্ধকারে তারা বের হয়ে পড়ল ও বিরামহীনভাবে অতি দ্রুত পথ অতিক্রম করতে লাগল। যাতে তারা অনতিবিলম্বে সিরিয়ার অঞ্চলে পৌঁছতে পারে। ফেরাউন যখন তাদের মিসর ত্যাগের কথা জানতে পারল, তখন সে তাদের প্রতি চরম ক্রুদ্ধ হল। সে তার সেনাবাহিনীকে প্ররোচিত করল এবং বনি ইসরাঈলকে পাকড়াও করার ও তাদের সমূলে ধ্বংস করার জন্যে তাদের সমবেত করল।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ (٥٢) فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (٥٣) إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ (٥٤) وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ (٥٥) وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ (٥٦) فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (٥٧) وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (٥٨) كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ (٥٩) فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ (٦٠) فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ (٦١) قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ (٦٢) فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ (٦٣) وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ (٦٤) وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ (٦٥) ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ (٦٦) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (٦٧) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

"আমি মূসার প্রতি ওহি অবতীর্ণ করেছিলাম– আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাতের বেলা বের হয়ে পড়। তোমাদের তো পশ্চাদ্ধাবন করা হবে। তারপর ফেরাউন শহরে শহরে লোক সংগ্রহকারী পাঠাল এই বলে, এরা তো ক্ষুদ্র একটি দল; ওরা তো আমাদের ক্রোধ উদ্রেক করেছে এবং আমরা তো সকলেই সদা সতর্ক। পরিণামে আমি ফেরাউন গোষ্ঠীকে বহিষ্কৃত করলাম ওদের উদ্যানরাজি ও প্রস্রবণ থেকে এবং ধনভাণ্ডার ও সুরম্য সৌধমালা থেকে। এরূপই ঘটেছিল এবং বনি ইসরাঈলকে এসবের অধিকারী করেছিলাম। ওরা সূর্যোদয়কালে তাদের পশ্চাতে এসে পড়ল। এরপর যখন দুদল পরস্পরকে দেখল, তখন মূসার সঙ্গীরা বলল, 'আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম।' মূসা বলল, 'কখনই নয়! আমার সঙ্গে আছেন আমার প্রতিপালক; সত্বর তিনি আমাকে পথ-নির্দেশ করবেন।' তারপর মূসার প্রতি ওহি করলাম, তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত

কর! ফলে এটা বিভক্ত হয়ে প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতের মতো হয়ে গেল। আমি সেখানে উপনীত করলাম অপর দলটিকে এবং আমি উদ্ধার করলাম মূসা ও তাঁর সঙ্গী সকলকে। তারপর নিমজ্জিত করলাম অপর দলটিকে। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুমিন নয়। আর তোমার প্রতিপালক– তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।" (সূরা শুআরা : ৫২-৬৮)

তাফসিরকারকগণ বলেন, ফেরাউন যখন বনি ইসরাঈলকে পিছু ধাওয়ার জন্যে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বের হল, তখন তার সাথে ছিল একটি বিরাট সৈন্যদল। ওই সৈন্যদলের ব্যবহৃত ঘোড়ার মধ্যে ছিল এক লাখ উন্নতমানের কালো ঘোড়া আর সৈন্য সংখ্যা ছিল ষোল লাখের ঊর্ধ্বে। প্রকৃত সংখ্যা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলাই সম্যক জ্ঞাত।

কেউ কেউ বলেন, শিশুদের সংখ্যা বাদ দিয়ে বনি ইসরাঈলের মধ্যেই ছিল প্রায় ছয় লাখ যোদ্ধা। মূসা আ.-এর-সাথে বনি ইসরাঈলের মিসর ত্যাগ ও তাদের আদি পিতা ইয়াকুব আ.-এর সঙ্গে মিসর প্রবেশের মধ্যে ছিল চারশ ছাব্বিশ সৌর বছরের ব্যবধান।

ফেরাউন সৈন্যসামন্ত নিয়ে বনি ইসরাঈলকে ধরার জন্যে অগ্রসর হল এবং সূর্যোদয়ের সময়ে তারা পরস্পরের দেখা পেল। তখন সামনাসামনি যুদ্ধ ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। এ সময়ই মূসা আ.-এর অনুসারীগণ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বলতে লাগল, 'আমরা তা হলে ধরা পড়েই গেলাম!' তাদের ভীত হওয়ার কারণ হল, তাদের সম্মুখে ছিল উত্তাল সাগর। সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া তাদের আর কোনো পথ বা গত্যন্তর ছিল না। আবার সাগর পাড়ি দেওয়ার শক্তিও ছিল না। তাদের বাঁ পাশে ও ডান পাশে ছিল সুউচ্চ খাঁড়া পাহাড়। ফেরাউন তাদেরকে একেবারে আটকে ফেলেছিল। মূসা আ.-এর অনুসারীরা ফেরাউনকে তার দলবল ও বিশাল সৈন্যসামন্তসহ অবলোকন করছিল। তারা ফেরাউনের ভয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়ছিল। কেননা তারা ফেরাউনের রাজ্যে ফেরাউন কর্তৃক লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়েছিল। সুতরাং তারা আল্লাহর নবী মূসা আ.-এর কাছে তাদের অবস্থা সম্পর্কে অভিযোগ করল।

তখন আল্লাহর নবী মূসা আ. তাদেরকে অভয় দিয়ে বললেন : كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ –"কখনো নয়; নিশ্চয়ই আমার সাথে আমার প্রতিপালক রয়েছেন, তিনি আমাকে পরিত্রাণের সঠিক পথ-নির্দেশ করবেন।" মূসা আ. ছিলেন তাঁর অনুসারীদের পশ্চাৎভাগে। তিনি অগ্রসর হয়ে সকলের সম্মুখে গেলেন এবং সাগরের দিকে তাকালেন। তখন সাগরে ছিল উত্তাল তরঙ্গ। তিনি বললেন : আমাকে এখানেই আসার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাঁর সাথে ছিলেন তাঁর ভাই হারূন আ. ও ইউশা ইবনে নূন। যিনি বনি ইসরাঈলের বিশিষ্ট নেতা, আলেম ও আবেদ। মূসা আ. ও হারূন আ.-এর পরে আল্লাহ তাআলা তাঁর কাছে ওহি প্রেরণ করেন এব তাঁকে নবুয়ত দান করেন। মূসা আ. ও তাঁর দলবলের সঙ্গে ফেরাউন সম্প্রদায়ের মুমিন বান্দাটিও ছিলেন। তারা থমকে দাঁড়িয়েছিলেন আর গোটা বনি ইসরাঈল গোত্র তাদের ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। কথিত আছে, ফেরাউন সম্প্রদায়ের মুমিন লোকটি ঘোড়া নিয়ে কয়েকবার সাগরে ঝাঁপ

দেওয়ার চেষ্টা করেন, কিন্তু তার পক্ষে তা সম্ভব হয়ে উঠল না। তাই তিনি মূসা আ.-কে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর নবী! আমাদেরকে কি এখানেই আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে? মূসা আ. বললেন, 'হ্যাঁ'। যখন ব্যাপারটি তুঙ্গে উঠল, অবস্থা জটিল হয়ে দাঁড়াল, ভারি ভয়াবহ আকার ধারণ করল; ফেরাউন ও তার গোষ্ঠী সশস্ত্র সৈন্য-সামন্ত নিয়ে ক্রোধভরে অতি সন্নিকটে এসে পৌঁছাল; অবস্থা বেগতিক হয়ে দাঁড়াল; চক্ষু স্থির হয়ে গেল এবং প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠল, তখন ধৈর্যশীল মহান শক্তিমান, আরশের মহান অধিপতি, প্রতিপালক আল্লাহ তাআলা মূসা কালিমুল্লাহ আ.-এর কাছে ওহি প্রেরণ করলেন : أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ অর্থাৎ নিজ লাঠি দ্বারা সাগরে আঘাত কর! যখন তিনি সাগরে আঘাত করলেন– কথিত আছে, তিনি সাগরকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন : 'আল্লাহর হুকুমে বিভক্ত হয়ে যাও।' আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ

"আমি মূসার প্রতি ওহি প্রেরণ করলাম। আপন লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর। ফলে তা বিভক্ত হয়ে প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতের মতো হয়ে গেল। (সূরা শুআরা : ৬৩)

কথিত আছে, সমুদ্রটি বারটি খণ্ডে বা রাস্তায় বিভক্ত হয়েছিল। প্রতিটি গোত্রের জন্যে একটি করে রাস্তা হয়ে গেল। যাতে তারা নিজ নিজ নির্ধারিত রাস্তায় সহজে পথ চলতে পারে। এ রাস্তাগুলোর মধ্যে জানালা ছিল বলেও কেউ কেউ মত প্রকাশ করেন। যাতে তারা একদল অন্যদলকে অনায়াসে চলার পথে দেখতে পায়। কিন্তু এ অভিমতটি শুদ্ধ নয়। কেননা পানি যেহেতু স্বচ্ছ পদার্থ, তাই তার পিছনে আলো থাকলে দৃষ্টি বাধাপ্রাপ্ত হয় না। সুতরাং একদল অন্যদলকে দেখার জন্যে জানালা থাকার প্রয়োজন হয় না। যে সত্তা কোনো বস্তুকে সৃষ্টি করতে 'হয়ে যাও' বললে সাথে সাথে তা হয়ে যায়, সেই সত্তার মহান কুদরতের কারণেই সমুদ্রের পানি ছিল পর্বতের মতো দণ্ডায়মান। এরপর আল্লাহ তাআলা সমুদ্রে বিশেষ ধরনের বায়ু প্রেরণ করেন, যার ধাক্কায় পানি সরে রাস্তাগুলো শুকিয়ে যায়, যাতে ঘোড়া ও অন্যান্য প্রাণীর খুর না আটকে যায়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى (٧٧) فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ (٧٨) وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى

"আমি অবশ্যই মূসার প্রতি ওহি নাযিল করেছিলাম– আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাতের বেলা বেরিয়ে পড় এবং তাদের জন্যে সমুদ্রের মধ্য দিয়ে এক শুকনো পথ নির্মাণ কর। পশ্চাৎ হতে এসে তোমাকে ধরে ফেলা হবে এরূপ আশঙ্কা করো না এবং ভয়ও করো না। এরপর ফেরাউন তার সৈন্য-সামন্তসহ তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল। তারপর

সমুদ্র তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করল আর ফেরাউন তার সম্প্রদায়কে পথভ্রষ্ট করেছিল এবং সৎপথ দেখায় নি।" (সূরা তহা : ৭৭-৭৯)

বস্তুত পরম পরাক্রমশালী সৃষ্টিকর্তা প্রতিপালকের আদেশে যখন সমুদ্রের অবস্থা এরূপ দাঁড়াল আর বনি ইসরাঈলকে নিয়ে সমুদ্র পার হওয়ার জন্যে মূসা আ.-কে নির্দেশ দেওয়া হল, তখন তারা সকলে আনন্দচিত্তে অতি দ্রুত সমুদ্রে অবতরণ করেন। এ দৃশ্য অবশ্য দৃষ্টি নিক্ষেপকারীদের দৃষ্টি ঝলসিয়ে দেয় ও অবাক করে দেয় আর মুমিনদের অন্তরসমূহকে সঠিক পথের সন্ধান দেয়। যখন তারা এরূপে সমুদ্র পার হওয়ার জন্যে সমুদ্রে অবতরণ করেন, নির্বিঘ্নে তাঁরা সমুদ্র পার হলেন এবং তাঁদের শেষ সদস্যও সমুদ্র পার হলেন। আর যখন তাঁরা সমুদ্র পার হলেন, ঠিক তখনই ফেরাউনের সৈন্য-সামন্তের প্রথমাংশ ও অগ্রগামী দল সমুদ্রের কিনারায় পৌঁছাল। তখন মূসা আ. ইচ্ছে করেছিলেন, পুনরায় সমুদ্রে লাঠি দিয়ে আঘাত করবেন। যাতে সমুদ্রের অবস্থা পূর্ববৎ হয়ে যায় এবং ফেরাউনের দল তাদের ধরতে না পারে এবং তাদের পৌঁছার কোনো বাহনই না থাকে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা সমুদ্রকে এ অবস্থায় ছেড়ে দিতে মূসা আ.-কে নির্দেশ দিলেন। যেমন আল্লাহ তাআলা সূরা দুখানে ইরশাদ করেন :

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ (١٧) أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٨) وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (١٩) وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ (٢٠) وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ (٢١) فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ (٢٢) فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ (٢٣) وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ (٢٤) كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (٢٥) وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (٢٦) وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ (٢٧) كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ (٢٨) فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ (٢٩) وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ (٣٠) مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ (٣١) وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ (٣٢) وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ (٣٣)

"তাদের পূর্বে আমি তো ফেরাউন সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছিলাম এবং তাদের কাছেও এসেছিল এক সম্মানিত রাসূল। সে বলল, "আল্লাহর বান্দাদেরকে আমার কাছে ফিরিয়ে দাও। আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল এবং তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করো না। আমি তোমাদের কাছে উপস্থিত করছি স্পষ্ট প্রমাণ। তোমরা যাতে আমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে না পার, সে জন্য আমি আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালকের আশ্রয় নিচ্ছি। যদি তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন না কর, তবে তোমরা আমার নিকট থেকে দূরে থাক। তারপর মূসা তাঁর প্রতিপালকের নিকট নিবেদন করল, 'এরা তো এক অপরাধী সম্প্রদায়।' আমি বলেছিলাম, "তুমি

আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাতের বেলা বের হয়ে পড়; তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে। সমুদ্রকে স্থির থাকতে দাও, ওরা এমন এক বাহিনী যা নিমজ্জিত হবে। ওরা পশ্চাতে রেখে গিয়েছিল কত উদ্যান ও প্রস্রবণ, কত শস্যক্ষেত্র ও সুরম্য প্রাসাদ, কত বিলাস-উপকরণ, ওতে তারা আনন্দ পেত। এরূপই ঘটেছিল এবং আমি এ সমুদয়ের উত্তরাধিকারী করেছিলাম ভিন্ন সম্প্রদায়কে। আকাশ এবং পৃথিবী কেউই ওদের জন্যে অশ্রুপাত করে নি এবং ওদেরকে অবকাশও দেওয়া হয় নি। আমি তো উদ্ধার করেছিলাম বনি ইসরাঈলকে ফেরাউনের লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি থেকে; সে তো ছিল পরাক্রান্ত সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত। আমি জেনে-শুনেই ওদেরকে বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম এবং ওদেরকে দিয়েছিলাম নিদর্শনাবলী, যাতে ছিল সুস্পষ্ট পরীক্ষা।"

(সূরা দুখান : ১৭-৩৩)

সমুদ্রের স্থিতশীল অবস্থায় ফেরাউন সমুদ্রের তীরে গিয়ে পৌঁছল। সবকিছু দেখল এবং সমুদ্রের আশ্চর্যজনক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করল। আর পুরোপুরি বুঝতে পারল যেমন পূর্বেও বুঝত, এটা মহা সম্মানিত আরশের মহান মালিক প্রতিপালকেরই কুদরতের লীলাখেলা। সে থমকে দাঁড়াল। সম্মুখে অগ্রসর হল না। বনি ইসরাঈল ও মূসা আ.-কে পিছু ধাওয়া করার জন্যে মনে মনে অনুতপ্ত হল। তবে এ অবস্থায় অনুতাপ যে তার কোনো উপকারে আসবে না, সে তা ভালো করে বুঝতে পারল। তা সত্ত্বেও সে তার সেনাবাহিনীর কাছে তার অটুট মনোবলের কথা ও আক্রমণাত্মক ভাব প্রকাশ করল। ওই সম্প্রদায়কে সে হতবুদ্ধি করে দিয়েছিল। ফলে তারা তার আনুগত্য স্বীকার করেছিল। তারা তাকে বাতিলের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও অনুসরণ করেছিল। নিজ কুফরিতে লিপ্ত ফাসেক ও ফাজের নফসের প্ররোচনায় তাদেরকে উদ্দেশ্য করে সে বলল, 'তোমরা একটু লক্ষ করে দেখ! সমুদ্র আমার জন্যে সরে গিয়ে কী রূপে পথ করে দিয়েছে; যাতে আমি আমার ওইসব পলাতক দাসদেরকে ধরতে পারি, যারা আমার প্রভুত্ব স্বীকার না করে আমার রাজত্ব থেকে বের হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। মুখে এরূপ উচ্চবাচ্য করলেও অন্তরে সে দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে ছিল, সে কি তাদের পিছু ধাওয়া করবে, নাকি আত্মরক্ষার্থে পিছু হটে যাবে? হায়! তার হটে যাওয়ার কোনো উপায় ছিল না। সে এক কদম সামনে অগ্রসর হলে কয়েক কদম পিছু হটার চেষ্টা করেছিল।

তাফসিরকারকগণ বলেন, এরূপ অবস্থায় জিবরাঈল আ. একটি আকর্ষণীয় ঘোটকীর উপর সওয়ার হয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন। এবং ফেরাউন যে ঘোড়ার ওপর সওয়ার ছিল তার সম্মুখ দিয়ে সমুদ্রের দিকে ঘোটকীটি অগ্রসর হল। তার ঘোড়াটি ঘোটকীর প্রতি আকৃষ্ট হল এবং ঘোড়াটি ঘোটকীর পিছু পিছু ছুটতে লাগল। জিবরাঈল আ. দ্রুত তার সামনে গেলেন এবং সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। ঘোড়া ও মাদী ঘোড়াটি ছুটতে লাগল। ঘোড়াটি সামনের দিকে দ্রুত অগ্রসর হতে লাগল। ঘোড়ার ওপর ফেরাউনের আর নিয়ন্ত্রণ রইল না। ফেরাউন তার ভালো-মন্দ কিছুই চিন্তা করতে সক্ষম হল না। সেনাবাহিনী যখন ফেরাউনকে দ্রুত সামনের দিকে অগ্রসর হতে দেখল, তারাও অতি

দ্রুত তার পিছনে সমুদ্রে ঝাঁপ দিল। যখন তারা সকলেই পরিপূর্ণভাবে সমুদ্রে ঢুকে গেল এবং সেনাবাহিনীর প্রথম ভাগ সমুদ্র থেকে বের হওয়ার উপক্রম হল, আল্লাহ তাআলা মূসা আ.-কে আদেশ করলেন– তিনি যেন তাঁর লাঠি দিয়ে পুনরায় সমুদ্রে আঘাত করেন। তিনি সমুদ্রে আঘাত করলেন। তখন সমুদ্র পূর্বের আকার ধারণ করে ফেরাউন ও তার সেনাবাহিনীর মাথার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হল। ফলে তাদের কেউই আর রক্ষা পেল না, সকলেই ডুবে মরল। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ (٦٥) ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ (٦٦) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (٦٧) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

"এবং আমি উদ্ধার করলাম মূসা ও তার সঙ্গী সকলকে। তারপর নিমজ্জিত করলাম অপর দলটিকে। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুমিন নয়। তোমার প্রতিপালক– তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।" (সূরা শুআরা : ৬৫-৬৮)

অর্থাৎ তিনি তার পছন্দনীয় মুমিন বান্দাদের উদ্ধারের ব্যাপারে পরাক্রমশালী। তাই তাদের একজনও ডুবে মারা যায় নি। পক্ষান্তরে তার দুশমনদেরকে ডুবিয়ে মারার ব্যাপারেও তিনি পরাক্রমশালী। তাই তাদের কেউই রক্ষা পায় নি। এতে রয়েছে আল্লাহ তাআলার অসীম কুদরতের একটি মহা নিদর্শন ও প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আবার অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মহান শরিয়ত ও সরল-সঠিক তরীকা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন, তার সত্যতার জ্বলন্ত প্রমাণও বটে।

এরপর আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন :

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ

"আজ আমি তোমার দেহটি রক্ষা করব যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাকে। অবশ্যই মানুষের মধ্যে অনেকে আমার নিদর্শন সম্বন্ধে গাফেল।"

(সুরা ইউনুস : ৯০-৯২)

উত্তাল তরঙ্গ যখন তাকে একবার উপরের দিকে উঠাচ্ছিল, আরেকবার নিচের দিকে নামাচ্ছিল এবং ফেরাউন ও তার সেনাবাহিনী যখন এ মহা সংকট ও দুর্ভেদ্য মুসিবতে পতিত হয়েছিল, তখন তা বনি ইসরাঈলরা দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করছিল এবং তাদের চোখ জুড়াচ্ছিল ও হৃদয়ের জ্বালা প্রশমিত করছিল। ফেরাউন যখন নিজের ধ্বংস প্রত্যক্ষ করল; সে কোণঠাসা হয়ে পড়ল এবং তার মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হয়ে গেল তখন সে বিনম্র হল; তওবা করল এবং এমন সময় ঈমান আনয়ন করল, যখন কারো ঈমান তার কোনো উপকারে আসে না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ (٩٦) وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (٩٧)

"যাদের বিরুদ্ধে তোমার প্রতিপালকের বাক্য সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছে তারা ঈমান আনবে না যদি তাদের নিকট প্রত্যেকটি নিদর্শন আসে– যতক্ষণ না তারা মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। (সূরা ইউনুস : ৯৬-৯৭)

আল্লাহ তাআলা সূরা মুমিনে এ প্রসঙ্গে আরো ইরশাদ করেন :

فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ (٨٤) فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ (٨٥)

"তারপর তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন বলল, আমরা এক আল্লাহ ওপর ঈমান আনলাম এবং আমরা তাঁর সঙ্গে যাদেরকে শরিক করতাম তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম। ওরা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল, তখন ওদের ঈমান ওদের কোনো উপকারে আসল না। আল্লাহর এই বিধান পূর্ব থেকেই তাঁর বান্দাদের মধ্যে চলে আসছে এবং এ ক্ষেত্রে কাফেররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।" (সূরা মুমিন : ৮৪-৮৫)

অনুরূপ মূসা আ. ফেরাউন ও তার গোষ্ঠীর ব্যাপারে বদদুআ করেছিলেন, যাতে আল্লাহ তাআলা তাদের সম্পদ ধ্বংস করে দেন এবং তাদের অন্তরে আল্লাহ তাআলা মোহর মেরে দেন, যাতে তারা মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ করার পূর্বে ঈমান না আনতে পারে। অর্থাৎ তখন তাদের ঈমান তাদের কোনো কাজে আসবে না আর এটা হবে তাদের জন্যে আক্ষেপের কারণ। মূসা আ. ও হারূন আ. যখন এরূপ বদদুআ করছিলেন, তখন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করলেন :

قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا

"তোমাদের দুজনের দুআ কবুল হল।"

এ প্রসঙ্গে ইবনে আব্বাস রাযি. সূত্রে বর্ণিত একটি হাদিসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : ফেরাউনের উক্তি–

آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ

"আমি বিশ্বাস করলাম বনি ইসরাঈল যাতে বিশ্বাস করে, নিশ্চয়ই তিনি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই।" (সূরা ইউনুস : ৯০)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এ প্রসঙ্গে জিবরাঈল আমাকে বললেন, (আল্লাহর রাসূল!) ওই সময়ের অবস্থা যদি আপনি দেখতেন! সমুদ্রের তলদেশ থেকে কাদা নিয়ে তার মুখে পুরে দিলাম। যাতে পাছে না সে আল্লাহ তাআলার রহমত পেয়ে যায়। এ সম্পর্কে ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে অন্য এক সূত্রে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলা যখন ফেরাউনকে ডুবিয়ে দিলেন, তখন সে তার আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করল এবং উচ্চঃস্বরে বলল :

آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, জিবরাঈল আ. তখন আশঙ্কা করছিলেন, আল্লাহ তাআলার রহমত আল্লাহ তাআলার গযবের উপর প্রাধান্য না পেয়ে যায়। তিনি তখন তাঁর পাখা দ্বারা কালো মাটি তুলে ফেরাউনের মুখে ছুঁড়ে মারলেন যাতে করে তার মুখ ঢাকা পড়ে যায়।

কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে, জিবরাঈল আ. বলেছেন, 'আমি ফেরাউনের মতো অন্য কাউকে এত বেশি ঘৃণা করি নি, যখন সে বলেছিল- أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى অর্থাৎ 'আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠতম প্রতিপালক।"

আল্লাহ তাআলা তার ঈমান কবুল করেন নি। কেননা আল্লাহ তাআলা জানতেন, যদি তাকে পুনরায় দুনিয়ায় ফেরত পাঠানো হয়, তা হলে সে পুনরায় আগের মতো আচরণ করত। যেমন আল্লাহ তাআলা অন্যান্য কাফেরদের সম্পর্কে বলেছেন : যখন তারা জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করবে, তখন বলে উঠবে-

وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

"তুমি যদি দেখতে পেতে যখন তাদেরকে আগুনের পাশে দাঁড় করানো হবে এবং তারা বলবে, হায়! যদি আমাদের প্রত্যাবর্তন ঘটত, তবে আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনকে অস্বীকার করতাম না এবং আমরা মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।" (সূরা আনআম : ২৭)

জবাবে আল্লাহ তাআলা বলবেন :

بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

"না, পূর্বে তারা যা গোপন করত তা এখন তাদের নিকট প্রকাশ পেয়েছে এবং তারা প্রত্যাবর্তিত হলেও যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল পুনরায় তারা তা-ই করত এবং নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী।" (সূরা আনআম : ২৮)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. প্রমুখ মুফাসসির বর্ণনা করেছেন, বনি ইসরাঈলের কেউ কেউ ফেরাউনের মৃত্যুর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেছিল। তারা বলেছিল, ফেরাউন কখনো মরবে না। এ জন্য আল্লাহ তাআলা সমুদ্রকে নির্দেশ দিলেন, যাতে ফেরাউনকে কোনো একটি উঁচু জায়গায় নিক্ষেপ করে। অর্থাৎ পানির উপরে কিংবা মাটির একটি টিবির ওপরে। তখন তার গায়ে ছিল তার সুপরিচিত বর্ম। যাতে ফেরাউনের লাশ বলে বনি ইসরাঈল সহজে শনাক্ত করতে পারে এবং আল্লাহ তাআলার কুদরতের পরিচয় পেতে পারে।

এজন্যই পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً

"আজ আমি তোমার দেহটা রক্ষা করব। যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্যে নিদর্শন হয়ে থাক।"

অর্থাৎ তোমার পরিচিত বর্মসহ তোমাকে রক্ষা করব যাতে তুমি বনি ইসরাঈলের কাছে শক্তিমান আল্লাহ তাআলার কুদরতের একটি নিদর্শন হয়ে থাক। ফেরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী আশুরার দিন ধ্বংস হয়েছিল। বুখারি শরিফে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. সূত্রে একটি হাদিস বর্ণিত আছে : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা শরিফ আগমন করলে দেখলেন ইহুদিরা আশুরার দিন রোযা পালন করে থাকে। (কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে) তারা বলল, 'এটা এমন একটি দিন, যেদিনে ফেরাউনের বিরুদ্ধে মূসা আ.-এর বিজয় সূচিত হয়েছিল। অনন্তর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

أَنْتُمْ أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْهُمْ فَصُومُوا

"মূসা আ. সম্পর্কে বনি ইসরাঈল থেকে তোমরা (মুসলমানরা) বেশি হকদার। কাজেই তোমরা ওই দিবসে রোযা পালন কর।" অন্যান্য হাদিস গ্রন্থেও এ মর্মের হাদিসটি পাওয়া যায়।

ফেরাউনের ধ্বংসের পর বনি ইসরাঈলের অবস্থা

আল্লাহ তাআলা সূরা আরাফে এ সম্পর্কে বলেন :

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ (١٣٦) وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (١٣٨) إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٣٩) قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (١٤٠) وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ

সুতরাং আমি তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি এবং তাদেরকে অতল সমুদ্রে নিমজ্জিত করেছি। কারণ, তারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করত এবং এ সম্বন্ধে তারা ছিল গাফেল। যে সম্প্রদায়কে দুর্বল গণ্য করা হত, তাদেরকে আমি আমার কল্যাণপ্রাপ্ত রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকারী করি; এবং বনি ইসরাঈল সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালকের শুভবাণী সত্যে পরিণত হল। যেহেতু তারা ধৈর্যধারণ করেছিল, আর

ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের শিল্প এবং যে সব প্রাসাদ তারা নির্মাণ করেছিল তা ধ্বংস করেছি। আর আমি বনি ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করিয়ে দিই; তারপর তারা প্রতিমাপূজায় রত এক সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হয়। তারা বলল, হে মূসা! তাদের দেবতার মতো আমাদের জন্যও একটি দেবতা গড়ে দাও; সে বলল, তোমরা তো এক মূর্খ সম্প্রদায়। এসব লোক যাতে লিপ্ত রয়েছে তা তো বিধ্বস্ত হবে এবং তারা যা করছে তাও অমূলক। সে আবারো বলল, আল্লাহ ছাড়া তোমাদের জন্য আমি কি অন্য ইলাহ খুঁজব অথচ তিনি তোমাদেরকে বিশ্বজগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন? স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে ফেরাউনের অনুসারীদের হাত হতে উদ্ধার করেছি, যারা তোমাদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তি দিত। তারা তোমাদের পুত্র সন্তানকে হত্যা করত এবং তোমাদের নারীদেরকে জীবিত রাখত; এতে ছিল তোমাদের প্রতিপালকের এক মহাপরীক্ষা।

(সূরা আরাফ : ১৩৬-১৪১)

অনুরূপভাবে এ সম্পর্কে অন্যত্র আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ

"আমি ইচ্ছে করেছিলাম, সে দেশে যাদেরকে হীনবল করা হয়েছিল, তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে; তাদেকে নেতৃত্ব দান করতে ও উত্তরাধিকারী করতে।" (সূরা কাসাস : ৫)

আল্লাহ তাআলা ফেরাউন ও তার গোষ্ঠীর সকলকে ধ্বংস করে দিলেন। দুনিয়ায় বিরাজমান তাদের সম্মান ঐতিহ্য তিনি বিনষ্ট করে দিলেন। তাদের রাজা, আমীর-উমারা ও সৈন্য-সামন্ত ধ্বংস হয়ে গেল। মিসর দেশে সাধারণ প্রজাবর্গ ছাড়া আর কেউ অবশিষ্ট রইল না।

ইবনে আবদুল হাকাম 'মিসরের ইতিহাস" গ্রন্থে লিখেছেন, সেদিন থেকে মিসরের স্ত্রী লোকেরা পুরুষদের উপর প্রাধান্য লাভ করেছিল। কেননা আমীর-উমারাদের স্ত্রীরা তাদের চেয়ে নিম্নশ্রেণীর সাধারণ লোকদেরকে বিয়ে করতে হয়েছিল। তাই তাদের স্বামীদের ওপর স্বভাবতই তাদের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ প্রথা মিসরে আজ পর্যন্ত চলে আসছে।

মূসা আ. মিসর ত্যাগ করে বায়তুল মুকাদ্দাস পৌঁছলেন। তখন সেখানে হায়সানি, ফাযারি, ও কানআনি ইত্যাদি গোত্র সম্বলিত এক দুর্দান্ত জাতিকে বসবাসরত দেখতে পান। মূসা আ. তখন বনি ইসরাঈলকে শহরে প্রবেশ করার এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদেরকে বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে বিতাড়িত করতে হুকুম দিলেন। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ইবরাহীম আ. কিংবা মূসা আ.-এর মাধ্যমে এ শহরটি বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা মূসা আ.-এর নির্দেশ মানতে অস্বীকার করল এবং যুদ্ধ থেকে বিরত রইল। তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ভীতিগ্রস্ত করলেন এবং তীহ প্রান্তরে নিক্ষেপ করেন। সেখানে তারা সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর যাবত উদ্ভ্রান্তের মতো ঘোরাফেরা করতে থাকে। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ (٢٠) يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ (٢١) قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ (٢٢) قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٣) قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ (٢٤) قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ (٢٥) قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ

"স্মরণ কর, যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলল– হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর; যখন তিনি তোমাদের মধ্য থেকে নবী করেছিলেন ও তোমাদেরকে রাজাধিপতি করেছিলেন এবং বিশ্বজগতে কাউকেও যা তিনি দেন নি তা তোমাদেরকে দিয়েছিলেন। হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ তোমাদের জন্য যে পবিত্র ভূমি নির্দিষ্ট করেছেন, তাতে তোমরা প্রবেশ কর এবং পিছু পালাবে না। করলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। তারা বলল, হে মূসা! সেখানে এক দুর্দান্ত সম্প্রদায় রয়েছে এবং তারা সে স্থান থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত আমরা সেখানে কিছুতেই প্রবেশ করব না; তারা সেই স্থান থেকে বের হয়ে গেলেই আমরা প্রবেশ করব। যারা ভয় করছিল তাদের মধ্যে দুজন, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেন তারা বলল, তোমরা তাদের মুকাবিলা করে দরজায় প্রবেশ করলেই তোমরা জয়ী হবে আর তোমরা মুমিন হলে আল্লাহর উপরই নির্ভর কর। তারা বলল, হে মূসা! তারা যতদিন সেখানে থাকবে, ততদিন আমরা সেখানে প্রবেশ করবই না। সুতরাং তুমি আর তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ কর; আমরা এখানেই বসে থাকব। সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার ও আমার ভাই ছাড়া অপর কারো ওপর আমার আধিপত্য নেই। সুতরাং তুমি আমাদের ও সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের মধ্যে ফয়সালা করে দাও। আল্লাহ বললেন, তবে এটা চল্লিশ বছর তাদের জন্য নিষিদ্ধ রইল, তারা পৃথিবীতে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবে। সুতরাং তুমি সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করবে না।" (সূরা মায়েদা : ২০-২৬)

বনি ইসরাঈলের সর্দাররা জিহাদ হতে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নিল। এর ফলে বিরাট বিপর্যয় ঘটে গেল। কথিত আছে, ইউশা আ. ও কালিব আ. যখন তাদের এরূপ উক্তি শুনতে পেলেন (তখনকার নিয়ম অনুযায়ী) তারা তাদের কাপড় ছিঁড়ে ফেলেন এবং মূসা

আ. ও হারূন আ. এ অশ্রাব্য কথার জন্য আল্লাহ তাআলার গযব থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে বনি ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ তাআলার রহমত কামনা করে সিজদায় পড়ে গেলেন। ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, হযরত মূসা আ. বললেন :

رَبِّ اِنِّیْ لَا اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِیْ وَاَخِیْ فَافْرُقْ بَیْنَنَا وَبَیْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِیْنَ

অর্থাৎ আমার ও তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিন।

এরপর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জিহাদ থেকে বিরত থাকার দরুন শাস্তিস্বরূপ চল্লিশ বছর যাবত দিন-রাত সকাল-সন্ধ্যা তীহ ময়দানে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ভবঘুরে জীবন যাপন চূড়ান্ত করে দিলেন। কথিত আছে, তাদের যারা তীহ ময়দানে প্রবেশ করেছিল তাদের কেউ বের হতে পারে নি। তাদের সকলেই এ চল্লিশ বছরে সেখানে মৃত্যুবরণ করেছিল। কেবল তাদের ছেলে-মেয়েরা এবং ইউশা আ. ও কালিব আ. বেঁচে ছিলেন।

ইমাম আহমদ ইবনে শিহাব রহ. থেকে বর্ণনা করেন– হযরত মিকদাদ রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বদরের যুদ্ধের দিন বললেন, "আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনাকে সেরূপ বলব না, যেরূপ বনি ইসরাঈল মূসা আ.-কে বলেছিল,

اِذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَاۤ اِنَّا هٰهُنَا قَاعِدُوْنَ

"তুমি ও তোমার প্রতিপালক যুদ্ধ কর! আমরা এখানে বসে রইলাম।" বরং আমরা বলব, "আপনি ও আপনার প্রতিপালক যুদ্ধে যাত্রা করুন, আমরাও আপনাদের সঙ্গে যুদ্ধে শরিক থাকব।"

উল্লিখিত হাদিসের এ সনদটি উত্তম। অন্য অনেক সূত্রেও এ হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। সেখানে আরো অতিরিক্ত আছে, "বরং আমরা যুদ্ধ করব, আপনার ডানপাশে আপনার বামপাশে, আপনার সামনে ও পিছন থেকে– আমরা প্রাণ দিয়ে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। এ কথা শুনার পর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর চেহারা মুবারক উজ্জ্বল হয়ে উঠতে দেখতে পেলাম। তিনি এতে খুশি হয়েছিলেন।

তীহ ময়দান ও অত্যাশ্চর্য ঘটনাবলী

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوْۤا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ (١٥١) وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ وَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا

وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (١٥٢) وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ

"বল– এসো, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যা হারাম করেছেন, তোমাদেরকে তা পড়ে শুনাই, তা হল তোমরা তাঁর কোনো শরিক করবে না, পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে, দারিদ্রের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, আমিই তোমাদেরকে ও তাদেরকে রিযিক দিয়ে থাকি। প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে হোক, অশ্লীল কাজের কাছে যাবে না; আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করবে না। তোমাদেরকে তিনি এ নির্দেশ দিলেন, যেন তোমরা অনুধাবন কর। এতিম বয়োপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত উত্তম ব্যবস্থা ছাড়া তোমরা তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হবে না এবং পরিমাণ ও ওজন ন্যায্যভাবে পুরোপুরি দিবে। আমি কাউকেও তার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না। যখন তোমরা কথা বলবে, তখন ন্যায্য বলবে, স্বজনের সম্পর্কে হলেও এবং আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করবে। এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিলেন, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর এবং এ পথই আমার সরলপথ। সুতরাং তোমরা এরই অনুসরণ করবে।" (সূরা আনআম : ১৫১-১৫৩)

তারা এ দশটি উপদেশ বাণীর পরও বহু অসিয়ত ও বিভিন্ন মূল্যবান নির্দেশাবলীর উল্লেখ করেছেন, যেগুলো বহুদিন যাবত চালু ছিল। তারা একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এগুলো আমল করেছেন। কিন্তু এরপরই এগুলোতে আমলকারীদের পক্ষ থেকে অবাধ্যতার ছোঁয়া লাগে। তারা এগুলোর দিকে লক্ষ করল এবং এগুলোতে পরিবর্তন সাধন করল, কোনো কোনোটা একেবারে বদল করে দিল; আবার কোনো কোনোটার মনগড়া ব্যাখ্যা করতে লাগল। তারপর এগুলোকে একেবারেই তারা ছেড়ে দিল। এসব নির্দেশ এককালে পূর্ণরূপে চালু থাকার পর পরিবর্তিত ও বর্জিত হয়ে যায়। পূর্বে ও পরে আল্লাহ তাআলার হুকুমই বলবৎ থাকবে, তিনিই যা ইচ্ছে হুকুম করে থাকেন এবং যা ইচ্ছে করে থাকেন, তাঁরই হাতে সৃষ্টি ও আদেশের মূল চাবিকাঠি। জগতের প্রতিপালক আল্লাহই বরকতময়। অন্যত্র আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ (٨٠) كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ (٨١) وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ

হে বনি ইসরাঈল! আমি তোমাদেরকে শত্রুর কবল থেকে উদ্ধার করেছিলাম, আমি তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তূর পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে এবং তোমাদের কাছে মান্না ও সালওয়া প্রেরণ করেছিলাম, তোমাদেরকে যা দান করেছি তা হতে ভালো ভালো বস্তু আহার কর এবং এ বিষয়ে সীমালঙ্ঘন করো না, করলে তোমাদের উপর

আমার ক্রোধ অবধারিত এবং যার উপর আমার ক্রোধ অবধারিত সে তো ধ্বংস হয়ে যায়। আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল তাঁর প্রতি, যে তওবা করে ঈমান আনে, সৎকর্ম করে ও সৎপথে অবিচল থাকে। (সূরা তহা : ৮০-৮২)

তা ছাড়া আল্লাহ্ তাআলা তাদের উপর আসমান থেকে প্রতিদিন সকালে মান্না নাযিল করেন। তাদের জন্যে অতি প্রয়োজনের বেলায় কঠিন সময়ে এমন ভূমিতে ভ্রমণ ও অবস্থানকালে যেখানে কোনো প্রকার ফসলাদি ও দুধেল প্রাণী ছিল না, প্রতিদিন সকালে তারা মান্না ঘরের মাঝেই পেয়ে যেত এবং তাদের প্রয়োজন মতো রেখে দিত। যাতে সেদিনের সকাল হতে আগামী দিনের সেসময় পর্যন্ত তাদের খাওয়া-দাওয়া চলে। যে ব্যক্তি এরূপ প্রয়োজনের অতিরিক্ত সঞ্চয় করে রাখত, তা নষ্ট হয়ে যেত আর যে কম গ্রহণ করত, এটাই তার জন্যে যথেষ্ট হত। যে অতিরিক্ত নিত, তাও অবশিষ্ট থাকত না। মান্না তারা রুটির মতো করে তৈরি করত। এটা ছিল ধবধবে সাদা এবং অতি মিষ্টদ্রব্য। দিনের শেষ বেলা সালওয়া নামক পাখি তাদের কাছে এসে যেত। রাতের খাবারের প্রয়োজন মতো পরিমাণ পাখি তারা অনায়াসে শিকার করত। গ্রীষ্মকাল দেখা দিলে আল্লাহ্ তাআলা তাদের উপর মেঘখণ্ড প্রেরণ করে ছায়া দান করতেন। এ মেঘখণ্ড তাদেরকে সূর্যের প্রখরতা ও উত্তাপ থেকে রক্ষা করত।

আল্লাহ্ তাআলা অন্যত্র ইরশাদ করেন :

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (٤٠) وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ

“হে বনি ইসরাঈল! আমার সে অনুগ্রহকে তোমরা স্মরণ কর যা দিয়ে আমি তোমাদেরকে অনুগৃহীত করেছি এবং আমার সঙ্গে তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ কর। আমিও তোমাদের সঙ্গে আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করব এবং তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর। আমি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে ঈমান আন। এটা তোমাদের কাছে যা আছে তার প্রত্যয়নকারী। আর তোমরাই এটার প্রথম প্রত্যাখ্যানকারী হয়ো না এবং আমার আয়াতের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করবে না। তোমরা শুধু আমাকেই ভয় করবে।

(সূরা বাকারা : ৪০-৪১)

এরপর আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (٥٥) ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٥٦) وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

স্মরণ কর! যখন তোমরা বলেছিলে : হে মূসা! আমরা আল্লাহকে প্রত্যক্ষভাবে না দেখা পর্যন্ত তোমাকে কখনো বিশ্বাস করব না, তখন তোমরা বজ্রাহত হয়েছিলে আর তোমরা নিজেরাই দেখছিলে। তারপর মৃত্যুর পর আমি তোমাদেরকে পুনর্জীবিত করলাম, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। আমি মেঘ দ্বারা তোমাদের উপর ছায়া বিস্তার করলাম। তোমাদের নিকট মান্না ও সালওয়া প্রেরণ করলাম। বলেছিলাম তোমাদেরকে ভালো যা দান করেছি তা থেকে আহার কর। তারা আমার প্রতি কোনো যুলুম করে নি বরং তারা তাদের প্রতিই জুলুম করেছিল। (সূরা বাকারা : ৫৫-৫৭)

এরপর আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٦٠) وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ

"স্মরণ কর, যখন মূসা তাঁর সম্প্রদায়ের জন্য পানি প্রার্থনা করল। আমি বললাম, তোমার লাঠি দিয়ে পাথরে আঘাত কর।" ফলে তা থেকে বারটি ঝরনা প্রবাহিত হল। প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পান-স্থান চিনে নিল। আমি বললাম, "আল্লাহ প্রদত্ত জীবিকা হতে তোমরা পানাহার কর এবং দুষ্কৃতকারীরূপে পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে বেড়াবে না।" যখন তোমরা বলেছিলে, "হে মূসা! আমরা একই রকম খাদ্যে কখনো ধৈর্যধারণ করব না। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা কর, তিনি যেন ভূমিজাত দ্রব্য, শাক-সবজি, ফাঁকুড়, গম, মসুর ও পিঁয়াজ আমাদের জন্য উৎপাদন করেন।" মূসা বলল, তোমরা কি উৎকৃষ্টতর বস্তুকে নিকৃষ্টতর বস্তুর সাথে বদল করতে চাও? তোমরা কোনো এক শহরে অবতরণ কর। তোমরা যা চাও, তা সেখানে রয়েছে। আর তারা লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্যগ্রস্ত হল এবং তারা আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হল। এটা এ জন্য, তারা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করত এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করত। অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘন করার জন্যই তাদের এ পরিণতি হয়েছিল।"

(সূরা বাকারা : ৬০-৬১)

মোটকথা, আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাঈলকে দুটো সুস্বাদু খাবার বিনা কষ্টে ও পরিশ্রমে সহজলভ্য করে দিয়েছিলেন। প্রতিদিন ভোরে আল্লাহ তাআলা তাদের জন্যে মান্না অবতীর্ণ করতেন এবং সন্ধ্যার সময় সালওয়া নামক পাখি প্রেরণ করতেন। মূসা আ.-এর লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করার ফলে তাদের জন্যে আল্লাহ তাআলা পানি

প্রবাহিত করে দিয়েছিলেন। তারা এ পাথরটিকে তাদের সাথে লাঠি সহকারে বহন করত। এ পাথর থেকে বারটি প্রস্রবণ প্রবাহিত হত; প্রতিটি গোত্রের জন্যে একটি প্রস্রবণ নির্ধারিত ছিল। এ প্রসবণগুলো পরিষ্কার ও স্বচ্ছ পানি প্রবাহিত করত। তারা নিজেরা পান করত ও তাদের প্রাণীদেরকে পানি পান করাত এবং তারা প্রয়োজনীয় পানি জমাও করে রাখত। উত্তাপ থেকে বাঁচার জন্যে মেঘ দ্বারা তাদেরকে আল্লাহ্ তাআলা ছায়া দান করেছিলেন। আল্লাহ্ তাআলার তরফ থেকে তাদের জন্যে ছিল এগুলো বড় বড় নিয়ামত ও দান। কিন্তু তারা এগুলোর পূর্ণ মর্যাদা অনুধাবন করে নি। এগুলোর জন্যে যথাযোগ্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে নি। আর যথাযথভাবে ইবাদতও তারা আঞ্জাম দেয় নি। এরপর তাদের অনেকেই এসব নিয়ামতের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করল। এগুলোর প্রতি অধৈর্য হয়ে উঠল এগুলোর পরিবর্তন কামনা করল। চাইল এমন সব বস্তু, যা ভূমি উৎপন্ন করে। যেমন : শাক, সবজি, ফাঁকুড়, গম, মসুর ও পিঁয়াজ ইত্যাদি। এ কথার জন্যে মূসা আ. তাদেরকে ভর্ৎসনা করলেন এবং ধমক দিলেন। তাদের সতর্ক করে বললেন :

ছোট-বড় নির্বিশেষে সকল শহরের অধিবাসীর জন্য অর্জিত উৎকৃষ্ট নিয়ামতসমূহের পরিবর্তে কি তোমরা নিকৃষ্টতর বস্তু চাও? তা হলে তোমরা যেসব বস্তু ও মর্যাদার উপযুক্ত নও, তার থেকে অবতরণ করে তোমরা যে ধরনের নিকৃষ্ট মানের খাদ্য খাবার চাও, তা তোমরা অর্জন করতে পারবে। তবে আমি তোমাদের আবদারের প্রতি সাড়া দিচ্ছি না এবং তোমরা যে ধরনের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছ, তাও আল্লাহ্ তাআলার দরবারে আপাতত পৌঁছাচ্ছি না। তাদের আচরণ দেখে বোঝা যায়, মূসা আ. তাদেরকে যেসব কাজ থেকে বিরত রাখতে ইচ্ছে করেছিলেন, তা থেকে তারা বিরত থাকে নি। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى

এ বিষয়ে সীমালঙ্ঘন করবে না, করলে তোমাদের উপর আমার ক্রোধ অবধারিত এবং যার উপর আমার ক্রোধ অবধারিত সে তো ধ্বংস হয়ে যায়। (সূরা তহা : ৮১)

বনি ইসরাঈলের উপর মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলার গযব অবধারিত হয়েছিল। তবে আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ কঠোর শাস্তিকে আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথেও সম্পৃক্ত করেছেন ওই ব্যক্তির ক্ষেত্রে, যে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি প্রত্যাবর্তন করে ও পাপরাশি থেকে তওবা করে এবং বিতাড়িত শয়তানের অনুসরণে আর লিপ্ত না থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى

"আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল তার প্রতি যে তওবা করে, ঈমান আনে, সৎকর্ম করে ও সৎপথে অবিচলিত থাকে। (সূরা তহা : ৮২)

আল্লাহর দীদার লাভ

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে :

وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (١٤٢) وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (١٤٣) قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (١٤٤) وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ

"স্মরণ কর! মূসার জন্য আমি ত্রিশ রাত নির্ধারিত করি এবং আরো দশ দ্বারা তা পূর্ণ করি। এভাবে তার প্রতিপালকের নির্ধারিত সময় চল্লিশ রাত্রিতে পূর্ণ হয় এবং মূসা তার ভাই হারুনকে বলল, আমার অনুপস্থিতিতে সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমি আমার প্রতিনিধিত্ব করবে; সংশোধন করবে এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করবে না। মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হল এবং তার প্রতিপালক তার সাথে কথা বললেন, তখন সে বলল, "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দর্শন দাও, আমি তোমাকে দেখব।" তিনি বললেন, "তুমি আমাকে কখনোই দেখতে পাবে না, বরং তুমি পাহাড়ের প্রতি লক্ষ কর, এটা স্বস্থানে স্থির থাকলে তুমি আমাকে দেখবে।" যখন তার প্রতিপালক পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করলেন, তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল। আর মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। যখন তিনি জ্ঞান ফিরে পেলেন তখন তিনি বললেন, 'মহিমাময় তুমি, আমি অনুতপ্ত হয়ে তোমার কাছেই প্রত্যাবর্তন করলাম এবং মুমিনদের মধ্যে আমিই প্রথম।" তিনি বললেন, "হে মূসা! আমি তোমাকে আমার রিসালাত ও বাক্যালাপ দ্বারা মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। সুতরাং আমি যা দিলাম, তা গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞ হও। আমি তার জন্য ফলকে সর্ববিষয়ে উপদেশ ও সকল বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা লিখে দিয়েছি। সুতরাং এগুলো শক্তভাবে ধর এবং তোমার সম্প্রদায়কে এগুলোর যা উত্তম তা গ্রহণ করতে নির্দেশ দাও। (সূরা আরাফ : ১৪২-১৪৫)

পূর্ববর্তী যুগের ওলামায়ে কেরাম বিশেষত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, এখানে ত্রিশ রাত্রের অর্থ হচ্ছে যিলকাদ মাসের পূর্ণটা এবং যিলহজ মাসের প্রথম দশ রাত, মোট চল্লিশ রাত। এ হিসেবে মূসা আ.-এর জন্যে আল্লাহ তাআলার বাক্যালাপের দিন হচ্ছে কুরবানীর ঈদের দিন।

মূলত মূসা আ. যখন তাঁর নির্ধারিত মেয়াদ পরিপূর্ণ করলেন, তখন তিনি ছিলেন রোযাদার। কথিত আছে, তিনি কোনো প্রকার খাবার চান নি। এরপর যখন মাস সমাপ্ত

হল তিনি একপ্রকার বৃক্ষের ছাল হাতে নিলেন এবং মুখে সুগন্ধি আনয়ন করার জন্যে তা একটু চিবিয়ে নিলেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁকে আরো দশদিন রোযা রাখতে আদেশ দিলেন। তাতে চল্লিশ দিন পুরা হল।

মূসা আ. যখন তার নির্ধারিত মেয়াদ পূর্ণ করার জন্যে পাহাড়ের দিকে রওনা হলেন। তখন ভাই হারূন আ.-কে বনি ইসরাঈলের কাছে নিজ প্রতিনিধিরূপে রেখে গেলেন। হারূন আ. ছিলেন মূসা আ.-এর সহোদর ভাই। অতি নিষ্ঠাবান দায়িত্বশীল ও জনপ্রিয় ব্যক্তি।

আল্লাহ তাআলার মনোনীত ধর্মের প্রতি আহবানের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন মূসা আ.-এর সাহায্যকারী। মূসা আ. তাঁকে প্রয়োজনীয় কাজের আদেশ দিলেন। নবুয়তের ক্ষেত্রে তাঁর বিশিষ্ট মর্যাদা থাকায় মূসা আ.-এর নবুয়তের মর্যাদার কোনো ব্যাঘাত ঘটে নি। আল্লাহ তাআলা তাকে আপন কথা শুনালেন; মূসা আ.-কে আহবান করলেন, সঙ্গোপনে তাঁর সাথে কথা বললেন এবং নিকটবর্তী করে নিলেন। এটা উচ্চ একটি সম্মানিত স্থান, দুর্ভেদ্য দুর্গ, সম্মানিত পদমর্যাদা ও অতি উচ্চ অবস্থান। তাঁর ওপর আল্লাহ তাআলার অবিরাম সালাম বা শান্তি বর্ষিত হোক। যখন তাঁকে উচ্চ মর্যাদা ও মহা সম্মান দান করা হল এবং তিনি আল্লাহ তাআলার কালাম শুনলেন, তখন তিনি পর্দা সরিয়ে নেওয়ার আবেদন করলেন এবং এমন মহান সত্তার উদ্দেশ্যে যাঁকে দুনিয়ার চোখ দেখতে পায় না, তাঁর উদ্দেশ্যে বললেন :

رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ لَنْ تَرَانِي হে আমার প্রতিপালক! আমাকে নির্দেশ দাও! আমি তোমাকে দেখব। আল্লাহ উত্তরে বলেন : لَنْ تَرَانِي তুমি আমাকে কখনই দেখতে পাবে না। অর্থাৎ মূসা আ. আল্লাহ তাআলার প্রকাশের সময় স্থির থাকতে পারলেন না। কেননা পাহাড় যা মানুষের তুলনায় অধিকতর স্থির ও কাঠামোগতভাবে অধিক শক্তিশালী। পাহাড়ই যখন আল্লাহ তাআলার জ্যোতি প্রকাশের সময় স্থির থাকতে পারে না, তখন মানুষ কেমন করে পারবে? এ জন্যই আল্লাহ তাআলা বলেন : তুমি বরং পাহাড়ের প্রতি লক্ষ কর! তা স্বস্থানে স্থির থাকলে তবে তুমি আমাকে দেখতে পারবে।

প্রাচীণ যুগের কিতাবগুলোতে বর্ণিত রয়েছে, আল্লাহ তাআলা মূসা আ.-কে বললেন, "হে মূসা, কোনো জীবিত ব্যক্তি আমাকে দেখলে মারা পড়বে এবং কোনো শুষ্ক দ্রব্য আমাকে দেখলে উলট-পালট হয়ে গড়িয়ে পড়বে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে আবু মূসা রাযি. হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : আল্লাহ তাআলার পর্দা হচ্ছে নূর বা জ্যোতির। অন্য এক বর্ণনা মতে আগুন। যদি তিনি পর্দা সরান তা হলে তাঁর চেহারার ঔজ্জ্বল্যের দরুন যতদূর তাঁর দৃষ্টি পৌঁছে সবকিছুই পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। এ জন্যই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ

যখন তার প্রতিপালক পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করলেন তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করল। আর মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল। যখন সে জ্ঞান ফিরে পেল, তখন সে বলে উঠল : "মহিমাময় তুমি, আমি অনুতপ্ত হয়ে তোমার কাছেই প্রত্যাবর্তন করলাম এবং মুমিনদের মধ্যে আমিই প্রথম।"

ইবনে জারীর রহ. আনাস রাযি. সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়েতে অতিরিক্ত এটুকু রয়েছে, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত আয়াতাংশ তেলাওয়াত করেন এবং আঙ্গুলে ইশারা করে বলেন, এভাবে পাহাড় ধসে গেল, বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃদ্ধাঙ্গুলিকে কনিষ্ঠা আঙ্গুলের উপরের জোড়ায় স্থাপন করলেন।

অর্থাৎ আল্লাহ যেহেতু মহামহিম ও মহাসম্মানিত সেহেতু কেউ তাঁকে দেখতে পারবে না। মূসা আ. বলেন, এর পর আর কোনো দিনও তোমার দর্শনের আকাঙ্ক্ষা করব না। আমিই প্রথম মুমিন অর্থাৎ তোমাকে কোনো জীবিত লোক দেখলে মারা যাবে এবং কোনো শুষ্ক বস্তু দেখলে তা গড়িয়ে পড়বে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : "আমাকে তোমরা আম্বিয়ায়ে কিরামের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে প্রাধান্য দিও না। কেননা, কিয়ামতের দিন যখন মানবজাতি জ্ঞানহারা হয়ে যাবে, তখন আমিই সর্বপ্রথম জ্ঞান ফিরে পাব। আর তখন আমি মূসা আ.-কে আল্লাহ তাআলার আরশের কাছে স্তম্ভ ধরে থাকতে দেখব। আমি জানি না, তিনি কি আমার পূর্বেই জ্ঞান ফিরে পাবেন, না কি তাঁকে তূর পাহাড়ে জ্ঞান হারাবার প্রতিদান দেওয়া হবে।" এ অভিমতটি ইমাম বুখারী রহ.-এর।

তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সমস্ত মানব তথা সমস্ত সৃষ্টির সেরা এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমি জানি না, তাঁর জ্ঞানহারা হওয়া কি অতি হালকা ছিল কি না। কেননা তিনি দুনিয়ায় একবার জ্ঞানহারা হয়েছিলেন। নাকি তাঁকে তূর পাহাড়ে জ্ঞান হারানোর প্রতিদান দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তিনি আদৌ জ্ঞানহারা হন নি। এতে রয়েছে মূসা আ.-এর জন্য বড় মর্যাদা। তবে এ বিশেষ মর্যাদার কারণে তাঁর সার্বিক মর্যাদাবান বুঝায় না। আর তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মূসা আ.-এর মর্যাদা ও ফযীলতের দিকে এভাবে ইঙ্গিত করেন। 'যাতে আনসারী সাহাবী ইহুদির গালে চপেটাঘাত করায় মূসা আ.-এর সম্পর্কে কেউ বিরূপ মনোভাব পোষণ করতে না পারে।'

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, হে মূসা! আমি তোমাকে আমার রিসালাত এবং বাক্যালাপ দ্বারা তোমাকে মানুষের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। অর্থাৎ সমসাময়িক যুগের লোকদের ওপর, পূর্ববর্তীদের ওপর নয়। কেননা ইবরাহীম আ. মূসা আ. থেকে উত্তম ছিলেন। যা ইবরাহীম আ.-এর কাহিনীর মধ্যে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। আবার

তার পরবর্তীদের ওপরও নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের উভয় থেকেই উত্তম ছিলেন। যেমন মিরাজের রাতে সকল নবী-রাসূলের ওপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পেয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : আমি এমন মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হব যার আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টিকুলের সকলেই করবে, এমনকি ইবরাহীম আ.-ও।

আল্লাহ তাআলা বলেন : আমি যে রিসালাত তোমাকে দান করেছি তা শক্তভাবে গ্রহণ কর, তার চাইতে বেশি প্রার্থনা কর না এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হও।

অন্যত্র বলেন : "আমি তার জন্য ফলকে সর্ববিষয়ে উপদেশ ও সকল বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা লিখে দিয়েছি।" উক্ত ফলকগুলোর উপাদান ছিল খুবই মূল্যবান। সহি গ্রন্থে আছে, আল্লাহ তাআলা নিজ কুদরতি হাতে মূসা আ.-এর জন্য তাওরাত লিখেছিলেন। তার মধ্যে ছিল উপদেশাবলী এবং বনি ইসরাঈলের প্রয়োজনীয় হালাল-হারামের বিস্তারিত ব্যাখ্যা। তারপর আল্লাহ তাআলা বলেন : তোমার সম্প্রদায়কে নির্দেশ দাও, তারা যেন এগুলোর উত্তম ব্যাখ্যা গ্রহণ করে। কিন্তু যারা আমার আনুগত্য পরিহারকারী, আমার আদেশের বিরোধী ও আমার রাসূলদের মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের পরিণাম গোপন রাখছে। আমি শীঘ্রই সত্য-ত্যাগীদের বাসস্থান তোমাদেরকে দেখাব।

বনি ইসরাঈলের বাছুর পূজা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন :

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ (١٤٨) وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (١٤٩) وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٠) قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ () إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ

"মূসা আ.-এর সম্প্রদায় তার অনুপস্থিতিতে নিজেদের অলঙ্কার দ্বারা গড়ল একটি বাছুর, একটি অবয়ব, যা হাম্বা রব করত। তারা কি দেখল না, এটা তাদের সঙ্গে কথা বলে না এবং তাদেরকে পথও দেখায় না? তারা এটাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করলো এবং তারা ছিল জালেম। তারা যখন অনুতপ্ত হল ও দেখল, তারা বিপথগামী হয়ে গিয়েছে,

তখন তারা বলল, "আমাদের প্রতিপালক যদি আমাদের প্রতি দয়া না করেন ও আমাদেরকে ক্ষমা না করেন তবে আমরা তো ক্ষতিগ্রস্ত হবই। মূসা যখন ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে প্রত্যাবতন করলেন, তখন বললেন, আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা আমার কত নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্ব করেছ। তোমাদের প্রতিপালকের আদেশের পূর্বে তোমরা ত্বরান্বিত করলে? এমনকি তিনি ফলকগুলো ফেলে দিলেন আর তাঁর ভাইকে চুলে ধরে নিজের দিকে টেনে আনলেন। হারূন বললেন, হে আমার সহোদর! লোকেরা তো আমাকে দুর্বল বানিয়েছিল এবং আমাকে প্রায় হত্যা করেই ফেলেছিল। তুমি আমার সঙ্গে এমন করো না, যাতে শত্রুরা আনন্দিত হয় এবং আমাকে জালিমদের অন্তর্ভুক্ত করো না। মূসা বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা করো এবং আমাদেরকে তোমার রহমতের মধ্যে দাখিল কর। তুমিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু। যারা বাছুরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে, পার্থিব জীবনে তাদের ওপর তাদের প্রতিপালকের ক্রোধ ও লাঞ্ছনা আপতিত হবেই। আর এভাবে আমি মিথ্যা রচনাকারীদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি। যারা অসৎকার্য করে তারা পরে তওবা করলে ও ঈমান আনলে তোমার প্রতিপালক তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। মূসার ক্রোধ যখন প্রশমিত হল, তখন তিনি ফলকগুলো তুলে নিলেন। যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের জন্য এতে যা লিখিত ছিল তাতে ছিল পথনির্দেশ ও রহমত।" (সূরা আরাফ : ১৪৮-১৫৪)

অন্যত্র আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى (٨٣) قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى (٨٤) قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ (٨٥) فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي (٨٦) قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ (٨٧) فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ (٨٨) أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا (٨٩) وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي (٩٠) قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى (٩١) قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا (٩٢) أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي (٩٣) قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي (٩٤) قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ (٩٥) قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ

فَنَبَذْتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي (٩٦) قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا (٩٧)

হে মূসা! তোমার সম্প্রদায়কে পশ্চাতে ফেলে তোমাকে তাড়াহুড়া করতে বাধ্য করল কী-সে? তিনি বললেন, এই তো তারা আমার পশ্চাতে এবং হে আমার প্রতিপালক! আমি তাড়াতাড়ি তোমার কাছে আসলাম, তুমি সন্তুষ্ট হবে বলে। তিনি বললেন, আমি তোমার সম্প্রদায়কে পরীক্ষায় ফেলেছি, তোমার চলে আসার পর এবং সামিরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে। তারপর মূসা তার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেল ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদেরকে এক উত্তম প্রতিশ্রুতি দেন নি? তবে কি প্রতিশ্রুতিকাল তোমাদের কাছে সুদীর্ঘ হয়েছে; না তোমরা চেয়েছ তোমাদের প্রতি আপতিত হোক তোমাদের প্রতিপালকের ক্রোধ, যে কারণে তোমরা আমার প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে? ওরা বলল, "আমরা তোমার প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করি নি, তবে আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল লোকের অলঙ্কারের বোঝা এবং আমরা তা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করি, অনুরূপভাবে সামিরীও নিক্ষেপ করে। তারপর সে ওদের জন্যে গড়ল একটা বাছুর, একটা অবয়ব, যা হাম্বা রব করত। ওরা বলল, "এটা তোমাদের ইলাহ এবং মূসারও ইলাহ, কিন্তু মূসা ভুলে গিয়েছে। তবে কি ওরা ভেবে দেখে না, এটা তাদের কথায় সাড়া দেয় না এবং তাদের কোনো ক্ষতি অথবা উপকার করার ক্ষমতাও রাখে না। হারূন তাদেরকে পূর্বেই বলেছিলেন, হে আমার সম্প্রদায়! এটার দ্বারা তো কেবল তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। তোমাদের প্রতিপালক দয়াময়। সুতরাং তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মেনে চল। ওরা বলেছিল, আমাদের কাছে মূসা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা এটার পূজা হতে কিছুতেই বিরত হব না। মূসা বললেন, হে হারূন! তুমি যখন দেখলে তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তখন কী-সে তোমাকে নিবৃত্ত করল আমার অনুসরণ করা থেকে? তবে কি আমার আদেশ অমান্য করলে? হারূন বলল, হে আমার সহোদর! আমার দাড়ি ও চুল ধরো না। আমি আশঙ্কা করেছিলাম, তুমি বলবে– তুমি বনি ইসরাঈলদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ ও তুমি আমার বাক্য পালনে যত্নবান হও নি। মূসা বললেন, হে সামিরী! তোমার ব্যাপার কী? সে বলল, আমি দেখেছিলাম যা ওরা দেখে নি। তারপর আমি সেই দূতের (জিবরাঈলের) পদচিহ্ন থেকে এক মুষ্টি (ধুলা) নিয়েছিলাম এবং আমি এটা নিক্ষেপ করেছিলাম এবং আমার মন আমার জন্য শোভন করেছিল এরূপ করা।" মূসা বললেন, দূর হও! তোমার জীবদ্দশায় তোমার জন্য এটাই রইল যে, তুমি বলবে– "আমি অস্পৃশ্য" আর তোমার জন্য রইল একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ, তোমার বেলায় যার ব্যতিক্রম

হবে না এবং তুমি তোমার সেই ইলাহের প্রতি লক্ষ্য কর যার পূজায় তুমি রত ছিলে; আমরা ওটাকে জ্বালিয়ে দিবই। এরপর ওটাকে বিক্ষিপ্ত করে সাগরে নিক্ষেপ করবই। তোমাদের ইলাহ তো কেবল আল্লাহই, যিনি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই। তাঁর জ্ঞান সর্ববিষয়ে ব্যাপ্ত। (সূরা তহা : ৮৩-৯৮)

মোটকথা, হযরত মূসা আ. যখন আল্লাহ তাআলা নির্ধারিত সময়ে উপনীত হলেন, তখন তিনি তূর পর্বতে অবস্থান করে আপন প্রতিপালকের সঙ্গে একান্ত কথা বললেন। মূসা আ. আল্লাহ তাআলার নিকট বিভিন্ন বিষয়ে জানতে চান এবং আল্লাহ তাআলা সে সব বিষয়ে তাকে জানিয়ে দেন। তাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি যাকে সামিরী বলা হয়, সে যেসব অলংকার ধারস্বরূপ নিয়েছিল সেগুলো দিয়ে সে একটি বাছুর-মূর্তি তৈরি করল এবং বনি ইসরাঈলের সামনে ফেরাউনকে আল্লাহ তাআলা ডুবিয়ে মারার সময় জিবরাঈল আ.-এর ঘোড়ার পায়ের এক মুষ্টি ধূলা মূর্তিটির ভিতরে নিক্ষেপ করল। সাথে সাথে বাছুর মূর্তিটি জীবন্ত বাছুরের মতো হাম্বা হাম্বা আওয়াজ দিতে লাগল। কেউ কেউ বলেন, এতে তা রক্ত-মাংসের জীবন্ত একটি বাছুরে রূপান্তরিত হয়ে যায় আর তা হাম্বা হাম্বা ডাকতে থাকে।

কেউ কেউ বলেন, যখন এটার পিছন দিক থেকে বাতাস ঢুকত এবং মুখ দিয়ে বের হত, তখনই হাম্বা হাম্বা আওয়াজ হত। যেমন সাধারণত গরু ডেকে থাকে। এতে তারা এর চতুর্দিকে নাচতে থাকে এবং উল্লাস প্রকাশ করতে থাকে। তারা বলতে থাকে, এটাই তোমাদের ও মূসা আ.-এর ইলাহ, কিন্তু তিনি ভুলে গেছেন। অর্থাৎ মূসা আ. আমাদের নিকটস্থ প্রতিপালককে ভুলে গেছেন এবং অন্যত্র গিয়ে তাকে খোঁজাখুঁজি করছেন। অথচ প্রতিপালক তো এখানেই রয়েছেন। (নির্বোধরা যা বলছে আল্লাহ তাআলা তার বহু বহু ঊর্ধে, তাঁর নাম ও গুণগুলো এসব অপবাদ থেকে পবিত্র এবং আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত নেয়ামতসমূহও অগণিত) বস্তুত তারা যেটাকে ইলাহরূপে গ্রহণ করেছিল তা বড়জোর একটা জন্তু বা শয়তান ছিল।

যে জন্তুটি তাদের সাথে কথা বলতে পারে না, তাদের কোনো কথার জবাব দিতে পারে না, কোনো ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না কিংবা কোনো উপকার করারও শক্তি রাখে না, তাদেরকে পথনির্দেশও করতে পারে না। আসলে এভাবে তারা তাদের নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে। তারা তাদের এই মূর্খতা ও বিভ্রান্তির অসারতা সম্বন্ধে সম্যক অবগত।

এরপর মূসা আ. তাদের কাছে ফিরে আসলেন এবং তাদের বাছুর পূজা করার বিষয়টি জানতে পারলেন। তাঁর সাথে ছিল বেশ কয়েকটি ফলক যেগুলোর মধ্যে তাওরাত লিপিবদ্ধ ছিল, তিনি এগুলো ফেলে দিলেন। কেউ কেউ বলেন, এগুলোকে তিনি ভেঙে ফেলেন। কিতাবীরা এরূপ বলে থাকে। এরপর আল্লাহ তাআলা এগুলোর পরিবর্তে অন্য ফলক দান করেন। কুরআনুল করীমের ভাষ্যে এর স্পষ্ট উল্লেখ নেই।

তবে কুরআনে কারীমে আছে, মূসা আ. তাদের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করে ফলকগুলো ফেলে দিয়েছিলেন। কিতাবীদের মতে সেখানে ছিল মাত্র দুটি ফলক। কুরআনের আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, ফলক বেশ কয়েকটিই ছিল। আল্লাহ তাআলা যখন তাঁকে তাঁর সম্প্রদায়ের বাছুর পূজার কথা অবগত করেছিলেন, তখন মূসা আ. তেমন প্রভাবান্বিত হন নি। আল্লাহ তাঁকে তা নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করতে নির্দেশ দেন। এ জন্যেই ইমাম আহমদ রহ. ও ইবনে হিব্বান রহ. কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ

"সংবাদ প্রাপ্তি এবং প্রত্যক্ষ দর্শন সমান নয়।"

এরপর মূসা আ. তাদের দিকে অগ্রসর হলেন এবং তাদেরকে ভর্ৎসনা করলেন এবং তাদের এ হীন কাজের জন্যে তাদেরকে দোষারোপ করলেন। তখন তার কাছে তারা মিথ্যা ওযর আপত্তি পেশ করে বলল :

مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ

আমরা তোমার প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করি নি। আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল লোকের অলংকারের বোঝা। আমরা তা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করি। অনুরূপভাবে সামিরীও নিক্ষেপ করে। (সূরা তহা : ৮৭)

ফেরাউন সম্প্রদায়ের অলঙ্কারের অধিকারী হওয়াকে তারা পাপকার্য বলে মনে করতে লাগল অথচ আল্লাহ তাআলা এগুলোকে তাদের জন্য বৈধ করে দিয়েছিলেন। অথচ তারা মহা পরাক্রমশালী অদ্বিতীয় মহাপ্রভুর সাথে হাম্বা হাম্বা রবের অধিকারী বাছুরের পূজাকে তাদের মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতার কারণে পাপকার্য বলে বিবেচনা করছিল না। এরপর মূসা আ. আপন সহোদর হারূন আ.-এর প্রতি মনোযোগী হলেন এবং তাঁকে বললেন : হে হারূন! তুমি যখন দেখলে তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে, তখন কিসে তোমাকে নিবৃত্ত করল আমার অনুসরণ করা থেকে? কেন তুমি আমাকে সে সম্বন্ধে অবহিত করলে না? তখন তিনি বললেন : আমি আশঙ্কা করেছিলাম, তুমি বলবে– তুমি বনি ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ। তুমি হয়তো বলতে, তুমি তাদেরকে ছেড়ে আমার কাছে চলে আসলে অথচ আমি তোমাকে তাদের মধ্যে আমার প্রতিনিধি নিযুক্ত করে এসেছিলাম।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

"মূসা বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা কর এবং আমাদেরকে তোমার রহমতের মধ্যে দাখিল কর। তুমিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু।
(সূরা আ'রাফ : ১৫১)

হারূন আ. তাদেরকে এরূপ জঘন্য কাজ থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছিলেন এবং তাদেরকে কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করেছিলেন। বলেছিলেন হে আমার সম্প্রদায়! এর দ্বারা তো কেবল তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা এ বাছুর ও এর হাম্বা রবকে তোমাদের জন্যে একটি পরীক্ষার বিষয় করেছেন। নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক খুবই দয়াময় অর্থাৎ এ বাছুর তোমাদের প্রভু নয়। সুতরাং আমি যা বলি তার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মান্য কর। তারা বলেছিল, আমাদের কাছে মূসা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা এটার পূজা থেকে কিছুতেই বিরত হব না।

এরপর মূসা আ. সামিরীর প্রতি মনোযোগী হলেন এবং বললেন, "তুমি যা করেছ কে তোমাকে এরূপ করতে বলেছিল?" উত্তরে সে বলল, "আমি জিবরাঈল আ.-কে দেখেছিলাম, তিনি ছিলেন একটি ঘোড়ার উপর সওয়ার। তখন আমি জিবরাঈল আ.-এর ঘোড়ার পায়ের ধুলা সংগ্রহ করেছিলাম। আবার কেউ কেউ বলেন : সামিরী জিবরাঈল আ.-কে দেখেছিল। জিবরাঈল আ.-এর ঘোড়ার খুর যেখানেই পড়ত, অমনি সে স্থানটি ঘাসে সবুজ হয়ে যেত। তাই সে ঘোড়ার খুরের নিচের মাটি সংগ্রহ করল। এরপর যখন সে এ স্বর্ণ-নির্মিত বাছুরের মুখে ওই মাটি রেখে দিল, তখনই সে আওয়াজ করতে লাগল এবং পরবর্তী ঘটনা সংঘটিত হল। এজন্যেই সামিরী বলেছিল– "আমার মন আমার জন্যে এরূপ করা শোভন করেছিল।" তখন মূসা আ. তাকে অভিশাপ দিলেন এবং বললেন, তুমি সব সময় বলবে, আমাকে কেউ স্পর্শ করবে না। কেননা সে এমন জিনিস স্পর্শ করেছিল, যা তার স্পর্শ করা উচিত ছিল না। এটা তার দুনিয়ার শাস্তি। এরপর আখিরাতের শাস্তির কথাও তিনি ঘোষণা করেন। এরপর মূসা আ. বাছুরটি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেললেন।

এরপর এটাকে মূসা আ. সমুদ্রে নিক্ষেপ করলেন এবং বনি ইসরাঈলকে সেই সমুদ্রের পানি পান করতে নির্দেশ দিলেন। তারা পানি পান করল। যারা বাছুরের পূজা করেছিল, বাছুরের ছাই তাদের ঠোঁটে লেগে রইল। এতে বোঝা গেল, তারাই ছিল এর পূজারী। কেউ কেউ বলেন, তাদের রং হলদে হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

"যারা বাছুরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে পার্থিব জীবনে তাদের উপর তাদের প্রতিপালকের ক্রোধ ও লাঞ্ছনা হবেই।"

বাস্তবিকই বনি ইসরাঈলের উপর এরূপ ক্রোধ ও লাঞ্ছনাই আপতিত হয়েছিল। এরপর আল্লাহ তাআলা আপন ধৈর্যশীলতা, সৃষ্টির প্রতি তাঁর দয়া ও তওবা কবুলের ব্যাপারে বান্দাদের ওপর তাঁর অনুগ্রহের কথা বর্ণনা করে বলেন :

"যারা অসৎকার্য করে তারা পরে তওবা করলে ও ঈমান আনলে তোমার প্রতিপালক তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা আরাফ : ১৫৩)

কিন্তু বাছুর পূজারীদের হত্যার শাস্তি ব্যতীত আল্লাহ তাআলা কোনো তওবা কবুল করলেন না। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

আর স্মরণ কর, যখন মূসা আপন সম্প্রদায়ের লোককে বলল, "হে আমার সম্প্রদায়! বাছুরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে তোমরা নিজেদের প্রতি ঘোর অত্যাচার করেছ। সুতরাং তোমরা তোমাদের স্রষ্টার পানে ফিরে যাও এবং তোমরা নিজেদেরকে হত্যা কর। তোমাদের স্রষ্টার কাছে এটাই শ্রেয়। তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হবেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা বাকারা : ৫৪)

কথিত আছে, একদিন ভোরবেলা যারা বাছুর পূজা করে নি, তারা তরবারি হাতে নিল; অন্যদিকে আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি এমন ঘন কুয়াশা অবতীর্ণ করলেন, প্রতিবেশী প্রতিবেশীকে এবং একই বংশের একজন অন্যজনকে চিনতে পারছিল না। তারা বাছুর পূজারীদেরকে পাইকারীহারে হত্যা করল এবং তাদের মূলোৎপাটন করে দিল। কথিত রয়েছে, তারা সে দিনের একই প্রভাতে সত্তর হাজার লোককে হত্যা করেছিল। এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

"যখন মূসার ক্রোধ থেমে গেল, তখন তিনি ফলকগুলো তুলে নিলেন। তার লেখাতে ছিল হেদায়েত ও রহমত, তাদের জন্য যারা নিজেদের রবকেই ভয় করে।

(সূরা আরাফ : ১৫৪)

আয়াতাংশে উল্লিখিত وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ -এর দ্বারা কেউ কেউ প্রমাণ করেন, ফলকগুলো ভেঙে গিয়েছিল। এ প্রমাণটি সঠিক নয়। কেননা কুরআনের শব্দে এরূপ কিছু পাওয়া যায় না। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. ফিৎনা সম্বলিত হাদিসসমূহে উল্লেখ করেছেন, তাদের বাছুর পূজার ঘটনাটি ছিল তাদের সমুদ্র পার হবার পর। এ অভিমতটি অযৌক্তিক নয়। কেননা তারা যখন সমুদ্র পার হয়ে বলেছিল, "হে মূসা! তাদের যেমনি ইলাহসমূহ রয়েছে আমাদের জন্যেও তেমন একটি ইলাহ গড়ে দাও।"

অনুরূপ অভিমত আহলে কিতাবদের। কেননা তাদের বাছুর পূজার ঘটনাটি ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস শহরে আগমনের পূর্বে। বাছুর পূজারীদেরকে হত্যা করার যখন হুকুম দেওয়া হয়, তখন প্রথম দিনে তিন হাজার লোককে হত্যা করা হয়েছিল। এরপর মূসা আ. তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। তাদের ক্ষমা করা হল এই শর্তে, তারা বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ

"মূসা তার নিজ সম্প্রদায় থেকে সত্তরজন লোককে আমার নির্ধারিত স্থানে সমবেত হওয়ার জন্যে মনোনীত করলেন। তারা যখন ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হল, তখন মূসা বললেন, হে আমার প্রতিপালক! তুমি ইচ্ছা করলে পূর্বেই তো তাদেরকে এবং আমাকেও ধ্বংস করতে পারতে। আমাদের মধ্যে যারা নির্বোধ তারা যা করেছে সেজন্য কি তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করবে? এটা তো শুধু তোমার পরীক্ষা, যা দিয়ে তুমি যাকে ইচ্ছে বিপথগামী কর এবং যাকে ইচ্ছে সৎপথে পরিচালিত কর। তুমিই তো আমাদের অভিভাবক। সুতরাং আমাদের ক্ষমা কর ও আমাদের প্রতি দয়া কর এবং ক্ষমাশীলদের মধ্যে তুমিই তো শ্রেষ্ঠ। আমাদের জন্য নির্ধারিত কর দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ, আমরা তোমার নিকট প্রত্যাবর্তণ করেছি। আল্লাহ বলেন, আমার শাস্তি যাকে ইচ্ছে দিয়ে থাকি, আর আমার দয়া, তা তো প্রত্যেক বস্তুতে ব্যাপ্ত। সুতরাং আমি এটা তাদের জন্য নির্ধারিত করব, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দেয় ও আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করে। যারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক উম্মী নবীর, যার উল্লেখ তাওরাত ও ইঞ্জিল, যা তাদের নিকট নিকট রয়েছে তাতে তারা লিপিবদ্ধ পায়, যে তাদেরকে সৎকাজের নির্দেশ দেয় ও অসৎকার্যে বাধা দেয়, যে তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করে ও অপবিত্র বস্তু হারাম করে এবং যে মুক্ত করে তাদেরকে তাদের গুরুভার থেকে ও শৃঙ্খল থেকে যা তাদের উপর ছিল। সুতরাং যারা তার প্রতি ঈমান আনে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে এবং যেই নূর তার সাথে অবতীর্ণ হয়েছে তার অনুসরণ করে তারাই সফলকাম।" (সূরা আরাফ : ১৫৫-১৫৭)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, এ সত্তরজন ছিলেন বনি ইসরাঈলের ওলামায়ে কেরাম। আর তাদের সঙ্গে ছিলেন হযরত মূসা আ., হারূন আ., ইউশা আ. নাদাব ও আবীহু। বনি ইসরাঈলের যারা বাছুর পূজা করেছিল তাদের পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রার্থনার জন্যে তারা মূসা আ.-এর সঙ্গে গিয়েছিলেন। তাদেরকে হুকুম দেওয়া হয়েছিল, তারা যেন পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জন করে গোসল করে ও সুগন্ধি ব্যবহার করে। তখন তারা মূসা আ.-এর সঙ্গে আগমন করলেন, পাহাড়ের নিকটবর্তী হলেন। পাহাড়ের উপরে ঝুলন্ত ছিল মেঘখণ্ড, নূরের স্তম্ভ ছিল সমুন্নত। মূসা আ. পাহাড়ে আরোহণ করলেন। বনি ইসরাঈলরা দাবি করেন, তারা আল্লাহ তাআলার কালাম শুনেছেন। তাবলীগের খাতিরে তাঁকে আল্লাহ তাআলার বাণী শোনানোর জন্যে হুকুম দেওয়া হয়েছে, অনুরূপভাবে তারাও মূসা আ. থেকে তাবলীগ হিসেবে আল্লাহ তাআলার বাণী শুনেছিলেন। কিতাবীরা আরো মনে করে, এ সত্তর ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে দেখেছিল। এটা তাদের ভ্রান্ত ধারণা ছাড়া কিছুই নয়। কেননা তারা যখন আল্লাহ তাআলাকে দেখতে চেয়েছিল, তখনই তারা বজ্রাহত হয়েছিল।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক রহ. বলেন, "মূসা আ. বনি ইসরাঈল থেকে সত্তরজন সদস্যকে তাদের শ্রেষ্ঠত্বের ক্রমানুযায়ী মনোনীত করেছিলেন এবং তাদেরকে

বলেছিলেন, "আল্লাহ তাআলার দিকে প্রত্যাগমন কর, নিজেদের কৃতকর্মের জন্য তওবা কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা বাছুর পূজা করে অন্যায় করেছে তাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ তাআলার কাছে তোমরা তওবা কর; তোমরা সিয়াম আদায় কর; পবিত্রতা অর্জন কর ও নিজেদের জামা-কাপড় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কর।" এরপর আপন প্রতিপালক কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে সীনাই মরুভূমির তূর পাহাড়ে মূসা আ. তাদেরকে নিয়ে বের হয়ে পড়লেন। আর তিনি কোনো সময়ই আল্লাহ তাআলার অনুমতি ব্যতীত সেখানে গমন করতেন না। আল্লাহ তাআলার কালাম শোনানোর জন্যে তাদের সেই সত্তরজন মূসা আ.-কে অনুরোধ করল। মূসা আ. বললেন, আমি এ কাজটি করতে চেষ্টা করব। মূসা আ. যখন পাহাড়ের নিকটবর্তী হলেন, তখন তাঁর উপর মেঘমালার স্তম্ভ নেমে আসল এবং তা সমস্ত পাহাড়কে আচ্ছন্ন করে ফেলল। মূসা আ. আরও নিকটবর্তী হলেন এবং মেঘমালায় ঢুকে পড়লেন, আর নিজের সম্প্রদায়কে বলতে লাগলেন, "তোমরা নিকটবর্তী হও।" মূসা আ. যখন আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কথা বলতেন, তখন মূসা আ.-এর মুখমণ্ডলের উপর এমন উজ্জ্বল নূরের প্রতিফলন ঘটত যার দিকে বনি আদমের কেউ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারত না। তাই সামনে পর্দা ঝুলিয়ে দেওয়া হল, সম্প্রদায়ের লোকেরা অগ্রসর হলেন এবং মেঘমালায় ঢুকে সিজদাবনত হয়ে পড়লেন। আল্লাহ তাআলা যখন মূসা আ.-এর সঙ্গে কথা বলছিলেন, মূসা আ.-কে বলছিলেন : এটা কর-ওটা করো না। তখন তারা আল্লাহ তাআলার কথা শুনছিলেন। আল্লাহ তাআলা যখন তাঁর নির্দেশ প্রদান সম্পন্ন করলেন এবং মূসা আ. থেকে মেঘমালা কেটে গেল ও সম্প্রদায়ের দিকে তিনি দৃষ্টি দিলেন, তখন তারা বলল, হে মূসা! আমরা তোমার কথায় বিশ্বাস করি না, যতক্ষণ না আমরা আল্লাহকে প্রকাশ্য দেখতে পাই। তারা তখন বজ্রাহত হল এবং তাদের থেকে তাদের রূহ বের হয়ে পড়ল। তাতে তারা সকলেই মৃত্যুবরণ করল। তৎক্ষণাৎ মূসা আ. আপন প্রতিপালককে অনুনয় বিনয় করে আরযি জানাতে লাগলেন :

رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا

"হে আমার প্রতিপালক! তুমি ইচ্ছে করলে পূর্বেই তো তাদেরকে এবং আমাকেও ধ্বংস করতে পারতে। আমাদের মধ্যে যারা নির্বোধ, তারা যা করেছে সেজন্য তুমি আমাদেরকে কি ধ্বংস করবে?"

অন্য কথায়, আমাদের মধ্য হতে নির্বোধরা যা করেছে; তারা বাছুরের পূজা করেছে। তাদের এ কাজের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. সহ বহু আলেম বলেন, বনি ইসরাঈলরা বজ্রাঘাতে আক্রান্ত হয়েছিল। কেননা তারা তাদের সম্প্রদায়কে বাছুর পূজা থেকে বিরত রাখে নি। উক্ত আয়াতের অর্থ হচ্ছে, "এটা তোমার প্রদত্ত পরীক্ষা ছাড়া কিছুই নয়।" অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমিই এটা নির্ধারিত করে রেখেছিলে বা তাদেরকে এটার দ্বারা পরীক্ষা করার জন্যে বাছুর পূজা করার বিষয়টি সৃষ্টি

করেছিলে। এজন্য মূসা আ. বলেছিলেন : "তুমিই এই পরীক্ষা দ্বারা যাকে ইচ্ছে পথভ্রষ্ট কর এবং যাকে ইচ্ছে হেদায়েত কর।" তুমিই নির্দেশ ও ইচ্ছার মালিক। তুমি যা নির্দেশ বা ফয়সালা কর তা বাধা দেওয়ার মত কারো শক্তি নেই এবং কেউ তা প্রতিহতও করতে পারবে না।

رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ

তুমিই তো আমাদের অভিভাবক। সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা কর ও আমাদের প্রতি দয়া কর এবং ক্ষমাশীলদের মধ্যে তুমিই তো শ্রেষ্ঠ। আমাদের জন্য নির্ধারিত কর ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ, আমরা তোমার নিকট প্রত্যাবর্তন করেছি এবং অনুনয় বিনয় সহকারে তোমাকেই স্মরণ করেছি।

কাতাদা রহ. বলেন, মূসা আ. বলেছিলেন, "হে আমার প্রতিপালক! ফলকে আমি এমন এক উম্মতের উল্লেখ দেখতে পাচ্ছি যারা হবে শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য তাদের আবির্ভাব হবে, তারা সৎকার্যের নির্দেশ দান করবে, অসৎ কাজে নিষেধ করবে। হে প্রতিপালক! তাদেরকে আমার উম্মত করে দিন! আল্লাহ তাআলা বললেন : 'না, ওরা আহমদের উম্মত।' পুনরায় মূসা আ. বললেন, 'হে আমার প্রতিপালক! ফলকে আমি একটি উম্মতের উল্লেখ পাচ্ছি যারা সৃষ্টি হিসেবে সর্বশেষ কিন্তু জান্নাতে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম। হে আমার প্রতিপালক! তাদেরকে আমার উম্মত করে দিন!' আল্লাহ তাআলা বললেন, 'না, এরা আহমদের উম্মত।' আবার মূসা আ. বললেন, 'হে আমার প্রতিপালক! ফলকে আমি একটি উম্মতের উল্লেখ পাচ্ছি, যাদের অন্তরে আল্লাহ তাআলার কালাম সুরক্ষিত অর্থাৎ ওরা হবে আল্লাহ তাআলার কালামের হাফেয। তারা হিফয হতে আল্লাহ তাআলার কালাম তিলাওয়াত করবেন। উম্মতে মুহাম্মদীর পূর্বে যেসব উম্মত ছিলেন তারা দেখে দেখে আল্লাহ তাআলার কালাম তিলাওয়াত করতেন। কিন্তু যখন তাদের থেকে আল্লাহ তাআলার কালাম উঠিয়ে নেওয়া হত, তখন তারা আর কিছুই তিলাওয়াত করতে পারত না। কেননা তারা আল্লাহ তাআলার কালামের কোনো অংশই হিফয করতে পারে নি। তারা পরবর্তীতে আল্লাহ তাআলার কালামকে আর চিনতেই সক্ষম হত না। কিন্তু উম্মতে মুহাম্মদীকে আল্লাহ তাআলার কালাম হিফয করার তাওফীক দান করা হয়েছে, যা অন্য কাউকে দান করা হয় নি। মূসা আ. বললেন, "হে আমার প্রতিপালক! ওদেরকে আমার উম্মত করে দিন।" আল্লাহ তাআলা বললেন, 'না, ওরা আহমদের উম্মত।'

মূসা আ. আবারো বললেন, "হে আমার প্রতিপালক! ফলকে আমি এমন একটি উম্মতের উল্লেখ পাচ্ছি, যারা তাদের পূর্বের আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং শেষ কিতাবের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করবে। তারা পথভ্রষ্ট বিভিন্ন গোত্রের

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, এমন কি আখেরী যামানার একচক্ষুবিশিষ্ট মিথ্যাবাদী দাজ্জালের বিরুদ্ধেও জিহাদ করবে। তাদেরকে আমার উম্মত করে দিন।" আল্লাহ তাআলা বললেন, 'না, ওরা আহমদের উম্মত।" মূসা আ. পুনরায় বললেন, "হে আমার প্রতিপালক! ফলকে আমি এমন একটি উম্মতের পাচ্ছি যারা আল্লাহ তাআলার নামের দান-সদকা নিজেরা খাবে কিন্তু তাদেরকে এটার জন্যে আবার পুরস্কারও দেওয়া হবে।" উম্মতে মুহাম্মদীর পূর্বে অন্যান্য উম্মতের কোনো ব্যক্তি যদি সদকা করত এবং তা আল্লাহ তাআলার দরবারে কবুল হত তখন আল্লাহ তাআলা আগুন প্রেরণ করতেন এবং সে আগুন তা পুড়িয়ে দিত। কিন্তু যদি তা কবুল না হত তা হলে আগুন তা পোড়াত না। বরং এটাকে পশু-পাখিরা খেয়ে ফেলত এবং আল্লাহ তাআলা উক্ত উম্মতের ধনীদের সদকা দরিদ্রদের জন্যে গ্রহণ করবেন। মূসা আ. বললেন, "হে আমার প্রতিপালক! এদেরকে আমার উম্মত বানিয়ে দিন।" আল্লাহ তাআলা বললেন : 'না, ওরা আহমদের উম্মত।" মূসা আ. পুনরায় বললেন, "ফলকে আমি এমন এক উম্মতের উল্লেখ পাচ্ছি, তারা যদি একটি নেককাজ করতে ইচ্ছে করে অথচ পরবর্তীকালে তা করতে না পারে, তবে তাদের জন্য একটি নেকি লেখা হবে। আর যদি তা তারা করতে পারে, তা হলে তাদের জন্যে দশ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত নেকি দেওয়া হবে। ওদেরকে আমার উম্মত করে দিন!" আল্লাহ তাআলা বললেন, "না, ওরা আহমদের উম্মত।" মূসা আ. পুনরায় বললেন, "আমি ফলকে এমন একটি উম্মতের উল্লেখ পাচ্ছি যারা অন্যদের জন্যে কেয়ামতের দিন সুপারিশ করবে এবং তাদের সে সুপারিশ কবুলও করা হবে। তাদেরকে আমার উম্মত করে দিন।" আল্লাহ তাআলা বললেন, "না, এরা আহমদের উম্মত।"

তিনি আরো বলেন, আমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে, এরপর মূসা আ. ফলক ফেলে দিয়ে বললেন : اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنْ اُمَّةِ اَحْمَدَ হে আল্লাহ! আমাকেও আহমদের উম্মতে শামিল করুন। অনেকেই মূসা আ.-এর এরূপ মুনাজাত উল্লেখ করেছেন এবং মুনাজাতে এমন বিষয়াদি সম্বন্ধে উল্লেখ রয়েছে, যেগুলোর কোনো ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই বিশুদ্ধ হাদিস ও বাণীসমূহের মাধ্যমে প্রাপ্ত এ সংক্রান্ত বিবরণ আল্লাহ তাআলার সাহায্য, তাওফিক, হিদায়াত ও সহায়তা নিয়ে পেশ করব।

আবু হোরায়রা রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। একদিন মূসা আ. আপন প্রতিপালকের কাছে ছয়টি বিষয়ে প্রশ্ন করেন, আর এ ছয়টি বিষয় শুধু তাঁরই জন্যে বলে তিনি মনে করেছিলেন। সপ্তম বিষয়টি মূসা আ. পছন্দ করেন নি। মূসা আ. প্রশ্ন করেন,

(১) হে আমার প্রতিপালক! তোমার বান্দাদের মধ্যে সর্বাধিক পরহেজগার কে? আল্লাহ তাআলা বললেন : যে ব্যক্তি যিকির করে এবং গাফিল থাকে না।

(২) মূসা আ. বলেন, তোমার বান্দাদের মধ্যে সর্বাধিক হেদায়েতপ্রাপ্ত কে? আল্লাহ তাআলা বলেন, যে আমার হেদায়েতের অনুসরণ করে।

(৩) মূসা আ. বলেন, তোমার বান্দাদের মধ্যে সর্বোত্তম বিচারক কে? আল্লাহ তাআলা বলেন, যে মানুষের জন্যে সেরূপ বিচারই করে, যা সে নিজের জন্যে করে।

(৪) মূসা আ. বলেন, তোমার বান্দাদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী কে? আল্লাহ তাআলা বলেন, এমন জ্ঞানী যে জ্ঞান আহরণে তৃপ্ত হয় না, বরং লোকজনের জ্ঞানকে নিজের জ্ঞানের সঙ্গে যোগ করে।

(৫) মূসা আ. বলেন, তোমার বান্দাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত কে? আল্লাহ তাআলা বলেন, যে বান্দা প্রতিশোধ গ্রহণের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেয়।

(৬) মূসা আ. প্রশ্ন করেন : তোমার বান্দাদের মধ্যে সর্বাধিক ধনী কে? আল্লাহ তাআলা বলেন, ওই বান্দা তাকে যা দেওয়া হয়েছে তা নিয়েই সে সন্তুষ্ট থাকে।

(৭) মূসা আ. প্রশ্ন করেন : তোমার বান্দাদের মধ্যে সর্বাধিক দরিদ্র কে? আল্লাহ তাআলা বলেন, 'মানকূস' –যার মনে অভাববোধ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "বাহ্যিক ধনীকে প্রকৃত পক্ষে ধনী বলা হয় না, অন্তরের ধনীকেই বলা হয়।" যখন আল্লাহ তাআলা কোনো বান্দার প্রতি কল্যাণ চান, তখন তাকে অন্তরের ধনী হওয়ার এবং হৃদয়ে আল্লাহর প্রতি ভয় করার তাওফিক দেন। আর যদি কোনো বান্দার অকল্যাণ চান তা হলে তার দৃষ্টিতে দারিদ্রকে প্রকট করে তোলেন। অর্থাৎ তাকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে, তা সে নগন্য মনে করে এবং আরো অধিক চায়।

বনি ইসরাইলের মাথায় তূর পাহাড়

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ () ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"স্মরণ কর যখন তোমাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তূরকে তোমাদের ঊর্ধে উত্তোলন করেছিলাম; বলেছিলাম, আমি যা দিলাম দৃঢ়তার সঙ্গে তা গ্রহণ কর এবং তাতে যা রয়েছে তা স্মরণ রাখ। যাতে তোমরা সাবধান হয়ে চলতে পার। এটার পরেও তোমরা মুখ ফিরালে! আল্লাহর অনুগ্রহ এবং অনুকম্পা তোমাদের প্রতি না থাকলে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হতে। (সূরা বাকারা : ৬৩-৬৪)

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র ইরশাদ করেন :

وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"আর স্মরণ কর, আমি পর্বতকে তাদের ঊর্ধে উত্তোলন করি। আর তা ছিল যেন এক চাঁদোয়া। তারা ধারণা করল, এটা তাদের উপর পড়ে যাবে। বললাম, আমি যা

দিলাম তা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং ওতে যা আছে তা স্মরণ করো, যাতে তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হও।" (সূরা আরাফ : ১৭১)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. ও প্রাচীন যুগের ওলামায়ে কেরামের অনেকেই বলেন, মূসা আ. যখন তাওরাত সম্বলিত ফলক নিয়ে নিজ সম্প্রদায়ের কাছে আগমন করলেন এবং নিজ সম্প্রদায়কে তা গ্রহণ করতে ও শক্তভাবে তা ধরতে নির্দেশ দিলেন, তখন তারা বলল : তাওরাতকে আমাদের কাছে খুলে ধরুন! যদি এর আদেশ নিষেধাবলী সহজ হয় তা হলে আমরা তা গ্রহণ করব। মূসা আ. বললেন, 'তাওরাতের মধ্যে যা কিছু রয়েছে তা তোমরা কবুল কর, তারা তা কয়েকবার প্রত্যাখ্যান করে। এরপর আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদেরকে হুকুম করেন তারা যেন তূর পাহাড় বনি ইসরাঈলের মাথার ওপর উত্তোলন করেন। অমনি পাহাড় তাদের মাথার ওপর মেঘখণ্ডের মতো ঝুলতে লাগল, তাদের তখন বলা হল, তোমরা যদি তাওরাতকে তার সব কিছুসহ কবুল না কর এই পাহাড় তোমাদের মাথার উপর পড়বে। তখন তারা তা কবুল করল। তাদেরকে সিজদা করার হুকুম দেওয়া হলো, তখন তারা সিজদা করল। তবে তারা পাহাড়ের দিকে আড় নজরে তাকিয়ে রয়েছিল। ইহুদিরা আজ পর্যন্ত বলাবলি করে, যে সিজদার কারণে আমাদের ওপর থেকে আযাব বিদূরিত হয়েছিল, তার থেকে উত্তম সিজদা হতে পারে না।

আবু বকর ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত আছে। মূসা আ. যখন তাওরাতকে খুলে ধরলেন তখন পৃথিবীতে যত পাহাড়, গাছপালা ও পাথর রয়েছে সবই কম্পিত হয়ে উঠল। এমনকি দুনিয়ার বালক বৃদ্ধ নির্বিশেষে যত ইহুদির কাছে তাওরাত পাঠ করা হল, তারা প্রকম্পিত হয়ে উঠল ও মাথা অবনত করল।

বনি ইসরাঈলের গাভী

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (٦٧) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ (٦٨) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ (٦٩) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ (٧٠) قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ (٧١) وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (٧٢) فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَٰلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

"স্মরণ কর, যখন মূসা আপন সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গরু যবাইর আদেশ দিয়েছেন। তারা বলেছিল, তুমি কি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছ? মূসা বললেন, আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। যাতে আমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত না হই। তারা বলল, আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে বল, ওটা কী রূপ? মূসা বললেন, আল্লাহ বলেছেন, 'এটা এমন গরু যা বৃদ্ধও নয়, অল্পবয়স্কও নয়– মধ্যবয়সী। সুতরাং তোমরা যা আদিষ্ট হয়েছ তা কর। তারা বলল, আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে বল, এটার রং কি? মূসা বললেন, আল্লাহ বলেছেন, 'এটা হলুদ বর্ণের গরু, এটার রং উজ্জ্বল গাঢ়, যা দর্শকদেরকে আনন্দ দেয়।' তারা বলল, আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে বল, তা কোনটি? আমরা গরুটি সম্পর্কে সন্দেহে পতিত হয়েছি এবং আল্লাহ ইচ্ছে করলে নিশ্চয়ই আমরা দিশা পাব। মূসা বললেন, তিনি বলেছেন, ওটা এমন এক গরু যা জমি চাষে ও ক্ষেতে পানি সেচের জন্য ব্যবহৃত হয় নি, সুস্থ ও নিখুঁত। তারা বলল, এখন তুমি সত্য এনেছো যদিও তারা যবাই করতে প্রস্তুত ছিল না, তবুও তারা এটাকে যবাই করল। স্মরণ কর, যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে এবং একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করেছিলে। তোমরা যা গোপন রাখছিলে, আল্লাহ তা ব্যক্ত করছেন। আমি বললাম, 'এটার কোনো অংশ দ্বারা ওকে আঘাত কর, এভাবে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন এবং তার নিদর্শন তোমাদেরকে দেখিয়ে থাকেন, যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার। (সূরা বাকারা : ৬৭-৭৩)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, বনি ইসরাঈলের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল খুবই ধনী ও অতিশয় বৃদ্ধ। তার ছিল বেশ কয়েকজন ভাতিজা। তারা তার ওয়ারিশ হওয়ার জন্যে তার মৃত্যু কামনা করছিল। তাই একরাতে তাদের একজন তাকে হত্যা করল এবং তার লাশ চৌরাস্তায় ফেলে রেখে এল। আবার কেউ কেউ বলেন, ভাতিজাদের একজনের ঘরের সামনে তা রেখে এল। ভোর বেলায় হত্যাকারী সম্বন্ধে লোকজনের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। তার ওই ভাতিজা এসে কান্নাকাটি করতে লাগল এবং তার উপরে জুলুম হয়েছে বলে অভিযোগ করতে লাগল। অন্য লোকজন বলতে লাগল, তোমরা কেন ঝগড়া করছ এবং আল্লাহর নবীর কাছে গিয়ে কেন এটার ফয়সালা প্রার্থনা করছ না? তাই মৃত ব্যক্তির ভাতিজা আল্লাহর নবী মূসা আ.-এর কাছে আগমন করে তার চাচার হত্যা ব্যাপারে অভিযোগ করল। মূসা আ. তাদেরকে আল্লাহ তাআলার শপথ দিয়ে বললেন, কেউ যদি এ বিষয়ে কিছু জানে, তা হলে সে যেন বিষয়টি আমাকে জানিয়ে দেয়। কিন্তু তাদের মধ্যে এমন একটি লোকও পাওয়া গেল না, যে এ বিষয়ে জানে। তারা বরং মূসা আ.-কে অনুরোধ করল, তিনি যেন নিজ প্রতিপালককে এ বিষয়ে প্রশ্ন করে জেনে নেন। সুতরাং মূসা আ. আপন প্রতিপালকের নিকট তা জানতে চান। আল্লাহ তাআলা মূসা আ.-কে হুকুম দিলেন; তুমি তাদেরকে একটি গাভী যবাই করতে আদেশ কর। তিনি তাই বললেন।

প্রতি উত্তরে তারা বলল, তুমি কি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছ? আমরা তোমাকে নিহত ব্যক্তি প্রসঙ্গে প্রশ্ন করছি, আর তুমি আমাদের গরু যবাই করার পরামর্শ দিচ্ছি? মূসা আ. বললেন, আমার কাছে প্রেরিত ওহি ব্যতীত অন্য কিছু বলার ব্যাপারে আমি আল্লাহ তাআলার নিকট পানাহ চাই। তোমরা আল্লাহ তাআলাকে প্রশ্ন করার জন্যে আবেদন করেছ, আল্লাহ তাআলা প্রশ্নের উত্তরে এটা বলেছেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেছেন : যদি তারা যে কোনো একটি গাভী যবাই করত, তা হলে তার দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হাসিল হত। কিন্তু তারা ব্যাপারটি জটিল করে তুলল। এরপর তারা গরুটির গুণাগুণ, রঙ ও বয়স সম্পর্কে প্রশ্ন করল আর তাদেরকে প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এমনভাবে জবাব দেওয়া হল যে, এরূপ গরু খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর হয়ে দাঁড়াল। তাফসির গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। বস্তুত তাদেরকে একটি মধ্য বয়সী গরু যবাই করার জন্যে হুকুম দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ এটা বৃদ্ধও নয়, আবার অল্প বয়সীও নয়।

কিন্তু তারা নিজেদের জন্য সঙ্কীর্ণতা ও জটিলতা ডেকে আনল। তারা গরুটির রং সম্বন্ধে প্রশ্ন করল। তাই তাদেরকে এমন লোহিতাভ হলুদ রং-এর কথা বলা হল, যা দর্শকদেরও আনন্দ দেয়। এ রংটি একান্তই দুর্লভ। এরপর তারা আরো সঙ্কীর্ণতা ও জটিলতা সৃষ্টি করে বলল, হে মূসা! তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে বল, তা কোনটি? আমরা গরুটি সম্পর্কে সন্দেহে পতিত হয়েছি এবং আল্লাহ ইচ্ছে করলে নিশ্চয়ই আমরা দিশা পাব।" এই প্রসঙ্গে ইবনে আবু হাতিম রহ. ও ইবনে মারদুইয়্যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর বরাতে বর্ণনা করেন : বনি ইসরাঈল যদি গরু সম্বন্ধে পরিচিতি লাভ করার ক্ষেত্রে ইনশাআল্লাহ না বলত, তা হলে কখনো তাদেরকে এ কাজ সম্পাদন করার জন্যে তাওফিক দেওয়া হত না। তবে এ হাদিসের বিশুদ্ধতা সন্দেহমুক্ত নয়। আল্লাহ তাআলাই অধিকতর জ্ঞাত। সুতরাং আল্লাহ তাআলা বললেন :

إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ

ওটা এমন এক গরু, যা জমি চাষে ও ক্ষেতে পানি সেচের জন্য ব্যবহৃত হয় নি। সুস্থ, নিখুঁত। তারা বলল, এখন তুমি সত্য এনেছ। অথচ এ বৈশিষ্ট্যগুলো পূর্বের বৈশিষ্ট্যগুলোর তুলনায় আরো দুষ্প্রাপ্য ছিল। কেননা এখানে শর্ত আরোপ করা হয়েছে, যেন গরুটি জমি চাষ ও ক্ষেতে পানি সেচের জন্য ব্যবহৃত হওয়ার ফলে দুর্বল ও অসুস্থ না হয়ে থাকে এবং তা যেন সুস্থ, সবল ও নিখুঁত হয়। অর্থাৎ এটার মধ্যে নিজস্ব রং ব্যতীত এতে যেন অন্য কোনো রঙের মিশ্রণ না থাকে। বরং এটা যাবতীয় দোষ ও অন্য সব রংয়ের মিশ্রণ থেকে যেন নিখুঁত হয়। কথিত আছে, তারা এসব গুণবিশিষ্ট গরুটি খোঁজাখুঁজি করে এমন এক ব্যক্তির কাছে এটাকে পেয়েছিল, যে ছিলেন অত্যন্ত পিতৃভক্ত। তারা তার কাছ থেকে গরুটি কিনতে চাইল, কিন্তু সে তাদের কাছে গরুটি বিক্রি করতে রাজি হল না। তারা তাকে অত্যন্ত চড়ামূল্য দিয়ে গরুটি খরিদ করল।

সুদ্দী রহ. উল্লেখ করেছেন, তারা প্রথমত গরুটির সম-ওজনের স্বর্ণ দিয়ে গরুটি ক্রয় করতে চায়। কিন্তু গরুর মালিক রাজি না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত তার ওজনের দশগুণ স্বর্ণ দিয়ে তারা গরুটি ক্রয় করল। এরপর আল্লাহর নবী মূসা আ. এটাকে যবাই করার নির্দেশ দিলেন। তারা গরুটি যবাই করার ব্যাপারে প্রথমত ইতস্তত করছিল। পরে রাজি হল। এরপর আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে হুকুম আসল, যেন তারা নিহত ব্যক্তিটিকে যবাইকৃত গরুটির কোনো অঙ্গ দ্বারা আঘাত করে। কেউ কেউ বলেন, উরুর গোশত দ্বারা আঘাত করার কথা বলা হয়েছিল, কেউ কোমলাস্থি দ্বারা আবার কেউ কেউ দুই কাঁধের মধ্যবর্তী গোশত দ্বারা আঘাত করার কথা বলা হয়েছিল বলে মত প্রকাশ করেন। যখন তারা মৃত ব্যক্তিকে ওটার দ্বারা আঘাত করল, তখন আল্লাহ তাআলা তাকে পুনর্জীবিত করলেন এবং লোকটি উঠে দাঁড়াল। তার গলার শিরা থেকে রক্ত ঝরছিল। মূসা আ. তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কে তোমাকে হত্যা করেছে? সে বলল, 'আমার ভাতিজা।' তারপর সে পূর্বের মতো অবস্থায় ফিরে গেল।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

كَذَٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

'এভাবে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন এবং তার নিদর্শন তোমাদের দেখিয়ে থাকেন যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার।' অর্থাৎ তোমরা যেমন আল্লাহ তাআলার হুকুমে নিহত ব্যক্তির পুনর্জীবিত হওয়া প্রত্যক্ষ করলে, তেমনি আল্লাহ তাআলা একমুহূর্তে সমস্ত মৃতকে যখন ইচ্ছে তখন জীবিত করবেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ

"তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানেরই অনুরূপ।

তাঁবু-গম্বুজের নির্মাণ প্রসঙ্গ

কিতাবীরা বলে, আল্লাহ তাআলা একবার মূসা আ.-কে শিমশার কাঠ, পশুর চামড়া ও ভেড়ার পশমের দ্বারা একটি তাঁবু তৈরি করতে নির্দেশ দিলেন। তাদের বিস্তারিত বর্ণনা অনুযায়ী রঙিন রেশম, স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা এটাকে সজ্জিত করার হুকুম দেওয়া হয়েছিল। এতে ছিল ১০টি শামিয়ানা। প্রতিটি শামিয়ানার দৈর্ঘ ছিল ২৮ হাত ও প্রস্থ ছিল ৪ হাত। এতে ছিল ৪টি দরজা। এর রশিগুলো ছিল বিভিন্ন প্রকার ও বিভিন্ন বর্ণের রেশমের। এর চৌকাঠ এবং তাক ছিল স্বর্ণ-রৌপ্যের। প্রতিটি কোণে ছিল ২টি দরজা এ ছাড়া আরো অনেক বড় বড় দরজা ছিল। এর পর্দাগুলো ছিল রঙিন রেশমের। এ ধরনের বহু সাজসজ্জার সামগ্রী ছিল, যার ফিরিস্তি ছিল দীর্ঘ।

আল্লাহ তাআলা মূসা আ.-কে শিমশার কাঠের একটি সিন্দুকও তৈরি করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। যার দৈর্ঘ আড়াই হাত এবং প্রস্থ দুই হাত এবং উচ্চতা ছিল দেড় হাত।

ভিতরে ও বাইরে খাঁটি স্বর্ণ দ্বারা মোড়ানো। এটার চার কোণে ছিল আংটা। সম্মুখ ভাগের দুই দিকে ছিল চারটি আংটা; সম্মুখ ভাগের দুই দিক ছিল স্বর্ণের পাখাবিশিষ্ট। তাদের ধারণায় দুজন ফেরেশতার মূর্তি যেগুলো মুখোমুখিভাবে স্থাপিত ছিল। এগুলো ছিল বাসলিয়াল নামক এক প্রসিদ্ধ শিল্পীর তৈরি। তাঁরা তাকে নির্দেশ দিয়েছিল, শিমশার কাঠের একটি খাঞ্চা তৈরি করতে। যার দৈর্ঘ দুই হাত ও প্রস্থ ছিল দেড় হাত। এতে ছিল উপরের ডালায় স্বর্ণের তালা ও স্বর্ণের মুকুট; এর চতুর্দিকে ছিল চারটি আঙটা যেগুলোর কিনারাগুলো ছিল সোনা দিয়ে মোড়ানো, আনারের মতো কাঠের তৈরি। তাঁরা তাকে নির্দেশ দেয়, তিনি যেন খাঞ্চাটিতে বড় বড় বরতন; পেয়ালা ও গ্লাসের ব্যবস্থা করেন। তিনি যেন স্বর্ণের মিনার তৈরি করেন যাতে প্রতি দিকে তিনটি করে ৬টি সোনার আলোক স্তম্ভ থাকে আবার প্রতিটি স্তম্ভে যেন ৩টি করে বাতি থাকে। আর মিনারের মধ্যে যেন চারটি ঝাড় বাতি থাকে। এগুলো এবং অন্যান্য পানপাত্র যেন স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত হয়। এ সবই ছিল বাসলিয়ালের তৈরি। বাসলিয়াল পশু যবাইর জন্য নির্দিষ্ট স্থানও তৈরি করে।

উপর্যুক্ত তাঁবুটি তাদের বছরের প্রথম দিন স্থাপন করা হয়। আর সেই দিনটি ছিল বসন্ত ঋতুর প্রথম দিন। আবার 'শাহাদতের তাঁবু'ও এতে স্থাপন করা হয়েছিল। সম্ভবত কুরআনুল করীমে এর প্রতিই ইঙ্গিত করেই ইরশাদ হয়েছে :

إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

"তার রাজত্বের নিদর্শন এই যে, তোমাদের কাছে সেই তাবূত (ইসরাঈলীদের পবিত্র সিন্দুক) আসবে, যাতে তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে চিত্ত প্রশান্তি এবং মূসা ও হারুন বংশীয়গণ যা পরিত্যাগ করেছে তার অবশিষ্টাংশ থাকবে; ফেরেশতাগণ এটা বহন করে আনবে। তোমরা মুমিন হও, তবে অবশ্যই তোমাদের জন্য এটাতে নিদর্শন রয়েছে।" (সূরা বাকারা : ২৪৮)

বায়তুল মুকাদ্দাসের নিয়ন্ত্রণভার যখন ইউশা ইবনে নূন আ.-এর ওপর ন্যস্ত হল, তখন তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসের একটি পাথরের উপর এ তাঁবু গম্বুজটি স্থাপন করেন। বনি ইসরাঈলরা এটার দিকে মুখ করে নামায আদায় করত। এরপর যখন তাঁবু গম্বুজটি বিনষ্ট হয়ে যায় তখন তারা গম্বুজের স্থান অর্থাৎ পাথরের দিকেই নামায আদায় করতে লাগল। এ জন্যেই ইউশা আ.-এর পর থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর যুগ পর্যন্ত সমস্ত নবীর কেবলা ছিল এটাই। এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও হিজরতের পূর্বে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায আদায় করতেন। তবে কাবা শরীফকে সামনে রেখেই তা করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় হিজরত করেন, তখন তাঁকে বায়তুল মুকাদ্দাসের

দিকে মুখ করে নামায আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়। ষোল মাস মতান্তরে সতের মাস তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায আদায় করেন। এরপর দ্বিতীয় হিজরির শাবান মাসে আসরের নামাযে মতান্তরে যোহরের সময় ইবরাহীমী কিবলা কাবার দিকে কিবলা পরিবর্তিত হয়। যেমন নিম্ন বর্ণিত আয়াতের ব্যাখ্যায় বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন :

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (١٤٢) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (١٤٣) قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

নির্বোধ লোকেরা বলবে, তারা এ যাবত যে কিবলা অনুসরণ করে আসছিল, তা হতে কিসে তাদেরকে ফিরিয়ে দিল? বলুন! পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। তিনি যাকে ইচ্ছে সরল পথে পরিচালিত করেন। আকাশের দিকে তোমার বারবার তাকানোকে আমি অবশ্য লক্ষ করি। সুতরাং তোমাকে অবশ্যই এমন কিবলার দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি, যা তুমি পছন্দ কর। অতএব, তুমি মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও। তোমরা যেখানেই থাক না কেন, সেদিকে মুখ ফিরাও। (সূরা বাকারা : ১৪২ ও ১৪৪)

মূসা আ.-এর সঙ্গে কারূনের ঘটনা

আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন :

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ (٧٦) وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (٧٧) قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ (٧٨) فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ

لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (٧٩) وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ (٨٠) فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ (٨١) وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ (٨٢) تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

কারূন ছিল মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত, কিন্তু সে তাদের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিল। আমি তাকে দান করেছিলাম এমন ধনভাণ্ডার, যার চাবিগুলো বহন করা একদল বলবান লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। স্মরণ কর, তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল– দম্ভ করবে না, নিশ্চয় আল্লাহ দাম্ভিকদেরকে পছন্দ করেন না। আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন তা দিয়ে আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান কর এবং দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলবে না। তুমি অনুগ্রহ কর যেমনটি আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না। আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভালোবাসেন না। সে বলল, 'এ সম্পদ আমি আমার জ্ঞানবলে প্রাপ্ত হয়েছি।' সে কি জানত না আল্লাহ তার পূর্বে ধ্বংস করেছেন বহু মানবগোষ্ঠীকে, যারা তার চেয়ে শক্তিতে ছিল প্রবল, জনসংখ্যায় ছিল অধিক। অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না। আর সে (কারূন) তার সম্প্রদায়ের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিল জাঁকজমক সহকারে। যারা পার্থিব জীবন কামনা করত তারা বলল, আহা! কারূনকে যেরূপ দেওয়া হয়েছে আমাদেরকেও যদি তা দেওয়া হত! প্রকৃতই সে মহা ভাগ্যবান! আর যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল তারা বলল, ধিক্ তোমাদেরকে! যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য আল্লাহর পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ এবং ধৈর্যশীল ব্যতীত এটা কেউ পাবে না। তারপর আমি কারূনকে তার প্রাসাদসহ ভূ-গর্ভে প্রোথিত করলাম। তার স্বপক্ষে এমন কোনো দল ছিল না, যে আল্লাহর শাস্তি থেকে তাকে সাহায্য করতে পারত এবং সে নিজেও আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিল না।' আগের দিন যারা তার মতো হবার কামনা করেছিল তারা বলতে লাগল, দেখলে তো আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছে, তার রিযিক বর্ধিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছে হ্রাস করেন। যদি আল্লাহ আমাদের প্রতি সদয় না হতেন, তবে আমাদেরকেও তিনি ভূ-গর্ভে প্রোথিত করতেন। দেখলে তো কাফিররা সফলকাম হয় না। এটা আখিরাতের সেই আবাস যা আমি নির্ধারিত করি তাদের জন্য, যারা এ পৃথিবীতে উদ্ধ্যত হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য।

(সূরা কাসাস : ৭৬-৮৩)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কারূন ছিল মূসা আ.-এর চাচাতো ভাই। মূসা আ. ও কারূনের বংশপরম্পরা নিম্নরূপ বর্ণিত আছে : কারূন

ইবনে ইয়াসহার ইবনে কাহিস; মূসা আ. ইবনে ইমরান ইবনে হাফিছ। অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মতে কারূন ছিল মূসা আ.-এর চাচাতো ভাই।

আল্লাহ তাআলা কারূনের প্রচুর সম্পদের কথা কোরআনুল কারিমে উল্লেখ করেছেন। তার চাবিগুলো শক্তিশালী লোকদের একটি দলের জন্যে কষ্টকর বোঝা হয়ে যেত। কেউ কেউ বলেন, এ চাবিগুলো ছিল চামড়ার তৈরি আর এগুলো বহন করতে ষাটটি খচ্চরের প্রয়োজন হত। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলাই সমধিক জ্ঞাত। তার সম্প্রদায়ের উপদেশ দাতাগণ তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন। তাঁরা তাকে বলেছিলেন, তোমাকে যা দেওয়া হয়েছে, তা নিয়ে গর্ব কর না এবং অন্যের উপর দর্প কর না। কেননা, আল্লাহ তাআলা দাম্ভিক লোকদের পছন্দ করেন না। আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন, তা দিয়ে আখেরাতের আবাস অন্বেষণ কর না। অর্থাৎ তাঁরা বলেছিলেন, হে কারূন! আখেরাতে আল্লাহ তাআলা থেকে যাবতীয় ছওয়াব অর্জন করার প্রচেষ্টা তোমার অব্যাহত থাকা প্রয়োজন। কেননা এটা তোমার জন্যে উত্তম ও অধিকতর স্থায়ী। এতদসত্ত্বেও তুমি দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলবে না অর্থাৎ বৈধভাবে অর্জন ও ব্যয় করবে এবং হালাল পবিত্র বস্তুসমূহ উপভোগ করবে। তবে আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির প্রতি অনুগ্রহ করবে, যেমনটি তাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আল্লাহর যমিনে ফিৎনা-ফাসাদ করবে না। আমার নির্দেশ লঙ্ঘন করে তাদের সাথে দুর্ব্যবহার ও ঝগড়াঝাটি করবে না। অন্যথায় তোমাকে শাস্তি দেওয়া হবে এবং তোমাকে যা দেওয়া হয়েছে, তা কেড়ে নেওয়া হবে। কেননা আল্লাহ তাআলা ফিৎনা সৃষ্টিকারীকে ভালোবাসেন না।

তার সম্প্রদায়ের এরূপ স্পষ্ট নসিহতের জবাবে তার একমাত্র উত্তর ছিল, আমার জ্ঞানের জন্যে আমাকে এসব দেওয়া হয়েছে। তোমরা আমাকে যেসব নসিহত করলে এগুলো মান্য করার আমার কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা এগুলো আল্লাহ তাআলা আমায় দান করেছেন এ জন্য, তিনি আমাকে এসব বস্তুর উপযুক্ত বলে মনে করেছেন। যদি আমি তাঁর অন্তরঙ্গ না হতাম কিংবা তাঁর কাছে আমার কোনো প্রাপ্য না থাকত, তা হলে কখনও তিনি আমাকে যা দিয়েছেন তা দিতেন না। তার এ বক্তব্য খণ্ডন করে আল্লাহ তাআলা বলেন : তার পূর্বে বহু উম্মতকে তাদের পাপ ও অপরাধের জন্যে ধ্বংস করে দিয়েছি। তারা কারূন অপেক্ষা শক্তিতে অধিক প্রবল ছিল। ধনবলে, জনবলে তার চাইতে অগ্রগামী ছিল। যদি কারূনের বক্তব্য যথার্থ হত, তা হলে তার চাইতে অধিক শক্তিশালী ও সম্পদশালী কাউকে শাস্তি দিতাম না। সুতরাং তার সম্পদ আমার প্রিয়পাত্র বা অনুগ্রহভাজন হওয়ার প্রমাণ নয়। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ
جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ

"তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি এমন কিছু নয় যা তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করে দেবে। তবে তারা ব্যতীত যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে।"
(সূরা সাবা : ৩৭)

অন্যত্র আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন :

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ (٥٥) نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ

"তারা কি মনে করে, আমি তাদেরকে সাহায্য স্বরূপ যে ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্তুতি দান করি তা দিয়ে তাদের জন্য সকল প্রকার মঙ্গল ত্বরান্বিত করেছিল? না, বরং তারা বুঝে না।" (সূরা মুমিনূন : ৫৫-৫৬)

বহু তাফসিরকারক উল্লেখ করেছেন, একদিন কারূন মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে গাড়ি, ঘোড়া, বহু সংখ্যক লস্কর ও পরিচর্যাকারী নিয়ে শহরে বের হল। যারা পার্থিব সম্পদকে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে, কারূনকে এরূপ শান-শওকতে দেখে তারা কামনা করতে লাগল যদি তাদেরও এরূপ ধন-সম্পদ থাকত! তারা তার প্রতি ঈর্ষান্বিত হল। তখনকার বুদ্ধিমান পণ্ডিত ও সাধকগণ তাদের কথা শুনে তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন :

وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا

"ধিক তোমাদেরকে! আখিরাতের জীবনে আল্লাহ্ প্রদত্ত পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ,
অধিকতর স্থায়ী ও উন্নতর।"

আল্লাহ্ তাআলা বলেন : এ পৃথিবীর চাকচিক্যের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে আখিরাতের মহাকল্যাণ লাভের জন্য যে উপরিউক্ত নসিহতকে গ্রহণ করতে পারে একমাত্র ওই ব্যক্তি, যার অন্তরে আল্লাহ্ তাআলা হেদায়ত প্রদান করেছেন, তাকে দৃঢ়চিত্ত করেছেন, তার বুদ্ধি-বিবেক পোক্ত করেছেন এবং তাঁর গন্তব্যস্থলে পৌঁছার তাকে তাওফীক দান করেছেন। কোনো কোনো বুযুর্গানে দীন কতই না উত্তম কথা বলেছেন, সন্দেহের স্থলে দূরদৃষ্টি এবং ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ বুদ্ধিমত্তা আল্লাহ্ তাআলার কাছে প্রিয়।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন :

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ

"আল্লাহ্ তাআলা যখন কারূনের জাঁকজমক ও দাম্ভিকতাসহ নিজ সম্প্রদায়ের উপর গর্ব সহকারে তার শহর প্রদক্ষিণের কথা বর্ণনা করে তার পরিণতি সম্পর্কে বলেন, তাকে তার বাড়িঘরসহ আমি ভূ-গর্ভে প্রোথিত করলাম।" (সূরা কাসাস : ৮১)

ইমাম বুখারী রহ. আবু সালিম রাযি. সূত্রে বর্ণনা করেন : এক ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখতে পেলেন, সে তার পরিধেয় বস্ত্র হেঁচড়িয়ে

চলছে। সে ভূগর্ভে চলে যাচ্ছে। কিয়ামতের দিন পর্যন্ত সে এভাবে ভূগর্ভে তলিয়ে যেতেই থাকবে।

ইমাম বুখারী রহ. আবু হোরায়রা রাযি. থেকেও অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেন। ইবনে আব্বাস রাযি. ও ইমাম সুদ্দী রহ. বর্ণনা করেছেন, একদিন কারূন এক ব্যভিচারী মহিলাকে এ শর্তে কিছু অর্থ দিল, সে জনতার সামনে প্রকাশ্যে বলবে, হে মূসা! তুমি আমার সাথে ব্যভিচার করেছ।

কথিত আছে, মহিলাটি জনসমক্ষে মূসা আ.-কে এরূপ বলেছিল। মূসা আ. আঁৎকে উঠলেন দু রাকাত নামায আদায় করলেন। এরপর মহিলাটির দিকে অগ্রসর হয়ে শপথ সহকারে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাকে এরূপ মিথ্যা অপবাদে কে প্ররোচিত করেছে?' মহিলাটি তখন উল্লেখ করল, কারূনই তাকে এ কাজে প্ররোচিত করেছে। সে আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা চাইল এবং তওবা করল। তখন মূসা আ. সিজদাবনত হলেন এবং কারূনের বিরুদ্ধে বদদুআ করলেন। আল্লাহ তাআলা মূসা আ.-এর কাছে এ মর্মে ওহি প্রেরণ করলেন, ভূমিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এ ব্যাপারে সে তোমার যাবতীয় নির্দেশ মান্য করবে। তখন মূসা আ. ও কারূন ও তার ঘরবাড়ি গ্রাস করার জন্যে ভূমিকে নির্দেশ দিলেন। ফলে তা-ই হয়। আল্লাহ তাআলাই সর্বজ্ঞ।

আরো কথিত আছে, একদিন কারূন সাজসজ্জা করে সৈন্য-সামন্ত, ঘোড়া, খচ্চর ও মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছেদে সজ্জিত হয়ে তার সম্প্রদায়কে নিজ ক্ষমতা প্রদর্শনার্থে মূসা আ.-এর মাহফিলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। মূসা আ. তখন তাঁর সম্প্রদায়কে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাবহুল দিনগুলো সম্বন্ধে নসিহত করছেন। জনতা যখন কারূনকে দেখল, তখন মজলিসের অনেকেই তার দিকে ফিরে তাকাল। মূসা আ. তাকে ডাকলেন এবং তার এরূপ করার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। কারূন বলল, হে মূসা! যদিও তুমি নবুয়ত প্রাপ্ত হয়ে আমার উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছ, কিন্তু মনে রেখো, আমিও বিত্ত-সম্পদের দিক থেকে তোমার উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছি। যদি ইচ্ছে কর, তা হলে তুমি ঘরের বাইরে বের হয়ে আমার বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে বদদুআ করতে পার এবং আমিও তোমার বিরুদ্ধে বদদুআ করব।

তখন তারা উভয়েই জনতার সামনে হাযির হলেন। মূসা আ. বললেন, 'তুমি দুআ করবে, না কি আমি দুআ করব? "এরপর কারূন দুআ করল কিন্তু মূসা আ.-এর বিরুদ্ধে তার দুআ কবুল হল না। মূসা আ. বললেন, এবার আমি দুআ করব কি? কারূন বলল, 'হ্যাঁ। মূসা আ. বললেন, اَللّٰهُمَّ مُرِ الْأَرْضَ فَلْتُطِعْنِ الْيَوْمَ 'হে আল্লাহ! ভূমিকে নির্দেশ দাও, যাতে সে আজ আমার নির্দেশ মান্য করে।' এরপর আল্লাহ তাআলা মূসা আ.-কে ওহির মাধ্যমে জানালেন, 'আমি ভূমিকে নির্দেশ দিয়েছি।' তখন মূসা আ. বললেন, 'হে ভূমি! তাদেরকে পাকড়াও কর!' ভূমি তাদেরকে তাদের পা পর্যন্ত গ্রাস করল। এরপর মূসা আ. বললেন, 'হে ভূমি, তাদেরকে আরো পাকড়াও কর।' ভূমি তাদেরকে হাঁটু

পর্যন্ত গ্রাস করল। তারপর কাঁধ পর্যন্ত। পুনরায় মূসা আ. বললেন, 'তাদের পুঞ্জীভূত ধন-দৌলতের দিকে অগ্রসর হও। 'ভূমি এগুলোর দিকে অগ্রসর হল এবং তারা সে দিকে তাকাল। মূসা আ. আপন হাতে ইঙ্গিত করলেন এবং বললেন, 'বনু লাওয়ি নিপাত যাও!' সাথে সাথে ভূমি তাদেরকে গ্রাস করে ফেলল।

কাতাদা রহ. বলেন, কারূন ও তার সম্প্রদায় কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিদিন একটি মানব দেহের পরিমাণ তলিয়ে যেতে থাকবে। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, সপ্ত যমিন পর্যন্ত ভূমি তাদেরকে ভূগর্ভস্থ করেছিল। এই প্রসঙ্গে বহু তাফসিরকারক বহু ইসরাঈলী বর্ণনা পেশ করেছেন, আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে এগুলো পরিহার করেছি।

আয়াতাংশ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ এর অর্থ হচ্ছে তার জন্যে নিজের থেকে কিংবা অপর থেকে কোনো সাহায্যকারী ছিল না। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন : فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ অর্থাৎ তার শক্তিও নেই কিংবা তার সাহায্যকারীও নেই। যখন কারূন ভূগর্ভে চলে গেল তার বাড়িঘর, জান-মাল, পরিবার-পরিজন, জমি-জমা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। কারূনের মতো যারা সম্পদ কামনা করেছিল তারা লজ্জিত হল এবং আল্লাহ তাআলার দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করল। আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্যে উত্তম ব্যবস্থাপনা করে থাকেন। এ জন্যেই তারা বলল :

لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ

"যদি আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রতি সদয় না হতেন, তবে আমাদেরকেও তিনি ভূগর্ভে প্রোথিত করতেন। দেখলে তো, কাফিররা সফলকাম হয় না।" (সূরা কাসাস : ৮২)

আর আখিরাতের আবাস অর্থাৎ স্থায়ী আবাস।' বস্তুত এটা এমন একটি আবাস যাকে দেওয়া হয়, সে ঈর্ষার পাত্র হয় আর যাকে বঞ্চিত করা হয়, সে করুণার পাত্র হয়। এরূপ আবাসস্থল এমন লোকদের জন্যে তৈরি করে রাখা হয়েছে, যারা পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য অহংকার ও গর্বকারী হতে চায় না কিংবা কোনো প্রকার বিপর্যয়ও সৃষ্টি করতে চায় না। নিজের মধ্যে হোক বা অন্যের সাথে সম্পৃক্ত হোক। যেমন : লোকের সম্পদ আত্মসাৎ করা ও তাদের জীবিকা অর্জনের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করা, তাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করা এবং তাদের অকল্যাণ কামনা করা। কারূনের ঘটনাটি হয়তো তাদের মিসর থেকে বের হবার পূর্বেই সংঘটিত হয়েছিল। আবার এটা হয়তো বা তীহের ময়দানেই হয়েছিল।

মূসা আ.-এর মর্যাদা, স্বভাব ও গুণাবলী

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا (٥١) وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا (٥٢) وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا

"স্মরণ কর, এ কিতাবে উল্লিখিত মূসার কথা, সে ছিল বিশুদ্ধচিত্ত এবং সে ছিল রাসূল, নবী। তাকে আমি আহবান করেছিলাম তূর পর্বতের দক্ষিণ দিক থেকে এবং আমি অন্তরঙ্গ আলাপে তাকে নিকটবর্তী করেছিলাম। আমি নিজ অনুগ্রহে তাকে দিলাম তার ভাই হারূনকে নবীরূপে।" (সূরা মারয়াম : ৫১-৫৩)

আল্লাহ্ তাআলা অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন :

قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي

আল্লাহ তাআলা বলেন, হে মূসা! আমি তোমাকে আমার রিসালাত ও বাক্যালাপ দ্বারা মনুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। (সূরা আরাফ : ১৪৪)

সহি বুখারী ও মুসলিমের বরাতে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমাকে তোমরা মূসা আ.-এর উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করবে না। কেননা কিয়ামতের দিন যখন মানবজাতি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়বে, তখন আমিই প্রথম ব্যক্তি, যে সংজ্ঞা ফিরে পাব। তখন আমি মূসা আ.-কে আল্লাহ্ তাআলার আরশের একটি স্তম্ভ ধরে রয়েছে দেখতে পাব। আমি জানি না, তিনি কি অচেতন হয়েছিলেন? এরপর আমার পূর্বে তিনি চেতনা ফিরে পেলেন, নাকি তূরে অচেতন হওয়ার প্রতিদানে তিনি আদৌ অচেতনই হন নি।

এ কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, এ ধরনের উক্তি ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিনম্রতা ও বিনয়ের প্রকাশ স্বরূপ। কেননা, তিনি ছিলেন সর্বশেষ নবী, তিনি ছিলেন দুনিয়া ও আখিরাতে নিঃসন্দেহে আদম সন্তানের সর্দার। এর বিপরীত হওয়ার কোনো অবকাশ নেই। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا

"হে মুমিনগণ! মূসাকে যারা ক্লেশ দিয়েছে, তোমরা তাদের মত হয়ো না। ওরা যা রটনা করেছিল, আল্লাহ্ তা থেকে তাকে নির্দোষ প্রমাণিত করেন এবং আল্লাহর নিকট সে মর্যাদাবান"। (সূরা আহযাব : ৬৯)

ইমাম বুখারী রহ. আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন। "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন; মূসা আ. ছিলেন এক লজ্জাশীল ও পর্দা রক্ষাকারী ব্যক্তি। শালীনতার কারণে তাঁর দেহের কোনো অংশই দেখা যেত না। তাই বনি ইসরাঈলের কিছু সংখ্যক লোক তাকে অপবাদ দিল ও বলতে লাগল, কোনো রোগের কারণে তিনি নিজের পায়ের চামড়া কাউকে দেখতে দেন না। তিনি শ্বেত রোগ কিংবা একশিরা অথবা অন্য রোগে আক্রান্ত রয়েছেন। আল্লাহ্ তাঁকে সে সব দোষ থেকে মুক্ত বলে প্রতিপন্ন করতে ইচ্ছে করলেন। একদিন মূসা আ. এক নির্জন স্থানে গোসল করছিলেন। পাথরের উপর কাপড় রেখেছিলেন। যখন তিনি গোসল সেরে কাপড় পরার জন্যে কাপড় ধরতে গেলেন, অমনি পাথর কাপড় নিয়ে দৌড়াতে লাগল। মূসা আ.

হাতে লাঠি ধারণ করলেন ও পাথরের পেছনে ছুটলেন এবং বলতে লাগলেন, হে পাথর! আমার কাপড়, হে পাথর! আমার কাপড়। এমনিভাবে তিনি দৌড়াতে দৌড়াতে বনি ইসরাঈলের গণ্যমান্য লোকদের সামনে হাযির হয়ে গেলেন। তখন তারা তাঁকে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখে নিল, আল্লাহ তাআলা তাঁকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন। এভাবে আল্লাহ তাআলা তাদের অপবাদ থেকে তাঁকে নির্দোষ প্রমাণ করলেন। পাথরটি থেমে গেল, মূসা আ. আপন কাপড় তুলে নিয়ে পরে নিলেন। আর পাথরকে তিনি লাঠি দিয়ে আঘাত করতে লাগলেন। তিনটি, চারটি কিংবা পাঁচটি আঘাতের কারণে পাথরের উপর অংশ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছিল।

ইমাম আহমদ রহ. ইমাম বুখারী রহ. ও মুসলিম রহ. বিভিন্ন সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। প্রাচীন কালের আলেমগণের কেউ কেউ বলেন, মূসা আ.-এর মাহাত্ম্যের একটি ছিল– তিনি আল্লাহ তাআলার সমীপে আপন ভাই-এর ব্যাপারে সুপারিশ করেছিলেন এবং তাঁকে তার সাহায্যকারী হিসেবে পাওয়ার জন্যে দরখাস্ত করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর দরখাস্ত কবুল করেছিলেন এবং তাঁর ভাইকে নবীও করে দিয়েছিলেন।

ইমাম বুখারী রহ. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু সম্পদ সাহাবীদের মধ্যে বণ্টন করেন। তখন এক ব্যক্তি বলল, এ বণ্টনের দ্বারা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির দিকে লক্ষ রাখা হয় নি। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে তাঁকে তা জানালাম। তখন আমি তাঁর চেহারায় ক্রোধের ভাব লক্ষ করলাম। তখন তিনি ইরশাদ করেন, মূসা আ.-এর ওপর আল্লাহ তাআলার রহমত বর্ষিত হোক! তাকে এর চাইতেও বেশি ক্লেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি ধৈর্যধারণ করেছিলেন।

ইমাম বুখারী রহ. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে তাশরীফ আনেন এবং বলেন, 'আমার সম্মুখে সকল উম্মতকে পেশ করা হয়। তখন আমি দিগন্ত জুড়ে একটি বিরাট দল দেখতে পেলাম। ঘোষণা করা হল, এ হচ্ছে মূসা আ. ও তাঁর উম্মত।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করেছেন : "সকল উম্মতকে আমার সামনে পেশ করা হলে আমি কোনো নবীকে দেখলাম, তাঁর সাথে একটি ক্ষুদ্র দল রয়েছে, আবার কোনো নবীকে দেখলাম তাঁর সঙ্গে কেবল একজন কি দুজন। আবার এমন নবীকেও দেখলাম যার সাথে একজন লোকও নেই। এরপর আমার কাছে একটি বিরাট জামাতকে উপস্থিত করা হল। আমি বললাম, এরাই বুঝি আমার উম্মত। তখন বলা হল, এ হচ্ছে মূসা আ. ও তাঁর সম্প্রদায়। আমাকে বলা হল, এবার দিগন্ত রেখার দিকে তাকান। দেখতে

পেলাম, একটি বিশাল দল। এরপর বলা হল, 'এদিকে একটু লক্ষ করুন!' দেখলাম, এ দিকেও একটি বিশাল দল। তখন বলা হল, 'এরাই হচ্ছে আপনার উম্মত। তাদের সাথে রয়েছে এমন সত্তর হাজার ব্যক্তি যারা বিনা হিসাবে এবং শাস্তি ভোগ ব্যতীতই জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

আল্লাহ তাআলা মূসা আ. সম্পর্কে কুরআনের বহু জায়গায় উল্লেখ করেছেন ও তাঁর প্রশংসা করেছেন এবং তাঁর কালামে মাজিদে মূসা আ.-এর কাহিনী কোথাও বিস্তারিত আবার কোথাও সংক্ষিপ্ত আকারে বহুবার উল্লেখ করেছেন। কুরআনের বহু স্থানে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর প্রতি প্রেরিত কিতাবের পাশাপাশি মূসা আ. ও তাঁর প্রতি প্রদত্ত কিতাব তাওরাত সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। যেমন সূরা বাকারায় রয়েছে,

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

যখন আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের নিকট রাসূল আসল, যে তাদের নিকট যা রয়েছে তার সমর্থক, তখন যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের একদল আল্লাহর কিতাবটিকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করল, যেন তারা জানে না। (সূরা বাকারা : ১০১)

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন :

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (٢) نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ الْإِنْجِيلَ (٣) مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ

"আলিফ লাম মীম, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও সর্বসত্তার ধারক। তিনি সত্যসহ তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যা তার পূর্বের কিতাবের সমর্থক। আর তিনি অবতীর্ণ করেছিলেন তাওরাত ও ইঞ্জীল ইতিপূর্বে; মানব জাতিকে সৎপথ প্রদর্শনের জন্য আর তিনি ফুরকানও অবতীর্ণ করেছেন। যারা আল্লাহর নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে, তাদের জন্য কঠোর শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী দণ্ডদাতা। (সূরা আলে-ইমরান : ১-৪)

সূরা আনআমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ (٩١) وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ

contents

"তারা আল্লাহ তাআলার যথার্থ মর্যাদা উপলব্ধি করে নি; যখন তারা বলে, আল্লাহ মানুষের নিকট কিছুই নাযিল করেন নি। বল, কে নাযিল করেছেন মূসার আনীত কিতাব যা মানুষের জন্য আলো ও পথনির্দেশ ছিল তা তোমরা বিভিন্ন পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করে কিছু প্রকাশ কর ও যার অনেকাংশ গোপন রাখ এবং যা তোমাদের পিতৃ-পুরুষগণ ও তোমরা জানতে না তাও শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল? বল, আল্লাহই; তারপর তাদেরকে নিরর্থক আলোচনারূপ খেলায় মগ্ন হতে দাও। আমি এ কল্যাণময় কিতাব নাযিল করেছি, যা এর পূর্বেকার কিতাবের সমর্থক এবং যা দ্বারা তুমি মক্কা ও এর চতুপার্শ্বের লোকদেরকে সতর্ক কর, যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে তারা তাতে বিশ্বাস করে এবং তারা তাদের সালাতের হেফাজত করে। (সূরা আনআম : ৯১-৯২)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাওরাতের প্রশংসা করেছেন। এরপর কুরআনুল কারিমের ততোধিক প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ তাআলা অন্যত্র ইরশাদ করেন :

ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (١٥٤) وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"তারপর আমি মূসাকে দিয়েছিলাম কিতাব যা সৎকর্মপরায়ণের জন্য সম্পূর্ণ, যা সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ, পথ-নির্দেশ এবং দয়া স্বরূপ, যাতে তারা তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিশ্বাস করে। এই কিতাব আমি নাযিল করেছি যা কল্যাণময়। সুতরাং এটার অনুসরণ কর এবং সাবধান হও, হয়তো তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হবে। (সূরা আনআম : ১৫৪-১৫৫)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবার হতে ফিরে গিয়ে জিনরা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, আমরা এমন একটি কিতাবের বাণী শুনেছি, যা মূসা আ.-এর পরে অবতীর্ণ হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি প্রথম ওহি নাযিল হওয়ার প্রেক্ষিতে যে ঘটনা ঘটেছিল, তা শোনার পর ওরাকা ইবনে নওফল বলেছিল : পবিত্র! পবিত্র! ওনিই সেই জিবরাইল (নামূস) যিনি মূসা ইবনে ইমরানের নিকট ওহি নিয়ে এসেছিলেন। মোটকথা, মূসা আ.-এর শরিয়ত ছিল মহান, তাঁর উম্মতের সংখ্যা ছিল প্রচুর, তাঁদের মধ্যে ছিলেন বহু নবী, আলেম-ইবাদতগোযার বান্দা, বাদশা, আমীর-সর্দার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। কিন্তু তাঁরা যখন বিদায় নিলেন, তখন সে উম্মতের মধ্যেও পরিবর্তন দেখা দিল। যেমন তাদের এবং তাদের শরিয়তেও বিকৃতি ঘটল। তারা নিজ নিজ কর্মদোষে বানর ও শূকরে পরিণত হলো। একের পর এক বিধান রহিত হতে লাগল এবং তাদের উপর বিপদাপদ নেমে আসতে লাগল।

মূসা আ.-এর হজ পালন

ইমাম আহমদ রহ. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আল-আযরাক' উপত্যকায় গমন করেন এবং

প্রশ্ন করেন, এটা কোন উপত্যকা? উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আল-আযরাক উপত্যকা। তখন তিনি ইরশাদ করলেন, আমি যেন মূসা আ.-কে দেখতে পাচ্ছি, তিনি যেন রাস্তার মোড় থেকে অবতরণ করছেন এবং তালবিয়া সহকারে আল্লাহ তাআলাকে উচ্চ স্বরে ডাকছেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারশা মোড়ে পৌঁছলেন এবং প্রশ্ন করলেন, এটা কোন মোড়? উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম বললেন, "এটা হারশা মোড়।" তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি যেন ইউনুস ইবনে মাত্তা আ.-কে দেখতে পাচ্ছি। তিনি একটি লাল রঙের উটের উপর সওয়ার রয়েছেন, তাঁর পরনে পশমের একটি জুব্বা এবং তাঁর উটের নাকের দড়ি ছিল খেজুর গাছের ছালের। তিনি তালবিয়া পড়ছেন।

ইমাম আহমদ রহ. মুজাহিদ রহ. থেকে বর্ণনা করেন, ... আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি এ কথা বলতে শুনেছি, ইবরাহীম আ. সম্বন্ধে জানতে হলে তোমাদের সাথীর দিকে অর্থাৎ আমার দিকে লক্ষ কর। আর মূসা আ. ছিলেন ধূসর রংয়ের ব্যক্তি, তাঁর ছিল কোঁকড়ানো চুল। তিনি লাল রঙের উটের ওপর সওয়ার ছিলেন। উটের নাকের দড়ি ছিল খেজুর গাছের ছালের। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমি যেন তাঁকে দেখতে পাচ্ছি। আর তিনি উপত্যকা থেকে তালবীয়া পড়ায় রত অবস্থায় নেমে আসছেন।

ইমাম আহমদ রহ. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'আল্লাহর নবী বলেছেন, মিরাজের রাতে আমি মূসা আ. ইবনে ইমরানকে দেখেছি একজন দীর্ঘদেহী ও কোঁকড়ানো চুলধারী ব্যক্তি হিসেবে। মনে হয় যেন তিনি শানুয়া গোত্রের লোক।

হযরত মূসা আ.-এর ইনতেকাল

ইমাম বুখারী রহ. তাঁর বুখারীতে 'মূসা আ.-এর ইনতেকাল শিরোনামে আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন। একদিন মৃত্যুর ফেরেশতা (আযরাঈল)-কে মূসা আ.-এর কাছে প্রেরণ করা হয়। যখন তিনি মূসা আ.-এর কাছে আসলেন, তখন তিনি তাঁকে চপেটাঘাত করলেন। ফেরেশতা আল্লাহ তাআলার দরবারে ফিরে গিয়ে আরয করলেন, 'আপনি আমাকে এমন এক বান্দার কাছে প্রেরণ করেছেন যিনি মৃত্যু চান না।' আল্লাহ তা'আলা বললেন, তাঁর কাছে পুনরায় যাও! তাঁকে একটি ষাঁড়ের পিঠে হাত রাখতে বল এবং এ কথাটিও বল, তার হাতের নিচে যতগুলো চুল পড়বে তাঁকে তত বছরের আয়ু দেওয়া হবে।' মূসা আ. বললেন, 'হে আমার প্রতিপালক! তারপর কি হবে? আল্লাহ বললেন, 'তারপর মৃত্যু। তখন তিনি বললেন, 'তা হলে এখনই তা হয়ে যাক।'

বর্ণনাকারী বলেন, তখন তিনি আল্লাহ তাআলার দরবারে আরয করলেন : যেন তাঁকে একটি ঢিল নিক্ষেপের দূরত্বে পবিত্র ভূমি বায়তুল মুকাদ্দাসের নিকটবর্তী করা হয়। আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "যদি আমি সেখানে এখন থাকতাম, তা হলে ওই স্থানটিতে তাঁর

কবরটি তোমাদেরকে চিহ্নিত করে দেখাতাম। এটা রাস্তার পার্শ্বে 'লাল ঢিবির' কাছে অবস্থিত।

ইমাম আহমদ রহ.-ও আবু হোরায়রা রাযি. উক্তিরূপে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, মৃত্যুর ফেরেশতা মূসা আ.-এর কাছে আগমন করে বললেন, 'আপনি আপনার প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দিন। তিনি যখন মৃত্যুর ফেরেশতাকে চপেটাঘাত করে তার একটি চোখ নষ্ট করে দেন। ফেরেশতা তখন আল্লাহ তাআলার কাছে গিয়ে বললেন, 'আপনি আমাকে আপনার এমন এক বান্দার কাছে প্রেরণ করেছেন, যিনি মৃত্যু চান না। তিনি আমার চোখ নষ্ট করে দিয়েছেন।' বর্ণনাকারী বলেন, তখন আল্লাহ তাআলা তার চোখ নিরাময় করে দিলেন এবং বললেন, তুমি আমার বান্দার কাছে ফিরে যাও এবং তাকে বল, আপনি কি দীর্ঘায়ু চান? যদি আপনি দীর্ঘায়ু চান, তা হলে আপনি একটি ষাঁড়ের পিঠের উপর আপনার হাত রাখুন এবং আপনার হাতের নিচে যতগুলো লোম পড়বে, তত বছরের আয়ু আপনাকে প্রদান করা হবে। মূসা আ. বললেন, 'তারপর কি হবে? আল্লাহ তাআলা বললেন, 'তারপর মৃত্যু।' মূসা আ. বললেন, 'হে আমার প্রতিপালক! তা হলে অচিরেই মৃত্যু দেওয়া হোক।'

কোনো কোনো তাফসিরকারক মনে করেন, মূসা আ. বনি ইসরাঈলকে নিয়ে তীহ ময়দান থেকে বের হয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করেছিলেন। এ অভিমতটি কিতাবীদের ও জমহূর ওলামায়ে কেরামের অভিমতের পরিপন্থী। আর এটা মূসা আ.-এর সেই দুআর সঙ্গেও অসঙ্গতিপূর্ণ, যাতে তিনি বলেছিলেন– হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি ঢিল নিক্ষেপের তফাতে বায়তুল মুকাদ্দাসের নিকটবর্তী করুন। যদি তিনি তথায় প্রবেশই করে ফেলতেন, তা হলে তিনি এরূপ দুআ করতেন না। কিন্তু তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের সঙ্গে তীহ প্রান্তরে ছিলেন। যখন তাঁর মৃত্যু সন্নিকট হল, তখন তিনি যেই পবিত্র ভূমিতে হিজরত করার জন্যে যাত্রা শুরু করেছিলেন। সেই ভূমির নিকটবর্তী হওয়ার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করলেন এবং নিজের সম্প্রদায়কে এ কাজে অনুপ্রাণিত করলেন। কিন্তু তাদের ও তাদের আকাঙ্ক্ষিত পবিত্র ভূমির মাঝে ভাগ্য অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : "যদি আমি সেখানে যেতাম, তা হলে তোমাদেরকে লাল ঢিবির কাছে মূসা আ.-এর কবর দেখাতাম।'

ইমাম বুখারী রহ. আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মিরাজের রাতে যখন আমি মূসা আ.-এর কাছে গমন করলাম তখন আমি তাঁকে লাল ঢিবির কাছে তাঁর কবরে নামায আদায় করতে দেখলাম।

ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম রাযি. বলেন, আল্লাহ তাআলা মূসা আ.-এর কাছে ওহি প্রেরণ করলেন, আমি হারূন আ.-কে মৃত্যু দান করব। তাই তাঁকে অমুক পাহাড়ে নিয়ে আস। নির্দেশ মোতাবেক মূসা আ. ও হারূন আ. নির্দেশিত পাহাড়ের দিকে রওনা হলেন। পথে তাঁরা এমন একটি গাছ দেখতে পেলেন, যেরূপ গাছ কেউ কোনোদিন দেখে নি। এরপর তাঁরা একটি পাকা ঘর দেখতে

পেলেন। সেখানে একটি খাট রয়েছে এবং খাটে সুসজ্জিত বিছানাও রয়েছে। আর ঘরে তখন সুবাতাস খেলছে।

হারূন আ. যখন পাহাড় ও ঘরের দিকে তাকালেন তখন এগুলো তাঁর কাছে খুবই ভালো লাগল। তাই তিনি বললেন : 'হে মূসা! আমি এ খাটে ঘুমাতে চাই।' মূসা আ. বললেন, আপনার ভালো লাগলে আপনি এখানে ঘুমিয়ে পড়ুন। হারূন আ. বললেন, তবে আমার ভয় হচ্ছে, ঘরের মালিক যদি এসে আমার উপর রাগান্বিত হন। মূসা আ. বললেন, এ ব্যাপারে আপনি কোনো ভয় করবেন না, ঘরের মালিকের ব্যাপারটি আমিই দেখব। আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন। তিনি বললেন, হে মূসা! তুমিও আমার সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়। যদি ঘরের মালিক আসেন, তা হলে তিনি আমাদের দুজনের প্রতিই রাগান্বিত হবেন।' যখন তাঁরা দুজনই ঘুমিয়ে পড়লেন, হারূন আ.-কে মৃত্যু স্পর্শ করল। যখন তিনি ব্যাপারটি টের পেলেন, তখন বললেন, হে মূসা! তুমি আমাকে ফাঁকি দিয়েছ।" হারূন আ. যখন ইনতেকাল করলেন, ঘর, গাছ ও খাট আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হল।

এরপর মূসা আ. যখন তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে আসলেন, অথচ হারূন আ.-ও তার সাথে নেই, তখন বনি ইসরাঈলরা বলতে লাগল, "নিশ্চয়ই মূসা হারূনকে হত্যা করেছেন। বনি ইসরাঈলরা হারূন আ.-কে যেহেতু অধিকতর ভালোবাসে, সে জন্য মূসা হিংসা করে হারূন আ.-কে হত্যা করেছেন। বস্তুত মূসা আ.-এর থেকে বনি ইসরাঈলের কাছে হারূন আ. ছিলেন অধিকতর নমনীয়। পক্ষান্তরে মূসা আ.-এর মধ্যে ছিল কিছুটা কঠোরতা। মূসা আ. একথা শুনে তাদেরকে বললেন, তোমাদের জন্য আফসোস, তোমরা কি জান না, তিনি ছিলেন আমার সহোদর। তোমরা কি করে ভাবলে, আমি তাঁকে হত্যা করতে পারি? যখন তারা এ বিষয় নিয়ে মূসা আ.-কে অধিক জ্বালাতন করতে লাগল, তখন তিনি দাঁড়িয়ে দু রাকাত সালাত আদায় করলেন ও আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করলেন। তখন খাটটি উপর থেকে নিচে নেমে আসল এবং তারা সকলে আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী জায়গায় হারূন আ.-এর লাশটি দেখতে পেল।

ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ রহ. উল্লেখ করেছেন, একদিন মূসা আ. একদল ফেরেশতার কাছে আগমন করলেন। তারা তখন একটি কবর খুঁড়ছিলেন। এ কবর থেকে উত্তম, সুন্দর ও মনোরম কবর কখনো দেখা যায় নি। তিনি ফেরেশতাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনারা কার জন্যে এ কবরটি খুঁড়ছেন? তাঁরা বললেন, "এটা আল্লাহ তাআলার এক বান্দার জন্যে যিনি খুবই সম্মানিত। যদি আপনি এরূপ সম্মানিত বান্দা হতে চান তা হলে এ কবরে প্রবেশ করুন। বহুক্ষণ এখানে সটান শুয়ে পড়ুন এবং আপনার প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করুন এবং আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস নিতে থাকুন। তিনি তাই করলেন ও ইনতেকাল করলেন। ফেরেশতাগণ তাঁর জানাযার নামায আদায় করেন এবং তাঁকে দাফন করেন।

ওলামায়ে কেরাম উল্লেখ করেছেন, হযরত মূসা আ. যখন ইনতেকাল করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল একশ বিশ বছর।

মাদয়ান উপত্যকা

একটি কূপ। কথিত আছে যে, মূসা আ. এ কূপে ছাগলকে পানি পান করান
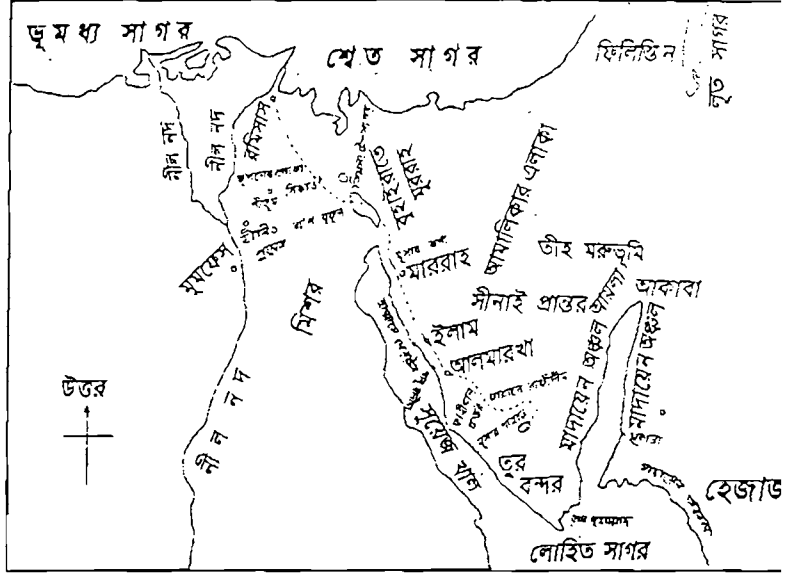
বনী ইসরাঈলের নির্গমন পথ

তূর পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত সেন্ট ক্যাথারাইন গীর্জা
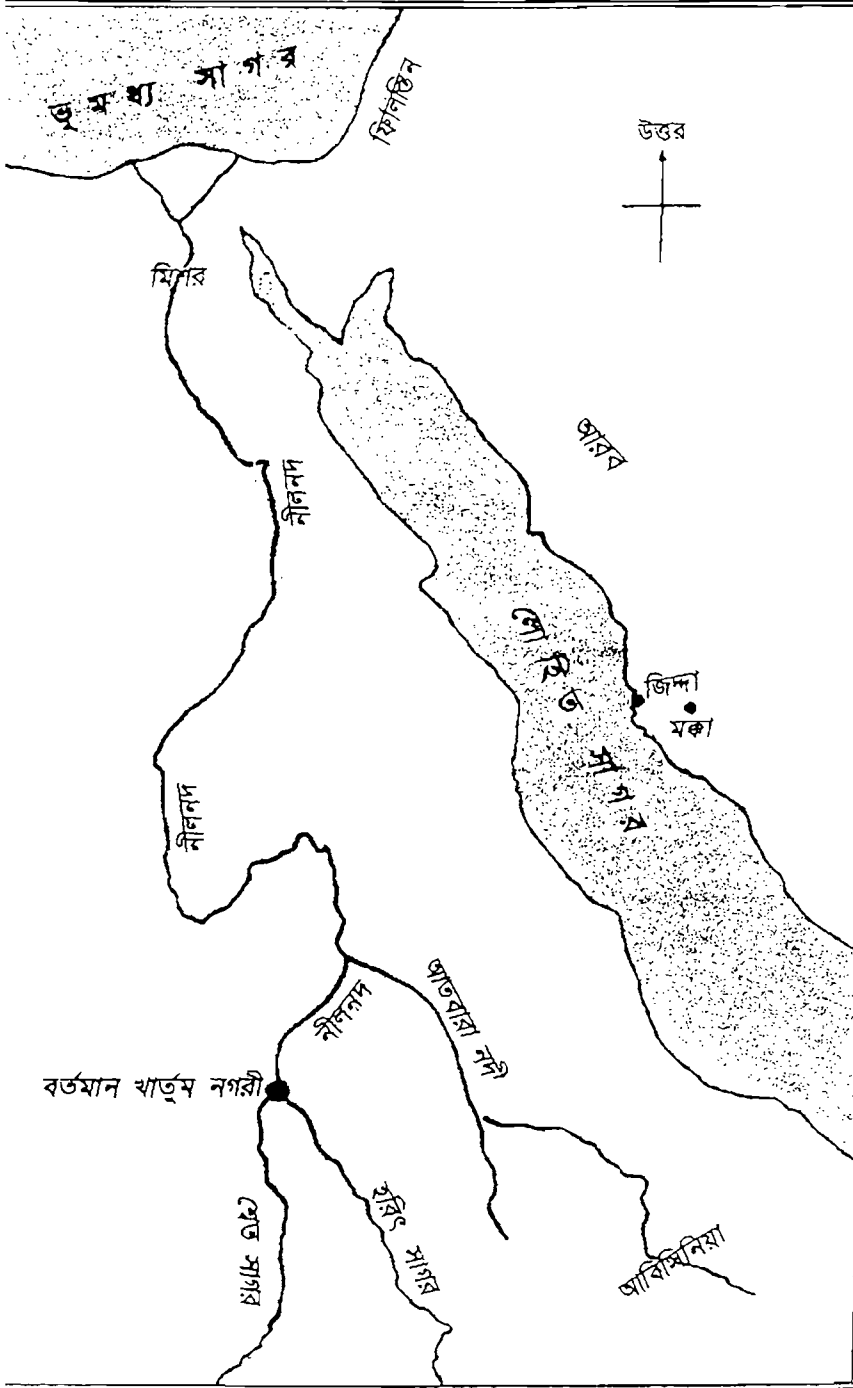
হযরত মূসা আ. ও খিজির আ.-এর কিসসা সংক্রান্ত মানচিত্র

contents

বনী ইসরাঈলের মরু পরিক্রমা
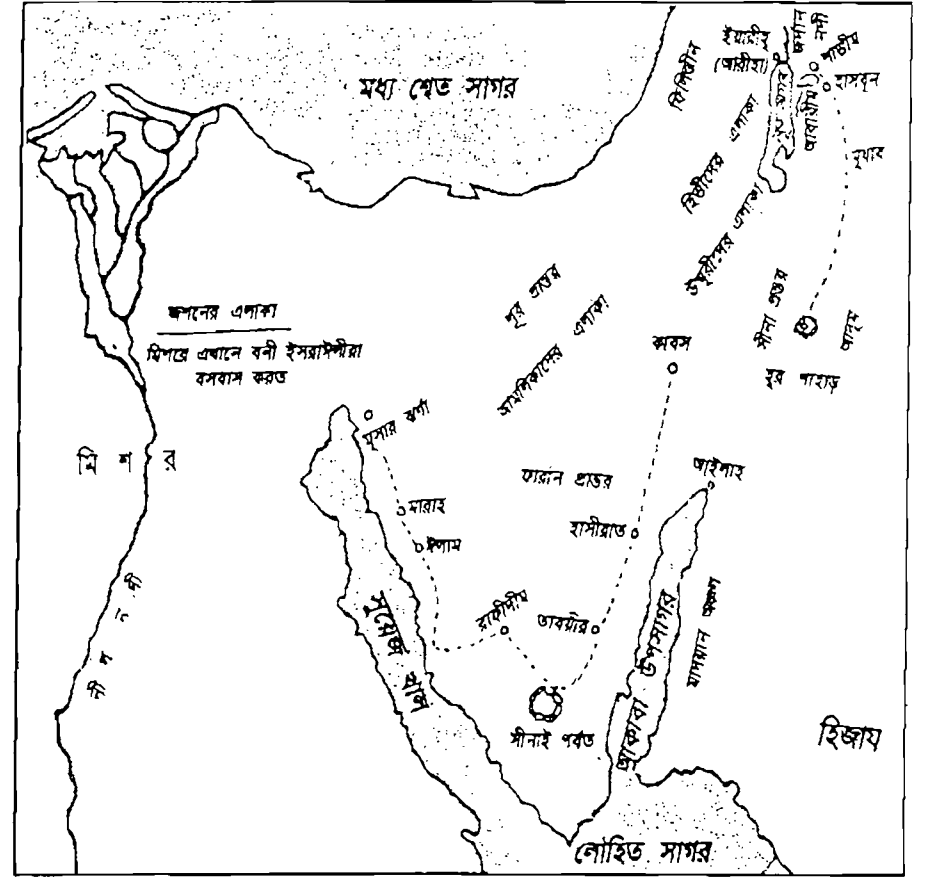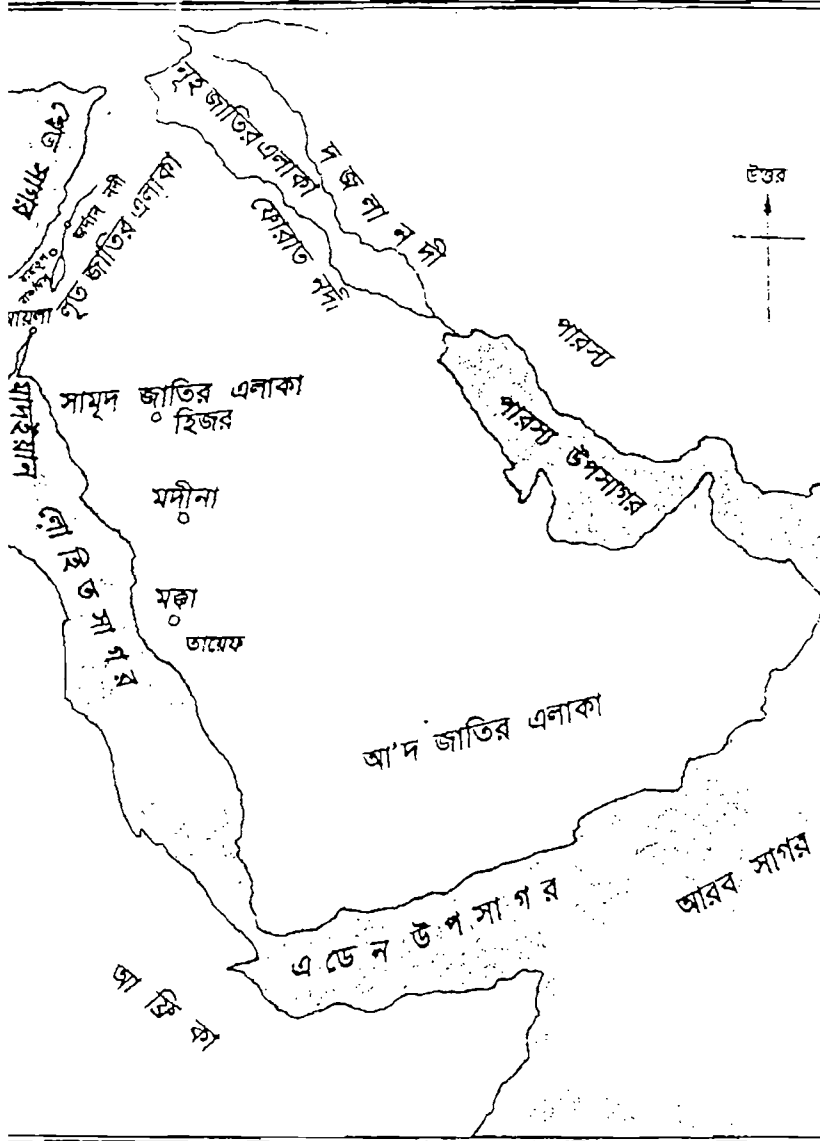
সূরা আল আ'রাফে উল্লেখিত জাতিসমূহের এলাকা

হযরত মূসা আ.-এর পর বনী-ইসরাঈলীরা ফিলিস্তিনের সমগ্র অঞ্চল জয় করে লয় বটে। কিন্তু তারা ঐকবদ্ধ ও সম্মিলিত হয়ে নিজেদের কোনো একটি সুসংঘবদ্ধ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় নাই। তারা এই গোটা অঞ্চলটিকে বিভিন্ন বনী ইসরাঈল গোষ্ঠীর লোকদের মধ্যে বিভক্ত ও বন্টন করে লয়। ফলে তারা নিজেদের ক্ষুদ্রায়তন বহু কয়টি গোত্রীয় রাষ্ট্র কায়েম করে। অত্র চিত্রে দেখানো হয়েছে যে, ফিলিস্তিনের সংক্ষিপ্ততম অঞ্চলটি বনী ইসরাঈলের বনু ইয়াহুদাহ, বনু শামউন, বনু দান, বনু বিনইয়ামিন, বনু আফরায়াম, বনু রুবন, বনু জাদ্দ, বনু মুনাসসা, বনু আশকার, বনু জুবলুন, বনু নাফতালী ও বনু আশের-এ গোত্রসমূহের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল।

এ কারণে প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই দুর্বল হয়ে থাকল। ফলে তারা তাওরাত কিতাবের লক্ষ অর্জনে সম্পূর্ণ অক্ষম থেকে গেল। আর সেই লক্ষ ছিল এই অঞ্চলের অধিবাসী মুশরিক জাতিগুলির সম্পূর্ণ মূলোৎপাটন ও বহিষ্কার।

ইসরাঈলী গোত্রসমূহের অধীন এ অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে মুশরিক কিনয়ানী জাতিসমূহের কতকগুলি নগর-রাষ্ট্র রীতিমত প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাইবেল পাঠে জানতে পারা যায় যে, তালূত-এর শাসন আমল পর্যন্ত সাইদা, সূর, দূয়ার ও মুজেদ্দু, বাইতেশান, জজর, জেরুজালেম প্রভৃতি শহরগুলি প্রখ্যাত মুশরিক জাতিগুলির দখলে থেকে গিয়েছিল। আর বনী ইসরাঈলদের উপর এসব শহরে অবস্থিত মুশরিকী সভ্যতার অত্যন্ত গভীর প্রভাব বিস্তার হয়েছিল।

উপরন্তু ইসরাঈলী গোত্রগুলোর অবস্থানের সীমান্ত এলাকায় ফলস্তিয়া, রোমক, মুয়াবী ও আমূনীয়দের অত্যন্ত শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলিও যথারীতি প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তারা পরবর্তীকালে উপর্যুপরি আক্রমণ চালাইয়া ইসরাঈলীদের দখল হতে বিস্তীর্ণ অঞ্চল কেড়ে নিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এ দাঁড়িয়েছিল যে, সমগ্র ফিলিস্তিন হতে ইয়াহূদীদেরকে কান ধরে ও গলা ধাক্কা দিয়ে বহিস্কৃত করা হত- যদি যথা সময়ে আল্লাহ তাআলা তালূত - এর নেতৃত্বে ইসরাঈলীদেরকে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ করে না দিতেন।
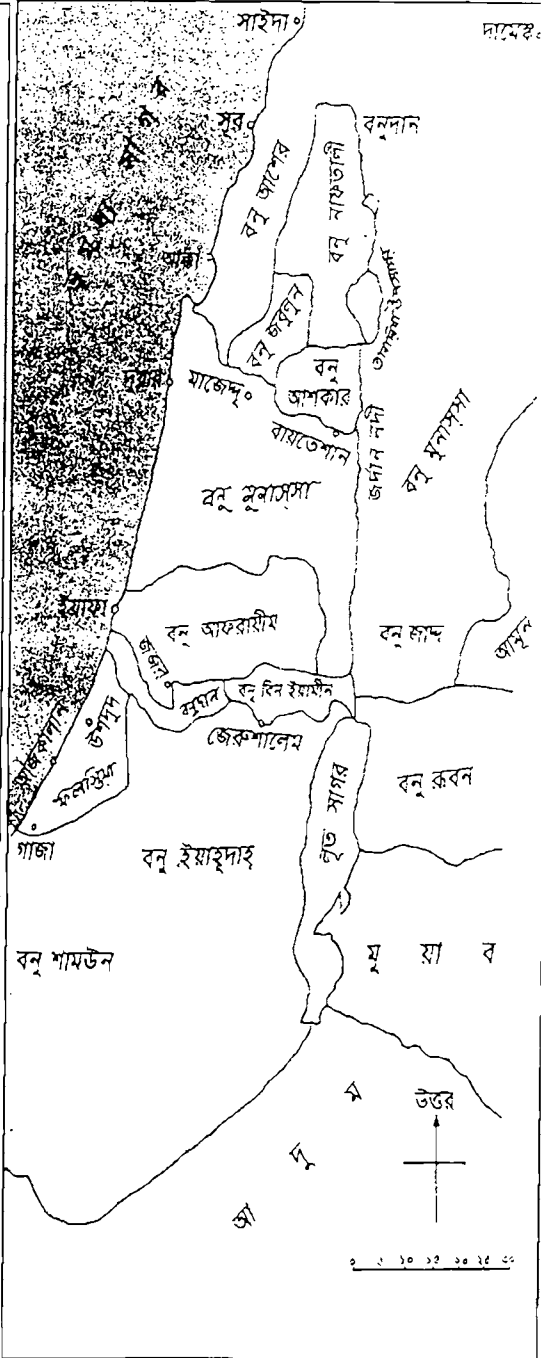
হযরত মূসা আ. পরবর্তী ফিলিস্তিন

contents

হযরত হারূন আ.

হযরত মূসা আ. নবুয়ত লাভ করে আপন স্ত্রীকে নিয়ে যখন মিসরে এসে পৌঁছলেন, তখন রাত হয়ে গিয়েছিল। তিনি নিজের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলেন; কিন্তু ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন না। মায়ের কাছে গিয়ে একজন মুসাফিরের মতো আত্মপ্রকাশ করলেন। তাদের পরিবার ছিল বনি ইসরাঈল গোত্রের মধ্যে মেহমানের সমাদরকারী। সুতরাং হযরত মূসা আ.-এর খুব সমাদর ও যত্ন করা হল। ইতোমধ্যে তাঁর জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতা হযরত হারূন আ. ঘরে এসে পৌছুলেন। এখানে পৌছার আগেই হযরত হারূন আ. আল্লাহ পাকের তরফ থেকে নবুয়ত ও রেসালতের মর্যাদা লাভ করেছিলেন। তাঁকে ওহি দ্বারা হযরত মূসা আ.-এর সমুদয় ঘটনা জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তিনি ঘরে এসেই ভাইয়ের সঙ্গে আলিঙ্গন করলেন। এরপর তাঁর পরিবারবর্গকে ঘরের ভিতর নিয়ে গেলেন এবং মাতাকে সমুদয় ঘটনা বর্ণনা করে শুনালেন। তখন পরিবারের সকলেই পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হলেন। বিচ্ছিন্ন ভাইয়েরা একে অন্যের বিগত জীবনের পরিচয় লাভ করলেন। শীতল হলো মাতার চক্ষুদ্বয়। তাওরাত এ সম্পর্কে বলেছে :

"আর আল্লাহ তাআলা হারূনকে বললেন, মাঠে গিয়ে সাক্ষাৎ কর! তিনি গমন করলেন। পাহাড়ের ওপর তাঁর সাক্ষাৎ পেলেন। তাঁকে চুম্বন করলেন। আল্লাহ তাআলা যে মূসা আ. কে নবী করে পাঠিয়েছেন, তিনি সে সমস্ত কথা হারূন আ.-কে বর্ণনা করে শুনালেন।"

অপরদিকে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে :

اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (٢٤) قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (٢٥) وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي (٢٦) وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي (٢٧) يَفْقَهُوا قَوْلِي (٢٨) وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي (٢٩) هَارُونَ أَخِي (٣٠) اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي (٣١) وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي (٣٢) كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا (٣٣) وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا (٣٤) إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا (٣٥) قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى

"(আদেশ হল) হে মূসা! তুমি (মিসরের বাদশা) ফেরাউনের নিকট যাও, সে বড়ই অবাধ্য হয়ে গেছে। মূসা আবেদন করলেন, হে আমার পালনকর্তা! আমার বক্ষ উন্মুক্ত করে দেন, (যেন বড় হতে বড় বোঝা বহন করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাই) আমার কাজ আমার জন্য সহজ করে দিন। (যেন পথের কোনো কষ্টই আমার ওপর প্রবল ও কঠোর না হয়) আমার যবানের গিরা খুলে দিন, (যেন কথাবার্তায় এবং ওয়ায-নসিহত পূর্ণরূপে চালু হয়ে যায়) আমার কথা মানুষের অন্তরের মধ্যে বসে যায়। এতদ্ভিন্ন আমার পরিবারবর্গের মধ্যে আমার ভাই হারূনকে আমার উযির বানিয়ে দিন, যেন তাঁর দ্বারা শক্তি মযবুত হয়ে যায় এবং তাঁকে আমার কাজের শরীক বানিয়ে দিন। যেন আমরা উভয়ে (এক মনে) আপনার পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্ব খুব বেশী ঘোষণা করতে পারি। আর

নিঃসন্দেহ আপনি আমাদের অবস্থা খুব অবলোকন করছেন (আপনি কোনো অবস্থায়ই আমাদের হতে গাফেল নন)। আল্লাহ পাক বললেন, হে মূসা! তোমার আবেদন মনযুর করা হল। (সূরা তহা : ২৪-৩৬)

সূরা তহাতেই এর পরে আরও ইরশাদ হচ্ছে :

اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (٤٣) فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى (٤٤) قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى (٤٥) قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى (٤٦) فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى

"এখন তুমি ও তোমার ভ্রাতা আমার নিদর্শনসমূহ নিয়ে যাও এবং আমার স্মরণে ত্রুটি করো না। হ্যাঁ তোমরা উভয়ে (অর্থাৎ মূসা ও হারূন আ. কেননা এখন তাঁরা উভয়ে একত্র হয়ে গিয়েছিলেন। আল্লাহর ওহি মিসরের নিকটবর্তী স্থানে তাঁদেরকে দ্বিতীয়বার সম্বোধন করছে।) ফেরাউনের নিকট যাও, সে অবাধ্যাচরণে সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। অতঃপর যখন তার নিকট পৌঁছবে, তখন তার সাথে কঠোর ব্যবহার করো না। নম্রতার সাথে কথা বল, (তোমরা কি জান?) হয়ত সে নসিহত কবুল করে অথবা (পরিণামকে) ভয় করে। উভয়ে আরয করলেন, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের আশংকা, ফেরাউন দ্রুত আমাদের বিরুদ্ধাচরণ না করে বসে অথবা অবাধ্যতার সাথেই অগ্রসর হয়। আল্লাহ পাক বললেন, কোনো আশংকা করো না। আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, আমি সবকিছুই শুনি এবং সবকিছুই দেখি, তোমরা তার নিকট (বিনা দ্বিধায়) চলে যাও এবং বল, আমরা তোমার রবের প্রেরিত রাসূল। অতএব বনি ইসরাঈলকে (মুক্ত করে) আমাদের সঙ্গে পাঠাও, তাদেরকে কষ্ট প্রদান করো না। আমরা তোমার রবের নিদর্শনসমূহ নিয়ে তোমার সম্মুখে এসেছি, আল্লাহ পাকের শান্তি বর্ষিত হোক তার ওপর, যে সরল পথ অবলম্বন করে নেয়।" (সূরা তহা : ৪৩-৪৭)

ফেরাউনের দরবারে সত্যের দাওয়াত

হযরত মূসা ও হযরত হারূন আ.-এর মধ্যে যখন পরস্পর সাক্ষাৎ ও কথোপকথনের পালা সমাপ্ত হল, তখন উভয়ে সিদ্ধান্ত করলেন, আল্লাহর তাআলার আদেশ পালনের উদ্দেশ্যে ফেরাউনের নিকট গমন এবং তাকে আল্লাহ তাআলার পয়গাম পৌঁছিয়ে দেওয়া উচিত। কোনো কোনো তাফসিরকারক লিখেছেন, যখন উভয় ভ্রাতা ফেরাউনের দরবারে গমন করতে উদ্যত হলেন, তখন তাঁদের মাতা স্নেহাতিশয্যে তাঁদেরকে বারণ করতে চাইলেন। বললেন–

"তোমরা এমন ব্যক্তির নিকট যেতে চাচ্ছ, যে রাজমুকুট এবং রাজসিংহাসনের মালিক, যালিম এবং অহংকারীও। সেখানে যেও না, সেখানে যাওয়া বিফল হবে। কিন্তু

উভয়ে মাতাকে বুঝালেন, আল্লাহ্ তাআলার আদেশ লঙ্ঘন করা যায় না। তিনি ওয়াদা করেছেন, আমরা সফলকাম হব। মোটকথা, উভয় ভ্রাতা আল্লাহ্ তাআলার সত্য নবী ফেরাউনের দরবারে পৌঁছুলেন এবং নির্ভয়ে ও নিশ্চিন্তে ভিতরে প্রবেশ করলেন। ফেরাউনের সিংহাসনের নিকটে পৌঁছে হযরত মূসা ও হারূন আ. নিজেদের আগমনের কারণ বর্ণনা করলেন। যখন কথোপকথন আরম্ভ হল, তাঁরা বললেন, ফেরাউন! আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে রাসূল নিযুক্ত করে তোমার নিকট পাঠিয়েছেন। আমরা তোমার নিকট দুটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চাচ্ছি।

এক. আল্লাহ্ তাআলাকে একক ও অদ্বিতীয় বলে বিশ্বাস কর; কাউকেও তাঁর শরীক সাব্যস্ত করো না।

দুই. যুলুম এবং অত্যাচার হতে নিবৃত্ত হও; বনি ইসরাঈলকে তোমার গোলামী হতে মুক্ত করে দাও। আমরা যা কিছু বলছি, দৃঢ় বিশ্বাস কর, আমরা বানোয়াট এবং কৃত্রিম বলছি না। আমাদের এমন দুঃসাহসও হতে পারে না, আমরা আল্লাহ্ তাআলা সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলব। আমাদের সত্যতা প্রমাণের জন্য যেমন আমাদের এ শিক্ষা স্বয়ং সাক্ষী রয়েছে, তদ্রূপ আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে দুটি নিদর্শন অর্থাৎ মুজিযাও দান করেছেন। তাই তোমার জন্য এ সত্যকে এবং আল্লাহ্ পাকের এ পয়গামকে কবুল করা এবং বনি ইসরাঈলকে মুক্তি দেওয়াই সঙ্গত। আমি তাদেরকে পয়গম্বরগণের সেই দেশে নিয়ে যাব, যেখানে তারা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার এবাদত করবে। তাঁকে ছাড়া আর কারও পূজা করবে না। কেননা এটাই সত্য পথ এবং তাদের পূর্ব পুরুষগণের চিরন্তন রীতিনীতি। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে :

وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٠٤) حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ

"আর মূসা বললেন, হে ফেরাউন! আমি রাব্বুল আলামীনের প্রেরিত রাসূল। আমার জন্য কোনোক্রমেই শোভনীয় নয়, আল্লাহ্ তাআলা সম্বন্ধে সত্য ছাড়া অন্য কিছু বলি। নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের জন্য তোমাদের রবের তরফ হতে প্রমাণ এবং নিদর্শন এনেছি। অতএব, তুমি বনি ইসরাঈলদেরকে মুক্ত করে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দাও।"

(সূরা আরাফ : ১০৪-১০৫)

ফেরাউন এটা শুনে বলল, হে মূসা! আজ তুমি নবী সেজে আমার সম্মুখে বনি ইসরাঈলের মুক্তি দাবি করছ। সেই দিনগুলি কি ভুলে গেলে, যখন তুমি আমার ঘরে প্রতিপালিত হয়েছিলে এবং শৈশবের জীবন অতিবাহিত করেছিলে ? আর তুমি কি এটাও ভুলে গেলে, তুমি একজন মিসরীয় লোককে হত্যা করে এখান হতে পলায়ন করেছিলে?

হযরত মূসা আ. বললেন, হে ফেরাউন! এটা সত্য, আমি তোমারই ঘরে প্রতিপালিত হয়েছি এবং এক দীর্ঘকাল পর্যন্ত রাজপ্রাসাদে অবস্থান করেছি। আর এটা আমিও

স্বীকার করি, ভুলের কারণে আমার দ্বারা অজ্ঞাতসারে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছে এবং সেই ভয়ে মিসর ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলাম। কিন্তু এটা আল্লাহ পাকেরই অপার মহিমা এবং দয়া, সমস্ত নিঃসহায়তামূলক অপারগতার অবস্থায় তোমারই পরিবারে আমার প্রতিপালন করেছেন। এরপর আমাকে সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত নবুয়ত ও রিসালত দান করে মহাসম্মানিত করেছেন। হে ফেরাউন! এটা কি ন্যায়-বিচার হবে, তুমি একজন ইসরাঈলিকে প্রতিপালন করার বিনিময়ে বনি-ইসরাঈলের গোটা জাতি বা সম্প্রদায়কে গোলাম বানিয়ে রাখবে?

ফেরাউনের খোদায়ী দাবি

ফেরাউন তার কথাবার্তার সময় মূসা আ.-কে বলেছিল, তুমি আমার এখানে প্রতিপালিত হয়েছ এবং তোমার প্রতিপালক আমি। তার উদ্দেশ্য শুধু এতটুকুই নয় বরং এর অভ্যন্তরে তার সেই বিশ্বাসও কাজ করছিল, যা ভেঙে-চুরে মিসমার করার জন্য মূসা আ. প্রেরিত হয়েছিলেন। অর্থাৎ মিসর রাজ্যের রাজাকে শুধু রাজাই বলা হত না বরং তাকে رَعْ (রা') অর্থাৎ সূর্য দেবতার অবতার বলে মান্য করা হত। এ কারণেই রাজারা 'ফেরাউন' উপাধিতে ভূষিত হত। মিসরীয়দের আকিদায় বিশ্ব জগতের প্রতিপালনের ব্যাপারটি رَعْ (রা') দেবতার উপর ন্যস্ত ছিল।

মিসরবাসীরা দেব-দেবীর পূজা করত। তন্মধ্যে কতক তো ছিল বিশেষ বিশেষ গোত্র এবং বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের দেবতা। যেমন : 'নীফাত', 'ফাতা' এবং 'মাত'। আর কোনো কোনোটির ক্ষমতা বিশ্বব্যাপী বলে বিশ্বাস করা হত। যেমন : 'উযীরাস' পরলোকের খোদা, 'মীহউরাত' আসমানের খোদা,'কাইনামু' প্রাণীর দেহ নির্মাতা, 'ঈযীর' দেহে প্রাণ সঞ্চারকরিণী দেবী, 'তোতা' আয়ুষ্কালের পরিমাণ নির্ধারণকারী, 'হাওরাস' ব্যথা-বেদনা ও শোক-চিন্তা বিদূরণকারী, 'হাসৃ' (গাভী) রিযিকদাত্রী দেবী এবং এ সমস্ত দেব-দেবীর সর্বোচ্চ দেবতা ছিল 'আমিনরা' অর্থাৎ 'সূর্য' দেবতা। এতদ্ভিন্ন মিসরীয়দের মধ্যে খোদায়িত্ব মিশ্রিত রাজত্বের কল্পনাও পূর্ণরূপে বৃদ্ধি লাভ করেছিল। মিসরের রাজমুকুট ও সিংহাসনের অধিকারীরা অর্ধখোদার মর্যাদা অবলম্বন করেছিল। তাদের উপাধি فَارَعْ 'ফারা' এই জন্য হয়েছিল, তাদেরকে সর্বোচ্চ رَعْ (রা') অর্থাৎ সূর্য দেবতার অবতার বলে মনে করা হত।

হযরত মূসা আ. এ সমস্ত বাতিল মাবুদের পূজার বিরুদ্ধে আওয়ায তুলে এক খোদার ইবাদতের প্রতি আহবান জানালেন। বললেন- إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ "আমি রাব্বুল আলামীনের তরফ হতে প্রেরিত দূত।" তখন প্রথমে ফেরাউন নিজের ও নিজের পূর্বপুরুষদের খোদায়িত্ব এরূপে সাব্যস্ত করল, মূসা আ.-এর ব্যক্তিত্বের উপর চাপ পড়ে। আর যখন দেখল, এই উপায়ে আসল বিষয়ের মীমাংসা হচ্ছে না। তখন বিষয়টিকে আরও নগ্ন করে হযরত মূসা আ.-এর সাথে বিতর্কে প্রবৃত্ত হল। বলল, মূসা! এটা তুমি কেমন নতুন কথা শুনাচ্ছ? আমি ছাড়াও কি কোনোও খোদা আছে? যাকে

তুমি 'রাব্বুল আলামীন' বলছ? যদি এটা সঠিক হয়, তবে তার স্বরূপ বর্ণনা কর। হযরত মূসা আ. বললেন, তোমার মধ্যে প্রকৃত ঈমান ও বিশ্বাসের অবকাশ থাকলে তোমার বুঝা উচিত– আমি যে মহান সত্তাকে রাব্বুল আলামীন বলছি, তিনি সেই পবিত্র সত্তা, যাঁরই ক্ষমতাধীন রয়েছে আসমান, যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সমুদয় সৃষ্টির প্রতিপালন বা খোদায়িত্ব। হে ফেরাউন! তুমি কি দাবি করতে পার, এ আসমান, যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত যাবতীয় সৃষ্টিকে তুমি সৃষ্টি করেছ কিংবা এদের প্রতিপালনের কারখানা তোমারই ক্ষমতার কবলে রয়েছে? যদি না হয় এবং অবশ্যই নয়, তবে রাব্বুল আলামীনের সর্বব্যাপী খোদায়িত্ব অস্বীকার করছ কেন? ফেরাউন এ শুনে সভাসদবৃন্দের প্রতি লক্ষ করে বিস্ময়ের সাথে বলল, তোমরা কি শুনছ! মূসা কেমন আশ্চর্য কথা বলছে?

মূসা আ. ফেরাউন ও তার সভাসদবৃন্দের এ বিস্ময়ের কেনো পরোয়াই করলেন না। বরং বললেন, রাব্বুল আলামীন সেই অদ্বিতীয় সত্তা, যাঁর খোদায়িত্বের প্রভাব হতে তোমার এবং তোমার পূর্বপুরুষগণের অস্তিত্বও মুক্ত নয়। যখন তোমার এবং তোমার পূর্বপুরুষগণের অস্তিত্বই ছিল না, তখন তিনিই তোমাদের সকলকে অস্তিত্বে আনয়ন করেছেন। নিজের প্রতিপালন ক্ষমতা দ্বারা প্রতিপালন করেছেন।

ফেরাউন এই নিরুত্তরকারী ও শক্তিশালী প্রমাণ শ্রবণ করে কোনো উত্তর করতে পারল না। তখন সভাসদবৃন্দকে লক্ষ্য করে বলল, "আমার মনে হয় এই ব্যক্তি নিজেকে তোমাদের নিকট আল্লাহর পয়গম্বর ও রাসূল বলে দাবি করছে, একজন বিকৃত মস্তিষ্ক ও উন্মাদ।" হযরত মূসা আ. ফেরাউনের এই লা-জাওয়াব অবস্থা দৃষ্টে আরও চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে আল্লাহ তাআলার খোদায়িত্বের বর্ণনা স্পষ্ট করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বললেন : এই যে মাশরিক ও মাগরিব এবং এদের মধ্যস্থিত সমুদয় সৃষ্টি দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, এই সমুদয়ের প্রতিপালন যাঁর কুদরতের হস্তে নিহত রয়েছে, আমি তাঁকেই 'রাব্বুল আলামীন' বলছি। তুমি যদি সামান্য মাত্র জ্ঞান-বুদ্ধি খরচ কর, তবে অতি সহজে এ সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করতে পার।

কুরআন মাজিদে ইরশাদ হচ্ছে

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ (٢٣) قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ (٢٤) قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ (٢٥) قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (٢٦) قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ (٢٧) قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ

"ফেরাউন বলল, রাব্বুল আলামীনের অর্থ কী? মূসা বললেন, আসমান, যমীন এবং এর মধ্যস্থিত যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুর পরওয়ারদিগার, যদি তুমি বিশ্বাস কর। ফেরাউন তার

সভাসদবৃন্দকে বলল, তোমরা কি শুন না? মূসা বলল, তোমার প্রতিপালক এবং তোমার পূর্বপুরুষদের প্রতিপালক। ফেরাউন সভাসদবৃন্দকে লক্ষ্য করে বলল, তোমদের এই পয়গম্বর, যে তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছে, অবশ্যই উম্মাদ। মূসা বললেন, তিনি মাশরিক ও মাগরিবের পরওয়ারদিগার, এবং ওই সমস্ত পদার্থের যা এতদুভয়ের মধ্যস্থলে বিদ্যমান রয়েছে, যদি তোমার জ্ঞান-বুদ্ধি থাকে।" (সূরা শুআরা : ২৩-২৮)

ফেরাউন আবারও সেই একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করল, হে মূসা! তোমাদের উভয়ের 'রব' কে? হযরত মূসা আ.-এর জবাবে এমন কথা বললেন, যার উত্তর নেই। ফেরাউন হতভম্ব হয়ে রইল এবং কথার মোড় ঘুরিয়ে নিতে চেষ্টা করল। যেমন, বাতিলপন্থীরা সঠিক উত্তর দিতে না পারলে এবং প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ হয়ে পড়লে কথার মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়ে থাকে।

মোটকথা, মূসা আ. বললেন, আমাদের পালনকর্তা তো সেই একমাত্র পালনকর্তা, যিনি দুনিয়ার প্রত্যেকটি বস্তুকে দান করেছেন। এরপর সর্বপ্রকারের প্রয়োজনীয় ক্ষমতা (যেমন : পঞ্চইন্দ্রিয় ও জ্ঞানশক্তি ইত্যাদি) প্রদানপূর্বক তার জন্য যিন্দেগীর যাবতীয় কার্যের দ্বার মুক্ত করে দিয়েছেন, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে দেহ এবং অস্তিত্বরূপী নেয়ামত দান করেছেন। এরপর সকলকে পূর্ণতা লাভের পথে চলার জন্য পথ প্রদর্শন করেছেন।

তখন ফেরাউন নিরুত্তর হয়ে কথার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে বলল, قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ "তবে অতীতকালের লোকদের অবস্থা কিরূপ হয়েছে?" উদ্দেশ্য ছিল, যদি তোমার কথাই ঠিক হয়, তা হলে আমাদের পূর্বে যারা অতীত হয়ে গেছে, যেমন আমাদের পূর্বপুরুষগণ, যাদের আকিদা তোমার আকিদার অনুকূলে ছিল না, তারা কি সকলেই আযাবে পতিত হবে। এবং সকলেই কি মিথ্যাবাদী ছিল? হযরত মূসা আ. ফেরাউনের এ বক্র কথা বুঝতে পারলেন এবং তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হল, এ ব্যক্তি আসল উদ্দেশ্যকে এলোমেলো করে দিতে চাচ্ছে। তাই তৎক্ষণাৎ তিনি কথার মোড় আসল দিকে ঘুরিয়ে উত্তর দিলেন :

قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى

"তাদের উপর কি ঘটেছে, তাদের সঙ্গে আল্লাহ তাআলা কিরূপ ব্যবহার করেছেন, এর দায়িত্ব আমার উপরও নয়; তোমার উপরও নয়। সেই জ্ঞান আমার পালনকর্তার নিকট সুরক্ষিত রয়েছে। হ্যাঁ, এতটুকু কথা বলে দেওয়া আবশ্যক, আমার পালনকর্তা ভুল-ত্রুটি হতে সম্পূর্ণ পবিত্র। যে যা কিছু করেছে, তার ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও ভুল এবং জুলুম হবে না।"

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে :

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ (٥٠) قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ (٥١) قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى (٥٢) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا

سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى (٥٣) كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ (٥٤) مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ

"ফেরাউন জিজ্ঞাসা করল, হে মূসা! যদি এরূপই হয়, তবে বল, তোমাদের রব কে? মূসা বললেন, আমাদের পরওয়ারদিগার সেই অদ্বিতীয় সত্তা, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার গঠন দান করেছেন, এরপর তার প্রতি (যিন্দেগী ও কর্মের) পথ মুক্ত করে দিয়েছেন। ফেরাউন বলল, তবে ঐ সমস্ত লোকের কেমন অবস্থা হবে যারা অতীতকালে (পরলোকে) চলে গেছে? মূসা বললেন, এই বিষয়ের জ্ঞান আমার পরওয়ারদিগারের নিকট দফতরের মধ্যে রক্ষিত রয়েছে। আমার রব এমন নন, হারিয়ে যাবেন, না ভ্রমে পতিত হবেন। তিনি সেই রব যিনি যমীনকে তোমাদের জন্য বিছানাস্বরূপ বিছিয়ে দিয়েছেন। চলাফেরার জন্য এর বহু পথ বের করে দিয়েছেন। আসমান হতে পানি বর্ষণ করেছেন, তাঁরই জল সিঞ্চন দ্বারা সর্বপ্রকার উদ্ভিদ জাতীয় বস্তুগুলি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। নিজেরাও খাও এবং নিজেদের গবাদিপশুগুলিকেও চরাও। এই বিষয়টিতে জ্ঞানীদের জন্য কেমন প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ বিদ্যমান রয়েছে! তিনি এই যমীন হতেই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, এই যমীনেই তোমদের ফিরে যেতে হবে এবং এ যমীন হতেই পুনর্বার তোমাদেরকে উঠানো হবে।" (সূরা তহা : ৪৯-৫৫)

তাফসিরকারক ওলামায়ে কেরাম বলেন, ফেরাউন ও মূসা আ. এ সমস্ত কথোপকথনে হযরত হারূন আ. উভয়ের মধ্যে দোভাষী হিসেবে থাকতেন আর হযরত মূসা আ.-এর প্রমাণগুলিকে নিতান্ত মার্জিত ভাষায় বর্ণনা করতেন। বিভিন্ন মজলিসে বিতর্কের এই ধারা হযরত মূসা আ. ও ফেরাউনের মধ্যে চালু রইল। ফেরাউন হযরত মূসা ও হযরত হারূন আ.-এর উজ্জ্বল ও প্রকৃত প্রমাণসমূহ শুনে শুনে যদিও হতভম্ব ও ভিতরে ভিতরে খুব রাগান্বিত হয়ে উঠত, কিন্তু নিরুত্তর হয়ে পড়ার কারণে মূসা আ. হতে মুক্তি পাওয়ার কোনো উপায়ও স্থির করতে পারত না।

সে জানত, আমার খোদয়িত্বের ভিত্তি এত দুর্বল, মূসা আ.-এর প্রমাণসমূহের সম্মুখে মাকড়সার জালের মত ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে, দরবারীরাও তা ভালোভাবে বুঝত। সুতরাং ফেরাউনের পক্ষে এটা অত্যন্ত অসহনীয় ছিল। বিশেষত যেই রাজ্যের মধ্যে তার রাজকীয় প্রভাব এবং রাজত্বের আড়ম্বরের সাথে সাথে খোদায়িত্বের মান-মর্যাদাও প্রদান করা হয়, সেখানে মূসা ও হারূনের এ দুঃসাহস বরং সত্য প্রচারের সাহস তাকে ভিতরে ভিতরে খুবই ভীত এবং ব্যাকুল করে তুলছিল। সুতরাং সে অন্য পন্থা অবলম্বন করল। তন্মধ্যে ছিল নিজের শক্তি ও ক্রোধের বিকাশ, মিসরী সম্প্রদায়কে মূসা ও বনি ইসরাঈলের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা, রাব্বুল আলামীনের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করে এ বিতর্ক ও আলোচনার অবসান ঘটিয়ে দেওয়া।

ফেরাউনের দরবারে মুজিযা প্রকাশ

ফেরাউনের উদ্বেগ ও ভীতি বৃদ্ধি পেতে থাকল। সত্য ও মিথ্যার এ টানা-হেঁচড়ার মধ্যে সে ভীষণ বিপদ দেখছিল। সে ব্যাপারটিকে এখানে সমাপ্ত করে দিল না। এটাই

জরুরি মনে করল, নিজের শক্তিমত্তা ও ক্রোধের প্রভাব দিয়ে মূসা ও হারূনকে ভীত ও শংকিত করে সত্যের পয়গাম পৌঁছানোর কর্তব্য পালন থেকে বিরত রাখবে। তাই সে বলল :

قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ (٢٩) قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ (٣٠) قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

"ফেরাউন বলল, যদি তুমি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে মাবুদ সাব্যস্ত কর, তবে আমি তোমাকে আমি অবশ্যই জেলখানায় আটক রাখব। মূসা বললেন : যদিও আমি তোমার নিকট স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছি, তবুও কি! ফেরাউন বলল, যদি তুমি তোমার খোদার নিকট হতে কোনো নিদর্শন আনয়ন করে থাক এবং তুমি এ সম্বন্ধে সত্যবাদী হও, তবে তুমি সেই নিদর্শন দেখাও।" (সূরা শুআরা : ২৯-৩১)

হযরত মূসা আ. সম্মুখে অগ্রসর হলেন এবং জনসমাকীর্ণ দরবারে ফেরাউনের সম্মুখে স্বীয় লাঠিটি যমীনে ফেললেন। তৎক্ষণাৎ এক বিরাটকায় অজগরের আকৃতি ধারণ করল এবং এটা সত্যিকারের অজগরই ছিল; দৃষ্টির ভ্রম ছিল না। এরপর হযরত মূসা আ. নিজের হাতকে জামার বুকের অংশের ভিতরে ঢুকিয়ে আবার বের করে আনলেন। তৎক্ষণাৎ তা একটি উজ্জ্বল তারকার মতো দীপ্তিমান দেখা যেতে লাগল। এটা ছিল দ্বিতীয় মুজিযা বা দ্বিতীয় নিদর্শন।

ফেরাউনের সভাসদবৃন্দ যখন একজন ইসরাঈলীর কাছে নিজেদের কওম বাদশার পরাজয় দর্শন করল, তখন বিচলিত হয়ে উঠল। তারা বলতে লাগল, নিঃসন্দেহে এ ব্যক্তি অতি বড় বিচক্ষণ জাদুকর। সে এ সমস্ত কলাকৌশল এ জন্যই দেখাচ্ছে, তোমাদের উপর জয়ী হয়ে তোমাদের দেশ মিসর থেকে তোমাদেরকে বের করে দিবে। অতএব, আমাদের ভেবে দেখা দরকার এ ব্যক্তি সম্বন্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। অবশেষে ফেরাউন ও তার সভাসদরা সিদ্ধান্ত করল, আপাতত মূসা ও হারূনকে অবকাশ দেওয়া হোক। ইতোমধ্যে সমগ্র রাজ্যের সমস্ত বিচক্ষণ জাদুকরদেরকে রাজধানীতে সমবেত করা হোক। এরপর মূসার সঙ্গে জাদুবিদ্যার প্রতিযোগিতা করা হবে। নিঃসন্দেহে এ ব্যক্তি পরাজিত হয়ে যাবে এবং তার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা মাটিতে মিশে যাবে। তখন ফেরাউন মূসা আ.-কে বলল, মূসা! আমরা খুব বুঝতে পেরেছি, তুমি এই কৌশল দ্বারা আমাদেরকে মিসর ভূমি হতে বেদখল করতে চাচ্ছ। অতএব, এখন তোমার প্রতিবিধান এটা ছাড়া আর কিছুই নয়, দেশের বড় বড় জাদুকরদেরকে একত্র করে তোমাকে পরাজিত করা। এখন আমাদের ও তোমার মধ্যে প্রতিযোগিতার দিন নির্দিষ্ট হওয়া উচিত। এরপর আমরা সেই নির্দিষ্ট দিবসের ব্যতিক্রম করব না, তুমিও ওয়াদা ভঙ্গ করো না। সুতরাং ওই প্রতিযোগিতার জন্য চূড়ান্ত একটি দিন-ক্ষণ ধার্য করা হল। এ প্রসঙ্গে কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে :

فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ (١٠٧) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ (١٠٨) قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ (١٠٩) يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ (١١٠) قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (١١١) يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ

"এরপর মূসা নিজের লাঠিটি মাটিতে নিক্ষেপ করলেন। তৎক্ষণাৎ সেটা পরিষ্কার একটি অজগরে পরিণত হয়ে গেল। আর মূসা নিজের হাতকে জামার বুকের অংশ (মধ্যে ঢুকিয়ে সেখান) সেখান থেকে বের করলেন, তা দর্শকদের জন্য শুভ্র উজ্জ্বল হয়ে গেল। ফেরাউনীদের একদল বলল, নিঃসন্দেহ এ ব্যক্তি বিচক্ষণ জাদুকর। তার ইচ্ছা সে তোমাদেরকে (মিসর) দেশ হতে বের করে দেয়। অতএব তোমাদের পরামর্শ কি? তারা বলল, তাকে এবং তার ভাই হারুনকে অবকাশ দাও। একদল লোককে শহরসমূহে প্রেরণ কর, তারা বিচক্ষণ জাদুকরদেরকে এনে একত্র করবে।

(সূরা আরাফ : ১০৭-১১২)

ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ (٧٥) فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا إِنَّ هَٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ (٧٦) قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَٰذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ (٧٧) قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ (٧٨) وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ

"এরপর আমি সেই রাসূলদের পরে মূসা ও হারুনকে আমার নিদর্শনসমূহ সঙ্গে দিয়ে প্রেরণ করলাম ফেরাউন ও তার সভাসদবৃন্দের কাছে। কিন্তু ফেরাউন ও তার সভাসদমণ্ডলী অহংকার করল, তাদের সম্প্রদায় ছিল পাপিষ্ঠদের সম্প্রদায়। এরপর যখন আমার তরফ হতে তাদের উপর সত্যতা প্রকাশ পেল, তখন ফেরাউনীরা বলতে লাগল, এটা প্রকাশ্য জাদু ছাড়া আর কিছুই নয়। মূসা বললেন, তোমরা সত্য সম্বন্ধে –যখন তা প্রকাশ হয়ে পড়ল– এমন কথা বলছ, এটা কি জাদু? অথচ জাদুকরেরা তো কখনো সফলকাম হতে পারে না। তারা উত্তরে বলল, তোমরা আমাদের নিকট এই জন্য এসেছ, যে পথে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষগণকে চলতে দেখেছি, সেই পথ হতে আমাদেরকে সরিয়ে দাও আর দেশে তোমাদের দুই ভাইয়ের জন্য নেতৃত্ব হয়ে যায়। আমরা তো তোমাদেরকে মান্য করব না। আর ফেরাউন বলল, আমার নিকট সর্বপ্রকারের বিচক্ষণ জাদুকরদেরকে আন।" (সূরা ইউনুস : ৭৫-৭৯)

বনি ইসরাঈলের মিসর ত্যাগ

আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা আ.-কে আদেশ করলেন, 'এখন সময় এসে গেছে, বনি ইসরাঈলকে মিসর হতে বের করে বাপ-দাদার দেশে নিয়ে যাও।' মিসর হতে ফিলিস্তিন

বা কেনান ভূমির দিকে যাওয়ার দুটি রাস্তা ছিল। একটি সরাসরি স্থলভাগের ওপর দিয়ে, এই পথটি নিকটবর্তী। দ্বিতীয়টি লোহিত সাগরের পথ। লোহিত সাগর অতিক্রম করে 'সূর' এবং 'তীহ' বা 'সাইনা' ময়দানের পথ। এটি ছিল দূরবর্তী পথ। কিন্তু আল্লাহ তাআলার হেকমতের চাহিদা হল, স্থলভাগের সরাসরি নিকটবর্তী পথটি ছেড়ে দূরবর্তী পথ লোহিত সাগর অতিক্রম করে যাওয়া।

প্রকাশিত ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে, এ পথটিকে আল্লাহ তাআলা এ জন্য প্রাধান্য দান করেছেন, স্থলভাগের পথ অতিক্রম করার বেলায় ফেরাউন ও তার সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ অপরিহার্য হয়ে পড়ত। কেননা ফেরাউনীরা বনি ইসরাঈলদেরকে প্রায় ধরেই ফেলেছিল। যদি সমুদ্রের মুজিযাটি না ঘটত, তবে ফেরাউন বনি ইসরাঈলদেরকে মিসরে ফিরিয়ে নিতে সফলকাম হত। যেহেতু বহু শতাব্দীর দাসত্ব বনি ইসরাঈলদেরকে কাপুরুষ এবং ভগ্নপ্রাণ বানিয়ে দিয়েছিল, তাই তারা ভয় ও আতংকের কারণে কোনোক্রমেই ফেরাউনের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হত না। তাওরাতের বর্ণনা দ্বারা এ ব্যাখ্যার সমর্থনও পাওয়া যায়।

ফেরাউন যখন তাদেরকে মিসর হতে চলে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করল, তখন আল্লাহ তাদেরকে ফিলিস্তিনের পথে নিলেন না। যদিও এই পথই নিকটবর্তী ছিল। কেননা আল্লাহ পাকের এরূপ ইচ্ছা ছিল না, এরা যুদ্ধ-বিগ্রহ দেখে পস্তাতে থাকে এবং ফেরাউনের সাথে মিসরে ফিরে যায়। বরং আল্লাহ পাক তাদের লোহিত সাগর ও সাইনা ময়দানের ঘুরা পথে নিয়ে গেলেন।

এতদ্ভিন্ন ফেরাউন ও তার কওমকে তাদের নাফরমানী ও অবাধ্যতার প্রতিফল এবং (মহান অলৌকিক ক্ষমতা) বিশাল মুজেযার দ্বারা যালেম ও যবরদস্ত শক্তির কবল হতে উৎপীড়িত কওমের নাজাত প্রদানের অনুপম ঘটনা বিকাশ করাও উদ্দেশ্য ছিল। এ কারণেই এ পথটিকে যথোপযোগী মনে করা হয়েছে। ফলে হযরত মূসা ও হারূন আ. বনি ইসরাঈলকে নিয়ে রাত্রিকালে লোহিত সাগরের পথ ধরলেন। রওনা হওয়ার পূর্বে মিসরীয় রমণীদের অলঙ্কার ও মূল্যবান কপড়সমূহ, যা একটি উৎসব উপলক্ষে বনি ইসরাঈলরা ফেরাউনীদের নিকট হতে ধার নিয়েছিল, তাও ফেরত দিতে সক্ষম হয় নি। এ আশঙ্কায়, ফেরাউনীরা যদি আসল ব্যাপার জেনে ফেলে।

এদিকে গুপ্তচরের মাধ্যমে ফেরাউন বনি ইসরাঈলরা মিসর হতে পলায়নের জন্য শহর হতে বের হয়ে গেছে জেনে তখনই এক বিরাট সেনাবাহিনী সঙ্গে নিয়ে 'রাআমসীস' হতে বের হয়ে তাদের পিছু ছুটল। এবং ভোর হওয়ার পূর্বক্ষণে তাদের সন্নিকটে গিয়ে পৌঁছল।

বনি ইসরাঈলদের সংখ্যা তাওরাতের উক্তি অনুযায়ী শিশু ও গবাদিপশু ছাড়া ছিল ছয় লাখ। কিন্তু ভোর হওয়ার সময় যখন তারা পিছনের দিকে ফিরে তাকাল, তখন দেখল, ফেরাউন সসৈন্যে তাদের মাথার উপরে উপস্থিত। তারা ঘাবড়ে গিয়ে মূসা আ.-কে

বলল : "মিসরে কি কবরের জায়গা ছিল না, তুমি আমাদেরকে মারার জন্য এ ময়দানে নিয়ে এসেছ? তুমি আমাদের সঙ্গে এ কি করলে, আমাদেরকে মিসর হতে বের করে আনলে? আমরা কি মিসরে তোমাকে বলতাম না, আমাদেরকে এখানেই থাকতে দাও, আমরা মিসরীয়দের কাজই করতে থাকি। আমাদের জন্য ময়দানে মৃত্যুবরণ করার চেয়ে মিসরীদের গোলামি করাই উত্তম হতো।

ফেরাউনের নিমজ্জন

হযরত মূসা আ. তাদেরকে সান্ত্বনা প্রদান করে বললেন, ভয় করো না। আল্লাহ পাকের ওয়াদা সত্য। তিনি অবশ্যই তোমাদেরকে নাজাত দিবেন, পরিশেষে তোমরাই সফলকাম হবে। এরপর মূসা আ. আল্লাহ তাআলার দরবারে হাত তুলে দুআ করলেন। আল্লাহ পাক মূসা আ.-কে আদেশ করলেন, তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রের পানির ওপর আঘাত কর, তা হলে মধ্যস্থলে পথ বের হবে। যখন তিনি লোহিত সাগরের বুকে নিজ লাঠি দ্বারা আঘাত করলেন, তৎক্ষণাৎ পানি দ্বিখণ্ডিত হয়ে দুই পার্শ্বে দুই পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে গেল। মধ্যস্থলে রাস্তা বের হল এবং হযরত মূসার আদেশে বনি ইসরাঈলরা তাতে নেমে পড়ল এবং শুকনা পথের মতো তার উপর দিয়ে হেঁটে সমুদ্রের অপর পাড়ে চলে গেল। ফেরাউন এটা দেখে নিজ কওমকে বলল, এটা আমারই মহিমা, তোমরা বনি ইসরাঈলকে গিয়ে ধরে ফেলবে। অতএব তোমরা চল। ফেরাউন এবং তার সেনাবাহিনী বনি ইসরাঈলের পিছে পিছে সেই পথেই নেমে পড়ল। কিন্তু আল্লাহ পাকের মহিমা হলো, বনি ইসরাঈলরা যখন সবাই অপর পাড়ে নিরাপদে পৌঁছে গেল, তখন পানি আল্লাহ পাকের আদেশে পুনরায় আগের অবস্থায় ফিরে আসল। এদিকে ফেরাউন ও তার গোটা সেনাবাহিনী, যারা এখনও মধ্য সমুদ্রে ছিল, নিমজ্জিত হয়ে গেল।

ফেরাউন যখন ডুবতে লাগল এবং আযাবের ফেরেশতাদেরকে সম্মুখে দেখতে লাগল, তখন ডেকে বলতে লাগল– "আমি সেই ওহদাহু লা-শারীকা লাহুর উপর ঈমান আনছি, যাঁর উপর বনি ইসরাঈলরা ঈমান এনেছে, আর আমি আল্লাহর ফরমাবরদার বান্দাগণের দলভুক্ত।" কিন্তু এ ঈমান যেহেতু প্রকৃত ঈমান ছিল না, বরং অতীতকালের ধোঁকাবাজির মতো মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে এটাও একটি অস্থিরতামূলক উক্তি ছিল। সুতরাং আল্লাহ পাকের তরফ হতে জবাব আসল :

آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ

"এখন এটা বলছ, অথচ এর পূর্বে যখন স্বীকার করার সময় ছিল, তখন অস্বীকার এবং অব্যাহত বিরোধিতাই করে গেছ এবং প্রকৃতপক্ষে তুমি ফাসাদ বিস্তারকারীদের মধ্যে ছিলে।" (সূরা ইউনুস : রুকূ-৯)

গো-বাছুর পূজার ঘটনা

হযরত মূসা আ. যখন তাওরাত আনয়নের জন্য তূর পর্বতের দিকে তাশরিফ নিয়ে গেলেন, তখন বনি ইসরাঈলকে বললেন : "তূর পর্বতে আমার এতেকাফের মুদ্দত

একমাস। সময় শেষ হওয়ার পর তৎক্ষণাৎ আমি তোমাদের নিকট ফিরে আসব। হারূন আ. তোমাদের নিকট রইলেন। তিনি তোমাদের যাবতীয় অবস্থার তত্ত্বাবধান করবেন। কিন্তু তূর পর্বতে পৌঁছে সেই একমাসের মুদ্দত চল্লিশ দিন হয়ে গেল। এ সময় সামেরী নামক এক ব্যক্তি সুযোগ গ্রহণ করল। হযরত মূসা আ.-এর ফিরতে বিলম্ব হওয়ায় বনি ইসরাঈলরা অস্থির হয়ে উঠেছে দেখে সে বনি ইসরাঈলকে বলল, যদি তোমরা নিজেদের সে সমস্ত অলংকারাদি আমার নিকট নিয়ে আস, যা তোমরা মিসরীয়দের নিকট হতে ধার করে এনেছিলে এবং মিসর হতে বের হয়ে আসার সময়ে তাড়াহুড়ার দরুন ফিরিয়ে দিতে পার নি, তা হলে আমি তা দ্বারা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক একটি কাজ করে দিব।

সামেরী বাইরে যদিও মুসলমান ছিল, কিন্তু তার অন্তরে কুফর ও শিরকের অপবিত্রতা ছিল পরিপূর্ণ। যখন বনি ইসরাঈলরা সমস্ত অলংকার তার নিকট এনে দিল, তখন সে অলংকারগুলিকে আগুনের ভাট্টিতে দিয়ে গলিয়ে ফেলল। এর দ্বারা গো-বাছুরের দেহ প্রস্তুত করল। এরপর নিজের থলি হতে এক মুষ্টি মাটি বের করে সেই দেহের ভিতরে রাখল। এতে বাছুরটির মধ্যে প্রাণের লক্ষণ দেখা গেল। সেটি গো-বাছুরের মতো হাম্বা হাম্বা ডাকতে লাগল। সামেরী বনি ইসরাঈলকে বলল : মূসা আ.-এর ভুল হয়েছে। তিনি খোদার অন্বেষণে তূর পাহাড়ে গিয়েছেন। তোমাদের মাবুদ তো এখানেই বিদ্যমান।

উল্লেখ্য, বহু শতাব্দি পর্যন্ত মিসরের রাজা-ফেরাউনদের গোলামী করার বনি ইসরাঈলদের মধ্যে মুশরেকি আকিদা ও প্রথা-প্রচলন ছড়িয়ে দিয়েছিল। তারা সেই রঙে এক বিশেষ পর্যায়ে রঞ্জিত হয়ে গিয়েছিল। আর গো-বাছুর পূজা ছিল মিসরের প্রাচীনকালের আকীদা। তাদের ধর্মে এ পূজা বহু গুরুত্বের ও মর্যাদার অধিকারী ছিল। তাদের এক বড় দেবতা (হাওরাস)-এর মুখ ছিল গাভীর আকৃতির। তাদের বিশ্বাস ছিল, ভূগোলকটি গাভীর মাথার উপর স্থাপিত। মনে হয়, পৃথিবীর সমস্ত মূর্তিপূজক দলগুলির মধ্যে গাভীর পবিত্রতা এবং গো-বাছুর পূজার এক ব্যাপক মর্যাদা রয়েছে। এ কারণেই হিন্দুস্তান, ইরাক, ইরান, চীন এবং জাপানের মূর্তিপূজক জাতিগুলির মধ্যে এর গুরুত্ব সমভাবে দৃষ্ট হয়।

সামেরী বনি ইসরাঈলকে উৎসাহ দিল, তারা যেন তার স্বহস্তে নির্মিত গো-বাছুরকে নিজেদের উপাস্য মনে করে এর পূজা করে। তখন তারা সহজে প্রস্তাবটি কবুল করে নিল। হযরত হারূন আ. এ দেখে বনি ইসরাঈলকে খুব বুঝালেন, এরূপ করো না। এটা তো গোমরাহীর পথ। কিন্তু তারা হারূন আ.-এর কথা মান্য করতে অস্বীকার করল। বলল : আমরা যা অবলম্বন করেছি, মূসা আ. ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা এ হতে নিবৃত্ত হব না।

অপরদিকে আল্লাহ তাআলা হযরত, মূসা আ.-কে এ সম্বন্ধে অবহিত করে দেন। সুতরাং তিনি মূসা আ.-কে জিজ্ঞাসা করলেন, মূসা! তুমি কওমকে ছেড়ে এখানে আসার

ব্যাপারে এত তাড়াহুড়া করলে কেন? হযরত মূসা আ. আরয করলেন, "হে আল্লাহ! আপনার নিকট তাড়াতাড়ি পৌঁছেছি যেন কওমের জন্য হেদায়ত লাভ করি।" আল্লাহ তাআলা তখন তাঁকে বললেন : যাদের হেদায়েতের জন্য তুমি এত অস্থির, তারা এরূপ গোমরাহীর মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। হযরত মূসা আ. এ কথা শুনে অত্যন্ত দুঃখ, ক্রোধ ও লজ্জার সঙ্গে কওমের দিকে ফিরে আসলেন এবং কওমকে সম্বোধন করে বললেন, তোমরা এ কী করলে!? আমার এত কি বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল, তোমরা এ অনর্থ ঘটিয়ে দিলে? এরূপ বলছিলেন এবং ক্রোধে কাঁপছিলেন। এমনকি হাত থেকে তাওরাতের ফলকগুলিও পড়ে গেল। বনি ইসরাঈলরা বলল, আমাদের কোনো দোষ নেই। মিসরীয়দের যেই অলংকারের বোঝা আমরা সঙ্গে নিয়ে বেড়াচ্ছিলাম, তা সামেরী আমাদের নিকট হতে চেয়ে নিয়ে এই 'সঙ' বানিয়ে দিয়েছে এবং আমাদেরকে গোমরাহ করেছে।

বস্তুত 'শিরক' নবুয়ত পদের জন্য একটি অসহনীয় বিষয়। তা ছাড়া হযরত মূসা আ. অত্যন্ত উষ্ণ মেজাজের লোক ছিলেন। তিনি তাঁর ভাই হারূন আ.-এর ঘাড় ধরে ফেললেন এবং দাড়ির দিকেও হাত বাড়ালেন। তখন হযরত হারূন আ. বললেন, হে আমার মাতৃনন্দন! আমার কোনোই দোষ নেই। আমি তাদেরকে যতই বুঝালাম, তারা কোনো প্রকারেই মানল না এবং বলতে লাগল, মূসা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা তোমার কোনো কথাই শুনব না। বরং তারা আমাকে দুর্বল পেয়ে আমাকে হত্যা করার সংকল্প করেছিল। আমি এ অবস্থা দেখে মনে করলাম, এখন যদি এদের সাথে লড়াই বাঁধিয়ে দিই এবং পূর্ণ ঈমানদারগণ আর এদের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায়, তবে পাছে না আমার উপর এ দোষারোপ হয়, আমার অনুপস্থিতিতে তুমি কওমের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দিয়েছ। এ কারণে আমি নীরবে তোমার অপেক্ষা করতে থাকলাম। প্রিয় ভাই! তুমি আমার মাথার চুল ধরে টেনো না এবং দাড়িও ধরো না এবং এরূপে অন্যান্য লোকদেরকে হাসার করে সুযোগ দিও না।

হারূন আ.-এর এ যুক্তিযুক্ত প্রমাণ শুনে তাঁর দিক হতে হযরত মূসা আ.-এর ক্রোধ প্রশমিত হয়ে গেল। এখন সামেরীকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন, সামেরী! তুমি এটা কেমন সঙ বানালে? সামেরী উত্তর করল : "আমি এমন একটি বিষয় দেখতে পেয়েছি, যা এ বনি ইসরাঈলদের মধ্যে কেউই দেখতে পায় নি।" অর্থাৎ ফেরাউনের নিমজ্জিত হওয়ার সময় হযরত জিবরাইল আ. অশ্বরোহী অবস্থায় ফেরাউন ও বনি ইসরাঈলদের মধ্যস্থলে আড়ালস্বরূপ বিদ্যমান ছিলেন। আমি দেখতে পেলাম, তাঁর অশ্বের ক্ষুরের মাটিতে প্রাণের লক্ষণ সৃষ্টি হয়ে যায় এবং শুষ্ক যমীনে উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়ে যায়। তখন আমি হযরত জিবরাইলের অশ্বের ক্ষুরের মাটি হতে এক মুষ্টি নিয়ে নিজের নিকট রাখলাম এবং সেই মটিকে এ বাছুরের ভিতরে নিক্ষেপ করলাম। তৎক্ষণাৎ এর মধ্যে প্রাণের লক্ষণ সৃষ্টি হয়ে গেল আর এটি 'হাম্বা' 'হাম্বা' শব্দ করতে লাগল।

হযরত মূসা আ. বললেন, আচ্ছা! তোমার জন্য পৃথিবীতে এ শাস্তির ব্যবস্থা করা হল, তুমি উম্মাদের মতো লক্ষ্যহীনভাবে এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়াবে এবং কোনো মানুষকে তোমার নিকটবর্তী হতে দেখলেই, তার থেকে পলায়ন করতে করতে বলবে : দেখো, আমাকে যেন স্পর্শ না কর! এ তো হল পার্থিব শাস্তি আর কেয়ামত দিবসে এরূপ নাফরমান এবং গোমরাহদের জন্য যেই শাস্তি নির্ধারিত আছে, তা তোমার জন্য আল্লাহ্ তাআলার প্রতিশ্রুতি আকারে পূর্ণ হতে থাকবে।

হে সামেরী! তুমি দেখে নাও! তুমি যে গো-বৎসকে বানিয়েছিলে এবং তার চারপাশে হলকা বানিয়ে পূজা বসিয়েছিলে, আমি এখনই এটিকে আগুনে নিক্ষেপ করে ভস্ম ছাই করে দিচ্ছি। এরপর সেই ছাইকে নদীর পানিতে ভাসিয়ে দিচ্ছি। যেন তুই এবং তোর এ সমস্ত নির্বোধ অনুসারীরা বুঝতে পারিস, তোদের উপাস্যের মূল্য-মর্যাদা এবং শক্তি-ক্ষমতার অবস্থা এই! সে অপরের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য কী করবে! সে তো নিজের অস্তিত্বকেই ধ্বংস এবং বিনাশ হতে রক্ষা করতে পারল না!

হতভাগার দল! এ সাধারণ কথটুকুও বুঝতে পারলে না! তোমাদের মাবুদ কেবল সেই একমাত্র খোদাই, যাঁর কোনো সাথী নেই, কোনো শরীক নেই এবং তিনিই সর্ববিষয়ে জ্ঞানী ও অবহিত।

এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন সূরায় বিভিন্ন স্থানে- যেমন : সূরা বাকারা : ৯২-৯৩, সূরা আরাফ : ১৪৮-১৫৪, বিশেষত সূরা তহায় : ৮৩-৯৮ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন ইরশাদ হচ্ছে :

وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى (٨٣) قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى (٨٤) قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ (٨٥) فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي (٨٦) قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ (٨٧) فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ (٨٨) أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا (٨٩) وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي (٩٠) قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى (٩١) قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا (٩٢) أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي (٩٣) قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي (٩٤) قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ (٩٥) قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ

فَنَبَذْتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي (٩٦) قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا (٩٧) إِنَّمَا إِلَٰهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا (٩٨)

"আর [মূসা তূর পর্বতে পৌঁছুলে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম,] হে মূসা! কোন বস্তু তোমাকে (এখানে আসার জন্য) ত্বরান্বিত করল, তুমি কওমকে পশ্চাতে রেখে চলে আসলে? মূসা আরয করলেন, তারা আমার থেকে দূরে নয়। আমার পিছু পিছুই রয়েছে। আর হে আমার পালনকর্তা! আমি আপনার দরবারে আসতে তাড়াতাড়ি করেছি, যেন আপনি সন্তুষ্ট হন। আল্লাহ পাক বললেন, কিন্তু আমি তোমার পিছনে তোমার কওমের ধৈর্যের পরীক্ষা করেছি। সামেরী তাদেরকে গোমরাহ করে দিয়েছে। এরপর মূসা ক্রোধান্বিত ও অনুতপ্ত অবস্থায় কওমের নিকট ফিরে গেলেন। বললেন, হে আমার কওম! (এটা তোমরা কি করলে?) তোমাদের পালনকর্তা কি তোমাদের সাথে এক মহা কল্যাণের ওয়াদা করেন নি? এরপর তোমাদের উপর কি এত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে গেল? (যে, তোমরা তা স্মরণ রাখতে পারলে না।) নাকি ব্যাপার এই যে, তোমরা ইচ্ছা করেছ, তোমাদের রবের গযব তোমাদের প্রতি নযিল হোক এবং সেজন্য তোমরা আমার সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করে ফেলেছ? তারা বলল, আমরা স্বেচ্ছায় তোমার সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করি নি বরং (অন্য একটি ঘটনা ঘটে গেছে, মিসরী) কওমের সাজ-সজ্জার অলংকারের যে বোঝা আমাদের ঘাড়ে চাপানো ছিল (অর্থাৎ ভারি ভারি অলংকারসমূহ যা মিসরে পরা হত। আমরা সে সমস্ত বোঝা বহন করতে ইচ্ছুক ছিলাম না।) তা আমরা ফেলে দিয়েছিলাম, (ব্যস, এটুকুই আমাদের অপরাধ!) অতএব, এরূপে (যখন স্বর্ণগুলি একত্র হয়ে গেল, তখন) সামেরী সেগুলিকে অগ্নির মধ্যে নিক্ষেপ করল এবং তাদের জন্য (বানিয়ে) বের করল একটি (স্বর্ণের) গো-বাছুর। নিছক একটা দেহ, যা হতে গরুর আওয়াযের মতো আওয়ায বের হচ্ছিল। লোকেরা এটা দেখে বলে উঠল, এটা আমাদের মাবুদ এবং মূসারও; কিন্তু তারা ভ্রান্তির মধ্যে পতিত হল, (তাদের জ্ঞানের উপর আফসোস?) তারা কি এই (মোটা) বিষয়টিও দেখতে পেল না? বাছুরটি (আওয়াজ তো দেয়, কিন্তু) তাদের কথার জবাব দিতে সক্ষম হয় না। তাদের কোনো হিতও সাধন করতে পারে না এবং কোনো ক্ষতিও করতে পারে না। আর হারূন ইতোপূর্বে তাদেরকে পরিষ্কার বলে দিয়েছিলেন, ভাইয়েরা আমার! এটা আর কিছুই নয়, তোমাদের (ধৈর্যের ও দৃঢ়তার) পরীক্ষা হচ্ছে। তোমাদের পালনকর্তা তো রহমান খোদা। দেখ, আমার কথা মান্য কর এবং আমার কথার বাইরে যেও না। কিন্তু তারা উত্তর করেছিল, মূসা আমাদের নিকট ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা এটার পূজার উপরই স্থায়ী থাকব। মূসা হারূনকে বললেন : হে হারূন, যখন তুমি দেখলে, লোকেরা গোমরাহ হয়ে গেছে, তখন আমার অনুসরণ করতে তোমাকে কিসে নিবৃত্ত

করল? তুমি কি আমার আদেশ লঙ্ঘন করাই পছন্দ করলে? হারূন বললেন, হে আমার মাতৃনন্দন! আমার দাড়ি ও মাথার চুল টেনো না। (আমি যদি কঠোরতা না করে থাকি, তবে তা শুধু এই মনে করে,) আমি আশঙ্কা করেছি, পরে তুমি এরূপ না বল, তুমি বনি ইসরাঈলদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ এবং আমার আদেশের অপেক্ষা কর নি। তখন মূসা (সামেরীকে) বললেন, তোমার এ কি অবস্থা হল? সামেরী বলল, আমি এমন একটি ব্যাপার দেখতে পেয়েছি, যা অন্যেরা দেখতে পায় নি। অতএব, আমি ফেরেশতার পদচিহ্ন হতেই এক মুষ্টি (মাটি) নিলাম। এরপর তাকে (আমার বানানো বাছুরের মধ্যে) নিক্ষেপ করলাম। আমার মন আমাকে এটাই বুঝাল। মূসা আ. বললেন : যদি এরূপই হয়, তবে যা! জীবনে তোর অবস্থা এরূপ হবে, তুই বলে বেড়াবি, আমি অস্পৃশ্য। (আমাকে কেউ স্পর্শ করো না।) আর আখেরাতে তোর জন্য (আযাবের) এক ওয়াদা রয়েছে, যার ব্যতিক্রম কখনো হবে না। আর দেখ, তোর (হাতে গড়া) মাবুদের এখন কি অবস্থা হচ্ছে, যার পূজায় তোরা জমে বসেছিলি, আমি একে পুড়িয়ে ছাই-ভস্ম করে দিচ্ছি আর সেই ছাই-ভস্ম উড়িয়ে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিচ্ছি। তোমাদের প্রকৃত মাবুদ তো একমাত্র আল্লাহ তাআলাই, যিনি ছাড়া আর কেউই মাবুদ হওয়ার যোগ্য নয়। যাঁর জ্ঞান সকল বস্তুকে পরিবেষ্টন করে আছে।" (সূরা তহা : ৮৩-৯৮)

হযরত খিযির আ.

নাম ও বংশ পরিচয়

হযরত খিযির আ.-এর নাম সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে একাধিক মত আছে। আবু হাতিম রহ. বলেন, আমার উস্তাদ আবু ওবায়দা রহ. বলেছেন, আদম সন্তানদের মধ্যে দীর্ঘতম আয়ুর অধিকারী হচ্ছে খিযির আ., আর তার নাম হচ্ছে খাযরুন। তিনি ছিলেন আদম আ.-এর পুত্র কাবীলের সন্তান।

ইবনে ইসহাক রহ. উল্লেখ করেছেন, যখন আদম আ.-এর মৃত্যুর সময় হল, তখন তিনি তাঁর সন্তানদের জানালেন, একটি প্লাবন আসন্ন। তিনি তাদেরকে অসিয়ত করলেন, তারা যেন তাঁর মৃতদেহ তাদের সাথে নৌযানে উঠিয়ে নেয় এবং তার নির্দেশিত স্থানে তাঁকে দাফন করে। যখন প্লাবন সংঘটিত হল, তখন তারা তাঁর লাশ তাদের সাথে উঠিয়ে নিলেন আর যখন তারা অবতরণ করলেন, তখন নূহ আ. তাঁর পুত্রদের নির্দেশ দিলেন, যেন তারা তাঁকে তাঁর অসিয়ত মতো নির্দিষ্ট স্থানে দাফন করেন। তখন তাঁরা বলতে লাগলেন, পৃথিবী এখনও বসবাসযোগ্য হয়ে উঠে নি। এখনো তা নিভৃত নির্জন। তখন নূহ আ. তাদেরকে দাফনের কাজে উৎসাহিত করলেন। তিনি বললেন, 'আদম আ.-এর দাফনের দায়িত্ব যিনি নেবেন, তাকে দীর্ঘায়ু করার জন্যে আদম আ. আল্লাহর দরবারে দুআ করেছিলেন। সে সময় তাঁরা দাফনের নির্দেশিত স্থানে যেতে ভীতিবোধ করলেন। ফলে আদম আ.-এর দেহ তাদের কাছেই রয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত খিযির আ. আদম আ.-এর দাফনের দায়িত্ব পালন করেন। এবং আল্লাহ তাআলাও তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন। তাই আল্লাহ তাআলা যত দিন চান, খিযির আ. ততদিন জীবিত থাকবেন।

মাআরিফ গ্রন্থে আছে, খিযির আ.-এর নাম বালিয়া। কেউ বলেন, তার নাম ঈলীয়া ইবনে মালকান ইবনে ফালিগ ইবনে আবির ইবনে শালিখ ইবনে আর-ফাখশায ইবনে সাম ইবনে নূহ আ.।

কেউ বলেন, মামার ইবনে মালিক ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে নসর ইবনে লাযিদ। কেউ বলেন, খাযিরুন ইবনে আমীয়াঈল ইবনে ইয়াফিয ইবনে ঈস ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম খলীল আ.। আবার কেউ বলেন, আরমীয়া ইবনে খালকীয়া। আল্লাহ তাআলাই অধিক পরিজ্ঞাত। কেউ কেউ বলেন, তিনি যুলকারনাইনের অগ্রবর্তী বাহিনীর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। কেউ বলেন, তিনি ছিলেন এমন এক মুমিন বান্দার পুত্র, যিনি ইবরাহীম খলীল আ.-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করেছিলেন এবং তাঁর সাথে হিজরতও করেছিলেন। আবার কেউ বলেন, তিনি বাশতাসিব ইবনে লাহরাসিরের যুগে নবী ছিলেন।

ইবনে জারীর তাবারী বলেন, বিশুদ্ধ মতে তিনি ছিলেন আফরীদুন ইবনে আসফীয়ান-এর যুগের প্রথম দিকের লোক। এবং তিনি মূসা আ.-এর যুগ পেয়েছিলেন।

হাফেয ইবনে আসাকির রহ.-এর মতে খিযির আ.-এর মা ছিলেন রোম দেশীয় এবং পিতা ছিলেন পারস্য দেশীয়।

আবু যুরয়া রহ. 'দালায়েলুল নবুয়ত' নামক কিতাবে উবাই ইবনে কাব রহ. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেরাজের রাতে সুগন্ধি অনুভব করেন। তখন তিনি বললেন, জিবরাঈল! এ সুগন্ধি কিসের? জবাবে জিবরাঈল আ. বললেন, এটা ফেরাউন কন্যার চুল বিন্যাসকারিণী মহিলা, তার কন্যা ও তার স্বামীর কবরের সুগন্ধি। আর এ সুগন্ধির সূচনা হয়েছিল এভাবে :

খিযির আ. ছিলেন বনি ইসরাঈলের সম্মানিত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর রাস্তায় ছিল এক ধর্মযাজকের ইবাদতখানা। তিনি খিযির আ.-এর সন্ধান পান এবং তাকে ইসলামের শিক্ষা দেন। খিযির আ. যখন বয়োপ্রাপ্ত হন, তখন তার পিতা তাকে বিবাহ দেন। তখন খিযির আ. তাঁর স্ত্রীকে ইসলাম শিক্ষা দেন এবং তার থেকে প্রতিশ্রুতি নেন, তিনি তা কারো কাছে ব্যক্ত করবেন না। খিযির আ. যেহেতু স্ত্রী সংসর্গে যেতেন না, তাই তিনি তাকে তালাক দেন। তারপর তার পিতা তাকে অন্য এক মহিলার সাথে বিবাহ দেন। তিনি তাকেও ইসলাম শিক্ষা দেন এবং তার থেকেও প্রতিশ্রুতি নেন, তিনি কারো কাছে তা ব্যক্ত করবেন না। এরপর তিনি তাঁকেও তালাক দেন। অনন্তর তাদের একজন তা প্রকাশ না করলেও অপরজন প্রকাশ করে দিল। তাই তিনি পলায়ন করলেন এবং সাগরের একটি দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

সেখানে দুজন কাঠুরিয়া তাকে দেখতে পায়। তাদের মধ্য হতে একজন তাঁর কথা গোপন রাখল; কিন্তু অন্যজন প্রকাশ করে দিল। সে বলল, আমি খিযির আ.-কে দেখেছি। তাকে বলা হল, তুমি ইযকিলকে দেখেছ, তবে তোমার সাথে আর কে দেখেছে? সে বলল, আমার সাথে অমুকও দেখেছে। তাকে প্রশ্ন করা হল, তখন সে এ সংবাদটি গোপন করল। আর তাদের ধর্মে রীতি ছিল, যে ব্যক্তি মিথ্যা বলত তাকে হত্যা করা হত। তাই তাকে হত্যা করা হল। ঘটনাচক্রে ইতোপূর্বে গোপনকারী ব্যক্তিটি পূর্বোক্ত গোপনকারিণী মহিলাকে বিয়ে করেছিল।

বর্ণনাকারী বলেন, একদিন মহিলাটি ফেরাউনের কন্যার চুল আঁচড়াচ্ছিল। এমনি সময় তার হাত থেকে চিরুনিটি পড়ে যায়। তখন সে বলে উঠল- ফিরআউন ধ্বংস হোক! কন্যা তার পিতাকে এ সংবাদটি দিল। উক্ত মহিলাটির স্বামী ও দুটি পুত্র ছিল। ফেরাউন তাদের কাছে দূত পাঠাল এবং মহিলা ও তার স্বামীকে তাদের ধর্ম ত্যাগ করতে প্ররোচিত করল; কিন্তু তাঁরা তাতে অস্বীকৃতি জানাল। তখন সে বলল, আমি তোমাদের দুজনকে হত্যা করব। তাঁরা বললেন, যদি তুমি আমাদেরকে হত্যাই কর, তা হলে আমাদেরকে এক কবরে দাফন করলে তা হবে আমাদের প্রতি তোমার অনুগ্রহ।

তাদেরকে এক কবরে দাফন করা হয়। এবং সেখান থেকে সুগন্ধি বের হতে থাকে। বর্ণনাকারী বলেন; এর চেয়ে অধিক সুগন্ধি আর কখনো পাওয়া যায় নি। মহিলাটি জান্নাতের অধিকারী হন।

খিযির আ.-এর ব্যাপারে চিরুনির ঘটনাটি সংক্রান্ত উক্তি সম্ভবত উবাই ইবনে কাব রাযি. কিংবা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.-এর। আল্লাহই সম্যক জ্ঞাত।

কেউ কেউ বলেন, খিযির আ.-এর উপনাম ছিল আবুল আব্বাস। তবে 'খিযির' তাঁর উপাধি ছিল– এটাই অধিক গ্রহণযোগ্য।

ইমাম বুখারী রহ. আবু হোরায়রা রাযি. এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। খিযির আ.-কে খিযির বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এ জন্য, একদিন তিনি একটি সাদা চামড়ার উপর বসেছিলেন। হঠাৎ দেখা গেল তাঁর পেছন থেকে সাদা চামড়াটি সবুজ আকার ধারণ করে কেঁপে উঠল।

খাত্তাবী রহ. বলেন, খিযির আ.-কে তাঁর সৌন্দর্য ও চেহারার উজ্জ্বলতার জন্যে খিযির নামে অভিহিত করা হয়েছে।

হাফেয ইবনে আসাকির রহ. হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : খিযির আ.-কে খিযির বলা হয়ে থাকে এ জন্যে, তিনি একবার সাদা চামড়ার উপর নামায আদায় করেন। হঠাৎ চামড়াটি সবুজ বর্ণ ধারণ করে নড়ে উঠে।

মুজাহিদ রহ. বলেন, তাঁকে খিযির আ. বলা হত এ জন্যে, তিনি যখন কোথাও নামায আদায় করতেন তাঁর আশেপাশের স্থানটিতে ঘাস জন্মাত ও স্থানটি সবুজ হয়ে যেত।

হযরত খিযির নবী ছিলেন কি না ?

মুজাহিদ রহ. বলেন, হযরত মূসা ও ইউশা আ. যখন নিজেদের পদাঙ্ক অনুকরণ করে পশ্চাতে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন তাঁরা সমুদ্রের মাঝে একটি ফরাশের ওপর শোয়া অবস্থায় খিযির আ.-কে দেখতে পেলেন। তিনি কাপড়ের দুই প্রান্ত মাথা ও দুই পায়ের নিচে মুড়ে রেখেছিলেন। মূসা আ. তাঁকে সালাম করলেন। তখন তিনি মুখ থেকে কাপড় সরালেন ও সালামের উত্তর দিলেন এবং বললেন, এ জায়গায় সালাম কোত্থেকে এল? আপনি কে? মূসা আ. বললেন, 'আমি মূসা।' তিনি বললেন, আপনি কি বনি ইসরাঈলের মূসা?' তিনি বললেন, জি হ্যাঁ। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কুরআন শরীফে বর্ণনা দিয়েছেন। উক্ত বর্ণনাধারা থেকে খিযির আ. নবী ছিলেন বলেই কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন ইরশাদ হচ্ছে :

فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا

এরপর তারা সাক্ষাৎ পেল আমার বান্দাদের মধ্যে এমন একজনের, যাকে আমি আমার কাছ থেকে অনুগ্রহ দান করেছিলাম ও আমার কাছ থেকে শিক্ষা দিয়েছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান। (সূরা কাহাফ : ৬৫)

দ্বিতীয়ত কোরআনে উল্লিখিত মূসা আ.-এর উক্তি হযরত খিজির আ. নবী হওয়ার ব্যাপারে সমর্থন করে। যেমন কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে :

هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا (٦٦) قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (٦٧) وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا (٦٨) قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا (٦٩) قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا

"মূসা তাঁকে বললেন, 'সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে, তা থেকে আমাকে শিক্ষা দিবেন– এ শর্তে আমি আপনার অনুসরণ করব কি? তিনি বললেন, আপনি কিছুতেই আমার সঙ্গে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না। যে বিষয় আপনার অবগতিতে নেই, সে বিষয়ে আপনি ধৈর্যধারণ করবেন কেমন করে? মূসা বললেন, আল্লাহ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আপনার কোনো আদেশ আমি অমান্য করব না।' তিনি বললেন, আচ্ছা আপনি যদি আমার অনুসরণ করতেই চান, তবে কোনো বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যতক্ষণ না আমি সে সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলি।" (সূরা কাহাফ : ৬৬-৭০)

হযরত খিজির আ. ওলি হতেন; নবী না হতেন, তা হলে মূসা আ. তাঁকে এরূপ কথা বলতেন না। আর তিনিও এরূপ জবাব দিতেন না। অথচ মূসা আ. তাঁর সঙ্গ লাভের আবেদন করেছিলেন, যাতে তিনি তাঁর কাছ থেকে এমন কিছু ইলম শিখতে পারেন, যা আল্লাহ তাআলা তাঁকেই বিশেষভাবে দান করেছিলেন।

তৃতীয়ত খিযির আ. কিশোরটিকে [যার বিবরণ সামনে আসবে] হত্যা করলেন। আর এটা মহান আল্লাহর ওহি ব্যতীত হতে পারে না। এটিই তাঁর নবুয়তের রীতিমতো একটি দলীল এবং তাঁর নিষ্পাপ হওয়ার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কেননা ওলির পক্ষে ইলহামের মাধ্যমে আদিষ্ট হয়ে প্রাণ বধ করার পদক্ষেপ গ্রহণ বৈধ নয়। ইলহামের দ্বারা নিষ্পাপ হওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় না। বরং এখানে ভুল-ভ্রান্তির আশঙ্কা সর্বজন স্বীকৃত। কিশোরটি প্রাপ্ত বয়স্ক হলে কাফের হবে, তার প্রতি গভীর মহব্বতের দরুন তার পিতামাতা তার অনুকরণে পথভ্রষ্ট হবেন ইত্যাদি তথ্য অবগত হয়ে অপ্রাপ্ত বয়সের কিশোরটিকে খিযির আ. হত্যা করার পদক্ষেপ নেওয়ায় বোঝা যায়, এ হত্যাকাণ্ডে বিরাট কল্যাণ নিহিত ছিল। আর তা হচ্ছে তার পিতার ঐতিহ্যবাহী বংশ রক্ষা এবং কুফরি ও তার শাস্তি থেকে তাকে রক্ষার ব্যবস্থা করা। এটাই তাঁর নবুয়তের প্রমাণ। অধিকন্তু এতে বোঝা যায়, তিনি তার নিষ্পাপ হওয়ার কারণে আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত।

চতুর্থত খিযির আ. যখন তাঁর কর্মকাণ্ডের রহস্য মূসা আ.-এর কাছে ব্যাখ্যা করলেন এবং মূসা আ.-এর কাছে তার তাৎপর্য সুস্পষ্ট হল, তারপর খিযির আ. মন্তব্য করেন :

رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي

"আমি যা কিছু করেছি আমার নিজের ইচ্ছে মতো করি নি বরং আমি এরূপ করতে আদিষ্ট হয়েছিলাম। আমার কাছে ওহি প্রেরণ করা হয়েছিল।"

এসব কারণ দ্বারা খিযির আ. যে নবী ছিলেন, তা প্রমাণিত হয়। তবে এটা তাঁর ওলি হওয়া বা রাসূল হওয়ার পরিপন্থী নয়, যেমনটি অন্যরা বলেছেন। তাঁর ফেরেশতা হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। উপর্যুক্ত বর্ণনায় তাঁর নবী হওয়ার ব্যাপারটা প্রমাণিত হওয়ার পর তিনি ওলি হওয়ার সপক্ষে কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ থাকে না। যদিও কোনো কোনো সময় আল্লাহর ওলিগণ এমন সব তথ্য অবগত হন, যেগুলো সম্বন্ধে প্রকাশ্য শরিয়ত প্রতিষ্ঠার জন্যে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ অবহিত থাকেন না।

হযরত মূসা ও খিযির আ.-এর ঘটনা

প্রথমে আমরা কুরআনে কারিমের আয়াতসমূহ উপস্থাপন করছি। এরপর আমরা তাফসীর, হাদীস ও ইতিহাসভিত্তিক বিশদ আলোচনা করব। সুতরাং এ সম্পর্কে কুরআনে কারিমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا (٦٠) فَلَمَّا بَلَغَا
مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا (٦١) فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا
غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا (٦٢) قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ
الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا (٦٣) قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا
نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا (٦٤) فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ
مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا (٦٥) قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا (٦٦) قَالَ إِنَّكَ لَنْ
تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (٦٧) وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا (٦٨) قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ
صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا (٦٩) قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ
ذِكْرًا (٧٠) فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ
شَيْئًا إِمْرًا (٧١) قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (٧٢) قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا
تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا (٧٣) فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ
نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا (٧٤) قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (٧٥) قَالَ إِنْ
سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا (٧٦) فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ
قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ
شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا (٧٧) قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ
عَلَيْهِ صَبْرًا (٧٨) أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ

وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا (٧٩) وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا (٨٠) فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا (٨١) وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا

'স্মরণ কর, যখন মূসা তাঁর সঙ্গীকে বললেন, দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে না পৌঁছে আমি থামব না অথবা আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব। তারা উভয়েই যখন দুই সমুদ্রের সংগমস্থলে পৌঁছুল, তারা নিজেদের মাছের কথা ভুলে গেল। এটা সুড়ঙ্গের মতো পথ করে সমুদ্রে নেমে গেল। যখন তারা আরও অগ্রসর হল, মূসা তাঁর সঙ্গীকে বললেন, 'আমাদের সকালের নাশতা নিয়ে এসো, আমরা তো আমাদের এ সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।' সঙ্গী বলল, আপনি কি লক্ষ করেছেন– আমরা যখন শিলাখণ্ডে বিশ্রাম করছিলাম, তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। শয়তানই এটার কথা বলতে আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে নিজের পথ করে সমুদ্রে নেমে গেল। মূসা বললেন, আমরা তো সেই স্থানটিরই অনুসন্ধান করছিলাম। তারপর তারা নিজেদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চলল। এরপর তারা সাক্ষাৎ পেল আমার বান্দাদের মধ্যে এমন একজনের, যাকে আমি আমার নিকট হতে অনুগ্রহ দান করেছিলাম এবং আমার নিকট হতে শিক্ষা দিয়েছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান। মূসা তাঁকে বললেন, 'সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে, তা থেকে আমাকে শিক্ষা দিবেন –এ শর্তে আমি আপনার অনুসরণ করব কি?' তিনি বললেন, আপনি কিছুতেই আমার সঙ্গে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না। যে বিষয় আপনার অবগতিতে নেই, সে বিষয়ে আপনি ধৈর্যধারণ করবেন কেমন করে?' মূসা বললেন, 'আল্লাহ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আপনার কোনো আদেশ আমি অমান্য করব না।' তিনি বললেন, 'আচ্ছা আপনি যদি আমার অনুসরণ করেনই, তবে কোনো বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যতক্ষণ না আমি সে সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলি।' তারপর উভয়ের চলতে লাগল। পরে তারা যখন নৌকায় আরোহণ করল, তখন তিনি ওটা বিদীর্ণ করে দিলেন। মূসা বললেন, আপনি কি আরোহীদের নিমজ্জিত করে দেওয়ার জন্যে এটা বিদীর্ণ করলেন? আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন।' সে বলল, 'আমি বলি নি, আপনি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করতে পারবেন না?' মূসা বললেন, আমার ভুলের জন্য আমাকে অপরাধী করবেন না এবং আমার ব্যাপারে অত্যধিক কঠোরতা অবলম্বন করবেন না।

তারপর উভয়ে চলতে লাগল। চলতে চলতে ওদের সাথে এক বালকের সাক্ষাৎ হলে তিনি তাকে হত্যা করলেন। তখন মূসা বললেন, আপনি কি এক নিষ্পাপ জীবন নাশ

করলেন হত্যার অপরাধ ছাড়াই? আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন।' সে বলল, 'আমি কি বলি নি, আপনি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করতে পারবেন না?' মূসা বললেন, এটার পর যদি আমি আপনাকে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞেস করি, তবে আপনি আমাকে সঙ্গে রাখবেন না, আমার ওযর-আপত্তির চূড়ান্ত হয়েছে।' তারপর উভয়ে চলতে লাগল। চলতে চলতে তারা এক জনপদের অধিবাসীদের কাছে পৌঁছে তাদের কাছে খাদ্য চাইল, কিন্তু তারা তাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। তারপর তারা এক পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখতে পেলেন। তিনি সেটাকে সুদৃঢ় করে দিলেন। মূসা বললেন, 'আপনি তো ইচ্ছে করলে এর জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন।' তিনি বললেন, 'এখানেই আপনার এবং আমার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হল; যে বিষয়ে আপনি ধৈর্যধারণ করতে পারেন নি, আমি তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছি।'

নৌকাটির ব্যাপার– এটা ছিল কয়েকজন দরিদ্র ব্যক্তির, ওরা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করত; আমি ইচ্ছা করলাম নৌকাটিকে ত্রুটিযুক্ত করতে। কারণ, তাদের পশ্চাতে ছিল এক রাজা, যে বলপ্রয়োগে সকল নৌকা ছিনিয়ে নিত। আর কিশোরটি– তার পিতামাতা ছিল মুমিন। আমি আশঙ্কা করলাম, সে বিদ্রোহাচরণ ও কুফরির দ্বারা তাদেরকে বিব্রত করবে। তার পরে আমি চাইলাম, ওদের প্রতিপালক যেন ওদেরকে তার পরিবর্তে এক সন্তান দান করেন, যে হবে পবিত্রতায় মহত্তর ও ভক্তি-ভালোবাসায় ঘনিষ্ঠতর। আর ওই প্রাচীরটি– এটা ছিল নগরবাসী দুই পিতৃহীন কিশোরের। এর তলদেশে আছে ওদের গুপ্তধন। ওদের পিতা ছিল সৎকর্মপরায়ণ। সুতরাং আপনার প্রতিপালক দয়াপরবশ হয়ে ইচ্ছা করলেন, ওরা বয়োপ্রাপ্ত হোক এবং ওরা ওদের ধনভাণ্ডার উদ্ধার করুক। আমি নিজ থেকে কিছু করি নি, আপনি যে বিষয়ে ধৈর্যধারণে অপারগ হয়েছিলেন, তার ব্যাখ্যা এটাই। (সূরা কাহাফ : ৫৯-৮২)

কোনো কোনো কিতাবী বলে : খিযির আ.-এর কাছে যে মূসা আ. গমন করেছিলেন, তিনি হচ্ছেন মূসা আ. ইবনে মীশা ইবনে ইউসুফ আ. ইবনে ইয়াকুব আ. ইবনে ইসহাক আ. ইবনে ইবরাহীম আল খলীল আ.। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন নূপ ইবনে ফুআলা হিমইয়ারী আশ-শামী, আল বুকালী। কথিত আছে, তিনি ছিলেন দামিশকের অধিবাসী। তাঁর মাতা হচ্ছে কাব আহবারের স্ত্রী। বাহ্যত কুরআনের পূর্বাপর বর্ণনা ও সর্বজন গৃহীত বিশুদ্ধ হাদীসের স্পষ্ট দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয়, মূসা আ. ইবনে ইমরানই হচ্ছে বনি ইসরাঈলের কাছে প্রেরিত মূসা আ.।

ইমাম বুখারী রহ. বলেন, সাঈদ ইবনে জুবায়র রাযি. বলেছেন, একদিন আমি ইবনে আব্বাস রাযি.-কে বললাম : নূফ আল বুকালীর ধারণা হল, খিযির আ.-এর সাথে যে মূসা আ. সাক্ষাৎ করেছিলেন, তিনি বনি ইসরাঈলের মূসা আ. নন। ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, আল্লাহর দুশমন মিথ্যা বলেছে।'

উবাই ইবনে কাব রাযি. বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, একদিন মূসা আ. ইসরাঈলীদের কাছে বক্তব্য রাখছিলেন। এমন সময়

তাঁকে প্রশ্ন করা হল, মানবজাতির মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী কে? তিনি বললেন, 'আমি'। যেহেতু জ্ঞানকে তিনি আল্লাহ তাআলার দিকে সম্পর্কিত করেন নি, তাই আল্লাহ তাআলা তাঁকে ভর্ৎসনা করলেন। তাঁর কাছে আল্লাহ তাআলা এ মর্মে ওহী প্রেরণ করেন– দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে আমার এক বান্দা রয়েছে যিনি তোমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী। মূসা আ. বললেন, "হে আমার প্রতিপালক! আমি কেমন করে তার কাছে পৌঁছুতে পারব?" আল্লাহ তাআলা বললেন, 'একটি মাছ সাথে নিয়ে তা থলেতে পুরে নাও। যেখানেই মাছটি হারিয়ে যাবে, সেখানেই তাকে পাওয়া যাবে।' তিনি একটি মাছ থলেতে নিয়ে নিলেন। তারপর তিনি চলতে লাগলেন। তাঁর সাথে তাঁর খাদেম ইউশা ইবনে নূনও ছিলেন। যখন তাঁরা শৈলশীলার কাছে পৌঁছলেন, তখন তাঁরা তাতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। মাছটি লাফ দিয়ে থলে থেকে বের হয়ে গেল এবং সুড়ঙ্গের পথ করে সাগরে নেমে গেল।

আল্লাহ তাআলা মাছের যাত্রাপথের পানি ঠেকিয়ে রাখলেন, যাতে সুড়ঙ্গের মতো হয়ে গেল। মূসা আ. যখন জাগলেন, তখন খাদেম মাছটি সম্বন্ধে তাঁকে অবহিত করতে ভুলে গেলেন। এরপর তাঁরা বাকি দিন ও রাত পথ চলতে লাগলেন। পরদিন সকালে মূসা আ. তাঁর খাদেমকে বললেন, 'আমাদের নাশতা আন, আমরা তো আমাদের এ সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।' যে স্থানে পৌঁছার জন্য আল্লাহ তাআলা মূসা আ.-কে হুকুম দিয়েছিলেন সে স্থান অতিক্রম করার পূর্ব পর্যন্ত তিনি কোনো ক্লান্তি বোধ করেন নি। খাদেম মূসা আ.-কে বললেন : "আপনি কি লক্ষ করেছেন আমরা যখন শিলাখণ্ডে বিশ্রাম করছিলাম, তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম? শয়তানই এটার কথা বলতে আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে নিজের পথ করে সাগরে নেমে যায়।" অর্থাৎ মাছটি পথ করে সমুদ্রে নেমে যাওয়ায় দুজনই আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলেন। মূসা আ. বললেন, 'আমরা তো সেই স্থানটিরই অন্বেষণ করছিলাম।'

তারপর তাঁরা নিজেদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চললেন এবং পাথরটির কাছে গিয়ে পৌঁছলেন। তাঁরা সেখানে একজন বস্ত্রাবৃত লোককে দেখতে পান। মূসা আ. তাঁকে সালাম দিলেন, তখন ওই ব্যক্তি অর্থাৎ খিযির আ. বললেন, আমার এ জনপদে সালাম আসল কোত্থেকে? মূসা আ. বললেন, আমি মূসা। তিনি প্রশ্ন করলেন, বনি ইসরাঈলের মূসা আ.? মূসা আ. বললেন : হ্যাঁ, তাই। সত্যের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে, তা থেকে আমাকে শিক্ষা দিবেন এজন্য আমি আপনার কাছে এসেছি। খিযির আ. বললেন, "হে মূসা আ.! আল্লাহ তাআলা তাঁর জ্ঞান থেকে আমাকে একটি বিশেষ জ্ঞান প্রদান করেছেন, যা আপনার অজ্ঞাত। অনুরূপভাবে আপনাকে এমন একটি জ্ঞান দান করেছেন, যা আমার অজ্ঞাত। তাই আপনি কিছুতেই আমার সঙ্গে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না।"

হযরত মূসা আ. খিযির আ.-কে বললেন, "আল্লাহ ইচ্ছা করলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আপনার কোনো আদেশ আমি অমান্য করব না।" খিযির আ.

মূসা আ.-কে বললেন, 'যদি আপনি আমার অনুকরণ করেনই, তবে কোনো বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যতক্ষণ না আমি সে সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলি।' তারপর উভয়ে সাগরের তীর ধরে চলতে লাগলেন এবং একটি নৌকার দেখা পেলেন। নৌকার মালিকদের সাথে পারাপারের ব্যাপারে আলোচনা করলেন। নৌকার মালিকগণ খিযির আ.-কে চিনতে পারলেন। ভাড়া না নিয়েই তাদেরকে পার করে দিলেন। যখন তারা উভয়ে নৌকায় আরোহণ করলেন, খিযির আ. কিছুক্ষণের মধ্যে কুঠার দ্বারা নৌকার একটি কাঠ খুলে ফেললেন। তখন মূসা আ. তাঁকে বললেন, 'এরা বিনা ভাড়ায় আমাদেরকে পার করে দিলেন আর আপনি আরোহীদেরকে নিমজ্জিত করার জন্যে নৌকাটিকে বিদীর্ণ করে দিলেন! আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন!" তিনি মূসা আ.-কে বললেন, "আমি কি আপনাকে বলি নি, আপনি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করতে পারবেন না?" মূসা আ. বললেন, "আমার ভুলের জন্য আমাকে অপরাধী সাব্যস্ত করবেন না এবং আমার ব্যাপারে অত্যধিক কঠোরতা অবলম্বন করবেন না।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, প্রথম বারের প্রশ্নটি মূসা আ. হতে ভুলক্রমে সংঘটিত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, এমন সময় একটি চড়ুই পাখি এসে নৌকার একপাশে বসল। তারপর ঠোঁট দিয়ে পানি উঠাল। তখন খিযির আ. মূসা আ.-কে লক্ষ্য করে বললেন, আল্লাহ তাআলার জ্ঞানের তুলনায় আমার ও আপনার জ্ঞানের পরিমাণ হচ্ছে সাগর থেকে নেওয়া চড়ুই পাখির একবিন্দু পানির মতো। তারা উভয়ে নৌকা থেকে অবতরণের পর সাগরের কূল ঘেঁষে চলতে লাগলেন। এরপর খিযির আ. এক বালককে দেখতে পেলেন। সে অন্যান্য বালকের সাথে খেলাধুলা করছিল। খিযির আ. কিশোরটির মাথা ধরে টেনে ছিঁড়ে ফেললেন। এভাবে তাকে তিনি হত্যা করলেন। মূসা আ. তখন তাঁকে বললেন, আপনি কি এক নিষ্পাপ জীবন নাশ করলেন, হত্যার অপরাধ ছাড়াই? আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন! তিনি বললেন, আমি কি বলি নি, আপনি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করতে পারবেন না?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এবারের প্রশ্নটি উত্থাপন ছিল পূর্বের বারের চেয়ে গুরুতর। তাই মূসা আ. বললেন : এরপর যদি আমি আপনাকে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি, তবে আপনি আমাকে সঙ্গে রাখবেন না। আমার ওযর-আপত্তির চূড়ান্ত হয়েছে। এরপর উভয়ে চলতে লাগলেন। চলতে চলতে তাঁরা এক জনপদের আধিবাসীদের নিকট পৌঁছে তাদের কাছে খাদ্য চাইলেন। কিন্তু তারা এঁদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। এরপর তারা তথায় এক পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখতে পেলেন, তখন খিযির আ. তা সুদৃঢ় করে দিলেন। তখন মূসা আ. বললেন, তারা এমন একটি সম্প্রদায় যাদের কাছে আমরা আগমন করলাম, তারা আমাদেরকে

না দিল খাদ্য, না করল মেহমানদারী, আপনি তো ইচ্ছে করলে এটার জন্যে পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন। খিযির আ. বললেন, এখানেই আপনার এবং আমার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হল। তবে যে বিষয়ে আপনি ধৈর্যধারণ করতে পারেন নি, আমি তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমাদের এটা পছন্দনীয় ছিল, মূসা আ. যদি ধৈর্যধারণ করতেন, তা হলে আল্লাহ তাআলা তাদের সম্বন্ধে আমাদেরকে আরও অনেক ঘটনা শুনাতেন।

বুখারী শরীফে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা রহ. এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। তবে এতে অতিরিক্ত রয়েছে, মূসা আ. সফরে বের হয়ে পড়লেন। তাঁর সাথে ছিলেন ইউশা ইবনে নূন এবং তাঁদের সাথে ছিল একটি মাছ। এরপর তাঁরা উভয়ে একটি পাথরের কাছে পৌঁছলেন এবং দুজনেই পাথরের নিকট অবতরণ করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, মূসা আ. পাথরের উপর তাঁর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। পাথরের উপর ছিল একটি প্রস্রবণ, যাকে আল্হীলাহ বলা হত। কোনো কিছুর মধ্যে ওই প্রস্রবণের পানি পড়লে উক্ত বস্তুটি জীবিত হয়ে যেত। ভুনা মাছটির উপরও উক্ত প্রস্রবণ থেকে পানি পড়েছিল। তাই মাছটি নড়ে উঠল। থলে থেকে বের হয়ে সমুদ্রে পড়ে গেল। এরপর যখন মূসা আ. জেগে উঠলেন, তখন খাদেমকে বললেন আমাদের নাশতা নিয়ে এসো। আমরা তো আমাদের এ সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি...।

সাঈদ রহ. ছাড়া অন্য মুফাসসিরগণের অভিমত হল, নৌকা ছিনতাইকারী বাদশার নাম ছিল হাদাদ ইবনে বাদাদ। আর নিহত কিশোরটির নাম ছিল জায়সূর।

বাদশার সামনে দিয়ে যখন কোনো খুঁত বিশিষ্ট নৌকা অতিক্রম করত, তখন সে এটাকে খুঁতের কারণে ছেড়ে দিত। এ স্থান অতিক্রম করার পর নৌকার মালিক এর খুঁত সারিয়ে নিয়ে নৌকাকে কাজে লাগাত। তাফসিরকারকদের কেউ কেউ বলেন, নৌকার ছিদ্রটি বন্ধ করা হয়েছিল কাঁচের দ্বারা। আবার কেউ কেউ বলেন, আলকাতরা দিয়ে। কিশোরটির পিতামাতা ছিলেন মুমিন বান্দা। কিন্তু কিশোরটি নিজে ছিল কাফের। তাই খিযির আ. আশঙ্কা করেছিলেন, তার প্রতি বাৎসল্যের কারণে পিতামাতা তার ধর্মের অনুসারী হয়ে পড়বেন। সাঈদ ইবনে জুবায়ের রহ.-এর ধারণা সন্তানটি ছিল বালক, মেয়ে নয়। দাউদ ইবনে আবু আসেম রহ. বহু সংখ্যক তাফসিরকারকদের থেকে বর্ণনা করেন, সন্তানটি ছিল বালিকা।

ইমাম বায়হাকী রহ. আবু আবদুল্লাহ মুলাতী রহ. থেকে বর্ণনা করেন : মূসা আ. যখন খিযির আ. থেকে বিদায় নিতে চাইলেন, তখন তিনি তাঁকে বললেন, 'আমাকে অসিয়ত করুন!' খিযির আ. বললেন, "মানুষের জন্য কল্যাণকারী হবেন, অকল্যাণকারী হবেন না, হাসিমুখে থাকবেন, ক্রুদ্ধ হবেন না। একগুঁয়েমি করবেন না, প্রয়োজন ব্যতিরেকে ভ্রমণ করবেন না।" অন্য এক সূত্রে অতিরিক্ত রয়েছে : 'অদ্ভুত কিছু না দেখলে হাসবেন না।'

ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ রহ. বলেন, খিযির আ. বলেছিলেন, "হে মূসা! দুনিয়া সম্বন্ধে মানুষের নিমগ্নতা অনুযায়ীই তাদেরকে দুনিয়ায় শাস্তি প্রদান করা হয়ে থাকে।" বিশর ইবনে হারিস আল হাফী রহ. বলেন : মূসা আ. খিযির আ.-কে বলেছিলেন, "আল্লাহ তাআলা আপনার জন্যে তাঁর আনুগত্যকে সহজ করে দিন!"

এ সম্পর্কে একটি মারফূ হাদিস ইবনে আসাকির রহ. থেকে যাকারিয়া ইবনে ইয়াহইয়া আল ওকাদ সূত্রে বর্ণিত রয়েছে। এ যাকারিয়া একজন চরম মিথ্যাবাদী, সে বলে... ওমর রাযি. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "আমার ভাই মূসা আ. বলেছিলেন, হে আমার প্রতিপালক! এ কথা বলে তিনি আল্লাহর বাণী স্মরণ করেন। এরপর তার কাছে খিযির আ. আসলেন। তিনি ছিলেন একজন যুবক। সুরভিত দেহী, ধবধবে সাদা কাপড় পরিহিত ও কাপড়কে টেনে ধরে রয়েছেন। তিনি মূসা আ.-কে বললেন, আপনার প্রতি আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক, হে মূসা ইবনে ইমরান! আপনার প্রতিপালক আপনার কাছে সালাম প্রেরণ করেছেন।" মূসা আ. বললেন, "তিনি নিজেই সালাম (শান্তি), তাঁর কাছেই সালাম, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি সারা জগতের প্রতিপালক, যাঁর যাবতীয় অনুগ্রহের হিসাব করা সম্ভব নয় এবং তাঁর সাহায্য ব্যতীত তাঁর যাবতীয় নিয়ামতের শোকরগুজারীও সম্ভব নয়।

এরপর মূসা আ. বললেন, আমি আপনার কাছে কিছু উপদেশ চাই যেন আল্লাহ তাআলা আপনার পরে আমাকে এগুলোর দ্বারা উপকৃত করেন। খিযির আ. বললেন, 'হে জ্ঞান অন্বেষী! জেনে রাখুন, বক্তা শ্রোতা থেকে কম ভর্ৎসনার পাত্র। তাই আপনি যখন কারো সঙ্গে কথা বলবেন, তাদেরকে বিরক্ত করবেন না। আরও জেনে রাখুন, আপনার অন্তরটি একটি পাত্রের মতো। তাই আপনাকে লক্ষ রাখতে হবে কি দিয়ে আপনি তা পরিপূর্ণ করছেন! দুনিয়া থেকে সামান্য গ্রহণ করুন, বাকিটা আপনার পিছনে ফেলে রাখুন। কেননা দুনিয়া আপনার জন্যে বসবাসের জায়গা নয়। এটি শান্তি পাবার জায়গাও নয়। দুনিয়াকে বান্দাদের জন্য স্বল্প পরিমাণ বলেই আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং পরকালের জন্য পাথেয় সংগ্রহের স্থান বলেই মনে করতে হবে। ধৈর্যধারণ করবেন, তা হলে পাপ থেকে বাঁচতে পারবেন। হে মূসা আ.! জ্ঞান অন্বেষণ করুন, যদি জ্ঞান লাভ করতে চান– কেননা জ্ঞান যে অন্বেষণ করে, সেই তা লাভ করতে পারে। জ্ঞান অন্বেষণের জন্যে অতিরিক্ত বকবক করবেন না। কারণ, তাতে আলেমগণ বিরক্ত হন এবং বোকামি প্রকাশ পায়। তবে আপনাকে মধ্যমপন্থী হতে হবে। কেননা এটা আল্লাহ প্রদত্ত তাওফীক ও সত্যপথ লাভের উপায়। মূর্খদের মূর্খতা থেকে বিরত থাকুন! বোকাদের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করুন। কেননা এটাই বুদ্ধিমানের কাজ। এতেই ওলামায়ে কেরামের সৌন্দর্য নিহিত। যদি কোনো মূর্খ লোক আপনাকে গাল দেয়, ধৈর্যধারণ করে চুপ থাকবেন ও সতর্কতার সাথে তাকে পরিহার করবেন। কেননা তার বোকামি আপনারই অধিক ক্ষতি করবে ও আপনাকে আরও অধিক তিরস্কৃত করবে।

"হে ইমরানের পুত্র! আপনি কি অনুভব করেন না, আপনাকে অতি অল্প জ্ঞানই দেওয়া হয়েছে। কোনো কিছুতে অযথাই জড়িয়ে পড়বেন না এবং বিপথগামী হবেন না। হে ইমরানের পুত্র! আপনি এমন কোনো বন্ধ দরজা খুলবেন না, যেটা কিসে বন্ধ করেছে তা আপনার জানা নেই। অনুরূপ এমন কোনো খোলা দরজা বন্ধ করবেন না, যা কিসে উন্মুক্ত করেছে তা আপনার জানা নেই। হে ইমরানের পুত্র! যে ব্যক্তির দুনিয়ার প্রতি লোভের শেষ নেই, দুনিয়ার প্রতি তার আকর্ষণের অন্ত নেই এবং যে ব্যক্তি নিজেকে হীন বোধ করে এবং তার ভাগ্যের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাকে দোষারোপ করে; সে কেমন করে সংসারাসক্তিমুক্ত হতে পারবে? প্রবৃত্তি যার ওপর প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে, তাকে কি কামনা-বাসনা থেকে বিরত রাখা যায় কিংবা মূর্খতা যাকে গ্রাস করে ফেলেছে, জ্ঞান অন্বেষণ কি তার কোনো উপকার সাধন করতে পারে? না, পারে না। কেননা তার অভীষ্ট আখিরাত হলেও সে তো শুধু দুনিয়ার প্রতিই আকৃষ্ট।"

"হে মূসা! যা শিখবেন তা কাজে পরিণত করার জন্য শিখবেন। কোনো কিছু শুধু গল্প করার জন্যই শিখবেন না। যদি এরূপ করেন, তা হলে এটা ধ্বংসের কারণ হবে আপনার জন্যে অথচ তা অন্যের জন্যে আলোকবর্তিকা হবে। হে মূসা ইবনে ইমরান! সংসার থেকে মোহমুক্তি ও তাকওয়াকে আপনার পোশাকরূপে গ্রহণ করুন। আর ইলম ও যিকিরকে নিজের বুলিতে পরিণত করুন! বেশি বেশি করে নেকআমল করবেন। কেননা অচিরেই আপনি মন্দ কাজের শিকার হতে পারেন। আল্লাহর ভয়ে নিজের অন্তরকে কম্পমান রাখুন। কেননা তা আপনার প্রতিপালককে সন্তুষ্ট করবে। সৎকাজ করুন। কেননা মন্দকাজ করা অবশ্যম্ভাবী। আমার এ সব নসিহত আপনার কাজে আসবে, যদি আপনি তা স্মরণ রাখেন।" বর্ণনাকারী বলেন, এরপর খিযির আ. চলে গেলেন এবং মূসা আ. দুঃখ-ভারাক্রান্ত মনে কান্নাকাটি করতে লাগলেন।

উপরিউক্ত বর্ণনাটি শুদ্ধ নয়। সম্ভবত এটা যাকারিয়া ইবনে ইয়াহইয়া আল ওক্কাদ আল মিসরীর মনগড়া বর্ণনা। একাধিক হাদিস বিশারদ তাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করেছেন। তবে বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, হাফেয ইবনে আসাকির রহ. তার ব্যাপারে নিশ্চুপ।

হাফেয আবু নুয়াঈম ইসফাহানী রহ. আবু উমামা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবিগণকে লক্ষ্য করে একদিন বললেন, 'আমি কি তোমাদের কাছে খিযির আ. সম্বন্ধে কিছু বলব? তাঁরা বললেন, জী হ্যাঁ! হে আল্লাহর রাসূল! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'একদিন খিযির আ. বনি ইসরাঈলের একটি বাজারে হাঁটছিলেন। এমন সময় একজন মুকাতাব (মুকাতাব হচ্ছে ওই দাস, যে তার মালিককে নির্দিষ্ট পরিমাণ মুক্তিপণ পরিশোধের শর্তসাপেক্ষে স্বাধীনতা লাভের প্রতিশ্রুতি পেয়েছে।) ক্রীতদাস তাঁকে দেখল এবং বলল, "আমাকে কিছু সাদকা দিন, আল্লাহ তাআলা আপনাকে বরকত দান করবেন।"

খিযির আ. বললেন, আমি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী একজন বান্দা আল্লাহ তাআলা যা ইচ্ছে করেন, তাই হয়ে যাক। আমার কাছে তোমাকে দান করার মতো কিছু নেই। মিসকিন ব্যক্তিটি বলল, আমি আল্লাহর নামে আপনার কাছে যাঞ্চা করছি, আমাকে কিছু সদকা দিন।

আমি আপনার চেহারায় আসমানী আলামত লক্ষ করেছি এবং আপনার কাছে বরকত কামনা করছি। খিযির আ. বললেন, আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান রেখে অর্থাৎ শপথ করে বলছি, 'আমার কাছে তোমাকে দেওয়ার মতো কিছুই নেই। তবে তুমি আমাকে নিয়ে বিক্রি করে দিতে পার।' মিসকিন লোকটি বলল, এটা ঠিক আছে তো? তিনি বললেন : হ্যাঁ, এটা আমি তোমাকে সত্যিই বলছি। তুমি আমার কাছে একটি বড় যাঞ্চা করেছ। তবে আমি আমার প্রতিপালকের সন্তুষ্টির জন্য তোমাকে নিরাশ করব না। তুমি আমাকে বিক্রি করে দাও।' বর্ণনাকারী বলেন, সে তাকে বাজারে উঠাল এবং চারশ' দিরহামের বিনিময়ে তাঁকে বিক্রি করে দিল। তিনি ক্রেতার কাছে বেশ কিছুদিন অবস্থান করলেন। কিন্তু ক্রেতা তাকে কোনো কাজে নিয়োজিত করলেন না। খিযির আ. ক্রেতাকে বললেন, আমার থেকে কিছু না কিছু উপকার পাওয়ার জন্য আপনি আমাকে ক্রয় করেছেন। তাই আপনি আমাকে কিছু করতে দিন! ক্রেতা বললেন, 'আপনাকে কষ্ট দিতে আমি পছন্দ করি না। কেননা আপনি একজন অতি বৃদ্ধ দুর্বল লোক।' খিযির আ. বললেন, 'আমার কোনো কষ্ট হবে না।' ক্রেতা বললেন, 'তা হলে আপনি এ পাথরগুলোকে সরিয়ে দিন।' প্রকৃতপক্ষে একদিনে ছয়জনের কম লোক এগুলোকে সরাতে পারত না। ক্রেতা লোকটি তার কোনো কাজে বের হয়ে পড়লেন। পরে ফিরে আসলেন। অথচ এক ঘণ্টার মধ্যে পাথরগুলো সরানোর কাজ সমাপ্ত হয়েছিল। ক্রেতা বললেন, 'বেশ করেছেন! চমৎকার করেছেন। আপনি যা পারবেন না বলে আমি ধারণা করেছিলাম, তা আপনি করতে সমর্থ হয়েছেন।'

এরপর লোকটির সফরের প্রয়োজন দেখা দিল। তিনি খিযির আ.-কে বললেন, আমি আপনাকে আমানতদার বলে মনে করি। তাই আপনি আমার পরিবারের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করুন! তিনি বললেন, 'তা হলে আমাকে কি করতে হবে বলে দিন!' ক্রেতা লোকটি বললেন, আমি আপনাকে কষ্ট দেওয়াটা পছন্দ করি না। তিনি বললেন, না আমার কোনো কষ্ট হবে না। তখন তিনি বললেন, 'আমি ফিরে আসা পর্যন্ত আপনি আমার ঘরের জন্য ইট তৈরি করবেন।' লোকটি তার ভ্রমণে বের হয়ে পড়ল ও কিছুদিন পর ফেরত আসল এবং তার প্রাসাদ তৈরি দেখতে পেল। তখন তিনি তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, আল্লাহর কসম দিয়ে আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, 'আপনি কে এবং আপনার ব্যাপারটি কী?' তিনি বললেন, আপনি আল্লাহর শপথ দিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন! আর আল্লাহর নামে যাঞ্চাই আমাকে দাসে পরিণত করেছে। আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি, আমি কে। আমিই খিযির। যার কথা আপনি শুনে আসছেন। আমার কাছে

একজন মিসকিন ব্যক্তি সাদকা চেয়েছিল। আমার কাছে তাকে দেওয়ার মতো কিছুই ছিল না। সে আল্লাহর নামে ও আল্লাহর সন্তুষ্টির দোহাই দিয়ে আমার কাছে পুনরায় কিছু চাইল। অগত্যা আমি নিজেকেই তার হাতে তুলে দিলাম। তখন সে আমাকে বিক্রি করে দেয়। আমি একটি তথ্য আপনার কাছে বলছি, 'আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির দোহাই দিয়ে যদি কেউ কারো কাছে কিছু যাঞ্ঝা করে আর সে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তা না দেয়, তা হলে সে কিয়ামতের দিন তার শরীরে মাংসবিহীন চামড়া নিয়ে দণ্ডায়মান হবে। চলার সময় মটমট শব্দকারী কোনো হাড়ও তার শরীরে থাকবে না।' ক্রেতা লোকটি বলল,

'হে আল্লাহর নবী! আমি আল্লাহ তাআলার প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং না চিনে আমি আপনাকে কষ্ট দিয়েছি।' তখন তিনি বললেন, 'তাতে কোনো কিছু আসে-যায় না বরং তুমি ভালোই করেছ ও নিজকে সংযত রেখেছ।' লোকটি বলল, 'হে আল্লাহর নবী! আপনার প্রতি আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক! আপনি আমার পরিবার ও সম্পদ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার নির্দেশিত হুকুম অনুযায়ী নির্দেশ করুন, যাতে আমি আপনাকে মুক্ত করে দিতে পারি।' তিনি বললেন, 'আমি চাই, তুমি আমাকে মুক্ত করে দাও। যাতে আমি আমার প্রতিপালকের ইবাদত করতে পারি।'

এরপর লোকটি খিযির আ.-কে মুক্ত করে দিলেন। তখন খিযির আ. বললেন : 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার যিনি আমাকে দাসত্বে নিপতিত করেছিলেন এবং পরে তা থেকে মুক্তি দিয়েছেন।' এ হাদিসটি মারফূ নয়; সম্ভবত এটা মওকূফ পর্যায়ের। বর্ণনাকারীদের মধ্যে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিও রয়েছেন। আল্লাহ তাআলাই সম্যধিক জ্ঞাত।

হাফেয ইবনে আসাকির রহ. সুদ্দী রহ. সূত্রে বর্ণনা করেন : খিযির ও ইলিয়াস আ. ছিলেন দুই সহোদর ভাই। তাঁদের পিতা একজন বাদশা ছিলেন। একদিন ইলিয়াস আ. তাঁর পিতাকে বললেন, আমার ভাই খিযির-এর রাজত্বের প্রতি কোনো আগ্রহ নেই, যদি আপনি তাকে বিয়ে দেন, তা হলে হয়তো তাঁর কোনো সন্তান জন্ম নিতে পারে, যে হবে রাজ্যের কর্ণধার।

এরপর তাঁর পিতা একটি সুন্দরী কুমারী যুবতীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিলেন। খিযির আ. তার স্ত্রীকে বললেন, "আমার কোনো মহিলার প্রয়োজন নেই। তুমি চাইলে আমি তোমাকে বন্ধনমুক্ত করে দিতে পারি। আর যদি চাও তা হলে তুমি আমার সঙ্গে থাকতেও পার। আল্লাহ তাআলার ইবাদত করবে ও আমার রহস্যাদি গোপন করবে।" মহিলা তাতে সম্মত হলেন। এভাবে তিনি তাঁর সাথে এক বছর অবস্থান করলেন। এক বছর পর বাদশা মহিলাটিকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, "তুমি যুবতী এবং আমার ছেলেও যুবক, তোমাদের সন্তান কোথায়?" মহিলা বললেন, "সন্তান তো আল্লাহর তরফ থেকে হয়ে থাকে। তিনি যদি চান সন্তান হয় আর না চাইলে হয় না।" তখন পিতার

নির্দেশে পুত্র মহিলাকে তালাক দিলেন। পিতা তাঁকে আবার অন্য একটি সন্তানবতী স্বামীহীনা মহিলার সাথে বিয়ে দিলেন। মহিলা বাসর ঘরে এলে খিযির আ. পূর্বের মহিলাকে যা বলেছিলেন, তাকেও তাই বললেন। তখন মহিলা তার সাথে থাকাকেই বেছে নিলেন। যখন এক বছর গত হল, বাদশা মহিলাকে সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। মহিলা উত্তরে বললেন, "আপনার ছেলে, মেয়েদের কোনো প্রয়োজনবোধ করেন না।" তাঁর পিতা তখন তাঁকে ডাকলেন, কিন্তু তিনি পলায়ন করলেন। তাঁকে ধরে আনার জন্য লোক পাঠানো হয়, কিন্তু তারা তাঁকে ধরে আনতে সমর্থ হল না।

কথিত আছে, তিনি দ্বিতীয় মহিলাটিকে হত্যা করেছিলেন। কেননা সে তার রহস্য ফাঁস করে দিয়েছিল। এ কারণেই তিনি তখন পলায়ন করেন আর এভাবে দ্বিতীয় মহিলাকে তিনি নিজ থেকে মুক্ত করলেন।

পূর্বের মহিলা শহরের কোনো একপাশে নির্জন জায়গায় থেকে আল্লাহ্ তাআলার ইবাদত করছিলেন। এমনি সময় একদিন এক লোক মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। মহিলা পুরুষটিকে বিসমিল্লাহ পড়তে শুনলেন। মহিলা পুরুষকে বললেন, "তোমার কাছে এ নামটি কেমন করে আসল?" তুমি কোথা থেকে এ নামটি শিখলে? তিনি বললেন, আমি খিযির আ.-এর একজন শিষ্য। তখন মহিলা তাঁকে বিয়ে করলেন এবং তাঁর ঔরসে সন্তান ধারণ করলেন। এরপর উক্ত মহিলাই ফেরাউনের কন্যার চুল বিন্যাসকারিণী রূপে নিযুক্ত হন। একদিন মহিলা ফেরাউনের কন্যার মাথার চুল আঁচড়াচ্ছিলেন। এমন সময় তাঁর হাত থেকে চিরুনিটি পড়ে যায়। চিরুনিটি উঠানোর সময় মহিলা বললেন, 'বিসমিল্লাহ' অর্থাৎ- আল্লাহর নামে উঠাচ্ছি। ফেরাউন কন্যা বলল

"আমার পিতার নামে বল।" মহিলা বললেন, "না, বরং এমন আল্লাহর নামে উঠবে। যিনি আমার, তোমার ও তোমার পিতার প্রতিপালক।" মেয়েটি তার পিতাকে এ ব্যাপারটি সম্পর্কে জানাল। ফেরাউনের তখন একটি গর্তে তামা ভর্তি করে তা উত্তপ্ত করতে নির্দেশ দিল। এরপর তার নির্দেশে গর্তের মধ্যে মহিলাটিকে নিক্ষেপ করা হল। মহিলা যখন তা দেখতে পেলেন, তখন তিনি যাতে এ গর্তে পড়ে না যান এজন্যে পিছিয়ে আসলেন। তখন তার একটি ছোট ছেলে -যে তার সঙ্গে ছিল- বলল, 'হে আম্মাজান! তুমি ধৈর্য ধর! কেননা তুমি সত্যের উপর রয়েছ।' তখন তিনি আগুনে ঝাঁপ দিলেন এবং প্রাণ ত্যাগ করলেন। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রতি রহমত নাযিল করুন!

হাফেয আবু বকর বায়হাকী আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণনা করেন। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনতেকাল করেন, তাঁর সাহাবীগণ তাঁ চারপাশে বসে গেলেন এবং কাঁদতে লাগলেন। তাঁরা সকলে একত্র হলেন। এমন সময় একজন আধাপাকা শ্মশ্রুধারী উজ্জ্বল স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করলেন এবং সকলকে ডিঙ্গিয়ে তাঁর নিকটবর্তী হলেন এবং কান্নাকাটি করলেন। অতঃপর সাহাবায়ে কেরামের প্রতি তাকালেন এবং বললেন : "প্রতিটি মুসিবত হতেই আল্লাহ তাআলার কাছে সান্ত্বনা

রয়েছে। প্রতিটি ক্ষতিরই ক্ষতিপূরণ রয়েছে এবং প্রতিটি নশ্বর বস্তুর স্থলবর্তী রয়েছে। সুতরাং আল্লাহর প্রতি সকলে প্রত্যাবর্তন করুন! তাঁরই দিকে মনোযোগী হন! তিনি আপনাদেরকে মুসিবতের মাধ্যমে পরীক্ষা করছেন। আপনারা ধৈর্যধারণ করুন! ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সে-ই, যার ক্ষতি পূরণ হওয়ার নয়। এ কথা বলে তিনি চলে গেলেন।" সাহাবীগণের একজন অন্যজনকে বলতে লাগলেন, তোমরা কি এ ব্যক্তিকে চেন? আবু বকর রাযি. ও আলি রাযি. বললেন : হ্যাঁ, এ হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জ্ঞাতি ভাই খিযির আ.।

উপরিউক্ত হাদিসটি আবু বকর ইবনে আবিদ দুনিয়াও বর্ণনা করেছেন। তবে হাদিসের সূত্রে উল্লিখিত ইবাদ ইবনে আবদুস সামাদ দুর্বল। কোনো কোনো সময় তাকে হাদিস শাস্ত্রে মুনকার বা প্রত্যাখ্যাত বলে গণ্য করা হয়। আনাস রাযি. হতে অন্য একটি বর্ণনা রয়েছে যার অধিকাংশই জাল বলে ইবনে হিব্বান ও উকায়লী রহ. মনে করেন। ইমাম বুখারী রহ. এটাকে মুনকারুল হাদীস বলেছেন। আবু হাতিম রহ. বলেন, এটা অত্যন্ত দুর্বল ও মুনকার হাদীস। ইবনে আদী রহ. বলেন, আলি রাযি.-এর ফযিলত সম্বন্ধে বর্ণিত হাদীসগুলোর অধিকাংশই দুর্বল ও শিয়াদের অতিরঞ্জিত বর্ণনা।

আবদুল্লাহ ইবনে ওহাব রহ. মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির রহ. থেকে বর্ণনা করেন– একদিন ওমর ইবনে খাত্তাব রাযি. একটি জানাযার নামায আদায় করছিলেন। এমন সময় তিনি একজন অদৃশ্য ব্যক্তির আওয়ায শুনলেন, "আপনার প্রতি আল্লাহ তাআলা রহমত করুন। আমাদেরকে ছেড়ে জানাযা পড়বেন না।" ওমর রাযি. তাঁর জন্য অপেক্ষা করলেন। তিনি নামাযে যোগদান করলেন এবং মৃত ব্যক্তির জন্য এরূপ দুআ করলেন–

"হে আল্লাহ! আপনি যদি তাকে শাস্তি দেন, তা হলে অনেক ক্ষেত্রেই সে আপনার অবাধ্যতা করেছে। আর আপনি যদি তাকে মাফ করে দেন, তা হলে সে তো আপনার রহমতেরই মুখাপেক্ষী।" মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর ওই ব্যক্তি বললেন :

طُوْبٰى لَكَ يَا صَاحِبَ الْقَبْرِ اِنْ لَمْ تَكُنْ عَرِيْفًا اَوْ جَابِيًا اَوْ خَازِنًا اَوْ كَاتِبًا اَوْ شُرْطِيًّا

"হে কবরের বাসিন্দা! তোমার জন্য সুসংবাদ, যদি না তুমি তত্ত্বাবধায়ক, কর উসুলকারী, খাজাঞ্চী, কোষাধ্যক্ষ কিংবা কোতয়াল হয়ে থাক।"

তখন ওমর রাযি. বলেন, চল! আমরা তাঁকে তাঁর দুআ ও তাঁর উক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি, তিনি কে? বর্ণনাকারী বলেন, এমন সময় তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তাঁরা লক্ষ করে দেখলেন, তাঁর পায়ের চিহ্ন এক হাত দীর্ঘ। তখন ওমর রাযি. বলেন, আল্লাহর শপথ! ওনিই খিযির আ.। যাঁর সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে অবহিত করেছিলেন।

এ বর্ণনার একজন রাবী অজ্ঞাত পরিচয়। তাছাড়া বর্ণনার সূত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষা পায় নি। এরূপ বর্ণনা শুদ্ধ বলে বিবেচিত হয় না।

হাফিয ইবনে আসাকির রহ. আলি রাযি. থেকে বর্ণনা করেন : একদিন রাতের বেলায় আমি তাওয়াফ করছিলাম। হঠাৎ এক লোককে দেখলাম, কাবা শরীফের গিলাফ ধরে আছে। তখন তিনি বলছিলেন :

يَا مَنْ لَا يَمْنَعُهُ سَمْعٌ مَنْ سَمِعَ وَيَا مَنْ لَا تُغْلِطُهُ الْمَسَائِلُ وَيَا مَنْ لَا يُبْرِمُهُ اِلْحَاحُ الْمُلِحِّيْنَ وَلَا مَسْأَلَةُ السَّائِلِيْنَ اُرْزُقْنِيْ بَرْدَ عَفْوِكَ وَحَلَاوَةَ رَحْمَتِكَ۔

অর্থাৎ হে মহান সত্তা! যার বাণী শুনতে কেউ বিরক্ত বোধ করে না, আবেদন যাঁকে বিব্রত করে না, বারবার কাকুতি মিনতিকারীর মিনতিতে এবং সাহায্যপ্রার্থীদের প্রার্থনায় যিনি বিরক্ত হন না। আপনার ক্ষমার শীতলতা দিয়ে আমার প্রাণ জুড়ান! এবং আপনার রহমতের স্বাদ আস্বাদন করান!

আলি রাযি. বলেন, আমি বললাম, 'আপনি যা বলছিলেন তা আমার জন্য পুনরায় বলুন।' তিনি বললেন, 'আমি যা বলেছি তুমি কি তা শুনে ফেলেছ?' বললাম, শুনেছি। তখন তিনি আবার বললেন, ওই সত্তার শপথ, যার হাতে খিযিরের প্রাণ ন্যস্ত। আলি রাযি. বলেন, "ওনিই হচ্ছেন খিযির আ.।" যে ব্যক্তি দুআটি প্রতি ফরয নামাযের পর পড়বে, তার গুনাহরাশি আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দেবেন। যদিও তার গুনাহরাশি সাগরের ফেনা, গাছের পাতা ও তারকার সংখ্যার মতো হয় তবুও আল্লাহ তাআলা তা মাফ করে দিবেন।

এ হাদিসটি দুর্বল পর্যায়ের। কেননা এর একজন বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনে মুহরিযের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। আবার অন্য একজন বর্ণনাকারী ইয়াযিদ ইবনে আসাম, আলি রাযি.-এর সাক্ষাৎ পান নি। এ ধরনের বর্ণনা শুদ্ধ বলে বিবেচিত হয় না। আল্লাহই সম্যক জ্ঞাত।

আবদুর রাযযাক রহ. আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন দাজ্জাল সম্পর্কে একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, দাজ্জাল আবির্ভূত হবে, কিন্তু মদীনার রাস্তায় প্রবেশ করা তার জন্যে নিষিদ্ধ। রাস্তার মাথায় আসলে মদীনার একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তার দিকে অগ্রসর হয়ে বলবেন– আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি দাজ্জাল, যার সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলে গিয়েছেন। দাজ্জাল বলবে– তোমরা কি বল? যদি আমি এ লোকটিকে হত্যা করি ও পরে জীবিত করি, তোমরা কি আমার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে? তারা বলবে, না। দাজ্জাল লোকটিকে হত্যা করবে, পুনরায় জীবিত করবে। যখন ঐ ব্যক্তি জীবিত হবেন, তখন তিনি বলবেন, আল্লাহ তাআলার শপথ! তোমার সম্বন্ধে এখন আমার অন্তর্দৃষ্টি তীক্ষ্ণতর হল। বর্ণনাকারী বলেন, দাজ্জাল দ্বিতীয়বার তাকে হত্যা করতে উদ্যত হবে, কিন্তু সে তা করতে পারবে না। বর্ণনাকারী মামার রহ. বলেন, 'আমার কাছে এরূপ বর্ণনাও পৌছেছে যে, ঐ মুমিন বান্দার গলা

তামায় পরিণত করা হবে।' আবার এরূপ বর্ণনাও পৌঁছেছে, যে ব্যক্তিকে দাজ্জাল একবার হত্যা করবে এবং পুনরায় জীবিত করবে–তিনি হচ্ছেন খিযির আ.।

উপর্যুক্ত হাদীসটি বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে রয়েছে। কোনো কোনো হাদীসের মূল পাঠ এরূপ রয়েছে– অর্থাৎ দাজ্জাল একজন ভরা যৌবনের অধিকারী যুবককে নিয়ে আসবে এবং তাকে হত্যা করবে। শায়খ আবুল ফারায ইবনুল জাওযী রহ. তাঁর কিতাবে عجالة المنتظر এ সম্পর্কে মারফূরূপে বর্ণিত হাদীসগুলোকে জাল বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর সাহাবা, তাবিঈন ও তাবে-তাবিঈন থেকে যে সব বর্ণনা এসেছে এগুলোর সূত্রসমূহ দুর্বল এবং বর্ণনাকারীদের পরিচয়বিহীন বলে তিনি আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর এ সমালোচনা চমৎকার।

খিযির আ. ইনতেকাল করেছেন বলে যাঁরা অভিমত পেশ করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন, ইমাম বুখারী রহ., ইবরাহীম আল হারবী রহ., আবুল হুসায়ন ইবনুল মুনাদী রহ., ইবনুল জাওযী রহ.। ইবনুল জাওযী এ ব্যাপারে অধিকতর ভূমিকা নিয়েছেন। এ সম্পর্কে তিনি عجالة المنتظر في شرح حالة الخضر একটি কিতাব লিখেছেন। এতে বিভিন্ন প্রকারের দলীল রয়েছে। সে দলীলসমূহের একটি হল আল্লাহর বাণী :

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ

অর্থাৎ–আমি তোমার পূর্বেও কোনো মানুষকে অনন্ত জীবন দান করি নি।

(সূরা আম্বিয়া : ৩৪)

সুতরাং খিযির আ. মানুষ হয়ে থাকলে তিনিও অবশ্যই এই সাধারণ নিয়মের অন্তর্ভুক্ত হবেন। আর বিশুদ্ধ দলীল ব্যতীত তাঁকে ব্যতিক্রম বলে গণ্য করা যাবে। সাধারণ নিয়ম হচ্ছে ব্যতিক্রম না থাকা– যতক্ষণ না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তার সপক্ষে কোনো দলীল পাওয়া যায়। খিযির আ.-এর ক্ষেত্রে এরূপ কোনো ব্যতিক্রমের প্রমাণ পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয় দলীল হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার বাণী :

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ

"স্মরণ কর, যখন আল্লাহ নবীদের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, 'তোমাদেরকে কিতাব ও হেকমত যা কিছু দিয়েছি তারপর তোমাদের কাছে যা রয়েছে তার সমর্থক রূপে যখন একজন রাসূল আসবে, তখন তোমরা অবশ্যই তার প্রতি ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে।' তিনি বললেন, 'তোমরা কি স্বীকার করলে? এবং এ সম্পর্কে আমার অঙ্গীকার কি তোমরা গ্রহণ করলে?' তারা বলল, আমরা স্বীকার করলাম।' তিনি বললেন, 'তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সঙ্গে সাক্ষী রইলাম।"

(সূরা আলে ইমরান : ৮১)

ইবনে আব্বাস রাযি. এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রেরিত প্রত্যেক নবী থেকে এ মর্মে অঙ্গীকার নিয়েছেন, যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর আমলে পাঠানো হয় এবং তিনি জীবিত থাকেন, তা হলে তিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবেন ও তাঁকে সর্বতোভাবে সাহায্য সহায়তা করবেন। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক নবীকে হুকুম দিয়েছিলেন তিনি যেন তার উম্মত থেকে এ মর্মে অঙ্গীকার নেন, যদি তাদের জীবিত অবস্থায় তাদের কাছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করা হয় তা হলে তারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে ও তাঁকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবে।

সহি বুখারী ও মুসলিম শরীফে এবং অন্যান্য কিতাবেও আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত রয়েছে, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার নামায আদায় করলেন এবং সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে বললেন, আজকের রাতে তোমরা কি একটা কথা চিন্তা করেছ, আজকের দিনে যারা পৃথিবীতে জীবিত রয়েছে, একশ বছর পর তাদের কেউই পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকবে না। বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. বলেন, একথা শুনে লোকজন ভীত হয়ে পড়লেন। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর যুগের সমাপ্তির কথাই বুঝাচ্ছিলেন। ইমাম আহমদ রহ.-ও সামান্য শাব্দিক পার্থক্যসহ অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ রহ. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ইনতেকালের একমাস কিংবা কিছুদিন পূর্বে বলেছেন : তোমাদের মধ্যে যারা এখন জীবিত, একশ বছরের মাথায় তাদের কেউই জীবিত থাকবে না।

অন্য এক সূত্রে ইমাম আহমদ রহ. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনতেকালের একমাস পূর্বে বলেন, তারা আমাকে কিয়ামত সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছে, অথচ এ সম্বন্ধে শুধু আল্লাহ তাআলাই জানেন। আল্লাহর শপথ, আজকাল পৃথিবীতে যারা রয়েছে তাদের কেউই একশ বছর অতিক্রম করবে না। ইমাম মুসলিম রহ.ও তিরমিযী রহ. অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইবনুল জাওযী রহ. বলেন, উপরোক্ত বিশুদ্ধ হাদীসগুলো খিযির আ.-এর বেঁচে থাকার দাবিকে নাকচ করে দেয়। অন্যান্য ওলামা বলেন, খিযির আ. যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগ না পেয়ে থাকেন, যেমন দৃঢ় দলীল দ্বারা বোঝা যায়– তাতে কোনো সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে না। আর যদি তিনি তাঁর যুগ পেয়ে থাকেন তা হলে এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, তিনি একশ' বছর পর আর জীবিত ছিলেন না। সুতরাং এখন আর তিনি বেঁচে নেই। কেননা তাঁর ক্ষেত্রেও সাধারণ নীতি প্রযোজ্য। যতক্ষন না, ব্যতিক্রমের অকাট্য দলীল পাওয়া যায়। আল্লাহ তাআলাই সম্যক জ্ঞাত।

হাফিজ আবুল কাসেম সুহায়লী তাঁর কিতাব التعريف والاعلام এ ইমাম বুখারী রহ. আবু বকর ইবনুল আরাবী রহ. থেকে বর্ণনা করেন, হযরত খিজির আ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগ পেয়েছেন। কিন্তু এরপর তিনি উপরোক্ত হাদীসের মর্ম অনুসারে ইনতেকাল করেছেন। খিযির আ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন বলে ইমাম বুখারী যে মন্তব্য করেছেন, এ তথ্যটিতে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। সুহায়লী রহ. খিযির আ.-এর ঐ পর্যন্ত বেঁচে থাকার বিষয়ে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং এটাই অধিকাংশের মত বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি আরো বলেন, তাঁর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতেকালের পর নবী পরিবারের প্রতি তাঁর সমবেদনা জ্ঞাপনের বিষয়টি বিশুদ্ধ হাদীসসমূহে বর্ণিত রয়েছে। এরপর তিনি আমাদের পূর্বে বর্ণিত দুর্বল হাদিসগুলো উপস্থাপন করেন। কিন্তু এগুলোর সূত্র উল্লেখ করেন নি। আল্লাহ তাআলাই জানেন।

হযরত ইউশা ইবনে নূন আ.

হযরত মূসা আ.-এর প্রতিনিধিত্ব

হযরত মূসা আ.-এর জীবনীতে হযরত হারূন আ.-এর পরেই তাওরাতে ইউশা আ.-এর উল্লেখ অধিক পরিমাণে এসেছে। তিনি হযরত মূসা আ.-এর জীবৎকালে তাঁর খাদেম ছিলেন। হযরত হারূন ও হযরত মূসা-এর ইনতেকালের পরে তাঁদের খলিফা এবং নবুয়তের স্থলবর্তী হলেন। কেনানে অত্যাচারী মুশরিক (অংশীবাদী) কওমগুলির অবস্থাবলী জানার জন্য যেই প্রতিনিধিদল গমন করেছিল, তন্মধ্যে তিনিও একজন ছিলেন। হযরত মূসা আ. যখন বনি ইসরাঈলকে সেই কওমগুলোর সঙ্গে জিহাদের আহবান ও উৎসাহ প্রদান করলেন, কিন্তু তারা অস্বীকার করল, তখন ওনিই প্রথম ব্যক্তি ছিলেন যিনি বনি ইসরাঈলকে হিম্মত ও সাহস প্রদানের চেষ্টা করেছিলেন এবং আল্লাহ তাআলার সাহায্যের ওয়াদা স্মরণ করে দিয়ে জিহাদের প্রতি অনুপ্রাণিত করে বলেছিলেন, (যদি তোমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও, তবে তোমাদের বিজয় সুনিশ্চিত।"

তাওরাতে আরো উল্লেখ আছে, হযরত মূসা আ.-এর জীবৎকালেই আল্লাহ তাআলা তাঁকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, 'ইউশা' আমার বিশিষ্ট বান্দা। বনি ইসরাঈল বংশের যুবকেরা তারই নেতৃত্বে কেনান ভূমি ও বাইতুল মুকাদ্দাসকে অত্যাচারী (যালিম) মুশরিকগণ হতে পবিত্র করবে।

"আল্লাহ তাআলা মূসা আ.-কে বললেন, নূনের পুত্র ইউশাকে নিয়ে তাঁর উপর নিজের হাত (অধিকার) রাখ। কেননা এ ব্যক্তির মধ্যে প্রাণ আছে। আর তাকে জ্যোতিষী ইয়াযার এবং সমগ্র দলের সম্মুখে দাঁড় করিয়ে তাদের চোখের সম্মুখে ইউশাকে অসিয়ত কর এবং তোমার নিজের ও প্রতিপত্তির অংশ তাকে দান কর, যেন বনি ইসরাঈলদের পূর্ণ দলটি তাঁর আদেশানুবর্তী থাকে। আর নূনের পুত্র ইউশা জ্ঞানে পরিপূর্ণ ছিল। কেননা মূসা আ. তার ওপর আপন হাত রাখতেন। বনি ইসরাঈল তাঁর অনুসরণ করতে থাকল।

মোটকথা, হযরত মূসা আ.-এর পরে তাঁরই নেতৃত্বে চল্লিশ বছর পরে বনি ইসরাঈল পবিত্র ভূমিতে (বায়তুল মুকাদ্দাসে) আগমন করল। তারা কেনান, শাম ও পূর্ব-জর্দান হতে সমস্ত অত্যাচারী ও যালিম শক্তিগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলল।

কুরআনে হযরত ইউশা আ.-এর আলোচনা

কুরআন মাজিদে হযরত ইউশা আ.-এর নাম উল্লেখ করা হয় নি। অবশ্য সূরা কাহাফের দুই জায়গায় হযরত মূসা আ.-এর সফর সাথী এক যুবকের আলোচনা করা হয়েছে, যখন তিনি হযরত খিযির আ.-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন। যেমন ইরশাদ হচ্ছে :

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا (٦٠) فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ

بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا (٦١) فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ

হযরত উবাই ইবনে কাব রাযি. হতে রেওয়ায়েত কৃত একটি সহিহ্ হাদিসে সেই যুবক সাথীর নাম ইউশা বলা হয়েছে। এরূপে যেন তাঁর আলোচনাও কুরআন মাজিদে বিদ্যমান রয়েছে। সমস্ত কিতাবী সম্প্রদায়গুলি তাঁর নবী হওয়া সম্বন্ধে একমত। প্রাচীনকালের তাওরাতে ইয়াশু আ.-এর ওপর স্বতন্ত্র সহিফা নাযিল হয়েছিল বলে উল্লেখ রয়েছে।

বংশ পরিচয়

হযরত ইউশা আ. বনি ইসরাঈলদের বারো গোত্রের মধ্যে হযরত ইউসুফ আ.-এর গোত্রের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন। ঐতিহাসিকগণ তাঁর বংশ-পরম্পরা বর্ণনা করেছেন : ইউশা ইবনে নূন ইবনে ফারাহীম ইবনে ইউসুফ আ. ইবনে ইয়াকুব আ. ইবনে ইসহাক আ. ইবনে ইবরাহীম আ.। কিতাবীরা বলেন, ইউশা হলেন হুদ আ.-এর চাচাতো ভাই।

আল্লাহ্ তাআলা কুরআন শরীফে খিযির আ.-এর ঘটনা প্রসঙ্গে ইউশা আ.-এর নাম উল্লেখ না করে তাঁর বর্ণনা দিয়েছেন। আল্লাহ্ তাআলা বলেন : 'স্মরণ কর, যখন মূসা তার খাদেমকে বলেছিল। বুখারী শরীফেও উবাই ইবনে কাব রাযি. থেকে নাম ধরে তাঁর বর্ণনা এসেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তিনি হলেন ইউশা ইবনে নূন আ.।

আল্লাহর পাকের মহিমার একটি বিচিত্র প্রদর্শনী! হযরত ইউসুফ আ.-এর বদৌলতে কেনানের ৭০ জন লোকের একটি খান্দান মান-মর্যাদা ও প্রতাপের সাথে কেনান থেকে হিজরত করে মিসরে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। আজ তারই প্রপৌত্র ইউশা আ.-এর নেতৃত্বে সেই খান্দানই সংখ্যায় লাখ লাখ জনে পরিণত হয়ে পুনরায় নিজেদের পূর্বপুরুষদের জন্মভূমি কেনানে সেই মান-মর্যাদা এবং প্রতাপ ও প্রতিপত্তির সাথে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। এর বিস্তারিত বিবরণ হচ্ছে :

চল্লিশ বছর গত হওয়ার পর আল্লাহ তাআলা হযরত ইউশা আ.-কে আদেশ করলেন, তুমি বনি ইসরাঈলদের এই দলটিকে নিয়ে প্রতিশ্রুত ভূমির দিকে অগ্রসর হও এবং তথায় আমালেকা ও অন্যান্য অত্যাচারী সম্প্রদায়গুলির সাথে যুদ্ধ করে তাদেরকে পরাজিত কর, আমার সাহায্য তোমাদের সঙ্গে রয়েছে।

তাওরাতে উল্লেখ আছে : "আল্লাহ তাআলার বিশিষ্ট বান্দা হযরত মূসা আ.-এর ওফাত প্রাপ্তির পরে তাঁর খাদেম ইউশা ইবনে নূনকে আল্লাহ তাআলা বললেন, আমার বান্দা মূসার মৃত্যু হয়েছে। এখন তুমি উঠ এবং তোমাদের সমস্ত লোকদেরকে সঙ্গে নিয়ে সেই জর্দান নদীর তীরবর্তী সেই দেশে যাও, যা আমি তাদেরকে অর্থাৎ বনি ইসরাঈলদেরকে দান করেছি। যেই যেই স্থান তোমাদের পদতলে পতিত হবে, সেই স্থানগুলি আমি তোমাদেরকে দান করলাম, যেমন আমি মূসাকেও একথা বলেছিলাম। মরুপ্রান্তর বা অরণ্যভূমি এবং লেবানন হতে আরম্ভ করে বড় ফোরাত নদী পর্যন্ত হিত্তীদের সমগ্র দেশ এবং পশ্চিমদিকে বড় সমুদ্র পর্যন্ত তোমাদের সীমা হবে। তোমার

জীবিতকাল পর্যন্ত তোমার সম্মুখে কেউই দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। আমি মূসার সঙ্গে যেরূপ ছিলাম, তোমার সঙ্গেও তদ্রূপ থাকব। আমি তোমার থেকে হাতও উঠাব না এবং তোমাকে ত্যাগও করব না।"

নবুয়ত লাভ ও বনি ইসরাঈলের দায়িত্ব গ্রহণ

হযরত ইউশা ইবনে নূন আ.-এর নবুয়ত প্রাপ্তির বিষয়ে আহলে কিতাবরা একমত। তাদের একটি দল যারা সামিরাহ বলে বিখ্যাত, তারা মূসা আ.-এর পর ইউশা ইবনে নূন আ. ব্যতীত কারো নবুয়ত স্বীকার করে না। তাওরাতে ইউশা আ.-এর নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই তারা ইউশা আ. ব্যতীত অন্যের নবুয়তকে অস্বীকার করে। অথচ অন্যদের নবুয়ত প্রতিপালকের তরফ থেকে সত্য ও যথার্থ। তাদের উপর কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার লানত বর্ষিত হতে থাকবে।

পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ

হযরত ইউশা আ. বনি ইসরাঈলকে আল্লাহ তাআলার পয়গাম শুনিয়ে দিলেন। তারা সকলে সানা প্রান্তর থেকে বের হয়ে কেনান ভূমির সর্বপ্রথম শহর ইয়ারীহু বা আরীহার দিকে অগ্রসর হয়ে শত্রুপক্ষকে যুদ্ধে আহবান করল। শত্রুরাও বের হয়ে ভীষণভাবে মোকাবিলা করল, পরিশেষে পরাজিত হয়ে সেখানেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। আর বনি ইসরাঈলগণ যুদ্ধ করতে করতে সমগ্র পবিত্র ভূমি অধিকার করে নিল। আর অত্যাচারী মুশরিকদের হতে উক্ত ভূমিকে পবিত্র করে পুনরায় নিজেদের পূর্বপুরুষদের জন্মভূমির মালিক হয়ে গেল।

তাওরাতে বর্ণিত আছে : যখন বনি ইসরাঈলরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল, তখন আল্লাহ তাআলার আদেশে প্রতিশ্রুত 'তাবুতে সাকীনা' নামক সিন্দুকটি অদৃশ্য জগৎ হতে আবির্ভূত হয়ে তাদের সঙ্গী হল। তাতে ছিল মূসা আ.-এর লাঠি, হারূন আ.-এর পিরহান, 'মান্না'র পাত্র। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য মুবারক দ্রব্যাদিও ছিল। কেননা আল্লাহ পাক তাদেরকে আদেশ করেছিলেন, তোমরা মান্নাকে সুরক্ষিত করে রাখ, যেন তোমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ স্বচক্ষে দর্শন করতে পারে, তোমাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার নেয়ামত এসেছিল।

আল্লামা ইবনে আসীর রহ. বলেন, হযরত মূসা আ. জীবিতকালেই পবিত্র ভূমিতে অত্যাচারী মুশরিক কওমগুলির সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য হযরত ইউশা আ.-কে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন এবং বনি ইসরাঈলদেরকে গোত্রে গোত্রে বিভক্ত করে প্রত্যেক গোত্রের সেনাপতির নাম ঘোষণা করে দিয়েছিলেন। সুতরাং হযরত ইউশা আ.-এর এ ব্যাপারটি হুবহু হযরত উসামা রাযি.-এর ব্যাপারে অনুরূপ ছিল। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও জীবিতকালেই শামদেশ অধিকার করার জন্য হযরত উসামা রাযি.-কে প্রধান সেনাপতি মনোনীত করেছিলেন এবং আপন পবিত্র হস্তে তাঁর জন্য পতাকা নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেনাবাহিনী যাত্রা করবার পূর্বেই

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতেকাল হয়ে গেল। এরপর হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযি.-এর খেলাফতকালে সর্বপ্রথম কর্তব্য হিসাবে উসামা বাহিনীকে শামের দিকে রওনা করে দেওয়া হল। পরিশেষে এ অভিযানই রোম, ইরাক এবং ইরানের সমস্ত বিজয়ের সূচনা বলে প্রমাণিত হল।

অনুরূপভাবে হযরত মূসা আ. পবিত্র ভূমিতে অত্যাচারী শক্তিগুলির মূলোৎপাটনের জন্য আল্লাহ পাকের নির্দেশে হযরত ইউশা আ.-কে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন এবং যুদ্ধের প্রাথমিক কার্যসমূহকে নিজেই সম্পন্ন করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেনাবাহিনী যাত্রা করার পূর্বেই হযরত মূসা আ.-এর ওফাত হয়ে গেল। আর এখন আল্লাহ তাআলা হযরত ইউশা আ.-কে নবুয়তের সম্মানেও ভূষিত করলেন এবং তাঁরই হাতে অবশেষে পবিত্র ভূমি অত্যাচারী মুশরিক শক্তিগুলি হতে পবিত্র হয়ে গেল। আরীহার সাফল্য সমগ্র পবিত্র ভূমির বিজিত ও অধিকৃত হওয়ার সূচনা বলে সাব্যস্ত হল।

হযরত ইউশা আ. সর্বপ্রথম কোন শহরটি অধিকার করেছেন, কুরআন মাজিদ এর নাম উল্লেখ করে নি। বরং 'জনপদ' বলে অস্পষ্ট রেখে দিয়েছে। কেননা এ স্থলে এ ঘটনাটি বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য। এর সাথে জনপদের নির্দিষ্টতার কোনো সম্পর্ক নেই।

হাফেয ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর বলেন : প্রবল মত হল, এটা বাইতুল মুকাদ্দাসে (জেরুজালেম)। 'আরীহা' বলা ঠিক নয়। কারণ, তা বনি ইসরাঈলদের এ পথে পড়ে না। আর আল্লাহ পাক বনি ইসরাঈলদের সঙ্গে এর প্রতিশ্রুতিও দেন নি বরং প্রতিশ্রুতি ছিল বাইতুল মুকাদ্দাসের।

আমাদের মতে তাঁর উক্তিটি তো ঠিক, জনপদ-এর উদ্দেশ্য বাইতুল মুকাদ্দাস, কিন্তু তিনি এ প্রসঙ্গে যে সমস্ত দলিল পেশ করেছেন তা ঠিক নয়। কারণ, এটা একটি অনস্বীকার্য সত্য কথা, যদি বনি ইসরাঈলগণ সীনা প্রান্তর হতে সোজাসুজি বাইতুল মুকাদ্দাসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করত, তথাপি স্থলপথে কেনান ভূমিই সর্বপ্রথম তাদের সম্মুখে পড়ত। আর এর সর্বপ্রথম শহর ছিল 'আরীহা'। মানচিত্র সামনে রাখুন এবং দেখুন, একালে কেউ স্থলপথে সীনা প্রান্তর অতিক্রম করে জেরুজালেম যেতে চাইলে তাকে কেনান ভূমি হয়েই যেতে হবে। এতদ্ভিন্ন বনি ইসরাঈলদের সাথে আল্লাহ তাআলার ওয়াদা ছিল, তিনি তাদেরকে তাদের পূর্বপুরুষদের দেশে ফিরিয়ে নিবেন। বলাবাহুল্য তাদের পূর্বপুরুষদের ভূমি শুধু বাইতুল মুকাদ্দাসই নয় বরং কেনান ভূমিও। যেখান হতে হিজরত করে হযরত ইউসুফ ও ইয়াকুব আ.-এর যমানায় বনি ইসরাঈলরা মিসরে এসে বসত স্থাপন করেছিল। অবশ্য 'জনপদ' শব্দের উদ্দেশ্য বাইতুল মুকাদ্দাস এ জন্য সঠিক হতে পারে, আল্লাহ তাআলার আদেশে হযরত ইউশা আ. ও বনি ইসরাঈলরা সর্বপ্রথম আরীহাতে আমালেকা সম্প্রদায়কে পরাজিত করেছেন। এরপর কেনান ভূমি জয় করতে করতে ফিলিস্তিন ভূমিতে গিয়ে পৌঁছলেন এবং বাইতুল মুকাদ্দাসও জয় করলেন। আর যেহেতু এ স্থানটি তাদের সমস্ত বিজয়ের একক কেন্দ্র ও

লক্ষ্যস্থল ছিল, তাই আল্লাহ তাআলা এ বিরাট সাফল্যের উপর সেই আদেশ প্রদান করলেন, যার উল্লেখ কুরআন মাজিদে রয়েছে।

বনি ইসরাঈলদের না-শোকরি

কুরআন মাজিদে উল্লেখ আছে, যখন আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাঈলকে সফলকাম করে দিলেন এবং শহরে তাদের বিজয়সূচক প্রবেশ হতে লাগল, তখন তিনি আদেশ করলেন, গর্বিত এবং অহংকৃত লোকদের মতো প্রবেশ করো না। বরং আল্লাহর শোকরগুযার বান্দাদের মতো আল্লাহ পাকের দরবারে বিনয়ের সাথে অবনমিত হয়ে এবং তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে করতে প্রবেশ করো! যাতে আল্লাহ পাকের শোকরগুযার বান্দা আর অহংকারী ও অবাধ্য লোকের মধ্যে পার্থক্য থাকে। কিন্তু বিজয় লাভের পর বনি ইসরাঈলদের জাতিগত স্বভাব মাথা-চাড়া দিয়ে উঠল এবং আল্লাহ পাকের আদেশের বিরোধিতা করে অহংকারী ও অবাধ্য মানুষের মতো শহরে প্রবেশ করল। তারা সদর্পে পদক্ষেপ করতে করতে মাথা উঁচু করে বুক ফুলিয়ে চলছিল। আর ক্ষমা প্রার্থনা ও বিনয়ের পরিবর্তে ধৃষ্টতামূলক শব্দ উচ্চারণ করতে করতে যেন আল্লাহ পাকের আদেশের সাথে বিদ্রুপ প্রকাশ করতে করতে প্রবেশ করছিল। অবশেষে আল্লাহ তাআলার ক্রোধ উথলে উঠল এবং আল্লাহ তাআলার কর্মফল নীতি আযাবের আকারে এসে তাদেরকে পাকড়াও করল। যেমন এ সম্পর্কে সূরা বাকারায় ইরশাদ হচ্ছে :

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (٥٨) فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

"আর যখন আমি বললাম, এ জনপদে প্রবেশ কর এবং নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী যা ইচ্ছা খাও। আর শহরের প্রধান ফটক দিয়ে বিনয়ের সাথে অবনমিত হয়ে প্রবেশ করো। সেই সঙ্গে বলতে থাকো, হে আল্লাহ! আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দিন! তা হলে আমি তোমাদের অপরাধসমূহ মার্জনা করে দিব। এরপর অচিরেই আমি নেককারদেরকে আরও অধিক দান করব। অনন্তর সেই জালিমরা, ওই বাক্যটিকে, যা তাদেরকে উচ্চারণ করতে বলা হয়েছিল, অন্য একটি (মনগড়া) উক্তিতে পরিবর্তিত করে দিয়েছিল। কাজেই আমি সেই জালিমদের উপর তাদের নাফরমানীর কারণে আসমান হতে কঠিন আযাব প্রেরণ করলাম।"

সূরা আরাফে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (١٦١) فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ

"আর যখন তাদেরকে বলা হল, তোমরা এ জনপদে বসবাস কর এবং তোমরা তথা হতে যথেচ্ছা পানাহার কর। আর এই বলতে বলতে শহরে প্রবেশ কর– 'হে আল্লাহ! আমাদের পাপসমূহ মোচন করে দিন এবং বিনয়ের সাথে মস্তক অবনত করে সেজদা করতে করতে প্রবেশ করো! তা হলে আমি তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দিব। আর অচিরেই আমি নেককারদেরকে প্রচুর দান করব। এরপর সেই যালিমরা উক্ত বাক্যটিকে, যা তাদেরকে উচ্চারণ করতে বলা হয়েছিল, তা অন্য এক (মনগড়া) উক্তিতে পরিবর্তিত করে দিল। সুতরাং আমি তাদের উপর আসমান হতে আযাব নাযিল করে দিলাম তাদের যালিম হওয়ার কারণে।"

উপর্যুক্ত আয়াতে কারীমায় দেখা যায়, বনি ইসরাঈলদেরকে حِطَّةٌ শব্দ মুখে উচ্চারণ করতে করতে বিনয়ের সাথে অবনত মস্তকে শহরে প্রবেশ করতে বলা হয়েছিল। কিন্তু বনি ইসরাঈল এ শব্দের পরিবর্তে কোন শব্দ উচ্চারণ করেছিল? এ সম্পর্কে বুখারী শরীফের এক বর্ণনায় আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বনি ইসরাঈলরা حطة -এর পরিবর্তে বলতে আরম্ভ করল حَبَّةٌ فِيْ شَعْرَةٍ অর্থাৎ, "আমাদের আবশ্যক শীষের (ছড়ার) মধ্যে শষ্যবীজ। যেন তারা আল্লাহ তাআলার আদেশের সাথে বিদ্রুপ করছিল। তদুপরি অবনত মস্তকে সিজদাবস্থায় প্রবেশ করার পরিবর্তে নিতম্ব হেঁচড়িয়ে চলছিল।"

কিন্তু এমতাবস্থায় প্রশ্ন জাগে, অহমিকা ও গর্বিত অবস্থায় চলার এ নিয়ম কোথাও প্রচলিত এবং বিবেকসম্মত নয়। এতে তো নিজেকেই বিদ্রুপ এবং হাস্যাস্পদ করা হয়; অপরের সাথে বিদ্রুপ করা হয় না। সুতরাং হাদীসটির এ বাক্যটির বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা হলো, যা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. হতে রেওয়ায়াত করা হয়েছে। তিনি বলেন, বনি ইসরাঈলরা শহরে প্রবেশ করবার সময় মস্তক অবনত করে চলার পরিবর্তে মস্তক উন্নত করে চলছিল। অর্থাৎ একজন অহংকারী ও গর্বিত ব্যক্তি যেমন সদর্পে বুক ফুলিয়ে মস্তক উঁচু করে নিতম্বকে হেলিয়ে দুলিয়ে এক বিচিত্র ভঙ্গিতে চলে, তদ্রুপ বনি ইসরাঈলরাও নিতম্ব দুলিয়ে বুক ফুলিয়ে শহরে প্রবেশ করছিল।

তাওরাত কিতাবে উল্লেখ রয়েছে, মূসা আ.-এর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বনি ইসরাঈলের প্রয়োজন মুতাবিক আল্লাহ তাআলা মূসা আ.-এর প্রতি আদেশ-নিষেধ সংক্রান্ত ওহি অবতীর্ণ করেছেন। তাঁবু আকৃতির গম্বুজে স্থাপিত সাক্ষ্যদানে তাবৃত সম্বন্ধে তাদের কিতাবে উল্লিখিত তথ্যাদি পর্যালোচনা করলে তা সহজেই প্রতীয়মান হয়। বনি ইসরাঈলের তৃতীয় যাত্রা পুস্তকে উল্লেখ রয়েছে, বনি ইসরাঈলকে ১২টি গোত্রে বিভক্ত করার জন্যে আল্লাহ তাআলা মূসা আ. ও হারূন আ.-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন। আবার প্রতিটি গোত্রের একজন আমীর নির্ধারণ করার জন্যে হুকুম দিয়েছিলেন। আমীরকে বলা হত নকীব। তীহ ময়দান থেকে বের হওয়ার পর দুর্ধর্ষ জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি হিসেবে তাদেরকে এরূপ বিভক্ত করার হুকুম দেওয়া হয়েছিল। আর এ নির্দেশটি

ছিল চল্লিশ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার শেষের দিকে। এ জন্যই কেউ কেউ বলেছেন, 'মূসা আ. মৃত্যুর ফেরেশতার চোখ বিনষ্ট করে দিয়েছিলেন। কারণ, তিনি তাঁকে তাঁর সে সময়ের অবয়বে চিনেন নি। অধিকন্তু আল্লাহ তাআলা মূসা আ.-কে এমন একটি কাজের নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাঁর যমানায় যেটা সঙ্ঘটিত হওয়ার তিনি আশা পোষণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর আমলে এটা সঙ্ঘটিত হওয়া তকদীরের ফয়সালা ছিল না বরং এটা তাঁর খাদেম ইউশা ইবনে নূনের ভাগ্যেই নির্ধারিত ছিল।

কাজেই আল্লাহ তাআলা মূসা আ.-কে বনি ইসরাঈল থেকে সৈন্য সংগ্রহ করতে এবং তাদের মধ্যে নকীব নির্ধারণ করতে হুকুম দিয়েছিলেন। যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا

আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাঈলের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন এবং তাদের মধ্য হতে বারো জন নেতা নিযুক্ত করেছিলেন। (সূরা মায়েদা : ১২)

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

আর আল্লাহ বলেছিলেন : আমি তোমাদের সঙ্গে আছি; তোমরা যদি সালাত কায়েম কর যাকাত দাও, আমার রাসূলগণে ঈমান আন ও তাদেরকে সম্মান কর এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান কর, তবে তোমাদের পাপ অবশ্যই মোচন করব এবং নিশ্চয় তোমাদেরকে দাখিল করব জান্নাতে; যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; এর পরও কেউ কুফরী করলে সে সরল পথ হারাবে। (সূরা মায়েদা : ১২)

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাঈলকে যেন বললেন : তোমাদের প্রতি আমি যা বাধ্যতামূলক করেছি, তা যদি তোমরা যথাযথ পালন কর এবং যুদ্ধ থেকে বিরত না থাক, যেমন পূর্বে বিরত ছিলে, তা হলে এটার সওয়াবকে আমি তোমাদের উপর পতিত গযব ও শাস্তির কাফফারা রূপে গণ্য করব। এরপর আল্লাহ তাআলা তাদের দুষ্কর্মের ও ওয়াদা ভঙ্গের জন্য তিরস্কার করেন। যেমনিভাবে তাদের পর খৃস্টানদের ধর্মীয় ব্যাপারে মতবিরোধের জন্য আল্লাহ তাদেরকে তিরস্কার করেছেন।

বস্তুত আল্লাহ তাআলা মূসা আ.-কে বনি ইসরাঈলের সেসব যোদ্ধার নাম লিপিবদ্ধ করার জন্যে নির্দেশ দেন, যারা অস্ত্রধারণ ও যুদ্ধ করতে পারে এবং বিশ বছর কিংবা তার অধিক বয়সে পৌঁছেছে। সেই সঙ্গে তাদের প্রতিটি দলের জন্যে একজন নকীব তথা নেতা নির্ধারণেরও তিনি হুকুম দেন।

প্রথম গোত্রটি ছিল রূবীল-এর গোত্র। রূবীল ছিলেন ইয়াকূব আ.-এর প্রথম সন্তান। এ গোত্রে যোদ্ধার সংখ্যা ছিল ৪৬ হাজার ৫শ। তাদের নেতা ছিলেন আল ইয়াসূর ইবনে শাদ ইয়াসূরা।

দ্বিতীয় গোত্রটি ছিল শামউন-এর গোত্র। তাদের সংখ্যা ছিল ৫৯ হাজার ৩শ। তাদের নেতা ছিলেন শালো মীঈল ইবনে হুরইয়া শুদাই।

তৃতীয়টি ছিল ইয়াহুদা-এর গোত্র। তাদের সংখ্যা ছিল ৭৪ হাজার ৬শ। তাদের নেতা ছিলেন নাহশূন ইবনে ওমায়না দাব।

চতুর্থ ছিল ঈশাখার-এর গোত্র। তাদের সংখ্যা ছিল ৫৪ হাজার ৪শ। তাদের নেতা ছিলেন নাশাঈল ইবনে সাওগার।

পঞ্চম গোত্রটি ছিল ইউসুফ আ.-এর। তাদের সংখ্যা ছিল ৪০ হাজার ৫শ। তাদের নেতা ছিলেন ইউশা ইবনে নূন আ.।

ষষ্ঠ ছিল মীশা-এর গোত্র। তাদের সংখ্যা ছিল ৩১ হাজার ২শ। তাদের নেতা ছিলেন জামলীঈল ইবনে ফাদাহ সূর।

সপ্তম গোত্রটি ছিল বিন ইয়ামনী-এর গোত্র। তাদের সংখ্যা ছিল ৩৫ হাজার ৪শ'। তাদের নেতা ছিলেন আবীদান ইবনে জাদউন।

অষ্টম গোত্রটি ছিল হাদ-এর গোত্র। তাদের সংখ্যা ছিল ৪৫ হাজার ৬শ' ৫০ জন। তাদের নেতা ছিলেন আল ইয়াসাফ ইবনে রাউঈল

নবমটি ছিল আশীর-এর। তাদের সংখ্যা ছিল ৪১ হাজার ৫শ'। তাদের নেতা ছিলেন ফাজ-ঈল ইবনে আকরান।

দশম গোত্রটি ছিল দান-এর। তাদের সংখ্যা ছিল ৬২ হাজার ৭শ'। নেতা ছিলেন আখী আযার ইবনে আম শুদাই।

একাদশতম গোত্রটি ছিল নাফতালী-এর গোত্র। তাদের সংখ্যা ছিল ৫৩ হাজার ৪শ'। তাদের নেতা ছিলেন আখীরা ইবনে আইন।

দ্বাদশতম গোত্রটি ছিল যাবূলূন-এর গোত্র। তাদের সংখ্যা ছিল ৫৭ হাজার ৪শ'। তাদের নেতা ছিলেন আলবাব ইবনে হাইলুন।

উপর্যুক্ত বর্ণনাটি ইহুদিদের কিতাব থেকে চয়িত। আল্লাহ তাআলাই অধিক পরিজ্ঞাত। উল্লেখ্য, বনু লাওয়ী বনি ইসরাঈলের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বনি ইসরাঈলের সাথে যোদ্ধা হিসাবে গণ্য করতে নিষেধ করেছেন। কেননা তারা ছিল তাঁবু-গম্বুজের বহন, খাটানো ও গুটানোর দায়িত্বে নিয়োজিত। তারা ছিল মূসা আ. ও হারূন আ.-এর গোত্র। তাদের সংখ্যা ছিল ২২ হাজার। এ সংখ্যার মধ্যে ১ মাস বা তদূর্ধ বয়সের শিশুদেরকেও ধরা হয়েছে। তারা আবার নিজেরা বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত ছিল। প্রতিটি ছোট ছোট গোত্র তাঁবু-গম্বুজের বিভিন্ন কাজের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিল।

একদল এটাকে পাহারা দিত, অন্য একদল এটার যাবতীয় মেরামতের কাজে নিয়োজিত থাকত। যখন বনি ইসরাঈলরা অন্যত্র গমন করত, তখন একটি দল তাঁবু পরিবহন ও খাটানোর কাজে নিয়োজিত থাকত। তারা সকলেই তাঁবু গম্বুজের আশেপাশে সামনে পেছনে ডানে ও বামে হেফাজতে নিয়োজিত থাকত।

বনু লাওয়ী ব্যতীত বনি ইসরাঈলের উপরিউক্ত যোদ্ধাদের মোট সংখ্যা হচ্ছে ৫ লাখ ৭১ হাজার ৬শ ৫৬। কিন্তু তারা বলে ২০ বছর বয়স্ক ও তদূর্ধ্বের অস্ত্রধারণকারী বনি ইসরাঈলের যোদ্ধাদের সংখ্যা হচ্ছে (বনূ লাওয়ীকে বাদ দিয়ে) ৬ লাখ ৩ হাজার ৫শ ৫৫ জন। এরূপ বর্ণনায় সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। কেননা, তাদের কিতাবে উল্লিখিত উপরোক্ত সৈন্যদের সংখ্যার সাথে তাদের উল্লিখিত সৈন্য সংখ্যার মিল নেই। আল্লাহ তাআলাই অধিক পরিজ্ঞাত।

চলার সময় তাঁবু-গম্বুজের জন্য নিযুক্ত বনু লাওয়ীরা বনি ইসরাঈলের মধ্যভাগে অবস্থান করতেন। আর ডান-পাশের শীর্ষে থাকতেন বনু রুবীল ও বাম পার্শ্বের শীর্ষে থাকতেন বনুদান। বনু নাফতালী হতেন পশ্চাৎবর্তী দলে অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলার নির্দেশে মূসা আ. বনু হারূন আ.-কে ইমাম নির্ধারণ করলেন। তাদের পূর্বে তাদের পিতারাও এরূপ ইমাম ছিলেন। তারা ছিলেন নাদাব; হুবকারাহ, আবীহু, আল আযির ও ইয়াসমার।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.-সহ পূর্ব ও পরের ওলামায়ে কেরাম বলছেন, হারূন আ. ও মূসা আ. উভয়েই ইতোপূর্বে তীহের প্রান্তরে ইনতেকাল করেছিলেন। তবে ইবনে ইসহাক রহ. মনে করেন, বায়তুল মুকাদ্দাস জয় করেছেন হযরত মূসা আ. আর ইউশা আ. ছিলেন তাঁর অগ্রগামী দলের প্রধান। তিনি আবার এ প্রসঙ্গে বালআম বাঊর-এর ঘটনাও বর্ণনা করেন।

যেমন সূরা আরাফে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ () وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (١٧٦) سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ

তাদেরকে ওই ব্যক্তির বৃত্তান্ত পড়ে শুনাও, যাকে আমি দিয়েছিলাম আমার নিদর্শনাবলী। এরপর সে ওটা বর্জন করে ও শয়তান তার পেছনে লাগে আর সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আমি ইচ্ছে করলে এটার দ্বারা তাকে উচ্চমর্যাদা দান করতাম; কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়ে ও তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। তার অবস্থা কুকুরের মতো যার উপর তুমি বোঝা চাপালে সে হাঁপাতে থাকে এবং তুমি বোঝা না

চাপালেও হাঁপায়। যে সম্প্রদায় আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের অবস্থাও এরূপ; তুমি বৃত্তান্ত বিবৃত কর, যাতে তারা চিন্তা করে। যে সম্প্রদায় আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে ও নিজেদের প্রতি জুলুম করে তাদের অবস্থা কত মন্দ!"

(সূরা আরাফ : ১৭৫-১৭৭)

বালয়াম ইবনে বাওর-এর ঘটনা তাফসির গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. প্রমুখ উল্লেখ করেছেন, সে ইসমে আযম জানত। তার সম্প্রদায় তাকে মূসা আ. ও তাঁর সম্প্রদায়ের উপর অভিশাপ দিতে অনুরোধ করেছিল। প্রথমত সে বিরত ছিল কিন্তু যখন তারা তাকে বারবার অনুরোধ করল, তখন সে তার একটি গাধার উপর আরোহণ করল। এরপর বনি ইসরাঈলের শিবিরের দিকে অগ্রসর হল। সে তাদের নিকটবর্তী হলে গাধাটি তাকে নিয়ে বসে পড়ল। সে গাধাটিকে মারধর করতে লাগল। গাধাটি দাঁড়িয়ে কিছু দূর চলার পর আবার বসে পড়ল। তখন সে গাধাটিকে আগের চাইতে অধিক মার দিল। গাধাটি দাঁড়াল, পরে আবার বসে পড়ল। তখন সে আবার গাধাটিকে অধিক জোরে পিটাতে লাগল। তখন গাধাটির মুখে ভাষা ফুটল। সে বালয়ামকে বলতে লাগল, হে বালয়াম! তুমি কোথায় যাচ্ছ? তুমি কি ফেরেশতাদের দেখছ না- তাঁরা আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে তীব্রভাবে বাধা দিচ্ছেন? তুমি কি আল্লাহর নবী ও মুমিনদের অভিশাপ দেওয়ার জন্য যাচ্ছ? তবু সে বিরত রইল না, সে আবার গাধাটিকে মার দিল।

গাধাটি অগ্রসর হল এবং হাসবান পাহাড়ের চূড়ার নিকটবর্তী হল। বালয়াম মূসা আ.-এর শিবির ও বনি ইসরাঈলের দিকে তাকাল এবং তাদেরকে অভিশাপ দিতে লাগল। তবে তার জিহবা তার এখতিয়ারে ছিল না বিধায় সে অনিচ্ছায় মূসা আ. ও তাঁর সম্প্রদায়ের জন্য আর্শীবাদ করতে লাগল এবং তার নিজের সম্প্রদায়ের উপর অভিশাপ দিতে লাগল। ফলে তার সম্প্রদায় তাকে তিরস্কার করতে লাগল। তখন সে তার সম্প্রদায়ের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল এবং বলল, সে তার জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না।

তার জিহবা ক্রমেই ঝুলে পড়ছিল এবং তা শেষ পর্যন্ত বুকের উপর গিয়ে পড়ল। সে তা সম্প্রদায়কে বলতে লাগল, আমার দুনিয়া ও আখেরাত বরবাদ হয়ে গেল। প্রতারণা ও ধোঁকাবাজি ব্যতীত আমার জন্যে আর কোনো পথই বাকি রইল না। তারপর সে তার সম্প্রদায়কে নির্দেশ দিল, তারা যেন তাদের নারীদেরকে বিশেষ সাজে সজ্জিত করে পণ্য বিক্রয়ের ছলে মূসা আ.-এর সৈন্যদের কাছে পাঠায়। তারা তাদের কাছে মালপত্র বিক্রয় করে এবং নিজেদেরকে তাদের কাছে সমর্পণ করে। যাতে তারা তাদের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। কেননা তারে মধ্য হতে যদি একজনও ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তা হলে এটা তাদের সকলের ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট। তারা এরূপই করল। তাদের নারীদের বিশেষভাবে সজ্জিত করল এবং তাদেরকে বনি ইসরাঈল শিবিরে পাঠাল।

তাদের মধ্যকার কুস্তি নামের একজন নারী বনি ইসরাঈলের একজন সরদারের কাছে গেল। তার নাম ছিল যামরী ইবনে শালূম। কথিত আছে, সে ছিল বনু শামাউন ইবনে ইয়াকূব আ.-এর গোত্রের সরদার। সে তখনই এ নারীটিকে নিয়ে তার তাঁবুতে প্রবেশ করল ও তার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হল। আল্লাহ্ তাআলা বনি ইসরাঈলের প্রতি প্লেগ রোগ পাঠালেন। এ রোগ তাদের মধ্যে ছড়াতে লাগল। এ সংবাদ যখন ফিনহাস ইবনে আযার ইবনে হারূন-এর কাছে পৌছল, তখন তিনি তার লোহার বর্শা হাতে ওই তাঁবুতে ঢুকে তাদের দুজনকেই বিদ্ধ করলেন। এরপর তাদেরকে নিয়ে বের হয়ে জনসমক্ষে আসলেন। তখন তাঁর হাতে ওই হাতিয়ারটিও ছিল। পুরুষ ও মহিলা উভয়ের লাশ তিনি ঘরের বাইরে নিয়ে আসেন এবং আকাশের দিকে লাশ দুটি তুলে ধরে বললেন, হে আল্লাহ! আপনার অবাধ্যের সাথে আপনি এরূপ আচরণই করে থাকেন। এরপর প্লেগের প্রকোপ প্রশমিত হয়ে যায়। ওই প্লেগ মহামারীতে সত্তর হাজার লোক মারা গিয়েছিল। যারা এ সংখ্যা কম করে বলেন, তারাও বিশ হাজার লোক মারা গিয়েছিল বলে থাকেন।

ফিনহাস ছিলেন তাঁর পিতার প্রথম সন্তান। তার পিতা আল আযার ছিলেন হারূন আ.-এর পুত্র। ইবনে ইসহাক রহ.-এর বর্ণিত বালয়ামের উপর্যুক্ত ঘটনাটিকে বুযুর্গানে দীনের অনেকেই যথার্থ বলে মন্তব্য করেছেন। তবে হয়তো মিসর থেকে প্রথমবার বায়তুল মুকাদ্দাস প্রবেশের জন্যে মূসা আ. যে উদ্যোগ গ্রহণ করে ছিলেন, তিনি তা বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু কোনো কোনো বর্ণনাকারী তা অনুধাবনে সক্ষম হন নি। আল্লাহই অধিক পরিজ্ঞাত। আবার এ ঘটনাটি তীহ ময়দানে ভ্রমণকালে সঙ্ঘটিত একটি ভিন্ন ঘটনাও হতে পারে। কেননা এ ঘটনার বর্ণনায় হাসবান পাহাড়ের উল্লেখ রয়েছে। তা বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে বহু দূরে অবস্থিত। অথবা এ ঘটনা ছিল মূসা আ.-এর বাহিনীর মধ্যে যারা ইউশা ইবনে নূন আ.-এর নেতৃত্বে বায়তুল মুকাদ্দাসের উদ্দেশ্যে তীহ ময়দান থেকে বের হয়ে এসেছিল, তাদের। যেমনটি সুদ্দী রহ. বলেছেন।

এসব মতামতের প্রেক্ষিতে জমহূর ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত, হারূন আ. তাঁর ভাই মূসা আ.-এর প্রায় দু'বছর পূর্বে তীহ প্রান্তরে ইনতেকাল করেন। তারপর মূসা আ.-ও সেখানেই ইনতিকাল করেন। এ কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, মূসা আ. তাঁর প্রতিপালকের কাছে বায়তুল মুকাদ্দাসের নিকটবর্তী স্থানে তাঁকে নিয়ে যাওয়ার জন্য দুআ করেছিলেন এবং তা কবূলও হয়েছিল।

বনি ইসরাঈল যাঁর সাথে তীহ ময়দান থেকে বের হয়েছিল এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিল, তিনি ছিলেন ইউশা ইবনে নূন আ.। কিতাবীরা ও অন্যান্য ইতিহাসবেত্তা উল্লেখ করেন, ইউশা ইবনে নূন আ. বনি ইসরাঈলকে নিয়ে জর্দান নদী অতিক্রম করে উরায়হায় পৌছলেন। উরায়হা ছিল ময়দানের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মজবুত প্রাচীরঘেরা দুর্গ, সুউচ্চ অট্টালিকাপূর্ণ জনবহুল শহর। তিনি এ শহরটিকে ছয় মাস অবরোধ করে রাখেন। এরপর একদিন ইউশা আ.-এর সৈন্যরা শহরটি আক্রমণ

করলেন এবং যুদ্ধের শিংগায় ফুঁক এবং সমস্বরে তাকবীর দিতে লাগলেন, শহরের প্রাচীরগুলোতে ফাটল সৃষ্টি হল এবং প্রাচীরের একটি বিধ্বস্ত অংশ দিয়ে ইউশা আ.-এর সৈন্য দুর্গে ঢুকে গেলেন। তারা প্রচুর গণিমত লাভ করলেন এবং বার হাজার নারী-পুরুষকে হত্যা করলেন। এভাবে তারা বহু রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন।

আরো কথিত আছে, ইউশা আ. সিরিয়ার ৩১ জন রাজার বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন। আবার এরূপও বর্ণিত রয়েছে, উপর্যুক্ত শহরটির অবরোধ জুমার দিন আসরের পর পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হয়। যখন সূর্য অস্ত যায় কিংবা অস্ত্র যাওয়ার উপক্রম হয় ও তাদের জন্য তাদের শরিয়তে নিষিদ্ধ শনিবার প্রায় আগত, তখন ইউশা আ. সূর্যকে লক্ষ্য করে বললেন : তুমি অস্ত যাওয়ার জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ প্রাপ্ত আর আমিও এ শহরকে জয় করার জন্য নির্দেশ প্রাপ্ত। হে আল্লাহ! সূর্যকে আমার জন্যে স্থির করে রাখুন।

শহরটি জয়লাভ করা পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা সূর্যকে ইউশা আ.-এর স্থির করে রাখলেন। অন্যদিকে আল্লাহ তাআলা চাঁদকে বিলম্বে উদিত হওয়ার হুকুম দিলেন। এতে প্রতীয়মান হয়, উক্ত রাতটি ছিল পূর্ণিমার রাত। সূর্যের ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসে উল্লিখিত রয়েছে, একটু পরেই আমরা তা আলোচনা করব। তবে চাঁদের ব্যাপারটি কিতাবীদের দ্বারা বর্ণিত এবং তা হাদীসের পরিপন্থী নয় বরং এটা অতিরিক্ত। এ বর্ধিত অংশকে সত্য বা মিথ্যা বলা যায় না। তারা আরো উল্লেখ করেন, এ ঘটনাটি ঘটেছিল উরায়হা বিজয়কালে। তবে এতে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। আল্লাহ তাআলা অধিক পরিজ্ঞাত। অধিকতর গ্রহণযোগ্য মতামত হচ্ছে– এ ঘটনাটা ঘটেছিল বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়কালে। মূল লক্ষ্য ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয় আর উরায়হা বিজয় ছিল তার উপায় মাত্র।

ইমাম আহমদ রহ. আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– ইউশা আ. ব্যতীত অন্য কারোর জন্যে সূর্যকে নিশ্চল করে রাখা হয় নি। এ বর্ণনাটি শুধু ইমাম আহমদ রহ. থেকেই বর্ণিত। তবে এটা ইমাম বুখারী রহ.-এর শর্ত অনুযায়ী সূত্রে বর্ণিত। এ হাদীসের দ্বারা বোঝা যায়, বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মিত হয় ইউশা ইবনে নূন আ.-এর হাতে; মূসা আ.-এর হাতে নয়। আর সূর্যের নিশ্চলতা ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়কালে, উরায়হা বিজয় করার সময় নয়। তা ছাড়া সূর্যকে নিশ্চল করে রাখা ছিল ইউশা আ.-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ইমাম আহমদ রহ. আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন : একজন নবী যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। তখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে বলেন : যে ব্যক্তি নব বিবাহিত, এখনও বাসর রাত যাপন করে নি, সে যেন আমার সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত না হয়; এমন ব্যক্তিও যেন অন্তর্ভুক্ত না হয়– যে ঘরের ভিত্তিপত্তন করেছে; কিন্তু এখনও তার ছাদ দিতে পারে নি। আবার এমন ব্যক্তিও যেন অন্তর্ভুক্ত না হয়, যে বকরি কিংবা মেষ খরিদ

করেছে ও শাবক জন্মের অপেক্ষায় রয়েছে। এরপর তিনি যুদ্ধ করতে করতে এমন সময় শহরের নিকটবর্তী হলেন, যখন আসরের নামায আদায় করা হয় কিংবা তিনি বলেন, আসরের ওয়াক্তের নিকটবর্তী হন।

তখন তিনি সূর্যকে লক্ষ্য করে বলেন, তুমি যেমন নির্দেশপ্রাপ্ত তেমনি আমিও নির্দেশপ্রাপ্ত। হে আল্লাহ! এটাকে ক্ষণকাল আমার জন্যে নিশ্চল করে রাখুন! এরপর আল্লাহ তাআলা বিজয় দান পর্যন্ত সূর্যকে নিশ্চল করে রাখেন। নবীর সৈন্যগণ গনীমতের মাল একস্থানে জড়ো করলেন এবং আগুন এগুলোকে গ্রাস করার জন্যে আসল; কিন্তু গ্রাস করতে অস্বীকার করল। তখন তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! নিশ্চয় তোমরা কেউ এ গনীমতের মাল হতে কিছু মাল আত্মসাৎ করেছ! সুতরাং তোমাদের প্রতি গোত্র থেকে একজন করে আমার কাছে বায়আত কর। তারা বায়আত করল। একজনের হাত নবীর হাতের সাথে আটকে গেল। তখন তিনি বললেন, তোমাদের গোত্রের লোকই গনীমতের মাল আত্মসাৎ করেছে। কাজেই তোমাদের গোত্রের লোকজনকে বল, আমার বায়আত গ্রহণ করতে। গোত্রের সকলে তাঁর হাতে বায়আত হল, কিন্তু দুই বা তিনজনের হাত নবীর হাতের সাথে আটকে গেল। তখন নবী বললেন, তোমাদের কাছে চুরির মাল রয়েছে। তোমরাই আত্মসাৎকারী। তখন তারা একটি গরুর মাথা পরিমাণ স্বর্ণ বের করে দিল। বর্ণনাকারী বলেন, তারা তা গনীমতের মালের সাথে রেখে দিল। মাল ময়দানে রাখা ছিল। এরপর আগুন অগ্রসর হয়ে আসল এবং মালগুলোকে গ্রাস করে নিল। আমাদের উম্মতের পূর্বে কারোর জন্য গনীমতের মাল বৈধ ছিল না। আল্লাহ তাআলা আমাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতার দিকে লক্ষ্য করে গনীমতের মাল আমাদের জন্য বৈধ করে দিলেন। উপর্যুক্ত সূত্রে শুধু ইমাম মুসলিম রহ.-ই এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

বাযযায রহ. অন্য সূত্রে আবু হোরায়রা রাযি. থেকে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। যখন ইউশা আ. বনি ইসরাঈলকে নিয়ে শহরের দরজায় পৌছেন, তখন তাদেরকে বিনীতভাবে শহরে প্রবেশের নির্দেশ দেওয়া হয়। অর্থাৎ যেহেতু আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতিশ্রুতি মতে মহান বিজয় দান করে তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, সেজন্য তাদেরকে অনুনয়-বিনয়ের সাথে শোকর গোযার হয়ে ও রুকূ অবস্থায় প্রবেশ করতে হুকুম দেওয়া হল।

তাদেরকে আরো হুকুম দেওয়া হল, যেন তারা প্রবেশ করার সময় মুখে উচ্চারণ করে حِطَّةٌ অর্থাৎ পূর্বে বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করতে অস্বীকার করে আমরা ও আমাদের পূর্ব পুরুষেরা যে ভুল করেছিলাম, সে ভুল ক্ষমা কর! বনি ইসরাঈল কথায় ও কাজে আল্লাহ তাআলার নির্দেশের বিরোধিতা করেছিল। নিতম্ব হেঁচড়িয়ে দ্বারে প্রবেশ করছিল। বলছিল حَبَّةٌ فِي شَعْرَةٍ অর্থাৎ বীজ তার খোসায়। অন্য বর্ণনা মতে حِنْطَةٌ فِي شَعْرَةٍ অর্থাৎ গম তার খোসায়। মোটকথা, তাদেরকে যা নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তারা তা পাল্টে দিয়েছিল। তা নিয়ে করেছিল ঠাট্টা-বিদ্রুপ।

ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا -এর তাফসীরে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে, ছোট দরজা দিয়ে নতশিরে প্রবেশ কর! মুজাহিদ, সুদ্দী ও যাহহাক রহ. বলেন, উপরিউক্ত দরজাটি ছিল বায়তুল মুকাদ্দাসের বায়তে ইলিয়ার বাবে হিত্তা।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, তারা নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের মাথা উঁচিয়ে প্রবেশ করে। আর ইবনে আব্বাস রাযি. বলেছেন, তারা তাদের নিতম্বের উপর ভর দিয়ে প্রবেশ করেছিল। বস্তুত তারা মাথা উঁচিয়ে নিতম্বের ওপর ভর দিয়ে প্রবেশ করেছিল। তাই দুই বর্ণনায় কোনো বিরোধ নেই। আল্লাহর আদেশ অমান্য করে নিজ ভাষায় বনি ইসরাঈল বলেছিল : هطى سقاثنا ازمة مزبا যার আরবী হচ্ছে :

حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَمْرَاءَ مَثْقُوْبَةٌ فِيْهَا شَعْرَةٌ سَوْدَاءُ

অর্থাৎ 'লাল গমের বীজ যার মধ্যে খচিত ছিল কালো দানা।'

আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমে উল্লেখ করেছেন, তাদের এ বিরোধিতার জন্যে তিনি আযাব নাযিল করেছিলেন। আর সে আযাব ছিল প্লেগ। বুখারী ও মুসলিমে তা উল্লেখ রয়েছে। এরপর বনি ইসরাঈল বায়তুল মুকাদ্দাসে আধিপত্য বিস্তার করে। তখন থেকেই তারা সেখানে বসবাস করতে থাকে। তাদের মধ্যে ছিলেন আল্লাহর নবী ইউশা আ.। আল্লাহর কিতাব তাওরাতের নির্দেশ মুতাবিক তিনি তাদের শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। তিনি একশ সাতাশ বছর বয়সে ইনতেকাল করেন। মূসা আ.-এর ইনতেকালের পর হযরত ইউশা আ. ২৭ বছর জীবিত ছিলেন।

হযরত হিযকীল আ.

হযরত মূসা ও হযরত হারুন আলাইহিস সালামের পরে হযরত ইউশা আ. নবুয়ত লাভ করেন। তাঁর পরে হযরত মূসা আ.-এর সাথী কালেব ইবনে ইউহান্না হযরত ইউশা আ.-এর স্থলবর্তী হন। ওনি হযরত মূসা আ.-এর সহোদর ভগ্নি মারইয়াম বিনতে ইমরানের স্বামী ছিলেন, কিন্তু নবী ছিলেন না।

তাবারী বলেন, কালেবের পরে সর্বপ্রথম যিনি বনি ইসরাঈলদের আধ্যাত্মিক ও পার্থিব নেতৃত্ব ও পথ প্রদর্শনের কর্তব্য সম্পন্ন করেন, তিনি হযরত হিযকীল আ.।

নাম ও বংশ পরিচয়

তাওরাতে উল্লেখ আছে– হিযকীল আ. বুশীর কাহেনের পুত্র। (বনি ইসরাঈলদের ভাষায় খুব শ্রেষ্ঠ আলেম ও পীরে কামেলকে কাহেন বলা হয়।) তাঁর নাম হিয্‌কী-ঈল। হিব্রু ভাষায় 'হিযকী' শব্দের অর্থ, কুদরত ও শক্তি। আর 'ঈল' অর্থ, আল্লাহ। অতএব আরবি ভাষায় অনুবাদ 'কুদরতুল্লাহ'। কথিত আছে, শৈশবকালেই হযরত হিযকীল আ. পিতৃহারা হন। যখন তাঁর নবুয়ত প্রাপ্তির সময় নিকটবর্তী হল, তখন তাঁর মাতা খুব বৃদ্ধ ও দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। সুতরাং বনি ইসরাঈলদের মধ্যে 'ইবনুল্ আজুয' (বুড়ীর পুত্র) উপাধিতে তিনি খ্যাত ছিলেন। হযরত হিযকীল আ. দীর্ঘকাল পর্যন্ত বনী ইসরাঈলদের মধ্যে ইহকাল ও পরকালের পথ প্রদর্শনের কর্তব্য পালন করছিলেন।

কুরআন মাজিদে হিযকীল আ.

কুরআন মাজিদে হিযকীল নামে কোনো নবীর উল্লেখ নেই। কিন্তু সূরা বাকারায় বর্ণিত একটি ঘটনা সম্বন্ধে প্রাচীনকালের ওলামায়ে কেরাম হতে যে সমস্ত রেওয়ায়েত নকল করা হয়েছে, তা হতে জানা যায়, সেই ঘটনাটি হযরত হিযকীল আ.-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তাফসিরের কিতাবসমূহে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং অন্যান্য কতিপয় সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত আছে, বনি ইসরাঈলদের একটি বিরাট দলকে তাদের বাদশা কিংবা পয়গম্বর হিযকীল আ. যখন বললেন : অমুক শত্রুর সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হও, আল্লাহ তাআলার বাণীকে উন্নত করার কর্তব্য পালন কর, তখন তারা প্রাণের ভয়ে পলায়ন করল এবং এত দূরে চলে গেল, তাদের মনে বিশ্বাস জন্মাল, এখন আমরা জিহাদ হতে আত্মরক্ষা করে মৃত্যুর হাত হতে সুরক্ষিত হয়ে গেছি। এরপর সেই দূরবর্তী এলাকায় এক উপত্যকায় বসবাস করতে লাগল। এখন হয়ত তাদের এই পলায়নকার্যকে আল্লাহ তাআলার আদেশ অমান্য করা কিংবা অদৃষ্টের ফয়সালা হতে বিমুখ হওয়া মনে করে পয়গম্বর আ. অসন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে তাদের জন্য বদদুআ করলেন কিংবা স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই তাদের এ কার্যকলাপের প্রতি বিরাট অসন্তুষ্ট হলেন। মোটকথা, আল্লাহ তাআলার গযব নাযিল হয়ে তাদের ইহলীলা সাঙ্গ করে দিল। এক সপ্তাহ পরে হিযকীল আ. তাদের নিকট গমন করে তাদের এ অবস্থা দর্শন করে আফসোস করলেন এবং দুআ করলেন, ইয়া আল্লাহ! এদেরকে মৃত্যুর আযাব

হতে মুক্তি দান করুন! যেন তাদের জীবন প্রাপ্তি স্বয়ং তাদের জন্য এবং অন্যান্য মানুষের জন্য দৃষ্টান্তমূলক উপদেশ হয়। পয়গম্বরের দুআ কবুল হল। তারা সকলে জীবনপ্রাপ্ত হয়ে উপদেশমূলক দৃষ্টান্ত হল।

তাফসিরে ইবনে কাসিরে বর্ণিত আছে, এ ইসরাঈলী দলটি 'দাদারওয়ান' নামক স্থানের অধিবাসী ছিল। এরা পলায়ন করে 'উনীহ' পার্বত্য এলাকার উপত্যকা ভূমিতে চলে গিয়েছিল। তথায় তাদের উপর মৃত্যুর আযাব নাযিল হয়েছিল। যেমন কুরআন মাজিদে এ সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ

أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ

"তুমি কি তাদেরকে দেখ নি যারা মৃত্যুভয়ে হাজারে-হাজারে তাদের আবাসভূমি ত্যাগ করেছিল? তারপর আল্লাহ তাদেরকে বলেছিলেন, "তোমাদের মৃত্যু হোক!" তারপর আল্লাহ তাদেরকে জীবিত করেছিলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল; কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।" (সূরা বাকারা : ২৪৩)

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন : ইউশার মৃত্যুর পর কালিব ইবনে ইউহান্না বনি ইসরাঈলের নেতা হন। তাঁর ইনতেকালের পর হিযকীল ইবনে ইউযী বনি ইসরাঈলে পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এ হিযকীল ইবনুল আজুয তথা বৃদ্ধার পুত্র হিসেবে পরিচিত। যার দুআয় আল্লাহ সে-সব মৃতলোকদেরকে জীবিত করে দিয়েছিলেন, যাদের ঘটনা পূর্বোক্ত আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে।

ইবনে ইসহাক বলেন, এসব লোক মহামারীর ভয়ে ঘর-বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায় এবং এক প্রান্তরে উপনীত হয়। আল্লাহ বললেন, তোমাদের মৃত্যু হোক! ফলে তারা সকলেই তথায় মারা যায়। অবশ্য তাদের লাশগুলো হিংস্র জন্তুর কবল থেকে রক্ষা করার জন্য বেষ্টনীর ব্যবস্থা করা হয়। এভাবে সুদীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়। একবার হযরত হিযকীল তাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তিনি থমকে দাঁড়ান ও চিন্তা করতে থাকেন। এ সময় একটি গায়েবী আওয়াজের মাধ্যমে তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, আল্লাহ এ মৃত লোকগুলোকে তোমার সম্মুখে জীবিত করে দেন, তা কি তুমি চাও? হিযকীল বললেন, জ্বী! এরপর তাঁকে বলা হল, তুমি হাড়গুলোকে আদেশ কর, যাতে সেগুলো গোশত দ্বারা আবৃত হয় এবং শিরাগুলো যেন পরস্পর সংযুক্ত হয়ে যায়। আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী হিযকীল হাড়গুলোকে সে আহবান করার সাথে সাথে লাশগুলো সবই জীবিত হয়ে গেল এবং সমস্বরে তাকবির ধ্বনি উচ্চারণ করল।

আসবাত ঐতিহাসিক সুদ্দী থেকে বিভিন্ন সূত্রে ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ রাযি. প্রমুখ সাহাবীর উদ্ধৃতি দিয়ে উপর্যুক্ত أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا... আয়াতে উল্লিখিত ঘটনা সম্পর্কে লিখেছেন : ওয়াসিত এর নিকটে অবস্থিত একটি জনপদের নাম ছিল দাওয়ার-

দান। এ জনপদে একবার ভয়াবহ মহামারী দেখা দিল। এতে সেখানকার অধিকাংশ লোক ভয়ে পালিয়ে গিয়ে পার্শ্ববর্তী এক এলাকায় অবস্থান করল। জনপদে যারা থেকে গিয়েছিল তাদের কিছু সংখ্যক মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়; কিন্তু বেশির ভাগ লোকই বেঁচে যায়। মহামারী চলে যাওয়ার পর পালিয়ে যাওয়া লোকজন জনপদে ফিরে আসে। জনপদে থেকে যাওয়া লোকদের মধ্যে যারা বেঁচেছিল– তারা পরস্পর বলাবলি করল, আমাদের যেসব ভাইয়েরা এলাকা ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল, তারাই বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছে। তাদের মতো যদি আমরাও চলে যেতাম, তবে সবাই বেঁচে থাকতাম। পুনরায় যদি এ রকম মহামারী আসে, তবে আমরাও তাদের সাথে চলে যাব।

পরবর্তী বছর আবার মহামারী ছড়িয়ে পড়ে। এবার জনপদ শূন্য করে সবাই বেরিয়ে গেল এবং পূর্বের স্থানে গিয়ে অবস্থান নিল। সংখ্যায় এরা ছিল তেত্রিশ হাজার বা তার চাইতে কিছু বেশি। যে স্থানে তারা সমবেত হয়, সে স্থানটি ছিল একটি প্রশস্ত উপত্যকা। তখন একজন ফিরিশতা উপত্যকাটির নিচের দিক থেকে এবং আর একজন ফিরিশতা উপত্যকাটির উপর দিক থেকে আওয়াজ দিয়ে বললেন, "তোমাদের মৃত্যু হোক!" এতে যে সমস্ত লোক মারা গেল, তাদের মৃতদেহগুলো সেখানে পড়ে থাকল।

একবার নবী হিযকীল আ. সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ দৃশ্য দেখে তিনি বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন এবং আপন মুখের চোয়াল ও হাতের আঙ্গুল মোচড়াতে থাকলেন। এ অবস্থায় আল্লাহ তাঁর নিকট ওহি পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হিযকীল! তুমি কি দেখতে চাও, আমি কিভাবে এদেরকে পুনরায় জীবিত করি? হিযকীল আ. বললেন, জ্বী! আমি তা দেখতে চাই। বস্তুত তিনি এখানে দাঁড়িয়ে এ বিষয়েই চিন্তামগ্ন ছিলেন এবং অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন।

তাঁকে বলা হল, তুমি আহবান কর! তিনি আহবান করলেন, হে অস্থিসমূহ! আল্লাহ তোমাদেরকে একত্র হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। দেখা গেল, যার যার অস্থি উড়ে উড়ে এসে পরস্পর সংযুক্ত হয়ে কঙ্কালে পরিণত হয়েছে। তাঁকে পুনরায় বলা হল, আহবান কর! তিনি আহবান করলেন, "হে অস্থিসমূহ! আল্লাহ তোমাদের কঙ্কালগুলো গোশত ইত্যাদি দ্বারা আবৃত করার নির্দেশ দিয়েছেন।" দেখা গেল, কঙ্কালগুলো মাংস দ্বারা আবৃত হয়ে তাতে শিরা-উপশিরা চালু হয়ে গিয়েছে এবং যে কাপড় পরিহিত অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়েছিল, সে কাপড়গুলোই তাদের দেহে শোভা পাচ্ছে। এরপর হিযকীলকে বলা হল, আহবান কর! তিনি আহবান করলেন, "হে দেহসমূহ! আল্লাহর হুকুমে দাঁড়িয়ে যাও!" সাথে সাথে সবাই দাঁড়িয়ে গেল। আসবাত বলেন, মনসুর মুজাহিদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, লোকগুলো জীবিত হয়ে এ দুআটি পাঠ করে :

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ

"হে আল্লাহ! আপনি অতি পবিত্র-মহান, যাবতীয় প্রশংসা আপনার, আপনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই"। এরপর তারা জনপদে আপন সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে যাও।

জনপদের অধিবাসীরা দেখেই তাদেরকে চিনতে পারল, এরাই ঐসব লোক, যারা আকস্মিকভাবে মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছিল। তবে যে কাপড়ই তারা পরিধান করতেন, তাই পুরনো হয়ে যেত। এরপর এ অবস্থায়ই নির্ধারিত সময়ে তাদের সকলের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়।

এদের সংখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে এদের সংখ্যা চার হাজার, আট হাজার, অপর এক বর্ণনা মতে চল্লিশ হাজার বর্ণিত আছে। তারা ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী একটি জাতি। অধিকাংশ আলেমের মতে এটা ছিল একটি বাস্তব ঘটনা।

ইমাম আহমদ, বুখারী ও মুসলিম রহ. হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, একবার ওমর ইবনে খাত্তাব রাযি. সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হন। 'সারাগ' নামক স্থানে পৌঁছুলে আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ রাযি. ও তাঁর সঙ্গী সেনাধ্যক্ষগণ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানান, সিরিয়ায় বর্তমানে মহামারীর প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। এ সংবাদ শুনে সম্মুখে অগ্রসর হবেন কি-না, সে বিষয়ে পরামর্শের জন্যে তিনি মুহাজির ও আনসারদের সাথে বৈঠকে বসেন। আলোচনায় তাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। এমন সময় আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. এসে তথায় উপস্থিত হন। তাঁর কোনো এক প্রয়োজনে তিনি প্রথমে পরামর্শ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি বললেন, এ ব্যাপারে আমার একটা হাদিস জানা আছে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যদি কোনো এলাকায় মহামারী দেখা দেয়, আর পূর্ব থেকেই তোমরা সেখানে অবস্থানরত থাক, তা হলে মহামারীর ভয়ে পালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে সে এলাকা ত্যাগ করো না। আর যদি কোনো অঞ্চলে মহামারী ছড়িয়ে পড়ার সংবাদ পাও এবং তোমরা সে অঞ্চলের বাইরে থাক, তবে সে দিকে অগ্রসর হয়ো না।

হাদিসটি শোনার পর হযরত ওমর রাযি. আল্লাহর শোকর আদায় করেন এবং মদীনায় ফিরে আসেন। বস্তুত এই মহামারী দ্বারা পূর্ববর্তী যুগের উম্মতদেরকে শাস্তি দেওয়া হত।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক রহ. বলেন, হিযকীল আ. বনি-ইসরাঈলের মধ্যে কত কাল অবস্থান করেছিলেন, সে সম্বন্ধে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। একসময়ে আল্লাহ তাঁকে তাঁর নিকট উঠিয়ে নেন। হিযকীলের মৃত্যুর পর বনি-ইসরাঈলরা আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকারের কথা বেমালুম ভুলে যায়। ফলে তাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে বেদায়াতের প্রসার ঘটে। তারা মূর্তিপূজা আরম্ভ করে। তাদের এক উপাস্য বেদ-মূর্তির নাম ছিল বাআল (بعل) অবশেষে আল্লাহ তাদের প্রতি একজন নবী প্রেরণ করেন। তাঁর নাম ইলিয়াস ইবনে ইয়াসীন ইবনে ফিনহাস ইবনে ঈযার ইবনে হারূন ইবনে ইমরান। সামনে তাঁর জীবনী আলোচনা করা হবে।

হযরত ইলিয়াস আ.

হযরত মূসা ও হারূন আ.-এর পরে কুরআন মাজিদে তাঁদের প্রথম দিকের স্থলবর্তীগণের নাম উল্লেখ করা হয় নি। হযরত ইউশা আ.-এর নাম কুরআনের দুই জায়গায় উল্লেখ হয়েছে। একস্থানে فَتًى অর্থাৎ মূসা আ.-এর যুবক সঙ্গী বলা হয়েছে আর অন্যত্র তথা সূরা মায়েদায় হযরত ইউশা' আ. ও কাবিল ইবনে ইউহান্নাকে رَجُلَانِ অর্থাৎ 'দুই ব্যক্তি' বলা হয়েছে। তা ছাড়া হযরত হিযকীল আ.-এর আলোচনা জমহুরের রেওয়ায়ত অনুযায়ী শুধু ঘটনার মাধ্যমেই এসেছে। নতুবা আয়াতে কোনো বিশেষণের সঙ্গে তাঁর আলোচনা করা হয় নি। হযরত মূসা ও হারূন আ.-এর পরে সর্বপ্রথম যে নবী ও পয়গম্বরের উল্লেখ পরিষ্কারভাবে নামের সঙ্গে কুরআন মাজিদে এসেছে, তিনি হলেন হযরত ইলিয়াস আ.। তিনি হযরত হিযকীল আ.-এর স্থলাবর্তী এবং বনি ইসরাঈলদের মধ্য ঈলিয়া নামে অভিহিত।

নাম ও বংশ পরিচয়

কুরআন মাজিদ তাঁর নাম 'ইলিয়াস' বলেছে। আর ইউহান্নার ইনযিলে তাঁকে ইলিয়াহ নবী বলা হয়েছে। কোনো কোনো সাহাবায়ে কেরামের উক্তিতে দেখা যায়, ইলিয়াস ও ইদরীস একই নবীর দুই নাম। কিন্তু একথা ঠিক নয়। প্রথমত এ উক্তিগুলির সম্বন্ধে মুহাদ্দিসীনে কেরামের আপত্তি আছে। তাঁরা এগুলিকে প্রামাণ্য মনে করেন না। দ্বি ়ত কুরআন মাজিদের বর্ণনাভঙ্গিও এ উক্তিগুলিকে খণ্ডন করছে। কেননা কুরআন মাজিদ সূরা আনআম ও আস-সাফফাতে হযরত 'ইলিয়াস' আ.-এর যেই বিশেষণ ও অবস্থাবলী উল্লেখ করেছে, তাতে কোনো এক জায়গায়ও এরূপ ইঙ্গিত পাওয়া যায় না, তাঁকে 'ইদরীসও বলা হয়। আর সূরা আম্বিয়ায় যে আয়াতে ইদরিস আ.-এর আলোচনা করা হয়েছে, তাতেও এমন কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় না, যদ্দারা এ দুই পয়গম্বরের বিশেষণ ও অবস্থাবলীর সাদৃশ্যের ওপরও প্রমাণ গ্রহণ করা যেতে পারে। সেই বিশেষণ ও অবস্থাসমূহকে একই ব্যক্তির মনে করা তো দূরেরই কথা।

এতদ্ভিন্ন ঐতিহাসিকগণ হযরত ইদরীস আ.-এর যে বংশপরিচয় বর্ণনা করেছেন, তা হযরত ইলিয়াস আ. সম্বন্ধে বর্ণিত বংশপরিচয়ের সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র এবং এই বংশানুক্রম হিসাবে উভয়ের মধ্যে বহু শতাব্দির ব্যবধান হয়ে যায়। অতএব যদি এ দুটি নাম একই পয়গম্বরের হত, তবে কুরআন মাজিদ অবশ্যই এদিকে ইঙ্গিত করত। আর ঐতিহাসিকগণও অবশ্যই উভয়ের পরিচয় এক হওয়ার কোনো না কোনো প্রমাণ বর্ণনা করতে পারতেন। সুতরাং এটাই সঠিক, হযরত ইদরীস আ. ছিলেন হযরত নূহ আ. ও হযরত ইবরাহীম আ.-এর মধ্যবর্তী যুগের পয়গম্বর। আর হযরত ইলিয়াস আ. ইসরাঈলী নবী এবং হযরত মূসা আ.-এর পরে প্রেরিত হয়েছিলেন। ইমাম তাবারী রহ. বলছেন, তিনি হযরত 'আলইয়াসা' আ.-এর চাচাত ভাই ছিলেন এবং হযরত হিযকীল আ.-এর পরে নবুয়ত প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

ঐতিহাসিকগণ একমত, হযরত ইলিয়াস আ. হযরত হারূন আ.-এর বংশধর। তাঁর বংশ-তালিকা হল : ইলিয়াস ইবনে ইয়াসীন, ইবনে ফাতহাছ, ইবনে ইয়াযার, ইবনে হারূন আ. কিংবা ইলিয়াস ইবনে আযেব ইবনে ইয়াযার ইবনে হারূন আ.।

বংশপরিচয় বিশারদগণ বলেন, তিনি ছিলেন ইলিয়াস তাশাবী। আবার বলা হয়েছে, তিনি ছিলেন ইবনে ইয়াসীন ইবনে ফিনহাস ইবনে আল ঈযার ইবনে হারূন আ.। কেউ কেউ বলেন, তিনি ছিলেন ইলিয়াস ইবনে আল আযির ইবনুল ঈযার, ইবনে হারূন, ইবনে ইমরান আ.।

নবুয়তপ্রাপ্তি

কথিত আছে, হযরত ইলিয়াস দামেশকের পশ্চিমস্থ বালাবাক-এর অধিবাসীদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল। তিনি তাদেরকে আল্লাহ তাআলার প্রতি আহবান করলেন এবং তাদের দেবমূর্তি বা'ল-এর ইবাদত করতে তাদেরকে বারণ করলেন। অবশ্য কেউ কেউ বলেন, বা'ল ছিল জনৈকা মহিলার নাম। তবে প্রথমোক্ত অভিমতটিই শুদ্ধ। এজন্যই ইলিয়াস আ. তাদেরকে বলেছিলেন :

أَلَا تَتَّقُونَ (١٢٤) أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ (١٢٥)

اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ

"তোমরা কি সাবধান হবে না? তোমরা কি বা'লকে ডাকবে এবং পরিত্যাগ করবে শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা আল্লাহ তাআলাকে, যিনি তোমাদের প্রতিপালক ও তোমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতিপালক?"

তারপর তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। তাঁর বিরোধিতা করেছিল এবং তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। কথিত আছে, তিনি তাদের থেকে পলায়ন করে আত্মগোপন করেছিলেন। কাব আহবার রহ. বলেন, ইলিয়াস আ. নিজ সম্প্রদায়ের বাদশার ভয়ে দম পাহাড়ের নিচে গুহার মধ্যে দীর্ঘ দশ বছর আত্মগোপন করেছিলেন। ওই বাদশার মৃত্যু হলে পরবর্তী বাদশার নিকট ফিরে এসে তিনি তাকে ইসলামের দাওয়াত দেন। বাদশা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং দশ হাজার লোক ছাড়া তাঁর সম্প্রদায়ের সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেন। বাদশার নির্দেশে ওই দশহাজার লোককে হত্যা করা হয়।

মুহাম্মদ ইবনে সায়িব কালবী রহ. থেকে বর্ণিত আছে, সর্বপ্রথম প্রেরিত নবী হচ্ছেন ইদরীস আ., এরপর নূহ আ., এরপর ইবরাহীম আ., এরপর ইসরাঈল আ. ও ইসহাক আ., এরপর ইয়াকুব আ., এরপর ইউসুফ আ., এরপর লূত আ., এরপর হূদ আ., এরপর সালেহ আ., এরপর শুআইব আ., এরপর ইমরানের পুত্রদ্বয় মূসা ও হারূন আ., এরপর ইলিয়াস তাশাবী ইবনে কাহিস ইবনে লাওয়ী ইবনে ইয়াকুব আ. ইবনে ইসহাক আ. ইবনে ইবরাহীম আ.। অবশ্য নবীদের উপর্যুক্ত বিন্যাস সন্দেহমুক্ত নয়।

মাকহুল রহ. কাব আহবার রহ. থেকে বর্ণনা করেন, চারজন নবী জীবিত রয়েছেন। দুজন যমীনে যথা ইলিয়াস ও খিযির আ. আর দুজন আকাশে যথা ইদরীস আ. ও ঈসা আ.। কোনো কোনো লোক বলে থাকেন : ইলিয়াস আ. ও খিযির আ. প্রতি বছর রমযান মাসে বায়তুল মুকাদ্দাসে একত্র হন। প্রতি বছর একত্রে হজ করেন এবং তাঁরা দু'জনই যমযম কুয়ার পানি এমন পরিমাণে পান করেন, পরবর্তী বছর পর্যন্ত তাঁদের জন্যে যথেষ্ট হয়ে যায়। আবার কথিত আছে, "তাঁরা দুজন প্রতি বছর আরাফাতের ময়দানে একত্র হন।" বস্তুত এগুলোর কোনোটিই শুদ্ধ নয়। বরং দলীল-প্রমাণে বোঝা যায়, খিযির আ. ও ইলিয়াস আ. ইনতিকাল করেছেন।

ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ রহ.-সহ অন্যরা বর্ণনা করেন : যখন ইলিয়াস আ.-কে তাঁর সম্প্রদায় মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করল ও তাঁকে কষ্ট দিতে লাগল, তখন তাঁর রূহ কবয করার জন্য তিনি তাঁর প্রতিপালকের কাছে দোয়া করলেন। এরপর তাঁর কাছে একটি চতুষ্পদ জন্তু আসল, যার রঙ ছিল আগুনের মতো। তিনি তার উপর সওয়ার হলেন। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে মূল্যবান নূরের পোশাক পরিধান করালেন, তাঁর পানাহারের স্বাদ তিরোহিত করলেন এবং তিনি একাধারে মানবীয়, ফেরেশতাসুলভ আসমানী ও যমীনী সত্তায় পরিণত হলেন। তিনি ইয়াসা ইবনে আখতুব আ.-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যান।

এ বর্ণনাটাও ইসরাঈলী ও সন্দেহযুক্ত। যাকে সত্য-মিথ্যা কোনোটাই বলা যায় না। অবশ্য এটার সত্যতা সুদূর পরাহত। আল্লাহ তাআলাই সম্যক পরিজ্ঞাত।

হাফেজ আবু বকর বায়হাকী রহ. আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণনা করেন : আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। আমরা একটি মনযিলে অবতরণ করলাম ও উপত্যকায় এক ব্যক্তিকে পেলাম। তিনি এ দুআ পড়ছেন :

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْحُوْمَةِ الْمَغْفُوْرَةِ الْمُتَابِ لَهَا

"হে আল্লাহ! আমাকে রহমত প্রাপ্ত, ক্ষমাপ্রাপ্ত ও তাওবা কবুলকৃত উম্মতে মুহাম্মদীর অন্তর্ভুক্ত করুন!

আনাস রাযি. বলেন, আমি উপত্যকার দিকে অগ্রসর হলাম এবং এমন এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম যার উচ্চতা ৩শ হাতের অধিক। তিনি আমাকে বললেন– তুমি কে? উত্তরে আমি বললাম, 'আমি মালিকের পুত্র আনাস, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদেম।' তিনি বললেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথায়? আমি বললাম, 'তিনি আপনার কথা শুনছেন।' তিনি বললেন, "তুমি তাঁর কাছে যাও এবং তাঁর কাছে আমার সালাম পৌঁছিয়ে দাও এবং বল, আপনার ভাই ইলিয়াস আপনাকে সালাম দিচ্ছেন।" আনাস রা .বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম ও তাঁকে এ সম্বন্ধে সংবাদ দিলাম। তিনি তাঁর কাছে এসে

তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলেন, তাঁকে আলিঙ্গন করলেন ও সালাম করলেন। এরপর দুজনে বসে কথোপকথন করতে লাগলেন। ইলিয়াস আ. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি বছরে একবার খাবার খাই। আজকে আমার সেই খাওয়ার দিন। আপনিও চলুন, একসাথে খাওয়া-দাওয়া করি। বর্ণনাকারী আনাস রাযি. বলেন, তখন আসমান থেকে দুজনের জন্যে একটি দস্তরখান অবতীর্ণ হল। তার মধ্যে ছিল রুটি, মাছ ও শাক। তাঁরা উভয়ে খেলেন ও আমাকে খেতে দিলেন। এরপর উভয়ে আসরের নামায আদায় করেন। তারপর ইলিয়াস আ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিদায় নিয়ে মেঘমালার মধ্য দিয়ে আসমানের দিকে চলে গেলেন।"

ইমাম বায়হাকী রহ. এ হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। বস্তুত এ হাদিসটি জাল এবং বিভিন্ন দিক দিয়ে অন্যান্য সহি হাদীসের পরিপন্থী। প্রথমত : এ হাদীসের বক্তব্যই শুদ্ধ নয়। কেননা বুখারী ও মুসলিমে একটি হাদীস বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আদম আ.-কে আসমানে সৃষ্টি করেছেন, যার উচ্চতা ছিল ষাট হাত। এরপর সৃষ্টিকুলের উচ্চতা হ্রাস পেতে পেতে বর্তমান আকারে এসে পৌঁছেছে। দ্বিতীয়ত : হাদিসটিতে বলা হয়েছে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসেন নি। বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাছে গিয়েছিলেন। এটাও শুদ্ধ হতে পারে না। কেননা তাঁর পক্ষে অধিক শোভনীয় ছিল, তিনি নিজেই খাতামুন নাবিয়্যিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে এগিয়ে আসবেন। তৃতীয়ত : হাদীসটিতে বলা হয়েছে, তিনি বছরে একবার পানাহার করেন। অথচ অন্যত্র ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ থেকে বর্ণিত আছে, তার থেকে আল্লাহ তাআলা পানাহারের স্বাদ রহিত করে দিয়েছিলেন।

চতুর্থত : বর্ণনাকারীদের কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন– তিনি যমযম কুয়া থেকে প্রতি বছর এমনভাবে একবার পানি পান করতেন, যা তাঁর পরবর্তী বছর পর্যন্ত যথেষ্ট হত। এরূপে হাদীসে বিভিন্ন ধরনের বিপরীতধর্মী ও বাতিল তথ্যাদি পরিবেশন করানো হয়েছে, যার কোনোটাই সঠিক নয়।

ইবনে আসাকির রহ.-ও এ হাদীসটি অন্য সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং এর সমালোচনা করেছেন। আবার তিনি নিজেই অন্য সূত্রে সবিস্তারে এটি বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে, এ ঘটনাটি তাবুক যুদ্ধের সময় ঘটেছিল। আর তার কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনাস ইবনে মালিক রাযি. ও হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাযি.-কে পাঠিয়ে ছিলেন। তারা দুজনে বলেন, তিনি ছিলেন সাধারণ মানুষের চেয়ে দুই-তিন হাত অধিক উচ্চতাসম্পন্ন এবং উটগুলি পালিয়ে যাওয়ার আশঙ্কার কারণে তিনি স্বয়ং মুলাকাত করতে অক্ষম বলে ওজর পেশ করেছিলেন। অনন্তর যখন তার সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুলাকাত করেন, তখন তাঁরা দু'জন মিলে জান্নাতী খাবার খান। তখন ইলিয়াস আ. বলেন, আমি চল্লিশ দিনে একবার এক

লোকমা খাবার খেয়ে থাকি। অন্যদিকে দস্তরখানে ছিল রুটি, ডালিম, আঙ্গুর, কলা, খেজুর, অন্যান্য শাক-সবজি। তবে তাতে পিঁয়াজ-রসুন জাতীয় ছিল না। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে খিযির আ.-এর সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় তিনি বলেন, আমার সাথে তাঁর সাক্ষাৎ করার কথা বছরের প্রথমে। তাই তিনি আমাকে বলেছেন, "তুমি আমার পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, তখন তুমি আমার পক্ষ থেকে তাঁকে সালাম দিবে।" এতে বোঝা যায়, খিযির আ. ও ইলিয়াস আ. যদি বেঁচেও থাকেন এবং এ হাদিসটি যদি শুদ্ধ হয়ে থাকে, তা হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নবম হিজরী পর্যন্ত সাক্ষাৎ করেন নি। আর এটা শরিয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। কাজেই এই হাদিসটিও জাল। এ সম্পর্কে সর্বোত্তম বর্ণনাটি হচ্ছে আবু বকর ইবনে আবীদ দুনিয়া রহ. এর। তিনি ছাবিত রহ. থেকে বর্ননা করেন : 'আমরা মুসআব ইবনে যুবায়র রহ.-এর সঙ্গে কুফার শহরতলিতে অবস্থান করছিলাম। আমি একটি বাগানে প্রবেশ করলাম। সেখানে দুই রাকাত নামায আদায় করছিলাম। আমি শুরু করলাম :

حم (١) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (٢) غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ

"হা-মীম, এ কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ তাআলার নিকট হতে। যিনি পাপ ক্ষমা করেন, তওবা কবুল করেন, যিনি শাস্তিদানে কঠোর শক্তিশালী।" (সূরা মুমিন : ১-৩)

আমার পিছনে ছিলেন এক ব্যক্তি তিনি ধূসর বর্ণের এক খচ্চরের পিঠে সওয়ার ছিলেন। তার গায়ে ছিল ইয়ামানী চাদর। তিনি আমাকে বললেন, যখন তুমি غَافِرِ الذَّنْبِ বল, তখন তুমি বলবে : يَا غَافِرَ الذَّنْبِ اِغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ -হে ক্ষমাকারী! আমার পাপ ক্ষমা করে দাও। যখন তুমি قَابِلِ التَّوْبِ বলবে, তখন তুমি বলবে : يَا قَابِلَ التَّوْبِ تَقَبَّلْ تَوْبَتِيْ -হে তওবা কবুলকারী! আমার তওবা কবুল কর। যখন তুমি شَدِيْدِ الْعِقَابِ বলবে, তখন তুমি বলবে : يَا شَدِيْدَ الْعِقَابِ لَا تُعَاقِبْنِيْ হে শাস্তিদানে কঠোর সত্তা! আমাকে শাস্তি দিও না; যখন তুমি ذِي الطَّوْلِ বলবে, তখন তুমি বলবে : يَا ذَا الطَّوْلِ تَطَوَّلْ عَلَيَّ بِرَحْمَةٍ -হে শক্তিশালী প্রভু! তুমি আমার জন্য রহমতকে বাড়িয়ে দাও। তখন আমি পিছনের দিকে তাকালাম কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না। বের হয়ে গেলাম। লোকজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, ধূসর রংয়ের খচ্চরের ওপর সওয়ার হয়ে ইয়ামানী চাদর গায়ে কেউ কি তোমাদের পাশ দিয়ে গিয়েছেন? তারা বলল, 'না আমাদের এদিক দিয়ে কেউ অতিক্রম করে নি।' তখন তারা সকলে ধারণা করলেন, তিনি ইলিয়াস আ.-ই হবেন।

সূরায়ে সাফফাতে ইরশাদ হয়েছে : فَكَذَّبُوْهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ অর্থ : 'তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করেছিল। কাজেই তাদের অবশ্যই শাস্তির জন্য উপস্থিত করা হবে।' অর্থাৎ দুনিয়া ও আখিরাতে। إِلَّا عِبَادَاللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ তবে তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনয়ন করেছে ও একনিষ্ঠ বান্দা হিসেবে গণ্য হয়েছে তারা ব্যতীত। وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِيْنَ অর্থাৎ, তার পরে জগতে পরবর্তীদের মধ্যে তাঁর সুখ্যাতি অব্যাহত রেখেছি। তারা তাঁর সুনামই করে থাকে। এরপর তাই আল্লাহ তাআলা বলেন : سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِيْنَ অর্থাৎ ইলিয়াস আ.-এর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। (সূরা সাফফাত : ১২৭-১৩০)

আরবগণ অধিকাংশ নামের সাথে নূনকে যুক্ত করে এবং শেষ অক্ষরকে পরিবর্তন করে পাঠ করে। যেমন তারা إِسْمَاعِيْل শব্দটিকে إِسْمَاعِيْن এবং إِلْيَاس শব্দটিকে إِلْيَاسِيْن ইত্যাদি রূপে পাঠ করেন। আর যারা سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِيْن পড়ে থাকেন, তাদের উদ্দিষ্ট থাকে, শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার পরিজনের প্রতি।

ইবনে মাসউদ রাযি. ও অন্যরা পাঠ করেন : سَلَامٌ عَلَى إِدْرِيْس ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, إِلْيَاس হচ্ছেন– إِدْرِيْس (আ.)। এটি যাহ্হাক, কাতাদা ও মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক রহ.-এর অভিমত। তবে বিশুদ্ধ মতামত হচ্ছে إِدْرِيْس ও إِلْيَاس ভিন্ন ভিন্ন দুজন নবী। যেমন পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলাই সম্যক জ্ঞাত।

মোটকথা, কুরআন মাজিদে হযরত ইলিয়াস আ.-এর উল্লেখ দু জায়গায় এসেছে। সূরায়ে আনআমের ৮৫ নং আয়াতে শুধু আম্বিয়ায়ে কেরামের তালিকায় তাঁর নাম গণনা করা হয়েছে। আর সূরা আস সাফফাতে ১৩১ ও ১৪৩ নং আয়াতদ্বয়ে নবুয়তপ্রাপ্তি এবং কওমের হেদায়েত সংক্রান্ত অবস্থাবলী সংক্ষিপ্তরূপে বর্ণিত হয়েছে। হযরত ইলিয়াস আ.-এর নবুয়তপ্রাপ্তি সম্বন্ধে তাফসিরকারক ও ঐতিহাসিকগণ একমত, তিনি শামদেশের অধিবাসীদের হেদায়তের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন এবং বিখ্যাত 'বা'আলবাক্কা' শহর তাঁর হেদায়তের কেন্দ্রভূমি ছিল। হযরত ইলিয়াস আ.-এর কওম কুখ্যাত মূর্তি 'বা'আলের' পূজারী ছিল এবং একত্ববাদ হতে বিমুখ হয়ে অংশীবাদে লিপ্ত ছিল। আল্লাহ তাআলার নির্বাচিত পয়গম্বর তাদেরকে বুঝালেন এবং হেদায়তের পথ দেখালেন, মূর্তিপূজা ও নক্ষত্রপূজার বিরুদ্ধে ওয়ায-নসিহত করে খাঁটি একত্ববাদের দাওয়াত প্রদান করলেন।

'বাআল' দেবতা

'বাআল' মূর্তিটি পূর্বাঞ্চলে বসবাসকারী সামী কওমসমূহের কুখ্যাত এবং সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয় দেবতা ছিল। এ মূর্তিটি ছিল নর। একে যোহাল ও মুশতারী নামক নারী নক্ষত্র দেবীর স্বামী বলে মনে করা হত। ফাইনাক্কী, কেনানী, মুআবী ও মাদায়েনী গোত্রগুলি বিশেষভাবে এর পূজা করত। সুতরাং 'বাআলের' পূজা প্রাচীনকাল হতে চলে

আসছিল, আর মুআবী ও মাদায়েনীরা একে হযরত মূসা আ.-এর যামানা হতে পূজা করে আসতে ছিল। শাম দেশের বিখ্যাত শহর বাআলাবাক্কাও এ দেবতার নামের সাথেই সম্পর্কিত। আর হযরত শুআইব আ. মাদায়েনে এ বাআলের পূজকদেরই হেদায়েতের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিকদের মতে হেজাযের বিখ্যাত দেবতা 'হুবুল্'ও এ বাআলই বটে। বাআল দেবতার মাহাত্ম্যের অবস্থা ছিল, সে বিভিন্ন প্রকার মুরব্বীসুলভ দান ও বদান্যতার কারণে বিভিন্ন নামে অভিহিত ছিল। যেমন, সামের বংশধর কওমগুলির বা'আল পূজার উল্লেখ করে তাওরাতে বাআলকে বাআলে বারীস এবং বাআলে ফাগূর নামেও উল্লেখ করা হয়েছে। আর আক্করোনীদের সেখানে 'বাআল্যাবুব'-এর বর্ধিতরূপ পাওয়া যায়। কালদানীদের সেখানে ب অক্ষরে যের দিয়া 'বে'এল' বলা হয়। আর তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বেএল এবং বেলুস কিংবা বাআল এবং বা'লুসও বলে থাকে।

ইহুদি বা পূর্বাঞ্চলের ইসরাঈলীদের সেখানে বাআলের পূজার জন্য বিভিন্ন মৌসুমে বিরাট মজলিস অনুষ্ঠিত হত এবং এর জন্য বড় এবাদতখানা এবং কুরবানির স্থান নির্মাণ করা হত। আর শ্রেষ্ঠ ইহুদি জ্যোতিষ পণ্ডিতরা এর ওপর সুগন্ধ দ্রব্যাদির ধোঁয়া দিত এবং নানা প্রকার সুগন্ধ দ্রব্য ছিটাত। কোনো কোনো সময় তার সম্মুখে মানুষও বলি দেওয়া হত।

তাফসিরের কিতাবসমূহে বর্ণিত আছে : 'বাআল' মূর্তিটি ছিল স্বর্ণ নির্মিত, বিশ গজ লম্বা এবং এর চারটা মুখ ছিল। তার সেবার জন্য নিযুক্ত ছিল চারশ সেবক। হযরত ইলিয়াস আ.-এর যামানায়ও ইয়ামন এবং শাম দেশে এ মূর্তিটি প্রিয় দেবতা ছিল। আর হযরত ইলিয়াসের কওম অন্যান্য মূর্তির সাথে এই মূর্তিটিরও বিশেষভাবে পূজা করত।

সূরা আনআমে যে সমস্ত আয়াতে হযরত ইলিয়াস আ.-এর আলোচনা এসেছে, তা হযরত ইবরাহীম আ.-এর সন্তান এবং তাঁদের বংশধরদের মধ্যকার আম্বিয়া ও রাসূলগণের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা মাত্র। আল্লাহ্ পাক বলেন :

كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (٨٤) وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ (٨٥) وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ

"আমি (তাদের মধ্য হতে) প্রত্যেককে হেদায়েত দান করেছি। আর নূহকে হেদায়েত দান করেছি তাদের পূর্বে। আর ইবরাহীমের বংশধরদের মধ্য হতে দাউদ, সুলাইমান, আইয়ুব, ইউসুফ, মূসা ও হারূনকেও এ পথই প্রদর্শন করেছি। আর আমি এরূপে নেককারদেরকে নেকির বিনিময় প্রদান করে থাকি। আর যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা ও ইলিয়াসকেও। এরা সকলেই নেককার লোকদের মধ্য হতে ছিলেন। আর ইসমাঈল, আলইয়াসা, ইউনুস ও লূতকেও। এ সমস্ত লোককে আমি দুনিয়াবাসীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম।"

কুরআন মাজিদ এ তালিকায় আম্বিয়া আ.-কে, তিনটি পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত করেছে, এর হেকমত কি? 'মানার' কিতাবের রচয়িতা এর যে কারণ বিশ্লেষণ করেছেন, তাই সর্বোত্তম। তার সারমর্ম হল :

বনি ইসরাঈল বংশীয় নবীগণ বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে তিন ভাগে বিভক্ত ছিলেন। তাঁদের কতক ছিলেন যাঁরা রাজসিংহাসন, রাজমুকুট ও শাসন সংরক্ষণের কিংবা মন্ত্রিত্ব ও নেতৃত্বের অধিকারী। কতক আম্বিয়া আ.-এর জীবনধারা এর বিপরীতে সংসারের সাথে সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্ক ছিল। ধন-সম্পদ এর সংস্রব হতে তাঁরা একেবারে দূরে ছিলেন। ফকির ও নিঃস্বরূপে জীবন যাপন করতেন। আবার একেবারে খাঁটি সংসারবিরাগীরূপেও জীবন যাপন করতেন না বরং একদিকে কওমের হেদায়েতকারী পয়গম্বর ছিলেন, অপরদিকে মধ্যম প্রকারের জীবন যাপন করতেন।

সুতরাং কুরআন মাজিদ এ সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামের উল্লেখ করার সময় তাঁদের নবুয়তপ্রাপ্তির যামানা এবং অন্যান্য কতিপয় বৈশিষ্ট্যের সামঞ্জস্যের প্রতি লক্ষ্য না করে শুধু উল্লিখিত দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁদেরকে তিন দলে বিভক্ত করে দিয়েছে। আবার মর্যাদার পর্যায়ক্রম হিসাবে সেই পর্যায়ক্রমিকরূপে উল্লেখ করাকেও জরুরি মনে করেছে। অর্থাৎ প্রথম তালিকায় প্রথমে হযরত দাউদ ও সুলাইমান আ.-এর উল্লেখ করেছে, যারা নবী এবং রাসূল হওয়া ছাড়া রাজত্বের অধিকারীও ছিলেন। এরপর হযরত আইয়ুব ও হযরত ইউসুফ আ.-এর উল্লেখ করেছে, যাঁরা বিশাল রাজত্বের অধিকারী ছিলেন না। তবে হযরত আইয়ুব আ. ক্ষুদ্র এক রাজ্যের মালিক ছিলেন এবং হযরত ইউসুফ আ. মিসর রাজ্যের উযির এবং প্রধান নির্বাহী ছিলেন।

এরপর হযরত মূসা ও হারূন আ.-এর নাম এসেছে, এঁরা বিশাল রাজ্যের অধিপতিও ছিলেন না, ক্ষুদ্র রাজ্যের না। কিংবা কোনো রাজ্যের উযিরও ছিলেন না বা সার্বিক ক্ষমতার অধিকারীও ছিলেন না, বরং নিজ কওমের রাসূল ও পয়গম্বর ছিলেন এবং তাদের নেতাও ছিলেন। আর দ্বিতীয় তালিকায় ওই সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামের উল্লেখ হয়েছে, যাঁরা সারা জীবন সংসারবিরাগী অবস্থায় কাটিয়েছেন। তাঁরা বাস করার জন্য গৃহও নির্মাণ করেন নি। পানাহারের সামগ্রীও সঞ্চয় করেন নি। সারা দিন সত্যের প্রচারে মশগুল থাকতেন এবং রাত্রিকালে আল্লাহ তাআলার যিকির-আযকারের পরে যেখানে স্থান মিলত, মাথার নিচে হাত রেখে ঘুমিয়ে পড়তেন। দুনিয়া ও সংসারবিরাগী এ সকল নবী হলেন : হযরত ইয়াহইয়া, হযরত যাকারিয়া, হযরত ঈসা ও হযরত ইলিয়াস আ. ছিলেন। এরপর এ শ্রেণীর আম্বিয়ায়ে কেরামের উল্লেখ হয়েছে, যাঁরা রাজত্ব করেন নি এবং পূর্ণ সংসারবিরাগীও ছিলেন না; বরং মধ্যম প্রকারের জীবন যাপন করে সত্যের প্রচার এবং কওমের নেতৃত্বের কর্তব্য পালন করেছেন। যেমন হযরত ইসমাঈল, আলইয়াসা, ইউনুস এবং লূত আ.।

উপদেশ

হযরত ইলিয়াস আ. এবং তাঁর কওমের ঘটনা যদিও কুরআন মাজিদে খুব সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে, তথাপি এতে শিক্ষণীয় ব্যাপার হল, বনি-ইসরাঈল বংশীয় ইহুদিদের মনোবৃত্তি এ পর্যায়ে বিকৃত হয়ে গিয়েছিল– দুনিয়ার মধ্যে এমন কোনো মন্দকাজ ছিল না, যা করার জন্য এরা লালায়িত ছিল না। এবং কোনো ভালো কাজ ছিল না, যার প্রতি তারা আকৃষ্ট হত। আর নবী ও রাসূলদের এক সুদীর্ঘ ও অবিরত ধারা সত্ত্বেও মূর্তিপূজা এবং জড়পদার্থের পূজা, নক্ষত্রপূজা মোটকথা, গায়রুল্লাহর পূজার কোনো শাখাই এমন ছিল না, যার পূজারী এরা হয় নি। অতএব, কুরআন মাজিদে বনি ইসরাঈল সম্পর্কিত যে সমস্ত ঘটনায় তাদের দুর্ভাগ্য এবং বক্রগতির উপর আলোকপাত হয়, সেখানেই আমাদের এ উপদেশ ও নসিহত লাভ হয়। এখন যেহেতু আম্বিয়ায়ে কেরাম ও রাসূলদের ধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং খাতামুন নাবিয়্যিন-এর আবির্ভাব এবং কুরআন মাজিদের সর্বশেষ পয়গাম এ আম্বিয়ায়ে কেরামের ধারাকে খতম করে দিয়েছে, তাই আমাদের জন্য একান্ত কর্তব্য হল, বনি ইসরাঈলের বিকৃত স্বভাব-প্রকৃতি ও বিধ্বস্ত মনোবৃত্তির বিপরীত আল্লাহ পাকের বিধানসমূহকে দৃঢ়তার সঙ্গে ধারণ করা এবং তাতে বক্রগতি ও বক্র স্বভাবের আশ্রয় নিয়ে ওই সমস্ত আহকামে ইলাহি অমান্য করার দুঃসাহস না করা। মোটকথা, আমাদের স্বভাব যেন হয়, খোদায়ী বিধানের সম্মুখে আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য; অবিশ্বাস ও বিমুখতা নয়। ইসলামের অর্থ শুধু এটাই।

হযরত আল-ইয়াসা আ.

নাম ও বংশ পরিচয়

ওয়াহহাব ইবনে মুনাব্বিহ রহ.-এর ইসরাঈলী রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত আছে : তাঁর নাম আলইয়াসা; তিনি খাতুবের পুত্র। ইবনে ইসহাক রহ.ও এ মত পোষণ করেছেন। ইতিহাসের গ্রন্থসমূহে আরো উল্লেখ আছে, হযরত আলইয়াসা ছিলেন হযরত ইলিয়াস আ.-এর চাচাত ভাই। ইবনে আসাকির তাঁর রচিত ইতিহাসগ্রন্থে হযরত আল-ইয়াসা আ.-এর বংশ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, হযরত আলইয়াসা আ. হযরত ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব আ.-এর বংশধর।

তাঁর বংশপরিচয় হল, আলইয়াসা ইবনে আদী ইবনে শোতাম ইবনে আফরাঈম ইবনে ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম আ.। যদি তাওরাতের ইয়াসইয়া নবী এবং আলইয়াসা' একই ব্যক্তি হন, তবে তাওরাত তাঁর পিতার নাম 'আমুছ' বলা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, তিনি ছিলেন হযরত ইলিয়াস আ.-এর চাচাত ভাই।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক রহ. বলেছেন, আল-ইয়াসা ছিলেন আখতূবের পুত্র। কিন্তু হাফেজ আবুল কাসিম ইবনে আসাকির তাঁর বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থে 'ইয়া' হরফের অধীনে লিখেছেন, আল-ইয়াসর নাম আসবাত এবং পিতার নাম আদী।

নবুয়ত লাভ

হযরত আলইয়াসা আ. ছিলেন হযরত ইলিয়াস আ.-এর স্থলবর্তী ও প্রতিনিধি। তিনি প্রথম জীবনে তাঁরই সাহচর্যে থাকতেন। তাঁর ইনতেকালের পর আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাঈলদের হেদায়েতের জন্য হযরত আলইয়াসা আ.-কে নবুয়তের সম্মানে সম্মানিত করেন। তিনি হযরত ইলিয়াস আ.-এর তরীকা অনুযায়ী বনি ইসরাঈলকে হেদায়েত করেন। হযরত আলইয়াসা আ.-এর বয়স কত হয়েছিল এবং তিনি কতকাল বনি ইসরাঈলদের মধ্যে তাবলীগে দীনের হক আদায় করেছিলেন, তা জানা যায় নি।

পবিত্র কুরআনে হযরত আল-ইয়াসা আ.

কুরআন মাজিদ তাঁর অবস্থাবলী সম্বন্ধে অধিক আলোকপাত করে নি। সূরা 'আনআম' ও সূরা' ছোয়াদ'-এর মধ্যে কেবল তাঁর নামই উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন সূরা আনআমে বলা হয়েছে :

وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ

"আরও সৎ পথে পরিচালিত করেছিলাম ইসমাঈল, আল-ইয়াসা, ইউনুস ও লূতকে; এবং শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম বিশ্ব জগতের উপর প্রত্যেককে। (আনআম : ৮৬)

তদ্রূপ সূরা ছোয়াদে বলা হয়েছে :

وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ

স্মরণ কর! ইসমাঈল, আল-ইয়াসা ও যুল-কিফলের কথা, এরা প্রত্যেকেই ছিল সজ্জন। (৩৮ ছোয়াদ : ৪৮)

ইসহাক ইবনে বিশর আবু হুযাইফা ... হাসান রাযি. সূত্রে বর্ণনা করেন, ইলিয়াস আ.-এর পরে আল-ইয়াসা ছিলেন বনি ইসরাঈলের নবী। তিনি আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী নির্ধাতির সময় পর্যন্ত তাদের মধ্যে অবস্থান করেন। বনি ইসরাঈলকে তিনি আল্লাহর আনুগত্য করার ও ইলিয়াস আ.-এর শরিয়তের অনুবর্তী হওয়ার আহবান জানান। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব পালন করে যান। তাঁর ইনতেকালের পর বনি ইসরাঈলের বহু প্রজন্ম এ পৃথিবীতে আগমন করে। তাদের মধ্যে ব্যাপকহারে বিভিন্ন প্রকার বেদয়াত ও পাপাচার সংক্রামক ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়ে। এ সময়ে বহু অত্যাচারী বাদশার আবির্ভাব ঘটে। তারা আল্লাহর নবীগণকে নির্বিচারের হত্যা করে। এদের মধ্যে একজন ছিল অত্যন্ত অহংকারী ও সীমালঙ্ঘনকারী। কথিত আছে, হযরত যুল-কিফল আ. এ অহংকারী বাদশা সম্পর্কে বলেছিলেন, সে যদি তওবা করে ও অন্যায় কাজ ত্যাগ করে, তবে আমি তার জান্নাতের যিম্মাদার। এ কারণেই তিনি যুল-কিফল বা যিম্মাদার অভিধায় অভিহিত হন।

কথিত আছে, হযরত আল-ইয়াসা হযরত ইলিয়াসের সঙ্গে কাসিয়ূন নামক পর্বতে বা'লা-বাক্কা বাদশার ভয়ে আত্মগোপন করেছিলেন। পরে উভয়ে সেখান থেকে আপন সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যাবর্তন করেন। এরপর ইলিয়াস আ. ইনতেকাল করলে আল-ইয়াসা তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন এবং আল্লাহ তাঁকে নবুয়ত দান করেন। অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ বলেছেন, তিনি বানিয়াসে বসবাস করতেন। ইবনে আসাকির 'আল-ইয়াসা' শব্দের বানান সম্পর্কে লিখেছেন, এ শব্দটি তিন প্রকারে উচ্চারিত হয়ে থাকে যথা : আলইয়াসা (اليسع) আল-য়াস'(اليسع) এবং আল-লায়াসা'আ (الليسع)। এ হচ্ছে এক নবীর নামের বিভিন্নরূপ। আবার কথিত আছে, তিনি ছিলেন হযরত আইয়ুব আ.-এর পুত্র।

উপদেশ

বনি ইসরাঈল বংশের যে সমস্ত পয়গম্বর ও আম্বিয়ায়ে কেরামের ঘটনাবলী হতে যাঁরা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের সংসর্গ, খাঁটি অনুসরণ ও আনুগত্যের ফলে খেলাফত লাভ করার পর নবুয়তের পদ লাভ করেছেন, তাতে প্রমাণিত হয়, নেককারদের সংসর্গ মঙ্গল লাভের জন্য মহৌষধস্বরূপ। মাওলানা রুমী সত্যই বলেছেন :

ایک زمانہ صحبت با اولیاء + بہتر ست صد سال طاعت بے ریاء

বুযুর্গদের সঙ্গে তোমার মুহূর্তকালের সংসর্গ

একশ বছরের অকপট এবাদতের চেয়ে উত্তম!

হাজার হাজার বছর পর্যন্ত অবিরত রিয়াযত ও এবাদত করতে থাকলেও যদি কোনো কামেল ব্যক্তির সোহবত হতে বঞ্চিত থাকে, তবে নিঃসন্দেহ তা বিরাট অপূর্ণতা, যার পূরণ শুধু কামেল ব্যক্তির সংসর্গ দ্বারাই হতে পারে।

ইবনে জারীর ও অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ বলেন, উপর্যুক্ত ঘটনার পর বনি-ইসরাঈলের মধ্যে অনেক গুরুতর ঘটনা ঘটে এবং অপরাধ সংঘটিত হয়। এমনকি বহু নবীকে তারা হত্যা করে। আল্লাহ তখন নবীগণের পরিবর্তে অত্যাচারী রাজা-বাদশাদেরকে তাদের উপর চাপিয়ে দেন। যারা তাদের ওপর অত্যাচারের পাহাড় চাপিয়ে দেয়। এবং নির্বিচারে তাদেরকে হত্যা করে। এ ছাড়া আল্লাহ তাদেরকে শত্রুদের দ্বারা পদানত করে দেন। ইতোপূর্বে বনি ইসরাঈল যখন কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হত, তখন তাদের ঐতিহাসিক সিন্দুকটি (তাবূত) কাছে রাখত এবং যুদ্ধের ময়দানে একটি তাঁবুর মধ্যে তা' সংরক্ষণ করত। ওই সিন্দুকের বরকতে আল্লাহ তাদেরকে বিজয় দান করতেন। এ ছিল তাদের সেই পবিত্র সিন্দুক, যাতে ছিল হযরত মূসা ও হারূন আ.-এর উত্তরসূরীদের পরিত্যক্ত বরকতময় সম্পদ ও শান্তিদায়ক বস্তুসমূহ। কিন্তু বনি ইসরাঈলের এ বিপর্যয়কালে গাজা ও 'আসকালান এলাকার অধিবাসীদের সাথে তাদের এক যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে বনি ইসরাঈলরা পরাজয় বরণ করে। শত্রুরা বনি ইসরাঈলদের পরাজিত করে তাদের থেকে সিন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

বনি ইসরাঈলের তৎকালীন বাদশার নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে তার ঘাড় বেঁকে যায়। দুঃখে-ক্ষোভে সে মৃত্যুবরণ করেন। এ সময় বনি ইসরাঈলের অবস্থা দাঁড়ায় রাখালবিহীন মেষপালকের মতো। বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত হয়ে তারা যাযাবরের মতো জীবন কাটাতে থাকে। দীর্ঘদিন এ অবস্থায় থাকার পর আল্লাহ তাআলা হযরত শামুয়েল নবীকে তাদের মধ্যে প্রেরণ করেন।

ইবনে জারীর বলেন, ইউশা ইবনে নূন আ.-এর ইনতেকালের ৪৬০ বছর পর আল্লাহ তাআলা হযরত শামুয়েল ইবনে বালীকে নবীরূপে প্রেরণ করেন।

হযরত শামুয়েল আ.

বনি ইসরাঈলের অতীত

হযরত ইউশা আ.-এর যমানায় বনি ইসরাঈলরা যখন ফিলিস্তিন ভূমিতে প্রবেশ করল, তখন তারা আল্লাহ তাআলার আদেশে ফিলিস্তিনকে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নিল। যেন তারা নিরাপদে ও শান্তিতে বসবাস করতে পারে এবং সত্য ধর্মের উন্নতির জন্য কর্মরত থাকতে পারে। তাওরাত ইয়াশূ ২৩ অধ্যায়ে এই ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত রয়েছে।

হযরত ইউশা আ. শেষ জীবন পর্যন্ত তাদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং অবস্থার সংশোধন কার্যে মশগুল ছিলেন। তাদের যাবতীয় ব্যাপারের এবং পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসার জন্য বহু কাজী নিযুক্ত করেছিলেন, যেন তারা ভবিষ্যতেও এরূপেই নিজেদের শৃঙ্খলা কায়েম রাখে।

হযরত মূসা আ.-এর ইনতেকালের পর প্রায় সাড়ে ৩শ বছর পর্যন্ত শৃঙ্খলা এরূপেই কায়েম ছিল। খান্দান ও গোত্রগুলির মধ্যে সর্দাররা শাসন করত। তাদের বিচার বিধান ও পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসার কাজ সমাধা করতেন কাজীগণ। আর ওই সমস্ত ব্যাপার পরিদর্শন করার সাথে সাথে ধর্মের প্রতি আহবান এবং ধর্মের প্রচার-প্রসারের কর্তব্য পালন করতেন নবী। কোনো কোনো সময় আল্লাহ পাকের অনুগ্রহে এ কাজীদের মধ্য হতেই কোনো কাজীকে নবুয়ত প্রদান করা হত। আর এ সময়গুলিতে বনি ইসরাঈলদের কোনো বাদশা কিংবা গোটা কওমের উপর কোনো শাসকও ছিল না। এ কারণে প্রতিবেশী কওমগুলি অধিকাংশ সময়ে তাদের উপর আক্রমণ করে বসত। কোনো সময় আমালেকা সম্প্রদায় আক্রমণ করত। কোনো সময় ফিলিস্তীনবাসীরা, কোনো সময় মাদায়েনবাসীরা, আবার কোনো সময় আরামীরা আক্রমণ করত। এ সব আক্রমণে যদি আক্রমণকারীদের পরাজয়ও ঘটত, তবুও পরবর্তীকালে তারা এদের উপর নৈশআক্রমণ চালিয়ে লুটতরাজ করতে থাকত। এ ধারা চলছিল। তাতে কখনও বনি ইসরাঈল জয়লাভ করত আবার কখনও আক্রমণকারীরা জয়লাভ করত।

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষের দিকে 'আইলী কাহেনের' যমানায় 'আশদুদ' এবং হাওয়ালী গাযযার ফিলিস্তিনি কওম বনি ইসরাঈলদের উপর এক প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে পরাজিত করে তাদের পবিত্র 'তাবূতে সাকীনা' নামক সিন্দুকটিও কেড়ে নিয়ে যায়। এ সিন্দুকটির ভিতরে তাওরাতের মূলকপি, হযরত মূসা আ.-এর লাঠি, হযরত হারূন আ.-এর জামা আর মান্ন-এর পাত্র রক্ষিত ছিল। ফিলিস্তিনিরা একে তাদের বিখ্যাত মন্দির 'বাইতে দাজুনে' রেখেছিল। মন্দিরটি তাদের প্রধান দেবতা দাজুনের নামে নামকৃত ছিল। দাজুনের দেহটি মানুষের চেহারা এবং মাছের দেহ দ্বারা সংযুক্ত করে নির্মাণ করা হয়েছিল। তা এই মন্দিরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। হযরত নাজ্জার মিসরী 'কাছাছুল আম্বিয়া' কিতাবে বলেন, ফিলিস্তিনের বিখ্যাত 'রামলাহ' নামক স্থানের নিকটে

আজও একটি বস্তি 'বাইতে দাজুন' নামে পাওয়া যায়। প্রবল ধারণা মতে তাওরাতে দাজুনের যেই মন্দিরটির উল্লেখ আছে, তা এ স্থানেই হবে। আর এ সামঞ্জস্যেই বস্তিটির নামও 'বাইতে দাজুন' রাখা হয়েছে।

শামুয়েল আ.-এর বংশধারা

শামুয়েল বা ইশমুঈল ইবনে বালী ইবনে আলকামা ইবনে ইবনে আল ইয়াহু ইবনে তাহূ ইবনে সূফ ইবনে 'আলকামা ইবনে মাহিছ ইবনে 'আমূসা ইবনে 'আযরুবা। মুকাতিল রহ. বলেছেন, তিনি ছিলেন হারূন আ.-এর বংশধর। মুজাহিদ রহ. বলেছেন, তাঁর নাম ছিল ইশমুঈল ইবনে হালফাকা। তার পূর্ববর্তী বংশ তালিকা তিনি উল্লেখ করেন নি। সুদ্দী ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ রাযি. প্রমুখ সাহাবী থেকে এবং ছালাবী ও অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ এ প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন, গাজা ও 'আসকালান এলাকার অধিবাসী আমালিকা সম্প্রদায় বনি ইসরাঈলের উপর বিজয় লাভ করে। এরা তাদের অসংখ্য লোককে হত্যা করে এবং বিপুল সংখ্যক লোককে বন্দী করে নিয়ে যায়। তারপর লাবী বংশের মধ্যে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত নবী প্রেরণ বন্ধ থাকে। এ সময়ে তাদের মধ্যে মাত্র একজন মহিলা গর্ভবতী ছিল।

সে আল্লাহর নিকট একজন পুত্র সন্তানের জন্য দোয়া করে। আল্লাহ তার দোয়া কবুল করেন এবং একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। মহিলা তার নাম রাখেন ইশমুঈল। ইবরানী বা হিব্রু ভাষায় ইশমুঈল ইসমাঈল শব্দের সমার্থক। যার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ আমার প্রার্থনা কবুল করেছেন। পুত্রটি বড় হলে তিনি তাঁকে মসজিদে (বায়তুল মুকাদ্দাসে) অবস্থানকারী একজন পুণ্যবান বান্দার দায়িত্বে অর্পণ করেন। উদ্দেশ্য ছিল যাতে তার পুত্র ঐ পুণ্যবান বান্দার সাহচর্যে থেকে তাঁর চারিত্রিক গুণাবলী ও ইবাদত-বন্দেগী থেকে সুশিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন। ছেলেটি মসজিদেই অবস্থান করতে থাকেন।

যখন তিনি পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হন তখনকার একটি ঘটনা হচ্ছে এই, একদিন রাত্রিবেলা তিনি মসজিদের এক কোণে ঘুমিয়ে ছিলেন। হঠাৎ মসজিদের পার্শ্ব থেকে একটি শব্দ তাঁর কানে আসে। তখন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তিনি জেগে উঠেন। তার ধারণা হয়, তাঁর শায়খই তাঁকে ডেকেছেন। তাই তিনি শায়খকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি আমাকে ডেকেছেন? তিনি ভয় পেতে পারেন এই আশঙ্কায় শায়খ তাঁকে সরাসরি কোনো উত্তর দিলেন না। তিনি শুধু বললেন, হ্যাঁ, ঘুমিয়ে পড়। তখন তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। দ্বিতীয়বার অনুরূপ ঘটনা ঘটল। তারপর তৃতীয়বারও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল। তিনি দেখতে পেলেন, স্বয়ং জিবরাইল আ.-ই তাঁকে ডাকছেন। জিবরাইল আ. তাঁকে জানালেন, আল্লাহ আপনাকে আপনার সম্প্রদায়ের প্রতি নবীরূপে প্রেরণ করেছেন।

ঐতিহাসিকগণ বলেন, এক দীর্ঘকাল পর্যন্ত বনি ইসরাঈলদের নবুতের পদ 'লাদীর' বংশধরদের মধ্যে এবং শাসনক্ষমতা ও নেতৃত্ব 'ইয়াহূদার' বংশধরদের মধ্যে চলে আসছিল। এখন যেহেতু শামুয়েল আ.-এর কথা অনুযায়ী এই মর্যাদা বিনইয়ামিনের

বংশের দিকে চলে যাচ্ছে, কাজেই বনি ইসরাঈলদের সেই সর্দারদের মনে হিংসার উৎপত্তি হল। তারা এটা বরদাশত করতে পারছিল না।

প্রথমে কোনো বিষয় মেনে ও স্বীকার করে নেওয়া এবং যথাসময়ে তা অমান্য ও অস্বীকার করার এই ঢং বনি ইসরাঈলদের জীবনের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অতএব, সেই ঢং এখানেও কার্যকরীই রইল। কেননা, তারা এরূপ মনে করে বসেছিল, শামুয়েল আ. -এর নির্বাচনী দৃষ্টি আমাদের মধ্য হতে কারও উপর পতিত হবে। সুতরাং তারা যখন আশার বিপরীত বেনয়ামীনের খান্দান হতে একজন দরিদ্র, কিন্তু শক্তিশালী ও আলেম লোককে বাদশার পদে অধিষ্ঠিত দেখল, তখন তাদের হিংসার আগুন জ্বলে উঠল এবং তারা বাদ-প্রতিবাদ আরম্ভ করে দিল। হযরত শামুয়েল আ. বনি ইসরাঈলদের এ সমস্ত তর্ককারী ও খুঁত অনুসন্ধানী সর্দারদের খুঁত অনুসন্ধানের উত্তরে বললেন :

"আমি পূর্বেই জানতাম, তোমাদের নীচতা ও কাপুরুষতা তোমাদের সাময়িক উত্তেজনা ও উদ্যমকে কখনও স্থায়ী এবং দৃঢ় থাকতে দিবে না। সময় আসলে তোমাদের এই উত্তেজনা বরফের মতো শীতল হয়ে যাবে। এই জন্যই তোমরা টালবাহানা আরম্ভ করেছ। তোমাদের জানা উচিত, শাসনক্ষমতা পরিচালনার জন্য তোমরা যেই মাপকাঠি মনে করে নিয়েছ– অর্থাৎ, প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারী হওয়া। বাস্তবে এটা একেবারে ভুল ধারণা। আল্লাহ পাকের সমীপে শাসকের ব্যক্তিগত গুণাবলীর মধ্যে প্রজ্ঞা এবং দৈহিক শক্তিই বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য। কেননা, এই দুইটি গুণই সুষ্ঠ পরিচালনা, সঠিক চিন্তা এবং সৎসাহস ও বীরত্বের যিম্মাদার। আর এই দুইটি গুণে তালূত (সাউল) তোমাদের সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও বিশিষ্ট। কোরআন মাজিদের নিম্নোক্ত আয়াতগুলো ন্যায়ানুগ সাক্ষী :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (٢٤٦) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"তুমি কি মূসার পরবর্তী বনি ইসরাঈলদের প্রধানদেরকে দেখ নি? তারা যখন তাদের নবীকে বলেছিল, আমাদের জন্যে এক রাজা নিযুক্ত কর, যাতে আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে পারি; সে বলল, এমন তো হবে না, তোমাদের প্রতি যুদ্ধের বিধান দেওয়া হলে তখন আর তোমরা যুদ্ধ করবে না? তারা বলল, আমরা যখন নিজেদের

আবাসভূমি ও সন্তান-সন্ততি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছি, তখন আল্লাহর পথে কেন যুদ্ধ করব না? তারপর যখন তাদের প্রতি যুদ্ধের বিধান দেওয়া হল, তখন তাদের অল্পসংখ্যক ব্যতীত সকলেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল এবং আল্লাহ জালিমদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং তাদের নবী তাদেরকে বলেছিল, আল্লাহ তালূতকে তোমাদের রাজা করেছেন; তারা বলল, "আমাদের উপর তার রাজত্ব কিরূপে হবে, যখন আমরা তার অপেক্ষা কর্তৃত্বের অধিক হকদার এবং তাকে প্রচুর ঐশ্বর্য দেওয়া হয় নি!" নবী বলল, "আল্লাহ অবশ্যই তাকে তোমাদের জন্যে মনোনীত করেছেন এবং তিনি তাকে জ্ঞানে ও দেহে সমৃদ্ধ করেছেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছে তাঁর রাজত্ব দান করেন আল্লাহ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়।" এ আয়াতগুলিতে যেই নবীর উল্লেখ করা হয়েছে– তিনি হযরত শামুয়েল আ.।

তাবুতে সাকীনাহ

বনি ইসরাঈলের এই বাদ-প্রতিবাদ এত দীর্ঘসূত্রতার রূপ ধারণ করল, তারা বলতে লাগল, যদি তালূতের নিযুক্তি আল্লাহ তাআলার তরফ থেকেই হয়ে থাকে, তবে এর জন্য আল্লাহ তাআলার কোনো নিদর্শন প্রদর্শন করুন। হযরত শামুয়েল আ. বললেন, যদি আল্লাহ তাআলার এই মীমাংসার সত্যায়নই তোমাদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তবে প্রমাণ পূর্ণায়নের জন্য তোমাদেরকে তা জানানো হচ্ছে। তাক হলো, যেই পবিত্র সিন্দুক (তাবুতে সাকীনাহ) তোমাদের হস্তচ্যুত হয়েছে এবং যাতে হযরত মূসা আ.-এর লাঠি এবং তাওরাত আর হযরত হারুন আ.-এর মুবারক বস্তুসমূহ রক্ষিত রয়েছে, তা তালূতের বদৌলতে তোমাদের নিকট ফিরে আসবে এবং আল্লাহ তাআলার হেকমতে ব্যাপারটি এরূপ হবে, তোমাদের চোখের সম্মুখেই ফেরেশতাগণ তা বহন করে নিয়ে আসবেন। এবং পুনরায় এটি তোমাদের অধিকারে চলে আসবে। এই ঘটনাটিকে কোরআন মাজিদ নিম্নরূপে বর্ণনা করছে :

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

আর তাদের নবী তাদের বলেছিল, তাঁর রাজত্বের নিদর্শন এই, তোমাদের নিকট সেই তাবূত আসবে, যাতে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে চিত্ত প্রশান্তি এবং মূসা ও হারুন বংশীয়গণ যা রেখে গিয়েছে, তার অবশিষ্টাংশ থাকবে; ফিরিশতাগণ তা বহন করে আনবেন। তোমরা যদি মুমিন হও তবে অবশ্যই তোমাদের জন্যে এতে নিদর্শন আছে।

হযরত শামুয়েল আ.-এর এই শুভ সংবাদ অবশেষে বাস্তবে পরিণত হল। বনি ইসরাঈলদের উপস্থিতিতে আল্লাহর ফেরেশতারা তাবুতে সাকীনা এনে তালূতের সম্মুখে স্থাপন করলেন। এরূপে তারা বুঝতে পারল, যদি তারা হযরত শামুয়েল আ.-এর এই

এলহামী মীমাংসা কবুল করে নেয়, তবে তাদের সফলতা ও কৃতকার্যতা অবধারিত। তাওরাতে 'তাবুতে সাকীনা' ফিরে আসার কাহিনীট যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তা অতিশয় চিত্তাকর্ষক। তা হলো :

"শামুয়েল আ.-এর ভ্রমণবৃত্তান্তে উল্লেখ রয়েছে, যখন থেকে 'তাবুতে সাকীনা' এনে 'বাইতে দাজুনে' রাখা হয়েছে; তখন হতে ফিলিস্তিনিরা প্রত্যহ এই দৃশ্য দেখতে লাগল– যখনই তারা প্রাতঃকালে তাদের দেবতা দাজুনের ইবাদতের জন্য গমন করে, তখনই সেটাকে উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখতে পায়। সকালবেলা যখন তারা সেটাকে পুনরায় নিজের জায়গায় দাঁড় করিয়ে দেয়, তখন পরবর্তী রাত্রি অবসানের পর পুনরায় সেটাকে সেরূপ উপুড় হয়ে পতিত থাকা অবস্থায় দেখতে পায়। আবার একটি নুতুন ব্যাপার ঘটল। সেই শহরে এত অধিকসংখ্যক ইঁদুর উৎপন্ন হল, সেগুলো তাদের সর্ববিধ মালামাল বিনষ্ট ও বরবাদ করে দিল। আর এক বিশেষ রকমের গলগণ্ড রোগের মহামারী সেখানে এসে বাসা বাঁধল, যার ফলে ভীষণভাবে প্রাণহানি ঘটতে লাগল।

ফিলিস্তিনিরা যখন কোনো প্রকারেই এ সমস্ত বিপদ হতে মুক্তি পেল না, তখন চিন্তা ও গবেষণার পর বলতে লাগল, মনে হয় আমাদের উপর এ সমস্ত বিপদ শুধু এই সিন্দুকটির কারণেই ঘটছে। সুতরাং একে এই শহর হতে বের করে দাও। এই চিন্তা করে ফিলিস্তিনিরা নিজেদের বড় বড় গণক ও জ্যোতিষীদের একত্র করে তাদের নিকট সমুদয় ঘটনা ব্যক্ত করে প্রতিকার দাবি করল। গণক ও জ্যোতিষীরা বলল, এর একমাত্র প্রতিকার– যথাসম্ভব সত্বর এই সিন্দুকটি এখান হতে বের করে দাও। আর বের করে দেওয়ার অবস্থা হবে, স্বর্ণ দ্বারা সাতটি ইঁদুর নির্মাণ করা হোক এবং সাতটি প্রতীকি গলগণ্ড ব্যাধিও। এরপর ঐগুলিকে সিন্দুকটিসহ একটা গরুর গাড়ির উপর উঠিয়ে দেওয়া হবে এবং গাড়িটিতে দুইটি দুগ্ধবতী গাভী জুড়ে দেওয়া হবে।

এরপর তাদেরকে বস্তির বাইরে সড়কের উপর নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হবে। যেন গাড়ির মুখ যেদিকে থাকে, গাভিগুলি সিন্দুকটিকে সেই দিকেই নিয়ে যায়।" ফিলিস্তিনিরা তা-ই করল। আল্লাহ পাকের কুদরত! সেই গাভীগুলি নিজে নিজেই গাড়িটিকে সেই দিকেই নিয়ে চলল, যেদিকে বনি ইসরাঈলদের বস্তি ছিল। চলতে চলতে অবশেষে এমন একটি ক্ষেতে গিয়ে পৌঁছল, যেখানে ইসরাঈলরা তাদের ক্ষেতের শস্য কাঁটছিল। ইসরাঈলীরা সিন্দুকটি দেখে খুশি ও আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল এবং তৎক্ষনাৎ দৌড়িয়ে 'বাইতে শামস' শহরে গিয়ে সংবাদ দিল। এরপর বাইতে ইয়ারীমের ইহুদিরা এসে সিন্দুকটিকে অতিশয় সম্মান ও তাযীমের সাথে নিয়ে গিয়ে টিলার উপরে অবস্থিত ইন্দাবের ঘরে হেফাযতের সাথে রেখে দিল।

আবদুল ওয়াহহাব নাজ্জার মিসরী এই ঘটনা হতে আবিষ্কার করেছেন, কুরআন মাজিদে যে বলা হয়েছে : تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ "সেটি ফেরেশতারা বহন করে আনবে" এর অর্থ হলো, আল্লাহ তাআলার ফেরেশতাদের পথ প্রদর্শনে এরূপে সেই গাভীগুলি

সিন্দুকের গাড়িটিকে কোনো চালক ব্যতীত উদ্দিষ্ট স্থানে নিয়ে আসবে। কুরআন মাজিদ ও বাইবেলের বিষয়বস্তুর সাথে সমন্বয় রক্ষার জন্য এই ব্যাখ্যা খুবই সুন্দর বলে বোধ হয়। তবুও ব্যাখ্যাটি বাতিল ও অমূলক। কোরআন মাজিদের আয়াতই এটা অস্বীকার করছে। কেননা, কোরআন মাজিদের বর্ণনার সারমর্ম হলো– তাবুতে সাকীনা ফিরে আসা তালূতের বাদশা হওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলার একটি নিদর্শন, যা শামুয়েল আ.-এর হাতে এভাবে প্রকাশ করা হয়েছে, ফেরেশতারা বনি ইসরাঈলদের চোখের সামনে সিন্দুটিকে এনে তালুতের সম্মুখে হাযির করে দিল।

কিন্তু তাওরাতের ইবারতে একথা প্রকাশ পায়, সিন্দুকটি গাড়িতে উঠিয়ে গাড়ির সাথে গাভীগুলিকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে এবং গাভীরা সেটিকে বাইতে শামসের সড়কের ওপর নিয়ে গিয়েছিল। অবশ্য তারা ডানে-বামে কোনো দিকে যায় নি। সোজাসুজি উদ্দিষ্ট স্থানের দিকেই চলতে রয়েছে। অবশেষে বাইতে শামসের সম্মুখে কৃষিক্ষেতের ওপর গিয়ে দাঁড়িয়েছে। যা ফিলিস্তিনিদের সীমা অতিক্রম করার পর ইসরাঈলদের প্রথম সীমান্ত বস্তি ছিল। আর উক্ত ইবারতে এ কথাও পরিষ্কার বলা হয়েছে, ফিলিস্তিনি লোক সেই গাড়ির পিছনে পিছনে বাইতে শামসের সীমানা পর্যন্ত গিয়েছিল এবং গাড়ি বাইতে শামসের সম্মুখস্থ ক্ষেতে পৌঁছে গেলে তারা প্রত্যাবর্তন করেছিল।

তাওরাতের বর্ণনা হলো : "এরপর গাভীগুলি বাইতে শামসের সড়কের সোজা পথ ধরল এবং সেই প্রধান সড়কের উপর দিয়ে চলতে লাগল। চলতে চলতে গোঁ গোঁ করছিল এবং ডানে-বাঁয়ে যায় নি। ফিলিস্তিনি কুতুব তাদের পিছনে পিছনে বাইতে শামসের সীমারেখা পর্যন্ত গেল, বাইতে শামসের লোকেরা মাঠে গমের ফসল কাটছিল, তারা চক্ষু উঠাতেই সিন্দুকটি দেখতে পেল।" তাবুত লাভ করার এই পন্থাটি কোনোক্রমেই 'মুজেযা' কিংবা নিদর্শন হওয়া যোগ্য নয়। বিশেষত তাওরাতে যখন এটাও পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে, বাইতে দাজুনের 'কাহেন' (শ্রেষ্ঠ আলেম) এর পিছনে পিছনে ইসরাঈলী ক্ষেতসমূহের নিকট পর্যন্ত এসেছিল। এতদ্ভিন্ন কোরআন মাজিদ কখনও এরূপ ঘটনার জন্য এত জোরদার বাক্য বলত না–

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ

"নিঃসন্দেহ, এতে তোমাদের জন্য বড় নিদর্শন রয়েছে।"

এতদ্ভিন্ন কোরআন মাজিদের বর্ণনাপদ্ধতি এবং তার ইবারত বুঝার জন্য যার মামুলী ধরনের রুচিও আছে, সে খুব সহজেই এ উপলব্দি করতে পারে, যদি 'তাবুতে সাকীনা' বাইবেলের বর্ণনানুযায়ী আসতে থাকে, তবে কুরআন মাজিদ তাকে : تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ কিংবা এই ধরনের এমন কোনো বাক্য বলত, যাতে বুঝা যেত, তাবুতে সাকীনা ফেরেশতাদের পথ প্রদর্শনে এসে পৌঁছবে। আর যদি তাওরাতের এই বিস্তারিত বিবরণকে শুদ্ধ ও সঠিক মেনে নেওয়া যায়, তবুও এর সারমর্ম এই বের হবে, যখন 'বাইতে দাজুনে দাজুন দেবতা তাবুতে সাকীনার বর্তমানে প্রত্যহ উপুড় হয়ে পড়ে যেত

এবং সেই ঘটনারই বদৌলতে তাবুতকে দাজুন ভূমি হতে বহিষ্কার করা হয়েছে। তবে এটাও সর্বাবস্থায় এমন জাতীয় মুজেযা বা নিদর্শন, যা কোনো বাহ্যিক কারণ ও উপকরণ ব্যতীতই দাজুনের মন্দিরে প্রকাশ পাচ্ছিল। সুতরাং যে ব্যক্তি এই ঘটনটির পূর্ণ বিবরণ সঠিক বলে মেনে নিতে প্রস্তুত হতে পারে, তার تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ বাক্যটির এই পরিস্কার ও সাদাসিধা অর্থ কবুল করে নিতে কি অসুবিধা হতে পারে, আল্লাহ তাআলার ফেরেশতারা বনি ইসরাঈলদের চোখের সামনেই সিন্দুকটিকে বহন করে আনবেন?

তালূত ও জালূতের যুদ্ধ এবং বনী ইসরাঈলের পরীক্ষা

এ সমস্ত বাদ-প্রতিবাদের পর বনি ইসরাঈলদের আর অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করার জো রইল না। হযরত শামুয়েল আ.-এর এলহামী মীমাংসার ওপরই তালুতকে বনি ইসরাঈলদের বাদশা করে দেওয়া হল। এখন তালুত বনি ইসরাঈলদের প্রতি সাধারণ ঘোষণা প্রদাণ করলেন, তারা যেন সকলেই ফিলিস্তিনি শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বের হয়ে পড়ে। বনি ইসরাঈলরা যখন তালুতের নেতৃত্বে যুদ্ধের ময়দানের দিকে যাত্রা করল, তখন বনি ইসরাঈলের পরীক্ষার জন্য আরও একটি ক্ষেত্র সম্মুখে আসল। তা এই, তালূত চিন্তা করলেন, যুদ্ধের ব্যাপারটি নিতান্তই সঙ্গিন ব্যাপার এবং এতে কোনো কোনো সময় একজন লোকের কাপুরুষতা এবং কপটতাপূর্ণ আচরণ পূর্ণ সেনাবাহিনীকেই ধ্বংস করে দেয়।

সুতরাং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে বনি ইসরাঈলদেরকে পরীক্ষা করে নেওয়া একান্ত আবশ্যক, কার মধ্যে আদেশ পালন, সংযম, সততা ও এখলাছ আছে; আর কার মধ্যে নেই এবং তাদের কে দুর্বল ও কাপুরুষ, যাতে যুদ্ধের কর্তব্য সমাধা করার পূর্বেই ঐ সমস্ত লোককে দল হতে পৃথক করে দেওয়া যায়। কেননা, এ স্থলে ধৈর্য, দৃঢ়তা, আনুগত্য এবং ফরমাবরদারীই আসল বস্তু। অতএব যারা সাধারণ পিপাসায় সংযম ও ধৈর্য রক্ষা করতে অক্ষম হয়, তারা জিহাদের মতো গুরুত্বপূর্ণ ও সঙ্গিন ব্যাপারে কেমন করে দৃঢ়পদ থাকতে পারে?

অনন্তর যখন এই দল একটি নদীর তীরে পৌঁছিল, তখন তালূত ঘোষণা করলেন, আল্লাহ পাক এই নদীটি দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান। তা হলো– কেউই এই নদী থেকে তৃপ্তির সঙ্গে পানি পান করবে না। যে ব্যক্তি এর অন্যথায় করবে, তাকে আল্লাহ তাআলার দল হতে বের করে দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি আদেশ পালন করবে সে আল্লাহর দলেরই অন্তর্ভুক্ত থাকবে। অবশ্য কঠিন পিপাসায় এক অঞ্জলি পানি পান দ্বারা গলা ভিজিয়ে নেওয়ার জন্য অনুমতি রয়েছে। এই ঘটনাটি কুরআন মাজিদ এরূপে বর্ণনা করছে :

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ

তারপর তালূত যখন সৈন্যবাহিনীসহ বের হল সে তখন বলল, আল্লাহ এক নদী দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করবেন। যে কেউ তা থেকে পান করবে সে আমার দলভুক্ত নয়; আর যে কেউ তার স্বাদ গ্রহণ করবে না, সে আমার দলভুক্ত; এ ছাড়া যে কেউ তার হাতে এক কোষ পানি গ্রহণ করবে, সে-ও। তার পর অল্প সংখ্যক ব্যতীত তারা তা থেকে পান করল।

তাফসিরকারকগণ বলেন, এই ঘটনাটি জর্দান নদীতে ঘটেছিল। বোখারী শরীফের এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, বারা ইবনে আযেব রাযি. বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ পরস্পরে কথাবার্তা বলছিলাম, বদরী সাহাবীগণের সংখ্যা তালূতের সঙ্গীদের সমান।

যা হোক, ফল এই দাঁড়াল, যখন সেনাবাহিনী নদী অতিক্রম করে গেল, তখন যারা আদেশ লঙ্ঘনপূর্বক তৃপ্তি সহকারে পানি পান করেছিল, তারা বলতে লাগল, আমাদের মধ্যে জালূতের মতো শক্তিশালী ব্যক্তি এবং তাদের দলের সঙ্গে যুদ্ধ করার শক্তি নেই। কিন্তু যারা সংযম এবং নেতার আনুগত্যের প্রমাণ দিয়েছিল, তারা নির্ভয়ে বলল, আমরা অবশ্যই শত্রুর মোকাবিলা করব। কেননা, আল্লাহ তাআলার কুদরতের এরূপ প্রদর্শনী অধিকাংশ সময়েই হয়ে থাকে, ক্ষুদ্র দল বিরাট দলের ওপর জয়লাভ করে থাকে। অবশ্য আল্লাহ তাআলার প্রতি দৃঢ় ঈমান, এখলাছ এবং অন্তরের দৃঢ়তা থাকা শর্ত। এই ঘটনাটি কুরআন মাজিদ এরূপে বর্ণনা করছে :

فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ

أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

'সে এবং তার সঙ্গী ঈমানদারগণ যখন তা অতিক্রম করল তারা বলল, জালুত ও তার সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত শক্তি আজ আমাদের নেই; কিন্তু যাদের প্রত্যয় ছিল আল্লাহর সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ ঘটবে। তারা বলল, আল্লাহর হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাভূত করেছে! আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে রয়েছেন।'

মুজাহিদীনের দল সম্মুখের দিকে অগ্রসর হল এবং সৈন্যদের সম্মুখে সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হল। শত্রুপক্ষের প্রধান সেনাধ্যক্ষ জালুত নামক একজন দৈত্যকায় ব্যক্তি ছিল। তার সৈন্যসংখ্যাও অধিক ছিল। মুজাহিদরা আল্লাহ পাকের দরবারে অকপট মনে বিনয় ও কান্নাকাটির সঙ্গে দোয়া করল– "আল্লাহ! শত্রুদেরকে পরাজিত করে দিন এবং আমাদেরকে (জিহাদে) দৃঢ়পদ রাখুন এবং স্বীয় সাহায্যে ও বিজয়ে আমাদেরকে সফলকাম করুন।" ইতিহাস গ্রন্থসমূহে বর্ণিত আছে, জালূতের অসাধারণ বীরত্ব ও বাহাদুরী বনি ইসরাঈলদেরকে প্রভাবিত করে রেখেছিল। সুতরাং প্রতিদ্বন্দ্বীর আহবানে সাড়া দিতে তারা সংকোচ ও ভীতি অনুভব করছিল।

হযরত দাউদ আ.-এর বীরত্ব

বনি ইসরাঈলীদের এই সেনাবাহিনীতে জনৈক যুবকও ছিল। যিনি বাহ্যিক দৃষ্টিতে কোনো বৈশিষ্ট্যধারী ছিলেন না। সাহসিকতা ও বীরত্বেও কোনো বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন না। এ যুবকের নাম হযরত দাউদ। কথিত আছে, তিনি তাঁর পিতার সর্বকনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন এবং যুদ্ধে যোগদানের ইচ্ছায়ও আসেন নি। বরং বৃদ্ধ পিতার তরফ হতে নিজের ভাইদের এবং অন্যান্য ইসরাঈলীদের অবস্থাবলী অনুসন্ধানের জন্য সেনাবাহিনীর সঙ্গে প্রেরিত হয়েছিলেন। কিন্তু যখন তিনি জালূতের বীরত্বসূচক প্রতিদ্বন্দ্বী আহবান এবং ইসরাঈলীদের উক্ত আহবানে সাড়া প্রদানে ইতস্তভাব দর্শন করলেন, তখন তিনি আর নীরব থাকতে পারলেন না। তালূতের নিকট অনুমতি চাহিলেন, জালূতের প্রতিদ্বন্দ্বী আহবানে জবাব প্রদানের সুযোগ তাঁকে প্রদান করা হোক। তালূত বললেন, তুমি এখনও অনভিজ্ঞ বালক, সুতরাং তুমি জালূতের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না। কিন্তু দাউদ আ.-এর আবদার বৃদ্ধিই পেতে থাকল। অবশেষে তালূতকে অনুমতি দিতেই হল।

দাউদ আ. সন্মুখে অগ্রসর হলেন এবং জালূতকে হুঙ্কারের সাথে আহবান করলেন। জালূত একজন তরুণ যুবককে প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে সম্মুখে দেখে তাকে তুচ্ছ মনে করে তাঁর দিকে তেমন মনোযোগ দিল না। কিন্তু যখন উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল, তখন দাউদের প্রবল সাহসিকতা ও বীরত্বের অনুমান করতে পারল। দাউদ আ. যুদ্ধ করতে করতে নিজের গুলেল বের করে নিলেন এবং লক্ষ্যস্থির করে জালূতের মস্তকে উপর্যুপরি তিনটি প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করলেন এবং জালূতের মস্তককে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেললেন। এরপর অগ্রসর হয়ে তার গর্দান কেটে নিয়ে আসলেন। জালূত নিহত হওয়ার সাথে সাথেই যুদ্ধের পট পরিবর্তিত হয়ে গেল এবং বনি ইসরাঈলদের পরাজয়মুখী যুদ্ধ আক্রমণাত্মক রূপ ধারণ করল এবং শয়তানী শক্তির পরাজয় ঘটল। বনি ইসরাঈল কৃতকার্য ও সফলকাম হয়ে প্রত্যাবর্তন করল। এই ঘটনাটি শত্রু ও মিত্র উভয় পক্ষের অন্তরে হযরত দাউদ আ.-এর বীরত্বের মোহরাঙ্কিত করে দিল এবং তিনি সকলের নিকট অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠলেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব সকলের দৃষ্টিতে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও দৃষ্ট হতে লাগল।

কুরআন মাজিদ ও তাওরাত এ বিষয়ে একমত, জালূতের হত্যাকারী হযরত দাউদ আ.। জালূত নিহত হওয়ার ফলেই বনি ইসরাঈলদের জয় এবং শত্রুপক্ষের পরাজয় ঘটেছে। কোরআন মাজিদ তা এভাবে বর্ণনা করেছে :

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

(٢٥٠) فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ

তারা যখন যুদ্ধের উদ্দেশ্যে জালূত ও তার সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হল তখন তারা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ধৈর্য দান কর। সুতরাং তারা আল্লাহর হুকুমে

তাদেরকে পরাভূত করল। আল্লাহ তাআলা তাকে রাজত্ব এবং হেকমত দান করলেন; এবং যা ইচ্ছা করলেন তা তাকে শিক্ষা দিলেন। আল্লাহ যদি মানব জাতির একদলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তবে পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ জগতসমূহের প্রতি অনুগ্রহশীল। (সূরা বাকারা : ২৪৬-২৫১)

অধিকাংশ মুফাস্সিরের মতে উপরোক্ত আয়াতে যাদের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যিনি তাদের নবী ছিলেন, তাঁর নাম শামুয়েল আ.। কারো কারো মতে শামউন। কেউ বলেছেন, শামুয়েল ও শামঊন অভিন্ন ব্যক্তি। কেননা ইবনে জারীর তাবারী লিখেছেন– ইউশা আ.-এর ইনতেকাল এবং শামুয়েল আ.-এর নবুয়ত প্রাপ্তির মধ্যে চারশ ষাট বছরের ব্যবধান ছিল।

বনি ইসরাঈলরা যখন একের পর এক যুদ্ধে পর্যুদস্ত হতে থাকল এবং শত্রুদের নিপীড়নে জর্জরিত হয়ে গেল, তখন তারা সে যুগের নবীর কাছে গিয়ে তাদের জন্যে একজন বাদশা নিয়োগের আবেদন জানাল। যাতে তার নেতৃত্বে তারা শত্রুর মুকাবিলায় লড়াই করতে পারে। আর নবী তাদেরকে বললেন :

هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا

'যুদ্ধ করতে আমাদেরকে কিসে বাঁধা দেবে? বিশেষত আমাদেরকে যখন আমাদের ঘর বাড়ি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে আর আমাদের সন্তানদেরকে আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে।' অর্থাৎ আমাদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং আমরা নির্যাতিত। আমাদের সন্তানরা শত্রুর হাতে বন্দী। তাই এদেরকে উদ্ধার করার জন্যে আমাদের অবশ্যই যুদ্ধ করতে হবে। আল্লাহ বলেন :

فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ

'কিন্তু যখন তাদেরকে লড়াই করার নির্দেশ দেওয়া হল, তখন অতি অল্প সংখ্যক লোক ছাড়া তারা সকলেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল। আল্লাহ তাআলা জালিমদেরকে ভালো করেই জানেন।'

অল্প সংখ্যক লোকই বাদশাহর সাথে নদী অতিক্রম করে। তারা ছাড়া অবশিষ্ট সবাই যুদ্ধের ভয়ে ভীত হয়ে প্রত্যাবর্তন করে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا

"তাদের নবী তাদেরকে বলল, আল্লাহ তালুতকে তোমাদের
জন্যে বাদশা নিযুক্ত করেছেন।"

তাফসিরবিদ ছালাবী বলেন, তালুতের বংশ তালিকা হলো : তালুত ইবনে কায়শ ইবনে আফয়াল ইবনে সারূ ইবনে ইবনে আফয়াহ ইবনে উনায়স ইবনে বিন্ইয়ামিন

ইবনে ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম। ইকরামা ও সুদ্দী রহ. বলেন, তালুত পেশায় একজন ভিসতি ছিলেন। ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ বলেন, তিনি চামড়া পাকা করার কাজ করতেন। এ সম্পর্কে আরও বিভিন্ন মত রয়েছে। এ জন্য বনি ইসরাঈলের লোকজন বলল :

أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ

"তারা বলল, এ কেমন করে হয়, আমাদের উপর বাদশা হওয়ার তার কি অধিকার আছে? রাষ্ট্র-ক্ষমতা পাওয়ার ক্ষেত্রে তার চেয়ে আমাদেরই অধিকার বেশি। সে তো কোনো বড় ধনী ব্যক্তিও নয়।"

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, দীর্ঘদিন যাবত বনি ইসরাঈলের লাও শাখা থেকে নবী এবং য়াহুদা শাখা থেকে রাজা-বাদশা হওয়ার প্রচলন চলে আসছিল। এবার তালুত যখন বিনইয়ামিনের বংশধরদের থেকে রাজা মনোনীত হলেন, তখন তারা অপছন্দ করল এবং তাঁর নেতৃত্ব সম্পর্কে কটাক্ষ করতে আরম্ভ করল। তারা দাবি করল, তালুতের তুলনায় রাজা হওয়ার অধিকার আমাদের বেশি। দাবির সপক্ষে তারা বলল, তালুত তো একজন দরিদ্র ব্যক্তি; তার তো যথেষ্ট অর্থ সম্পদ নেই। এমন লোক কীভাবে রাজা হতে পারে? নবী বললেন :

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ

"আল্লাহ তোমাদের ওপর তাকেই মনোনীত করেছেন। স্বাস্থ্য ও জ্ঞান উভয় দিকের যোগ্যতা তাকে প্রচুর দান করেছেন।"

কথিত আছে, আল্লাহ তাআলা হযরত শামুয়েল আ. কে ওহির মাধ্যমে জানিয়েছিলেন, বনি ইসরাঈলের মধ্যে যে ব্যক্তি (তোমার হাতের) এ লাঠির সমান দীর্ঘকার হবে এবং যার আগমনে (তোমার কাছে রক্ষিত) শিং এর মধ্যে রাখা পবিত্র তেল (دهن القدس) উথলে ওঠবে, সে ব্যক্তিই হবে তাদের বাদশা। এরপর বনি ইসরাঈলের লোকজন এসে উক্ত লাঠির সঙ্গে নিজেদেরকে মাপতে থাকে। কিন্তু তালুত ছাড়া অন্য কেই লাঠির মাপে টিকে নি। তিনি নবীর নিকট উপস্থিত হতেই শিং এর তেল উথলে উঠল। নবী তাকে সেই তেল মাখিয়ে দিলেন এবং বনি ইসরাইলের শাসক হিসেবে ঘোষণা দিলেন। তিনি তাদেরকে বললেন :

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ

"আল্লাহ তাকে তোমাদের জন্যে মনোনীত করেছেন এবং তিনি তাকে জ্ঞানে ও দেহে সমৃদ্ধ করেছেন।"

জ্ঞানের ক্ষেত্রে সমৃদ্ধির বিষয়ে কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর এ সমৃদ্ধি কেবল যুদ্ধের ব্যাপারে সীমাবদ্ধ। কিন্তু কারো কারো মতে এ সমৃদ্ধি সার্বিকভাবে এবং সকল ক্ষেত্রে। অনুরূপ দেহের সমৃদ্ধির ব্যাপারে কেউ বলেছেন, তিনি সবার চেয়ে দীর্ঘ ছিলেন। আবার

কারো কারো মতে, তিনি সবার চেয়ে সুদর্শন ছিলেন। তবে স্বাভাবিকভাবে ধরে নেওয়া যায়, নবীর পরে তালুতই ছিলেন বনি ইসরাঈলের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী ও সুদর্শন ব্যক্তি।

وَاللّٰهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ (বস্তুত আল্লাহ যাকে চান তাকেই তাঁর রাজ্য দান করেন।) কেননা, তিনিই মহাজ্ঞানী এবং সৃষ্টির উপর হুকুম চালাবার ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই আছে। وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (আল্লাহ হলেন অনুগ্রহ দানকারী এবং সকল বিষয়ে সম্যক অবগত।)

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

আর তাদের নবী তাদের বলেছিল, তার রাজত্বের নিদর্শন, তোমাদের কাছে সেই তাবুত আসবে, যাতে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে চিত্ত প্রশান্তি এবং মূসা ও হারূন বংশীয়গণ যা রেখে গিয়েছেন তার অবশিষ্টাংশ থাকবে। সিন্দুকটিকে ফেরেশতারা বয়ে আনবে। তোমরা যদি মুমিন হয়ে থাক তবে এতে অবশ্যই তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (সূরা বাকারা : ২৪৮)

তালুতের রাজত্ব পাওয়ার এটা ছিল আর একটা বরকত। বনি ইসরাঈলের নিকট বংশ-পরম্পরায় যে ঐতিহাসিক সিন্দুকটি শত্রুরা ছিনিয়ে নিয়ে যায়। আল্লাহ অনুগ্রহ করে সেই সিন্দুকটি তালুতের মাধ্যমে বনি ইসরাঈলকে ফিরিয়ে দেন। "সেই সিন্দুকে আছে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে চিত্ত প্রশান্তি।" কারও কারও মতে, তা ছিল স্বর্ণের তস্তরী, যাতে নবীদের বক্ষ ধৌত করা হত। কেউ বলেছেন, তা হয়েছে শান্তি দায়ক প্রবাহমান বায়ু।

যুদ্ধের সময় যখন তা শব্দ করত তখন বনি ইসরাঈলরা বিশ্বাস করত, তাদের সাহায্য প্রাপ্তি সুনিশ্চিত এবং মূসা ও হারূন বংশীয়গণ যা কিছু রেখে গিয়েছেন অর্থাৎ যে ফলকের উপর তাওরাত লিপিবদ্ধ ছিল, তার কিছু খন্ড অংশ এবং তীহ ময়দানে তাদের উপর যে 'মান্না' নাযিল হত, তার কিছু অংশ বয়ে আনবে ফেরেশতারা। অর্থাৎ তোমাদের কাছে তাদের তা বয়ে নিয়ে আসা তোমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবে। আমি তোমাদেরকে যা কিছু বলছি তার সত্যতা এবং তালুত যে নেতৃত্বদানের অধিকারী তার সুস্পষ্ট প্রমাণ তোমরা এ থেকে লাভ করবে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন : "এতে তোমাদের জন্যে নিদর্শন আছে যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক।"

আমালিকা জাতি বনি ইসরাঈলকে এক যুদ্ধে পরাজিত করে তাদের নিকট থেকে এ সিন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে যায়। সিন্দুকটিতে ছিল তাদের চিত্ত প্রশান্তি ও পূর্ব পুরুষদের বরকতময় কিছু স্মারক। কেউ কেউ বলেছেন, এতে তাওরাত কিতাবও ছিল। আমালিকারা এ সিন্দুকটি ছিনিয়ে নিয়ে তাদের শহরের একটি মূর্তির নীচে রেখে দেয়।

পরদিন সকালে তারা দেখতে পায়, সিন্দুকটি ঐ মূর্তির মাথার উপর রয়েছে। তারা সিন্দুকটি নামিয়ে পুনরায় মূর্তির নীচে রেখে দেয়। দ্বিতীয় দিন এসে পূর্বের দিনের ন্যায় তারা সিন্দুকটিকে মূর্তির মাথার উপরে দেখতে পায়। বারবার এ অবস্থা সংঘটিত হতে দেখে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস হল, আল্লাহর হুকুমেই এ রকম হচ্ছে।

অবশেষে তারা সিন্দুকটিকে শহর থেকে এনে একটি পল্লীতে রেখে দেয়। কিন্তু এবার হল আর এক বিপদ। গ্রামবাসীদের ঘাড়ে এক প্রকার রোগ দেখা দেয়। এ অবস্থা কিছুদিন চলতে থাকলে তারা সিন্দুকটিকে দুটি গাভীর উপর বেঁধে বনি ইসরাঈলের বসতি এলাকার দিকে হাঁকিয়ে দেয়। গাভী দুটি সিন্দুকটিকে বয়ে নিয়ে চলতে থাকে। কথিত আছে, ফেরেশতারা গাভীকে পেছন দিক থেকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। এভাবে সিন্দুকসহ গাভী দুটি হাঁটতে হাঁটতে বনি ইসরাঈলদের এলাকায় প্রবেশ করে। বনি ইসরাঈলকে তাদের নবী যেসব কথা বলেছিলেন, তারা সেভাবেই ঐসব কথা বাস্তবে পরিণত হতে দেখতে পায়। ফেরেশতারা সিন্দুকটি কিভাবে এনেছিলেন, তা আল্লাহই ভালো জানেন। তবে, আয়াতের শব্দ থেকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে অনুমিত হয়, ফেরেশতারা সরাসরি নিজেরাই সিন্দুক বহন করে এনে ছিলেন। অবশ্য অধিকাংশ মুফাস্সির প্রথম ব্যাখ্যাই গ্রহণ করেছেন। আল্লাহর বাণী :

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ

"এরপর তালুত সৈন্যবাহিনীসহ বের হল। তখন সে বলল : একটি নদীর মাধ্যমে আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন। যে কেউ তা থেকে পান করবে, সে আমার দলভুক্ত নয়। আর যে কেউ এর স্বাদ গ্রহণ করবে না, সে আমার দলভুক্ত; তা ছাড়া যে কেউ তার হাতে এক কোষ পানি গ্রহণ করবে সেও। (সূরা বাকারা : ২৪৯)

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.সহ প্রমুখ মুফাসসির বলেছেন, সেই নদীটি ছিল জর্দান নদী। একে 'শারীয়া' নামে অভিহিত করা হয়। আল্লাহর নির্দেশক্রমে ও নবীর হুকুম অনুযায়ী সৈন্যবাহিনীকে পরীক্ষা করার জন্যে তালুত এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, যে লোক এ নদী থেকে পানি পান করবে সে আমার সঙ্গে এ যুদ্ধে যেতে পারবে না। আমার সাথে কেবল সেই যেতে পারবে, যে আদৌ তা পান করবে না, কিংবা মাত্র এক কোষ পানি পান করবে। এরপর আল্লাহ বলেন, কিন্তু একটি ক্ষুদ্র দল ব্যতীত আর সকলেই তা থেকে পান করে।

সুদ্দী রহ. বলেন, তালুতের সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা ছিল ৮০ হাজার। তাদের মধ্য থেকে পানি পান করেছিল ৭৬ হাজার। অবশিষ্ট ৪ হাজার সৈন্য তাঁর সঙ্গে ছিল।

ইমাম বুখারী রহ. তাঁর 'সহি' গ্রন্থে বারা ইবনে আযিব রাযি. সূত্রে বর্ণনা করেন, আমরা বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী কয়েকজন বসে আলাপ করছিলাম, বদর যুদ্ধে অংশ

গ্রহণকারীদের সংখ্যা তালুত বাহিনীর যারা নদী পার হয়েছিল তাদের সমান। তালুতের সঙ্গে যারা নদী পার হয়েছিল, তাদের সংখ্যা ছিল ৩শ দশের কিছু বেশি। সুদ্দী রহ. যে তালুত বাহিনীর সংখ্যা আশি হাজার বলেছেন, তা সন্দেহমুক্ত নয়। কেননা বায়তুল মুকাদ্দাস এলাকাটিতে ৮০ হাজার লোকের যুদ্ধ করার মতো অবস্থা ছিল না।

আল্লাহর বাণী :

فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ

"এরপর তালুত ও তার সহযোগী মুমিনগণ যখন তা অতিক্রম করল তখন তারা বলল, জালুত ও তার সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে মুকাবিলা করার কোনো শক্তিই আজ আমাদের নেই।"

অর্থাৎ শত্রু সংখ্যা অধিক হওয়ায় এবং সে তুলনায় নিজেদের সংখ্যা কম থাকায় তারা মুকাবিলা করতে অক্ষমতা প্রকাশ করছিল। কিন্তু যাদের প্রত্যয় ছিল আল্লাহর সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ ঘটবে, তারা বলল : বারবার দেখা গেছে, আল্লাহর হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাভূত করেছে। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে রয়েছেন। এই দলের মধ্যে একটি অংশ ছিল অশ্বারোহী বাহিনী এবং তারাই ছিল ঈমানদার ও যুদ্ধ ক্ষেত্রে অসীম ধৈর্যশীল।

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

"তারা যখন যুদ্ধের উদ্দেশ্যে জালুত ও তার সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হল, তখন তারা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ধৈর্য দান করুন, আমাদের সুদৃঢ় করে দিন এবং এই কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য দান করুন! তারা আল্লাহর নিকট দোয়া করল, যেন তিনি তাদের ধৈর্য দান করেন। (সূরা বাকারা ২৫০)

অর্থাৎ ধৈর্য যেন তাদেরকে এমনভাবে বেষ্টন করে রাখে, যাতে অন্তরের মধ্যে দৃঢ়তা আসে, কোনো প্রকার সংশয় মনে না জাগে। তারা আল্লাহর নিকট দুআ করে যেন তারা যুদ্ধের ময়দানে দৃঢ়পদে শত্রুর মুকাবিলা করে বাতিল শক্তিকে পর্যুদস্ত করতে পারে এবং বিজয় লাভে ধন্য হতে পারে। এভাবে তারা বাহ্যিক দিক থেকে এবং অভ্যন্তরীণভাবে মজবুত হয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয় এবং আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অস্বীকারকারী কাফির দুশমনদের মুকাবিলায় তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করে। ফলে সর্বশক্তিমান, সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রোষ্টা, মহাজ্ঞানী ও নিগূঢ় তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী আল্লাহ তাদের দোয়া মঞ্জুর করেন ও তাদের কাঙ্ক্ষিত বিজয় দান করেন। এজন্য আল্লাহ বলেন :

فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ (শেষ পর্যন্ত ঈমানদাররা আল্লাহর হুকুমে তাদেরকে পরাজিত করে দিল)। অর্থাৎ শত্রু বাহিনী সংখ্যায় অধিক হওয়া সত্ত্বেও তালুত বাহিনী বিজয় লাভে

সমর্থ হল। কেবলমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহে এবং তাঁরই প্রদত্ত শক্তিও সাহায্য বলে- তাদের নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য দ্বারা নয়। অন্যত্র আল্লাহ্ বলেছেন :

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"আল্লাহ তোমাদেরকে বদরের যুদ্ধে সাহায্য করেছিলেন যখন তোমরা হীনবল ছিলে। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।"
(সূরা আলে ইমরান : ১২৩)

আল্লাহর বাণী :

وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ

"এবং দাউদ জালূতকে হত্যা করল। আল্লাহ দাউদকে রাজ্য ও হেকমত দান করলেন এবং যা তিনি ইচ্ছা করলেন তা তাকে শিক্ষা দিলেন।" (বাকারা : ২৫১)

এ ঘটনা থেকে হযরত দাউদ আ.-এর বীরত্ব প্রমাণিত হয়। এ যুদ্ধে তিনি এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেন, যার নিহত হওয়ার কারণে শত্রুবাহিনী পরাজিত হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। বস্তুত যে যুদ্ধে শত্রুবাহিনীর রাজাই নিহত হয়, বিপুল পরিমাণ গনিমত হস্তগত হয়, এবং সাহসী যোদ্ধারা বন্দী হয়ে যায়। ইসলামের বিজয় কেতন দেবমূর্তিদের উপরে বুলন্দ হয়। আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের সবাই তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয়ের পালা আসে এবং বাতিল দীন ও বাতিল পন্থীদের উপর সত্য দীন বিজয় লাভ করে এর চেয়ে গৌরবের বিষয় আর কি হতে পারে?

সুদ্দী রহ. বলেন : হযরত দাউদ আ. ছিলেন পিতার ১৩ জন পুত্রের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। তিনি শুনতে পান, বনি ইসরাঈলের রাজা তালুত, জালুত ও তার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বনি ইসরাঈলকে সংগঠিত করেছেন। তালুত ঘোষণা দিয়েছেন, যে ব্যক্তি জালুতকে হত্যা করতে পারবে তার সঙ্গে নিজের কন্যাকে বিবাহ দেবেন, এবং তাকে রাজ্য পরিচালনায় শরিক করে নেবেন। দাউদ আ. ছিলেন একজন তীরন্দাজ। তিনি নিক্ষেপক যন্ত্রে পাথর রেখেও নিক্ষেপ করতেন। বনি ইসরাঈলরা যখন জালূতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গমন করে, তখন দাউদ আ.ও তাদের অভিযানে শরিক হন। গমন পথে একটি পাথর তাঁকে ডেকে বলল, আমাকে তুলে নিন। আমার দ্বারা আপনি জালূতকে হত্যা করতে পারবেন।

দাউদ আ. পাথরটি তুলে নেন। কিছু দূর গেলে দ্বিতীয় আরেকটি পাথর এবং আরো কিছু দূর অগ্রসর হলে তৃতীয় আরো একটি পাথর একইভাবে দাউদ আ.-কে ডেকে তুলে নিতে বলে। দাউদ আ. তিনটি পাথরই উঠিয়ে নেন এবং থলের মধ্যে রেখে দেন। যুদ্ধের ময়দানে দুই বাহিনী যখন ব্যূহ রচনা করে পরস্পর মুখোমুখী হয় তখন জালূত সৈন্যব্যূহ থেকে বেরিয়ে এসে মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার আহবান জানায়। আহবানে সাড়া দিয়ে হযরত দাউদ আ. সম্মুখে অগ্রসর হন। কিন্তু তাঁকে জালূত বলল, তুমি ফিরে যাও। কেননা, তোমার মতো লোককে হত্যা করতে আমি ঘৃণাবোধ করি।

দাউদ আ. বললেন, তবে আমি তোমাকে বধ করতে খুবই আগ্রহী। এ কথা বলে তিনি পাথর তিনটিকে থলের মধ্যে রেখে ঘুরাতে আরম্ভ করলেন। ঘুরাবার ফলে তিনটি পাথর পরস্পর মিলিত হয়ে একটি পাথরে পরিণত হয়। এবার এ পাথরটিকে তিনি জালূতের দিকে সজোরে নিক্ষেপ করেন। পাথরটি জালূতের মাথায় গিয়ে লাগে। সঙ্গে সঙ্গে তার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। এ অবস্থা দেখে জালূতের সৈন্য বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যায়। তালূত তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাঁর কন্যাকে দাউদ আ.-এর সঙ্গে বিবাহ দেন এবং রাজ্যে তাঁর শাসন চালু করেন।

অতি অল্প দিনের মধ্যেই বনি ইসরাঈলের নিকট দাউদ আ.-এর উচ্চ মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। তালূতের চেয়ে তারা দাউদ আ.-কেই অগ্রাধিকার দিতে থাকে। কথিত আছে, এতে তালূতের অন্তরে হিংসার আগুন প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠে এবং তিনি দাউদকে হত্যার প্রয়াস পান এবং তার সুযোগ খুঁজতে থাকেন। কিন্তু তিনি তাতে সফল হন নি। দাউদ আ.-কে হত্যা করার উদ্যোগ নিলে সমাজের আলেমগণ তালূতকে এ থেকে নিবৃত্ত হওয়ার পরামর্শ দেন এবং তাঁকে বাধা প্রদান করতে থাকেন। এতে তালূত ক্রুদ্ধ হয়ে আলেমদের উপর অত্যাচার চালান এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যতীত সবাইকে হত্যা করেন। কিন্তু কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর এই কৃতকর্মের জন্যে তিনি অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর নিকট তওবা করেন। অধিকাংশ সময় তিনি কান্নাকাটি করে কাটাতেন। রাত্রিকালে গোরস্তানে গিয়েও কান্নাকাটি করতে থাকেন। কোনো কোনো সময় তাঁর চোখের পানিতে মাটি পর্যন্ত ভিজে যেত। এ সময়ে এক রাতের ঘটনা :

তালূত গোরস্তানে বসে কাঁদছেন। হঠাৎ কবর থেকে একটি শব্দ ভেসে এল। "হে তালূত! তুমি আমাদেরকে হত্যা করেছিলে, কিন্তু আমরা জীবিত। তুমি আমাদেরকে যাতনা দিয়েছিলে কিন্তু আমরা এখন মৃত।" এতে তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন এবং আরও বেশি করে কাঁদতে লাগলেন। তিনি লোকজনের কাছে এমন একজন আলেমের সন্ধানে ঘুরতে থাকেন, যার নিকট তিনি তাঁর অবস্থা এবং তাঁর তওবা কবুল হবে কি না জিজ্ঞেস করবেন। লোকেরা জবাব দিল, আপনি কি কোনো আলেমকে অবশিষ্ট রেখেছেন? বহু চেষ্টার পর একজন পূণ্যবতী মহিলার সন্ধান মিলল।

সালাবী বলেছেন, উল্লিখিত মহিলা তালূতকে হযরত শামুয়েল আ.-এর কবরের কাছে নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তালূত যে সব অপকর্ম করেছিলেন, সে জন্যে তিনি তাকে তিরস্কার করেন। সালাবী রহ.-এর এ ব্যাখ্যা অধিকতর সঙ্গত। তা ছাড়া তালূতের সঙ্গে নবীর সাক্ষাৎ ও কথোপকথনের ব্যাপারটি সম্ভবত স্বপ্নের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল, কবর থেকে পুনর্জীবিত হয়ে নয়। কেননা এ জাতীয় কাজের প্রকাশ পাওয়া নবীদের মুজিযা বিশেষ। কিন্তু ঐ মহিলা তো আর নবী ছিলেন না। তাওরাতের অনুসারীদের ধারণা মতে তালূতের রাজত্ব প্রাপ্তি থেকে জিহাদের ময়দানে পুত্রদের সঙ্গে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত মোট সময় ছিল ৪০ বছর।

হযরত দাউদ আ.

বংশ পরিচয়

হযরত শামুয়েল আ. জীবনীর শেষ দিকে হযরত দাউদ আ.-এর সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বর্ণিত হয়েছে : জালূতকে হত্যায় হযরত দাউদ আ.-এর অতুলনীয় বীরত্ব বনি ইসরাঈলদের অন্তরে তাঁর প্রতি ভালোবাসা এবং মাহাত্ম্য বদ্ধমূল করে দিয়েছিল। তাঁর অনন্য ব্যক্তিত্ব বনি ইসরাঈলদের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল বিশেষভাবে। এ দাউদ আ.-ই পরবর্তীকালে বনি ইসরাঈলদের হেদায়েত ও পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ তাআলার মনোনীত রাসূল ও পয়গম্বর হয়েছেন। সেই সঙ্গে তাদের সমষ্টিগত শাসন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য খলিফাও নিযুক্ত হয়েছেন।

বংশতালিকা

দাউদ ইবনে ঈশা ইবনে আবীদ ইবনে ইবনে সালমুন ইবনে নাহশূন ইবনে আবি নাযিব ইবনে ইরাম ইবনে হাসীরূন ইবনে ফারিয ইবনে ইয়াহুদা ইবনে ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহিম খলীলুল্লাহ আ.।

হযরত দাউদ আ. ছিলেন আল্লাহর বান্দা ও নবী। এবং বায়তুল মুকাদ্দাস এলাকায় তাঁর খলিফা। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক কতিপয় আলেমের সূত্রে ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ থেকে বর্ণনা করেছেন : হযরত দাউদ আ. ছিলেন বেঁটে, তাঁর চক্ষুদ্বয় ছিল নীলাভ। তিনি ছিলেন স্বল্প কেশ বিশিষ্ট এবং পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী।

ইতঃপূর্বে হযরত শামুয়েল আ.-এর জীবনী আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত দাউদ আ. জালূত বাদশাকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে হত্যা করেন। ইবনে আসাকিরের বর্ণনা মতে, এ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল মারাজুস সাফার নামক এলাকার সন্নিকটে উম্মে হাকিমের প্রাসাদের কাছে। ফলে বনি ইসরাঈলের লোকজন দাউদ আ.-এর প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাঁকে ভালোবাসতে শুরু করে এবং তাঁকে শাসকরূপে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। সুতরাং তালূত অধিকৃত রাজ্যের শাসনকর্তৃত্ব হযরত দাউদ আ.-এর উপর ন্যস্ত হয়। এভাবে আল্লাহ তাআলা দাউদ আ.-এর মধ্যে বাদশাহি ও নবুয়ত তথা দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ একত্র করে দিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ

"দাউদ জালূতকে হত্যা করল। আল্লাহ তাকে রাজত্ব ও হেকমত দান করলেন এবং যা তিনি ইচ্ছে করলেন, তা তাকে শিক্ষা দিলেন। আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অন্যদল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ জগতসমূহের প্রতি অনুগ্রহশীল। (সূরা বাকারা : ২৫১)

নবুয়ত ও রেসালত লাভ

হযরত দাউদ আ.-এর সঙ্গে বনি ইসরাঈলদের ক্রমবর্ধমান প্রীতি ও বন্ধুত্বের ফলে তালূতের জীবদ্দশায়ই মতান্তরে তাঁর মৃত্যুর পরে শাসন-ক্ষমতা হযরত দাউদ আ.-এর হাতে চলে আসে। আর ইতঃমধ্যে তাঁর প্রতি আল্লাহ্ তাআলার আরেকটি মহা পুরস্কার অবতীর্ণ হয়। তাঁকে নবুয়ত এবং রেসালতের সম্মানেও ভূষিত করা হয়। হযরত দাউদ আ.-এর পূর্বে বনি ইসরাঈলদের মধ্যে প্রচলিত নিয়ম ছিল, শাসনকার্য সংশ্লিষ্ট ছিল এক খানদানের সঙ্গে আর নবুয়ত ও রেসালতের গুরুভার ছিল অন্য খানদানের ওপর। ইয়াহুদার খানদানে নবুয়ত চলে আসছিল আর ইউসুফ আ.-এর খান্দানে ছিল শাসনক্ষমতা ও রাজত্ব। হযরত দাউদ আ.-ই প্রথম ব্যক্তি; যাঁর হাতে আল্লাহ তাআলা উক্ত দুই নেয়ামতই একত্র করে দিয়েছিলেন। কাজেই তিনি আল্লাহ্ তাআলার পয়গম্বরও ছিলেন এবং রাজসিংহাসনের অধিকারীও ছিলেন।

শাসক পৃথিবীতে আল্লাহর ছায়া স্বরূপ

যদি শাসনকর্তা রূপে বাদশা নিযুক্তির ব্যবস্থা না থাকত, তা হলে সমাজের শক্তিশালী লোকেরা দুর্বল লোকদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিত। এ জন্যে কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে

اَلسُّلْطَانُ ظِلُّ اللّٰهِ فِیْ اَرْضِهٖ

আল্লাহর যমীনে শাসনকর্তা তাঁর ছায়া স্বরূপ।

আমিরুল মুমিনিন হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান রাযি. বলেছেন :

اِنَّ اللّٰهَ لَيَزَعُ بِالسُّلْطَانِ مَالَا يَزَعُ بِالْقُرْاٰنِ.

অর্থাৎ আল্লাহ শাসনকর্তা দ্বারা এমন অনেক কিছু দমন করেন, যা কুরআন দ্বারা করেন না।

পাহাড়, পাখি ও লোহা ইত্যাদি অনুগত করে দেওয়া

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন :

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ (١٠) أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"আমি নিশ্চয় দাউদের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং আদেশ করেছিলাম, হে পর্বতমালা! তোমরা দাউদের সঙ্গে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং বিহঙ্গকুলকেও, তার জন্যে নমনীয় করেছিলাম লোহা, যাতে তুমি পূর্ণ মাপের বর্ম তৈরি করতে এবং বুননে পরিমাণ রক্ষা করতে পার এবং সৎকর্ম কর। তোমরা যা কিছু কর, আমি তার সম্যক দ্রষ্টা। (সূরা সাবা : ১০-১১)

আল্লাহ অন্যত্র বলেন :

وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ (٧٩) وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ

আমি পর্বত ও বিহঙ্গকুলের জন্যে নিয়ম করে দিয়েছিলাম। যেন তারা দাউদের সঙ্গে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে; এ সবের কর্তা আমিই ছিলাম। আমি তাকে তোমাদের জন্যে বর্ম শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে তা তোমাদের যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করে। সুতরাং তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে না? (সূরা : আম্বিয়া : ৭৯-৮০)

যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ আল্লাহ হযরত দাউদ আ.-কে লোহা দ্বারা বর্ম তৈরি করতে সাহায্য করেন এবং তাকে তা তৈরি করার নিয়ম-পদ্ধতিও শিক্ষা দেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন : وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ 'এবং বুনন কাজে পরিমাণ রক্ষা কর' অর্থাৎ বুননটা এত সূক্ষ্ম হবে না, যাতে ফাঁক বন্ধ হয়ে যেতে পারে আর এতটা মোটাও হবে না, যাতে ভেঙে যেতে পারে। মুজাহিদ, কাতাদা, হাকাম ও ইকরামা রহ. এ তাফসিরই করেছেন।

হাসান বসরী, কাতাদা ও আমাশ রহ. বলেছেন, আল্লাহ তাআলা হযরত দাউদ আ.-এর জন্যে লোহাকে এমনভাবে নরম করে দিয়েছেন, তিনি হাত দ্বারা যেমন ইচ্ছে, পেঁচাতে ও ভাঁজ করতে পারতেন। এ জন্যে তাঁর আগুন বা হাতুড়ির প্রয়োজন হত না। হযরত কাতাদা বলেন, হযরত দাউদ আ.-ই প্রথম মানুষ, যিনি ঠিক পরিমাণ মতো আংটা ব্যবহার করে লৌহবর্ম নির্মাণ করেন। এর আগে লোহার পাত দ্বারা বর্মের কাজ চালানো হত।

ইবনে শাওযাব বলেন, তিনি প্রতিদিন একটি করে বর্ম তৈরি করতেন এবং ছয় হাজার দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করতেন। হাদিসে এসেছে : إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ মানুষের পবিত্রতম খাবার হল যা সে নিজে উপার্জন করে।

আর আল্লাহর নবী হযরত দাউদ আ. নিজের হাতে উপার্জিত খাদ্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন। আল্লাহ পাক বলেন :

اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ (١٧) إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ (١٨) وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ (١٩) وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ

এবং স্মরণ কর, আমার শক্তিশালী বান্দা দাউদের কথা; সে ছিল অতিশয় আল্লাহ অভিমুখী। আমি নিয়োজিত করেছিলাম পর্বতমালাকে, যেন এরা সকাল-সন্ধ্যায় তার সঙ্গে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং সমবেত বিহঙ্গকুলকেও; সকলেই ছিল তার অনুগত। আমি তার রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম এবং তাকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও ফয়সালাকারী বাগ্মিতা। (সূরা সাদ : ১৭-২০)

ইবনে আব্বাস রাযি. ও মুজাহিদ রহ. বলেন, আয়াতে উল্লিখিত الأيد অর্থ ইবাদত করার শক্তি। অর্থাৎ তিনি ছিলেন ইবাদত ও অন্যান্য সৎকাজে অত্যন্ত শক্তিশালী। হযরত কাতাদা রহ. বলেন, তাঁকে আল্লাহ্ ইবাদত করতে দিয়েছিলেন শক্তি এবং ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে দিয়েছিলেন গভীর জ্ঞান। হযরত দাউদ আ. রাতের বেলা দাঁড়িয়ে ইবাদত করতেন এবং বছরের অর্ধেক সময় রোযা রাখতেন।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহর নিকট তদ্রুপ নামায সবচেয়ে প্রিয়, যেরূপ নামায হযরত দাউদ পড়তেন এবং আল্লাহর নিকট ওই রোযা সবচেয়ে পছন্দনীয়, যে রোযা হযরত দাউদ আ. রাখতেন। তিনি রাতের প্রথম অর্ধেক ঘুমাতেন, তারপরে এক-তৃতীয়াংশ নামাযে কাটাতেন এবং শেষে এক-ষষ্ঠাংশ পুনরায় ঘুমিয়ে কাটাতেন। তিনি এক দিন রোযা রাখতেন এবং এক দিন রোযা থাকতেন না। আর শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই হলে কখনো ভয়ে পালাতেন না। তার সঙ্গে পর্বতমালা এবং পক্ষীকুল দিনের সূচনা লগ্নে ও শেষ ভাগে তাসবি পাঠ করত। হযরত দাউদ আ.-কে আল্লাহ্ এমন সুউচ্চ ও সুললিত সুমধুর কণ্ঠ দান করেছিলেন, যা পৃথিবীর অন্য কাউকে দান করেন নি। তিনি যখন তাঁর প্রতি অবতীর্ণ যাবূর কিতাব সুর দিয়ে পাঠ করতেন, তখন আকাশে উড়ন্ত পাখিকুল সুরের মূর্ছনায় থমকে দাঁড়াত। হযরত দাউদ আ.-এর সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে আবৃত্তি করত ও তার সাথে তাসবি পাঠ করত। এভাবেই তিনি সকাল-সন্ধ্যায় যখন তাসবি পাঠ করতেন। পাহাড়-পর্বতও তখন তার সঙ্গে তাসবি পাঠে শরিক হত।

ইমাম আওযায়ি বলেছেন, হযরত দাউদ আ.-কে এমন সুমধুর কণ্ঠস্বর দান করা হয়েছিল, যেমনটি আর কাউকে দান করা হয় নি। তিনি যখন আল্লাহর কিতাব পাঠ করতেন তখন আকাশের পাখি ও বনের পশু তাঁর চারপাশে জড়ো হয়ে যেত। এমনকি তীব্র ক্ষুৎপিপাসায় তারা সে স্থানে মারা গেলেও নড়াচড়া করত না। শুধু তা-ই নয়, নদীর পানির প্রবাহ পর্যন্ত থেমে যেত। ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ বলেছেন, দাউদ আ.-এর কণ্ঠস্বর যে-ই শুনত লাফিয়ে উঠত এবং কণ্ঠের তালে তালে নাচতে শুরু করত। তিনি যাবূর এমন অভূতপূর্ব কণ্ঠে পাঠ করতেন, যা কোনো দিন কেউ শুনে নি। সে সুর শুনে জিন, ইনসান, পক্ষী ও জীব-জন্তু আপন আপন স্থানে দাঁড়িয়ে যেত। দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার ফলে তাদের কেউ কেউ মারাও যেত।

আবদুর রাযযাকের সূত্রে হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আবু মূসা আশআরি রাযি. কোরআন পড়া শুনে বলেছিলেন : আবু মূসাকে আলে-দাউদের সুর লহরী দান করা হয়েছে।

বুখারী ও মুসলিমের শর্তে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। তবে হাদিসটি বুখারী ও মুসলিমে নেই। অন্যত্র ইমাম আহমদ হাসানের সূত্রে আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আবু মূসাকে দাউদের বাদ্য প্রদান

করা হয়েছে। এ হাদিসটি মুসলিমের শর্তে বর্ণিত। ইমাম তিরমিযি রহ. বলেন, বাদ্য ও বাঁশরী শুনেছি, কিন্তু আবু মূসা আশআরির কণ্ঠের চেয়ে তা অধিক শ্রুতিমধুর নয়। এ রকম মধুর সুর হওয়া সত্ত্বেও দাউদ আ. অতি দ্রুত যাবূর পাঠ করতেন।

এ সম্পর্কে ইমাম আহমদ আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা দাউদ অপেক্ষা ধীরে কেরাত পড়। কেননা তিনি বাহনের উপর জিন লাগাতে আদেশ করে যাবূর পড়তেন এবং জিন লাগানো শেষ হওয়ার আগেই তাঁর যাবূর পড়া শেষ হয়ে যেত। আর তিনি স্বহস্তে উপার্জন করেই জীবিকা নির্বাহ করতেন।

হযরত দাউদ আ.-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল 'যাবূর' কিতাব। এর বর্ণনাগুলো ছিল সংরক্ষিত। কেননা তিনি ছিলেন একজন বাদশা। তাঁর ছিল বহু অনুসারী। তাই বাহনের উপর জিন লাগাতে যতটুকু সময় লাগে সে সময় পর্যন্ত তিনি যাবূর পাঠ করতেন। ভক্তিসহ নিবিষ্ট চিত্তে ও সুর প্রয়োগে পড়া সত্ত্বেও তাঁর তেলাওয়াত ছিল অত্যন্ত দ্রুত। তাঁর আসমানী কিতাবখানা রমযান মাসে অবতীর্ণ হয়। এতে ছিল বিভিন্ন উপদেশ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ উক্তি।

ফসলে খিতাব

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত আছে। একবার এক গাভী সংক্রান্ত বিচার নিয়ে দু ব্যক্তি দাউদ আ.-এর শরণাপন্ন হয়ে এদের একজন অপর জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল, সে তার গাভী জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়েছে। কিন্তু বিবাদী অভিযোগ অস্বীকার করল। হযরত দাউদ আ. তাদের ফয়সালা রাত পর্যন্ত স্থগিত রাখলেন। আল্লাহ ওই রাতে ওহির মাধ্যমে নবীকে নির্দেশ দিলেন, বাদীকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। সকাল হলে নবী বাদিকে ডেকে আল্লাহর নির্দেশ জানিয়ে বলেন, আমি অবশ্যই তোমার ওপর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করব। এখন বল, তোমার দাবির মূলে আসল ঘটনা কী? বাদি বলল, আল্লাহর নবী! আমি কসম করে বলছি, আমার দাবি যথার্থ। তবে এ ঘটনার পূর্বে আমি বিবাদীর পিতাকে হত্যা করেছিলাম। তখন হযরত দাউদ আ. তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার নির্দেশ দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তা কার্যকর হয়। এ ঘটনার পরে বনি ইসরাঈলের মধ্যে হযরত দাউদ আ.-এর মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং তাঁর প্রতি তাদের আনুগত্য বৃদ্ধি পায়।

শুরাইহ, শাবী, কাতাদা, আবু আবদুর রহমান প্রমুখের মতে 'ফাসলাল খিতাব' অর্থ, সাক্ষী ও শপথ। অর্থাৎ বিচার কার্যের মূলনীতি হিসেবে বাদির জন্যে সাক্ষী-প্রমাণ আর বিবাদির জন্যে শপথ গ্রহণ। যেমন হাদিসে আছে : البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ তাদের মতে আল্লাহ হযরত দাউদ আ.-কে এ মূলনীতি দান করেছিলেন। মুজাহিদ ও সুদ্দীর মতে 'ফাসলাল খিতাব' অর্থ, বিচার কাজের প্রজ্ঞা ও সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। মুজাহিদ বলেন, বাক্য প্রয়োগ ও সিদ্ধান্তে স্পষ্টবাদিতা।

আবু মূসা বলেছেন : ফাসলাল খিতাব হচ্ছে, হামদ ও সালাতের পরে اَمَّا بَعْدُ বলা। অর্থাৎ হযরত দাউদ-ই প্রথমে اَمَّا بَعْدُ শব্দ ব্যবহার করেন। ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ লিখেছেন, বনি ইসরাঈল জাতির মধ্যে পাপাচার ও মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ার প্রবণতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেলে হযরত দাউদ আ.-কে একটি ফয়সালাকারী শিকল দেওয়া হয়। এ শিকলটি আসমান থেকে বায়তুল মুকাদ্দাসের পার্শ্বে রক্ষিত 'সাখরা' পাথর খণ্ড পর্যন্ত ঝুলন্ত ছিল। শিকলটি ছিল স্বর্ণের। ফয়সালা হত এভাবে, বিবদমান দু ব্যক্তির মধ্যে যে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত সেই ওই শিকলটি নাগাল পেত আর অপরজন তা পেত না। দীর্ঘদিন যাবত এভাবে চলতে থাকে। অবশেষে এক ঘটনা ঘটে।

এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির নিকট একটা মুক্তা গচ্ছিত রাখে। যখন সে তার মুক্তাটি ফিরিয়ে আনতে যায়, তখন ওই ব্যক্তি তার দাবি প্রত্যাখান করে। সে একটি লাঠি দিয়ে তার মধ্যে মুক্তাটি রেখে দেয়। এরপর তাদের বিবাদ মীমাংসার জন্যে সাখরা পাথরের কাছে উপস্থিত হলে বাদী শিকলটি নাগাল পায়। বিবাদীকে তা ধরতে বলা হলে সে উক্ত মুক্তা সম্বলিত লাঠিটি বাদীর কাছে দিয়ে দেয়। এরপর সে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানিয়ে বলে, হে আল্লাহ! আপনি অবশ্যই অবগত আছেন, আমি তাকে তার মুক্তাটি প্রত্যার্পণ করেছি। প্রার্থনার পর সে শিকলটি ধরতে সক্ষম হয়। এভাবে উক্ত শিকলটির দরুন বনি ইসরাঈলরা মুশকিলে পড়ে যায়। ফলে অল্প দিনের মধ্যেই শিকলটি উঠিয়ে নেওয়া হয়। অনেক মুফাসসিরই এ ঘটনাটিই উল্লেখ করেছেন।

হযরত দাউদ আ. সম্পর্কে অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে :

وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (٢١) إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ (٢٢) إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ (٢٣) قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

তোমার নিকট বিবদমান লোকদের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি? যখন তারা প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে ইবাদতখানায় এলো এবং দাউদের নিকট পৌঁছল। তখন সে তাদের কারণে ভীত হয়ে পড়ল। তারা বলল, ভীত হবেন না, আমরা দু বিবদমান পক্ষ। আমাদের একে অপরের ওপর জুলুম করেছে। অতএব আমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করুন; অবিচার করবেন না এবং আমাদেরকে সঠিক পথ নির্দেশ করুন। এ আমার ভাই, এর আছে নিরানব্বইটা দুম্বা এবং আমার আছে মাত্র একটি দুম্বা। তবুও সে বলে, আমার যিম্মায় একটা দিয়ে

দাও এবং কথায় সে আমার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করেছে। দাউদ বলল, তোমার দুম্বাটিকে তার দুম্বাগুলোর সঙ্গে যুক্ত করার দাবি করে সে তোমার প্রতি জুলুম করেছে। শরিকদের অনেকে একে অন্যের উপর অবিচার করে থাকে। করে না কেবল মুমিন ও সৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ এবং তারা সংখ্যায় স্বল্প। দাউদ বুঝতে পারলেন, আমি তাকে পরীক্ষা করেছি। আর সে তার প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং নত হয়ে লুটিয়ে পড়লেন ও তাঁর অভিমুখী হলেন। তারপর আমি তার ত্রুটি ক্ষমা করলাম। আমার নিকট তার জন্যে রয়েছে উচ্চ মর্যাদা ও শুভ পরিণাম। (৩৮ সাদ : ২১-২৫)

মুসনাদে ইমাম আহমাদে আবু সাঈদ খুদরি রাযি. থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কেয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় ও নৈকট্যপ্রাপ্ত হল ন্যায়বিচারক শাসক। পক্ষান্তরে আল্লাহর নিকট কেয়ামতের দিন সবচেয়ে ঘৃণিত ও কঠিন শাস্তিযোগ্য ব্যক্তি হল জালিম শাসক।

হযরত দাউদ আ. কেয়ামতের দিন আরশে আযীমের স্তম্ভের কাছে দণ্ডায়মান থাকবেন। আল্লাহ তখন বলবেন, হে দাউদ! দুনিয়ায় তুমি যে মধুর সুরে আমার প্রশংসা ও মহত্ব প্রকাশ করতে, সেরূপ মধুর সুরে আজ আমার প্রশংসা ও মহত্ব প্রকাশ কর। হযরত দাউদ আ. বলবেন, হে আল্লাহ! আপনি তো তা আমার থেকে উঠিয়ে নিয়েছেন, এখন কিরূপে তা করব? আল্লাহ বলবেন, আজ আমি তা তোমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। এরপর হযরত দাউদ আ. এমন মধুর আওয়াজে আল্লাহর প্রশংসা করবেন, যার প্রতি সমস্ত জান্নাতবাসী আকৃষ্ট হয়ে পড়বে।

আল্লাহ পাক বলেন :

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ
سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

"হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর এবং খেয়াল- খুশির অনুসরণ করো না। কেননা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। যারা আল্লাহর পথ হতে ভ্রষ্ট হয়, তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি। কারণ, তারা বিচার দিবসকে বিস্মৃত হয়ে আছে।" (সূরা সাদ : ২৬)

উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতে হযরত দাউদ আ.-কে সম্বোধন করা হলেও বস্তুত এতে শাসক ও বিচারকমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে মানুষের মাঝে তাঁর পক্ষ থেকে নির্দেশিত ন্যায়বিচার ও সত্যের অনুসরণ করার আদেশ করেছেন। নিজেদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। যারা সত্য পথ পরিত্যাগ করে নিজের খেয়াল-খুশির পথ অনুসরণ করবে আল্লাহ তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন। সে যুগে হযরত দাউদ আ. ছিলেন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, প্রচুর ইবাদত ও অন্যান্য নেককাজের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় আদর্শ। কথিত আছে, রাত ও দিনের মধ্যে

এমন একটি সময় অতিবাহিত হত না, যে সময় তাঁর পরিবারের কোনো না কোনো সদস্য ইবাদতে মশগুল না থাকত।

আল্লাহ বলেছেন :

اِعْمَلُوْا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ

হে দাউদ পরিবার! কৃতজ্ঞতা সহকারে তোমরা কাজ করে যাও। আমার বান্দাদের মধ্যে অল্প সংখ্যকই কৃতজ্ঞ। (সূরা সাবা : ১৩)

আবু বকর ইবনে আবিদ দুনিয়া ... আবুল জালদ থেকে বর্ণনা করেন। আমি দাউদ আ.-এর ঘটনাবলী অধ্যয়ন করেছি। তাতে পেয়েছি, তিনি আরজ করলেন, "হে আমার পালনকর্তা! আমি আপনার শুকরিয়া কিভাবে আদায় করব? আপনার নিয়ামত ব্যতীত তো আপনার শোকর আদায়ে আমি সামর্থ্য হব না।" এরপর দাউদ আ.-এর নিকট ওহি আসে : "হে দাউদ! তুমি কি জানো না, যে সব নিয়ামত তোমার কাছে রয়েছে, তা আমারই দেওয়া?" জবাবে দাউদ আ. বললেন, "হ্যাঁ তাই, হে আমার রব!" আল্লাহ বললেন, "তোমার এ স্বীকারোক্তিতেই আমি সন্তুষ্ট।"

বায়হাকী ইবনে শিহাব থেকে বর্ণনা করেন, হযরত দাউদ আ. বলেছিলেন :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَمَا يَنْبَغِيْ لِكَرَمِ وَجْهِهٖ وَعَزِّ جَلَالِهٖ

আল্লাহর জন্যে এমন যাবতীয় প্রশংসা নির্দিষ্ট, যেমন প্রশংসা তাঁর সত্ত্বা ও মহত্ত্বের জন্যে উপযোগী। আল্লাহ বললেন, "হে দাউদ : তুমি তো হেফাজতকারী ফেরেশতাদের মতই দুআ করলে।"

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক তাঁর 'কিতাবুয যুহদে' বর্ণনা করেন : হযরত দাউদ আ.-এর বংশধরদের হেকমতের মধ্যে ছিল :

(১) কোনো জ্ঞানী লোকের পক্ষে চারটি বিশেষ সময়ে গাফেল থাকা উচিত নয়–

(ক) একটি সময় নির্দিষ্ট করবে, যে সময়ে সে একান্তে আল্লাহর ইবাদত করবে।

(খ) একটি নির্দিষ্ট সময়ে আত্মসমালোচনায় প্রবৃত্ত হবে।

(গ) একটি সময় নির্ধারণ করবে, যে সময়ে সেসব অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হবে, যারা তাঁকে ভালোবাসে এবং তার ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরিয়ে দেয়।

(ঘ) আর একটি সময় বেছে নেবে হালাল ও বৈধ-বিনোদনের জন্যে। এই শেষোক্ত সময়টা তার অন্যান্য সময়ের কাজের সহায়ক হবে এবং অন্তরে প্রশান্তি সৃষ্টি করবে।

(২) একজন জ্ঞানী লোকের উচিত সময় সম্পর্কে সচেতন থাকা। রসনাকে সংযত রাখা এবং আপন অবস্থাকে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেওয়া।

(৩) একজন জ্ঞানী লোকের কর্তব্য, ৩টি বিষয়ের যে কোনো একটি ছাড়া যেন সে কোথাও যাত্রা না করে। (ক.) পরকালের পাথেয় সংগ্রহের জন্য, (খ.) দুনিয়ার জীবন যাপনের উপাদান অন্বেষণে কিংবা (গ.) বৈধ আনন্দ-বিনোদনে।

হাফেয ইবনে আসাকির হযরত দাউদ আ.-এর কতগুলো শিক্ষামূলক উপদেশবাণী তাঁর জীবনী আলোচনায় উল্লেখ করেছেন। যেমন :

(১) এতিমের সঙ্গে দয়ালু পিতার মতো আচরণ কর! كُنْ لِلْيَتِيْمِ كَالْأَبِ الرَّحِيْمِ

(২) স্মরণ রেখ! যেমন বীজ বুনবে, তেমন ফলন পাবে وَاعْلَمْ أَنَّكَ كَمَا تَزْرَعُ كَذَالِكَ تَحْصُدُ

(৩) একটি 'গরিব' পর্যায়ের মারফূ হাদিসে বর্ণিত আছে, হযরত দাউদ আ. বলেছিলেন : হে পাপের চাষকারী! ফসলরূপে তুমি কেবল কাঁটা আর খোসাই পাবে।

يَا زَارِعَ السَّيِّئَاتِ أَنْتَ تَحْصُدُ شَوْكَهَا وَحسكها

(৪) কোনো মজলিসের নির্বোধ বক্তা হচ্ছে মৃতের শিয়রে গায়কের তুল্য।

مَثَلُ الْخَطِيْبِ الْاَحْمَقِ فِيْ نَادِى الْقَوْمِ كَمَثَلِ الْمُغَنِّيْ عِنْدَ رَأْسِ الْمَيِّتِ

(৫) ধনী থাকার পরে দরিদ্র হওয়ার মতো দুর্ভাগ্য আর নেই। কিন্তু তার চেয়ে অধিক দুর্ভাগ্য হল হেদায়েত লাভের পর পথভ্রষ্ট হওয়া। اَلضَّلَالَةُ بَعْدَ الْهُدٰى

(৬) প্রকাশ্য সভায় তোমার সমালোচনা না হোক– এ যদি তোমার কাম্য হয়, তবে ওই কাজটি তুমি নির্জনেও করবে না।

أُنْظُرْ مَا تَكْرَهُ أَنْ يُذْكَرَ عَنْكَ نَادِى الْقَوْمِ فَلَا تَفْعَلْهُ إِذَا خَلَوْتَ

(৭) তুমি কাউকে এমন কিছুর প্রতিশ্রুতি দিও না, যা তুমি পূর্ণ করতে পারবে না। কেননা এতে তোমার ও তার মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি হবে।

لَا تَعِدَنَّ أَخَاكُمْ بِمَا لَا تُنْجِزُهُ لَهُ فَإِنَّ ذَالِكَ عَدَاوَةٌ مَّا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ

হযরত দাউদ আ.-এর স্ত্রী

মুহাম্মাদ ইবনে সাদ আফরার মাওলা ওমর রাযি. থেকে বর্ণনা করেন। ইহুদিরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একাধিক সহধর্মিণী দেখে বলাবলি শুরু করল, "তোমরা এ লোকটিকে দেখো! সে আহারে পরিতৃপ্ত হয় না এবং আল্লাহর কসম! সে নারী ছাড়া কিছু বুঝে না।" মোটকথা, তাঁর একাধিক সহধর্মিণী থাকায় তারা তাঁর প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ ও তাঁর প্রতি দোষারোপ করে মন্তব্য করল, যদি ওনি নবী হতেন, তা হলে নারীদের প্রতি তাঁর এত লিপ্সা থাকত না। এ কুৎসা রটনায় সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে হুয়াই ইবনে আখতাব। কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তাঁর দান ও অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করেন।

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا

"অথবা আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে মানুষকে যা দিয়েছেন, সে জন্যে কি তারা তাদেরকে হিংসা করে? তা হলে ইবরাহীমের বংশধরকেও তো আমি কিতাবও হেকমত প্রদান করেছিলাম এবং তাদেরকে বিশাল রাজ্য দান করেছিলাম। (সূরা নিসা : ৫৪)

এখানে النَّاسُ বা মানুষ অর্থ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ইবরাহীমের বংশধর বলতে এখানে হযরত সুলাইমান আ.-কে বুঝানো হয়েছে। তাঁর ছিলেন এক হাজার স্ত্রী। তাদের মধ্যে সাত শ স্বাধীন এবং তিন শ বাঁদি। আর হযরত দাউদ আ.-এর ছিল একশ জন স্ত্রী। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত সুলাইমান আ.-এর মা। যিনি ইতোপূর্বে উরিয়ার স্ত্রী ছিলেন। পরে তাঁকে বিবাহ করেছিলেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী সংখ্যার তুলনায় তাঁদের সংখ্যা অনেকগুণ বেশি। কালবীও ঠিক এইরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইনতেকাল

হযরত আদম আ.-এর জন্মবৃত্তান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্বোল্লিখিত হাদিসে বর্ণনা করা হয়েছে, আল্লাহ যখন আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাঁর সন্তানদের বের করেন তখন হযরত আদম আ. তাঁদের মধ্যে সকল নবীকে দেখতে পান। তাঁদের মধ্যে একজনকে অত্যন্ত উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট দেখে তিনি বলেন, হে আল্লাহ! ওনি কে? আল্লাহ জানালেন, এ তোমার সন্তান দাউদ। হযরত আদম আ. বললেন, হে আমার প্রতিপালক! তার আয়ু কত? আল্লাহ জানালেন, ৬০ বছর। আদম আ. বললেন, হে পালনকর্তা! তার আয়ু বাড়িয়ে দিন। আল্লাহ জানালেন, বৃদ্ধি করা যাবে না; তবে তোমার নিজের আয়ু থেকে নিয়ে বাড়িয়ে দিতে পারি। হযরত আদমের নির্ধারিত আয়ু ছিল ১ হাজার বছর। তা থেকে নিয়ে দাউদ আ.-এর আয়ু আরো ৪০ বছর বাড়িয়ে দেওয়া হল।

যখন হযরত আদম আ.-এর আয়ু শেষ হয়ে আসে, তখন মৃত্যুর ফেরেশতা আসেন। হযরত আদম আ. বললেন, আমার আয়ুর তো এখনও ৪০ বছর বাকি। হযরত দাউদ আ.-কে দেওয়া বয়সের কথা তিনি সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলেন। এভাবে আল্লাহ আদম আ.-এর আয়ু এক হাজার বছর এবং দাউদ আ.-এর আয়ু একশ পূর্ণ করে দেন।

হাদিসটিকে ইমাম তিরমিযি রহ. একে সহি বলে মন্তব্য করেছেন। ইমাম হাকিম একে মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী আছে বলে উল্লেখ করেছেন। আদম আ.-এর আলোচনা প্রসঙ্গে এ সম্পর্কে বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইবনে জারীর লিখেছেন, কোনো কোনো আহলে কিতাবের মতে হযরত দাউদ আ.-এর আয়ু ছিল ৭৭ বছর। কিন্তু এটা ভুল ও প্রত্যাখ্যাত। তাঁদের মতে হযরত দাউদের রাজত্বের মেয়াদ ছিল ৪০ বছর। তাঁদের এ মত গ্রহণযোগ্য। কেননা আমাদের কাছে এর পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো প্রমাণ নেই।

হযরত দাউদ আ.-এর ইনতেকাল সম্পর্কে ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদে আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন

: দাউদ আ. ছিলেন অত্যন্ত ব্যক্তিত্ব ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন। যখন তিনি বাইরে যেতেন তখন ঘরের দরজা বন্ধ করে যেতেন, যাতে তিনি ফিরে আসা পর্যন্ত অন্য কেউ তাঁর ঘরে প্রবেশ করতে না পারে। এভাবে একদিন তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ঘরের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল। এ সময় তাঁর স্ত্রী উঁকি দিয়ে দেখলেন, একজন পুরুষ লোক ঘরের মধ্যখানে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি প্রহরীকে জিজ্ঞেস করলেন : এ লোকটি কে? তালাবদ্ধ ঘরে কিভাবে প্রবেশ করল? কসম আল্লাহর! হযরত দাউদ আ.-এর কাছে আমরা লজ্জায় পড়ব! এমনি সময় হযরত দাউদ আ. ফিরে এলেন এবং দেখলেন ঘরের মধ্যখানে একজন পুরুষ লোক দাঁড়িয়ে আছে। হযরত দাউদ আ. জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? লোকটি বলল : আমি সেইজন, যে কোনো রাজা-বাদশাকে তোয়াক্কা করে না এবং কোনো আড়ালই তাকে আটকাতে পারে না। হযরত দাউদ আ. বললেন, আল্লাহর কসম! তা হলে আপনি নিশ্চয়ই মালাকুল মওত? আল্লাহর নির্দেশ পালনের জন্যে আপনাকে স্বাগতম! এর অল্পক্ষণ পরেই তাঁর রূহ কবয করা হল। এরপর তাকে গোসল দেওয়া হল ও কাফন পরান হল।

ইতঃমধ্যে সূর্য উদিত হল। তখন সুলাইমান আ. পাখিদের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা হযরত দাউদ আ.-এর ওপর ছায়া করে রাখ। পাখিরা তাই করল। সন্ধ্যা হলে হযরত সুলাইমান আ. পাখিদের বললেন, তোমরা এখন পাখা সঙ্কুচিত করে নাও। আবু হোরায়রা রাযি. বলেন, পাখিরা কিভাবে তাদের পাখা মেলেছিল এবং কিভাবে বন্ধ করেছিল, তা তিনি নিজের হাত দিয়ে আমাদেরকে দেখাতে লাগলেন। হযরত দাউদ আ.-এর ওপর সেদিন ছায়াদানে দীর্ঘ ডানা বিশিষ্ট বাযপাখির ভূমিকাই প্রধান ছিল। ইমাম আহমাদ একাই এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তবে এর সনদ উত্তম এবং বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

সুদ্দি রহ. ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, দাউদ আ. আকস্মিকভাবে ইনতিকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর দিন ছিল শনিবার। পাখিরা তাঁর দেহের উপর ছায়া দান করে।

এ ছাড়া আরো বর্ণিত আছে, হযরত দাউদ আ. একশ বছর বয়সে হঠাৎ এক বুধবারে ইনতেকাল করেন। কারো কারো বর্ণনায় আছে, একবার হযরত দাউদ আ. মিহরাব থেকে নিচে অবতরণ করছিলেন। এমন সময় মৃত্যুর ফেরেশতা তাঁর সম্মুখে এসে উপস্থিত হন। হযরত দাউদ আ. তাকে বললেন, আমকে নিচে নামতে বা উপরে উঠতে দিন! তখন ফেরেশতা বললেন, হে আল্লাহর নবী! আপনার জন্যে নির্ধারিত বছর, মাস, দিন ও রিযিক শেষ হয়ে গেছে। এ কথা শুনেই হযরত দাউদ আ. সেখানেই একটি সিঁড়ির উপরে সিজদায় লুটিয়ে পড়েন এবং সিজদারত অবস্থায়ই তাঁর রূহ কবয করা হয়।

আরো বর্ণিত আছে, গ্রীষ্মকালে রৌদ্রতাপের মধ্যে লোকজন হযরত দাউদ আ.-এর জানাযায় শরিক হয়। সেদিন তাঁর জানাযায় এত বেশি লোকসমাগম হয়, সাধারণ লোক

ছাড়া কেবল যাজকদের সংখ্যাই ছিল চল্লিশ হাজার। এরা সবাই ছিল লম্বাটুপী (বুরনুস টুপী) পরিহিত। হযরত মূসা ও হারূন আ.-এর পরে বনি ইসরাঈলের মধ্যে কারো জন্যে হযরত দাউদ আ.-এর জন্যে যে শোক-তাপ প্রকাশ করা হয়, তা আর কারো জন্যে করা হয় নি।

জানাযায় উপস্থিত লোকজন রৌদ্রতাপে কষ্ট পাচ্ছিল। তাই রৌদ্র থেকে বাঁচার জন্যে তারা সুলাইমান আ.-কে ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানায়। সুলাইমান আ. বের হয়ে পক্ষীকূলকে আহবান করেন। পক্ষীকূল তাঁর আহবানে সাড়া দেয়। তিনি লোকদেরকে ছায়া দানের জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেন। ফলে পক্ষীকূল পরস্পর মিলিত হয়ে পাখা মেলে চারদিক এমনভাবে ঘিরে রইল, সে স্থানে বাতাস চলাচল বন্ধ হয়ে গেল। এমনকি লোকজন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যাওয়ার উপক্রম হল। তারা এ অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের জন্যে চিৎকার করে সুলাইমান আ.-কে ফরিয়াদ জানাল।

সুলাইমান আ. বের হয়ে পাখিদেরকে ডেকে বললেন, তোমরা সূর্যের তাপ যেদিক থেকে আসছে সেদিকে ছায়া দাও, আর যে দিক থেকে বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে সেদিক থেকে সরে যাও। পাখীরা তাই করল। তখন লোকজন একদিকে ছায়ার নিচে থাকে এবং অন্য দিকে তাদের উপর দিয়ে বাতাস প্রবাহিত হতে থাকে। এটাকেই মানুষ সুলাইমান আ.-এর কর্তৃত্বের প্রথম নিদর্শন হিসেবে দেখতে পায়।

আবু দারদা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তাআলা হযরত দাউদ আ.-কে তাঁর সঙ্গীদের মাঝ থেকে তুলে নেন, তারা কোনো ফিৎনায় পতিত হয় নি এবং হযরত দাউদ আ.-এর দীনকেও পরিবর্তন করে নি। আর মাসীহের অনুসারীরা তাঁর বিধান ও প্রদর্শিত পথের ওপর মাত্র দু শ বছর বহাল ছিল। হাদিসটি গরীব পর্যায়ের।
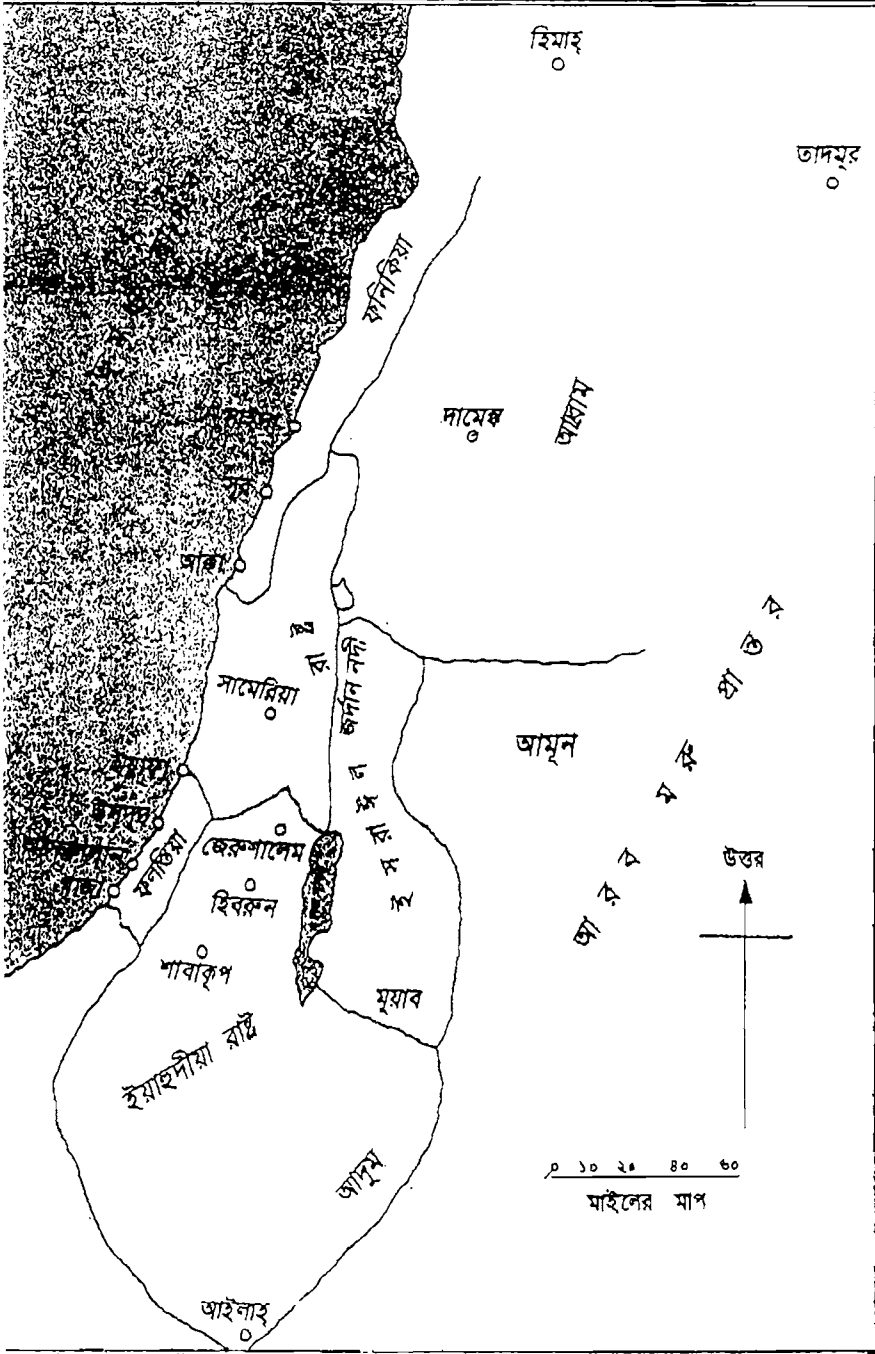
বনী ইসরাঈলদের দুই রাষ্ট্র ইয়াহুদীয়া ও ইসরাইল (খৃস্টপূর্ব ৮৬০)

হযরত সুলাইমান আ.

বংশ পরিচয়

হযরত সুলাইমান আ. হযরত দাউদ আ.-এর পুত্র। সুতরাং তাঁর বংশ সম্পর্কও ইয়াহুদার মাধ্যমে হযরত ইয়াকুব (ইসরাঈল) আ. পর্যন্ত পৌঁছে। তাঁর মাতার নাম জানা যায় নি। তাওরাত- 'বিনতে সাবা' বলেছে; কিন্তু তিনি প্রথমে উরাইয়ার স্ত্রী ছিলেন। এরপর হযরত দাউদ আ.-এর স্ত্রী হয়েছেন। হযরত সুলাইমান আ. তাঁর গর্ভে জন্ম লাভ করেন। ইবনে মাজাহ শরীফের এক হাদিসে শুধু এতটুকু উলেখ করা হয়েছে, রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সুলাইমান ইবনে দাউদ আ.-এর মাতা একবার সুলাইমান আ.-কে নসিহত করলেন : বৎস! সারা রাত ঘুমিয়ে থেকো না। কেননা পুরা রাত ঘুমিয়ে কাটালে মানুষ কেয়ামতের দিন নেককাজের জন্য মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। কুরআন মাজিদও শুধু এতটুকু বলেছে, তিনি হযরত ইয়াকুব আ.-এর মাধ্যমে হযরত ইবরাহীম আ.-এর বংশধর। যেমন ইরশাদ হচ্ছে :

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ

"আর আমি তাঁকে (ইবরাহীমকে) দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব। আমি প্রত্যেককে হেদায়েত দান করেছি। আর নূহকেও হেদায়েত দান করেছি ইবরাহীমের পূর্বে। আর ইবরাহীমের আওলাদের মধ্যে দাউদ ও সুলাইমানকেও হেদায়েত দান করেছি। (সূরা আনআম : রুকু ১০)

وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ

"আর আমি দাউদকে সুলাইমান দান করেছি।" (সূরা ছোয়াদ : রুকু ৩)

হাফেজ ইবনে আসাকিরের বর্ণনা মতে হযরত সুলাইমান আ.-এর নসবনামা নিম্নরূপ : সুলাইমান ইবনে দাউদ ইবনে ঈশা ... ইবনে আবীদ ... ইবনে আবির ইবনে সালমুন ইবনে নাহশূন ইবনে আমীনাদাব ইবনে ইরাম ইবনে হাসিরূন ইবনে ফারিস ইবনে ইয়াহুদা ইবনে ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম আ.। সুলাইমান আ. ছিলেন নবীর পুত্র নবী। ইতিহাসের কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, তিনি দামিশকে গিয়েছিলেন। সুলাইমান আ. প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন :

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ

"সুলাইমান হয়েছিল দাউদের উত্তরাধিকারী এবং সে বলেছিল, "হে মানুষ! আমাকে পক্ষীকূলের ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে সকল কিছু দেওয়া হয়েছে। এটা অবশ্যই সুস্পষ্ট অনুগ্রহ।" (সূরা নামল : ১৭)

অর্থাৎ তিনি পিতা দাউদের নবুয়ত ও রাজত্বের উত্তরাধিকারী হন। এখানে সম্পদের উত্তরাধিকার সত্বের কথা বলা হয় নি। কেননা সুলাইমান আ. ব্যতীত হযরত দাউদ আ.-এর আরও অনেক পুত্র ছিলেন। তাঁদেরকে বাদ দিয়ে শুধু সুলাইমানের নামে সম্পদের উল্লেখ করার কোনো অর্থ হয় না। তা ছাড়া সহি হাদিসের বিভিন্ন সূত্রে একদল সাহাবী থেকে বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

لَا نُوْرِثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ

"আমরা উত্তরাধিকারী রেখে যাই না, আমরা যা কিছু রেখে যাই তা সদকা।"

আমরা বলতে এখানে নবীদের জামাত বুঝানো হয়েছে। এ বাক্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে জানিয়েছেন, নবীদের রেখে যাওয়া বৈষয়িক সম্পদের কেউ উত্তরাধিকারী হয় না। যেমন অন্যদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। কেউ এর দাবিদার থাকে না বরং তা সদকা; অসহায় গরীবরাই তা প্রাপ্য। কেননা দুনিয়ার সহায়-সম্পদ যেমন আল্লাহর কাছে তুচ্ছ ও নগণ্য, তেমনি তাঁর মনোনীত নবীগণের নিকটও তা মূল্যহীন ও গুরুত্বহীন। হযরত সুলাইমান আ. পাখিদের ভাষা বুঝতেন, তারা শব্দ করে কি বুঝাতে চায়, তিনি মানুষকে তার ব্যাখ্যা বলতেন।

শৈশবকাল

আল্লাহ তাআলা হযরত সুলাইমান আ.-এর মধ্যে তীক্ষ্ণ মেধাশক্তি ও মামলা-মোকাদ্দামার মীমাংসায় সঠিক রায় প্রদানের পূর্ণক্ষমতা সৃষ্টিকাল হতে দান করেছিলেন। তাঁর শৈশবকালে হযরত দাউদ আ.-এর দরবারে উত্থাপিত বকরির পাল শস্যক্ষেত্র বিনষ্ট করে ফেলার ঘটনাটি এর উজ্জ্বল প্রমাণ। কুরআন মাজিদে হযরত দাউদ আ.-এর ঘটনায় তা বর্ণিত হয়েছে। হযরত দাউদ আ. তাঁর এ ক্ষমতার পরিচয় পেয়েছিলেন। সুতরাং শৈশবকাল হতেই রাজকার্যে তাঁকে শরিক ও সঙ্গে রাখতেন। বিশেষত মোকদ্দমাসমূহের মীমাংসায় তাঁর সঙ্গে অবশ্যই পরামর্শ করে নিতেন।

হাফেজ আবু বকর বায়হাকী ... আবু মালেক থেকে বর্ণনা করেন, একদিন সুলাইমান আ. কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে দেখেন একটা পুরুষ চড়ুই পাখি আর একটা স্ত্রী চড়ুই পাখির পাশে ঘোরাঘুরি করছে। সুলাইমান আ. তার সাথীদেরকে বললেন, তোমরা কি বুঝছ– চড়ুই পাখিটি কী বলছে? তারা বলল, হে আল্লাহর নবী! এরা কী বলছে? সুলায়মান আ. বললেন, সে তার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব দিচ্ছে এবং বলছে তুমি আমাকে বিয়ে কর। তুমি চাইলে আমি তোমাকে নিয়ে দামিশকের প্রাসাদে বসবাস করব। এরপর সুলাইমান আ. এরূপ বলার কারণ ব্যাখ্যা করলেন। দামিশকের প্রাসাদসমূহ শক্ত পাথর দ্বারা নির্মিত। তার মধ্যে কেউই বসবাস করতে পারে না। তবে বিবাহের প্রত্যেক প্রস্তাবক মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে থাকে।

ইবনে আসাকির ... বায়হাকী থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। চড়ুই ছাড়া অন্যান্য সকল জীব-জন্তু ও প্রাণীর ভাষাও তিনি বুঝতেন। এর প্রমাণ কুরআনের আয়াত : وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ "আমাকে সকল জিনিসের জ্ঞান দান করা হয়েছে।" একজন বাদশার জন্য প্রয়োজন অর্থাৎ দ্রব্য-সামগ্রী, অস্ত্র, আসবাবপত্র, সৈন্য-সামন্ত, জিন-ইনসান, বিহঙ্গকুল, বন্যজন্তু, বিচরণকারী শয়তান, জ্ঞান-বিজ্ঞান, বাক ও নির্বাক জীবের অন্তরের খবর জানা ইত্যাদি সব কিছুই দান করা হয়েছে। এ সবই সৃষ্টিকুলের স্রষ্টা ও আসমান-যমিনের সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে দান।

সেনাবাহিনী ও পিপীলিকার ময়দান

আল্লাহ তাআলা হযরত সুলাইমান আ.-কে সব প্রাণীর ভাষা বুঝার জ্ঞান দান করেছিলেন। এ প্রসঙ্গেই কুরআন মাজিদে 'ওয়াদিয়ে নামলাহ' অর্থাৎ 'পিপীলিকাদের বসতি' বলে বর্ণিত আছে। একবার হযরত সুলাইমান আ. জিন, মানুষ ও সর্ববিধ জীব-জন্তুদের বিরাট এক সেনাবাহিনী নিয়ে একটা স্থান দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন। সেনাবাহিনীর এত আধিক্য সত্ত্বেও কোনো শ্রেণীর সংখ্যাগুলিরই সাধ্য ছিল না, নিজেদের শ্রেণী ও মর্যাদার বিপরীত সম্মুখে বা পশ্চাতে গিয়ে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। সকলেই সেনাপতির আজ্ঞাবহ সৈন্যের মতো হযরত সুলাইমান আ.-এর ভয়ে নিজ নিজ দলে দলে বিভক্ত হয়ে চলছিল।

সেনাবাহিনী চলতে চলতে এমন এক ময়দানে পৌঁছল, যেখানে অসংখ্য পিপীলিকা ছিল। পূর্ণ ময়দানটিই তাদের বাসস্থান ছিল। পিপীলিকাদের রাজা সেনাবাহিনীর এ বিরাট দলটিকে দেখে নিজের অনুবর্তী পিপীলিকাদের বলল : "তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ গর্তসমূহে ঢুকে পড়। সুলাইমান ও তাঁর সেনাবাহিনী জানে না, তোমরা এত অধিক সংখ্যায় এই ময়দানে বিচরণ করছ। এমন যেন না হয়, অজ্ঞাতসারে তাদের অশ্বারোহী ও পদাতিকদের পদতলে তোমাদের কিছু সংখ্যক পিপীলিকা দলিত মথিত হয়ে যায়।"

হযরত সুলাইমান আ. পিপীলিকা-রাজার এ কথাগুলি শ্রবণ করে হাসলেন এবং তার জ্ঞানীসুলভ আদেশের প্রশংসা করতে লাগলেন। ঘটনাটি কোরআন মাজিদে বর্ণিত আছে। পিঁপড়াটি সুলাইমান আ. ও তাঁর বাহিনীর অজ্ঞাতসারে দুর্ঘটনার বিষয়ে পিঁপড়ার দলকে সাবধান করে দিল।

বর্ণিত আছে, 'হযরত সুলাইমান আ. তখন তাঁর আসনে আসীন অবস্থায় তায়েফের একটি উপত্যকা অতিক্রম করছিলেন। উক্ত পিঁপড়াটির নাম ছিল জারাস এবং তার, গোত্রের নাম বানুশ শায়তান। সে ছিল খোঁড়া এবং আকৃতিতে নেকড়ে বাঘের মতো।' এ বর্ণনার কথাগুলো সহি না। কারণ প্রমাণিত আছে, হযরত সুলাইমান আ. তখন অশ্বারোহী বাহিনীতে ঘোড় সওয়ার অবস্থায় ছিলেন; আসনে আসীন ছিলেন না। কেননা যদি তাই হত, তা হলে পিঁপড়ের কোনো ভয় থাকত না, তারা পদদলিত হত না। তখন আসনের উপরই তাঁর যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস, সৈন্যবাহিনী, অশ্ব-উষ্ট্রী, যাবতীয় প্রয়োজনীয় পত্র, তাঁবু চতুষ্পদ জন্তু, পাখি ইত্যাদি সব কিছুই থাকত।

এতে স্পষ্ট বুঝা যায়, পিঁপড়াটি তার দলবলকে বুদ্ধিমত্তার সাথে যে সঠিক নির্দেশ দিয়েছিল হযরত সুলাইমান আ.-তা বুঝেছিলেন এবং আনন্দে মুচকি হেসেছিলেন। কেননা আল্লাহ কেবল তাঁকেই এ বৈশিষ্ট্য দান করেছিলেন, অন্য কাউকে দান করেন নি। কিন্তু কতিপয় মূর্খ বলে : "সুলাইমান আ.-এর পূর্বে জীব-জন্তুর বাকশক্তি ছিল এবং মানুষের সাথে তারা কথা বলত। হযরত সুলাইমান তাদের কথা বলা বন্ধ করে দেন, তাদের থেকে অঙ্গীকার আদায় করেন এবং তাদের মুখে লাগাম পরিয়ে দেন। এরপর থেকে তারা আর মানুষের সাথে কথা বলতে পারে না।" এরূপ কথা কেবল অজ্ঞরাই বলতে পারে। ঘটনা যদি এ রকমই হত তা হলে সুলাইমান আ.-এর জন্যে এটা কোনো বৈশিষ্ট্য হত না এবং অন্যদের তুলনায় তাঁর মাহাত্ম্যরূপে গণ্য হবে না। কেননা তা হলে তো সকল মানুষই জীব-জন্তুর কথা বুঝত। আর যদি তিনি অন্যদের সাথে কথা না বলার অঙ্গীকার নিয়ে থাকেন এবং কেবল নিজেই বুঝার পথ করে থাকেন, তা হলে এরূপ বন্ধ রাখার মধ্যেও কোনো মাহাত্ম নেই। তাই তিনি আরয করলেন :

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي

بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

"হে আমার পালনকর্তা, তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও, যাতে আমি তোমার সেই নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছ এবং যাতে আমি তোমার পছন্দনীয় সৎকর্ম করতে পারি এবং আমাকে নিজ অনুগ্রহে তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর। অর্থাৎ আমার অন্তরে প্রেরণা জাগিয়ে দিন এবং সঠিক পথ প্রদর্শন করুন।"

মোটকথা, তিনি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছেন, আল্লাহ পাক যেন তাঁকে সেইসব নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের তাওফিক দেন, যা তিনি তাঁকে দান করেছেন এবং যে সব বিষয়ে অন্যদের উপর তাঁকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন। এসব নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তিনি সৎকর্ম করার তাওফিক কামনা করছেন এবং মৃত্যুর পর নেকবান্দাদের সাথে যেন তাঁর হাশর হয়, সেই দোয়া করেছেন। আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করেছেন।

হযরত সুলায়মন আ.-এর মাতা ছিলেন একজন ইবাদতকারী সৎকর্মশীল মহিলা। হযরত জাবের রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : সুলাইমান ইবনে দাউদের মাতা বলেছিলেন, "হে প্রিয় বৎস! রাতে অধিক ঘুমিয়ো না। কেননা এ অভ্যাস মানুষকে কেয়ামতের দিন নিঃস্ব-দরিদ্র করে উঠাবে।"

আবদুর রাযযাক মামারের সূত্রে যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন : হযরত সুলাইমান ইবনে দাউদ আ. ও তাঁর সৈন্যবাহিনী একবার ইসতিসকা নামায (বৃষ্টির জন্যে দোয়ার নামায) আদায় করার জন্য বের হন। পথে দেখলেন, একটা পিঁপড়া, তার একটা পা উপরের দিকে উঠিয়ে বৃষ্টি কামনা করছে। এ দৃশ্য দেখে সুলাইমান আ. সৈন্যদেরকে

বললেন, "তোমরা ফিরে চল! তোমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হবে। কেননা এ পিঁপড়াটি আল্লাহর কাছে বৃষ্টি কামনা করছে এবং তার দোয়া মনযুর হয়েছে।"

অন্য এক সূত্রে আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : আল্লাহর এক নবী একবার আল্লাহর কাছে বৃষ্টি কামনার উদ্দেশ্যে লোকজন সাথে নিয়ে বের হয়েছিলেন। পথে তারা দেখতে পান, একটি পিঁপড়া আকাশের দিকে তার এক পা উঠিয়ে বৃষ্টি কামনা করছে। এরপর ওই নবী তাঁর সঙ্গীদেরকে বললেন, তোমরা ফিরে চল! কেননা এ পিঁপড়াটির অসিলায় তোমাদের জন্যেও বৃষ্টি মঞ্জুর হয়েছে। অন্য বর্ণনায় অতিরিক্ত আছে, চলার পথে তাঁরা দেখলেন একটি পিঁপড়া দু-পায়ে দাঁড়িয়ে এবং দু-হাত মেলে এই দুআ করছে– 'হে আল্লাহ! আমরা আপনারই সৃষ্টিকূলের মধ্যে এক সৃষ্টি। আপনার অনুগ্রহ থেকে আমরা নিরাশ হই নি'। এরপর আল্লাহ তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন।

সাবার রানি বিলকিস

কুরআন মাজিদে সূরা নামলের মধ্যে হযরত সুলাইমান আ. ও 'মুলকে সাবার' (সাবা দেশের) রানি সম্বন্ধে একটি ঘটনা অনেকটা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। এটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক, উপদেশমূলক ও নেহাৎ গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক এক ঘটনা। ঘটনাটি হল–

হযরত সুলাইমান আ.-এর দরবারে মানুষ ছাড়াও বহু জীব-জন্তু এবং জিন খেদমতের জন্য সর্বদা উপস্থিত থাকত। তারা নিজেদের মর্যাদা ও অর্পিত দায়িত্বানুসারে অকুণ্ঠ ও দ্বীধাহীন চিত্তে আজ্ঞাবহ থাকত। একবার হযরত সুলাইমান আ.-এর দরবার পূর্ণ শানশওকতের সঙ্গে বসেছে। হযরত সুলাইমান আ. উপস্থিত সভাসদবর্গের হিসাব নিয়ে দেখলেন, হুদহুদ (কাঠঠোকরা পাখি) অনুপস্থিত। বললেন, আমি হুদহুদকে উপস্থিত দেখছি না কেন? যদি সত্যিই সে অনুপস্থিত হয়ে থাকে, তবে তার এই অহেতুক অনুপস্থিতির জন্য সে অবশ্যই শাস্তির যোগ্য। সুতরাং হয়তো আমি তাকে কঠিন শাস্তি প্রদান করব কিংবা যবাহ করে ফেলব। নতুবা সে তার অনুপস্থিতির কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ বর্ণনা করবে।

একটু পরেই হুদহুদ এসে উপস্থিত হল। হযরত সুলাইমান আ. তাকে বিলম্বে উপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। সে বলতে লাগল, আমি এমন একটি সুনিশ্চিত ও বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ আনয়ন করেছি, যে সম্বন্ধে আপনি পূর্বে কিছুই জানতেন না। তা হল, ইয়ামান অঞ্চলে মূলকে সাবায় এক রানি বাস করে। আল্লাহ তাআলা তাকে সব কিছুই দান করেছেন। তার রাজসিংহাসন বিশেষ সৌন্দর্যসমূহের হিসাবে বড়ই জাঁকজমকপূর্ণ। রানি ও তার প্রজাবৃন্দ সকলেই সূর্যপূজক। শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে রেখেছে। তারা বিশ্বজগতের মালিক, বিশ্বের পালনকর্তা, একক ও লা-শরীক আল্লাহ তাআলার ইবাদত করে না।

হযরত সুলাইমান আ. বললেন, আচ্ছা তোমার সত্য-মিথ্যার পরীক্ষা এখনই হয়ে যাবে। যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে আমার এ পত্রখানি নিয়ে তাদের হাতে পৌঁছে দাও এবং তথায় অপেক্ষা করে শুনতে থাক, তারা এ সম্বন্ধে কী বলাবলি করে?

হুদহুদ পত্রখানি নিয়ে রানির কোলে নিক্ষেপ করল। রানি তখনই তা পাঠ করল। এরপর সভাসদবৃন্দকে বলল, এইমাত্র আমার নিকট একখানি সিলমহরযুক্ত পত্র এসেছে। তাতে লেখা রয়েছে :

"এ পত্রখানা সুলাইমানের তরফ হতে। আমি আল্লাহ পাকের নামে আরম্ভ করছি, যিনি বড়ই মেহেরবান এবং দয়ালু। আমার অবাধ্য হওয়া এবং আমার ওপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করা উচিত হবে না। তুমি আল্লাহ তাআলার আদেশ পালনকারিণী (মুসলমান) হয়ে আমার নিকট চলে আস।"

মুলকে সাবার রানি পত্র পাঠ করে বললেন, হে আমার রাজ্যের নেতৃবৃন্দ! তোমরা অবগত আছ, আমি জরুরি ব্যাপারসমূহে তোমাদের সাথে পরামর্শ করা ব্যতীত কখনো অগ্রসর হই না। সুতরাং এখন তোমরা পরামর্শ দাও, আমার কী করা কর্তব্য। সভাসদরা বললেন, ভীত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ, আমরা বিশেষ সামর্থ্যবান ও শক্তিশালী। যুদ্ধের পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী। তবে পরামর্শের ব্যাপারে আমরা এটাই বলব, সিদ্ধান্ত গ্রহণ আপনারই হাতে। যা সঙ্গত মনে করেন, তাই আদেশ করুন। রানি বললেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই, আমরা শক্তিশালী এবং প্রতাপ ও প্রতিপত্তিশালী। কিন্তু সুলাইমানের ব্যাপারে আমাদের তাড়াহুড়া করা উচিত নয়। প্রথমে আমাদের উচিত তাঁর শক্তি ও ক্ষমতা যাচাই করে দেখা। কেননা আমার কাছে তাঁর নিকট থেকে যে বিস্ময়কর পয়গাম এসে পৌঁছেছে, তা এ শিক্ষাই প্রদান করে, সুলাইমানের ব্যাপারে বুঝে শুনে অগ্রসর হওয়া সঙ্গত। আমার ইচ্ছে হল, কয়েকজন দূত তাঁর নিকট পাঠাব। তারা সুলাইমানের জন্য উত্তম ও মূল্যবান উপঢৌকন ও হাদিয়া নিয়ে যাবে। এ কৌশলে তারা সুলাইমানের প্রতাপ ও মাহাত্ম্যের পরিমাণ নির্ণয় করে আসতে পারবে। আর এটাও বুঝা যাবে, সে আমাদের নিকট আসলে কী চায়?

যদি বাস্তবিকই সে বিপুল শক্তি ও প্রতাপের অধিকারী এবং সম্রাট হয়ে থাকে, তবে তাঁর সাথে যুদ্ধ করা অনর্থক। কেননা শক্তিধর ও প্রতাপশালী বাদশাদের রীতি হল, যখন তারা কোনো জনপদে বিজয়ীসুলভ ক্ষমতার সাথে প্রবেশ করে, তখন সেই জনপদকে ধ্বংস করে দেয় এবং তথাকার সম্মানিত অধিবাসীবৃন্দকে অপদস্থ করে। সুতরাং বিনা কারণে ধ্বংস ডেকে আনার কী প্রয়োজন?

এরপর মুলকে সাবার রানির প্রেরিত দূতগণ উপঢৌকন নিয়ে হযরত সুলাইমান আ.-এর দরবারে উপস্থিত হল। তিনি বললেন, তোমরা ও তোমাদের রানি আমার পয়গামের উদ্দেশ্য বুঝতে ভুল করেছ। তোমরা চাচ্ছ– যে সমস্ত উপঢৌকনকে তোমরা মহামূল্যবান মনে করে খুবই আনন্দিত, তা দিয়ে আমাকে ফুসলাবে এবং খোশামোদ করবে। অথচ তোমরা দেখছ আল্লাহ তাআলা আমাকে যা দান করেছেন, তার তুলনায় তোমাদের এ সমস্ত মহামূল্যবান ধনসম্পদ একেবারেই নগণ্য। সুতরাং তোমরা তোমাদের হাদিয়া ও উপঢৌকন ফেরত নিয়ে যাও। রানিকে বল, যদি তিনি আমার

পয়গাম অনুযায়ী কাজ না করেন, তবে এমন এক বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে সাবার ওপর হামলা করব, তোমরা সেই বাহিনীকে ঠেকাতে ও মোকাবিলা করতে অক্ষম থাকবে। এরপর আমি তোমাদেরকে লাঞ্ছিত করে দেশান্তর করে দেব।

দূতরা প্রত্যাবর্তন করে মুলকে সাবার রানির সম্মুখে পূর্ণ বিবরণ ব্যক্ত করল। হযরত সুলাইমান আ.-এর প্রতাপ প্রতিপত্তি ও মাহাত্ম্য যা কিছু স্বচক্ষে দর্শন করেছিল, অক্ষরে অক্ষরে বলে শুনাল। আরো বলল, তাঁর আধিপত্য শুধু মানব জাতির উপর নয় বরং জিন ও অন্যান্য যাবতীয় জীবজন্তুও তাঁর আজ্ঞাধীন এবং বশীভূত। রানি এটা শ্রবণ করে সিদ্ধান্ত করলেন, হযরত সুলাইমান আ.-এর সাথে যুদ্ধ করার অর্থ নিজের ধ্বংস ডেকে আনা। অতএব তাঁর পয়গাম কবুল করে নেওয়াই উত্তম।

যেহেতু হযরত সুলাইমান আ.-এর মহান পত্রে একটি বাক্য এও ছিল, "মুসলমান হয়ে আমার নিকট চলে আস।" আর সাবার রানি হযরত সুলাইমান আ.-এর ধর্ম ও মাযহাব সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না, তাই তিনি 'মুসলিম' শব্দের শাব্দিক অর্থ 'অনুগত' গ্রহণ করে মনে করলেন, প্রতাপশালী বাদশাদের মতো সুলাইমান আ.-এরও উদ্দেশ্য 'আমি যেন তাঁর আনুগত্য-আধিপত্য মেনে নিয়ে তাঁর অধীনতা স্বীকার করি'। সুতরাং সে এ সিদ্ধান্ত করে সফর আরম্ভ করল এবং হযরত সুলাইমান আ.-এর দরবারের দিকে যাত্রা করল।

হযরত সুলাইমান আ. অহির মাধ্যমে অবগত হলেন, সাবার রানি তাঁর দরবারে হাযির হচ্ছেন। তখন তিনি নিজের সভাসদবৃন্দকে সম্বোধন করে বললেন : আমার ইচ্ছা, সাবার রানি এখানে পৌঁছার পূর্বে তাঁর রাজসিংহাসনটি এখানে উঠিয়ে আনা হোক। তোমাদের মধ্যে কে এ কাজটি করতে পার? এটা শুনে এক জিন বলল, আপনি দরবার ভঙ্গ করার পূর্বেই আমি তা নিয়ে আসতে পারি। আমার এ ক্ষমতা আছে। এতদ্ব্যতীত আমি তার মূল্যবান সরঞ্জামের জন্য আমানতদার। কখনো তাতে বিশ্বাসঘাতকতা করব না।

জিনটির এ কথা শুনে হযরত সুলাইমান আ.-এর উযির বললেন, "আমি চোখের পলক পড়তেই তা আপনার খেদমতে পেশ করতে পারি।" এরপর হযরত সুলাইমান আ. মুখ ফিরিয়েই দেখতে পেলেন, সাবার রানির সিংহাসন বিদ্যমান। বলতে লাগলেন, এটা আমার পালনকর্তার দয়া ও অনুগ্রহ। তিনি আমাকে পরীক্ষা করছেন, আমি তাঁর শোকরগুযারি করি, না নাফরমানি করি ? বস্তুত যে ব্যক্তি তাঁর শোকরগুযারী করে, সে প্রকৃতপক্ষে নিজের কল্যাণসাধন করে আর যে ব্যক্তি নাফরমানি করে, তবে আল্লাহ তাআলা তার নাফরমানির কোনো পরোয়া করেন না। এবং তিনি তার নাফরমানির বহু উর্ধ্বে। আর সেই নাফরমানির শাস্তি স্বয়ং নাফরমান ব্যক্তির উপরই পতিত হয়।"

আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করার পর হযরত সুলাইমান আ. আদেশ করলেন, এ সিংহাসনের আকৃতি কিঞ্চিত পরিবর্তন করে দেওয়া হোক। আমি দেখতে চাই,

সাবার রানি এটা দেখে প্রকৃত বিষয়টি বুঝতে পারে কি না ? পরে মুলকে সাবার রানি হযরত সুলাইমান আ.-এর দরবারে এসে পৌছলেন। যখন তিনি দরবারে উপস্থিত হলেন, তখন সুলাইমান আ. তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার সিংহাসনটা কি এরূপ? বুদ্ধিমতী রানি উত্তর করলেন, মনে হয় এটা তা-ই। অর্থাৎ সিংহাসনটির গঠন এবং সম্যক অবস্থা তো এটাই বুঝাচ্ছে, এটা আমারই সিংহাসন। কিন্তু এর আকৃতির মধ্যে সামান্য পরিবর্তন এ বিশ্বাসে কিছুটা সন্দেহ সৃষ্টি করছে। কাজেই বলতে পারছি না, এটাই আমারই সিংহাসন।

সাবার রানি সঙ্গে সঙ্গে আরো বললেন, আমি পূর্বেই আপনার অনুপম ও অতুলনীয় শক্তি ও সামর্থ্যের বিষয় জানতে পেরেছি। এ জন্যই আমি অনুগত ও ফরমাবরদার হয়ে আপনার খেদমতে হাযির হয়েছি। আর এখন সিংহাসনের এ বিস্ময়কর ব্যাপারটি তো আপনার অদ্বিতীয় ক্ষমতার নতুন নিদর্শন এবং আমাদের আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকারের জন্য আরো প্রেরণাদায়ক। সুতরাং পুনরায় আপনার খেদমতে নিজের আনুগত্য প্রকাশ করছি।

রানি বিশ্বাস করে নিয়েছিলেন, كُنَّا مُسْلِمِيْنَ 'আমরা অনুগত' বলে সুলাইমান আ.-এর পয়গাম অনুযায়ী কাজ করেছি এবং তাঁর উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করে দিয়েছি। আসলে কিন্তু রানির মুশরেকি জীবন এবং সূর্যপূজা হযরত সুলাইমান আ.-এর পয়গামের যথার্থ অর্থ বুঝতে পারার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং হেদায়েতের পথ পাওয়ার জন্য প্রতিবন্ধক হয়েছে। সুতরাং হযরত সুলাইমান আ. উদ্দেশ্য প্রকাশের জন্য অন্য একটি সূক্ষ্ম পন্থা অবলম্বন করলেন এবং তাঁর মেধা ও বুদ্ধিমত্তাকে ঝাঁকি দিলেন। তাই তিনি জিনদের দিয়ে একটি বিরাট 'শীষমহল' নির্মাণ করালেন। যা কাঁচের ঔজ্জ্বল্যে, প্রাসাদের উচ্চতায় এবং আশ্চর্যজনক ও অভিনব শিল্পকলায় অতুলনীয় ছিল।

তাতে প্রবেশ করার জন্য সম্মুখে যে আঙ্গিনাটি পড়ত, তাতে একটি বিরাট গর্ত খোদাই করে তাকে পানি দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিয়েছিলেন। আবার স্বচ্ছ কাঁচ ও বেলওয়ারী খণ্ডসমূহের এমন মনোরম ফরশ প্রস্তুত করা হয়েছিল, যদ্দরুন দর্শকদের দৃষ্টি ধোঁকায় পতিত হত, আঙ্গিনার মধ্যে স্বচ্ছ-পরিষ্কার পানি প্রবাহিত হচ্ছে।

সাবার রানিকে বলা হল, "এ রাজ প্রাসাদে অবস্থান করুন।" রানি প্রাসাদের সম্মুখে পৌছে স্বচ্ছ ও পরিষ্কার পানি প্রবাহিত হতে দেখলেন। এটা দেখে পানিতে নামার জন্য নিজের পরিধেয় বস্ত্রকে পায়ের গোছার উপরে প্রায় হাঁটু পর্যন্ত উঠিয়ে নিলেন। তখন হযরত সুলাইমান আ. বললেন, এর প্রয়োজন নেই। এটা পানি নয়, গোটা প্রাসাদটি এবং এর মনোরম আঙ্গিনাটি উজ্জ্বল কাঁচের তৈরি।

সাবার রানির মেধা ও বুদ্ধিমত্তার উপর এটা একটা কঠিন আঘাত ছিল। যা যথার্থ অবস্থা অনুধাবনের জন্য তাঁর জ্ঞান শক্তিসমূহকে সচেতন করে দিল। আর তখন তিনি বুঝতে পারলেন, এতক্ষণ পর্যন্ত এ সমস্ত যা কিছু হচ্ছিল, একজন যবরদস্ত বাদশার

প্রবল ক্ষমতাসমূহের প্রদর্শনী নয় বরং আমাকে এটা বুঝানোর উদ্দেশ্যে, সুলাইমানের এ অতুলনীয় ও অনুপম শক্তি এবং অলৌকিক ক্ষমতা এমন এক মহান সত্তার প্রদত্ত যিনি সূর্য ও চন্দ্র বরং সমস্ত বিশ্বজগতের একচ্ছত্র মালিক। সুতরাং সুলাইমান আ. আমার নিকট নিজের আনুগত্যের দাবি করছেন না বরং সেই একক সত্তারই আনুগত্য ও আনুগত্যের দাওয়াত প্রদান করাই তাঁর উদ্দেশ্য।

রানির মস্তিষ্কে এ কল্পনা আসতেই তিনি তৎক্ষণাৎ হযরত সুলাইমান আ.-এর সম্মুখে একজন লজ্জিত ও অনুতপ্ত মানুষের মতো আল্লাহ তাআলার দরবারে এ স্বীকৃতি প্রদান করলেন, 'হে পালনকর্তা! এ পর্যন্ত আমি গায়রুল্লাহর পূজা করে নিজের ওপর বড়ই যুলুম করেছি। কিন্তু এখন আমি সুলাইমান আ.-এর সঙ্গ অবলম্বন করে বিশ্বপালক এক আল্লাহ তাআলার ওপরই ঈমান আনলাম।

এরূপে হযরত সুলাইমান আ.-এর পত্রে বর্ণিত وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ "ফরমাবরদার হয়ে আমার নিকট চলে আস"-এর প্রকৃত উদ্দেশ্য উপলব্ধি করে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন। কুরআন মাজিদ সাবার রানির এ ঘটনাকে এমন অলৌকিক সংক্ষেপে বর্ণনা করেছে, ঘটনাটি বর্ণনা করার যেই প্রকৃত উদ্দেশ্য ও উপদেশ, তাও স্পষ্ট হয়ে যায় এবং ঘটনার গুরুত্বপূর্ণ ও দরকারি অংশগুলিও উল্লেখ হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে এটাও জানা যায়, পূর্বোক্ত যে আয়াতে হযরত সুলাইমান আ.-কে পাখির ভাষা বুঝার ক্ষমতা প্রদানের কথা উল্লেখ হয়েছে, তা প্রমাণের জন্য এটা দ্বিতীয় ঘটনা, যা হুদহুদ এবং হযরত সুলাইমান আ.-এর কথোপকথন দ্বারা আরম্ভ হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে :

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ (٢٠) لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (٢١) فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ (٢٢) إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ (٢٣) وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ (٢٤) أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (٢٥) اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (٢٦) قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٢٧) اذْهَبْ بِكِتَابِي هَٰذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ (٢٨) قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ (٢٩) إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ (٣٠) أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (٣١) قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ (٣٢) قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ

شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ (٣٣) قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (٣٤) وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ (٣٥) فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ (٣٦) ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ (٣٧) قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (٣٨) قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ (٣٩) قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ (٤٠) قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ (٤١) فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ (٤٢) وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ (٤٣) قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٤٤)

"তিনি পাখিকুলের হিসাব নিয়ে বললেন, আমি হুদহুদকে দেখছি না, এর কারণ কি? বাস্তবিকই কি সে অনুপস্থিত? যদি তাই হয়, তবে আমি তাকে অবশ্যই কঠিন শাস্তি প্রদান করব, কিংবা যবাহ করব অথবা সে আমার নিকট তার অনুপস্থিতির যুক্তিসঙ্গত কারণ প্রদর্শন করবে। অনতিবিলম্বে হুদহুদ উপস্থিত হয়ে বলল, আমি এমন একটি সংবাদ নিয়ে আগমন করেছি, যা আপনি পূর্বে জানতেন না। আমি মুলকে সাবা হতে একটি নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে আপনার নিকট এসেছি। আমি এক রমণীকে রানি পদে দেখেছি, যিনি সাবার অধিবাসীদের উপর রাজত্ব করছেন এবং তাঁর নিকট সব কিছুই প্রস্তুত রয়েছে। তাঁর একটি আড়ম্বরপূর্ণ সিংহাসন আছে। আমি তাঁকে এই অবস্থায় পেয়েছি, সে এবং তার কওম আল্লাহকে ছেড়ে সূর্যের পূজা করছে এবং তার সম্মুখে মস্তক অবনত করে সেজদা করছে। শয়তান তাদের কার্যগুলিকে তাদের জন্য সুশোভিত ও সুন্দর করে দেখিয়েছে এবং তাদেরকে সিরাতুল মুস্তাকীম হতে বিভ্রান্ত করে রেখেছে; কাজেই তারা সৎপথ প্রাপ্ত হচ্ছে না।

বিস্ময়ের বিষয় হল, তারা কেন সেই আল্লাহ তাআলাকে সেজদা করে না, যিনি বের করেন আসমানসমূহের ও যমিনের যাবতীয় গুপ্ত পদার্থসমূহকে। আর যিনি অবগত

আছেন ওই সমস্ত কাজ, যা তারা গোপনে করে থাকে এবং যা প্রকাশ্যে করে থাকে। আল্লাহ এমন সত্তা, যিনি ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ নেই। তিনি মহান আরশের অধিপতি। সুলাইমান বললেন, আমি এখনই দেখব, তুমি সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী। এই আমার পত্র নিয়ে যাও এবং তার নিকট নিক্ষেপ কর, এরপর তার নিকট হতে একটু দূরে সরে লক্ষ কর, সে কি উত্তর প্রদান করে? (পত্র পেয়ে রানি) বলতে লাগল, হে সভাসদগণ! আমার নিকট একটি মর্যাদাপূর্ণ পত্র এসেছে। (তাতে লিখিত রয়েছে,)

এ পত্র সুলায়মানের তরফ হতে। বিষয়বস্তু এই যে, আমি আল্লাহ তাআলার নামে আরম্ভ করছি। যিনি অসীম অনুগ্রহশীল অতিশয় দয়ালু। তোমার উচিত আমার উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ না করা এবং আমার মোকাবেলায় ক্ষমতার বাহাদুরী না করা। মুসলমান হয়ে আমার নিকট চলে আসো।

রানি বলতে লাগল, হে আমার কওম! এ ব্যাপারে আমাকে পরামর্শ দাও! (কেননা) আমি তোমাদের পরামর্শ ছাড়া কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না। তারা জবাব দিল, আমরা খুব শক্তিশালী এবং বীর যোদ্ধা। এরপর আপনার স্বাধীন মত রয়েছে। আপনি গভীর চিন্তা করে বলুন আপনার কি আদেশ। (রানি) বলল, বাদশারা যখন (বিজয়ী বেশে) কোনো জনপদে প্রবেশ করেন, তখন তাকে ধ্বংস করে দেন এবং তথাকার সম্মানিত লোকদেরকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করে ছাড়েন। আর এটা বাস্তবিক ব্যাপার, বাদশাগণ এরূপ করে থাকেন। আমি তাঁর নিকট কিছু হাদিয়া প্রেরণ করছি। এরপর দেখি, দূত কি উত্তর নিয়ে প্রত্যাবর্তন করে। দূত সুলাইমানের নিকট গমন করলে তিনি বললেন, তোমরা আমাকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করতে চাচ্ছ। (কাজেই এ সমস্ত মূল্যবান হাদিয়া নিয়ে এসেছ?) আল্লাহ পাক আমাকে যা কিছু দান করেছেন, (তা) তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তদপেক্ষা অধিক উত্তম। আমি এর প্রত্যাশী নই। তোমরাই তোমাদের হাদিয়া নিয়ে সন্তুষ্ট থাক। তোমরা ফিরে যাও। (যদি এ সমস্ত হাদিয়াই আমার পয়গামের উত্তর হয়ে থাকে) তবে আমি তাদের নিকট এমন সেনাবাহিনী নিয়ে আসছি, যাদের মোকাবেলা করা তাদের দ্বারা কখনও সম্ভব হবে না। আমি তাদেরকে অপদস্থ করে সেই জনপদসমূহ হতে বের করে দিব। দূত এসে উত্তর শুনালে রানি তৎক্ষণাৎ সুলাইমানের দরবারে গমনের সংকল্প করল (এবং যাত্রাও করল)।

সুলাইমান (অহির মাধ্যমে তা জানতে পেরে) বললেন, হে সভাসদবৃন্দ! তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে, সে অনুগত হয়ে এখানে আসার পূর্বে তার সিংহাসনটি উঠিয়ে নিয়ে আসবে? তাদের মধ্যে জনৈক দৈত্যাকার জিন বলল, "আমি একে আপনার এ দরবার ভঙ্গ হওয়ার পূর্বেই নিয়ে আসতে পারি এবং আমার এ ক্ষমতা রয়েছে। আর আমি এ সম্বন্ধে খুব আমানতদার"। আরেক ব্যক্তি, যার নিকট আল্লাহ তাআলার কিতাবের জ্ঞান ছিল– বলল, "আমি সেটিকে আপনার চক্ষুর পলক পড়তেই এনে উপস্থিত করতে পারি।" এরপর যখন সুলাইমান (আ. চক্ষুর পলক পড়তেই) সেটিকে

নিজের সম্মুখে বিদ্যমান দেখতে পেলেন তখন তিনি বললেন, এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ। আমাকে এ পরীক্ষা করার জন্য, আমি শোকরগুযারী করি, না নাশোকরী করি। বস্তুত যে ব্যক্তি শোকর করে, সে নিজের হিতার্থেই শোকর করে আর যে নাশোকরী করে, আমার পালনকর্তা তার কোনো পরওয়া করেন না। তিনি অতিশয় দয়ালু। সুলাইমান আ. বললেন, এই সিংহাসনটির রূপ পরিবর্তন করে সেই স্ত্রীলোকটির সম্মুখে পেশ কর। আমি দেখব, সে চিনিতে পারে, না ওই সমস্ত লোকদের মধ্যেই থাকে, যারা চিনিতে পারে না। যখন রানি এসে পৌঁছল, তখন তাকে বলা হল, এরূপই কি তোমার সিংহাসন? সে বলল, এ যেন সেটিই। আর আমরা (সুলাইমানের অনুপম শক্তি সম্বন্ধে) পূর্বেই জানতাম এবং আমরা তাঁর অনুগত। আর তাকে (ঈমান আনয়ন করা হতে) নিবৃত্ত রেখেছে সেই বস্তু, যাকে সে আল্লাহকে ছেড়ে পূজা করত। নিঃসন্দেহ সে কাফেরদের দলভুক্ত ছিল। এখন তাকে বলা হল, প্রাসাদে চল। সে প্রাসাদের নির্মাণ কাজের নৈপুণ্য দেখে মনে করল, গভীর পানি প্রবাহিত হচ্ছে এবং এই মনে করে (তা অতিক্রম করার জন্য) নিজের পায়ের গোছা উন্মুক্ত করল। (কেউ বলে উঠল,) এটা তো একটি প্রাসাদ, যাতে স্বচ্ছ কাঁচ জড়িত হয়েছে। (রানি) বলতে লাগল, হে আমার পালনকর্তা! আমি নিজের উপর জুলুম করেছি এবং আমি এখন সুলাইমানের সাথী হয়ে ঈমান আনয়ন করছি সেই আল্লাহ তাআলার ওপর, যিনি সারা জাহানের প্রতিপালক।"

(সূরা নামল : রুকু ২-৩)

হযরত সুলাইমান আ. সফরকালে প্রত্যেক শ্রেণীর পাখীদের থেকে কিছু সংখ্যক সম্মুখভাগে থাকত। তারা সময় মতো তাঁর নিকট উপস্থিত হতো এবং তাদের থেকে তিনি প্রয়োজনীয় সংবাদ জেনে নিতেন। তারা পালাক্রমে তাঁর কাছে নামত, যেমনটি সেনাবাহিনী রাজা-বাদশার সাথে করে থাকে। পাখীর দায়িত্ব সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. প্রমুখ বলেন : কোনো শূন্য প্রান্তর অতিক্রমকালে সুলাইমান আ. ও তাঁর সঙ্গীরা যদি পানির অভাবে পড়তেন, তা হলে সে স্থানে পানি কোথায় আছে, হুদহুদ আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে তার সন্ধান দিত। মাটির নিচে কোন স্তরে পানি আছে হুদহুদ তা বলে দিতে পারত। সুতরাং যেখানে পানি আছে বলে সে নির্দেশ করত, সেখানকার মাটি খুঁড়ে সেখান থেকে পানি উত্তোলন করা হত এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তা ব্যবহৃত হত।

হযরত সুলাইমান আ.-এর যুগের সাবার রাজার কোনো পুত্র সন্তান না থাকায় তার কন্যার উপর রাজ্য পরিচালনার দায়িত্বভার অর্পিত হয়।

সালাবিসহ অন্যান্য ইতিহাসবিদ লিখেছেন : বিলকিসের পিতার মৃত্যুর পর তার সম্প্রদায়ের লোকেরা একজন পুরুষ লোককে তাদের রাজা মনোনীত করে। কিন্তু তার অযোগ্যতার কারণে রাজ্যের সর্বত্র বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে। বিলকিস তখন কৌশলে সে রাজার কাছে নিজের বিবাহের প্রস্তাব পাঠালেন। ফলে রাজা তাঁকে বিবাহ করেন। বিলকিস স্বামী-গৃহে গিয়ে স্বামীকে মদ্যপান করতে দেন। রাজা যখন মদপান করে

মাতাল অবস্থায় ছিল তখন বিলকিস তার দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে দরজার ওপর লটকিয়ে দেন। জনগণ সেখানে উপস্থিত হয়ে এ দৃশ্য দেখতে পেয়ে বিলকিসকে সিংহাসনে বসায় এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে।

বিলকিসের বংশধারা হল : বিলকিস বিনত সিরাহ (ইনি হুদহাদ নামে পরিচিত, আবার কেউ কেউ একে শারাহিলও বলেছেন।) ইবনে যিজাদান ইবনে সিরাহ ইবনে হারছ ইবনে কায়স ইবনে সায়ফি ইবনে সাবা ইবনে ইয়াশজাব ইবনে ইয়ারাব ইবনে কাহতান। বিলকিসের পিতা ছিলেন একজন বিখ্যাত রাজা। তিনি ইয়ামানের কোনো নারীকে বিবাহ করতে অস্বীকৃতি জানান। কথিত আছে, তিনি একজন জিন মহিলাকে বিবাহ করেছিলেন। তার নাম ছিল রায়হানা বিনতে সাকান। তার গর্ভে একটি মেয়ের জন্ম হয়। তার নাম রাখা হয় তালকামা। ইনিই বিলকিস নামে অভিহিত হন।

সালাবি হযরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বিলকিসের পিতা-মাতার একজন ছিল জিন। হাদিসটি গরিব পর্যায়ের এবং এর সনদ দুর্বল। ইমাম বুখারী রহ. 'আওফ-হাসানের মাধ্যমে আবূ বাকরা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যখন এ সংবাদ পৌঁছল, পারস্যবাসীরা পারস্য সম্রাটের কন্যাকে তাদের সম্রাজ্ঞী বানিয়েছে, তখন তিনি বলেছিলেন : সে জাতির কল্যাণ হবে না, যারা তাদের নেতৃত্ব কোনো নারীর ওপর ন্যস্ত করে। ইমাম তিরমিযি ও নাসায়ি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তিরমিযি একে হাসান সহি পর্যায়ের বলে মন্তব্য করেছেন।

বিলকিসের সিংহাসন ছিল স্বর্ণ, মণি-মুক্তা খচিত। এবং বিভিন্ন প্রকার মূল্যবান ও উজ্জ্বল ধাতু দ্বারা সুসজ্জিত। হযরত সুলাইমান আ. হুদহুদ পাখির নিকট একটি পত্র দিয়ে বিলকিসের নিকট পাঠান। চিঠিতে তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের প্রতি আহবান জানান এবং বশ্যতা স্বীকার করে তাঁর কর্তৃত্ব ও রাজত্বের প্রতি আনুগত্য দেখানোর নির্দেশ দেন। এ আহবান ছিল বিলকিসের অধীনস্ত সকল প্রজাদের প্রতিও। তাই তিনি লেখেন :

"অহমিকা বশে আমাকে অমান্য করো না।" অর্থাৎ আমার আনুগত্য প্রত্যাখ্যান ও নির্দেশ অমান্য করো না। এবং আনুগত্য স্বীকার করে আমার নিকট উপস্থিত হও।" এ কথা তোমাকে দ্বিতীয়বার বলা হবে না এবং কোনো রকম অনুরোধও করা হবে না। এরপর হুদহুদ বিলকিসের নিকট চিঠি নিয়ে আসে। এ ঘটনার পর থেকে মানুষ চিঠির আদান-প্রদান করতে শেখে। কিন্তু সেই অনুগত, বিনয়ী বিচক্ষণ পাখির আনীত চিঠির মূল্যের সাথে কি আর কোনো চিঠির তুলনা করা চলে!

মুফাসসির ও ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, হুদহুদ পাখি চিঠি নিয়ে বিলকিসের রাজ-প্রাসাদে তাঁর কক্ষে প্রবেশ করে। এবং তার সামনে চিঠিটি রেখে দিয়ে একটু দূরে সরে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে, বিলকিস এর কি উত্তর দেন। বিলকিস তার মন্ত্রীবর্গ, পারিষদবর্গ ও অমাত্যদের এক জরুরি পরামর্শ সভা আহবান করেন।

বিলকিসের রাজ্যের জনগণ যখন সুলাইমান আ.-এর ঘোষণা জানতে পারল, তখন নবীর আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করা ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় ছিল না। সুতরাং তারা সেই মুহূর্তে নবীর ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্যে রানির নিকট এসে সমবেত হল এবং বিনয়ের সাথে তাঁর আনুগত্য করে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করল। সুলাইমান আ. যখন তাদের আগমনের ও প্রতিনিধি দল প্রেরণের সংবাদ শুনলেন তখন তাঁর অনুগত এক জিনকে বললেন :

তারা আত্মসমর্পণ করে আমার নিকট আসার পূর্বে তোমাদের মধ্যে কে তার সিংহাসন আমার নিকট নিয়ে আসবে? এক শক্তিশালী জিন বলল, আপনার মজলিস শেষ হবার পূর্বেই আমি তা হাজির করে দেব। কথিত আছে, সুলাইমান আ. বনি ইসরাঈলের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানকল্পে দিনের প্রথম থেকে দুপুরের পূর্ব পর্যন্ত মজলিস করতেন। জিনটি আরও বলল, উক্ত সিংহাসন আপনার কাছে উপস্থিত করে দিতে আমি সক্ষম এবং তাতে যে সব মূল্যবান মণি-মুক্তা রয়েছে তা যথাযথভাবে আপনার কাছে বুঝিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে আমি বিশ্বস্ততার পরিচয় দেব। কিন্তু "কিতাবের জ্ঞান যার ছিল, সে বলল...।"

এ উক্তিকারীর নাম আসফ ইবনে বারখিয়া বলে প্রসিদ্ধি রয়েছে। তিনি ছিলেন হযরত সুলাইমান আ.-এর খালাত ভাই। কেউ কেউ বলেন, তিনি ছিলেন একজন মুমিন জিন। কথিত আছে, ইসমে আজম এ জিনের কণ্ঠস্থ ছিল। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এ ব্যক্তি ছিলেন বনি ইসরাঈলের একজন বিখ্যাত আলেম।

কেউ কেউ বলেছেন, তিনি স্বয়ং হযরত সুলাইমান আ.। কিন্তু এ মতটি অত্যন্ত দুর্বল। সুহায়লী এ মতকে দুর্বল আখ্যায়িত করে বলেন, বাক্যের পূর্বাপর এ কথাকে আদৌ সমর্থন করে না। চতুর্থ আরও একটি মত আছে, তিনি হযরত জিবরাঈল আ.।

"আপনি চোখের পলক ফেলার পূর্বেই আমি তা আপনাকে এনে দেব"– এ কথার বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়।

(১) যমীনের উপরে আপনার দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত একজন লোকের যেতে ও ফিরে আসতে যত সময় লাগবে, এ সময়ের পূর্বে আমি নিয়ে আসব।

(২) দৃষ্টি সীমার মধ্যে সবচেয়ে দূরবর্তী একটি লোকের হেঁটে এসে আপনার কাছে পৌঁছতে যে সময় লাগবে, তার পূর্বে।

(৩) আপনি পলকবিহীন একটানা দৃষ্টিপাত করতে থাকলে চক্ষু ক্লান্ত হয়ে যখন চোখের পাতা বন্ধ হয়ে আসবে, তার পূর্বে।

(৪) আপনি সম্মুখপানে সর্বদূরে দৃষ্টিপাত করে পুনরায় দৃষ্টি নিজের কাছে ফিরিয়ে এনে চক্ষু বন্ধ করার পূর্বে। উল্লিখিত মতামতের মধ্যে এই সর্বশেষ মতটি অধিক যথার্থ বলে মনে হয়।

এরপর সুলাইমান আ. বিলকিসের এ সিংহাসনের কারুকার্য পরিবর্তন করে দিতে ও আকৃতি বদলিয়ে দিতে নির্দেশ দেন। উদ্দেশ্য ছিল এর দ্বারা বিলকিসের জ্ঞান-বুদ্ধি পরীক্ষা করা। বিলকিস সিংহাসনটি দেখে বলল, "এটা তো যেন তা-ই।" অর্থাৎ এটা ছিল তার বুদ্ধিমত্তা ও গভীর জ্ঞানের পরিচয়। কারণ, এ সিংহাসন তার না হয়ে অন্যের হওয়া তার কাছে অসম্ভব মনে হচ্ছিল। কেননা এটা সে-ই নির্মাণ করিয়েছে এবং দীর্ঘ দিন একে ইয়ামানে প্রত্যক্ষ করেছে। তার ধারণা ছিল না, এ ধরনের আশ্চর্য কারুকার্য খচিত মূল্যবান সিংহাসন অন্য কেউ বানাতে পারে।

বিলকিস ও তার সম্প্রদায়ের লোকেরা পূর্ব-পুরুষদের অন্ধ অনুকরণে আল্লাহকে বাদ দিয়ে সূর্যের পূজা করত। এই সূর্যপূজাই তাদেরকে আল্লাহর সত্য পথ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। অথচ সূর্য পূজার পক্ষে তাদের কাছে কোনো দলিল প্রমাণ কিছুই ছিল না। হযরত সুলাইমান আ. জিনদের দ্বারা একটি কাঁচের প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। প্রাসাদে যাওয়ার পথে তিনি একটি গভীর জলাশয় তৈরি করেন। জলাশয়ে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী ছাড়েন। তারপর জলাশয়ের ওপরে ছাদস্বরূপ স্বচ্ছ কাঁচের আবরণ নির্মাণ করেন। তারপর হযরত সুলাইমান তাঁর সিংহাসনের ওপর উপবিষ্ট থেকে বিলকিসকে ওই প্রাসাদে প্রবেশ করার আদেশ দেন।

"যখন সে তা দেখল তখন সে এটাকে এক গভীর জলাশয় মনে করল এবং সে তার পদদ্বয় অনাবৃত করল। সুলায়মান বলল, এ তো স্বচ্ছ স্ফটিক মণ্ডিত প্রাসাদ! সেই নারী বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো নিজের প্রতি জুলুম করেছিলাম। আমি সুলাইমানের সাথে জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করছি।"

কথিত আছে, বিলকিসের পায়ের গোছায় লম্বা লম্বা পশম ছিল। জিনরা চেয়েছিল এ পশম কোনো উপায়ে সুলাইমানের সামনে প্রকাশ পাক এবং তা দেখে সুলাইমানের মনে ঘৃণা হোক। জিনদের এরূপ করার কারণ ছিল, বিলকিসের মা ছিল জিন। এখন সুলাইমান যদি বিলকিসকে বিবাহ করেন, তা হলে সুলাইমানের সাথে বিলকিসও জিনদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করবে বলে তারা আশঙ্কা করছিল।

কেউ কেউ বলেছেন, বিলকিসের পায়ের পাতা ছিল পশুর ক্ষুরের মতো। এ মতটি অত্যন্ত দুর্বল, প্রথম মতটিও সন্দেহমুক্ত নয়। কথিত আছে, হযরত সুলাইমান আ. যখন বিলকিসকে বিবাহ করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন তার পায়ের পশম ফেলে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ ব্যাপারে তিনি মানুষের পরামর্শ নেন। তারা ক্ষুর ব্যবহারের প্রস্তাব দেয়। বিলকিস এতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। এরপর তিনি জিনদের জিজ্ঞেস করেন। তারা সুলাইমান আ.-এর জন্যে এক প্রকার চুনা তৈরি করে দেয়। এবং একটা হাম্মামখানা নির্মাণ করে। এর পূর্বে মানুষ হাম্মামখানা কি, তা বুঝত না। তিনিই সর্বপ্রথম হাম্মামখানা তৈরি করেন ও ব্যবহার করেন। সুলাইমান আ. হাম্মামখানায় প্রবেশ করে চুনা দেখতে পান এবং পরীক্ষামূলকভাবে তা স্পর্শ করেন। স্পর্শ করতেই

চুনের ঝাঁজে উহ্ বলে ওঠেন। কিন্তু তার এ উহতে কোনো কাজ হয় নি। তিবরানী এ ঘটনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে (মারফুভাবে) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তা সমর্থনযোগ্য নয়।

সালাবি প্রমুখ লেখেছেন, সুলাইমান আ. বিলকিসের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং তাঁর রাজত্ব বহাল রেখে তাঁকে ইয়ামানে পাঠিয়ে দেন। তিনি প্রতি মাসে একবার করে ইয়ামানে গমন করতেন। তিন দিন বিলকিসের কাছে থেকে চলে আসতেন। যাতায়াতে তিনি তাঁর সেই বিখ্যাত আসনটি ব্যবহার করতেন। তিনি জিনদের দ্বারা ইয়ামানে তিনটি অনুপম প্রাসাদ নির্মাণ করিয়ে দেন। প্রাসাদ তিনটির নাম গামদান, সালিহীন ও বায়তুন।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ... ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ থেকে বর্ণনা করেন, সুলাইমান আ. বিলকিসকে নিজে বিবাহ করেন নি। বরং তাঁকে তিনি হামাদানের বাদশার সাথে বিবাহ করিয়ে দেন এবং বিলকীসকে ইয়ামানের রাজত্ব বহাল রাখেন। এরপর তিনি জিনদের বাদশা যুবিয়াকে তাঁর অনুগত করে দেন। সে তথায় উপরোল্লিখিত প্রাসাদে তিনটি নির্মাণ করে। তবে প্রথম বর্ণনাটিই অধিক প্রসিদ্ধ।

'সাবা'র পরিচয়

'সাবা' শব্দের বিস্তারিত বিশ্লেষণ 'সাইলে আরেম' এর আলোচনা প্রসঙ্গে পরে আসবে। এখানে শুধু এতটুকু জেনে নেওয়া যথেষ্ট, কাহতানি বংশের একটি বিখ্যাত শাখার নাম 'সাবা'। 'সাবা' নামক এই লোক স্ব গোত্রের আদিপুরুষ ছিল। তার আসল নাম ওমর কিংবা আবদে শামস ছিল। আর 'সাবা' ছিল তার উপাধি। এটা আরব দেশীয় এবং আধুনিক যুগের ঐতিহাসিকগণের বিশ্লেষণ। আর তাওরাতের বর্ণনা মতে তার নামই ছিল 'সাবা'। এ লোকটি অত্যন্ত বাহাদুর ও সাহসী ছিল। সে খুব বিশাল বিজয়সমূহের দ্বারা সাবার রাজত্বের ভিত্তি স্থাপন করেছিল। সাবার সেই উন্নতির যুগ তত্ত্ববিদদের মতে খৃস্টপূর্ব প্রায় ১১০০ সন মনে করা হয়। কেননা খৃস্টপূর্ব প্রায় ১০০০ সন তার রাজত্ব, ক্ষমতা এবং উন্নতির উল্লেখ হযরত দাউদ আ.-এর যাবূরে বিদ্যমান রয়েছে।

সাবা রাজত্বের মূল কেন্দ্রস্থল ছিল আরবের দক্ষিণাংশে ইয়ামানের পূর্বাঞ্চল। এর রাজধানী ছিল মাআরেব। একে তারা সাবা শহর বলত। ক্রমে ক্রমে তার পরিধি সম্প্রসারিত হয়ে পশ্চিমে হাযরামাউত পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। আর অন্যদিকে আফ্রিকা পর্যন্তও তার প্রভাব পৌঁছে গিয়েছিল। ফলত আবিসিনিয়ার আযিনা অঞ্চল ধ্বংসমুখী হয়ে পড়েছিল এবং সাবা ইয়ামানে ও ইয়ামানের পার্শ্ববর্তী এলাকায় নিজের বিখ্যাত দুর্গ নির্মাণ করে নিয়েছিল। সাবা বংশের বিভিন্ন শাখা ছিল। দীর্ঘকাল পরে তাদের মধ্য হতে বহু শাখা একত্র হয়ে ইয়ামানকে রাজত্বের কেন্দ্রস্থল করে বিরাট সামাজিক জীবন ও রাজত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে নিল। তন্মধ্যে হিমইয়ার ও তাবাবেয়াহ

বিখ্যাত রাজন্যবর্গের শাখা। সাবায়ি শাসকগণ সাবার রাজা নামে খ্যাত। সাবার রাজাদের সর্বশেষ রাজত্বের যুগ খৃস্টপূর্ব ৫৫০ সন বলা হয়। [সূত্র : মুজামুল বুলদান ও দায়েরাতুল মাআরিফ-যিকরে সাবা]

সাবার রানির নাম

কুরআন মাজিদ হযরত সুলাইমান আ. ও সাবার রানির ঘটনায় উল্লেখ করে নি, রানির নাম কী ছিল। রানি সাবা রাজত্বের কেন্দ্র– ইয়ামান, আবিসিনিয়া ও উত্তর আরবের কোন কেন্দ্র হতে আগমন করেছিলেন। কেননা কুরআনের উদ্দেশ্যের জন্য দুনোটা বিষয়ই অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু ইহুদিদের ইসরাঈলী কাহিনিসমূহে উক্ত রানির নাম 'বিলকিস' বলে উল্লেখ রয়েছে। আর আবিসিনিয়াবাসী দাবি করে, তারা সাবার রানির ও হযরত সুলাইমান আ.-এর বংশধর। তাই নিজেদের ভাষায় তারা রানির নাম 'মাকিদা' বর্ণনা করেছে। কোন দিক হতে এসেছে, এ সম্বন্ধে 'তারগুম' (সাবা সম্বন্ধীয় ইনসাইক্লোপেডিয়া)-তে আছে, এ রানির রাজত্ব ফিলিস্তিনের পূর্ব দিকে। ইঞ্জিলে আছে, ফিলিস্তিনের দক্ষিণ দিকে। ইউসিফিউসের ইতিহাসে আছে, সে মিসর ও আবিসিনিয়ার রানি ছিল। আবিসিনিয়াবাসীরা তাকে হাবশী গোত্রের মনে করে এবং আবিসিনিয়ার শাসকরা আজও গর্ব করে বলে, তারা সাবার রানি বিলকিসের বংশধর।

এ বর্ণনাগুলোর মধ্যে তত্ত্বজ্ঞানীরা ইউসিফিউসের রেওয়ায়েতটিকে ভুল সাব্যস্ত করেন। আর বাকি দুটি রেওয়ায়েতের সারমর্ম একই বলে প্রকাশ করছেন। কেননা এ দুটি অংশ ইয়ামান রাজ্যেরই অংশ ছিল। আর ইঞ্জীলের বর্ণনাকে শুদ্ধ বলে মানছেন। তত্ত্ববিদগণ বলেন, খাস ইয়ামান অঞ্চলের শিলালিপি ও অন্যান্য চিহ্নসমূহ দ্বারা কোনো নারীশাসক থাকা প্রমাণিত হয় না। অবশ্য ইরাক সংলগ্ন উত্তর আরবে চারজন নারীশাসকের নাম পাওয়া যায়। সাবার রানি এ অঞ্চল থেকে হযরত সুলাইমান আ.-এর খেদমতে হাযির হয়ে ছিলেন।

সাবার রানির ইসলাম গ্রহণ

সাবার রানি বিলকিস হযরত সুলাইমান আ.-এর মর্যাদা এবং বুযুর্গি দেখে ইসলাম গ্রহণ করলেন। যেমন ইরশাদ হচ্ছে :

وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

আর এ পূর্ণ ঘটনায় হযরত সুলাইমান আ.-এর উদ্দেশ্য ছিল তা-ই। যা তিনি তাঁর পত্রে প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু রানি তখন তা লাভ করতে পারেন নি। জমহুর তাফসিরকারকগণের দৃষ্টিতে এখানে মীমাংসা সাপেক্ষ একটি প্রশ্ন রয়েছে, এ উদ্দেশ্যের জন্য হযরত সুলাইমান আ. রানিকে নিজের দরবারে ডেকে আনা তো ন্যায়সঙ্গতই হয়েছে। কিন্তু সিংহাসনকে এভাবে আনিয়ে নেওয়া এবং শীষমহলে রানির সঙ্গে সংঘটিত ব্যাপারটির সঙ্গে এ উদ্দেশ্যের কী সম্পর্ক? এরপর তাঁরা নিজেরাই এ প্রশ্নের

জবাব দিয়েছেন, এটার দ্বারা রানির ওপর প্রভাব বিস্তার করা উদ্দেশ্য ছিল। যেন সে বিশ্বাস করে, হযরত সুলাইমান আ. রানিকে ডেকে আনার উদ্দেশ্য পার্থিব লোভ কিংবা ধনসম্পদ ও রাজ্য বৃদ্ধি করা নয় বরং তা হতে বহু ঊর্ধ্বে অন্য একটি উদ্দেশ্য আছে। এতদ্ভিন্ন রানি যেন বুঝতে পারে, এতদুভয় ঘটনাই রাজকীয় ক্ষমতা ও প্রতাপ-প্রতিপত্তি প্রদর্শনের ঊর্ধ্বে। এটা হযরত সুলাইমান আ.-এর নবুয়তের সত্যতার নিদর্শন। এ জন্যই তাফসিরকারকগণ সাবার রানির উক্তি كُنَّا مُسْلِمِينَ বাক্যে ইসলামের অর্থ 'ঈমান আনয়ন' গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ রানি এবার প্রকৃত অর্থে ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

কিন্তু প্রশ্ন হয়, যদি كُنَّا مُسْلِمِينَ বলে রানি ইসলাম গ্রহণ করে থাকেন, তবে তার পরবর্তী আয়াতগুলির মধ্যে এ দুইটি বাক্যের অর্থ কী হবে ?

وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ

তাকে ঈমান আনয়ন করা হতে গায়রুল্লাহর (সূর্যের) এবাদত করা বিরত রেখেছিল। কেননা নিঃসন্দেহে সে কাফেরদের দলভুক্ত ছিল এবং

قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

অর্থাৎ শীষমহলের ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রানি বললেন, "এতদিন পর্যন্ত আমি শিরক করে নিজের ওপর যুলুম করেছি এবং এখন আমি সুলাইমানের সাথী হয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ওপর ঈমান আনলাম।"

এ বাক্য দুটি দ্বারা বুঝা যায়, كُنَّا مُسْلِمِينَ বলার সময় সে মুসলমান হয় নি। বরং এর পরে অন্য ঘটনায় প্রভাবিত হয়ে তখন ইসলাম গ্রহণ করার কথা ঘোষণা করেন। অথচ উভয় বিষয়েরই প্রকাশ হযরত সুলাইমান আ.-এর দরবারেই হচ্ছিল। কাজেই মুজাহিদ, সাঈদ এবং ইবনে জারীর রহ. এ প্রশ্নটিকে মেনে নিয়ে আলোচ্য আয়াতগুলির ব্যাখ্যায় বলেন : وَأُوتِينَا الْعِلْمَ বাক্যটি হতে مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ পর্যন্ত সম্পূর্ণই হযরত সুলাইমান আ.-এর উক্তি। আয়াতটির অর্থ হচ্ছে, হযরত সুলাইমান আ. বললেন, সাবার রানির আগমনের পূর্বেই আমি এটা জানতে পেরেছি, রানি কাফেরদের দলভুক্ত। আর আমরা সর্বাবস্থায়ই মুসলমান আর সূর্যপূজা রানিকে গায়রুল্লাহর পূজায় অভ্যস্ত করে এক আল্লাহ তাআলার ইবাদত হতে বিমুখ করে দিয়েছে।

ইবনে কাসীর রহ. বলেছেন, "এ তাফসিরটি প্রবল। কেননা সাবার রানি তখন পর্যন্ত মুসলমান হয় নি। বরং কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী শীষমহলের ঘটনার পরে ঈমান এনেছে। সুতরাং كُنَّا مُسْلِمِينَ রানির উক্তি হতে পারে না। কিন্তু এই তাফসিরের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। শাইখুল হিন্দ থেকে হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. বলেন : হযরত সুলাইমান আ. হুদহুদের দ্বারা যে পয়গাম প্রেরণ করেছিলেন, তাতে "মুসলমান হয়ে আমার নিকট চলে আস" লিখে সাবার রানিকে পরিষ্কার কথায় ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেছিলেন। কিন্তু রানি যেহেতু তাওহিদের স্বরূপ ও ইসলাম সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন,

তাই তিনি হযরত সুলাইমান আ.-এর উদ্দেশ্য বুঝতে পারেন নি। পত্রে "আমার উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করো না!" এবং وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ পাঠ করলেন, তখন রাজা বাদশাদের চিঠিপত্রের ধারার প্রতি লক্ষ করে তিনি মনে করলেন, হযরত সুলাইমান আ. নিজের বিপুল শক্তির জোরে আমাকে এবং আমার রাজ্যকে আজ্ঞাধীন ও ক্ষমতাধীন করতে চাচ্ছেন। কাজেই রানি নিজের সভাসদবৃন্দের সাথে পরামর্শ করে হযরত সুলাইমান আ.-এর অবগত হওয়ার জন্য সেই পন্থা অবলম্বন করলেন, যা কুরআন মাজিদ উল্লেখ করেছে।

আর যখন তাঁর এই বিশ্বাস হয়ে গেল, প্রকৃতপক্ষে সুলাইমান আ.-এর রাজকীয় আড়ম্বর এবং প্রবল প্রতাপ, দুনিয়ার সমস্ত সম্রাটদের চেয়ে অনেক উর্ধ্বে, তখন তিনি সিদ্ধান্ত করে ফেললেন, সুলাইমান আ.-এর সাথে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া সমীচীন হবে না। বরং তাঁর বশ্যতা ও আনুগত্যের মধ্যেই রয়েছে মুক্তি। কাজেই রানি শামের অভিমুখে যাত্রা করলেন। হযরত সুলায়মান আ. যখন এ সংবাদ অবগত হলেন, সাবার রানি তাঁর দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য রওনা হয়েছেন। তখন তিনি চিন্তা করলেন, এমন কোনো সূক্ষ্ম উপায় অবলম্বন করা উচিত, যাতে সাবার রানি নিজেই স্বীকার করতে বাধ্য হয়, সূর্যপূজা নিঃসন্দেহে পথভ্রষ্টতা। সরল ও সত্য পথ হল, শুধু এক আল্লাহ তাআলার ইবাদত করা।

সাবা সম্প্রদায়ের ধর্ম ছিল সূর্যপূজা করা। তারা মনে করত, বিশ্বজগতের কল্যাণ ও অকল্যাণ করার সর্বময় ক্ষমতা নক্ষত্রমণ্ডলীর হাতে। আর সূর্য যেহেতু তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং বিশ্বজগতের উপর প্রভাব ও ক্রিয়াশীল, তাই সে-ই পূজা পাওয়ার যোগ্য। কাজেই হযরত সুলাইমান আ. রানিকে বলতে চাইলেন, এ সমস্ত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ যাবতীয় বস্তুর উপর শুধু একক সত্তার একচ্ছত্র শাসন ও আধিপত্য রয়েছে। এবং তিনিই বিশ্বজগতের মাবুদ। আর সূর্য, চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রাদি সব কিছুই তাঁর শক্তি ও ক্ষমতা প্রকাশকারী।

সুতরাং মানুষের সর্বপ্রধান পথভ্রষ্টতা হল, আসল সত্তাকে ত্যাগ করে তাঁর অস্তিত্ব ও ক্ষমতা প্রকাশক বস্তুসমূহের পূজা করতে আরম্ভ করা। কেননা তা তাদের সম্মুখে দৃশ্যমান বস্তু। অথচ প্রকাশক বস্তুগুলি মূল সত্তার অস্তিত্বের জন্য প্রমাণ মাত্র, নিজেদের কোনো মূল সত্তাই নেই। এ কারণেই পরিবর্তন, অস্তিত্ব ধ্বংস, উদয় ও অস্ত, স্থায়িত্ব ও স্থিতিহীনতা-প্রকাশক বস্তুসমূহের শিরায় শিরায় ব্যাপৃত রয়েছে। আর মূলসত্তা অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার সত্তা এ সমস্ত পরিবর্তন হতে পবিত্র এবং বহু উর্ধ্বে।

এ চিন্তা করে তিনি রানির সিংহাসনটিকে ইয়ামান দেশ হতে উঠিয়ে আনলেন। যেন তার নিকট হতে একটি দৃষ্টান্ত প্রদান করে তাকে বলে দেন এবং তাঁর নিকট পরিষ্কার ও প্রমাণ করে দেন, দেখ! আমার এ দাবির প্রমাণ স্বয়ং তোমার এ রাজসিংহাসন। গভীরভাবে চিন্তা কর, এটা তোমার রাজত্ব ও প্রতিপত্তির প্রকাশস্থল এবং এ কারণেই

এটাকে রাজসিংহাসন বলা হয়। কিন্তু যখনই তুমি নিজের রাজ্য হতে গায়েব হয়ে গেলে, এ 'প্রকাশস্থল' অকর্মণ্য হয়ে গেল এবং গতকাল যে বস্তুটি তোমার প্রতাপ ও প্রতিপত্তির প্রকাশস্থল ছিল, আজ তা আমার দরবারের শোভাবর্ধন করছে। এবং এখানেও আকৃতি ও অবস্থার পরিবর্তনের দ্বারা তোমাকে তোমার স্থিতিহীনতা ও অস্থায়িত্বের শিক্ষা প্রদান করছে।

হযরত সুলাইমান আ.-এর এরূপ ইচ্ছা পোষণের কারণ– দেখি সে এ ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে হেদায়েত কবুল করে, না গুমরাহীর মধ্যেই থেকে যায়! অর্থাৎ এখানে হেদায়েত বলতে নির্দিষ্টরূপে ইসলামের হেদায়েতই উদ্দেশ্য। শুধু পথ প্রাপ্ত হওয়া উদ্দেশ্য নয়, যা প্রত্যেক ব্যাপারের মূল তথ্য অবগত হওয়ার জন্য ব্যাপক।

এই বর্ণনা পদ্ধতি দ্বারা হযরত সুলাইমান আ. সাবার রানিকে স্পষ্টরূপে জানিয়ে দিলেন, তাঁর বুযুর্গী ও প্রতাপ শুধু রাজকীয় ক্ষমতা এবং শাসক সুলভ শক্তি ও প্রতিপত্তির কারণ নয় বরং এর পিছনে আল্লাহ তাআলার সেই শক্তি কাজ করছে, যা রাজাধিরাজদের যবরদস্ত ক্ষমতার বহু উর্ধ্বে। কেননা পয়গম্বরসুলভ মর্যাদা ও বুযুর্গীর সাথে আল্লাহ তাআলার নিদর্শন সংশ্লিষ্ট থাকে। সঙ্গে সঙ্গে তাবলিগ ও দাওয়াতে ইসলামের উপর্যুক্ত বিশেষ পদ্ধতি দ্বারা এটাও পরিষ্কার করে দিলেন, 'সাবা' সম্প্রদায়ের সূর্য পূজা 'মূল সত্তাকে' ছেড়ে তাঁর অস্তিত্ব ও ক্ষমতার 'প্রকাশকের', 'চিরস্থায়ী সত্তা' হতে মুখ ফিরিয়ে অস্থায়ী পদার্থের, 'অনাদি অনন্ত সত্তা' হতে বিমুখ হয়ে নশ্বর বস্তুতে, 'অভাবশূন্য সত্তা' হতে দৃষ্টি ফিরিয়ে 'পরমুখাপেক্ষী পদার্থের এবং স্রষ্টা হতে দৃষ্টি ফিরিয়ে সৃষ্ট বস্তুর পূজা ইত্যাদি ভীষণ গোমরাহি এবং পথভ্রষ্টতা। আর ছিরাতুল মুস্তাকিম হল, শুধু মূল সত্তা এক আল্লাহ তাআলাকেই হিতাহিত ও মঙ্গলামঙ্গলের মালিক মনে করা এবং শুধু তাঁরই এবাদত করা।

কিন্তু সাবা সম্প্রদায় যেহেতু বহু শতাব্দী হতে গায়রুল্লাহর পূজায় বিশ্বাসী, রানি হযরত সুলাইমান আ.-এর সেই সূক্ষ্ম প্রমাণটি বুঝতে অক্ষম থেকে গেলেন। তাঁর জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা মূল সত্তার পরিচয় পর্যন্ত পৌঁছিতে সক্ষম হল না। সিংহাসনের এই পূর্ণ ঘটনাটি হতে রানি শুধু এতটুকু ফল লাভ করলেন, সুলাইমান আ. এ বিস্ময়কর ঘটনা দ্বারা নিজের অনুপম শান-শওকত প্রদর্শন করে আমাকে তাঁর আনুগত্য ও আজ্ঞাবহ হওয়ার জন্য প্রভাবিত করছেন। অতএব রানি এরূপ চিন্তা করে জবাব দিলেন : "আপনি যদি এ বিরাট প্রদর্শনী নাও করতেন, তবুও আমি পূর্ব হতেই আপনার মহিমা এবং অসীম ক্ষমতা সম্বন্ধে অবগত হয়েছি এবং আপনার বশীভূত এবং আজ্ঞাবহ হয়ে গিয়েছি।" কিন্তু এরপর আল্লাহ তাআলা তার বহু শতাব্দীর গোমরাহি এবং তার আসল তথ্য সম্বন্ধে উপলব্ধির ত্রুটির কারণও বর্ণনা করে দিয়েছেন, "চিরদিনের সূর্যপূজা এখনও তাকে ইসলাম কবুল করা হতে নিবৃত্ত রেখেছে এবং সে এখনও কাফেরই রয়েছে।"

এর পর হযরত সুলাইমান আ. অন্য একটি মহিমা প্রদর্শন করলেন। এ ব্যাপারে যা পূর্বটি অপেক্ষা অধিক স্পষ্ট এবং উজ্জ্বল ছিল। তা ছিল কাঁচের প্রাসাদের ঘটনাটি। রানি যখন স্বচ্ছ পরিস্কার পানি প্রবাহিত হচ্ছে মনে করে কাপড় গুটিয়ে তাতে নামবার ইচ্ছা করলেন, তখন তাঁকে বলা হল– যে বস্তুকে তুমি পানি মনে করছ তা কাঁচের প্রতিচ্ছায়া, পানি নয়। রানি যখন রহস্য বুঝতে পারলেন, তখন তাঁর ধ্যান ধারণা এদিকে মোড় নিল, হযরত সুলাইমান আ.-এর এ সমস্ত প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য কী? এখন তার জ্ঞান ও বিবেক এ তথ্যটি উপলব্ধি করতে পারল, যেভাবে আমি এখানে ভুল করে এক বস্তুর প্রতিচ্ছায়া ও প্রকাশস্থলকে মূলবস্তু মনে করে তার সাথে মূলবস্তুর মতো আচরণ করতে চেয়েছি, তদ্রুপই নিঃসন্দেহ আমি ও আমার কওম এই ভুলে পতিত রয়েছি, সূর্যের পূজা করছি। অথচ এটা মূল সত্তা এক আল্লাহ তাআলার অসীম ক্ষমতার প্রকাশস্থলসমূহ হতে একটি প্রকাশস্থল মাত্র। এটা অপেক্ষা অধিক আর কোনো যুলুম হতে পারে, মূল সত্তাকে ছেড়ে তাঁর প্রকাশস্থলকে পূজা করা হয়। এখন রানি বুঝতে পারলেন, হযরত সুলাইমান আ.-এর পবিত্র চিঠির মধ্যে লিখিত وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ 'মুসলমান হয়ে আমার নিকট চলে আস' কথার উদ্দেশ্য কী ছিল। রানির মনে এই কল্পনা আসামাত্র তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন,

رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. এর এই তাফসির দ্বারা আয়াতগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সর্বনামসমূহের লক্ষ্যস্থলের শৃঙ্খলাতেও কোনো প্রকারের দোষ-ত্রুটি ঘটে না। এবং বাক্যের মধ্যে কোনো কিছু বিলুপ্ত কিংবা উহ্য মানারও প্রয়োজন হয় না। উভয় ঘটনা সম্বন্ধীয় হেকমত ও মুছলেহাত এবং হযরত সুলাইমান আ.-এর পয়গম্বরসুলভ দাওয়াত ও নসিহত এবং মর্যাদা, মহিমা ও মাহাত্মের বিকাশও খুব সুন্দরভাবে হয়ে যায়।

প্রথম বাক্যে সাবার রানি এমন কোনো কথার উল্লেখ করেন নি; যাতে তিনি শিরকের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে ইসলাম কবুল করেছেন। এ কারণে আল্লাহ তাআলা রানির সেই বাক্যের পরেও এটাই প্রকাশ করেছেন, "সূর্যপূজা' তাকে ইসলাম গ্রহণে বিরত রেখেছে এবং তিনি কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু শেষের বাক্যটিতে রানি স্পষ্টরূপেই স্বীকার করেছেন, এখন তাঁর ইসলাম, আভিধানিক অর্থের আনুগত্য এবং বশ্যতা নয়; বরং ইসলাম ধর্মের পারিভাষিক অর্থের ইসলাম, আর সেই আনুগত্য সুলাইমান আ.-এর নয়; বরং সুলাইমান আ.-এর সঙ্গ অবলম্বন করে রাব্বুল আলামিন এর আনুগত্য। খুব সম্ভত এই পার্থক্যের প্রতি লক্ষ করেই রানি প্রথম বাক্যে নিজের সাথে সমস্ত সভাসদবৃন্দ ও প্রজাবৃন্দকে শামিল করে বহুবচনের শব্দে বর্ণনা করেছেন।

কেননা হযরত সুলাইমান আ.-এর রাজকীয় ক্ষমতার বশ্যতা স্বীকারের বিষয়টি রানি এবং তাঁর রাজসভার সভ্যবৃন্দের ঐকমত্যের সিদ্ধান্ত ছিল। আর ইসলাম ধর্ম কবুল করার বিষয়টি ছিল তাঁর নিজের একক মত ও ব্যক্তিগত বিশ্বাসে। সুতরাং তা প্রকাশের

সময় তিনি একবচনের শব্দ ব্যবহার করেছেন। যদিও সেকালের নিয়মানুযায়ী রাজার ধর্ম আপনাআপনিই প্রজাবৃন্দের কবুলকৃত ধর্ম হয়ে যেত। আর এটাও সম্ভব, তাঁর অনুসরণে তাঁর সভাসদ এবং প্রজাবৃন্দও ইসলাম ধর্ম কবুল করে থাকবে। ফলকথা, হযরত শাইখুল হিন্দ রহ.-এর তাফসির খুবই সূক্ষ্ম এবং সর্বদিক দিয়ে প্রবল ও গ্রহণযোগ্য।

তাওরাতে সাবার রানি

তাওরাতেও হযরত সুলাইমান আ. ও সাবার রানির সাক্ষাতের কথা উল্লেখ রয়েছে : "আর যখন আল্লাহ তাআলার নাম প্রচার সম্বন্ধে হযরত সুলাইমান আ.-এর খ্যাতি সাবার রানির নিকট পর্যন্ত পৌঁছল, তখন তিনি জটিল প্রশ্নসমূহের দ্বারা হযরত সুলাইমান আ.-কে পরীক্ষা করার জন্য তাঁর সমীপে আগমন করলেন, বিরাট শোভাযাত্রা ও উষ্ট্রের পাল সহকারে, যাতে সুগন্ধি দ্রব্যাদি বোঝাই করা ছিল এবং বহু স্বর্ণ ও মহামূল্যবান হীরা-জহরত সঙ্গে নিয়ে জেরুযালেম পৌঁছলেন। তিনি সুলাইমান আ.-এর দরবারে এসে তাঁর কল্পিত সমস্ত বিষয় তাঁর সাথে আলাপ করলেন। হযরত সুলাইমান আ. তাঁর সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিলেন। সুলাইমান আ.-এর নিকট কোনো বিষয়ই অজ্ঞাত ছিল না, তিনি রানির প্রশ্নসমূহের জবাব দিতে পারবেন না।

সাবার রানি হযরত সুলাইমান আ.-এর সমস্ত জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার অবস্থা এবং সেই শীষমহলটি– যা হযরত সুলাইমান আ. রানির জন্য নির্মাণ করেছিলেন এবং দস্তরখানের নেয়ামতসমূহকে এবং তাঁর সভাসদবৃন্দের আসনসমূহকে এবং তাঁর 'সাকিদেরকে, আর সেই সিঁড়িটিকে– যার দ্বারা তিনি খোদাওয়ান্দ তাআলার দরবারে গমন করতেন– দেখলেন, তখন তিনি হতভম্ব হয়ে গেলেন। তিনি সুলাইমান আ.-কে বললেন–

"এটা যথার্থ সংবাদই ছিল, যা আপনার বুযুর্গী ও বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে আমি রাজ্যে বসে প্রাপ্ত হয়েছিলাম। আপনার যে সংবাদ লোকমুখে শ্রবণ করেছিলাম, তা প্রকৃত ব্যাপারে অর্ধেকও ছিল না। কেননা আপনার বুদ্ধিমত্তা, আড়ম্বর ও জাঁকজমক যা দেখতে পাচ্ছি, তা আমার শ্রুত সংবাদের চেয়ে বহু গুণের অধিক। আপনার লোকেরা সকলেই নেককার, আর আপনার খাস সভাসদবৃন্দ– যারা সর্বদা আপনার দরবারে হাযির থাকে, তাঁরাও নেককার, খোদাওয়ান্দ আপনার কথা শ্রবণ করেন। আপনার খোদা মোবারক। যিনি আপনার প্রতি সন্তুষ্ট এবং আপনাকে ইসরাঈলের সিংহাসনে বসিয়েছেন। কেননা খোদাওয়ান্দ ইসরাঈলীদেরকে সর্বদা ভালোবাসেন।"

তাওরাতের বর্ণনায় যদিও রানির মুসলমান হওয়ার কথা উল্লেখ নেই; কিন্তু শেষের বাক্যগুলি প্রকাশ করছে, সে ইসরাঈলী খোদার উপর ঈমান এনেছিল। সে কারণেই তাঁর উল্লেখ এত শ্রদ্ধার সাথে করছে। কিন্তু কুরআন ও তাওরাতের বর্ণনার মধ্যে একটা পার্থক্য সুস্পষ্ট, কুরআন মাজিদের বর্ণনায় বুঝা যায়, হযরত সুলাইমান আ. এমন মর্যাদা এবং বুযুর্গীর সাথে সাবার রানির সঙ্গে আচরণ করেছেন, যা একজন উচ্চ শ্রেণীর

পয়গম্বরের মতো ছিল। আর কুরআন মাজিদের বর্ণনার প্রতি কথায় কথায় পয়গম্বরী শান অনুযায়ী তাবলিগ ও দাওয়াতে ইসলাম দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাওরাতের বর্ণনায় হযরত সুলাইমানের বুদ্ধিমত্তা এবং রাজকীয় ক্ষমতা ব্যতীত আর কিছুই প্রকাশ পায় না।

এটা বনি ইসরাঈলদের সেই ভুল আকিদারই ফল, যা তারা হযরত সুলাইমান আ. সম্বন্ধে মিথ্যা আবিষ্কার করে নিয়েছে– তিনি পয়গম্বর নন, শুধু বাদশা। আর কুরআন মাজিদ যেহেতু আকিদা ও আমলসমূহের সংশোধনের সাথে সাথে প্রাচীনকালের উম্মতদের এবং তাদের নবী ও রাসূলদের সম্বন্ধীয় ঘটনাবলীতে বনি ইসরাঈলদের বিকৃতকরণ, পরিবর্তন সাধন এবং তাদের ভুল ও অনর্থক মনগড়া আবিষ্কারসমূহের সংশোধনেরও দাবিদার, তাই কুরআন মাজিদ এ স্থলেও আলোচ্য ঘটনা সম্বন্ধে প্রকৃত ও সঠিক তথ্য বর্ণনা এবং সেই ভুলসমূহকে প্রকাশ করে দিয়েছে, যা উম্মতদের বিকৃতকরণের দরুন পূর্বের আসমানি কিতাবসমূহে পাওয়া যায়।

বিলকিসের বিবাহ

তাফসিরের কিতাবসমূহে বর্ণিত আছে, ইসলাম গ্রহণের পর হযরত সুলাইমান আ. সাবার রানি বিলকিসকে বিবাহ করেন এবং তাঁকে নিজ রাজ্যে প্রত্যাগমনের অনুমতি প্রদান করেন। এরপর হযরত সুলাইমান আ. সময় সময় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন।

(তারিখে ইবনে কাসীর : ২/২৪)

কিন্তু কুরআন মাজিদে ও সহি হাদিসে তাদের বিবাহ হওয়া বা না হওয়া সম্বন্ধে কোনোই উল্লেখ নেই।

বনি ইসরাঈলদের মিথ্যা অপবাদ

ইহুদিরা তাদের আসমানি কিতাবে বহু রদবদল করেছে। যেমন হযরত দাউদ ও হযরত সুলাইমান আ.-এর ব্যাপারে তো তারা এত দুঃসাহসিকতা অবলম্বন করেছে, তাঁদের নবুয়ত পর্যন্ত অস্বীকার করেছে, তাঁদের প্রতি নানা প্রকার দোষারোপ করেছে এবং অনর্থক মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছে। হযরত সুলাইমান আ.-এর প্রতি তারা একটি দোষারোপ করেছিল, তিনি জাদুবিদ্যা জানতেন এবং তারই বলে তিনি "সম্রাট সুলায়মান" ছিলেন এবং জিন, ইনসান, যাবতীয় জন্তু ও পক্ষীসমূহকে বশীভূত করে নিয়েছিলেন।

কুরআন মাজিদ বনি ইসরাঈলদের আরোপিত সে সমস্ত অপবাদকে প্রমাণ দ্বারা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন সাব্যস্ত করেছে এবং হযরত সুলাইমান আ.-এর পয়গম্বরী শান ও মর্যাদাকে সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল করে দিয়েছে। কুরআন পাক বলেছে, হযরত সুলাইমান আ.- জাদুর অপবিত্রতা থেকে পবিত্র ও মুক্ত ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে হযরত সুলাইমান আ.-এর যমানায় বনি ইসরাঈলদেরকে গোমরাহ করার জন্য (মানব ও দানব জাতীয়) শয়তানেরা জাদু শিখিয়েছিল। এবং উক্ত জাদুসমূহকে বইয়ের মধ্যে সংকলিত করা হয়েছে।

contents

ইহুদিরা সেটা শিখতে ও মানুষদের শিখাতে শুরু করল। তখন বনি ইসরাঈলদের মধ্য হতে বিশিষ্ট হকপন্থীরা তাদেরকে বুঝিয়ে বলল, "এটা (যাদুবিদ্যা) নেহায়েত পথভ্রষ্টতা ও কুফর।" তোমরা এটা হতে বিরত থাকো! তখন শয়তানের প্ররোচনায় তারা বলতে লাগল, এটা হযরত সুলাইমান আ.-এর শিখানো বিদ্যা। সুলাইমান এরই দ্বারা এত বড় রাজ্যের রাজত্বের অধিপতি হয়েছিলেন। এই বলে তারা নিজেদের ভ্রান্ত পথের উপর প্রতিষ্ঠিত রইল। কিন্তু তারা এ উক্তিতে সম্পূর্ণরূপে মিথ্যাবাদী এবং হযরত সুলাইমান আ.-এর উপর মিথ্যাপবাদ আরোপ করছে।

সুদ্দী রহ. বলেন, হযরত সুলাইমান আ.-এর জীবিতকালেই বনি ইসরাঈলদের মধ্যে এই গোমরাহী আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে এ কথাও প্রসিদ্ধ হয়ে পড়েছিল, "জিনজাতি গায়েবি ইলম জানে।" হযরত সুলাইমান আ. এ সংবাদ জানতে পেরে শয়তানদের সংকলিত সেই দফতরগুলোকে সংগ্রহ করে নিজের সিংহাসনের নিচে পুঁতে রেখেছিলেন। যেন কোনো জিন বা মানুষের সেখান পর্যন্ত পৌঁছানোর দুঃসাহস না হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে আদেশ জারি করে দিলেন, "যে ব্যক্তি জাদু প্রয়োগ করবে বা জিন জাতি সম্বন্ধে গায়েবি ইলম জানার আকিদা পোষণ করবে, তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। কিন্তু হযরত সুলাইমান আ.-এর ইনতেকালের পর শয়তানরা সেই প্রোথিত জাদুভাণ্ডারকে বের করে নিল এবং বনি ইসরাঈলদের মধ্যে এ আকিদা ছড়িয়ে দিল, জাদুবিদ্যাটি হযরত সুলাইমান আ.-এর বিদ্যা। তিনি এ জাদুবিদ্যার বলেই জিন ইনসান, যাবতীয় জীবজন্তু, পক্ষীকুল এবং বায়ুর উপর রাজত্ব করতেন। এরূপে শয়তানেরা বনি ইসরাঈলদের মধ্যে পুনরায় জাদু-বিদ্যার প্রচলন করে দিল।

হযরত সুলাইমান আ. সম্পর্কে সূরা 'সাদ'-এ ইরশাদ হচ্ছে :

وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (٣٠) إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ (٣١) فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ (٣٢) رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ (٣٣) وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ (٣٤) قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (٣٥) فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ (٣٦) وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ (٣٧) وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ (٣٨) هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٩) وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ

আমি দাউদকে দান করলাম সুলাইমান। সে ছিল উত্তম বান্দা এবং সে ছিল অতিশয় আল্লাহ অভিমুখী। যখন অপরাহ্নে তার সম্মুখে ধাবনোদ্যতা উৎকৃষ্ট অশ্বরাজিকে উপস্থিত করা হল, তখন সে বলল, 'আমি তো আমার প্রতিপালকের স্মরণ হতে বিমুখ

হয়ে সম্পদ প্রীতিতে মগ্ন হয়ে পড়েছি, এ দিকে সূর্য অস্তমিত হয়ে গিয়েছে। এগুলোকে পুনরায় আমার সম্মুখে আনয়ন কর। তারপর সে এগুলোর পা ও গলা ছেদন করতে লাগল। আমি সুলাইমানকে পরীক্ষা করলাম এবং তার আসনের ওপর রাখলাম একটি ধড়; তারপর সুলাইমান আমার অভিমুখী হল। সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে দান কর এমন এক রাজ্য, যার অধিকারী আমি ছাড়া কেউ না হয়। তুমি তো পরম দাতা। তখন আমি তার অধিন করেছিলাম বায়ুকে, যা তার আদেশে সে যেখানে ইচ্ছে করত সেথায় মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হত এবং শয়তানদেরকে, যারা সকলেই ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী এবং শৃঙ্খলে আবদ্ধ আরও অনেককে। এসব আমার অনুগ্রহ, এ থেকে তুমি অন্যকে দিতে অথবা নিজে রাখতে পার। এর জন্যে তোমাকে হিসেব দিতে হবে না। এবং আমার নিকট রয়েছে তার জন্যে নৈকট্যের মর্যাদা ও শুভ পরিণাম। (সূরা সাদ : ৩০-৪০)

এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ পাক বলেন, তিনি দাউদ আ.-কে পুত্র হিসেবে সুলাইমান আ.-কে দান করেছেন। এরপর তাঁর প্রশংসা করে তাঁর উৎকৃষ্ট, শক্তিশালী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দ্রুতগামী অশ্ব সম্পর্কিত ঘটনার উল্লেখ করেছেন। ওই শক্তিশালী অশ্বগুলো পূর্ণ তিন পায়ের উপর এবং চতুর্থ পায়ের একাংশের উপর ভর করে দাঁড়াত। তখন সে বলল, আমি তো আমার প্রতিপালকের স্মরণ থেকে বিমুখ হয়ে সম্পদ প্রীতিতে মগ্ন হয়ে পড়েছি, এদিকে সূর্য অস্তমিত হয়ে গিয়েছে।" কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন, ঘোড়া চোখের আড়ালে চলে গিয়েছে। "এগুলোকে পুনরায় আমার সম্মুখে আনয়ন কর। এরপর সে ঐগুলোর পদ ও গলদেশ ছেদন করতে লাগল।" এ কথার দু রকম তাফসির করা হয়েছিল। প্রথম মতে অর্থ হল, তিনি তরবারি দ্বারা ঘাড়ের রগ ও গলদেশ কেটে দিয়েছেন। দ্বিতীয় মতে অর্থ হল, ঘোড়াগুলোকে প্রতিযোগিতা করানোর পর ওগুলোকে ফিরিয়ে এনে তিনি ওগুলোর ঘাম মুছে দেন। অধিকাংশ আলেম প্রথম মত সমর্থন করেন। তাঁরা বলেছেন, হযরত সুলাইমান আ. অশ্বরাজি পরিদর্শন করার কাজে ব্যস্ত থাকায় আসরের নামাযের সময় অতিবাহিত হয়ে যায় এবং সূর্য অস্তমিত হয়।

হযরত আলি রাযি. সহ কতিপয় সাহাবি থেকে এরূপ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এই বক্তব্যের উপর আপত্তি তোলা যায়, তিনি ওযর ব্যতীত কখনও ইচ্ছাকৃতভাবে নামায কাযা করেন নি বলে নিশ্চিতরূপে বলা যায়। অবশ্য এ আপত্তির উত্তর এভাবে দেওয়া যায়, তাঁর অশ্বরাজি ছিল জিহাদের জন্যে প্রস্তুত। তিনি সেগুলো পরিদর্শন করছিলেন আর এ জাতীয় ব্যাপারে নামায আদায় বিলম্ব করা তখনকার শরিয়তে বৈধ ছিল। যেসব মুফাসসির ঘোড়া আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন, তাঁদের মতে সুলাইমান আ.-এর নামায কাযা হয় নি। এবং رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ আয়াতের অর্থ পূর্বের অর্থের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হবে। তখন এর অর্থ হবে, ঘোড়াগুলিকে আমার কাছে ফিরিয়ে আন। ফিরিয়ে আনার পর তিনি সেগুলোর গলদেশ ও পায়ে হাত বুলিয়ে

আদর করেন ও ঘাম মুছিয়ে দেন। ইবনে জারীর এই তাফসিরকে সমর্থন করেছেন। তিনি এ তাফসিরকে এ কারণে অগ্রাধিকার দিয়েছেন, এতে সম্পদ বিনষ্ট করার অভিযোগ এবং বিনা অপরাধে পশুকে রগ কেটে শাস্তি দেওয়ার আপত্তি থাকে না। কিন্তু এ তাফসিরও প্রশ্নাতীত নয়। কেননা হতে পারে পশু এভাবে যবেহ করা তখনকার শরিয়তে বিধিসম্মত ছিল। এ কারণে আমাদের অনেক আলেম বলেছেন, মুসলমানদের যদি আশঙ্কা হয়, তাদের গনিমতে প্রাপ্ত কিংবা অন্য কোনো উপায়ে প্রাপ্ত পশু কাফেররা দখল করে নেবে, তখন এসব পশু নিজেদের হাতে যবেহ করা ও ধ্বংস করে দেওয়া বৈধ, যাতে কাফেররা এগুলো দখল করে শক্তি সঞ্চয় করতে না পারে। এ যুক্তিতেই হযরত জাফর ইবনে আবু তালেব রাযি. মূতার যুদ্ধে নিজের অশ্বের পা নিজেই কেটে দিয়েছিলেন। কথিত আছে, হযরত সুলাইমান আ.-এর ছিল বিরাট অশ্ব পাল। কারও মতে দশ হাজার এবং কারও মতে বিশ হাজার। কেউ কেউ বলেছেন, এসব অশ্বের মধ্যে বিশটি অশ্ব ছিল ডানা বিশিষ্ট।

আবু দাউদ রহ. তাঁর সুনান গ্রন্থে আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবূক অথবা খায়বার যুদ্ধ থেকে মদিনায় ফিরে যখন বাড়িতে এলেন, তখন বাতাসে পর্দা সরে যাওয়ার ওই ফাঁক দিয়ে দেখেন, আয়েশা রাযি. ঘরের মধ্যে কাপড়ের পুতুল নিয়ে খেলা করছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আয়েশা! এগুলো কি? আয়েশা বললেন, এগুলো আমার মেয়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুতুলদের মাঝে দুই ডানা বিশিষ্ট একটা কাপড়ের ঘোড়া দেখে জিজ্ঞেস করেন, মাঝখানে ওটা কি দেখা যায়? আয়েশা বললেন, ওটা ঘোড়া। রাসূলুল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, ঘোড়ার উপর ওটা কি? আয়েশা বললেন, ওটা ঘোড়ার দুই ডানা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঘোড়ার আবার দুই ডানা হয় নাকি? আয়েশা রাযি. বললেন : কেন, আপনি কি শুনেন নি, সুলায়মান আ.-এর ঘোড়া ডানা বিশিষ্ট ছিল? আয়েশা রাযি. বলেন, আমার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনভাবে হাসলেন, আমি তার মাড়ির শেষ দাঁত পর্যন্ত দেখতে পেলাম।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, সুলাইমান আ. আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে অশ্বরাজি বিনষ্ট করার পর আল্লাহ তাঁকে আরও উত্তম বস্তু দান করেন, তা হল আল্লাহ বাতাসকে তাঁর অনুগত করে দেন, যার সাহায্যে তিনি এক সকালে এক মাসের পথ এবং এক বিকেলে এক মাসের পথ অতিক্রম করতে পারতেন।

এর সমর্থনে ইমাম আহমদ রহ. কাতাদা ও আবুদ দাহমা রহ. থেকে বর্ণনা করেন। তাঁরা দুজন প্রায়ই বায়তুল্লাহ সফর করতেন। এমনি এক সফরে তাঁদের সাথে এক বেদুইনের সাক্ষাৎ হয়। বেদুইন লোকটি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরে কাছে নিয়ে কিছু বিষয় শিক্ষা দিলেন, যা স্বয়ং আল্লাহ তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি আমাকে বললেন : আল্লাহর ভয়ে তুমি যা কিছু ত্যাগ করবে, তার চেয়ে অধিক উত্তম বস্তু আল্লাহ তোমাকে দান করবেন।

হযরত সুলাইমান আ. সম্পর্কে আরো বিস্তারিত আলোচনা আছে। যার অধিকাংশ বা সম্পূর্ণটা ইসরাঈলী বর্ণনা। এর অধিকাংশ ঘটনাই খুবই আপত্তিকর। ওইসব বর্ণনার সারমর্ম হচ্ছে, সুলাইমান আ. সিংহাসন থেকে চল্লিশ দিন অনুপস্থিত থাকেন। চল্লিশ দিন পর পুনরায় সিংহাসনে ফিরে আসেন এবং বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণ করার আদেশ দেন। ফলে অত্যন্ত মজবুতভাবে বায়তুল মুকাদ্দাসের মসজিদটি নির্মিত হয়। কিন্তু মূলত হযরত সুলাইমান আ. বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণ করেন নি, বরং পুনঃনির্মাণ করেছিলেন। এটি প্রথমে নির্মাণ করেছিলেন হযরত ইয়াকুব আ.।

এ সম্পর্কে হযরত আবু যর রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, সর্বপ্রথম নির্মিত মসজিদ কোনটি? তিনি বললেন, মসজিদুল হারাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপরে কোনটি? তিনি বললেন, বায়তুল মুকাদ্দাসের মসজিদ। আমি জিজ্ঞেস করলাম। এ দুই মসজিদ নির্মাণের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কত? তিনি বললেন, চল্লিশ বছর। এখানে উল্লেখ্য, মসজিদে হারামের নির্মাতা হযরত ইবরাহীম আ. ও হযরত সুলাইমান আ.-এর মাঝে সময়ের ব্যবধান চল্লিশ বছর তো হতেই পারে না। বরং তা এক হাজার বছরেরও বেশি।

হযরত সুলাইমান আ. আল্লাহর নিকট এমন একটা রাজত্ব পাওয়ার আবেদন করেছেন, যেরূপ রাজত্ব তাঁর পরে আর কাউকে দেওয়া হবে না, এর মর্ম হল, বায়তুল মুকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা। এ সম্পর্কে ইমাম আহমদ, নাসায়ি, ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযায়মা, ইবনে হিব্বান, হাকিম রহ. প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ নিজ নিজ সনদে ... 'আমর ইবনুল আস রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সুলাইমান আ. বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণ করার সময় আল্লাহর নিকট তিনটি বিষয় চেয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তাঁকে দুটি দান করেছেন। আশা করি, তৃতীয়টি আল্লাহ আমাদেরকে দান করবেন। তিনি আল্লাহর কাছে চেয়েছিলেন এমন ফয়সালা দানের ক্ষমতা, যা আল্লাহর ফয়সালার সাথে মিলে যায়। আল্লাহ তাঁকে তা দান করেন।

তিনি আল্লাহর নিকট এমন একটা রাজত্ব পাওয়ার আবেদন করেন, যে রকম রাজত্ব তাঁর পরে আর কাউকে দেওয়া হবে না। আল্লাহ এটাও তাঁকে দান করেন। তিনি আল্লাহর নিকট আবেদন করেন, কোনো লোক যদি এ (বায়তুল মুকাদ্দাস) মসজিদে কেবল নামায আদায় করার উদ্দেশ্যেই ঘর থেকে বের হয়, সে যেন এমন নিষ্পাপ হয়ে বেরিয়ে যায়, যেমন নিষ্পাপ ছিল সে মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিন। আমরা আশা করি, এ তৃতীয়টা আল্লাহ আমাদেরকে দান করবেন। সুলাইমান আ. যে ফয়সালা দিতেন, তা যে আল্লাহর ফয়সালা অনুযায়ী হত সে প্রসঙ্গে আল্লাহ তাঁর ও তাঁর পিতার প্রশংসায় বলেছেন :

وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ
(٧٨) فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا

"এবং স্মরণ কর দাউদ ও সুলাইমানের কথা, যখন তারা বিচার করছিল শস্যক্ষেত সম্পর্কে; তাতে রাত্রিকালে প্রবেশ করেছিল কোনো সম্প্রদায়ের মেষ; আমি প্রত্যক্ষ করছিলাম তাদের বিচার। এবং আমি সুলাইমানকে এ বিষয়ের মীমাংসা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং তাদের প্রত্যেককে আমি দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান।"

(সূরা আম্বিয়া : ৭৮-৭৯)

কাযি শুরাইহ ও অন্যান্য কতিপয় প্রাচীন মুফাস্সির এ আয়াতের শানে নুযূলে লিখেছেন : হযরত দাউদ আ.-এর নিকট যারা বিচারপ্রার্থী হয়েছিল তাদের আঙ্গুরের ক্ষেত ছিল। অন্য এক সম্প্রদায় তাদের মেষপাল রাত্রিবেলায় ওই ক্ষেতে ঢুকিয়ে দেয়। ফলে মেষপাল আঙ্গুরের গাছ খেয়ে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করে ফেলে। এরপর বাদী-বিবাদী উভয় দল হযরত দাউদ আ.-এর নিকট মীমাংসার জন্যে আসে। ঘটনার বিবরণ শুনে তিনি আঙ্গুর ক্ষেতের মালিক পক্ষকে তার ক্ষয়-ক্ষতির সমপরিমাণ মূল্য প্রদান করার জন্যে মেষ-মালিক পক্ষকে নির্দেশ দেন। তারা সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পথে হযরত দাউদ আ.-এর পুত্র সুলাইমানের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হয়। হযরত সুলাইমান আ. জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহর নবী তোমাদেরকে কী ফয়সালা দিয়েছেন? তারা ফয়সালার বিবরণ শুনাল।

হযরত সুলাইমান আ. বললেন : যদি আমি এ ঘটনার বিচার করতাম, তা হলে এ রায় দিতাম না, বরং আমার ফয়সালা হত– মেষপাল আঙ্গুর ক্ষেতের মালিক পক্ষকে দেওয়া। তারা এগুলোর দুধ, বাচ্চা, পশম থেকে উপকৃত হতে থাকত আর ক্ষেত মেষপালের মালিক পক্ষের নিকট অর্পণ করা হত। তারা তাতে চাষাবাদ করে শস্য উৎপন্ন করত। যখন শস্য ক্ষেত্র মেষপালক দ্বারা বিনষ্ট হওয়ার পূর্বের অবস্থায় পৌঁছে যেত, তখন শস্য ক্ষেত্র ক্ষেতের মালিক পক্ষকে এবং মেষপাল মেষের মালিক পক্ষকে ফিরিয়ে দেওয়া হতো। এ কথা হযরত দাউদ আ.-এর কর্ণগোচর হলে তিনি পূর্বের রায় রহিত করে সুলাইমানের মত অনুযায়ী পুনরায় রায় দেন।

এ ধরনের অপর একটি ঘটনা বুখারী শরীফে হযরত আবু হোরায়রা রাযি. সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দুই মহিলা একসঙ্গে সফর করছিল। উভয়ের কোলে ছিল দুগ্ধপোষ্য শিশু পুত্র। পথে একটি শিশুকে বাঘ নিয়ে যায়। অপর শিশুকে উভয় মহিলা নিজের পুত্র বলে দাবি করে এবং পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হয়। দুজনের মধ্যে বড়জন বলল, তোমার পুত্রকে বাঘে নিয়ে গেছে আর কনিষ্ঠা মহিলাটি বলল : না, বরং তোমার পুত্রকেই বাঘে নিয়েছে।

এরপর মহিলাদ্বয় হযরত দাউদ আ.-এর নিকট এর মীমাংসায় জন্যে যায়। তিনি উভয়ের বিবরণ শুনে বড়জনের পক্ষে রায় দেন। কারণ, শিশুটি তার কাছে ছিল এবং

ছোট জনের পক্ষে কোনো সাক্ষী ছিল না। বিচারের পর তারা যখন বেরিয়ে যাচ্ছিল, তখন সুলাইমান আ.-এর সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয়। তিনি বিচারের বর্ণনা শোনার পর একটা ছুরি আনার হুকুম দেন এবং বলেন, আমি শিশুটিকে সমান দুভাগ করে প্রত্যেককে অর্ধেক করে দিব। তখন কনিষ্ঠা মহিলাটি বলল, আল্লাহ আপনাকে রহম করুন, আপনি ওকে দ্বি-খণ্ডিত করবেন না, শিশুটি ওই মহিলারই, আপনি ওকে দিয়ে দিন। (তখন স্পষ্ট হয়ে গেল, শিশুটি কনিষ্ঠা মহিলারই) তাই তিনি শিশুটিকে কনিষ্ঠা মহিলাকেই প্রদান করেন।

সম্ভবত উভয় প্রকার বিচার তখনকার শরিয়তে চালু ছিল। তবে সুলাইমান আ.-এর বিচার ছিল অধিকতর গ্রহণযোগ্য। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদে প্রথমে সুলাইমান আ.-এর সুবিচারের প্রশংসা করার পর তাঁর পিতা দাউদ আ.-এর প্রশংসা করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেছেন :

وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ (٧٩) وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ

"এবং তাদের প্রত্যেককে আমি দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান। আমি পর্বত ও বিহঙ্গকুলকে অধীন করে দিয়েছিলাম। ওরা দাউদের সঙ্গে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করত। আমিই ছিলাম এ সমস্তের কর্তা। আমি তাকে তোমাদের জন্যে বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে তা তোমাদের যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করে। সুতরাং তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে না?" (সূরা আম্বিয়া : ৭৯-৮০)

এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ (٨١) وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَٰلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ

"এবং সুলাইমানের বশীভূত করে দিয়েছিলাম উদ্দাম বায়ুকে; তা তার আদেশক্রমে প্রবাহিত হত সেই দেশের দিকে, যেখানে আমি কল্যাণ রেখেছি; প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে আমি সম্যক অবগত। এবং শয়তানদের মধ্যে কতক তার জন্যে ডুবুরীর কাজ করত; তা ছাড়া অন্য কাজও করত; আমি ওদের রক্ষাকারী ছিলাম।" (সূরা আম্বিয়া : ৮১-৮২)

হযরত সুলাইমান আ. যখন আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাঁর রক্ষিত অশ্বরাজির মায়া ত্যাগ করলেন তখন আল্লাহ তার পরিবর্তে বায়ুকে তাঁর অধীন করে দেন। যা ছিল অশ্বের তুলনায় অধিক দ্রুতগামী ও শক্তিশালী। এতে কোনো রকম কষ্টও ছিল না; তাঁর নির্দেশে সে বায়ু প্রবাহিত হত মৃদুমন্দ গতিতে। যেই কোনো শহরে তিনি যেতে ইচ্ছে করতেন, বায়ু সেখানেই তাকে নিয়ে যেত। হযরত সুলাইমানের ছিল কাঠের তৈরি এক বিশাল আসন তাতে পাকা ঘর, প্রসাদ, তাঁবু, আসবাবপত্র, অশ্ব, উট, ভারি জিনিসপত্র, মানুষ, জিন এবং সর্বপ্রকার পশুপাখী প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সবকিছুর স্থান সঙ্কুলান হতো।

যখন তিনি কোথাও কোনো সফরে বিনোদনে কিংবা কোনো রাজা অথবা শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযানে বের হতেন, তখন ওইসব কিছু উক্ত আসনে তুলে বায়ুকে হুকুম করতেন। বায়ু উক্ত আসনের নিচে প্রবেশ করে তা শূন্যে উঠিয়ে নিত। এরপর আসমান-যমীনের মধ্যবর্তী স্তর পর্যন্ত তা উঠার পর মৃদুমন্দ গতিতে চলার নির্দেশ দিলে বায়ু সেভাবে তা সম্মুখে এগিয়ে নিয়ে যেত। আবার যখন দ্রুত যাওয়ার ইচ্ছে করতেন, তখন বায়ুকে যেভাবে নির্দেশ দিতেন। ফলে বায়ু প্রবল বেগে ধাবিত হত এবং অল্প সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিয়ে দিত। এভাবে তিনি সকাল বেলা বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে যাত্রা করে এক মাসের দূরত্বে অবস্থিত ইসতাখারে দ্বিপ্রহরের পূর্বেই পৌঁছে যেতেন এবং সেখানে বিকেল পর্যন্ত অবস্থান করে আবার সন্ধ্যার পূর্বেই বায়তুল মুকাদ্দাসে ফিরে আসতেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ (١٢) يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ

"আমি সুলাইমানের অধীন করেছিলাম বায়ুকে, যা প্রভাতে এক মাসের পথ অতিক্রম করত এবং সন্ধ্যায় এক মাসের পথ অতিক্রম করত। আমি তার জন্যে গলিত তামার এক প্রস্রবণ প্রবাহিত করেছিলাম। তার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে জিনদের কতক তার সম্মুখে কাজ করত। ওদের মধ্যে যে আমার নির্দেশ অমান্য করে তাকে আমি জ্বলন্ত অগ্নি-শাস্তি-আস্বাদন করাব। তারা সুলাইমানের ইচ্ছানুযায়ী প্রাসাদ, ভাস্কর্য, হাউজ-সদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং সুদৃঢ় স্থাপিত বৃহদাকার ডেগ নির্মাণ করত। আমি বলেছিলাম, হে দাউদ পরিবার! কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তোমরা কাজ করতে থাক। আমার বান্দাদের মধ্যে অল্প সংখ্যকই কৃতজ্ঞ।" (সূরা সাবা : ১২-১৩)

হাসান বসরী রহ. বলেছেন, হযরত সুলাইমান আ. প্রভাতে দামিশক থেকে যাত্রা শুরু করতেন এবং ইসতাখারে পৌঁছে সকালের নাশতা করতেন। আবার বিকেল বেলা সেখান থেকে যাত্রা করে কাবুলে পৌঁছে রাত্রি যাপন করতেন। অথচ স্বাভাবিক গতিতে দামিশক থেকে ইসতাখার যেতে সময় লাগত এক মাস। অনুরূপ ইসতাখার থেকে কাবুলের দূরত্ব ছিল এক মাসের। শহর-নগর ও স্থাপত্য শিল্পের বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, ইসতাখার শহরটি জিনরা হযরত সুলায়মান আ.-এর জন্যে নির্মাণ করেছিল। এটা ছিল প্রাচীন তুর্কিস্তানের রাজধানী। অনুরূপ অন্যান্য কতিপয় শহর যেমন– তাদমুর, বায়তুল মুকাদ্দাস, বাবে জাবরূন ও বাবুল বারীদ। শেষোক্ত দুটি শহর অনেকের মতে দামিশক অঞ্চলে অবস্থিত।

ইবনে আব্বাস রাযি. মুজাহিদ, ইকরামা, কাতাদা রহ. প্রমুখ অনেকেই قطر শব্দটির অর্থ করেছেন তামা। কাতাদা বলেন, এই তামা ইয়ামানের খনিজ সম্পদ ছিল। আল্লাহ তা উত্থিত করে ঝর্ণার আকারে সুলাইমান আ.-এর জন্যে প্রবাহিত করে দেন। সুদ্দী বলেন, তা মাত্র তিন দিন স্থায়ী ছিল। সুলাইমান আ. তাঁর নির্মাণাদির জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ তামা এই সময়ের মধ্যে সংগ্রহ করে নেন। আল্লাহ কতক জিনকে সুলাইমান আ.-এর মজুর হিসেবে অধীনস্থ করে দিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে যে কাজ করার আদেশ দিতেন, তারা সে কাজই করত। এতে তারা গাফলতি করত না বা অবাধ্যও হত না। অবশ্য যে-ই অবাধ্য হত ও আনুগত্য প্রত্যাহার করত, তাকে তিনি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতেন। তারা সুলাইমান আ. এর জন্যে নির্মাণ করত দুর্গ, সুদৃশ্য প্রাসাদ ও সভাকক্ষ, প্রাচীন গোত্রে উৎকীর্ণ ভাস্কর্য। তখনকার শরিয়তে তা বৈধ ছিল। তদ্রূপভাবে وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ মাটির গর্ত বা মাটির দ্বারা তৈরি পাত্র, যা আকারে হাউযের মতো বড়। وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ তথা চুল্লির উপর স্থাপিত বিশাল ডেগ। এসব ডেগ সর্বদা সেখানে স্থাপিত, কখনও নামিয়ে রাখা হয় না। এ কথা বলার তাৎপর্য হচ্ছে, তিনি সর্বদা জিন ও ইনসানকে খাদ্য সরবরাহ করতেন এবং তাদের প্রতি বদান্যতা প্রকাশ করতেন।

হযরত সুলাইমান আ. এর স্ত্রী

হযরত সুলাইমান আ.-এর এক হাজার স্ত্রী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে সাতশ ছিলেন স্বাধীন এবং তিনশ বাঁদি। কেউ কেউ এর বিপরীতে তিনশ স্বাধীন ও সাতশ বাঁদির কথা বলেছেন। হযরত সুলাইমান আ. ছিলেন অত্যন্ত ক্ষমতাবান ও সক্ষম পুরুষ। ইমাম বুখারী রহ. হযরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : একবার হযরত সুলাইমান ইবনে দাউদ আ. বলেছিলেন, আজ রাত্রে আমি সত্তরজন স্ত্রীর কাছে যাব। প্রত্যেক স্ত্রীর গর্ভে একজন করে পুত্র সন্তান জন্ম হবে এবং তারা সকলেই অশ্ব চালনায় পারদর্শী হবে। আল্লাহর রাস্তায় তারা জিহাদ করবে। সুলাইমানের কাছে অবস্থানকারী একজন তখন বলেছিল, 'ইনশাআল্লাহ' (আল্লাহ যদি চান); কিন্তু সুলাইমান আ. ইনশাআল্লাহ বলেন নি। ফলে সে রাতে কোনো স্ত্রীই সন্তান ধারণ করেন নি। মাত্র একজন স্ত্রী পরে একটি অসম্পূর্ণ সন্তান প্রসব করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তিনি যদি ইনশাআল্লাহ বলতেন, তবে সকল স্ত্রী থেকেই পুত্র সন্তান জন্ম হত এবং তারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করত।

শুআইব ও ইবনে আবি যিনাদ ৭০ স্থলে ৯০ জন স্ত্রীর কথা বর্ণনা করেছেন এবং এটাই বিশুদ্ধতম। অপর এক বর্ণনায় আছে, সুলাইমান আ. ইনশাআল্লাহ বলতে ভুলে গিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তিনি যদি ইনশাআল্লাহ বলতেন, তাহলে তার নেক নিয়তে এভাবে নিষ্ফল হয়ে যেত না। বরং তাঁর ইচ্ছাই পূরণ হতো। আবু হোরায়রা রাযি. সূত্রে অপর এক বর্ণনায় হযরত সুলাইমান আ.-এর চারশ স্ত্রী ও সাতশ বাঁদির উল্লেখসহ উক্ত ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে।

অবশ্য হযরত সুলাইমান আ.-এর ছিল বিশাল সাম্রাজ্য, অসংখ্য সৈন্য-সামন্ত, বিভিন্ন প্রজাতির সেনাবাহিনী এবং রাজ্য পরিচালনার অন্যান্য সামগ্রী যা আল্লাহ তাঁর পূর্বেও কাউকে দেন নি এবং পরেও কাউকে দেন নি। হযরত সুলাইমান আ.-কে আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার জীবনে যে সব অনুগ্রহ দান করেছেন তার উল্লেখ শেষে পরকালীন জীবনেও অনুগ্রহ, সম্মান ও নৈকট্য দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, "নিশ্চয়ই তার জন্যে আমার কাছে রয়েছে নৈকট্যের মর্যাদা ও শুভ পরিণতি।"

বাইতুল মুকাদ্দাস নির্মাণ

আল্লাহ তাআলা জিন জাতিকে এমন একটি সৃষ্টজীব হিসেবে পয়দা করেছেন, যারা জটিল হতে জটিল এবং কঠিন হতে কঠিন কাজ সমাধা করতে পারে। হযরত সুলাইমান আ. ইচ্ছা করলেন, মসজিদ (হায়কাল)-এর চতুর্দিকে একটি বিরাট শহর স্থাপন করবেন এবং মসজিদটিকেও সম্পূর্ণ নতুনভাবে পুনঃনির্মাণ করবেন। তাঁর অভিলাষ ছিল, মসজিদ ও শহরটিকে অধিক মূল্যবান পাথর দ্বারা নির্মাণ করেন এবং এর জন্য দূর-দুরান্ত হতে সুন্দর ও বড় বড় পাথর আনিয়ে নেন। বলা বাহুল্য, তৎকালীন যোগাযোগ ব্যবস্থার সীমিত উপকরণসমূহ হযরত সুলাইমান আ.-এর এ বাসনা পূর্ণ করার জন্য যথেষ্ট ছিল না। এ কার্য শুধু জিন জাতিই সম্পন্ন করতে পারত। সুতরাং তিনি জিন জাতি দ্বারাই এ কার্যটি করিয়ে নিলেন। জিনেরা দূর-দূরান্ত হতে সুন্দর ও বড় বড় পাথর সংগ্রহ করে আনত এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের নির্মাণ কার্যের ব্যবস্থা করত।

সাধারণত এটাই প্রসিদ্ধ, মসজিদে আকছা ও বাইতুল মুকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ হযরত সুলাইমান আ.-এর কালেই সূচনা হয়েছিল, কিন্তু এটা সঠিক নয়। কেননা বুখারী ও মুসলিম শরীফের সহি ও মারফূ হাদীসে উল্লেখ আছে, একবার হযরত আবু যর গেফারী রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দুনিয়ার বুকে সর্বপ্রথম মসজিদ কোন্‌টি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান, "মসজিদে হারাম।" আবু যর রাযি. পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, "এর পরে কোনটি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "মসজিদে আকছা"।

আবু যর রাযি. তৃতীয় বার জিজ্ঞাসা করলেন, এতদুভয় মসজিদের নির্মাণ কাজের মধ্যে ব্যবধান কি পরিমাণ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ দুটির মধ্যে চল্লিশ বছরের ব্যবধান।" অথচ হযরত সুলাইমান আ.- ও মসজিদ হারামের নির্মাতা হযরত ইবরাহীম আ.-এর মধ্যে এক হাজার বছরের চেয়েও অধিক সময়ের ব্যবধান রয়েছে। সুতরাং হাদীসটির অর্থ হল, যেভাবে হযরত ইবরাহীম আ. মসজিদে হারামের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন আর তা মক্কা শহরটি আবাদ হওয়ার কারণ হয়েছিল, তেমনি হযরত ইয়াকুব আ. বাইতুল মুকাদ্দাসের মসজিদটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন এবং তার ফলে বাইতুল মুকাদ্দাস শহরটি আবাদ হয়েছিল।

এর দীর্ঘকাল পরে হযরত সুলাইমান আ.-এর আদেশে মসজিদ এবং শহরটি নতুনভাবে পুনঃ নির্মিত হয়েছিল। এবং জিনদেরকে বশীভূত করে কাজে লাগাবার কারণে অনুপম বিরাট ইমারত নির্মিত হয়েছিল। যা অদ্যাবধি দর্শকদের বিস্ময়ের কারণ হয়ে রয়েছে– এ দৈত্যাকার পাথরসমূহ কোথা থেকে আনা হয়েছে! কিরূপে আনয়ন করা হয়েছে! আর এ প্রকাণ্ড ও গুরুভার পাথরসমূহ উত্তোলনের জন্য কেমন যন্ত্রাদি ব্যবহার করা হয়েছিল, যার সাহায্যে সেগুলো এত উপরে উঠিয়ে পরস্পর সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল! জিনজাতি হযরত সুলাইমানের জন্য বাইতুল মুক্বাদ্দাস ছাড়াও আরও বহু ইমারত নির্মাণ করেছিল। কতিপয় এমন বস্তুও নির্মাণ করেছিল, যা তৎকালের হিসাবে বিচিত্র এবং অভিনব মনে করা হত। যেমন কুরআন মাজিদে বর্ণিত আছে :

وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَٰلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ

"আর শয়তান অর্থাৎ অবাধ্য জিনদের মধ্য হতে আমি বশীভূত করে দিয়েছিলাম, যারা তার (সুলায়মান আ.-এর) জন্য সমুদ্রে ডুব দিত (মহামূল্যবান সামুদ্রিক দ্রব্যসমূহ বের করে আনত)। এতদ্ব্যতীত আরো বহু কাজ করত এবং আমি তাদের প্রতি লক্ষ রাখতাম ও সংরক্ষণ করতাম।" (সূরা আম্বিয়া : রুকূ : ৬)

ওফাত লাভ

কুরআন মাজিদের সূরায়ে সাবাতে হযরত সুলাইমান আ.-এর ওফাতের যে ঘটনা বর্ণনা করেছে, তার সারমর্ম হল, হযরত সুলাইমান আ.-এর আদেশে জিনদের একটি বড় দল বিরাট ইমারতের নির্মাণ কাজে মশগুল রয়েছে। ইতঃমধ্যে হযরত সুলাইমান আ.-এর ওফাতের পয়গাম এসে পৌঁছল। কিন্তু জিনেরা তাঁর ইনতেকালের সংবাদ জানতে পারল না। তারা তাদের উপর ন্যস্ত কার্যসমূহে মশগুল থাকল।

দীর্ঘকাল পরে উইপোকা তার লাঠিটিকে খেয়ে ফেলল। যার দরুন হযরত সুলাইমান আ.-কে লাঠির ওপর ভর করে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখা যাচ্ছিল, তিনি ভূপতিত হলেন। তখন জিনরা জানতে পারল, হযরত সুলাইমান আ. দীর্ঘকাল পূর্বেই ইনতেকাল করেছিলেন। আফসোস, আমরা জানতে পারি নি! কতই না ভালো হত, যদি আমরা গায়েবি খবর জানতাম, তবে এ দীর্ঘকাল পর্যন্ত এ পরিশ্রম ও মেহনতের মধ্যে পতিত থাকতাম না, যাতে আমরা হযরত সুলায়মান আ.-এর ভয়ে লিপ্ত ছিলাম। কুরআন মাজিদে ঘটনাটি এরূপে বর্ণিত আছে :

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ

"যখন আমি সুলাইমানের মৃত্যুর ফয়সালা করে দিলাম, তখন (কর্মরত) জিনদেরকে কেউই তাঁর মৃত্যুর কোনো সংবাদ প্রদান করে নি উইপোকা ছাড়া, যারা সুলাইমানের

লাঠিটি খাচ্ছিল। যখন সুলাইমান (লাঠিটির ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে) পড়ে গেলেন, তখন জিনদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ল, কি ভালো হত যদি তারা গায়েবি ইলম জানত। তবে এই কঠিন মুসিবতে পতিত থাকত না।" (সূরা সাবা : রুকূ : ২)

কথিত আছে, জিনদের নিকট যখন এই রহস্য প্রকাশ হয়ে পড়ল, তখন ইমারত নির্মাণের কার্য সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং জিনদের আফসোস হলো। যদি তারা গায়েবি ইলমে জ্ঞানী হত, তবে এর বহু পূর্বে তারা মুক্ত হয়ে যেত।

এ স্থলে কুরআন মাজিদের উদ্দেশ্য যেমনি হযরত সুলাইমান আ.-এর ওফাতের ঘটনা বর্ণনা করা, তদ্রুপ বনি ইসরাঈলদেরকে তাদের বোকামি সম্বন্ধে অবহিত করাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য। কেননা তাদের আকিদা অনুযায়ী যদি জিনেরা গায়েবি জ্ঞানসম্পন্ন হত, তবে তারা দীর্ঘকাল পর্যন্ত হযরত সুলাইমান আ.-এর ভয়ে বাইতুল মুকাদ্দাসের বা মতান্তরে অন্য কোনো শহরের নির্মাণ কার্যের কঠিন পরিশ্রমে লিপ্ত থাকত না। ফলে যেভাবে তারা হযরত সুলাইমান আ.-এর মৃত্যু সংবাদ জানতে পেরেছে, তার পর স্বয়ং শয়তানরা অর্থাৎ জিনরাও একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে, আমরা যে গায়েবি ইলম জানি বলে দাবি করতাম, তা সম্পূর্ণ ভুল সাব্যস্ত হল।

হযরত সুলাইমান আ.-এর ওফাত সম্বন্ধে কুরআন মাজিদ এ পরিমাণই বর্ণনা করেছে। এর চেয়ে অধিক বিস্তারিত কিছুই বর্ণনা করে নি। তাবলিগের উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ করে এরপর কোনো প্রয়োজনও ছিল না। সুতরাং সে সমস্ত বিস্তারিত বিবরণের অনুসন্ধানে লিপ্ত হওয়া আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই, হযরত সুলায়মান আ. কতকাল লাঠির উপর ভর করে দণ্ডায়মান ছিলেন? কি অবস্থায় দণ্ডায়মান ছিলেন? জিন ও ইনসান উভয় জাতিই কি তাঁর মৃত্যু-সংবাদ জানতে পারে নি? অথবা শুধু জিনরাই জানতে পারে নি, যারা বাইতুল মুকাদ্দাস হতে বহু দূরে কোনো শহরের নির্মাণ কার্যে মশগুল ছিল ইত্যাদি।

ইসরাঈলী রেওয়ায়েতসমূহ থেকে গৃহীত একটি রেওয়ায়েতে আছে– যখন মালাকুল মউত আযরাইল আ. এসে হযরত সুলাইমান আ.-কে এ পয়গাম শুনালেন– আপনার মৃত্যুর মাত্র আর কয়েক ঘণ্টা বাকি আছে। তখন তিনি একথা বিবেচনা করে, পাছে জিনরা আমার এ ইমারত নির্মাণের কার্য অসম্পূর্ণ ছেড়ে না দেয়। তাতে দরজা রাখলেন না। নিজে তার ভিতর আবদ্ধ অবস্থায় লাঠির উপর ভর করে দণ্ডায়মান হয়ে ইবাদতে মশগুল হয়ে গেলেন। এ অবস্থায়ই মালাকুল মউত নিজের কাজ সমাধা করে ফেললেন।

প্রায় এক বছর পর্যন্ত হযরত সুলাইমান আ. এ অবস্থায়ই দণ্ডায়মান রইলেন। এদিকে জিনেরা নির্মাণ কাজে মশগুল রইল। যখন তারা নির্মাণ কার্য সমাধা করে ফেলল, তখন হযরত সুলাইমান আ.-এর লাঠিতে উইপোকার জন্ম হল এবং সেগুলো লাঠিটি খেয়ে নিষ্ক্রিয় করে ফেলল। ফলে তা হযরত সুলাইমান আ.-এর ভার বহন করতে অক্ষম হয়ে গেল। হযরত সুলাইমান আ. মাটিতে পড়ে গেলেন। তখন জিনরা বুঝতে পারল,

বহুকাল পূর্বেই হযরত সুলাইমান আ.-এর ইনতেকাল হয়ে গেছে এবং নিজেদের অজ্ঞতার জন্য আফসোস করতে লাগল। (তাফসিরে ইবনে কাসীর : ৩/৫২৯-৫৫৩)

এ রেওয়ায়েত এবং এ জাতীয় আরো বহু ইসরাঈলী রেওয়ায়েত তত্ত্বজ্ঞানীরা পরিস্কার করে দিয়েছেন, এ সমূদয়ের স্বরূপ কি? তাওরাতে হযরত সুলাইমান আ.-এর ইনতেকালের ঘটনা এরূপ বর্ণিত আছে : "জেরুযালেমে হযরত সুলাইমান আ.-এর রাজত্বকাল চল্লিশ বছর ছিল। এবং হযরত সুলাইমান আ. তাঁর পূর্বপুরুষদের শহর 'ছাইহুনে' সমাহিত হয়েছেন। এরপর তাঁর পুত্র 'রাজআম' তাঁর স্থলে বাদশা হন।"

কাযি বাইযাবি রহ. বলেছেন, হযরত সুলাইমান আ.-এর ১৩ বছর বয়সে তাঁর পিতা হযরত দাউদ আ. ইনতেকাল করেন। এবং তখনই তিনি রাজ্যের সিংহাসন অলঙ্কৃত করেন আর তিপ্পান্ন বৎসর বয়সে তিনি ইনতেকাল করেন। ইমাম বাইযাবি সম্ভবত এ কথাটি তাওরাত হতেই নকল করেছেন।

ইবনে জারীর ইবনে আবী হাতিম ও অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ ইবনে আব্বাস রাযি.-এর বরাতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : হযরত সুলাইমান যখনই নামায আদায় করতেন, তখনই সম্মুখে একটি চারা গাছ দেখতে পেতেন। তিনি গাছের কাছে তার নাম জিজ্ঞেস করতেন। গাছ নিজের নাম বলে দিত। তার পরে জিজ্ঞেস করতেন, কি কাজের জন্যে তোমার সৃষ্টি? যদি রোপণ করার উদ্দেশ্যে হয়ে থাকলে তা রোপণ করা হত। যদি ওষুধ হিসেবে হত, তা হলে ওষুধ উৎপাদনে লাগানো হত। এক দিন তিনি নামাযে রত ছিলেন। সহসা সম্মুখে একটি বৃক্ষ-চারা দেখেন। জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম? সে বলল, আল-খারূব। তিনি বললেন, কি উদ্দেশ্যে তোমার সৃষ্টি? সে বলল, বায়তুল মুকাদ্দাস ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে। তখন সুলাইমান আ. দুআ করলেন, 'আল্লাহ! জিনদের কাছে আমার মৃত্যুর অবস্থাটা গোপন রাখুন, যাতে মানুষ জানতে পারে– জিনরা আসলে গায়েব জানে না। এরপর সুলাইমান আ. ওই বৃক্ষ-চারা দ্বারা একটি লাঠি তৈরি করেন এবং এক বছর যাবত তাতে ভর করে দাঁড়িয়ে থাকেন। ও দিকে জিনেরা পূর্ণ উদ্যমে কাজ চালিয়ে যেতে থাকে।

অবশেষে উইপোকা লাঠিটি খেয়ে শেষ করে ফেলে। এ ঘটনা থেকে মানুষ সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারল, জিনরা গায়েবের খবর জানে না। জানলে এক বছর পর্যন্ত এ লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি তারা কিছুতেই ভোগ করত না।

সুদ্দী রহ. হযরত সুলাইমান আ.-এর ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে ইবনে আব্বাস ও ইবনে মাসউদসহ কতিপয় সাহাবা থেকে বর্ণনা করেছেন, সুলাইমান আ. অন্যান্য কাজ-কর্ম থেকে অব্যাহতি দিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসে কখনও কখনও একটানা এক বছর, দু বছর, এক মাস, দু মাস কিংবা এর চেয়ে বেশী কিংবা এর চেয়ে কম সময় অবস্থান করতেন।

তাঁর খাদ্য ও পানীয় মসজিদেই সরবরাহ করা হত। যেবার তিনি মসজিদে প্রবেশ করার পর ইনতিকাল করেন, সেবার এক নতুন ঘটনা দেখতে পান। প্রত্যেক

সকালবেলা তিনি দেখতেন, বায়তুল মুকাদ্দাসের অভ্যন্তরে একটি বৃক্ষ উদগত হচ্ছে। কাছে এসে নাম জিজ্ঞেস করলে বৃক্ষটি তার নাম বলে দিত। যদি তা রোপণ করার উদ্দেশ্যে হত, তা হলে রোপণ করতেন। যদি ঔষধরূপে ব্যবহারের জন্যে হত, তা হলে বলে দিত আমি ঔষধ-বৃক্ষ। যদি অন্য কোনো উদ্দেশ্যে জন্মাত, তবে বৃক্ষ তাও বলে দিত এবং তাকে সে কাজেই ব্যবহার করা হত। অবশেষে এক দিন এমন এক বৃক্ষের জন্ম হল, যার নাম জিজ্ঞেস করলে সে বলল, আমার নাম খারুবা। সুলায়মান আ. জানতে চাইলেন, তোমার সৃষ্টি কী উদ্দেশ্যে? বৃক্ষটি বলল, এ মসজিদ ধ্বংস করার জন্যে। সুলায়মান আ. বললেন, আমি জীবিত থাকতে আল্লাহ এ মসজিদ ধ্বংস করবেন না বরং তুমি এমন একটি বৃক্ষ, যার উপর ভর দেওয়া অবস্থায় আমার মৃত্যু হবে এবং বায়তুল মুকাদ্দাসও ধ্বংস হবে। এরপর তিনি বৃক্ষ-চারাটি সেখান থেকে তুলে মসজিদের আঙিনার বাগানে রোপণ করেন। এরপর তিনি মসজিদের মিহরাবের প্রবেশ করে লাঠির উপর হেলান দিয়ে সালাতে দণ্ডায়মান হন। এ অবস্থায় তাঁর ইনতেকাল হয়ে যায়; কিন্তু কর্মরত জিনরা তা টের পেলো না। তারা নবীর নির্দেশ মতে মসজিদের কাজ অব্যাহত রাখে। তাদের অন্তরে সর্বদা এ ভয় ছিল, কাজে ফাঁকি দিলে তিনি মিহরাব থেকে বেরিয়ে এসে শাস্তি দেবেন। অবশ্য, কখনও কখনও জিনগুলো মেহরাবের পাশের এসে একত্র হত। মিহরাবের সম্মুখে ও পশ্চাতে জানালা লাগানো ছিল।

কোনো জিন পলায়নের ইচ্ছে করলে বলত, আমি কি এক দিকে প্রবেশ করে অন্যদিকে বের হয়ে যাওয়ার মতো চালাক নই? সুলাইমান আ. মিহরাবের মধ্যে থাকা অবস্থায় কোনো জিন তাঁর দিকে তাকালেই সঙ্গে সঙ্গে সে পুড়ে যেত। একবার কর্মরত জিনদের একজন মিহরাবে প্রবেশ করে সুলাইমান আ.-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করে গেল। কিন্তু তাঁর কোনো আওয়াজ শুনতে পেল না। পুনরায় সে ওই পথে প্রত্যাবর্তন করল, তখনও কোনো সাড়া-শব্দ পেল না। আবার সে ঘরে ঢুকল কিন্তু পুড়ল না, তখন সে সুলাইমান আ.-এর প্রতি তাকিয়ে দেখল, তাঁর মৃতদেহ পড়ে রয়েছে।

এবার জিনটি বেরিয়ে এসে লোকজনকে জানালো, সুলাইমানের মৃত্যু হয়েছে। লোকজন দরজা খুলে মিহরাবে প্রবেশ করে দেখল ঘটনা সত্য। তারা তাঁর দেহকে বাইরে বের করে আনল। তারা দেখতে পেল, তাঁর লাঠিটি কীটে খেয়ে ফেলেছে। কুরআন মাজিদে مِنسَأَةٌ শব্দ এসেছে। এটা হাবশি ভাষার শব্দ, অর্থ লাঠি। তিনি কবে, কত দিন আগে মারা গেছেন, জানার কোনো উপায় ছিল না। তাই মৃত্যুকাল বের করার উদ্দেশ্যে তারা একটি কীটকে একটি লাঠির গায়ে ছেড়ে দেয়। কীটটি একদিন এক রাত পর্যন্ত লাঠিটি খেতে থাকে। এবার তারা হিসেব বের করল, এই হারে একটা লাঠি খেতে এক বছর লাগে। তাতে তারা বুঝতে পারে, তিনি এক বছর পূর্বেই ইনতেকাল করেছেন। মোটকথা, হযরত সুলাইমান আ.-এর মৃত্যুর পর পূর্ণ একটি বছর পর্যন্ত জিনরা হাড়ভাঙা খাটুনী খাটে।

মানুষ তখন পূর্বের ধারণা পরিবর্তন করে নতুনভাবে বিশ্বাস করতে থাকে, জিনরা গায়েব জানে-এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তারা যদি সত্যিই গায়েব জানত, তা হলে সুলাইমান আ.-এর মৃত্যু সম্পর্কে অবশ্যই অবগত হত এবং পূর্ণ এক বছর পর্যন্ত শাস্তি মূলক কাজে কিছুতেই আবদ্ধ থাকত না। জিনরা গায়েব জানার যে দাবি করত, এক্ষনি তা মানুষের কাছে ফাঁস হয়ে গেল। এরপর জিনরা ওই পোকাটির কাছে গিয়ে বলল, তুমি যদি খাদ্য দ্রব্য আহার করতে তবে আমরা তোমাকে উৎকৃষ্ট খাদ্য সরবরাহ করতাম। যদি তুমি পানীয় পান করতে তবে উন্নতমানের শরাব পান করাতাম। কিন্তু এগুলো যেহেতু তোমার আহার্য নয়, তাই আমরা তোমাকে পানি ও কাদা দিচ্ছি। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর থেকে উই পোকাটি যেখানেই অবস্থান করত জিনরা সেখানে পানি ও মাটি পৌঁছিয়ে দিত। এ কারণেই কাঠের ভিতরে যে মাটি দেখা যায়– তা বস্তুত সেই উই পোকার কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে জিনরাই পৌঁছিয়ে দিয়ে থাকে। এ বর্ণনার মধ্যে কিছু ইসরাঈলী বিবরণ আছে, যাকে সত্য বা মিথ্যা কোনোটাই বলা যায় না।

আবু দাউদ রহ. তাঁর গ্রন্থে আমাশের সূত্রে খায়ছামা থেকে বর্ণনা করেন : হযরত সুলাইমান ইবনে দাউদ মালাকুল মওতকে বলেছিলেন, আপনি যখন আমার রূহ কবয করবেন, তার পূর্বে আমাকে জানিয়ে দেবেন। ফিরিশতা বললেন, এ বিষয়ে আপনার থেকে আমার অধিক কিছু জানা নেই। বস্তুত আমার নিকট একটি লিখিত পত্র দেওয়া হয়। যার মৃত্যু হবে, ওই পত্রে তার নাম লেখা থাকে। বর্ণনাকারী বলেন, সুলাইমান আ. মালাকুল মওতকে বলেছিলেন, আপনি যখন আমার রূহ কবয করার আদেশ পাবেন, তখন পূর্বাহ্নে আমাকে জানিয়ে দেবেন। একবার মালাকুল মওত এসে সুলাইমান আ.-কে জানালেন, আপনার রূহ কবয করার জন্যে আমি আদিষ্ট হয়েছি। আর স্বল্প সময় বাকি আছে। তিনি তৎক্ষণাৎ শয়তান জিনদের ডেকে অবিলম্বে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করার আদেশ দেন। নির্দেশ মতে তারা একটি কাঁচের প্রাসাদ তৈরি করল। এতে কোনো দরজা জানালা ছিল না। সুলাইমান আ. ওই কাঁচের ঘরে লাঠির উপর হেলান দিয়ে সালাতে মগ্ন হন। ইত্যবসরে মালাকুল মওত তথায় প্রবেশ করে সুলাইমান আ. এর রূহ কবয করে নেন। অবশ্য তাঁর মৃত দেহ লাঠির উপর হেলান দেওয়া অবস্থায়ই থেকে যায়। সুলাইমান আ. মালাকুল মওতকে ফাঁকি দিয়ে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার জন্যে এই কৌশল অবলম্বন করেন নি। জিনরা তাঁর সম্মুখেই নির্মাণ কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল।

সুলাইমান আ.-এর প্রতি তারা বারবার তাকিয়ে দেখত এবং মনে করত, তিনি তো জীবিতই আছেন। পরে আল্লাহ তাঁর লাঠির কাছে একটি উইপোকা পাঠান। উইপোকাটি লাঠির গায়ে লেগে খেতে শুরু করে। যখন লাঠির অভ্যন্তর ভাগ খেয়ে শূন্য করে ফেলে, তখন তা দুর্বল হয়ে যায়। হযরত সুলাইমান আ.-এর ভার সহ্য করতে না পেরে লাঠিটি ভেঙ্গে যায় এবং তাঁর মৃতদেহ মাটিতে পড়ে যায়। জিনরা এ অবস্থা দেখে কাজ ছেড়ে চলে যায়।

ইসহাক ইবনে বিশর মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের সূত্রে যুহরী প্রমুখ থেকে বর্ণনা করেন, হযরত সুলাইমান আ. বায়ান্ন বছর জীবিত ছিলেন এবং চল্লিশ বছর রাজত্ব করেন। কিন্তু ইসহাক আবু রওক হযরত ইকরামার সূত্রে ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন, তাঁর রাজত্ব বিশ বছর স্থায়ী ছিল। ইবনে জারীর লিখেছেন, সুলাইমান আ.-এর বয়স হয়েছিল মোটামুটি পঞ্চাশ বছরের কিছু বেশি।

কেউ কেউ বলেন, হযরত সুলাইমান আ. তাঁর রাজত্বের চতুর্থ বছরে বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণ শুরু করেন। সুলাইমান আ. এর পরে তাঁর পুত্র রুহবিআম ১৭ বছর রাজত্ব করেন। ঐতিহাসিক ইবনে জারীর লিখেছেন, এরপর বনি ইসরাঈলের রাজত্ব ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়।

হযরত দানিয়াল আ.

হযরত দানিয়াল আ. এর আলোচনা

ইবনে আবিদ দুনয়া আবদুল্লাহ ইবনে হুজায়ল থেকে বর্ণনা করেন, কাফের বাদশা বুখত নসর দুটি সিংহ ধরে একটা কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করে। এর পর হযরত দানিয়াল আ.-কে এনে ওই দুটি সিংহের মধ্যে ছেড়ে দেয়। কিন্তু সিংহ দুটি তাঁর ওপর কোনোরূপ আক্রমণ করে নি। তিনি দীর্ঘক্ষণ সেখানে স্বাভাবিকভাবে অবস্থান করার পর মানুষের জৈবিক চাহিদা অনুযায়ী তাঁর খাদ্য পানীয়ের প্রয়োজন দেখা দেয়। তখন আল্লাহ ওহির মাধ্যমে নবী আরমিয়াকে দানিয়াল আ.-এর জন্যে খাদ্য-পানীয় প্রস্তুত করতে বলেন। তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি থাকি বায়তুল মুকাদ্দাস এলাকায় আর দানিয়াল আছেন সুদূর ইরাকের বাবেল শহরে। সেখানে আমি কিভাবে খাদ্য-পানীয় পৌঁছাব? আল্লাহ বললেন, আরমিয়া! আমি তোমাকে যা আদেশ করেছি, তুমি তা-ই কর। প্রস্তুতকৃত খাদ্য সামগ্রীসহ তোমাকে সেখানে পৌঁছিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা শীঘ্রই আমি করছি।

আরমিয়া আ. খাদ্য তৈরি করলেন। তারপর এমন একজনকে প্রেরণ করা হল, যিনি খাদ্য-পানীয়সহ আরমিয়া আ.-কে উক্ত কূপের পাড়ে পৌঁছিয়ে দিলেন। হযরত দানিয়াল আ. ভিতর থেকে জিজ্ঞেস করলেন, কে? আরমিয়া আ. নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, আমি আরমিয়া। দানিয়াল আ. বললেন, আপনি এখানে এসেছেন কেন? আরমিয়া আ. জানালেন, আপনার প্রভু আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন।

দানিয়াল আ. বললেন, তা হলে আমার প্রভু আমাকে স্মরণ করেছেন? আরমিয়া আ. বললেন, জি! তখন তিনি বললেন :

'সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর, যাঁকে কেউ স্মরণ করলে তিনি তাকে ভুলেন না; সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর, যাঁকে কেউ আহবান করলে তিনি সেই আহবানে সাড়া দেন; সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর, যাঁর প্রতি কেউ নির্ভরশীল হলে তিনি তাকে অন্যের দিকে ঠেলে দেন না; সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি উত্তম কাজের উত্তম বিনিময় দান

করেন; সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি ধৈর্যের বিনিময়ে মুক্তি দান করেন: সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন; সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি আমাদের বিশ্বাস ও কর্মদ্যোম শিথিল হয়ে পড়লে দৃঢ়তা দান করেন; সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি আমাদের সকল উপায় শেষ হওয়ার পর একমাত্র ভরসা স্থল।'

ইউনুস ইবনে বুকায়েব রহ. হযরত আবুল আলিয়া রাযি. থেকে বর্ণনা করেন : আমরা যখন তুসতর শহর জয় করি, তখন হরমুযানের বাড়িতে খাটের ওপর একটি মৃত দেহ দেখতে পাই। তার লাশের শিয়রের কাছে পড়েছিল একটি আসমানী কিতাব। আমরা তা নিয়ে আসি এবং হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযি.-কে দেখাই। তিনি হযরত কাব রাযি. কে ডেকে তাকে দিয়ে তার আরবি অনুবাদ করান। আবুল আলিয়া রাযি. বলেন, আরবদের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম ওই কিতাবখানির অনূদিত কপি পাঠ করি, যেভাবে আমি কুরআন পাঠ করে থাকি। খুলদ ইবনে দীনার বলেন, আমি আবুল আলিয়া রাযি. কে জিজ্ঞেস করলাম, তাতে কী লেখা ছিল? তিনি বলেন, তাতে লিখিত ছিল : তোমাদের কর্মকাণ্ড, ঘটনাবলী, কথাবার্তা ও পরবর্তীকালে ঘটিতব্য সার্বিক অবস্থা। আমি বললাম, আপনারা সে লোকটিকে কী করলেন? তিনি বললেন, আমরা দিনেরবেলা তেরটি কবর খুঁড়লাম এবং রাত্রিকালে একটি কবরে তাকে দাফন করে বাকি সবকটি কবর একই রূপ করে দিলাম। এ ব্যবস্থা করলাম যাতে সাধারণ লোক তার কবরের সন্ধান না পায় এবং কবর খুঁড়ে না ফেলে।

বর্ণনাকারী জিজ্ঞেস করলেন, মানুষ তার কাছে কী প্রত্যাশা করে? আবুল আলিয়া রাযি. বললেন, বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ হয়ে গেলে লোকজন এ খাট নিয়ে ময়দানে এসে বৃষ্টি কামনা করত এবং এর ফলে বৃষ্টিপাত হত। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ মৃত লোকটিকে চিনেন কি? আবুল আলিয়া রাযি. বললেন, তাঁর নাম হযরত দানিয়াল আ. বলে শোনা যায়। রাবী পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কত বছর পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছেন? আবুল আলিয়া রাযি. বললেন, তিনশ বছর পূর্বে।

রাবী পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, এ সময়ের মধ্যে তার মৃতদেহের কোনো পরিবর্তন হয়েছিল কি? আবুল আলিয়া রাযি. বললেন, না, তবে মাথার পিছনের দিকের কয়েকটি চুলের পরিবর্তন হয়েছে মাত্র। নবীদের দেহ মাটিতেও পঁচে না এবং জীবজন্তু খায় না। এ ঘটনাটি আবুল আলিয়া থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে। তবে তার মৃত্যু তারিখ যদি তিনশ বছর পূর্বে হওয়া সঠিক হয়, তা হলে তিনি নবী নন বরং কোনো পুণ্যবান হবেন। কেননা সহি বুখারী শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ঈসা ইবনে মারিয়ামের মধ্যে অন্য কোনো নবীর আগমন ঘটে নি। আর এ দুই নবীর মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান চারশ বছর। কারও মতে ছয়শ বছর, কারও মতে ছয়শ বিশ বছর। কোনো কোনো লেখক ওই ব্যক্তির মৃত্যু আটশ বছর পূর্বে হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন।

ঐতিহাসিক মতে হযরত দানিয়াল আ.-এর মৃত্যুও প্রায় এ সময়ে হয়েছিল। এ হিসাব অনুযায়ী মৃত ব্যক্তি দানিয়াল আ.-ও হতে পারেন বা অন্য কোনো নবীও হতে পারেন কিংবা কোনো নেককার লোকও হতে পারেন। তবে হযরত দানিয়াল আ. হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। কেননা দানিয়াল নবীকেই পারস্য সম্রাট ধরে নিয়ে বন্দি করে রেখেছিল। আবুল আলিয়া রাযি. থেকে সহি সনদে বর্ণিত হয়েছে, মৃত ব্যক্তিটির নাক এক বিঘত লম্বা ছিল। এ দিকে লক্ষ্য করলে বলা যেতে পারে, এ লাশ বহু পূর্বের, দূর অতীতের কোনো নবীর লাশ।

আবু বকর ইবনে আবিদ দুনয়া তাঁর রচিত 'কিতাবু আহকামিল কুবূর' গ্রন্থে আবুল আশআছ রাযি. সূত্রে লিখেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নবী হযরত দানিয়াল আ. আল্লাহর নিকট দুআ করেছিলেন, তাঁর দাফনকার্য যেন উম্মতে মুহাম্মাদীর হাতে সুসম্পন্ন হয়। পরবর্তীকালে আবু মূসা আশআরী রাযি. হাতে তুসতর নগরী বিজিত হলে তাঁর লাশ একটি সিন্দুকের মধ্যে দেখতে পান। এ সময় তাঁর দেহের শিরা ও কাঁধের মোটা রগ দুটি নড়াচড়া করছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, "যে ব্যক্তি দানিয়েল আ.-এর লাশ সনাক্ত করিয়ে দেবে, তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দেবে।" হারকূস নামক এক ব্যক্তি দানিয়াল আ.-এর লাশ সনাক্ত করেছিলেন। আবু মূসা রাযি. হযরত ওমর রাযি.-কে এ বিষয়ে অবহিত করেন। তখন হযরত ওমর রাযি. লোক মারফত তাঁকে জানান, হযরত দনিয়াল আ.-কে ওখানে দাফন কর এবং হারকূসকে আমার নিকট পাঠিয়ে দাও। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দান করেছেন। বর্ণিত সূত্রে হাদিসটি মুরসাল এবং এর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

ইবনে আবিদ দুনিয়া আম্বাসা ইবনে সাঈদ থেকে বর্ণনা করেন, আবূ মূসা আশআরি রাযি. মৃত দানিয়ালের সাথে একখানা আসমানী কিতাব, চর্বি ভর্তি একটি কলস, কিছু সংখ্যক দিরহাম ও তাঁর ব্যবহৃত আংটি পান। এরপর হযরত ওমর রাযি.-কে এ সম্পর্কে অবহিত করে আবূ মূসা রাযি. একটি পত্র লেখেন। হযরত ওমর রাযি. চিঠির মাধ্যমে আবু মূসাকে জানান, আসমানি কিতাবখানা আমাদের নিকট পাঠিয়ে দাও। চর্বির কিছু অংশ আমাদের জন্যে পাঠাও এবং অবশিষ্ট অংশ থেকে আরোগ্য লাভের জন্যে মুসলমানদেরকে তোমার পক্ষ থেকে ব্যবহার করতে দাও আর দিরহামগুলো তাদের মাঝে বণ্টন কর এবং আংটিটি তুমি ব্যবহার কর!

ভিন্ন সূত্রে ইবনে আবিদ দুনিয়া থেকে বর্ণিত, আবু মূসা রাযি. যখন দানিয়ালের লাশ পেলেন, তখন তিনি তা জড়িয়ে ধরেন ও চুম্বন করেন। এরপর তিনি হযরত ওমর রাযি.-কে এ বিষয়ে অবহিত করেন এবং জানান, তাঁর লাশের সাথে প্রায় দশ হাজার দিরহাম মূল্যের ধন-সম্পদ পাওয়া গিয়েছে। বিভিন্ন লোক তা থেকে ধার নেয় এবং পরে ফেরত দিয়ে যায়। কেউ ফেরত না দিলে রোগে আক্রান্ত হয়। তার পাশে আতর ভর্তি একটি কৌটাও রয়েছে। হযরত ওমর রাযি. আবু মূসাকে জানান, তাকে বরই

পাতা মেশানো পানি দ্বারা গোসল করিয়ে, কাফন পরিয়ে দাফন কর এবং তাঁর কবরটি এমনভাবে গোপন রাখ, যেন কেউ তার সন্ধান না পায়। মালামাল সম্পর্কে জানান যে, সেগুলো বায়তুলমালে জমা কর, আতরের কৌটা পাঠিয়ে দাও এবং আংটিটি তুমি নিজে ব্যবহার কর।

আবূ মূসা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, তাঁর নির্দেশক্রমে চারজন বন্দি নদীর মধ্যে বাঁধ দিয়ে তার তলদেশে কবর খুঁড়ে সেখানে হযরত দানিয়াল আ.-এর লাশ দাফন করে। পরে আবূ মূসা রাযি. ওই চার বন্দিকে ডেকে এনে হত্যা করেন। ফলে আবূ মূসা আশআরী রাযি. ব্যতীত উক্ত কবরের সন্ধান জানার মতো আর কেউ অবশিষ্ট থাকল না। ইবনে আবিদ দুনিয়া আবুয-যিনাদ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি আবূ মূসা আশআরীর পুত্র আবূ বুরদার হাতে একটি আংটি দেখেছি, যাতে দু'টি সিংহ এবং সিংহদ্বয়ের মাঝে জনৈক ব্যক্তির চিত্র অংকিত রয়েছে; আর সিংহ দু'টি ওই লোকটিকে জিহবা দ্বারা চাটছে। আবু বুরদা বললেন, এটি ওই লোকটির আংটি, যাঁকে এ শহরের লোক দানিয়াল নামে জানে। তাঁকে দাফন করার সময় আবু মূসা রাযি. তা নিজের কাছে তুলে রাখেন।

আবু বুরদা বলেন, আবূ মূসা আশআরী রাযি. উক্ত জনপদের লোকজনের নিকট আংটিতে অংকিত এ চিত্রের কারণ জানতে চাইলে তারা জানায়, দানিয়ালের আবির্ভাবকালে দেশের যিনি শাসনকর্তা ছিলেন, তার নিকট জ্যোতিষী ও গণকদল এসে ভবিষ্যদ্বাণী করে, অমুক রাত্রে আপনার রাজ্যে এমন একজন শিশুর জন্ম হবে, যে এ রাজ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। রাজা বললেন, আল্লাহর কসম! ওই রাত্রে যত শিশুর জন্ম হবে, আমি তাদের সকলকে হত্যা করব। বাস্তবে রাজা তাই করল।

অবশ্য, শিশু হযরত দানিয়াল আ.-কে রাজার লোকজন সিংহপালের মধ্যে নিক্ষেপ করে চলে যায়। কিন্তু সিংহ তার কোনো ক্ষতি করল না বরং দুটি সিংহ শিশুটিকে জিহবা দ্বারা চেটে সুস্থ রাখে। এরপর শিশুটির মাতা এসে সন্তানকে এ অবস্থায় দেখে সেখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যান। এভাবে আল্লাহ হযরত দানিয়াল আ.-কে রক্ষা করেন এবং নিজের ইচ্ছা কার্যকরী করেন। আবু মূসা রাযি. বলেন, ওই জনপদের লোকজন জানায়, হযরত দানিয়াল আ.-এর প্রতি আল্লাহর এ অনুগ্রহ স্মৃতিতে ধরে রাখার জন্যে দানিয়াল তাঁর আংটিতে নিজেকে সিংহদ্বয়ের চাটারত অবস্থা চিত্রাঙ্কিত করে রাখেন। এ বর্ণনার সূত্রটি 'হাসান' পর্যায়ের।

বনি ইসরাঈলকে একত্র করা

এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী :

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ

إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"অথবা তুমি কী সে ব্যক্তিকে দেখ নি, যে এমন এক নগরে উপনীত হয়েছিল, যা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। সে বলল, "মৃত্যুর পর কিরূপে আল্লাহ একে জীবিত করবেন?" তারপর আল্লাহ তাকে একশ বছর মৃত রাখলেন। পরে তাকে পুনর্জীবিত করলেন। আল্লাহ বললেন, "তুমি কতকাল অবস্থান করলে?" সে বলল, একদিন অথবা একদিনেরও কিছু কম অবস্থান করেছি। তিনি বললেন : না, বরং তুমি একশ বছর অবস্থান করেছ। তোমার খাদ্য সামগ্রী ও পানীয় বস্তুর প্রতি লক্ষ্য কর, তা অবিকৃত রয়েছে এবং তোমার গাধাটির প্রতি লক্ষ্য কর, কিভাবে সেগুলোকে সংযোজিত করি এবং গোশত দ্বারা ঢেকে দেই।" যখন এ তার নিকট সুস্পষ্ট হল তখন সে বলে উঠল, আমি জানি যে, আল্লাহ নিশ্চয়ই সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (২ বাকারা : ২৫৯)

হিশাম ইবনে কালবী বলেন, এরপর আল্লাহ তাআলা হযরত আরমিয়া নবীর নিকট ওহি প্রেরণ করলেন, আমি বায়তুল-মুকাদ্দাসকে পুনরায় আবাদ করব। সুতরাং তুমি সেখানে যাও ও অবস্থান কর। নির্দেশ মতে আরমিয়া আ. সেখানে গেলেন এবং দেখলেন, গোটা নগরী সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। অবাক বিস্ময়ে তিনি ভাবলেন, সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ আমাকে এ নগরীতে অবস্থান করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং জানিয়েছেন, তিনি একে পুনরায় আবাদ করবেন; কিন্তু তা কবে? এমন বিধ্বস্ত নগরীকে তিনি কতদিনে কিভাবে আবাদ করবেন?

এসব চিন্তা করতে করতে তিনি ঘুমিয়ে গেলেন। তাঁর সাথে ছিল একটি গাধা ও কিছু খাদ্যদ্রব্য। এ ঘুমের মধ্যে তাঁর ৭০ বছর কেটে যায়। ইতঃমধ্যে বুখতে নসর ও তার মনিব সম্রাট লাহরাসা মৃত্যু হয়। লাহরাসা একশ বিশ বছর যাবত রাজত্ব করেছিল। তার মৃত্যুর পর তার পুত্র বাশ্‌তাসাব তার স্থলাভিষিক্ত হয়। তারই রাজত্বকালে বুখত নসরের মৃত্যু হয়। বাশ্‌তাসাব সিরিয়া (শাম) সম্পর্ক অবগত হলেন, দেশটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে আছে, সমগ্র ফিলিস্তিন হিংস্র শ্বাপদে ভরে গিয়েছে এবং মানুষের কোনো অস্তিত্ব সেখানে নেই। তোমরা যারা নিজেদের দেশে সিরিয়ায় ফিরে যেতে চাও, যেতে পার। তিনি দাউদ আ.-এর বংশের একজনকে তাদের রাজা বানিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসসহ অন্যান্য মসজিদ পুনঃনির্মাণ করার নির্দেশ দেন। বনি ইসরাঈলরা তাদের রাজার সাথে আপন দেশ সিরিয়ায় চলে গেল এবং বায়তুল মুকাদ্দাস পুনঃপ্রতিষ্ঠা করল।

আল্লাহ তখন আরমিয়া আ. এর চোখ খুলে দিলেন। তিনি নগরীর আবাদ হওয়া দৃশ্যটি প্রত্যক্ষ করতে থাকলেন। এভাবে তাঁর আরও ত্রিশ বছর কেটে যায়। ফলে পূর্ণ নিদ্রাকাল একশ বছর পূর্ণ হয় এবং তারপরে তিনি জাগ্রত হন। কিন্তু তিনি ধারণা করতে থাকেন, তার নিদ্রাকাল কয়েক ঘণ্টার বেশি হয় নি। অথচ নগরীকে দেখেছিলেন ধ্বংস ও বিধ্বস্ত। আর নিদ্রা থেকে জেগে এখন দেখতে পাচ্ছেন আবাদ নগরী হিসেবে। তাই সহসা বলে উঠলেন, আল্লাহ সব কিছুই করতে পারেন।

এরপর বনি ইসরাঈলরা তথায় বসবাস করতে থাকে। আল্লাহ্ তাদের রাজত্ব ফিরিয়ে দিলেন। এভাবে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়। তারপর তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে দ্বন্দ্ব কলহে লিপ্ত হয়। এ সুযোগে রোমান সম্রাট তাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদের দেশ দখল করে নেয়। রোমীয় খ্রিষ্টানদের শাসনাধীন থেকে বনি ইসরাঈলের শক্তি ও ঐক্য-সংহতি কিছুই অবশিষ্ট থাকল না।

ইবনে জারির রহ. তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে উক্ত ঘটনা এভাবেই বর্ণনা করেছেন। তিনি আরও লিখেছেন, লাহরাসাব ছিলেন একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক। প্রজাবর্গ, সামন্ত রাজগণ, অধিনায়কগণ ও শহর-নগর সবই ছিল তাঁর অনুগত আজ্ঞাবহ। নগর তৈরি, নদী খনন ও সরাইখানা নির্মাণে তিনি ছিলেন অতিশয় বিজ্ঞ ও পারদর্শী। একশ বছরের ঊর্ধ্বে রাজ্য শাসনের পর দুর্বল ও ক্লান্ত হয়ে পড়লে আপন পুত্র বাশতাসবের নিকট ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

বাশতাসবের আমলে সে দেশে মাজূসী ধর্মের (অগ্নিপূজার) উদ্ভব হয়। এ ধর্মের সূচনা করেন যারদাশত নামক এক ব্যক্তি। সে হযরত আরমিয়া আ. এর সঙ্গে থাকত। সে নবীর উপর কোনো কারণে রাগান্বিত হয়। নবী তাকে অভিশাপ দেন। ফলে যারদাশত কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়। এরপর সে আজার-বাইজানে গিয়ে বাশ্তাসবের সাথে মিলিত হয় এবং তাকে নিজের উদ্ভাবিত মাজূসী ধর্মে দীক্ষিত করে। এ ধর্ম গ্রহণ করার জন্যে বাশতাসব জনগণের উপর ভীষণভাবে চাপ সৃষ্টি করে। যারা স্বীকার করতে রাজি হয় নি, তাদেরকে সে পাইকারীভাবে হত্যা করে। বাশ্তাসবের পরে তার পুত্র বাহমান পারস্যের সম্রাট হয় এবং রাজ্যশাসনে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করে।

বুখত নসর উপর্যুক্ত তিনজন সম্রাটের অধীনে আঞ্চলিক শাসনকর্তা ছিল এবং দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিল। উপর্যুক্ত বর্ণনার সারমর্ম হল : ইবনে জারিরের মতে, উক্ত জনপদের মধ্য দিয়ে অতিক্রমকারী ব্যক্তি হলেন হযরত আরমিয়া আ.। কিন্তু অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ হযরত আলি, ইবনে আব্বাস রাযি. প্রমুখ থেকে বর্ণনা করেছেন, উক্ত অতিক্রমকারী ব্যক্তি হযরত উযায়ের আ.। শেষোক্ত বর্ণনার সূত্র উপরের মতের বর্ণনার সূত্রের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী এবং প্রথম যুগের ও পরবর্তী যুগের আলেমগণের অধিকাংশের নিকট বেশি প্রসিদ্ধ।

হযরত উযায়ের আ.

বংশ পরিচয়

হযরত উযায়ের আ. এর পিতা এবং বংশাধারার কোনো কোনো নাম সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ পাওয়া যায়। কিন্তু সকলে এ কথায় একমত, তিনি হযরত হারূন ইবনে ইমরান আ.-এর বংশধর। ইবনে আসাকির রহ. তাঁর পিতার নাম 'জারওয়াহ' বলেন। কেউ কেউ 'সুওয়ারেক' এবং কেউ 'সারুখা' বর্ণনা করেন। আর সহিফায়ে উয্‌রার মধ্যে বর্ণিত আছে, তাঁর পিতার নাম 'খালক্বিয়াহ' ছিল।

ইসহাক ইবনে বিশর হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেন : বুখতে নসর যাদেরকে বন্দি করে নিয়েছিল, তাদের মধ্যে উযায়ের আ.ও ছিলেন। তখন তিনি ছিলেন একজন কিশোর। যখন তিনি চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হন তখন আল্লাহ তাকে হেকমত (নবুয়ত) দান করেন। তাওরাত কিতাবে তার চেয়ে বিজ্ঞ পণ্ডিত আর কেউ ছিল না।

ইসহাক ইবনে বিশর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রাযি. থেকে বর্ণনা করেন : উযায়ের আ. হলেন আল্লাহর সেই বান্দা, যাঁকে তিনি একশ বছর মৃত অবস্থায় রেখে পুনরায় জীবিত করেছিলেন। ইসহাক ইবনে বিশর বিভিন্ন সূত্রে ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন : উযায়ের আ. ছিলেন একজন জ্ঞানী ও পুণ্যবান লোক। একবার তিনি তাঁর ক্ষেত-খামার ও বাগ-বাগিচা দেখার জন্যে ঘর থেকে বের হন। সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনকালে দ্বিপ্রহরের সময় একটা বিধ্বস্ত বাড়িতে বিশ্রাম নেন। তাঁর বাহন গাধার পিঠ থেকে নিচে অবতরণ করেন। তাঁর সাথে একটি ঝুড়িতে ছিল ডুমুর এবং অন্য একটি ঝুঁড়িতে ছিল আঙ্গুর। খাওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি একটি পেয়ালায় আঙ্গুর নিংড়িয়ে রস বের করেন এবং শুকনো রুটি তাতে ভিজিয়ে রাখেন। রুটি উক্ত রসে ভালোরূপে ভিজে গেলে খাবেন, এই সময়ের মধ্যে বিশ্রামের উদ্দেশ্যে কিছু সময়ের জন্যে শুয়ে পড়েন এবং পা দুখানা দেয়ালের সাথে লাগিয়ে দেন। এ অবস্থায় তিনি বিধ্বস্ত ঘরগুলোর প্রতি লক্ষ করলেন, যার অধিবাসীরা ধ্বংস হয়ে গেছে। তিনি অনেকগুলো পুরাতন হাড় দেখতে পেয়ে মনে মনে ভাবলেন, 'মৃত্যুর পর আল্লাহ কিরূপে এগুলোকে জীবিত করবেন?" আল্লাহ যে জীবিত করবেন, এতে তাঁর আদৌ কোনো সন্দেহ ছিল না। এ কথাটি তিনি কেবল অবাক বিস্ময়ের সাথে ভেবেছিলেন। এরপর আল্লাহ মৃত্যুর ফেরেশতাকে পাঠিয়ে তাঁর রূহ কবজ করান এবং একশ বছর পর্যন্ত মৃত অবস্থায় রেখে দেন। একশ বছর পূর্ণ হলে আল্লাহ উযায়ের আ. এর কাছে ফেরেশতা পাঠিয়ে দেন।

এ দীর্ঘ সময়ে বনি ইসরাঈলের মধ্যে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়ে গিয়েছিল এবং তারা ধর্মের মধ্যে অনেক বেদআতের প্রচলন করেছিল। যা হোক, ফেরেশতা এসে উযায়ের আ. এর কলব ও চক্ষুদ্বয় জীবিত করলেন, যাতে কিভাবে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করবেন তা স্বচক্ষে দেখেন ও অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেন। এরপর ফেরেশতা

উযায়ের আ. এর বিক্ষিপ্ত হাড়গুলো একত্র করে তাতে গোশত লাগালেন, চুল পশম যথাস্থানে সংযুক্ত করলেন এবং চামড়া দ্বারা সমস্ত শরীর আবৃত করলেন। সবশেষে তাঁর মধ্যে রূহ প্রবেশ করালেন। তাঁর দেহ এভাবে তৈরি হচ্ছে, তা তিনি প্রত্যক্ষ করছিলেন এবং অন্তর দিয়ে আল্লাহর কুদরত উপলব্ধি করছিলেন। উযায়ের আ. উঠে বসলেন।

ফেরেশতা জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এ অবস্থায় কতদিন অবস্থান করলেন? তিনি বললেন, এক দিন অথবা এক দিনেরও কিছু কম।' এরূপ বলার কারণ হল, তিনি দ্বিপ্রহরে দিনের প্রথম ভাগে শুয়েছিলেন এবং সূর্যাস্তের পূর্বে উঠেছিলেন। তাই বললেন, দিনের কিছু অংশ, পূর্ণ দিন নয়। ফেরেশতা জানালেন : না, বরং আপনি একশ বছর এভাবে অবস্থান করেছেন। আপনার খাদ্যসামগ্রী ও পানীয় বস্তুর প্রতি লক্ষ করুন! এখানে খাদ্য বলতে তাঁর শুকনো রুটি এবং পানীয় বলতে পেয়ালার মধ্যে আঙ্গুর নিংড়ানো রস বুঝানো হয়েছে। দেখা গেল এ দুটির একটিও নষ্ট হয় নি। রুটি শুকনা আছে এবং রস অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে।

কুরআনে একেই বলা হয়েছে لَمْ يَتَسَنَّهْ অর্থাৎ তা অবিকৃত রয়েছে। রুটি ও রসের মত তাঁর আঙ্গুর এবং ডুমুরও টাটকা রয়েছে। এর কিছুই নষ্ট হয় নি। উযায়ের আ. ফেরেশতার মুখে একশ বছর অবস্থানের কথা শুনে এবং খাদ্যদ্রব্য অবিকৃত দেখে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে যান। যেন ফেরেশতার কথা তিনি মেনে নিতে পারছিলেন না। তাই ফেরেশতা তাঁকে বললেন, আপনি আমার কথায় সন্দেহ করছেন, তা হলে আপনার গাধাটির প্রতি লক্ষ করুন। উযায়ের আ. দেখলেন, তাঁর গাধাটি মরে পঁচে গলে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। হাড়গুলো পুরাতন হয়ে যত্রতত্র বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে রয়েছে।

এরপর ফেরেশতা হাড়গুলোকে আহবান করলেন। সঙ্গে সঙ্গে হাড়গুলো চতুর্দিক থেকে এসে একত্র হয়ে গেল। ফেরেশতা সেগুলো পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করে দিলেন। উযায়ের আ. তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলেন। তারপর ফেরেশতা উক্ত কঙ্কালে রগ, শিরা-উপশিরা সংযোজন করেন। গোশত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং চামড়া ও পশম দ্বারা তা আবৃত করেন। সবশেষে তার মধ্যে রূহ প্রবেশ করান। ফলে গাধাটি মাথা ও কান খাড়া করে দাঁড়াল এবং কেয়ামত আরম্ভ হয়ে গেছে ভেবে চিৎকার করতে লাগল। এ সম্পর্কেই আল্লাহ পাক বলেন :

وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا

"এবং তোমার গাধাটির প্রতি লক্ষ কর" কারণ, তোমাকে মানবজাতির জন্যে নিদর্শনস্বরূপ করব। আর অস্থিগুলোর প্রতি লক্ষ কর, কিভাবে সেগুলোকে সংযোজিত করি এবং গোশত দ্বারা ঢেকে দিই।" (সূরা বাকারা : ২৫৯)

অর্থাৎ তোমার গাধার বিক্ষিপ্ত হাড়গুলোর প্রতি লক্ষ কর। কিভাবে সেগুলোকে গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে সংযোজন করা হয়। যখন গোশতবিহীন হাড়ের কঙ্কাল তৈরি হল, তখন বলা হয়, এবার লক্ষ কর, কিভাবে আমি এ কঙ্কালকে গোশত দ্বারা আচ্ছাদিত করি।

যখন তার নিকট এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে গেল তখন তিনি বলে উঠলেন, আমি জানি, আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। মৃতকে জীবিত করাসহ যে কোনো কাজ করতে তিনি সম্পূর্ণ সক্ষম।

এরপর উযায়ের আ. উক্ত গাধার পিঠে আরোহণ করে নিজ এলাকায় চলে যান। কিন্তু সেখানে কোনো লোককেই তিনি চিনতে পারছেন না। আর তাকেও দেখে কেউ চিনতে পারছে না। নিজের বাড়ি-ঘরও তিনি সঠিকভাবে চিনে উঠতে পারছিলেন না। অবশেষে ধারণার বশে নিজের মনে করে এক বাড়িতে উঠলেন। সেখানে অন্ধ ও পঙ্গু এক বৃদ্ধাকে পেলেন। তার বয়স ছিল একশ বিশ বছর। এ বৃদ্ধা ছিল উযায়ের আ. এর পরিবারের দাসী। একশ বছর পূর্বে তিনি যখন বাড়ি থেকে বের হয়ে যান, তখন এই বৃদ্ধার বয়স ছিল বিশ বছর এবং উযায়ের আ.-কে সে চিনত। বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হলে সে অন্ধ ও পঙ্গু হয়ে যায়। উযায়ের আ. জিজ্ঞেস করলেন, হে বৃদ্ধা! এটা কি উযায়রের বাড়ি?

বৃদ্ধা বলল : হ্যাঁ, এটা উযায়েরের বাড়ি। বৃদ্ধা মহিলাটি কেঁদে ফেলল এবং বলল, এতগুলো বছর কেটে গেল, কেউ তার নামটি উচ্চারণও করে না, সবাই তাকে ভুলে গিয়েছে। উযায়ের আ. নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, আমিই সেই উযায়ের। আল্লাহ আমাকে একশ বছর মৃত অবস্থায় রেখে পুনরায় জীবিত করেছেন। বৃদ্ধা বলল, কী আশ্চর্য! আমরাও তো তাকে একশ বছর পর্যন্ত পাচ্ছি না, সবাই তার নাম ভুলে গিয়েছে, কেউ তাকে স্মরণ করে না। তিনি বললেন, আমিই সেই উযায়ের। বৃদ্ধা বলল, আপনি যদি সত্যিই উযায়ের হন, তা হলে উযায়রের দুআ আল্লাহ কবুল করতেন। কোনো রোগী বা বিপদগ্রস্তের জন্যে দুআ করলে আল্লাহ তাকে নিরাময় করতেন এবং বিপদ থেকে মুক্তি দিতেন। সুতরাং আপনি আমার জন্যে দুআ করুন, আল্লাহ আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলে আপনাকে দেখব এবং আপনি উযায়ের হলে আমি চিনব। তখন উযায়ের আ. দুআ করলেন এবং বৃদ্ধার চোখে হাত বুলিয়ে দিলেন। এতে তার অন্ধত্ব দূর হয়ে গেল।

তারপর তিনি বৃদ্ধার হাত ধরে বললেন, আল্লাহর হুকুমে তুমি উঠে দাঁড়াও। সাথে সাথে তার পঙ্গুত্ব বিদূরিত হল। সে সুস্থ লোকের মতো উঠে দাঁড়াল। মনে হল সে বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করেছে। তারপর উযায়ের আ. এর দিকে তাকিয়ে দেখে বলে উঠল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনিই উযায়ের। এরপর ওই বৃদ্ধা বনি ইসরাঈলের মহল্লায় চলে গেল। দেখল, তারা এক আসরে জমায়েত হয়েছে। সে আসরে উযায়ের আ. এর এক বৃদ্ধ পুত্রও উপস্থিত ছিল। বয়স একশ আঠার বছর। শুধু তাই নয়; প্রপুত্ররাও তথায় উপস্থিত ছিল। তারাও আজ প্রৌঢ়। বৃদ্ধা মহিলা এক পার্শ্বে দাঁড়িয়ে মজলিসের লোকদেরকে ডেকে বলল, উযায়ের আ. তোমাদের মাঝে আবার ফিরে এসেছেন। কিন্তু বৃদ্ধার এ কথা তারা হেসে উড়িয়ে দিল। তারা বলল, তুমি মিথ্যুক। বৃদ্ধা নিজের পরিচয় দিয়ে বলল : আমি অমুক, তোমাদের বাড়ির দাসি। উযায়ের আ. এসে আমার জন্যে

আল্লাহর নিকট দুআ করেছেন। আল্লাহ তাআলা আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং পঙ্গু পা সুস্থ করে দিয়েছেন। উযায়ের আ. বলেছেন, আল্লাহ তাকে একশ বছর মৃত অবস্থায় রেখে আবার জীবিত করে দিয়েছেন। এ কথা শোনার পর লোকজন উঠে উযায়ের আ. এর বাড়িতে গেল এবং তাকে ভালো করে দেখল। উযায়রের বৃদ্ধ পুত্র বলল, আমার পিতার দুই কাঁধের মাঝে একটি কালো তিল ছিল।

সুতরাং সে কাঁধের কাপড় উঠিয়ে তিল দেখে তাঁকে চিনতে পারল। বলল, ইনিই আমার পিতা উযায়ের। তখন বনি ইসরাঈলের লোকজন উযায়ের আ.-কে বলল, আমরা শুনেছি আপনি ব্যতীত অন্য কোনো লোকের তাওরাত কিতাব মুখস্থ ছিল না। এদিকে বুখত নসর এসে লিখিত তাওরাতের সমস্ত কপি আগুনে জ্বালিয়ে দিয়েছে। একটি অংশও অবশিষ্ট নেই। সুতরাং আপনি আমাদের জন্যে একখানা তাওরাত লিখে দিন। বুখতে নসরের আক্রমণকালে উযায়ের আ. এর পিতা সারূখা তাওরাতের একটি কপি মাটির নিচে পুঁতে রেখেছিলেন। কিন্তু সেই স্থানটি কোথায়, উযায়ের আ. ব্যতীত আর কেউ তা জানত না। সুতরাং তিনি উপস্থিত লোকদেরকে সাথে নিয়ে সেই স্থানে গেলেন এবং মাটি খুঁড়ে তাওরাতের কপি বের করলেন। কিন্তু এতদিনে তাওরাতের পাতাগুলো নষ্ট হয়ে সমস্ত লেখা মুছে গিয়েছে।

এরপর তিনি একটি বৃক্ষের নিচে গিয়ে বসলেন। বনি ইসরাঈলের লোকজনও তাঁর পাশে গিয়ে ঘিরে বসল। কিছুক্ষণের মধ্যে আকাশ থেকে দুটি নক্ষত্র এসে তাঁর পেটের মধ্যে প্রবেশ করে। এতে গোটা তাওরাত কিতাব তাঁর স্মৃতিতে ভেসে উঠল। তখন বনি ইসরাঈলের জন্যে তিনি নতুনভাবে তাওরাত লিখে দিলেন। এ সবের জন্যে অর্থাৎ নক্ষত্রদ্বয়ের অবতরণ ও কার্যক্রম, তাওরাত কিতাব নতুনভাবে লিখন ও বনি ইসরাঈলের নেতৃত্ব গ্রহণের কারণে ইহুদিরা উযায়ের আ.-কে আল্লাহর পুত্র হিসেবে আখ্যায়িত করে। হযরত উযায়ের আ. হিযকিল আ. এর সাওয়াদ এলাকায় বসে তাওরাত কিতাবের পুনর্লিখন কাজ সম্পন্ন করেছিলেন।

যে নগরীতে তিনি ইনতেকাল করেছিলেন তার নাম সাইরাবায। ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী : وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ (তোমাকে আমি মানব জাতির জন্যে নিদর্শন বানাবার উদ্দেশ্যে এরূপ করেছি) মানবজাতি বলতে এখানে বনি ইসরাঈলকে বুঝানো হয়েছে। কেননা উযায়ের আ. তাঁর পুত্রদের মাঝে অবস্থান করছিলেন। অথচ পুত্রগণ সবাই ছিল বৃদ্ধ, আর তিনি যুবক। যখন তাঁর মৃত্যু হয় তখন বয়স ছিল চল্লিশ বছর। একশ বছর পর আল্লাহ যখন তাঁকে জীবিত করলেন তখন (প্রথম) মৃত্যুকালের যৌবন অবস্থার উপরেই জীবিত করেছিলেন। ইবনে আব্বাস রাযি. বলেছেন, বুখত নসরের ঘটনার পরে উযায়ের আ. পুনর্জীবিত হয়েছিলেন।

উযায়ের আ. আল্লাহর পুত্র হওয়ার আকিদা

জালেম বাদশা বুখতে নছর বাইতুল মুকাদ্দাসকে বিধ্বস্ত ও বরবাদ করে দিয়েছিল। সে বনি ইসরাঈলদের নর-নারী এবং শিশুদেরকে ভেড়ার পালের মতো হাঁকিয়ে নিয়ে

গিয়েছিল। তাওরাতের সমস্ত কপিগুলোকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিল। বনি ইসরাঈলদের নিকট একটি কপিও বাকি রইল না। তাদের মধ্যে তাওরাতের এমন কোনো হাফেযও কেউ ছিল না, তাওরাতের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত যার মুখস্থ আছে। ফলে বন্দি থাকাকালের পূর্ণ সময়টিতে তারা তাওরাত হতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিল। কিন্তু দীর্ঘকাল পরে যখন তারা বাবেলের বন্দিদশা হতে মুক্তি লাভ করল এবং তারা পুনরায় বাইতুল মুকাদ্দাসে (জেরুযালেমে) এসে আবাদ হয়ে বসতি স্থাপন করল, তখন তাদের চিন্তা হল, আল্লাহ তাআলার কিতাব তাওরাতকে কিভাবে লাভ করা যায়। তখন হযরত উযায়ের আ. সমস্ত বনি ইসরাঈলকে সমবেত করে তাদের সম্মুখে তাওরাত প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত মুখস্থ পাঠ করে শুনালেন এবং লিখে দিলেন।

কোনো কোনো ইসরাঈলী রেওয়ায়েতে আছে, যখন তিনি বনি ইসরাঈলদের একত্র করলেন, তখন সকলের সম্মুখে আসমান হতে দুটি উজ্জ্বল নক্ষত্র নেমে এসে হযরত উযায়ের আ.-এর বক্ষের ভিতর প্রবেশ করল। তখন হযরত উযায়ের আ. বনি ইসরাঈলদেরকে তাওরাত পুনরায় প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত ক্রমানুসারে সাজিয়ে দিলেন। হযরত উযায়ের আ. যখন এ বিরাট গুরুত্বপূর্ণ কাজ হতে অবসর লাভ করলেন, তখন বনি ইসরাঈলরা অশেষ আনন্দ প্রকাশ করল। তাদের অন্তরে হযরত উযায়ের আ.-এর মূল্য ও মর্যাদা শতগুণ বৃদ্ধি পেল।

ক্রমশ এ মহব্বতের আতিশয্য গুমরাহীর রূপ ধারণ করল। তারা হযরত উযায়ের আ.-কে তেমনি আল্লাহ তাআলার পুত্র মেনে নিল, যেমনি নাসারারা হযরত ঈসা আ.-কে আল্লাহর পুত্র বলে মানে। আর বনি ইসরাঈলদের একটি দল নিজেদের এ আকীদার পক্ষে প্রমাণ স্বরূপ বলল, মূসা আ. যখন আমাদেরকে তাওরাত এনে দিয়েছিলেন, তখন তা তক্তাসমূহে (কাষ্ঠফলকে) লিখিত ছিল। আর উযায়ের আ. তো কোনো তক্তা বা কাগজে লিখিত অবস্থায় নয় বরং অক্ষরে অক্ষরে নিজের স্মৃতিপট হতে তা আমাদের সম্মুখে নকল করে দিলেন। অতএব, উযায়ের আ. আল্লাহর পুত্র বলেই এরূপ ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন। سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ (বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ২/৪৬)

একটি সন্দেহের উত্তর

কুরআন মাজিদের ঘোষণা "ইহুদিরা উযায়ের আ.-কে আল্লাহ তাআলার পুত্র বলে থাকে" শোনার পর এ কালের কোনো কোনো ইহুদি বলে, আমরা তো উযায়ের আ.-কে আল্লাহ তাআলার পুত্র বলে মানি না। কাজেই কুরআনের এই দাবি ভুল। কিন্তু বর্তমান যমানার ইহুদিদের এ প্রশ্নটিও তাদের পূর্বকালের লোকদের মতো প্রতারণা এবং সত্য গোপনের ভিত্তিতেই করা হয়েছে। অন্যথায় তারা এবং তাদের ছাড়া প্রত্যেক এ সমস্ত লোকও যারা মুসলিম রাজ্যসমূহে ভ্রমণ করেছে এবং দুনিয়ার কওমসমূহের ধর্ম সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার আগ্রহও তাদের আছে– ভালোরূপেই জানে, আজও ফিলিস্তিনের আশেপাশে ইহুদিদের সেই দলটি বিদ্যমান রয়েছে, যারা উযায়ের আ.-কে আল্লাহ তাআলার পুত্র বলে মানে এবং রোমান ক্যাথলিকদের মতো হযরত উযায়ের আ.-এর

প্রতিমূর্তি নির্মাণ করে তার সাথে সেরূপ আচরণই করে থাকে, যেরূপ আচরণ আল্লাহ তাআলার সাথে হওয়া উচিত।

ওফাত ও সমাধি

ইবনে কাসীর রহ. ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম হতে উযায়ের আ. সম্বন্ধে যে সুদীর্ঘ রেওয়ায়েতটি নকল করেছেন, তাতে বর্ণিত আছে : হযরত উযায়ের আ. ইরাকে অবস্থানকালে দায়রে হিযকিলে বসে বনি ইসরাঈলদের জন্য তাওরাতের নুতন সংস্করণ লিখে দিয়েছিলেন এবং এ অঞ্চলেই সাইরাবাদ নামক একটি বসতিতে তাঁর ইনতেকাল হয়। কোনো কোনো সাহাবায়ে কেরামের ও তাবেঈনের বাণীতে আছে, তাঁর সমাধি মোবারক দামেশকে অবস্থিত।

হযরত যাকারিয়া আ.

বংশ পরিচয়

তাওরাতে যে যাকারিয়ার আলোচনা করা হয়েছে তিনি কুরআন মাজিদের যাকারিয়া আ. নন। তাওরাতে উল্লিখিত যাকারিয়ার আবির্ভাব হয়েছিল পারস্য-রাজা দারায়ূশের যামানায়। যেমন সহিফায় উল্লেখ রয়েছে :

"দারার রাজত্বকালের দ্বিতীয় বছর অষ্টম মাসে আল্লাহ তাআলার কালাম যাকারিয়া ইবনে বরখিয়া ইবনে আদূর থেকে পৌঁছেছে। আর দারা ইবনে গোশতাসপ-এর যমানা হযরত ঈসা মাসীহ আ.-এর জন্মের পাঁচশ বছর পূর্বে। কেননা তিনি কায়কোবাদ ইবনে কায়খসরুর ইনতেকালের পরে খৃস্টপূর্ব ৫২১ সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন। আর কুরআন মাজিদে যে যাকারিয়া আ.-এর আলোচনা করা হয়েছে, তিনি হযরত ঈসা মাসীহ আ.-এর মাতা হযরত মারিয়াম আ.-এর প্রতিপালক এবং হযরত ঈসা আ.-এর সমসাময়িক। হযরত ঈসা আ. ও ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া আ. এর মধ্যস্থলে অন্য কোনো নবী নেই। হযরত যাকারিয়া আ. হলেন হযরত ইয়াহইয়া আ.-এর পিতা।

(ফতহুল বারী : ৬/৩৬৫)

হযরত যাকারিয়া আ.-এর পিতার নাম কি ছিল? সে সম্বন্ধে জীবনী লেখকদের মধ্যে বিভিন্ন মত রয়েছে। তন্মধ্যে কোনো মতকেই নির্ভরযোগ্য বলা যায় না। হাফেয ইবনে হাজার ফাতহুল বারীতে এবং ইবনে কাসীর স্বীয় তাফসির ও ইতিহাসে ইবনে আসাকের থেকে ওই মতগুলি উদ্ধৃত করে দিয়েছেন। অর্থাৎ যাকারিয়া ইবনে 'ঊন' (ওয়ান) বা ইবনে শাবওয়া, বা ইবনে লাদুন বা ইবনে বরখিয়া ইবনে মুসলিম।(ফাতহুল বারী : ২/৩৭)

ইবনে আসাকির তাঁর বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থে হযরত যাকারিয়া আ.-এর বংশ তালিকা নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন : যাকারিয়া ইবনে বারখিয়া বা যাকারিয়া ইবনে দান কিংবা যাকারিয়া ইবনে লাদুন ইবনে মুসলিম ইবনে সাদূক ইবনে সাদূক ইবনে হাশবান ইবনে দাউদ ইবনে সুলায়মান ইবনে মুসলিম সাদিকা ইবনে বারখিয়া ইবনে বালআতা ইবনে নাহূর ইবনে শালূম ইবনে বাহনাশাত ইবনে আয়নামান ইবনে বাহবিআম ইবনে

সুলাইমান ইবনে দাউদ। হযরত যাকারিয়া আ. ছিলেন বনি ইসরাঈলের নবী ইয়াহইয়া আ.-এর পিতা। তিনি পুত্র ইয়াহইয়ার সন্ধানে দামিশকের বুছায়না শহরে গিয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন, পুত্র ইয়াহইয়া নিহত হওয়ার সময় তিনি দামিশকেই অবস্থান করছিলেন। তার নসবনামা সম্পর্কে আরও বিভিন্ন মত রয়েছে। উচ্চারণে যাকারিয়া। (দীর্ঘ স্বরবিশিষ্ট) যাকারিয়া বা যাকরা বলাও হয়ে থাকে।

জীবনের অবস্থাবলী

যাকারিয়া আ.-এর জীবনের অবস্থাবলী বিস্তারিতভাবে জানা নেই। যতটুকু কুরআন মাজিদ, জীবনী ও ইতিহাসগ্রন্থের নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েতসমূহ দ্বারা জানা যায় তা হল : বনি ইসরাঈলদের মধ্যে 'কাহেন' একটি সম্মানিত পদ ছিল। তাঁর দায়িত্ব ছিল তিনি ইহকালের (অর্থাৎ ছাখরায়ে বাইতুল মুকাদ্দাসের) পবিত্র রুসুমসমূহ পালন করতেন। এজন্য বিভিন্ন গোত্র হতে পৃথক কাহেন নির্ধারিত হত এবং নিজ নিজ পালাক্রমে সে কার্যটি সম্পন্ন করতেন। হযরত যাকারিয়া আ. বনি ইসরাঈলদের মধ্যে সম্মানিত 'কাহিন'ও ছিলেন এবং উচ্চস্তরের পয়গম্বরও ছিলেন। যেমন কুরআন মাজিদ তাঁকে আম্বিয়ায়ে কেরামের তালিকায় গণ্য করে বলেছে :

وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ

"আর যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা, ইলিয়াস এরা সকলেই নেককারদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।" (সূরা আনআম : রুকূ : ১০)

আর লুকার ইঞ্জিলেও তাঁকে 'কাহেন' বলা হয়েছে। কিন্তু ইসলামের প্রাথমিক যুগে আরবে যে কাহেন বা জ্যোতিষী হত, তারা ভবিষ্যতের কথা ও অবস্থা বর্ণনা করত এবং যাদের কথা বিশ্বাস করা 'কুফর' বলা হয়েছে, তা বনি ইসরাঈলদের ওই 'কাহেন' হতে সম্পূর্ণ পৃথক। লুকার ইঞ্জিলে উল্লেখ রয়েছে :

"ইহুদিদের বাদশা হীরোদেসের যামানায় 'আবইয়াহ' দলে যাকারিয়া নামক একজন 'কাহেন' ছিলেন। তাঁর স্ত্রী হারুন আ.-এর বংশধরগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর নাম ছিল আলইয়াশা'। তাঁরা উভয়ে আল্লাহ তাআলার দরবারে অতিশয় সত্যপরায়ণ ছিলেন এবং আল্লাহ তাআলার সমস্ত নির্দেশাবলী এবং বিধানসমূহের উপর ত্রুটিহীনভাবে চলতেন।

(প্রথম অধ্যায় : আয়াত : ৫-৬)

কিন্তু বারনাবার ইঞ্জিলে স্পষ্টরূপে উল্লেখ আছে, তিনি আল্লাহ তাআলার মনোনীত পয়গম্বর ছিলেন। যেমন হযরত মাসীহ ঈসা আ. ইহুদিদেরকে সম্বোধন করে বলছেন, "সেই সময়টি খুবই নিকটবর্তী, যখন তোমাদের উপর ঐ সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামের দরুন আযাব এসে পড়বে, যাঁদেরকে তোমরা যাকারিয়া আ.-এর যুগ পর্যন্ত হত্যা করেছ?

বারনাবার ইঞ্জীল বিখ্যাত চার ইঞ্জীল হতে পৃথক ৫ম একটি ইঞ্জিল। এটা হযরত ঈসা আ.-এর হাওয়ারীগণের অন্তর্ভুক্ত বারনাবার সাথে সম্পর্কিত। এটা রোমজাতির

পোপ সেক্‌টাসের লাইব্রেরীতে রক্ষিত ছিল। সেখান থেকে তাদের একজন ধর্মীয় নেতা কোনো প্রকারে হস্তগত করে সেটিকে প্রচার করে দেন এবং নিজে মুসলমান হয়ে যান। কেননা তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবির্ভাবের সুসংবাদ পরিষ্কার ও স্পষ্টরূপে পাওয়া যায়।

হযরত যাকারিয়া আ. হযরত দাউদ আ.-এর বংশধর এবং তাঁর স্ত্রী আলইয়াশা' বা ঈশা হযরত হারুন আ.-এর বংশধর ছিলেন। (ফাতহুল বারী : ৬ খণ্ড)

সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম তাঁরা বাদশা এবং রাজ্যাধিপতিই হন না কেন, নিজের জীবিকা নিজের হাতে উপার্জন করতেন। তাঁরা কারো কাঁধের বোঝা হতেন না। এ জন্যই প্রত্যেক নবী যখন নিজের উম্মতকে হেদায়েত করতেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে এটাও ঘোষণা করতেন :

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ

"আমি এ হেদায়েত কাজের বিনিময়ে তোমাদের নিকট হতে কোনো পারিশ্রমিক দাবি করছি না। আমার পারিশ্রমিক তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারেই রয়েছে।" (সূরা শুআরা)

যাকারিয়া আ.-ও নিজের জীবিকা উপার্জনের জন্য করাতির কাজ করতেন। মুসলিম, ইবনে মাজা ও মুসনাদে আহমদে পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «كَانَ زَكَرِيَّا نَجَّارًا

"হযরত আবু হোরায়রা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যাকারিয়া আ.করাতির কাজ করতেন।"

তাঁর বংশে অর্থাৎ সুলাইমান ইবনে দাউদ আ.-এর বংশধরদের মধ্যে ইমরান ইবনে নাশী এবং তার স্ত্রী হান্না বিনতে ফাকূদ নেককার লোক ছিলেন। তিনি দরবেশী জীবন যাপন করতেন, কিন্তু নিঃসন্তান ছিলেন। হযরত ঈসা আ.-এর আলোচনায় সবিস্তার বর্ণিত হবে। হান্নার দোয়ায় তাঁর গর্ভে একটি কন্যা-সন্তান জন্মগ্রহণ করে। যার নাম রাখলেন মারিয়াম। আর হান্না নিজের মানত অনুযায়ী মারিয়ামকে বাইতুল মুকাদ্দাসের জন্য উৎসর্গ করলেন। প্রশ্ন হল, এর প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার কার ওপর ন্যস্ত হবে? কাহেনদের মধ্যে আল্লাহ তাআলার কবুলকৃত এ মানত সম্বন্ধে মতানৈক্য হয়ে যখন সাব্যস্ত হল, এ সম্বন্ধে লটারি করা হবে। তখন লটারিতে হযরত যাকারিয়া আ.-এর নাম উঠল। সুতরাং তিনিই মারিয়ামের প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করলেন। যেমন কুরআন মাজিদে আছে :

وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا

"আর যাকারিয়া মারিয়ামের প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।" (আলে-ইমরান : রুকূ : ৪)

وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ

"আর আপনি (হে মুহাম্মদ) তাদের নিকট উপস্থিত ছিলেন না, যখন তারা নিজ নিজ কলম (লটারীর জন্য নদীতে) নিক্ষেপ করছিল (এ উদ্দেশ্যে) কে মারিয়ামের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। আর তখনও আপনি তাদের নিকট উপস্থিত ছিলেন না, যখন তারা মারিয়ামের দায়িত্ব গ্রহণের ব্যাপারে পরস্পর ঝগড়া করছিল।"

(আলে ইমরান : রুকূ : ৫)

ইতিহাসবিদ ওলামায়ে কেরাম বলেন, হযরত যাকারিয়া আ. এমনিতেও মারিয়াম আ.-এর রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণের হকদার ছিলেন। কেননা বশির ইবনে ইসহাক 'আল-মুবতাদা' কিতাবে লিখেছেন, হযরত যাকারিয়া আ.-এর পত্নী ঈশা' (আলইয়াশা') এবং হযরত মারিয়াম আ.-এর মাতা হান্না উভয়ে পরস্পর সহোদর ভগ্নি ছিলেন। (ফাতহুল বারী) আর খালা মাতার স্থলবর্তী বটে। যেমন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, উমামা বিনতে হামযা রাযি.-এর প্রতিপালন হযরত জাফর রাযি.-এর পত্নী করবেন। কেননা তিনি উমামার খালা আর খালা মাতার তুল্য। (বুখারী)

মারিয়াম আ. যখন বোধমতী হলেন, তখন হযরত যাকারিয়া আ. তাঁর জন্য বায়তুল মুকাদ্দাসের কাছে একটি হুজরা (নির্জন কামরা) নির্দিষ্ট করে দিলেন। সেখানে তিনি সারা দিন আল্লাহ পাকের ইবাদতের কাটাতেন এবং রাতে তাঁর খালার নিকটে কাটাতেন। হযরত যাকারিয়া আ. যখনই মারিয়ামের হুজরায় প্রবেশ করতেন, তখনই দেখতে পেতেন, তাঁর নিকট বেমৌসুমী ফল বিদ্যমান রয়েছে। একদিন তিনি বিস্ময় সহকারে জিজ্ঞাসা করলেন, মারিয়াম! এই বেমৌসুমী ফল তোমার নিকট কোথা থেকে আসল? মারিয়াম আ. বললেন, এটা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এসেছে? নিঃসন্দেহে, আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা ধারণার বাইরে থেকে রিযিক দান করে থাকেন। এ সম্পর্কে কোরআন মাজিদে ইরশাদ হচ্ছে :

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ

هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

"যখনই যাকারিয়া আ. তাঁর নিকট হুজরায় (মেহরাবে) প্রবেশ করতেন, তখনই তাঁর নিকট খাদ্য ও পানীয় বস্তুসমূহ দেখতে পেতেন। যাকারিয়া জিজ্ঞাসা করলেন, মারিয়াম! এটা তোমার নিকট কোথা হতে আসে? মারিয়াম বললেন, এ আল্লাহ পাকের তরফ হতে। নিঃসন্দেহ আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা ধারণাতীত রিযিক দান করে থাকেন।"

(আলে-ইমরান : রুকূ : ৪)

হযরত যাকারিয়া আ.-এর কোনো সন্তান ছিল না। তিনি অনুভব করতেন, "আমি সন্তান হতে বঞ্চিত; কিন্তু এর চেয়ে আমার অধিক চিন্তার বিষয় হল, আমার বন্ধুদের মধ্যে কেউই এমন উপযুক্ত নাই, আমার পরে বনি ইসরাঈলদের হেদায়েত ও সৎপথ

প্রদর্শনের খেদমতের কাজ সম্পন্ন করবে। অতএব যদি আল্লাহ তাআলা আমাকে নেকস্বভাব ও সৎপ্রকৃতির পুত্র দান করতেন, তবে আমি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হতাম, আমার পরে বনি ইসরাঈলদের হেদায়েতের কাজ সম্পন্ন করার জন্য উপযুক্ত লোক রয়েছে।" (ফাতহুল বারী : ৬/৩৬৪)

কিন্তু তাঁর বয়স যেহেতু (ইবনে কাসীর রহ. এর উক্তি অনুযায়ী) তখন ৭৭ বছর আর ছালাবীর উক্তি অনুযায়ী ৯০ বছর মতান্তরে ৯২ বা ১২০ বছর হয়ে গিয়েছিল এবং তাঁর স্ত্রী ছিল বন্ধ্যা, তাই বাহ্যিক কারণে সম্পূর্ণ নিরাশ ছিলেন। এখন আর সন্তান হওয়ার কোনো উপায় নেই। কিন্তু তিনি যখন মারিয়াম আ.-এর নিকট বেমৌসুমী ফল দেখতে পেলেন এবং জানতে পারলেন, মারিয়ামের উপর আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ। তখনই তাঁর অন্তরে প্রেরণার উদয় হল, যে পবিত্র সত্তা এরূপে বেমৌসুমে মারিয়ামকে ফল দান করছেন, তিনি কি আমাকে আমার বর্তমানের এ নৈরাশ্যপূর্ণ অবস্থায় আমার জীবনের ফলস্বরূপ একটি পুত্র-সন্তান দান করতে পারেন না? নিশ্চয়ই পারেন। সুতরাং আমার নিরাশ হওয়া সম্পূর্ণ ভুল। নিঃসন্দেহ যে পবিত্র সত্তা মারিয়ামের উপর নিজের অনুগ্রহ ও দয়া বর্ষণ করেছেন, তিনি অবশ্যই আমার উপরও দয়া-অনুগ্রহ করবেন। এরপর তিনি আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করলেন, "হে আল্লাহ! আমি একাকী, উত্তরাধিকারীর মুখাপেক্ষী। এমনি তো সত্যিকারের এবং সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী আপনারই পবিত্র সত্তা। আয় খোদা! আমাকে পবিত্র-স্বভাব সন্তান দান করুন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, আপনি অভাবীর দোয়া নিশ্চয়ই শ্রবণ ও মঞ্জুর করে থাকেন।"

নবীর দোয়া এবং দোয়া শুধু নিজের জন্য নয়; বরং কওমের হেদায়েতের জন্য। অতএব আল্লাহ তাআলা তাঁর দোয়া কবুল করে নেন। যখন যাকারিয়া আ. মসজিদে ইবাদতে মশগুল ছিলেন, তখন আল্লাহ তাআলার ফেরেশতা তাঁর সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করে সুসংবাদ প্রদান করলেন, আপনার পুত্র জন্মলাভ করবে। আপনি তার নাম রাখবেন ইয়াহইয়া। হযরত যাকারিয়া আ. এটা শ্রবণে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞাসা করলেন, এ সংবাদটি কেমন করে পূর্ণতা লাভ করবে? অর্থাৎ আমাকেই কি যৌবন প্রদান করা হবে না-কি আমার স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব দূর করে দেওয়া হবে? ফেরেশতা উত্তর করলেন : আমি এতটুকুই বলতে পারি, অবস্থা যাই হোক, আপনাদের পুত্র জন্মলাভ করবে। কেননা আল্লাহ পাকের সিদ্ধান্ত অটল। আর আপনার আল্লাহ বলেন, "আমার জন্য এটা খুবই সহজ" অর্থাৎ যে পন্থাই তার জন্য ইচ্ছা করি অবলম্বন করতে পারি। আমি কি তোমাকে অস্তিত্বহীন অবস্থা হতে অস্তিত্বে আনয়ন করি নি?

যাকারিয়া আ. আল্লাহ পাকের দরবারে আরয করলেন, ইয়া আল্লাহ! এমন কোনো লক্ষণ আমাকে দান করুন, যাতে আমি বুঝতে পারি, আপনার সুসংবাদটি অস্তিত্ব প্রাপ্তির আকার ধারণ করেছে। আল্লাহ তাআলা বললেন, তোমার লক্ষণ হল, যখন তুমি তিন দিন পর্যন্ত কথা বলতে না পারবে এবং শুধু ইঙ্গিতে ও ইশারায়ই নিজের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করবে, তখন মনে করবে, সুসংবাদটি অস্তিত্ব লাভ করেছে। কিন্তু এই তিন দিবসে তুমি

আল্লাহ তাআলার তাসবিহ ও তাহলিলে খুব মশগুল থাকবে। সুতরাং যখন সেই নির্দিষ্ট সময় এসে গেল, তখন হযরত যাকারিয়া আ. আল্লাহর পাকের স্মরণে আরও অধিক মশগুল হয়ে পড়লেন এবং উম্মতদেরকেও ইশারায় আদেশ করলেন। তারাও যেন আল্লাহ তাআলার স্মরণে আরও অধিক মশগুল থাকে।

কেননা হযরত ইয়াহইয়া আ.-এর জন্মলাভ যেমনিভাবে হযরত যাকারিয়া আ.-এর জন্য হাজার অজুত আনন্দের কারণ ছিল, তদ্রূপ এটি বনি ইসরাঈলদের জন্যও তা কম আনন্দের কারণ ছিল না। যাঁর জন্ম লাভের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে, তিনি হবেন হযরত যাকারিয়া আ.-এর একজন সঠিক স্থলবর্তী এবং ইলম ও হেকমতের সঠিক উত্তরাধিকারী।

এ ঘটনাগুলি কুরআন মাজিদ ও সহি হাদিসসমূহের মাধ্যমে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। তাই শুধু এর উপরই নির্ভর করা যেতে পারে। এছাড়া আর যত কথা রয়েছে, তা হয়ত ইসরাঈলী রেওয়ায়েত– তন্মধ্যে অধিকাংশ কুরআন ও হাদিসের বর্ণিত ঘটনাবলীর সাথে সামঞ্জস্যশীল আর কতক রেওয়ায়েত এমন আছে, যা নির্ভরের অযোগ্য অথবা কতক সাহাবী ও তাবেঈনের বাণী রয়েছে, যা রেওয়ায়েত এবং বিবেক উভয় দিক হতেই প্রমাণরূপে গ্রহণের অযোগ্য এবং সনদবিহীন। এ সম্পর্কে সূরা মারিয়ামে আল্লাহ পাক বলেন :

كهيعص (١) ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا (٢) إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا (٣) قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا (٤) وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (٥) يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا (٦) يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا (٧) قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا (٨) قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا (٩) قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا (١٠) فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا (١١) يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا (١٢) وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا (١٣) وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا (١٤) وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا

"কাফ–হা–ইয়া–আইন–স-দ; এটা তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের বিবরণ তাঁর বান্দা যাকারিয়ার প্রতি। যখন সে তার প্রতিপালককে আহবান করেছিল নিভৃতে। সে বলেছিল, "আমার অস্থি দুর্বল হয়েছে। বার্ধক্যে আমার মস্তক শুভ্রোজ্জ্বল হয়েছে; হে আমার প্রতিপালক! তোমাকে আহবান করে আমি কখনও ব্যর্থ হই নি। আমি আশঙ্কা করি আমার পর আমার স্বগোত্রীয়দের সম্পর্কে; আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। সুতরাং তুমি তোমার

নিকট হতে আমাকে দান কর উত্তরাধিকারী। যে আমার উত্তরাধিকারিত্ব করবে এবং উত্তরাধিকারিত্ব করবে ইয়াকূবের বংশের। আর হে আমার প্রতিপালক! তাকে কর সন্তোষজনক। তিনি বললেন : "হে যাকারিয়া! আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি। তার নাম হবে ইয়াহইয়া; এ নামে পূর্বে আমি কারও নামকরণ করি নি। সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! কেমন করে আমার পুত্র হবে যখন আমার স্ত্রী বন্ধ্যা ও আমি বার্ধ্যক্যের শেষ সীমায় উপনীত? তিনি বললেন, এ এরূপই হবে। তোমার প্রতিপালক বললেন, এ তো আমার জন্যে সহজসাধ্য, আমি তো পূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি যখন তুমি কিছুই ছিলে না।" যাকারিয়া বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি নিদর্শন দাও। তিনি বললেন, তোমার নিদর্শন হল, তুমি সুস্থ থাকা সত্ত্বেও কারও সাথে তিন দিন বাক্যালাপ করবে না। এরপর সে কক্ষ হতে বের হয়ে তার সম্প্রদায়ের নিকট আসল। ইঙ্গিতে তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে বলল। (আমি বললাম) হে ইয়াহইয়া! এ কিতাব দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ কর। আমি তাকে শৈশবেই দান করেছিলাম জ্ঞান এবং আমার নিকট হতে হৃদয়ের কোমলতা ও পবিত্রতা; সে ছিল মুত্তাকী। পিতামাতার অনুগত এবং সে ছিল না উদ্ধত-অবাধ্য। তার প্রতি শান্তি যেদিন তার মৃত্যু হবে এবং যে দিন সে জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে।

(সূরা মারিয়াম : ১-১৫)

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন :

وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٧) هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ (٣٨) فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (٣٩) قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (٤٠) قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ

"এবং তিনি তাকে (মারিয়ামকে) যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে রেখেছিলেন। যখনই যাকারিয়া কক্ষে তার সাথে সাক্ষাত করতে যেত, তখনই তার নিকট খাদ্য-সামগ্রী দেখতে পেত। সে বলত, হে মারিয়ম। এসব তুমি কোথায় পেলে? সে বলত, এ আল্লাহর নিকট হতে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবনোপকরণ দান করেন। সেখানেই যাকারিয়া তার প্রতিপালকের নিকট দোয়া করে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তুমি তোমার নিকট হতে সৎ বংশধর দান কর। তুমিই প্রার্থনা শ্রবণকারী। যখন যাকারিয়া কক্ষে নামাযে দাঁড়িয়েছিল তখন ফেরেশতাগণ তাকে সম্বোধন করে

বলল : "আল্লাহ্ তোমাকে ইয়াহইয়ার সুসংবাদ দিচ্ছেন। সে হবে আল্লাহর বাণীর সমর্থক, নেতা, স্ত্রী-বিরাগী এবং পুণ্যবানদের মধ্যে একজন নবী।" সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! বার্ধক্য এসেছে এবং আমার স্ত্রী-বন্ধ্যা। তিনি বললেন, এভাবেই। আল্লাহ যা ইচ্ছা তা-ই করেন। সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি নিদর্শন দাও। তিনি বললেন, তোমার নিদর্শন এই, তিন দিন তুমি ইঙ্গিত ব্যতীত কোনো মানুষের সাথে কথা বলতে পারবে না। আর তোমার প্রতিপালককে অধিক স্মরণ করবে। এবং সন্ধ্যায় ও প্রভাতে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে।" (আলে-ইমরান : ৩৭-৪১)

মুজাহিদ, ইকরামা, ওহাব, সুদ্দী ও কাতাদা বলেছেন, কোনোরূপ অসুখ ব্যতীতই [উক্ত নির্দিষ্ট সময়ে] হযরত যাকারিয়া আ.-এর জিহবা আড়ষ্ট হয়ে যায়। ইবনে যায়েদ বলেছেন, তিনি তাসবিহ পাঠ করতে পারতেন; কিন্তু কারও সাথে কথা বলতে পারতেন না।

সূরা আম্বিয়ায়ে আল্লাহ্ তাআলা বলেন :

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ (٨٩) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ

"এবং স্মরণ কর যাকারিয়ার কথা, যখন সে তার প্রতিপালককে আহবান করে বলেছিল, "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একা রেখো না, তুমি তো শ্রেষ্ঠ মালিকানার অধিকারী।" এরপর আমি তার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে দান করেছিলাম ইয়াহইয়া এবং তার জন্যে তার স্ত্রীকে যোগ্যতা সম্পন্ন করেছিলাম। তারা সৎকাজে প্রতিযোগিতা করত, তারা আমাকে ডাকত আশা ও ভীতির সাথে এবং তারা ছিল আমার নিকট বিনীত।" (সূরা আম্বিয়া : ৮৯-৯০)

আল্লাহ্ তাআলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হযরত যাকারিয়া আ.-কে সন্তান প্রদানের ঘটনা মানুষের কাছে বর্ণনা করার নির্দেশ দেন। আল্লাহ্ যখন হযরত যাকারিয়া আ.-কে পুত্র সন্তান দান করেন, তখন তিনি ছিলেন বৃদ্ধ। তাঁর স্ত্রী যৌবনকালে থেকেই ছিলেন বন্ধ্যা। আর এখন বার্ধক্যে আক্রান্ত। কিন্তু এসব প্রতিকূল অবস্থা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তিনি আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হন নি। তিনি তার পালনকর্তাকে আহবান করেছিলেন নিভৃতে। কাতাদা রহ. বলেছেন, আল্লাহ্ স্বচ্ছ অন্তর ও ক্ষীণ আওয়াজ সম্পর্কে সম্যক অবহিত। কোনো কোনো প্রাচীন আলেম বলেছেন, হযরত যাকারিয়া আ. রাত্রিবেলা নিদ্রা থেকে উঠে অতি ক্ষীণ আওয়াজে, যাতে তাঁর কাছের কেউ শুনতে না পায়। আল্লাহকে আহবান করে বলেন, হে আমার প্রভু! আল্লাহ তাআলা আহবানে সাড়া দিয়ে বললেন : লাব্বায়িক। লাব্বায়িক!! লাব্বায়িক!! এরপর যাকারিয়া আ. বলেন :

رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا

'প্রভু! আমার অস্থি দুর্বল হয়ে পড়েছে, বয়সে দেহ ভারাবনত হয়ে গিয়েছে। বার্ধক্যে মস্তক শুভ্র হয়েছে। অগ্নিশিখা যেমন কাষ্ঠখণ্ড গ্রাস করে, তেমন বার্ধক্য আমার কালো চুল গ্রাস করে নিয়েছে।'

হযরত যাকারিয়া আ. এর দোয়া– আপনি আমাকে নিজের পক্ষ থেকে একজন উত্তরাধিকারী দান করুন, যে নবুয়তের দায়িত্ব পালনে এবং বনি ইসরাঈলের নেতৃত্ব প্রদানে আমার স্থলাভিষিক্ত হবে এবং সে প্রতিনিধিত্ব করবে ইয়াকুব বংশের। অর্থাৎ ইয়াকুবের সন্তানদের মধ্যে তার (আমার প্রার্থিত পুত্রের) পূর্ব-পুরুষগণ যেভাবে নবুয়ত, মর্যাদা ও ওহি প্রাপ্ত হয়েছে, তাকেও সেই সুমহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করুন! এখানে উত্তরাধিকারী বলতে ধন-সম্পদের উত্তরাধিকারী হওয়া বুঝানো হয় নি। কিন্তু শিয়া সম্প্রদায় এখানে ধন-সম্পদের উত্তরাধিকারের অর্থ গ্রহণ করেছে। ইবনে জারীরও এখানে শিয়া মতকে সমর্থন করেছেন। তিনি সালেহ ইবনে ইউসুফের উক্তির কথাও নিজের মতের সমর্থনে উল্লেখ করেছেন। কয়েকটি কারণে এ মতটি গ্রহণযোগ্য নয়।

(১) সূরা 'নামল' এর ১৬ নং আয়াত وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ –সুলাইমান আ. দাউদ আ. (নবুয়ত ও রাজত্বের) উত্তরাধিকারী হয়। তাফসিরের কিতাবে এ আয়াতের অধীনে বুখারী মুসলিমসহ সহি মুসনাদ ও সুনানের কিতাবে বহু সংখ্যক সাহাবী থেকে বর্ণিত সেই প্রসিদ্ধ হাদীস উল্লেখ আছে, যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : لَا نُوْرِثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ "আমরা কোনো উত্তরাধিকারী রেখে যাই না, মৃত্যুর পরে যা কিছু পরিত্যক্ত সম্পদ থাকে, তা সর্বসাধারণের জন্যে সদকা বা দান হিসেবে গণ্য হবে।" এ হাদীস থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিত্যক্ত সম্পদের কোনো উত্তরাধিকারী রেখে যান নি। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায় যেসব সম্পত্তি ব্যক্তিগতভাবে ভোগ করতেন, হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযি. সেগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তরাধিকারীদের হাতে তুলে দেন নি। বরং এসব উত্তরাধিকারীদের দাবির বিরুদ্ধে হযরত আবু বকর রাযি. উপর্যুক্ত হাদিসটি দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। আর তাঁর সমর্থন দেন হযরত ওমর, উসমান, আলি, আব্বাস, আবদুর রহমান ইবনে আওফ, তালহা, যুবায়ের, আবু হোরায়রা রাযি. প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম।

(২) উপর্যুক্ত হাদিসটি ইমাম তিরমিযি তাঁর গ্রন্থে বহুবচনের শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন। ফলে সকল নবীই এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। তিনি বর্ণনা করেছেন : نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُوْرِثُ "আমরা নবীরা কোনো উত্তরাধীকারী রেখে যাই না।" ইমাম তিরমিযী এ বর্ণনাটিকে সহি বলে আখ্যায়িত করেছেন।

(৩) নবীগণের নিকট দুনিয়ার সহায়-সম্পদ সর্বদাই অতি নগন্য ও তুচ্ছ বলে গণ্য হয়েছে। তাঁরা কখনই এগুলো সংগ্রহে ব্যস্ত হন নি। এর প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন নি এবং এর কোনো গুরুত্বই দেন নি। সুতরাং সন্তান ধন-সম্পদ সঞ্চয়ের জন্যে প্রার্থনা

করার প্রশ্নই আসে না। কারণ যে সন্তান ত্যাগের মহিমায় নবীদের মর্যাদার সীমানায় পৌঁছতে পারবে না, সে তো নবীর পরিত্যক্ত সামান্য সম্পদকে কোনো গুরুত্বই দেবে না। তাই সেই তুচ্ছ সম্পদের উত্তরাধিকারী বানানোর লক্ষ্যে কোনো সন্তান কামনা করা একেবারেই অবান্তর।

(৪) ঐতিহাসিক মতে হযরত যাকারিয়া আ. পেশায় ছিলেন ছুতার। স্বহস্তে উপার্জিত রোজগার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন, যেমনটি করতেন হযরত দাউদ আ.। বলাবাহুল্য, নবীগণ সাধারণত আয়-রোজগারে এমনভাবে আত্মনিয়োগ করতেন না, যার দ্বারা অতিরিক্ত মাল সঞ্চয় হতে পারে এবং পরবর্তী সন্তানগণ তার উত্তরাধিকারী হতে পারে। ব্যাপারটি দিবালোকের মতো স্পষ্ট। সামান্য চিন্তা করলেই যে কেউ বিষয়টি সহজেই বুঝতে পারে।

ওফাত

হযরত যাকারিয়া আ.-এর ইনতেকাল স্বাভাবিক মৃত্যুতে হয়েছিল, না কি তাঁকে শহিদ করে দেওয়া হয়েছিল এ নিয়ে বেশ মতভেদ রয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় হল, উভয়বিদ মতের সনদই ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ রহ. পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছছে। তিনি বলেন, হযরত যাকারিয়া আ. তাঁর কওমের যুলুম থেকে বাঁচার জন্য পালিয়ে একটি গাছের মধ্যে ঢুকে পড়েন। সম্প্রদায়ের লোকজন ওই গাছটি করাত দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করে ফেলে। করাত যখন তাঁর দেহ স্পর্শ করে, তখন তিনি চিৎকার করেন। আল্লাহ তখন ওহি প্রেরণ করে তাঁকে জানান, তোমার চিৎকার বন্ধ না হলে যমিন উলটিয়ে দেওয়া হবে। তিনি চিৎকার বন্ধ করে দেন এবং তাঁর দেহ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়।

অপর বর্ণনায় আছে, যিনি গাছের মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন, তার নাম যীশাইর বা শাইয়া আ.। আর হযরত যাকারিয়া আ. স্বাভাবিকভাবেই ইনতেকাল করেছিলেন। তাকে শহিদ করা হয় নি। (তারীখে ইবনে কাসীর : ২/৫২)

তবে প্রসিদ্ধ মতে তাঁকেও ইহুদিরা শহিদ করে ফেলেছিল। অবশ্য এ ব্যাপারটি কীরূপে এবং কোন স্থানে ঘটেছিল, সেই সম্বন্ধে শুধু বলা যায়, প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ পাকই ভালোরূপে অবগত আছেন।

হযরত ইয়াহইয়া আ.

নাম ও বংশ পরিচয়

হযরত ইয়াহইয়া আ. ছিলেন হযরত যাকারিয়া আ.-এর পুত্র এবং তাঁর পয়গম্বরি দোয়ার সুফল। তাঁর নাম আল্লাহ তাআলার নির্দেশিত। এটি এমন এক নাম যা তাঁর বংশে ও খান্দানে ইতঃপূর্বে আর কারো রাখা হয় নি। যেমন কুরআন মাজিদ বলে :

يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا

"হে যাকারিয়া! আমি নিঃসন্দেহে তোমাকে সুসংবাদ প্রদান করছি এক পুত্রের, তার নাম ইয়াহইয়া হবে। এর পূর্বে কারো জন্য আমি এ নাম নির্ধারিত করি নি।"

(সূরা মারিয়াম : রুকূ : ১)

জীবনের অবস্থাবলী

মালেক ইবনে আনাস রাযি. বলেন, ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া আ. এবং ঈসা ইবনে মারিয়াম আ. উভয়ের মাতৃগর্ভে আগমন একই যমানায় হয়েছিল। সালাবি রহ. বলেন, ঈসা আ. মাতৃগর্ভে আগমনের ছয় মাস পূর্বে হযরত ইয়াহইয়া আ. মাতৃগর্ভে আগমন করেন। (ফতহুল বারী : ৬/৩৬৪)

আর লুকার ইঞ্জিলে আছে, যখন হযরত যাকারিয়া আ.-এর স্ত্রী ইয়াশা ছয় মাসের গর্ভবতী, তখন ফেরেশতা জিবরাইল আ. মারিয়াম আ.-এর নিকট এসে আত্মপ্রকাশ করলেন এবং ঈসা আ.-এর জন্ম সম্বন্ধে তাঁকে সুসংবাদ প্রদান করলেন– 'তোমার আত্মীয় ইয়াশারও বৃদ্ধবয়সে পুত্র হবে। ছয় মাস পূর্বে পর্যন্ত তাকে বন্ধ্যা বলা হত।' গত ছয় মাস যাবৎ সে আর বন্ধ্যা নয় বরং গর্ভে সন্তান ধারণ করেছে। এ সমস্ত রেওয়ায়েতের সারমর্ম হল, হযরত ইয়াহইয়া আ. বয়সে হযরত ঈসা আ. হতে ছয় মাসের বড় ছিলেন।

হযরত ইয়াহইয়া আ.-এর জন্মলাভের জন্য যখন হযরত যাকারিয়া আ. দুআ করেছিলেন, তখন সেই দুআয় তিনি বলেছিলেন, সেই সন্তান যেন নেকস্বভাবের সন্তান হয়। আল্লাহ তাআলা তাঁর দুআ কবুল করলেন। সুতরাং হযরত ইয়াহইয়া আ. সমস্ত নেককারদের সরদার এবং সংসার বিমুখতা ও খোদাভীতিতে অনুপম ছিলেন। তিনি বিবাহ করেন নি। তাঁর অন্তরে কোনো সময় কোনো পাপ কার্যের চিন্তাও উদিত হয় নি। নিজ বুযুর্গ পিতার মতো তিনিও আল্লাহ পাকের মনোনীত নবী ছিলেন। আল্লাহ তাআলা শৈশবকালেই তাঁকে ইলম ও হেকমতে পরিপূর্ণ করে দিয়েছিলেন। তাঁর জীবনের সর্বপ্রধান কাজ ছিল, তিনি ঈসা আ.-এর আগমনের সুসংবাদ প্রদান করতেন। তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে তিনি হেদায়েত ও সৎপথ প্রদর্শনের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করতেন। যেমন আল্লাহ পাক বলেন :

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ

مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ

"এরপর যখন যাকারিয়া হুজরায় নামাযে রত ছিলেন, তখন ফেরেশতারা তাঁকে সম্বোধন করে বললেন, হে যাকারিয়া! আল্লাহ তাআলা আপনাকে এক সন্তান ইয়াহইয়া-এর সুসংবাদ দিচ্ছেন। যিনি আল্লাহর কালেমা (ঈসা)-এর (আগমনের) সুসংবাদ প্রদান করবেন। আর তিনি আল্লাহ তাআলার ও তাঁর বান্দাগণের দৃষ্টিতে সম্মানিত এবং যাবতীয় পাপকার্য হতে পবিত্র হবেন। আর নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে নবী হবেন।"

(আলে-ইমরান : রুকূ : ৪)

জীবনচরিত গ্রন্থসমূহে এ স্থলের 'সাইয়্যেদ' শব্দের বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন : 'হালীম' তথা ধৈর্যশীল, 'আলেম' তথা জ্ঞানী, 'ফকিহ' তথা ধর্ম বিধানসমূহের বিশারদ, ধর্মীয় ও পার্থিব নেতা, বুযুর্গ, পরহেযগার, আল্লাহ তাআলার নিকট পছন্দনীয় এবং মনোনীত। কিন্তু সর্বশেষ অর্থটি যেহেতু সমস্ত অর্থগুলির প্রকাশক, তাই অনুবাদে এ শেষোক্ত অর্থটিকে গ্রহণ করা হয়েছে।

তদ্রুপ حَصُور শব্দেরও বিভিন্ন প্রকার অর্থ বর্ণিত হয়েছে। এমন ব্যক্তি যে কখনও স্ত্রী জাতির কাছেও যায় নি। যে ব্যক্তি সর্বপ্রকার নাফরমানীর কাজ হতে সুরক্ষিত এবং তাঁর অন্তরে কোনো সময় পাপ কার্যের চিন্তা উদিত হয় নি। যে ব্যক্তির নফস সম্পূর্ণরূপে তার নিয়ন্ত্রনাধীন রয়েছে এবং নফসের প্রবৃত্তিসমূহকে দমন করে রেখেছে।

(তাফসিরে ইবনে কাসীর : ২/৩৬১)

অবশ্য কারো কারো মতে حَصُور শব্দের অর্থ পুরুষত্ব শক্তি হতে বঞ্চিত। কিন্তু এ অর্থ এ স্থলে একদম বাতিল। কেননা এ অর্থটি পুরুষের জন্য প্রশংসনীয় নয় বরং ত্রুটি ও দোষ জ্ঞাপক। এ কারণেই তত্ত্বজ্ঞানীরা নিজ নিজ তাফসিরসমূহে একে প্রত্যাখ্যানযোগ্য সাব্যস্ত করেছেন। কাযি ইয়ায রহ. তাঁর 'শেফা' নামক কিতাবে এবং খাফাজি রহ. এর শরাহ 'নাসিমুরবিয়াযে' এর উপর কঠোর সমালোচনা করেছেন এবং জমহূর মুফাসসির এ উক্তিটিকে বাতিল সাব্যস্ত করেছেন।

অবশ্য পুরুষত্ব শক্তি বহাল থাকা সত্ত্বেও এর উপর নিয়ন্ত্রণক্ষমতা লাভের জন্য আল্লাহ তাআলার মনোনীত বান্দাদের সর্বদা দুটি পন্থা রয়েছে। একটি হল একাকিত্ব বা নিঃসঙ্গতা এবং সংসারবিরাগী হয়ে আল্লাহর দিকে রুজু হওয়া এবং আল্লাহ তাআলার পথে চেষ্টা ও পরিশ্রম করা ও নফসকে দমিত করা, সর্বদার জন্য একে দাবিয়ে রাখা, যেন তা বিলুপ্তই করে দেওয়া হল। ঈসা আ.-এর জীবনে এ দিকটি সমধিক সুস্পষ্ট। আর ইয়াহইয়া আ.-এর মধ্যে আল্লাহ তাআলা এ গুণটি বিনা চেষ্টায় ও পরিশ্রমে অর্থাৎ সাধ্য-সাধনা ব্যতিরেকে সৃষ্টিগতভাবে দান করেছিলেন।

আর দ্বিতীয় পন্থাটি হল নফসকে এরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত রাখা, যাতে কোনো সময় মুহূর্তের জন্যও অন্যায় গতিবিধিতে আসতে না পারে, এমনকি অন্যায় গতিবিধিতে আসার চিন্তাও বাকি না থাকে, কিন্তু মানব বংশ বৃদ্ধির জন্য বিশুদ্ধ কর্মপন্থার দ্বারা বৈবাহিক জীবন অবলম্বন করা হয়।

প্রথম পন্থাটি যদিও কোনো কোনো অবস্থায় প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু মানব প্রকৃতি ও সমষ্টিগত জীবন যাপনের জন্য অসঙ্গত। অতএব, যে সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম এ প্রথম পন্থাটি অবলম্বন করেছেন, তা সময়ের অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনে অবলম্বন করেছিলেন। বিশেষত তাঁদের দাওয়াত ও তাবলিগ বিশেষ বিশেষ কওমগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু সমষ্টিগত জীবনের জন্য প্রকৃতির যথাযথ তাকিদ শুধু দ্বিতীয় কর্মপন্থাটি পালন করা।

এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা এবং তাঁর ব্যক্তিগত কার্য এ দ্বিতীয় কর্মপন্থারই তাকিদ করে। আর যেহেতু তিনি সারা দুনিয়ার মানবজাতির হেদায়েতের জন্য প্রেরিত হয়েছেন, তাই এমতাবস্থায় তাঁর আনীত 'প্রাকৃতিক ধর্মে' এ দ্বিতীয় পন্থাটিরই প্রাধান্য পাওয়া উচিত ছিল। সুতরাং তিনি জীবনের বিভিন্ন শাখায় এ সত্যটির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন, দুনিয়ার আচার-ব্যবহার হতে পৃথক হয়ে পাহাড়ের গুহায় এবং জঙ্গলে জীবন যাপনকারীর তুলনায় সেই ব্যক্তির মর্যাদা আল্লাহ তাআলার নিকট অধিক, যে ব্যক্তি দুনিয়ার জীবনের ব্যাপারসমূহে আবদ্ধ থেকে মুহূর্তের জন্যও আল্লাহ পাকের নাফরমানি না করে এবং প্রতি পদক্ষেপে তাঁর আদেশাবলী ও বিধানসমূহকে সম্মুখে রাখে। এরপর আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন :

يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا (١٢) وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا () وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا (١٤) وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا

"হে ইয়াহইয়া, আল্লাহ তাআলার কিতাব (তাওরাত)-এর পিছনে দৃঢ়তার সাথে লেগে যাও। আর আমি তাকে বাল্যকালেই ইলম ও ফযিলত দান করলাম। এতদ্ভিন্ন নিজের বিশেষ অনুগ্রহে তাকে অন্তরের নম্রতা এবং নফসের পবিত্রতা ও দান করলাম, সে পরহেযগার এবং পিতা-মাতার খেদমতগার ছিল, যালেম, উৎপীড়ক এবং নাফরমান ছিল না। তার প্রতি (আল্লাহ তাআলার) শান্তি বর্ষিত হোক –যেদিন জন্মগ্রহণ করেছে, যেদিন মৃত্যু হবে এবং যেদিন পুনরায় জীবিত হয়ে উঠবে। (সূরা মারিয়াম : রুকূ : ১)

"জন্মলাভের সুসংবাদ প্রদানের পর কোরআন মাজিদ হযরত ইয়াহইয়া আ.-এর শৈশব ও বাল্যকালের যে সমস্ত ঘটনা কুরআনের উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কহীন ছিল, সেসব পরিত্যাগ করে বলেছে : আল্লাহ তাআলা ইয়াহইয়াকে আদেশ করলেন, তিনি যেন তাওরাতের বিধানানুযায়ী দৃঢ়তা সহকারে আমল করতে থাকেন, তাওরাতেরই অনুযায়ী মানুষকে হেদায়েত করতে থাকেন। কেননা হযরত ইয়াহইয়া আ. নবী ছিলেন, রাসূল ছিলেন না। তাওরাতেরই শরিয়তের পাবন্দ ছিলেন। আল্লাহ তাআলা আরও বললেন, আমি সাধারণ বালকদের জীবন হতে পৃথক তাঁকে শৈশবকালেই ইলম ও ফযিলত দান করেছিলাম, যেন অতি শীঘ্র তিনি নবুয়তের পদ লাভ করতে পারেন।

জীবনী গ্রন্থসমূহে উল্লেখ রয়েছে, বাল্যকালে যখন বালকেরা তাঁকে খেলাধুলায় যোগদানের জন্য পীড়াপীড়ি করত, তখন তিনি জবাব দিতেন, "আল্লাহ তাআলা

আমাকে খেলাধুলার জন্য পয়দা করেন নি।" আরও উল্লেখ আছে, ৩০ বছর বয়সের পূর্বেই তাঁকে নবুয়ত প্রদান করা হয়েছিল। (নাজ্জার মিসরীর কাছাছুল আম্বিয়া : ৪২)

বলা বাহুল্য, হযরত ইয়াহইয়া আ.-কে শৈশবকালেই নবী বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল কথাটি ঠিক নয়। কেননা নবুয়ত পদের মতো এত উচ্চ ও এত গুরুত্বপূর্ণ পদ কাউকেও অল্প বয়সে প্রদত্ত হওয়া বিবেকসম্মত নয় এবং কুরআন হাদিস দ্বারাও প্রমাণিত নয়।

আল্লাহ্ পাকের তরফ হতে হযরত ইয়াহইয়া আ.-কে উপর্যুক্ত এ আয়াতসমূহে যে শান্তি ও নিরাপত্তার দুআ প্রদান করা হয়েছে, তা তিনটি সময়ের সাথে নির্দিষ্ট। বস্তুত মানুষের জন্য এ তিনটি সময়ই সর্বাপেক্ষা অধিক সঙ্কটকময় ও গুরুত্বপূর্ণ। জন্মগ্রহণের সময় যখন মাতৃগর্ভ হতে পৃথক হয়ে দুনিয়ার জগতে আগমন করে, মৃত্যু মুহূর্তে– যাতে দুনিয়ার জগত হতে রোখছত হয়ে আলমে বরযখে পৌঁছে। (কবরস্থ হওয়ার পর হতে কেয়ামত পর্যন্ত সময়টুকুকে আলমে বরযখ বলা হয়।) আর হাশর-নশরের সময়– যাতে আলমে বরযখ হতে পরলোকে আমলসমূহের পুরস্কার বা শাস্তি গ্রহণের জন্য উপস্থিত হতে হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার তরফ হতে এ তিনটি সময়ের জন্য শান্তি ও সুসংবাদ লাভ করেছে, সে তো উভয় জগতেরই সৌভাগ্যের সমস্ত ভাণ্ডার লাভ করেছে।

আর সূরা আম্বিয়াতে আল্লাহ পাক বলছেন :

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ (٨٩) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ

"আর এরূপে (যাকারিয়ার ব্যাপারটি স্মরণ করুন) যখন সে নিজ পরওয়ারদিগারকে ডেকে বলেছিল, খোদা! আমাকে (এ দুনিয়ায় উত্তরাধিকারীবিহীন অবস্থায়) একা ত্যাগ করবেন না। আর আপনিই (আমাদের সকলের জন্য) সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী। আমি তার দোয়া কবুল করলাম এবং তাকে ইয়াহইয়া (নামক এক সন্তান) দান করলাম, আর তার স্ত্রীকে তার জন্য সুস্থ করে দিলাম (বন্ধ্যাত্বের অবসান ঘটিয়ে দিলাম)। এরা সকলে নেকির পথে খুব দ্রুতগামী ছিল। (আমার অনুগ্রহ ও দয়ার) আশার সম্পর্ক লাগিয়ে আমার (জালাল ও প্রতাপের ভয়ে) ভীত হয়ে দোয়া করত। আর আমার সম্মুখে অক্ষমতা ও অভাব প্রকাশের সাথে ঝুঁকে পড়ত।" (সূরা আম্বিয়া : রুকূ : ৬)

মামার থেকে আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. বলেন : একবার কতিপয় বালক হযরত ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া আ.-কে তাদের সাথে খেলতে যেতে বলেছিল। তিনি তখন তাদেরকে বললেন, "খেলার জন্যে আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয় নি।" আল্লাহ তাআলা যে বলেছেন : "তার প্রতি শান্তি যে দিন সে জন্মলাভ করে, যে দিন তার মৃত্যু হবে এবং যে দিন সে জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে।" উল্লিখিত এ সময় তিনটি মানবজীবনে অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন অবস্থা হিসাবে বিবেচিত। কারণ, এ তিনটি সময় হল এক জগৎ থেকে অন্য জগতে স্থানান্তরের সময়। তাকে এক জগতে কিছুকাল অবস্থান করায়

সে জগতের সাথে পরিচিতি লাভ ও ভালোবাসা সৃষ্টি হওয়ার পর তা ছিন্ন করে এমন এক জগতে চলে যেতে হয়, যে জগত সম্পর্কে তার কিছুই জানা থাকে না।

তাই দেখা যায় নবজাত শিশু মাতৃগর্ভের কোমল ও সংকীর্ণ স্থান ত্যাগ করে যখন এ সমস্যাপূর্ণ পৃথিবীতে আসে, তখন সে চিৎকার কর কাঁদতে থাকে। অনুরূপভাবে এ পৃথিবী ছেড়ে যখন সে বরযখ জগতে যায়, তখনও একই অবস্থা দেখা দেয়। এসব জগত ত্যাগ করে মৃত্যুর আঙ্গিনায় পৌঁছে সে কবরের বাসিন্দা হয়ে ইসরাফিল আ. এর শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার অপেক্ষায় থাকে। এর পরেই তার স্থায়ী বাসস্থান। কবর থেকে পুনরুত্থিত হওয়ার পর হয় স্থায়ী শান্তি ও সুখ, না হয় চিরস্থায়ী শাস্তি ও দুঃখ। কেউ হবে জান্নাতের অধিবাসী আর কেউ হবে জাহান্নামের বাসিন্দা।

উপর্যুক্ত স্থান তিনটি যখন মানুষের উপর অত্যধিক কঠিন, তখন আল্লাহ হযরত ইয়াহইয়া আ.-কে প্রতিটি স্থানেই শান্তি ও নিরাপত্তার ঘোষণা দান করে বলেছেন : "তার প্রতি শান্তি যে দিন সে জন্ম লাভ করে, যে দিন তার মৃত্যু হবে এবং যে দিন সে জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে।"

সাঈদ ইবনে আবী আরুবা কাতাদার সূত্রে হাসান থেকে বর্ণনা করেন, একদিন হযরত ইয়াহইয়া আ. ও হযরত ঈসা আ. পরস্পর সাক্ষাতে মিলিত হন। হযরত ঈসা আ. ইয়াহইয়া আ.-কে বললেন, আমার জন্যে ইসতেগফার কর। কেননা তুমি আমার চেয়ে উত্তম। হযরত ইয়াহইয়া বললেন, আপনি বরং আমার জন্যে ইসতেগফার করুন! আমার তুলনায় আপনি শ্রেষ্ঠ। হযরত ঈসা বললেন, তুমি আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কেননা আমি নিজেই আমার উপর শান্তি ঘোষণা করেছি আর তোমার উপর শান্তি ঘোষণা করেছেন স্বয়ং আল্লাহ। এর দ্বারা উভয়ের উচ্চমর্যাদার কথা জানা গেল। সূরা আলে-ইমরানের ৩৯নং আয়াতে উল্লেখিত "সে হবে নেতা, স্ত্রী-বিরাগী এবং পুণ্যবানদের মধ্যে একজন নবী।" (سَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ) এখানে 'হাসূর"– স্ত্রী বিরাগী প্রসঙ্গে কেউ কেউ বলেছেন– হাসূর বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে, যে কখনো কোনো নারীর সঙ্গ ভোগ করে না, কেউ কেউ ভিন্ন অর্থও করেছেন। এটিই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। কেননা, যাকারিয়া আ. দুআয় বলেছিলেন, "আমাকে তুমি তোমার নিকট থেকে পবিত্র বংশধর দান কর।" এ দুআর সাথে উপরোক্ত অর্থই বেশি মিলে।

ইমাম আহমদ হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আদম সন্তানের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে কোনো গুনাহ করে নি কিংবা অন্তত গুনাহর ইচ্ছা পোষণ করে নি, একমাত্র হযরত ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া আ. ব্যতীত। আর কারো পক্ষেই এরূপ কথা বলা বাঞ্ছনীয় নয়, "আমি ইউনুস ইবনে মাত্তার চেয়ে ভালো।" এ হাদিসের সনদে আলি ইবনে যায়দ ইবনে জাদআন নামক বর্ণনাকারী সম্পর্কে একাধিক ইমাম বিরূপ মন্তব্য করেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন ইবনে খুযায়মা ও ইবনে ওহাব রহ. ইবনে শিহাব থেকে বর্ণনা করেছেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের মাঝে

আসেন। তাঁরা তখন বিভিন্ন নবীদের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে আলোচনা করছিল। একজন বলছিল, হযরত মূসা আ. আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন। তিনি কালিমুল্লাহ। আর একজন বলছিল, হযরত ঈসা আ. আল্লাহর রূহ ও তাঁর কালেমা-ঈসা রূহুল্লাহ। আর একজন বলছিল, ইবরাহীম আল্লাহর বন্ধু খলিলুল্লাহ। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শহীদের পুত্র শহিদের উল্লেখ করছ না কেন? তিনি তো পাপের ভয়ে উটের লোমের তৈরি বস্ত্র পরতেন এবং গাছের পাতা খেতেন। ইবনে ওহাব বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথার দ্বারা হযরত ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া আ.-কে বুঝিয়েছিলেন।

আবু নুআইম ইসফাহানী আবু সুলাইমান থেকে বর্ণনা করেন, একবার হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম ও হযরত ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া আ. একত্রে হেঁটে যাচ্ছিলেন। পথে এক মহিলার সঙ্গে হযরত ইয়াহইয়া আ.-এর ধাক্কা লেগে গেল। হযরত ঈসা আ. বললেন, ওহে খালাত ভাই! আজ তুমি এমন একটি গুনাহ করে ফেলেছ, যা কখনো মাফ হবে বলে মনে হয় না। হযরত ইয়াহইয়া আ. জিজ্ঞেস করলেন, খালাত ভাই! সেটা কী? হযরত ঈসা আ. বললেন, এক মহিলাকে যে ধাক্কা দিলে! হযরত ইয়াহইয়া আ. বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তো টেরই পাই নি। হযরত ঈসা বললেন, সুবহনাল্লাহ! কী আশ্চর্য! তোমার দেহ তো আমার সাথেই ছিল, তা হলে তোমার রূহ [আত্মা] কোথায় ছিল? হযরত ইয়াহইয়া আ. বললেন, আমার রূহ আরশের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। আমার রূহ যদি জিবরাঈল আ. পর্যন্ত গিয়ে প্রশান্তি পায়, তা হলে আমি মনে করি, আল্লাহকে আমি কিছু মাত্রই বুঝতে পারি নি। এ বর্ণনাটি গরিব পর্যায়ের এবং ইসরাঈলী উপাখ্যান থেকে চয়িত।

খায়ছামা থেকে বর্ণিত আছে, হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম ও ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া আ. ছিলেন পরস্পর খালাত ভাই। ঈসা আ. ভেড়ার পশমজাত বস্ত্র পরতেন আর হযরত ইয়াহইয়া আ. পরতেন উটের লোমের তৈরি বস্ত্র। উভয়ের মধ্যে কারোরই কোনো দিনার-দিরহাম ও দাস-দাসী ছিল না। ছিল না আশ্রয় গ্রহণের মতো কোনো ঠিকানা। যেখানেই রাত হত, সেখানেই শুয়ে পড়তেন। অবশেষে যখন একে অপর থেকে বিদায় নেন, তখন হযরত ইয়াহইয়া আ. হযরত ঈসা আ.-কে বললেন, আমাকে কিছু উপদেশ দিন। ঈসা আ. বললেন, ক্রোধ সংবরণ কর। ইয়াহইয়া আ. বললেন, ক্রোধ সংবরণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ঈসা আ. বললেন, সম্পদের মোহে পড়ো না। ইয়াহইয়া আ. বললেন, এটা সম্ভব।

ইবনে আসাকির হযরত ইবনে আনাস থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের উদ্ধৃতি দিয়ে আমাদেরকে জানান হয়েছে : তারা বনি ইসরাঈলের আলেমদের থেকে শুনেছেন, হযরত ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া আ. পাঁচটি বিধানসহ প্রেরিত হয়েছিলেন। (হযরত ইয়াহইয়া আ. এর জীবনীতে সেগুলো উল্লেখ রয়েছে।) তারা আরো বলেছেন, ইয়াহইয়া আ. অধিকাংশ সময় মানুষের সংস্পর্শ

থেকে দূরে নির্জনে অবস্থান করতেন। তিনি বনে-জংগলে থাকতে বেশি পছন্দ করতেন। গাছের পাতা খেয়ে, নদীর পানি পান করে, কখনও কখনও টিড্ডি [এক জাতের ফড়িং] খেয়ে জীবন ধারণ করতেন এবং নিজেকে সম্বোধন করে বলতেন, হে ইয়াহইয়া! তোমার চেয়ে অধিক নিয়ামত আর কার ভাগ্যে জুটেছে?

ইবনে আসাকির বর্ণনা করেন, একবার ইয়াহইয়া আ. পিতা-মাতা ছেলের সন্ধানে বের হন। বহু অনুসন্ধানের পর তাঁকে জর্দান নদীর তীরে গিয়ে তাঁকে দেখতে পান। পুত্রকে সেখানে আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর ভয়ে ভীত-কম্পিত দেখে তাঁরা উভয়ে অঝোরে কাঁদতে থাকেন। অন্য বর্ণনায় আছে : সেখানে গিয়ে তিনি দেখতে পান, ইয়াহইয়া আ. একটি কবর খনন করে তাঁর মধ্যে দাঁড়িয়ে অঝোরে কাঁদছেন।

হযরত যাকারিয়া আ. বললেন, প্রিয় বৎস! তোমাকে আমি তিন দিন যাবত খুঁজে ফিরছি। আর তুমি কিনা কবর খুঁড়ে তার মধ্যে দাঁড়িয়ে কাঁদছ। তখন ইয়াহইয়া আ. উত্তর দিলেন, আব্বাজান! আপনিই তো আমাকে বলেছেন, জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে এক বিশাল কঠিন ও দুর্গম ময়দান– যা কান্নার পানি ব্যতীত অতিক্রম করা যায় না। পিতা বললেন, সত্যিই বৎস! প্রাণ ভরে কাঁদো। তখন পিতা-পুত্র উভয়ে একত্রে কাঁদতে লাগলেন। বর্ণনাকারীগণ বলেছেন, নবী ইয়াহইয়া আ. এত অধিক পরিমাণ কাঁদতেন, চোখের পানি গড়িয়ে পড়তে পড়তে তাঁর দুই গালে স্পষ্ট দাগ পড়ে যায়।

নসিহত

ইমাম আহমদ হযরত হারেস আনসারী রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া আ.-কে পাঁচটি আমল করতে এবং বনি ইসরাঈলকেও আমল করার নির্দেশ দিয়ে অহি নাযিল করেন। হযরত ইয়াইইয়া আ. সেটি পৌছাতে একটু বিলম্ব করেছিলেন। তখন ঈসা আ. তাঁকে বলেছিলেন, আল্লাহ তোমাকে পাঁচটি বিষয়ে আমল করতে ও বনি ইসরাঈলকে আমল করার হুকুম করতে আদেশ পাঠিয়েছিলেন। বনি ইসরাঈলের নিকট এ সংবাদ তুমি পৌছিয়ে দেবে, না আমি গিয়ে পৌছিয়ে দেব? হযরত ইয়াহইয়া আ. বললেন, ভাই! তুমি যদি পৌছিয়ে দাও, তা হলে আমার আশঙ্কা হয়, আমাকে হয় শাস্তি দেওয়া হবে, না হয় মাটির মধ্যে ধসিয়ে দেওয়া হবে। এরপর হযরত ইয়াহইয়া আ. ইসরাঈলিদেরকে বায়তুল মুকাদ্দাসে সমবেত করলেন। মসজিদ লোকে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। হযরত ইয়াহইয়া আ. সম্মুখ দিকের উঁচু স্থানে বসলেন। প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি জানালেন। এরপর বললেন, আল্লাহ পাঁচটি বিষয়ের হুকুম করেছেন। আমাকে সেগুলো আমল করতে বলেছেন এবং তোমাদেরকেও আমল করার আদেশ দিতে বলেছেন। যথা–

এক. তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরিক করবে না। কেননা তাঁর সাথে শরীক করার উদাহরণ হল– এক ব্যক্তি তার উপার্জিত খাঁটি স্বর্ণ বা রৌপ্য দ্বারা একটা গোলাম ক্রয় করল। উক্ত গোলাম সারা দিন কাজ করে

উপার্জিত ফসল নিজের মনিবকে বাদ দিয়ে অন্যের বাড়িতে উঠাল। তবে এরূপ গোলামের ওপর তোমরা কেউ কি সন্তুষ্ট থাকবে? জেনে রেখো, আল্লাহই তোমাদেকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই তোমাদের রিযিকের ব্যবস্থা করেছেন। সুতরাং একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে, অন্য কাউকে তাঁর সঙ্গে শরিক করবে না।

দুই. আমি তোমাদেরকে নামাযের আদেশ দিচ্ছি। কেননা আল্লাহ বান্দার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ অব্যাহত রাখেন, যতক্ষণ বান্দা অন্য দিকে ফিরে না তাকায়। অতএব যখন তোমরা নামায আদায় করবে, তখন অন্য দিকে তাকাবে না।

তিন. রোযা পালন করার জন্যে আমি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছি। কেননা যে ব্যক্তি রোযা পালন করে, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন ব্যক্তির মতো, যে একটি দলের মধ্যে অবস্থান করছে। তার নিকট মেশকের একটি কৌটা আছে। আর ওই মেশকের সুঘ্রাণ দলের প্রতিটি লোক পাচ্ছে। আর শোনো! রোযা পালনকারীর মুখে দুর্গন্ধ আল্লাহর নিকট মেশকের চেয়ে অধিকতর সুঘ্রাণ হিসেবে বিবেচিত।

চার. দান-সদকা করার জন্যে আমি তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছি। কেননা যে ব্যক্তি দান-সাদকা করে, তার উদাহরণ ওই ব্যক্তির মতো, যে শত্রুর হাতে ধরা পড়ে বন্দি হয়েছে। তারা তার হাত পা বেঁধে হত্যা করার জন্যে উদ্যোগ নিয়েছে। ঠিক সেই মুহূর্তে সে প্রস্তাব দিল, আমি অর্থের বিনিময়ে মুক্তি চাই। তারা রাজি হল এবং সে ব্যক্তি কম-বেশি অর্থ দান করে জীবন রক্ষা করল।

পাঁচ. আল্লাহর যিকির অধিক পরিমাণ করার জন্যে আমি তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছি। কেননা যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির করে, তার দৃষ্টান্ত এমন ব্যক্তির মতো, যাকে ধরার জন্যে শত্রুরা দ্রুত ধাওয়া করছে। এরপর সে একটি সুরক্ষিত দুর্গে প্রবেশ করে আত্মরক্ষা করল। অনুরূপ বান্দা যতক্ষণ আল্লাহর যিকিরে নিমগ্ন থাকে, ততক্ষণ সে শয়তানের পাকড়াও থেকে নিরাপদে অবস্থান করে।

হযরত ইয়াহইয়া আ.-এর কতল

বনি ইসরাঈলের নবীগণের মধ্যে হযরত ইয়াহইয়া আ.-এর দাওয়াত ও তাবলিগের যুগ চলছিল। সেকালে ইয়াহূদিয়া অঞ্চলে হযরত ইয়াহইয়া আ.-এর ওয়ায নসিহতের সুফলে বনি ইসরাঈলদের অন্তরসমূহ ক্রমশ বশীভূত হয়ে যাচ্ছিল। তিনি যেদিকে বের হতেন, দলে দলে মানুষ তাঁর কাছে পঙ্গপালের মতো লুটিয়ে পড়ত। অপরদিকে ইহুদিদের বাদশা হীরোদেস' খুবই অসৎ ও যালেম ছিল। সে হযরত ইয়াহইয়া আ.-এর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা দেখে ভীত হয়ে গেল। ভয় করতে লাগল, ইয়াহূদিয়ার রাজত্ব আমার হস্তচ্যুত হয়ে পাছে না এ হেদায়েতকারী ব্যক্তির হাতে চলে যায়।

ঘটনাক্রমে একদিন হীরোদেসের বৈমাত্রেয় ভাইয়ের ইনতেকাল হয়ে গেল। তার স্ত্রী ছিল অত্যন্ত সুন্দরী। সে হীরোদেসের ভাবী হওয়া ছাড়াও তার বৈপিত্রেয় ভ্রাতুষ্পুত্রি ছিল। হীরোদেস তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ল এবং তাকে বিবাহ করে ফেলল। কিন্তু এ

বিবাহ যেহেতু ইসরাঈলী ধর্মে শরিয়তবিরোধী ছিল। তাই হযরত ইয়াহইয়া আ. পূর্ণ রাজদরবারের সমক্ষে তাকে তিরস্কার করলেন এবং আল্লাহ তাআলার আযাবের ভয় প্রদর্শন করলেন। হীরোদেসের প্রেয়সী এটা শুনে চিন্তায় ও ক্রোধে অধীর হয়ে পড়ল এবং ইয়াহইয়া আ.-কে কতল করে ফেলার জন্য হীরোদেসকে প্রস্তুত করে নিল। অবশ্য হীরোদেসও ভরা দরবারে এ নসিহত করার কারণে ইয়াহইয়া আ.-এর উপর তেলে-বেগুনে জ্বলছিল; কিন্তু কতল করা সম্বন্ধে ইতস্তত করছিল। বাদশা স্ত্রীর অনুরোধে হযরত ইয়াহইয়া আ.-কে হত্যা করে ফেলে। তার পর তাঁর মাথা কেটে একটি থালার মধ্যে রেখে প্রেয়সীর নিকট পাঠিয়ে দিল।

অত্যন্ত বিস্ময়ের ব্যাপার হল, হযরত ইয়াহইয়া আ.-এর জনপ্রিয়তা ব্যাপক হওয়া সত্ত্বেও কোনো ইসরাঈলীরই সাহস হল না, হীরোদেসের এ অভিশপ্ত কাজের জন্য তাকে বাধা প্রদান করবে বা তাকে তিরস্কার করবে। বরং একটি দল তার এ অভিশপ্ত কাজটিকে সুনজরে দেখল। এখন হযরত ইয়াহইয়া আ.-এর শহিদ হওয়ার পর হযরত ঈসা আ.-এর দাওয়াত এবং তবলিগের সময় আসল। তিনি প্রকাশ্যভাবে ইহুদিদের বিদআত ও মুশরিকী রসম, যালেম-শৈরাচারী স্বভাব এবং ধর্মদ্রোহিতার বিরুদ্ধে বাকযুদ্ধ আরম্ভ করে দিলেন। কিন্তু ইহুদিদের মধ্যে এ যোগ্যতা কোথায় ছিল, তাঁর সত্যের ডাকে সাড়া দিবে? ফলে অতি সামান্য কজন লোক ব্যতীত তাদের বিরাট দলই তাঁর বিরোধিতা শুরু করল। ইতঃমধ্যে নাবতী বাদশা হারেস– যিনি হিরোদেসের প্রথমা স্ত্রীর পিতা অর্থাৎ তার শ্বশুর ছিলেন, তাঁর রাজ্য আক্রমণ করলেন এবং ভীষণ রক্তারক্তির পর হীরোদেসকে পরাস্ত করলেন।

এ পরাজয় হিরোদেসের শক্তির অবসান ঘটাল। তথাপি ইহুদিরা বলত, হীরোদেস ও বনি ইসরাঈলদের এ অপমান ও পরাজয় হযরত ইয়াহইয়া আ.-কে অন্যায়ভাবে হত্যা করার প্রতিফলেই ঘটেছিল। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও তারা এ ঘটনা হতে কোনো শিক্ষা গ্রহণ করে নি। তারা তাদের জুলুম এবং অত্যাচারমূলক কার্যাবলী হতে বিরত হয় নি। হযরত ঈসা আ.-এর বিরোধিতায় শত্রুতা এবং অবাধ্যতার সাথে সক্রিয় থাকে। ইহুদিদের বাদশা প্লাটিস হতে তাঁকে হত্যা করার অনুমতি লাভ করে। ইহুদিরা একদিন তাঁকে অবরুদ্ধ করে ফেলল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের উদ্দেশ্যকে বানচাল করে দিয়ে হযরত ঈসা আ.-কে জীবিত অবস্থায় আসমানে উঠিয়ে নিলেন।

(তারীখে তাবারী : ২/১৭-৪৫)

হযরত ইয়াহইয়া আ.-এর হত্যার বিভিন্ন কারণের মধ্যে প্রসিদ্ধতম কারণ হল, সে যুগে দামিশকের জনৈক রাজা তার এক মাহরাম নারীকে বিবাহ করার সংকল্প করে। হযরত ইয়াহইয়া আ. তাকে এ বিবাহ করতে নিষেধ করেন। এতে মহিলাটির মনে ইয়াহইয়া আ. এর প্রতি ক্ষোভের সঞ্চার হয়। এক পর্যায়ে উক্ত মহিলা ও রাজার মধ্যে সম্পর্ক গভীর হয়ে ওঠে। তখন মহিলা রাজার নিকট ইয়াহইয়া আ.-কে হত্যার আবদার জানায়। সে মতে রাজা তাঁকে উক্ত মহিলার হাতে তুলে দেন। মহিলাটি ইয়াহইয়া

আ.-কে হত্যা করার জন্যে ঘাতক নিয়োগ করে। ওই ঘাতক নির্দেশ মতো তাঁকে হত্যা করে এবং কর্তিত মস্তক ও তাঁর রক্ত একটি পাত্রে রেখে মহিলার সামনে হাজির করে। কথিত আছে, মহিলা তৎক্ষণাৎ মারা যায়।

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, উল্লিখিত রাজার স্ত্রীই হযরত ইয়াহইয়া আ.-কে মনে মনে ভালোবাসত। একদিন সে তাঁর সাথে মিলনের প্রস্তাব পাঠায়। হযরত ইয়াহইয়া আ. তাঁতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। মহিলাটি নিরাশ হয়ে তাকে হত্যার বাহানা খোঁজে। সে রাজার নিকট সে জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে। রাজা প্রথমে নিষেধ করলেও পরে অনুমতি দিয়ে দেয়। অনন্তর মহিলাটি ঘাতক নিয়োগ করে। সে হযরত ইয়াহইয়া আ.-এর রক্তমাখা ছিন্ন মস্তক একটি পাত্রে করে মহিলার সামনে হাজির করে।

ইসহাক ইবনে বিশর-এর 'মুবতাদা' নামক গ্রন্থে এ মর্মে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তিনি ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেন : মেরাজের রাত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যাকারিয়া আ.-কে আসমানে দেখতে পান। তিনি সালাম দিয়ে বললেন, হে ইয়াহইয়ার পিতা! বনি-ইসরাঈলরা আপনাকে কেন এবং কিভাবে হত্যা করেছিল, আমাকে বলুন! তিনি বললেন, হে মুহাম্মদ! এ বিষয়ে আমি আপনাকে বিস্তারিত বলছি। আমার পুত্র ইয়াহইয়া ছিল তার যুগের অনন্য গুণের অধিকারী শ্রেষ্ঠ যুবক, সুদর্শন ও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। যার সম্পর্কে আল্লাহ নিজেই বলছেন, "সে হবে নেতা ও স্ত্রী-বিরাগী।" নারীদের প্রতি তার কোনো মোহ ছিল না। বনি ইসরাঈলের রাজার স্ত্রী ইয়াহইয়ার প্রতি আসক্ত হয়। সে ছিল ব্যভিচারিণী। সে ইয়াহইয়ার কাছে কুপ্রস্তাব পাঠায়। আল্লাহ তাকে হেফাজত করেন। সে মহিলার প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। এতে মহিলাটি ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। বনি ইসরাঈল সমাজে একটি বার্ষিক উৎসবের দিন সবাই নির্দিষ্ট স্থানে একত্র হয়। উক্ত রাজার নীতি ছিল, কাউকে প্রতিশ্রুতি দিলে ভঙ্গ করত না এবং মিথ্যা কথা বলত না। রাজা উক্ত উৎসবের নির্দিষ্ট দিনে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়। তার স্ত্রী তাকে বিদায় অভিনন্দন জানায়। রাজা তাকে খুব ভালোবাসত, অতীতে কিন্তু রাজা কখনো এরূপ করে নি। অভিনন্দন পেয়ে খুশি হয়ে রাজা বলল, তুমি আমার নিকট যে আবদার করবে, আমি তা-ই পূরণ করব। স্ত্রী বলল, আমি যাকারিয়ার পুত্র ইয়াহইয়ার রক্ত চাই। রাজা বলল : এটা নয়, অন্য কিছু চাও। স্ত্রী বলল : না, ওটাই আমি চাই। রাজা বলল : ঠিক আছে, তা-ই হবে। এরপর রাজার স্ত্রী হযরত ইয়াহইয়া আ.-কে হত্যার জন্যে জল্লাদ পাঠিয়ে দেয়। তখন তিনি মিহরাবের মধ্যে নামায আদায়ে রত ছিলেন। যাকারিয়া আ. বলেন, আমি পুত্রের পাশেই নামাযরত ছিলাম। এ অবস্থায় জল্লাদ ইয়াহইয়াকে হত্যা করে এবং তার রক্ত ও ছিন্ন মস্তক একটি পাত্রে করে উক্ত মহিলার নিকট নিয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আপনার ধৈর্য তো প্রশংসনীয়।

দিন শেষে যখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, তখন আল্লাহ ওই রাজা, তার পরিবারবর্গ ও লোক-লশকরকে মাটির নিচে ধ্বসিয়ে দেন। পরদিন সকালে এ ঘটনা দেখে বনি ইসরাঈলা পরস্পর বলাবলি করল, যাকারিয়ার মনিব যাকারিয়ার অনুকূলে ক্রুদ্ধ হয়েছেন; চল আমরাও আমাদের রাজার অনুকূলে ক্রুদ্ধ হই এবং যাকারিয়াকে হত্যা করি। তখন আমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে তারা সম্মিলিতভাবে আমার সন্ধানে বের হয়। ইতঃমধ্যে এক ব্যক্তি বনি ইসরাঈলের এ ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আমাকে সাবধান করে দেয়। আমি তাদের হাত থেকে বাঁচার জন্যে সে স্থান থেকে পলায়ন করি।

কিন্তু ইবলিস তাদের সম্মুখে থেকে আমার গমন পথ দেখিয়ে দেয়। যখন দেখলাম, তাদের হাত থেকে বাঁচার কোনো উপায় নেই, তখন সম্মুখে একটি গাছ দেখতে পাই। তার নিকট যাওয়ার জন্যে গাছটি তখন আমাকে আহবান করছিল এবং দুভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। আমি তখন তাতে ঢুকে পড়ি। কিন্তু ইবলিস তখন আমার চাদরের আঁচল টেনে ধরে, বৃক্ষের ফাটল মুদে যায়। কিন্তু আমার চাদরের আঁচলটি বাইরে থেকে যায়। বনি ইসরাঈল সেখানে উপস্থিত হলে ইবলীস জানায়, যাকারিয়া জাদুবলে এ গাছটির মধ্যে ঢুকে পড়েছে। বনি ইসরাঈল বলল, তা হলে গাছটিকে আমরা পুড়িয়ে ফেলি। ইবলীস বলল : না, বরং গাছটি করাত দিয়ে চিরে ফেল। যাকারিয়া আ. বলেন, ফলে বৃক্ষের সাথে আমিও দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি করাতের স্পর্শ বুঝতে পেরেছিলেন কিংবা ব্যাথ্যা অনুভব করেছিলেন? যাকারিয়া আ. বললেন : না, বরং ওই গাছটি তা অনুভব করেছে, যার মধ্যে আল্লাহ আমার রূহ রেখে দিয়েছিলেন।

এ হাদিসটি অত্যন্ত গরিব পর্যায়ের। এ এক অদ্ভুত কাহিনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ হাদিস বর্ণিত হওয়ার ব্যাপারটি আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। এ ঘটনার মধ্যে এমন কিছু কথা আছে, যা কোনো মতেই গ্রহণ করা চলে না। এ বর্ণনা ছাড়া মেরাজ সম্পর্কে বর্ণিত কোনো হাদিসেই যাকারিয়া আ.-এর উল্লেখ নেই। অবশ্য সহি হাদিসের কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, আমি ইয়াহইয়া আ. ও ঈসা আ. দু খালাত ভাইয়ের পাশ দিয়ে গমন করেছিলাম। অধিকাংশ আলেমের মতে তাঁরা ছিলেন পরস্পর খালাত ভাই। হাদিস থেকেও তাই স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে। কেননা ইয়াহইয়া আ.-এর মা আশয়া বিনতে ইমরান মারিয়াম বিনতে ইমরানের বোন ছিলেন। কিন্তু কারো কারো মতে ইয়াহইয়া আ.-এর মা আশয়া (যাকারিয়া আ.-এর স্ত্রী) ছিল মারিয়ামের মা হান্না (ইমরানের স্ত্রীর) এর বোন। সে মতে ইয়াহইয়া আ. হন মারিয়ামের খালাতো ভাই।

ইয়াহইয়া আ. কোথায় নিহত হন

হযরত ইয়াহইয়া আ. কোন স্থানে নিহত হয়েছিলেন, এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। কারো মতে বায়তুল মুকাদ্দাসের ভিতরে; কারও মতে মসজিদের বাইরে অন্য কোথাও। সুফিয়ান ছাওরী রহ. বলেন : বায়তুল মুকাদ্দাসের অভ্যন্তরে যে ঐতিহাসিক পাথর আছে, সেখানে সত্তরজন নবীকে হত্যা করা হয়। ইয়াহইয়া আ. তাঁদের অন্যতম।

আবু উবায়দ হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব রহ. থেকে বর্ণনা করেন, বুখতে নসর যখন দামিশকে অভিযানে আসে, তখন ইয়াহইয়া আ.-এর রক্ত মাটির নিচ থেকে উপরের দিকে উত্থিত হতে দেখতে পায়। সে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে লোকজন প্রকৃত ঘটনা জানায়। তখন বুখতে নসর এ রক্তের উপরে সত্তর হাজার বনি ইসরাঈলকে জবাই করে। ফলে রক্ত উঠা বন্ধ হয়ে যায়। এ বর্ণনার সূত্রে সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব রহ. পর্যন্ত সহি। এ বর্ণনা অনুযায়ী ইয়াহইয়া আ. এর হত্যাস্থল দামিশক। আর বুখত নসরের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল হযরত ঈসা মাসীহ আ.-এর পরে।

ইবনে আসাকির হযরত যায়েদ ইবনে ওয়াকিদ থেকে বর্ণনা করেন, তার আমলে দামিশকের মসজিদ পুনঃনির্মাণের সময় হযরত ইয়াহইয়া আ.-এর মস্তক বের হয়ে পড়ে। আমি তা প্রত্যক্ষ করেছিলাম। মসজিদের পূর্ব দিকের মিহরাবের নিকট কিবলার যে দেয়াল ছিল, তার নিচ থেকে ওই মস্তক বের হয়েছিল। মস্তকের চামড়া ও চুল অক্ষত ছিল। এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, মস্তকটি দেখে মনে হয় যেন এই মাত্র কর্তন করা হয়েছে। এরপর উক্ত মসজিদের সাকাসিকা' নামক প্রসিদ্ধ স্তম্ভের নিচে মস্তকটি দাফন করা হয়।

ইবনে আসাকির তাঁর 'আল-মুসতাকসা-ফী ফাযাইলিল আকসা' নামক গ্রন্থে মুআবিয়া আ. এর গোলাম কাসেম থেকে বর্ণনা করেন, দামিশকের জনৈক রাজার নাম ছিল হাদদাদ ইবনে হাদার। রাজা তার এক পুত্রকে তার ভাই আরয়ালের কন্যার সাথে বিবাহ করায়। পুত্রবধূটি ছিল বহু ভূ-সম্পত্তির মালিক। দামিশকের সকল বাজার-ঘাট ছিল তার কর্তৃত্বাধীন। রাজপুত্র একবার কসম খেয়ে স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে দেয়। কিন্তু কিছু দিন পর সে আবার ওই স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং হযরত ইয়াহইয়া আ.-এর নিকট এ ব্যাপারে মাসআলা জিজ্ঞেস করে। হযরত ইয়াহইয়া আ. বললেন, অন্যত্র বিবাহ ব্যতীত এ স্ত্রী পুনরায় গ্রহণ করা তোমার জন্যে বৈধ নয়।

এ রকম সিদ্ধান্ত দেওয়ায় উক্ত মহিলার মনে ইয়াহইয়া আ. প্রতি বৈরিতা সৃষ্টি হয়। এবং সে তাঁকে হত্যা করার জন্যে রাজার নিকট অনুমতি চায়। মহিলার মা-ই এ কাজে তাকে প্ররোচিত করে। রাজা প্রথম দিকে বারণ করলেও পরে অনুমতি দিয়ে দেয়। হযরত ইয়াহইয়া আ. জায়রূন নামক স্থানে এক মসজিদে নামায আদায় করছিলেন। এ অবস্থায় উক্ত মহিলা কর্তৃক প্রেরিত এক ব্যক্তি তাকে হত্যা করে এবং ছিন্ন মস্তক একটি পাত্রে করে নিয়ে যায়। কিন্তু তখনও ওই পাত্র থেকে আওয়াজ আসছিল :

لَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

(অন্যত্র বিবাহ ব্যতীত ওই স্বামীর কাছে যাওয়া বৈধ হবে না, বৈধ হবে না!)

এ অবস্থা দেখে মহিলাটি পাত্রের উপর ঢাকনা দিয়ে আবদ্ধ করে নিজের মাথার উপর রেখে মায়ের নিকট নিয়ে আসে। কিন্তু তখনও পাত্রের মধ্য থেকে অনুরূপ আওয়াজ বের হচ্ছিল। মহিলাটি হযরত ইয়াহইয়া আ.-এর মস্তক রেখে তার মায়ের সম্মুখে যখন

ঘটনার বিবরণ দিচ্ছিল, তখন তার দুই পা মাটির মধ্যে ডেবে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যে তার দেহ কোমর পর্যন্ত মাটির নিচে চলে যায়। মহিলার মা তুলূল এবং তার দাসীরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে চিৎকার করতে থাকে এবং নিজ নিজ মুখে করাঘাত করতে থাকে। দেখতে দেখতে মহিলার কাঁধ পর্যন্ত মাটির মধ্যে গেড়ে যায়। তখন তার মা সান্ত্বনা লাভের উদ্দেশ্যে মেয়েটির মস্তক মাটির নিচে চলে যাওয়ার আগে কেটে রাখার জন্যে একজনকে নির্দেশ দেয়। উপস্থিত জল্লাদ সাথে সাথে তরবারি দ্বারা মস্তক কেটে নিয়ে আসে। কিন্তু সেই মুহূর্তেই মাটি মহিলার অবশিষ্ট দেহ ভিতর থেকে উগলে ফেলে দেয়। এভাবে মহিলাটির গোটা পরিবারই লাঞ্ছনা ও অভিশাপে ধ্বংস হয়ে যায়।

অপরদিকে হযরত ইয়াহইয়া আ. যে স্থানে নিহত হয়েছিলেন, সে স্থানে মাটির নিচ থেকে রক্ত উপরের দিকে উথলে উঠছিল। এরপর বুখত নসর এসে পঁচাত্তর হাজার বনি ইসরাঈলকে হত্যা করলে রক্তের ওই প্রবাহ বন্ধ হয়। সাঈদ ইবনে আবদিল রহ. বলেছেন, উক্ত রক্ত ছিল সমস্ত নবীদের মিশ্রিত রক্ত। মাটির তলদেশ থেকে সর্বদা উথলে উঠত এবং বাইরে গড়িয়ে যেত। হযরত আরমিয়া আ. সে স্থানে দাঁড়িয়ে রক্তকে সম্বোধন করে বলেন, "হে রক্ত! বনি ইসরাঈল তো শেষ হয়ে গেছে! আল্লাহর হুকুমে এখন থাম।" এরপর রক্ত থেমে যায়। বুখত নসর এরপর হত্যাকাণ্ড বন্ধ করে এবং তলোয়ার গুটিয়ে নেয়। তার এ অভিযানকালে দামিশকের বহু লোক পালিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসে চলে যায়। বুখত নসর তাদেরকে ধাওয়া করে সেখানে গিয়েও হত্যা করে। কত লোক যে এ অভিযানে তার হাতে নিহত হয়েছিল, তার কোনো হিসেব নেই। হত্যাযজ্ঞ শেষ হলে বহু সংখ্যক লোককে বন্দি করে বুখত নসর দামিশক ত্যাগ করে।

হযরত লোকমান আ.

নাম ও বংশ পরিচিতি

লোকমান বা লোকমান হাকীম আরববাসীদের নিকট একটি বিখ্যাত নাম ও ব্যক্তিত্ব। তাঁর অবস্থাবলী, খান্দান এবং বংশ-পরিচয় সম্বন্ধে বিভিন্ন উক্তি ও মতামত পাওয়া যায়। তিনি একজন মহান ও সুবিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর জ্ঞানগর্ভ উক্তিসমূহ 'সহিফায়ে লোকমান' নামে আরবদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ ছিল। এতটুকু কথার উপর সকলের ঐকমত্য রয়েছে। তবে অন্যান্য বিষয়সমূহে বিপরীতমুখী উক্তি পাওয়া যায়। প্রাচীনকালের ইতিহাসে লোকমান নামে আরও এক ব্যক্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন দ্বিতীয় আদ এর সম্প্রদায়ের একজন নেককার বাদশা। তিনি খাঁটি আরব বংশদ্ভূত। ইবনে জারীর, ইবনে কাসীর ও সুহাইলীর মতো বিখ্যাত ঐতিহাসিকগণের মতে লোকমান হাকীম ছিলেন আফ্রিকান লোক। তিনি আরব দেশে একজন ক্রীতদাসরূপে আগমন করেছিলেন। এ সমস্ত ইতিহাসবিদগণ তাঁর বংশ-পরিচয় এবং শারীরিক গঠন ও আকৃতি এরূপ বর্ণনা করেন :

هُوَ لُقْمَانُ بْنُ عُنْقَا بْنُ سَنْدُوْنَ اَوْ لُقْمَانُ بْنُ ثَارِ بْنِ سُنْدُوْ

"তিনি লোকমান ইবনে ওনকা ইবনে সান্দূন বা লোকমান ইবনে ছার ইবনে সান্দূন।"

তারা বলেন, তিনি সুদানের 'নাওবী' গোত্রভুক্ত ছিলেন। খর্বাকৃতি, স্থূলকায় ও কৃষ্ণ বর্ণের ছিলেন। তাঁর ওষ্ঠাধার ছিল খুব মোটা এবং হাত-পাগুলি ছিল বিশ্রী; কিন্তু খুবই নেককার, এবাদতকারী, সংসারবিরাগী, বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে হেকমত ও জ্ঞানের বিরাট এক অংশ দান করেছিলেন। কেউ কেউ আবার বলেন, তিনি হযরত দাউদ আ.-এর যমানায় 'কাযির' পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا نَجَّارًا وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ
كَانَ لُقْمَانُ قَصِيْرًا فَطِسَّ مِّنَ النَّوْبَةِ

১। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, লোকমান ছিলেন হাবশী গোলাম এবং করাতির কাজ করতেন। আর জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. বলেন : লোকমান খর্বাকৃতি, পুরু ওষ্ঠাধরবিশিষ্ট এবং নাওবাহ গোত্রভুক্ত ছিলেন। (রাওযুল আনফ : ১ম খণ্ড)

وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ كَانَ لُقْمَانُ مِنْ سُوْدَانِ مِصْرَ ذُوْ شَافِرٍ اَعْطَاهُ اللهُ الْحِكْمَةَ وَمَنَعَهُ النُّبُوَّةَ

২। আবু সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব বলেন : লোকমান মিছরী-সুদানী ছিলেন। তাঁর ওষ্ঠাধর অত্যন্ত পুরু ছিল। আল্লাহ তাআলা যদিও তাঁকে নবুয়ত প্রদান করেন নি; কিন্তু জ্ঞান-বুদ্ধি ও হেকমতের বিরাট অংশ দান করেছিলেন।

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَرْمَلَةَ قَالَ جَآءَ اَسْوَدُ اِلٰى سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ يَسْئَلُهٗ فَقَالَ لَهٗ سَعِيْدٌ لَا تَحْزَنْ مِنْ اَجْلِ اَنَّكَ اَسْوَدُ فَاِنَّهٗ كَانَ مِنْ اَخْيَرِ النَّاسِ ثَلٰثَةٌ مِّنَ السُّوْدَانِ بِلَالٌ وَمَهْجَعُ مَوْلٰى عُمَرَ وَلُقْمَانُ الْحَكِيْمُ كَانَ اَسْوَدَ نُوْبِيًّا ذَا شَافِرٍ ـ

৩। আবদুর রহমান ইবনে হারমালা বলেন, একবার জনৈক হাবশী হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাবের কাছে কতিপয় প্রশ্ন করলে তিনি তাকে বললেন : তুমি এ বিষয়ে দুঃখিত হয়ো না, তুমি একজন কৃষ্ণকায় হাবশী। কেননা সুদানীদের মধ্যে তিন ব্যক্তি দুনিয়ায় অপেক্ষাকৃত উত্তম ব্যক্তি হয়েছেন : (১) হযরত বেলাল রা (২) হযরত ওমর রাযি.-এর গোলাম মাহজা এবং (৩) হাকিম লোকমান, যিনি সুদানী এবং নাওবী ছিলেন। তাঁর ওষ্ঠাধর বেশ পুরু এবং কুৎসিত ছিল। (তারিখে ইবনে কাসীর)

বিখ্যাত ইতিহাসবিদ এবং ইসলামী জিহাদসমূহের ঘটনা লেখক মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেন, লোকমান হাকিম আরবের বিখ্যাত আদ গোত্রভূত ছিলেন। অর্থাৎ বহিরাগত আরবদের বংশধর ছিলেন। গোলাম ছিলেন না; বাদশা ছিলেন।

قَالَ وَهْبٌ فَلَمَّا مَاتَ شَدَّادُ بْنُ عَادٍ صَارَ الْمُلْكُ اِلٰى اَخِيْهِ لُقْمَانَ بْنِ عَادٍ وَكَانَ اَعْطَى اللّٰهُ لُقْمَانَ مَا لَمْ يُعْطِ غَيْرَهٗ مِنَ النَّاسِ فِىْ زَمَانِهٖ اَعْطَاهُ حَاسَّةَ مِائَةِ رَجُلٍ وَّكَانَ طَوِيْلًا لَا يُقَارِبُ اَهْلَ زَمَانِهٖ ـ

"ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ বলেন, শাদ্দাদ ইবনে আদের মৃত্যু হলে শাসনদণ্ড তার ভ্রাতা লোকমান ইবনে আদের হস্তগত হয়। আল্লাহ তাআলা লোকমানকে এমন বস্তু দান করেছিলেন, তৎকালের লোকদের মধ্যে কাউকেও সেই বস্তু দান করেন নি। আল্লাহ তাআলা তাকে একশ লোকের সমান জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা তাঁকে দান করেছিলেন। তিনি তাঁর সমকালের লোকদের মধ্যে সকলের চেয়ে অধিক দীর্ঘাকৃতির ছিলেন।"

قَالَ وَهْبٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ لُقْمَانُ بْنُ عَادِ بْنِ الْمُلْطَاطِ بْنِ السَّلَكِ بْنِ وَائِلِ بْنِ حِمْيَرَ نَبِيًّا غَيْرَ مُرْسَلٍ

"ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলতেন, লোকমান ইবনে আদের বংশ পরিচয় হল : মুলতাত ইবনে সালাক ইবনে ওয়ায়েল ইবনে হিমইয়ার। তিনি নবী ছিলেন, কিন্তু রাসূল ছিলেন না।" (কিতাবুত্তীজনা : ৭০)

মজার ব্যাপার হল, ইবনে জারীর ও ইবনে কাসীর নিজেদের মতের সমর্থনে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. এর উক্তিই রেওয়ায়েত করছেন। ইবনে ইসহাকও তাঁরই উক্তিকে নিজের মতের সমর্থনে পেশ করছেন। সমসাময়িক ইতিহাসবিদগণের মধ্য হতে 'আরদুল কুরআনে'র লেখক বলেছেন, লোকমান হাকীম ও লোকমান বাদশা একই ব্যক্তি। তিনি দ্বিতীয় আদ সম্প্রদায়ের নেককার বাদশাগণের মধ্যে একজন অতি বড় বিজ্ঞানী ও অত্যন্ত জ্ঞানবান ছিলেন। আরবজাতির মধ্যে 'সহিফায়ে লোকমান' নামে যে গ্রন্থটি লোকমানের সাথে সম্পর্কিত ছিল, তা এ দ্বিতীয় আদ সম্প্রদায়ের

লোকমানেরই ছিল। তিনি নিজের এ দাবির স্বপক্ষে বিভিন্ন প্রমাণসমূহের মধ্যে একটি প্রমাণ এটাও পেশ করেন, অজ্ঞ যুগের কবি সালমা ইবনে রবিয়ার নিম্নোক্ত কবিতাগুলি আমার এ দাবিকে স্পষ্টরূপে প্রকাশ করছে :

اهلكن طسما وبعده + غذى بهم وذا جدون

واهل جاش ومارب + "وحى لقمان" والتقون

"যমানার বিবর্তনসমূহ আতসাম গোত্রকে এবং এরপর ইয়ামানের বাদশা যা জাদওয়ানকে, জাশের ও মাআরেবের অধিবাসীগণকে এবং লোকমানের গোত্রকে ও তাকূনের অধিবাসীগণকে ধ্বংস করে দিয়েছে।"

এরপর বলেন, এ কবিতায় লোকমানের শুধু আরব হওয়াই প্রকাশ পায় না; 'সাবা' সম্প্রদায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বলেও বুঝা যায়। আর এ সমুদয় বিষয় আদে সানীর লোকমানের উপর প্রযোজ্য হতে পারে। ১৮ হিজরি সনে প্রাপ্ত আদ সম্প্রদায়ের একটি শিলালিপিতে লিখা ছিল– "আমাদের উপর সেই বাদশা রাজত্ব করছেন, যিনি হীনম্মন্যতা হতে বহু দূরে এবং দুশ্চরিত্র লোকদেরকে শাস্তি প্রদানকারী ছিলেন এবং হূদের শরিয়ত অনুযায়ী আমাদের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। উত্তম মীমাংসাসমূহ একটি কিতাবে লিখিত হত।" আমরা কি এ শেষোক্ত শব্দগুলি হতে– যা কাগজ নয়, শীলার উপর লিখিত পাওয়া গেছে– এই ফল বের করতে পারি না, "সহিফায়ে লোকমান'ই লোকমানের উত্তম মীমাংসাসমূহ, যা একটি কিতাবে লিপিবদ্ধ হয়েছিল?

(আরদুল কুরআন : ১/১৮১-১৮২)

কুরআন মাজিদে হযরত লোকমান আ.

কুরআন মাজিদে হযরত লোকমানের আলোচনা রয়েছে। পূর্ণ একটি সূরার নামও লোকমান রাখা হয়েছে। অবশ্য কুরআন মাজিদ যদিও নিজের আসল উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে লোকমানের বংশ-পরিচয় এবং খানদানের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া পছন্দ করে নি, তবুও তাঁর জ্ঞানগর্ভ উক্তিসমূহকে যে ধরনে উল্লেখ করেছে, তদ্দ্বারা লোকমানের ব্যক্তিত্বের উপর একরকম আলোকপাত অবশ্যই হয়ে যায়। সুতরাং সঙ্গত এই মনে হয়, কুরআনের সেই বর্ণনাকে উল্লেখ করার পর এই মীমাংসায় আসা যায়, উপর্যুক্ত অভিমত দুটির মধ্যে কোন অভিমতটি যুক্তিসম্মত।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (١٢) وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (١٣) وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (١٤) وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا

وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٥) يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (١٦) يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (١٧) وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (١٨) وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (١٩)

"আমি লোকমানকে জ্ঞান দান করেছিলাম এবং বলেছিলাম, আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তো তা করে নিজেরই জন্যে এবং কেউ অকৃতজ্ঞ হলে আল্লাহ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ। স্মরণ কর, যখন লোকমান উপদেশচ্ছলে তার পুত্রকে বলেছিল, হে ছেলে! আল্লাহর কোনো শরিক করো না, নিশ্চয়ই শিরিক চরম জুলুম। আমি তো মানুষকে তার পিতামাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। মা সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দু বছরে। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট। তোমার পিতামাতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সমকক্ষ দাঁড় করাতে, যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তুমি তাদের কথা মানবে না; তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে বসবাস করবে সৎভাবে আর যে বিশুদ্ধচিত্তে আমার অভিমুখী হয়েছে, তার পথ অবলম্বন করবে।

এরপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট এবং তোমরা যা করতে সে বিষয়ে আমি তোমাদেরকে অবহিত করব। হে ছেলে! কোনো বস্তু যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং সেটি যদি থাকে শিলাগর্ভে অথবা আকাশে কিংবা মাটির নিচে, আল্লাহ তাও উপস্থিত করবেন। আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত। হে ছেলে! নামায কায়েম করবে, সৎকর্মের নির্দেশ দিবে আর অসৎকর্মে নিষেধ করবে এবং আপদে-বিপদে ধৈর্যধারণ করবে। এটিই তো দৃঢ় সংকল্পের কাজ। অহংকার বলে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করবে না এবং পৃথিবীতে দম্ভভরে বিচরণ করবে না। নিশ্চয় আল্লাহ কোনো দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না। তুমি পা ফেলবে সংযতভাবে এবং তোমার কণ্ঠস্বর নিচু করবে। নিশ্চয় সুরের মধ্যে গর্দভের সুরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর।"

হাদিস পাকে হযরত লোকমান আ.

সুফিয়ান ছাওরী রহ. ইবনে আব্বাস রাযি. সূত্রে বলেন, লোকমান ছিলেন জনৈক আবিসিনীয় দাস। পেশায় নাজ্জার বা সূত্রধর। কাতাদা রহ. ইবনে যুবায়ের রাযি. সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : আমি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাযি.-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, লোকমান সম্পর্কে শেষ পর্যন্ত আপনাদের অভিমত কি নাজ্জার বা সূত্রধর?

তিনি বললেন, লোকমান ছিলেন খর্বাকৃতি এবং নূবী গোত্রস্থিত চ্যাপ্টা নাক বিশিষ্ট লোক। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আনসারী সাঈদ ইবনে মুসায়্যাব থেকে বর্ণনা করেন, লোকমান ছিলেন মিসরীয় কৃষ্ণকায় লোক। তার ওষ্ঠাধর ছিল মোটা ও পুরু। আল্লাহ তাআলা তাঁকে হিকমত ও প্রজ্ঞা দিয়েছিলেন, নবুয়ত দান করেন নি।

উমর ইবনে কায়েস বলেন, লোকমান ছিলেন একজন কৃষ্ণকায় ক্রীতদাস। ঠোঁট দুটো পুরু, পা দুটো চ্যাপ্টা। তিনি যখন লোকজনকে উপদেশ দিচ্ছিলেন এমন সময় একজন লোক এসে বলল, আপনি না আমার সাথে অমুক অমুক স্থানে বকরি চরিয়েছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। লোকটি বলল, তা হলে এখন যা দেখছি, এ পর্যায়ে আপনি উন্নীত হলেন কেমন করে? তিনি উত্তর দিলেন, সত্য বলা এবং অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে মৌনতা অবলম্বনের মাধ্যমে। এ বর্ণনাটি ইবনে জারীরের।

ইবনে আবী হাতিম আবদুর রহমান ইবনে আবী ইয়াযিদ ইবনে জাবির থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, লোকমান হাকীমের হেকমত ও প্রজ্ঞার বদৌলতে আল্লাহ তাআলা তাঁকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। তাঁর পূর্ব পরিচিত এক ব্যক্তি তাঁকে দেখে বলল, আপনি কি অমুকের ক্রীতদাস ছিলেন না? আপনি কি পূর্বে বকরী চরাতেন না? তিনি বললেন, হ্যাঁ, লোকটি বলেন, কিসে আপনাকে আমার দেখা এ পর্যায়ে উন্নীত করল? তিনি বললেন, তাকদিরের লিখন, আমানতদারী, সত্যবাদিতা ও অপ্রয়োজনীয় বিষয় বর্জন।

আফরার আযাতকৃত দাস ওমর থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি লোকমান হাকীমের নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, আপনি তো বনি নুহাস গোত্রের ক্রীতদাস লোকমান? তিনি বললেন, হ্যাঁ। লোকটি বলল, আপনি সেই কৃষ্ণকায় বকরি চরানো ব্যক্তিই তো? তিনি বললেন, আমার কালোবর্ণ বলার অপেক্ষা রাখে না। আমার কোন বিষয়টি আপনাকে বিস্মিত করছে? সে বলল, এই যে লোকজন আপনার কাছে জড়ো হচ্ছে, আপনার দরজা ওদেরকে আচ্ছাদিত করছে এবং আপনার বক্তব্যে তারা প্রীতও হচ্ছে –এসব। লোকমান বললেন, ভাতিজা! আমি তোমাকে যা বলব, তুমি যদি তা কর, তবে তুমিও আমার মতো হতে পারবে।

সে বলল, তা কী? লোকমান বললেন, আমি আমার দৃষ্টি অবনত রাখি। আমার জিহবা সংযত রাখি। আমার পানাহার ও যৌনাচারের ব্যাপারে আমি সংযম অবলম্বন করি। আমার দায়িত্ব পালন করি। অঙ্গীকার পূরণ করি। মেহামানদের সম্মান করি। প্রতিবেশীদের হক আদায় করি। অপ্রয়োজনীয় বিষয় বর্জন করি। এ কর্মগুলোই আমাকে এ পর্যায়ে উন্নীত করেছে, যা তুমি দেখতে পাচ্ছ।

ইবনে আবী হাতিম হযরত আবু দারদা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, লোকমান হাকীমের আলোচনায় একদিন তিনি বললেন, তাঁর না ছিল উল্লেখযোগ্য পরিবার-পরিজন, না ধন-সম্পদ, না কোনো বংশ-মর্যাদা, না কোনো বৈশিষ্ট্য। তবে তিনি ছিলেন

সুঠামদেহী নীরবতা অবলম্বনকারী, চিন্তাশীল, গভীরভাবে পর্যবেক্ষণকারী। দিনের বেলা তিনি কখনও ঘুমাতেন না, তাকে কেউ থুথু ফেলতে দেখে নি, দেখে নি কাশি দিতে, পেশাব-পায়খানা করতে, গোসল করতে কিংবা বাজে কাজকর্ম করতে এবং কেউ তাকে হাসতেও দেখে নি। খুব গভীর কোনো জ্ঞানের কথা না হলে বা কেউ জিজ্ঞাসা না করলে তিনি কখনও তাঁর বক্তব্য পুনঃউচ্চারণ করতেন না।

তিনি বিবাহ করেছিলেন এবং তাঁর একাধিক সন্তানও জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এদের মৃত্যুতে তিনি কাঁদেন নি। তিনি রাজা-বাদশা ও আমীর-উমরাদের নিকট যেতেন তাদের অবস্থা দেখার জন্যে, চিন্তা-ভাবনা করার জন্যে এবং ওদের জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্যে। ফলে তিনি এ মর্যাদার অধিকারী হন।

কেউ কেউ বলেন, তাকে নবুয়ত গ্রহণের এখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল। তিনি নবুয়তের গুরুদায়িত্ব পালনে শঙ্কিত হন আর হিকমত তথা প্রজ্ঞাকেই বেছে নেন। কারণ, এটি ছিল তাঁর নিকট সহজতর। এ মন্তব্যের যথার্থতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। আল্লাহই ভালো জানেন। ইবনে আবী হাতিম ও ইবনে জারীর ইকরামার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, লোকমান নবী ছিলেন। তবে বর্ণনাটি দুর্বল বলে গণ্য করা হয়।

অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে লোকমান ছিলেন প্রজ্ঞাময় ও বিচক্ষণ একজন ওলি। তিনি নবী ছিলেন না। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে হযরত লোকমানের কথা উল্লেখ করে তাঁর প্রশংসা করেছেন। সেইসঙ্গে তাঁর প্রাণপ্রিয় ও স্নেহধন্য পুত্রকে যেসব উপদেশ দিয়েছেন, আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে তাও উল্লেখ করেছেন। তিনি প্রথমে আপন পুত্রকে শিরিক করতে নিষেধ করলেন এবং সতর্ক করে দেন। এরপর তিনি সন্তানের ওপর পিতামাতার অধিকারের কথা, তারা মুশরিক হলেও তাদের প্রতি সদাচরণের কথা এবং তাদের দীন কবুল করার ব্যাপারে তাদের আনুগত্য না করার কথা উল্লেখ করেছেন।

এরপর হযরত লোকমান আ. তাঁর পুত্রকে মানুষের প্রতি জুলুম করতে বারণ করেন। জুলুম যদিও সর্ষে দানা পরিমাণও হয়। কারণ, আল্লাহ তাআলা জুলুম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। জুলুমকে হিসাব নিকাশকালে হাজির করবেন এবং আমলের পাল্লায় রাখবেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, إِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ আল্লাহ অণু পরিমাণও জুলুম করেন না।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ

"এবং কিয়ামত দিবসে আমি স্থাপন করব ন্যায় বিচারের মানদণ্ড। সুতরাং কারো প্রতি কোনো অবিচার করা হবে না এবং কর্ম যদি তিল পরিমাণ ওজনেরও হয় তবুও আমি সেটি উপস্থিত করব। হিসাব গ্রহণকারী রূপে আমিই যথেষ্ট।" (সূরা আম্বিয়া : ৪৭)

এর দ্বারা জানিয়ে দেওয়া হল, জুলুম দৃষ্টিতে তিল পরিমাণ ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ হলেও এবং তা দরজা জানালাহীন, এমনকি ছিদ্র বিহীন কঠিন পাথরের মধ্যে রাখা হলেও অথবা বিশাল ও বিস্তৃত এ অসীম আসমানের গহীন অন্ধকার স্থান থেকে কোনো বস্তুতে পতিত হলেও আল্লাহ তাআলা সেটি সম্পর্কে অবগত থাকেন। আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী সম্যক অবহিত। আল্লাহ তাআলার ইলম অত্যন্ত সূক্ষ্ম। তাই সাধারণত যা লোকচক্ষুর আড়ালে থাকে, সেই অণু পরিমাণ বিষয়ও তাঁর অগোচরে থাকে না। আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন :

وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ
وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

"তার অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও পড়ে না। মৃত্তিকার অন্ধকারে এমন কোনো শস্য কণাও অঙ্কুরিত হয় না অথবা রসযুক্ত কিংবা শুষ্ক এমন কোনো বস্তু নেই, যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।" (সূরা আনআম : ৫৯)

ইমাম আহমদ রহ. আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

لَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ يَعْمَلُ فِيْ صَخْرَةٍ صَمَّاءَ لَيْسَ لَهَا بَابٌ وَلَا كُوَّةٌ لَخَرَجَ عَمَلُهُ لِلنَّاسِ كَائِنًا مَا كَانَ

"তোমাদের কেউ যদি দরজা ও ছিদ্রহীন পাথরের মধ্যেও কোনো আমল কর, তাও মানুষের সম্মুখে প্রকাশিত হয়ে পড়বে, আমলটি যে পর্যায়েরই হোক না কেন।"

এরপর হযরত লোকমান তাঁর পুত্রকে বললেন : হে বৎস! নামায কায়েম কর। অর্থাৎ সকল নিয়মনীতি সহকারে ফরয, ওয়াজিব, ওয়াক্ত, রুকূ সিজদা, ধীর-স্থির ও বিনয় সব কিছুর প্রতি লক্ষ রেখে এবং এ সম্পর্কিত শরিয়তের নিষিদ্ধ বিষয়াদি পরিহার করে পূর্ণাঙ্গ রূপে নামায আদায় কর।

এরপর তিনি বললেন, সৎকর্মের নির্দেশ দিবে এবং অসৎকর্মে নিষেধ করবে নিজের শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী। হাতে তথা বলপ্রয়োগে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা থাকলে বলপ্রয়োগে বাধা দেবে। নতুবা মুখে, তাতেও সমর্থ না হলে অন্তরে। এরপর পুত্রকে নির্দেশ দিলেন ধৈর্য ধারণের। কারণ, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করতে গেলে সাধারণত বাধা ও প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়। তবে এর পরিণাম উৎকৃষ্ট। এটি সর্বজনবিদিত, সবুরে মেওয়া ফলে। তাই তিনি বলেন : এ তো দৃঢ় সংকল্পের কাজ, অপরিহার্যও বটে।

তিনি বললেন, অহংকার বশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না। মানুষের প্রতি অহংকারী হয়ো না। লোকজনের সাথে কথা বলার সময় তাদের প্রতি গর্বভরে ও অবজ্ঞা বশে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে কথা বলো না। যেমনি ঘাড়ের রোগে আক্রান্ত উটের মাথা ঝুঁকে পড়ে। এরপর তিনি তাঁর পুত্রকে মানুষের সম্মুখে দম্ভ, অহংকার ও ঔদ্ধত্য সহকারে পথ চলতে নিষেধ করেছেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا

ভূ-পৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ করো না, তুমি কখনই পদভারে ভূ-পৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনই, পর্বত প্রমাণ হতে পারবে না। (সূরা ইসরা : ৩৭)

অর্থাৎ তুমি তোমার দ্রুতগতি সম্পন্ন পথ চলার সকল শহর, নগর অতিক্রম করে যেতে পারবে না, তোমার পদাঘাতে বিদীর্ণ করতে পারবে না, আর তোমার বিশালত্ব অহংকার ও উচ্চতায় তুমি পাহাড়ের সমান উঁচুও হতে পারবে না। সুতরাং নিজের প্রতি তাকাও এবং বুঝে নাও, তুমি তোমার সীমাবদ্ধতা ছাড়িয়ে যেতে পারবে না।

হাদিস শরিফে আছে, এক ব্যক্তি দুটো কাপড় পরে গর্বভরে পথ চলছিল। তখন আল্লাহ তাআলা তাকে ভূমিতে প্রোথিত করে দিলেন। কেয়ামত পর্যন্ত সে নিচের দিকে প্রোথিত হতে থাকবে। অপর হাদিসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : গোড়ালীর নিচ পর্যন্ত লুঙ্গি ঝুলিয়ে দেওয়া থেকে তুমি নিজেকে বাঁচিয়ে রাখ। কেননা তা অহংকারের পরিচায়ক। আল্লাহ তা পছন্দ করেন না। এরপর লোকমান তাঁর পুত্রকে মধ্যম গতিতে পথ চলতে নির্দেশ দিলেন। কারণ, পথ চলাতো লাগবেই। তিনি এ বিষয়ে পুত্রকে মন্দ দিক সম্পর্কে নিষেধ করলেন এবং কল্যাণকর দিকটি অবলম্বনের নির্দেশ দিলেন। বললেন, পথ চলতে মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে; খুব মন্থরগতি কিংবা খুব দ্রুতগতিতে নয় বরং মধ্যম গতিতে চলবে।

এরপর লোকমান তাঁর পুত্রকে বললেন : তুমি যখন কথা বলবে, তখন প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চ স্বরে কথা বলবে না। কারণ, সর্বোচ্চ এবং সর্বনিকৃষ্ট কণ্ঠস্বর হল গাধার স্বর। সহি বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে, রাত্রি বেলায় গাধার ডাক শুনলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আউযুবিল্লাহ পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ, গাধা শয়তানকে দেখতে পায়। এ জন্যেই বিনা প্রয়োজনে কণ্ঠস্বর উচ্চ করতে নিষেধ করেছেন। বিশেষত হাঁচি দেওয়ার সময়। হাঁচির সময় শব্দ নিচু রাখা এবং মুখ ঢেকে রাখা মুস্তাহাব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ করতেন বলে হাদিসে প্রমাণ রয়েছে। অবশ্য আযানের সময় উচ্চ স্বরে আযান দেওয়া, যুদ্ধের সময় উচ্চ স্বরে আহবান জানানো এবং বিপদ-আপদ ও মৃত্যুর আশঙ্কায় উচ্চস্বরে কাউকে ডাকা শরিয়তসম্মত।

হযরত লোকমান আ.-এর এসব প্রজ্ঞাপূর্ণ বক্তব্য, কল্যাণকর ও অকল্যাণরোধক উপদেশাবলী আল্লাহ তাআলা কোরআন মাজিদে উল্লেখ করেছেন। হযরত লোকমান আ.-এর বিবরণ ও উপদেশাবলী সম্পর্কে আরও বহু বর্ণনা রয়েছে। তাঁর বক্তব্য সম্বলিত 'হেকমতে লোকমান' নামে একটি পুস্তক পাওয়া যায়।

ইমাম আহমদ হযরত ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে জানালেন, লোকমান হাকীম বলতেন, আল্লাহ তাআলা কোনো কিছু আমানতরূপে দিলে তিনি তা হেফাজতও করেন।

ইবনে আবী হাতিম কাসিম ইবনে মুখায়মারা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, লোকমান তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন, "হে বৎস! হিম্মত ও প্রজ্ঞা দরিদ্রদেরকে রাজার আসনে বসিয়েছে।

আওন ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। লোকমান তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন, হে বৎস! তুমি কোনো মজলিসে উপস্থিত হলে ইসলামের রীতি অনুযায়ী সালাম করবে। তারপর মজলিসের এক পাশে বসে পড়বে। তাদের কথা বলার পূর্বে তুমি কোনো কথা বলো না। তারা আল্লাহর যিকির ও আল্লাহ সম্পর্কে আলোচনায় নিয়োজিত হলে তুমি তাদের সাথে আলোচনায় অংশ নিবে। তারা যদি অন্য কোনো বিষয়ে আলোচনা করে, তবে তুমি তাদেরকে ত্যাগ করে অন্যদের কাছে চলে যাবে।

হাফস ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত। হযরত লোকমান আ. এক থলে সরিষা পাশে নিয়ে তাঁর পুত্রকে উপদেশ দিতে বসেছিলেন। একটি করে উপদেশ দিচ্ছিলেন আর একটি সরিষা থলে থেকে বের করছিলেন। এভাবে তাঁর সব সরিষা শেষ হয়ে গেল। তখন তিনি বললেন, হে বৎস! আমি তোমাকে এমন উপদেশ দিলাম, কোনো পর্বতকে এ উপদেশ শুনালে ফেটে চৌচির হয়ে যেত। তাঁর পুত্রের অবস্থাও তাই হয়েছিল।

মালেক ইবনে দীনার থেকে বর্ণিত, লোকমান তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন, হে বৎস! তুমি ব্যবসা রূপে আল্লাহর ইবাদতকে বেছে নাও, তা হলে পুঁজি ছাড়াই লাভ পাবে। ইয়াযিদ মুহাম্মদ ইবনে ওয়াছি থেকে বর্ণনা করেন, লোকমান তাঁর পুত্রকে লক্ষ্য করে প্রায়ই বলতেন, হে বৎস! আল্লাহকে ভয় কর। তোমার অন্তর কলুষিত থাকা অবস্থায় মানুষের শ্রদ্ধা অর্জনের জন্যে তুমি আল্লাহকে ভয় করার ভান কর না!

ইয়াযিদ বলেন, লোকমান ছিলেন একজন হাবশী ক্রীতদাস। পেশায় ছুতার। তাঁর মালিক তাঁকে একটি বকরি জবাই করতে বলেছিল। সে মতে তিনি একটি বকরি জবাই করেন। বকরির উৎকৃষ্টতম দুটো টুকরো আনতে মালিক তাঁকে নির্দেশ দেন। তিনি বকরিটির জিহবা ও হৃৎপিণ্ড নিয়ে আসেন। মালিক তাকে জিজ্ঞেস করল, এর চাইতে উৎকৃষ্ট কোনো অঙ্গ কি এ বকরিতে নেই? তিনি বললেন, না। মালিক কিছু সময় চুপ করে থাকার পর আবার তাঁকে বললেন, আমার জন্যে অপর একটি বকরি জবাই কর। তিনি তার জন্যে অপর একটি বকরি জবাই করলেন। মালিক বললেন, এটির নিকৃষ্টতম টুকরো দুটো ফেলে দাও! তিনি বকরিটির জিহবা ও হৃৎপিণ্ড ফেলে দিলেন। মালিক বললেন, আমি তোমাকে উৎকৃষ্ট দুটো টুকরো আনতে বললাম, তুমি নিয়ে এলে জিহবা আর হৃৎপিণ্ড। আবার নিকৃষ্টতম দুটো টুকরা ফেলে দিতে বললাম, তুমি জিহবা আর হৃৎপিণ্ড ফেলে দিলে! এর রহস্য কি? লোকমান বললেন, জিহবা ও হৃৎপিণ্ড যতক্ষণ পবিত্র থাকে ততক্ষণ এ দু'টো অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কিছু থাকে না। আর এ দুটো যখন কলুষিত হয়, তখন এ দুটো অপেক্ষা ঘৃণিত অন্য কিছু থাকে না।

দাউদ ইবনে রশীদ আবু উছমান রহ. এর সূত্রে বলেন, লোকমান তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন, মূর্খদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনে আগ্রহী হয়ো না। তা হলে সে মনে করবে,

তার কর্মে তুমি সন্তুষ্ট। বিজ্ঞ ব্যক্তিদের অসন্তুষ্টিকে তুচ্ছ ভেব না। তা হলে সে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে।

দাউদ ইবনে উসায়দ আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদের সূত্রে বলেন, লোকমান বলেছেন : জেনে রাখ! প্রজ্ঞাবানদের মুখে আল্লাহ পাকের হাত থাকে। তিনি যা তৈরি করে দেন, তা ব্যতীত তারা কথা বলেন না।

আবদুর রাযযাক বলেন, তিনি ইবনে জুরায়েজকে বলতে শুনেছেন, আমি রাতে মাথা ঢেকে রাখতাম। ওমর রাযি. আমাকে বললেন, তুমি রাতে মাথা ঢেকে রাখ কেন? তুমি কি জান না, লোকমান আ. বলেছেন, দিনের বেলা মাথা ঢেকে রাখা অপমানজনক এবং রাত্রে তা ওযর বা অপারগতার নিদর্শন। তা হলে তুমি রাতে মাথা ঢাক কেন? তখন আমি তাকে বললাম, লোকমান আ.-এর তো কোনো ঋণ ছিল না। সুফিয়ান বলেন, লোকমান তার পুত্রকে বলেছিলেন, হে বৎস! নীরবতা অবলম্বন করে আমি কখনো লজ্জিত হই নি। কথা বলা যদি রূপা হয়, তবে নীরব থাকা হচ্ছে সোনা।

আবদুস সামাদ কাতাদা সূত্রে বলেন, লোকমান তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন, হে বৎস! মন্দ থেকে দূরে থাক। তা হলে মন্দ তোমার থেকে দূরে থাকবে। কারণ মন্দের জন্যেই মন্দের সৃষ্টি। আবু মুআবিয়া উরওয়ার সূত্রে বলেন : হযরত লোকমানের প্রজ্ঞাপূর্ণ বক্তব্যে আছে, হে বৎস! অতিরিক্ত মাখামাখি পরিহার করবে। কারণ, অতিরিক্ত মাখামাখি ঘনিষ্ঠজন থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং প্রজ্ঞাকে বিলুপ্ত করে দেয়। হে বৎস! অতি ক্রোধ বর্জন করবে। কারণ, তা প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির অন্তঃকরণকে ধ্বংস করে দেয়।

ইমাম আহমদ উবায়দ ইবনে উমায়েরের সূত্রে বলেন, লোকমান আ. তার পুত্রকে নসিহত করেন, হে বৎস! দেখে-শুনে মজলিস বেছে নেবে। যদি এমন মজলিস দেখ, যেখানে আল্লাহর যিকির হয়, তবে তুমি তাদের সাথে সেখানে বসবে। কারণ, তুমি নিজে জ্ঞানী হলে তোমার জ্ঞান তোমার উপকার করবে; তুমি মূর্খ হলে মজলিসের লোকেরা তোমাকে জ্ঞান দান করবে। আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর রহমত নাযিল করলে তাদের সাথে তুমিও রহমতের অংশ পাবে।

হে বৎস! যে মজলিসে আল্লাহর যিকির হয় না, সে মজলিসে বসবে না। কারণ, তুমি নিজে জ্ঞানী হলে তখন তোমার জ্ঞান তোমার কোনো উপকার করবে না। আর তুমি যদি মূর্খ হও তারা তোমার মূর্খতা আরও বৃদ্ধি করে দিবে। উপরন্তু আল্লাহ তাদের উপর কোনো গযব নাযিল করলে তাদের সাথে তুমিও গযবে পতিত হবে। হে বৎস! ঈমানদারের রক্তপাতকারী শক্তিমান ব্যক্তিকে ঈর্ষা করো না। কারণ, তার জন্যে আল্লাহর নিকট এমন ঘাতক রয়েছে, যার মৃত্যু নেই।

আবু মুয়াবিয়া উরওয়া রহ. সূত্রে বলেন, 'আলহিকমাহ' গ্রন্থে রয়েছে, হে বৎস! তুমি ভালো কথা বলবে এবং হাসিমুখে থাকবে। তা হলে দানশীল ব্যক্তিদের তুলনায় তুমি মানুষের নিকট অধিকতর প্রিয় হবে।

তিনি আরও বলেন, 'আলহিকমাহ' গ্রন্থে বা তাওরাতে আছে, নম্রতা হল প্রজ্ঞার মস্তক স্বরূপ। তুমি যেমন দয়া করবে, তেমন দয়া পাবে। তিনি আরও বলেছেন, হিকমত গ্রন্থে আছে, যেমন বপন করবে তেমন ফসল তুলবে। তোমার বন্ধুকে এবং তোমার পিতার বন্ধুকে ভালোবাসবে।

আবদুর রাযযাক আবু কিলাবা সূত্রে বলেন, লোকমান আ.-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কোন ব্যক্তি অধিক ধৈর্যশীল? তিনি বললেন : যে ধৈর্যের যার পরে কষ্ট দেওয়া হয় না। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, কোন ব্যক্তি সর্বাধিক জ্ঞানী? তিনি বললেন : যে অন্যের জ্ঞান দ্বারা নিজের জ্ঞান বৃদ্ধি করে। বলা হল, কোন লোক উত্তম? তিনি বললেন, ধনী ব্যক্তি। বলা হল, প্রাচুর্যের অধিকারী, সম্পদে প্রাচুর্য? তিনি বললেন : না, বরং আমি সে ব্যক্তিকে বুঝিয়েছি, যার কাছে কোনো কল্যাণ চাওয়া হলে তা পাওয়া যায়। তা না হলে অন্তত সে অন্যের দ্বারস্থ হয় না। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেন, লোকমান আ.-কে বলা হল, নিকৃষ্টতম ব্যক্তি কে? তিনি বললেন : যে ব্যক্তি এ কথার পরোয়া করে না, লোকে তাকে মন্দ কার্যে লিপ্ত দেখবে।

আবু সামাদ মালিক ইবনে দীনার সূত্রে বলেন, প্রজ্ঞাপূর্ণ কথার মধ্যে আমি এটা পেয়েছি, মানুষের খেয়াল-খুশি ও কুপ্রবৃত্তি সম্পর্কে সমাজের উপরতলার যে সকল লোক আলাপ-আলোচনা করে আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দেন। আমি তাতে আরো পেয়েছি, তুমি যা জানো তা আমল না করে, যা জানো না তা জানার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। এটি তো সে ব্যক্তির মতো, যে কাঠ সংগ্রহ করে বোঝা বাঁধে। তারপর তা মাথায় তুলে নিতে চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। তারপর গিয়ে আরো কাঠ সংগ্রহ করে।

আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ আবু সাঈদ রহ. সূত্রে বলেন, হযরত লোকমান তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন : হে বৎস! পরহেযগার ব্যক্তিরাই যেন তোমার খাদ্য খায় এবং তোমার কাজকর্মে বিজ্ঞজনদের পরামর্শ নিও। এ বিষয়ে ইমাম আহমদ রহ. যা বর্ণনা করেছেন, এগুলো হচ্ছে তার সারসংক্ষেপ। আল্লাহই ভালো জানেন।

ইবনে আবি হাতিম কাতাদা রহ. এর সূত্রে বলেন, আল্লাহ তাআলা লোকমান হাকীমকে নবুয়ত ও হেকমতের যে কোনো একটি বেছে নেওয়ার ইখতিয়ার দিয়েছিলেন। তিনি নবুয়তের পরিবর্তে হেকমত গ্রহণ করেন। তারপর জিবরাঈল আ. তাঁর নিকট এলেন। তিনি তখন নিদ্রামগ্ন। জিবরাঈল আ. তাঁর নিকট হেকমতের বারি বর্ষণ করেন। এরপর থেকে তিনি হেকমতপূর্ণ কথা বলতে শুরু করেন।

সাদ বলেন, আমি কাতাদা রহ.-কে বলতে শুনেছি, লোকমানকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনি নবুয়ত না নিয়ে হেকমত নিলেন কেন? আপনাকে তো এ দুটোতেও আপনার প্রতিপালক ইখতিয়ার দিয়েছিলেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমাকে যদি বাধ্যতামূলকভাবে নবুয়ত দেওয়া হত, তা হলে আশা করি, আমি ওই দায়িত্ব পালনে

সাফল্য লাভ করতাম। কিন্তু আমাকে যখন যে কোনো একটি বেছে নেওয়ার ইখতিয়ার দেওয়া হল, তখন আমি নবুয়তের গুরুদায়িত্ব পালনে অক্ষম হয়ে যাব বলে আশঙ্কা করলাম। তাই হেকমতই আমার নিকট প্রিয়তর মনে হল।

এ বর্ণনাটি সংশয়মুক্ত নয়। কাতাদা রহ. থেকে সাঈদ ইবনে কাছীরের বর্ণনা সম্পর্কে হাদিসবেত্তাগণের বিরূপ সমালোচনা রয়েছে। উপরন্তু সাঈদ ইবনে আবি আরূবা কাতাদা রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন, আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন : হেকমত অর্থ, প্রজ্ঞা ও ইসলাম। তিনি নবী ছিলেন না, তাঁর প্রতি ওহি অবতীর্ণ হয় নি। পূর্ববর্তী কালের ওলামায়ে কেরামও স্পষ্টভাবে তা বলেছেন। তাঁদের মধ্যে মুজাহিদ। আর সাঈদ ইবনে মুসায়্যাব ও ইবনে আব্বাস রাযি. প্রমুখ প্রথম যুগের আলেমগণ দৃঢ়ভাবে এ মত পোষণ করতেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

হেকমতপূর্ণ বাণী

আরবদেশে তৎকালে লোকমানের হেকমতের যথেষ্ট চর্চা ছিল। তারা অধিকাংশ মজলিসে লোকমানের জ্ঞানগর্ভ উক্তিসমূহ উদ্ধৃত করে থাকত। তাবেয়িন, সাহাবায়ে কেরাম, এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতেও এ সম্বন্ধীয় কতিপয় জ্ঞানবাণী নকল করা হয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে প্রদত্ত হল :

১. হেকমত ও বুদ্ধিমত্তা দরিদ্রকে রাজা করে দেয়।

২. কোনো মজলিসে প্রবেশ করলে প্রথমে সালাম করবে। এরপর একপার্শ্বে বসে পড়বে। মজলিসের লোকদের কথা না শুনা পর্যন্ত নিজের কথা আরম্ভ করবে না। যদি তারা আল্লাহ তাআলার যিকিরে মশগুল থাকে, তবে তুমিও তাতে অংশগ্রহণ করবে। আর যদি তারা বেহুদা কাজে মশগুল থাকে, তবে সেখান থেকে পৃথক হয়ে অন্য কোনো ভালো মজলিসে চলে যাবে।

৩. আল্লাহ তাআলা যদি কাউকেও আমানতদার বানান, তবে তার ওপর সেই আমানতের হেফাযত করা ফরয।

৪. হে বৎস! আল্লাহ তাআলাকে ভয় কর। রিয়াকারীর সাথে (লোকদেখানোভাবে) আল্লাহ তাআলার ভয় প্রকাশ করো না– যাতে লোকে তোমার সম্মান করবে, অথচ তোমার অন্তর প্রকৃতপক্ষে গুনাহগার।

৫. হে বৎস! মূর্খের সাথে বন্ধুত্ব করো না, যাতে সে মনে করবে, তুমি তার মূর্খতাসুলব আচরণ পছন্দ কর। জ্ঞানী ব্যক্তির গোসসা ও অসন্তোষের প্রতি বেপরোয়া ভাব প্রকাশ করো না, পাছে না তুমি তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়।

৬. জ্ঞানী লোকদের মুখে খোদাপ্রদত্ত শক্তি থাকে। কোনো বিষয় আল্লাহ তাআলা যেরূপ করতে ইচ্ছা করেন, তাঁরা তদ্রুপই বলে থাকেন।

৭. হে বৎস! নীরবতা অবলম্বনে কখনো অনুতপ্ত এবং লজ্জিত হতে হয় না। কথা বলা যদি রৌপ্য হয় তবে নীরবতা অবলম্বন স্বর্ণ স্বরূপ।

৮. হে বৎস! সর্বদা মন্দ কাজ হতে দূরে থাক! তা হলে মন্দ কাজও তোমার থেকে দূরে থাকবে। কেননা মন্দ হতে মন্দ উৎপন্ন হয়ে থাকে।

৯. হে বৎস! ক্রোধ ও গোসসা হতে আত্মরক্ষা কর। কেননা অতিরিক্ত গোসসা জ্ঞানী লোকের অন্তরকে মুর্দা করে ফেলে।

১০. হে বৎস! মধুরভাষী হও। সদা হাস্যময় চেহারা ধারণ কর। তবে তুমি মানুষের দৃষ্টিতে সেই ব্যক্তির চেয়েও অধিক প্রিয় হয়ে যাবে, যে ব্যক্তি তাদেরকে সর্বক্ষণ দান-দক্ষিণা প্রদান করে থাকে।

১১. নম্রস্বভাব বুদ্ধিমত্তার মূল।

১২. যা বপন করবে তাই কাটবে।

১৩. নিজের ও নিজের পিতার বন্ধুকে ভালোবাসবে।

১৪. কেউ লোকমানকে জিজ্ঞাসা করল, সর্বাপেক্ষা অধিক ছবরকারী কোন ব্যক্তি? তিনি উত্তর করলেন, যার ছবর করার পিছনে কষ্টপ্রদান করা উদ্দেশ্য না হয়। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করল, সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম কে? তিনি উত্তর করলেন, যে ব্যক্তি অন্যান্য আলেমদের ইলম দ্বারা নিজের ইলম বাড়াতে থাকে। সে পুনরায় প্রশ্ন করল, সর্বাপেক্ষা উত্তম মানুষ কে? তিনি বললেন "অভাবমুক্ত লোক"। প্রশ্নকারী পুনরায় বলল, 'অভাবমুক্ত' বলতে কি ধনবান লোক উদ্দেশ্য? উত্তরে তিনি বললেন : না, বরং অভাবমুক্ত সেই ব্যক্তি, যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে মঙ্গল ও সৎগুণ তালাশ করলে তা বিদ্যমান দেখতে পায়। অন্যথায় সে নিজেকে অপর হতে অমুখাপেক্ষী রাখে।

১৫. কেউ জিজ্ঞাসা করল, নিকৃষ্টতম মানুষ কে? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি এ পরোয়া করে না, লোকে তাকে মন্দকার্য করতে দেখলে মন্দ বলবে।

১৬. হে বৎস! তোমার দস্তরখানে যদি সর্বদা নেককার লোকদের সমাবেশ থাকে তো উত্তম। আর পরামর্শ শুধু ওলামায়ে হক থেকেই গ্রহণ কর!

(তাফসিরে ইবনে কাসীর : ২/১২৫)

হযরত লোকমানের নসিহত

১. মানুষ যদি নিষ্পাপ নবী ও পয়গম্বরও না হয়, কিন্তু জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার সম্মানে সম্মানিত হয়, তবুও আল্লাহ তাআলার নিকট তার মর্যাদা অতি মহান হয়ে থাকে। এ কারণেই হযরত লোকমান এত সম্মান লাভ করেছেন, আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদে তাঁর প্রশংসা ও সৎগুণাবলীর বর্ণনা করেছেন এবং উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য তাঁর এমন কতকগুলি নসিহত ও অসিয়ত বর্ণনা করেছেন, যা তিনি তাঁর পুত্রকে করেছেন। এমনকি কুরআন শরিফের একটি সূরা তাঁর নামে নামকরণ করা হয়েছে।

২. আল্লাহর সঙ্গে শরীক সাব্যস্ত করা সমস্ত নেককাজকে বিলীন করে দিয়ে মানুষকে খালি হাতে আল্লাহ পাকের সম্মুখে নিয়ে যায়। সুতরাং সর্বদা তা হতে দূরে থাকা

অবশ্য কর্তব্য। প্রকাশ্য শিরকের মতো গুপ্ত শিরকও মানুষের আমলসমূহ এমনভাবে ভক্ষণ করে, যেমনি আগুন লাকড়িকে ভক্ষণ করে। আর গুপ্ত শিরকসমূহের মধ্যে রিয়াকারী অর্থাৎ লোকদেখানো কার্য এবং খ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৩. পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার এবং তাদের শ্রদ্ধা করা ইসলামে এত গুরুত্বপূর্ণ, কুরআন মাজিদ তাঁদেরকে ব্যবহারিক অর্থে রব আখ্যা দিয়েছে। এমনকি তাদের খেদমত এবং তাঁদের সম্মুখে মস্তক অবনত রাখাকে পিতা-মাতার ইসলাম এবং কুফর উভয় অবস্থাতে জরুরি সাব্যস্ত করেছে। আর এ গুরুত্বের প্রতি লক্ষ করেই স্থানে স্থানে আল্লাহ তাআলা নিজের একত্ব ঘোষণার সাথে সাথে পিতা-মাতার হকসমূহের কথাও উল্লেখ করেছেন এবং পিতা-মাতার হকসমূহকে সমস্ত হকের উপর অগ্রগণ্য রেখেছেন। যেমন সূরা বনি ইসরাঈলে বলা হয়েছে :

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (٢٣) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (٢٤) رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا

"আর তোমার রব আদেশ করেছেন, তাঁকে ব্যতীত আর কারো ইবাদত করবে না। পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো, যদি তোমাদের সম্মুখে তাঁদের কোনো একজন কিংবা উভয়ে বার্ধক্যে উপনীত হন, তবে তাঁদের প্রতি উঃ শব্দটিও প্রয়োগ করো না এবং তাঁদেরকে ধমক দিয়ে কথা বলো না। আদবের সাথে তাদের সাথে কথা বলো, তাদের সম্মুখে বিনয় ও নম্রতার সাথে নিজের কাঁধ অবনত করে দাও বিনীতভাবে এবং দোয়া কর– হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া করুন, যেভাবে তারা আমাকে শৈশবে (স্নেহ ও দয়ার সাথে) প্রতিপালন করেছেন। তোমাদের রব খুব অবহিত আছেন, যা কিছু তোমাদের মনের মধ্যে রয়েছে। যদি তোমরা নেককার হও, তবে তিনি (তাঁর প্রতি) রুজুকারীদেরকে ক্ষমা করে দেন।" (সূরা বনি ইসরাঈল : রুকূ : ৩)

এ ছাড়া পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে অসংখ্য হাদিস বিদ্যমান রয়েছে হাদিসের কিতাবসমূহে। যেমন : নাসায়ির এক হাদীসে আছে : اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَامِ الْاُمِّ –"বেহেশত মায়ের পদতলে"।

আসহাবে কাহাফ

وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا (٢١) سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا (٢٢) وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا (٢٤) وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا (٢٥) قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا

তুমি কি মনে কর, গুহা ও রাকীম (পর্বত বা ফলক)-এর অধিবাসীরা আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর? যখন যুবকরা গুহায় আশ্রয় নিল, তখন তারা বলেছিল : হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি নিজ থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান করুন এবং আমাদের জন্যে আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করুন। এরপর আমি তাদেরকে গুহায় কয়েক বছর ঘুমন্ত অবস্থায় রাখলাম। পরে আমি ওদেরকে জাগ্রত করলাম জানার জন্যে, দু দলের মধ্যে কোনটি ওদের অবস্থান কাল সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে? আমি তোমার নিকট ওদের বৃত্তান্ত সঠিকভাবে বর্ণনা করছি। ওরা ছিল কয়েকজন যুবক। ওরা ওদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং আমি ওদের সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেছিলাম আমি ওদের চিত্ত দৃঢ় করে দিলাম। ওরা যখন উঠে দাঁড়াল, তখন বলল, আমাদের প্রতিপালক আকাশরাজি ও পৃথিবীর প্রতিপালক। আমরা কখনই তাঁর পরিবর্তে অন্য কোনো ইলাহকে আহ্বান করব না। যদি করে বসি, তবে তা হবে অত্যন্ত গর্হিত কাজ। আমাদেরই এ স্বজাতিরা তাঁর পরিবর্তে অনেক ইলাহ গ্রহণ করেছে। তারা এ সকল ইলাহ সম্বন্ধে স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করে না কেন? যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে তার চেয়ে অধিক জালেম আর কে?

তোমরা যখন বিচ্ছিন্ন হলে ওদের থেকে এবং ওরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের উপাসনা করে তাদের থেকে তখন তোমরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য তাঁর দয়া বিস্তার করবেন এবং তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের কাজকর্মকে ফলপ্রসূ করার ব্যবস্থা করবেন।

তুমি দেখতে পেতে– ওরা গুহার প্রশস্ত চত্বরে অবস্থিত, সূর্য উদয়কাল ওদের গুহার দক্ষিণ পার্শ্বে হেলে যায় এবং অস্তকালে ওদেরকে অতিক্রম করে বামপার্শ্ব দিয়ে। এ সমস্ত আল্লাহর নিদর্শন আল্লাহ যাকে সৎপথে পরিচালিত করেন, সে সৎপথ প্রাপ্ত এবং

তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি কখনই তার কোনো পথ প্রদর্শনকারী অভিভাবক পাবে না। তুমি মনে করতে ওরা জাগ্রত, কিন্তু ওরা ছিল নিদ্রিত। আমি তাদেরকে পার্শ্ব পরিবর্তন করাতাম ডান দিকে ও বামে এবং ওদের কুকুর ছিল সম্মুখের পা দুটো গুহাদ্বারে প্রসারিত করে। তাকিয়ে ওদেরকে দেখলে তুমি পিছনে ফিরে পলায়ন করতে ও ওদের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়তে। এবং এভাবেই আমি ওদেরকে জাগ্রত করলাম, যাতে ওরা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করে। ওদের একজন বলল, তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ? কেউ কেউ বলল, একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ। কেউ কেউ বলল, তোমরা কতদিন অবস্থান করেছ, তা তোমাদের প্রতিপালকই ভালো জানেন।

এখন তোমাদের একজনকে তোমাদের এ মুদ্রাসহ নগরে প্রেরণ কর! সে যেন দেখে কোন খাদ্য উত্তম এবং তা হতে যেন কিছু তোমাদের জন্যে নিয়ে আসে। সে যেন বিচক্ষণতার সাথে কাজ করে এবং কিছুতেই যেন তোমাদের সম্বন্ধে কাউকেই কিছু জানতে না দেয়। ওরা যদি তোমাদের বিষয় জানতে পারে, তবে তোমাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবে অথবা তোমাদেরকে ওদের ধর্মে ফিরিয়ে নিবে এবং সে ক্ষেত্রে তোমরা কখনই সাফল্য লাভ করবে না। এবং এভাবে আমি মানুষকে তাদের বিষয় জানিয়ে দিলাম, যাতে তারা জ্ঞাত হয়, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য এবং কিয়ামতের কোনো সন্দেহ নেই।

যখন তারা তাদের কর্তব্য বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করছিল, তখন অনেকে বলল, ওদের উপর সৌধ নির্মাণ কর। ওদের প্রতিপালক ওদের বিষয়ে ভালো জানেন। তাদের কর্তব্য বিষয়ে যাদের মত প্রবল হল, তারা বলল– আমরা তো নিশ্চয়ই ওদের পার্শ্বে মসজিদ নির্মাণ করব। কেউ কেউ বলবে : ওরা ছিল তিনজন, ওদের চতুর্থটি ছিল ওদের কুকুর। কেউ কেউ বলবে : ওরা ছিল পাঁচজন, ওদের ষষ্ঠটি ছিল ওদের কুকুর। অজানা বিষয়ে অনুমানের উপর নির্ভর করে। আবার কেউ কেউ বলবে : ওরা ছিল সাত জন, ওদের অষ্টমটি ছিল ওদের কুকুর। বল, আমার প্রতিপালকই ওদের সংখ্যা ভালো জানেন; ওদের সংখ্যা অল্প কজনই জানে। সাধারণ আলোচনা ব্যতীত আপনি ওদের বিষয়ে বিতর্ক করবে না এবং ওদের কাউকে ওদের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে না। কখনই তুমি কোনো বিষয়ে বলবে না, 'আমি এটি আগামীকাল করব। আল্লাহ ইচ্ছা করলে' কথাটি না বলে। যদি ভুলে যাও, তবে তোমার প্রতিপালককে স্মরণ করবে এবং বলবে, সম্ভবত আমার প্রতিপালক আমাকে ওটি অপেক্ষা সত্যের নিকটতর পথনির্দেশ করবেন। ওরা ওদের গুহায় ছিল তিন শ' বছর আরো নয় বছর। তুমি বল, তারা কতকাল ছিল তা আল্লাহই ভালো জানেন, আকাশরাজি ও পৃথিবীর অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান তাঁরই। তিনি কত সুন্দর দ্রষ্টা ও শ্রোতা! তিনি ব্যতীত ওদের অন্য কোনো অভিভাবক নেই। তিনি কাউকে তাঁর কর্তৃত্বে শরিক করেন না। (সূরা কাহাফ : ৯-২৬)

আসহাবে কাহাফ ও যুলকারনাইন সম্পর্কে আয়াত নাযিল হওয়ার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকসহ অন্যান্য সীরাত রচয়িতাগণ তাঁদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন,

কুরায়েশরা মদিনার ইহুদিদের নিকট একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল, ইহুদিরা যেন তাদেরকে কিছু প্রশ্ন শিখিয়ে দেয়। এরপর কুরাইশরা সেগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করবে এবং এর দ্বারা তারা তাঁকে পরীক্ষা করবে। ইহুদিরা বলেছিল, তোমরা তাঁকে এমন এক সম্প্রদায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে, যারা অতীতেই বিলীন হয়ে গেছে। যার ফলে তাদের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে জানা যায় না। আর প্রশ্ন করবে পৃথিবী প্রদক্ষিণকারী একজন লোক সম্পর্কে এবং রূহ সম্পর্কে।

এ প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তাআলা নাযিল করলেন : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ –তারা আপনাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে! অন্যত্র আছে, وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ –তারা আপনাকে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে! আর এখানে বললেন :

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا

তুমি কি মনে কর, গুহা ও রাকীমের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর?

অর্থাৎ, আমি আপনাকে যেসব অভূতপূর্ব আশ্চর্যজনক বিষয়াদি, উজ্জ্বল নিদর্শনাদি ও বিস্ময়কর ঘটনাবলী সম্পর্কে অবহিত করেছি, সে সবের তুলনায় গুহা ও রাকীমের অধিবাসীদের সংবাদ ও ঘটনা মোটেই আশ্চর্যজনক নয়।

'কাহফ' অর্থ, পর্বত গুহা। শুআইব যুবাঈ বলেন, গুহাটির নাম হায়যুম। রাকীম শব্দ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, রাকীম দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে, তা আমার জানা নেই। কেউ কেউ বলেন : রাকীম অর্থ লিখিত ফলক, যাতে সেখানে আশ্রয় গ্রহণকারীদের নাম এবং তাদের ঘটনাবলী লিখিত রয়েছে। পরবর্তী যুগের লোকজন এটি লিখে রেখেছিল। ইবনে জারীর ও অন্যান্যগণ এ অভিমত করেন। কেউ কেউ বলেন : রাকীম হল সেই পর্বতের নাম, যে পর্বতের গুহায় তারা আশ্রয় নিয়েছিলেন।

ইবনে আব্বাস রাযি. ও শুআইব যুবাঈ বলেন, ওই পর্বতের নাম বিনাজলুস। কারো কারো মতে রাকীম হচ্ছে ওই গুহার পাশে অবস্থিত একটি উপত্যকার নাম। অপর কারো কারো মতে এটি সে এলাকার একটি জনপদের নাম।

শুআইব যুবাঈ বলেন, তাদের কুকুরের নাম হামরান। কোনো কোনো তাফসিরকারক বলেছেন, তাঁরা ছিলেন হযরত ঈসা আ.-এর পরবর্তী যুগের লোক এবং তাঁরা খৃস্টান ছিলেন। কিন্তু তাঁদের সম্পর্কে ইহুদিদের গুরুত্ব আরোপ এবং তাদের সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহের আগ্রহ দ্বারা প্রমাণিত হয়, তারা হযরত ঈসা আ.-এর পূর্ববর্তী যুগের লোক। আয়াতের বাচনভঙ্গি থেকে প্রতীয়মান হয়, তাদের সম্প্রদায়ের লোকজন ছিল মুশরিক। তারা মূর্তিপূজা করত। বহু তাফসিরকারক ও ইতিহাসবিদ অভিমত প্রকাশ করেছেন, তারা বাদশা দাকরানূমের সময়ের অভিজাত বংশীয় লোক ছিলেন। আবার কারো কারো মতে তারা ছিলেন রাজপুত্র।

ঘটনাক্রমে তারা সম্প্রদায়ের উৎসবের দিনে একত্র হয়। তাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা সেখানে যে মূর্তিদেরকে সিজদা করছে এবং প্রতিমাগুলোকে সম্মান প্রদর্শন করছে, তা তারা প্রত্যক্ষ করে। তখন তারা গভীর মনোযোগের সাথে তা পর্যালোচনা করেন। আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরের উদাসীনতার পর্দা ছিন্ন করে দেন এবং তাদের মনে সত্য ও হেদায়েতের উন্মেষ ঘটান। ফলে তারা উপলব্ধি করেন, তাদের সম্প্রদায়ের এসব কাজকর্ম সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। যুবকরা তাদের ওই ধর্ম পরিত্যাগ করেন এবং এক আল্লাহর ইবাদতে আত্মনিয়োগ করেন।

কেউ কেউ বলেন, যুবকদের প্রত্যেকের মনে আল্লাহ তাআলা তাওহিদ ও হেদায়েতের অনুভূতি সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। তারপর তারা সকলেই লোকজনের সংসর্গ ত্যাগ করে এক নির্জন এলাকায় এসে উপস্থিত হন। বুখারীতে এ বিষয়ে একটি বিশুদ্ধ হাদিস রয়েছে।

اَلْاَرْوَاحُ جُنُوْدٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ

রূহগুলো সুবিন্যস্ত বাহিনী স্বরূপ। তাদের মধ্যে যেগুলো পূর্ব-পরিচিত, সেগুলো বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। আর যারা পরস্পর অপরিচিত তাদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়। তখন তারা একে অপরের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থান বর্ণনা করে। তখন জানা যায়, তারা সবাই নিজ নিজ গোত্র ছেড়ে এসেছে এবং ওদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে আপন দীন রক্ষার্থে পালিয়ে এসেছে। ফিতনা, বিশৃঙ্খলা ও পাপাচারের বিস্তৃতিকালে এভাবে সমাজ ত্যাগ করা শরিয়তসম্মত।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا (١٥) وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ

যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে তার চেয়ে অধিক জালিম আর কে? তোমরা যখন তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হলে এবং ওরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করে তাদের থেকে অর্থাৎ দীনের প্রশ্নে তোমরা যখন তাদের থেকে পৃথক হয়ে গেলে এবং তারা আল্লাহ ব্যতীত যেগুলোর উপাসনা করে, সেগুলোকে ত্যাগ করল। কারণ, তারা আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করত। যেমন হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ বলেছিলেন :

إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ (٢٦) إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ

তোমরা যেগুলোর পূজা কর, তাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক আছে শুধু তাঁরই সাথে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আমাকে সৎপথ দেখাবেন। (সূরা যুখরুফ : ২৬-২৭)

এ যুবকরাও অনুরূপ বলেছিলেন। আয়াতের ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেন, দীনের প্রশ্নে তোমরা যেমন তোমাদের সম্প্রদায় থেকে পৃথক হয়ে গেছ, দৈহিকভাবেও তোমরা তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাও, যাতে ওদের অনিষ্ট থেকে তোমরা নিরাপদ থাকতে পার।

فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا

তখন তোমরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্যে তাঁর দয়া বিস্তার করবেন এবং তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের কাজ কর্মকে ফলপ্রসূ করার ব্যবস্থা করবেন অর্থাৎ তাঁর রহমতের পর্দা দ্বারা তোমাদেরকে ঢেকে দিবেন। তোমরা তার নিরাপত্তা ও আশ্রয়ে থাকবে এবং তিনি তোমাদের পরিণাম কল্যাণময় করে দিবেন। যেমন হাদিস শরীফে এসেছে :

اَللّٰهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُوْرِ كُلِّهَا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَمِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ.

হে আল্লাহ! সকল কর্মে আমাদেরকে কল্যাণময় পরিণতি দান করুন এবং দুনিয়ার লাঞ্ছনা ও আখেরাতের আযাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন।

এরপর তাঁরা যে গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন সে সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, গুহাটি উত্তরমুখী ছিল। তার পশ্চিম দিকে ঢালু ছিল। কিবলার দিকে ঢালু উত্তরমুখী স্থান অধিক কল্যাণকর স্থানরূপে বিবেচিত হয়ে থাকে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ

"তুমি দেখতে পেতে, ওরা গুহার চত্বরে অবস্থিত। সূর্য উদয়কালে ওদের গুহার ডান দিকে হেলে যায় এবং অস্তকালে ওদেরকে অতিক্রম করে বাম পার্শ্ব দিয়ে" অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে সূর্য উদিত হওয়ার সময় তাদের গুহার পশ্চিম দিকে আলো ছড়ায়, তারপর সূর্য যতই উপরে উঠতে থাকে, ক্রমান্বয়ে ততই ওই আলো গুহা থেকে বেরিয়ে যেতে থাকে। এটি হল সূর্যের ডান দিক দিয়ে অতিক্রম। এরপর সূর্য মধ্য আকাশে উত্থিত হয় এবং গুহা থেকে ওই আলো বেরিয়ে যায়। তারপর যখন অস্ত যেতে শুরু করে, তখন পূর্ব পাশ দিয়ে অল্প অল্প করে আলো প্রবেশ করতে থাকে। অবশেষে সূর্য অস্ত যায়। এ ধরনের স্থানে এরূপই দেখা যায়। তাদের গুহায় মাঝে মধ্যে সূর্যের আলো প্রবেশের এ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল, যাতে ওই গুহার আবহাওয়া দূষিত না হয়।

وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ

'ওরা গুহার প্রশস্ত চত্বরে অবস্থিত'। এ সব আল্লাহর নিদর্শন। তাদের পানাহার না করে, খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ না করে শত শত বছর এ অবস্থায় বিদ্যমান থাকাটা আল্লাহ তাআলার অন্যতম নিদর্শন এবং তাঁর মহাশক্তির প্রমাণ স্বরূপ।

مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا (١٧) وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ

"আল্লাহ যাকে সৎপথে পরিচালিত করেন, সে সৎপথপ্রাপ্ত এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি কখনই তার কোনো পথ প্রদর্শনকারী অভিভাবক পাবে না। তুমি মনে করতে তারা ঘুমন্ত অথচ তারা জাগ্রত।" এর ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেন : তাদের চোখ খোলা ছিল। যাতে সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত বন্ধ থাকার ফলে চক্ষু নষ্ট হয়ে না যায়।

وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ

"আমি ওদেরকে পার্শ্ব পরিবর্তন করাতাম ডানে, বামে"-এর ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেন, বছরে একবার করে তাদের পার্শ্ব পরিবর্তন করানো হত। এ পাশ থেকে ও পাশে ফেরানো হত। হতে পারে বছরে একাধিকবারও তা ঘটত। আল্লাহই সম্যক অবগত।

وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ

"তাদের কুকুর ছিল সম্মুখের পা দুটো গুহার মুখের দিকে প্রসারিত করে।" শুআইব জুবাঈ বলেন, তাদের কুকুরের নাম ছিল হামরান। অন্য এক মুফাসসির বলেন : যুবকগণ যখন নিজ নিজ গোত্র থেকে একাকী বেরিয়ে এসেছিলেন, তখন যে কুকুরটি তাদের সাথে এসেছিল সেটি শেষ পর্যন্ত তাদের সাথে থেকে যায়। এটি গুহার মধ্যে প্রবেশ করে নি বরং দুহাত গুহামুখে রেখে গুহার প্রবেশ পথে বসেছিল। এটি ওই কুকুরের অনুপম শিষ্টাচার এবং যুবকদের প্রতি সম্ভ্রমবোধের নিদর্শন। কারণ, সাধারণত যে ঘরে কুকুর থাকে সে ঘরে রহমতের ফিরিশতা প্রবেশ করেন না। সাহচর্য ও আনুগত্যের স্বভাবতই একটা প্রভাব থাকে। তাই যুবকদের অনুসরণ করতে গিয়ে কুকুরটিও তাদের সাথে অমর হয়ে রয়। কারণ, যে যাকে ভালবাসে, সে তার সৌভাগ্যের অংশীদার হয়। একটি কুকুরের ব্যাপারে যখন এমন হল, তখন সম্মানের পাত্র কোনো পুণ্যবানের অনুসরণকারীর ক্ষেত্রে কী হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়।

বহু ধর্মীয় বক্তা ও তাফসিরকারক উক্ত কুকুর সম্পর্কে অনেক লম্বা-চওড়া কাহিনীর উল্লেখ করেছেন। কুকুরটির নাম ও রং সম্পর্কে তারা বিভিন্ন কথা বলেছেন। এগুলোর অধিকাংশই ইসরাঈলী বর্ণনা থেকে সংগৃহিত এবং এর অধিকাংশ নির্জলা মিথ্যা। এতে কোনো ফায়দাও নেই।

গুহাটি কোথায় অবস্থিত, এ নিয়ে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তাঁদের অনেকে বলেন, এটি আয়লা অঞ্চলে অবস্থিত। কেউ বলেন, এটির অবস্থান নিনোভা এলাকায়। কারো মতে কলকা অঞ্চলে আবার কারো মতে রোমকদের এলাকায়। শেষ অভিমতটিই অধিক যুক্তিসঙ্গত।

আল্লাহ তাআলা তাদের ঘটনার অধিক কল্যাণকর অংশটি এমন সাবলীল প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করলেন, যেন শ্রবণকারী তা প্রত্যক্ষ করছে এবং নিজের চোখে তাদের

গুহার অবস্থা, গুহার মধ্যে তাদের অবস্থান, ওদের পার্শ্ব পরিবর্তন এবং তাদের গুহা মুখে প্রসারিত করে উপবিষ্ট কুকুর স্বচক্ষে দেখছে। এরপর আল্লাহ্ তাআলা বলেন :

لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا

"তুমি যদি ওদেরকে তাকিয়ে দেখতে, তবে পিছনে ফিরে পালাতে এবং ওদের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়তে"। অর্থাৎ তারা যে পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে এবং যে গুরুগম্ভীর ও ভীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, তার জন্য। সম্ভবত এ সম্বোধনটি সকল মানুষের জন্যে, শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে নয়। আল্লাহ তাআলার বাণী

فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ (٧)

"সুতরাং এর পরে কিসে তোমাকে কর্মফল সম্বন্ধে অবিশ্বাসী করে?" এ আয়াতে 'তোমাকে' বলতে সাধারণভাবে অবিশ্বাসী মানুষদেরকে বুঝানো হয়েছে; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নয়। কারণ, মানুষ সাধারণত ভীতিকর দৃশ্য দেখলে পালিয়ে যায়। এ জন্যেই আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন :

لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا

এতে বুঝা যায়, শোনা আর দেখা এক কথা নয়। যেমনটি হাদীসেও এর সমর্থন রয়েছে। কারণ, আলোচ্য ঘটনায় গুহাবাসীর ভীতিকর সংবাদ শুনে কেউ পালায় নি বা ভীতও হয় নি। তারপর আল্লাহ্ তাআলা বলেন, তিনি তাদেরকে জাগ্রত করলেন তাদের ৩০৯ বছর নিদ্রামগ্ন থাকার পর। জাগ্রত হওয়ার পর তাদের একে অন্যকে বলল : তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ? কেউ কেউ বলল, একদিন অথবা এক দিনের কিছু অংশ। অপর কেউ বলল : তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ, তা তোমাদের প্রতিপালকই ভালো জানেন। যা হোক, তোমাদের একজনকে তোমাদের এ মুদ্রাসহ নগরে প্রেরণ কর অর্থাৎ তাদের সাথে থাকা রৌপ্য মুদ্রার দিকে ইঙ্গিত করে, তা নিয়ে নগরে যেতে বলেছিল।

কথিত আছে, ওই নগরীর নাম ছিল দাফসূস। "সে গিয়ে দেখুক কোন খাদ্য উত্তম" অর্থাৎ কোনটি উৎকৃষ্ট মানের। "এরপর তা থেকে যেন কিছু খাদ্য নিয়ে আসে তোমাদের জন্যে"। অর্থাৎ যা তোমরা খেতে পারবে। এটি ছিল তাদের সংযম ও নির্লোভ মনোভাবের পরিচায়ক। সে যেন বিচক্ষণতার সাথে কাজ করে নগরে প্রবেশ করার সময়।

"কিছুতেই যেন তোমাদের সম্বন্ধে কাউকে কিছু টের পেতে না দেয়। ওরা যদি তোমাদের বিষয় জানতে পারে তবে তোমাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবে অথবা তোমাদেরকে ওদের ধর্মে ফিরিয়ে নিবে। সেক্ষেত্রে তোমরা কখনই সাফল্য লাভ করবে না।"

অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদেরকে ওদের বাতিল ধর্ম থেকে উদ্ধার করার পর তোমরা যদি পুনরায় ওদের মধ্যে ফিরে যাও, তবে আর তোমাদের সাফল্য নেই। তারা এ জাতীয় কথাবার্তা এ জন্য বলেছিল, তারা মনে করেছিল তারা একদিন, একদিনের কতকাংশ কিংবা তার চাইতে কিঞ্চিতাধিক সময় নিদ্রামগ্ন ছিল। তারা যে ৩০০ বছরের অধিককাল ধরে নিদ্রামগ্ন ছিল এবং ইতোমধ্যে যে রাষ্ট্রক্ষমতার বহুবার হাত বদল হয়েছে, নগর ও নগরবাসীর পরিবর্তন হয়েছে, তাদের প্রজন্মের লোকদেরও মৃত্যু হয়েছে, অন্য প্রজন্ম এসেছে এবং তারাও চলে গিয়েছে, এরপর অন্য আরেক প্রজন্মের আবির্ভাব হয়েছে; তার কিছুই তারা তখনও আঁচ করে উঠতে পারে নি। এ জন্যে তাদের একজন অর্থাৎ তীযূসীস যখন নিজের পরিচয় গোপন রাখার উদ্দেশ্যে ছদ্মবেশে গুহা থেকে বের হন এবং নগরে প্রবেশ করেন, তখন তা তাঁর নিকট অপরিচিত মনে হয়। নগরবাসীরাও তাকে দেখে অপরিচিত বোধ করে। তার আকার-আকৃতি কথাবার্তা এবং তার মুদ্রা সবই নগরবাসীর নিকট অপরিচিত ও আশ্চর্যজনক মনে হয়।

কথিত আছে, তারা তাকে তাদের রাজার নিকট নিয়ে যায় এবং তারা তাকে গুপ্তচর বলে সন্দেহ করে। কেউ কেউ তাঁকে শক্তিশালী শত্রু মনে করে তার ক্ষতিকর আক্রমণেরও আশঙ্কা করেছে। কতক ঐতিহাসিকের মতে তিনি তখন তাদের নিকট থেকে পালিয়ে যান। আর কতক ঐতিহাসিকের মতে তিনি নগরবাসীকে তাঁর নিজের ও সাথীদের অবস্থার বিবরণ দেন। এরপর তারা তার সাথে তার অবস্থান ক্ষেত্রের দিকে রওনা হয়, যাতে তিনি তাদেরকে নিজেদের অবস্থানস্থল দেখিয়ে দেন। নগরবাসী গুহার নিকট এসে পৌঁছার পর তীযূসীস সর্বাগ্রে তার সাথীদের নিকট প্রবেশ করেন। তিনি নিজেদের প্রকৃত অবস্থা এবং নিদ্রার মেয়াদ সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করেন। তখন তারা উপলব্ধি করে, মূলত এটি মহান আল্লাহর নির্ধারিত একটি বিষয়। কথিত আছে, এরপর তাঁরা আবার নিদ্রামগ্ন হয়ে পড়েন। মতান্তরে এরপর তাঁদের ইনতেকাল হয়ে যায়।

ওই নগরবাসীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, তারা ওই গুহাটি খুঁজে পায়নি। গুহাবাসীদের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে অনবহিত রেখে দেন। কেউ কেউ বলেন, গুহাবাসীদের ব্যাপারে তাদের মনে ভীতির সৃষ্টি হওয়ার দরুণ গুহায় প্রবেশ করতে পারে নি। গুহাবাসীদের ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেওয়া যায়, সে বিষয়ে নগরবাসীদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। তাদের একদল বলল, "তাদের উপর সৌধ নির্মাণ করে দাও!" অর্থাৎ গুহামুখ বন্ধ করে দাও! যাতে তারা সেখান থেকে বের হতে না পারে কিংবা কেউ তাদেরকে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাদের নিকট যেতে না পারে। অপর দল বলল, "আমরা অবশ্যই ওদের উপর মসজিদ নির্মাণ করব" অর্থাৎ ইবাদতখানা তৈরি করব। আর এদের মতই প্রবল ছিল। এ সকল পূণ্যবান লোকদের পাশাপাশি থাকার কারণে তা বরকতময় হয়ে থাকবে।

পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে এরূপ মসজিদ নির্মাণের রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। আমাদের শরিয়তে এ বিষয়ে দিক নির্দেশনা হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ اتَّخَذُوا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

"আল্লাহ তাআলার লানত ইহুদি ও খৃস্টানদের ওপর। তারা তাদের নবীদের কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করেছে।"

ওরা যা করেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতদেরকে তা না করার জন্য সতর্ক করে দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি মানুষকে এভাবে তাদের বিষয় জানিয়ে দিলাম। যাতে তারা জ্ঞাত হয়, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য এবং কিয়ামতে কোনো সন্দেহ নেই।"

(সূরা হিজর : ২১)

বহু তাফসিরকারক বলেছেন, এর অর্থ হল যাতে লোকজন জানতে পারে, পুনরুত্থান সত্য এবং কিয়ামত অনুষ্ঠানে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা মানুষ যখন অবগত হবে, গুহাবাসীগণ তিনশ বছরেরও অধিককাল ধরে নিদ্রামগ্ন ছিল, তারপর কোনো প্রকারের বিকৃতি ছাড়া যে অবস্থায় ছিলেন ঠিক সে অবস্থায়ই জাগ্রত হয়ে উঠেছেন, তখন তারা উপলব্ধি করতে পারবে, মহান সত্তা তাদেরকে কোনো পরিবর্তন ছাড়া অক্ষুণ্ণ রাখার ক্ষমতা রাখেন। তিনি নিশ্চয়ই চূর্ণ-বিচূর্ণ অস্থি বিশিষ্ট মানবদেহকে মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত করার ক্ষমতা রাখেন। এটি এমন একটি বিষয়, যাতে ঈমানদারগণ কোনোই সন্দেহ পোষণ করে না।

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

"তাঁর ব্যাপার শুধু এই, তিনি যখন কোনো কিছুর ইচ্ছা করেন তিনি সেটিকে বলেন হও! ফলে তা হয়ে যায়।" (সূরা ইয়াসীন : ৮২)

অবশ্য আয়াতের আরেকটি ব্যাখ্যাও হতে পারে। অর্থাৎ 'যাতে তারা জানতে পারে' বলতে গুহাবাসীগণকে বুঝানো হয়েছে। কারণ, তাদের নিজেদের সম্পর্কে তাদের অবগত হওয়াটা তাদের সম্পর্কে অন্যের অবগত হওয়া অপেক্ষা অধিকতর প্রভাব বিস্তারকারী। আবার হতে পারে আয়াতে 'তারা জানতে পারে' বলতে সকলকেই বুঝানো হয়েছে। এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন :

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ

وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ

"কেউ বলবে, ওরা ছিল তিনজন; ওদের চতুর্থটি ছিল ওদের কুকুর এবং কেউ বলবে, ওরা ছিল পাঁচজন; ওদের ষষ্ঠটি ছিল ওদের কুকুর। অজানা বিষয়ে অনুমানের

উপর নির্ভর করে। আবার কেউ কেউ বলবে, ওরা ছিল সাতজন; ওদের অষ্টমটি ছিল ওদের কুকুর।" (সূরা কাহাফ : ২২)

তাদের সংখ্যা সম্পর্কে মানুষের তিনটি অভিমতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম দুটো অভিমত দুর্বল সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং তৃতীয়টিকে সত্য বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এতে বুঝা যায়, তৃতীয় অভিমতটিই যথার্থ। এ ছাড়া অন্য কোনো মত থাকলে তা-ও উল্লিখিত হত। এ তৃতীয় মতটি যথার্থ না হলে তাও দুর্বল বলে চিহ্নিত করা হত। তাই তৃতীয় মতটিই সঠিক। তবে এ জাতীয় বিষয়ে বিতর্কে যেহেতু কোনো উপকারিতা নেই, সেহেতু আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁর রাসূলকে করণীয় শিক্ষা দিয়েছেন, মানুষ যখন এ জাতীয় বিষয়ে মতভেদ করবে, তখন তিনি যেন বলেন, 'আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন।' এ জন্যেই আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন, "বল আমার প্রতিপালকই ওদের সংখ্যা ভালো জানেন। ওদের সংখ্যা অল্প কয়েকজনই জানে।" "সাধারণ আলোচনা ব্যতীত তুমি ওদের বিষয়ে বিতর্ক করবে না।" অর্থাৎ সহজ ও স্বাভাবিক আলোচনা করুন। এ জাতীয় বিষয়বস্তু নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হবেন না। আর তাদের সম্বন্ধে কোনো মানুষকে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। এ কারণে শুরুতে আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের সংখ্যা অস্পষ্ট রেখেছেন। আল্লাহ্‌ তাআলা বলেছেন "ওরা ছিল কয়েকজন যুবক; ওরা ওদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছিল।" তাদের সংখ্যা বর্ণনা যদি সমধিক গুরুত্বপূর্ণ হত, তবে দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সকল বিষয়ে অবগত মহান আল্লাহ্‌ তাআলা সূরার প্রারম্ভেই ওদের সংখ্যার বিবরণ দিতেন।

সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন, "কখনও তুমি কোনো বিষয়ে বলবে না, আমি এটি আগামীকাল করব 'আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করলে' কথাটি না বলে।" এটি একটি উচ্চস্তরের শিষ্টাচার। এটা আল্লাহ্‌ তাআলা শিক্ষা দিয়েছেন। কেউ কোনো কাজ করতে চাইলে তার জন্যে শরিয়তের বিধান, সে 'ইনশাআল্লাহ্‌' বলবে। যাতে এতে তার সুদৃঢ় সংকল্প প্রকাশ পায়। কারণ আগামীকাল কি হবে তা তো বান্দা জানে না। সে এটাও জানে না, সে যে কাজটি করার সংকল্প করেছে তা তার তাকদিরে আছে কি-না? এই 'ইনশাআল্লাহ্‌' শব্দটি শর্ত বলে গণ্য হবে না। বরং এটি তার দৃঢ় সংকল্প বলেই গণ্য হবে। এ জন্যে হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, বাক্যে ইনশাআল্লাহ শব্দটি এক বছর মেয়াদের মধ্যে যুক্ত করা চলে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটি শীঘ্র জ্ঞাপক অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন, ইতোপূর্বে হযরত সুলাইমান আ.-এর ঘটনা আলোচিত হয়েছে। তিনি বলেছিলেন, আজ রাতে আমি ৭০ জন স্ত্রীর সাথে মিলিত হব। তারা প্রত্যেকে একটি করে ছেলে সন্তান প্রসব করবে, যারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করবে। তখন নেপথ্যে তাঁকে বলা হয়েছিল, 'ইনশাআল্লাহ্‌' বলুন! তিনি তা বলেন নি। এরপর তিনি সহবাস করলেন। তাতে মাত্র একজন স্ত্রী একটি অসম্পূর্ণদেহী ছেলে প্রসব করেন। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَمْ يَحْنَثْ. وَكَانَ دَرَكًا لِحَاجَتِهٖ

"যে মহান সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ! হযরত সুলাইমান আ. যদি ইনশাআল্লাহ্ বলতেন, তবে তাঁর শপথ ভঙ্গ হত না এবং তাঁর মনোবাঞ্ছাও পূর্ণ হত।"

আল্লাহ্ তাআলার বাণী : "যদি ভুলে যাও তবে তোমার প্রতিপালককে স্মরণ কর!" কারণ, ভুলে যাওয়াটা কোনো কোনো সময় শয়তানের প্রভাবে হয়ে থাকে। তখন আল্লাহর স্মরণ অন্তর থেকে প্রভাব বিদূরিত করে দেয়। ফলে যা ভুলে গিয়েছিল, তা স্মরণে আসে।

আল্লাহর বাণী : "এবং বল সম্ভবত আমার প্রতিপালক আমাকে এটি অপেক্ষা সত্যের নিকটতর পথ নির্দেশ করবেন।" অর্থাৎ যখন কোনো বিষয়ে অস্পষ্টতা এসে যায় এবং লোকজনের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়, তবে আপনি আল্লাহ্ অভিমুখী হন, তিনি বিষয়টিকে আপনার জন্যে সহজ ও স্বাভাবিক করে দিবেন। এরপর আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "তারা তাদের গুহায় ছিল তিনশ বছর, আরও নয় বছর।" তাদের সুদীর্ঘ কাল গুহায় অবস্থানের কথা উল্লেখ তাৎপর্যবহ। তাই আল্লাহ্ তাআলা এর উল্লেখ করেছেন। এখানে অতিরিক্ত নয় বছর হল চান্দ্র মাসের হিসাবে। সৌর বছরের ৩০০ বছর পূর্ণ করতে চান্দ্র মাসের হিসেবে অতিরিক্ত নয় বছরের প্রয়োজন হয়। কারণ, প্রতি ১০০ সৌর বছর থেকে ১০০ চান্দ্র বছরের সময়কাল তিন বছর কম হয়ে থাকে।

আল্লাহর বাণী : "বল, তারা কতকাল ছিল তা আল্লাহই ভালো জানেন।" অর্থাৎ এ জাতীয় কোনো বিষয়ে যদি আপনাকে কেউ জিজ্ঞেস করে আর আপনার নিকট সে বিষয়ে কোনো লিখিত প্রমাণ না থাকে, তবে বিষয়টি মহান আল্লাহর প্রতি সোপর্দ করে দিন।

"আকাশরাজি ও পৃথিবীর অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান তাঁরই।" অর্থাৎ অদৃশ্য বিষয়ে অবগত তিনিই, তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে তা অবগত করান; অন্য কাউকে নয়। "তিনি কত সুন্দর দ্রষ্টাও শ্রোতা।" অর্থাৎ তিনি সবকিছুকে যথাস্থানে স্থাপন করেন। কারণ, তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে এবং সেগুলোর চাহিদা ও প্রয়োজন সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত।

তারপর আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "তিনি ব্যতীত ওদের অন্য কোনো অভিভাবক নেই। তিনি কাউকে নিজ কর্তৃত্বে শরীক করেন না।" অর্থাৎ রাজত্বে, ক্ষমতায় ও কর্তৃত্বে আপনার প্রতিপালক একক, অনন্য। তাঁর কোনো শরীক ও অংশীদার নেই।

হযরত যুলকারনাইন আ.

কোরআন মাজিদে যুলকারনাইন আ.

আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا (٨٣) إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا (٨٤) فَأَتْبَعَ سَبَبًا (٨٥) حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا (٨٦) قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا (٨٧) وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا (٨٨) ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا (٨٩) حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا (٩٠) كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا (٩١) ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا (٩٢) حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا (٩٣) قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا (٩٤) قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا (٩٥) آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا (٩٦) فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا (٩٧) قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا.

"ওরা তোমাকে যুল-কারনাইন সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে। বল, আমি তোমাদের নিকট তার বিষয় বর্ণনা করব। আমি তাকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দিয়েছিলাম এবং প্রত্যেক বিষয়ের উপায়-উপকরণ দান করেছিলাম। এরপর সে এক পথ অবলম্বন করল। চলতে চলতে সে যখন সূর্যের অস্তাচলে গিয়ে পৌঁছুল। তখন সে সূর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে অস্তগমন করতে দেখল এবং সে সেখানে এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেল। আমি বললাম, 'হে যুলকারনাইন! তুমি এদেরকে শাস্তি দিতে পার অথবা এদের ব্যাপারে সদয়ভাব গ্রহণ করতে পার।' সে বলল : 'যে কেউ সীমালঙ্ঘন করবে, আমি তাকে শাস্তি দিব। এরপর সে তার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে এবং তিনি তাকে কঠিন শাস্তি দিবেন। তবে যে ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে তার জন্যে প্রতিদান স্বরূপ আছে কল্যাণ এবং তার প্রতি ব্যবহারে আমি নম্র কথা বলব।

আবার সে এক পথ ধরল। চলতে চলতে সে সূর্যের উদয়াচলে গিয়ে পৌঁছুল। তখন সে দেখল, তা এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদয় হচ্ছে, যাদের জন্যে সূর্যতাপ হতে

কোনো অন্তরাল আমি সৃষ্টি করি নি। প্রকৃত ঘটনা এটাই, তার বৃত্তান্ত আমি সম্যক অবগত আছি। আবার সে এক পথ ধরল। চলতে চলতে সে যখন দুই পর্বত প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থলে গিয়ে পৌঁছল, তখন সেখানে সে এক সম্প্রদায়কে পেল, যারা তার কথা একেবারেই বুঝতে পারছিল না। তারা বলল, "হে যুলকারনাইন! ইয়াজুজ ও মাজুজ পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করছে; আমরা কি তোমাকে কর দিব এই শর্তে, তুমি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটি প্রাচীর গড়ে দিবে? সে বলল, 'আমার প্রতিপালক আমাকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন, তাই উৎকৃষ্ট। সুতরাং তোমরা আমাকে শ্রম দিয়ে সাহায্য কর। আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যস্থলে এক মজবুত প্রাচীর গড়ে দিব। তোমরা আমার নিকট লৌহ পিণ্ডসমূহ আন! এরপর মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে যখন লৌহস্তূপ দুই পর্বতের সমান হল, তখন সে বলল : তোমরা গলিত তামা আন! আমি তা ঢেলে দিই এর ওপর। এরপর তারা তা অতিক্রম করতে পারল না কিংবা ভেদ করতেও পারল না। সে বলল, এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। যখন আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে, তখন এটাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিবেন আর আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি সত্য।"

(কাহফ : ৮৩-৯৮)

তিনি নবী ছিলেন কি না?

আল্লাহ পাক যুলকারনাইনের আলোচনায় তাকে ন্যায়-পরায়ণ বলে প্রশংসা করেছেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তিনি অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। সমস্ত ভূ-খণ্ডের উপর তিনি বিজয় লাভ করেছিলেন। সকল দেশের অধিবাসীরা তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেছিল। তাদের মধ্যে তিনি পূর্ণ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বস্তুত তিনি ছিলেন আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত এক সফল ও বিজয়ী বীর; ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী বাদশা। তাঁর সম্পর্কে এটাই বিশুদ্ধ কথা। অবশ্য কারো কারো মতে তিনি নবী, কারো কারো মতে রাসূল। তাঁর সম্পর্কে একটি বিরল মত হচ্ছে, তিনি ছিলেন ফেরেশতা। এ শেষোক্ত মতটি আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. থেকে শ্রুত হয়ে বর্ণিত হয়েছে। তিনি একদিন শুনতে পেলেন, এক ব্যক্তি অপর একজনকে বলছে– হে যুলকারনাইন! তখন তিনি বললেন, থাম! যে কোনো একজন নবীর নামে নাম রাখাই যথেষ্ট; ফেরেশতার নামে কারও নাম রাখার কী প্রয়োজন? সুহায়লী এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

মুজাহিদের সূত্রে আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন, যুলকারনাইন নবী ছিলেন। হাফিজ ইবনে আসাকির আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি জানি না, তুব্বা বাদশা অভিশপ্ত ছিল কি-না? আমি এও জানি না, শরয়ি শাস্তি দ্বারা দণ্ডপ্রাপ্তের গুনাহ মাফ হবে কি-না? আমি জানি না, যুলকারনাইন নবী ছিলেন কি-না! এ হাদিস উপর্যুক্ত সনদে গরীব।

ইসহাক ইবনে বিশর ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, যুলকারনাইন ছিলেন একজন ধার্মিক বাদশা। আল্লাহ তাঁর কাজ-কর্মে সন্তুষ্ট ছিলেন। নিজ কিতাবে তিনি তাঁর প্রশংসা করেছেন। তিনি ছিলেন আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত। হযরত খিযির আ. ছিলেন তাঁর উযির। তিনি আরও বলেছেন, খিযির আ. থাকতেন তাঁর সেনাবাহিনীর অগ্রভাগে। বর্তমানকালে বাদশা নিকট উযিরের যে স্থান, যুলকারনাইনের নিকট হযরত খিযিরের ছিল ঠিক সেরূপ উপদেষ্টার মর্যাদা। কোনো কোনো ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, যুলকারনাইন হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ আ.-এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হযরত ইবরাহীম আ.-এর সাথে তিনি ও ইসমাঈল আ. একত্রে কাবা তাওয়াফ করেন। কেউ কেউ বলেছেন, যুলকারনাইন পদব্রজে হজ পালন করেছেন। ইবরাহীম আ. তাঁর আগমনের সংবাদ পেয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন, তাঁকে দুআ করেন ও তাঁর উপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। আল্লাহ মেঘপুঞ্জকে যুলকারনাইনের অনুগত করে দিয়েছিলেন। যেখানে তিনি যেতে চাইতেন, মেঘমালা তাকে সেখানে বহন করে নিয়ে যেত।

যুলকারনাইন নামকরণের ব্যাপারে ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করেছেন। কারো মতে তাঁর মাথায় দুটি শিং-এর মতো ছিল। এ কারণে তাঁকে যুলকারনাইন (দুই শিংওয়ালা) বলা হয়েছে।

ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ বলেন, তাঁর মাথায় দুটি শিং ছিল। এটা দুর্বল মত। কোনো কোনো আহলে কিতাব বলেছেন : যেহেতু তিনি রোম-পারস্য উভয় সাম্রাজ্যের সম্রাট ছিলেন, তাই তাঁকে এরূপ উপাধি দেওয়া হয়েছে। কেউ বলেন, যেহেতু তিনি সূর্যের দুই প্রান্ত পূর্ব ও পশ্চিম এবং এর মধ্যবর্তী সমস্ত জায়গার একচ্ছত্র বাদশা ছিলেন, তাই তাঁকে এ নামে ভূষিত করা হয়েছে। এ ব্যাখ্যা ইমাম যুহরী রহ.-এর। এ মতটিই অধিক গ্রহণযোগ্য।

হযরত সুফিয়ান ছাওরী রহ. আলি ইবনে আবি তালিব রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি হযরত আলি রাযি.-কে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, যুলকারনাইন আল্লাহর এক সৎ বান্দা। আল্লাহ তাঁকে উপদেশ দেন। তিনি উপদেশ কবুল করেন। তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে আল্লাহর দিকে আহবান করেন। তারা তাঁর একটি শিং-এর উপর সজোরে আঘাত করে। ফলে তিনি মারা যান। আল্লাহ তাঁকে জীবিত করেন। আবারও তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে আল্লাহর দিকে আহবান করেন। তখন তারা অপর শিং এর উপর আঘাত করে। এ আঘাতেও তিনি মারা যান। তখন থেকে তাঁকে যুলকারনাইন বলা হয়ে থাকে।

আবু তোফায়েল হযরত আলি রাযি. থেকে বর্ণনা করেন : যুলকারনাইন নবী, রাসূল বা ফেরেশতা কোনোটিই ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন পুণ্যবান ব্যক্তি।

তাঁর আসল নাম কী?

যুলকারনাইনের আসল নাম কি ছিল, এ ব্যাপারে একাধিক মত পাওয়া যায়। যুবায়র হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, তাঁর নাম আবদুল্লাহ ইবনে যাহহাক ইবনে মাআদ। কারো কারো বর্ণনা মতে মুসআব ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে কিনান ইবনে মানসূর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আযদ ইবনে আওন ইবনে নাবাত ইবনে মালিক ইবনে যায়দ ইবনে কাহলান ইবনে সাবা ইবনে কাহতান।

এক হাদীসে আছে, যুলকারনাইন হিমইয়ার গোত্রভুক্ত ছিলেন। তাঁর মা ছিলেন রোম দেশীয়। প্রখর জ্ঞানের অধিকারী হওয়ায় যুলকারনাইনকে ইবনুল ফায়সালুফ বা মহাবিজ্ঞানী বলা হত। হিমইয়ার গোত্রের জনৈক কবি তাদের পূর্ব-পুরুষ যুলকারনাইনের প্রশংসায় নিম্নরূপ গৌরবগাঁথা লিখেন:

قَدْ كَانَ ذُو الْقَرْنَيْنِ جَدِّىْ مُسْلِمًا + مَلِكًا تَدِيْنُ لَهُ الْمُلُوكُ وَتُحْشَدِ

بَلَغَ الْمَشَارِقَ وَالْمَغَارِبَ يَبْتَغِي + أُسْبَابَ اَمْرٍ مِنْ حَكِيمٍ مُرْشِدِ

فَرَأَى مَغِيبَ الشَّمْسِ عِنْدَ غُرُوْبِهَا + فِي عَيْنِ ذِي خُلْبٍ وَثَأْطٍ حَرْمَدِ

مِنْ بَعْدِهٖ بِلْقِيْسُ كَانَتْ عَمَّتِىْ + مَلَكَتْهُمْ حَتّٰى اَتَاهَا الْهُدْهُدُ

"যুলকারনাইন ছিলেন আমার পিতামহ, মুসলমান ও এমন একজন বাদশা, অন্যান্য রাজন্যবর্গ তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে ও তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করেন। তিনি অভিযানের পর অভিযান পরিচালনা করে পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছেন এবং মহাজ্ঞানী পথপ্রদর্শক আল্লাহর প্রদত্ত উপায়-উপকরণ অনুসন্ধান করেন। পশ্চিমে সূর্যের অস্তাচলে গিয়ে সেখানে সূর্যকে এক কর্দমাক্ত কালো জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখেন। তাঁর পর আসেন সম্রাজ্ঞী বিলকিস। তিনি ছিলেন আমার ফুফু। বিশাল রাজ্যের অধিকারী হন তিনি। সুলাইমানের হুদহুদ পাখীর আগমন পর্যন্ত তিনি অত্যন্ত প্রতাপের সাথে রাজ্য পরিচালনা করেন।"

সুহায়লী লিখেছেন, কেউ কেউ তাঁর নাম বলেছেন মারযুবান ইবনে মারযুবা। ইবনে হিশাম অন্য স্থানে লিখেছেন : যুলকারনাইনের নাম আসসাব ইবনে যী-মারাইদ। তুব্বা বংশের ওনিই প্রথম বাদশা। বীরুস-সাবার ঘটনায় তিনি ইবরাহীমের পক্ষে ফয়সালা দিয়েছিলেন। কেউ বলেছেন, যুলকারনাইনের নাম আফরীদূন ইবনে আসফিয়ান, যিনি যাহহাককে হত্যা করেছিলেন। আরবের বাগ্মী পুরুষ কুস তাঁর এক ভাষণে বলেছিলেন : হে আয়াদ ইবনে সাব যুলকারনাইনের বংশধর। তোমাদের পূর্বপুরুষ যুলকারনাইন যিনি পূর্ব ও পশ্চিমের বাদশা, জিন ও ইনসানের উপর ক্ষমতা প্রয়োগকারী এবং দু হাজার বছর যার বয়স। এ সত্ত্বেও তা যেন ছিল এক মুহূর্তের মতো। এ কথা উল্লেখ করার পর ইবনে হিশাম কবি আ'শার নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন :

وَالصَّعْبُ ذُو الْقَرْنَيْنِ اَصْبَحَ ثَاوِيًا + بِالْجَنُوْ فِيْ جَدَثٍ اَشَمِ مُقِيْمًا.

"এরপর যুলকারনাইন মাটির নিচে কবরের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ীভাবে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং সেখানে অবস্থানরত অবস্থায় তার সুবাস নিতে থাকেন।"

ইমাম দারাকুত্নী ও ইবনে মাকূলা বলেছেন, যুলকারনাইনের নাম হুরমুস। তাঁকে বলা হত হারবীস ইবনে কায়তুন ইবনে রূমী ইবনে লান্‌তী ইবনে কাশলূখীন ইবনে ইউনান ইবনে ইয়াফিছ ইবনে নূহ আ.। ইসহাক ইবনে বিশর হযরত কাতাদা রহ. থেকে বর্ণনা করেন, বাদশা ইস্কান্দার (আলেকজাণ্ডার)-ই হলেন যুলকারনাইন। তাঁর পিতা ছিলেন প্রথম কায়সার (রোম সম্রাট)। তিনি সাম ইবনে নূহ আ.-এর বংশধর। আর দ্বিতীয় যুলকারনাইন হচ্ছেন ইস্কান্দার ইবনে ফিলিপস ইবনে মুসরীম ইবনে হুরমুস ইবনে মায়তুন ইবনে রূমী ইবনে লানতী ইবনে ইউনান ইবনে ইয়াফিছ ইবনে যূনাহ ইবনে শারখূন ইবনে রূমাহ ইবনে শারফত ইবনে তাওফীল ইবনে রূমী ইবনে আসফার ইবনে ইয়াকিয ইবনে ঈস ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম খলীল আ.। হাফেজ ইবনে আসাকির তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে এই নসবখানা উল্লেখ করেছেন।

যুলকারনাইন মাকদূন ইউনানী মিসর আলেকজান্দ্রিয়া নগরীর প্রতিষ্ঠাতা। যিনি তার শাসনামলে রোমের ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। প্রথম যুলকারনাইন থেকে এ দ্বিতীয় যুলকারনাইন দীর্ঘকাল পরে হযরত ঈসা আ.-এর তিনশ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। দার্শনিক এরিস্টটল ছিলেন তাঁর উযির। তিনি দারার পুত্র দারাকে হত্যা করেন এবং পারস্য সাম্রাজ্যকে পদানত করেন। আমরা এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করলাম এজন্যে, অনেকেই উভয় ইস্কান্দারকে অভিন্ন ব্যক্তি মনে করেন। ফলে তাঁরা বিশ্বাস করেন কুরআনে যে যুলকারনাইনের কথা বলা হয়েছে, তাঁরই উযির ছিলেন এরিষ্টটল। এ বিশ্বাসের ফলে বিরাট ভুল ও জটিলতার সৃষ্টি হয়। কেননা প্রথম যুলকারনাইন ছিলেন মুমিন, সৎ, আল্লাহভক্ত ও ন্যায়পরায়ন বাদশা; হযরত খিযির আ. তাঁর উযির। অনেকের মতে তিনি ছিলেন নবী।

পক্ষান্তরে দ্বিতীয় যুলকারনাইন ছিল মুশরিক। তার উযির ছিল একজন দার্শনিক। তা ছাড়া এ দুজনের মধ্যে দুহাজার বছরের চেয়েও অধিক সময়ের ব্যবধান রয়েছে। সুতরাং কোথায় এর অবস্থান আর কোথায় তাঁর অবস্থান! উভয়ের মধ্যে আদৌ কোনোই সামঞ্জস্য নেই। অজ্ঞ ও নির্বোধ লোকেরাই দুজনকে এক বলে ভাবতে পারে। এ প্রেক্ষাপটে আল্লাহ বলেন : "ওরা তোমাকে যুলকারনাইন সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে!" এর কারণ হচ্ছে, কতিপয় কুরায়েশের কাফের ইহুদিদের কাছে গিয়ে বলে : তোমরা আমাদেরকে এমন কিছু বলে দাও, যে বিষয়ে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জ্ঞান পরীক্ষা করতে পারি। ইহুদিরা এদেরকে শিখিয়ে দিল, তোমরা তাকে এমন এক ব্যক্তির কথা জিজ্ঞেস কর, যে সমগ্র ভূখণ্ড বিচরণ করেছে। আর কতিপয় যুবকের পরিচয় জিজ্ঞেস কর, যারা তাদের বাড়ি থেকে বের হয়ে নিরুদ্দেশ

হয়ে গিয়েছিল, যাদের পরিণতি সম্পর্কে কেউ কিছু জানে না। কুরায়েশরা ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ প্রশ্ন করলে আল্লাহ তাআলা আসহাবে কাহফ ও যুলকারনাইনের ঘটনা সম্বলিত আয়াতসমূহ নাযিল করেন।

কুতায়বা রহ. হাবীব ইবনে হাম্মাদ থেকে বর্ণনা করেন : আমি হযরত আলি রাযি. এর কাছে বসা ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করল, যুলকারনাইন কী উপায়ে পৃথিবীর পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছতে পারলেন? হযরত আলি রাযি. বললেন, মেঘমালাকে তাঁর অনুগত করে দেওয়া হয়েছিল, সকল উপকরণ তাঁর হস্তগত করা হয়েছিল এবং তাঁর জন্যে আলো বিচ্ছুরিত করা হয়েছিল। এ পর্যন্ত বলে জিজ্ঞেস করলেন, আরও বলতে হবে না-কি? শুনে লোকটি চুপ হয়ে গেল। হযরত আলি রাযি.ও থেমে গেলেন।

আবু ইসহাক সাবীয়ী হযরত মুআবিয়া রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, সমগ্র পৃথিবীর বাদশাহী করেছেন চারজন : (১) সুলায়মান ইবনে দাউদ আ., (২) যুলকারনাইন (৩) হুল ওয়ানের জনৈক অধিবাসী (৪) অন্য একজন। জিজ্ঞেস করা হল, তিনি কি খিযির? বললেন, না।

যুবায়র ইবনে বাক্কার হযরত সুফিয়ান ছাওরী রহ. থেকে বর্ণনা করেন, সমগ্র পৃথিবীতে রাজত্ব করেছেন ৪ জন বাদশা। তাদের দুজন মুমিন– (১) হযরত সুলাইমান আ. (২) যুলকারনাইন। অন্য দুজন কাফের– (৩) নমরূদ ও (৪) বুখত নসর।

ইসহাক ইবনে বিশর হযরত হাসান বসরী রহ. থেকে বর্ণনা করেন, নমরূদের পরে যুলকারনাইন বাদশা হন। তিনি একজন খাঁটি-নেককার মুসলমান ছিলেন। তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে অভিযান চালান। আল্লাহ তাঁর আয়ু বাড়িয়ে দেন ও তাঁকে সাহায্য করেন। ফলে সমস্ত জনপদ তিনি নিজের অধীনে আনেন, ধন-রত্ন করায়ত্ব করেন, দেশের পর দেশ জয় করেন এবং বহু কাফির নিধন করেন। তিনি বিভিন্ন জনপদ, শহর ও কিল্লা অতিক্রম করে চলতে চলতে পৃথিবীর পূর্ব সীমান্তে ও পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে যান। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন : "তারা তোমাকে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বল, আমি তোমাদের কাছে তার কিছু অবস্থা বর্ণনা করব। আমি তাকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম এবং প্রত্যেক বিষয়ের কার্যোপকরণ দান করেছিলাম।" অর্থাৎ উপায়-উপকরণ অন্বেষণের জ্ঞান দান করেছিলাম।

ঐতিহাসিক ইসহাক লিখেছেন, মুকাতিল বলেন, যুলকারনাইন দেশের পর দেশ জয় করেন, ধনরত্ন সংগ্রহ করেন এবং যারা তার দীন গ্রহণ করত ও তা অনুসরণ করত তাদেরকে ছেড়ে দিতেন, অন্যথায় হত্যা করতেন। তাঁকে দান করা হয়েছিল বিভিন্ন ভাষার জ্ঞান। কেননা যুলকারনাইন যে জাতির বিরুদ্ধেই লড়াই করতেন সেই জাতির ভাষায় তাদের সাথে কথা বলতেন। তদুপরি তাঁকে দেওয়া হয়েছিল এমন প্রতিটি উপকরণ, যার সাহায্যে তিনি রাষ্ট্রের ভিতরে ও বাইরে নিজ উদ্দেশ্য পূরণ করতেন।

কারণ, তিনি প্রতিটি বিজিত দেশ থেকে প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদ, খাদ্য-সামগ্রী ও পাথেয় গ্রহণ করতেন। যা তাঁর কাজে লাগত এবং অন্য দেশ জয়ের জন্যে সহায়ক হত।

কোনো কোনো আহলে কিতাব উল্লেখ করেছেন, যুলকারনাইন এক হাজার ছয় শ' বছর আয়ু পেয়েছিলেন। তিনি গোটা বিশ্ব ভ্রমণ করেন এবং মানুষকে এক আল্লাহর দিকে আহবান জানাতে থাকেন। কিন্তু তাঁর বয়সকাল সম্পর্কে যে সব মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে, তাতে সন্দেহের অবকাশ আছে। চলতে চলতে পৃথিবীর পশ্চিম দিকে এমন এক স্থানে গিয়ে তিনি পৌঁছলেন, যে স্থান অতিক্রম করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। এখানে এসে তিনি থেকে যান। এ স্থানটি হল পশ্চিম আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূল। এর মধ্যে ছিল কতগুলো দ্বীপ। দ্বীপগুলোকে আরবিতে খালিদাত দ্বীপপুঞ্জ বলা হয়।

মানচিত্রবিদদের কারো কারো মতে এ দ্বীপ থেকেই ভূ-ভাগ শুরু হয়েছে, কিন্তু অন্যদের মতে উক্ত সাগরের উপকূল থেকে ভূ-পৃষ্ঠের সূচনা মাত্র। যুলকারনাইন এখানে দাঁড়িয়ে সূর্যের অস্তগমন প্রত্যক্ষ করেন। "সে সূর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে অস্তগমন করতে দেখল।" পঙ্কিল জলাশয় বলতে সাগর উদ্দেশ্য। কেননা যে ব্যক্তি সাগর থেকে বা তার উপকূল থেকে প্রত্যক্ষ করে, সে দেখতে পায় সূর্য যেন সমুদ্রের মধ্য থেকে উদিত হচ্ছে এবং সমুদ্রের মধ্যে অস্ত যাচ্ছে। সূর্যের কিরণ এখানে সোজাসুজি ও তীর্যকভাবে পতিত হয়। ফলে এখানকার পানি উষ্ণ থাকে।

কেউ কেউ বলেছেন, যুলকারনাইন সূর্যের অস্তগমন স্থান অতিক্রম করে সেনাদলসহ দীর্ঘদিন পর্যন্ত অন্ধকারের মধ্যে সম্মুখ পানে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাদের এ কথা ভুল এবং যুক্তি ও রেওয়ায়ত এর পরিপন্থী।

আবে হায়াতের সন্ধানে

ইবনে আসাকির ওকী রহ. এর সূত্রে যাইনুল আবিদীন থেকে এক দীর্ঘ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ঘটনার সারমর্ম হল, যুলকারনাইনের সাথে একজন ফেরেশতা থাকতেন। তাঁর নাম ছিল রানাকীল। একদিন যুলকারনাইন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন : পৃথিবীতে এমন কোনো ঝর্ণা আছে, যার নাম আইনুল হায়াত বা সঞ্জীবনী ঝর্ণা? ফেরেশতা ঝর্ণাটির অবস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত জানালেন। যুলকারনাইন তার সন্ধানে যাত্রা শুরু করলেন। হযরত খিযির আ.-কে তিনি অগ্রবর্তী দলে রাখলেন। যেতে যেতে এক অন্ধকার উপত্যকায় গিয়ে ওই ঝর্ণাটির সন্ধান পেলেন। খিযির আ. ঝর্ণার কাছে গিয়ে সেখান থেকে পানি পান করলেন। কিন্তু যুলকারনাইন ঝর্ণার কাছে যেতে পারলেন না। তিনি সেখানে অবস্থিত একটি প্রাসাদে এক ফেরেশতার সাথে মিলিত হলেন। ফেরেশতা যুলকারনাইনকে একটি পাথর দান করলেন।

পরে তিনি সেনাবাহিনীর নিকট ফিরে এলে আলেমগণ পাথরটি সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি পাথরটিকে ওজন করার জন্য এক পাল্লায় রাখলেন এবং অপর পাল্লায় অনুরূপ এক হাজার পাথর রাখলেন। কিন্তু ওই পাথরটির পাল্লা ভারি হল। তখন

হযরত খিযির আ.-ও পাথরটির রহস্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তখন তিনি তার বিপরীত পাল্লায় একটি পাথর উঠিয়ে তার উপর এক মুষ্টি মাটি ছেড়ে দিলেন। এবার পাল্লাটি ভারি হয়ে গেল। তখন তিনি বললেন, এটা ঠিক বনি আদমের উপমা। যারা কবরের মাটি ছাড়া কোনো কিছুতেই তৃপ্ত হয় না। এ দৃশ্য দেখে আলেমগণ ভক্তিভরে তাঁর প্রতি নত হলেন। অনন্তর তিনি পশ্চিম থেকে প্রত্যাবর্তন করে পূর্ব দিকে যাওয়ার পথ ধরলেন। কথিত আছে, পশ্চিম প্রান্ত থেকে পূর্ব প্রান্তে ফিরে আসতে তাঁর বারো বছর অতিবাহিত হয়। চলতে চলতে যখন সূর্যোদয়স্থলে পৌঁছেন, তখন এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদিত হচ্ছে, যাদের কোনো ঘর-বাড়ি ছিল না এবং সূর্যের তাপ থেকে বাঁচার কোনো উপায় ছিল না। অবশ্য অনেক আলেম বলেছেন, তারা মাটিতে কবরের মতো এক প্রকার সুড়ঙ্গে গিয়ে প্রচণ্ড তাপের সময় আশ্রয় নিত। প্রকৃত ঘটনা এটাই। তাঁর বৃত্তান্ত আল্লাহ সম্যক অবগত।

উবায়দ ইবনে উমায়ের ও তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ প্রমুখ আলেমগণ বলেছেন, যুলকারনাইন পদব্রজে হজ পালন করেন। হযরত ইবরাহীম আ. যুলকারনাইনের আগমনের সংবাদ পেয়ে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন। উভয়ে একত্রে মিলিত হলে ইবরাহীম আ. তাঁর জন্যে দুআ করেন এবং কতিপয় উপদেশ দেন।

কথিত আছে, হযরত ইবরাহীম আ. একটি ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে যান এবং যুলকারনাইনকে তাতে আরোহণ করতে বলেন। কিন্তু যুলকারনাইন অস্বীকার করে বলেন, যে শহরে আল্লাহর খলীল বিদ্যমান আছেন সেই শহরে আমি বাহনে আরোহণ করে প্রবেশ করব না। তখন আল্লাহ মেঘমালাকে তাঁর অনুগত করে দেন এবং ইবরাহীম আ. এ সুখবর তাঁকে দেন। তিনি যেখানে যাওয়ার ইচ্ছে করতেন, মেঘমালা তাঁকে সেখানে নিয়ে যেত।

আবার তিনি পথ চলতে চলতে দুই পর্বত প্রাচীরের মধ্যবর্তীস্থলে পৌঁছুলে সেখানে এমন এক সম্প্রদায়কে পেলেন, যারা তার কথা একেবারেই বুঝতে পারছিল না। এ সম্প্রদায় সম্পর্কে বলা হয়, এরা হল তুর্কী জাতি; ইয়াজুজ ও মাজুজের জ্ঞাতি ভাই।

এ সম্প্রদায়ের লোকজন যুলকারনাইনের নিকট অভিযোগ করে, ইয়াজুজ ও মাজুজ গোত্রদ্বয় তাদের উপর অত্যাচার চালায়, লুটতরাজ ও ধ্বংসাত্মক কার্যক্রমের দ্বারা শহরকে বিপর্যস্ত করে ফেলে। তারা যুলকারনাইনকে কর দিতে আগ্রহ প্রকাশ করে। যেন তিনি তাদের ও ইয়াজুজ-মাজুজের মাঝে একটি প্রাচীর তৈরি করে দেন। যাতে করে তারা আর এদিকে উঠে আসতে না পারে। যুলকারনাইন তাদের থেকে কর নিতে অস্বীকার করেন এবং তাকে আল্লাহ যে সম্পদ ও ক্ষমতা দিয়েছেন তাতেই সন্তোষ প্রকাশ করেন। তবে তিনি তাদেরকে শ্রমিক ও উপকরণ সরবরাহ করতে বলেন এবং উক্ত দুই পর্বতের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান ভরাট করে বাঁধ নির্মাণ করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। আর এ দু পর্বতের মধ্যবর্তী স্থান ছাড়া ইয়াজুজ-মাজুজের আসার অন্য কোনো পথ ছিল না।

তাদের একদিকে ছিল গভীর সমুদ্র, অন্যদিকে সুউচ্চ পর্বতমালা। এরপর তিনি লোহা ও গলিত তামা, মতান্তরে সীসা দ্বারা উক্ত বাঁধ নির্মাণ করেন। কিন্তু প্রথমোক্ত মতোই সঠিক। সে মতে এ বাঁধ নির্মাণে তিনি ইটের পরিবর্তে লোহা এবং সুরকির পরিবর্তে তামা ব্যবহার করেন। এরপর তারা সিঁড়ি কিংবা অন্য কিছুর সাহায্যে বাঁধ পার হয়ে আসতে পারল না এবং কুঠার বা শাবল দ্বারা ছিদ্রও করতে পারল না। সহজের মুকাবিলায় সহজ ও কঠিনের মুকাবিলায় কঠিন নীতি অবলম্বন করা হল। তিনি বললেন, এ বাঁধ নির্মাণের ক্ষমতা আল্লাহই দান করেছেন। এটা তাঁরই অনুগ্রহ ও দয়া। কেননা এর দ্বারা উক্ত সীমালঙ্ঘনকারী জাতির অত্যাচার থেকে তাদের প্রতিবেশী লোকদেরকে রক্ষা করতে পেরেছেন। কিন্তু শেষ যামানায় মানব জাতির উপর তাদের বের হয়ে আসার নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হবে, তখন তিনি একে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিবেন; মাটির সাথে মিশিয়ে দিবেন। কেননা তাদের বের হয়ে আসার জন্যে এ রকম হওয়া আবশ্যক। আর আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, "ইয়াজুজ-মাজুজকে যখন ছেড়ে দেওয়া হবে তখন তারা ভূ-পৃষ্ঠের উঁচু স্থান দিয়ে দ্রুত অগ্রসর হতে থাকবে।" "আল্লাহর সত্য প্রতিশ্রুতি নিকটবর্তী।" এ জন্যে এখানেও আল্লাহ বলেছেন, " সেদিন আমি তাদেরকে ছেড়ে দিব এ অবস্থায়, একদল আর এক দলের উপর তরঙ্গের মতো পতিত হবে।" 'সেদিন' বলতে বিশুদ্ধ মতে বাঁধ ভেঙ্গে দেওয়ার দিন উদ্দেশ্য।

ওফাত লাভ

আবু দাউদ রহ. হযরত সুফিয়ান ছাওরী রহ. এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, সর্বপ্রথম যিনি মুসাফার প্রবর্তন করেন তিনি হলেন, যুলকারনাইন। কাব আহবাব হযরত মুআবিয়া রাযি. কে বলেছেন : যুলকারনাইনের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে তিনি তাঁর মাকে ওসিয়ত করেন, আমার মৃত্যু হয়ে গেলে আপনি ভোজের ব্যবস্থা করবেন এবং নগরীতে সমস্ত মহিলাদেরকে ডাকবেন। তারা আসলে তাদের সম্মুখে খানা রেখে সন্তানহারা মহিলাদের ব্যতীত অন্যদেরকে আহার করতে বলবেন। যে সব মহিলা সন্তান হারিয়েছে, তারা যেন উক্ত খাদ্য ভক্ষণ না করে।

ওসিয়ত অনুযায়ী মা সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন করে উক্তরূপে আহার গ্রহণের আহবান জানালেন। কিন্তু একজন মহিলাও খাবার স্পর্শ করল না। যুলকারনাইনের মা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার তোমরা সকলেই কি সন্তানহারা? তারা বলল, আল্লাহর কসম! আমরা প্রত্যেকেই সন্তান হারিয়েছি। এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে তখন তিনি মনে সান্ত্বনা লাভ করলেন।

ইসহাক ইবনে বিশর আবদুল্লাহ ইবনে যিনাদের মাধ্যমে জনৈক আহলে কিতাব থেকে বর্ণনা করেন, যুলকারনাইনের ওসিয়ত ও তাঁর মায়ের উপদেশ একটি সুদীর্ঘ মূল্যবান উপদেশ। তাতে বহু জ্ঞানপূর্ণ ও কল্যাণকর কথা আছে। যুলকারনাইন যখন ইনতেকাল করেন, তখন তার বয়স হয়েছিল তিন হাজার বছর। এ বর্ণনাটি 'গরীব' পর্যায়ের।

ইবনে আসাকির রহ. অন্য এক সূত্রে বলেছেন, যুলকারনাইন ছত্রিশ বছর জীবিত ছিলেন। কারো মতে তিনি বত্রিশ বছর বেঁচে ছিলেন। হযরত দাউদ আ.-এর সাতশ চল্লিশ বছর পর এবং আদম আ.-এর পাঁচ হাজার একশ একাশি বছর পর তিনি দুনিয়ায় আগমন করেন এবং ষোল বছর রাজত্ব করেন। ইবনে আসাকিরের এ বক্তব্য দ্বিতীয় ইসকান্দারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, প্রথম ইসকান্দারের ক্ষেত্রে নয়। তিনি দুই ইসকান্দারের মধ্যে প্রথম জন ও দ্বিতীয় জনের মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। প্রকৃতপক্ষে ইসকান্দার দুজন। আমরা বিভিন্ন বিজ্ঞজনের উদ্ধৃতি দিয়ে এ আলোচনার শুরুতে সে বিষয়ে উল্লেখ করে এসেছি। যারা দুই ইসকান্দারকে একজন ভেবেছেন, তাদের মধ্যে সীরাত লেখক আবদুল মালিক ইবনে হিশাম অন্যতম। হাফেজ আবুল কাসিম সুহায়লী এর জোর প্রতিবাদ এবং কঠোর সমালোচনা করেছেন। সাথে সাথে উভয় ইসকান্দারের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে পার্থক্য নির্ণয় করে দেখিয়েছেন। সুহায়লী বলেছেন, সম্ভবত প্রাচীন যুগের কতিপয় রাজা-বাদশা প্রথম ইসকান্দারের সাথে তুলনা করে দ্বিতীয় ইসকান্দরকেও যুলকারনাইন নামে আখ্যায়িত করেছেন।
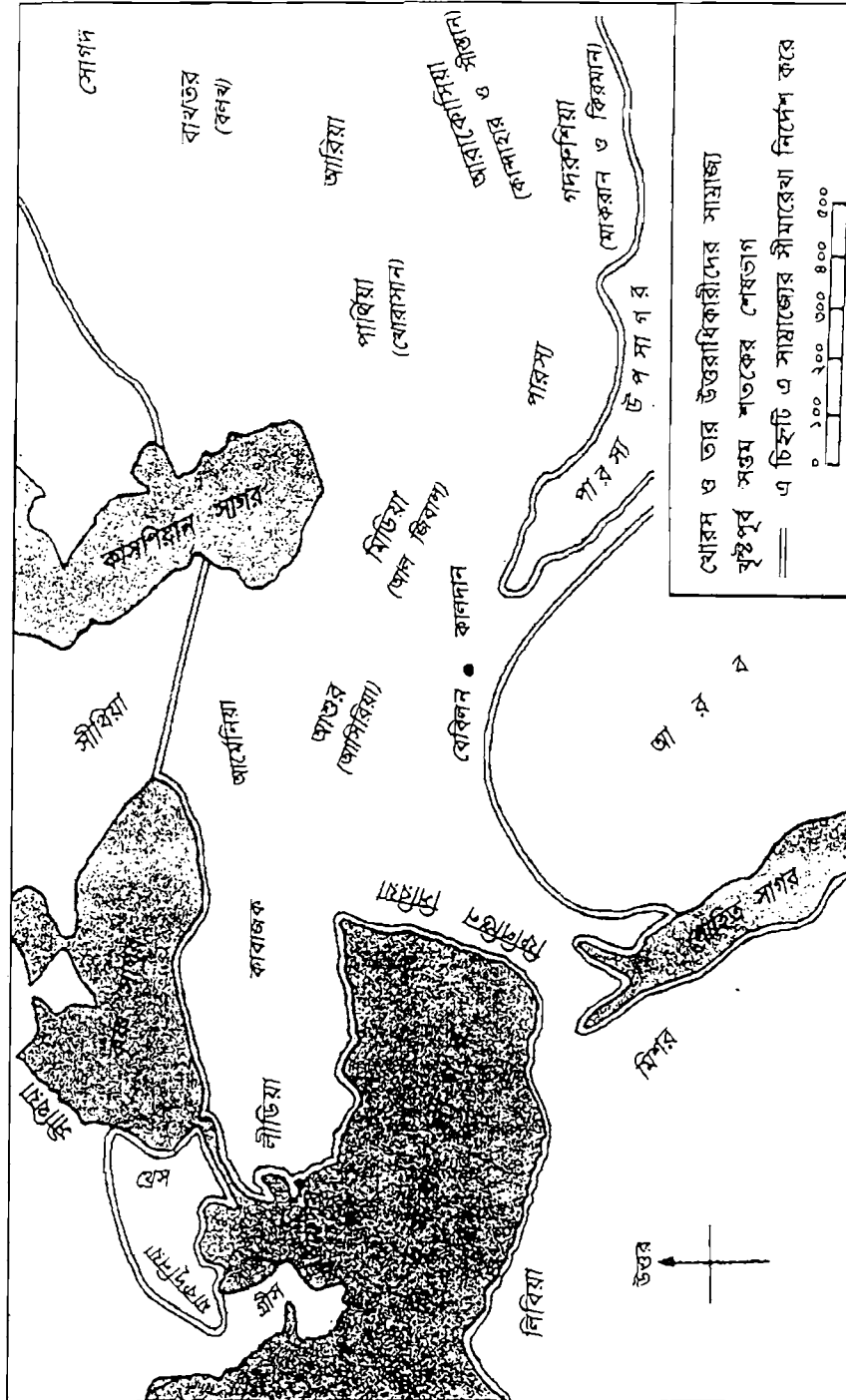
জুলকারনাইন কিস্‌সা সংক্রান্ত মানচিত্র (সূরা আল-কাহ্‌ফ ৬২নং টীকা)

ইয়াজুজ-মাজুজ

পরিচয় ও বিবরণ

ইয়াজুজ-মাজুজ যে হযরত আদম আ.-এর বংশধর, এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। প্রমাণ হল সহি বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হযরত আবু সাঈদ রাযি.-এর হাদিস। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তাআলা আদেশ দেবেন, হে আদম! উঠ, তোমার বংশধরদের মধ্য থেকে জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামের দিকে পাঠিয়ে দাও। হযরত আদম আ. বলবেন, হে প্রতিপালক! জাহান্নামীদের সংখ্যা কত? আল্লাহ তাআলা বলবেন, প্রতি হাজারে ৯৯৯ জন জাহান্নামী আর একজন মাত্র জান্নাতী। তখন শিশুগণ বৃদ্ধে পরিণত হবে। গর্ভবতী নারীদের গর্ভপাত ঘটবে এবং তুমি তাদেরকে মাতালের মতো দেখতে পাবে, যদিও তারা নেশাগ্রস্ত নয়। বস্তুত আল্লাহর শাস্তি কঠিন। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে সে একজন কে হবে? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সুসংবাদ গ্রহণ কর, তোমাদের থেকে হবে একজন আর ইয়াজুজ-মাজুজ থেকে হবে এক হাজার জন।

অপর বর্ণনায় এসেছে, সুসংবাদ গ্রহণ কর, তোমাদের মধ্যে দুটো দল রয়েছে। সে দুদল যেখানে যাবে সেখানে সংখ্যাধিক্য হবে। এটি প্রমাণ করে, ইয়াজুজ-মাজুজের সংখ্যা অত্যধিক এবং তারা সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেকগুণ বেশি।

দ্বিতীয় কথা হল, তারা হযরত নূহ আ.-এর বংশধর। কারণ, জগতবাসীর উদ্দেশ্যে হযরত নূহ আ.-এর দুআ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا- হে আমার প্রতিপালক! পৃথিবীতে কাফিরদের মধ্য হতে কোনো গৃহবাসীকে অব্যাহতি দেবেন না। আল্লাহ তাআলা এ দোয়া কবুল করেছেন বলে জানিয়েছেন। আবার আল্লাহ তাআলা বলেছেন, فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ-তারপর আমি তাকে এবং নৌকা আরোহনকারীদের রক্ষা করেছি। তিনি অন্যত্র বলেছেন, وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ তার বংশধরদেরকেই আমি বিদ্যমান রেখেছি বংশপরম্পরায়।

মুসনাদ ও সুনান-এ আছে, হযরত নূহ আ.-এর তিন পুত্র ছিলেন- সাম, হাম ও ইয়াফিছ। এদের মধ্যে সাম হচ্ছেন আরবদের পূর্বপুরুষ, হাম সুদানীদের পূর্বপুরুষ এবং ইয়াফিছ তুর্কীদের পূর্বপুরুষ। সুতরাং ইয়াজুজ-মাজুজ তুর্কীদেরই গোত্র। এরা মোঙ্গল সম্প্রদায়ভুক্ত। দুর্ধর্ষতা ও ধ্বংস সাধনে এরা মোঙ্গলীয়দের অন্যান্য শাখার তুলনায় অগ্রগামী। সাধারণ মানুষের তুলনায় সাধারণ মোঙ্গলীয়দের যে অবস্থান, সাধারণ মোঙ্গলদের তুলনায় ইয়াজুজ-মাজুজের অবস্থা তদ্রুপ। কথিত আছে, তুর্কীদের এরূপ নামকরণের কারণ হল বাদশা যুলকারনাইন যখন তাঁর ঐতিহাসিক প্রাচীর তৈরি করেন, তখন ইয়াজুজ-মাজুজকে ওই প্রাচীরের পিছনে থাকতে বাধ্য করেন। ওদের একটি গোত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রাচীরের এদিকে রয়ে গিয়েছিল। এদের দুর্ধর্ষতা পূর্বোক্তদের সমপর্যায়ের

ছিল না। ওদেরকে প্রাচীরের এ পাশে রেখে দেওয়া হয়েছিল। তাই তাদের নাম হয়েছে তুর্ক বা পরিত্যক্ত।

কেউ কেউ বলেন, ইয়াজুজ-মাজুজের সৃষ্টি হযরত আদম আ.-এর স্বপ্নদোষকালীন বীর্য থেকে। ওই বীর্য মাটির সাথে মিলিত হয় এবং তা থেকে তারা সৃষ্টি হয়েছিল। তারা হযরত হাওয়া আ.-এর গর্ভজাত সন্তান নয়। শায়খ আবু যাকারিয়া নববী সহি মুসলিমের ভাষ্যগ্রন্থ ও অন্যান্য গ্রন্থে এ বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন এবং এ বক্তব্য যথার্থভাবেই দুর্বল বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। কারণ, এর পক্ষে কোনো দলিল প্রমাণ নেই। বরং কুরআনের আয়াত দ্বারা আমরা প্রমাণ করেছি, এ যুগের সকল মানুষই নূহ আ.-এর বংশধর। উপর্যুক্ত বক্তব্য তার বিপরীত।

যারা মনে করেন, ইয়াজুজ-মাজুজের অবয়ব বিভিন্ন প্রকৃতির এবং শারীরিক দৈর্ঘ্যে তাদের মধ্যে পরস্পরের ব্যবধান বিস্তর। কতক হল সুদীর্ঘ খেজুর গাছের মতো আর কতক একেবারে খাটো। তাদের কতক এমন, এক কান বিছিয়ে অপর কান দিয়ে নিজেকে ঢেকে নেয়। এ সব উক্তির কোনো প্রমাণ নেই; এগুলো নেহায়েত কাল্পনিক উক্তি। সঠিক মত হল, তারা হযরত আদম আ.-এর বংশধর এবং তাদের আকৃতি-প্রকৃতিও সাধারণ মানুষের মতোই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ اللهَ خَلَقَ اٰدَمَ وَطُوْلُهُ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا

আল্লাহ তাআলা হযরত আদম আ.-কে সৃষ্টি করেছেন।

হযরত আদম আ.-এর দৈর্ঘ্য ছিল ষাট হাত। তারপর মানুষ ক্রমান্বয়ে খাটো হতে হতে বর্তমান পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। এ বিষয়ে এটিই চূড়ান্ত কথা। কেউ কেউ যে বলেন, ওদের একজনের ঔরসে ১০০০ সন্তান জন্মগ্রহণ না করা পর্যন্ত তার মৃত্যু হয় না। এ বর্ণনাটি বিশুদ্ধ প্রমাণিত হলে তবেই আমরা মানব। অন্যথায় আমরা এটি প্রত্যাখ্যানও করব না। কারণ, বিবেক-বুদ্ধি এবং রেওয়ায়েতের আলোকে এমনটি হওয়াও সম্ভব। আল্লাহই সর্বজ্ঞ। অবশ্য এ ব্যাপারে একটি হাদীসও রয়েছে। তবে তা প্রমাণ সাপেক্ষ।

আল্লামা তাবারানী বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন :

إِنَّ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ مِنْ وُلْدِ اٰدَمَ وَلَوْ أُرْسِلُوْا لَأَفْسَدُوْا عَلَى النَّاسِ مَعَائِشَهُمْ وَلَنْ يَّمُوْتَ مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا تَرَكَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ أَلْفًا فَصَاعِدًا۔

"ইয়াজুজ-মাজুজ হযরত আদম আ.-এর বংশধর। তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হলে মানবজাতির জীবনোপকরণগুলো ধ্বংস করে দিত। এক হাজার কিংবা ততোধিক সন্তানের জন্ম না দেওয়া পর্যন্ত তাদের কোনো পুরুষের মৃত্যু হয় না। ওদের পশ্চাতে

রয়েছে তিনটি দল –তাবীল, তারীগ ও মানসাক।" এটি একটি চূড়ান্ত গরীব পর্যায়ের হাদীস। এর সনদ দুর্বল এবং এতে অগ্রহণযোগ্য বর্ণনাকারী রয়েছে।

ইবনে জারীর রহ. তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে এ মর্মে একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন, মেরাজের রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওদের নিকট গিয়েছিলেন এবং তাদেরকে আল্লাহর পথে আসার দাওয়াত দিয়েছিলেন। তারা তাঁর ডাকে সাড়া দেয় নি এবং তাঁর অনুসরণ করে নি। তিনি ওখানকার ওই উম্মতত্রয়কেও দাওয়াত দিয়েছিলেন। এরা তাঁর আহবানে সাড়া দিয়েছিল। মূলত এটি একটা জাল হাদিস। এটা আবু নুআইম আমর ইবনে সুবাহর গড়া জাল বর্ণনা। মিথ্যা হাদীস রচনার স্বীকারোক্তিকারীদের সে অন্যতম।

যদি কেউ প্রশ্ন করেন, সহি বুখারী ও সহি মুসলিমের হাদীস কী করে প্রমাণ করে কিয়ামতের দিনে ইয়াজুজ-মাজুজ সম্প্রদায় ঈমানদারদের বদলে জাহান্নামে যাবে, অথচ ইয়াজুজ-মাজুজের নিকট তো কোনো রাসূল প্রেরিত হন নি? অপরদিকে আল্লাহ তাআলা বলেছেন : وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا –আমি রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দেই না?

তা হলে এ প্রশ্নের উত্তর হবে, তাদের বিরুদ্ধে অপরাধ সাব্যস্ত না করে এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে না। যেমনটি উপর্যুক্ত আয়াতে রয়েছে। তারা যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্ববর্তী সময়ের লোক হয়ে থাকে এবং তাদের প্রতি অন্যান্য রাসূল এসে থাকেন, তবে তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ তো সাব্যস্ত হয়েই গিয়েছে। আর যদি তাদের প্রতি কোনো রাসূল প্রেরিত না হয়ে থাকেন, তবে তাদের বিধান হবে দুই রাসূলের অন্তবর্তী যুগের লোকদের মতো এবং যাদের নিকট দাওয়াত পৌঁছে নি তাদের মতো।

এ বিষয়ে একাধিক সাহাবী থেকে বর্ণিত হাদিস রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এ পর্যায়ের লোকদের কিয়ামতের ময়দানে পরীক্ষা করা হবে। তখন যে ব্যক্তি সত্যের ডাকে সাড়া দিবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর যে ব্যক্তি তা প্রত্যাখ্যান করবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। শায়খ আবুল হাসান আশআরি রহ. এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের ইজমা বা ঐকমত্য রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন।

তাদেরকে পরীক্ষা করায় তাদের মুক্তি অনিবার্য সাব্যস্ত হয় না এবং এটি তাদের জাহান্নামী হওয়া বিষয়ক সংবাদের পরিপন্থীও নয়। কারণ, আল্লাহ তাআলা তো রাসূলকে আপন ইচ্ছা মোতাবেক অদৃশ্য বিষয়াদি অবহিত করেন। আল্লাহ তাঁকে অবহিত করেছেন, ওরা পাপাচারী লোক এবং তাদের প্রকৃতিই সত্য গ্রহণে ও সত্যের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তারা সত্যের আহবানকারীর ডাকে সাড়া দিবে না। এতে প্রমাণিত হয়, দুনিয়াতে তাদের নিকট

সত্যের দাওয়াত পৌঁছলে তারা অধিকতর দৃঢ়তার সাথে প্রত্যাখ্যান করত। কারণ, দুনিয়াতে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী অনেক মানুষই ভয়ংকর কিয়ামতের ময়দানে আনুগত্য প্রদর্শন করবে। সুতরাং ওই সব ভয়ংকর অবস্থা দর্শনের পর ঈমান আনা, দুনিয়ায় ঈমান আনা অপেক্ষা অধিকতর যুক্তিযুক্ত। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ

"এবং হায়, যদি তুমি দেখতে যখন অপরাধীরা তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে নতশির হয়ে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা প্রত্যক্ষ করলাম ও শ্রবণ করলাম, এখন তুমি আমাদেরকে পুনরায় প্রেরণ কর। আমরা সৎকর্ম করব, আমরা তো দৃঢ় বিশ্বাসী।"

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا

"ওরা সেদিন আমার নিকট আসবে সেদিন কত স্পষ্ট শুনবে ও দেখবে।"

ইতঃপূর্বে আলোচিত হয়েছে, যুলকারনাইন প্রাচীরটি নির্মাণ করেছেন লোহা ও তামা দ্বারা এবং সেটিকে তিনি সুউচ্চ, সুদৃঢ় ও সুদীর্ঘ পর্বতের সমান করেছেন। পৃথিবীর বুকে এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ উপকারী নির্মাণ কাজ আর আছে বলে জানা যায় না।

প্রাচীরটির অবস্থান

ইমাম বুখারী রহ. বলেন, এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, আমি ওই প্রাচীরটি দেখেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কেমন দেখেছ? সে বলল, জমকালো চাদরের মতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমিও তাই দেখেছি। ইমাম বুখারী রহ. এ হাদিসটি সনদ উল্লেখ না করেই দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে উদ্ধৃত করেছেন।

তবে হযরত কাতাদা রহ. থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি বলেছিল : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীর দেখেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তা হলে আমার নিকট সেটির বর্ণনা দাও। সে বলল, সেটি ডোরাদার চাদরের মতো, যার একটি ডোরা কালো এবং অপরটি লাল ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমিও তাই দেখছি। কথিত আছে, খলিফা ওয়াসিক বিল্লাহ যুলকারনাইনের প্রাচীর দেখার জন্য একদল প্রতিনিধি প্রেরণ করেছিলেন। পথে অবস্থিত রাজ্যসমূহের রাজাদের নিকট তিনি চিঠি লিখে দিয়েছিলেন, যেন তাঁরা ওই প্রতিনিধি দলকে নিজ নিজ রাজ্য অতিক্রম করে প্রাচীর পর্যন্ত পৌঁছার ব্যাপারে সাহায্য করেন। যাতে তারা প্রাচীর সম্পর্কে অবগতি লাভ করতে পারেন এবং

যুলকারনাইন এটি কিভাবে নির্মাণ করেছেন, তা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করতে পারে। ওই প্রতিনিধি দলটি ফিরে এসে উক্ত প্রাচীর সম্পর্কে বর্ণনা দেয়, তাতে একটি বিরাট দরজা রয়েছে। দরজায় রয়েছে বহু তালা। এটি সুউচ্চ, মজবুত ও সুদৃঢ়। প্রাচীরটি নির্মাণের পর যে লোহার ইট ও যন্ত্রপাতি অবশিষ্ট ছিল, সেগুলো একটি সুদৃঢ় মহলের মধ্যে রক্ষিত আছে। তারা আরও বলেন, সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর রাজাদের পক্ষ থেকে নিয়োজিত প্রহরীগণ সার্বক্ষণিক ওই প্রাচীরটি প্রহরায় নিয়োজিত রয়েছে। এটির অবস্থান ছিল পৃথিবীর উত্তরপূর্ব কোণের উত্তর-পূর্ব অংশে। কথিত আছে, তাদের শহর বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ও প্রশস্ত ছিল। কৃষিকাজ ও জলে-স্থলে শিকার করে তারা জীবিকা নির্বাহ করত। একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা ব্যতীত ওদের সংখ্যা কেউ জানে না।

যদি কেউ প্রশ্ন করে, আল্লাহ তাআলার বাণী :

فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا

(এরপর তারা সেটি অতিক্রম করতে পারল না এবং ভেদ করতেও পারল না) এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত হাদীসটির মাঝে সমন্বয় সাধন করা যাবে কিভাবে? যেমন ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহ. উদ্ধৃত করেছেন, উম্মুল মুমিনীন যায়নাব বিনতে জাহাশ রাযি. বলেন : একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। তাঁর মুখমণ্ডল তখন রক্তিম বর্ণ। তিনি বলছিলেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ! আরবদের ধ্বংস নিকটবর্তী। আজ ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীর এতটুকু ছিদ্র হয়ে গেছে। (এরপর তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনী দ্বারা বৃত্ত বানিয়ে দেখান)। আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে সৎকর্মশীল ব্যক্তিগণ থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। যখন পাপাচার বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং এর কী সমাধান?

উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর হতে পারে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "প্রাচীর খুলে গিয়েছে" বাক্যাংশের দ্বারা ফিতনা ও অকল্যাণের দরজাগুলো খুলে গিয়েছে বুঝিয়েছেন। এটি একটি রূপক বাক্য ও বাগধারা স্বরূপ। তাই এতে কোনো অসঙ্গতি নেই। অথবা বলা হবে, 'প্রাচীর খুলে গিয়েছে' বাক্যাংশের দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাস্তবে প্রাচীর খুলে গিয়েছে বুঝিয়েছেন এবং আয়াতে "তারা এটি অতিক্রম করতে পারল না এবং ভেদ করতেও পারল না" দ্বারা তখনকার সময়ের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে। কারণ, আয়াতে বর্ণিত শব্দ অতীতবাচক। সুতরাং পরবর্তীকালে তাতে ছিদ্র হয়ে যাওয়া আয়াতের পরিপন্থী নয়। হতে পারে পরবর্তীকালে আল্লাহর অনুমতিক্রমে এবং আল্লাহ কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে তারা অল্প অল্প করে ক্রমান্বয়ে ওই নির্ধারিত সময়ে প্রাচীর ক্ষয় করে ফেলবে। অবশেষে এক সময়ে নির্ধারিত মেয়াদও পূর্ণ হবে এবং আল্লাহর নির্ধারিত উদ্দেশ্যও সফল হবে। তারপর তারা বেরিয়ে পড়বে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُوْنَ

"এবং তারা প্রতি উচ্চ ভূমি হতে ছুটে আসবে।"

অবশ্য অন্য এক হাদিসের কারণে আরও সমস্যা সৃষ্টি হয়। হাদীসটি ইমাম আহমদ রহ. তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে আবু হোরায়রা রাযি. সূত্রে উদ্ধৃত করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : ইয়াজুজ-মাজুজ প্রতিদিন ওই প্রাচীরটি খুঁড়ে চলছে। খুঁড়তে খুঁড়তে তারা যখন এতটুকু পৌঁছে, যাতে সূর্যের আলো দেখতে পাওয়ার উপক্রম হয়, তখন তাদের উট ও বকরির নাকে জন্ম নেয় এমন কীট। তখন নেতা বলে, আজ তোমরা ফিরে যাও; আগামী কাল অনায়াসে খোঁড়া শেষ করে দিব। পরের দিন তারা এসে দেখতে পায়, পূর্বে যতটুকু ছিল, প্রাচীরটি এখন তার চাইতে অধিকতর মজবুত হয়ে রয়েছে। এভাবে যখন তাদের অবরুদ্ধ রাখার মেয়াদ শেষ হবে এবং আল্লাহ তাআলা তাদেরকে লোকালয়ে প্রেরণের ইচ্ছা করবেন, তখন তারা খুঁড়তে খুঁড়তে সূর্যের আলো দেখার পর্যায়ে চলে এলে তাদের নেতা বলবে, এখন ফিরে যাও, আগামীকাল ইনশাআল্লাহ খোঁড়া শেষ করতে পারবে।

পরদিন তারা এসে প্রাচীরটিকে পূর্ববর্তী দিবসের রেখে যাওয়া অবস্থায় দেখতে পাবে। তখন তারা খননকার্য শেষ করে লোকালয়ে বেরিয়ে আসবে। তারা পৃথিবীর সব পানি পান করে ফেলবে। লোকজন নিজ নিজ দুর্গে আশ্রয় নিবে। এরপর ইয়াজুজ-মাজুজ আকাশের দিকে তীর নিক্ষেপ করবে। রক্তের চিহ্নসহ তীর ফিরে আসবে। তারা বলবে, আমরা পৃথিবীর অধিবাসীদেরকে পদানত করেছি এবং আকাশের অধিবাসীদের উপর বিজয় লাভ করেছি। তারপর আল্লাহ তাআলা তাদের ঘাড়ে কীট সৃষ্টি করে দিবেন। এ কীটের দ্বারা তিনি তাদেরকে ধ্বংস করবেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন :

وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ اِنَّ دَوَابَّ الْاَرْضِ لَتَسْمَنُ وَتَشْكُرُ شُكْرًا

"যে মহান সত্তার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ তাঁর শপথ! ওদের গোশত ও রক্ত খেয়ে পৃথিবীর জীবজন্তুগুলো মোটা তাজা হয়ে উঠবে এবং শোকর আদায় করবে।"

ইমাম আহমদ রহ. ইবনে মাজাহ ও তিরমিযি রহ. ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযি রহ. হাদিসটি গরীব পর্যায়ের বলে মন্তব্য করেছেন। এ হাদিসে রয়েছে, ওরা প্রতিদিন জিহবা দিয়ে ওই প্রাচীরটি চাটতে থাকে। চাটতে চাটতে প্রাচীরটি এমন পাতলা হয়ে যায়, অপর দিকে সূর্যের কিরণ দেখা যাওয়ার উপক্রম হয়। এটি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তি না হয়ে কাব আহবাবের উক্তি হয়– যেমনটি কেউ কেউ বলেছেন, তবে আমরা ওই অসঙ্গতির হাত থেকে মুক্তি পাই। আর এটি যদি প্রকৃতই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী হয়ে থাকে, তবে বলা হবে, তাদের ওই কর্মতৎপরতা চলবে আখেরী যামানায় তাদের

বেরিয়ে আসার নিকটবর্তী সময়ে, যেমন কাব আহবার থেকে বর্ণিত হয়েছে। অথবা বলা যাবে, وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا অর্থ, এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত ছিদ্র করে সারতে পারে নি। সুতরাং এটি তাদের জিহবা দিয়ে চাটা। অথচ ছিদ্র না করা এর পরিপন্থী নয়। আল্লাহই সর্বজ্ঞ। এ সূত্রে আলোচ্য হাদিস এবং সহি বুখারী ও মুসলিমে উদ্ধৃত হাদিস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী "আজ ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীর এ পরিমাণ ছিদ্র হয়ে গেছে"-এর সমন্বয় এনে বলা হবে- 'আজ ছিদ্র হয়ে গিয়েছে' অর্থ প্রাচীরের এপার-ওপার ভেদ করে ছিদ্র হয়েছে। আল্লাহই সম্যক জ্ঞাত।

হযরত ঈসা আ.

হযরত ঈসা আ.-এর বিবরণ

খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, আল্লাহর সন্তান আছে। তাদের এ ভ্রান্ত বিশ্বাসের খণ্ডনে আল্লাহ তাআলা সূরা আলে-ইমরানের প্রথম দিকে ধারাবাহিকভাবে তিরাশিটি আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। নাজরান থেকে খ্রিষ্টানদের একটি প্রতিনিধিদল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে তাদের ভ্রান্ত ধর্ম-বিশ্বাসের কথা ব্যক্ত করে বলে, তারা ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী এবং তাদের ধারণা অনুসারে আল্লাহ হচ্ছেন তিন সত্তার এক সত্তা। তাদের মধ্যকার বিভিন্ন দল উপদলের মধ্যে এক দলের মতে সেই তিন সত্তা হল : আল্লাহ, ঈসা আ. ও মারিয়াম। এ প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তাআলা সূরার প্রারম্ভে উক্ত বিষয়ে আয়াত নাযিল করেন। তাতে তিনি বলেন, ঈসা আ. আল্লাহর বান্দাদের মধ্যকার একজন বান্দা। অন্যান্য সৃষ্টির মতো আল্লাহ তাঁকেও সৃষ্টি করেছেন এবং মাতৃগর্ভে আকৃতি দান করেছেন। তবে আল্লাহ তাঁকে পিতা ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন, যেমন আদমকে পিতা ও মাতা ছাড়া সৃষ্টি করেছেন। তাঁর ক্ষেত্রে তিনি কেবল বলেছেন, 'কুন' (হয়ে যাও), তখনই তিনি সৃষ্ট হয়ে যান। এ সম্পর্কে সূরা আলে-ইমরানে আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (٣٣) ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٣٤) إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٣٥) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (٣٦) فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

"নিশ্চয়ই আদম, নূহ ও ইবরাহীম ও ইমরানের বংশধরকে আল্লাহ বিশ্বজগতে মনোনীত করেছেন। এরা একে অপরের বংশধর। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। স্মরণ কর, যখন ইমরানের স্ত্রী বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! আমার গর্ভে যা আছে, তা একান্ত তোমার জন্যে আমি উৎসর্গ করলাম। সুতরাং তুমি আমার নিকট হতে তা কবুল কর, তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। এরপর যখন সে তাকে প্রসব করল তখন সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি কন্যা প্রসব করেছি। সে যা প্রসব করেছে, আল্লাহ তা সম্যক অবগত। ছেলে তো এ মেয়ের মতো নয়, আমি তার নাম মারিয়াম রেখেছি এবং অভিশপ্ত শয়তান হতে তার ও তার বংশধরদের জন্যে তোমার আশ্রয় নিচ্ছি। এরপর তার প্রতিপালক তাকে সাগ্রহে কবুল করলেন এবং তাকে উত্তমরূপে লালন-পালন করলেন এবং তিনি তাকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে রেখেছিলাম। যখনই যাকারিয়া কক্ষে তার সাথে সাক্ষাৎ করতে যেত, তখনই তার নিকট খাদ্যসামগ্রী দেখতে পেত। সে বলত, হে মারিয়াম! এ সব তুমি কোথায় পেলে? সে বলত, এটা আল্লাহর নিকট হতে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবনোপকরণ দান করেন।"(সূরা আলে-ইমরান : ৩৩-৩৭)

আল্লাহ এখানে আদম আ.-কে এবং তাঁর সন্তানদের মধ্যে যারা তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণে অটল ও অবিচল ছিলেন, বিশেষভাবে হযরত ইবরাহীম আ.-এর বংশধর, তাঁর বংশের ইসমাঈলী শাখা ও ইসহাকের শাখা এবং ইমরান পরিবারের মর্যাদা বর্ণনা করেছেন। এখানে ইমরান বলতে মারিয়ামের পিতা উদ্দেশ্য।

ইমরানের পরিচয়

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইমরানের নসবনামা উল্লেখ করেছেন। ইমরান ইবনে বাশিম ইবনে আমূন ইবনে মীশা ইবনে হিযকিয়া ইবনে আহরীক ইবনে মুছাম ইবনে আযাবিয়া ইবনে আমসিয়া ইবনে ইয়াউশ ইবনে আহরীহ ইবনে ইয়াযাম ইবনে ইয়াহফাশাত ইবনে ঈশা ইবনে আয়ান ইবনে রাহবিআম ইবনে সুলাইমান ইবনে দাউদ আ.।

অপরদিকে ইবনে আসাকিরের বর্ণনা মতে হযরত মারিয়াম আ. এর বংশধারা হল : মারিয়াম বিনতে ইমরান ইবনে মাছান ইবনুল আযির ইবনুল ইয়াওদ ইবনে আখনার ইবনে সাদূক ইবনে 'আয়াযূয ইবনে আল-য়াকীম ইবনে আয়বূদ ইবনে যারয়াবীল ইবনে মাওছাম ইবনে আযরিয়া ইবনে য়ূরাম ইবনে য়ূশাফাত ইবনে ঈশা ইবনে ঈবা ইবনে রাহরিআম ইবনে সুলায়মান ইবনে দাউদ আ.।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের বর্ণিত নসবনামার সাথে এ নসবনামার যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। তবে মারিয়াম আ. যে দাউদ আ.-এর বংশধর, এ ব্যাপারে কোনো বিরোধ নেই। মারিয়ামের পিতা ইমরান ছিলেন যে যুগে বনি ইসরাঈলের ইমাম। তাঁর মা হান্না বিনতে ফাকূদ ইবনে কাবীল ছিলেন ইবাদতগুজার মহিলা। আর হযরত যাকারিয়া আ. ছিলেন সে যুগের নবী।

অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে তিনি ছিলেন মারিয়ামের বোন আশইয়ার স্বামী। কিন্তু কারও কারও মতে মারিয়ামের খালার নাম ছিল আশইয়া' এবং যাকারিয়া ছিলেন এ আশইয়ার স্বামী।

ইমরানের স্ত্রীর সন্তান প্রার্থনা

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ও অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, মারিয়াম আ. এর মায়ের কোনো সন্তান হত না। এ অবস্থায় একদিন তিনি দেখেন, একটি পাখি তার ছানাকে আদর-সোহাগ করছে। এ দৃশ্য দেখে তাঁর অন্তরে সন্তান লাভের অদম্য আগ্রহ জাগে। তখনই তিনি মানত করলেন, তিনি যদি গর্ভবতী হন তবে তাঁর পুত্র সন্তানকে আল্লাহর জন্যে উৎসর্গ করবেন; বায়তুল মুকাদ্দাসের খাদেম বানাবেন। মানত করার সাথে সাথেই তাঁর মাসিক স্রাব আরম্ভ হয়ে যায়। পবিত্র হওয়ার পর তাঁর স্বামী তাঁর সাথে মিলিত হন এবং মারিয়াম তাঁর গর্ভে আসেন।

আল-কুরআনের ভাষ্য হচ্ছে, এরপর সে যখন তাকে প্রসব করল, তখন সে বলল– হে আমার প্রতিপালক! আমি কন্যাসন্তান প্রসব করেছি। আর বায়তুল মুকাদ্দাসের খেদমতের ব্যাপারে কন্যাসন্তান পুত্র সন্তানের মতো নয়। উল্লেখ্য, সে যুগের লোকেরা বায়তুল মুকাদ্দাসের খেদমতের জন্যে নিজেদের সন্তান মান্নত করত। মারিয়ামের মা তার নাম রাখল মারিয়াম।"

শয়তান থেকে আশ্রয় কামনা

এরপর তার মা বললেন, "আমি একে এবং এর ভবিষ্যৎ বংশধরকে বিতাড়িত শয়তান থেকে রক্ষা করার জন্যে তোমারই আশ্রয় চাই।" মারিয়ামের মায়ের এ দুআ তাঁর মানতের মতই কবুল হয়েছিল। এ সম্পর্কে হাদিসে আছে, ইমাম আহমদ আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে কোনো সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় শয়তান তাকে স্পর্শ করে, তাই সে চিৎকার করে কাঁদতে থাকে। কেবল মারিয়াম ও তার পুত্র এর ব্যতিক্রম। আবু হোরায়রা রাযি. বলেন, তোমরা ইচ্ছে করলে কুরআনের এ আয়াত পড়তে পার :

وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

ইমাম আহমদ রহ. ভিন্ন সূত্রে আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বনি আদমের প্রতিটি নবজাত শিশুকে শয়তান আঙ্গুল দিয়ে স্পর্শ করে। কেবল মারিয়াম বিনতে ইমরান ও তাঁর পুত্র ঈসা এর ব্যতিক্রম। ভিন্ন সূত্রে আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোনো মা যখন সন্তান প্রসব করে, তখন মায়ের কোলেই শয়তান তাকে ঘুষি মারে। কেবল মারিয়াম ও তার পুত্র এর ব্যতিক্রম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরপর জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা কি দেখেছ, শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন চিৎকার করে কাঁদে? সাহাবাগণ বললেন : হ্যাঁ,

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা দেখেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ চিৎকার তখনই সে দেয়, যখন মায়ের কোলে শয়তান তাকে ঘুষি মারে। এ হাদীসটি মুসলিমের শর্তানুযায়ী বর্ণিত।

কায়স আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কোনো শিশু ভূমিষ্ঠ হলে শয়তান তাকে একবার বা দুবার চাপ দেয়। কেবল ঈসা ইবনে মারিয়াম ও মারিয়াম এ থেকে রক্ষা পেয়েছে। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত পাঠ করলেন। "আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে তার ও তার বংশধরদের জন্যে তোমার আশ্রয় চাই।"

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ও ইমাম আহমদ আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : প্রতিটি আদম সন্তান, যখন সে ভূমিষ্ঠ হয় তখন শয়তান তার পার্শ্বদেশে খোঁচা মারে। কেবল ঈসা ইবনে মারিয়াম এর ব্যতিক্রম। শয়তান ঈসাকে খোঁচা মারতে গিয়ে পর্দায় খোঁচা মেরে চলে যায়। এ হাদীস বুখারী ও মুসলিমের শর্তে বর্ণিত।

অনেক মুফাস্‌সির লিখেছেন, মারিয়াম ভূমিষ্ঠ হলে তাঁর মা তাঁকে একটি কাপড়ে জড়িয়ে বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদে চলে যান এবং সেখানকার ইবাদতকারী লোকদের নিকট সোপর্দ করেন। মারিয়াম আ. ছিলেন তাদের নেতা ও নামাযের ইমামের কন্যা। তাই তার দেখাশুনার দায়িত্ব কে নিবে, এ নিয়ে তারা বাদানুবাদে লিপ্ত হয়। বলাবাহুল্য, মারিয়ামের দুগ্ধপানের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেই তাকে বায়তুল মুকাদ্দাসে ইবাদতকারীদের দায়িত্বে সোপর্দ করা হয়েছিল। মারিয়ামকে যখন তাদের কাছে সোপর্দ করা হয়, তখন তারা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় কে তার দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

হযরত যাকারিয়া আ. ছিলেন সে যুগের নবী। তিনি চাচ্ছিলেন নিজের দায়িত্বে রাখতে এবং এ ব্যাপারে অন্যদের তুলনায় তাঁরই হক ছিল সর্বাধিক। কেননা তাঁর স্ত্রী ছিলেন মারিয়ামের বোন, মতান্তরে খালা। কিন্তু অন্যরা এতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করল এবং লটারীর মাধ্যমে ফয়সালা করার দাবি জানাল। এরপর লটারী করা হল এবং তাতে যাকারিয়া আ.-এর নাম উঠল। প্রকৃতপক্ষে খালা তো মায়েরই তুল্য।

মুফাসসিরগণ লিখেছেন, কলমের মাধ্যমে লটারী তিনবার হয়েছিল। প্রথমবার প্রত্যেক নিজ নিজ কলমে চিহ্ন দিয়ে এক জায়গায় রেখে দেয়। এরপর একজন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালককে সেখান থেকে একটা কলম উঠিয়ে আনতে বলে। দেখা গেল, যাকারিয়ার কলমই উঠে এসেছে। তাদের দাবি অনুযায়ী দ্বিতীয়বার লটারী করা হয়। এবার লটারীর পদ্ধতি ঠিক করা হয়, প্রত্যেকের কলম নদীর মধ্যে ফেলে দেওয়া হবে। তারপর যার কলম স্রোতের বিপরীত দিকে চলবে, সে জয়ী হবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কলম নদীতে নিক্ষেপ করা হয়। দেখা গেল, যাকারিয়া আ. এর কলম স্রোতের বিপরীতে চলছে এবং অন্য সবার কলম স্রোতের অনুকূলে প্রবাহিত হচ্ছে। তখন তারা

তৃতীয়বার লটারী করার দাবি জানাল এবং বলল, এবার যার কলম স্রোতের অনুকূলে চলবে এবং অন্যদের কলম উজানের দিকে যাবে, সেই জয়ী হবে। এবারের লটারীতেও যাকারিয়া আ. জয়ী হলেন এবং মারিয়ামের তত্ত্বাবধানের অধিকার লাভ করলেন। শরিয়তের বিচারে এবং লটারীতে জয়ী হওয়ায় তাঁর অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

মুফাসসিরগণ লিখেছেন, হযরত যাকারিয়া আ. মারিয়ামের জন্যে বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদে একটি উত্তম কক্ষ নির্ধারণ করে দেন। তিনি ছাড়া ওই কক্ষে অন্য কেউ প্রবেশ করত না। মারিয়াম আ. এ কক্ষে অবস্থান করে আল্লাহর ইবাদত করতেন। মসজিদের কোনো খেদমতের সুযোগ যখন আসত, তখন তিনি সে দায়িত্ব পালন করতেন। রাত-দিন সর্বদা সেখানে তিনি আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকতেন। তিনি এত বেশি পরিমাণে আল্লাহর ইবাদত করতেন, বনি ইসরাঈলের মধ্যে তাঁর ইবাদতকে দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা হত। তাঁর বহু কারামত ও বৈশিষ্ট্যের কথা ইসরাঈলী সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করে। হযরত যাকারিয়া আ. যখনই মারিয়ামের কক্ষে প্রবেশ করতেন, তখনই তার নিকট বেমৌসুমের বিরল খাদ্য দ্রব্য দেখতে পেতেন। যেমন, শীত মৌসুমে গ্রীষ্মের ফল এবং গ্রীষ্ম মৌসুমে শীতকালের ফল দেখতে পেতেন। কাজেই তখন তিনি জিজ্ঞেস করতেন, মারয়াম! এসব তুমি কোথায় পেলে? সে বলত, এসব আল্লাহর নিকট থেকে। আল্লাহই এসব খাদ্য সামগ্রী আমার জন্যে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন, অপরিমিত রিযিক দান করেন। সেখানেই যাকারিয়ার মনে পুত্র-সন্তানের আকাঙ্ক্ষা জাগে এবং বয়স অনেক বেশী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর নিকট দু'আ করে বলেন, "হে আমার পালনকর্তা! আমাকে তুমি তোমার নিকট থেকে সৎ বংশধর দান কর। নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী।" এর পরবর্তী ঘটনাবলী আমরা যথাস্থানে বর্ণনা করে এসেছি।

এরপর আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ (٤٢) يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ (٤٣) ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ (٤٤) إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (٤٥) وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ (٤٦) قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٤٧) وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ (٤٨) وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ

فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٤٩) وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (٥٠) إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (٥١) فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ–

"স্মরণ কর, যখন ফেরেশতাগণ বলেছিল, হে মারিয়াম! আল্লাহ্ তোমাকে মনোনীত ও পবিত্র করেছেন এবং বিশ্বের নারীগণের মধ্যে তোমাকে মনোনীত করেছেন। হে মারিয়াম! তোমার প্রতিপালকের অনুগত হও ও সিজদা কর এবং যারা রুকু করে তাদের সাথে রুকু কর। এটা অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ, যা তোমাকে ওহী দ্বারা অবহিত করছি। মারিয়ামের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাদের মধ্যে কে গ্রহণ করবে এর জন্যে যখন তারা তাদের কলম নিক্ষেপ করছিল, তুমি তখন তাদের নিকট ছিলে না এবং তারা যখন বাদানুবাদ করছিল তখনও তুমি তাদের নিকট ছিলে না। স্মরণ কর, যখন ফেরেশতাগণ বলল, হে মারিয়াম! আল্লাহ্ তোমাকে তাঁর পক্ষ হতে একটি কলেমার সুসংবাদ দিচ্ছেন। তার নাম মসীহ– মারিয়াম তনয় ঈসা, সে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত এবং সান্নিধ্যপ্রাপ্তগণের অন্যতম হবে। সে দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে মানুষের সাথে কথা বলবে এবং সে হবে পুণ্যবানদের একজন।

সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে কোনো পুরুষ স্পর্শ করে নি, আমার সন্তান হবে কীভাবে? তিনি বললেন, 'এভাবেই', আল্লাহ্ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কিছু স্থির করেন, তখন বলেন, 'হও' আর তা হয়ে যায়। এবং তিনি তাকে শিক্ষা দিবেন কিভাবে, হিকমত, তাওরাত ও ইনজিল এবং তাকে বনি ইসরাঈলের জন্যে রাসূল করবেন। সে বলবে, আমি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের নিকট নিদর্শন নিয়ে এসেছি। আমি তোমাদের জন্যে কাদা দ্বারা একটি পাখির মতো আকৃতি গঠন করব; তারপর তাতে আমি ফুঁৎকার দিব; ফলে আল্লাহ্‌র হুকুমে তা পাখি হয়ে যাবে। আমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে নিরাময় করব এবং আল্লাহ্‌র হুকুমে মৃতকে জীবন্ত করব। তোমরা তোমাদের ঘরসমূহে যা আহার কর ও মওজুদ কর, তা তোমাদেরকে বলে দিব। তোমরা যদি মুমিন হও, তবে এতে তোমাদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে। আর আমি এসেছি আমার সম্মুখে তাওরাতের যা রয়েছে, তার সমর্থকরূপে ও তোমাদের জন্যে যা নিষিদ্ধ ছিল তার কতকগুলোতে বৈধ করতে এবং আমি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট নিদর্শন নিয়ে এসেছি। সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় কর আর আমাকে অনুসরণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদত করবে। এটাই সরল পথ।

(সূরা আলে ইমরান : ৪২-৫১)

ফেরেশতাগণের সুসংবাদ

ফেরেশতাগণ মারিয়াম আ.-কে একদিন সুসংবাদ দিলেন, আল্লাহ তাঁকে সে যুগের সমস্ত নারীদের মধ্যে মনোনীত করেছেন। কেননা তিনি তার থেকে সৃষ্টি করবেন পিতা ছাড়া পুত্র-সন্তান এবং সে পুত্রটি হবেন মর্যাদাশীল নবী। মানুষের সাথে কথা বলবেন দোলনায় থাকা অবস্থায়। শিশুকালেই তিনি মানুষকে ওই একই আহবান জানাতে থাকবেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, মারিয়াম তনয় পরিণত বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকবেন এবং মানুষকে আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহবান করবেন। সেইসঙ্গে তাঁকে বেশি বেশি ইবাদত-বন্দেগী ও রুকু সিজদা করার নির্দেশ দেওয়া হয়। যাতে করে তিনি ওই মর্যাদার যোগ্য হয়ে উঠেন এবং তিনি এ অপার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে পারেন। তিনি এ নির্দেশ পূর্ণভাবে পালন করার চেষ্টা করতেন। কথিত আছে, দীর্ঘক্ষণ নামাযে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তাঁর দু পা ফুলে যেত।

মারিয়াম আ. এর মর্যাদা

ফেরেশতাগণ বলেন, "হে মারিয়াম! আল্লাহ মন্দ চরিত্র থেকে তোমাকে পবিত্র রেখেছেন এবং উত্তম গুণাবলী দ্বারা বিভূষিত করেছেন। তদুপরি তোমাকে বিশ্বের নারীগণের মধ্যে মনোনীত করেছেন। অর্থাৎ সে যুগে বিশ্বে যত নারী ছিল, তাদের উর্ধ্বে।

অথবা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিশ্বের সমস্ত নারীর মধ্যে মারিয়ামই শ্রেষ্ঠ। কেননা তিনি যদি নবী হয়ে থাকেন, যেমনটি ইবনে হাযম প্রমুখের ধারণা। তিনি মনে করেন, ঈসা নবীর মা মারিয়াম, ইসহাক নবীর মা সারা ও মূসা নবীর মা নবী ছিলেন। কেননা এঁদের প্রত্যেকের সাথে ফেরেশতা কথা বলেছেন। তদ্রুফ মূসা নবীর মায়ের নিকটও ওহি এসেছে। এ মত অনুযায়ী মারিয়াম অন্যান্য নারীদের তুলনায় তো বটেই, এমনকি সারা এবং মূসা আ.-এর মায়ের তুলনায়ও শ্রেষ্ঠতর।

ইমাম আহমদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও নাসাঈ রহ. বিভিন্ন সূত্রে হযরত আলি রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নারীদের মধ্যে সর্বোত্তম মারিয়াম বিনতে ইমরান এবং নারীদের মধ্যে সর্বোত্তম খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ। ইমাম আহমদ আনাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বিশ্বজগতে নারীদের মধ্যে কেবল চারজনই শ্রেষ্ঠ। তারা হলেন মারিয়াম বিনতে ইমরান, ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া, খাদিজা বিনতে খুওয়ায়লিদ ও ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ ।

আবু ইয়ালার সূত্রে ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার মাটির উপরে চারটি রেখা আঁকেন এবং সাহাবাগণের নিকট জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি বুঝতে পেরেছ এ রেখা কিসের? তাঁরা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বললেন, জান্নাতবাসী মহিলাদের মধ্যে সর্বোত্তম মহিলা খুওয়াইলিদের কন্যা খাদিজা, মুহাম্মদের কন্যা ফাতেমা, ইমরানের কন্যা মারিয়াম এবং মুযাহিমের কন্যা ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া।

মোটকথা, উপর্যুক্ত হাদীস ছাড়াও এ সম্পর্কিত আরও হাদীস রয়েছে। যার দ্বারা বুঝা যায়, চার জনের মধ্যে ফাতেমা ও মারিয়ামই শ্রেষ্ঠ। তবে এ দুজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? এ বিষয়ে হাদিসের অর্থ দু'রকম হতে পারে। এক. মারিয়াম আ. ফাতেমা রাযি. চেয়ে শ্রেষ্ঠ। দুই. মারিয়াম ও ফাতেমা উভয়ে সমমর্যাদা সম্পন্ন। এ বিষয়ে হাফেজ ইবনে আসাকির ইবনে আব্বাসের এক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "জান্নাতবাসী মহিলাদের মধ্যে সবার শীর্ষে থাকবে মারিয়াম বিনতে ইমরান, তারপরে ফাতেমা তারপরে খাদিজা, তারপরে ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া।"

এখানে শব্দ বিন্যাস থেকে তাঁদের, মর্যাদার ক্রমবিন্যাস বুঝা যায়। ইতঃপূর্বে যে সব হাদীস বর্ণিত হয়েছে, সেখানেও চারজনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে; যার দ্বারা মর্যাদার বিন্যাসও বুঝায় না এবং বিন্যাসের পরিপন্থীও বুঝায় না। এ হাদীসটিই আবু হাতিম রহ. ভিন্ন সূত্রে ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন। সেখানেও বর্ণনা থেকে মর্যাদার ক্রম বিন্যাস বুঝায় না।

ইবনে মারদুই থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পুরুষদের মধ্যে বিপুল সংখ্যক লোক পূর্ণতা (কামালিয়াত) লাভ করেছেন; কিন্তু মহিলাদের মধ্যে তিনজন ছাড়া আর কেউই পূর্ণতা অর্জন করেন নি। তাঁরা হচ্ছেন মারিয়াম বিনতে ইমরান, ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া ও খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ। আর নারীদের মধ্যে আয়েশার মর্যাদা সেই পরিমাণ, যেই পরিমাণ মর্যাদা সমস্ত খাদ্যের মধ্যে ছারীদের।

হযরত ঈসা আ.-এর জন্মগ্রহণ

এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন :

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا (١٦) فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا (١٧) قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا (١٨) قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا (١٩) قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا (٢٠) قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا (٢١) فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا (٢٢) فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا (٢٣) فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا

تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا (٢٤) وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا (٢٥) فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا (٢٦) فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا (٢٧) يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا (٢٨) فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا (٢٩) قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا (٣٠) وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا (٣١) وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا (٣٢) وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا (٣٣) ذَٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ (٣٤) مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٣٥) وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (٣٦) فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ

"বর্ণনা কর এ কিতাবে উল্লিখিত মারিয়ামের কথা, যখন সে তার পরিবারবর্গ থেকে পৃথক হয়ে নিরালায় পূর্ব দিকে এক স্থানে আশ্রয় নিল। তারপর তাদের থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্যে সে পর্দা করল। তারপর আমি তার নিকট আমার রূহকে পাঠালাম। সে তার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল। মারিয়াম বলল, আমি তোমার থেকে দয়াময়ের আশ্রয় চাচ্ছি যদি তুমি মুত্তাকী হও। মারিয়াম বলল, কেমন করে পুত্র হবে যখন আমাকে কোনো পুরুষ স্পর্শ করে নি এবং আমি ব্যভিচারিণীও নই? সে বলল, 'এরূপই হবে'। তোমার প্রতিপালক বলেছেন, এটা আমার জন্যে সহজসাধ্য এবং আমি তাকে এ জন্যে সৃষ্টি করব, যেন সে হয় মানুষের জন্যে এক নিদর্শন ও আমার নিকট হতে এক অনুগ্রহ; এটা তো এক স্থিরকৃত ব্যাপার। তারপর সে গর্ভে তাকে ধারণ করল; তারপর তাকে নিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেল। প্রসব-বেদনা তাকে এক খেজুর গাছের নিচে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। সে বলল, হায়, এর পূর্বে আমি মারা যেতাম ও লোকের স্মৃতি থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হতাম!

ফেরেশতা তার নিচ দিক থেকে আহবান করে তাকে বলল, "তুমি দুঃখ করো না, তোমার নিচ দিয়ে তোমার প্রতিপালক এক নহর সৃষ্টি করেছেন। তুমি তোমার দিকে খেজুর গাছের কাণ্ডে নাড়া দাও, তা তোমাকে পাকা তাজা খেজুর দান করবে। সুতরাং আহার কর, পান কর ও চোখ জুড়াও। মানুষের মধ্যে কাউকেও যদি তুমি দেখ, তখন বলবে– আমি দয়াময়ের উদ্দেশ্যে মৌনতাবলম্বনের মানত করেছি। সুতরাং আজ আমি কিছুতেই কোনো মানুষের সাথে বাক্যালাপ করব না। তারপর সে সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হল। তারা বলল, "হে মারিয়াম! তুমি তো এক অদ্ভুত কাণ্ড

করে বসেছ। হে হারুনের বোন! তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিল না এবং তোমার মা না ছিল ব্যভিচারিণী।" তারপর সন্তানের প্রতি ইঙ্গিত করল। তারা বলল, যে কোলের শিশু, তার সাথে আমরা কেমন করে কথা বলব?

সে বলল, "আমি তো আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন, আমাকে নবী করেছেন। যেখানেই আমি থাকি না কেন তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন জীবিত থাকি ততদিন নামায ও যাকাত আদায় করতে। আর আমাকে আমার মায়ের প্রতি অনুগত করেছেন এবং তিনি আমাকে করেন নি উদ্ধত ও হতভাগ্য। আমার প্রতি শান্তি যে দিন আমি জন্মলাভ করেছি, যেদিন আমার মৃত্যু হবে এবং যেদিন জীবিত অবস্থায় আমি পুনরুত্থিত হব।" এ-ই মারিয়াম তনয় ঈসা। আমি বললাম, সত্য কথা, যে বিষয়ে তারা বিতর্ক করে। সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহর কাজ নয়, তিনি পবিত্র মহিমাময়। তিনি যখন কিছু স্থির করেন, তখন বলেন, 'হও' এবং তা হয়ে যায়। আল্লাহই আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং তার ইবাদত কর, এটাই সরল পথ। তারপর দলগুলি নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করল। সুতরাং দুর্ভোগ কাফেরদের মহাদিবস আগমনকালে।"

(সূরা মারিয়াম : ১৬-৩৭)

সূরা আম্বিয়ায় আল্লাহ পাক বলেন : "এবং স্মরণ কর সেই নারীর কথা, যে নিজ সতীত্বকে রক্ষা করছিল। তারপর আমি তার মধ্যে আমার রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং তাকে ও তার পুত্রকে করেছিলাম বিশ্ববাসীর জন্যে এক নিদর্শন। (সূরা আম্বিয়া : ৮৯-৯১)

পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি, মারিয়ামকে তার মা বায়তুল মুকাদ্দাসের খেদমতের জন্যে উৎসর্গ করেছিলেন। সেখানে মারিয়ামের বোনের স্বামী বা খালার স্বামী যাকারিয়া তাঁর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যিনি ছিলেন ওই যামানার নবী। হযরত যাকারিয়া আ. মারিয়ামের জন্যে বায়তুল মুকাদ্দাসে একটি উত্তম কক্ষ বরাদ্দ করেন। সেখানে তিনি ব্যতীত অন্য কারও প্রবেশের অনুমতি ছিল না। প্রাপ্ত বয়স্কা হলে মারিয়াম আল্লাহর ইবাদতে এত গভীরভাবে নিমগ্ন হন যে, সে যুগে তাঁর মতো এত অধিক ইবাদতকারী অন্য কেউ ছিল না। তাঁর থেকে এমন সব অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পেতে থাকে, যা দেখে হযরত যাকারিয়া আ.-এর মনে ঈর্ষার উদ্রেক হয়। একবার ফেরেশতা তাঁকে সুসংবাদ দিলেন, আল্লাহ তাঁকে বিশেষ উদ্দেশ্যে মনোনীত করেছেন; অচিরেই তাঁর এক পুত্র সন্তান জন্মলাভ করবেন, তিনি হবেন পূতঃপবিত্র সম্মানিত নবী ও বিভিন্ন মুজিযার অধিকারী। পিতা ব্যতীত সন্তান হওয়ার ব্যাপারে মারিয়াম অবাক হয়ে যান। তিনি বললেন, আমার বিবাহ হয় নি, স্বামী নেই, কিরূপে আমার সন্তান হবে? জবাবে ফেরেশতা জানালেন, আল্লাহ সব কিছু করতে সক্ষম। তিনি যখন কোনো কিছু অস্তিত্বে আনতে চান, তখন শুধু বলেন, 'হয়ে যাও'! অমনি তা হয়ে যায়। মারিয়াম এরপর আল্লাহর সিদ্ধান্তের উপর বিনয়ের সাথে আত্মসমর্পণ করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, তাঁর সম্মুখে এক বিরাট পরীক্ষা।

কেননা সাধারণ লোক এতে সমালোচনার ঝড় তুলবে। আল্লাহর শক্তি সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব ও সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকার ফলে শুধু বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিচার করেই তারা নানা কথা বলতে থাকবে। বায়তুল মুকাদ্দাসে অবস্থানকালে বিভিন্ন প্রয়োজনে মারিয়াম কখনও কখনও মসজিদের বাইরে আসতেন। যেমন, মাসিক ঋতুস্রাব হলে কিংবা পানি ও খাদ্যের সন্ধানে অথবা অন্য কোনো অতি প্রয়োজনীয় কাজে তিনি মসজিদ থেকে বেরিয়ে আসতেন। একবার এ জাতীয় এক বিশেষ প্রয়োজনে তিনি মসজিদ থেকে বের হলেন এবং দূরে এক স্থানে আশ্রয় নিলেন অর্থাৎ তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদের পূর্ব দিকে অনেক দূর পর্যন্ত একাকী চলে যান। আল্লাহ হযরত জিবরাঈল আমীনকে তথায় প্রেরণ করেন।

জিবরাঈল আ. মারিয়ামের নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করলেন। মারিয়াম তাঁকে দেখেই বলে উঠলেন, "আমি তোমার থেকে দয়াময়ের আশ্রয় প্রার্থনা করি যদি তুমি আল্লাহ ভীরু হও।" আবুল আলিয়া বলেন : আয়াতে উল্লিখিত 'তাকিয়্যা' বলা হয় এমন ব্যক্তিকে, যে নিষেধাজ্ঞা মেনে চলে; নিষিদ্ধ কাজকে যে ভয় করে।

জিবরাঈল আ. বললেন, "আমি তো শুধু তোমার পালনকর্তার প্রেরিত এক দূত।" আমি মানুষ নই– তুমি যা ভেবেছ বরং আমি ফেরেশতা। আল্লাহ তোমার নিকট আমাকে প্রেরণ করেছেন। তোমাকে আমি এক পবিত্র পুত্র দান করে যাব। মারিয়াম বললেন, কিরূপে আমার পুত্র হবে অথচ কোনো মানব আমাকে স্পর্শ করে নি এবং আমি ব্যভিচারিণীও কখনও ছিলাম না। আমার এখনও বিবাহ হয় নি এবং আমি কখনও অশ্লীল কাজে লিপ্ত হই নি। এমতাবস্থায় আমার সন্তান হবে কিভাবে? তিনি বললেন, এমনিতেই হবে। তোমার পালনকর্তা বলেছেন, এটা আমার জন্যে সহজসাধ্য। অর্থাৎ পুত্র হওয়ার সংবাদে মারিয়াম বিস্ময় প্রকাশ করে যে প্রশ্ন করেছিলেন, তার উত্তরে ফেরেশতা বললেন, স্বামী না থাকা এবং ব্যভিচারিণী না হওয়া সত্ত্বেও তোমার পুত্র সন্তান সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আর তাঁর জন্যে এ কাজ অতি সহজ। কেননা তিনি যা ইচ্ছা করেন সব কিছুই করতে পারেন।

এরপর আল্লাহ বলেন : এ অবস্থায় তাকে সৃষ্টি করে আমি বিভিন্ন পন্থায় আমার সৃষ্টি কৌশলের ক্ষমতার দৃষ্টান্ত পেশ করতে চাই। কেননা আল্লাহ আদমকে নর-নারী ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন, হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন নারী ছাড়া নর থেকে, ঈসাকে সৃষ্টি করেছেন নর ছাড়া নারী থেকে এবং অন্যান্য সবাইকে সৃষ্টি করেছেন নর ও নারী উভয় থেকে। এটা ঈসার সাহায্যে মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ প্রকাশ কল্পে। কেননা তিনি তার শৈশবে মানুষকে কেবল আমার ইবাদতের দিকে আহবান করবেন এবং আল্লাহকে স্ত্রী, সন্তান, অংশীদার সমকক্ষ, শরীক ও সাদৃশ্য থেকে মুক্ত থাকার বাণী প্রচার করবে আর এটাই শেষ কথা।

এ বিষয়টি আল্লাহ চূড়ান্ত করে ফেলেছেন, যার বাস্তবায়ন অবধারিত এবং যা অবশ্যই সংঘটিত হবে। অথবা এরপর মারিয়ামের মধ্যে হযরত জিবরাঈল আ. ঈসার

রূহ ফুঁকে দিয়েছেন। যেমন, সূরা তাহরীমে আল্লাহ পাক বলেছেন : "আল্লাহ মুমিনদের জন্যে আরও উপস্থিত করছেন, ইমরান তনয়া মারিয়ামের দৃষ্টান্ত, যে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিল। ফলে আমি তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম।" (সূরা তাহরীম : ১২)

হযরত জিবরাঈল আ. কিভাবে ফুঁক দিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে একাধিক মুফাস্‌সির লিখেছেন : হযরত জিবরাঈল হযরত মারিয়ামের জামার আস্তিনে ফুঁক দিয়েছিলেন। ওই ফুঁক জামার মধ্যে দিয়ে তার গুপ্তাঙ্গে গিয়ে প্রবেশ করে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি অন্তঃসত্ত্বা হন, যেরূপ নারীরা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে থাকে স্বামীর সাথে সহবাসের মাধ্যমে।

এভাবেই মারিয়ামের মধ্যে ফেরেশতার ফুঁক প্রবেশ করে। এতে তার গর্ভে একটি পুত্র সন্তান এল। এরপর তাকে নিয়ে তিনি এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেলেন। কেননা গর্ভে সন্তান আসার পর মারিয়ামের অন্তরে স্বাভাবিকভাবেই সঙ্কোচ সৃষ্টি হয়। তিনি বুঝতে পারলেন, অচিরেই লোকজন তাঁর প্রসঙ্গে নানা কথা ছড়াবে। প্রথম যুগের একাধিক তাফসীরবিদগণ এ ব্যাপারে বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করেছেন।

ওহাব ইবনে মুনাববিহ বলেন, মারয়ামের অন্তঃসত্ত্বা হওয়া সম্পর্কে যে ব্যক্তি টের পায়, সে হল বনি ইসরাঈলের ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব আন-নাজ্জার নামক এক ব্যক্তি। তিনি ছিলেন মারিয়ামেরই খালাতো ভাই। মারিয়ামের পূতঃপবিত্র চরিত্র, তাঁর ইবাদত-বন্দেগী ও দীনদারী সম্পর্কে তিনি ভালোভাবেই অবগত ছিলেন। কিন্তু বিবাহ ব্যতীত অন্তঃসত্ত্বা হওয়ায় তিনি ভীষণভাবে বিস্মিত হন। একদিন তিনি মারিয়ামকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, মারয়াম! বল তো বীজ ছাড়াই কি শস্য হয় কখনও? মারিয়াম বললেন, কেন হবে না? সর্বপ্রথম শস্য কিভাবে সৃষ্টি হল? তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, বৃষ্টি ও পানি ব্যতীত কি বৃক্ষ জন্মায়? মারিয়াম বললেন, জন্মায় বৈ কি? না হলে প্রথম বৃক্ষের জন্ম হল কিভাবে? তিনি বললেন : আচ্ছা! পুরুষের স্পর্শ ব্যতীত কি সন্তান জন্মগ্রহণ করে? মারিয়াম বললেন : হ্যাঁ, হয়। আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করেছিলেন নর-নারী ব্যতীত; এরপর তিনি বললেন, এখন তোমার ব্যাপারটা আমাকে খুলে বল, কি হয়েছে? মারয়াম বললেন : আল্লাহ আমাকে তাঁর এক বাণীর সুসংবাদ দিয়েছেন, যার নাম হল মসীহ মারিয়াম-তনয় ঈসা; দুনিয়া ও আখিরাতের সে হবে মহা সম্মানের অধিকারী এবং আল্লাহর ঘনিষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত। যখন সে মায়ের কোলে থাকবে এবং পূর্ণ বয়স্ক হবে, তখন সে মানুষের সঙ্গে কথা বলবে আর সে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" বর্ণিত আছে, হযরত যাকারিয়া আ.-ও মারিয়ামকে এ ধরনের প্রশ্ন করেছিলেন এবং তিনি তাঁকেও অনুরূপ উত্তর দিয়েছিলেন।

মুজাহিদ রহ.থেকে বর্ণিত আছে, মারিয়াম বলতেন : আমি যখন একাকী নির্জনে থাকতাম, তখন আমার পেটের বাচ্চা আমার সাথে কথা বলত। আর যখন আমি লোক সমাজে থাকতাম, তখন সে আমার পেটের মধ্যে তাসবীহ পাঠ করত। স্পষ্টত মারিয়াম অন্যান্য নারীদের মতো স্বাবাবিকভাবে নয় মাস গর্ভ ধারণের পর প্রসব করেছিলেন।

কেননা এর ব্যতিক্রম হলে তার উল্লেখ করা হত। ইকরামা ও ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, তাঁর এ গর্ভকাল ছিল আট মাস। ইবনে আব্বাসের অপর বর্ণনায় রয়েছে, তিনি গর্ভধারণ মাত্রই সন্তান প্রসব করেছিলেন। আবার কেউ কেউ তাঁর গর্ভকাল মাত্র নয় ঘণ্টা স্থায়ী ছিল বলে বলেছেন।

এ মতের সমর্থনে নিম্নের আয়াত "তৎপর সে গর্ভে তাকে ধারণ করল। এরপর তৎসহ এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেল। প্রসব বেদনা তাকে এক খেজুর বৃক্ষ মূলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল।" (সূরা মারিয়াম : ২২-২৩) প্রনিধানযোগ্য। বিস্তাতির তাফসীরের দ্রষ্টব্য।

তা ছাড়া সূরা মুমিনের ১৩ নং আয়াতসহ কুরআনে কারিমের বেশ কিছু আয়াত বুঝা যায় মানবসৃষ্টির প্রতিটি পর্যায় অতিক্রম করতে সময় লাগে চল্লিশ দিন। এ কথা বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক লিখেছেন, গোটা বনি ইসরাঈলের মধ্যে এ সংবাদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, মারিয়াম অন্তঃসত্ত্বা হয়েছেন। এতে যাকারিয়া আ. এর পরিবার দুঃখ-শোকে সর্বাধিক মুহ্যমান হয়ে পড়েন। কোনো কোনো ধর্মহীন ব্যক্তি (যিনদীক) জনৈক ইউসুফের দ্বারা এরূপ হয়েছে বলে অপবাদ রটায়। ইউসুফ বায়তুল মুকাদ্দাসে একই সময়ে ইবাদত বন্দেগী করতেন। মারিয়াম লোকালয় থেকে বহু দূরে লোকচক্ষুর অন্ত রালে চলে যান। প্রসব বেদনা তাঁকে এক খর্জুরবৃক্ষ তলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। যে স্থানে মারিয়াম আশ্রয় নিয়েছিলেন সে স্থানের নাম বায়তে লাহম (বেথেলহাম)। পরবর্তীকালে জনৈক রোমান সম্রাট ওই স্থানে একটি সৌধ নির্মাণ করেন। সে স্মৃতিসৌধ সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করব।

মারিয়াম বললেন, হায়! আমি যদি কোনোরূপে এর পূর্বে মারা যেতাম এবং মানুষের স্মৃতি থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যেতাম! তাঁর এ মৃত্যু কামনা থেকে দলীল গ্রহণ করে বলা হয়ে থাকে যে, ফিতনা বা মহা বিপদকালে মৃত্যু কামনা করা বৈধ। মারিয়ামও এরূপ মহা-বিপদকালে মৃত্যু কামনা করেছিলেন। কেননা তিনি নিশ্চিত রূপেই বুঝতে পেরেছিলেন, আমার ইবাদত-বন্দেগী, পবিত্রতা, সার্বক্ষণিক মসজিদে অবস্থান ও ইতিকাফ করা, নবী পরিবারের লোক হওয়া ও দীনদারী সম্পর্কে লোকজন যতই অবগত থাকুক না কেন, যখনই আমি সন্তান কোলে নিয়ে তাদের মাঝে আসব তখনই তারা আমার বিরুদ্ধে অপবাদ দিবে। আমি যতই সত্য কথা বলি না কেন, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করবে। এসব চিন্তা করেই তিনি উপরোক্ত কামনা করেন যে, এ অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার আগেই যদি আমার মৃত্যু হয়ে যেত! কিংবা যদি আমার জন্মই না হত!

এরপর নিম্ন দিক থেকে তাকে কেউ আহ্বান করে বলল– "তুমি নিজের দিকে খেজুর গাছের কাণ্ডে নাড়া দাও, তা থেকে তোমার উপর সুপক্ক তাজা খেজুর পতিত

হবে।" আল্লাহ পাক সেখানে তার জন্য পবিত্র পানি ও পরিপক্ক খেজুরের ব্যবস্থা করেন।

ইবনে আবি হাতিম হযরত আলি ইবনে আবি তালিব রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : খেজুর গাছকে তোমরা ভালোবাস, সে তোমাদের ফুফু। কেননা তোমাদের পিতা আদমকে যে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছিল সেই মাটি থেকেই খেজুর গাছের সৃষ্টি আর খেজুর গাছ ব্যতীত অন্য কোনো গাছের নর-মাদার প্রজনন করা হয় না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের স্ত্রীগণ যেন শিশু সন্তানকে তাজা খেজুর খাওয়ায়। যদি তাজা খেজুর পাওয়া না যায়, তা হলে অন্তত খুরমা যেন খেতে দেয়। জেনে রেখো! আল্লাহর নিকট সেই বৃক্ষের চেয়ে উত্তম কোনো বৃক্ষ নেই, যে বৃক্ষের নিচে মারিয়াম বিনতে ইমরান অবতরণ করেছিলেন।

অবশেষে ওই আহ্বানকারী তাকে সওম পালন অর্থাৎ চুপ থাকা ও মৌনতা অবলম্বন করার উপদেশ দেন। সে যুগের শরিয়তে পানাহার ও বাক্যালাপ থেকে বিরত থাকাকে সওম বলা হত। কিন্তু আমাদের শরিয়তে কোনো রোযাদার ব্যক্তি যদি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চুপচাপ থাকে ও মৌনতা অবলম্বন করে কাটায় তবে তার রোযা মাকরূহ হয়ে যায়।

মারিয়াম আ. এর সম্প্রদায়ের লোকেরা যখন তাঁর কোলে নবজাত শিশু সন্তানকে দেখল তখন বলল : "হে মারিয়াম! তুমি তো এক বিরাট অন্যায় কাজ করে ফেলেছ।" তুমি তো এমন পরিবারের মেয়ে নও, যাদের চরিত্র এত নীচু পর্যায়ের। তোমার পরিবারের কেউই তো মন্দ কাজে জড়িত ছিল না। তোমার ভাই, পিতা ও মাতা কেউ তো এরূপ ছিলেন না। এভাবে তারা মারিয়ামের চরিত্রে কলঙ্ক লেপে দিল এবং মহা অপবাদ আরোপ করল।

ইবনে জারীর রহ. তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন, তারা হযরত যাকারিয়া আ. এর উপর অসৎ কর্মের অপবাদ দেয় এবং তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে। হযরত যাকারিয়া আ. সেখান থেকে পলায়ন করলে তারাও তাঁর পিছু ধাওয়া করে।

কতিপয় মুনাফিক মারিয়ামকে তাঁর খালাত ভাই ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব আল-নাজ্জারকে জড়িয়ে অপবাদ দেয়। সম্প্রদায়ের লোকদের এ সব অপবাদের মুখে মারিয়ামের অবস্থা যখন কঠিন হয়ে পড়ল, বাকশক্তি রুদ্ধ হয়ে গেল এবং নিজেকে অপবাদ থেকে মুক্ত করার কোনো উপায়ই রইল না, তখন তিনি মহান আল্লাহর উপর ভরসা রেখে হাত দ্বারা সন্তানের দিকে ইঙ্গিত করে তাদেরকে বুঝিয়ে দিলেন, তোমরা ওর কাছে জিজ্ঞেস কর এবং তার সাথে কথা বলো! কেননা তোমাদের প্রশ্নের জওয়াব তার কাছে পাওয়া যাবে এবং তোমরা যা শুনতে চাচ্ছ, তা তার কাছেই আছে। তখন উপস্থিত জনতার মধ্য থেকে দুষ্ট-দুর্দান্ত প্রকৃতির লোকেরা বলল :

এ তো কোলের শিশু! এর সাথে আমরা কেমন করে কথা বলব?" তুমি আমাদের প্রশ্নের উত্তর অবুঝ শিশুর উপর কি করে ছেড়ে দিলে? যে মাখন ও ঘোলের মধ্যে পার্থক্য করতে জানে না। তুমি আমাদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছ। মুখে কথা না বলে, অবুঝ শিশুর দিকে ইঙ্গিত করে আমাদের সাথে উপহাস করছ। ঠিক এমন সময় শিশু ঈসা বলে উঠলেন :

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا (٣٠) وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا (٣١) وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا (٣٢) وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا

"আমি তো আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন। আমি যেখানেই থাকি, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন সালাত ও যাকাত আদায় করতে এবং মায়ের অনুগত থাকতে এবং আমাকে তিনি উদ্ধত ও হতভাগ্য করেন নি। আমার প্রতি সালাম যে দিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি। যে দিন মৃত্যুবরণ করব এবং যে দিন পুনর্জীবিত হয়ে উত্থিত হব।" (সূরা মারিয়াম : ৩০-৩২)

এই হল ঈসা আ. এর মুখ থেকে প্রকাশিত প্রথম কথা। এখানে সর্বপ্রথম তিনি নিজেকে "আমি আল্লাহর বান্দা" আল্লাহর দাসত্বকে স্বীকার করে নেন এবং আল্লাহ যে তাঁর প্রতিপালক এ কথার ঘোষণা দেন। ফলে জালিম লোকেরা দাবি করল, ঈসা আ. আল্লাহর পুত্র। কিন্তু আল্লাহ যে এ থেকে পবিত্র, তা তিনি ঘোষণা করেন। ঈসা আল্লাহর পুত্র নন বরং তিনি, তাঁর বান্দা ও রাসূল এবং তাঁর এক দাসীর পুত্র এ কথাও ঘোষণা করেন। এরপর জাহিল লোকেরা তাঁর মায়ের উপর যে অপবাদ দিয়েছিল, সে অপবাদ থেকে তাঁর মা যে পবিত্র ছিলেন সে সম্পর্কে বলেন, "আল্লাহ আমাকে কিতাব দিয়েছেন ও নবী করেছেন।" কেননা আল্লাহ এমন ব্যক্তিকে নবুয়ত দান করেন না, যার জন্ম হয় ব্যভিচারের মাধ্যমে। অথচ ওইসব অভিশপ্ত লোকগুলো ঈসা আ.-এর প্রতি সেরূপ কুৎসিৎ ধারণাই পোষণ করেছিল। সূরা নিসায় আল্লাহ বলেন, "তারা লানতগ্রস্ত হয়েছিল তাদের কুফরীর জন্যে এবং মারিয়ামের প্রতি গুরুতর অপবাদ দেওয়ার জন্যে।" (সূরা নিসা : ১৫৬)

এমনিভাবে সূরা আলে-ইমরানেও ঈসা আ.-এর ঘটনা বিস্তারিত আলোচনা করার পর বলা হয়েছে :

ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ (٥٨) إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ (٥٩) الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ (٦٠) فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا

وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ (٦١) إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٦٢) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ

"যা আমি তোমার নিকট বিবৃত করছি তার নিদর্শন ও সারগর্ভ বাণী হতে। আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্ত সদৃশ। তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছিলেন, এরপর তাকে বলেছিলেন, 'হও' ফলে সে হয়ে গেল। এ সত্য তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে, সুতরাং তুমি সংশয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। তোমার নিকট জ্ঞান আসার পর যে কেউ এ বিষয়ে তোমার সাথে তর্ক করে তাকে বল, এস, আমরা আহবান করি আমাদের পুত্রগণকে ও তোমাদের পুত্রগণকে, আমাদের নারীগণকে ও তোমাদের নারীগণকে, আমাদের নিজদেরকে ও তোমাদের নিজদেরকে; এরপর আমরা বিনীত আবেদন করি এবং মিথ্যাবাদীদের উপর দেই আল্লাহর লানত। নিশ্চয়ই এটা সত্য বৃত্তান্ত। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ পরম প্রতাপশালী, প্রজ্ঞাময়। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ ফাসাদকারীদের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।" (আলে-ইমরান : ৫৮-৬৩)

মোটকথা, মায়ের কোলে থাকা অবস্থায় হযরত ঈসা আ. এর কথা এ পর্যন্ত। তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিলেন, আল্লাহ তাঁর প্রতিপালক এবং তাদেরও প্রতিপালক; তার প্রভু এবং তাদেরও প্রভু। আর এটাই সরল পথ। এরপর দলগুলো নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করল। সুতরাং দুর্ভোগ কাফিরদের মহাদিবস আগমনকালে। সেই যুগের ও পরবর্তী যুগের লোক হযরত ঈসা আ. সম্পর্কে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ইহুদিদের এক দল বলল, ঈসা ব্যভিচার জাত সন্তান এবং এ কথার উপরই তারা অটল হয়ে থাকল। আর এক দল আরও অগ্রসর হয়ে বলল, ঈসাই আল্লাহ। অন্য দল বলল, সে আল্লাহর পুত্র। কিন্তু সৃষ্টিজ্ঞান সম্পন্ন লোকেরা বললেন : তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল, আল্লাহর এক দাসীর সন্তান এবং আল্লাহর কালেমা, যা মারিয়ামের প্রতি প্রদান করেছিলেন এবং তিনি আল্লাহর প্রেরিত রূহ। শেষোক্ত এ দলটিই মুক্তিপ্রাপ্ত, সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং অল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত। যে ব্যক্তিই হযরত ঈসা আ. সম্পর্কে বিষয়গুলোর কোনো একটি ব্যাপারেও বিরোধিতা করবে, সেই হবে কাফির পথভ্রষ্ট ও জাহিল। এ জাতীয় লোকদেরকেই সাবধান করে আল্লাহ বলেছেন : "সুতরাং মহাদিবসকালে কাফিরদের জন্যে ধ্বংস।"

বুখারী শরীফের হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই, মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল, ঈসা আল্লাহর বান্দা রাসূল ও কলেমা, যা মারয়ামের প্রতি অর্পণ করেছেন এবং আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত রূহ।

জান্নাত জাহান্নাম সত্য। আল্লাহ তাঁকে জান্নাত দান করবেন। তার আমল যে রকম হোক না কেন। অন্য সূত্রে অতিরিক্ত আছে, জান্নাতের আটটি দরজার মধ্যে যেটি দ্বারা ইচ্ছা সে প্রবেশ করতে পারবে।

আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ থেকে পবিত্র

এ প্রসঙ্গে সূরা মারিয়ামে আল্লাহ্ বলেন :

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا (٨٨) لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا (٨٩) تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا (٩٠) أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا (٩١) وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا (٩٢) إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَٰنِ عَبْدًا (٩٣) لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا (٩٤) وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا (٩٥)

"তারা বলে, দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন! তোমরা তো এক বীভৎস কথার অবতারণা করেছ; (অর্থাৎ তোমাদের এ কথা অত্যন্ত ভয়াবহ, কুরুচিপূর্ণ ও নিরেট মিথ্যা।) এতে যেন আকাশমণ্ডলী বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হবে ও পর্বতমণ্ডলী চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পতিত হবে, যেহেতু তারা দয়াময়ের প্রতি সন্তান আরোপ করে। অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্যে শোভন নয়। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে দয়াময়ের নিকট বান্দারূপে উপস্থিত হবে না। তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে গণনা করেছেন এবং কিয়ামত দিবসে তাদের সকলেই তাঁর নিকট আসবে একাকী অবস্থায়।"

(সূরা মারিয়াম : ৮৮-৯৫)

উক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহর জন্যে মোটেই শোভনীয় নয়। কেননা তিনি সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা ও মালিক এবং সব কিছু তাঁর মুখাপেক্ষী ও অনুগত। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলেই তাঁর দাস, তিনি এ সবের প্রতিপালক। তিনি ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই, আর কোনো প্রতিপালকও নেই।

এখানে আল্লাহ স্পষ্ট জানিয়েছেন, তিনি সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা। সুতরাং কিরূপে তাঁর সন্তান হতে পারে? আমরা জানি, সমশ্রেণীর দুজনের মিলন ব্যতীত সন্তান হয় না। আর আল্লাহর সমকক্ষ, সদৃশ ও সমশ্রেণীর কেউ নেই। অতএব তাঁর স্ত্রীও নেই, যখন তাঁর সন্তানও হতে পারে না। তাই আল্লাহ তাআলা বলেন :

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (٤)

"বল, তিনিই আল্লাহ একক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকেও জন্ম দেন নি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয় নি এবং তাঁর সমতুল্য কেউ-ই নেই। (সূরা ইখলাস)

বলা বাহুল্য, আল্লাহ্ 'একক' অর্থ তিনি এমন এক অস্তিত্ব যাঁর সত্তার কোনো সদৃশ নেই। গুণাবলীতে কোনো দৃষ্টান্ত নেই এবং কর্মকাণ্ডের কোনো উদাহরণ নেই। জটৈম্বহ্লক্ষ (আস-সামাদ) এমন মনিবকে বলা হয়, যার মধ্যে জ্ঞান, প্রজ্ঞা, করুণা ও সমস্ত গুণাবলী পরিপূর্ণভাবে থাকে। لَمْ يَلِدْ তিনি কাউকে জন্ম দেন নি। الصَّمَدُ। অর্থ পূর্বের কোনো কিছু থেকে তিনি সৃষ্টি নন। وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ অর্থাৎ তাঁর সমকক্ষ, সমপর্যায়ের ও সমান আর কেউ নেই।

এ আয়াতগুলো থেকে জানা গেল, আল্লাহ্‌র নযীর, কাছাকাছি, তাঁর চেয়ে ঊর্ধ্বে বা সমপর্যায়ের অন্য কেউ নেই। সুতরাং তাঁর সন্তান হওয়ার কোনো পথই খোলা নেই। কেননা সন্তান জন্ম হয় সমজাতীয় বা অন্তত সমশ্রেণীর কাছাকাছি দুজনের মাধ্যমে কিন্তু আল্লাহ্ তার অনেক ঊর্ধ্বে। অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন :

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (١٧١) لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا (١٧٢) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

"হে কিতাবীগণ! দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না ও আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলো না। মারিয়াম-তনয় ঈসা মসীহ্ তো আল্লাহ্‌র রাসূল এবং তাঁর বাণী, যা তিনি মারিয়ামের নিকট প্রেরণ করেছিলেন ও তাঁর আদেশ। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনো এবং বলো না তিন। নিবৃত্ত হও, এটা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর হবে। আল্লাহ্ তো একমাত্র ইলাহ্; তাঁর সন্তান হবে– তিনি এ থেকে পবিত্র। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সব আল্লাহ্‌রই; কর্মবিধানে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। মসীহ্ আল্লাহ্‌র বান্দা হওয়াকে কখনো হেয় জ্ঞান করে না এবং ঘনিষ্ঠ ফেরেশতাগণও করে না এবং কেউ তাঁর ইবাদতকে হেয় জ্ঞান করলে এবং অহংকার করলে তিনি অবশ্যই তাদের সকলকে তাঁর নিকট একত্র করবেন। যারা ঈমান আনে ও সৎকার্য করে তিনি তাদেরকে পূর্ণ পুরস্কার দান করবেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও বেশি দিবেন; কিন্তু যারা হেয় জ্ঞান করে ও অহংকার করে তাদেরকে তিনি মর্মন্তুদ শাস্তি দান করবেন এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের জন্যে তারা কোনো অভিভাবক ও সহায় পাবে না।"

(সূরা নিসা : ১৭১-১৭৩)

আল্লাহ্ আহলে কিতাব ও তাদের অনুরূপ সম্প্রদায়কে ধর্মীয় বিষয়ে বাড়াবাড়ি ও অহংকার প্রদর্শন করতে নিষেধ করেছেন। ধর্মে বাড়াবাড়ি অর্থ আকীদা-বিশ্বাস ও ক্রিয়া-কর্মে নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করা। নাসারা বা খ্রিষ্টান সম্প্রদায় মাসীহ-এর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও সীমা লঙ্ঘন করেছে। এ ক্ষেত্রে তাদের উচিত ছিল তাঁকে আল্লাহর বান্দা ও রাসূল হিসেবে বিশ্বাস করা এবং এ আকীদা পোষণ করা যে, তিনি আল্লাহর সতী বাঁদী কুমারী মারিয়ামের সন্তান। ফিরিশতা জিবরাঈলকে আল্লাহ্ মারিয়ামের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী মারয়ামের মধ্যে ফুঁক দেন। এ প্রক্রিয়ায় হযরত ঈসা আ. মারয়ামের গর্ভে আসেন। এই রূহ আল্লাহর কোনো অংশ নয় বরং আল্লাহর সৃষ্টি বা মাখলূক। আল্লাহর দিকে রূহকে সম্পর্কিত করা হয়েছে সম্মানার্থে ও গুরুত্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে। যেমন : বলা হয়ে থাকে, বায়তুল্লাহ্ (আল্লাহর ঘর), নাকাতুল্লাহ্ (আল্লাহর উষ্ট্রী) ও আবদুল্লাহ্ (আল্লাহর বান্দা) ইত্যাদি। অনুরূপ একই উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, রূহুল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহর রূহ। বিনা পিতায় জন্ম হওয়ায় হযরত ঈসাকে বলা হয়েছে রূহুল্লাহ। তাঁকে কালেমাতুল্লাহ্ বা আল্লাহর কলেমাও (বাণী) বলা হয়। কেননা আল্লাহর এক কলেমার (বাণী) দ্বারাই তিনি অস্তিত্ব লাভ করেন। যেমন, আল্লাহ্ বলেছেন:

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ

আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্ত সদৃশ। তাকে বলেছিলেন, হও, ফলে সে হয়ে গেল। (সূরা আলে ইমরান : ৫৯)

অন্যত্র আল্লাহ্ বলেছেন : তারা বলে, আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি অতি পবিত্র। বরং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর যা কিছু আছে সব আল্লাহরই। সব কিছু তাঁরই একান্ত অনুগত। আল্লাহ্ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা। এর ফলে তিনি কোনো কিছু করতে সিদ্ধান্ত করেন, তখন তার জন্য শুধু বলেন, 'হও' আর তা হয়ে যায়।

(সূরা বাকারা : ১১৬-১১৭)

এখানে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন : "ইহুদিরা বলে, উযায়ের আল্লাহর পুত্র এবং খ্রিষ্টানরা বলে, মসীহ আল্লাহর পুত্র। এটা তাদের মুখের কথা। পূর্বে যারা কুফরী করেছিল এরা তাদের মত কথা বলে। আল্লাহ্ ওদেরকে ধ্বংস করুন! তারা কেমন করে সত্য বিমুখ হয়।" (সূরা তাওবা : ৩০)

মোটকথা, ইহুদি ও খ্রিষ্টান অভিশপ্ত উভয় দলই আল্লাহর ব্যাপারে অন্যায় ও অযৌক্তিক দাবি করেছে এবং ধারণা করেছে, আল্লাহর পুত্র সন্তান আছে। অথচ তাদের এ দাবির বহু উর্ধ্বে আল্লাহর মর্যাদা। তাদের এ দাবি ছিল সম্পূর্ণ মনগড়া। এদের পূর্ববর্তী পথভ্রষ্ট মানুষও এ জাতীয় মনগড়া উক্তি করেছে। তাদের সাথে এদের অন্তরের মিল রয়েছে।

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা আরো বলেন : "ওরা বলে, দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি পবিত্র, মহান! তারা তো তাঁর সম্মানিত বান্দা। তারা আগে বেড়ে কথা বলে না; ওরা তো তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে থাকে। ওদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত, তারা সুপারিশ করে শুধু তাদের জন্যে, যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত। তাদের মধ্যে যে বলবে, 'আমিই ইলাহ তিনি ব্যতীত' তাকে আমি প্রতিফল দিব জাহান্নাম, এভাবেই আমি জালিমদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি।"

(সূরা আম্বিয়া : ২৬-২৯)

কুরআন মাজিদের উপর্যুক্ত মক্কী আয়াতগুলোতে ইহুদি, খ্রিষ্টান, মুশরিক ও দার্শনিকদের সমস্ত দল-উপদলের মতামতের খণ্ডন করা হয়েছে। যারা অজ্ঞতাবশত, বিশ্বাস করে ও দাবি করে যে, আল্লাহর সন্তান আছে। এসব জালিমদের সীমালঙ্ঘনমূলক উক্তি থেকে আল্লাহ পবিত্র ও মহান।

এ জঘন্য উক্তি উচ্চারণকারীদের মধ্যে সবচাইতে প্রসিদ্ধ দল হল খ্রিষ্টান সম্প্রদায়। এ কারণে কুরআন মাজিদে তাদের খণ্ডন করা হয়েছে সবচাইতে বেশী। তাদের স্ব-বিরোধী উক্তি, অজ্ঞতা ও জ্ঞানের দৈন্যের কথা বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তাদের এ কুফরী উক্তির মধ্যে আবার বিভিন্ন দল-উপদলের সৃষ্টি হয়েছে। আর এমনটি হওয়াই স্বাভাবিক। কেননা বাতিলপন্থীরা নানা দলাদলি, মতবিরোধ ও স্ব-বিরোধিতার শিকার হয়েই থাকে। পক্ষান্তরে হক এর মধ্যে কোনো স্ব-বিরোধ থাকে না। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

"এ যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও পক্ষ থেকে হত, তবে তারা তাতে অনেক অসঙ্গতি পেত। (সূরা নিসা : ৮২)

এ থেকে বুঝা গেল, হক ও সত্যগুলো অভিন্ন ও অপরিবর্তিত থাকে আর বাতিল ও অসত্যগুলো বিকৃত ও অসঙ্গতিপূর্ণ হয়। এ কারণে পথভ্রষ্ট ও অভিশপ্ত খ্রিষ্টানদের একদল বলছে, মসীহ-ই আল্লাহ। অন্যদল বলছে, মসীহ আল্লাহর পুত্র। তৃতীয় একদল বলছে, আল্লাহ হলেন তিন জনের তৃতীয় জন। যেমন, সূরা আল মায়িদায় আল্লাহ পাক বলেন :

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"যারা বলে, মারিয়াম তনয় মসীহই আল্লাহ, তারা তো কুফরী করেছেই। বলুন! আল্লাহ মারিয়াম তনয় মসীহ, তার মাতা এবং দুনিয়ার সকলকে যদি ধ্বংস করতে ইচ্ছা

করেন, তবে তাকে বাধা দেওয়ার শক্তি কার আছে? আসমান ও যমীনের এবং ওগুলোর মধ্যে যা কিছু আছে তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং আল্লাহ্ সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।" (সূরা মায়িদা : ১৭)

যারা বলে, আল্লাহ তো তিনের মধ্যে একজন, তারা তো কুফরী করেছেই, যদিও এক ইলাহ ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই। তারা যা বলে তা হতে নিবৃত্ত না হলে, তাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদের উপর অবশ্যই মর্মন্তুদ শাস্তি আপতিত হবেই। তবে কি তারা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে না ও তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে না? আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। মারিয়াম-তনয় মসীহ তো কেবল একজন রাসূল! তার পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছে এবং তার মাতা সত্যনিষ্ঠ ছিল। তারা উভয়ে খাদ্য গ্রহণ করত। দেখ, আমি ওদের জন্যে আয়াত সমূহ কিরূপ বিশদভাবে বর্ণনা করি। আরও দেখ, ওরা কিভাবে সত্যবিমুখ হয়।" (সূরা মায়িদা : ৭২-৭৫)

এখানেও পরিষ্কার যে, তারা তাদের নবী আ.-কে আল্লাহর পুত্র বলে, অথচ সেই ঈসাই তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি আল্লাহর সৃষ্ট, আল্লাহ-ই তাকে প্রতিপালন করেছেন এবং মায়ের গর্ভে তাকে আকৃতি দান করেছেন। তিনি এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর ইবাদতের দিকে মানুষকে আহ্বান করেছেন এবং এর বিরুদ্ধকারীদেরকে পরকালের শাস্তি, লাঞ্ছনা, ব্যর্থতা ও জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শন করেছেন।

সুতরাং এরপরও কি তারা আল্লাহর নিকট তওবা করবে না? তাঁর নিকট ক্ষমা চাইবে না? বস্তুত আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তারা উভয়েই খাদ্য গ্রহণ করত। অন্যদের মতো তাদেরও পেশাব-পায়খানার প্রয়োজন হত। এমতাবস্থায় তাঁরা ইলাহ হন কীরূপে? আল্লাহ তাদের এ মূর্খতাব্যঞ্জক উক্তি থেকে মুক্ত ও পবিত্র। নিশ্চয় তারা কাফির, যারা বলে : আল্লাহ তিন জনের একজন। এ সূরার শেস দিকে আল্লাহ্ তাদের এ বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করে বলেন :

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (١١٦) مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (١١٧) إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

"আল্লাহ্ যখন বলবেন, হে মারিয়াম তনয় ঈসা! তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আমাকে ও আমার মাকে ইলাহরূপে গ্রহণ কর? সে বলবে,

তুমিই মহিমান্বিত! যা বলার অধিকার আমার নেই, তা বলা আমার পক্ষে শোভন নয়। যদি আমি তা বলতাম, তবে নিশ্চয়ই তুমি তা জানতে। আমার অন্তরে যা আছে, তা তো তুমি অবগত আছ কিন্তু তোমার অন্তরে কী আছে, আমি তা অবগত নই; তুমি তো অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত। তুমি আমাকে যে আদেশ করেছ, তা ব্যতীত তাদেরকে আমি কিছুই বলি নি; তা এই: তোমরা আমার ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর ইবাদত কর এবং যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম, ততদিন আমি ছিলাম তাদের কার্যকলাপের সাক্ষী; কিন্তু যখন তুমি আমাকে তুলে নিলে, তখন তুমিই তো ছিলে তাদের কার্যকলাপের তত্ত্বাবধায়ক এবং তুমিই সর্ববিষয়ে সাক্ষী। তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি দাও, তবে তারা তো তোমারই বান্দা আর যদি তাদেরকে ক্ষমা কর, তবে তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা মায়িদা : ১১৬-১১৮)

সহি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ বলেন : বনী আদম আমাকে গালি দেয়; কিন্তু তার জন্যে এটা শোভা পায় না। সে বলে, আমার সন্তান আছে। অথচ আমি একক, অমুখাপেক্ষী। আমি কাউকে জন্ম দেই নি এবং কারও থেকে আমি জন্মগ্রহণ করি নি। আমর সমতুল্য কেউ নেই।"

সহি হাদীসে আরও বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পীড়াদায়ক কথা শোনার পর তাতে ধৈর্য ধরার ক্ষেত্রে আল্লাহর চাইতে অধিক ধৈর্যধারণকারী আর কেউ নেই। কারণ, যে সব লোক আল্লাহর জন্যে সন্তান সাব্যস্ত করে, তাদেরকে তিনি রিযিক দিচ্ছেন এবং রোগ থেকে নিরাময় করছেন। তবে অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ জালিমকে কিছু দিনের জন্যে অবকাশ দিয়ে থাকেন। যখন তাকে পাকড়াও করবেন তখন আর রেহাই দিবেন না। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নের আয়াতগুলো পাঠ করেন :

وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ

"এরূপ তোমার প্রতিপালকের শাস্তি! তিনি শাস্তিদান করেন জনপদসমূহকে যখন তারা জুলুম করে থাকে। নিশ্চয়ই তাঁর শাস্তি মর্মন্তুদ কঠিন। (সূরা হূদ : ১০২)

وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ

"এবং আমি অবকাশ দিয়েছি কত জনপদকে যখন ওরা ছিল জালিম; তারপর ওদেরকে শাস্তি দিয়েছি এবং প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট।" (সূরা হজ : ৪৮)

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ

"আমি ওদেরকে জীবনোপকরণ ভোগ করতে দিব স্বল্পকালের জন্যে। তারপর ওদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব।" (সূরা লোকমান : ২৪)

فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا

"অতএব কাফিরদেরকে অবকাশ দাও: ওদেরকে অবকাশ দাও কিছুকালের জন্যে।"
(সূরা আত-তারিক : ১৭)

হযরত ঈসা আ.-এর জন্মকালীন কিছু মুজিযা

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত ঈসা আ. বায়তুল মুকাদ্দাসের সন্নিকটে বায়তে লাহমে জন্মগ্রহণ করেন। অবশ্য ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ রহ.-এর ধারণা, হযরত ঈসা আ.-এর জন্ম হয় মিসরে এবং মারয়াম ও ইউসুফ ইবনে ইয়াকূব আল-নাজ্জার একই গাধার পিঠে আরোহণ করে ভ্রমণ করেন। তখন গাধার পিঠের গদি ব্যতীত তাঁদের মধ্যে অন্য কোনো আড়াল ছিল না। কিন্তু এ বর্ণনা সঠিক নয়। কেননা পূর্বেই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, ঈসা আ.-এর জন্মস্থান হচ্ছে বায়তে লাহাম। সুতরাং এ হাদীসের মুকাবিলায় অন্য যে কোনো বর্ণনা অগ্রহণযোগ্য।

ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ উল্লেখ করেছেন যে, হযরত ঈসা আ. যখন ভূমিষ্ঠ হন তখন পূর্ব ও পশ্চিমের সমস্ত মূর্তি ভেঙ্গে পড়ে যায়। ফলে শয়তানরা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে। এর কোনো কারণ তারা খুঁজে পাচ্ছিল না। অবশেষে বড় ইবলীস তাদেরকে জানাল যে, ঈসা আ.-এর জন্ম হয়েছে। শয়তানরা শিশু ঈসাকে তার মায়ের কোলে আর চারদিকে ফেরেশতাগণ দাঁড়িয়ে তাঁকে ঘিরে রেখেছেন দেখতে পেল। তারা আকাশে উদিত একটি বিরাট নক্ষত্রও দেখতে পেল। পারস্য সম্রাট ওই নক্ষত্র দেখে শঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং জ্যোতিষীদের নিকট এর উদিত হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। জ্যোতিষীরা জানাল, পৃথিবীতে এক মহান ব্যক্তির জন্ম হয়েছে। এজন্য এ নক্ষত্র উদিত হয়েছে। তখন পারস্য সম্রাট উপঢৌকন হিসেবে স্বর্ণ, রূপা ও কিছু লুবান দিয়ে নবজাতকের সন্ধানে কতিপয় দূত প্রেরণ করেন। দূতগণ সিরিয়ায় এসে পৌঁছে। সিরিয়ার বাদশা তাদের আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তারা উক্ত নক্ষত্র ও জ্যোতিষীদের মন্তব্যের কথা তাকে জানায়।

বাদশা দূতদের নিকট নক্ষত্রটির উদয়কাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। উত্তর শুনে তিনি বুঝলেন, ওই শিশুটি বায়তুল মুকাদ্দাসে জন্মগ্রহণকারী মারিয়াম পুত্র ঈসা। ইতঃমধ্যেই ব্যাপক প্রচার হয়ে গিয়েছিল যে, নবজাত শিশুটি দোলনায় থেকেই মানুষের সাথে কথা বলেছেন। এরপর বাদশা দূতদেরকে তাদের সাথে আনীত উপঢৌকনসহ শিশু ঈসার সাথে পাঠিয়ে দেন এবং এদেরকে চিনিয়ে দেওয়ার জন্যে সাথে একজন লোকও দেন। বাদশার উদ্দেশ্য ছিল, দূতগণ যখন উপঢৌকন প্রদান করে চলে আসবে, তখন এ লোক ঈসাকে হত্যা করে ফেলবে। পারস্যের দূতগণ মারিয়ামের নিকট গিয়ে উপঢৌকনগুলো প্রদান করে চলে আসার সময় বলে আসল, সিরিয়ার বাদশা আপনার নবজাত শিশুকে হত্যা করার জন্যে চর পাঠিয়েছে। এ সংবাদ শুনে মারিয়াম শিশুপুত্র ঈসাকে নিয়ে মিসরে চলে আসেন এবং একটানা বার বছর সেখানে অবস্থান করেন। এ

সময়ের মধ্যে ঈসা আ.-এর বিভিন্ন রকম কারামাত ও মুজিযা প্রকাশ হতে থাকে। ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ কতিপয় মু'জিযার কথা উল্লেখ করেছেন। যথা :

এক. মারিয়াম আ. মিসরের যে সর্দারের বাড়িতে অবস্থান করেন, একবার ওই বাড়ি থেকে একটি বস্তু হারিয়ে যায়। ভিক্ষুক, দরিদ্র ও অসহায় লোকজন সে বাড়িতে বসবাস করত। কে বা কারা বস্তুটি চুরি করেছে, তা অনুসন্ধান করেও তার কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। বিষয়টি মারয়ামকে ভীষণ চিন্তায় ফেলে দিল। বাড়ির মালিক ও অন্যান্য লোকজনও বিব্রত অবস্থায় পড়ে গেল। অবশেষে শিশু ঈসা সেখানে অবস্থানকারী এক অন্ধ ও এক পঙ্গু ব্যক্তির নিকট গেলেন। অন্ধকে বললেন, তুমি এ পঙ্গুকে ধরে উঠাও এবং তাকে সাথে নিয়ে চুরি করা বস্তা নিয়ে এস। অন্ধ বলল, আমি তো তাকে উঠাতে সক্ষম নই। ঈসা আ. বললেন : কেন, তোমরা উভয়ে যেভাবে ঘরের জানালা দিয়ে বস্তুটি নিয়ে এসেছিলে, সেভাবেই গিয়ে দিয়ে এস। এ কথা শোনার পর তারা এর সত্যতা স্বীকার করল এবং চুরি করা বস্তুটি নিয়ে আসল। এ ঘটনার পর ঈসার মর্যাদা মানুষের নিকট অত্যধিক বেড়ে যায়। যদিও তিনি তখন শিশু মাত্র।

দুই. উক্ত সর্দারের পুত্র আপন সন্তানদের পবিত্রতা অর্জনের উৎসবের দিনে এক ভোজসভার আয়োজন করে। লোকজন সমবেত হল। খাওয়া-দাওয়া শেষ হল। সে যুগের নিয়মানুযায়ী এখন মদ পরিবেশনের পালা। কিন্তু মদ ঢালতে গিয়ে দেখা গেল কোনো কলসিতেই মদ নেই। সর্দার পুত্র ভীষণ লজ্জায় পড়ে গেল। হযরত ঈসা আ. এ অবস্থা দেখে প্রতিটি কলসির মুখে হাত ঘুরিয়ে আসলেন। ফলে সেগুলো সাথে সাথে উৎকৃষ্ট মদে পূর্ণ হয়ে গেল। লোকজন এ ঘটনা দেখে বিস্মিত হল। ফলে, তাদের নিকট আরও মর্যাদা বৃদ্ধি পেল। মানুষ বিভিন্ন রকম উপঢৌকন এনে ঈসা আ. ও তার মার কাছে পেশ করল; কিন্তু তাঁরা এর কিছুই গ্রহণ করলেন না। তারপর তারা বায়তুল মুকাদ্দাসের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে পড়লেন।

ইসহাক ইবনে বিশর আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন। হযরত ঈসা ইবনে মারিয়ামই প্রথম মানুষ, যিনি শিশুকালে কথা বলেছেন। আল্লাহ তাঁর রসনা খুলে দেন এবং তিনি আল্লাহর প্রশংসায় এমন অনেক কথা বলেন, যা ইতিপূর্বে কোনো কান কখনও শোনে নি। এ প্রশংসায় তিনি চাঁদ, সুরুজ, পর্বত, নদী, ঝর্ণা কোনো কিছুকেই উল্লেখ করতে বাদ দেন নি।

ইসহাক ইবনে বিশর হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেন। ঈসা ইবনে মারয়াম আ. শিশু অবস্থায় একবার কথা বলেন। এরপর তার কথা বলা বন্ধ হয়ে যায়। অন্যান্য শিশুরা যখন স্বাভাবিক বয়সে কথা বলে থাকে, তিনিও সে বয়সে পুনরায় কথা বলতে শুরু করেন। আল্লাহ তখন তাঁকে যুক্তিপূর্ণ কথা ও বাগ্মিতা শিক্ষা দেন। ইহুদিরা ঈসা আ. ও তাঁর মা সম্পর্কে জঘন্য উক্তি করে। তাঁকে তারা জারয সন্তান বলত। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا

"এবং তারা লানতগ্রস্ত হয়েছিল তাদের কুফরীর জন্যে ও মারিয়ামের বিরুদ্ধে গুরুতর অপবাদের জন্যে।" (সূরা নিসা : ১৫৬)

হযরত ঈসা আ.-এর বয়স যখন সাত বছর, তখন তাঁরা তাঁকে লেখাপড়া শিখানোর জন্যে বিদ্যালয়ে পাঠান। কিন্তু শিক্ষক তাঁকে যে বিষয়টিই শিখাতে চাইতেন, তিনি আগেই সে বিষয় সম্পর্কে বলে দিতেন। এমতাবস্থায় এক শিক্ষক তাঁকে 'আবূ জাদ' শিখালেন। ঈসা জিজ্ঞেস করলেন, 'আবূ জাদ' কি? শিক্ষক বললেন, আবূ জাদ কি আমি বলতে পারি না। ঈসা বললেন, যে বিষয়ে আপনি জানেন না, সে বিষয়ে আমাকে কেমন করে শিখাবেন? শিক্ষক বললেন, তা হলে তুমিই আমাকে শিখাও। ঈসা আ. বললেন, তবে আপনি ওই আসন থেকে নেমে আসুন! শিক্ষক নেমে আসলেন। তারপর ঈসা আ. সে আসনে গিয়ে বসলেন এবং বললেন, আমার নিকট জিজ্ঞেস করুন! শিক্ষক জিজ্ঞেস করলেন, আবূ জাদ কি? উত্তরে ঈসা বললেন, الف দ্বারা آلاءالله (আল্লাহর নিয়ামতরাশি) با দ্বারা بهاءالله (আল্লাহর দীপ্তি) جيم দ্বারা بهجة الله وجماله (আল্লাহর অনুপম সৌন্দর্য)।

এ উত্তর শুনে শিক্ষক বিস্মিত হয়ে গেলেন। হযরত ঈসা আ.-ই সর্ব প্রথম আবূ জাদ শব্দের ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

ইসহাক ইবনে বিশর রহ. ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ্ থেকে বর্ণনা করেন, হযরত ঈসার বয়স যখন তের বছর, তখন আল্লাহ তাকে মিসর ত্যাগ করে ঈলিয়া যাওয়ার নির্দেশ দেন। তখন ঈসার মায়ের মামাত ভাই ইউসুফ এসে ঈসা আ. ও মারিয়ামকে একটি গাধার পিঠে উঠিয়ে ঈলিয়া নিয়ে যান এবং সেখানেই অবস্থান করতে থাকেন। আল্লাহ এখানেই তার উপর ইনজীল অবতীর্ণ করেন, তাওরাত শিক্ষা দেন, মৃতকে জীবিত করা, রোগকি আরোগ্য করা, বাড়িতে প্রস্তুতকৃত খাদ্য সম্পর্কে না দেখেই জানিয়ে দেওয়ার জ্ঞান দান করেন। ঈলিয়ার লোকদের মধ্যে তাঁর আগমন বার্তা পৌঁছে যায়। তাঁর দ্বারা বিস্ময়কর ঘটনাবলী প্রকাশিত হতে দেখে তারা ঘাবড়ে যায় এবং আশ্চর্যবোধ করতে থাকে। ঈসা আ. তাদেরকে আল্লাহর দিকে আহবান জানান। এভাবে তাঁর নবুয়তি প্রচারকার্য জনগণের মধ্যে বিকাশ লাভ করে।

প্রসিদ্ধ আসমানি চার কিতাব

আবু যুরআ দামেশকী রহ. বর্ণনা করেন, তাওরাত কিতাব হযরত মূসা আ.-এর উপর ৬ রমযানে অবতীর্ণ হয়। এর ৪৮২ বছর পর হযরত দাউদ আ.-এর উপর যাবূর নাযিল হয় ১২ রমযানে। এর ১০৫০ বছর পর ১৮ রমাযানে হযরত ঈসা আ.-এর উপর ইনজীল অবতীর্ণ হয় এবং ২৪ রমাযানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কুরআন মজিদ নাযিল হয়।

ইবনে জারীর রহ. তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন, ত্রিশ বছর বয়সকালে হযরত ঈসা আ.-এর প্রতি ইনজীল অবতীর্ণ হয় এবং তেত্রিশ বছর বয়সের সময় তাঁকে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়।

তূবা বৃক্ষের বর্ণনা

নবী ঈসা আ. একবার আল্লাহর নিকট নিবেদন করলেন, হে আমার প্রতিপালক! তূবা কী? আল্লাহ জানালেন, তূবা একটি বৃক্ষের নাম। আমি নিজ হাতে তা রোপণ করেছি। এটা প্রত্যেকটা জান্নাতের জন্যই। এর শিকড় রিয্ওয়ানে এবং তার পানির উৎস তাসনীম। এর শিশির কর্পূরের মতো, এর স্বাদ আদার এবং ঘ্রাণ মিশকের মতো। যে ব্যক্তি এর থেকে একবার পান করবে সে কখনও পিপাসাবোধ করবে না। ঈসা আ. বললেন, আমাকে একবার সে পানি পান করার সুযোগ দিন। আল্লাহ বললেন, সেই নবী পান করার পূর্বে অন্য নবীদের জন্যে এটা পান করা নিষিদ্ধ এবং সেই নবীর উম্মতরা পান করার পূর্বে অন্য নবীদের উম্মতদের জন্যে এর স্বাদ গ্রহণ নিষিদ্ধ। আল্লাহ বললেন, হে ঈসা! আমি তোমাকে আমার নিকট উঠিয়ে আনব। ঈসা আ. বললেন, প্রভু! কেন আমাকে উঠিয়ে নিবেন?

আল্লাহ বললেন, আমি প্রথমে তোমাকে উঠিয়ে আনব। তারপর শেষ যামানায় আবার পৃথিবীতে পাঠাব। এতে তুমি সেই নবীর উম্মতের বিস্ময়কর অবস্থা প্রত্যক্ষ করতে পারবে এবং অভিশপ্ত দাজ্জালকে হত্যা করার ব্যাপারে তাদেরকে সাহায্য করতে পারবে। কোনো এক নামাযের সময় তোমাকে পৃথিবীতে নামাব। কিন্তু তুমি তাদের নামাযে ইমামতি করবে না। কেননা তারা হচ্ছে রহমতপ্রাপ্ত উম্মত। তাদের যিনি নবী, তারপর আর কোনো নবী নেই।

ইবনে আসাকির আবদুল্লাহ ইবনে আওসাজা থেকে বর্ণনা করেন। আল্লাহ ওহির মাধ্যমে ঈসা ইবনে মারিয়াম আ.-কে বলেন, তোমার চিন্তা-ভাবনায় আমাকে নিত্য সাথী করে রাখ এবং তোমার আখেরাতের জন্যে আমাকে সম্বলরূপে রাখ। নফল ইবাদতের দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন কর, তা হলে আমি তোমাকে প্রিয় জানব। আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে তোমার বন্ধু বানিয়ো না। এরূপ করলে তুমি লাঞ্ছিত হবে। বিপদে ধৈর্যধারণ কর এবং তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্ট থাক। তোমার মধ্যে আমার সন্তুষ্টিকে জাগ্রত রাখ। কেননা তোমার সন্তুষ্টি আমার আনুগত্যে নিহিত, অবাধ্যতায় নয়। আমার নৈকট্য লাভের চেষ্টা কর, আমাকে সর্বদা স্মরণ রাখ। তোমার অন্তরে যেন আমার ভালোবাসা বিরাজ করে। অবসর সময়ে সদা সচেতন থাক। সূক্ষ্ম প্রজ্ঞাকে সুদৃঢ় কর। আমার প্রতি আগ্রহ ও ভীতি পোষণ কর।

আবু দাউদ তাঁর কিতাবে তাকদীর অধ্যায়ে লিখেছেন, তাউস থেকে বর্ণিত আছে : একবার ঈসা ইবনে মারিয়ামের সাথে ইবলিসের সাক্ষাৎ হয়। ঈসা আ. ইবলীসকে বললেন, তুমি তো জান, তোমার তাকদীরে যা লেখা হয়েছে তার ব্যতিক্রম কিছুতেই

হবে না। ইবলীস বলল, তা হলে আপনি এ পাহাড়ের চূড়ায় উঠুন এবং সেখান থেকে লাফ দিয়ে নিচে পড়ে দেখুন জীবিত থাকেন কি-না। ঈসা আ. বললেন, তুমি জান না, আল্লাহ বলেছেন- বান্দা আমাকে পরীক্ষা করতে পারে না- আমি যা চাই তাই করে থাকি? যুহরী বলেছেন, মানুষ কোনো বিষয়ে আল্লাহকে পরীক্ষা করতে পারে না বরং আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষা করে থাকেন।

আবু দাউদ বলেন, একবার শয়তান হযরত ঈসা আ. এর নিকটে এসে বলল : আপনি তো নিজেকে সত্যবাদী বলে মনে করেন, তা হলে আপনি উর্ধ্বে উঠে নিচে লাফিয়ে পড়ুন দেখি। ঈসা আ. বললেন, তোমার অমঙ্গল হোক আল্লাহ কি এ কথা বলেন নি, হে মারিয়াম তনয় ঈসা! তোমার প্রতি ও তোমার জননীর প্রতি আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর। পবিত্র আত্মা অর্থাৎ জিবরাইল আ. ফেরেশতা দ্বারা আমি তোমাকে শক্তিশালী করেছিলাম। হিকমত, তাওরাত ও ইনজীল শিক্ষা দিয়েছিলাম; তুমি কর্দম দ্বারা আমার অনুমতিক্রমে পাখি সদৃশ আকৃতি গঠন করতে এবং তাতে ফুঁৎকার দিতে। ফলে আমার অনুমতিক্রমে তা পাখি হয়ে যেত; জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যধিগ্রস্তকে তুমি আমার অনুমতিক্রমে নিরাময় করতে এবং আমার অনুমতি ক্রমে তুমি মৃতকে জীবিত করতে; আমি তোমার থেকে বনি ইসরাঈলকে নিবৃত্ত রেখেছিলাম; তুমি যখন তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন এনেছিলে, তখন তাদের মধ্যে যারা কুফরি করেছিল তারা বলেছিল, এ তো স্পষ্ট যাদু। (সূরা মায়িদা : ১১০)

আমি গরীব ও মিসকীন লোকদেরকে তোমার একান্ত ভক্ত ও সাথী বানিয়েছি, যাদের উপরে তুমি সন্তুষ্ট। এমন সব শিষ্য ও সাহায্যকারী তোমাকে দিয়েছি, যারা তোমাকে জান্নাতের পথ প্রদর্শনকারী রূপে পেয়ে সন্তুষ্ট। জেনে রেখো, উক্ত গুণ দুটি বান্দার জন্যে প্রধান গুণ। যারা এ গুণ দুটি নিয়ে আমার কাছে আসবে, তারা আমার নিকট সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ও মনোনীত বান্দা হিসেবে গণ্য হবে। বনি ইসরাঈলরা তোমাকে বলবে, আমরা রোজা রেখেছি কিন্তু তা কবুল হয় নি, নামায পড়েছি কিন্তু তা গৃহিত হয় নি, দান-সদকা করেছি কিন্তু তা মঞ্জুর হয় নি, উটের কান্নার মতো করুণ সুরে কেঁদেছি কিন্তু আমাদের কান্নার প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হয় নি। এ সব অভিযোগের জবাব তাদের কাছে জিজ্ঞেস কর, এমনটা কেন হল? কোন জিনিসটি আমাকে এসব কবুল করা থেকে বাঁধা দিয়েছে? আসমান ও যমীনের সমস্ত ধনভাণ্ডার কি আমার হাতে নেই? আমি আমার ধনভাণ্ডার থেকে যেরূপ ইচ্ছা খরচ করে থাকি। কৃপণতা আমাকে স্পর্শ করে না। আমি কি প্রার্থনা শ্রবণের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম এবং দান করার ব্যাপারে সবচেয়ে উদার সত্তা নই? না আমার দান-অনুগ্রহ সঙ্কুচিত হয়ে গিয়েছে? দুনিয়ার কেউ কারও প্রতি অনুগ্রহশীল হলে সে তো আমারই দয়ার কারণে তা করে থাকে।

হে ঈসা ইবনে মারিয়াম! ওই সম্প্রদায়ের লোকদের অন্তরে আমি যে সব সদগুণ প্রদান করেছিলাম, তারা যদি সেগুলোকে সঠিকভাবে কাজে লাগাত, তা হলে

আখিরাতের জীবনের উপরে দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিত না এবং বুঝতে পারত যে, কোথা থেকে তাদেরকে দান করা হয়েছে আর তারা এটাও বিশ্বাস করত যে, মনের কামনা বাসনাই তাদের বড় দুশমন। তাদের রোযা আমি কিভাবে কবুল করি। যখন হারাম খাবার গ্রহণের মাধ্যমে তারা শক্তি সঞ্চয় করেছে? তাদের নামায আমি কিভাবে কবুল করি, যখন তাদের অন্তর ওই সব লোকদের প্রতি আকৃষ্ট যারা আমার বিরোধিতা করে এবং আমার নিষিদ্ধ বস্তুকে হালাল জানে? কি করে তাদের দান-সদকা আমি মঞ্জুর করি, যখন তারা মানুষের উপর জুলুম করে অবৈধ পন্থায় তাদের ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নেয়। হে ইসা! আমি ওই সব লোকদেরকে যথাযথ প্রতিদান দিব। হে ঈসা! তাদের কান্নায় আমি দয়া দেখাব কিভাবে, যখন তাদের হাত নবীদের রক্তে রঞ্জিত? এ কারণে তাদের প্রতি আমার ক্রোধ অতি মাত্রায় বেশি।

হে ঈসা! যে দিন আমি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছি, সে দিনই আমি চূড়ান্ত করে রেখেছি, যে ব্যক্তি আমার দাসত্ব কবুল করবে এবং তোমার ও তোমার মা সম্পর্কে আমার বাণীকে সঠিক বলে মেনে নিবে, তাকে আমি তোমার ঘরের প্রতিবেশী বানাব, সফরের সাথী করব এবং অলৌকিক ঘটনা প্রকাশে তোমার শরীক করব। যে দিন আমি আসমান যমীন সৃষ্টি করেছি, সেদিন আরো চূড়ান্ত করে রেখেছি, যেসব লোক তোমাকে ও তোমার মাকে আল্লাহর সাথে শরীফ করে প্রভু বানাবে, তাদেরকে আমি জাহান্নামের সর্বনিম্নে স্থান দেব।

যেদিন আমি আসমান ও যমিন সৃষ্টি করেছি, সে দিন এ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে রেখেছি, আমি আমার প্রিয় বান্দা মুহাম্মদের হাতে এ বিষয়টি নিষ্পত্তি করব। তার উপরেই নবুয়ত ও রিসালাতের পরিসমাপ্তি টানব। তার জন্ম হবে মক্কায়, হিজরতস্থল (মদীনা) তায়্যিবা। শাম দেশ তার অধীন হবে। সে কর্কশভাষী ও কঠোরহৃদয় হবে না, বাজারে চিৎকার করে ফিরবে না, অশ্লীল-অশ্রাব্য কথাবার্তা বলবে না। প্রতিটি বিষয়ে উত্তম পন্থা অবলম্বনের জন্যে আমি তাকে তাওফিক দিব। সৎচরিত্রের যাবতীয় গুণাবলী তাকে প্রদান করব। তার অন্তর থাকবে তাকওয়ায় পরিপূর্ণ। জ্ঞান হবে প্রজ্ঞায় সমৃদ্ধ। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা তার স্বভাব, ন্যায়বিচার তার চরিত্র, সত্য তার শরিয়ত, ইসলাম তার আদর্শ, নাম হবে তার আহমদ।

আমি তার সাহায্যে মানুষকে বিভ্রান্তি থেকে সঠিক পথ দেখাব, অজ্ঞতা থেকে ফিরিয়ে জ্ঞানের দিকে আনব, নিঃস্ব অবস্থা থেকে স্বচ্ছলতার দিকে আনব, বিপর্যস্ত অবস্থা থেকে উদ্ধার করে উন্নতির সোপানে উঠাব। তার দ্বারা সঠিক পথ প্রদর্শন করব। তার সাহায্যে বধির ব্যক্তিকে শ্রবণশক্তি দান করব, আচ্ছাদিত হৃদয়সমূহকে উন্মুক্ত করে দিব, বিভিন্ন কামনা-বাসনাকে সংযত করব। তার উম্মতকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উম্মতের মর্যাদা দান করব। মানবজাতির কল্যাণ সাধনের জন্যে তাদের অভ্যুদয় ঘটবে। তারা মানুষকে ভালো কাজে আহবান জানাবে ও গর্হিত কাজ থেকে নিষেধ করবে। আমার

নামে তারা নিষ্ঠাবান থাকবে। রাসূলের আনীত আদর্শকে তারা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করবে।

তারা তাদের মসজিদে, সভা-সমিতিতে বাড়ি ঘরে ও চলতে ফিরতে সর্বাবস্থায় আমার তাসবীহ পাঠ করবে, পবিত্রতা ঘোষণা করবে ও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ কালেমা পড়বে। তারা দাঁড়ানো অবস্থায়, বসা অবস্থায় রুকু-সিজদার মাধ্যমে আমার জন্যে নামায আদায় করবে। আমার পথে তারা সারিবদ্ধ হয়ে দুশমনের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। আল্লাহর পথে রক্ত দান হচ্ছে তাদের নিকট পুণ্যকর্ম। সুসংবাদের আশায় তাদের অন্তর ভরপুর, তাদের নেককাজসমূহ প্রদর্শনীযুক্ত। রাতের বেলায় তারা আল্লাহর ধ্যানে মশগুল তাপস আর দিনের বেলায় যুদ্ধের ময়দানে সাক্ষাৎ সিংহ– এ সবই আমার অনুগ্রহ। যাকে ইচ্ছা তাকে দিই। আমি মহা অনুগ্রহশীল।

বনি ইসরাঈলের মুনাফিক ও কাফির শ্রেণীর লোকেরা তাঁর সাথে উপহাস করে জিজ্ঞেস করত– বলুন তো, অমুক গতকাল কী খাবার খেয়েছে এবং বাড়িতে সে কি রেখে এসেছে? হযরত ঈসা আ. তাদের সঠিক জবাব দিয়ে দিতেন।

এতে মুমিনদের ঈমান এবং কাফির ও মুনাফিকদের সন্দেহ ও অবিশ্বাস আরও বেড়ে যেত, এতদসত্ত্বে ও হযরত ঈসা আ. এর মাথা গোঁজার মতো কোনো ঘর বাড়ি ছিল না। খোলা আকাশের নিচে মাটির উপর তিনি সালাত ও তাসবীহ আদায় করতেন। তাঁর কোনো স্থায়ী আবাসস্থল বা ঠিকানা ছিল না। সর্বপ্রথম তিনি যে মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করেন, সে ঘটনাটি ছিল নিম্নরূপ :

একবার তিনি কোনো এক কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ওই কবরের নিকটে এক মহিলা বসে কাঁদছিল। ঈসা আ. মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কী হয়েছে? মহিলা বলল, আমার একটি মাত্র কন্যা ছিল। সে ছাড়া আমার আর কোনো সন্তান নেই। আমার সে কন্যাটি মারা গেছে। আমি আল্লাহর সাথে প্রতিজ্ঞা করেছি, হয় তিনি আমার কন্যাকে জীবিত করে দিবেন, না হয় আমিও তার মতো মারা যাব; এ জায়গা ত্যাগ করব না। আপনি এর দিকে একটু লক্ষ্য করুন। ঈসা আ. বললেন, আমি যদি লক্ষ্য করি তবে কি তুমি এখান থেকে ফিরে যাবে? মহিলাটি বলল, হ্যাঁ তাই করব। তারপর হযরত ঈসা আ. দু রাকআত নামায আদায় করে কবরের পাশে এসে বসলেন এবং বললেন : ওহে অমুক! তুমি আল্লাহর হুকুমে উঠে দাঁড়াও এবং বের হয়ে এস। তখন কবরটি সামান্য কেঁপে উঠল।

ঈসা আ. দ্বিতীয়বার আহবান করলেন। এবার কবরটি ফেটে গেল। তৃতীয়বার আহবান করলে কবরবাসিনী বেরিয়ে আসল এবং মাথার চুল থেকে ধুলাবালি ঝেড়ে ফেলতে লাগল। ঈসা আ. তাকে জিজ্ঞেস করলেন, বের হতে তোমার দেরী হল কেন? মেয়েটি বলল, প্রথম আওয়াজ শোনার পর আল্লাহ আমার নিকট একজন ফেরেশতা পাঠান। তিনি আমার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি জোড়া লাগান। দ্বিতীয় আওয়াজের পর রূহ আমার দেহের ভিতর প্রবেশ করে।

তৃতীয় আওয়াজ যখন হল তখন আমার ধারণা হল, এটা কিয়ামতের আওয়াজ। আমি ভীত-শঙ্কিত হয়ে পড়লাম। কিয়ামতের ভয়ে আমার মাথার চুল ও চোখের ভ্রু সব সাদা হয়ে গেছে। তারপর মেয়েটি তার মায়ের কাছে গিয়ে বলল, মা! আপনি আমাকে মৃত্যুর তিক্ত স্বাদ দুবার গ্রহণ করালেন কেন? মা! ধৈর্য ধরুন, পুণ্যের আশা করুন। দুনিয়ার উপরে থাকার কোনো আগ্রহ আমার নেই। হে রূহুল্লাহ! হে কালিমাতুল্লাহ! আপনি আল্লাহর নিকট দুআ করুন, যেন আমাকে তিনি আখিরাতের জীবন ফিরিয়ে দেন এবং মৃত্যুর কষ্ট কমিয়ে দেন। ঈসা আ. আল্লাহর নিকট দুআ করলেন। ফলে মেয়েটির দ্বিতীয়বার মৃত্যু হল এবং তাকে কবরস্থ করা হল। এ সংবাদ ইহুদিদের নিকট পৌঁছলে তারা ঈসা আ.-এর প্রতি পূর্বের চেয়ে অধিক বিদ্বেষ পরায়ণ হয়ে উঠল।

সুদ্দী হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.-এর বরাতে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। বনি ইসরাঈলের এক বাদশার মৃত্যু হয়। কবরস্থ করার জন্যে তাকে খাটের উপর রাখা হয়। এ সময় হযরত ঈসা আ. সেখানে উপস্থিত হন। তিনি আল্লাহর নিকট দুআ করেন। ফলে বাদশা জীবিত হয়ে যায়। মানুষ অবাক দৃষ্টিতে এ আশ্চর্য ও অভূতপূর্ব ঘটনা প্রত্যক্ষ করে। যেমন আল্লাহ পাক বলেন :

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (١١٠) وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ

আল্লাহ বলবেন, হে মারিয়াম-তনয় ঈসা! তোমার প্রতি ও তোমার মায়ের প্রতি আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর : পবিত্র আত্মা দ্বারা আমি তোমাকে শক্তিশালী করেছিলাম এবং তুমি দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে মানুষের সাথে কথা বলতে; তোমাকে কিতাব হিকমত, তাওরাত ইনজীল শিক্ষা দিয়েছিলাম; তুমি কাদা দ্বারা আমার অনুমতিক্রমে পাখী সদৃশ আকৃতি গঠন করতে এবং তাতে ফুঁৎকার দিতে, ফলে আমার অনুমতিক্রমে তা পাখী হয়ে যেত; জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে তুমি আমার অনুমতিক্রমে নিরাময় করতে এবং আমার অনুমতিক্রমে তুমি মৃতকে জীবিত করতে; আমি তোমা হতে বনি ইসরাঈলকে নিবৃত্ত রেখেছিলাম; তুমি যখন তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন এনেছিলে তখন তাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল তারা বলেছিল, এ তো স্পষ্ট জাদু। আরো স্মরণ কর, আমি যখন হাওয়ারীদেরকে এই আদেশ দিয়েছিলাম, তোমরা আমার প্রতি ও আমার রাসূলের প্রতি ঈমান আন। তারা বলেছিল, আমরা ঈমান আনলাম এবং তুমি সাক্ষী থাক যে, আমরা তো মুসলিম। (সূরা মায়িদা : ১১০-১১১)

প্রত্যেক নবীর মুজিযা ছিল তাঁর নিজ যুগের মানুষের চাহিদার উপযোগী। হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আ.-কে যে যুগে প্রেরণ করা হয় সে যুগটি ছিল উন্নত চিকিৎসার জন্যে প্রসিদ্ধ। আল্লাহ তাঁকে এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এমন মুজিযা দান করলেন যা ছিল তাদের ক্ষমতা ও আয়ত্তের বাইরে। একজন চিকিৎসক যখন অন্ধ, খঞ্জ, কুষ্ঠ ও পঙ্গুকে ভালো করতে অক্ষম, সেখানে একজন জন্মান্ধকে ভালো করার প্রশ্নই উঠে না। আর একজন মৃত ব্যক্তিকে কবর থেকে জীবিত উঠানোর শক্তি মানুষের জন্যে তো কল্পনাই করা যায় না। প্রত্যেকেই বুঝে, এসব এমন মুজিযা, যার মাধ্যমে এগুলো প্রকাশ পায় তার দাবির পক্ষে এটা হয়ে থাকে সুস্পষ্ট প্রমাণ এবং যে সত্তা তাকে প্রেরণ করেন তাঁর কুদরত ও মহাশক্তির প্রমাণ।

হযরত ঈসা আ. যখন বনি ইসরাঈলের নিকট অকাট্য দলীল-প্রমাণ স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন তখন তাদের অধিকাংশ লোকই কুফরী, ভ্রষ্টতা, বিদ্বেষ ও অবাধ্যতার উপর অটল থেকে যায়। তবে তাদের একটি ক্ষুদ্র দল তাঁর পক্ষ অবলম্বন করে এবং বিরোধিতাকারীদের প্রতিবাদ জানান। তাঁরা নবীর সাহায্যকারী হন ও তার শিষ্যত্ব বরণ করেন। তাঁরা নবীর আনুগত্য করেন, সাহায্য সহযোগিতা করেন ও উপদেশ মেনে চলেন। এ ক্ষুদ্র দলটির আত্মপ্রকাশ তখন ঘটে যখন বনি ইসরাঈল তাঁকে হত্যার জন্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং সে যুগের জনৈক বাদশার সাথে ষড়যন্ত্র পাকাপোক্ত করে তাঁকে হত্যা ও শূলে চড়ানোর চক্রান্ত সম্পন্ন করে। কিন্তু আল্লাহ তাঁকে তাদের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষ করেন। তাদের মধ্য থেকে নবীকে তাঁর সান্নিধ্যে উঠিয়ে নেন এবং তাঁর এক শিষ্যকে তাঁর চেহারার অনুরূপ চেহারায় রূপান্তরিত করে দেন। কিন্তু বনি ইসরাঈলরা তাকে ঈসা আ. মনে করে হত্যা করে ও শূলে চড়ায়। এ ব্যাপারে তারা ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ও সত্যকে উপেক্ষা করে। খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক এদের দাবিকে সমর্থন করে। কিন্তু উভয় দলই এ ব্যাপারে ভুলের মধ্যে রয়েছে।

ঈসা আ. হলেন বনি ইসরাঈলের শেষ নবী। তিনি তাদের তার পরে আগমনকারী সর্বশেষ নবীর সুসংবাদ দান করেন, তাঁর নাম উল্লেখ করেন এবং তাঁর লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করেন, যাতে করে সেই নবী যখন আগমন করবেন তখন তারা তাঁকে চিনতে পারে ও তাঁর আনুগত্য করতে পারে। তারা যাতে কোনো রকম অজুহাত তুলতে না পারে, সে জন্যে তিনি দলীল-প্রমাণ চূড়ান্তভাবে পেশ করেন এবং তাদের প্রতি এটা ছিল আল্লাহর অনুকম্পা স্বরূপ। যেমনটি আল্লাহ বলেন : "যারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক উম্মী নবীর যার উল্লেখ তাওরাত ও ইনজীল যা তাদের নিকট আছে তাতে লিপিবদ্ধ পায়। যে তাদেরকে সৎকাজের নির্দেশ দেয় ও অসৎকাজে বাধা দেয়, যে তাদের জন্যে পবিত্র বস্তু বৈধ করে ও অপবিত্র বস্তু অবৈধ করে এবং যে মুক্ত করে তাদেরকে তাদের গুরুভার থেকে ও শৃঙ্খল থেকে যা তাদের উপর ছিল। সুতরাং যারা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে এবং যে নূর তার সাথে অবতীর্ণ হয়েছে তার অনুসরণ করে, তারাই সফলকাম। (সূরা আরাফ : ১৫৭)

এরপর বনি ইসরাঈলের মধ্যে নবুতের ধারাবাহিকতা যখন ঈসা আ. পর্যন্ত এসে শেষ হল তখন তিনি তাদেরকে জানিয়ে দেন, তাদের মধ্যে নবী প্রেরণের ধারা শেষ হয়ে গিয়েছে। এরপর আরবদের মধ্যে এক উম্মী নবী আসবেন। তিনি হবেন খাতিমুল আম্বিয়া বা শেষ নবী। তাঁর নাম হবে আহমদ, তিনি হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম। ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীমের বংশধর।

আল্লাহ বলেন, "পরে সে [ঈসা আ.] যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের নিকট আসল, তারা বলতে লাগল, এতো এক স্পষ্ট যাদু" তার শিষ্যগণ বলেছিল, "আমরাই তো আল্লাহর পথে সাহায্যকারী।" নাসিরা নামক একটি গ্রামে ঈসা আ.-এর সাথে শিষ্যদের এ কথাবার্তা হয়েছিল; এ জন্যেই পরবর্তী সময়ে তারা নাসারা নামে আখ্যায়িত হয়।

পরবর্তীকালে আল্লাহ ঈমান গ্রহণকারীদেরকে সাহায্য ও শক্তি দান করেন। ফলে তারা ঈমান প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে পর্যুদস্ত করে এবং তাদের উপর বিজয় লাভ করে। ঈসা আ.-এর ব্যাপারে মুসলমানদের বিশ্বাসই যথার্থ, যাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর তা হচ্ছে তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। সুতরাং নাসারাদের (খ্রিষ্টানদের) উপর তারা বিজয়ী থাকবেন। কেননা নাসারারা ঈসা আ. এর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে, তাঁর ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করেছে, এবং আল্লাহ তাঁকে যে মর্যাদা দিয়েছেন, তারা এর চেয়ে ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছে। যেহেতু তারা মোটামুটিভাবে অভিশপ্ত ইহুদিদের তুলনায় ঈসা আ.-এর আদর্শের কাছাকাছি অবস্থানে আছে, সে জন্যে তারা ইহুদিদের উপরে বিজয়ী হয়ে ইসলামের পূর্বেও ছিল এবং ইসলামের আবির্ভাবের পরেও রয়েছে।

আসমানী খাঞ্চা

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন :

إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (١١٢) قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ (١١٣) قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ () قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ

"স্মরণ কর, হাওয়ারীগণ বলেছিল, হে মারিয়াম-তনয় ঈসা! তোমার প্রতিপালক কি আমাদের জন্যে আসমান হতে খাদ্য পরিপূর্ণ খাঞ্চা (মায়িদা) প্রেরন করতে সক্ষম? সে বলেছিল, আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা মুমিন হও। তারা বলেছিল, আমরা চাই যে, তা থেকে কিছু খাব এবং আমাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করবে। আর আমরা জানতে চাই

যে, তুমি আমাদেরকে সত্য বলেছ এবং আমরা এর সাক্ষী থাকতে চাই। মারিয়াম-তনয় ঈসা বলল, হে আল্লাহ, আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্যে আসমান হতে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা প্রেরণ কর; এটা আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের জন্যে হবে আনন্দ-উৎসব স্বরূপ ও তোমার নিকট হতে নিদর্শন। এবং আমাদেরকে জীবিকা দান কর; তুমিই তো শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা। আল্লাহ বললেন, আমিই তোমাদের নিকট এটা প্রেরণ করব; কিন্তু এরপর তোমাদের মধ্যে কেউ কুফরী করলে তাকে এমন শাস্তি দিব, যে শাস্তি বিশ্বজগতের অপর কাউকেও দিব না।" (সূরা মায়িদা : ১১২-১১৫)

তাফসীর গ্রন্থে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় খাঞ্চা অবতরণ প্রসঙ্গে সেই সব হাদীসে উল্লেখ আছে যা হযরত ইবনে আব্বাস, সালমান ফারসী, ইবনে ইয়াসির প্রমুখ থেকে বর্ণিত হয়েছে। ঘটনার সারসংক্ষেপ :

হযরত ঈসা আ. হাওয়ারীগণকে ত্রিশ দিন রোযা পালনের নির্দেশ দেন। তারা ত্রিশ দিন সওম পালন শেষে হযরত ঈসা আ.-এর নিকট আসমান থেকে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা অবতীর্ণ করার আবদার জানায়। উদ্দেশ্য ছিল তারা আল্লাহর প্রেরিত এ খাদ্য আহার করবে। তাদের রোযা ও দুআ আল্লাহ কবুল করেছেন এ ব্যাপারে অন্তরে প্রশান্তি লাভ করবে, সওমের মেয়াদ শেষে রোযা ভঙের দিনে ঈদ উৎসব পালন করবে, তাদের পূর্বপুরুষ ও উত্তরপুরুষ এবং ধনী ও দরিদ্র সকলের জন্যে তা আনন্দের বিষয় হিসেবে গণ্য হবে। ঈসা আ. এ ব্যাপারে তাদেরকে অনেক উপদেশ দিলেন। তাঁর আশঙ্কা হল, এরা আল্লাহর এ নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে এবং এর শর্তাদি পূরণ করতে সক্ষম হবে না। কিন্তু তারা তাদের আবদার পূরণ না হওয়া পর্যন্ত উপদেশ শুনতে প্রস্তুত হল না। অবশেষে তাদের পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে তিনি আল্লাহর নিকট দুআ করতে প্রস্তুত হন। তিনি নামাযে দণ্ডায়মান হলেন। পশম ও চুলের তৈরি কম্বল পরিধান করলেন এবং অবনত মস্তকে কান্নায় বুক ভাসিয়ে দিলেন। তিনি আল্লাহর নিকট কাকুতি-মিনতি করে দুআ করলেন, যেন তাদের প্রার্থীত জিনিস তিনি দিয়ে দেন। সুতরাং আল্লাহ আসমান থেকে খাদ্য ভর্তি খাঞ্চা অবতীর্ণ করেন।

মানুষ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল, দুটি মেঘের মাঝখান থেকে খাঞ্চাটি ধীরে ধীরে নিচের দিকে নেমে আসছে। খাঞ্চাটি যতই পৃথিবীর নিকটবর্তী হচ্ছিল, ততই হযরত ঈসা আ. বেশি বেশি করে আল্লাহর নিকট দুআ করছিলেন, "হে আল্লাহ! একে তুমি রহমত বরকত ও শান্তি হিসেবে দান কর। শাস্তি হিসেবে দিও না।" খাঞ্চাটি ক্রমান্বয়ে নেমে এসে একেবারে নিকটবর্তী হয়ে গেল এবং হযরত ঈসা আ.-এর সম্মুখে মাটির উপর থামল। খাঞ্চাটি ছিল রুমাল দিয়ে ঢাকা।

ঈসা আ. بِسْمِ اللّٰهِ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ বলে রুমালখানা উঠালেন। দেখলেন তাতে সাতটি মাছ ও সাতটি রুটি আছে। কেউ বলেছেন, এর সাথে সিরকা ছিল। কেউ বলেছেন, ডালিম এবং ফল ফলাদিও ছিল। উক্ত খাদ্য দ্রব্যগুলো ছিল অত্যন্ত সুগন্ধিময়। আল্লাহ

বলেছিলেন, হও আর তাতেই তা হয়ে গিয়েছিল।' তারপর ঈসা আ. তাদেরকে খাওয়ার জন্যে আহবান করেন। তারা বলল, আপনি প্রথমে খাওয়া আরম্ভ করুন তারপরে আমরা খাব। হযরত ঈসা আ. বললেন, এ খাঞ্চার জন্যে তোমরাই প্রথমে আবেদন করেছিলে; কিন্তু প্রথমে খেতে তারা কিছুতেই রাজি হল না। হযরত ঈসা আ. তখন ফকীর, মিসকীন, অভাবগ্রস্ত রোগাক্রান্ত ও পঙ্গুদেরকে খাওয়ার আদেশ দেন। এ জাতীয় লোকদের সংখ্যা ছিল তেরশ'। সকলেই তা থেকে খেল। ফলে দুঃখ-দুর্দশা ও রোগ-শোক যার যে সমস্যা ছিল, এ খাদ্যের বরকতে তা থেকে সে নিরাময় লাভ করল। যারা খেতে অস্বীকার করেছিল তা দেখে তারা খুবই লজ্জিত হল ও অনুশোচনা করতে লাগল। কথিত আছে, এ খাঞ্চা প্রতিদিন একবার করে আসত। লোক এ থেকে তৃপ্তি সহকারে আহার করত। খাদ্য একটুও হ্রাস পেতো না। প্রথম দল যেভাবে আহার করত, শেষের দলও ঐ একইভাবে আহার করত। কথিত আছে, প্রতিদিন সাত হাজার লোক ঐ খাদ্য আহার করত।

কিছুদিন অতিবাহিত হলে একদিন পর পর খাঞ্চা অবতরণ করত। যেমন সালেহ আ.-এর উটনীর দুধ একদিন পর পর লোকেরা পান করত। এরপর আল্লাহ্ হযরত ঈসা আ.-কে আদেশ দেন, এখন থেকে খাঞ্চার খাবার শুধু দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্ত লোকেরাই আহার করবে। ধনী লোকেরা তা থেকে আহার করতে পারবে না। এ নির্দেশ অনেককেই পীড়া দেয়। মুনাফিকরা এ নিয়ে বিরূপ সমালোচনা করতে শুরু করল। ফলে আসমানী খাঞ্চা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গেল এবং সমালোচনাকারীরা শূকরে পরিণত হল।

আবু বকর ইবনে আবিদ দুনিয়া হযরত বকর ইবনে আবদিল্লাহ মুযানী থেকে বর্ণনা করেন : একবার হাওয়ারীগণ হযরত ঈসা আ.-কে খুঁজে পাচ্ছিলেন না। জনৈক ব্যক্তি তাদেরকে বলল, তিনি সমুদ্রের দিকে গিয়েছেন। তারা সন্ধান করতে করতে সমুদ্রের দিকে গেল। সমুদ্রের তীরে গিয়ে দেখেন, তিনি পানির উপর দিয়ে হাঁটছেন। সমুদ্রের তরঙ্গ একবার তাঁকে উপরে উঠাচ্ছে এবার নিচে নামাচ্ছে। একটি চাদরের অর্ধেক গায়ের উপর দিয়ে রেখেছেন আর বাকী অর্ধেক তাঁর পরিধানে আছে। পানির উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তিনি তাঁদের নিকটে আসেন। তাঁদের মধ্যকার শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিটি বললেন, "হে আল্লাহর নবী! আমি কি আপনার নিকট আসব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, এস, যখন তিনি এক পা পানিতে রেখে অন্য পা তুলেছেন, অমনি চিৎকার করে উঠেন, হে আল্লাহর নবী! আমি তো ডুবে গেলাম। হযরত ঈসা আ. বললেন, ওহে দুর্বল ঈমানদার! তোমার হাত আমার দিকে বাড়াও। কোনো আদম সন্তানের যদি একটা যব পরিমাণও ঈমান থাকে তা হলে সে পানির উপর দিয়ে হাঁটতে পারে।

আবু সাঈদ ইবনুল আরাবী থেকে অনুরূপ ঘটনা বর্ণিত আছে। ইবনে আবিদ দুনিয়া হযরত ফুযায়েল ইবনে ইয়ায থেকে বর্ণনা করেন : জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে

ঈসা! আপনি কিসের সাহায্যে পানির উপর দিয়ে হাঁটেন? তিনি বললেন, ঈমান ও ইয়াকীনের বলে। উপস্থিত লোকেরা বলল, আপনি যেমন ইয়াকীন রাখেন, আমরাও তেমনি ইয়াকীন রাখি। হযরত ঈসা আ. বললেন, তাই যদি হয় তা হলে তোমরাও পানির উপর দিয়ে হেঁটে চল। তখন তারা নবী ঈসার সাথে পানির উপর দিয়ে হাঁটা শুরু করল। কিন্তু ঢেউ আসা মাত্রই তারা সকলেই ডুবে গেল। নবী বললেন, তোমাদের কী হল? তারা বলল, আমরা ঢেউ দেখে ভীত হয়ে গিয়েছিলাম। নবী বললেন, কত ভালো হত, যদি ঢেউ এর মালিককে তোমরা ভয় করতে! এরপর তিনি তাদেরকে বের করে আনলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি মাটিতে হাত মেরে এক মুষ্টি মাটি নিলেন। পরে হাত খুললে দেখা গেল এক হাতে স্বর্ণ এবং অন্য হাতে মাটির ঢেলা কিংবা কঙ্কর। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, এ দু'হাতের কোন্‌টির বস্তু তোমাদের কাছে প্রিয়তর? তারা বলল, স্বর্ণ। নবী বললেন, আমার নিকট স্বর্ণ ও মাটি উভয়ই সমান।

হযরত ঈসা আ. পশমী বস্ত্র পরিধান করতেন, গাছের পাতা আহার করতেন। তাঁর বসবাসের কোনো ঘরবাড়ী ছিল না। পরিবার ছিল না, অর্থ সম্পদ ছিল না এবং আগামী দিনের জন্যে কিছু সঞ্চয় করেও তিনি রাখতেন না। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি তাঁর মায়ের সূতা কাটার চরকার আয় থেকে আহার করতেন।

ফুযায়ল ইবনে ইয়ায, ইউনুস ইবনে উবায়দ সূত্রে বর্ণনা করেন, হযরত ঈসা আ. বলতেন : যতক্ষণ আমরা দুনিয়ার ভোগ-বিলাস থেকে বিমুখ হতে না পারব, ততক্ষণ প্রকৃত ঈমানের স্বাদ অনুভব করতে পারব না। হযরত ঈসা আ. বলতেন, আমি সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করেছি। তাতে আমি দেখেছি, যাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তার তুলনায় যাকে সৃষ্টি করা হয় নি, সে-ই আমার কাছে বেশী ঈর্ষণীয়।

ইসহাক ইবনে বিশর হযরত হাসান রহ. সূত্রে বর্ণনা করেন, কিয়ামতের দিন হযরত ঈসা আ. হবেন সংসার-বিমুখদের নেতা। তিনি আরও বলেছেন : কিয়ামতের দিন পাপ থেকে পলায়নকারী লোকদের হাশর হবে ঈসা আ.-এর সাথে।

রাবী আরও বলেন : একদিন হযরত ঈসা আ. একটি পাথরের উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়েন। তিনি গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। এমন সময় ওই স্থান দিয়ে ইবলিস যাচ্ছিল। সে বলল, "ওহে ঈসা! তুমি বলে থাক না, দুনিয়ার কোনো বস্তুর প্রতি তোমার আগ্রহ নেই? কিন্তু এই পাথরটি তো দুনিয়ার বস্তু।" তখন হযরত ঈসা আ. পাথরটি ধরে তাঁর দিকে ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন, দুনিয়ার সাথে এটিও তুই নিয়ে যা। মুতামির ইবনে সুলাইমান বলেন, একবার হযরত ঈসা আ. তাঁর শিষ্যদের সাথে নিয়ে বের হন।

তাঁর পরিধানে ছিল পশমের জুব্বা ও চাদর। তাঁর পায়ে কোনো জুতা ছিল না। তিনি ছিলেন ক্রন্দনরত। তাঁর মাথার চুল ছিল এলোমেলো। ক্ষুধার তীব্রতায় চেহারা ছিল ফ্যাকাশে। পিপাসায় ঠোঁট দু'টি শুষ্ক। এ অবস্থায় তিনি বনি ইসরাঈলের লোকদেরকে

সালাম দিয়ে বললেন : আল্লাহর মেহেরবানীতে আমি দুনিয়াকে তার সঠিক অবস্থানে রেখেছি। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই এবং এর জন্যে আমার গৌরবেরও কিছু নেই। তোমরা কি জান, আমার ঘর কোথায়? তারা বলল, হে রুহুল্লাহ! কোথায় আপনার ঘর? তিনি বললেন : আমার ঘর হল মসজিদ, পানি দিয়েই আমার অঙ্গসজ্জা। ক্ষুধাই আমার ব্যঞ্জন। রাতের চাঁদ আমার বাতি, শীতকালে আমার সালাত পূর্বাচল, শাক-সব্জিই আমার জীবিকা, মোটা পশমই আমার পরিধেয়। আল্লাহর ভয়ই আমার পরিচিতি, পঙ্গু ও নিঃস্বরা আমার সঙ্গী-সাথী। আমি যখন সকালে উঠি তখন আমার হাত শূন্য, যখন সন্ধ্যা হয় তখনও আমার হাতে কিছু থাকে না। এতে আমি সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত এবং নিরুদ্বিগ্ন। সুতরাং আমার চাইতে ধনী ও সচ্ছল আর কে আছে? বর্ণনাটি ইবনে আসাকিরের।

আবূ মুসআব মালিক থেকে বর্ণনা করেন, ঈসা আ. বনি ইসরাঈলদেরকে বলতেন : খালি পানি পান কর, তাজা সবজি খাও এবং যবের রুটি আহার কর। গমের রুটি খেয়ো না যেন। কেননা তোমরা এর শোকর আদায় করতে পারবে না।

ইবনে ওহাব হযরত ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ থেকে বর্ণনা করেন, ঈসা আ. বলতেন : তোমরা দুনিয়া অতিক্রম করে যাও। একে আবাদ করো না। তিনি বলতেন : দুনিয়ার মহব্বত সকল গুনাহের মূল এবং কুদৃষ্টি অন্তরের মধ্যে কামভাব উৎপন্ন করে। অবশ্য অন্য বর্ণনায় অতিরিক্ত আছে, কামনা-বাসনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষকে দীর্ঘস্থায়ী দুঃখে ফেলে। হযরত ঈসা আ. বলতেন, হে দুর্বল চিন্তা আদম-সন্তান! যেখানেই থাক আল্লাহকে ভয় কর, দুনিয়ায় মেহমান হিসেবে জীবন যাপন কর। মসজিদকে নিজের ঘর বানাও। চক্ষুদ্বয়কে কাঁদতে শিখাও, দেহকে ধৈর্যধারণ করতে ও অন্তরকে চিন্তা করতে অভ্যস্ত কর। আগামী দিনের খাদ্যের জন্যে দুশ্চিন্তা করো না এটা পাপ। তিনি বলতেন, 'সমুদ্রের তরঙ্গের উপরে ঘর বানান যেমন সম্ভব নয় তেমনি দুনিয়ায় স্থায়ীভাবে থাকাও সম্ভব নয়।'

সুফিয়ান ছাওরী বলেন, ঈসা আ. বলেছেন : মুমিনের অন্তরে দুনিয়ার মহব্বত ও আখিরাতের মহব্বত একত্রে থাকতে পারে না, যেভাবে একত্রে থাকতে পারে না একই পাত্রে আগুন ও পানি। ইবরাহীম হারবী হযরত আবু আবদুল্লাহ সূফি রহ. এর সূত্রে বলেন, ঈসা আ. বলেছেন : দুনিয়া অন্বেষণকারী লোক সমুদ্রের পানি পানকারীর সাথে তুলনীয়। সমুদ্রের পানি যত বেশি পান করবে তত বেশি পিপাসা বৃদ্ধি পাবে এবং তা তাকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দিবে। আর শয়তান দুনিয়া অন্বেষণ ও কামনাকে আকর্ষণীয় করে এবং প্রবৃত্তির লালসার সময় শক্তি যোগায়।

আমাশ খায়ছামা থেকে বর্ণনা করেন, ঈসা আ. সঙ্গী-সাথীদের সামনে আহার্য রেখে নিজে আহার থেকে বিরত থাকতেন এবং বলতেন, মেহমানদের সাথে তোমরাও এরূপ আচরণ করবে। জনৈক মহিলা ঈসা আ.-কে বলেছিল : ধন্য সেই লোক, যে আপনাকে ধারণ করেছিল এবং ধন্য সেই স্তন, যে আপনাকে দুধ পান করিয়েছিল। উত্তরে ঈসা

আ. বলেছিলেন : ধন্য সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর কিতাব পাঠ করে ও তাঁর বিধান মেনে চলে। ঈসা আ. আরও বলেছেন : সেই ব্যক্তিই সৌভাগ্যের অধিকারী যে নিজের গুনাহ স্মরণ করে কান্নাকাটি করে, জিহবাকে সংযত রাখে এবং যার ঘরই তার জন্য যথেষ্ট নয়। তিনি বলেছেন, ওই চক্ষুর জন্যে সুসংবাদ, যে গুনাহ থেকে চিন্তামুক্ত অবস্থায় ঘুমিয়ে যায় এবং জেগে উঠে গুনাহবিহীন কাজে মনোনিবেশ করে।

মালিক ইবনে দীনার থেকে বর্ণিত আছে, হযরত ঈসা আ. আপন শিষ্যবর্গের সাথে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে একটি মৃত দেহ দেখতে পান। শিষ্যরা বলল, মৃত দেহ থেকে তীব্র দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। ঈসা আ. বললেন, তার দাঁতগুলো কত সাদা! এ কথা বলে তিনি শিষ্যদেরকে গীবত করা থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিচ্ছিলেন। একবার ঈসা আ. ইবনে মারিয়াম বললেন, হে হাওয়ারীগণ! দীন নিরাপদ থাকলে দুনিয়ার নিম্নমান নিয়েই সন্তুষ্ট থাক; যেমন দুনিয়াদার ব্যক্তিরা দুনিয়ার জীবন নিরাপদ থাকলে দীনের নিম্নমান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে।

আবু মাসআব হযরত মালিক থেকে বর্ণনা করেন, ঈসা ইবনে মারিয়াম আ. বলেছেন : আল্লাহর যিকির ব্যতীত কথাবার্তা বেশি বলো না; অন্যথায় তোমাদের অন্তর কঠিন হয়ে যাবে। আর কঠিন অন্তর আল্লাহ থেকে দূরে থাকে; কিন্তু তোমরা সে বিষয়ে অবগত নও। মানুষের গুনাহের প্রতি এমনভাবে দৃষ্টি দিও না, যেন তুমিই প্রভু বরং নিজেকে দাসের ভূমিকায় রেখে সে দিকে লক্ষ্য করা। কেননা, মানুষ দুই শ্রেণীর হয়ে থাকে। কেউ বিপদমুক্ত, কেউ বিপদগ্রস্ত। বিপদগ্রস্তের প্রতি সদয় হও এবং বিপদমুক্তের জন্যে আল্লাহর প্রশংসা কর।

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক হযরত সালিম রহ. এর সূত্রে বর্ণনা করেন। হযরত ঈসা আ. বলেছেন : তোমরা কাজ কর আল্লাহর জন্যে, পেটের জন্যে নয়। পাখিদের প্রতি লক্ষ কর, তারা সকালে বের হয়। সন্ধ্যায় ফিরে তারা চাষাবাদও করে না, ফসলও ফলায় না; আল্লাহই তাদেরকে খাওয়ান। যদি বল যে, পাখিদের চেয়ে আমাদের পেট বড়। তা হলে গরু ও গাধার দিকে তাকাও। সকালে যায়, সন্ধ্যায় ফিরে আসে। এরাও না ক্ষেত করে, না ফসল ফলায়; আল্লাহই এদের রিযিক দান করেন।

সাফওয়ান ইবনে আমর হযরত ইয়াযিদ ইবনে মায়সারা থেকে বর্ণনা করেন, একবার হাওয়ারীগণ ঈসা আ.-কে বললেন, হে মাসীহুল্লাহ! দেখুন, আল্লাহর মসজিদ কতই না সুন্দর। মাসীহ বললেন, ঠিক ঠিক; তবে আমি তোমাদেরকে যথার্থ জানাচ্ছি, আল্লাহ এ মসজিদের পাথরগুলোকে স্থায়ীভাবে দণ্ডায়মান রাখবেন না বরং তার সাথে সংশ্লিষ্টদের গুনাহের কারণে ধ্বংস করে দিবেন। তোমাদের স্বর্ণ-রৌপ্য ও পছন্দনীয় ধন-সম্পদ দিয়ে আল্লাহর কোনো কাজ নেই। এ দুনিয়ায় আল্লাহর নিকট প্রিয় বস্তু হচ্ছে সৎ অন্তর। এর সাহায্যেই আল্লাহ দুনিয়াকে আবাদ রেখেছেন এবং এর জন্য তিনি দুনিয়া ধ্বংস করে দিবেন, যখন তা পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

ইবনে আসাকির তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে মুজাহিদের সূত্রে ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : একবার হযরত ঈসা আ. একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরের উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন। শহরের বিধ্বস্ত প্রাসাদারাজি দেখে তিনি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন। কিছু সময় পর তিনি আল্লাহর নিকট আবেদন করেন, হে আল্লাহ! এ শহরকে আমার কতিপয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার অনুমতি দিন। আল্লাহ তাআলা বিধ্বস্ত শহরটিকে ঈসা আ. এর প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন।

তখন শহরটি ঈসা আ.-কে ডেকে বলল, হে প্রিয়নবী ঈসা আ.! আপনি আমার নিকট কী জানতে চান? ঈসা আ. বললেন, তোমার বৃক্ষরাজি কোথায় গেল? তোমার নদী-নালার কী হলো? তোমার প্রাসাদরাজির কী অবস্থা? তোমার বাসিন্দারা কোথায় গেল? উত্তরে শহর বলল, হে প্রিয়নবী! আল্লাহর ওয়াদা কার্যকরী হয়েছে। তাই আমার বৃক্ষরাজি শুকিয়ে গিয়েছে, নদীনালা পানিশূন্য হয়ে গিয়েছে, প্রাসাদরাজি ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়েছে এবং আমার বাসিন্দারা সবাই মারা গিয়েছে। ঈসা আ. বললেন, তবে তাদের ধন-সম্পদ কোথায়? শহরটি উত্তর দিল, তারা হালাল ও হারাম পন্থায় নির্বিচারে সম্পদ সঞ্চয় করেছিল, সে সবই আমার অভ্যন্তরে রক্ষিত আছে। আসমান ও যমীনের সব কিছুর সত্ত্বাধিকারী তো আল্লাহই।

এরপর ঈসা আ. বললেন : তিন ব্যক্তির ব্যাপারে আমার অবাক লাগে। তারা হল– (১) যে ব্যক্তি দুনিয়ার সন্ধানে মত্ত। অথচ মৃত্যু তার পশ্চাতে লেগে আছে। (২) যে ব্যক্তি প্রাসাদ নির্মাণ করেছে, অথচ কবর তার ঠিকানা। (৩) যে ব্যক্তি অট্টহাসিতে মজে থাকে, অথচ তার সম্মুখে আগুন। আদম-সন্তানের অবস্থা হচ্ছে– অধিক পেয়েও সে তৃপ্ত হয় না আর কম পেলেও তুষ্ট থাকে না। হে আদম সন্তান! তুমি তোমার ধন-সম্পদ এমন লোকদের জন্যে সঞ্চয় করে রেখে যাচ্ছ, যারা তোমার প্রশংসা করবে না। তুমি এমন প্রভুর পানে এগিয়ে চলছ, যিনি তোমার কোনো ওযর শুনবেন না। তুমি তো তোমার পেট ও প্রবৃত্তির গোলাম হয়ে রয়েছ। কিন্তু তোমার পেট সেদিন পূর্ণ হবে, যেদিন তুমি কবরে প্রবেশ করবে। হে আদম-সন্তান! অচিরেই তুমি কবরে প্রবেশ করবে। হে আদম সন্তান! অচিরেই তুমি দেখতে পাবে, তোমার সঞ্চিত ধন-রত্ন অন্যের পাল্লাকে ভারি করছে। এ হাদীসটি সনদের বিচারে খুবই 'গরীব' পর্যায়ের। কিন্তু উত্তম উপদেশপূর্ণ হওয়ায় উল্লিখিত হল।

সুফিয়ান ছাওরী ইবরাহীম তায়মীর সূত্রে বর্ণনা করেন, ঈসা আ. বলেন : হে হওয়ারীগণ! তোমরা তোমাদের মূল্যবান সম্পদ আসমানে রাখ। কেননা মানুষের অন্তর সেই দিকেই আকৃষ্ট থাকে, যেখানে তার মূল্যবান সম্পদ সঞ্চিত থাকে।

বর্ণিত আছে, হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আ. বলেছেন : যে ব্যক্তি ইলম শিখে অন্যকে শেখায় এবং সে মতে আমল করে, ঊর্ধ্বজগতে তাকে বিরাট সম্মানে ভূষিত

করা হয়। অন্যত্র বর্ণিত আছে, হযরত ঈসা আ. বলেছেন : যে ইলম তোমাকে কাজের ময়দানে নিয়ে যায় না, কেবল মজলিস মাহফিলে নিয়ে যায়, তাতে কোনো কল্যাণ নেই। আরও বর্ণিত আছে, হযরত ঈসা আ. বনি ইসরাঈলের মাঝে গিয়ে এক ভাষণে বলেন : হে হাওয়ারীগণ! অযোগ্য লোকদের নিকট হিকমতের কথা বলো না। এরূপ করলে হিকমত ও প্রজ্ঞাকে হেয় করা হবে। কিন্তু যোগ্য লোকদের নিকট তা বলতে কৃপণতা কর না। তা হলে তাদের উপর অবিচার করা হবে। স্মরণ রেখো! যে কোনো বিষয়ের তিনটি অবস্থা হতে পারে। যথা– (১) যার উত্তম হওয়া স্পষ্ট; এগুলোর অনুসরণ কর। (২) যার মন্দ হওয়া স্পষ্ট; এর থেকে দূরে থাক; (৩) যার ভাল বা মন্দ হওয়া সন্দেহযুক্ত; তার ফয়সালা আল্লাহর ওপর ছেড়ে দাও।

আবদুর রাযযাক হযরত ইকরামা থেকে বর্ণনা করেন, ঈসা আ. বলেছেন : শূকরের কাছে মুক্তা ছড়িয়ো না। কেননা মুক্তা দিয়ে সে কিছুই করতে পারে না। জ্ঞানপূর্ণ কথা ওই ব্যক্তিকে বলো না, যে তা শুনতে চায় না। কেননা জ্ঞানপূর্ণ কথা মুক্তার চাইতেও মূল্যবান আর যে তা চায় না, সে শূকরের চেয়েও অধম।

ইকরামা আরও বর্ণনা করেন, ঈসা আ. হওয়ারীদেরকে বলেছেন : তোমরা হচ্ছ পৃথিবীতে লবণ তুল্য। যদি নষ্ট হয়ে যাও তবে তোমাদের জন্য কোনো ঔষধ নেই। তোমাদের মধ্যে মূর্খতার দুটি অভ্যাস আছে, (১) বিনা কারণে হাসা এবং (২) রাত্রি জাগরণ না করে সকালে উঠা।

ইকরামা থেকে আরও বর্ণিত আছে, ঈসা আ.-কে একবার জিজ্ঞাসা করা হল, কোন ব্যক্তির ফেতনা সবচাইতে মারাত্মক ? তিনি বললেন: আলেমের পদস্খলন। কেননা আলেমের পদস্খলনে আরও বহু লোক বিপথগামী হয়ে যায়। রাবী আরও বলেন, হযরত ঈসা আ. বলেছেন : হে জ্ঞান পাপীরা! দুনিয়াকে তোমরা মাথার উপরে রেখেছ আর আখেরাতকে রেখেছ পায়ের নিচে। তোমাদের কথাবার্তা যেন সর্বরোগের নিরাময় হয়। কিন্তু তোমাদের কার্যকলাপ হচ্ছে মহাব্যাধি। তোমাদের উপমা হচ্ছে সেই মাকাল গাছ যা দেখলে মানুষ আকৃষ্ট হয় কিন্তু তার ফল খেলে মারা যায়।

ওহাব থেকে বর্ণিত, ঈসা আ. বলেছেন : হে নিকৃষ্ট জ্ঞান পাপীরা! তোমরা জান্নাতের দরজায় বসে আছ, কিন্তু তাতে প্রবেশ করছো না আর নিঃস্বদেরকে তাতে প্রবেশ করার জন্যে আহবানও করছ না। আল্লাহর নিকট সর্বাধিক নিকৃষ্ট মানুষ সেই জ্ঞানী ব্যক্তি, যে তার জ্ঞানের বিনিময়ে দুনিয়া অর্জন করে। মাকহুল বর্ণনা করেন, একবার হযরত ঈসা আ.-এর সাথে ইয়াহইয়া আ.-এর সাক্ষাৎ হয়। তখন হযরত ঈসা আ. হাসিমুখে তাঁর সাথে মুসাফা করেন। ইয়াহইয়া আ. বললেন, কি খালাত ভাই! হাসছেন যে! মনে হচ্ছে আপনি নিরাপদ হয়ে গেছেন? ঈসা আ. বললেন, তোমাকে বিষণ্ন দেখাচ্ছে কেন, নৈরাশ্যে ভুগছ না কি? তখন আল্লাহ উভয়ের নিকট ওহী প্রেরণ করে জানালেন, 'তোমাদের দুজনের মধ্যে সেই আমার নিকট প্রিয়তর, যে তার সঙ্গীর সাথে অধিকতর হাসিমুখে মিলিত হয়।'

ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ বর্ণনা করেছেন, একবার হযরত ঈসা ও তাঁর সঙ্গীরা একটি কবরের পাশে থামলেন। ওই কবরবাসী সঙ্কীর্ণাবস্থায় ছিল। তখন সঙ্গীরা কবরের সঙ্কীর্ণতা নিয়ে আলাপ করতে লাগলেন। তাদের কথা শুনে ঈসা আ. বললেন : তোমরা মায়ের পেটে এর চেয়ে সঙ্কীর্ণ স্থানে ছিলে। তারপরে আল্লাহ যখন চাইলেন, প্রশস্ত জায়গায় নিয়ে আসলেন। আবু ওমর বলেন, ঈসা আ. যখন মৃত্যুর কথা আলোচনা করতেন, তখন তাঁর চামড়া ভেদ করে রক্ত ঝরে পড়ত। হযরত ঈসা আ. থেকে এ জাতীয় অনেক উক্তি বর্ণিত আছে। হাফেজ ইবনে আসাকির তাঁর গ্রন্থে বহু উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। আমরা এখানে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু উল্লেখ করলাম।

ঈসা আ. এর হাওয়ারীগণের নাম

কথিত আছে, হযরত ঈসা আ.-এর সান্নিধ্যে বারজন হাওয়ারী ছিলেন। (১) পিতর, (২) ইয়াকুব ইবনে যাবদা (সিবদিয়), (৩) ইয়াহনাস (য়ুহান্না) ইনি ইয়াকুবের ভাই ছিলেন (৪) ইনদারাউস (আন্দ্রিয়), (৫) ফিলিপ, (৬) আবরো ছালমা (বর্তলময়), (৭) মথি, (৮) টমাস (থমা), (৯) ইয়াকুব ইবনে হালকুবা (আলকেয়), (১০) তাদাউস (থদ্দেয়), (১১) ফাতাতিয়া শিমন ও (১২) (ইহুদা ইস্কারিযোৎ) ইউদাস কারয়া ইউতা। এই শেষোক্ত ব্যক্তি ইহুদিদেরকে ঈসা আ.-এর সন্ধান দিয়েছিল। ইবনে ইসহাক লিখেছেন, হাওয়ারীদের মধ্যে সারজিস নামক আর এক ব্যক্তি ছিল, যার কথা নাসারারা গোপন রাখে। এ ব্যক্তিকেই মাসীহর রূপ দেওয়া হয়েছিল এবং ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু নাসারাদের কিছু অংশের মতে যাকে মাসীহর রূপ দেওয়া হয় ও ক্রুশে বিদ্ধ করা হয়, তার নাম জভাস ইবনে কারয়া ইউতা।

ঈসা আ.-কে আসমানে তুলে নেওয়া

আল্লাহ তাআলা কর্তৃক ঈসা আ.-কে রক্ষা এবং ইহুদি ও নাসারারা তাঁকে শূলে চড়ানোর মিথ্যা দাবি প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক বলেন :

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (٥٤) إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

"তারা চক্রান্ত করেছিল, আল্লাহও কৌশল করেছিলেন, আল্লাহ কৌশলীদের শ্রেষ্ঠ। স্মরণ কর, যখন আল্লাহ বললেন, হে ঈসা! আমি তোমার কাল পূর্ণ করছি এবং আমার নিকট তোমাকে তুলে নিচ্ছি এবং যারা কুফরী করেছে, তাদের মধ্য হতে তোমাকে পবিত্র করছি। আর তোমার অনুসারীদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত কাফিরদের উপর প্রাধান্য দিচ্ছি। এরপর আমার কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তারপর যে বিষয়ে তোমাদের মতান্তর ঘটছে আমি তা মীমাংসা করে দিব। (আলে-ইমরান : ৫৪-৫৫)

আল্লাহ্ আরো বলেন :

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (١٥٥) وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا (١٥٦) وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا (١٥٧) بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (١٥٨) وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا

এবং তারা লানতগ্রস্ত হয়েছিল তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্যে, আল্লাহর আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করার জন্যে নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার জন্যে এবং আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত, তাদের এ উক্তির জন্যে বরং তাদের কুফরীর কারণে আল্লাহ্ তাতে মোহর মেরে দিয়েছেন। সুতরাং তাদের অল্প সংখ্যক লোকই বিশ্বাস করে। এবং লা'নতগ্রস্ত হয়েছিল তাদের কুফরীর জন্যে ও মারিয়ামের বিরুদ্ধে গুরুতর অপবাদের জন্যে। আর আমরা আল্লাহর রাসূল মারিয়াম-তনয় ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি– তাদের এ উক্তির জন্যে। অথচ তারা তাকে হত্যা করে নি, ক্রুশবিদ্ধও করে নি, কিন্তু তাদের এরূপ বিভ্রম হয়েছিল। যারা তার সম্বন্ধে মতভেদ করেছিল, তারা নিশ্চয়ই তার সম্বন্ধে সংশয়যুক্ত ছিল; এ সম্পর্কে অনুমানের অনুসরণ ব্যতীত তাদের কোনো জ্ঞানই ছিল না। এটা নিশ্চিত যে, তারা তাকে হত্যা করে নি এবং আল্লাহ তাকে তাঁর নিকট তুলে নিয়েছেন এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। কিতাবীদের মধ্যে প্রত্যেকে তার মৃত্যুর পূর্বে তাকে বিশ্বাস করবেই এবং কিয়ামতের দিন সে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে।

(সূরা নিসা : ১৫৫-১৫৯)

উপরোক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয়। আল্লাহ্ পাক হযরত ঈসা আ.-কে নিদ্রাচ্ছন্ন করার পরে আসমানে তুলে নেন। এটাই সন্দেহাতীত বিশুদ্ধ মত। ইহুদিরা সে যুগের জনৈক কাফির বাদশার সাথে ষড়যন্ত্র করে তাঁকে যে নির্যাতন করতে চেয়েছিল, আল্লাহ্ তা থেকে তাঁকে মুক্ত করেন।

হাসান বসরী ও মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেন, সে বাদশার নাম ছিল দাউদ ইবনে নুরা। সে হযরত ঈসা আ.-কে হত্যা ও ক্রুশবিদ্ধ করার হুকুম দেয়। হুকুম পেয়ে ইহুদিরা শুক্রবার দিবাগত শনিবার রাত্রে বায়তুল মুকাদ্দাসের একটি কক্ষে হযরত ঈসা আ.-কে অবরুদ্ধ করে রাখে। পরে যখন হত্যার উদ্দেশ্যে তারা কক্ষে প্রবেশ করে, তখন আল্লাহ্ তাআলা কক্ষে বিদ্যমান ঈসা আ.-এর অনুসারীদের মধ্য হতে একজনের চেহারাকে তাঁর চেহারার সদৃশ করে দেন এবং ঈসা আ.-কে বাতায়নপথে আকাশে তুলে নেন।

কক্ষে যারা ছিল তারা ঈসা আ.-কে তুলে নেওয়ার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছিল। ইতঃমধ্যে বাদশার রক্ষীরা কক্ষে প্রবেশ করে ঈসা আ.-এর চেহারা বিশিষ্ট ওই যুবককে দেখতে পায়। তারা তাকেই ঈসা আ. মনে করে ধরে এনে শূলে চড়ায় এবং মাথায় কাঁটার টুপি পরায়। তাঁকে অধিক লাঞ্ছিত করার জন্যে তারা এ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সাধারণ নাসারা, যারা ঈসা আ.-এর ঘটনা প্রত্যক্ষ করে নি, তারা ইহুদিদের ঈসা আ.-কে ক্রুশ বিদ্ধ করার দাবি মেনে নেয়। ফলে তারাও সত্য থেকে স্পষ্ট ও চূড়ান্ত বিভ্রান্তির অতল তলে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই জন্যে আল্লাহ বলেন, "কিতাবীদের প্রত্যেকেই তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর প্রতি বিশ্বাস করবে।" অর্থাৎ কিয়ামতের পূর্বে তখনকার সকল কিতাবীরাই তাঁর প্রতি বিশ্বাস আনবে। কেননা তিনি পুর্নবার পৃথিবীতে আসবেন এবং শূকর বধ করবেন, ক্রুশ ধ্বংস করবেন, জিযিয়া কর রহিত করবেন এবং ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দীন কবুল করবেন না।

ইবনে আবি হাতিম ইবনে আব্বাস রাযি.-এর বরাতে বর্ণনা করেন, আল্লাহ যখন ঈসা আ.-কে আসমানে তুলে নিতে ইচ্ছা করলেন, তখন ঘটনা ছিল, বায়তুল মুকাদ্দাসের একটি কক্ষে ঈসা আ.-এর বারজন হাওয়ারী অবস্থান করছিলেন। তিনি মসজিদের একটি ঝরনায় গোসল করে ওই কক্ষে শিষ্যদের নিকট যান। তাঁর মাথার চুল থেকে তখনও পানি ঝরে পড়ছিল। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি আছে, যে তার প্রতি ঈমান আনার পর ১২ বার আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। এরপরে তিনি তাদের নিকট জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কে রাজী আছে যাকে আমার গঠনাকৃতি দ্বারা পরিবর্তন করা হবে এবং আমার স্থলে তাকে হত্যা করা হবে, পরিণামে আমার সাথে সে মর্যাদা লাভ করবে? উপস্থিত শিষ্যদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ এক যুবক দণ্ডায়মান হলেন। ঈসা আ. তাঁকে বললেন, বস। এরপর তিনি দ্বিতীয় বার একই আহবান জানান। এবারও ওই যুবকটি দণ্ডায়মান হলেন। ঈসা আ. তাঁকে বসতে বললেন। তৃতীয়বার তিনি আবারও একই আহবান রাখেন আর ওই যুবক দাঁড়িয়ে বললেন, এ জন্যে আমি প্রস্তুত। ঈসা আ. বললেন : তাই হবে, তুমিই এর অধিকারী। এরপর যুবকটির গঠনাকৃতিকে ঈসা আ. এর গঠনাকৃতি দ্বারা পরিবর্তন করে দেওয়া এবং মসজিদের একটি বাতায়ন পথে ঈসা আ.-কে আসমানে তুলে নেওয়া হয়। এরপর ইহুদিদের একটি অনুসন্ধানকারী দল ঈসা আ.-কে ধরার জন্যে এসে উক্ত যুবককে ঈসা আ. মনে করে ধরে নিয়ে আসে ও তাকে হত্যা করে এবং ক্রুশবিদ্ধ করে। জনৈক শিষ্য ঈসা আ.-এর প্রতি ঈমান আনার পর বারবার বিশ্বাসঘাতকতা করে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বনী ইসরাঈল তিন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। যথা :

(১) আল-ইয়াকুবিয়্যা : এ দল বিশ্বাস করে যে, এতদিন আল্লাহ স্বয়ং আমাদের মাঝে বিদ্যমান ছিলেন, এখন তিনি আসমানে উঠে গিয়েছেন।

(২) আল-নাসুতরিয়্যা : এ দলের বিশ্বাস হল, আল্লাহর পুত্র আমাদের মধ্যে এতদিন ছিলেন, এখন তাঁকে আল্লাহ নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন।

(৩) আল-মুসলিমুন : এ দলের মতে ঈসা আ. আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহর যতদিন ইচ্ছা ছিল ততদিন তিনি আমাদের মধ্যে ছিলেন। এখন তাঁকে আল্লাহর নিজের সান্নিধ্যে উঠিয়ে নিয়েছেন। উক্ত তিন দলের মধ্যে কাফির দুই দল একত্র হয়ে মুসলিম দলের বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত রাখে। ফলে মুসলিম দল নিস্তেজ হয়ে পড়ে। এ অবস্থা দীর্ঘদিন চলার পর আল্লাহ মুহাম্মাদ -কে রসূলরূপে প্রেরণ করেন। ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, এ দিকে ইঙ্গিত করেই কুরআনে বলা হয়েছে "পরে আমি মুমিনদেরকে শক্তিশালী করলাম তাদের শত্রুদের মুকাবিলায়। ফলে তারা বিজয়ী হল। (সূরা সাফ : ১৪)

এ হাদীসটি সবচেয়ে দীর্ঘাকারে বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক। তাঁর বর্ণনায় এসেছে, ঈসা আ. আল্লাহর নিকট তাঁর মৃত্যুকে পিছিয়ে দেওয়ার জন্যে দুআ করতেন, যাতে তিনি রিসালাতের দায়িত্ব পূর্ণ করতে পারেন। দাওয়াতী কাজ সম্প্রসারণ করতে পারেন এবং অধিক পরিমাণ লোক যাতে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করতে পারে।

ইবনে জারীর বর্ণনা করেন, আল্লাহ যখন ঈসা আ.-কে জানিয়ে দেন, অচিরেই তুমি দুনিয়া থেকে নিষ্কৃতি পাচ্ছ তখন তিনি বিচলিত হয়ে পড়েন এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হন। এ সময় তিনি হাওয়ারীগণকে দাওয়াত করেন। তাঁদের জন্যে খাদ্য প্রস্তুত করেন। তাঁদেরকে জানিয়ে দেন, রাত্রে তোমরা আমার নিকট আসবে, তোমাদের কাছে আমার প্রয়োজন আছে। হাওয়ারীগণ রাত্রে আসলে ঈসা আ. তাদেরকে নিজ হাতে খানা পরিবেশন করে খাওয়ান। আহার শেষে নিজেই তাঁদের হাত ধুয়ে দেন ও নিজের কাপড় দ্বারা তাঁদের হাত মুছে দেন। এ সব দেখে হাওয়ারীগণ আশ্চর্যান্বিত হলেন এবং বিব্রত বোধ করলেন। ঈসা আ. বললেন, দেখ, আমি যা কিছু করব কেউ যদি তার প্রতিবাদ করে তবে সে আমার শিষ্যদের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং আমিও তার কেউ নই। তখন তারা তা মেনে নিলেন।

আর ঈসা আ. বললেন, আমি আজ রাত্রে তোমাদের সাথে যে আচরণ করলাম, তোমাদের সেবা করলাম, খাদ্য পরিবেশন করলাম, হাত ধুয়ে দিলাম, এ যেন তোমাদের জন্যে অনুকরণীয় আদর্শ হয়ে থাকে। তোমরা জানো, আমি তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম। সুতরাং তোমরা একে অপরের উপর নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করবে না বরং নিজেকে অপরের চাইতে ছোট জ্ঞান করবে। তোমরা তো প্রত্যক্ষ করলে, কিভাবে আমি তোমাদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করলাম। তোমরাও ঠিক এভাবে করবে, আমার জন্যে আল্লাহর নিকট দুআ করবে এবং মনে প্রাণে দুআ করবে যেন তিনি আমার মৃত্যুকে পিছিয়ে দেন। ঈসা আ.-এর কথা শোনার পর হাওয়ারীগণ যখন দুআ করার জন্যে প্রস্তুত হলেন এবং নিবিষ্ট চিত্তে দু'আ করতে বসলেন, তখন গভীর নিদ্রা তাঁদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। ফলে তাঁরা দুআ করতে সমর্থ হলেন না।

ঈসা আ. তাদেরকে ঘুম থেকে জাগাবার চেষ্টা করেন এবং বলেন : কী আশ্চর্য! তোমরা কি মাত্র একটা রাত আমার জন্যে ধৈর্যধারণ করতে এবং আমাকে সাহায্য

করতে পারবে না? তাঁরা বললেন, আল্লাহর কসম, আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না, আমাদের এ কী হল? আমরা তো প্রতি দিন রাত্রে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত জেগে থাকি, কথাবার্তা বলি; কিন্তু আজ রাত্রে তার কিছুই করতে পারছি না। যখনই দুআ করতে যাই তখনই ঘুম এসে মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তখন হযরত ঈসা আ. বললেন, রাখাল মাঠ থেকে বিদায় নিচ্ছে আর বকরীগুলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। এ জাতীয় আরও বিভিন্ন কথা তিনি বলতে থাকেন এবং নিজের বিয়োগ ব্যথার কথা ব্যক্ত করেন।

এরপর ঈসা আ. বললেন : আমি তোমাদেরকে একটি সত্য কথা বলছি– তোমাদের মধ্যে একজন আজ মোরগ ডাক দেওয়ার পূর্বে আমার সাথে তিনবার বিশ্বাসঘাতকতা করবে, তোমাদের মধ্যে একজন সামান্য কয়েকটি দিরহামের বিনিময়ে শত্রুদের কাছে আমার সন্ধান বলে দেবে এবং আমার বিনিময়ে প্রাপ্তঅর্থ ভক্ষণ করবে। এরপর তারা সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ল ও বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। এদিকে ইহুদিরা ঈসা আ.-কে সন্ধান করে ফিরছে। তারা শামউন নামক এক হওয়ারীকে ধরে বলল, এই ব্যক্তি ঈসার শিষ্য। কিন্তু সে অস্বীকার করে বলল, আমি ঈসার শিষ্য নই। এ কথা বললে, তারা শামউনকে ছেড়ে দিল। কিছুক্ষণ পরে তাকে অন্য ইহুদিরা পাকড়াও করলে সে পূর্বের মতো উত্তর দিয়ে আত্মরক্ষা করল। এমন সময় ঈসা আ. হঠাৎ মোরগের ডাক শুনতে পান। মোরগের ডাক শুনে তিনি চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং কাঁদতে থাকেন। প্রভাত হওয়ার পর জনৈক হাওয়ারী ইহুদিদের নিকট গিয়ে বলল, আমি যদি তোমাদেরকে ঈসা মাসীহর সন্ধান দিই, তা হলে তোমরা আমাকে কী পুরস্কার দিবে? ইহুদিরা তাকে ত্রিশটি দিরহাম দিল, বিনিময়ে সে তাদের নিকট তাঁর সন্ধান বলে দিল। কিন্তু এর পূর্বেই তাকে ঈসার অনুরূপ চেহারা দান করা হয় এবং তাদেরকে বিভ্রান্তিতে ফেলা হয়। ফলে তাকেই তারা পাকড়াও করে রশি দ্বারা শক্ত করে বাঁধল এবং একথা বলতে বলতে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে গেল, তুমিই তো মৃতকে জীবিত করতে, জীন-ভূত তাড়াতে, পাগল মানুষকে সুস্থ করে দিতে। এখন এই রশির বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত কর দেখি! তারা তার উপর থুথু নিক্ষেপ করল, দেহে কাঁটা ফুটাল এবং যেই ক্রুশে বিদ্ধ করার জন্যে স্থাপন করা হয়েছিল, সেখানে তাকে নিয়ে আসল।

ইতঃমধ্যে ঈসা আ.-কে আল্লাহ নিজ সান্নিধ্যে তুলে নিলেন এবং ইহুদিরা ওই চেহারা পরিবর্তিত ব্যক্তিকে ক্রুশবিদ্ধ করল। ক্রুশের উপরে লাশ সাত দিন পর্যন্ত ঝুলে ছিল। এরপর ঈসা আ.-এর মা এবং অন্য এক মহিলা যে পাগল ছিল এবং যাকে ঈসা আ. সুস্থ করেছিলেন উভয়ে কাঁদতে কাঁদতে ক্রুশবিদ্ধ লোকটির কাছে আসলেন। তখন হযরত ঈসা আ.-তাঁদের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কাঁদছেন কেন? তাঁরা বললেন, আমরা তো তোমার জন্যে কাঁদছি। ঈসা আ. বললেন, আমাকে আল্লাহ তাঁর সান্নিধ্যে তুলে নিয়েছেন এবং উত্তম অবস্থায় রেখেছেন আর এই যাকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে, তার ব্যাপারে ইহুদিরা বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে।

এরপর তিনি হাওয়ারীদের প্রতি নির্দেশ দিলেন যেন, অমুক স্থানে তারা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন। নির্দেশ মতে এগারজন হাওয়ারী সেখানে গিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাতে মিলিত হন। সেই এক হাওয়ারী অনুপস্থিত থাকে, যে ঈসাকে দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করেছিল এবং ইহুদিদেরকে তাঁর সন্ধান বলে দিয়েছিল; তার সম্পর্কে ঈসা আ. শিষ্যদের নিকট জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে তারা জানালো, সে তার কর্মের উপর অনুতপ্ত হয়ে আত্মহত্যা করেছে। ঈসা আ. বললেন, যদি সে তওবা করত তবে আল্লাহ তার তওবা কবুল করতেন। এরপর তিনি ইয়াহইয়া নামক সেই যুবকের কথা জিজ্ঞেস করলেন, যে তাদেরকে অনুসরণ করত। তিনি বললেন, সে তোমাদের সাথেই আছে। এরপর ঈসা আ. বললেন, তোমরা এখান থেকে চলে যাও। কেননা অচিরেই তোমরা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের ভাষায় কথা বলবে। সুতরাং তাদেরকে সতর্ক করবে এবং দীনের দাওয়াত দিবে।

ইবনে আসাকির ইয়াহইয়া ইবনে হাবীবের সূত্রে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তিকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল, মারিয়াম আ. ধারণা করেছিলেন, সে তাঁরই পুত্র। তাই তিনি ঘটনার সাত দিন পর বাদশার লোকদের নিকট গিয়ে লাশটি নামিয়ে দেওয়ার আবেদন জানান। তারা তাঁর আবেদনে সাড়া দেয় এবং সেখানেই লাশটি দাফন করা হয়। তারপর মারিয়াম আ. হযরত ইয়াহইয়া আ. মাকে বললেন : চল! আমরা মাসীহর কবর যিয়ারত করে আসি। উভয়ে রওনা হলেন। কবরের কাছাকাছি পৌঁছলে মারিয়াম আ. ইয়াহইয়া আ. এর মাকে বললেন, পর্দা কর! ইয়াহইয়ার মা বললেন, কার থেকে পর্দা করব? বললেন : কেন কবরের কাছে ওই যে লোকটিকে দেখা যায়, তার থেকে! ইয়াহইয়া আ. এর মা বললেন, কী বলছ? আমি তো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না! মারিয়াম আ. তখন ভাবছেন, ওনি জিবরাঈল ফিরিশতা হবেন। বস্তুত জিবরাঈল আ.-কে তিনি বহু পূর্বে দেখেছিলেন।

মোটকথা, ইয়াহইয়া আ. এর মাকে সেখানে রেখে মারিয়াম আ. কবরের কাছে গেলেন। কবরের নিকট গেলে তিনি তাকে চিনতে পারেন। জিবরাঈল আ. বললেন, মারিয়াম! কোথায় যাচ্ছ? মারিয়াম আ. বললেন, মাসীহর কবর যিয়ারত করতে এবং তাকে সালাম জানাতে। জিবরাঈল আ. বললেন, মারিয়াম! এ তো মাসীহ নয়। তাঁকে তো আল্লাহ তাঁর সান্নিধ্যে তুলে নিয়েছেন, কাফিরদের হাত থেকে তাঁকে পবিত্র করেছেন। তবে কবরবাসীকে মাসীহর আকৃতি বদলে দেওয়া হয়েছে এবং তাকেই ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে। এর নিদর্শন হচ্ছে, ওই লোকটির পরিবারের লোকজন একে খুঁজে বেড়াচ্ছে, কোথাও তার সন্ধান পাচ্ছে না এবং তার কি হয়েছে তাও তারা জানে না; এর জন্যে তারা কেবল কান্নাকাটি করে ফিরছে। তুমি অমুক দিন অমুক বাগানের নিকট আসলে মাসীহর সাথে সাক্ষাৎ করতে পারবে। এ কথা বলে জিবরাঈল আ. সেখান থেকে প্রস্থান করেন।

মারিয়াম আ. তার বোনের নিকট ফিরে এসে জিবরাঈল আ. এর ব্যাপারে জানালেন এবং বাগানের বিষয়টিও বললেন। নির্দিষ্ট দিনে মারিয়াম আ. সেই বাগানের নিকট গেলে সেখানে মাসীহকে দেখতে পান। ঈসা আ. মাকে দেখতে পেয়ে তাঁর দিকে ছুটে আসেন, মা তাঁকে জড়িয়ে ধরেন এবং তার মাথায় চুম্বন দেন। তিনি পূর্বের মত তাঁর জন্যে দুআ করেন। তারপর বলেন, মা! আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাকে হত্যা করতে পারে নি, আল্লাহ আমাকে তাঁর সান্নিধ্যে তুলে নিয়েছেন এবং আপনার সাথে সাক্ষাৎ করার অনুমতি দিয়েছেন। অচিরেই আপনার মৃত্যু হবে। ধৈর্য ধরুন ও বেশী বেশী আল্লাহকে স্মরণ করুন। ঈসা আ. ঊর্ধলোকে চলে গেলেন। এরপর মারিয়াম আ. সঙ্গে তাঁর মৃত্যুর পূর্বে ঈসার আর সাক্ষাৎ হয় নি। রাবী বলেন, ঈসা আ.-এর ঊর্ধারোহণের পরে তাঁর মা পাঁচ বছর জীবিত ছিলেন এবং তিপ্পান্ন বছর বয়সকালে তিনি ইনতিকাল করেন।

হযরত ঈসা আ.-এর আয়ু

হাসান বসরী রহ. বলেছেন, যেদিন হযরত ঈসা আ.-কে আসমানে নেওয়া হয় সেদিন পর্যন্ত তাঁর বয়স হয়েছিল ৩৪ বছর। কেউ কেউ বর্ণনা করেন, হযরত ঈসা আ.-কে যখন আসমানে তুলে নেওয়া হয় তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৩৩ বছর।

আমিরুল মুমিনীন হযরত আলি রাযি. থেকে বর্ণিত : হযরত ঈসা আ.-কে রমযান মাসের ২২ তারিখের রাত্রে আকাশে উঠিয়ে নেওয়া হয়। হযরত আলি রাযি.-ও শত্রুদের বর্শার আঘাত পাওয়ার ৫ দিন পর রমযানের ২২ তারিখ রাত্রে ইনতেকাল করেন।

যাহহাক রহ. ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, ঈসা আ.-কে যখন আসমানে তুলে নেওয়া হয় তখন এক খণ্ড মেঘ তাঁর নিকটবর্তী হয়। তিনি এর উপর বসেন। মা মারিয়াম আ. সেখানে উপস্থিত হন। পুত্রকে বিদায় জানান ও কান্নাকাটি করেন। তারপরে তাঁকে তুলে নেওয়া হয়। মারিয়াম আ. তাকিয়ে সে দৃশ্য দেখতে থাকেন। ঊর্ধে উঠার সময় হযরত ঈসা আ. তাঁর মাকে নিজের চাদরখানা দিয়ে যান এবং বলেন, এটি হবে কিয়ামতের দিনে আমার ও আপনার মধ্যে পরিচয়ের উপায়। শিষ্য শামউনের উদ্দেশ্যে তিনি নিজের পাগড়িটি নিক্ষেপ করেন। হযরত ঈসা আ. যখন উপরের দিকে উঠতে থাকেন, তখন মারিয়াম আ. হাতের আঙ্গুল উঠিয়ে ইঙ্গিতে তাঁকে বিদায় জানাতে থাকেন। যতক্ষণ না তিনি চোখের আড়ালে চলে যান। হযরত মরিয়াম ঈসা আ.-কে অত্যধিক স্নেহ করতেন। কেননা পিতা না থাকার কারণে ঈসা আ. পিতামাতা উভয়ের ভালোবাসা মাকেই দিতেন। সফরে হোক কিংবা বাড়িতে হোক হযরত মারিয়াম আ. ঈসা আ.-কে সর্বদা কাছে রাখতেন। মুহূর্তের জন্যেও দূরে যেতে দিতেন না।

ইসহাক ইবনে বিশর মুজাহিদ ইবনে জুবায়ের রহ. সূত্রে বর্ণনা করেন, ইহুদিরা মসীহরূপী যেই ব্যক্তিকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল তাকে আসল মাসীহ বলেই বিশ্বাস করত। অধিকাংশ নাসারা মূর্খতাবশত এ বিশ্বাসেরই সমর্থক ছিল। এরপর তারা মাসীহর শিষ্য

সমর্থকদের উপর ধর-পাকড়, হত্যা ও নির্যাতন আরম্ভ করে। এ সংবাদ রোম অধিপতি ও তদানীন্তন দামিশকের বাদশার নিকট পৌঁছয়। বাদশাকে জানানো হয়, ইহুদিরা এমন এক ব্যক্তির শিষ্য সমর্থকদের উপর নির্যাতন চালাচ্ছে, যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর রাসূল বলে দাবি করে, সে মৃতকে জীবিত করা, জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে নিরাময় করে এবং আরো অনেক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটায়। ইহুদিরা তার উপর চড়াও হয় এবং তাঁকে হত্যা করে। তাঁর শিষ্য ও অনুসারীদেরকে লাঞ্ছিত করে ও বন্দি করে রাখে। এ সব কথা শুনে বাদশা উক্ত নবীর কতিপয় অনুসারীকে তাঁর নিকট আনার জন্যে দূত প্রেরণ করেন।

বাদশার দূত কয়েকজন অনুসারীকে সেখানে নিয়ে আসে। এদের মধ্যে ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া আ. এবং শামউনসহ বেশ কিছুলোক ছিলেন। বাদশা তাদের নিকট মাসীহ আ. এর কার্যাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তাঁরা বিস্তারিতভাবে মাসীহ আ. এর কাজকর্ম সম্পর্কে বাদশাকে অবগত করেন। সবকিছু শুনে বাদশা তাদের নিকট মাসীহ আ. এর দীন গ্রহণ করেন। তাঁদের দীনের দাওয়াতের প্রসার ঘটান। এভাবে ইহুদিদের উপরে সত্য বিজয় লাভ করে এবং নাসারাদের বাণী তাদের উপর শ্রেষ্ঠত্বের সম্মানে ভূষিত হয়। এরপর বাদশা ক্রুশবিদ্ধ লাশের কাছে লোক প্রেরণ করেন। শূলকাষ্ঠ থেকে লাশ নামানো হয় এবং ক্রুশ-ফলকটি নিয়ে আসা হয়। বাদশা ক্রুশফলককে সম্মান প্রদর্শন করেন। তখন থেকে নাসারা সম্প্রদায় ক্রুশচিহ্নকে সম্মান করতে শুরু করে। এ ঘটনার পর থেকে নাসারা (খ্রিষ্টান) ধর্ম রোম সাম্রাজ্যে প্রসার লাভ করে। কিন্তু একাধিক কারণে এ বর্ণনাটি সংশয়মুক্ত নয়।

(১) ইয়াহয়া ইবনে যাকারিয়া আ. নবী ছিলেন। ঈসা আ.-কে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে, এ কথা স্বীকার করতেন না। কেননা তিনি ছিলেন মাসুম নবী। ঈসা আ.-কে নিরাপদ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে এ সত্যে তিনি বিশ্বাস করতেন।

(২) মাসীহ আ. এর আগমনের তিনশ বছর পর রোম সাম্রাজ্যে খ্রিষ্টান ধর্ম প্রবেশ করে, তার পূর্বে নয়। এটাই ঐতিহাসিক সত্য। কেননা রোমে খ্রিষ্টান ধর্ম প্রবেশ করেছিল কুস্তুনতীন ইবনে কুস্তুন-এর শাসনামলে, যিনি ছিলেন কনষ্টানটিনোপল তথা ইস্তাম্বুল শহরের প্রতিষ্ঠাতা।

(৩) ইহুদিরা ওই ব্যক্তিকে শূলে চড়ানোর পর সেই স্থানটিকে একটি ঘৃণিত স্থান হিসেবে ফেলে রাখে। সেখানে তারা ময়লা-আবর্জনা ও মৃত জীবজন্তু নিক্ষেপ করত। সম্রাট কনস্টানটাইনের আমল পর্যন্ত এ অবস্থা চলতে থাকে।

এরপর সম্রাট কনস্টানটাইনের মা হায়লানা হারানিয়া ফুনদুকানিয়া উক্ত ক্রুশবিদ্ধ লোকটিকে মাসীহ বলে বিশ্বাস করেন এবং সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করেন। তিনি সেখানে লোক প্রেরণ করেন। তারা ক্রুশের শূল দণ্ডটি খুঁজে পায়। কথিত আছে, উক্ত শূলদণ্ড যে কোনো রোগী স্পর্শ করলে আরোগ্য লাভ করত। আল্লাহই ভালো জানেন

ঘটনা এ রকম হয়েছিল কি না। কেননা যেই ব্যক্তি শূলে জীবন দিয়ে আত্মোৎসর্গ করেছিল, সে একজন নেককার লোক ছিল অথবা হতে পারে এটা সেই যুগের খ্রিষ্টানদের জন্যে একটি ফিৎনা বিশেষ। যে কারণে তারা উক্ত দণ্ডকে সম্মান করত এবং স্বর্ণ ও মুক্তা দ্বারা তাকে মুড়িয়ে রেখেছিল। এখান থেকে তারা বরকত ও কল্যাণের প্রতীক হিসেবে ক্রুশটিকে ব্যবহার করা আরম্ভ করে।

এরপর সম্রাটের মা হায়লানার নির্দেশে ওই স্থানের সমস্ত আবর্জনা পরিস্কার করে সেখানে উন্নত মানের পাথর দ্বারা একটি সুশোভিত গীর্জা নির্মাণ করা হয়। বর্তমান কালে যা বায়তুল মুকাদ্দাস শহর নামে খ্যাত। এ শহরটির অপর নাম কুমামা (কুমামা অর্থ আবর্জনা, যেহেতু পূর্বে এখানে আবর্জনা ছিল)। খ্রিষ্টানরা একে কিয়ামাহও বলে। কেননা কিয়ামতের দিন এ স্থান থেকে মাসীহ আ. দেহ পুনরুত্থিত হবে বলে তাদের বিশ্বাস। সম্রাট জননী হায়লানা এরপর নির্দেশ দেন, এখন থেকে এ শহরের সমস্ত ময়লা আবর্জনা ও পঁচা-গলা ইহুদিদের কিবলা হিসেবে পরিচিত বায়তুল মুকাদ্দাসে অবস্থিত শুভ্রপাথর (সাখরা)-এর উপর ফেলতে হবে। নির্দেশ মতে সমস্ত আবর্জনা সেখানেই নিক্ষেপ করা অব্যাহত থাকে। অবশেষে হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. বায়তুল মুকাদ্দাস জয় করেন। তিনি স্বয়ং সেখানে গমন করে নিজের চাদর দ্বারা বায়তুল মুকাদ্দাস ঝাড়ু দেন এবং সকল নাপাকী ও ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করেন। তিনি ইহুদিদের কেবলা হিসেবে রক্ষিত পাথরের পেছনে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন নি। বরং তা সামনের দিকে রেখেছেন, যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসরার রাত্রে নবীদের সাথে নামায আদায় করেছিলেন।

মাহাত্ম্য ও চারিত্রিক গুণাবলী

আল্লাহ পাক বলেন :

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ

"মারিয়াম-তনয় মাসীহ তো কেবল একজন রাসূল, তার পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছে এবং তার মা সত্যনিষ্ঠ ছিল।" (সূরা মায়িদা : ৭৫)

মাসীহ অর্থ অত্যধিক ভ্রমণকারী। ঈসা আ.-এর প্রতি ইহুদিদের কঠোর শত্রুতা, মিথ্যা আরোপ এবং তাঁর উপর ও তাঁর মায়ের উপর অপবাদ দেওয়ার কারণে সৃষ্ট ফিৎনা ফাসাদ থেকে দীনকে রক্ষার জন্যে তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় সফরে কাটান। এ কারণে তাঁকে মাসীহ বলে আখ্যায়িত করা হয়। কেউ কেউ বলেন, তার পায়ের তলা সমতল থাকার কারণে হযরত ঈসা আ.-কে মাসীহ বলা হয়।

অন্যত্র আল্লাহ পাক বলেন :

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ

এরপর আমি তাদের অনুগামী করেছিলাম আমার রাসূলগণকে এবং অনুগামী করেছিলাম মারিয়াম তনয় ঈসাকে আর তাকে দিয়েছিলাম ইনজীল। (সূরা হাদীদ : ২৭)

আল্লাহর বাণী :

وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ

এবং মারিয়াম-তনয় ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণ দিয়েছি এবং পবিত্র আত্মা দ্বারা তাকে শক্তিশালী করেছি। (সূরা বাকারা : ৮৭)

এ সম্পর্কে কুরআনে প্রচুর আয়াত বিদ্যমান। ইতঃপূর্বে বুখারী ও মুসলিমে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, এমন কোনো শিশু সন্তান নেই, যাকে জন্মের সময় শয়তান পেটের পার্শ্বদেশে খোঁচা না দেয়। জন্মের সময় শয়তানের খোঁচার কারণেই সে চিৎকার করে কাঁদে। তবে মারিয়াম ও তাঁর পুত্র ঈসা আ.-এর ব্যতিক্রম। শয়তান তাঁকে খোঁচা মারতে গিয়েছিল। কিন্তু তা না পেরে ঘরের পর্দায় খোঁচা মেরে চলে যায়।

ইমাম বুখারী রহ. ইবরাহীম ইবনে মুনযিরের সূত্রে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকজনের সামনে মাসীহ দাজ্জালের কথা উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ একচক্ষু বিশিষ্ট নন। শুনে রেখো, দাজ্জালের ডান চোখ কানা। তার চোখ যেন ফুলে যাওয়া আঙ্গুরের মতো ভাসাভাসা। আমি এক রাতে স্বপ্নে আমাকে কাবার কাছে দেখলাম। হঠাৎ সেখানে বাদামী রং-এর এক ব্যক্তিকে দেখলাম। তোমরা যেমন সুন্দর বাদামী রঙের লোক দেখে থাক তার চাইতেও বেশী সুন্দর ছিলেন তিনি। তাঁর মাথার সোজা চুলগুলো তাঁর দু'কাঁধ পর্যন্ত ঝুলছিল। তার মাথা থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি ঝরে পড়ছিল। তিনি দুজন লোকের কাঁধে হাত রেখে কা'বা শরীফ তাওয়াফ করছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ওনি কে? তারা জবাব দিল, ওনি হলেন মাসীহ ইবনে মারিয়াম। তারপর তাঁর পেছনে আর একজন লোক দেখলাম। তার মাথার চুল ছিল বেশী কোঁকড়ান, ডান চোখ কানা। আকৃতিতে সে আমার দেখা লোকদের মধ্যে ইবনে কাতানের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। সে একজন লোকের দু কাঁধে ভর করে কাবার চারদিকে ঘুরছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই লোকটি কে? তারা বলল, এ হল মাসীহ দাজ্জাল।

ইবনে আব্বাস রাযি. বর্ণনা করেন, তিনি হযরত উমর রাযি.-কে মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে অতিশয়োক্তি করো না। যেমনি ঈসা ইবনে মারিয়াম আ. সম্পর্কে নাসারারা করেছিল। আমি তো আল্লাহর বান্দা মাত্র। সুতরাং তোমরা আমার সম্পর্কে বলবে, আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।'

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিন জন শিশু ব্যতীত আর কেউ দোলনায় কথা বলেন নি। (১) হযরত ঈসা (২) জুরাইজ নামে বনি ইসরাঈলের এক ব্যক্তি। একবার সে নামাযরত থাকা অবস্থায় তার মা এসে তাকে ডাকল। সে ভাবল, আমি কি ডাকে সাড়া দিব, না নামাযে নিমগ্ন থাকব। জবাব না

পেয়ে তার মা বলল, ইয়া আল্লাহ! ব্যভিচারিণীর চেহারা না দেখা পর্যন্ত তুমি একে মৃত্যু দিও না। জুরাইজ তাঁর ইবাদতখানায় থাকতেন। একবার তাঁর কাছে এক মহিলা আসল। সে অসৎ উদ্দেশ্যে তাঁর সাথে কথা বলল। কিন্তু জুরাইজ তাতে রাজী হলেন না। এরপর মহিলাটি একজন রাখালের নিকট গেল এবং তাকে দিয়ে মনোবাসনা পূরণ করল। পরে সে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করল। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, এটি কার সন্তান? স্ত্রীলোকটি বলল, জুরাইজের। লোকেরা তাঁর কাছে আসল এবং তাঁর ইবাদতখানাটি ভেঙে দিল। আর তাঁকে নিচে নামিয়ে আনল ও গালিগালাজ করল। তখন জুরাইজ ওযু করে নামায আদায় করলেন : এরপর নবজাত শিশুটির নিকট এসে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে শিশু! তোমার পিতা কে? সে জবাব দিল, অমুক রাখাল আমার পিতা। তখন বনি ইসরাঈলের লোকেরা জুরাইজকে বলল, আমরা আপনার ইবাদতখানাটি সোনা দিয়ে তৈরি করে দিচ্ছি। জুরাইজ বললেন : না, তবে কাদা মাটি দিয়ে তৈরি করে দিতে পার।

(৩) বনি ইসরাঈলের একজন মহিলা তার শিশুকে দুধ পান করাচ্ছিল। তার কাছ দিয়ে একজন সুদর্শন পুরুষ আরোহী চলে গেল। মহিলাটি দুআ করল, ইয়া আল্লাহ! আমার ছেলেটিকে তার মতো বানাও। শিশুটি তখনই তার মায়ের স্তন ছেড়ে দিল এবং আরোহীর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, ইয়া আল্লাহ! আমাকে তার মতো করো না। এরপর মুখ ফিরিয়ে মায়ের দুধ পান করতে লাগল। আবু হোরাইরা রাযি. বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পাচ্ছি, তিনি নিজের আঙ্গুল চুষে দেখাচ্ছেন। এরপর সেই মহিলাটির পাশ দিয়ে একটি দাসী চলে গেল। মহিলাটি বলল, ইয়া আল্লাহ! আমার শিশুটিকে এর মতো করো না। শিশুটি তৎক্ষণাৎ মায়ের স্তন ছেড়ে দিয়ে বলল, ইয়া আল্লাহ! আমাকে তার মতো কর। মা জিজ্ঞেস করল, তা কেন? শিশুটি জবাব দিল, সেই আরোহী লোকটি ছিল বড় জালিম আর এ দাসীটিকে লোকে বলছে, তুমি চুরি করেছ, যেনা করেছ। অথচ সে এসবের কিছুই করে নি।

ইমাম বুখারী রহ. আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি মারিয়ামের পুত্র ঈসার বেশী নিকটতম। আর নবীগণ যেন পরস্পর বৈমাত্রেয় ভাই অর্থাৎ বাপ এক, মা ভিন্ন ভিন্ন। আমার ও ঈসার মাঝখানে কোনো নবী নেই। তবে ইমাম আহমদ রহ.-এর বর্ণনায় অতিরিক্ত আছে, কিয়ামতের পূর্বে ঈসা পুনরায় দুনিয়ায় অবতরণ করবেন। যখন তাঁকে দেখবে, তখন তোমরা চিনতে পারবে। কারণ, তিনি হবেন মাঝারি গড়নের। গায়ের রং লালচে সাদা। মাথার চুল সোজা। মনে হবে যেন মাথার চুল থেকে পানি টপকে পড়ছে। যদিও তিনি পানি স্পর্শ করেন নি। তিনি এসে ক্রুশ ভাঙবেন, শূকর হত্যা করবেন। জিযিয়া কর রহিত করবেন। একমাত্র ইসলাম ছাড়া সে যুগের সকল ধর্ম ও মতবাদ খতম করবেন। আল্লাহ তাঁর হাতে মিথ্যুক মাসীহ দাজ্জালকে ধ্বংস করবেন।

সমস্ত পৃথিবী শান্তি ও নিরাপত্তায় ভরে যাবে। এমনকি উট ও সিংহ, বাঘ ও গরু এবং নেকড়ে ও বকরী একই সাথে একই মাঠে বিচরণ করবে। কিশোর বালকগণ সাপের সাথে খেলা করবে। কিন্তু কেউ কারও ক্ষতি করবে না। যতদিন আল্লাহর ইচ্ছা ততদিন তিনি পৃথিবীতে থাকবেন। তারপর তিনি স্বাভাবিকভাবে ইনতিকাল করবেন এবং মুসলমানরা তাঁর জানাযা পড়বে।

হিশাম ইবনে উরওয়া আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ঈসা আ. পৃথিবীতে চল্লিশ বছর অবস্থান করবেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ঈসা আ.-এর পুনরায় দুনিয়ায় আগমন কিয়ামতের অন্যতম লক্ষণ। দামিশকের শুভ্র মিনারের ওপর তিনি অবতরণ করবেন। তিনি যখন অবতরণ করবেন, তখন ফজরের নামাযের ইকামত হতে থাকবে। তাঁকে দেখে মুসলমানদের ইমাম বলবেন, হে রুহুল্লাহ! সম্মুখে আসুন ও নামাযের ইমামতি করুন! ঈসা আ. বলবেন, "না, আপনারা একে অন্যের উপর নেতা! এ সম্মান আল্লাহ এ উম্মতকেই দান করেছেন।" অন্য বর্ণনায় এসেছে, ঈসা আ. ইমাম ছাহেবকে বলবেন, আপনিই ইমামতি করুন। কেননা আপনার জন্যে ইকামত দেওয়া হয়েছে। এরপর উক্ত ইমামের পেছনে তিনি নামায আদায় করবেন। নামায শেষে তিনি বাহনে আরোহণ করে দাজ্জালের সন্ধানে বের হবেন এবং মুসলমানরা তাঁর সাথে থাকবেন। দাজ্জালকে লুদ তোরণের নিকট পেয়ে সেখানেই তিনি নিজ হাতে তাকে হত্যা করবেন। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, দামিশকের পূর্ব পার্শ্বে এ মিনার যখন শুভ্র পাথর দ্বারা নির্মাণ করা হয় তখনই দৃঢ় আশা করা হয়েছিল, এখানেই তিনি অবতরণ করবেন। এ স্থানটি বিধ্বস্ত হওয়ার পর নাসারাদের অর্থ দ্বারাই এটি নির্মাণ করা হয়েছিল। ঈসা আ. এখানে অবতরণ করে শূকর নিধন করবেন। ক্রুশ ভেঙ্গে চুরমার করবেন এবং ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন তিনি গ্রাহ্য করবেন না।

ঈসা আ. রাওহা থেকে হজ কিংবা উমরা অথবা উভয়টির নিয়ত করে বের হবেন এবং তা সম্পন্ন করবেন। চল্লিশ বছর জীবিত থাকার পর তিনি ইনতিকাল করবেন। তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর প্রথম দুই খলীফার নিকট দাফন করা হবে। এ সম্পর্কে ইবনে আসাকির তাঁর ইতিহাসগ্রন্থে ঈসা আ.-এর বর্ণনা প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা রাযি. বর্ণিত মারফূ হাদীসে উল্লেখ করেছেন, হযরত ঈসা আ.-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুজরা শরীফের মধ্যে রাসূলুল্লাহ, আবু বকর ও উমরের সাথে দাফন করা হবে। কিন্তু এ হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ নয়। ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী. আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রাযি. থেকে বর্ণনা করেন যে, তাওরাত কিতাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ঈসা ইবনে মারিয়াম আ. এর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে আছে, হযরত ঈসা আ.-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে দাফন করা হবে।

এ হাদীসের অন্যতম রাবী মওদূদ মাদানী বলেন, রাসূলুল্লাহ এর হুজরায় একটি কবর পরিমাণ স্থান খালি আছে। ইমাম তিরমিযী রহ. এ হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। ইমাম বুখারী রহ. বলেন, আমার মতে এ হাদীসটি বিশুদ্ধ নয়। ইমাম বুখারী সুলাইমান থেকে বর্ণনা করেন, হযরত ঈসা আ. ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে নবুতের বিরতিকাল ছয় শ' বছর। কাতাদার মতে, পাঁচ শ ষাট বছর। কারও মতে পাঁচ শ' চল্লিশ বছর। য হোক, চার শ' ত্রিশ বছরের কিছু বেশি কিন্তু প্রসিদ্ধ মত ছয় শ' বছর। তবে কেউ কেউ বলেছেন, চান্দ্র বছরের হিসেবে ছয় শ' বিশ বছর এবং সৌর বছর হিসেবে ছয় শ' বছর।

ইবনে হিব্বান তাঁর সহি গ্রন্থে ঈসা আ.-এর উম্মতগণ কত দিন সঠিক দীনের উপরে ও নবীর আদর্শের উপরে টিকেছিল সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি আবু দারদা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ দাউদ নবীকে তাঁর অনুসারীদের মধ্যে মৃত্যু দেন। কিন্তু এতে তাঁর অনুসারীরা বিপথগামীও হয় নি, দীনও পরিবর্তন করে নি। আর ঈসা আ. অনুসারীরা তাঁর বিদায়ের পরে ২শ বছর তাঁর নীতি ও আদর্শের উপরে টিকে ছিল। ইবনে হিব্বান এ হাদীসকে সহি বললেও মূলত এর সনদ গরীব পর্যায়ের।

ইবনে জারীর মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের বরাত দিয়ে লিখেছেন, ঈসা আ.-কে আসমানে তুলে নেওয়ার পূর্বে তিনি হাওয়ারীগণকে উপদেশ দিয়েছিলেন, তারা যেন মানুষকে এক ও লা-শরীক আল্লাহর ইবাদতের দিকে ডাকতে থাকে। তিনি তাদের প্রত্যেককে সিরিয়া ও প্রাচ্য-প্রতীচ্যের জনগোষ্ঠীর এক এক এলাকা দাওয়াতী কাজের জন্যে নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন।

বর্ণনাকারীগণ বলেছেন, যে এলাকায় যে হাওয়ারীকে নিয়োগ করা হয়েছিল, তিনি সেই এলাকার অধিবাসীদের সাথে তাদের নিজ ভাষায় কথা বলতেন। অনেক ঐতিহাসিক বলেছেন, হযরত ঈসা আ.-এর নিকট থেকে চার জন লোক ইনজীল উদ্ধৃত করেছেন। তাঁরা হলেন লূক, মথি, মার্কস (মার্ক) ও ইউহান্না (যোহন)। কিন্তু এ ইনজীল চতুষ্টয়ের মধ্যে একটির সাথে আর একটির যথেষ্ট গরমিল বিদ্যমান। একটির মধ্যে বেশি তো আর একটিতে কম। উক্ত চার জনের মধ্যে মথি ও ইউহান্না হযরত ঈসা আ. এর যুগের এবং তারা তাঁকে দেখেছিলেন। মার্কস ও লূক তাঁর সমসাময়িক ছিলেন না বরং তাঁরা ছিলেন ঈসা আ.-এর শিষ্যদের শিষ্য। তবে তাঁরা মাসীহর উপর যথার্থ ঈমান আনেন ও তাঁকে সত্য নবী বলে স্বীকার করেন। দামিশকের এক ব্যক্তি ঈসা আ. উপর ঈমান আনেন, তার নাম যায়ন। তবে তিনি পোল নামক জনৈক ইহুদির ভয়ে দামিশকের পূর্ব গেটে গীর্জার নিকটে একটি গুহায় আত্মগোপন করে থাকেন। উক্ত ইহুদি অত্যাচারী ও ঈসা আ.-এর উপর ঈমান আনার কারণে সে তার মাথার চুল মুড়িয়ে দেয়। শহরের রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরায় এবং পাথর মেরে তাকে হত্যা করে। একদিন সে শুনতে পেল ঈসা আ. দামিশক অভিমুখে রওনা হয়েছেন। তখন সে তাঁকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে খচ্চরে আরোহণ করে সেদিকে বেরিয়ে পড়ল।

কাওকাব নামক স্থানে পৌঁছে সে ঈসা আ.-কে দেখতে পেল। ঈসা আ.-এর শিষ্যদের দিকে অগ্রসর হতেই এক ফেরেশতা এসে পাখা দিয়ে আঘাত করে তার চোখ কানা করে দিলেন। এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে তার অন্তরে ঈসা আ.-এর প্রতি বিশ্বাস জন্মায়। তখন সে ঈসা আ.-এর নিকট গিয়ে নিজের অপরাধ স্বীকার করে ঈমান আনে ঈসা আ. তার ঈমান গ্রহণ করলেন। এরপর সে ঈসা আ.-কে তার চক্ষুদ্বয়ের উপর হাত বুলিয়ে দিতে অনুরোধ করল, যাতে আল্লাহ্ তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেন। ঈসা আ. বললেন, তুমি যায়ন-এর কাছে ফিরে যাও। দামিশকের পূর্ব প্রান্তে লম্বা বাজারের পার্শ্বে তাকে পাবে। সে তোমার জন্যে দুআ করবে। ঈসা আ.-এর কথামতো সে সেখানে এসে যায়নকে পেল। যায়ন তার জন্যে দুআ করলে সে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল। পোল আন্তরিকভাবে ঈসা আ. এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন, তিনি তাকে আল্লাহর বান্দা ও রাসূল হিসেবে বিশ্বাস করতেন। তার নামে দামিশকে একটি গীর্জা তৈরি করা হয়। পোলের গীর্জা নামে খ্যাত এ গীর্জাটি সাহাবাদের যুগে দামিশক বিজয়কালেও বিদ্যমান ছিল। পরবর্তীকালে এটা ধ্বংস হয়ে যায়। সে ইতিহাস আমরা পরে বলব।

বেথেলহাম ও কুমামার ভিত্তি স্থাপন

হযরত ঈসা মাসীহ আ. যে স্থানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে স্থানে সম্রাট কনষ্টান্টাইন একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন, যার নাম রাখা হয় বায়তু লাহাম (বেথেলহাম)। অপর দিকে সম্রাটের মা হায়লানা কথিত ক্রুশবিদ্ধ ঈসার কবরের উপর আর একটি প্রাসাদ তৈরি করেন, যার নাম রাখা হয় কুমামা। ইহুদিদের প্রচারণায় পড়ে তারাও বিশ্বাস করত, নবী ঈসা মাসীহ আ.কেই ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু এ মত পোষণকারী পূর্বের পরের সকলেই কাফের। এরা বিভিন্ন রকম মনগড়া বিধি-বিধান ও আইন-কানুন তৈরি করে। এসব বিধানের মধ্যে ছিল পুরাতন নিয়ম তথা তাওরাতের বিরোধিতা করা। তারা তাওরাতে স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ ও হারাম বস্তুকে হালাল করে নেয়, যেমন শূকর খাওয়া। তারা পূর্বমুখী হয়ে উপাসনা করা। অথচ ঈসা মাসীহ বায়তুল মুকাদ্দাসের শুভ্র পাথরের দিকে মুখ করা ছাড়া ইবাদত করতেন না। শুধু তিনিই নন বরং মূসা আ.-এর পরবর্তী সকল নবী বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামায আদায় করেছেন। এমনকি শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও হিজরতের পরে ষোল কিংবা সতের মাস পর্যন্ত বায়তুল মুকাদ্দাসকে কিবলা করে নামায আদায় করেছেন। পরে তিনি আল্লাহর হুকুমে ইবরাহীম খলীল আ. কর্তৃক নির্মিত কাবা ঘরের দিকে ফিরে নামায পড়েন।

তারা গির্জাগুলোতে মূর্তি স্থাপন করে। অথচ ইতপূর্বে গির্জায় কখনো কোনো মূর্তি রাখা হত না। তারা এমন সব আকিদা তৈরি করে, যা শিশু, মহিলা ও পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই বিশ্বাস করত। এ আকিদার নাম ছিল 'আমান'। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল সম্পূর্ণ কুফরি আকিদা ও বিশ্বাসভঙ্গের নামান্তর। মালাকিয়া ও নাসতুরিয়া দলভুক্ত সকলেই ছিল নাসতুরাস এর অনুসারী। এরা ছিল দ্বিতীয় মহাসম্মেলনপন্থী। আর ইয়াকুবিয়া সম্প্রদায় হচ্ছে ইয়াকুব আল বারাদায়ীর অনুসারী। এরা হল তৃতীয় মহাসমাবেশপন্থী। এ দুই দলই প্রথমোক্ত দলের আকিদা পোষণ করত, যদিও খুঁটিনাটি বিষয়ে পারস্পরিক বিরোধ ছিল।
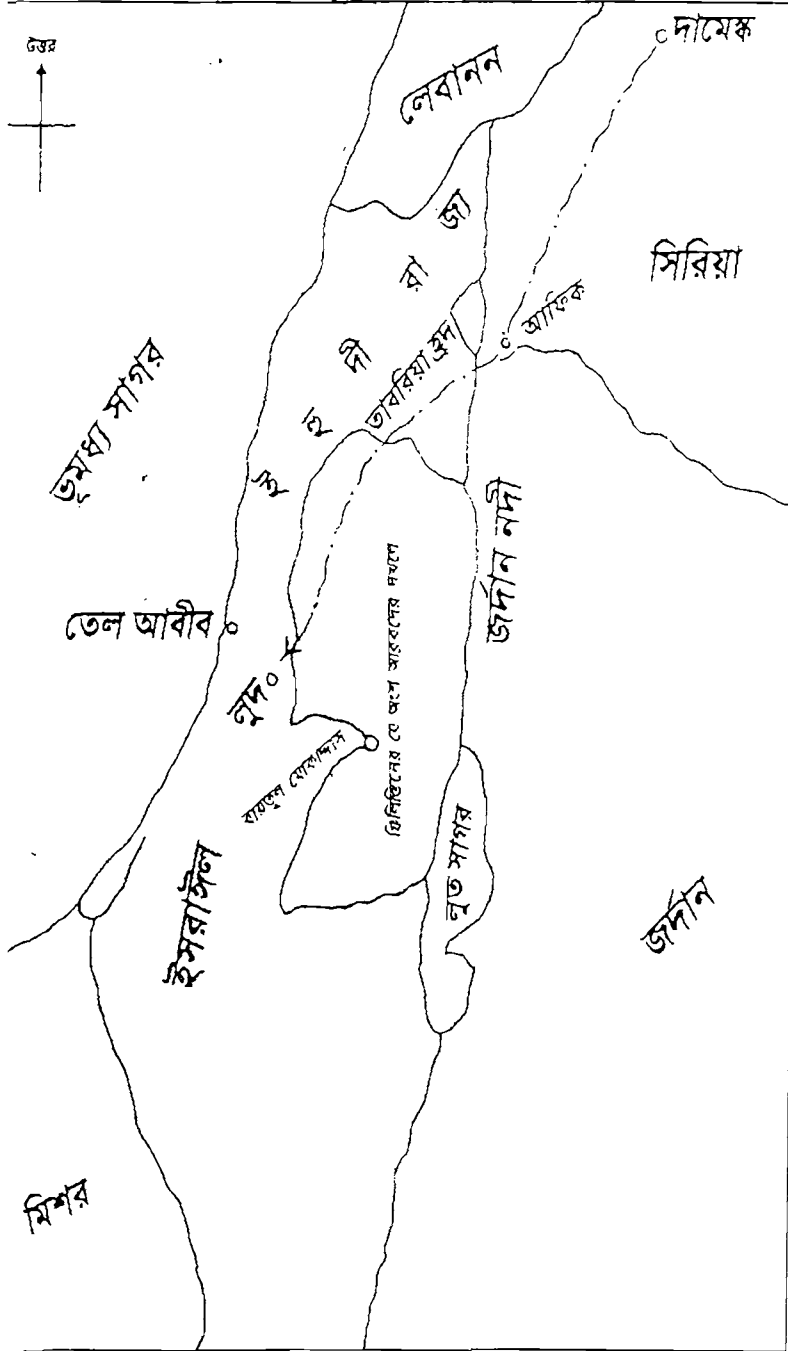
প্রকৃত মসীহ-এর অবতীর্ণ হওয়ার স্থান

হযরত ঈসা আ.-এর আমলে ফিলিস্তিন

contents
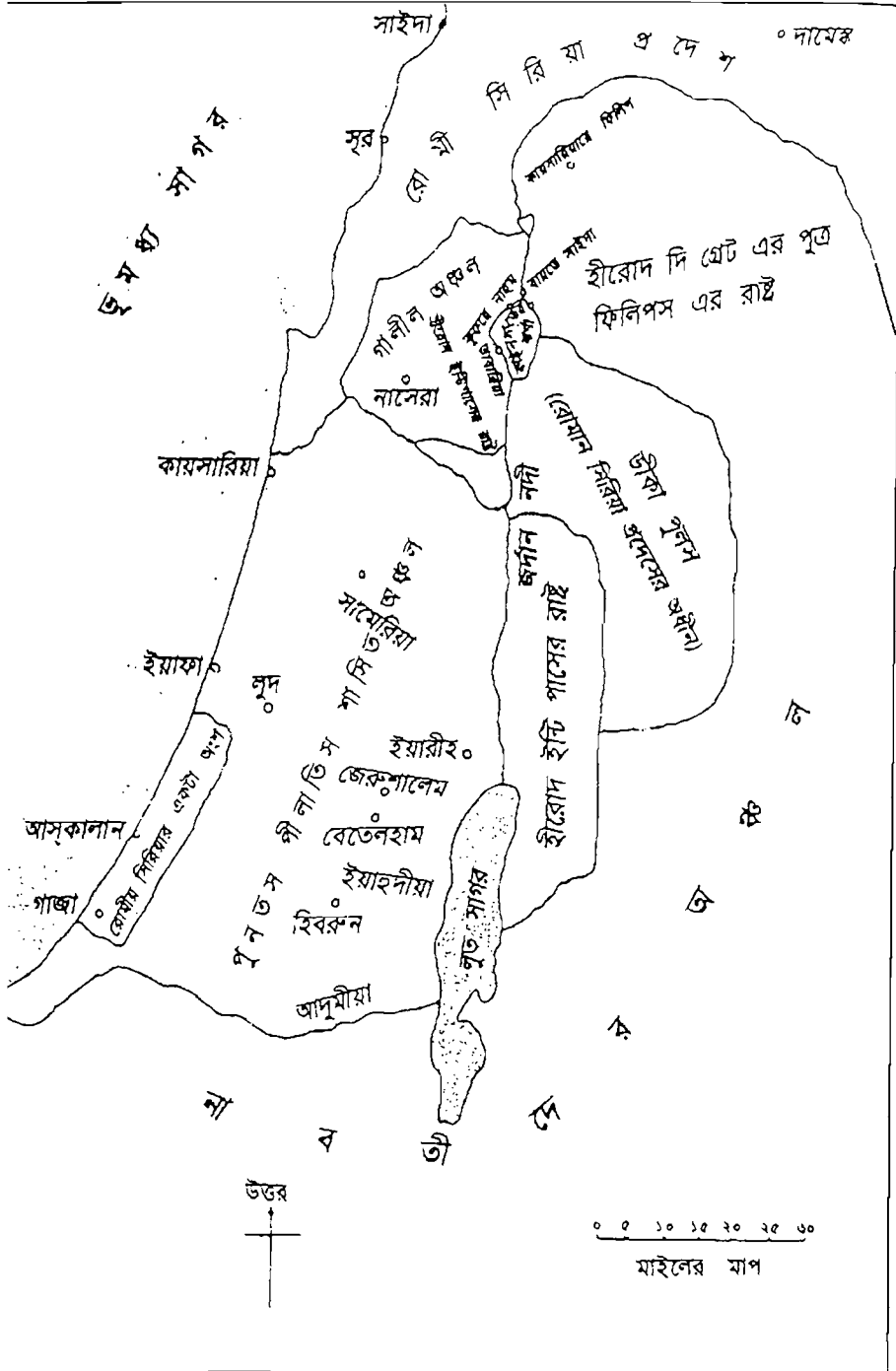
হযরত মুহাম্মদ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

মূল
হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ.

বংশ পরিচয়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র বংশ সারা বিশ্বের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত ও পবিত্র বংশ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই বংশগত মর্যাদা এমন একটি বিষয়, মক্কার কোনো কাফির এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোনো দুশমনও তা অস্বীকার করতে পারেনি। হযরত আবু সুফিয়ান রাযি. কাফির থাকা অবস্থায় রোম সম্রাটের সামনে অকপটে এ বিষয়টি স্বীকার করেছিলেন। অথচ সে সময় তিনি এটাই চেয়েছিলেন, যদি সুযোগ হয় তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর কোনো না কোনো দোষ চাপাবেন। দালায়েলে আবূ নাঈমে মারফূ রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, হযরত জিবরাঈল আ. বলেছেন, "আমি প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্য পর্যন্ত ভ্রমণ করেছি, কিন্তু বনি হাশিম অপেক্ষা উত্তম কোনো বংশ দেখিনি"। (মাওয়াহিব)

পিতার বংশধারা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিতার দিক থেকে বংশধারা হল : মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম ইবনে আবদে মানাফ ইবনে কুসাঈ ইবনে কিলাব ইবনে মুররাহ ইবনে কাব ইবনে লুওয়াই ইবনে গালিব ইবনে ফিহর ইবনে মালিক ইবনে নযর ইবনে কিনানা ইবনে খুযাইমা ইবনে মুদরিকা ইবনে ইলিয়াস ইবনে মুযার ইবনে নিযার ইবনে মাআদ ইবনে আদনান।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বংশধারা এ পর্যন্ত সর্বসম্মতিভাবে প্রমাণিত। এখান থেকে আদম আলাইহিস সালাম পর্যন্ত বংশ তালিকা সর্বসম্মত নয়। তাই এখানে তা উল্লেখ করা হলো না।

মাতৃকুল বংশধারা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মায়ের বংশধারা হল : মুহাম্মদ ইবনে আমিনা বিনতে ওহাব ইবনে আবদে মানাফ ইবনে যুহরা ইবনে কিলাব। এ বংশধারা দ্বারা বুঝা গেল, কিলাব ইবনে মুররা পর্যন্ত গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিতা ও মাতা উভয়ের বংশ একত্রে মিলে যায়।

জন্মের পূর্বেই বরকত প্রকাশ

সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বক্ষণে সুবহে সাদিকের দিগন্ত বিস্তৃত আলোকরশ্মি অতঃপর রক্তিম আভা যেমন বিশ্বজগতকে সূর্যোদয়ের সুসংবাদ প্রদান করে, তেমনি নবুয়তের সূর্য উদয়ের সময় যখন ঘনিয়ে এল, তখন পৃথিবীর দিক দিগন্তে এমন বহু ঘটনা ঘটতে লাগল, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনী বার্তা প্রচার করছিল। মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকদের পরিভাষায় এগুলোকে ইরহাসাত (অপেক্ষমান নিদর্শন) বলা হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মায়ের বর্ণনা, নবীজী তাঁর গর্ভে আসার পর একদিন স্বপ্নে তাকে সুসংবাদ দেওয়া হল, তোমার গর্ভের সন্তানটি এই উম্মতের কর্ণধার। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার জন্য তুমি এই দুআ করবে, আমি একে এক আল্লাহর আশ্রয়ে সোপর্দ করছি। আর তার নাম মুহাম্মদ রাখবে। তিনি আরো বলেন, মুহাম্মদ আমার গর্ভে থাকা অবস্থায় আমি একটি নূর দেখতে পেলাম। যার আলোকে বসরা ও সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠে। (ইবনে হিশাম)

তিনি আরও বলেন আমি কোনো মহিলাকে মুহাম্মদ অপেক্ষা সহজ ও আরামদায়ক গর্ভধারণ করতে আর দেখিনি। গর্ভাবস্থায় মহিলাদের সাধারণত যে মাথা ঘোরা, বমিভাব ও অলসতা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়, আমি তার কিছুই অনুভব করিনি।

শুভ জন্ম

অধিকাংশ আলেমগণই একমত, যে বছর আসহাবে ফীল বাইতুল্লাহ শরীফ আক্রমণ করে এবং আল্লাহ তাআলা ক্ষুদ্র এক ঝাঁক পাখি দ্বারা তাদের ধ্বংস করেন, (যে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা কুরআন মাজিদেও রয়েছে) ঠিক সে বছরের রবিউল আউয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্মগ্রহণ করেন। বস্তুত আসহাবে ফীলের ঘটনাটিও ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুনিয়ায় আগমনের বরকত সমূহের ভূমিকা মাত্র। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ঘরে জন্মলাভ করেন, পরবর্তীতে সে ঘরটি হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের ভাই মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফের হাতে এসেছিল। (সীরাতে মুগলতাঈ : ৫)

কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে আসহাবে ফীলের ঘটনাটি ঘটেছিল ৫৭১ সনের ২০শে এপ্রিল। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্ম হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম-এর জন্মের ৫৭১ বছর পরে হয়েছিল।

(দুরূসুত তারীখ আল ইসলামী : ১৪)

সর্বসম্মত মতানুসারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পুণ্যময় জন্ম রবিউল আউয়াল মাসের সোমবারে হয়। কিন্তু তারিখ নির্ধারণের ব্যাপারে ৪টি বর্ণনা প্রসিদ্ধ– দ্বিতীয়, অষ্টম, দশম, দ্বাদশ। হাফেয মুগলতাঈ রহ. ২ তারিখ গ্রহণ করে দ্বিতীয় বর্ণনাকে দুর্বল গণ্য করেছেন। কিন্তু প্রসিদ্ধ বর্ণনা হল ১২ তারিখ। এমনকি হাফেয ইবনুল হাজার আসকালানীর উপর অধিকাংশের মত বর্ণনা করেন। এটাকেই কামেল ইবনে আসীরে গ্রহণ করা হয়েছে এবং মিসরের বাদশা মাহমুদ পাশা হিসাব করে ৯ তারিখ গ্রহণ করেন। এটা অধিকাংশ আলেমের মতের বিরোধী সনদবিহীন বর্ণনা। চন্দ্রোদয়ের স্থান বিভিন্ন হওয়ার ফলে গণনার মধ্যে নির্ভর করা যায় না বলে অধিকাংশের মতের বিরুদ্ধাচরণ করা যায় না।

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আল্লামা ইবনে আসাকির পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এভাবে লিখেছেন, হযরত আদম আ. ও নূহ আ. এর মাঝে ব্যবধান ছিল ১২০০ বছর, নূহ আ.

থেকে ইবরাহীম আ. পর্যন্ত ১১৪২ বছর, ইবরাহীম আ. থেকে মূসা আ. পর্যন্ত ৫৬৫ বছর, মূসা আ. দাউদ আ. পর্যন্ত ৫৬৯ বছর, দাউদ আ. থেকে ঈসা (আ.) পর্যন্ত ১৩৫৬ বছর এবং ঈসা আ. থেকে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত ব্যবধান ছিল ৬০০ বছর।

এ হিসেবে হযরত আদম আ. থেকে আমাদের প্রিয়নবী পর্যন্ত ৫০৩২ বছর। আর প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী আদম আ. হায়াত পেয়েছিলেন ৯৬০ বছর। তাই আদম আ. পৃথিবীতে আগমনের প্রায় ৬ হাজার বছর পরে অর্থাৎ সপ্তম সহস্রাব্দে সাইয়িদুল মুরসালীন খাতামুল আম্বিয়া মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুনিয়ায় আবির্ভাব ঘটে।

মোটকথা যে বছর বাইতুল্লাহর ওপর আসহাবে ফীলের আক্রমণ হয়, সে বছর রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ সোমবার পৃথিবীর ইতিহাসে এক অনন্য দিন। এ দিনে জগত সৃষ্টির উদ্দেশ্য, রাত-দিনের বিবর্তনের মূল লক্ষ্য, আদম ও বনি আদমের গৌরব, নূহ আ. এর নৌকার হেফাজতের রহস্য, ইবরাহীম আ. এর দুআ এবং মূসা ও ঈসা আ. এর ভবিষ্যদ্বাণীর জীবন্ত প্রতীক হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ পৃথিবীতে শুভাগমন করেন।

এদিকে পৃথিবীর দিকে দিকে নবুয়তের সূর্যকিরণ আত্মপ্রকাশ করতে লাগল, ওদিকে পারস্যের রাজপ্রাসাদে ভূমিকম্প হতে শুরু করল। যার ফলে প্রাসাদের চৌদ্দটি গম্বুজ ভেঙ্গে পড়ল। হঠাৎ শুকিয়ে গেল পারস্যের খরস্রোতা শ্বেতসাগর। নিস্তেজ হয়ে গেল এক হাজার বছর ধরে প্রজ্বলিত পারসিকদের সেই অগ্নিকুণ্ড, যা প্রজ্বলনের পর 'এক মুহূর্তের জন্যও হাজার বছরে একবারও নির্বাপিত হয়নি। (সীরাতে মুগলতাঈ : ৫)

বস্তুত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্মকালীন এসব আশ্চর্য ঘটনা ছিল অগ্নিপূজা, মূর্তিপূজা ও অন্যসব গোমরাহীর পরিসমাপ্তির ঘোষণা এবং পারস্য ও রোমসাম্রাজ্যের পতনের প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।

এক রেওয়ায়েতে এরূপও আছে, তাঁর জন্মের ৭ মাস পর তাঁর পিতার মৃত্যু ঘটে। কিন্তু যাদুল মাআদ-এ ইবনে কাইয়ুম রহ. এ অভিমত দুর্বল বলে অভিহিত করেছেন।

বিভিন্ন সহি হাদীসে আছে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্মের সময় তাঁর মায়ের পেট থেকে এমন একটি আলো বিচ্ছুরিত হয়েছিল, যার আলোতে পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত আলোকিত হয়ে গিয়েছিল। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ভূমিষ্ঠ হন, তখন তিনি নিজের উভয় হাতের উপর ভর দেওয়া অবস্থায় ছিলেন। অতঃপর এক মুষ্টি মাটি নিয়ে আকাশপানে দৃষ্টিপাত করেন। (মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া)

পিতার ইনতেকাল

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় দাদা আবদুল মুত্তালিবের আদেশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিতা আবদুল্লাহ

খেজুর আনতে মদিনা যান। ঘটনাক্রমে সেখানে তিনি ইনতেকাল করেন। এভাবে দুনিয়াতে আগমনের পূর্বেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হন। (সীরাতে মুগলতাঈ : ৭)

দুধপান ও শৈশবকাল

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে নিজের মায়ের দুধ পান করেন। কয়েক দিন পর আবু লাহাবের দাসী সুআইবার দুধ পান করেন। অতঃপর আল্লাহ প্রদত্ত এ মহান দৌলত হালিমা সাদিয়ার ভাগ্যে জোটে। আরবের অভিজাত পরিবারসমূহের নিয়ম ছিল, দুধপানের জন্য নবজাত শিশুদের তারা আশপাশের পল্লী এলাকায় পাঠিয়ে দিত। এতে পল্লী অঞ্চলের আবহাওয়ায় শিশুদের স্বাস্থ্যও ভালো হত এবং তারা বিশুদ্ধ আরবি ভাষাও শিখতে পারত। এ কারণেই গ্রামের মহিলারা অনেক সময় দুগ্ধপোষ্য শিশু সংগ্রহের জন্য শহরে আসত। (সীরাতে মুগলতাঈ)

হযরত হালিমা সাদিয়া রাযি. এর নিজের বর্ণনা– দুগ্ধপোষ্য শিশুর সন্ধানে আমি বনু সাদ গোত্রের মহিলাদের সঙ্গে তায়েফ থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। সে বছর দেশে দুর্ভিক্ষ ছিল। আমার স্তনে এতটুকু দুধ ছিল না, যা আমার নিজের বাচ্চার প্রয়োজন মেটাতে পারে। রাতভর শিশুটি ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করত। আর আমি তাকে কোলে নিয়ে বসে বসে রাত কাটাতাম। আমাদের একটি উট ছিল বটে; কিন্তু তারও দুধ ছিল না। উটের ওপর চড়ে আমি মক্কায় রওনা হলাম। সেটি এত দুর্বল ছিল, অন্যদের সাথে সমানতালে সে চলতে পারছিল না। এতে আমার সফরসঙ্গীরাও বিরক্তিবোধ করছিল। অবশেষে অনেক কষ্টে সফর শেষ করে আমরা মক্কায় এসে পৌঁছি।

মক্কা পৌঁছে আমরা সকলে দুগ্ধপোষ্য শিশুর সন্ধান করতে লাগলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে যখন মহিলারা শুনতে পেল, শিশুটি এতিম, তখন কেউই তাকে গ্রহণ করছিল না। এতিম হওয়ার কারণে তার পক্ষ থেকে বেশি পুরস্কার পাওয়ার আশা ছিল না। এদিকে হালিমার ভাগ্যের তারকা চমকাতে শুরু করল। দুধের স্বল্পতা তাঁর জন্য রহমতের রূপ ধারণ করল। কারণ, দুধ কম দেখে কেউ তাকে শিশু দিতে সম্মত হল না।

হালিমা বলেন, অনেক খোঁজাখুজির পর কোনো শিশু না পেয়ে আমি আমার স্বামীকে বললাম, খালি হাতে ফিরে যেতে আমার ভালো লাগছে না। তার চেয়ে বরং এই এতিম শিশুটিই নিয়ে চলুন। আমার এ প্রস্তাবে স্বামী সম্মত হলেন। এতিম রত্নটিই কোলে করে আমরা বাড়ি ফিরে এলাম। যার উসিলায় কেবল হালিমা আর আমিনার গৃহই নয় বরং সমগ্র বিশ্বজগত আলোকিত হয়েছিল। আল্লাহর মেহেরবানিতে হালিমার ভাগ্য খুলে গেল। উভয় জগতের সরদার তাঁর কোলে এল। শিশুসন্তান মুহাম্মদকে নিয়ে তাঁবুতে এসে হালিমা তাঁকে দুধপান করাতে বসলেন। আর অমনি একের পর এক বরকত শুরু হয়ে গেল। হালিমার স্তনের বোটায় মুখ দেওয়ার সাথে সাথে এত অধিক পরিমাণ দুধ নেমে আসে, প্রিয়নবী নিজে এবং তাঁর দুধভাই উভয়ে মিলে অতি তৃপ্তির সাথে দুধপান করে আরামের সাথে ঘুমিয়ে পড়লেন।

অপর দিকে উটের দিকে তাকিয়ে দেখা গেল তার স্তন দুধে পরিপূর্ণ। হালিমা বলেন, আমার স্বামী উটের দুধ দোহন করে আনলেন। আমরা সকলে তৃপ্তি সহকারে পান করলাম এবং আরামের সাথে রাত কাটালাম। দীর্ঘদিন পর এ রাতেই প্রথম আমরা পরম শান্তিতে ঘুমিয়েছিলাম। এখন আমার স্বামীও বলতে লাগলেন, হালিমা, তুমি তো বড় বরকতময় ভাগ্যবান শিশু এনেছ! আমি বললাম, আমিও আশা করি শিশুটি অস্বাভাবিক মুবারক। অতঃপর আমরা মক্কা থেকে রওনা হলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোলে নিয়ে আমি সেই দুর্বল উটনীর পিঠে সওয়ার হলাম। কিন্তু আল্লাহর কি অপার মহিমা! সেই দুর্বল উটনী এবার এত দ্রুত চলতে শুরু করল, অন্য কোনো বাহনই তার নাগাল পেল না। আমার সঙ্গী মহিলারা বিস্ময়ের সাথে বলতে লাগল, এ কি তোমার সেই উটনী, যাতে চড়ে তুমি এসেছিলে?

মোটকথা, দীর্ঘপথ অতিক্রম করে আমরা ঘরে এসে পৌঁছলাম। এলাকায় তখন চরম দুর্ভিক্ষ চলছিল। দুধের পশুগুলো সব ছিল দুগ্ধশূন্য। কিন্তু আমি ঘরে প্রবেশ করা মাত্র আমার বকরিরগুলোর স্তন দুধে ভরপুর হয়ে গেল। অবস্থা এমন হল, আমার বকরিগুলো প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে দুধ দিচ্ছে, আর অন্য কেউ তাদের পশু থেকে এক ফোটা দুধও পাচ্ছে না। আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের রাখালদের বলে দিল, আমাদের বকরিগুলোও তোমরা সেই চারণভূমিতে নিয়ে যেও, হালিমার বকরিগুলো যেখানে ঘাস খায়। কিন্তু তাতে হবে কি? এখানে যে চারণভূমি আর ঘাসপাতার কোনো কৃতিত্ব নেই। যে রত্নের বরকতে এসব ঘটছে হালিমা ছাড়া অন্যেরা তা পাবে কোথায়? তাই একই স্থানে ঘাস খাওয়ানোর পরও অন্যদের বকরিগুলো আগের মতো দুগ্ধশূন্যই রয়ে গেল। হালিমা বলেন, এভাবে একের পর এক আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকত প্রত্যক্ষ করতে লাগলাম। এমন করে দু বছর কেটে গেলে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুধ খাওয়ানো বন্ধ করে দিলাম।

প্রথম কথা

হালিমা সাদিয়া বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি যখন দুধ ছাড়ালাম, তখন তাঁর পবিত্র মুখ থেকে নিম্নোক্ত কথাগুলো উচ্চারিত হয় :

اَللّٰهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

এ বাক্যগুলোই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখ থেকে উচ্চারিত প্রথম কথা। (খাসায়েস : ১/৫৫)

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দৈহিক বৃদ্ধি অন্য সব শিশুর তুলনায় ভালো ছিল। দুবছর বয়সেই বেশ হৃষ্টপুষ্ট মনে হতে লাগল। এবার নিয়মানুযায়ী তাঁকে তাঁর মায়ের কাছে নিয়ে গেলাম। কিন্তু তাঁর বরকতের কারণে তাঁকে রেখে যেতে মন চাচ্ছিল না। ঘটনাক্রমে সে বছর মক্কায় মহামারী দেখা দিয়েছিল। এ অজুহাতে আমরা পুনরায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাথে করে নিয়ে এলাম। তিনি আমাদের কাছেই থাকতে লাগলেন।

এবার তিনি ঘর থেকে বাইরে যান, পাড়ার ছেলেদের খেলা দেখেন কিন্তু নিজে কখনো খেলতেন না। সব সময় একা থাকতেন। একদিন আমাকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, মা ভাইয়াকে সারাদিন একবারও দেখি না, থাকেন কোথায়? আমি বললাম, ও মাঠে বকরি চরাতে যায়। এবার তিনি বললেন, তাহলে আমাকেও তার সাথে পাঠিয়ে দিন। এরপর থেকে নবীজি দুধভাই আব্দুল্লাহর সাথে প্রতিদিন বকরি চরাতে মাঠে যেতেন। [শৈশবকালেই এ শিশুর সাম্য-চেতনা লক্ষ্যণীয়, যখন আমার ভাই কাজ করবে, তখন আমি কেন করব না। (খাসায়েস :১/৫৫)

একদিনের ঘটনা। দু ভাই বকরি চরাচ্ছিলেন। হঠাৎ আব্দুল্লাহ হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়ে ঘরে এসে পিতাকে বলল, আমার কুরাইশী ভাইকে সাদা পোশাকধারী দুজন লোক ধরে মাটিতে শুইয়ে পেট চিরে ফেলেছে। এ অবস্থায়ই তাকে আমি ফেলে এসেছি। হালিমা বলেন, এ খবর শুনে আমরা শঙ্কিত হয়ে পড়লাম। মাঠে দৌঁড়ে গিয়ে দেখতে পেলাম নবীজি বসে আছেন। কিন্তু ভয়ে তার চেহারা বিবর্ণ। আমি বললাম, ব্যাপার কী! জবাবে তিনি বললেন, সাদা পোশাক পরা দুজন লোক এসে আমাকে ধরে মাটিতে শুইয়ে আমার পেট চিরে পেটের ভেতর থেকে খুঁজে কী যেন বের করলেন।

হালিমা বলেন, তাকে ঘরে নিয়ে এলাম। আমরা এক জ্যোতিষীর কাছে তাকে নিয়ে গেলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেই জ্যোতিষী আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে তাকে বুকে চেপে ধরে চিৎকার করে বলতে শুরু করল, কোথায় আছ আরবের মানুষ! জলদি এসো। যে বিপদ তোমাদের আসার কথা ছিল, তা এসে গেছে। শীঘ্রই তা দমন কর। এই শিশুটিকে খুন কর। এর সঙ্গে আমাকেও মেরে ফেল। একে বাঁচতে দিলে মনে রেখ এই শিশু তোমাদের দ্বীন-ধর্ম নিশ্চিহ্ন করে তোমাদের এমন এক ধর্মের প্রতি আহবান করবে যার কথা তোমরা কখনো শোননি। [ইসলামের পূর্বে কিছু মানুষ জিন ও শয়তান দ্বারা আসমানি খবর এবং গোপন কথাবার্তা জেনে নিয়ে গায়েবি খবরের দাবিদার ছিল, তাদেরকে কাহেন বা গণক বলা হয়। (সীরাতে ইবনে হিশাম, যাদুল মাআদ)

জ্যোতিষীর এ কথা শুনে হালিমা শিহরিত হয়ে উঠলেন। ক্রোধের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার হাত থেকে ছিনিয়ে এনে বললেন, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে। আগে তোমার মাথার চিকিৎসা করানো উচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে হালিমা ঘরে ফিরে এলেন। এই দ্বিতীয় ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর মায়ের হাতে তুলে দিয়ে আসার ব্যাপারে হালিমাকে উদ্বুদ্ধ করে। কারণ, হালিমা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারছিলেন না।

(শাওয়াহেদুন নবুওয়া, খাসায়েসে কুবরা : ১/৫৫)

মক্কা গিয়ে হালিমা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলেন। হযরত আমেনা জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি এত আগ্রহ করে নিয়ে

এত তাড়াতাড়ি আবার ফেরত দিয়ে যাচ্ছেন কেন? হালিমা সব ঘটনা খুলে বললেন। শুনে আমিনা বললেন, নিশ্চয় আমার এই পুত্রের ব্যতিক্রমধর্মী বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে! অতঃপর হালীমাকে তিনি গর্ভকালীন ও প্রসবকালীন সময়কার বিস্ময়কর ঘটনাসমূহ শুনালেন। (ইবনে হিশাম)

মায়ের ইনতেকাল

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর বয়স যখন চার কিংবা ছয় বছর, তখন মদিনা থেকে ফেরার পথে আবওয়া নামক স্থানে মা আমিনা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যান। (সীরাতে মুগলতাঈ : ১০)

ছয় বছরের শিশু। মাথার উপর থেকে পিতার স্নেহছায়া তো জন্মের আগেই বিদায় নিয়েছে। এবার জননীর মমতার কোলেরও পরিসমাপ্তি ঘটল। কিন্তু যে রহমতের কোলে লালিত হবেন এ এতিম, তিনি তো এ সকল উপায় উপকরণের মুখাপেক্ষী নন।

দাদার ইনতেকাল

পিতামাতা হারিয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাদা আব্দুল মুত্তালিবের আশ্রয়ে লালিত-পালিত হচ্ছিলেন। কিন্তু মহান আল্লাহ তাআলা দেখাতে চেয়েছিলেন, এই শিশু একমাত্র রহমতের কোলেই পালিত হবেন। জাগতিক উপায় উপকরণের মূল নিয়ামক যাঁর হাতে তিনি নিজেই এই শিশুর জিম্মাদার। যেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বয়স ৮ বছর ২ মাস ১০ দিনে উপনীত হল, সেদিন দাদা আব্দুল মুত্তালিবও চিরবিদায় গ্রহণ করেন।

সিরিয়া সফর

দাদার ইনতেকালের পর আপন চাচা আবু তালিব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর লালন-পালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। চাচার কাছে নবীজি বড় হতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর বয়স যখন বার বছর দু'মাস দশ দিন তখন চাচা আবু তালিব ব্যবসা উপলক্ষে সিরিয়া সফর করার মনস্থ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাথে নিয়ে তিনি সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পথে তায়মা নামক স্থানে যাত্রা বিরতি করলেন।

ইয়াহুদী পণ্ডিতের ভবিষ্যদ্বাণী

চাচার সঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়মায় অবস্থান করছিলেন। ঘটনাক্রমে এক ইহুদি পণ্ডিত যাকে বুহায়রা পাদ্রী বলা হত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। তাকে দেখে ইহুদি পণ্ডিত আবু তালিবকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার সঙ্গের এই ছেলেটি কে? আবু তালিব বললেন, এ আমার ভাতিজা। বুহায়রা বললেন, এ ছেলেটির প্রতি কি আপনার মমতা আছে? আপনি কি একে রক্ষা করতে চান? আবু তালিব বললেন, অবশ্যই। বুহায়রা এবার আল্লাহর শপথ করে বললেন, আপনি একে যদি সিরিয়া নিয়ে যান, তাহলে

ওখানকার ইহুদিরা নির্ঘাত একে খুন করবে। কারণ, বালকটি আল্লাহর নবী, যিনি ইহুদিদের ধর্মকে রহিত করে দেবেন। এর যাবতীয় গুণাগুণ আমি আসমানি কিতাবে দেখতে পেয়েছি।

বুহায়রা যেহেতু তাওরাতের আলেম ছিলেন এবং তাওরাতে প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দৈহিক আকার-আকৃতির পূর্ণ বিবরণ ছিল, তাই তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে চিনে ফেলেছিলেন– এ বালকই সেই শেষনবি, যিনি তাওরাতকে রহিত এবং ইহুদি পণ্ডিতদের রাজত্ব খতম করে দেবেন। বুহায়রার কথা শুনে আবু তালিব শঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে মক্কায় ফেরত পাঠিয়ে দেন।

দ্বিতীয়বার সিরিয়া সফর

সে সময় মক্কায় খাদিজা নামের এক বিত্তবান মহিলা বাস করতেন। অগাধ সম্পদের সাথে সাথে তিনি যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা এবং অভিজ্ঞতার অধিকারিণীও ছিলেন। বিচক্ষণ ও বিশ্বস্ত গরীব লোকদের দেখে তিনি ব্যবসার পণ্য দিয়ে বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করতেন এবং লাভের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ তাদেরকে প্রদান করতেন। নবীজি তখনও নবুয়ত প্রাপ্ত হননি ঠিক, কিন্তু সমগ্র মক্কাবাসীর কাছে তার সততা ও বিশ্বস্ততার যথেষ্ট সুনাম ছিল।

প্রত্যেকের কাছেই তিনি আস্থাভাজন ছিলেন। সকলের কাছে তিনি আল-আমীন তথা বিশ্বস্ত উপাধিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই সুনাম সুখ্যাতি খাদিজার কাছেও গোপন ছিল না। তাই তিনি তার ব্যবসার কাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে সোপর্দ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিয়ানতদারী দ্বারা উপকৃত হওয়ার মনস্থ করলেন।

তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট প্রস্তাব পাঠালেন, আপনি যদি আমার ব্যবসার পণ্য নিয়ে সিরিয়া যেতে রাজি হন তাহলে আপনার খেদমতের জন্য সঙ্গে আমার একটি গোলাম দেব এবং অন্যদের তুলনায় আপনাকে লাভের অংশ বেশী দেব। যেহেতু নবীজী অত্যন্ত সাহসী ও উদার মনের অধিকারী ছিলেন, তাই প্রস্তাব পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুদূর সিরিয়া সফরের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন এবং খাদিজার গোলাম মাইসারাকে সঙ্গে নিয়ে ১৬ই জিলহজ সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। সিরিয়া গিয়ে তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে অধিক লাভে পণ্য বিক্রি করে সেখান থেকে অন্য মাল ক্রয় করে ফিরে আসেন। মক্কা এসে সিরিয়া থেকে আনা পণ্যগুলো খাদিজার হাতে সোপর্দ করেন। সেই পণ্য বিক্রি করে খাদিজা প্রায় দ্বিগুণ লাভ করেন।

সিরিয়ার পথে একস্থানে নবীজি অবস্থান করছিলেন। সেখানে নাসতুরা নামক এক ইহুদি পণ্ডিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে বর্ণিত আখেরী নবীর লক্ষণসমূহ দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে চিনে ফেলেন। ইহুদি পণ্ডিত মাইসারাকে আগে থেকেই জানতেন।

তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সঙ্গের এই লোকটি কে? মাইসারা বলল, ইনি মক্কার কুরাইশ গোত্রের এক ভদ্র যুবক। ইহুদী পণ্ডিত বললেন, ভবিষ্যতে ইনি নবী হবেন।
(সীরাতে মুগলতাঈ : ১১)

খাদিজা রাযি. এর সঙ্গে নবীজির বিবাহ

হযরত খাদিজা রাযি. একজন বুদ্ধিমতি ও বিচক্ষণ মহিলা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যক্তিত্ব ও বিস্ময়কর চরিত্র দেখে তার প্রতি খাদিজা রাযি. এর অন্তরে পরম ভক্তি ও অকৃত্রিম ভালবাসা সৃষ্টি হয়ে গেল। ফলে খাদিজা রাযি. নিজেই ইচ্ছা করলেন, নবীজি রাজি হলে তাঁর সঙ্গে তিনি বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বয়স যখন একুশ বছর তখন খাদিজার সঙ্গে তাঁর বিবাহ ঠিক হল। খাদিজা রাযি.-এর বয়স তখন চল্লিশ বছর। কোন কোন বর্ণনা মতে পঁয়তাল্লিশ বছর। ওই সময়ের বয়স সম্পর্কে বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে, তা হলো, ২১, ২৯, ৩০, ৩৭। (সীরাতে মুগলতাঈ : ১৪)

নবীজির বিবাহ সময়ের বয়স সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। তবে অনেকের মতে ২৫ বছর। বিবাহের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বয়স পঁচিশ ছিল বলে বিভিন্ন জীবনীগ্রন্থে পাওয়া যায়। (সীরাতে মুস্তফা)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ বিবাহে আবু তালেব ও বনু হাশিম এবং মুযার গোত্রের সমস্ত নেতৃবর্গ সমবেত হন। আবু তালেব বিবাহের খুতবা পাঠ করেন। খুতবায় আবু তালেব নবীজি সম্পর্কে যেসব শব্দ ব্যবহার করেন তা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। যার অর্থ নিম্নরূপ :

"ইনি মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ। ধন-সম্পদে গরীব হলেও উন্নত চরিত্র ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে যার সঙ্গেই তুলনা করা হবে, তার থেকেই তিনি উন্নত বলে প্রমাণিত হবেন। কারণ, সম্পদ বিলীয়মান ছায়া মাত্র; যা আজ আছে তো কাল নেই। আপনাদের সর্বজন পরিচিত মুহাম্মদ, খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদকে বিবাহ করতে যাচ্ছেন। তাঁর নগদ বাকি সব মহর পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার। আল্লাহর শপথ! এরপর ইনি বিপুল সম্মানের অধিকারী হবেন"।

নবীজি সম্পর্কে আবু তালেবের এই মন্তব্য সে সময়কার, যখন তাঁর বয়স মাত্র একুশ বছর। বাহ্যত তখনও তিনি নবুয়ত প্রাপ্ত হননি। তা ছাড়া মজার বিষয় হল, আবু তালেব তখন সেই প্রাচীন ধর্ম বিশ্বাসের অনুসারী যা বিলুপ্ত করার জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাব, যার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গোটা জীবন কুরবান। কিন্তু বাস্তবতা এই, সত্য কখনো গোপন করা যায় না। খাদিজার সঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিবাহ সম্পন্ন হবার পর খাদিজা রাযি. ২৪ বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সেবা করার সুযোগ পান। নবুয়ত প্রাপ্তির আগে কিছুকাল, আর পরে কিছুকাল।

নবীজির সন্তান

খাদিজার গর্ভে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ২ জন পুত্রসন্তান ও ৪ জন কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করেন। পুত্র ২ জন হলেন কাসেম ও তাহের রাযি.। তাহের সম্পর্কে বলা হয়, তার নাম ছিল আব্দুল্লাহ। যাদুল মাআদে বর্ণিত আছে, তাঁর আসল নাম আবদুল্লাহ ছিল এবং তাইয়িব ও তাহির– এ দুটি তাঁর উপনাম ছিল।

কন্যা চারজন হলেন– ফাতেমা, যায়নব, রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুম। মেয়েদের মধ্যে যায়নব ছিলেন সবার বড়। উল্লিখিত সব কজনই ছিলেন খাদিজা রাযি. এর গর্ভের। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তৃতীয় পুত্র যার নাম ইবরাহীম, তিনি ছিলেন ক্রীতদাসী মারিয়া কিবতিয়ার গর্ভের। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ৩ পুত্র শৈশবেই মারা যান। তবে কাসেম সম্পর্কে বর্ণনা আছে, তিনি এতটুকু বড় হয়েছিলেন, সাওয়ারীতে আরোহণ করতে পারতেন। কাসেমের নামেই নবীজি আবুল কাসেম উপনামে প্রসিদ্ধ। (মুগলতাঈ)

চার কন্যা

উম্মতের সর্বসম্মত মত অনুসারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ৪ কন্যার মধ্যে ফাতেমা ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠা। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন, ফাতেমা জান্নাতী নারীদের নেত্রী হবে। পনের বছর পাঁচ মাস পনের দিন বয়সে হযরত আলি রাযি. এর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। বিবাহে মহর ছিল ৪৮০ দিরহাম। যা প্রায় ১৫০ তোলা রূপার সমান। রমণীকূল শিরোমনি ফাতেমার বিবাহের উপঢৌকন ছিল একটি চাদর, একটি বালিশ, যাতে খেজুর গাছের ছাল ভরা ছিল। একটি চামড়ার গদি, একটি দড়ির চৌকি, চামড়ার তৈরি একটি পানির পাত্র, দুটি মাটির কলস, দুটি মশক এবং একটি আটার। (তাবাকাতে ইবনে সাদ)

চাক্কীতে আটা পেষণসহ ঘরের যাবতীয় কাজ ফাতেমা রাযি. নিজ হাতেই করতেন। এ হলো উভয় জগতের সরদার নবীজির সবচেয়ে আদরের কন্যার বিবাহ এবং তার উপঢৌকন আর মহর। এই হলো তাঁর দারিদ্রপীড়িত জীবনের বাস্তব চিত্র। এরপরও কি সেসব মহিলার চোখে এতটুকু লজ্জাও আসে না, যারা বিবাহ সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিকতায় নিজেদের দীন-ধর্ম সব কিছুই খোয়াচ্ছেন?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পুত্র সন্তানদের কেউই জীবিত না থাকার পেছনে আল্লাহ পাকের বিশেষ হেকমত নিহিত আছে। কেবল কন্যা সন্তানদের দ্বারা দুনিয়াতে তাঁর বংশধারা টিকে আছে। আবার মেয়েদের মধ্যেও হযরত ফাতেমা রাযি. এর সন্তানরাই বেঁচে ছিলেন। অন্যান্য মেয়েদের কারো সন্তানই হয় নি। আবার কারো সন্তান জন্মাবার পর শৈশবেই মারা যায়।

হযরত যয়নব রাযি.-এর বিবাহ হয় আবুল আস ইবনে রবী রাযি. এর সঙ্গে। তাঁর একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে অল্প বয়সেই মারা যায়। একটি কন্যা সন্তানও জন্মলাভ করে। তার নাম ছিল উমামা। হযরত ফাতেমা রাযি.-এর ইনতেকালের পর হযরত

আলি রাযি. যয়নব রাযি. এর কন্যা উমামাকে বিয়ে করেন। কিন্তু তার গর্ভে হযরত আলি রাযি. এর কোনো সন্তান জন্মলাভ করেনি।

রুকাইয়া রাযি.-কে বিবাহ করেন হযরত উসমান রাযি.। হাবশা হিজরতের সময় তিনি স্বামী উসমান রাযি.-এর সঙ্গে ছিলেন। দ্বিতীয় হিজরিতে বদর যুদ্ধ থেকে ফেরার সময় নিঃসন্তান অবস্থায়ই তিনি ইনতেকাল করেন। এরপর তৃতীয় হিজরীতে তাঁর অপর এক বোন উম্মে কুলসুমকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উসমান রাযি.-এর সঙ্গে বিবাহ দেন। আর এ কারণেই হযরত উসমান রাযি. যুননূরাইন উপাধিতে ভূষিত হন। নবম হিজরিতে তিনিও ইহজগত ত্যাগ করেন। তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, আমার যদি আরো কোনো মেয়ে থাকত তাহলে তাকেও উসমানের সঙ্গে বিবাহ দিতাম। (সীরাতে মুগলতাঈ : ১৬-১৭)

নারী সমাজের জন্য স্মরণীয় বিষয়

সীরাতের বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে আছে, একদা হযরত রুকাইয়া রাযি. হযরত উসমান রাযি.-এর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট নালিশ করতে আসেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, "স্ত্রী স্বামীর নামে অভিযোগ করবে, এটা আমি পছন্দ করি না। ওঠ, ঘরে যাও"। এ-ই হলো, মেয়েদের জন্য শিক্ষা, যা তাদের দুনিয়া ও আখিরাত দু-ই ঠিক করে দিতে পারে। (আওজাযুস সিয়ার)

অন্যান্য বিবিগণ

খাদিজা রাযি.-এর জীবদ্দশায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য কোনো বিবাহ করেননি। হিজরতের তিন বছর আগে যখন খাদিজা রাযি. ইনতেকাল করেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বয়স ৪৯ বছরে উপনীত হয়, তখন আরো কয়েকজন মহিলা তাঁর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁরা হলেন :

(১) হযরত সাওদা বিনতে যামআ রাযি. (২) হযরত আয়েশা রাযি. (৩) হযরত হাফসা রাযি. (৪) হযরত যয়নব বিনতে খোযায়মা রাযি. (৫) হযরত উম্মে সালামা রাযি. (৬) হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ রাযি. (৭) হযরত জুওয়াইরিয়া রাযি. (৮) হযরত উম্মে হাবিবা রাযি. (৯) হযরত সাফিয়া রাযি. (১০) হযরত মায়মুনা রাযি.।

হযরত খাদিজা রাযি. সহ মোট ১১ জন মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। এর মধ্যে দুজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় মারা যান। বাকি নজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের সময়ও জীবিত ছিলেন। সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মোতাবেক এই বহু বিবাহ কেবল নবীজির বৈশিষ্ট্য ছিল। উম্মতের জন্য একত্রে ৪ জনের বেশি স্ত্রী রাখা বৈধ নয়। নবীজির জন্য চারের অধিক স্ত্রী গ্রহণ বৈধ হওয়ার তাৎপর্য পরে আলোচিত হবে।

হযরত সাওদা রাযি.

তিনি প্রথমে সাকরান ইবনে আমরের স্ত্রী ছিলেন। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি.

তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-এর কন্যা। ছয় বছর বয়সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। হিজরতের সময় ৯ বছর বয়সে নবীজির ঘরে আসেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের সময় তাঁর বয়স ছিল ১৮ বছর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে হযরত আয়েশা রাযি.-এর এ ৯ বছরের সাহচর্য তাঁর ওপর কেমন প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং কি তাঁর অর্জিত হয়েছিল, তা এ থেকে বুঝা যায়, বড় বড় সাহাবীগণ বলতেন, কোনো বিষয়ে আমাদের সন্দেহ হলে আমরা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি.-এর নিকট গিয়ে তা জানতে পারতাম। এ সুবাদেই বিখ্যাত সাহাবীগণ হযরত আয়েশা রাযি.-এর শিষ্য।

হযরত হাফসা রাযি.

হযরত ওমর রাযি.-এর কন্যা। প্রথমে উনায়েস ইবনে হুযাইফার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। অতঃপর হিজরতের দ্বিতীয় বা তৃতীয় বছরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। (সীরাতে মুগলতাঈ : ৪৮)

হযরত যয়নব বিনতে খোযাইমা হেলালিয়া রাযি.

হযরত যয়নব বিনতে খোযায়মা হেলালিয়া রাযি. উম্মুল মাসাকিন নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। প্রথমে তোফায়েল ইবনে হারিসের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তোফায়েল তালাক দিলে দ্বিতীয় পর্যায়ে তোফায়েলের ভাই উবায়দার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। এ স্বামী শাহাদাতবরণ করলে ওহুদ যুদ্ধের একমাস আগে তৃতীয় হিজরীতে নবীজি তাকে বিবাহ করেন। তিনি মাত্র দু মাস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘর সংসার করে মৃত্যুবরণ করেন। (নাশরুত্তীব, সীরাতে মুগলতাঈ)

হযরত উম্মে হাবীবা রাযি.

হযরত আবু সুফিয়ান রাযি.-এর কন্যা। প্রথম স্বামী ওবাইদুল্লাহ ইবনে জাহাশ। ওবাইদুল্লাহ ইবনে জাহশের ঔরসে তাঁর কয়েকটি সন্তানও জন্মগ্রহণ করেছিল। স্বামী-স্ত্রী দুজন ইসলাম গ্রহণ করে হাবশায় হিজরত করেছিলেন। হাবশা গিয়ে ওবায়দুল্লাহ খ্রিস্টান হয়ে যায়; কিন্তু উম্মে হাবীবা ইসলামের উপর দৃঢ় থাকেন। এ খবর শুনে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাবশার বাদশা নাজ্জাশীর কাছে পত্র লিখলেন– তাঁর পক্ষ থেকে উম্মে হাবীবার কাছে বিবাহের প্রস্তাব দিতে। নাজ্জাশী তার কাছে বিবাহের প্রস্তাব দেন এবং নিজেই এ বিবাহের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এবং নাজ্জাশী নিজেই বিবাহের চারশ দীনার মহর পরিশোধ করে দেন।

উম্মে সালামা রাযি.

আসল নাম হিন্দা। প্রথমে আবু সালামার স্ত্রী ছিলেন। এ ঘরে তার কয়েকটি সন্তান জন্মেছিল। চতুর্থ হিজরীর জুমাদাস সানীতে মতান্তরে তৃতীয় হিজরীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। বলা হয়, হযরত উম্মে সালামা রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীগণের মধ্যে সকলের পরে মৃত্যুবরণ করেন।

হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ রাযি.

হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ফুফাতো বোন। প্রথমে তাকে তিনি পালক পুত্র যায়েদ ইবনে হারেসার সঙ্গে বিবাহ দিতে ইচ্ছা করেন। যায়েদ ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গোলাম। পরে আযাদ করে তাকে পোষ্য পুত্রের মর্যাদা দিয়েছিলেন। কিন্তু এক সময় গোলাম হিসেবে পরিচিত ছিলেন বলে যয়নব তাকে পছন্দ করতে পারছিলেন না। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশ পালনার্থে এ বিবাহে তিনি সম্মতি দেন। তিনি প্রায় এক বছর যায়েদের ঘর করেন। কিন্তু মনের মিল না থাকার কারণে দুজনের মধ্যে সর্বদা মনোমালিন্য লেগেই থাকত। এক সময় যায়েদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে এসে যয়নবকে তালাক দেবেন বলে মতপোষণ করেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বুঝিয়ে তালাক দেওয়া থেকে বিরত রাখেন। কিন্তু তারপরও মনের মিল না হওয়ায় যায়েদ রাযি. বাধ্য হয়ে যয়নব রাযি. কে তালাক প্রদান করেন।

এবার সান্ত্বনা ও মনের প্রশান্তির উদ্দেশ্যে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই তাকে বিবাহ করতে মনস্থ করলেন। কিন্তু আরব সমাজে সে সময়ে পালক পুত্রকে ঔরসজাত সন্তানেরই সমতুল্য মনে করা হত। এজন্য সমালোচনার আশঙ্কায় নবীজি পালক পুত্র যায়েদের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যয়নবকে বিবাহ করা থেকে বিরত থাকেন; কিন্তু যেহেতু এটি জাহেলিয়াতের কুসংস্কার ছাড়া কিছুই ছিল না, তাই আয়াত নাযিল হল– "আপনি মানুষকে ভয় করছেন, অথচ আল্লাহকেই আপনার সর্বাধিক ভয় করা উচিত।" (সূরা আহযাব)

অবশেষে চতুর্থ হিজরীতে মতান্তরে তৃতীয় হিজরীতে আল্লাহ পাকের আদেশে নবীজি যয়নব রাযি. কে বিবাহ করেন। যাতে মানুষ এ কথা বুঝতে পারে, পালক পুত্র আর ঔরসজাত পুত্র সমান নয়। বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেলে পালক পুত্রের স্ত্রীকে বিবাহ করতে কোন অসুবিধে নেই। যারা আল্লাহ পাকের এ হালালকে বিশ্বাসে বা কার্যক্ষেত্রে হারাম মনে করে তারা যেন ভ্রান্তির বেড়াজাল থেকে বের হয়ে আসে এবং অন্ধকার যুগের এ কুসংস্কার যেন সমূলে উৎপাটিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিজে আমল করে দেখানোর মাধ্যমেই এ কুসংস্কার নির্মূল করা সম্ভব ছিল।

হযরত যয়নব রাযি.-এর বিবাহ সম্পর্কে যা কিছু লেখা হয়েছে, তার সবই বিশুদ্ধ হাদীস থেকে নেওয়া। বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে আল্লামা ইবনে হাজার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। (ফতহুল বারী, সূরা আহযাবের তাফসির)

এছাড়া এতদসংক্রান্ত যে সব অলীক কল্পকাহিনি প্রচারিত হয়েছে, তা সবই মুনাফিক কাফেরদের অপপ্রচার মাত্র। কোনো কোনো মুসলিম ঐতিহাসিকও বিচার-বিবেচনা ছাড়াই সেসব বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। তাই পাঠক মহলের এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

হযরত সাফিয়া বিনতে হুওয়াই রাযি.

হযরত সাফিয়া বিনতে হুওয়াই রাযি. হযরত হারুন আলাইহিস সালাম-এর বংশধর। একমাত্র হযরত সাফিয়ারই বৈশিষ্ট্য, তিনি এক নবীর কন্যা এবং অপর এক নবীর স্ত্রী। প্রথমে কিনানা ইবনে আবুল হাকীমের স্ত্রী ছিলেন। কিনানা নিহত হওয়ার পর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বিবাহ করেন।

হযরত জুওয়াইরিয়া বিনতে হারেছ রাযি.

তিনি বনু মুস্তালিকের নেতা হারেসের কন্যা। যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দী হয়ে মুসলমানদের হাতে এসেছিলেন। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বিবাহ করেন। এ বিবাহের বদৌলতে তার গোত্রের সকল বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং তাঁর পিতা ইসলাম গ্রহণ করেন।

হযরত মাইমুনা বিনতে হারেস হেলালিয়াহ রাযি.

হযরত মাইমুনা বিনতে হারেছ হেলালিয়াহ রাযি. প্রথমে মাসউদ ইবনে ওমর রাযি. এর স্ত্রী ছিলেন। মাসউদ ইবনে ওমর তালাক দেওয়ার পর আবু রহম -এর সঙ্গে তার দ্বিতীয় বিবাহ হয়। আবু রহমের মৃত্যুর পর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বিবাহ করেন। (সীরাতে মুগলতাঈ : ৬৬)

হযরত মাইমুনা রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সর্বশেষ স্ত্রী। তাঁর পরে নবীজি আর কোনো বিবাহ করেন নি। উল্লিখিত স্ত্রীগণ ছাড়া আরো কয়েক জন মহিলার সঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিবাহ হয়েছিল। কিন্তু তাদের কেউই নবীর ঘর করার সুযোগ পাননি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘরে আসার আগেই একেকজন একেক কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। সীরাতের বড় বড় কিতাবে এর বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

বহু বিবাহ সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা

একজন পুরুষের একাধিক স্ত্রী রাখার প্রচলন ইসলামের আগে প্রায় সকল ধর্মে বৈধ মনে করা হত। আরব, ভারতবর্ষ, ইরান, মিসর, গ্রীস, ব্যাবিলন ও অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশের প্রতিটি সম্প্রদায়ে বহু বিবাহের প্রথা চালু ছিল। এর স্বাভাবিক প্রয়োজনীয়তা আজও কেউ অস্বীকার করতে পারছে না। সাম্প্রতিককালে ইউরোপ তাদের পূর্বসূরীদের

বিপরীতে বহু বিবাহকে অবৈধ করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। অবশেষে প্রকৃতির বিধানই বিজয়ী হয়েছে। আর এখন এর প্রসার ঘটানোর চেষ্টা চলছে। প্রখ্যাত খ্রিস্টান পণ্ডিত ডেভিন পোর্ট বহু বিবাহের সমর্থনে ইঞ্জিলের বেশ কিছু অংশ উদ্ধৃত করে লিখেছেন :

ইনযিলের এসব আয়াত দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়, একাধিক বিবাহ কেবল পছন্দনীয়ই নয়; আল্লাহ পাক এতে বিশেষ বরকতও নিহিত রেখেছেন। [এভাবে পাদ্রী ফেকস, জন মিলটন এবং আইজাক টেলরসহ আরো অনেকের উক্তি তুলে ধরেছেন।

(জন ডেভিন পোর্ট রচিত 'লাইফ' : ১৫৮)

তবে দেখার বিষয় হল এই, ইসলামের পূর্বে বহু বিবাহের কোনো সীমারেখা ছিল না। একেক জন লোক হাজার হাজার স্ত্রীও রাখত। [বর্তমান বাইবেলের দ্বারা এটা প্রতীয়মান হয়, হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম-এর ৭ শ স্ত্রী এবং ৩ শ হেরেম ছিল। (প্রথম সালাতীন ১১/৩)। হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম-এর ৯৯ স্ত্রী, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর ৩ স্ত্রী, হযরত মুসা আলাইহিস সালাম-এর ৪ স্ত্রী ছিল। (বাইবেল, পয়দাদেশ অধ্যায়, ২৯-৩০)

খ্রিস্টান পাদ্রীগণ তো বরাবরই বহু বিবাহে অভ্যস্থ ছিল। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত জার্মানিতে রীতিমত বহু বিবাহের ব্যাপক প্রচলন ছিল। কনষ্টান্টিনোপলের রাজা এবং তার সঙ্গী-সাথীদের একেক জনের অসংখ্য স্ত্রী ছিল। অনুরূপভাবে বৈদিক আচারে বহু বিবাহ অনুমোদন করতো। এ বিধানে একত্রে দশজন, তেরজন ও সাতাশজন স্ত্রী রাখার অনুমোদন পাওয়া যায়। [মনুজী (মানচী), যাকে হিন্দু আর্যদের মধ্যে সর্বস্বীকৃত বুযুর্গ ও নেতা মান্য করা হয়, ধর্মশাস্ত্রে লিখেছেন, "যদি এক ব্যক্তির চার পাঁচজন স্ত্রী হয় এবং তাদের মধ্যে একজন গর্ভবতী হয়, তাহলে অন্যদেরকেও গর্ভবতী বলা হয়।" (মনু অধ্যায় ৯, শ্লোক ১৮৩; রিসালায়ে তেদাদে আযওয়াজ, অমৃতসর হিন্দুদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত দেবতা শ্রীকৃষ্ণের হাজার হাজার স্ত্রী ছিল।]

ইসলামের পূর্বযুগে লাগামহীনভাবে বহু বিবাহের প্রচলন ছিল। বিভিন্ন ধর্ম ও দেশের ইতিহাস থেকে যতটুকু জানা যায়, তাতে সুস্পষ্টভাবে একথা প্রমাণিত হয়, ইহুদি, খ্রিস্টান, হিন্দু, আর্য, পারসিক, প্রভৃতি কোনো ধর্ম বা কোনো বিধানই এ ব্যাপারে সীমারেখা নির্ধারণ করে দেয় নি।

ইসলামের প্রথম দিকেও এ প্রথা ঠিক পূর্বের ন্যায় প্রচলিত ছিল। প্রথম দিকে কোনো কোনো সাহাবীর ঘরে চারের অধিক স্ত্রীও ছিল। হযরত খাদিজা রাযি.-এর ইনতেকালের পর বিশেষ বিশেষ ইসলামি প্রয়োজনে একে একে ১০ জন স্ত্রী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিবাহ বন্ধনে একত্র হয়ে যান।

অতঃপর দেখা গেল, বহু বিবাহের কারণে মহিলাদের অধিকার ক্ষুণ্ন হতে শুরু হয়েছে। প্রথম তো মানুষ মোহে পড়ে একাধিক বিবাহ করে বসে। কিন্তু পরে তাদের

হক আদায় করতে পারে না। তাই পবিত্র কুরআনের চিরন্তন বিধান দুনিয়া থেকে জুলুম-নির্যাতন উৎখাত করার জন্য যার আবির্ভাব; মানুষের স্বাভাবিক প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে বহু বিবাহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেনি বটে, তবে সুনির্দিষ্ট সীমারেখা টেনে দিয়ে এর অপকারিতার সংশোধন করে দিয়েছে। তাই পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে-

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

এ আয়াতের ব্যাখ্যা হচ্ছে এ শর্তে একত্রে চার বিবাহ করা জায়েয, যে সমভাবে সকল স্ত্রীর হক আদায় করার ক্ষমতা থাকতে হবে। এতটুকু হিম্মত না থাকলে একের বেশি বিবাহ করা অন্যায়। এ বিধান নাযিল হওয়ার পর উম্মতের পক্ষে চারের অধিক স্ত্রী রাখাও হারাম হয়ে গিয়েছে।

যেসব সাহাবার ঘরে চারের অধিক স্ত্রী ছিল তাঁরা চারজন রেখে বাকিদের তালাক দিয়ে দেন। হাদীসে আছে, হযরত গায়লান রাযি. যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তাঁর ১০ জন স্ত্রী ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আদেশ করলেন, তোমার স্ত্রীদের মধ্য থেকে চারজন রেখে বাকিদের তালাক দিয়ে দাও।

এভাবে নওফল ইবনে মুআবিয়া রাযি. ইসলাম গ্রহণের সময় ৫ স্ত্রীর স্বামী ছিলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে একজন তালাক দিয়ে দেওয়ার আদেশ করলেন। আদেশ মোতাবেক একজনকে তিনি তালাক দিয়ে দেন।

(তাফসিরে কাবির : ২/৩৭)

উল্লিখিত সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরও চারের অধিক স্ত্রী না থাকারই কথা ছিল। কিন্তু সাথে সাথে এটাও বাস্তব সত্য, উম্মাহাতুল মুমিনীন তথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীগণ অন্যসব মহিলাদের মত নন। স্বয়ং পবিত্র কুরআনের ঘোষণা :

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ

"হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা আর সকল মহিলাদের মত নও"।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীগণ সমগ্র উম্মতের মা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবর্তমানে তারা উম্মতের কারো স্ত্রী হতে পারেন না। এখন সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী যদি চারজন ছাড়া বাকিদের তালাক দিয়ে দেওয়া হত, তা হত তাদের প্রতি চরম জুলুম। গোটা জীবন তাদের অসহায় অবস্থায় কাটাতে হতো। রাহমাতুল্লিল আলামিন-এর ক্ষণকালের সাহচর্য্য তাদের জন্য আযাবের কারণ হয়ে দাঁড়াত। কারণ, এতে একদিকে তাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হতে হত, অপরদিকে অন্য স্বামী গ্রহণ করতে না পারায় তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠত।

এ কারণে নবীপত্নীদের এ আইনের আওতায় আসা মোটেই সমীচীন ছিল না। বিশেষ করে যাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ জন্য বিয়ে করেছিলেন, তাদের স্বামীগণ জিহাদ করতে গিয়ে শাহাদাত বরণ করেছেন এবং তারা অসহায় হয়ে পড়েছেন, তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার তো প্রশ্নই ছিল না। নিছক আশ্রয় দানের জন্য নবীজি যাদের বিবাহ করলেন, তালাক দিয়ে দিলে তাদের কি করুণ দশা হত, তা সহজেই অনুমেয়। এসব কারণে শরিয়তের বিধান মোতাবেক চারের অধিক স্ত্রী রাখা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বৈশিষ্ট্য বলে প্রমাণিত হয়। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পারিবারিক জীবনের সার্বিক অবস্থা; যা উম্মতের জীবনের জন্য আদর্শ তা আমাদের পর্যন্ত পৌঁছানো কেবল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীগণের মাধ্যমেই সম্ভব। আর এটি এমনই একটি মিশন যা আঞ্জাম দেওয়ার জন্য নয় জন মহিলাও যথেষ্ট নয়। এরপরও কি কেউ এ কথা বলতে পারে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চারের অধিক বিবাহ করার মূলে (মাআযাল্লাহ) কোনো রকম জৈবিক লালসা কাজ করেছিল? এখানে আরো একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হল এই, যে সময়ে আরব-অনারবসহ সমগ্র বিশ্ব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধাচারণের জন্য ছিল এক পায়ে খাড়া, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার পরিকল্পনা আঁটা হয়েছিল, নানা রকম দুর্নাম ও অপবাদ ছড়ানো হচ্ছিল, পাগল বলা হল, মিথ্যাবাদী আখ্যা দেওয়া হল। মোটকথা, তখনকার ইসলাম বিরোধিরা নবুয়ত সূর্যের গায়ে কাদা নিক্ষেপ করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে অবশেষে নিজেরাই মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। সব কিছুই তারা করল, কিন্তু কোনো কাফের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যাপারে যৌন লালসা বা নারী সম্পর্কিত অভিযোগ তুলেছে কি? না তোলেনি। এ ব্যাপারে মিথ্যা রটানোর দুর্বল কোনো ভিত্তি তাদের কাছে ছিল না। কারও নামে কলঙ্ক লেপনের জন্য এর চেয়ে বড় হাতিয়ার আর কী হতে পারে? আঙ্গুল রাখার সামান্য একটু ফাঁক যদি থাকত, তা হলে আরবের কাফিররা তাতে সামান্যও অবহেলা কি করত? কিন্তু ওরা এত নির্বোধ ছিল না, চাক্ষুস সত্যকে অস্বীকার করে নিজেদের বিশ্বসযোগ্যতা হারাতে দেবে।

কেননা তাকওয়ার মূর্তপ্রতীক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র জীবন তাদের চোখের সামনে ছিল। তারা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যৌবনের বৃহৎ অংশ কেটেছে একাকীত্ব ও নির্জনতার মধ্যে। পঁচিশ বছর বয়সে হযরত খাদিজা রাযি.-এর পক্ষ থেকে বিবাহের প্রস্তাব পান। খাদিজা ছিলেন বিধবা, কয়েক সন্তানের জননী, চল্লিশ বছর অতিক্রম করে বার্ধক্যে উপনীত। ইতিপূর্বে দুস্বামীর ঘর করে এসেছেন তিনি। নবীজী তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন না। বিবাহ করলেন খাদিজাকে। পরে বাকী জীবনের বৃহৎ অংশ তিনি খাদিজাকে নিয়েই অতিবাহিত করেন। আবার এ সময়েও স্ত্রীকে নিয়ে ঘরে বসে থাকেন নি। খাদিজাকে ঘরে রেখে হেরা পর্বতের নির্জন এক গুহায় মাসের পর মাস

আল্লাহর ইবাদতে নিমগ্ন থাকতেন। জীবনের বৃহৎ অংশ এই খাদিজাকে নিয়ে কাটানোর ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সব কজন সন্তান খাদিজার গর্ভেই জন্ম লাভ করেছিলেন।

হযরত খাদিজা রাযি.-এর ওফাতের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বয়স যখন পঞ্চাশ ছাড়িয়ে গিয়েছিল, ঠিক তখন একের পর এক বাকি বিবাহগুলো সম্পন্ন করেন। বিশেষ বিশেষ শরয়ি প্রয়োজনে একে একে দশটি বিবাহ করেন। আয়েশা রাযি. ছাড়া যাদের বিবাহ করেছেন তারা সকলেই ছিলেন বিধবা। কারো কারো সন্তানও ছিল। এই সব পরিস্থিতির উপর চোখ ফেরালে আমি ধারণাই করতে পারি না, কোনো সুস্থ বিবেকসম্পন্ন মানুষ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই বহু বিবাহকে কোনোরকম প্রবৃত্তি চরিতার্থের পরিণাম বলতে পারে। টেরা চোখওয়ালা কেউ যদি নবুয়ত সূর্যের জ্যোতি মাহাত্ম্যকে দেখতে নাও পায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চরিত্র আমল, তাকওয়া-তাহারাত, অনুশীলন সাধনা ও পবিত্র জীবনের খুঁটি-নাটি যাবতীয় বিষয় দেখেও না দেখার ভান করে। তবু এই একাধিক বিবাহের ঘটনাবলিই তাকে একথা বলতে বাধ্য করবে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ বহু বিবাহ কোনো জৈবিক লালসার ওপর ভিত্তি করে সংঘটিত হয়নি। অন্যথায় গোটা যৌবন একজন বৃদ্ধার সঙ্গে অতিবাহিত করে পঞ্চাশের পরবর্তী বয়সকে এ কাজের জন্য মনোনিত করার কথা সুস্থ বিবেকসম্পন্ন মানুষ স্বীকার করতে পারে না। বিশেষত আরবের কাফের এবং কুরাইশ নেতৃবর্গ যে কোনো মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর পছন্দমত সুন্দরী নারী উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিল। সীরাত ও ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহ এর সাক্ষ্য বহন করে।

তাছাড়া মুসলমানদের সংখ্যাও তখন লাখের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। যে কোনো মুসলিম নারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াকে উভয় জগতের সাফল্য বলে মনে করত। এতদসত্ত্বেও পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি এক খাদিজাকে নিয়ে জীবন কাটালেন কেন? তার পরেও যাদেরকে বিবাহ করলেন, একজন ছাড়া তাদের সকলেই ছিলেন বিধবা। কারো কারো সন্তানও ছিল। এই বয়স পর্যন্ত উম্মতের একজন কুমারী মেয়েকেও তিনি বিবাহ করলেন না। এখানে এর চেয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। অন্যথায় দেখিয়ে দেওয়া যেত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই বহু বিবাহ কিরূপ ইসলামি ও শরয়ি প্রয়োজনের উপর নির্ভরশীল ছিল। বস্তুতঃ নবী- সহধর্মিণীগণ না হতেন তবে ইসলামের এমন বহু বিধিবিধান যা নারীদেরই মাধ্যমে উম্মতের কাছে পৌঁছার ছিল-তা অজ্ঞাতই থেকে যেত।

[আলহামদুলিল্লাহ! হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলি থানবি রহ. এ প্রয়োজনীয়তা এভাবে পূর্ণ করেছেন, পারিবারিক জীবন সম্পর্কে আযওয়াজে

মুতাহহারাতের মাধ্যমে যে সমস্ত হাদিস বর্ণিত হয়েছে, তা একটি সংকলনে একত্র করেছেন ওই সংকলনের নাম تعدالازواج لصاحب المعراج।

মোটকথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বহু বিবাহকে জৈবিক লালসা নির্ভর আখ্যা দেওয়া যার পর নাই নির্লজ্জতা ও সত্যের অপলাপমাত্র। অন্যায় প্রীতি যদি বিবেক-বুদ্ধিকে অন্ধ করে না থাকে তাহলে কোনো কট্টর কাফেরও এ ধরনের কথা মুখ দিয়ে বের করতে পারে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৯ জন স্ত্রী রেখে ইনতেকাল করেন। এই নয় জনের মধ্যে সর্ব প্রথম হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ রাযি. ইনতেকাল করেন। আর সর্বশেষ ইনতেকাল হয় হযরত উম্মে সালামা রাযি. এর।

চাচা ও ফুফুগণ

আবদুল মুত্তালিবের ১০ জন পুত্র ছিল। যথা-(১) হারিস (২) যুবায়ের (৩) হাজল (৪) দিরার (৫) মুকাওয়াম (৬) আবু লাহাব (৭) আব্বাস (৮) হামযা (৯) আবু তালেব (১০) আবদুল্লাহ। এর মধ্যে আবদুল্লাহ হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পিতা। বাকি নয় জন চাচা। হযরত আব্বাস রাযি. ছিলেন ভাইদের মধ্যে সকলের ছোট। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ফুফু ছিলেন ছয় জন। যথা- (১) উমাইমা (২) উম্মে হাকীম (৩) বাররা (৪) আতেকা (৫) সাফিয়া (৬) আরওয়া।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পাহারাদারগণ

(১) হযরত সাদ ইবনে মুআয রাযি.। তিনি বদর যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাহারা দিয়েছিলেন। (২) যাকওয়ান ইবনে আবদে কায়েস রাযি. (৩) মুহম্মাদ ইবনে সালামা আনসারী রাযি.। এ দুজন ওহুদ যুদ্ধে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাহারা দিয়েছিলেন (৪) যুবায়র রাযি. খন্দকের যুদ্ধে (৫) আসাদ ইবনে বশীর রাযি. (৬) সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাযি. (৭) আবু আইয়ুব আনসারী রাযি. এবং (৮) বেলাল রাযি. ওয়াদিউল কুরায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাহারা দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে এ আয়াত নাযিল হলে এ পাহারাদারীর ব্যবস্থা তুলে নেওয়া হয়।

وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

অর্থ : আল্লাহই আপনাকে লোকদের থেকে রক্ষা করবেন।

কাবা নির্মাণ এবং আল আমিন স্বীকৃতি দান

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বয়স যখন পঁয়ত্রিশ, তখন কুরাইশরা কাবাগৃহ পুনঃর্নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আল্লাহর ঘর নির্মাণ করাকে তারা প্রত্যেকেই নিজের জন্য সৌভাগ্যের বিষয় মনে করত। কুরাইশ গোত্রসমূহ বায়তুল্লাহ নির্মাণে কে কতটুকু অংশ নিতে পারে, তার উপর নিজেদের ভাগ্যের ফায়সালা করে রেখেছিল। এক সময় বিবাদ এড়ানোর জন্য এই নির্মাণকার্য গোত্রগুলোর মাঝে বণ্টন করে দেওয়ার

সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। এ কর্ম-বন্টন পদ্ধতিতে হাজরে আসওয়াদ স্থাপন ছাড়া কাবা নির্মাণের বাদ-বাকি কাজ সম্পন্ন হল। কিন্তু নির্মাণের এ পর্যায়ে এসে হাজারে আসওয়াদ উঠিয়ে এর নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করার ব্যাপারে গোত্রগুলোর মাঝে চরম মতানৈক্য দেখা দিল। প্রত্যেক গোত্র এমনকি প্রত্যেক ব্যক্তির প্রাণের দাবি হাজরে আসওয়াদ যথাস্থানে স্থাপনের সুযোগ তাকে দিতে হবে। এ নিয়ে বিবাদ এতদূর গড়ালো, প্রত্যেকেই লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ ও অঙ্গীকার ব্যক্ত করতে লাগল। এবার সমাজের কয়েকজন বিচক্ষণ ও চিন্তাশীল ব্যক্তি পরামর্শের মাধ্যমে কোনো মীমাংসায় পৌঁছা যায় কি না তা ভাবতে লাগলেন। কাবাগৃহেই তারা বৈঠকে মিলিত হলেন।

পরামর্শে সিদ্ধান্ত হল, আগামী কাল ভোরে যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম বায়তুল্লায় প্রবেশ করবেন তিনি এ ব্যাপারে মীমাংসা করবেন এবং তার সিদ্ধান্তকে কুদরতী ফায়সালা মনে করে সকলেই মেনে নেবেন।

আল্লাহর কি মহিমা! পরদিন সকালে সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবা ঘরে প্রবেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে সকলেই এক বাক্যে বলে উঠল, এই তো আল-আমিন এসে গেছেন! আমরা তার মীমাংসা মেনে নিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। নবীজি এগিয়ে আসলেন এবং অত্যন্ত বিজ্ঞোচিত মীমাংসা দিলেন, যা এক বাক্যে সকলেই মেনে নিলেন। তিনি প্রথমে একটি চাদর বিছালেন। চাদরে পাথরটি রেখে প্রত্যেক গোত্রের একজন করে প্রতিনিধিকে তার এক এক কোণ ধরতে বললেন। এভাবে পাথরটি ভিত পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হল। এবার নবীজি নিজ হাতে তুলে পাথরটি যথাস্থানে স্থাপন করে দিলেন। এ ঘটনাটি উদ্ধৃত করে ইবনে হিশাম লিখেছেন– নবুয়ত প্রাপ্তির আগে সমগ্র কুরাইশ এক বাক্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল-আমীন বা বিশ্বস্ত বলে সম্বোধন করত।

(সীরাতে ইবনে হিশাম : ১/১০৫)

নবুয়ত লাভ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বয়স যখন ৪০ বছর একদিন পূর্ণ হল, ঠিক সে দিন প্রকাশ্যে নিয়মতান্ত্রিক ভাবে তাঁকে নবুয়তের মর্যাদায় ভূষিত করা হয়। কেননা বাতেনীভাবে তো হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমস্ত আম্বিয়াদের পূর্বে নবুয়ত প্রদান করা হয়েছে। (খাসায়েসে কবুরা)

যে তারিখে নবীজি জন্মলাভ করেন ঠিক সে তারিখে তিনি নবুয়ত প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার। এ ছাড়া ভিন্নমতও পাওয়া যায়।

(সিরাতে মুগলতাঈ : ১৪)

পৃথিবীতে ইসলাম প্রচার

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওপর প্রথম যখন ওহি নাযিল হয়, তখন তিনি প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের জন্য আদিষ্ট ছিলেন না। বরং তাতে শুধু তাঁর

ব্যক্তিগত বিধি-বিধানই ছিল। অতঃপর কিছু দিন অহি আগমন বন্ধ থাকারপর যখন দ্বিতীয় পর্যায়ে পুনরায় তাঁর প্রতি অহি অবতীর্ণ হতে আরম্ভ করল, তখন তাঁকে ইসলাম প্রচারের নির্দেশ দেয়া হল। কিন্ত তখন বিশ্বময় ছিল ধর্মহীনতা ও পথ ভ্রষ্টতার জয় জয়কার করে। বিশেষ করে বাপ দাদার অন্ধঅনুকরণ আরবের লোকদেরকে সত্যের বাণী কানে নেওয়ার অনুমতি দিচ্ছিল না কোনোক্রমেই। এ কারণে আল্লাহ পাকের হেকমতের দাবি এটাই ছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের আদেশ দেওয়া যাবে না। অন্যথায় শুরুতে মানুষ বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠতে পারে। ফলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে নিজের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন ও বিশ্বাসভাজন লোকদের মধ্যে দাওয়াতের কাজ শুরু করেন। এ প্রক্রিয়ায় দাওয়াতের কাজ শুরু করলে সর্বপ্রথম তার নিজের স্ত্রী খাদিজা, হযরত আবু বকর রাযি. চাচাতো ভাই আলি এবং পালকপুত্র যায়েদ রাযি. ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। হযরত আবু বকর রাযি. নবুয়তের পূর্ব থেকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বন্ধু ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সততা ও আখলাক চরিত্র সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাকে নিজের নবুয়ত প্রাপ্তির খবর জানালেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বীকার করে নেন এবং কালিমা শাহাদাৎ পাঠ করে মুসলমান হয়ে যান।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযি. তাঁর সমাজে সর্বজনস্বীকৃত সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। যে কোনো ব্যাপারে মানুষ তার উপর আস্থা রাখত। ইসলাম গ্রহণের পর তিনিও সে সকল লোককে ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করেন, যাদের মধ্যে কিছুটা সততা ও কল্যাণ আছে বলে মনে করতেন। হযরত উসমান, আবদুর রহমান ইবনে আওফ, সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, যুবায়ের ইবনে আওয়াম ও তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রাযি. তাঁর দাওয়াত কবুল করেন এবং তিনি তাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে নিয়ে যান। তারা সকলে ইসলাম গ্রহণ করেন।

হযরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ, উবাইদা ইবনে হারিস ইবনে আব্দিল মুত্তালিব, সাঈদ ইবনে যায়েদ আদাবী, আবু সালামা মাখযুমী, খালেদ ইবনে সাঈদ ইবনে আস, উসমান ইবনে মাযউন ও তার দু ভাই, কুদামা ও উবাইদুল্লাহ ও আরকাম ইবনে আরকাম রাযি. ইসলাম গ্রহণ করেন। এরা সকলেই ছিলেন কুরাইশ গোত্রীয়। কুরাইশদের বাইরে সুহাইব রুমী, আম্মার ইবনে ইয়াসির, আবু যর গিফারী ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. ইসলাম গ্রহণ করেন।

এ দাওয়াতী কার্যক্রম গোপনে গোপনে চলছিল। ইবাদত এবং ইসলামি অনুষ্ঠানাদি ও লুকিয়ে লুকিয়ে আদায় করা হত। এমনকি ছেলে পিতা থেকে পিতা ছেলে থেকে লুকিয়ে নামায আদায় করত। মুসলমানের সংখ্যা ত্রিশ ছাড়িয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য বড় একটি ঘরের ব্যবস্থা করে দেন। এখানে তারা সকলে একত্র হতেন। এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের

তালিম দিতেন। এ পদ্ধতিতে তিন বছর পর্যন্ত দাওয়াতের কাজ চলে। এ তিন বছরে কুরাইশদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক ইসলাম কবুল করেন। পরে আস্তে আস্তে অন্যরা ও ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে। অবশেষে মক্কাবাসীদের মধ্যে এ খবর ছড়িয়ে পড়ে এবং জনসাধারণের মাঝে এর আলোচনা শুরু হতে থাকে। এরপর প্রকাশ্যে ইসলামের কাজ করার সময় এসে যায়।

প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত

৩ বছর পর যখন বিপুল সংখ্যক পুরুষ ও নারী ইসলামে প্রবেশ করতে শুরু করে এবং মানুষের মধ্যে ইসলাম নিয়ে আলোচনা হতে লাগল, তখন আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে মানুষের কাছে সত্যের বাণী পৌঁছানোর হুকুম করলেন। হুকুম পেয়ে রাসুলুল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে তা বাস্তবায়ন করতে শুরু করলেন। মক্কার সাফা পর্বতে উঠে কুরাইশ গোত্র সমূহকে নাম ধরে আহবান করতে লাগলেন।

সকলে সমবেত হলে তিনি প্রথমে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি যদি তোমাদেরকে এই সংবাদ দিই, গোনায়ম গোত্রের শত্রুবাহিনী তোমাদের উপর আক্রমণ করার জন্য ছুটে আসছে এবং এক্ষুণি তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, তাহলে তোমরা আমার এই কথা বিশ্বাস করবে? একথা শুনে সকলেই সমস্বরে বলে উঠল, অবশ্যই আপনার এই খবরকে আমরা সম্পূর্ণ সত্য ও বাস্তব মনে করব। কারণ এ পর্যন্ত কখনো আমরা আপনাকে মিথ্যা বলতে শুনিনি। এবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

আমি তোমাদের খবর দিচ্ছি, তোমরা যদি মিথ্যা ধ্যান-ধারণা আর বাতিল আকিদা-বিশ্বাস ত্যাগ না কর, তাহলে আল্লাহ তাআলার কঠিন শাস্তি তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। অতঃপর তিনি বললেন, আমি যতদূর জানি, দুনিয়াতে আজ পর্যন্ত কেউ আমার এই উপহার অপেক্ষা উত্তম উপহার নিয়ে আসেনি, যা আমি তোমাদের সামনে পেশ করেছি। তোমাদের জন্য আমি দীন ও দুনিয়ার কল্যাণ বহন করে এনেছি। আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে এর প্রতি আহবান করতে আদেশ করেছেন। আল্লাহর কসম! আমি যদি দুনিয়ার অপরাপর মানুষের সাথে মিথ্যা বলতাম, তবু ও তোমাদের সামনে মিথ্যা বলতাম না। দুনিয়ার সকল মানুষকে ধোঁকা দিলেও তোমাদেরকে ধোঁকা দিতাম না। কসম সেই পবিত্র সত্ত্বার, যিনি এক, যার কোনো শরিক নেই, আমি তোমাদের প্রতি বিশেষভাবে এবং সারা বিশ্ববাসীর প্রতি সাধারণভাবে আল্লাহর রাসূল ও সংবাদ বাহক হয়ে আগমন করেছি। (দুরুসুস সীরাত)

সমগ্র আরবের বিরোধিতা ও শত্রুতার মুখে নবীজির দৃঢ়তা

এই দীনি দাওয়াত ও তাবলিগের কাজ এভাবেই চলছিল। আরববাসীরা যখন জানতে পারল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সম্মুখে অহির মাধ্যমে

তাদের মূর্তির স্বরূপ স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে এবং মূর্তি-পূজারীদের মূর্খতার মুখোশ উন্মোচন করে দেওয়া হয়েছে, তখনই তারা তাঁর বিরোধিতার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। তাদের একটি দল চাচা আবু তালিবের নিকট এসে বলল, তিনি যেন মুহাম্মদ-কে এ ধরণের কথা-বার্তা থেকে বিরত রাখেন। নতুবা তিনি যেন তার প্রতি স্বীয় সমর্থন উঠিয়ে নেন।

আবু তালিব এক সুন্দর পন্থায় তাদের প্রস্তাবের উত্তর দিয়ে বিদায় দিলেন। এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্বের ন্যায় সত্যধর্মের প্রচার ও প্রসারে নিজেকে নিয়োজিত রাখলেন এবং মূর্তিপূজা থেকে মানুষকে বাধা দিতে থাকলেন। আরবরা এটা মেনে নিতে পারল না। তাই তারা পুনরায় আবু তালিবের নিকট এসে কঠোরভাবে এই দাবি উত্থাপন করল, হয়তো আপনি স্বীয় ভাতিজাকে তার কাজ থেকে বিরত রাখুন নতুবা আমরা সকলে আপনার বিরুদ্ধে, একপক্ষ নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকব।

সম্মিলিত আরবের মোকাবেলায় মহানবীর জবাব

কাফেরদের কথা শুনে আবু তালিব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তাই এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে আলোচনায় বসলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- হে আমার সম্মানিত চাচা, আল্লাহর শপথ! যদি তারা আমার ডান হাতে সূর্য আর বাম হাতে চন্দ্র এনে দেয় এবং তার বিনিময়ে তারা এটা চায়, আমি আল্লাহর বাণী তাঁরই সৃষ্টিজীবকে পৌঁছানো থেকে বিরত থাকি, তাহলেও আমি এ কাজের জন্য প্রস্তুত নই। আমার এ দাওয়াতের ফলে হয়তো আল্লাহর সত্যধর্মের প্রচার-প্রসার ঘটাবে; আর না হয় আমি এ কাজ করতে করতে আমার জীবন বিসর্জন দিয়ে দিব।

মানুষের মাঝে কুৎসা রটানো এবং তার উল্টো ফল

কুরাইশরা যখন দেখল যে বনি হাশেম ও বনি আবদুল মুত্তালিব তাঁর সাথে রয়েছে। এদিকে হজের মৌসুম সন্নিকটে এ সুযোগে তিনি পূর্ণোদ্যমে দীন-প্রচারের কাজ চালিয়ে যাবেন। আর হুযুরের সত্যবাণীর আকর্ষণ যে চুম্বকের মতো একথাও সকলের জানা ছিল। তাই তাদের বদ্ধমূল ধারণা হল, এ সুযোগে তার ধর্ম তো সারা বিশ্বের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়বে। তাই সকলে সমবেত হয়ে পরামর্শের মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল, মক্কার সকল রাস্তায় নিজেদের লোক বসিয়ে রাখবে এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হজের জন্য আগত সকল মানুষকে দূর থেকেই একথা বলে দিবে, এখানে একজন যাদুকর আছে। সে তার কথার যাদু দ্বারা পিতা-পুত্র ও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দেয়। তোমরা কেউ তার নিকট যেও না। কিন্তু

চراغے راکہ ایزد برفروزد + کسے کش تف زند ریشش بسوزد

আল্লাহ যে শিখায় আগুন দিল তার আলো সদা রবে
যে তারে বিরোধ বুঝে চায় নেভাতে সে-ই পুড়ে ছাই হবে।

যে আলো আল্লাহ তাআলা প্রজ্বলিত করেন, তা নির্বাপিত করার জন্য যে ব্যক্তি চেষ্টা করে, কেবল তার দাঁড়ি জ্বলে যায়। সে নিজেই ধ্বংস হয়ে যায়। আল্লাহর মেহেরবানি! তাদের এ কর্মপদ্ধতি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তাবলিগের পক্ষে কাজ করেছে। যদি তারা এ কাজ না করত তা হলে সম্ভাবনা ছিল, অনেক লোক তাঁর নামই শুনত না, কিন্তু তাদের এই প্রচেষ্টা সকলকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি আরো বেশি আকৃষ্ট করে দিল।

কুরাইশদের নির্যাতনে নবীজির দৃঢ়তা

কুরাইশরা দেখল তাদের সকল প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হল। দিনে দিনে হুযুরের দাওয়াতের কাজ ব্যাপক হয়ে চলেছে এবং দলে দলে লোক ইসলামের দিকে ধাবিত হচ্ছে। তখন তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বপ্রকারের কষ্ট দিতে শুরু করে দিল। মক্কার কিছু উচ্ছৃঙ্খল ও লম্পট লোক সমবেত করে এ কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে দিল, তারা যেন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রত্যেক মজলিসে গিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে এবং সম্ভাব্য সকল প্রকার কষ্ট দিতে ত্রুটি না করে।

নবীজিকে হত্যার চক্রান্ত ও প্রকাশ্য মুজেযা

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবা শরীফের নিকটে নামাযরত ছিলেন। যখন তিনি সিজদায় গেলেন তখন আবু জাহেল এটাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে প্রস্তরাঘাতে হুযুরের মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে উদ্যত হল। কিন্তু প্রবাদ আছে :

دشمن اگر قوی ست نگہبان قوی ترست

জানি শত্রুর আছে শক্তি প্রচুর, এও জানি অধীন যে, সে শক্তি প্রভূর।

যদি দুশমন শক্তিশালী হয়, তো নেগাহবান তার চেয়েও অধিক শক্তিশালী বটে। আবু জাহেল পাথর নিয়ে হুযুরের নিকট পৌঁছলে তার হাতে কম্পন সৃষ্টি হল। হাত থেকে পাথর পড়ে গেল। তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। সে দৌড়ে তার দলের নিকট এসে ঘটনার বিবরণ এভাবে দিল, যখন আমি পাথর হাতে নিয়ে তার মাথার দিকে হাত বাড়াতে ইচ্ছা করলাম তখন দেখলাম একটা বিশালাকৃতির উট মুখ খুলে আমার দিকে ধাবিত হয়ে আমাকে খাওয়ার জন্য উদ্যত হল। এ ধরণের উট আমি আজ পর্যন্ত কোথাও দেখি নি। এ ঘটনা সমবেত কাফিরদের সম্মুখেই সংঘটিত হয় এবং তাদের দলপতি আবু জাহেল তা স্বীকার করে।

আবু জাহেল, উকবা বিন আবী মুয়াইত, আস বিন ওয়ায়েল, আসওয়াদ বিন আবদ ইয়াগূছ, আসওয়াদ বিন আব্দুল মুত্তালিব, ওয়ালিদ বিন মুগীরা, নযর বিন হারেস- এ লোকগুলো সব সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেওয়ার কাজে লেগে থাকত। এদের মধ্য হতে কারো ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য হয় নি। বরং সকলেই চরম বেইজ্জতির সাথে ধ্বংস হয়েছে। কেউ বদরের যুদ্ধে তরবারির শিকার হয়েছে, আবার কেউ অত্যন্ত কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে পঁচে-গলে মরেছে।

সহজ কাসাসুল আম্বিয়া– ৫২/ক

কুরাইশদের লোভনীয় প্রস্তাব

কুরাইশরা দেখল, তাদের এ প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হল তখন তারা সম্মিলিতভাবে পরামর্শ করে সিদ্ধান্তে উপনীত হল, তাদের সর্বাধিক চতুর নেতা উতবা ইবনে রবিয়াকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রেরণ করবে। সে যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পার্থিব লোভ লালসা প্রদর্শন করে। হতে পারে এই প্রচেষ্টা দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় দাবি ছেড়ে দিয়ে নীরব হয়ে যাবেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উতবা ইবনে রবিয়া হুযুরের দরবারে উপস্থিত হল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নামাযরত ছিলেন। কাছে গিয়ে বলল, ভাতিজা! তুমি বংশ মর্যাদার দিক দিয়ে আমাদের সকলের শ্রেষ্ঠ। এতদসত্বেও তুমি স্বীয় দলের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করে দিয়েছ এবং তাদের (উপাস্যদেরকে) মন্দ বলছ, আমাদের বাপ-দাদাদেরকে মূর্খ সাব্যস্ত করে ছেড়েছ। আজ তুমি তোমার অন্তরের কথা আমার নিকট খুলে বল।

এ সমস্ত কার্যকলাপ দ্বারা যদি তোমার উদ্দেশ্য থাকে অগাধ ধন-সম্পদের মালিক হওয়া, তাহলে শুন! আমরা তোমাকে এত পরিমাণ অর্থ-সম্পদ দিতে প্রস্তুত আছি, মক্কার মধ্যে তুমি হবে সর্বশ্রেষ্ঠ বিত্তবান। আর যদি তুমি সর্দারী বা নেতৃত্ব চাও তাও বল। আমরা এতেও সম্মত আছি। সকল কুরাইশ গোত্র তোমার সর্দারী মেনে নেবে এবং তোমার হুকুম অমান্য করার সাধ্য কারো থাকবে না। আর যদি তুমি রাজত্ব চাও তাহলে তোমাকে রাজা বানাতেও আমাদের কোনো আপত্তি নেই। আর যদি তোমার ওপর কোনো খারাপ জিনের কু-প্রভাব পড়ে থাকে এবং তুমি তার সে কথাই (অহি) মানুষদের শুনিয়ে থাক, অথচ তুমি সেই জিন থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম নও, তাহলে ভালো একজন চিকিৎসকের ব্যবস্থা করি, তোমার চিকিৎসা করবে।

(সিরাতে মুগলতাঈ)

উতবা যখন তার দীর্ঘ বক্তব্য শেষ করল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সকল কথার জওয়াবে তাকে শুধুমাত্র কুরআনের একটি সূরা শুনিয়ে দিলেন। যা শুনে উতবা হতভম্ব হয়ে পড়ে। সেখান থেকে ফিরে স্বজাতীয় লোকদের কাছে এসে সে বলল– "খোদার কসম! আজ আমি এমন বাণী শ্রবণ করেছি যা ইতোপূর্বে আর কখনো শুনিনি। খোদার কসম! না কোনো কবিতার আবৃত্তি; আর না কোনো গণকের কথা বা যাদুমন্ত্র। সুতরাং আমার পরামর্শ হল তোমরা তাকে (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাক। কেননা আমি তার মুখ থেকে যেই বাণী শুনেছি, খোদার কসম! অচিরেই তার সম্মান ও সুখ্যাতি প্রকাশ পাবে। আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী। আমার পরামর্শ গ্রহণ কর, আর না হয় অন্ত ত কিছু দিন অপেক্ষা কর। যদি আরবরা তার ওপর বিজয় লাভ করে তাহলে তোমরা বিনা পরিশ্রমেই এই বিপদ থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে। আর যদি আরবদের ওপর তার বিজয় সূচিত হয়, তাহলে তার সম্মান আমাদেরই সম্মান। কেননা সে তো আমাদের বংশেরই লোক।"

কুরাইশরা তাদের সর্বাধিক চতুর সর্দারের বক্তব্য শ্রবণে হতবাক হয়ে গেল এবং এই বলে নিজেদের সান্ত্বনা দিল, এ লোকটির ওপরও মুহাম্মদ-এর যাদু প্রভাব বিস্তার করেছে। (দুরুসুস সীরাত : ১৪)

যখন কুরাইশরা সকল কৌশলে ব্যর্থ হয়ে গেল তখন তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে সঙ্গে হুযুরের সাহাবায়ে কেরাম, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও ঘনিষ্ট আত্মীয়-স্বজনদের ওপরও জুলুম অত্যাচার ও নানা রকম নির্যাতনের হাত প্রসারিত করে দিল। হযরত বেলাল রাযি. প্রমুখ সাহাবাগণকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হল। হযরত আম্মার বিন ইয়াসির রাযি. এর আম্মাজান তেমনি এক নির্যাতনের শিকার হয়ে করুণভাবে শাহাদাৎবরণ করেন। ইসলামের ইতিহাসে এটিই সর্বপ্রথম শাহাদাতের ঘটনা। (সিরাতে মুগলতাঈ : ২১)

সাহাবায়ে কেরামকে আবিসিনিয়া হিজরতের নির্দেশ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত দিন পর্যন্ত নিজে কাফেরদের যাবতীয় জুলুম-নির্যাতন নীরবে সহ্য করেছিলেন। কিন্তু যখন দেখলেন তাদের অত্যাচারের সীমা সাহাবায়ে কেরাম ও অন্যান্য নিকটাত্মীয়দের পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়ে গেছে এবং সাথে সাথে তিনি এটাও প্রত্যক্ষ করলেন, তারা সকল জুলুম-নির্যাতনকে নির্দ্বিধায় সহ্য করার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু সেই মহান সত্যবাণী যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়েছেন- তা থেকে বিন্দু মাত্রও হটতে রাজি নন, তখন তাদেরকে হাবশা বা আবিসিনিয়ায় হিজরত করার অনুমতি দিলেন। নবুয়তের পঞ্চম বছর রজব মাসে বার জন পুরুষ ও চার জন মহিলা আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। তন্মধ্যে হযরত উসমান রাযি. ও তাঁর স্ত্রী হযরত রুকাইয়া রাযি.ও ছিলেন।

(দুরুসুস সীরাত : ১৫, সীরাতে মুগলতাঈ : ২১)

আবিসিনিয়ার বাদশা নাজ্জাশী (হাবশার প্রত্যেক বাদশাকে নাজ্জাশী বলা হত। -মুগলতাঈ) এ সকল মুহাজিরকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করলেন। এরা সকলে সসম্মানে শান্তিতে সেখানে বসবাস করতে লাগলেন। কুরাইশরা যখন এ সংবাদ জানতে পারল, তখন আমর বিন আস ও আব্দুল্লাহ বিন রবিয়াকে এই বলে নাজ্জাশীর নিকট প্রেরণ করল, লোকগুলো সন্ত্রাসী ও দুস্কৃতিকারী। এদেরকে আপনার দেশে বসবাস করতে দেবেন না। বরং তাদেরকে আমাদের হাতে সোপর্দ করে দিন।

নাজ্জাশী ছিলেন একজন চিন্তাশীল ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি তাদের প্রস্তাবের জবাবে বললেন, আমি তাদের ধর্ম ও মতবাদ সম্পর্কে পূর্ণ তদন্ত না করে তাদেরকে তোমাদের হাতে তুলে দিতে পারি না। অতঃপর তিনি তাদেরকে ডেকে এনে বললেন, তোমরা তোমাদের ধর্ম সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রদান কর।

ইউরোপের কোনো কোনো রাজনীতিবিদ (সম্ভবত লর্ড ক্রোমার) বলেছেন, "যদি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমস্ত আলেম সম্প্রদায় একত্র হয়ে ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য বর্ণনা

করতে চান, তবে এর চেয়ে ভালোভাবে বলতে পারবেন না, যা হাবশার মুহাজিরগণ বর্ণনা করেছেন। (দুরুসুত তারীখ : ২৯)

হযরত জাফর বিন আবু তালেব রাযি. অগ্রসর হয়ে বাদশাকে সম্বোধন করে বললেন : "হে মহান বাদশা! পূর্বে আমরা ছিলাম চরম মূর্খ। মূর্তিপূজা করতাম, মৃত জানোয়ার আহার করতাম, অশ্লীলতা, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা ও চরিত্রহীনতায় নিমগ্ন ছিলাম। দুর্বলদের উপর সবলদের অত্যাচার ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। জাতির এহেন চরম দুর্দিনে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রেরণ করলেন আমাদের জন্য আমাদেরই বংশোদ্ভূত একজন শান্তির দূত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। আমরা তাঁর বংশ পরিচয়, সততা ন্যায়নিষ্ঠ আমানতদারী ও পূতচরিত্র সম্পর্কে ছিলাম পূর্ণ অবগত। তিনি এসে আমাদের এ মর্মে দাওয়াত দিলেন– আল্লাহ এক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই।

তিনি আমাদেরকে মূর্তিপূজা ছেড়ে দিতে, সত্য কথা বলতে আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে সৎ ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়াও যাবতীয় হারাম কাজ, খুন-খারাবি, মিথ্যাচার, এতিমের মাল আত্মসাৎ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। নামায, রোযা ও হজ সম্পাদন করতে আমাদেরকে হুকুম করেছেন। এ সমস্ত কথা শুনেই আমরা তার প্রতি ঈমান এনেছি।

বাদশা নাজ্জাশী জাফর বিন আবু তালিব রাযি. এর এ সুন্দর ও স্পষ্ট বক্তব্য শ্রবণে অভিভূত হলেন। কুরাইশ দূতদেরকে ফিরিয়ে দিলেন এবং নিজে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গেলেন।

এ নাজ্জাশী অন্য কোনো ব্যক্তি হবেন, যিনি নবুয়তের পঞ্চম বর্ষে ইসলাম গ্রহণ করেন। আসহামা; ৬ষ্ঠ হিজরীতে যাঁর ইসলাম গ্রহণের উল্লেখ আছে, তিনি অন্য কোনো ব্যক্তি।

মক্কার মুহাজিরগণ আনুমানিক তিন মাস সেখানে শান্তিতে অবস্থান করে পুনরায় মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। হযরত ওমর ফারুক রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দোয়ার বরকতে ইসলাম কবুল করে ধন্য হন। তখন মুসলমানদের সংখ্যা ছিল পুরুষ ৪০ জন আর মহিলা ১১ জন। (দুরূসুত তারিখ : ২২)

ওমর ফারুক রাযি. এর ইসলাম গ্রহণের ফলে মুসলমানরা পেল এক নতুন উদ্দীপনা। আর যে সমস্ত লোক স্পষ্ট দলিল-প্রমাণাদি দ্বারা ইসলামের সত্যতা স্বীকার করা সত্ত্বেও কুরাইশদের জুলুম-নির্যাতনের ভয়ে নিজেদের ইসলাম প্রকাশ করতে পারছিলেন না; তারাও এখন প্রকাশ্যে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আসতে শুরু করে দিল। এভাবেই আরবে ইসলামের সম্প্রসারণ ও উন্নতি হতে লাগল।

কুরাইশরা যখন দেখতে পেল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের সম্মান-সমৃদ্ধি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবিসিনিয়ার বাদশাও

মুসলমানদের যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করলেন। তখন তারা নিজেদের পরিণতি বুঝতে পারল। কুরাইশরা সম্মিলিতভাবে এই সিদ্ধান্ত নিল, বনি আবদুল মুত্তালিব ও বনি হাশিমের নিকট এ দাবি করা হবে, তারা যেন স্বীয় ভাতিজা মুহাম্মদকে আমাদের হাতে তুলে দেয়, নতুবা আমরা তাদের সঙ্গে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করে দিব।

কিন্তু বনি আবদুল মুত্তালিব তাদের এ দাবি মেনে নিতে পারল না। তাই তারা সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এক অঙ্গীকারপত্র লিপিবদ্ধ করল– বনি হাশিম ও বনি আবদুল মুত্তালিবের সাথে পূর্ণ মোকাবেলা করতে হবে। তাদের সাথে আত্মীয়তা বিবাহ-শাদি, ক্রয়-বিক্রয়, লেনদেন সব কিছু বন্ধ করে দিতে হবে। অবশেষে সেই অঙ্গীকারনামা বায়তুল্লাহর সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখা হল। এ অঙ্গীকারনামা মানসূর বিন আকরামা লিখেছিল। এর ফলে তার হাত অবশ হয়ে গিয়েছিল। (সীরাতে মুগলতাঈ : ২৪)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবাদের একটি পাহাড়ী উপত্যকায় অবরোধ করে রাখা হল। তখন আবু লাহাব ছাড়া বনি হাশিম ও বনি আবদুল মুত্তালিবের মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল ব্যক্তি আবু তালিবের সাথে পাহাড়ের উপত্যকায় অবরুদ্ধ ছিল। সকল দিক থেকে যাতায়াতের পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়। খাদ্যসামগ্রী যা তাদের সঙ্গে ছিল অবশেষে তাও নিঃশেষ হয়ে গেল। তখন তারা কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পড়লেন। ক্ষুধার তাড়নায় গাছের পাতা খেয়েও জীবন নির্বাহ করতে হয়েছিল।

মুসলমানদের এই কঠিন দুর্দশা দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে পুনরায় আবিসিনিয়ায় হিজরতের অনুমতি দিলেন। এবার হিজরতে মুসলমানদের একটি বিরাট কাফেলা অংশগ্রহণ করে। তাদের সংখ্যা ছিল ৮৩ জন পুরুষ আর ১২জন মহিলা। আবার তাদের সাথে যোগ দিলেন ইয়ামানের মুসলমানরাও। যাদের মধ্যে হযরত আবু মূসা আশআরী রাযি. এবং তাঁর বংশের লোকজন। (সীরাতে মুগলতাঈ : ২৪)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর অবশিষ্ট সাথী-সঙ্গী ও বন্ধু-বান্ধবগণ সুদীর্ঘ তিনটা বছর এই জুলুম-নির্যাতন ও কষ্টের মধ্যেই জীবন যাপন করেন। কোনো বর্ণনায় দু বছর এবং কোনো কোনো বর্ণনায় কয়েক বছর বর্ণনা করা হয়।

(সীরাতে মুগলতাঈ : ২৩)

অতঃপর কিছু লোক মিলে অঙ্গীকার ভঙ্গ করা ও অবরোধ প্রত্যাহার করার জন্য উদ্বুদ্ধ হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অহির মাধ্যমে সংবাদ দেওয়া হল, এই অঙ্গীকারপত্রটি উইপোকায় খেয়ে ফেলেছে এবং আল্লাহর নাম লিখিত স্থানটুকু ছাড়া একটি অক্ষরও অবশিষ্ট নেই। একথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলের নিকট বর্ণনা করলে তারা গিয়ে দেখল ব্যাপারটা সেরূপই, যেরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন।

তোফায়েল বিন আমর দাওসী রাযি. এর ইসলাম গ্রহণ

অবশেষে অবরোধ উঠিয়ে নেওয়া হয়। এ সময় হযরত তোফায়েল বিন আমর দাওসী রাযি. যিনি ছিলেন অত্যন্ত অভিজাত ও স্বীয় গোত্রের সর্দার, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলামের সুস্পষ্ট সত্যতা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তম চরিত্র দেখে স্বেচ্ছায় ও সানন্দচিত্তে মুসলমান হয়ে যান।

ইসলাম গ্রহণের পর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার গোত্রে আমার কথা মান্য করা হয়। আমাকে অনুমতি দিন, আমি গিয়ে তাদের ইসলামের দাওয়াত প্রদান করি। তবে আপনি আল্লাহর দরবারে দুআ করুন! যেন আমার সাথে এমন স্পষ্ট নিদর্শন প্রদান করা হয়, যার দ্বারা আমি তাদেরকে আমার কথা বিশ্বাস করাতে পারি।

আল্লাহর নবী তাঁর জন্য দুআ করলেন। নবীজির দুআর বদৌলতে আল্লাহ তাঁর কপালে এমন এক নূর চমকিয়ে দিলেন; যা গভীর অন্ধকারেও প্রদীপের মতো চমকাতে থাকত। তিনি যখন এ অবস্থায় স্বীয় গোত্রের নিকট গেলেন। তখন তার সংশয় ঘনীভূত হল, না জানি গোত্রের লোকেরা আমার এ নূরকে কোনো বিপদ বা রোগ মনে করে এবং এ ধারণা না করে বসে, ইসলাম গ্রহণের ফলে আমি এ রোগে আক্রান্ত হয়েছি। তাই তিনি দুআ করলেন, এ নূর যেন তাঁর চাবুকের মধ্যে চলে আসে। আল্লাহ তাআলা তাঁর দুআ কবুল করে সেই নূরকে তার চাবুকের সঙ্গে ঝুলন্ত প্রদীপের মতো স্থাপন করে দিলেন। তিনি স্বীয় গোত্রে গিয়ে দীনের দাওয়াত দিলেন।

তাঁর তাবলীগী প্রচেষ্টার ফলে কিছু লোক মুসলমান হল। তবে তাদের সংখ্যা আশানুরূপ হয়নি বিধায় হুযুরের খেদমতে উপস্থিত হয়ে দুআ আরয করলেন, যেন এই প্রচেষ্টা সফল হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআ করে বললেন, এবার গিয়ে দাওয়াতের কাজ কর। আর দাওয়াতি কাজে নম্রতা অবলম্বন বাঞ্ছনীয়।

তোফায়েল বিন আমর রাযি. স্বগোত্রে ফিরে গেলেন এবং মানুষদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করলেন। আল্লাহর মেহেরবানিতে এবার এমন সফলতা অর্জন করলেন, তিনি খন্দকের যুদ্ধের পর ৭০/৮০ পরিবারকে মুসলমান বানিয়ে নিজের সঙ্গে নিয়ে এসে খায়বারের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

আবু তালিবের ইনতেকাল

রাসূলের চাচা আবু তালেব ইনতেকাল করেন নবুয়তের দশম বছর শাওয়াল মাসে। এরই তিন দিন পর ইনতেকাল করেন হযরত খাদিজা রাযি.। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বছরটিকে ২ শোকের বছর নামে অভিহিত করেন।

–সীরাতে মুগলতাঈ : ২১

এ বছর হযরত সাওদা রাযি. এর সঙ্গে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাদি হয়। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, হযরত আয়েশা রাযি. সঙ্গে বিবাহ হয়।

–সীরাতে মুগলতাই : ২৬

তায়েফে হিজরত

আবু তালিবের ইনতেকালের পর কুরাইশরা সুযোগ পেয়ে বসল। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেওয়া হতে এক মুহূর্তও বিরত থাকল না। যখন তিনি মক্কাবাসীদের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়লেন, তখন নবুয়তের দশম বছর শাওয়াল মাসের শেষের দিকে যায়েদ বিন হারেসকে সঙ্গে নিয়ে তায়েফ গমন করে তায়েফবাসীকে কালিমার দাওয়াত দেন। সেখানে ক্রমাগত এক মাস দাওয়াত ও হেদায়েতের কাজ চালিয়ে যান; কিন্তু এক ব্যক্তিরও ইসলাম গ্রহণের তাওফিক হয়নি। আরো সেই জালিমরা শহরের কিছু বখাটে ও দুষ্ট প্রকৃতির ছেলেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেয়ার জন্য লেলিয়ে দিল। পাষাণ হৃদয় হতভাগারা প্রিয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পেছনে লেগে গেল। সেই মুহূর্তে যদি রাহমাতুল্লিল আলামিনের দয়া ও অনুগ্রহ প্রতিবন্ধক না হত তাহলে তাঁর একটি মাত্র ঠোঁটের কম্পন তাদের সকল প্রকার অপকর্ম ও উম্মাদনার পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে তায়েফ ও তায়েফবাসীর নাম নিশানা পর্যন্ত ভূপৃষ্ঠ থেকে মুছে যেত।

সেই হতভাগারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মারতে শুরু করেছিল। যার পরিপ্রেক্ষিতে হুযুরের পা মোবারক ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল। যেদিক থেকে পাথর আসতো, হযরত যায়েদ বিন হারেস রাযি. সেদিক গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাথরের আঘাত থেকে রক্ষা করত। অবশেষে যায়েদ রাযি. মাথা ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেল। রহমতে আলম দীর্ঘ একমাস পর তায়েফ হতে এমনভাবে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন তাঁর পায়ের গোড়ালী ছিল রক্তে রঞ্জিত। তথাপি তাঁর মুখ থেকে বদদুআর একটি বাক্যও উচ্চারিত হয় নি।

ইসরা ও মেরাজ

ইসলামের ইতিহাসে নবুয়তের একাদশ বর্ষটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। এ বছরই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক আড়ম্বরপূর্ণ শোভাযাত্রার মাধ্যমে সম্মান প্রর্দশন করা হয়, যা নবীগণের মধ্যে কেবলমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল। (নশরুত তিব)

ইসরা ও মেরাজের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা :

এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবার হাতিমে শায়িত ছিলেন। কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে, তিনি স্বীয় বাড়িতে শুয়েছিলেন। এমন সময় হযরত মীকাঈল আ. ও জিবরাঈল আ. তাশরিফ নিয়ে এসে বললেন- আমাদের সঙ্গে চলুন। তাঁকে বোরাক নামক এক বাহনে আরোহণ করানো হল। যার চলার গতি এত দ্রুত

ছিল, দৃষ্টিসীমার শেষ প্রান্তে সেটি কদম ফেলত। এরূপ দ্রুত গতিতে চলে প্রথমে তাঁকে সিরিয়ার মসজিদে আকসায় নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পূর্বের সকল নবীকে একত্র করে রেখেছিলেন; মুজেযাস্বরূপ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অভ্যর্থনা জানানোর উদ্দেশ্যে। এখানে পৌঁছে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আযান দেন। আযানের পর সকল নবী ও রাসূলগণ নামাযের প্রস্তুতিস্বরূপ কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। সকলেই এই অপেক্ষায় ছিলেন, নামায কে পড়াবেন। জিবরাঈল আ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাত মোবারক ধরে তাঁকে আগে বাড়িয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে সমবেত সকল নবী রাসূল ও ফেরেশতাদের নামাযের জামাতে ইমামতি করেন। বোরাকের পিঠে চড়ে পার্থিব জগতের সফর এখানে এসেই শেষ হয়।

অতঃপর পর্যায়ক্রমে তাঁকে সকল আকাশে সফর করানো হয়। এর মধ্যে মতভেদ রয়েছে, এ আকাশ ভ্রমণ বোরাকের মাধ্যমে হয়েছে না কি অন্য কোনো সোপানের মাধ্যমে । হাফেয নাজমুদ্দীন গায়তী কিসসাতুল মিরাজে বিশদ আলোচনা করেছেন। তিনি প্রথম আকাশে হযরত আদম আ. এর সঙ্গে, দ্বিতীয় আকাশে হযরত ঈসা আ., তৃতীয় আকাশে হযরত ইউসুফ আ., চতুর্থ আকাশে হযরত ইদরীস আ., পঞ্চম আকাশে হযরত হারুন আ. ষষ্ঠ আকাশে হযরত মূসা আ. ও সপ্তম আকাশে হযরত ইবরাহীম আ. এর সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ করেন। (ফতহুল বারী : ১৫/৪৭৫)

অতঃপর তিনি সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত গমন করেন। পথিমধ্যে হাউজে কাউসার অতিক্রম করেন। অতঃপর তিনি জান্নাতে প্রবেশ করেন। সেখানে মহান রাব্বুল আলামিনের মহান কুদরতের সৃষ্ট এমন বিস্ময়কর ও আশ্চর্যজনক জিনিস প্রত্যক্ষ করেন, যা আজ পর্যন্ত কোনো চোখ দেখে নি। কোনো কান তা শ্রবণ করে নি। এবং কোনো মানুষের হৃদয়পটে তার ধারণাও জন্মে নি।

অতঃপর হুযুরের সম্মুখে জাহান্নাম উপস্থিত করা হল যা ছিল সর্বপ্রকার শাস্তি ও প্রজ্বলিত আগুনের তীব্রদাহে পরিপূর্ণ। যার সম্মুখে শক্ত পাথর ও লোহার মতো কঠিন বস্তুরও কোনো অস্তিত্ব ছিল না। সেখানে তিনি একদল লোক দেখতে পেলেন, যারা মৃত জানোয়ার ভক্ষণ করছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা? জিবরাঈল আ. উত্তর দিলেন, এরা ঐ সমস্ত লোক যারা দুনিয়ায় মানুষের গোশত ভক্ষণ করত। গীবত বা পরনিন্দা করত। অতঃপর জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো সম্মুখে অগ্রসর হলেন। আর জিবরাঈল আ. সেখানেই রয়ে গেলেন। কেননা সেখান থেকে সামনে অগ্রসর হওয়ার অনুমতি তাঁর ছিল না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে মহান রাব্বুল আলামিনের দিদার লাভে ধন্য হন। সঠিক বর্ণনা অনুযায়ী সেই যিয়ারত হৃদয়ের অনুভূতি দ্বারা সংঘটিত হয় নি বরং চর্মচক্ষু দ্বারাই সংঘটিত হয়েছিল। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাযি. সহ

সকল মুহাক্কিক সাহাবায়ে কেরাম ও ইমামগণের অভিমতও তাই। সেখানে পৌঁছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদায় পড়ে যান এবং মহান রাব্বুল আলামিনের সঙ্গে কথোপকথনের সৌভাগ্য লাভ করেন। তখনই পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হয়।

এরপর তিনি প্রত্যাবর্তন করলেন। সেখান হতে পুনরায় তিনি বুরাকে চড়ে মক্কার দিকে চলেন। পথিমধ্যে বিভিন্ন স্থানে কুরাইশদের তিনটি বাণিজ্য কাফেলার নিকট দিয়ে অতিক্রমকালে অনেককে তিনি সালাম দিয়েছেন। তারা রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গলার আওয়াজ সনাক্ত করতে সক্ষম হয়। পরে মক্কায় এসে এ ঘটনার সাক্ষ্য প্রদান করে। প্রভাতের পূর্বেই এই বরকতময় ভ্রমণ সমাপ্ত হয়।

ইসরার সম্পর্কে চাক্ষুস প্রমাণ

সকালে যখন কুরাইশদের মাঝে এ খবর ছড়িয়ে পড়ল তখন এক অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি হল। কেউ হাতে তালি দিতে লাগল, কেউ তো অবাক বিস্ময়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। আবার কেউ ঠাট্টাচ্ছলে হাসাহাসি শুরু করে দিল। অতঃপর সকলে ঘটনার সত্যাসত্য যাচাইয়ের জন্য প্রশ্ন করতে শুরু করলো। কেউ জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা বলুন তো বায়তুল মুকাদ্দাস এর নির্মাণশৈলী ও গঠন প্রণালী কেমন? তা পাহাড় থেকে কতটুকু ব্যবধানে অবস্থিত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটির পূর্ণ নকশা বলে দিলেন। এমনি ধরনের আরো বিভিন্ন প্রশ্ন তারা করতে লাগল। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সঠিক উত্তর দিতে লাগলেন। এক পর্যায়ে তারা এমন সব অবান্তর প্রশ্ন শুরু করে দিল, যা একবার দেখে কেউ বলতে পারে না। যেমন মসজিদের দরজা কয়টি? কয়টি তাক ? ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে এ সমস্ত জিনিস কেউ গণনাই করে রাখে না। তাই তিনি বিরক্তিবোধ করতে লাগলেন। তখনই মুজেযা স্বরূপ মসজিদে আকসা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে তুলে ধরা হল। আর তিনি দেখে দেখে গণনা করে সব কিছু বলে দিতে লাগলেন। এ সংবাদ আবু বকর রাযি. শোনামাত্রই বলে উঠলেন :

اَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসূল"।

এদিকে কুরাইশরাও সকলে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল এবং পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, তিনি মসজিদের বিস্তারিত বিবরণ তো ঠিকই দিয়েছেন। অতঃপর তারা আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-কে সম্বোধন করে বলল, তুমি কি একথা বিশ্বাস কর, তিনি এক রাতে মসজিদে আকসা পর্যন্ত গিয়ে পুনরায় ফিরে আসতে পারেন?

হযরত সিদ্দিকে আকবার রাযি. বলেন, আমি তো এর চেয়েও অধিক অবিশ্বাস্য বিষয়েও তাকে বিশ্বাস করি। যেখানে সকাল সন্ধ্যার সামান্য ব্যবধানে তাঁর কাছে

আসমানি খবরাখবর সরবরাহ হয়ে থাকে, সেখানে এই সামান্য ব্যাপারে কোনো প্রকার সংশয় সৃষ্টির অবকাশ কোথায়? আমি সব কিছুকে এক বাক্যে বিশ্বাস করি। এ কারণেই হযরত আবু বকর রাযি.-কে "সিদ্দিক" উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

কুরাইশ কাফিরদের চাক্ষুস সাক্ষ্য

কুরাইশরা পুনরায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্যতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করল, আচ্ছা বলুন তো আমাদের যেই বাণিজ্য কাফেলাটি সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে তারা কোথায়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "রওহা" নামক স্থানে অমুক গোত্রের একটি বাণিজ্য কাফেলাকে আমি অতিক্রম করি, তাদের উট হারিয়ে গিয়েছিল। তারা সকলে উটের তালাশে চলে গিয়েছিল। আমি তাদের উটের হাওদার নিকট গিয়ে দেখি সেখানে কেউ উপস্থিত নেই। তাদের একটি মাটির পাত্রে পানি রাখা ছিল। আমি সেখান থেকে পানি পান করলাম। অতঃপর অমুক গোত্রের বাণিজ্য কাফেলাটিকে অমুক স্থানে অতিক্রম করি। বোরাক তাদের নিকটবর্তী হলে তাদের উটগুলো ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ছুটাছুটি শুরু করে দিল। তাদের মধ্যে যে লাল উটটি সাদা ও কালো রংয়ের থলে বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল। ওটা তো অজ্ঞান হয়ে পড়েই গেল। অতঃপর অমুক গোত্রের বাণিজ্য কাফেলাটি আমরা অতিক্রম করি "তানইম" নামক স্থানে যার সর্বাগ্রে ছিল একটি খাকি রংয়ের উট যার পৃষ্ঠে ছিল কালো চট ও দুইটি কালো থলে। কাফেলাটি অচিরেই তোমাদের কাছে এসে পড়বে। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, কবে নাগাদ তারা এসে পৌঁছবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারা বুধবারে এসে যাবে।

বাস্তবিকই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্ণনার সাথে সব কিছুই মিলে গেল। পরবর্তীতে কাফেলা ফিরে এসে হুযুরের সমস্ত বর্ণনার সত্যতা স্বীকার করে। যখন কুরাইশদের উপর মহান রাব্বুল আলামিনের সকল প্রমাণাদি পূর্ণ হয়ে গেল এবং এই বিস্ময়কর ভ্রমণের ব্যাপারে স্বয়ং তাদের লোকেরাই সাক্ষ্য দিয়ে দিল, তখন সেসব হঠকারী লোকগুলোর মেরাজের সত্যতা অস্বীকার করা এছাড়া আর কোনো পন্থাই বাকি রইল না, তারা এ সফরকে নিছক একটি যাদু এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যাদুকর আখ্যা দিয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করল।

মদীনায় ইসলাম

দীর্ঘ দশটি বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধারে আরব গোত্রের মাঝে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। আরবের এমন কোনো মজলিস ও লোক সমাগম বাকি থাকে নি, যেখানে গিয়ে তিনি দীনের দাওয়াত পৌঁছান নি। হজের মৌসুম, উকায মেলা, যিলমাজায প্রভৃতি স্থানে ঘুরে ঘুরে গিয়ে লোকদেরকে সত্যের পথে আহ্বান জানাতেন। কিন্তু তারা প্রতি উত্তরে এই বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নানাবিধ কষ্ট দিত ও ঠাট্টা করত, আগে নিজের কওমকে

মুসলমান বানিয়ে পরে আমাদেরকে হেদায়েত করতে আসুন। এভাবেই দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়ে গেল।

যখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইসলামের প্রসার ও উন্নতি দিতে ইচ্ছা করলেন, তখন আউস গোত্রের কিছু লোককে মদিনা থেকে নবীজির খেদমতে প্রেরণ করে দিলেন। যাদের মধ্য হতে আসওয়াদ বিন যুরারা ও যাকওয়ান বিন আবদে কায়স নামক দুজন লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। পরের বছরও তাদের মধ্য হতে আরো কিছু লোক আসে। তন্মধ্যে মতান্তরে ছয় বা আট জন লোক মুসলমান হয়ে যান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বললেন– তোমরা কি আল্লাহর বাণী প্রচারে আমাকে সাহায্য করবে?

তারা বলল, আল্লাহর রাসূল! এখন আমাদের আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মাঝে গৃহযুদ্ধ অব্যাহত রয়েছে। ওই সময় মদিনায় দু দল লোকের বাস ছিল। (১) মুশরিক (২) ইহুদি। মুশরিকরা দুটি বিরাট গোত্রে বিভক্ত ছিল– আওস ও খাযরাজ। এ দু দল সর্বদা পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত থাকত। প্রায় ১২০ বছর তাদের পারস্পরিক যুদ্ধ চলতে থাকে। এভাবে ইহুদিরাও দুভাগে বিভক্ত ছিল। বনু কুরায়যা ও বনু নযির। এ দুগোত্রও পরস্পর শত্রুতায় লিপ্ত ছিল। (সীরাতে হালবীয়া : ১/৪০)

আপনি যদি এ মুহূর্তে মদিনায় তাশরিফ নিয়ে যান তাহলে আপনার হাতে বায়আত গ্রহণের ব্যাপারে সকলে ঐকমত্যে পৌঁছতে পারবে না। আপাতত আপনি আপনার এ ইচ্ছা এক বছরের জন্য মুলতবি রাখুন। হতে পারে শিগগিরই আমাদের পরস্পরে সন্ধি হয়ে যাবে। আগামী বছর পুনরায় আমরা আপনার খেদমতে উপস্থিত হব। তখন এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে। এরূপ আলাপ-আলোচনার পর তারা মদিনায় ফিরে গেলেন। মদিনায় সর্বপ্রথম বনি যুরায়ক মসজিদে কুরআন শরিফ তিলাওয়াত করা হয়।

মদিনায় ইসলামের প্রচার ও প্রসার হোক– এটাই ছিল আল্লাহর ইচ্ছা। তাই সে বছরই কিছু দিনের মধ্যে আউস ও খাযরাজের যাবতীয় দ্বন্দ্ব মিটে গেলে ওয়াদা অনুযায়ী পরের বছর হজের মৌসুমে ১২জন লোক হুযুরের দরবারে মক্কায় হাযির হল। তাদের মধ্যে ১০ জন ছিল খাযরাজ আর দুজন ছিল আউস গোত্রের। তন্মধ্যে যারা গত বছর মুসলমান হয় নি। তারা এবার মুসলমান হয়ে হুযুরের হাতে বায়আত গ্রহণ করল।

এ বাইআত যেহেতু আকাবা নামক স্থানে সংঘটিত হয়েছিল তাই এর নামকরণ হয় আকাবার প্রথম বাইআত।

জুমরায়ে আকাবা, যা মিনার প্রথম অংশে অবস্থিত এবং হাজিগণ যার উপর কংকর নিক্ষেপ করে থাকেন। পরে এখানে একটি মসজিদও নির্মাণ করা হয়। এই মসজিদ বাইআতের মসজিদ নামে প্রসিদ্ধ। (সীরাতে হালবীয়া : ১/৫২)

এরা মুসলমান হয়ে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করলে মদিনার ঘরে ঘরে শুরু হয়ে গেল ইসলামের চর্চা। প্রতিটি মজলিসের প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে গেল ইসলাম।

মদিনায় ইসলামের প্রথম মাদরাসা

মদিনায় পৌঁছে আউস ও খাযরাজের নেতৃবৃন্দ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এ মর্মে পত্র পাঠালেন– আলহামদু লিল্লাহ! মদিনায় ইসলামের যথেষ্ট প্রসার ঘটেছে। এখন এমন কোনো লোক আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন; যিনি আমাদেরকে কুরআন শিক্ষা দেবেন, মানুষদেরকে ইসলামের প্রতি আহবান করবেন, আমাদেরকে শরিয়তের হুকুম-আহকাম শিক্ষা দেবেন এবং নামাযে আমাদের ইমামতি করবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের অনুরোধক্রমে হযরত মুসআব বিন উমায়ের রাযি. কে কুরআন শিক্ষাদানের জন্য পাঠিয়ে দিলেন। এভাবে মদিনায় ইসলামের সর্ব প্রথম মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। (সীরাতে হালবিয়া : ৪০৩)

হজের মৌসুমে মদিনা থেকে একটি বড় কাফেলা মক্কায় পৌঁছেন। তাদের মধ্যে ৭০ জন পুরুষ আর ২ জন মহিলা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন। রাতের বেলা তাদের সঙ্গে আকাবার সন্নিকটে মিলিত হওয়ার অঙ্গীকার করেন। ওয়াদা অনুযায়ী মধ্যরাতে সকলেই সেখানে সমবেত হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আব্বাস রাযি.ও সেরাতে নবীজির সঙ্গে সেখানে গিয়েছিলেন। যদিও তিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেন নি।

সমবেত জনতার সম্মুখে হযরত আব্বাস রাযি. ভাষণ দিলেন। তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন : আমার এ ভাতিজা (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বদা স্বীয় গোত্রের মাঝে সম্মানে ও সুরক্ষিতভাবে বসবাস করে আসছে। এখন তোমরা যারা তাকে মদিনায় নিতে এসেছ, তোমরা ভেবে দেখ, যদি তোমরা তাকে দেওয়া অঙ্গীকার পূরণ করতে পার এবং শত্রুর হাত থেকে তাকে রক্ষা করতে পার; তা হলে এ দায়িত্ব গ্রহণ কর নতুবা তাকে স্বীয় গোত্রেই থাকতে দাও।

এ প্রস্তাব শুনে কাফেলার সর্দার দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা দিলেন, নিশ্চয় আমরা তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। আর আমাদের ইচ্ছা হল আমরা তার বাইআত পূর্ণ করব। এ ঘোষণা শুনে (ওয়াদা ও বাইআত দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে) হযরত আসওয়াদ বিন যুরারাহ বলে উঠলেন, হে মদিনাবাসী! একটু থামুন, আপনারা আজ কীসের ওপর বাইআত গ্রহণ করেছেন, তা কি অনুভব করতে পেরেছেন?

ভালো করে বুঝে নিন, এ বাইআত সমগ্র আরব অনারবের মধ্যে এক মোকাবেলা ও বিরোধিতার অঙ্গীকার। যদি আপনারা তা রক্ষা করার ক্ষমতা রাখেন তাহলে বাইআত গ্রহণ করুন। অন্যথায় নিজেদের অক্ষমতার কথা জানিয়ে দিন। এ কথা শুনে সকলে সমস্বরে বলে উঠলেন : আমরা কোনো অবস্থাতেই এ বাইআত থেকে পিছু হটব না। অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, আল্লাহর রাসুল! আমরা যদি এ অঙ্গীকার পূর্ণ করি তা হলে আমরা এর কী প্রতিদান পাব?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এর প্রতিদান হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভ। একথা শুনে সকলে বললেন, আমরা এর উপরই রাজি আছি। আপনি

হাত মোবারক এগিয়ে দিন, আমরা বাইয়াত গ্রহণ করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত বাড়িয়ে দিলে সকলেই বাইয়াত লাভে ধন্য হলেন।

মহান রাব্বুল আলামিন জানেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভদৃষ্টি এবং কয়েকটি কথা সে লোকগুলোর উপর এমন প্রভাব ফেলল, অল্প কিছুক্ষণের সাহচর্যে পার্থিব সম্পদের মোহ, সম্মান-প্রতিপত্তি ও অর্থ-কড়ির মহব্বত তাদের অন্তর থেকে নিঃশেষ হয়ে গিয়ে কেবলমাত্র এক আল্লাহর মহব্বত তাদের অন্তরের গভীরে এমনভাবে বদ্ধমূল হল, জান-মাল, ইজ্জত-আবরু সব কিছুই তার মোকাবেলায় কুরবান করার জন্য তারা প্রস্তুত হয়ে গেলেন। শুধু তারাই নয় তাদের সন্তানদের মধ্যেও অনুপ্রেরণা অব্যহত ছিল।

বাইআতে অংশগ্রহণকারিণী হযরত উম্মে উমারার সাহেবজাদা হযরত হাবীব রাযি.-কে মিথ্যা নবুয়তের দাবিদার মুসায়লামা কাযযাব গ্রেফতার করে নানা ধরণের নির্যাতন করে অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সাথে হত্যা করে ফেলে। কিন্তু তিনি অঙ্গীকারের বিপক্ষে একটি শব্দও উচ্চারণ করেন নি। মুসায়লামা তাকে জিজ্ঞেস করে, তুমি কি মুহাম্মদকে নবী বলে স্বীকার কর? তিনি বললেন, নিশ্চয়ই। পুনরায় জিজ্ঞেস করল, তুমি কি এ মর্মে সাক্ষ্য দাও, আমিও আল্লাহর নবী? তখন তিনি বললেন, নিশ্চয়ই না। অতঃপর শরীরের একটি অঙ্গ কেটে ফেলত। এমনিভাবে এক এক অঙ্গ করে শরীরের একটি অঙ্গ অত্যন্ত নির্দয়ভাবে টুকরো করে ফেলা হয়। অবশেষে তিনি শহিদ হয়ে গেলেন। কিন্তু জায়েয হওয়া সত্ত্বেও তিনি ইসলামের অঙ্গীকারের বিরুদ্ধে কোনো শব্দও মুখ থেকে বের করা পছন্দ করলেন না। (সীরাতে হালবিয়া : ৪০৯)

اگرچہ خرمن عمرم غم تو داد بباد + بخاک پائے عزیزت کہ عہد نشکستم

আমি অক্লেশে গেলাম ক্ষয়ে তোমার বাসনার বিলাসে
তবু চরণ ছুয়েঁ বলছি; আজীবন যাবো ভালোবেসে।

অর্থ, তোমার চিন্তা যদিও আমার সমস্ত জীবন ধ্বংস করে দিয়েছে। কিন্তু তোমার পবিত্র পদযুগলের শপথ, আমি তোমার ওয়াদা ভঙ্গ করি নি। এরপর আকাবা নামক স্থানে সবাই বাইআত গ্রহণ করলেন। এ সময় বাইআত গ্রহণকারী পুরুষদের সংখ্যা ৭৩ ও মহিলাদের সংখ্যা ছিল ২ জন। এ বাইআতের নাম বাইআতে "আকবায়ে সানিয়া"। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদের মধ্যে থেকে ১২জনকে সমস্ত কাফেলার জিম্মাদার মনোনীত করে দিলেন। (সীরাতে হালাবিয়া : ৪১১)

মদিনায় হিজরতের সূচনা

কুরাইশরা যখন উক্ত বাইআতের সংবাদ শুনল তখন তারা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল। ফলে তারা মুসলমানদের অশান্তি, কষ্ট-যাতনা দেয়া থেকে ক্ষণিকের জন্যও বিরত থাকল না। এমন জটিল ও নাজুক পরিস্থিতিতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় সাহাবীগণকে মদিনা শরিফে হিজরত করার পরামর্শ দেন। সেমতে

সাহাবীগণ ক্রমে ক্রমে কুরাইশদের অগোচরে একজন দুজন করে মক্কা থেকে মদিনা অভিমুখে হিজরত করা শুরু করে দিলেন। এভাবে যেতে যেতে অবশেষে মক্কায় স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযি. ও আলি রাযি. এবং শিশু-নারী ও অসমর্থ কিছু পুরুষ ছাড়া আর কেউ অবশিষ্ট ছিল না। সিদ্দিকে আকবার রাযি. ও হিজরতের জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন- অপেক্ষা কর, আল্লাহ পাক আমাকেও হিজরতের অনুমতি দিয়ে দেবেন হয়তো। তাই তিনি সে অপেক্ষায় থাকলেন এবং বাহনের জন্য দুটি উটনী প্রস্তুত রাখলেন। একটি নিজের জন্য এবং অপরটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য। (সীরাতে মুগলতাঈ)

নবীজির হিজরত

মক্কার কুরাইশ কাফেররা যখন মুসলমানদের হিজরতের এ অবস্থা দেখতে পেল, তখন তারা দারুন নদওয়ায় (বৈঠকখানা) চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য একত্র হল এবং নবীজির ব্যাপারে কী করা যায় তা আলোচনা করল। কেউ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গ্রেফতার করার পক্ষে অভিমত দিল। কেউ দেশান্তর করার মত দিল। কিন্তু তাদের ধূর্ত লোকেরা বলল, গ্রেফতার করার পরিকল্পনা সহজ হবে না। এজন্য, তার সাথীরা তাকে আমাদের থেকে সহজে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত দেশান্তর করার পরিকল্পনা; এটা বাস্তবিক আমাদের জন্য আরো ক্ষতির কারণ হবে। কেননা এ অবস্থায় মক্কা ও আশেপাশের লোকেরা তাঁর উত্তম চরিত্র, মিষ্টি মধুর কথাবার্তা ও আল্লাহর পবিত্র বাণীর প্রতি অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে যাবে। পরিশেষে তিনি তাদের সকলকে নিয়ে আমাদের উপর আক্রমণ করবেন। (সীরাতে মুগলতাঈ)

হতভাগা আবু জাহল এ অভিমত পেশ করল, তাঁকে হত্যা করা হোক এবং হত্যা কাজে প্রতি গোত্র থেকে এক একজন ব্যক্তি শরিক হোক। তাহলে আবদে মানাফ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) গোত্র এর প্রতিশোধ নিতে সক্ষম হবে না। উপস্থিত সকল সদস্য এ অভিমতকে পছন্দ করল। আর সকল গোত্র থেকে এক একজন যুবককে সংগঠিত করে তাদের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হল, অমুক রাতে এ কাজ সম্পন্ন করা হবে।

এদিকে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাদের এই পরামর্শের কথা জানিয়ে দিলেন এবং হিজরতের আদেশ প্রদান করলেন। যে রাতে কুরাইশ কাফিররা তাদের হীন ষড়যন্ত্র কার্যকর করার পদক্ষেপ নিল এবং বিভিন্ন গোত্র থেকে বাছাইকৃত যুবকরা তার বাড়ির চারিদিকে ঘেরাও করে বসেছিল, সে রাতেই তিনি হিজরত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং আলি রাযি.-কে বললেন, তুমি আমার বিছানায় চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাক যেন আমার অনুপস্থিতি কাফিররা টের না পায়। এর পরই তিনি ঘর থেকে বের হলেন। দেখলেন ঘরের সাথে এক দল কাফের ওৎ পেতে বসে আছে। তিনি সূরা ইয়াসিন তেলাওয়াত করতে করতে বের হলেন এবং যখন-

فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ

"আমি তাদের চোখে পর্দা ফেলে দিয়েছি, ফলে তারা দেখেতে পাচ্ছে না।"

এ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলেন তখন আয়াতকে বেশ কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করলেন। ফলে আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের চোখে পর্দা ফেলে দিলেন। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পেল না। তিনি তাদের সকলের নাকের ডগা ডিঙ্গিয়ে আবু বকর রাযি.-এর বাসায় গেলেন। আর তিনি তো পূর্ব থেকেই বাহন ও পথ প্রর্দশক প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। আবু বকর সিদ্দিক রাযি. রাসূলের সহযাত্রী হলেন এবং বাড়ির পিছনের একটি দরজা দিয়ে বের হয়ে মক্কার অদূরবর্তী সাওর পাহাড়ের দিকে যাত্রা করলেন।

সাওর পাহাড়ের গুহায় অবস্থান

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওর পাহাড়ের একটি গুহায় আশ্রয় নিলেন। এদিকে কাফের পাহারাদার যুবকরা সকাল পর্যন্ত তার বাইরে আগমনের অপেক্ষায় থাকল। কিন্তু পরিশেষে তারা অবগত হল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জায়গায় আলি রাযি. আছেন। তারা অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে চতুর্দিকে অনুসন্ধানী দল পাঠাল। কতিপয় পদচিহ্ন বিশারদ লোক মরুভূমির মাটিতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করে ঠিক ওই গুহার কাছে উপনীত হল। গুহার মধ্যে উঁকি দিলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পেত। কেননা তিনি সম্মুখে ছিলেন। এমতাবস্থায় আবু বকর সিদ্দিক রাযি. দুশ্চিন্তায় বিচলিত হয়ে পড়লেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, শঙ্কিত হয়ো না। আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। আল্লাহর কি অপূর্ব কুদরত, তাদের সকলের দৃষ্টি ঐ গুহা থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হল। তারা একটু উঁকি দিয়েও দেখে নি বরং সবচেয়ে চতুর উমাইয়া বিন খলফ বলল, এখানে তাদের থাকা অসম্ভব। কেননা আল্লাহর হুকুমে রাতের মধ্যেই গুহার মুখে মাকড়সা জাল তৈরি করে এবং বন্য কবুতর বাসা বাঁধে। [হযরত সহল রহ. বলেন, হেরেমের কবুতরের বংশধর ঐ কবুতর থেকেই চলে আসছে। (সীরাতে মুগলতাঈ)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযি. সহ এ গুহায় একাধারে তিনরাত লুকিয়ে থাকেন। অবশেষে অনুসন্ধানকারীরা নিরাশ হয়ে পড়ল। এখানে তিন দিন অবস্থানকালে আবু বকর রাযি.-এর পুত্র আবদুল্লাহ রাতের অন্ধকারে গোপনে তাদের নিকট যেতেন এবং ভোর হওয়ার পূর্বে মক্কাতে ফিরে আসতেন। সারা দিন কুরাইশদের পরিকল্পনা শুনতেন এবং রাতে তাদের নিকট বর্ণনা করতেন। তাঁর বোন আসমা প্রতিরাতে খাদ্য দ্রব্য পাঠিয়ে দিতেন। আরবরা যেহেতু অতি সহজে পদচিহ্ন চিনতে পারত তাই আবদুল্লাহ স্বীয় গোলামকে ওই গুহা পর্যন্ত মেষ চরাতে যাওয়ার নির্দেশ দিত। যাতে করে পদচিহ্ন মুছে যায়।

সাওর পাহাড়ের গুহা থেকে মদিনা অভিমুখে যাত্রা

সাওর গুহায় অবস্থানের তৃতীয় দিনে ৪ঠা রবিউল আউয়াল সোমবার আমের বিন ফুহাইরা (আবু বকর রাযি. এর আযাদকৃত গোলাম) ঐ বাহন উটনী দুটি নিয়ে যায়। সাথে ছিল আবদুল্লাহ বিন উরাইকিত। তাকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়ে পূর্বেই পথপ্রদর্শনের জন্য সাথে নেওয়া হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক উটনীর উপর আরোহণ করেন। আর আবু বকর রাযি. অন্য উটনীর ওপর। খেদমতের জন্য আমের বিন ফুহাইরাকে তিনি নিজের পিছনে বসান। আর আব্দুল্লাহ বিন উরাইকিত সামনে থেকে রাস্তা দেখাতে থাকে।

সুরাকা বিন মালিকের মাটিতে ধ্বসে যাওয়া

এদিকে শিকার হাতছাড়া হয়ে গেছে ভেবে কুরাইশ অনুসন্ধানী দল দ্রুতগতিতে মক্কার অলি গলি তন্ন তন্ন করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুঁজতে লাগল। তন্মধ্যে সুরাকা বিন মালিক এ পথ ধরে খুঁজতে খুঁজতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একেবারে কাছে এসে পৌঁছল। ঠিক এমনি মুহূর্তে তার ঘোড়া গুরুতরভাবে হোঁচট খেল এবং সে ঘোড়ার পিঠ হতে মাটিতে পড়ে গেল। প্রথমবার আঘাত সামলে নিয়ে আবার ঘোড়ায় আরোহণ করে সামনে অগ্রসর হল। কিছু দূর যেতেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুরআন পাঠের শব্দ শুনতে পেল। সে সময় আবু বকর রাযি. বারবার মুখ ফিরিয়ে তার দিকে তাকাতে লাগলেন, কিন্তু রাসুল তার দিকে একবারও তাকান নি। সে যখন খুব কাছে এল তখন ঘোড়া দ্বিতীয়বার মাটিতে ধ্বসে যায় এবং সুরাকা লুটিয়ে পড়ল। এবারও সে কোনো রকমে নিজে উঠে এবং ঘোড়াকে তুলে সামনে বাড়াবার চেষ্টা করল। শত চেষ্টা করেও সে বিফল হল।

অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ক্ষমা ও আশ্রয় প্রার্থনা করে। ফলে হুযুরের বরকতে ঘোড়া সচল হয়। যখন ঘোড়াটির পা মাটির ভেতর থেকে উঠে এল তখন সে দেখল, পায়ের সে গর্তগুলো থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। ফলে সে আশঙ্কায় ভেঙ্গে পড়ল। পরিশেষে হুযুরের নিকট গিয়ে নতি স্বীকার করল এবং নিজের সব পাথেয়, জিনিস পত্র, উট ইত্যাদি তাঁর নিকট হস্তান্তর করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা প্রত্যাখ্যান করে বললেন, যেহেতু তুমি ইসলাম গ্রহণ কর নি, তাই আমি তোমার মাল গ্রহণ করতে পারি না। তবে এতটুকুই যথেষ্ট, তুমি কারো নিকট আমাদের অবস্থা বলবে না। সুরাকা ফিরে গেল। কিন্তু এ ঘটনা হুযুরের সম্পর্কে যতদিন আশঙ্কা ছিল ততদিন কারো নিকট প্রকাশ করেনি।

সুরাকার মুখে নবুয়তের স্বীকৃতি

কিছু দিন পর সুরাকা আবু জাহেলের নিকট উক্ত ঘটনা বর্ণনা করে কিছু কবিতা আবৃত্তি করল।

اَبَا حَكَمٍ وَاللَّاتِ لَوْ كُنْتَ شَاهِدًا + لِاَمْرِ جَوَادٍ اِذْ تَسُوْخُ قَوَائِمُهٗ

عَجِبْتُ وَلَمْ تُشَكِّكْ بِاَنَّ مُحَمَّدًا + نَبِيٌّ وَبُرْهَانٌ فَمَنْ ذَا يُقَاوِمُهٗ

عَلَيْكَ بِكَفِّ النَّاسِ عَنْهُ فَاِنِّىْ + اَرٰى اَمْرَهٗ يَوْمًا سَتَبْدُوْا مَعَالِمَهٗ

بِاَمْرٍ يَوَدُّ النَّاسُ فِيْهِ بِاَسْرِهِمْ + لَوْ بَانَ جَمِيْعُ انَاس طُرًّ يُسَالِمُهٗ

আসল কবিতা এইগুলি নহে। এই কবিতাগুলি সীরাতে মোগলতাঈ গ্রন্থে ত্রুটিযুক্ত ছিল। রাওয়ুল- উনস গ্রন্থের ২য় পৃষ্ঠা হতে এগুলোকে সংশোধন করা হয়েছে।]

যার অর্থ এরূপ-"হে আবুল হিকাম (আবু জাহেল) লাতের (একটি মূর্তি, কুরাইশরা এর পূজা করত) শপথ দিয়ে বলছি, তুমি যদি আমার ঘোড়াটির পা হাঁটু পর্যন্ত মাটিতে দেবে যাওয়ার ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে, তবে এ ব্যাপারে তোমার কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকত না, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য নবী। আমার মতে, তোমার অপরিহার্য কর্তব্য হল, তার সাথে বিরোধিতা থেকে বিরত থাকা এবং লোকদেরকেও তার বিরোধিতা করতে নিষেধ করে দেওয়া। কেননা, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অল্পকালের মধ্যে তার সফলতা ও বিজয়ের পতাকা এমনভাবে গোটা বিশ্বে চমকে যাবে, সমস্ত মানুষ তখন কামনা করবে, আমরা তার নিকট নতিস্বীকার করে সন্ধি ও শান্তিচুক্তি করে নিলে কতই না ভালো হত।" (মুগলতাঈ : ২৫)

আবু জাহলের উপাধি সমগ্র আরবে আবুল হিকাম বলে প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু কঠোর ইসলাম বিদ্বেষী হওয়ার কারণে তাকে আবু জাহল উপাধি প্রদান করা হয়। এই ব্যাপারটি জনৈক ব্যক্তি কবিতার ভাষায় অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছে :

اَلنَّاسُ كَنَّاهُ اَبَا حَكَمٍ + وَاللّٰهِ كَنَّاهُ اَبَا جَهْلٍ

উম্মে মাবাদ পরিবারের ইসলাম গ্রহণ

মদিনার পথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে মাবাদ বিনতে খালেদ নামের জনৈকা মহিলার বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তার একটি বকরি ছিল। কিন্তু দুধ দিত না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকরির স্তনে হাত বুলিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তা দুধে ভরপুর হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে পান করলেন ও সফরসঙ্গীদের পান করালেন। এ বরকত স্থায়ীভাবে অব্যাহত থাকল। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন চলে গেলেন তখন উম্মে মাবাদের স্বামী ঘরে ফিরল এবং বকরির দুধের আশ্চর্যজনক ঘটনা দেখে বিস্মিত হল। কারণ জিজ্ঞেস করলে উম্মে মাবাদ বলল, একজন অত্যন্ত ভদ্র যুবক স্বল্প সময়ের জন্য আমাদের এখানে মেহমান হয়ে ছিল। তাঁর হাতের বরকতে এত সব হয়েছে। স্বামী একথা শুনে মন্তব্য করল, আল্লাহর কসম! তিনি মক্কাবাসী সম্মানিত ব্যক্তি বলে মনে

হয়। এক বর্ণনায় আছে, এরপর তারা উভয়ে (স্বামী-স্ত্রী) হিজরত করে এবং মদিনায় পৌছে মুসলমান হয়ে যায়।

কুবা পল্লীতে অবস্থান

এখান থেকে রওনা হয়ে তিনি কুবা পৌছেন। কুবা মদিনা নগরের কাছাকাছি একটি পল্লী। মদিনাবাসী আনসাররা যখন সংবাদ পেলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় আসছেন, তখন থেকে স্বাগতম ও অভ্যর্থনা জানাবার জন্য প্রত্যহ তারা বসতি এলাকার বাইরে আসত। একদিনও তারা যথারীতি অপেক্ষা করে ফিরে গিয়েছিল। ইতোমধ্যে হঠাৎ শোনা গেল "এতদিন তারা যার জন্য অপেক্ষায় ছিল, তিনি শুভাগমন করেছেন।" তাঁর শুভাগমনে সবাই আনন্দ উচ্ছ্বাসের সাথে অভ্যর্থনা জানাল।

মহানবী ও তাঁর সাথীবর্গ চৌদ্দদিন কুবায় অবস্থান করেন। [কুবায় অবস্থানের ব্যাপারে আরও বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। তিনদিন, চারদিন, পাঁচদিন এবং কোনো বর্ণনায় বাইশ দিনও উল্লেখ রয়েছে। এ সময়েই তিনি কুবায় একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এটিই ইসলামের নির্মিত প্রথম মসজিদ।]

হযরত আলি রাযি.-এর হিজরত

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমানতদারী যেহেতু কাফিরদের নিকটও স্বীকৃত ছিল, তাই তাঁর নিকট লোকেরা আমানত রাখত। হিজরতের সময়ে তিনি হযরত আলি রাযি.-কে এ জন্য রেখে এসেছিলেন, তাঁর নিকট লোকদের যেসব আমানত ছিল তা যেন তিনি তাদেরকে বুঝিয়ে দেন এবং পরে মদিনায় হিজরত করেন।

হিজরি সন গণনা

হিজরতের সময় থেকে হযরত ওমর রাযি. ইসলামি হিজরী সন ও তারিখ চালু করেন এবং মুহররম মাসকে বছরের প্রথম মাস হিসেবে নির্ধারণ করেন।

মদিনায় নবীজির শুভাগমন

রবিউল আউয়াল মাসের জুমার দিন কুবা থেকে বিদায় নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনার দিকে যাত্রা করেন। মদিনাবাসী আনসারগণ আনন্দ-উচ্ছ্বাসের সাথে রাসূলের বাহনের চারদিকে চলছিল। কেউ পদব্রজে আবার কেউ আরোহী হয়ে হুযুরের উটনীর রশি ধরার জন্য প্রত্যেকেই সামনে যেতে চাইছিল। প্রত্যেকের মনের একমাত্র বাসনা ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে অবস্থান করুন। মহিলা ও শিশুরা আনন্দে সঙ্গীত পাঠ করছিল। যেহেতু দিনটি ছিল জুমার (শুক্রবার) দিন। বনু সালিম বিন আউফ গোত্রের আবাসিক এলাকার নিকট জুমার নামাযের সময় হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটনী হতে অবতরণ করলেন এবং জুমার নামায আদায় করে পুনরায় সওয়ার হয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। পথে যে আনসারীর বাড়ি পড়ছিল সেই নিবেদন করছিল,

আমার কুটিরে অবস্থান করুন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা উটনীকে নিজের অবস্থার উপর ছেড়ে দাও। সে আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট। যেখানে অবস্থান করার নির্দেশ আছে সেখানে গিয়ে নিজেই থেমে যাবে। সে মতে উটনী চলতে চলতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাতুল বংশ আদী বিন নাজ্জারের আবাসিক এলাকায় পৌঁছল এবং আবু আইয়ুব রাযি.-এর বাড়ির সামনে গিয়ে উটনী বসে পড়ল। নবীজি হযরত আবু আইয়ুব আনসারি রাযি.-এর ঘরে মেহমান হলেন এবং কিছু দিনের জন্য তাঁর বাড়িতেই অবস্থান করলেন।

মসজিদে নববী নির্মাণ

তখন পর্যন্ত মদীনায় কোনো মসজিদ ছিল না। যেখানে সুযোগ হত সেখানে নামায সম্পন্ন করা হত। অতঃপর উটনী যেখানে বসে ছিল সে জায়গাটি ক্রয় করা হল। সেখানে মসজিদে নববী নির্মাণ করা হয়। এর দেয়াল ছিল কাঁচা ইটের, খুঁটি খেজুর গাছের এবং ছাউনি খেজুর পাতার। কেবলা ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস (যা ছিল তখন পর্যন্ত মুসলমানদের কেবলা)। [এরপর হযরত ওমর রাযি. এর খিলাফতকালে তিনি এখানে আরো জায়গা সম্প্রসারণ করলেন; কিন্তু নির্মাণ পদ্ধতি পূর্ববৎই রাখলেন। এরপর হযরত উসমান রাযি. তাঁর শাসনকালে এতে বিরাট পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করলেন। এলাকা অনেক সম্প্রসারিত হল। দেয়ালগুলো নকশাযুক্ত পাথর, চাঁদির নকশা, খামগুলো নকশাযুক্ত পাথর এবং ছাদ শাল কাঠ দিয়ে তৈরি করা হল। এরপর হযরত ওমর বিন আবদুল আযিয রহ. ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের খেলাফতের সময় তাঁর নির্দেশে মসজিদের আরো পরিবর্ধন করেন এবং আযওয়াজে মুতাহহারাতের হুজরা (উম্মুল মোমিনীনদের বাসস্থান) এতে সংযোগ করে দেন। এরপর ১৬০ হিজরিতে খলিফা মাহদী এবং ২০২ হিজরীতে আল মামুন এতে পরিবর্ধন ও পরিবর্তন সাধন করেন এবং এর ভিত্তিকে খুব শক্ত ও মজবুত করে গড়েন। এরপর উসমানিয়া সুলতানগণ অত্যন্ত সুন্দরভাবে নির্মাণ কাজে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন যা এখন রয়েছে।]

মসজিদ নিমার্ণের সাথে আর দুটি কামরা নির্মাণ করা হয়। একটি হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাযি.-এর জন্য, অপরটি সাওদা রাযি.-এর জন্য। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে নিজের পরিবার পরিজন আনার জন্য মক্কায় পাঠালেন। এ সময় আবু বকর সিদ্দিক রাযি.-ও নিজের পরিবার পরিজনকে মদিনায় আনিয়ে নেন।

উম্মুল মুমিনীন সাওদা রাযি. এবং মহানবীর দু কন্যা ফাতেমা রাযি.-ও উম্মে কুলসুম রাযি. মদিনায় আগমন করেন। তৃতীয় কন্যা যয়নব রাযি.-কে তাঁর স্বামী আবুল আস (যিনি তখনও মুসলমান হন নি) আসতে দিলেন না। এ দিকে আবু বকর সিদ্দিক রাযি.-এর পুত্র আবদুল্লাহ তাঁর মা ও ভগ্নিদ্বয় আয়েশা ও আসমাকে সঙ্গে নিয়ে মদিনায় উপস্থিত হন। এখন মক্কায় শুধু এমন কিছু লোক অবশিষ্ট ছিল যারা সফর করতে সক্ষম

ছিল না। অবশ্য এমন কিছু ব্যক্তিও সেখান থেকে বের হয়ে পড়ছিল যারা মদিনায় পৌঁছার পূর্বে রাস্তায়ই ইনতেকাল করেন।

প্রথম হিজরী

সারিয়ায়ে হামযা ও সারিয়ায়ে উবায়দা রাযি.

এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীর্ঘ ৫৩ বছর জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র পাঠকবৃন্দের সম্মুখে উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে কিছুটা বিস্তারিতভাবে এটিও জানা গেছে, পৃথিবীতে ইসলামের প্রচার প্রসার কিভাবে হয়েছিল এবং প্রতিটি স্তরের ও প্রতিটি গোত্রের যে হাজারো মানুষ হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত ইসলামের গণ্ডির মধ্যে এসে এমনই আসক্ত হয়েছিল, ইসলাম ও ইসলামের পয়গাম্বরকে নিজের অর্থ সম্পত্তি বাপ-দাদা, স্ত্রী-পুত্র এমনকি নিজের জীবনের চেয়েও অধিক প্রিয় মনে করত। তাদের ইসলাম গ্রহণের কী কারণ ছিল ? প্রশাসনের চাপ ও বাধ্যবাধকতা অথবা অর্থের লোভ ও মর্যাদার আশা না কোনো প্রভাবশালী সংগঠন যার তলোয়ার তাদেরকে বাধ্য করেছিল? না অন্য কিছু? কিন্তু যখন এ উম্মী নবীর পবিত্র অবস্থাদির উপর দৃষ্টিপাত করা হবে তখন নিঃসন্দেহে এ সবের উত্তর হবে নেতিবাচক।

স্পষ্টতই যে এতিমের পিতৃছায়া দুনিয়াতে আসার আগেই তার মাথার ওপর থেকে উঠে গিয়েছিল এবং যার শৈশবে ছয় বছর বয়সের সময় মায়ের স্নেহকোলের অবসান হয়েছিল, যার ঘরে মাসের পর মাস আগুন পর্যন্ত জ্বালানোর সুযোগ হয়নি, যার পরিবারের লোকেরা পেট ভরে রুটি খায় নি, যার জীবিত আত্মীয়-স্বজনও এক সত্যবাণী উচ্চারণ করার কারণে শুধু তার থেকে পৃথক নয় বরং ঘোর শত্রু হয়ে গিয়েছিল, তিনি কি কারো ওপর কর্তৃত্ব চালাতে পারতেন কিংবা অর্থের লোভে, তলোয়ারের জোরে কাউকে নিজের সমমনা বানাতে পারতেন?

কুরআনের নির্দেশনা ও আত্মরক্ষামূলক জিহাদ

ইতিহাসগ্রন্থ সামনেই রয়েছে। এতে কোনো প্রকার মতপার্থক্য ব্যতীত বর্ণিত রয়েছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনের তিপ্পান্ন বছর এভাবে কেটেছে, প্রাথমিক নিঃসম্বলতা ও অসহায়ত্বের পর যখন ইসলাম এক ধরণের বাহ্যিক শক্তি লাভও করেছে এবং বড় বড় বীর সাহসী ও ধনী ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তখনও ইসলাম কোনো কাফিরের উপর হাত উঠায় নি বরং জালিমদের জুলুমের জবাব পর্যন্ত দেয় নি। অথচ মক্কার কাফিরদের পক্ষ থেকে শুধু মাত্র মহানবী-এর পবিত্র সত্তায় নয় বরং তার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, আত্মীয়-স্বজন ও অনুসারীদের উপর এমন নির্যাতন চালিয়েছিল যা বর্ণনার অতীত। কুরাইশ কাফিররা, যারা সব ধরণের শক্তি ও প্রভাব রাখত তারা তাঁকে কষ্ট দিতে বরং হত্যা করতে কোনো সম্ভাব্য উপায় হাতছাড়া করে নি। যেমন তিন বছর যাবত তাঁর আত্মীয়-স্বজনসহ অবরুদ্ধ থাকা, তাঁর সাথে সকল কুরাইশদের একেবারে সম্পর্ক ছিন্ন করা, তাঁকে হত্যার চক্রান্ত, সাহাবায়ে কেরামকে সব রকমের কষ্ট দেওয়া ইত্যাদি যা সবই আপনারা অবগত রয়েছেন।

নির্যাতনের যত ধরণ ছিল সবই মুসলমানদের উপর চলেছিল, কিন্তু কুরআন তার অনুসারীদের ধৈর্য, সংযম ও সহনশীল হওয়ার পরামর্শ ছাড়া যুদ্ধ করার অনুমতি দেয় নি। এ সময় যে জিহাদের নির্দেশ ছিল তা হলো কাফিরদের উপদেশমূলক কথা বলে নিজ প্রতিপালকের দিকে দাওয়াত দাও। যদি মুখোমুখি কথাবার্তার সুযোগ আসে তবে সুন্দরভাবে নম্র ভদ্র কথা বলে তাদের প্রতিহত কর এবং কুরআনের স্পষ্ট দলিল প্রমাণের মাধ্যমে মৌন জিহাদ কর যেন তারা সত্যকে বুঝতে পারে।

[পবিত্র কুরআনের আয়াত ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ এর মর্মার্থ এটাই।]

এ সময় পর্যন্ত হাজারো মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে সকল প্রকার বিপদের লক্ষ্যবস্তু হতে রাজি হয়েছিল। স্পষ্টতই তারা কোনো দুনিয়াবী লালসা কিংবা প্রশাসনের চাপ কিংবা তলোয়ারের ভয়ে বাধ্য হতে পারে না এমন উন্মুক্ত নিদর্শন দেখেও ঐ সব লোক কি আল্লাহ থেকে লজ্জা পায় না। যারা ইসলামের সত্যতার উপর প্রলেপ দেওয়ার জন্য বলে থাকে ইসলাম তলোয়ারের জোরে প্রসার লাভ করেছে। তারা কি এর কোনো জবাব দিতে পারে, ওই সব তলোয়ার চালনাকারীদের উপর কারা তলোয়ার চালিয়েছে? যারা শুধু মুসলমান হয় নি বরং ইসলামকে সতেজ রাখার জন্য তলোয়ার ধারণ করে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করার ঝুঁকি নিতে পর্যন্ত সদা প্রস্তুত ছিল? তারা কি বলতে পারবে আবু বকর, ওমর, উসমান ও আলি এঁদের উপর কে তলোয়ার উঁচিয়ে তাদেরকে মুসলমান করেছিল? আবু যর, উনাইস রাযি. এবং এদের গোত্রকে কে বাধ্য করেছিল সকলে এসে মুসলমান হওয়ার জন্য? নাজরানের নাসারাদেরকে কে বাধ্য করল মক্কায় উপস্থিত হয়ে মুসলমান হতে? জেমাদ আযদীকে কে বাধ্য করেছিল, তোফায়েল বিন আমর দৌসী ও তার গোত্রের উপর কে তলোয়ার চালিয়েছিল? বনি আবদে আশহাল গোত্রে কে চাপ দিয়েছিল, মদিনার আনসাদের উপর কার প্রভাব ছিল যে তারা শুধু মুসলমান হয়ে ক্ষান্ত হয় নি বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে সকল দায়িত্ব নিজেদের মাথায় তুলে নিয়েছিল এবং নিজেদের জান-মাল তার জন্য বিলীন করেছিল? বুরাইদা আসলামী রাযি.-কে কে বাধ্য করেছিল, তিনি ৭০ জন মানুষের এক বিরাট জামাত নিয়ে মদিনার পথে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাজির হয়ে স্বেচ্ছায় সাগ্রহে ইসলাম গ্রহণ করলেন? হাবশার বাদশা নাজ্জাশীর উপর কোন তলোয়ার উঠেছিল, নিজের রাজত্ব ও ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও হিজরতের পূর্বেই মুসলমান হয়ে গেলেন? হযরত আবু হিন্দ রাযি., হযরত তামীম রাযি., হযরত নাঈম রাযি. প্রমুখ এদের উপর কে বল প্রয়োগ করেছিল? যার ফলে তারা সিরিয়া থেকে সফর করে তাঁর খেদমতে পৌঁছে এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাসত্বকে বরণ করে নেয়? এ ধরণের শত শত ঘটনায় ইতিহাসের পাতা পরিপূর্ণ। এসব এমন অনস্বীকার্য বাস্তবতা যা পর্যবেক্ষণ করার পর কোনো বিবেকবান

মানুষ এ আস্থা স্থাপন না করে থাকতে পারে না, ইসলাম স্বীয় স্বকীয়তা ও মহিমা প্রচারে কখনো তলোয়ারের মুখাপেক্ষী নয়। [এ সমস্ত ঘটনা সংক্ষিপ্তভাবে রিসালায়ে হামিদিয়া গ্রন্থ হতে নেওয়া হয়েছে।]

ইসলামে জিহাদের বাস্তবতা

জিহাদ ফরয হওয়ার উদ্দেশ্য এ নয়, মানুষের ঘাড়ে তলোয়ার রেখে বলা হবে, মুসলমান হয়ে যাও বা অন্য কোনো প্রকার বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করে তাদেরকে ইসলামে প্রবেশ করানো হবে বরং জিহাদের সাথে জিযিয়ার (যা কাফিরদের নিরাপত্তার জন্য তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হয়) হুকুম এবং কাফিরদেরকে যিম্মী সাব্যস্ত করে তাদের জান-মালের হেফাযত পুরোপুরি মুসলমানদেরই মতো করা সম্পর্কে ইসলামি বিধান স্বয়ং এ প্রমাণ বহন করে, জিহাদ ফরয হওয়ার পরও ইসলাম কোনো কাফিরকে ইসলাম গ্রহণ করার ব্যাপারে কস্মিনকালেও বাধ্যতা আরোপ করে নি। তাই একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য হল-স্থির চিত্তে এ বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করা, ইসলামে কোনো উদ্দেশ্যে ও কী কী উপকারিতার কারণে জিহাদ ফরয করা হয়েছে। তখন তাকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে,

যেমনিভাবে সে ধর্ম পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না যা মানুষকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে জোর করে স্বীয় অনুসারী বানায়, তেমনিভাবে সে ধর্মও পূর্ণাঙ্গ নয় যাতে রাজনীতি নেই এবং সে রাজনীতিও পূর্ণাঙ্গ নয় যার সাথে তরবারী থাকে না।

ধর্মের পূর্ণাঙ্গতা কীসের মধ্যে

রাজনীতিবিহীন ধর্ম পূর্ণাঙ্গ নয় আবার তলোয়ার বা শাসনবিহীন রাজনীতি পরিপূর্ণ নয়। সে চিকিৎসক নিজের পেশায় দক্ষ নয় যে শুধু পট্টি বাঁধতে ও ব্যান্ডেজ লাগাতে জানে, কিন্তু পঁচে যাওয়া ও নষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে অস্ত্রোপচার করতে জানে না। জনৈক কবি বলেন :

کوئی عرب کے ساتھ ہو یا عجم کے ساتھ

کچھ بھی نہیں ہے تیغ نہ جب قلم کے ساتھ

তুমি আরব জোটেই থাক বা আজম জোটে, কিছুই তোমার থাকবে না, যদি কলম-তরবারী এক সাথে না রাখ।

বিষয়টি গভীরভাবে বুঝে অনুধাবন করার চেষ্টা করুন। বাস্তবিক পৃথিবীর পুরো দেহতেই যখন শিরকের বিষাক্ত জীবাণু সৃষ্টি হয়ে গেছে তখন করুণাময় আল্লাহ তাআলা তার জন্য একজন সংস্কারক ও দয়ালু চিকিৎসক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠালেন। যিনি ৫৩ বছর পর্যন্ত একাধারে তার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও শিরা-উপশিরা সংশোধনের চিন্তা করেন। যার ফলে সংশোধনযোগ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ সুস্থ হয়েছে। কিন্তু কিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেগুলো একবারে পঁচে গেছে তা সুস্থ করার কোনো উপায় নেই বরং আশঙ্কা দেখা দিল, তার বিষ সর্বশরীরে ছড়িয়ে পড়বে। তখন চিকিৎসা

বিজ্ঞানের নীতিমালা অনুযায়ী প্রকৃত দয়া ও প্রজ্ঞার দাবি ছিল, অপারেশনের মাধ্যমে সে অঙ্গগুলো দেহ থেকে ফেলে দেয়া। এটাই জিহাদের স্বরূপ ও বাস্তবতা। এটাই সকল আত্মরক্ষামূলক ও আক্রমণমূলক জিহাদ অভিযানের মৌলিক উদ্দেশ্য।

রণক্ষেত্রে কাকে হত্যা করা যাবে

রণক্ষেত্রে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ও যুদ্ধের সময় নিজ প্রতিপক্ষের সেসব লোককে হত্যা করার অনুমতি ইসলাম দেয়, যাদের ব্যাধি সংক্রামক ছিল অর্থাৎ যারা ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য পরিকল্পনা করত এবং যুদ্ধে অবতীর্ণ হত। এমন পরিস্থিতিতেও তাদের স্ত্রী, শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুদ্ধ বিরত ধর্মীয় পুরোহিতরাও রণাঙ্গনে হত্যার পর্যায় থেকে মুক্ত ছিল। যেসব লোক চাপে পড়ে যুদ্ধ করতে এসেছে তারাও মুসলমানদের হাত থেকে নিরাপদ ছিল।

ইকরামা রাযি. বর্ণনা করেন, বদর যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হাশিম গোত্র থেকে আগত কোনো ব্যক্তি তোমাদের সামনে পড়লে তাকে হত্যা করো না। কেননা, তারা স্বেচ্ছায় যুদ্ধে আসে নি। তাদেরকে বাধ্য করে আনা হয়েছে। (কানয)

যুদ্ধে আগত এবং যোদ্ধাদের মধ্য থেকে যতদুর সম্ভব সে সব মানুষকে বাঁচানো হত যাদের উন্নত চরিত্র এবং ভালো ব্যবহার সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবগত ছিলেন।

যে সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের জন্য যাচ্ছিলেন, তখন পথিমধ্যে এক ব্যক্তি হুযুরের খেদমতে উপস্থিত হল। সে হুযুরের জিহাদের পরিকল্পনাকে স্বাভাবিক জাহিলীযুগের যুদ্ধের মতো মনে করে বলল, আপনি যদি রূপসী রমণী এবং লাল উট পেতে চান তবে মুদাল্লাজ গোত্রের ওপর আক্রমণ করুন। (তাহলে উক্ত জিনিস দুটি অধিক পরিমাণ পাবেন) কিন্তু তার জানা ছিল না, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্ধি ও যুদ্ধের মধ্যে সম্পূর্ণ ভিন্নতর উদ্দেশ্য ছিল। তিনি বললেন, আল্লাহ আমাকে উক্ত গোত্রের ওপর যুদ্ধ চালাতে নিষেধ করেছেন। কারণ, তারা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে। —ইয়াহইয়া উলুমুদ্দিন

হযরত আলী রাযি. থেকে এক হাদীসে বর্ণিত আছে, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট সাতজন যুদ্ধবন্দী হাযির করা হলে তিনি তাদেরকে হত্যার হুকুম দেন। তখন জিবরাঈল আ. আগমন করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাদের ছয় জনকে হত্যার হুকুম বহাল রাখুন কিন্তু এই এক ব্যক্তিকে আজাদ করে দিন। তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করলে বললেন, সে ভালো চরিত্রের অধিকারী এবং দানশীল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, এটা আপনার নিজের পক্ষ থেকে বলছেন, না আল্লাহর হুকুম? তিনি বললেন, আল্লাহ আমাকে এ হুকুম দিয়ে পাঠিয়েছেন। (কানয : ১৩৫)

জিহাদ ও পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বরূপ

জিহাদ কখনো সভ্যতার দাবিদার ইউরোপীয় জাতিসমূহের মতো বিশ্বব্যাপী ধ্বংসলীলা ও আতংক সৃষ্টিকারী যুদ্ধের মতো ছিল না। যাদের চিন্তা-চেতনায় ব্যক্তি বা জাতিগত আক্রোশই ঠাঁই পায়। ফলে নির্বিচারে দোষী, নির্দোষ, অপরাধী, নিরাপরাধ এমনকি শহরের পর শহর নির্দয়ভাবে ধ্বংস করা হয়। মরহুম আকবর চমৎকার বলেছেন :

ہو رہا ہے مفاذ حکم فنا + نہ مکیں اس سے بچتے ہیں نہ مکاں

توپیں خود آب تو میدان میں + پڑھتی ہیں کل من علیھا فان

ধ্বংসের বাণী বিনাশিল যথা ঘর-দোর আর মানুষের জান

তোপের আঘাত ময়দান কাঁপে পড়ে কুল্লুমান আলাইহা ফান

আসল ব্যাপার হল, মানুষ অন্যের চোখে পতিত সামান্য খড়কুটাকে দেখতে পায় কিন্তু নিজের চোখের কড়িকাঠকেও উপেক্ষা করে চলে।

اپنے عیبوں کی نہ کچھ پرواہ ہے + غلط الزام بس اوروں پہ لگار کھا ہے

یہی فرماتے رہے تیغ سے پھیلا ہے اسلام + یہ نہ ارشاد ہوا توپ سے کیا پھیلا ہے

আকবর রহ. বলেন-

পরোয়া নাহি আপন দোষের এলজাম ছেড়ে মানুষে গায়

ছড়াল ইসলাম তলোয়ার জোরে এমন কুৎসাও মানুষ গায়?

কামান বারুদ করিল কি ভবে দাওনা জবাব তার তরে?

সারকথা হল, আত্মরক্ষা ও আক্রমণাত্মক জিহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল উত্তম চরিত্রের বিকাশ সাধন, ইসলামের সংরক্ষণ এবং ইসলাম প্রচারের পথে যেসব প্রতিবন্ধকতা আরোপ করা হত তা অপসারণ করা। (১) যমীনের উপর যা কিছু আছে সব ধ্বংসশীল। (২) যদি ইউরোপের রক্তাক্ত ইতিহাস সামনে রাখা হয়, যা ইংল্যান্ডের উত্থান ও পতনের সাথে সম্পর্কিত, তাহলে তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির রহস্য উদঘাটিত হয়ে যাবে। কেননা স্বয়ং ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের বর্ণনা ও স্বীকারোক্তি অনুযায়ী যেখানে দেখা যায়, নবম শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত গোলাগুলি, হত্যা গুম প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার জুলুম অত্যাচারের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে খ্রিস্টবাদে বাধ্য করা হয়েছে। লাখো লাখো আল্লাহর বান্দাকে জ্বালিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। হাজার হাজারকে হত্যা করা হয়েছে। লাখো লাখো মানুষকে গ্রেফতার করে তাদের সন্তানদের যবেহ করা হয়েছে, লাখো মুসলমান স্বীয় ধর্ম রক্ষার জন্য হিজরত করতে বাধ্য হয়েছে।

গ্রানাডার ময়দানে মুসলমানদের লিখিত ৮০ হাজার একান্ত মূল্যবান ও দুষ্পাপ্য কিতাব আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। ষোড়শ শতাব্দীতে রাজা ফিলিপ স্বীয়

শাসনভূক্ত এলাকায় আরবি ভাষায় একটা বাক্য উচ্চারণ করাও অপরাধ বলে ঘোষণা করেছে। কর্ডোভার অদ্বিতীয় জামে মসজিদে বিভিন্ন প্রকার গীর্জা তৈরি করা হয়েছে। এখানকার আল-হামরা ও মদীনাতুয যুহরা প্রাসাদ যা সারা দুনিয়ার অদ্বিতীয় ইমারত ছিল এবং যা ১২ হাজার গম্বুজ বিশিষ্ট হয়ে নির্মিত হয়েছিল। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর আওয়াজ এখানে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হত, এতে ক্রুশ স্থাপন করা হয়েছিল ও গীর্জায় পরিণত করা হয়েছিল, যা আজও বিদ্যমান রয়েছে। (এ সমস্ত বিষয় আল্লামা মুহাম্মদ করদে আলি রচিত غابر الاندلس وحاضرها গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, যাতে ইংল্যান্ডের অতীত ও বর্তমানকালের তুলনামূলক আলোচনা করে দেখিয়েছেন।

পর্যালোচনা

উল্লিখিত সকল ঘটনা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, ইউরোপীয় ঐতিহাসিক এবং মার্গোলিয়াস প্রমুখের এ ধারণা মিথ্যা ও ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়, ইসলামি জিহাদ দ্বারা মানুষকে মুসলমান বানাতে বাধ্য করা হয় এবং লুটপাট করে জীবিকার সংস্থান করা হয়। এমনিভাবে ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং সাহাবাগণের কর্ম তৎপরতা একত্র করলে সন্দেহের অবকাশ থাকে না, ইসলাম যেমন প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ ফরয করেছে তেমনি অগ্রসরমান ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রচারের ক্ষেত্রে বাধাবিপত্তি নিরসন করার জন্য আক্রমণাত্মক জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত অপরিহার্য করেছে। আত্মরক্ষামূলক জিহাদের উদ্দেশ্য যেমনি মানুষকে জোরপূর্বক মুসলমান বানানো নয় তেমনি আক্রমণাত্মক জিহাদের উদ্দেশ্য তা হতে পারে না।

বিশেষত কাফেররা কুফরিতে বহাল থেকে প্রতিপক্ষ হয়ে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে সে ক্ষেত্রেও ইসলামের উদারনীতি তাদের জানমাল ইজ্জত-আবরু হেফাযত করতে প্রস্তুত, যেমনিভাবে একজন মুসলমানের জান-মাল ইত্যাদির হেফাযত করে যাচ্ছে। তাই উভয় জিহাদই মূলত সমান কল্যাণকর। এ ছাড়াও বিশ্বের বুকে যথাযথ শান্তি ও নিরপত্তা পুনঃপ্রতিষ্ঠা, দুর্বলকে জালেম ও সবলের কবল থেকে মুক্ত করা ইত্যাদি যা জিহাদের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। সে ক্ষেত্রে উভয় প্রকার জিহাদ এক ও অভিন্ন।

সুতরাং আর কোনো কারণ থাকতে পারে না, ইসলামের অতীত ঐতিহ্যকে বিকৃত করে আক্রমণাত্মক জিহাদকে অস্বীকার করতে হবে। যেমন ইদানীং কোনো কোনো স্বাধীনচেতা ইতিহাসবিদ আক্রমণাত্মক জিহাদকে অস্বীকার করে বসেছেন।

গাযওয়া ও সারিয়ার সংখ্যা

হিজরতের পর যখন ইসলাম মদিনায় এক প্রকার রাষ্ট্রীয় শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামকে জিহাদের অনুমতি প্রদান করা হয় এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালিত হতে লাগল।

কোনো কোনো জিহাদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সশরীরে উপস্থিত হন। আবার কোনো কোনোটিতে বিশেষ বিশেষ সাহাবার নেতৃত্বে সৈন্য পাঠানো হয়।

ঐতিহাসিকদের পরিভাষায় প্রথম প্রকার জিহাদকে গাযওয়া এবং দ্বিতীয় প্রকারকে সারিয়া বলা হয়। গাযওয়ার মোট সংখ্যা ২৩। তন্মধ্যে ৯টিতে যুদ্ধ হয় অন্যগুলোতে হয় নি। সারিয়া মোট ৪৩ টি। কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার হল, এ সব যুদ্ধে মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা সমরসজ্জা ও রসদ-পত্র স্বল্প হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিজয় তাদের পক্ষেই ছিল। শুধুমাত্র ওহুদের যুদ্ধে মুসলিম সেনাদের একটি অংশের রাসূলের আদেশ পালনে অসাবধানতার কারণে প্রথমে বিজয় সূচিত হলেও পরে পরাজয় হয়।

হিজরিসন ভিত্তিক গাযওয়া ও সারিয়ার পরিসংখ্যান

প্রথম হিজরি

গাযওয়া : এ বছর কোনো গাযওয়া সংঘটিত হয় নি।

সারিয়া : এ বছর মোট ২ টি সারিয়া সংঘটিত হয়। (১) সারিয়ায়ে হামযা রাযি. (২) সরিয়ায়ে উবায়দা রাযি.

দ্বিতীয় হিজরি

গাযওয়া : এ বছর মোট ৫ টি গাযওয়া সংঘটিত হয়। যথা : (১) গাযওয়ায়ে আবওয়া (ওয়াদ্দান), (২) গাযওয়ায়ে বুওয়াত, (৩) গাযওয়ায়ে বদরে কুবরা, (৪) গাযওয়ায়ে বনি কাইনুকা, (৫) গাযওয়ায়ে সাবীক।

সারিয়া : মোট ৩ টি সারিয়া সংঘটিত হয়। যথা : (১) সারিয়ায়ে আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ রাযি. (২) সারিয়ায়ে উমাইর রাযি. (৩) সারিয়ায়ে সালিম রাযি.।

তৃতীয় হিজরি

গাযওয়া : এ বছর মোট ৩ টি গাযওয়া সংঘটিত হয়। যথা : (১) গাযওয়ায়ে গাতফান, (২) গাযওয়ায়ে উহুদ, (৩) গাযওয়ায়ে হামরাউল আসাদ।

সারিয়া : এ বছর ২টি সারিয়া পাঠানো হয়। যথাঃ (১) সারিয়ায়ে মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রাযি. (২) সারিয়ায়ে যায়েদ ইবনে হারিসা রাযি.। এ বছরের অভিযানগুলোর মধ্যে উহুদ যুদ্ধই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

চতুর্থ হিজরি

গাযওয়া : এ বছর মোট ২টি গাযওয়া সংঘটিত হয়। যথা : (১) গাযওয়ায়ে বনু নাযীর, (২) গাযওয়ায়ে বদরে সুগরা।

সারিয়া : এ বছর ৪ টি সারিয়া পাঠানো হয়। যথা : (১) সারিয়ায়ে আবূ সালামা, (২) সারিয়ায়ে আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস রাযি. (৩) সারিয়ায়ে মুনযির রাযি. (৪) সারিয়ায়ে মারসাদ রাযি.

পঞ্চম হিজরি

গাযওয়া ঃ এ বছর মোট ৪টি গাযওয়া সংঘটিত হয়। যথাঃ (১) গাযওয়ায়ে যাতুর রিকা, (২) গাযওয়ায়ে দাউমাতুল জান্দাল (৩) গাযওয়ায়ে মুরাইসি (বনী মুস্তালিক), (৪) গাযওয়ায়ে খন্দক। এ গুলোর মধ্যে খন্দকের যুদ্ধ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

সারিয়া ঃ এ বছর সারিয়া যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি।

ষষ্ঠ হিজরী

গাযওয়া : এ বছর মোট ৩টি গাযওয়া সংঘটিত হয়। যথা : (১) গাযওয়ায়ে বনি লাহইয়ান, (২) গাযওয়ায়ে গাবা, (৩) গাযওয়ায়ে হুদাইবিয়া।

সারিয়া : এ বছর ১১ টি সারিয়া পাঠানো হয়। যথা : (১) সারিয়ায়ে মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রাযি. (২) সারিয়ায়ে মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা রাযি. (৩) সারিয়ায়ে আক্কাস রাযি. (৪) সারিয়ায়ে যায়েদ ইবনে হারিসা রাযি. (৫) সারিয়ায়ে আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. (৬) সারিয়ায়ে আবদুল্লাহ ইবনে আতীক রাযি. (৭) সারিয়ায়ে আলি রাযি. (৮) সারিয়ায়ে যায়েদ ইবনে হারিসা রাযি. (৯) সারিয়ায়ে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি. (১০) সারিয়ায়ে কুরয ইবনে জাবের রাযি. (১১) সারিয়ায়ে আমরুদ দামরী রাযি.।

সপ্তম হিজরি

গাযওয়া : এ বছর শুধু গাযওয়ায়ে খায়বর সংঘটিত হয়। যা গুরুত্বপুর্ণ অভিযানগুলোর একটি।

সারিয়া : এ বছর ৫ টি সারিয়া পাঠানো হয়। যথা : (১) সারিয়ায়ে আবু বকর সিদ্দীক রাযি. (২) সারিয়ায়ে বিশর ইবনে সাদ রাযি. (৩) সারিয়ায়ে গালিব ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. (৪) সারিয়ায়ে বাশীর রাযি. (৫) সারিয়ায়ে আকরাম রাযি.।

অষ্টম হিজরি

গাযওয়া : এ বছর মোট ৪টি গাযওয়া সংঘটিত হয়। যথা : (১) গাযওয়ায়ে মুতা, (২) গাযওয়ায়ে ফাতহে মক্কা, (৩) গাযওয়ায়ে হুনাইন, (৪) গাযওয়ায়ে তায়েফ।

সারিয়া : এ বছর ১০ টি সারিয়া পাঠানো হয়। যথা : (১) সারিয়ায়ে গালিব বনীল মুলাকি অভিমুখে (২) সারিয়ায়ে গালিব ফাদাক অভিমুখে (৩) সারিয়ায়ে শূজা (৪) সারিয়ায়ে কাব (৫) সারিয়ায়ে আমর ইবনুল আস (৬) সারিয়ায়ে আবু উবাইদা বিন জাররাহ (৭) সারিয়ায়ে আবু কাতাদাহ (৮) সারিয়ায়ে খালিদ (৯) সারিয়ায়ে তোফায়েল বিন আমর দাউসী (১০) সারিয়ায়ে কাতবা।

নবম হিজরি

গাযওয়া : এ বছর মোট ১টি মাত্র গাযওয়া সংঘটিত হয়। যথা : (১) গাযওয়ায়ে তাবুক।

সারিয়া : এ বছর ৩ টি সারিয়া পাঠানো হয়। যথা : (১) সারিয়ায়ে আলকামা রাযি. (২) সারিয়ায়ে আলি রাযি. (৩) সারিয়ায়ে উকাশা রাযি.।

দশম হিজরি

গাযওয়া : এ বছর কোনো গাযওয়া সংঘটিত হয় নি।

সারিয়া : এ বছর ২ টি সারিয়া পাঠানো হয়। যথা : (১) সারিয়ায়ে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ (২) সারিয়ায়ে আলি রাযি.

একাদশ হিজরি

গাযওয়া : এ বছর কোনো গাযওয়া সংঘটিত হয় নি।

সারিয়া : এ বছরই বিদায় হজ অনুষ্ঠিত হয়। তবে এ বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি মাত্র সারিয়া হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রাযি.-এর নেতৃত্বে প্রেরণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যা তাঁর ইনতেকালের পর রওনা হয়েছিল। গাযওয়া মোট ২৩ টি। সারিয়া মোট ৪৩ টি।

উল্লেখ্য, হাদিস ও ঐতিহাসিকগণের পরিভাষায় অতি সাধারণ ঘটনাকেও গাযওয়া ও সারিয়া হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন ২/১ ব্যক্তি কোনো অপরাধীকে বন্দী করতে গেল, বা কয়েকজন লোক কোনো সাধারণ গোত্রের সংশোধন বা খোঁজ-খবর নিতে গেল। এমন স্বাভাবিক ঘটনাকে সারিয়া হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। গাযওয়া শব্দটিও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ কারণে উভয় প্রকারের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় (২৩+৪৩)=৬৬। নতুবা আমাদের প্রয়োগ অনুযায়ী জিহাদ ও গাযওয়া দ্বারা যে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধকে বুঝানো হয় তা এ সবের কয়েকটিই মাত্র। এ যুদ্ধসমূহের বর্ণনা কিছুটা বিস্তারিতভাবে পাঠকদের সামনে পেশ করা হল।

গুরুত্বপূর্ণ গাযওয়া ও সারিয়া

হযরত হামযা রাযি.-এর নেতৃত্বে প্রথম সারিয়া

হিজরতের সাত মাস পর পবিত্র রমজান মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হামযা রাযি. কে ৩০ সদস্যের মুহাজির দলের আমীর মনোনীত করে একটি সাদা ঝান্ডাসহ কুরাইশদের এক কাফেলা অভিমুখে পাঠালেন। কিন্তু তারা যখন সমুদ্র উপকূলে পৌঁছে পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হলেন তখন মাজদী বিন আমর জাহমী তাদের মধ্যে মধ্যস্থতা করে যুদ্ধ বন্ধ করে দিলেন।

ইসলামের ইতিহাসে প্রথম তীর নিক্ষেপের ঘটনা

প্রথম হিজরির শাওয়াল মাসে হযরত উবাইদা ইবনুল হারিসকে ৩০ সদস্যের আমীর বানিয়ে "বাতনে রাবেগ" এর দিকে আবু সুফিয়ানের মোকাবেলা করার জন্যে পাঠান হয়। এ জিহাদেই সর্বপ্রথম সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস রাযি. কাফিরদের ওপর তীর নিক্ষেপ করেন। আর এটাই ছিল ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম তীর যা (মুসলমানদের পক্ষ হতে) কাফেরদের উপর নিক্ষেপ করা হয়।

কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে, উক্ত সারিয়া দ্বিতীয় হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে রওনা হয়। অন্য রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে, গাযওয়ায়ে আবওয়ার পর পাঠানো হয়েছে। কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে, উক্ত সরিয়া দ্বিতীয় হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে রওনা হয়। অন্য রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে, গাযওয়ায়ে আবওয়ার পর পাঠানো হয়েছে।

দ্বিতীয় হিজরী

কেবলা পরিবর্তন

ইসলামের ইতিহাসে এ হিজরী সনে এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয় তা হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনের ঐকান্তিক ইচ্ছানুযায়ী বায়তুল মুকাদ্দাসের পরিবর্তে কাবা শরীফকে মুসলমানদের কেবলা নির্ধারণ করা হয়। এ কাবা শরীফই পৃথিবীর প্রথম ঘর এবং এরই দিকে মুখ করে আল্লাহ পাকের ইবাদতের জন্যে জমা হওয়ার লক্ষ্যে এটাকে মানুষের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু বানানো হয়। এই পরিবর্তনকে তাহবীলে কেবলা বলে।

ইসলামের প্রথম গনিমত

এ সনের রজব মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশকে ১২ সদস্যের এক মুহাজির দলের আমীর বানিয়ে কুরাইশ কাফেলার মোকাবেলায় প্রেরণ করেন। যেদিন কাফেলা মুখোমুখি হয়, ঘটনাক্রমে সেদিনটি ছিল রজব মাসের প্রথম তারিখ। ইসলামের প্রথম যুগে যে চার মাসে যুদ্ধবিগ্রহ হারাম ছিল, রজব মাস তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু সাহাবাগণ সে তারিখটিকে জুমাদাস সানী মাসের ত্রিশ তারিখ মনে করেছিলেন। পরে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, মোকাবেলা করা হবে। শেষ পর্যন্ত মোকাবেলা হলে প্রতিপক্ষের কাফেলার প্রধান নিহত ও অপর দুজন বন্দি হওয়ার পর অবশিষ্ট সকলে পালিয়ে গেল এবং প্রচুর গনিমতের মাল মুসলমানদের হস্তগত হল। মুসলিম সেনাপতি তা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদের মাঝে বন্টন করে এক পঞ্চমাংশ বায়তুল মালের জন্য আলাদা করে রাখলেন। কোনো কোনো বর্ণনা মতে সমস্ত গনিমতের মাল নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হলে তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে নিষিদ্ধ মাস অর্থাৎ রজব মাসে যুদ্ধ করার অনুমতি দেইনি। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদর যুদ্ধ হতে ফারেগ হওয়ার পর এ যুদ্ধের মালে গনিমতের সাথে উক্ত মাল বন্টন করে দেন।

এ ঘটনার পর সমগ্র আরবে প্রচার হয়ে গেল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষিদ্ধ মাসগুলোতেও যুদ্ধ-বিগ্রহ জায়েয করে দিয়েছেন। এ সময় তাদের অপপ্রচারের জবাবে আয়াতটি নাযিল হয় :

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ

"তারা আপনাকে নিষিদ্ধ মাসে লড়াই করা সম্পর্কে প্রশ্ন করে।"

বদর যুদ্ধ

মদিনা মুনাওয়ারা থেকে প্রায় ৮০ মাইল দূরে অবস্থিত একটি কূপের নাম বদর। এ কূপের নামানুসারে একটি জনপদও সেখানে গড়ে উঠেছে। ইতিহাস প্রসিদ্ধ এ বদর যুদ্ধ সেখানেই সংঘটিত হয় যার সংক্ষিপ্ত ঘটনা নিম্নরূপ :

যেহেতু কুরাইশদের সকল গর্ব ও অহংকারের মূল ও শক্তি সাহসের কারণ ছিল সিরিয়ার সঙ্গে অতি প্রাচীন কালের বাণিজ্যিক সম্পর্ক। তাই রাজনৈতিক কৌশল অনুযায়ী তাদের এ শক্তি ও অহমিকা খর্ব করতে হলে উক্ত বাণিজ্য ধারাটি বন্ধ করা ছিল অপরিহার্য।

সে সময় কুরাইশদের একটা বিরাট বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়া থেকে ফিরছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সংবাদ পেয়ে দ্বিতীয় হিজরী ১২ই রমযান তিনশ চৌদ্দজন মুহাজির ও আনসার সাহাবী সঙ্গে নিয়ে স্বয়ং তাদের মোকাবেলার জন্য বের হন। রাওহা নামক স্থানে পৌঁছে তাবু স্থাপন করলেন। রাওহা মদিনার দক্ষিণে অবস্থিত চল্লিশ মাইল দূরবর্তী একটি স্থানের নাম।

এদিকে কুরাইশ কাফেলার সর্দার এ সংবাদ পেয়ে চিরাচরিত উক্ত রাস্তা ছেড়ে কাফেলা নিয়ে সমুদ্র উপকূল দিয়ে অগ্রসর হতে লাগলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে একজন সাওয়ারীকে দ্রুত মক্কায় এ সংবাদ দিয়ে পাঠালেন, কুরাইশগণ যেন (সংবাদ পাওয়ামাত্র) সর্বশক্তি নিয়ে ঘটনাস্থলে এসে তাদের বাণিজ্য কাফেলাকে রক্ষা করে। কুরাইশগণ পূর্ব হতেই মুসলমানদের সমূলে ধ্বংস করার পরিকল্পনা রত ছিল। এ সংবাদ মক্কায় পৌঁছামাত্র ৯শ ৫০ জন যুবকের একটি বিরাট বাহিনী যার মধ্যে একশ জন অশ্বারোহী এবং সাতশ' উট ছিল। মুসলমানদের মোকাবেলা করার জন্য রওনা হল। এ বাহিনীর মধ্যে কুরাইশদের সব বড় বড় সর্দার এবং বিত্তশালী ব্যক্তিবর্গ শরীক ছিল।

সাহাবীদের আত্মোৎসর্গ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সংবাদ পেয়ে সাহাবীগণের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক এবং অন্যান্য সাহাবী তাদের নিজ নিজ জান ও মাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পেশ করে দিলেন। উমায়ের বিন ওয়াক্কাস রাযি. তখন অল্প বয়স্ক ছিলেন, তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিহাদে শরিক হওয়া থেকে বিরত রাখলে তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দিলেন এবং তিনিও জিহাদে শরিক হন। আনসারদের মধ্য হতে খাযরাজ গোত্রের সর্দার সাদ ইবনে উবাদা দাঁড়িয়ে বললেন, "আল্লাহর কসম! আপনার হুকুমে আমরা সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তেও প্রস্তুত। (কানজুল উম্মাল : ১/২৭০)

মুসলিম ও বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত মিকদাদ রাযি. আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার ডানে-বামে এবং সামনে-পিছনে থেকে যুদ্ধ করব। তার এ বক্তব্য শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই খুশি হলেন এবং তাদেরকে সামনে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন। বদরের নিকট পৌঁছে জানা গেল আবু সুফিয়ান তার বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে নিরাপদ স্থানে চলে গেছে এবং কুরাইশদের এক

বিশাল বাহিনী এ ময়দানের অপর প্রান্তে আশ্রয় নিয়েছে। কাফেলা নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়ার পরও আবু জাহেল লোকদেরকে যুদ্ধ বন্ধ না করার পরামর্শ দিল।

মুসলমান মুজাহিদগণ এ সংবাদ পেয়ে সম্মুখে অগ্রসর হন। কিন্তু কুরাইশগণ পূর্ব হতেই ময়দানের কৌশলগত ও সুবিধাজনক স্থান দখল করে নিয়েছিল। পানির সকল সুযোগ সুবিধাও তাদের দিকেই ছিল। মুসলমান সৈন্যদের ভাগ্যে এমন স্থান জুটল যেখানে চলাফেরা ছিল কষ্টকর আর পানির তো নাম গন্ধও ছিল না।

গায়েবি সাহায্য

কিন্তু আল্লাহ পাক তো পূর্বেই বিজয় এবং সাহায্যের অঙ্গীকার করেছিলেন। তিনি এমনই করলেন, যুদ্ধের সময় বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ায় জমিনের বালুকারাশি জমে গেল যার ফলে সমস্ত সৈন্য তৃপ্তি সহকারে পানি পান করল এবং তাদের নিজ নিজ পাত্রসমূহ ভরে নিল। আর বাকি পানি মাটিতে চৌবাচ্চা বানিয়ে আটকিয়ে রাখল। অন্যদিকে উক্ত বৃষ্টি কাফিরদের মাটিকে এমন কর্দমাক্ত করে দিল, তাদের চলাফেরা দুষ্কর হয়ে পড়ল। উভয় দল যখন যুদ্ধের জন্যে মুখোমুখি হল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের সারি ঠিক করার জন্যে স্বয়ং দাঁড়িয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ খোদায়ী সৈন্যরা এক দুর্ভেদ্য প্রাচীররূপে দাঁড়িয়ে গেল।

মুসলমানদের অঙ্গীকার পূরণ

যখন তিনশ নিরস্ত্র মানুষের মোকাবেলায় এক হাজার সশস্ত্র যোদ্ধা অগ্রসর হয়। এ মুহূর্তে যদি একটি লোকও মুসলমানদের সাহায্যে এগিয়ে আসে তবে তা বিরাট গনিমত বিবেচিত হওয়ার কথা। কিন্তু ইসলামে অঙ্গীকার এসব কিছুর চেয়েও অগ্রগণ্য। ঠিক যুদ্ধ শুরুর মুহূর্তে হযরত হুযাইফা এবং আবু হাসান নামক দু সাহাবী যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য এসে পৌঁছেন। কিন্তু পথিমধ্যের ঘটনা বর্ণনা করে তাঁরা বলেন, কাফেরগণ আমাদের পথরোধ করে জিজ্ঞাসা করেছিল, তোমরা কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহায্যের জন্যে যাচ্ছ? আমরা তখন অস্বীকার করি এবং যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করার অঙ্গীকার করে ফেলি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাদের এ অঙ্গীকারের কথা জানতে পারলেন, তখন তিনি উভয়কে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ থেকে নিষেধ করে বললেন, আমরা সর্বাবস্থায়ই অঙ্গীকার পালন করে যাব। আমাদের জন্যে আল্লাহর সাহায্যই যথেষ্ট। (মুসলিম)

যুদ্ধের কাতার রচনা শেষ হলে সর্ব প্রথম কুরাইশদের তিন বাহাদুর এগিয়ে এল, আর মুসলমানদের মধ্য হতে হযরত আলি রাযি. হযরত হামযা এবং উবায়দা ইবনুল হারিস রাযি. তাদের মোকাবেলা করলেন। সংঘর্ষে তিন কাফেরই প্রাণ হারাল আর মুসলমানদের মধ্য হতে শুধু উবায়দা রাযি. আহত হলেন। হযরত আলি রাযি. তাঁকে কাঁধে তুলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে স্বীয় পা মোবরকের ওপর ঠেস দিয়ে শোয়ায়ে নিজ হাতে তার চেহারার ধুলো-বালি মুছে দিতে লাগলেন। কবি বলেন :

دامن سے وہ پونچھتا ہے آنسو + روزے کا کیا آج ہی مزہ ہے

আঁচলে চক্ষু মুছে তিনি করলেন সোহাগ মোরে

চোখের অশ্রুতেও যে এত সুখ আছে; জানবে তা কেমন করে?

হযরত উবাইদা রাযি. মুমূর্ষাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কি শাহাদাতের মর্যাদা লাভে বঞ্চিত হলাম? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না বরং তুমি শহিদ এবং আমি স্বয়ং এর ওপর সাক্ষী রইলাম। তখন উবাইদা রাযি. খুশিতে বলতে লাগলেন, আজ যদি আবু তালিব জীবিত থাকতেন তবে তাকে স্বীকার করতে হত, আমিই তার কবিতার যোগ্যতার অধিকারী।

হযরত উবাইদা রাযি. শাহাদাত বরণ করলে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কবরে রাখলেন এবং নিজ হাতে দাফন করলেন। সমস্ত সাহাবাদের মধ্যে এ বিশেষ মর্যাদা কেবল মাত্র হযরত উবাইদা রাযি. এর ভাগ্যেই জুটেছিল।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আবু তালেব সর্বদা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহায্য ও সহযোগিতায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি স্বীয় সহযোগিতার আবেগ নিম্নবর্ণিত কবিতার মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন :

كَذَبْتُمْ وَبَيْتُ اللهِ نَبْرِىْ مُحَمَّدًا + وَلَمَّا نُطَاعِنْ دُوْنَهٗ وَنُنَاضِلُ

وَنُسْلِمُهٗ حَتّٰى نُصَرَّعَ حَوْلَهٗ + وَنُذْهَلُ عَنْ اَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلُ

"আল্লাহর ঘরের শপথ, তোমাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোনো যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াই মৃত্যুবরণ করতে দেব, যে পর্যন্ত না আমাদের লাশ তাঁর চতুর্দিক পড়ে থাকবে এবং আমরা স্বীয় সন্তানাদি ও স্ত্রীদেরকে ভুলে যাব। (কানয : ৫/২৭২)

بچہ ناز رفتہ باشد ز جہاں نیاز مندی

کہ بوقت جاں سپردن بسرش رسیدہ باشی

দুনিয়ার সম্পদ লাভে কি গৌরব করার আছে? আল্লাহ ও তার রাসূলের সন্তুষ্টিই তো প্রকৃত গৌরব। তাই মরণেও আনন্দ।

বিস্ময়কর আত্মোৎসর্গ

যখন উভয় পক্ষ পরস্পর মুখোমুখি হল, তখন দেখা গেল, বহু আপনজন ও কলিজার টুকরা তলোয়ারের নাগালের মধ্যে আছে। কিন্তু এহেন মুহূর্তেও আল্লাহর সৈনিকদের বিশ্বাস ছিল :

ہزار خویش کہ بیگانہ از خدا باشد + فدائے یک تن بیگانہ کاشنا باشد

অর্থাৎ, যতই নিকটাত্মীয় হোক না কেন, যে আল্লাহ তাআলার সম্পর্ক থেকে দূরে, তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক হতে পারে না। ওই ব্যক্তির উপর জীবন উৎসর্গ, যে সত্যের অনুসন্ধানকারী।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযি. এর পুত্র (যিনি তখনও কাফির ছিলেন) যখন মাঠে আসলেন, তখন স্বয়ং হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযি.-এর তরবারি তার দিকে অগ্রসর হল। উতবা সামনে আসামাত্র তার পুত্র হযরত হোযায়ফা রাযি. তরবারি উচিয়ে বের হয়ে আসলেন। হযরত ওমর রাযি.-এর মামা ময়দানে অগ্রসর হলে "ফারুকি তলোয়ার" স্বয়ং তার মীমাংসা করে দিল। তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। একদিকে যুদ্ধের ভয়াবহতা বৃদ্ধি পেয়েছে অন্যদিকে সাইয়্যিদুনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদায় পড়ে আল্লাহর সাহায্য কামনায় রত আছেন। অবশেষে তিনি গায়েবি সুসংবাদে আশ্বস্ত হলেন। (সীরাতে ইবনে হিশাম)

আবু জেহেলের পতন

আবু জাহেলের দুষ্টুমী এবং ইসলামের প্রতি দুশমনী যেহেতু সকলের নিকট প্রসিদ্ধ ছিল, এ কারণে আনসারদের মধ্য থেকে হযরত মুআওয়ায ও হযরত মাআয রাযি. নামে দু ভাই অঙ্গীকার করেছিল, আবু জাহেলের সাক্ষাৎ পাওয়া মাত্র তাকে হত্যা করে ফেলবে অথবা নিজেরা শাহাদাত বরণ করবে। এ শর্তের ওপর দু সহোদর স্বীয় প্রতিজ্ঞা পালনে রওনা হলেন। কিন্তু তারা আবু জেহেলকে চিনতেন না। তাই আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. কে জিজ্ঞেস করলেন, কোনটা আবু জাহেল? তিনি ইশারায় দেখিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দু ভাই বাজপাখির মতো উড়ে গিয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। মুহূর্তে আবু জাহেলের রক্তাক্ত দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

আবু জেহেলের পুত্র ইকরামা (যিনি পরে মুসলমান হয়েছিলেন) পিছন থেকে এসে হযরত মাআয রাযি. এর কাঁধে আঘাত করল, এতে তার কাঁধ কেটে গেল। কিন্তু এক হাত সামান্য চামড়ার সঙ্গে ঝুলে রইল। মুয়ায রাযি. ইকরামাকে ধাওয়া করলে ইকরামা পালিয়ে গেল। অতঃপর মুয়ায রাযি. এহেন কর্তিত হাত নিয়েও প্রচণ্ড ক্ষিপ্রতায় জিহাদ চালাতে লাগলেন। কিন্তু ঝুলন্ত স্থানটি নিয়ে যুদ্ধ করতে সমস্যা হচ্ছিল। তাই হাতটিকে পায়ের নিচে চেপে ধরে টান দিলেন, এতে হাতটি শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। আবার তিনি যুদ্ধে মগ্ন হয়ে গেলেন। সুবহানাল্লাহ!

এক আশ্চর্যজনক মুজেযা

আল্লাহর হুকুমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মুষ্টি কঙ্কর শত্রুবাহিনীর দিকে নিক্ষেপ করে সাহাবীদের বললেন : অকস্মাৎ শত্রুদের ওপর হামলা কর। একদিকে বাহ্যিক উপকরণ হিসেবে সাহাবীদের ক্ষুদ্র দলটি তাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, অন্যদিকে বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক মহান আল্লাহ ফেরেশতাদের একটি দল মুসলমানদের সাহায্যে পাঠিয়ে স্বীয় সাহায্যের অঙ্গীকার পূরণ করলেন।

যুদ্ধে কুরাইশদের বড় বড় সর্দার প্রাণ হারালে সাধারণ সৈন্যদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ল এবং তারা পালাতে শুরু করল। মুসলিম বাহিনী তাদের পশ্চাৎধাবন করে কাউকে কতল ও কাউকে বন্দি করলেন। সর্বমোট ৭০ জন কাফির নিহত এবং ৭০ জন বন্দী হল। কুরাইশদের বড় বড় সর্দার উৎবা, শাইবা, আবু জাহেল, উমাইয়া বিন খালফ, উকবা সকলে একে একে প্রাণ হারাল। অন্যদিকে মুসলমানদের মধ্যে সর্বমোট চৌদ্দজন (৬ জন মুহাজির ও ৮জন আনসার) শাহাদাত বরণ করলেন।

এ যুদ্ধটি ছিল মুলত প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ইসলামের একটি প্রকাশ্য মুজেযা। অন্যথায় এ যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ের কোনো প্রশ্নই উঠে না। কেননা, একদিকে কুরাইশদের এক হাজার যুবকের বিশাল বাহিনী, আর অন্যদিকে মুসলমানদের শুধুমাত্র তিনশ চৌদ্দজন সাধারণ মানুষ। একদিকে বড় বড় বিত্তশালী আমীর উমরা, যাদের যে কোনো একজনই গোটা সেনাবাহিনীর রসদ ও আনুষঙ্গিক ব্যয়ভার বহনে সক্ষম। আর অন্যদিকে সহায়-সম্বলহীন দরিদ্র মানুষের ক্ষুদ্র একটি দল। এদিকে একশ অশ্বারোহীর বিশাল বাহিনী অন্যদিকে গোটা মুসলমান বাহিনীর মধ্যে শুধুমাত্র ঘোড়ার সংখ্যা দুটি। একদিকে সকল প্রকার সমরাস্ত্রের বিপুল সমারোহ অন্যদিকে মাত্র কয়েকটি তলোয়ার।

ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ আশ্চর্যবোধ করেন, কিভাবে এ যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় সম্ভব হল? তারা তো আর এ খবর রাখে না, বিজয় ও সাহায্য, স্বচ্ছলতা বা ঘোড়া, তলোয়ার অথবা মালসম্পদের অধীন নয়। বরং এর পিছনে আর এক অদৃশ্য শক্তি কাজ করে। কিন্তু বস্তুবাদী ইউরোপ কি করে এর হাকিকতে পৌঁছতে সক্ষম হবে ? আকবর এলাহাবাদী যথার্থই বলেছেন :

چھوڑ کر بیٹھا ہے یورپ آسمانی باپ کو + بس سمجھا ہے اسنے برق کو اور بھاپ کو

ইউরোপবাসীরা আল্লাহ তাআলাকে পরিত্যাগ করেছে, সুতরাং তারা বিদুৎ আর আগুনকেই আল্লাহ বলে মেনে নিয়েছে। (সীরাতে হালবিয়া : ১/৫৫৪)

বদরের যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে মুসলমানদের আচরণ

বদর যুদ্ধের বন্দীরা মদিনায় পৌঁছার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুচার জন করে সাহাবীদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়ে সকলকে নির্দেশ দিলেন, তারা যেন বন্দীদেরকে যত্নের সাথে রাখে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ নির্দেশের প্রতিক্রিয়া এমন হল, সাহাবাগণ বন্দীদের খানা খাওয়াচ্ছিলেন আর নিজেরা শুধু খেজুর খেয়ে কাটাতে লাগলেন। হযরত মুসআব বিন উমায়ের রাযি.-এর ভাই আবু আযীযও উক্ত বন্দীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তার বর্ণনা হল, আমাকে যে আনসারীর নিকট সোপর্দ করা হয়েছিল, তিনি খানা এলে রুটির পাত্রটি আমার সামনে রেখে দিতেন আর নিজে শুধু খেজুর খেয়ে থাকতেন।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শের পর সিদ্ধান্ত করলেন, মুক্তিপণ নিয়ে তাদের ছেড়ে দেয়া হবে। সে মতে চার হাজার দেরহাম করে ফিদিয়া নিয়ে মুক্তি দেয়া হয়। (তাবারী)

ইসলামি সাম্য

বন্দীদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা হযরত আব্বাস রাযি.ও ছিলেন। তিনি পরে মুসলমান হয়েছিলেন। হযরত আব্বাস রাযি. রাতের বেলায় শৃঙ্খলের যাতনায় কাতরাচ্ছিলেন। তার এই যন্ত্রণা কাতর-ধ্বনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কানে পৌঁছলে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। লোকেরা জিজ্ঞেস করল : আল্লাহর রাসূল! আপনার ঘুম আসছে না কেন? ইরশাদ হল, আমার সম্মানিত চাচাজানের কাতরানোর শব্দ আমার কানে প্রবেশ করছে, এমতাবস্থায় আমি কেমন করে ঘুমাতে পারি? (কানুজুল উম্মাল ৫/২৭২)

মুসলমানদের অন্তরে স্বজনদের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও সহমর্মিতা সবই ছিল। কিন্তু সাম্য ও ন্যায়ের ইসলাম এটা অনুমোদন করে নি, বেআইনীভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়োবৃদ্ধ চাচাকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে দেওয়া হবে। তাই সকলের মতো তার নিকট থেকেও মুক্তিপণ আদায় করা হল। বরং সাধারণ কয়েদীদের চেয়ে কিছু বেশি আদায় করা হল। কেননা, সাধারণ কয়েদী থেকে চার হাজার আর বিত্তবানদের নিকট থেকে কিছু বেশি নেওয়া হয়েছিল। হযরত আব্বাস রাযি. যেহেতু বিত্তশালী ছিলেন। তাই তাকেও চার হাজারের অধিক মুক্তিপণ দিতে হয়েছিল।

আনসারগণ হযরত আব্বাস রাযি.-এর ফিদিয়া মাফ করে দেওয়ার আবেদনও করেছিলেন। কিন্তু ইসলামি সমতার বিধানে আপন-পর, দোস্ত-দুশমন সকলে ছিল সমান। তাই আনসারদের এ আবেদন নাকচ করে দেওয়া হল। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামাতা আবুল আসও যুদ্ধ বন্দী ছিলেন। তার কাছে ফিদিয়া আদায় করার মতো মাল-সম্পদ ছিল না। তাই তার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা যিনি মক্কায় অবস্থান করছিলেন তার নিকট ফিদিয়ার অর্থ পাঠাবার জন্যে সংবাদ দিলেন। মুক্তিপণ হিসেবে তিনি তার মাতা হযরত খাদিজা রাযি. এর দেওয়া উপঢৌকনের হারখানা গলা থেকে খুলে পাঠিয়ে দিলেন। হারখানা দেখামাত্র অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। তিনি সাহাবাগণকে বললেন, তোমরা যদি সম্মত হও, তবে যয়নবের মাতার স্মৃতিবিজড়িত এ হারখানা তার নিকট ফেরত পাঠিয়ে দাও। সাহাবাগণ খুশি মনে সম্মত হয়ে হারটি ফেরত পাঠিয়ে দিয়ে আবুল আসকে বলে দিলেন হযরত যয়নব রাযি. কে যেন মদিনায় পাঠিয়ে দেয়। (মেশকাত)

আবুল আসের ইসলাম গ্রহণ

মুক্তি লাভ করে আবুল আস মক্কায় পৌঁছে শর্তানুযায়ী হযরত যয়নব রাযি.-কে মদিনায় পাঠিয়ে দিলেন। আবুল আস ছিলেন একজন নামকরা ব্যবসায়ী। ঘটনাক্রমে তিনি সিরিয়া হতে ব্যবসায়ের মালামাল আনার সময় দ্বিতীয়বার গ্রেফতার হন এবং পূর্বের মতো একইভাবে মুক্তিলাভ করেন। এবার মুক্তি পেয়েই তিনি মক্কায় ফিরে সমস্ত

অংশীদারদের হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন। অতঃপর লোকজনকে বলে দিলেন, আমি এ কারণে এখানে এসে মুসলমান হলাম, যেন এ কথা বলতে না পারে, আবুল আস আমাদের মাল-সম্পদ আত্মসাৎ করে তাগাদার ভয়ে মুসলমান হয়ে মদিনায় রয়ে গেছে। অথবা জোরপূর্বক তাকে মুসলমান বানানো হয়েছে। (তারীখে তাবারী)

বদরের যুদ্ধ-বন্দীদের নিকট কাপড়-চোপড় ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলকে কাপড় দিলেন। হযরত আব্বাস রাযি.-এর দৈহিক গঠন এত বিশাল ছিল, কারো জামা তাঁর গায়ে লাগত না। অবশেষে আবদুল্লাহ বিন উবাই (মুনাফেক সর্দার) নিজের জামা (খুলে) তাকে দিয়ে দিল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে উবাইর কাফন হিসেবে নিজের যে কোর্তাটি দান করেছিলেন, এতে পূর্বের সেই উপকারের প্রতিদানের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছিল। (বুখারী)

ইসলামি রাজনীতি ও শিক্ষার উন্নতি

যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে যারা মুক্তিপণ দিতে অক্ষম ছিল তন্মধ্যে যারা কিছু লেখা পড়া জানত তাদেরকে বলা হল, তোমরা দশটি করে মুসলিম শিশুদের লেখা শিখিয়ে দাও; এটাই তোমাদের মুক্তিপণ। হযরত যায়েদ বিন সাবেত রাযি. এভাবেই লেখা শিখেছিলেন।

এ সনের বিবিধ ঘটনা

এ বছর রবিবার দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের যুদ্ধ থেকে যখন ফিরে এলেন তখন লোকজন তাঁর কন্যা হযরত রুকাইয়া রাযি.কে দাফন সম্পন্ন করে। বদর যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর এ বছরই সর্বপ্রথম ঈদুল ফিতরের নামায পড়া হয়। রমযানের রোযা, সদকাতুল ফিতর এবং যাকাতও এ বছর ওয়াজিব হয়। এ সনেরই যিলহজ মাসে হযরত ফাতেমা রাযি.-এর বিবাহ মুবারক সম্পন্ন হয়।

(সীরাতে মোগলাতাই)

তৃতীয় হিজরি

তৃতীয় হিজরি সনে দাসুর বিন হারেস মুহাবিরী ৪শ ৫০জন সৈন্য নিয়ে মদিনা শরীফে হামলা করার উদ্দেশ্যে রওনা হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোকাবেলার জন্যে অগ্রসর হলে তারা সকলে পালিয়ে পাহাড়ে আশ্রয় নিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিশ্চিন্ত মনে ময়দান পরিত্যাগ করলেন। হঠাৎ এ সময় বৃষ্টি নামলে তাঁর কাপড় ভিজে যায়। তিনি স্বীয় কাপড় শুকানোর জন্যে তা খুলে একটি গাছের উপর মেলে দিয়ে নিজে উক্ত গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়লেন। এদিকে দাসূর পাহাড়ের উপর থেকে লক্ষ্য করছিল। যখন সে দেখল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিশ্চিন্ত শুয়ে আছেন। সে তখন সরাসরি নবীজি সাল্লাল্লাহু

contents

আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথার কাছে এসে তলোয়ার উঁচু করে বলল, বল! এখন আমার হাত থেকে তোমাকে কে বাঁচাবে?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্বিঘ্নে বললেন, "আল্লাহ তাআলাই রক্ষা করবেন।" এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে দাসূরের দেহে কম্পন সৃষ্টি হল। তরবারি হাত থেকে পড়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তলোয়ারটি উঠিয়ে বললেন, "তুমি বল, এখন তোমাকে কে বাঁচাবে?" তার মুখে "কেউ নয়" ব্যতীত আর কি জবাব থাকতে পারে? তার অসহায়ত্ব দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মনে দয়া এল। তিনি তাকে ক্ষমা করে দিলেন। (সীরাতে মুগলতাই : ৪৯)

দাসূর ওই স্থান থেকে এমন প্রতিক্রিয়া নিয়ে উঠল, শুধু মুসলমান হয়েই ক্ষান্ত হল না বরং নিজ গোত্রে গিয়ে ইসলামের একজন জোরালো মুবাল্লেগ হয়ে গেল। [চামচিকার চোখে অবলোকনকারী প্রতিবাদী ইউরোপীয় জাতির দেখা উচিত, ইসলাম প্রসারের কারণ এ উত্তম চরিত্র ছিল, না কি তলোয়ারের জোর বা সম্পদের লোভ।]

دل میں گئی قیامت کی شوخیاں + دوچار دن رہے تھے کسی کی نگاہ میں

অন্তরে মোর সদা বিরাজ করে, রোজ হাশরের ভয়,
কোনো মতে তাই দু চার দিবস, করলাম তারে জয়।

হযরত হাফসা ও যয়নব রাযি. বিবাহ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৃতীয় হিজরির শাবান মাসে উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা এবং রমযান মাসে হযরত যয়নব বিনতে খোযায়মাকে বিবাহ করেন। (সীরাতে মোগলতাই)

ওহুদ যুদ্ধ

ওহুদ মদিনার নিকটবর্তী একটি পাহাড়ের নাম। যে স্থানে ঐতিহাসিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল এবং যেখানে হযরত হারুন আ.-কেও সমাহিত করা হয়েছিল। সর্বসম্মত মতানুসারে এ যুদ্ধ হিজরি তৃতীয় সনে শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়। তবে এর সঠিক তারিখ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। যেমন-৭, ৮, ৯, ১০, ১১ ইত্যাদি। (যুরকানী : ২/২০)

বদর যুদ্ধে পরাজিত মুশরিকগণ এক বছর পর যুদ্ধে ক্ষয়-ক্ষতি কাটিয়ে উঠে কিছুটা শান্ত হলে তাদের মধ্যে পুনরায় প্রতিশোধের স্পৃহা বাড়তে লাগল।

এবার তারা খুবই সতর্কতার সাথে মদিনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে পর্যাপ্ত সমরোপকরণ ও রসদসহ তিন হাজার সৈন্য নিয়ে মদিনার দিকে অগ্রসর হতে লাগল। এ বাহিনীর মধ্যে ছিল তিন হাজার উট, সাতশ বর্ম, দুশ ঘোড়া এবং রণক্ষেত্রে যোদ্ধাদের আত্মমর্যাদা ও ঐতিহ্য স্মরণ করিয়ে যুদ্ধে উত্তেজিত করা এবং যদি পালায় তাহলে গালি ও অভিশাপ দিয়ে লজ্জা দান করার জন্য ১৪ জন মহিলা।

এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা হযরত আব্বাস রাযি. যিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তিনি তখনও মক্কায়ই অবস্থান করছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ

রণপ্রস্তুতির বিস্তারিত বর্ণনা লিখে একজন দ্রুতগামী দূতের মাধ্যমে তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। তিনি এ সংবাদ পাওয়া মাত্রই দু ব্যক্তিকে সঠিক অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য পাঠালেন। তারা ফিরে এসে খবর দিল, কুরাইশ বাহিনী মদিনার উপকণ্ঠে পৌঁছে গেছে। যেহেতু শহরের উপর হামলা করার আশঙ্কা ছিল, তাই শহরের চতুর্দিকে পাহারার ব্যবস্থা করা হল। পরদিন সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের সঙ্গে পরামর্শ করে এক হাজার সাহাবীর এর বাহিনীসহ শহরের বাইরে তাশরিফ আনলেন। যার মধ্যে আবদুল্লাহ বিন উবাই মুনাফিকও ছিল। কিন্তু তারা সকলে রাস্তা থেকেই ফিরে গেল। যার ফলে মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা হয়ে গেল মাত্র সাত শ জন।

সৈন্য বিন্যস্তকরণ এবং অল্প বয়স্ক সাহাবীদের জিহাদের আকাঙ্খা

মদিনা থেকে বেরিয়ে যখন সৈন্যদের যাচাই বাছাই করা হল তখন অল্প বয়স্ক বালকদের ফেরত পাঠান হল। কিন্তু ছেলেদের মধ্যে জিহাদের আগ্রহ ও স্পৃহা এত প্রবল ছিল, রাফে বিন খাদিজকে যখন বলা হল, "তোমার বয়স কম তুমি ফিরে যাও"। তখন তিনি পায়ের আঙ্গুলে ভর করে উঁচু হয়ে দাঁড়ালেন, যেন তাকে বড় মনে হয়। সুতরাং তাকে জিহাদে নিয়ে যাওয়া হল। এ ঘটনা দেখে সমবয়সী সামুরা বিন জুনদুব নামক এক বালক আরয করল, আমি তো রাফেকে কুস্তিতে হারিয়ে দেই। তাই তাকে যদি জিহাদে নেওয়া হয় তাহলে আমাকে তো বিনা দ্বিধায় নেওয়া উচিত। তার মন্তব্য অনুযায়ী উভয়কে কুস্তিতে লাগিয়ে দেওয়া হলে সামুরা রাফেকে হারিয়ে দিল এবং তাকেও জিহাদে নিয়ে নেওয়া হল। (তারীখে তাবারী : ৩ খন্ড)

যারা বলে ইসলাম তলোয়ারের জোরে বিস্তার লাভ করেছে তারা ওই সকল ত্যাগ ও কুরবানি দেখে তাদের বানোয়াট উক্তির জন্য কি লজ্জিত হবে না? যা হোক রণাঙ্গনে পৌঁছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৈনিকদের কাতার ঠিক করলেন। ওহুদ পর্বতটি ছিল পেছনের দিকে। তাই সেদিক থেকে আক্রমণের আশঙ্কা ছিল বিধায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৫০ জন লোককে পাহাড়ের ওপর প্রহরায় নিযুক্ত করে বললেন, "মুসলমানদের জয় পরাজয় যাই হোক না কেন তোমরা কোনো অবস্থায়ই নিজ স্থান ছাড়বে না।"

লড়াই শুরু হল এবং দীর্ঘক্ষণ তুমুল লড়াইয়ের পর শত্রুপক্ষ পিছু হটে গেলে মুসলমানদের বিজয় সম্ভাব্য হয়ে ওঠল। তখন কুরাইশগণ দিশেহারা হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল এবং এদিকে মুসলমানগণ গনিমতের মাল সংগ্রহ করতে শুরু করে দিলেন। এ অবস্থা দেখে পেছন দিকে পাহাড়ের ওপর প্রহরায় নিয়োজিত ব্যক্তিগণও স্বীয় স্থান ত্যাগ করে গনিমতের মালের নিকট এলেন। তাদের আমীর আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রাযি. বারবার নিষেধ করলেও তারা এখানে প্রহরায় থাকার কোনো প্রয়োজন নেই এ কথা মনে করে ঐ স্থান পরিত্যাগ করলেন এবং মাত্র কয়েকজন সাহাবী তথায় থেকে গেলেন।

এ অবস্থা দেখে খালেদ বিন ওয়ালিদ (যিনি তখনও মুসলমান হন নি, কাফেরদের পক্ষ হতে যুদ্ধ করছিলেন) পেছন দিক থেকে হঠাৎ হামলা করলেন। আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের এবং তার সাথে অবশিষ্ট সাথী-সঙ্গীরা তাদের সঙ্গে মরণপণ লড়াই করলেন। অবশেষে সকলেই শহিদ হয়ে গেলেন। তখন রাস্তা কন্টকমুক্ত হয়ে পড়লে খালেদ বিন ওয়ালিদ তার সাথীদের নিয়ে মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। উভয় বাহিনী এমনভাবে মিশ্রিত হয়ে গেল, মুসলমানগণ নিজেরাই মুসলমানদের হাতে শহিদ হতে লাগলেন। মুসআব বিন উমায়ের রাযি. শহিদ হলেন। যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারার সঙ্গে তাঁর চেহারার যথেষ্ট মিল ছিল, তাই তিনি শাহাদাতবরণ করলে এ কথা ছড়িয়ে পড়ল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহিদ হয়ে গেছেন। কোনো কোনো বর্ণনা মতে, কোনো শয়তান বা মুশরিক উচ্চ স্বরে ঘোষণা করে ছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিহত হয়েছে।

(যরকানী শরহে মাওয়াহিব)

এ দুঃসংবাদ ছড়িয়ে পড়লে মুসলমান সৈন্যদের মধ্যে হতাশা নেমে এল। বড় বড় বাহাদুরের পা পর্যন্ত টলটলায়মান হয়ে গেল। তথাপি তখনও অনেক আত্মত্যাগী বীর পুরুষ যথারীতি যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সকলের দৃষ্টিই রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুঁজে ফিরছিল। সর্ব প্রথম হযরত কাব বিন মালেক রাযি.-এর দৃষ্টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওপর পড়লে তিনি খুশিতে চিৎকার দিয়ে বলতে লাগলেন, মোবারক হোক! আল্লাহর রাসূল সুস্থ এবং নিরাপদে এখানেই আছেন। এ সংবাদ শুনামাত্র সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে ছুটে এলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কাফেররাও সব দিক থেকে সরে এসে এদিকে হামলা করল। কয়েকবারই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর আক্রমণ হল। কিন্তু তিনি নিরাপদ রইলেন। একবার যখন কাফেররা চারদিক থেকে ঘিরে ধরল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কে আমার জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত আছ? তখন যিয়াদ বিন সাকানসহ চারজন সাহাবি ঝাঁপিয়ে পড়লেন। প্রাণপণ যুদ্ধ করে তাঁরা শহিদ হয়ে গেলেন। হযরত যিয়াদ আহত হয়ে পড়ে গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তার লাশ কাছে নিয়ে এস। লোকেরা যখন তাকে উঠিয়ে নিয়ে এলেন তখনও তার প্রাণের স্পন্দন কিছুটা বাকি ছিল। হযরত যিয়াদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পা মোবারকের উপর মুখ রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। সুবহানাল্লাহ!

নবীজির চেহারা মোবারক আহত হওয়া

কুরাইশদের প্রসিদ্ধ বীর আবদুল্লাহ ইবনে কামিয়াহ মুসলিম সেনাদের ব্যূহ অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারকের ওপর তলোয়ার মারল। যার ফলে শিরস্ত্রাণের দুটি কড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারকে ঢুকে গেল এবং একটি দাঁত মোবারক শহিদ হয়ে গেল।

হযরত সিদ্দিকে আকবর রাযি. ক্ষতস্থান থেকে কড়া বের করার জন্য অগ্রসর হওয়া মাত্র আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ রাযি. কসম দিয়ে বললেন, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে খেদমতটুকু আমাকে করার সুযোগ দিন। তিনি সম্মুখে অগ্রসর হয়ে হাতের পরিবর্তে স্বীয় মুখ দ্বারা টান দিলে প্রথম বারে একটি কড়া বের হয়ে গেল বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই টানের প্রচণ্ডতায় আবু উবাইদার একটি দাঁত ভেঙ্গে গেল। এ দৃশ্য দেখে দ্বিতীয় কড়াটি বের করার জন্য হযরত সিদ্দীক আকবর রাযি. অগ্রসর হলে আবু উবাইদা রাযি. পুনরায় কসম খেয়ে তাকে বাঁধা দিয়ে নিজেই পূর্বের মতো মুখ দিয়ে দ্বিতীয় কড়াটি বের করে আনলেন এবং এর সঙ্গে সঙ্গে আবু উবাইদা রাযি.-এর আরো একটি দাঁত ভেঙ্গে গেল।

এ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি গর্তে পতিত হয়েছিলেন যা কাফেররা মুসলমানদের (পতিত হওয়ার) উদ্দেশ্যে খনন করেছিল।

সাহাবাদের জীবন কুরবান

এ ভয়াবহ অবস্থা দেখে নিবেদিতপ্রাণ সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘিরে রাখলেন। চারদিক থেকে বৃষ্টির মত তীর ও তলোয়ারের আঘাত আসছিল। কিন্তু এ সকল আঘাত সাহাবাগণ নিজেদের উপর গ্রহণ করছিলেন। হযরত আবু দারদা রাযি. ঝুঁকে পড়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য ঢাল হয়ে গেলেন। যে সকল তীর আসছিল তা সব তাঁর পিঠে বিদ্ধ হচ্ছিল। হযরত ত ' রাযি. তীর এবং তলোয়ারকে স্বীয় শরীর পেতে ফেরাতে লাগলেন। তাতে তাঁর ..ত কেটে পড়ে গেল। যুদ্ধের শেষে দেখা গেল, তাঁর শরীরে ৭০ টিরও বেশি জখম রয়েছে।

(কানযুল উম্মাল ৫/২৭৮)

হযরত আবু তালহা রাযি. একটি ঢালের সাহায্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রক্ষা করছিলেন। তিনি যখন মাথা তুলে সৈন্যদের অবস্থা লক্ষ্য করতেন তখন হযরত আবু তালহা রাযি. বলতেন, আল্লাহর রাসূল, আপনি মাথা উঠাবেন না, শত্রু পক্ষের কোনো তীর এসে যেন আপনার শরীর মোবারকে না লাগে। এ জন্যে তো আপনার পূর্বে আমাদের শরীর প্রস্তুত আছে।

এক সাহাবী আরয করলেন, আল্লাহর রাসূল! আমি কতল হয়ে গেলে, আমার ঠিকানা কোথায় হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বললেন, "জান্নাতে"। তখন উক্ত সাহাবীর নিকট কিছু খেজুর ছিল যা তিনি খাচ্ছিলেন। কথা শুনামাত্র সেগুলো নিক্ষেপ করে সোজা রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তুমুল যুদ্ধ করতে করতে শহিদ হয়ে গেলেন।

হতভাগা কুরাইশরা অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করছিল। কিন্তু রাহমাতুলিল আলামীনের পবিত্র মুখে এ ভয়াবহ মুহূর্তেও এ ধ্বনিগুলো উচ্চারিত হচ্ছিল-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِىْ فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

"হে আল্লাহ! আমার কওমকে মাফ করে দাও, কেননা তারা জানে না।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারক থেকে রক্ত ঝরছিল। আর দয়ার আধার কোনো কাপড় ইত্যাদি দ্বারা তা মুছতে মুছতে বলছিলেন : "এ রক্তের এক ফোঁটাও যদি জমিনে পতিত হত তবে সকলের উপর আল্লাহর শাস্তি নাযিল হয়ে যেত। এ যুদ্ধে কাফিরদের মাত্র ২২ কি ২৩ জন মারা যায় আর মুসলমানদের ৭০ জন শাহাদাত বরণ করেন। (ফাতহুল বারী)

চতুর্থ হিজরি

বীরে মাউনা

এ বছর সফর মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৭০ জন সাহাবার একটি দলকে নজদবাসীদের নিকট ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে পাঠালেন। এ দলের মধ্যে বড় বড় আলেম সাহাবীও ছিলেন। সেখানে পৌঁছার পর আমের, রাল, যাকওয়ান ও উকবা গোত্র তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়ে গেল। অবশেষে যুদ্ধ শুরু হল এবং ঘটনাক্রমে সকল সাহাবীই শাহাদাতবরণ করলেন। এ ঘটনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতই মর্মাহত হলেন, তিনি কয়েকদিন পর্যন্ত ফজরের নামাযে ওই হত্যাকরীদের জন্য বদদুআ করলেন। এ বছর শাওয়াল মাসে হযরত হাসান রাযি. জন্মগ্রহণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হযরত উম্মে সালামা রাযি.-এর বিবাহ হয়। (সীরাতে মোগলতাই : ৫২)

পঞ্চম হিজরি

গাযওয়ায়ে আহযাব বা খন্দকের যুদ্ধ

কুরাইশ ও ইহুদিদের ঐক্য

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় তাশরিফ আনার পর স্থানীয় ইহুদিদের সঙ্গে একটি শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন। সে চুক্তির প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। কিন্তু ইহুদিরা যেহেতু মদিনার বিত্তবান ও বিশিষ্ট নাগরিক বলে গণ্য ছিল তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তথায় তাশরিফ আনার পর ইসলামের ক্রমাগত উন্নতি সমৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করে তাদের মনে প্রবল হিংসা ক্ষোভের সৃষ্টি হত। আর এ কারণেই সর্বদা তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানদের কষ্ট দেওয়ার চেষ্টায় তৎপর থাকত।

বদর যুদ্ধে মুসলমানদের বিস্ময়কর বিজয় অর্জিত হলে ইহুদিদের ক্রোধ ও ক্ষোভের অন্ত রইল না। এমনকি অবশেষে তারা প্রকাশ্যে চুক্তি ভঙ্গ করতে শুরু করে দিল। দ্বিতীয় হিজরিতে তো তাদের গোত্র বনি কাইনুকা যুদ্ধই ঘোষণা করে বসল। আর এদিকে বনি নাযীরও বিদ্রোহ শুরু করল। এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করলেন। যুদ্ধ শুরু হলে তারা সকলেই দূর্গে আত্মগোপন করল। কিছু দিন যাবত এভাবে অবরুদ্ধ থাকার পর দেশান্তরিত হয়ে বনি কাইনুকা সিরিয়া এলাকায় এবং বনি নাজীর খায়বার ও অন্যান্য এলাকায় চলে গেল।

এদিকে মক্কার কুরাইশরা শুরু থেকেই মদিনার ইহুদি ও মুনাফিকদের চিঠিপত্র লিখে শুধু বিরোধিতার উসকানিই দিত না, বরং সঙ্গে সঙ্গে এমন হুমকিও দিয়ে আসছিল, তোমরা যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মদিনা থেকে বহিস্কার না কর তবে আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। (আবু দাউদ)

তখন এ কারণগুলোই তাদের মধ্য পারস্পরিক সুসম্পর্ক ও ঐক্যের সূত্র হয়ে দাঁড়াল। আর এদিকে মক্কার কুরাইশ, মদিনার ইহুদি ও মুনাফিক সকলের সম্মিলিত শক্তি ইসলামের বিরুদ্ধে প্রস্তুত হয়ে গেল। মক্কা হতে মদিনা পর্যন্ত সমগ্র গোত্রে এক অগ্নি প্রজ্বলিত হল।

৫ম হিজরির ১০ মহররমে সংঘটিত গাযওয়ায়ে যাতুররিকা উক্ত ষড়যন্ত্রেরই ফসল ছিল। অতঃপর ৫ম হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে সংঘটিত দাউমাতুল জান্দাল এ ধারারই আরেকটি ঘটনা। এ সম্মিলিত ষড়যন্ত্রেরই নগ্ন প্রয়াস। উক্ত ষড়যন্ত্রের ধারাবাহিকতা দীর্ঘদিন যাবত এভাবে বিভিন্ন আকারে চরম পরিণতির দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

খন্দকের ঘটনা

অবশেষে ৫ম হিজরির যিলকদ মাসে সম্মিলিত বাহিনী তাদের সমস্ত শক্তি একত্র করে একযোগে মদিনা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিল। মুসলমানদের সমূলে ধ্বংস করার জন্যে ১০ হাজার লোকের সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে মদিনা অভিমুখে অগ্রসর হতে লাগল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি সাহাবাদেরকে একত্র করে পরামর্শ করলেন।

হযরত সালমান ফারসি রাযি. অভিমত প্রকাশ করলেন, খোলা ময়দানে বের হয়ে যুদ্ধ করা সমীচীন হবে না। বরং মদিনার যেদিক দিয়ে শত্রুদের ভিতরে প্রবেশ করার সম্ভাবনা রয়েছে সেই দিক দিয়ে পরিখা খনন করা হোক। উক্ত পরামর্শানুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন হাজার সাহাবাকে সঙ্গে নিয়ে খন্দক খনন করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে পড়লেন। মাত্র ছয় দিনে পাঁচ গজ গভীর পরিখা তৈরি হয়ে গেল। খনন কাজে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাতেরও একটা বিরাট ভূমিকা ছিল। (সীরাতে মোগলতাই : ৫৬)

একদিন পরিখা খননের সময় একটা পাথর খণ্ড বেরিয়ে এলে সরিয়ে ফেলতে সকলে অপারগ হয়ে পড়ল। খনন কাজ বন্ধ হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে কোদাল দ্বারা এক আঘাত করলে তা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল। অবশেষে খন্দক তৈরি হল। এদিকে কাফেরদের সৈন্যবাহিনী এসে মদিনা অবরোধ করে ফেললে প্রায় ১৫ দিন পর্যন্ত মুসলমানগন অবরুদ্ধ রইলেন। এ সময় ইহুদিদের অবশিষ্ট গোত্র বনু কুরাইজাও চুক্তি ভঙ্গ করে কাফেরদের দলভূক্ত হয়ে কাফের সৈন্যদের সংখ্যা বিপুল বৃদ্ধি করে দিল।

অবরোধের কারণে মদিনায় চরম অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ল। খাদ্য ঘাটতির কারণে সাহাবীদের পর পর তিন বেলা অনাহারে কাটাতে হল। একদিন অস্থির হয়ে সাহাবাগণ তাদের পেটের কাপড় সরিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখালেন, তারা সকলে ক্ষুধার জ্বালায় পেটে ১টি করে পাথর বেঁধেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও স্বীয় পেট মোবারাক খুলে দেখালেন, দেখা গেল সেখানে দুটি পাথর বাঁধা রয়েছে।

এদিকে অবরোধকারীরা খন্দক অতিক্রম করতে না পেরে এ স্থান থেকেই তীর ও পাথর নিক্ষেপ করতে শুরু করল। উভয় পক্ষ হতেই অবিরাম তীর বিনিময় চলতে লাগল। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চার ওয়াক্ত নামায কাযা হয় ।

আল্লাহর সাহায্য

অবশেষে রাব্বুল আলামিন এ সহায় সম্বলহীন জামাতটিকে সাহায্য করলেন। কাফের বাহিনীর ওপর এমন এক ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত করলেন, যার প্রচণ্ডতায় কাফেরদের তাবুর খুঁটিগুলি পর্যন্ত উপড়ে গেল। চুলার ওপর থেকে ডেকচিগুলো পর্যন্ত উল্টে গেল। ঝড়ের এ প্রচন্ড তাণ্ডবলীলা কাফের বাহিনীর চিন্তা শক্তিকে অকেজো করে দিল। এদিকে তাদের রসদ সামগ্রীও শেষ হয়ে গেল আর অন্যদিকে হযরত নাঈম ইবনে মাসউদ রাযি. এমন এক কৌশল চালান, যার ফলে কাফের সৈন্যদের মধ্যে ব্যাপক ভাঙ্গন ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। মোটকথা এমন সব উপায় উপকরণ একত্র হয়ে গেল , কাফেরদের পদস্খলন ঘটতে শুরু করল এবং অল্প সময়ের মধ্যে ময়দান পরিষ্কার হয়ে গেল।

বিভিন্ন ঘটনা

৫ম হিজরিতে হজ ফরয হয়। তবে এ সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। এ বছর জুমাদাল উলা মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৌহিত্র আবদুল্লাহ বিন উসমান রাযি. অর্থাৎ হযরত রুকাইয়ার পুত্র ইনতেকাল করেন। এবং শাওয়াল মাসের শেষের দিকে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাযি.-এর মাতা ইনতেকাল করেন। আর যিলকদ মাসে হযরত যয়নাব বিনতে জাহাশ রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হন। এ বছরই মদিনায় ভুমিকম্প এবং চন্দ্রগ্রহণ হয়।

(সীরাতে মোগলতাই)

ষষ্ঠ হিজরি

বাইআতে রিযওয়ান, রাষ্ট্র প্রধানদের নিকট ইসলামের দাওয়াত

ষষ্ঠ হিজরির যিলকদ মাসের প্রথম দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র মক্কা গমনের ইচ্ছায় ওমরা পালনের এহরাম বাঁধলেন। সাহাবাগণের এক বিরাট জামাত (যাদের সংখ্যা ১৪/১৫শ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সফরসঙ্গী হলেন। (সীরাতে মুগলতাঈ)

হুদায়বিয়া

মক্কা মুআযযমা থেকে এক মনযিল দূরে অবস্থিত একটি কূপ ছিল। এ কূপটির নামানুসারে উক্ত গ্রামের নাম হুদাইবিয়া বলে প্রসিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তথায় পৌঁছে অবস্থান নিলেন। সেখানে একটি কূপ ছিল সম্পূর্ণ শুষ্ক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতে তাতে এত বিপুল পানির উৎপত্তি হল যাতে সকলে তৃপ্তি সহকারে পানি পান করল। এখানে পৌঁছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উসমান রাযি. কে মক্কায় পাঠিয়ে দিলেন। কুরাইশদেরকে এ ব্যাপারে অবগত করা হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখন শুধুমাত্র বাইতুল্লাহ শরীফের যিয়ারত ও ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে আগমন করেছেন। অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়।

হযরত উসমান রাযি. মক্কায় পৌঁছলে কুরাইশরা তাঁকে আটক করে ফেলল। এদিকে এ খবর ছড়িয়ে পড়ল, কাফেররা হযরত উসমান রাযি.-কে হত্যা করে ফেলেছে। এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছলে তিনি একটি বাবলা গাছের নিচে বসে সাহাবায়ে কেরামের কাছ থেকে যুদ্ধের বাইআত নিলেন। এ বাইআতের কথা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে। একে বাইআতে রিযওয়ান নামে অভিহিত করা হয়। পরে জানা গেল, সংবাদটি মিথ্যা। বরং কুরাইশরা সাহাল বিন আমরকে সন্ধির শর্তাবলী চূড়ান্ত করার নিমিত্তে সেখানে প্রেরণ করেছে। উভয়পক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিম্নের শর্তাবলী চূড়ান্ত হয় এবং দশ বছরের জন্য একটি সন্ধিপত্র লেখা হয়।

(১) মুসলমানরা এ বছর ফেরত চলে যাবে।
(২) পরবর্তী বছর শুধুমাত্র তিনদিন অবস্থান করে চলে যাবে।
(৩) সশস্ত্র অবস্থায় আসতে পারবে না। সঙ্গে তরবারি থাকলে তা কোষবদ্ধ অবস্থায় রাখতে হবে।
(৪) মক্কা থেকে কোন মুসলমানকে তাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে না। আর যদি কোনো মুসলমান মক্কায় থাকতে চায় তাহলে তাকে বাধা দিতে পারবে না। যদি কোনো ব্যক্তি মক্কা থেকে মদিনায় চলে যায় তাহলে তাকে কাফেরদের কাছে ফেরত

দিতে হবে, আর মদিনা থেকে কোনো লোক মক্কায় চলে এলে কাফেররা তাকে হস্তান্তর করবে না।

এ সকল শর্ত যদিও মুসলমানদের বিপক্ষে ছিল এবং এ সন্ধি ছিল মুসলমানদের প্রকাশ্য পরাজয়সুলভ সন্ধি। কিন্তু মহান রাব্বুল আলামিন একে প্রকাশ্য বিজয় নামে আখ্যা দিয়েছেন। এ সফরেই সূরা ফাতাহ অবতীর্ণ হয়। এভাবে নতি স্বীকারের মাধ্যমে সন্ধি করা ছিল সম্পূর্ণরূপে সাহাবায়ে কেরামের অপছন্দনীয়। হযরত ওমর ফারুক রাযি. বারবার তাঁর মনের অবস্থা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পেশ করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটাই আল্লাহর নির্দেশ এবং আমাদের ভবিষ্যতের সকল সফলতা এরই মধ্যে নিহিত রয়েছে। বাস্তবিকই পরবর্তী সকল ঘটনাবলী রহস্যাবৃত এ জটিলতার সকল জট খুলে দিল। কেননা সন্ধির ফলে তারা নির্বিঘ্নে মক্কা-মদিনার মধ্যে যাতায়াত শুরু করে দিলেন।

কাফেররা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এবং মুসলমানদের কাছে আসতে শুরু করল। এদিকে ইসলামি আদর্শের চুম্বক সদৃশ আকর্ষণ তাদেরকে ইসলামের প্রতি ঝুঁকিয়ে দিল। ঐতিহাসিকগণ বলেন, সন্ধিকালীন এ সময়ে যত পরিমাণ লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে ইতোপূর্বে কখনো এত লোক ইসলাম গ্রহণ করে নি। প্রকৃতপক্ষে এ সন্ধি ছিল মক্কা বিজয়ের পূর্বাভাস।

রাজা বাদশাদের কাছে দাওয়াতি পত্র প্রেরণ

এ সন্ধির ফলে রাস্তা নিরাপদ হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইচ্ছা করছিলেন হকের এ আওয়াজ বিশ্বের সকল রাজা-বাদশার কাছেও পৌঁছিয়ে দেবেন। সে হিসেবে আমর বিন উমাইয়াকে হাবশার বাদশা আসহামা নাজ্জাশীর নিকট পত্র দিয়ে তথায় প্রেরণ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র পত্রখানির প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলেন। প্রথমে তাকে চোখের সঙ্গে লাগালেন এবং সিংহাসন ছেড়ে নিচে নেমে মাটিতেই বসে পড়লেন এবং সন্তুষ্টচিত্তে ইসলাম কবুল করে নিলেন। নাজ্জাশী বাদশা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশাতেই ইনতেকাল করেন। হযরত দাহইয়া কালবী রাযি. কে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে প্রেরণ করেন রোমসম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে। তিনিও অকাট্য দলিল প্রমাণাদি ও পূর্বের আসমানি কিতাব থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যতা জানতে পেরেছিলেন। তাই তিনি তৎক্ষণাত ইসলাম গ্রহণের সংকল্প নেন। কিন্তু তাঁর এ সিদ্ধান্তে প্রজাসাধারণ ক্ষেপে গেল। অতঃপর যখন তার এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেল, যদি আমি মুসলমান হয়ে যাই তাহলে এরা আমাকে ক্ষমতাচ্যুত করে ছাড়বে। তখন তিনি ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রইলেন।

হযরত আবদুল্লাহ বিন হুযায়ফা রাযি. কে দাওয়াতি পত্র দিয়ে ইরানের সম্রাট খসরু পারভেজের কাছে পাঠালেন। কিন্তু সে হতভাগা হুযুরের পবিত্র পত্রটির সঙ্গে চরম

ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ করল। সে পত্রটিকে ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে ফেলল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি তার জন্য এ বলে বদদুআ করলেন, আল্লাহ তাআলা তার রাজ্যকেও টুকরা টুকরা করে দিন যেরূপ সে আমার পত্র ছিড়ে টুকরা টুকরা করে ফেলেছে। সাইয়েদুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুআ বিফলে যাওয়ার নয়। অল্প দিন পরই খসরু পারভেজ তারই পুত্র শেরওয়ার হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়।

হযরত হাতেব বিন আবি বালতায়া রাযি.-কে মিশর ও ইস্কান্দারিয়ার (আলেকজান্দ্রিয়া) সম্রাট মুকাওকাসের কাছে প্রেরণ করেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার হৃদয়েও ইসলামের সত্যতা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বিশ্বাস সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। ফলে তিনি হযরত হাতেব রাযি.-এর সঙ্গে উত্তম আচরণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কিছু উপঢৌকন পাঠিয়ে দেন। তন্মধ্যে মারিয়া কিবতিয়া নামে একজন বাদী ও দুলদুল নামে একটি খচ্চরও ছিল। অন্য এক বর্ণনায় আছে এক হাজার দীনার ও বিশ জোড়া জামাকাপড়ও ছিল।

হযরত আমর বিন আস রাযি. কে আম্মানের দুই সম্রাট অর্থাৎ জাইফার ও আবদুল্লাহর কাছে প্রেরণ করেন। তারাও ব্যক্তিগত অনুসন্ধান ও পূর্ববর্তী আসমানি কিতাব পড়াশোনা করে রাসূলের নবুয়তের সত্যতা সম্পর্কে অবগত হন। তাই তারা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তখন থেকেই প্রজাদের কাছ থেকে যাকাত উসুল করে হযরত আমর বিন আস রাযি. এর কাছে জমা দেন।

হযরত খালিদ ও আমর ইবনুল আস রাযি.-এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ তখনো সব কটি জিহাদে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আসছিলেন। অধিকাংশ যুদ্ধে বিশেষ করে ওহুদ যুদ্ধে তারই কারণে কাফেরদের স্খলিত পা পুনরায় জমে গিয়েছিল। কিন্তু হুদাইবিয়ার সন্ধির পর তিনি স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে সফর করেন। পথিমধ্যে আমর ইবনুল আসের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে আলাপ-আলোচনায় জানতে পারলেন, তিনিও একই উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন। এরপর উভয়ে একত্রে এসে ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হন। (ইসাবা)

সপ্তম হিজরি

খায়বারের যুদ্ধ

খায়বার পবিত্র মদিনা থেকে উত্তর দিকে চার মনযিল দূরে একটি শহরের নাম। মদিনার বনি নাযির ও ইহুদিরা যখন খায়বার গিয়ে বসতি স্থাপন করল তখন খায়বার ইহুদিদের আবাসন কেন্দ্রে পরিণত হল। ইহুদিরা পার্শ্ববর্তী সকল আরবদেরকে ইসলামের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে থাকে।

৭ হিজরীর মহরম বা জুমাদাল উলা মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৪০০ পদাতিক ও ২০০ অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে খায়বার গিয়ে উপস্থিত হন। দীর্ঘ যুদ্ধের পর আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেন আর ইহুদিদের সকল দূর্গ মুসলমানদের হস্তগত হয়। এ যুদ্ধে হযরত আলি রাযি. এর কৃতিত্ব ছিল সর্বাধিক। তিনি স্বহস্তে একাই খায়বার দূর্গের ফটকটি উপড়িয়ে ফেলেন, যা ৭০ জন মিলেও নড়াতে পারত না। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, তিনি সেই ফটককে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। (যুরকানী)

ফাদাক বিজয়

খায়বার বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাদাকের ইহুদিদের কাছে এক পত্র প্রেরণ করলে তারা সন্ধি স্থাপন করে।

কাযা ওমরা

হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে যে ওমরা কাযা হয়ে গিয়েছিল এবং কুরাইশদের সঙ্গে অঙ্গীকার করা হয়েছিল, পরবর্তী বছর ওমরা আদায় করা হবে এবং তিন দিনের বেশি সেখানে অবস্থান করবে না। এ বছর ওই অঙ্গীকার অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল সাথী-সঙ্গিদের নিয়ে মক্কায় তাশরিফ নিয়ে যান এবং সন্ধির শর্তাবলী পুরোপুরি মেনে চলে ওমরার কাজ সম্পাদন করে মদিনায় ফিরে আসেন।

অষ্টম হিজরি

মুতার যুদ্ধ

সিরিয়ার বালকা শহরের উপকণ্ঠে বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে আনুমানিক একশ মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি শহরের নাম মুতা। এখানে মুসলমান ও রোমানদের মাঝে সর্বপ্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কারণ ছিল, রোমসম্রাটের নিযুক্ত বসরার গভর্ণর আমর বিন শুরাহবিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দূত হারেস ইবনে উমায়র রাযি. কে হত্যা করেছিল। কূটনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি ছিল ক্ষমার অযোগ্য ও গর্হিত অপরাধ এবং সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণার শামিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অষ্টম হিজরি মাঝামাঝি সময় হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তিন হাজার মুসলিম সেনা মুতার দিকে পাঠিয়ে দেন। মুসলিম সৈন্যদলের মুতার কাছে পৌঁছার সংবাদ রোমানরা জানতে পেরে দেড় লাখ সেনাবাহিনীর বিরাট দল নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য বেড়িয়ে পড়ে। কয়েকদিন যুদ্ধ চলার পর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দেড় লাখ কাফেরদের অন্তরে তিন হাজার মুসলিম সৈন্যের এমন ভয় প্রবেশ করিয়ে দিলেন, অবশেষে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আত্মরক্ষার কোনো পথই তাদের খোলা রইল না। (তালখীসুস সীরাত)

মক্কা বিজয়

হুদাইবিয়ায় যে সন্ধিপত্র লেখা হয়েছিল, মুসলমানরা তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পরিপূর্ণ নিষ্ঠা ও বিশ্বস্তার সহিত তা যথাযথ পালন করে আসছিল। ইত্যাবসরেই হিজরি ৮ম সালে কুরাইশরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে বসল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্ধি পত্র নবায়নের জন্য কতিপয় শর্ত যুক্ত করে কুরাইশদের কাছে একজন দূত প্রেরণ করেন। পরিশেষে একথা লিখে দিলেন, এ শর্তাবলী মনযুর করা না হলে হুদাইবিয়ার সন্ধি ভঙ্গ হয়েছে বলে মনে করা হবে। কুরাইশরা সন্ধি ভঙ্গ করাকেই পছন্দ করল। (যুরকানী : ২/২৬৭)

অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। ৮ম হিজরির ১০ই রমযান সোমবার আসরের পর দশ হাজার সাহাবায়ে কেরামের বিরাট এক বাহিনী নিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে মদিনা ত্যাগ করেন। কুদাইদ পৌঁছার পর মাগরিবের সময় হয়ে গেলে সকলে সেখানেই ইফতার সেরে নেন। মক্কার উপকণ্ঠে পৌঁছার পর হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদকে সৈন্যের একটি অংশ দিয়ে মক্কার উঁচু দিক দিয়ে প্রবেশের জন্য প্রেরণ করে তাদের বলে দিলেন, কেউ তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ না করলে তোমরাও তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে না। (সীরাতে মুগলতাঈ)

মক্কার অন্য দিক দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রবেশ করেন। এক সাধারণ ঘোষণায় তিনি বলে দিলেন, যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ, যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ, যে ব্যক্তি নিজ ঘরের দরজা বন্ধ করে দেবে সে নিরাপদ। অবশ্য এমন ১১ জন পুরুষ ও ৪ জন মহিলাকে ক্ষমা করেন নি, যাদের অস্তিত্বই ছিল সকল ফেতনা-ফাসাদের উৎস, কিন্তু এরা সকলেও বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে এদের অধিকাংশই মক্কা বিজয়ের পর মদিনায় পৌঁছে মুসলমান হয়ে যায়।

২০শে রমযান জুমার দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়তুল্লাহ তওয়াফ করেন। তখনো বায়তুল্লাহর আশেপাশে ৩৬০টি মূর্তি রাখা ছিল। হুযুরের হাতে ছিল একটি লাঠি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো মূর্তির নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় সে লাঠি দ্বারা ইশারা করতেই মূর্তিটি মুখ থুবড়ে পড়ে যেত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন নিম্নের আয়াতটি পড়ছিলেন :

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

"সত্য এসেছে, বাতিল ধ্বংস হয়েছে, নিশ্চয় বাতিল ধ্বংসশীল।"

কুরাইশদের সঙ্গে মুসলমানদের আচরণ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফ সেরে কাবার চাবিরক্ষক উসমান বিন তালহা শাইবার কাছ থেকে বাইতুল্লাহর চাবি নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেন।

অতঃপর সেখান থেকে বের হয়ে মাকামে ইবরাহীমে নামায আদায় করলেন। নামায শেষে তিনি মসজিদেই অবস্থান করছিলেন। আজ তিনি কুরাইশদের সম্পর্কে কী নির্দেশ জারি করেন লোকজন গভীর উৎকণ্ঠার সঙ্গে তারই অপেক্ষা করছিল। কিন্তু সকল সন্দেহও উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিয়ে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব শান্তির দূত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশদের সম্বোধন করে বললেন, তোমরা আজ সর্ব বিষয়ে নিরাপদ। অতঃপর কাবার চাবিও তাদের নিকট দিয়ে দিলেন। (তালখীসুস সীরাত)

আবু সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণ

আবু সুফিয়ান তখনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে কুরাইশ পক্ষের প্রধান ছিলেন। সকল যুদ্ধেই তাদের সেনাপ্রধান তিনি হতেন। তিনি মক্কা বিজয়ের পূর্বে মুসলিম সৈন্যের সংবাদ নেওয়ার জন্য মক্কা থেকে বের হয়েছিলেন। সাহাবারা তাকে গ্রেফতার করে ফেলেন। গ্রেফতার করে যখন তাকে রহমতে আলম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত করা হল, তখন সেখান থেকে তার ক্ষমার ঘোষণা হয়ে যায়। যার প্রতিক্রিয়া হল এই, তিনি তৎক্ষণাৎ ইসলাম কবুল করে মুসলমানদের দলভূক্ত হয়ে যান। তাই আমরা এখন তাকে "হযরত আবু সুফিয়ান রাযি." বলি।

মক্কা বিজয়ের দিন এক ব্যক্তি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে কাঁপতে কাঁপতে হুজুরের দরবারে উপস্থিত হল। শান্তির বাহক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন– 'শান্ত হও, আমি কোনো বাদশা নই। আমি একজন সাধারণ মায়ের সন্তান।'

মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পনের দিন মক্কায় অবস্থান করেন। তখন মদিনার আনসারগণ এ চিন্তায় অস্থির ছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝি ওখানে থেকে যাবেন, আর আমরা হয়ে যাবো তার থেকে দূরে। কিন্তু তিনি তাদের মনের এ ধারণা জানতে পেরে বললেন, তোমাদের ধারণা সঠিক নয় (বরং আমার জীবন-মরণ এখন তোমাদের সাথে)। অতঃপর হযরত আত্তাব ইবনে উসাইদ রাযি. কে মক্কার আমির নিযুক্ত করে নিজে মদিনায় ফিরে আসেন।

হুনাইন যুদ্ধ

মক্কা বিজয়ের পর সাধারণভাবে আরবরা ইসলাম কবুল করে। কেননা তাদের অধিকাংশ ছিল সে সব লোক যারা ইসলামের সত্যতার ওপর পূর্ণ বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও কুরাইশদের প্রতিপত্তির ভয়ে প্রকাশ্যে মুসলমান হওয়া থেকে বিরত ছিল এবং মক্কা বিজয়ের অপেক্ষায় ছিল। মক্কা বিজয়ের পর তারা সকলে দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিল। অবশিষ্ট আরবদের আর ইসলামের মোকাবেলা করার মতো দুঃসাহস বাকি থাকল না।

অবশ্য হাওয়াযিন ও সাকিফ গোত্রদ্বয় নিজস্ব আত্মমর্যাদাবোধের কারণে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ হয়ে মক্কার দিকে অগ্রসর হল। এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছলে তিনি ১২ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী যুদ্ধের জন্য সমবেত করলেন। যাদের মধ্যে দশ হাজার ছিলেন আনসার ও মুহাজির যারা মক্কা বিজয়ের সময় সঙ্গে ছিলেন। আর দু হাজার সেসব নও মুসলিম যারা মক্কা বিজয়ের সময় মুসলমান হয়েছিলেন।

এটা ছিল ইসলামি বাহিনীর তখনকার সময় পর্যন্ত সর্ববৃহৎ সংখ্যা। অষ্টম হিজরির ৬ শাওয়াল আল্লাহর এ বাহিনী যুদ্ধের জন্য রওনা হয়। তারা যখন হুনাইন উপত্যকার কাছে পৌঁছলেন তখন পাহাড়ের ঘাটিতে লুকিয়ে থাকা শত্রু সেনারা অতর্কিতভাবে মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

তখনো যেহেতু মুসলিম বাহিনী নিজেদের সৈন্যদের কাতার বিন্যাসও করে নি তাই ইসলামি সৈন্যের অগ্রভাগ প্রথমে কিছুটা পিছু হটতে লাগল। এ পিছু হটার বাহ্যিক কারণ যদিও মুসলিম বাহিনীর কাতার বিন্যাসের অপ্রস্তুতিকে দায়ি করা হয়, কিন্তু তার প্রকৃতকারণ ওটাই যেদিকে পবিত্র কুরআনে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ মুসলমানরা তখন তাদের চিরাচরিত অভ্যাসের বিপরীত নিজস্ব সংখ্যাধিক্য ও সাজ-সরঞ্জাম দেখে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলেন। কোনো কোনো সাহাবা এমনকি হযরত সিদ্দিকে আকবার রাযি.-এর মুখ দিয়েও একথা বের হয়েছিল, "আজ আমরা কোনো মতেই পরাজিত হতে পারি না।" তাই মহান রাব্বুল আলামিন তাদেরকে সতর্ক করার জন্য এ ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। যেন মুসলমানরা বুঝতে সক্ষম হয়, আমাদের যুদ্ধের হার-জিতটা বাহুবল আর তীর-তলোয়ারের খেলা নয়। বরং তা তো একমাত্র আল্লাহ পাকেরই হাতে

ایں ہمہ مستی و بیہوشی نہ حد بادہ بود + با حریفاں انچہ کرد آں نرگس مستانہ کرد

নার্গিসের কি শক্তি আছে বলো, মাতাল করে মোরে
আড়ালে তার যে আছে বিরাজ, স্মরি তারই জোরে।

বদরের যুদ্ধে নিরস্ত্র অবস্থায় মুসলিম বাহিনীর মহান বিজয় আর হুনাইনে (ব্যাপক সমরাস্ত্র ও সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও প্রথমে) পরাজয় বরণের রহস্য এটিই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন দুটি বর্ম পরিহিত অবস্থায় দুলদুল নামক একটি সাদা খচ্চরের ওপর আরোহী ছিলেন। মুসলিম সেনাদেরকে পিছু হটতে দেখে হুযুরের নির্দেশে হযরত আব্বাস রাযি. এক বীরত্বপূর্ণ আওয়াজ দিতে বলেন। যা শুনে সকলের স্খলিত পা পুনরায় জমে গেল এবং উভয় পক্ষে ঘোরতর লড়াই শুরু হয়ে গেল।

একটি মুজেযা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মুষ্টি মাটি নিয়ে শত্রুবাহিনীর দিকে নিক্ষেপ করলেন। আল্লাহর কুদরত সে মাটিকে বিরোধী শিবিরের প্রতিটি সৈন্যের চোখে এমনভাবে পৌঁছিয়ে দিলেন, একজনও এ থেকে রক্ষা পেল না। (মুগলতাই : ৭২)

অবশেষে শত্রুবাহিনী ভীত সন্ত্রস্ত ও পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। মুসলমানরা প্রতিশোধের স্পৃহায় বাচ্চা এবং মহিলাদের প্রতি হস্ত সম্প্রসারিত করতে উদ্যত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কাজ থেকে তাদেরকে নিষেধ করলেন।

(মুগলতাই : ৭২)

তায়েফ অভিযান

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফের প্রতি দৃষ্টি দিলেন। যেখানে ছিল হাওয়াযিন ও বনি সাকিফের কেন্দ্র। মুসলমানগণ আনুমানিক আঠার দিন পর্যন্ত তায়েফ অবরোধ করে রাখেন, কিন্তু তখনো বিজয় অর্জিত হল না। অতঃপর অবরোধ প্রত্যাহার করে সেখান থেকে ফিরে গেলেন। পথিমধ্যে জিরানা নামক স্থানে পৌঁছলে তায়েফের হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধি দল এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হুনাইনের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর হাতে তাদের বন্দীদের মুক্তি দান করার আবেদন জানায়, তাদের আবেদন মনযুর করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মুক্তি দিয়ে দেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফ থেকে মদিনা ফিরে আসলে তায়েফের একটি প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে মুসলমান হওয়ার আবেদন জানায় এবং পরে ইসলাম গ্রহণ করে সকলেই ধন্য হয়। (মুগলতাই : ৭৪)

ওমরায়ে জিরানা

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিরানা থেকেই ওমরা পালনের ইচ্ছা পোষণ করেন। ইহরাম বেঁধে মক্কা মুআযযমায় তাশরিফ নিয়ে যান এবং ওমরা শেষে পুনরায় মদিনায় ফিরে আসেন। অষ্টম হিজরির ৬ যিকদাহ মাসে তিনি মদিনা প্রবেশ করেন।

নবম হিজরি

তাবুক যুদ্ধ এবং ইসলামে চাঁদা প্রচলন

তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর নবম হিজরির মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি জানতে পারলেন, মুতার যুদ্ধে পরাজিত রোমানরা মুসলমানদের সাথে পুররায় যুদ্ধের জন্য তাবুক নামক স্থানে (মদিনা থেকে ১৪ মনযিল দূরত্বে অবস্থিত) বিপুল সৈন্যের সমাবেশ ঘটিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন। কিন্তু তখন দুর্ভিক্ষের কারণে মুসলমানরা ছিল অভাব-অনটন ও আর্থিক দৈন্যতার শিকার। তাছাড়া প্রচণ্ড গরম ছিল। এতদসত্ত্বেও আত্মত্যাগী সাহাবায়ে কেরামের মাঝে শুরু হয়ে গেল জিহাদের পূর্ণ প্রস্তুতি। জিহাদের জন্য চাঁদা সংগ্রহ শুরু হলে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযি. ঘরের সমস্ত আসবাব এনে জমা দিলেন। হযরত উসমান রাযি. দিলেন যুদ্ধ উপকরণের এক বিপুল ভাণ্ডার। যার মধ্যে ছিল ৯ শ উট ও ১ শ ঘোড়া।

কতিপয় মুজেযা

অভিযানে যাওয়ার পথে হযরত আবু যর গিফারি রাযি.-কে সকল থেকে পৃথক হয়ে একাকী পথ চলতে দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে পার্থিব জগত থেকে পৃথক হয়ে চলবে, পৃথক জীবন-যাপন করবে এবং জনপদ থেকে দূরে কোথাও পৃথক হয়েই মৃত্যুবরণ করবে। পরবর্তীতে ঠিক এমনই হয়েছিল। অভিযানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটটি হারিয়ে গেলে তাঁকে অহির মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছিল, উটের লাগাম একটি গাছের সাথে অমুক স্থানে জড়িয়ে গেছে। সেখানে গিয়ে দেখা গেল, ঘটনাটি ঠিক তদ্রুপই। (সীরাতে মুগলতাঈ : ৭৭)

অবশেষে তাবুক গিয়ে দেখা গেল সেখানে মানুষের কোনো চিহ্নমাত্রও নেই। হিরাক্লিয়াস হেমস চলে গিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদকে উকাইদির নামক এক খ্রিস্টানের কাছে পাঠালেন এবং ভবিষ্যৎদ্বাণী স্বরূপ বললেন, তুমি রাত্রি বেলায় তার সাক্ষাৎ পাবে। খালিদ রাযি. সেখানে পৌঁছলে ঠিক এ ঘটনাই দেখতে পেলেন এবং তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে এলেন।

মুসলিম বাহিনী সেখানে ১৫/২০ দিন অবস্থান করেন। কিন্তু কোনো যুদ্ধ হয় নি। তাই ফিরে আসার মনস্থ করেন। এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সর্বশেষ যুদ্ধ । ৯ম হিজরির রমযান মাসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা এসে পৌঁছেন।

মসজিদে যেরারে অগ্নিসংযোগ

মুতা অভিযান থেকে ফিরে আসার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের নামে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার উদ্দেশ্যে মুনাফিক কর্তৃক নির্মিত মসজিদে যেরারে অগ্নিসংযোগের নির্দেশ দেন। মুসলমানদের সাথে প্রতারণার উদ্দেশ্যে তারা তার নাম মসজিদ রেখেছিল। মসজিদে যেরার প্রকৃত পক্ষে কোনো মসজিদই ছিল না।

দলে দলে ইসলাম গ্রহণ

হুদাইবিয়ার সন্ধির পর যখন রাস্তা নিরাপদ হয়ে গেল তখন ইসলাম ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করল। যার জন্য নিরাপদ পরিবেশেরই প্রয়োজন ছিল। আর এ কারণেই আসমানি দফতরে এ সন্ধিকে বিজয় নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও কিছু সংখ্যক লোক কুরাইশদের চাপের মুখে ইসলাম গ্রহণে সক্ষম হচ্ছিল না। মক্কা বিজয় এ সমস্যারও অবসান ঘটিয়ে দেয়। এদিকে কুরআন শরীফ আরবের ঘরে ঘরে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও স্বীয় অলৌকিক ক্ষমতা বলে সকলের হৃদয় মন জয় করে নেয়। যার ফলশ্রুতিতে যে সব লোক কোনো এক সময় ইসলাম ও মুসলমানদের চেহারা দেখতেও প্রস্তুত ছিল না। তারাই এখন দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করে প্রতিনিধি দলের আকারে

মহানবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে স্বেচ্ছায় উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ পূর্বক স্বীয় জান-মাল কোরবান করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। এ সকল প্রতিনিধি দলের অধিকাংশই নবম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আগমন করেছিল।

সাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি দল : তাবুক যুদ্ধ শেষে মদিনা প্রত্যাবর্তনের পর পরই সাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি দল মদিনায় উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যায়। এর পরপরই প্রতিনিধি দল আগমনের ধারা শুরু হয়ে যায়। যাদের সংখ্যা ৭০ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

বনি ফাযারা গোত্রের প্রতিনিধি দল : এরা পূর্বেই মুসলমান হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়।

বনি তামীম গোত্রের প্রতিনিধি দল : বনি তামীম গোত্রের লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দরবারে উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলাপ-আলোচনার পর সম্মিলিতভাবে সকলেই মুসলমান হয়ে দেশে ফিরে যায়।

বনি সাদ বিন বকরের প্রতিনিধ দল : এ প্রতিনিধি দলের নেতা ছিলেন যিমাম বিন সা'লাবা। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বিভিন্ন বিষয়ের উপর বেশ কিছু প্রশ্ন করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিয়ে তাকে ইসলাম সম্পর্কিত সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে দেন। অতঃপর তিনি মুসলমান হয়ে নিজ গোত্রে ফিরে গিয়ে লোকদের মাঝে দীনের দাওয়াত দেন, যার ফলে গোত্রের সকলে মুসলমান হয়ে যায়।

কিন্দা-এর প্রতিনিধি দল : সূরা সাফফাত-এর প্রথম কয়েকটি আয়াত শুনেই তাদের মনে ইসলাম স্থান করে নেয়।

বনি আবদুল কায়েসের প্রতিনিধি দল : বনি আবদুল কায়েস গোত্রের লোকেরা পূর্বে ছিল খৃস্টান। অতঃপর সকলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে মুসলমান হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ইসলামের জরুরি বিষয়গুলোর ওপর তালিম দেন।

বনি হানীফার প্রতিনিধি দল : বনি হানিফার লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে মুসলমান হয়। এদের মধ্যে মুসায়লামাও অন্তর্ভূক্ত ছিল। মুসায়লামা পরবর্তীতে নবুয়তির দাবি করে এবং মুসায়লামা কায্যাব নামে প্রসিদ্ধ হয়। আর মিথ্যা নবুয়তের দাবি করার কারণেই সে হযরত সিদ্দীকে আকবার রা-এর খেলাফতকালে সাহাবায়ে কেরামের হাতে সাথী-সঙ্গীসহ নিহত হয়।

উল্লেখ্য : মুসায়লামা কাযযাব নবুয়তের দাবি করার সময়ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, কুরআন ও ইসলামের অস্বীকারকারী ছিল না। ইমামুল হাদীস

ওয়াত তাফসির শায়খ আবু জাফর তাবারী স্বীয় ইতিহাস গ্রন্থে লিখেন, মুসায়লামা স্বীয় মুয়াযযিনকে আযানের মধ্যে اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ বলার নির্দেশ দিয়েছিল।

কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর কোনো প্রকার নবুয়তের দাবিই বৈধ নয় বরং কুরআন হাদীস ও ইজমার অসংখ্য দলীল দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয়, সাধারণভাবে নবুয়তের দাবিই খতমে নবুওয়তকে অস্বীকার করার নামান্তর। তাই সাহাবায়ে কেরামের সম্মিলিত মত এই, মুসায়লামা যে শরিয়তহীন নবী দাবি করেছে, তা কুফরী এবং ধর্ম ছেড়ে দিয়ে মুরতাদ হয়ে যাওয়ার শামিল এবং সাহাবায়ে কেরামের সম্মিলিত মতামতের ভিত্তিতেই তার সাথে জিহাদ করা হয়েছিল। তার আযান, নামায ও কুরআন তিলাওয়াত তাদের কাফির বলা থেকে বিরত রাখেনি।

মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর নবুয়তীর দাবি মুসায়লামার দাবি অপেক্ষা জঘন্যতম। তার অপরাধ শুধু এ নয় যে সে নিজেকে সকল নবীর চেয়ে উত্তম দাবি করে বরং অনেক নবীদের ব্যাপারে এমন দুঃখজনক ও অশালীন অবমাননাকর মন্তব্য করে, যা কোনো সভ্যলোকের পক্ষে সম্ভব নয়। বিশেষ করে হযরত ঈসা আ.-কে সে নগ্ন ভাষায় এমন সব বাজারী গালি দিয়েছে যা শুনে কোন মুসলমানের পক্ষেই ধৈর্য্যধারণ করা সম্ভব নয়, যার সত্যতা খোদ তার রচিত কিতাব দ্বারা সকলেই যাচাই করে নিতে পারে।

এ ধরণের আরো অসংখ্য মুশরিকসুলভ দাবির প্রেক্ষিতে আলেমগণ সম্মিলিতভাবে যদি তার কুফরির ফতোয়া দেয়, এবং তার নামায, রোযা ও তাদের চিন্তা প্রসূত ইসলাম প্রচারের পরোয়া না করে তাহলে তা হবে সাহাবায়ে কেরামের আদর্শেরই পূর্ণ অনুসরণ। এ ব্যাপারে ওলামাদের সমালোচনা করা কোনো মতেই উচিত নয়।

বনি কাহতানের প্রতিনিধি দল : বনি কাহতানের প্রতিনিধি দলের প্রধান ছিল যায়েদ আল খাইল। তারাও সকলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে মুসলমান হয়ে যায়।

বনি হারেসের প্রতিনিধি দল : এ দলের মধ্যে বিখ্যাত সাহাবী খালিদ বিন ওয়ালিদও ছিলেন। তিনি সকল সাথী সঙ্গীসহ মুসলমান হয়ে যান।

তেমনিভাবে বনি আসাদ, বনি মাহারিব, হামদান, গাসসান ইত্যাদি গোত্রের লোকেরা কেউ তো হুযুরের দরবারে উপস্থিত হওয়ার আগেই, আবার কিছু লোক হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। হিমইয়ারের সর্দারগণ যাদেরকে আপন আপন দলের বাদশা মনে করা হয় তাদের পক্ষ থেকে দূতেরা এ সংবাদ নিয়ে এল যে তারা সকলে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছে।

এমনিভাবে পায়ে হেটে ও ঘোড়ার পিঠে চড়ে দূর-দূরান্ত থেকে প্রতিনিধি দল এসে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। তাই দশম হিজরিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের সঙ্গে লক্ষাধিক মুসলমান হজে অংশগ্রহণ করেন। আর যারা হজে অংশগ্রহণ করতে পারে নি তাদের সংখ্যা হজযাত্রী অপেক্ষা কয়েকগুণ বেশি ছিল।

হজের আমির নিযুক্ত হওয়া

নবম হিজরির যিলকদ মাসে তাবুক অভিযানের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর সিদ্দিক রাযি.-কে হজ প্রধান হিসাবে মক্কায় প্রেরণ করেন।

দশম হিজরি

বিদায় হজ্ব :

দশম হিজরির ২৫ যিলকদ সোমবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লক্ষাধিক সাহাবায়ে কেরামের এক বিশাল জামাত নিয়ে মক্কাভিমুখে রওনা হলেন। মদিনা থেকে ছয় মাইল দূরে যুলহুলাইফা নামক স্থানে গিয়ে ইহরাম বাঁধেন এবং যিলহজ মাসের ৪ তারিখ রোজ শনিবার মক্কায় প্রবেশ করে ইসলামি বিধান মতে হজ করেন।

বিদায় হজ্জের ভাষণ : যিলহজ মাসের ৯ তারিখে আরাফার ময়দানে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক দীর্ঘ ভাষণ দেন, যা ছিল উপদেশ ও আল্লাহর বিধানে পরিপূর্ণ। আখেরী নবীর এই অন্তিম ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি প্রতিটি মানুষের হৃদয় পটে অঙ্কিত করে রাখা উচিত।

"হে লোক সকল! তোমরা আমার কথা শোন, যেন আমি প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো তোমাদের সম্মুখে তুলে ধরতে পারি। জানি না আগামী বছর পুনরায় তোমাদের সঙ্গে মিলিত হতে পারব কি না। এর পর বললেন : মুসলমানদের জান-মাল ইজ্জত আবরূ তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে, যেভাবে এদিন (আরাফার দিন) এ মাস (যিলহজ) এবং এ শহরের অমর্যাদা করা তোমাদের জন্য হারাম। সুতরাং কারো নিকট কারো আমানত থাকলে তা আদায় করে দাও। অতঃপর তিনি এরশাদ করেন-

"হে লোক সকল! তোমাদের উপর মহিলাদের কিছু হক রয়েছে এবং মহিলাদের উপর তোমাদের কিছু হক রয়েছে।"

"হে লোক সকল! এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই স্বরূপ। এক ভাইয়ের মাল তার স্বেচ্ছায় অনুমতি ব্যতীত অপরের জন্য ব্যবহার করা হারাম। আমার (মৃত্যুর) পর তোমরা কাফের হয়ে গিয়ে একে অপরকে হত্যা করে ফেল না। আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর কিতাব রেখে যাচ্ছি। যদি তোমরা তার ওপর সঠিকভাবে আমল করতে থাক তাহলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। এরপর তিনি বললেন– "হে লোক সকল! তোমাদের রব এক, তোমাদের পিতা এক, তোমরা সকলে আদম আ. এর সন্তান। আদম আ. মাটির সৃষ্টি। তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানী ওই ব্যক্তি যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু। কোনো আরব কোনো অনারবের উপর তাকওয়া ও আল্লাহভীরুতা ব্যতীত অন্য কোনো

কারণে প্রাধান্য পেতে পারে না। তোমরা স্মরণ রেখো আমি দীনের দাওয়াত তোমাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছি। হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী, আমি তোমার বাণী পৌঁছে দিয়েছি। যারা আজ এখানে উপস্থিত আছে তাদের উচিত অনুপস্থিতদের নিকট এ বাণীসমূহ পৌঁছে দেওয়া।

হজ সমাপন করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশ দিন মক্কায় অবস্থান করে পুনরায় মদিনা প্রত্যাবর্তন করেন।

একাদশ হিজরি

সারিয়ায়ে উসামা

মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর একাদশ হিজরির ২৬ সফর রোজ সোমবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোমানদের সাথে জিহাদের জন্য সিদ্দিক আকবার রাযি. ফারুকে আযম রাযি. ও আবু উবায়দা রাযি. এর মতো শীর্ষ স্থানীয় সাহাবীদের সমন্বয়ে এক বাহিনী গঠন করেন। সে বাহিনীর প্রধান নিযুক্ত হন হযরত উসামা রাযি.। এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামর প্রেরিত সর্বশেষ অভিযান যার ব্যবস্থাপনা তিনি নিজেই করেছিলেন। এ বাহিনী রওনা করার পূর্বেই তিনি জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়েন।

অন্তিম রোগ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাদশ হিজরির ২৮ সফর বুধবার দিবাগত রাতে বাকিয়ে গারকাদ নামক কবরস্থানে গিয়ে কবরবাসীদের জন্য মাগফিরাতের দুআ করেন। দুআ শেষে তিনি বলেন, হে কবরবাসী! তোমাদের কবরের বর্তমান অবস্থা মোবারক হোক। কেননা পৃথিবীতে এখন ফেৎনা ফাসাদ ছড়িয়ে পড়েছে। অতঃপর সেখান থেকে ফিরে আসতেই মাথা ব্যথা ও জ্বর শুরু হয়ে যায়।

সহি বর্ণনা মতে এই জ্বর একাধারে তেরদিন স্থায়ী ছিল। এবং এ রোগেই তিনি ইনতেকাল করেন। এ সময়ে তিনি নিয়ম অনুযায়ী স্বীয় স্ত্রীগণের গৃহ পালাক্রমে পরিবর্তন করতে থাকেন। কিন্তু যখন রোগের মাত্রা বৃদ্ধি ও দীর্ঘ হয়ে গেল তখন অসুস্থতার দিনগুলো আয়েশা রাযি. গৃহে কাটানোর জন্য অন্যান্য বিবিগণের নিকট অনুমতি চাইলে সবাই অনুমতি দিয়ে দিলেন।

হযরত আবুবকর সিদ্দীক রাযি. এর ইমামতি

ধীরে ধীরে রোগ এত বৃদ্ধি পেল, তিনি মসজিদে যাওয়ার শক্তিও হারিয়ে ফেললেন। তাই তিনি বললেন, সিদ্দিকে আকবারকে বললেন, তিনি যেন নামাযের ইমামতি করেন। হযরত সিদ্দিকে আকবার আনুমানিক ১৭ ওয়াক্ত নামাযের ইমামতি করেন। ঘটনাক্রমে একদিন সিদ্দীকে আকবার রাযি. ও আব্বাস রাযি. আনসারদের এক সমাবেশের নিকট দিয়ে কোথাও যাওয়ার সময় দেখলেন, তারা কাঁদছেন। কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে

তারা বললেন- হুযুরের মজলিসের কথা স্মরণ করে আমরা কাঁদছি। হযরত আব্বাস রাযি. এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পৌঁছিয়ে দিলে তিনি একদিন আলি রাযি. ও হযরত ফযল রাযি.-এর কাঁধের উপর ভর দিয়ে বাইরে তাশরিরফ আনলেন। তখন হযরত আব্বাস রাযি. আগে আগে চলছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারে আরোহণ করে প্রথম সিঁড়িতেই বসে পড়েন আর উপরে উঠতে পারছিলেন না। মিম্বারে বসে তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দান করেন, যার কিছু অংশ নিম্নে উল্লেখ করা হল।

শেষ নবীর শেষ ভাষণ

"হে মানবমণ্ডলী! আমি জানতে পেরেছি, তোমরা তোমাদের নবীর মৃত্যুর ব্যাপারে শঙ্কিত। আমার পূর্বে কি আর কোনো নবী চিরঞ্জীব ছিলেন, আমিও তদ্রুপ হব? আমি আমার পালনকর্তার (রবের) সাথে মিলিত হতে চলে যাব। আর তোমরাও আমার সাথে মিলিত হবে। তোমাদের মিলন কেন্দ্র হবে "হাউজে কাউসার"। সুতরাং যার আকাঙ্ক্ষা আছে কেয়ামতের দিন হাউজে কাউসার থেকে পানি পান করে তৃপ্ত হবে, সে যেন স্বীয় হাত ও যবানকে অনর্থক ও অহেতুক কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখে। আমি তোমাদেরকে "মুহাজির" ভাইদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার উপদেশ দিচ্ছি। আর মুহাজিররা যেন পরস্পরে ঐক্য ও সম্প্রীতি বজায় রেখে চলে।

আরো বললেন : মানুষ যদি আল্লাহর হুকুম মেনে চলে তাহলে তাদের শাসকবর্গও তাদের সাথে ইনসাফ করেন, আর যদি তারা স্বীয় পরওয়ারদেগার-এর নাফরমান ও অবাধ্য হয় তাহ্লে শাসকগণও তাদের উপর নির্দয় আচরণ করেন। অতঃপর তিনি ঘরে তাশরিফ নিয়ে গেলেন। মৃত্যুর পাঁচ দিন বা তিন দিন পূর্বে পুনরায় একবার ঘর থেকে বের হন, তখন তাঁর মাথা কাপড় দিয়ে বাঁধা ছিল। হযরত সিদ্দিকে আকবার রাযি. তখন নামাযের ইমামতি করছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে পেছনে সরে যেতে উদ্যত হলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম তাকে হাতের ইশারায় নিষেধ করলেন এবং নিজে আবু বকর রাযি. বাম পাশে বসে গেলেন। অতঃপর নামায শেষে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি বলেন : "আবু বকর আমার সবচেয়ে বেশি হিতাকাঙ্ক্ষী। আমি যদি আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কাউকে খলীল বা প্রকৃত বন্ধু বানাতাম তাহলে আবু বকরকেই বানাতাম। কিন্তু আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আমার কোনো খলীল বা প্রকৃত বন্ধু নেই। তাই আবু বকর আমার দোস্ত ও ভাই। তিনি আরো বলেন : মসজিদের দিকে যত লোকের (ঘরের) দরজা আছে আবু বকর এর দরজা ব্যতীত অন্য সবারগুলো বন্ধ করে দেওয়া হোক।" (ফাতহুল বারী : ৩৫৬)

মুহাদ্দিস ইবনে হিব্বান এ হাদিসটি বর্ণনা করার পর বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতেকালের পর হযরত আবু বকর রাযি. ই যে ইসলামী দুনিয়ার খলিফা আলোচ্য হাদীসে এর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। এটা যোহরের নামায

ছিল। ওই সময় হযরত কেনানা রাযি. এর মুকতাদী ছিলেন। অবশ্য আবু বকর রাযি. উচ্চ আওয়াজে তাকবির বলছিলেন।

এরপর রবিউল আউয়ালের ২ তারিখ সোমবার লোকেরা ফজরের নামায হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-এর পেছনে আদায় করছিলেন। এ সময় হঠাৎ তিনি হযরত আয়েশা রাযি.-এর কামরার পর্দা উঠিয়ে লোকদের দেখলেন এবং মুচকি হাসলেন। হযরত সিদ্দিকে আকবার এটা দেখে পেছনে সরে যাচ্ছিলেন এবং আনন্দের আতিশয্যে সাহাবায়ে কিরামের মনও বিক্ষিপ্ত হতে লাগল।

دو نمازم خم ابروی تو چوں یاد آمد + حالتے رفت کہ محراب بفریاد آمد

নামাযের ভিতর তোমার মায়া-রূপ আসি যখন ভেসে ওঠে প্রাণে,

মেহরাব এসে নীরবে তখন তোমার কথা কয় আমার কানে কানে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে হাতের ইশারায় বললেন তুমিই নামায পূর্ণ কর। এ বলে তিনি পর্দা ছেড়ে দিয়ে ভেতরে চলে গেলেন। এরপর আর কখনো ঘর থেকে বের হন নি।

সেদিনই তিনি যোহরের নামাযের পর এ নশ্বর জগৎ ত্যাগ করে পরম বন্ধু আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হয়ে যান। إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

বুখারী শরীফের সঠিক বর্ণনা অনুযায়ী তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর মাত্র।

ইনতেকালের তারিখ নিয়ে প্রচলিত মত হল ১২ ই রবিউল আউয়াল মৃত্যু হয়। অধিকাংশ ঐতিহাসিক এ তারিখ লিখে আসছেন। কিন্তু গণনা অনুযায়ী কোন মতেই এ তারিখ হতে পারে না। কেননা এতে সবাই একমত এবং এটাও নিশ্চিত, ইনতেকাল সোমবারে হয়েছে। এটাও নিশ্চিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজের দিন ৯ই যিলহজ্জ জুমার দিন হয়েছে। এ দুটো মিলালে ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার হয় না। তাই হাফেয ইবনে হাজার রহ. সহি বুখারীর শরাহর মধ্যে বিস্তারিত আলোচনার পর বলেছেন, তারিখ ২রা রবিউল আউয়াল। অনুলিখনের ভুলে ২ এর জায়গায় ১২ হয়েছে এবং আরবী বাক্যে ثانی شهر ربیع الاول এর পরিবর্তে ثانی عشر ربیع الاول হয়ে গেছে। হাফেয মুগলতাঈ ২ তারিখকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।]

নবীজির অন্তিম বাণীসমূহ

হযরত আয়েশা রাযি. বলেন-অন্তিম রোগ শয্যায় শায়িত অবস্থায় কখনো কখনো চেহারা মোবারক থেকে চাদর উঠিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন- ইহুদি খৃস্টানদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত এজন্য পতিত হয়েছিল যে তারা তাদের নবীদের কবর সমূহকে সিজদার স্থান বানিয়েছিল। এ কথা দ্বারা রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানরা যেন এ জঘন্য গুনাহের কাজ থেকে বিরত থাকে। (বুখারী : ১০৫)

বড়ই পরিতাপের বিষয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অন্তিম মুহূর্তে যে বিষয়ে মানুষদেরকে সতর্ক করেছেন বর্তমান মুসলিম জাতি তা ছাড়েনি এবং আজও তারা ওলী বুযুর্গদের কবরকে সিজদার স্থান বানিয়ে নিয়েছে। (নাউযুবিল্লাহ মিনহু)

হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাদের দিকে তাকিয়ে বলছিলেন : اَللّٰهُمَّ الرَّفِيْقَ الْاَعْلٰى

"হে আল্লাহ আমি রফীকে আলা বা পরম বন্ধুকে পছন্দ করি।"

কোনো কোনো বর্ণনায় আছে : অন্তিম মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে যতক্ষণ আওয়াজ শোনা গিয়েছে ততক্ষণ اَلصَّلٰوةَ الصَّلٰوةَ (তোমরা নামাযে অবহেলা করো না) এ বাক্যসমূহই জারি ছিল। –খাসায়েসে কুবরা

ইমাম বায়হাকী রহ. হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন : মুখে اَلصَّلٰوةَ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ এই বাক্যটি উচ্চারিত হচ্ছিল অর্থাৎ নামায ও ওই সমস্ত লোকদের হক বা দায়িত্বের প্রতি ভালো করে খেয়াল রাখবে, যারা তোমাদের অধীন।]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের সংবাদ সাহাবায়ে কেরামগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথেই সকলে শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। ফারূকে আযম এর ন্যায় শীর্ষস্থানীয় সাহাবাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতেকালই অস্বীকার করে বসেন। সে সংকটময় মুহূর্তে হযরত সিদ্দীকে আকবার রাযি. সেখানে উপস্থি হয়ে সকলকে ধৈর্য্যধারণের উপদেশ দিয়ে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ দান করেন। ভাষণে তিনি বলেন- "যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইবাদত করত তারা জেনে রাখুক যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইনতেকাল করেছেন। আর যারা মহান রাব্বুল আলামীনের ইবাদত করত তারা জেনে রাখুক তিনি "চিরঞ্জীব সর্বদা বিরাজমান তিনি এখনো জীবিত আছেন।" এ ভাষণ শুনে সাহাবাদের মাঝে চেতনা কিছুটা ফিরে এল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল তাদের পরবর্তী খলিফা নির্বাচন করা। কেননা পার্থিব ও ধর্মীয় বিভিন্ন সমস্যাবলির সমাধানে নানাবিধ জটিলতা, আভ্যন্তরীন ও বহির্বিশ্বের হামলার সম্ভাবনা এবং স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাফন দাফনের ব্যাপারেও মতবিরোধের ছিল প্রবল সম্ভাবনা। তাই সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাফন-দাফনের পূর্বেই মুসলিম বিশ্বের পরবর্তী খলিফা নির্বাচন করাকে জরুরি মনে করলেন এবং এ বিষয়ের সমাধান করতে বেশ

সময় লেগে যায়। তাই এ কারণেই সোমবার দিনের বাকি অংশসহ বুধবার রাত পর্যন্ত কাফন-দাফনে বিলম্ব হয়ে যায়। বুধবার রাত্রে হযরত আলি রাযি. ও আব্বাস রাযি. প্রমুখ সাহাবায়ে কিরাম দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গোসল ও কাফন কার্য সম্পাদনের পর তাঁর নামাযে জানায পড়া হয়।

হাদিসের ভাষ্যানুযায়ী হযরত আয়েশা রাযি. এর গৃহের ওই স্থানে কবর খনন করা হয় যেখানে তিনি ইনতেকাল করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর খনন করেন হযরত আবু তালহা রাযি.। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কবর শরীফে অবতরণ করান হযরত আলি ও আব্বাস রাযি. প্রমুখ সাহাবাগণ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর শরীফ অর্ধহাত পরিমাণ উঁচু রাখা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী সংক্ষেপে আলোচনার পর হুযুরের পবিত্র চরিত্রমাধুরী সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করা সমীচীন মনে করলাম। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে তদানুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করুন।

নবীজির চরিত্র

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সকলের চেয়ে বেশি সাহসী বীর ও সবচেয়ে বেশি দানশীল। তাঁর কাছে কেউ কিছু চাইলে সাথে সাথে তা দান করে দিতেন। তিনি ছিলেন সবচেয়ে বেশি ধৈর্য্যশীল ও সহনশীল। একবার সাহাবায়ে কেরাম কোনো কাফের সম্প্রদায়ের জন্য বদদুআ করতে বললে তিনি বলেন, আমি তো এসেছি রহমত স্বরূপ, আযাব হয়ে আসি নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাঁত মোবারক শহিদ করা হলে তখনও তিনি তাদের জন্য মাগফেরাতের দুআ করতে থাকেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সকলের চেয়ে বেশি লজ্জাশীল। তাঁর দৃষ্টি কখনো কারো চেহারার উপর স্থির হয়ে থাকত না। নিজের ব্যক্তিগত কোন ব্যাপারে কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন না এবং রাগান্বিতও হতেন না। কিন্তু দীনের ব্যাপারে কোনো প্রকার অবৈধ হস্তক্ষেপ (সীমালঙ্গন) তিনি সহ্য করতে পারতেন না। আর তিনি ক্রোধান্বিত হলে তার সম্মুখে থাকার সাধ্য কারো ছিল না। যখন তাকে দুটি কাজের কোনো একটি করার অধিকার দেওয়া হত তখন তিনি সহজটিই গ্রহণ করতেন, যেন উম্মতের জন্য সহজ হয়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো খাবারের দোষ ধরতেন না। রুচিকর হলে খেয়ে নিতেন, নতুবা রেখে দিতেন। তিনি কখনো হেলান দিয়ে বা টেবিলে খানা খেতেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কখনো পাতলা চাপাতি রুটি তৈরি করা হয় নি। তিনি শসা এবং খরবুযা ফল খেজুরের সঙ্গে মিশিয়ে খেতেন। স্বভাবতই তিনি মধু ও সকল মিষ্টিদ্রব্য পছন্দ করতেন।

হযরত আবু হোরায়রা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার পরিবারবর্গ জীবনভর কখনো যবের রুটি পেট ভরে আহার করেন নি। রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারে কখনো কখনো এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হত, দু মাস যাবত চুলায় আগুন জ্বালানোর সুযোগ হত না। তখন তারা শুকনা খেজুর আর পানি দিয়েই জীবিকা নির্বাহ করতেন। তিনি নিজের জুতা নিজেই সেলাই করতেন এবং নিজের কাপড়ে নিজেই তালি লাগাতেন। পারিবারিক কাজে সহযোগিতা করতেন এবং রোগীদের সেবাযত্ন করতেন। ধনী বা গরীব হোক যে কেউ তাকে দাওয়াত দিলে তিনি তা সাদরে গ্রহণ করতেন। কোনো গরীব লোককে দরিদ্রতার কারণে অবজ্ঞা করতেন না। আর প্রতাপশালী বাদশার প্রতি তার রাজত্বের কারণে প্রভাবিত হতেন না। স্বীয় গোলামকে সওয়ারীর পেছনে আরোহণ করাতেন। মোটা কাপড় পরিধান করতেন। সেলাই করা জুতা ব্যবহার করতেন। সাদা কাপড় ছিল তার কাছে অধিক পছন্দনীয়। সর্বদা আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকতেন ও অনর্থক কথাবার্তা থেকে বিরত থাকতেন। তিনি নামায দীর্ঘ করতেন এবং খুতবা খুব সংক্ষিপ্ত করতেন। সুঘ্রাণ ছিল তাঁর পছন্দনীয়, আর দুর্গন্ধ ছিল তাঁর ঘৃণার বস্তু। গুণী ব্যক্তিদের সম্মান দিতেন। কারো সঙ্গে অভদ্র আচরণ করতেন না। বৈধ খেলাধুলা দেখলে নিষেধ করতেন না। কখনো কখনো হাসি মজাক এবং বিনোদনমূলক কথাবার্তা বলতেন। সে ক্ষেত্রেও তিনি কখনো অসত্যের আশ্রয় গ্রহণ করতেন না। পৃথিবীর সকল মানুষের চেয়ে বেশি হাসি খুশি এবং শ্রেষ্ঠ চরিত্রবান ছিলেন। কেউ অপারগতার দোহাই দিলে তিনি তা মেনে নিতেন।

হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র ছিল আল-কুরআন। কুরআনের দৃষ্টিতে যা পছন্দনীয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছেও তাই পছন্দনীয়। আর কুরআনের দৃষ্টিতে যা অপছন্দনীয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছেও তা-ই অপছন্দনীয় ছিল।

হযরত আনাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামর শরীর মোবারকের সৌরভের ন্যায় এত উত্তম অন্য কোন সৌরভের ঘ্রাণ আমি গ্রহণ করি নি।

নবীজির মুজেযা

দুনিয়ার রাজা-বাদশারা যখন কোনো ব্যক্তিকে কোনো প্রদেশের গভর্ণর নিযুক্ত করেন, তখন এমন কিছু নিদর্শনাবলী তার সঙ্গে দিয়ে দেন, যা দেখে জনগণ তার শাসক হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে পারে। যেমন সেবক, দাস-দাসী, সেনাবাহিনী এবং এমন কিছু অধিকার যা সাধারণের নিকট থাকে না। তেমনিভাবে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পৃথিবীতে আগমণ করেন তখন তার সাথে সততা, ন্যায়নিষ্ঠা, উত্তম চরিত্র এবং মানবীয় গুণাবলীর পরিপূর্ণতার পাশাপাশি একটি অলৌকিক শক্তিও সঙ্গে নিয়ে আসেন যার দ্বারা বিরুদ্ধবাদীদের মস্তক তাদের সম্মুখে অবনত হয়ে আসে। এই সকল অলৌকিক শক্তি আর অসম্ভবকে সম্ভব করার প্রকৃতির উর্ধ্বের ক্ষমতাসমূহকে মুজেযা বলা হয়ে থাকে।

আমাদের প্রিয়নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুজেযাসমূহ সংখ্যা এবং গুণগত মানের দিক থেকে পূর্ববর্তী সকল আম্বিয়া থেকে অধিক এবং উত্তম। পূর্ববর্তী নবীগণের মু'জেযাসমূহ তাদের জীবন পর্যন্তই সীমিত ছিল।

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রদত্ত মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের মুজেযা অদ্যবধি সকল মুসলিম সম্প্রদায়ের হাতে হাতে রয়েছে, যার মোকাবেলা করতে মানব-দানবের সকল শক্তি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এতদ্ব্যতীত চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করা, আঙ্গুল থেকে পানি প্রবাহিত হওয়া, কঙ্করের তাসবীহ পাঠ করা, কাঠের খুঁটির ক্রন্দন, হাজারো ভবিষ্যদ্বাণীর সবকটিই দিবালোকের মত সত্য প্রমাণিত হওয়া ইত্যাদি। হাজারো মুজেযা রয়েছে যা শুধু কুরআন আর সহি হাদিস দ্বারাই প্রমাণিত নয় বরং কাফের মুশরিকের সাক্ষ্য দ্বারাও প্রমাণিত হয়েছে, যেগুলোকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ওলামায়ে কেরাম পৃথক গ্রন্থের মধ্যে সন্নিবেশিত করেছেন। আল্লামা সুয়ূতী কর্তৃক রচিত খাসায়েসে কুবরা এবং পরবর্তী আলেমদের উর্দূ ভাষায় রচিত আল কালামুল মুবীন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ক্ষুদ্র পরিসরে তার বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভবপর নয়। তাই এখানে সমাপ্ত হল।

সমাপ্ত

হিজরতের পর মদীনায় ইয়াহুদী অবস্থানসমূহ

কোরাইশদের বাণিজ্যিক পথ